বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

বাংলা
মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের প্রাক্তন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অধ্যাপক এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যক্ষ



এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার)
কলিকাতা—৭৩

প্রকাশক :
দীপক ভট্টাচার্য
এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০৭৩

দ্বাদশ সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০০০

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শিল্পাচার্য যামিনী রায়

মুদ্রাকর :
ডি অ্যাণ্ড পি গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ
১৪৩ ওল্ড যশোর রোড, গঙ্গানগর
কলকাতা ৭০০১৩২, ফোন : ২৫৩৮ ৮৮৮০

মায়ের হাতে দিলাম

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসরচনায় লেখক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য যে অসামান্য পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। দুর্গম ও বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে তিনি প্রভূত তথ্য সংগ্রহ এবং সতর্কতার সাথে প্রমাণ বিশ্লেষণ করে তার ঐতিহাসিকতা নির্ণয় করেছেন। এই মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যেই বাংলা কাব্যধারার প্রথম আত্মপ্রকাশের অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের পরিণতি আলোচনা-কার্যে এই বইখানি বিশেষ সহায়তা করতে পারবে, এ জন্যে লেখক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সন্ধানকারীদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩।১২।৩৯

পরিচায়িকা

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের রসজ্ঞ ও রসানুসন্ধানী পাঠকের অভাব আছে কি না জানি না, কিন্তু এ পর্যন্ত ইহার সম্বন্ধে যাহা কিছু অন্বেষণ বা আলোচনা হইয়াছে, তাহা পর্যাপ্ত বা প্রচুর বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন বাঙ্গালা দেশ বুঝিতে হইলে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য না বুঝিলে চলিবে না; কিন্তু এই সাহিত্যের একটি সুসংযত ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। উদাসীনতার কথা ছাড়িয়া দিলেও, এই কাজের যোগ্যতা ও অধিকার সকলের নাই; যাঁহাদের আছে তাঁহাদের হয়ত সুবিধা ও সময়ের অভাব, অথবা আন্তরিক অনুরাগ ও অধ্যবসায়ের একাগ্রতা নাই। যে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত পুস্তক বা প্রবন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়, তাহাও সব সময়ে সকলের নজরে পড়ে না; এবং অনেক সময়ে এই সকল অসম্পূর্ণ এবং সাময়িক তাগিদের খাতিরে কোনও প্রকারে লেখা বৃত্তান্তগুলি তথ্য ও অতথ্যের নির্বিচার সমাবেশে অথবা শূন্যগর্ভ উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে, নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বিবরণ হইয়া উঠিতে পারে নাই।

বর্তমান গ্রন্থে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করা হয় নাই। তাহা লিখিবার সময় বোধ হয় এখনও আসে নাই। এরূপ ইতিহাস সর্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া লিখিতে হইলে যে-সকল তথ্যের উপাদান নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হয় নাই। সহজপ্রাপ্য সাধারণ কয়েকটি তথ্য ও ঘটনা লইয়া, এবং বাকিটুকু সুলভ কল্পনা দ্বারা পরিপূরণ করিয়া, এই যুগের বা সাহিত্যের একটি চমকপ্রদ বিবরণ রচনা করা কঠিন নয়; কিন্তু নিরপেক্ষ নিখুঁত ইতিবৃত্ত লিখিতে হইলে যে তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন, তাহা অশেষ পরিশ্রম ও যত্ন সাপেক্ষ। ঐতিহাসিক সাধনার এই কঠিন পথ অলম্বন করিবার ধৈর্য, অধ্যবসায় ও অনুরাগ সকলের নাই; থাকিলেও সহজ পথ গ্রহণ করা বোধ হয় মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এবং সহজ পথ অনেক সময় ক্ষিপ্র ও আপাতফলদায়ী।

সুখের বিষয় যে, আমাদের উৎসাহী ও পরিশ্রমী গ্রন্থকার এই সহজ পথ ও সুলভ উপায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং এরূপ চমকপ্রদ, কিন্তু পরিণাম-নিষ্ফল, রচনার লোভ সংবরণ করিয়াছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের প্রাক্তন কৃতী ছাত্র ও বর্তমান সুযোগ্য অধ্যাপক; প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনা করিবার উপযুক্ত শিক্ষা, অধিকার ও রসিকতা তাঁহার আছে এবং বর্তমান গ্রন্থে তাঁহার অনুসন্ধিৎসা, তথ্যানুরাগ ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি বুঝিয়াছেন যে, বর্তমান সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার শেষ নাই; সুতরাং ইহার বিভিন্ন অংশের উপকরণ সংগ্রহ সম্পূর্ণ না করিয়া, সমগ্র বিবরণ লিখিতে যাওয়া বাতুলতা বা সৌখীনতা মাত্র। মুটে-মজুরের কাজ

সকলে করিতে চাহে না। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐতিহাসিক সৌধ-নির্মাণে মুটে-মজুরের কাজই এখন একমাত্র কাজ আপাতদৃষ্টিতে এই কাজ তুচ্ছ ও সামান্য হইলেও বর্তমান সময়ে ইহারই একমাত্র আবশ্যকতা ও উপকারিতা আছে। বড় বড় সৌখীন বই লিখিয়া গৌরব অর্জন করিবার সহজ উপায় অনেকেই খুঁজিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত অনুসন্ধানীর অকিঞ্চিৎকর অথচ নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও শ্রমসাধ্য ব্যাপারে আত্মনিবেশ করিবার উৎসাহ ও একাগ্রতা সেরূপ সুলভ নয়। বর্তমান লেখকের সেই উৎসাহ ও একাগ্রতা রহিয়াছে বলিয়াই, আমি তাঁহার প্রথম বিস্তৃত ও সারগর্ভ রচনাটিকে সাহিত্যসমাজে পরিচিত করিয়া দিতে সাহসী হইয়াছি।

আমাদের লেখক বড় বই লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু সৌখীন বই লেখেন নাই। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের যে-বিষয়টি তিনি নির্বাচিত করিয়াছেন, তাহা চিত্তাকর্ষক হইলেও সহজ-সাধ্য নয়। শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, প্রাচীন সাহিত্যের অন্যান্য কীর্তির মধ্যে মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি একটি প্রধান কীর্তি। এই বিচিত্র রচনাগুলির ধারাবাহিক বৃত্তান্ত পাঠকের একেবারে অজ্ঞাত না হইলেও খুব সুস্পষ্ট নয়। এ সম্বন্ধে যে-সকল মূল্যবান্ উপাদান সাহিত্যের ভিতরে ও বাহিরে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে, সেগুলি একত্র ও নিপুণভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, লেখকের বহু প্রযত্নসাধ্য রচনা যে সরস ও তথ্যপূর্ণ বিবরণ প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা শুধু বিশেষজ্ঞের নয়, সাধারণ পাঠকেরও আদরণীয় হইবে।

প্রাচীনকালে ধর্মবিপ্লব ও সাম্প্রদায়িক ধর্মবিরোধের সংঘর্ষে ও সামঞ্জস্যে বাঙ্গালা সাহিত্য কিরূপ পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, তাহা মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্ট ধারার মধ্য দিয়া লেখক অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একদিকে শৈব সম্প্রদায়ের শিব-মঙ্গল, বা শিবায়ন, শাক্ত সম্প্রদায়ের চণ্ডী-মঙ্গল ও কালিকা-মঙ্গল, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্ম-মঙ্গল, অন্যদিকে লৌকিক দেবদেবীর উপলক্ষ্যে রচিত মনসা-মঙ্গল, শীতলা-মঙ্গল, বাশুলি-মঙ্গল, রায়-মঙ্গল প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত রচনাশ্রেণীর ও তৎপ্রতিপাদ্য দেবতাদিগের উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে গ্রন্থকার বহু যত্নের সহিত অনুসন্ধান করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে তাহাদের কবি, কাব্য ও কাহিনীর বিস্তৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বর্ণিত পুস্তকসমূহের অনেকগুলি এখনও অমুদ্রিত, এবং যেগুলি বটতলা বা অন্যান্য অপ্রখ্যাত স্থান হইতে কোনও রূপে মুদ্রিত হইয়াছে, সেগুলি সাধারণ পাঠকের সুলভ নয়। তাহা হইতে গ্রন্থকার যে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মূল্যও যথেষ্ট। এই সকল রচনার মধ্যে কতটা পরিকল্পনার বৈচিত্র্য, চরিত্রাঙ্কনের নৈপুণ্য অথবা কাব্যরসের সৃষ্টি রহিয়াছে, এবং কতটা তৎকালীন সমাজ ও ধর্মের চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহারও যথাসম্ভব আলোচনা গ্রন্থকার করিয়াছেন। এই আলোচনায় তিনি সাহিত্যের অন্তর্গত উপকরণের দ্বারাই তাঁহার বক্তব্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; নিজের মতবাদ, অত্যুক্তি বা কল্পনার দ্বারা তাহা অতিরঞ্জিত করেন নাই। সুতরাং ইহার মধ্যে যে কেবল লেখকের অধ্যবসায়, অনুসন্ধিৎসা ও তথ্যনিষ্ঠার প্রমাণ আছে তাহা নয়, চিন্তাশীলতা, রসগ্রাহিতা ও লিপিকৌশলের যথেষ্ট পরিচয়ও

রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার যে-সকল সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক সমস্যার উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার সমাধান সম্বন্ধে হয়ত সকলে সব বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইবেন না। তথাপি তাঁহার প্রয়াস ও যত্ন যদি ভবিষ্যৎ চর্চা ও সমালোচনার সহায়তা করে, এবং তাঁহার সংগৃহীত উপাদান যদি ভবিষ্যৎ পূর্ণতার বিবরণের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তাঁহার চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। এ দাবী বোধ হয় গ্রন্থকার নিজেও করিবেন না যে, এই দুরূহ বিষয়ের সকল সমস্যার তিনি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন। আরও অনুসন্ধান ও আলোচনার প্রয়োজন আছে; কিন্তু তিনি সমগ্র বিষয়টির যে সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট খসড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে যদি এই ক্ষেত্রে আরও অনুরাগী কর্মীর শুভাগমন হয় তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনার সৌভাগ্যের বিষয় হইবে।

বর্তমান ভাষা-বিকৃতি ও সাহিত্যিক আত্মভ্রষ্টতার যুগে এইরূপ প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা হয়ত আদৃত হইবে না, কিন্তু ইহার প্রয়োজন ও উপাকারিতা অস্বীকার করা যায় না। আজকালকার দিনে যাঁহারা সাহিত্যের যুগপ্রবর্তক বা যুগন্ধর সমালোচক বলিয়া স্পর্ধা করেন তাঁহাদের অধিকাংশই প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের বহু সাধনালব্ধ প্রতিষ্ঠিত ধারা সম্বন্ধে কোন খবর রাখেন না, বা রাখিতে চাহেন না। পরম্পরাগত সাহিত্য-প্রচেষ্টার সহিত ইহাদের যোগ নাই। কিন্তু জাতির আত্মচেতনার যাহা বৈশিষ্ট্য তাহারই দৃঢ়ভিত্তিমূলে তাহার ভাষা ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের এই সনাতন স্বরূপটি ইঁহারা আমাদের প্রাচীন সাহিত্য হইতে আয়ত্ত করিবার কোনও সাধনা করেন নাই। ইহাকে অস্বীকার করিয়া কেবল নিজেদের অজ্ঞতা নয়, জাতীয় ভাবধারা হইতে বিচ্ছিন্নতাও প্রমাণিত করেন। বিংশ শতাব্দীটিই নাকি একমাত্র শতাব্দী; ইহার পূর্বে যে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য ছিল, ইহা তাঁহারা জানেন না, বা মানেন না। কিন্তু যে-অতীতের মগ্ন চেতনা ও অনুভূতির উপর বর্তমান আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে না। সেইজন্য বলিতেছি যে, বর্তমান পুস্তকের একটি সময়োপযোগী সার্থকতা রহিয়াছে।

গ্রন্থের ভালমন্দের বিচার এই ভূমিকার উদ্দেশ্য নয়। সে ভার বিশেষজ্ঞের উপর দিয়া, এখানে এইটুকু নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, যাঁহারা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্তরলোকে প্রবেশ করিতে উৎসুক, তাঁহারা এই বইখানি হইতে যথেষ্ট উপকার ও আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন। করিবারই কথা, কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালী পাঠক সম্বন্ধে কোনও কথা জোর করিয়া বলা যায় না।

৫ই আশ্বিন, ১৩৪৬

শ্রী সুশীলকুমার দে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ষষ্ঠ সংস্করণের নিবেদন

তিন বছরের মধ্যেই 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' পঞ্চম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় ইহার ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইল। কিন্তু এই তিন বছরের মধ্যে পুস্তক প্রকাশের ব্যয় প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এ কথা ভুক্তভোগী মাত্রই অবগত আছেন; সেইজন্য নূতন সংস্করণে গ্রন্থখানির মূল্য বৃদ্ধি অপরিহার্য হইল। তথাপি পাঠকদিগের ক্রয়-ক্ষমতার উপর লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে ইহা বর্তমান দুর্মূল্যের দিনেও তাঁহাদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত না হয়, সেই জন্য ইহার ন্যায্যাতিরিক্ত মূল্য ধার্য করা হয় নাই।

পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর হইতে মাত্র এই তিন বছরের মধ্যে যে কয়েকটি নূতন পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহা বর্তমান সংস্করণের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একখানি পুঁথি রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গল। পুঁথিখানি ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত ছিল, এ'দেশে ইহার কোনও পুঁথি পাওয়া যায় নাই। একজন গবেষক লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম হইতে পুঁথিখানির একখানি অনুলিপি করিয়া তাহার ভিত্তিতে একটি গবেষণাপত্র রচনা করিয়াছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাহা পি-এইচ. ডি. উপাধির জন্য অনুমোদিত হইয়াছে। এই চণ্ডীমঙ্গলকাব্য একজন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী কর্তৃক রচিত। চণ্ডীমঙ্গল গার্হস্থ্য জীবনরসের কাব্য; তাহা একজন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে কি ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় সেইজন্য ইহার একটু বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

ইতিমধ্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একখানি নূতন পুঁথির সন্ধান পাইয়াছি, তাহা নানা কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য বর্তমান সংস্করণের মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আলোচনায় নূতন পুঁথিটি ভিত্তিরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। এই পুঁথিটি শিউড়ী রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী সত্যানন্দ মহারাজকে তাঁহার কোনও শিষ্য উপহার দিয়া গিয়াছিলেন। একবার শ্রীশ্রীসারদামাতার জন্মবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে যখন শিউড়ীতে যাই, তখন স্বামীজী স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া পুঁথিটি আমাকে দান করেন। পুঁথিটির বিষয়-বস্তু কি, তাহা তিনি নিজেও জানিতেন না। আমিও তাঁহার নিকট ইহা জানিবার জন্য কোনও কৌতূহল প্রকাশ করি নাই; কলিকাতার নিজ গৃহে আসিয়া পুঁথিটি অনেক দিন যাবৎ অমনি ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। একদিন অবসরমত পুঁথিটির বিষয়-বস্তু কি, তাহা অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিলাম, ইহা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথি। কৌতূহলবশত ইহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। দুই-একটি পাতা ছাড়া পুঁথিটি সর্বত্র অখণ্ডিত, গ্রন্থোৎপত্তির

বিবরণটি আদ্যোপান্ত রক্ষা পাইয়াছে। বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ উদ্ধৃত করিতে গিয়া আমি পুঁথিটি ব্যবহার কবিয়াছি, তবে সেইক্ষেত্রে অন্যান্য পুঁথির পাঠও পাদটীকায় নির্দেশ করিয়াছি; কোনও কোনও ক্ষেত্রে অন্যান্য পুঁথির পাঠ গ্রহণ করিলেও পাদটীকায় এই পুঁথিটির পাঠও নির্দেশ করিয়াছি। ইহার পাঠান্তরগুলি লক্ষ্য করিলেই পুঁথিটির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে।

বর্তমান সংস্করণের উপসংহারে 'আধুনিক যুগ ও মঙ্গলকাব্য' নামে একটি নূতন অধ্যায় (অষ্টম অধ্যায়) সংযোগ করিয়াছি। মঙ্গলকাব্যের প্রভাব অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আসিয়াই যে নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নব-প্রবুদ্ধ সাহিত্য-চেতনার সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়াও যে ইহা ভিতরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহাই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে মঙ্গলকাব্যের পরিণতি যে কি হইল, তাহা সম্যক বুঝিতে পারা যাইবে না।

আমার ছাত্র ডক্টর শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্তী এম. এ., পি-এইচ. ডি. এই সংস্করণের শব্দসূচী প্রণয়নের গুরু দায়িত্বটি গ্রহণ করিয়া আমার শ্রম লাঘব করিয়াছেন। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতার জন্য বর্তমান সংস্করণে পূর্ববর্তী সংস্করণের নিবেদনসমূহ পরিত্যক্ত হইল।

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
কার্তিকী পূর্ণিমা, ১৩৮১ সাল

দ্বাদশ সংস্করণে প্রকাশকের কথা

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস বইটির দ্বাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হলো। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিনন্দন জানিয়েছিলেন লেখক আশুতোষ ভট্টাচার্যকে। সময় ১৯৩৯। সেই হিসেবে সত্তর বছর হয়ে গেলো এই বইটি প্রকাশনার কাল। একটি গবেষণাগ্রন্থের সত্তর বছরে বারোটি সংস্করণ গৌরবজনক বটেই। আর এই জনপ্রিয়তার পিছনে আমাদেরও ক্ষুদ্র ভূমিকা আছে বলেই গোপন এক গর্বও আছে। এই ঐতিহাসিক জনপ্রিয়তার অংশ ভাগী আমরাও।

এই ধরনের বইয়ের প্রতিটি সংস্করণই যথেষ্ট পরিবর্তন পরিমার্জন প্রয়োজন। কারণ ইতিহাস তো অনড় কোন আবিষ্কারে সীমাবদ্ধ নয়; যা আছে ক্রমে তা আরো পুষ্ট হয়, তথ্য প্রমাণ ঘটনাগুলির বিস্তৃতি ঘটে। লেখক নিজে ষষ্ঠ সংস্করণ পর্যন্ত নানা পরিমার্জনা করে গেছেন, নতুন অধ্যায় জুড়েছেন। তারপর লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়নি নতুন করে লিখবার; আর আজ এসব ভাবনার বহুদূরে তিনি।

বইটির নিয়মিত চাহিদার জন্য বারবারই দ্রুত পুনর্মুদ্রণ ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কিন্তু পরিমার্জন আর করা যায়নি। এবারেও এ ঘটনার ব্যতিক্রম ঘটলো না। ভাবী পাঠকদের কাছে আজও সমাদৃত হবে এই আশায় দ্বাদশ সংস্করণের ব্যবস্থাপনা। আশা রাখি বিফলে যাবে না।

ধন্যবাদ

ইতি
দীপক ভট্টাচার্য
প্রকাশক

সঙ্কেত-বিশ্লেষণ

(বর্ণানুক্রমিক)

ক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথি

গ-স—গভর্ণমেণ্ট সংগৃহীত এসিয়াটিক সোসাইটির প্রাচীন পুঁথি

ঢা—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথি

পু-প—পুঁথি-পরিচয়, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সংকলিত, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় (১৩৫৮)—শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতীর বাংলা পুঁথির তালিকা

পু-পরি—পুঁথি-পরিচিতি, আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮)

ব—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাচীন পুঁথি

ব-প্র-পু-বি—বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত

ব-সা-প—বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড, দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত (১৯১৪)

ব-পু-তা—বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের বাংলা পুঁথির তালিকা, শ্রীমণীন্দ্র মোহন চৌধুরী সংকলিত (রাজসাহী, ১৯৫৬)

র-সা-প-প—রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

স-পু—স্বামী সত্যানন্দ প্রদত্ত পুঁথি

স-স—সোসাইটি সংগৃহীত এসিয়াটিক সোসাইটির প্রাচীন পুঁথি

সা-প-প—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

D.C.B.M.C.U—*A Descriptive Catalogue of the Bengali Manuscripts in the Calcutta University Library. Vol. 1 (1926).*

D.C.B.M.C.B - A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts preserved in the State Library of Cooch-Behar, Edited by Sashibhusan Das Gupta (1948).

D.C.V.M—*A Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the Collections of the Royal Asiatic Society of Bengal.* Vol. IX. by Haraprasad Sastri, Revised by Jogendranath Gupta (1941).

H.B.I—**History of Bengal** Vol. I Edited by R. C. Majumdar, Published by the University of Dacca (Dacca, 1943).

H.B.II—**History of Bengal,** Vol. II. Edited by Jadunath Sarkar (University of Dacca, 1943).
I.H.Q—**Indian Historical Quarterly**
J.A.S.B.—**Journal of the Asiatic Society of Bengal.**
J.Anth.S.B.—**Journal of the Anthropological Society of Bombay.**
J.B.O.R.S.—**Journal of the Bihar and Orissa Research Society.**
J.D.L.—**Journal of the Department of Letters,** Calcutta University.
J.R.A.S.B—**Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal.**
M.I.A.—**Man in India,** Ranchi.

পুস্তক কিংবা পত্রিকার নামের পর বন্ধনী চিহ্নের বাহিরে পর পর দুইটি সংখ্যা থাকিলে প্রথম সংখ্যাটি ইহার খণ্ড বা ভাগ (Volume) বুঝাইবে, দ্বিতীয় সংখ্যাটি পৃষ্ঠা বুঝাইবে; একটি সংখ্যা থাকিলে তাহা পৃষ্ঠা বুঝাইবে। বার বার একই পুস্তক কিংবা পত্রিকার বিস্তৃত পরিচয় উল্লেখের পরিবর্তে দ্বিতীয় বার কেবল মাত্র লেখক ও পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লিখিত হইয়াছে। যে সকল পুস্তকের মধ্যে প্রকাশকাল উল্লিখিত নাই, তাহাদের নামের পর বন্ধনীর মধ্যে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

বিষয়-সূচী

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

শিবমঙ্গল

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনসা-মঙ্গল

তৃতীয় অধ্যায়

চণ্ডীমঙ্গল

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মমঙ্গল

পঞ্চম অধ্যায়

অন্নদা-মঙ্গল

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবিধ দেবীমঙ্গলকাব্য

সপ্তম অধ্যায়

ঐতিহাসিক কাব্য

অষ্টম অধ্যায়

আধুনিক যুগ ও মঙ্গলকাব্য

পরিশিষ্ট

ভূমিকা

॥ ১ ॥ পল্লীসমাজ ও পল্লীর সাহিত্য

প্রধানত তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়া সমাজ-জীবনের ক্রমপরিবর্তন সাধিত হইয়া আসিয়াছে : আদিম সমাজ, লোকসমাজ এবং নাগরিক সমাজ। প্রত্যেক আদিম সমাজই যে ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা নহে, তাহা হইলে আদিম সমাজভুক্ত মানুষের আজ পৃথিবীতে অস্তিত্ব থাকিত না। জৈব ক্রমবিবর্তনের ধারায় এক জাতীয় বন-মানুষই যেমন মানুষে পরিবর্তিত হইয়াছে, অন্যান্য জাতীয়েরা সেই একই পর্যায়ে পড়িয়া আছে, সভ্যতার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রেও কোন কোন আদিম সমাজই সেই ধারা অনুসরণ করিতে না পারিয়া কেহ বা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, আবার কেহ বা কোনো প্রকারে আজিও অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছে। ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করিয়া যে সকল সমাজ অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের প্রথম পরিবর্তিত ও উল্লেখযোগ্য রূপকেই পল্লীসমাজের রূপ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে আদিম সমাজ-জীবনের উপকরণ যেমন বর্তমান থাকে, তেমনই ইহার পরবর্তী পরিবর্তিত সামজ-রূপেরও সম্ভাবনা দেখা যায়। ইহা জীবনীশক্তি লাভ করিয়া যায়, তাহার ফলে ইহার অগ্রগতি অব্যাহত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর সমাজে যে সাহিত্য জন্ম এবং পুষ্টি লাভ করে, তাহাকেই লোকসাহিত্য বলা হয়, এবং এই সমাজকেও লোকসমাজ বলিয়া উল্লেখ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে পল্লীসমাজকেই লোক-সমাজ বলা যায়।

পল্লীসমাজ গোষ্ঠীজীবন হইতে উদ্ভূত এবং গোষ্ঠীজীবনেরই একটি প্রসারিত রূপ তাহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আদিম সমাজের গোষ্ঠীজীবন (community life) এবং পল্লীসমাজের গোষ্ঠীজীবনের মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য এই, আদিম সমাজে এক একটি পরিবার ক্রমে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। পল্লীসমাজে একই প্রকৃতির বিভিন্ন গোষ্ঠী একটি বৃহত্তম গোষ্ঠীতে পরিণত হইয়া গোষ্ঠীজীবনের নিয়মই অনুসরণ করিয়া চলে। একই প্রকৃতির বিভিন্ন গোষ্ঠী হইলেও ইহাদের মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য কিংবা বৈষম্য থাকে, তাহা পল্লীসমাজের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাঙ্গীকৃত হইয়া একাকার হইয়া যায়। সকল রকম বিভিন্নতা পরিহার করিয়া ইহা একটি অখণ্ড সমাজে পরিণত হয়। আদিম সমাজ বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিত হইতে পারে না, বরং পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। ক্রমাগত গোষ্ঠীসংগ্রামের ফলে প্রত্যেকেরই বিনাশ অনিবার্য হইয়া উঠে। এইভাবে ক্রমাগত গোষ্ঠীসংগ্রামের ফলে পৃথিবীর বহু আদিম সমাজ বিলুপ্ত হইয়াছে এবং গোষ্ঠীসংগ্রামের অভ্যাস পরিত্যাগ করিবার ফলে পৃথিবীর বহু আদিম সমাজই বৃহত্তর সমাজ

গঠন করতে সক্ষম হইয়াছে। বাংলাদেশের পল্লীসমাজ কি ভাবে গঠিত হইয়া ইহার লোকসাহিত্যকে রূপ দিয়াছে, তাহাই এখন বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। কারণ, মঙ্গলকাব্য মূলতঃ লোকসাহিত্য বা পল্লীসাহিত্য হইতেই উদ্ভূত।

বাংলাদেশের চতুঃসীমান্ত জুড়িয়া যে সকল বিভিন্ন প্রকৃতির আদিবাসী বাস করে, তাহাদের কেহ কেহ বাংলার সমতল ভূমি অধিকার করিয়া ইহার বিভিন্ন অঞ্চলে যে আদিম সমাজ-জীবন গঠন করিয়াছিল, তাহা নানাসূত্র হইতে অনুমান করিতে পারা যায়। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রবল জাতির নিদর্শন বাংলার সামাজিক জীবন হইতে এখনও উদ্ধার করিতে পারা যায়। ইহাদের আদিম গোষ্ঠীজীবন নানাকারণে বিপর্যস্ত হইয়া ক্রমে তাহা পল্লীসমাজে পরিণত হইয়াছে। আদিম সমাজের গোষ্ঠীজীবন যে সকল কারণে বিপর্যস্ত হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান কারণ, কৃষিনির্ভরতা। যে সকল আদিম সমাজ যে কোনো প্রকারেই হউক কৃষিকর্মদ্বারা জীবন যাপন করে, তাহাদের কৃষিভূমির উপর একটি এমন আসক্তি সৃষ্টি হয় যে, তাহাদের সাংস্কৃতিক জীবন বিসর্জন দিয়াও তাহারা ইহার প্রতি আকর্ষণ প্রকাশ করে। ইহার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আসামের মণিপুরী জাতি। মণিপুরী এবং নাগাজাতি মূলত একই গোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত। একটি গোষ্ঠী মণিপুরের সমতল ভূমি অধিকার করিয়া কৃষিকর্মের মধ্যে নিজেকে নিযুক্ত করিয়াছিল, আর একটি গোষ্ঠী ক্রমে ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পার্বত্য এবং অরণ্যভূমিকে আশ্রয় করিয়াছিল। যে গোষ্ঠী কৃষিভূমি অবলম্বন করিল, তাহারা কেবলমাত্র ভূমির আকর্ষণে নানা দিক হইতে নানাপ্রকার সাংস্কৃতিক প্রভাবকে স্বীকার করিয়া লইয়া নিজের আদিম সমাজ-জীবনের ধারা পরিত্যাগ করিয়াও সেখানেই পড়িয়া রহিল, কিন্তু যাহারা পর্বত এবং অরণ্য আশ্রয় করিল, তাহারা অনায়াসে নিজেদের অধিকৃত এক অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া অন্য অঞ্চলে চলিয়া যাইতে যাইতে ক্রমে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া তাহাদের আদিম জীবনের ধারা রক্ষা করিল। তাহারাই পার্বত্য নাগা বলিয়া পরিচিত হইল। বর্হির্মুখী সকল প্রকার যোগাযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহারা ক্রমে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। আদিম নাগাজাতি সম্পর্কেই এই উক্তি প্রযোজ্য, ধর্মান্তরিত নাগাজাতি সম্পর্কে নয়।

বাংলাদেশেও যে আদিম জাতিই ইহার যে অঞ্চলেই বসতি স্থাপন করুক না কেন, কৃষিভূমির সঙ্গে তাহাদের অতি সহজেই সম্পর্ক স্থাপিত হইত বলিয়া তাহারা কোন কারণেই তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিত না; তাহার ফলে নিজেদের আদিম জীবনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনেক ক্ষেত্রে বহুলাংশে পরিবর্তন করিয়া বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে তাহারা সংমিশ্রণ লাভ করিয়াছে, তাহাতে এদেশে মিশ্র জাতির যে সমাজ-জীবন গঠিত হইয়াছে, তাহাই ক্রমে পল্লী-সমাজের রূপ লাভ করিয়াছে।

কৃষিভিত্তিক সমাজ সাধারণত মাতৃতান্ত্রিক (matriarchal) হইয়া থাকে। বাংলাদেশের সমাজও প্রধানত তাহাই ছিল বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালীর ধর্মীয় জীবনে দেব অপেক্ষা দেবীর স্থান যে উচ্চতর, তাহা হইতেও ইহা প্রমাণিত হয়। এমন কি, বাংলার উত্তর এবং উত্তর-

পূর্ব সীমান্তবর্তী গারো এবং খাসিয়াজৈন্তা পর্বতে যে আদিম জাতির বংশধরেরা বাস করে, তাহারা এখনও মাতৃতান্ত্রিক সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। কৃষিভিত্তিক মাতৃতান্ত্রিক সমাজকে কেন্দ্র করিয়া যত সহজে একটি পরিবার এবং তাহা হইতেই এক একটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে এক একটি গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায়, যাযাবর প্রকৃতির পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে তাহা তত সহজে সম্ভব হয় না। সমাজ যদি স্থায়ী ভাবে কোনো স্থানে বসবাস করিবার সুযোগ না পায়, তবে তাহার সাংস্কৃতিক জীবন বিচিত্র রূপ লাভ করিতে পারে না। বাংলার প্রকৃতি বাংলার সমাজ-জীবনকে গঠন করিতে সহায়তা করিয়াছে। আদিম সমাজ হইতে অতি সহজেই কেবলমাত্র কৃষিভূমির আকর্ষণেই বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এখানে নানা জাতি সংমিশ্রণ লাভ করিয়াছে, তারপর প্রত্যেকটি গোষ্ঠীই নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া পরস্পরের সঙ্গে একাকার হইয়া গিয়া ক্রমে একটি অখণ্ড সমাজ-জীবন গড়িয়াছে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই বাংলার পল্লীসাহিত্য রচনার প্রথম সূচনা দেখা দিয়াছিল।

বাংলার পল্লীসাহিত্যের যে কতকগুলি সুস্পষ্ট আঞ্চলিক রূপ আছে, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকৃতির আদিম জাতি বসতি স্থাপন করিয়াছিল, কালক্রমে তাহাদের সকলের মধ্য দিয়া একটি ঐক্যসূত্র গ্রথিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাদের আঞ্চলিক রূপ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই।

বাংলাদেশের প্রাচীন গ্রামগুলির সংগঠন এবং ইহাদের সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিলে দেখা যায়, খ্রীষ্টীয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত পাল রাজত্বের আমল হইতে ইহাতে গোষ্ঠীজীবনের রূপ শিথিল হইতে আরম্ভ করে। কারণ পাল রাজগণ জাতিতে বৌদ্ধ হইলেও বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে হিন্দু মন্দির স্থাপন এবং ব্রাহ্মণ বসতির উৎসাহ দিতেন। আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের সম্মুখে একটি বহিরাগত ধর্মীয় আদর্শ স্থাপন করিবার ফলে ইহার নিজস্ব মূল্য সম্পর্কে সমাজে ক্রমে অবিশ্বাসের সৃষ্টি হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে বহিরাগত ধর্মের প্রভাব আদিম গোষ্ঠীসমাজের মধ্যে প্রসার লাভ করে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা যায়, পাল সম্রাটদিগের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে প্রতিষ্ঠিত এই সকল বহু মন্দিরই সেকালের বৃহত্তর সমাজজীবনের উপর কোনো প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে পারে নাই। ক্রমে মন্দিরের দেবতা অদৃশ্য হইয়াছে, মন্দির ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে, এবং পূজারী ব্রাহ্মণ আদিম গোষ্ঠীজীবনের সঙ্গে একাকার হইয়া গিয়া নিজের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়াছে। সেন রাজত্বের সময় এদেশে সংস্কৃতচর্চা এবং হিন্দু ধর্মের অভ্যুত্থানের যে আয়োজন হইয়াছিল, তাহা প্রধানত রাজসভা-কেন্দ্রিক হইয়াছিল, সাধারণের সমাজকে তাহা স্পর্শ করিতে পারে নাই। কিন্তু সেন রাজত্বের অবসানে এদেশে যে তুর্কীবিজয় হইয়াছিল, তাহার ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গোষ্ঠীজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। কেবলমাত্র যে সকল অঞ্চলে তুর্কী আক্রমণের সামাজিক প্রতিক্রিয়া নিতান্ত গৌণ হইয়াছিল, তাহাতেই বাংলার গ্রাম্য সমাজ—জীবনের আদি রূপটি অবিকৃত ছিল। কিন্তু সেই প্রকার

প্রাচীন পল্লীর সংখ্যা কোনো কোনো অঞ্চলে একেবারে নাই বলিলেও চলে, কোনো কোনো অঞ্চলে সামান্য অবশিষ্ট আছে। তারপর হইতেই অধিকাংশই ক্ষেত্রেই হিন্দু মুসলমান এবং আদিবাসীর যে মিলিত একটি সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে লোকসমাজের বিশেষত্ব বহুলাংশে বর্তমান ছিল। ইহার কারণ, বহির্মুখী ধর্মের পরিচয়ে হিন্দু মুসলমান এবং আদিবাসীর মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্যই থাকুক না কেন, ইহাদের প্রত্যেকেই মূলত বাংলাদেশেরই অধিবাসী। লোকসমাজের শক্তি তাহার উপরই গড়িয়া ওঠে, বর্হিমুখী ধর্মীয় কিংবা সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের মধ্যে নহে।

যাই হোক, তুর্কীবিজয়ের পর হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজ অধিকার পর্যন্ত বাংলার পল্লীর সমাজ হিন্দু মুসুলমান এবং আদিবাসীর মিলিত জীবনধারায় গঠিত হইতে থাকে। তুর্কীশাসিত বাংলার সমাজে হিন্দুধর্মের একক আদর্শ কোনো দিক দিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং পাল এবং সেন রাজগণ যে কার্যের সূচনা করিয়াছিলেন, অঙ্কুরেই তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে যে হিন্দু মন্দির এবং হিন্দু সমাজের আদর্শ তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের প্রভাব সর্বজয়ী হইয়া উঠিবার পূর্বেই তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গেল। এই সময় সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ লইয়া বাংলার সমাজের লৌকিক স্তর হইতে যে এক ধর্মমত গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম। বাংলার ইহাই প্রথম লোকধর্ম। ইহা প্রথমত প্রামাণ্য শাস্ত্রের অনুশাসন স্বীকার করে নাই। কেবলমাত্র হৃদয়কেই শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া সকল ধর্মের মূল আদর্শকে গ্রহণ করিয়াছিল। সেইজন্য ইহা সমাজের সর্বস্তরে বিস্তার লাভ করিয়া সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলাদেশকে এক অখণ্ড যোগসূত্রে বাঁধিয়া দিয়া গেল। বৃহত্তম পরিধিতে বাংলার লোকসমাজ সেইদিন গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পাইল। বাংলার লোকসাহিত্যেরও যথার্থ পরিপুষ্টি তখন হইতেই দেখা দিল।

চৈতন্যধর্ম বাংলার সমাজ-জীবনের সাধারণ স্তরকে অবলম্বন করিয়া এক সুবৃহৎ লোকসমাজ গড়িয়া দিয়াছিল বলিয়া তাহার ভিত্তির উপরই বাংলার পল্লীসাহিত্যও নানাভাবে বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ পাইল। পূর্ববাংলার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলেও সকল লৌকিক প্রেমসংগীতেরই যে নায়ক-নায়িকা রাধাকৃষ্ণ, ইহার মূল কারণ তাহাই। ইহার জন্যই বাংলাদেশে 'কানু ছাড়া গীত নাই'। বৈষ্ণব ধর্মের মূল শাস্ত্রীয় আদর্শকে বাংলাদেশ সমগ্রভাবে গ্রহণ করে নাই সত্য, কিন্তু যে সর্বজনীন প্রেম ও ভালোবাসার সামাজিক আদর্শের উপর চৈতন্যধর্মের প্রেরণা দেখা দিয়াছিল, তাহা বাংলার সমাজ-জীবনের সকল লৌকিক স্তরকেই স্পর্শ করিয়াছে। সেইজন্য পশ্চিম সীমান্ত বাংলার অর্ধ-আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্য এবং অরণ্য অঞ্চলে সহস্র সহস্র ঝুমুর গানে যেমন রাধাকৃষ্ণেরই নাম এবং তাঁহাদের লীলাকাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়, তেমনই পূর্ববাংলার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের লোকসংগীতেও রাধাকৃষ্ণ-ব্যতীত প্রেমসংগীতের আর কোনো নায়ক-নায়িকার নাম শুনিতে পাওয়া যায় না।

পূর্বেই বলিয়াছি, চৈতন্যধর্মের মধ্যে মূলত লোকধর্মের প্রেরণা ছিল, কালক্রমে তাহা শাস্ত্রীয় অনুশাসনের পর্যায়ে উঠিয়া যাইবার ফলেই বাংলাদেশে ইহার শক্তি আজ লুপ্ত হইয়াছে। লোকধর্ম কথাটি আমি এখানে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেছি, ইংরেজিতে যাহাকে folk religion বলে সেই অর্থে নহে। ইংরেজিতে যাহাকে folk religion বুঝায়, তাহা কোনো ব্যক্তিবিশেষ প্রবর্তন করে না, সমাজ-মানসে আপন হইতে তাহার সৃষ্টি হয়। কিন্তু চৈতন্যধর্ম প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে; চৈতন্যদেব এই ধর্মের প্রবর্তক। তবে সমাজ-মানসে চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত ধর্মমতের যদি কোনো চেতনা বর্তমান না থাকিত, তবে বাংলা এবং উড়িষ্যার সাধারণ জনসমাজ এত ব্যাপকভাবে তাহা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়া আসিত না। জাতিধর্মনির্বিশেষে চৈতন্যের ধর্ম যে গৃহীত হইয়াছিল, তাহার অর্থই এই যে, জাতির নিজস্ব চেতনা অনুসরণ করিয়া তাহা বিকাশ লাভ করিয়াছে। সেই অর্থেই ইহাকে লোকধর্ম বলা হইয়াছে।

বাংলার যে সমাজ তুর্কী আক্রমণের পর শিথিলবদ্ধ হইয়া গিয়া ইহার মধ্য হইতে গ্রাম্যসাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল, চৈতন্যধর্ম সেই সমাজের মধ্যে নূতন করিয়া সংহতি সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইল। তাহার ফলেই তুর্কীবিজয়ের পর হইতে চৈতন্যধর্মের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত বাংলার যে সমাজ-জীবন আদর্শচ্যুত এবং বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছিল, তাহা পুনরায় নিজের মধ্যে সংহতি স্থাপনের এক নূতন শক্তি লাভ করিল। সেই জন্যই দেখা যায়, তখন হইতে কেবলমাত্র উচ্চতর বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ যেমন পদাবলী, জীবনী, অনুবাদ, মঙ্গলকাব্য ইত্যাদিই নহে, বরং পল্লীসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ পুষ্টিলাভ করিতে লাগিল। বৈষ্ণব কবিগণ যখন মহাজন পদাবলী রচনা এবং প্রচার করিয়া অভিজাত বৈষ্ণব সমাজের সম্মুখে একটি সুদৃঢ় আধ্যাত্মিক আদর্শ স্থাপন করিতেছিলেন, তখন তাহারই সমান্তরাল ধারায় মুখে মুখে বৈষ্ণব পদাবলীর আর একটি লৌকিক ধারা সৃষ্টি হইয়া তাহারই সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতেছিল। পশ্চিম বাংলার ঝুমুর গানে এবং পূর্ব বাংলার শত শত গ্রাম্য প্রেমসংগীতে তাহার ঝংকার শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। বৈষ্ণবধর্ম সমাজের সাধারণ স্তরে পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলায় সমানভাবেই প্রচারিত হইতে লাগিল। পূর্ব বাংলায় চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষের বাসভূমি শ্রীহট্টকে কেন্দ্র করিয়া ইহা বিকাশ লাভ করিতে করিতে ক্রমে কাছাড়ের পথে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিল এবং রাজ-আনুকূল্য লাভ করিয়া সাধারণ সমাজের মধ্যেও সেখানে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইল, পশ্চিম বাংলায় ও বিষ্ণুপুরের মল্লরাজদিগের আনুকূল্যে ইহা সমগ্র আদিবাসী এবং অর্ধ-উপজাতি সমাজে বিস্তার লাভ করিয়া সেই অঞ্চলের সমাজকে আদীবাসী সমাজের রূপ হইতে মুক্তি দিয়া লোক সমাজের স্তরে উন্নীত করিয়া দিল। ভাগীরথীর দুই তীরবর্তী অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারিল না। কারণ, এই অঞ্চলে শক্তিধর্ম ইতিপূর্বেই দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছিল এবং অভিজাত হিন্দু সমাজ এই অঞ্চলে ইতিপূর্বেই এক সুসংহত সমাজ-জীবন প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছিল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম আদিম জাতির ধর্ম (primitive religion) এবং উচ্চতম ধর্মের মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করিয়াছিল বলিয়াই ইহা হইতে লোকসমাজের একটি আদর্শ রূপ গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং তাহা হইতে লোক-সাহিত্যের সার্থকতম সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। চৈতন্যদেবের পরিকল্পনায় আদিম সমাজের মাদল বৈষ্ণব সমাজের মৃদঙ্গে পরিণত হইল। এই সম্পর্কে উড়িষ্যার কথাও উল্লেখ করা যায়। উড়িষ্যায়ও যে লোক-সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধ, তাহার মধ্যেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দান অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। উড়িষ্যার একদিক দিয়া উপজাতির আদিম ধর্ম আর এক দিক দিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম উভয়েই নিজেদের আদর্শে অটল ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম উড়িষ্যায় প্রচার লাভ করিয়া ইহাদের উভয়ের মধ্যে একটি সহজ যোগসূত্র স্থাপন করিয়া দিল; সেইজন্য সেখানে আদর্শ লোক সমাজ গড়িয়া উঠিয়া লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে সক্ষম হইল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে যে একটি লৌকিক এবং উদার আবেদন ছিল, তাহার ফলে বাংলার বহুবিধ লৌকিক ধর্মমত ইহার মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়া ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়া দিল। সহজিয়া, আউল, বাউল, কর্তাভজা, নাথ ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায় বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে নিজেদের আদর্শের সন্ধান পাইয়া ইহাকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার সুযোগ লাভ করিল। এই ভাবে নানা লৌকিক উপকরণে চৈতন্যধর্ম পুষ্টিলাভ করিয়া বাংলাদেশের সাধারণ লোকের সমাজের মধ্যে যেমন সংহতি সৃষ্টি করিল, তেমনই তাহার মধ্যে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিল। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই মুসলমান শাসনের মধ্যেও বাংলার মুমূর্ষু হিন্দুসমাজ বাঁচিয়া রহিল।

বাংলার পল্লীসমাজ এই ধারায় অগ্রসর হইতে হইতে কিছুকাল পর আর একটি নূতন অবস্থার সম্মুখীন হইল। তখন মুসলমান রাজত্বের অবসান হইয়া ইংরেজ রাজত্বের সূচনা হইয়াছে। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য ইংরেজ সরকার এক নূতন ভূমিব্যবস্থা করিলেন, তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে যাঁহারা এই বন্দোবস্ত করিবার সুযোগ পাইলেন, তাঁহারা তখনকার নবপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতা নগরের উচ্চবর্ণজাত ধনী সম্প্রদায়। এই বন্দোবস্তের সূত্রে তাঁহারা পল্লীর কৃষিভূমি এবং পল্লীবাসীর সকল সুখদুঃখের নিয়ন্তা হইলেন। যে গ্রামগুলি প্রাচীন পল্লীজীবনের সংগঠনধারা অনুসরণ করিয়া পল্লীবাসী একজন প্রধান, নায়ক বা মণ্ডল দ্বারা শাসিত হইত, সেই গ্রামগুলি শহর, হইতে আগত উচ্চবর্ণের জমিদারের হিন্দুকর্মচারীদিগের দ্বারা শাসিত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে জমিদারের কাছারী বা খাজনা আদায়ের কার্যালয় স্থাপিত হইল। ব্রহ্মোত্তর এবং দেবোত্তরের প্রলোভন দিয়া গ্রামে গ্রামে ব্রাহ্মণ বসতি স্থাপিত হইতে লাগিল। পাল রাজত্ব এবং সেন রাজত্বে একদিন যাহার সূচনা হইয়াছিল এবং পরবর্তী মুসলমান শাসনের ফলে যাহা ব্যাহত হইয়া গিয়াছিল, তাহা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিতে লাগিল। জমিদারের কর্মচারী তাহার অর্থনৈতিক সুবিধার সুযোগ লইয়া এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত তাহার বর্ণের শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারে পল্লীজীবনের লোকসমাজের রূপটিকে অল্পদিনের মধ্যেই বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। প্রাচীন

পল্লীর সংগঠন অনুযায়ী গ্রামের যে সকল প্রধান, মণ্ডল বা নায়ক গ্রামে এতদিন ধরিয়া নেতৃত্ব করিয়া আসিতেছিল, তাহাদের সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইতে লাগিল; গ্রামের বাদবিসম্বাদ মিটাইবার জন্য তাহাদেরই যে একদিন সার্বভৌম অধিকার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল। জমিদারের কাছারী কিংবা শহরের আদালত ফৌজদারীতে তাহার বিচার হইতে লাগিল। এতদিন জাতি এবং ধর্মের অধিকারে এক একটি গ্রামের মধ্যে সকলেই সমান ছিল; কিন্তু ক্রমে ব্রাহ্মণের একটি কৃত্রিম সামাজিক প্রাধান্য সৃষ্টি হইল। সাধারণ মানুষের মধ্য হইতে তাহার এই প্রাধান্য সৃষ্টি হয় নাই, এই বিষয়ে প্রচলিত ঐতিহ্যের বিরোধিতা দেখা দিল। পূর্বে গ্রামবাসীর সাধারণ নির্বাচনে গ্রামের প্রধান বা নায়ক স্থির করা হইত, তাহার কথা সকলে শুনিত, ক্রমে ব্রাহ্মণ কিংবা জমিদারের উচ্চ বর্ণের কর্মচারী সাধারণ গ্রামাজীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহানুভূতিহীন হওয়া সত্ত্বেও গ্রামের সর্ববিধ ব্যাপারে প্রভুত্ব করিতে আরম্ভ করিল। গ্রাম প্রধান বা নায়কের যে কর্তব্য কিংবা দায়িত্ব ছিল, তাহা ক্রমে লুপ্ত হইয়া গেল। তুর্কীবিজয়ের পর হইতেই বাংলার পল্লীতে পল্লীতে যে সংহত সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিবার প্রয়াস পাইতেছিল, তাহা শেষবারের মত ভাঙিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। যে সমাজ-জীবনের মধ্যে পল্লীসাহিত্য রচনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারিত, সেই সমাজ-জীবন ক্রমে বিদায় লইতে আরম্ভ করিল। তাহার ফলে বাংলার পল্লীসাহিত্যও সেই যুগ হইতেই গতিশক্তিহীন হইয়া পড়িতে লাগিল।

তখন নগরজীবন কেন্দ্র করিয়া পল্লীজীবনের ক্ষীণতম ভিত্তির আশ্রয়ে যে এক শ্রেণীর গীতি রচনা বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, তাহা লোকসাহিত্যও যেমন ছিল না, তেমনি পরিপূর্ণ নাগরিক সাহিত্য রূপেও গড়িয়া উঠিতে পারে নাই—তাহাই কবিওয়ালার গান নামে পরিচিত। ইহার রাধাকৃষ্ণের কাহিনী পল্লীজীবন হইতে জাত, পরিবেশনের ভঙ্গির মধ্যেও অনেকাংশে পল্লীর সংস্কার বর্তমান ছিল, কিন্তু ইহা পল্লীর নির্মল আলোবাতাস হইতে নির্বাসিত হইয়া শহরে বদ্ধ হাওয়ার মধ্যে প্রবেশ করিল। ইহার মধ্য হইতে স্বাচ্ছন্দ্যের ভাব লুপ্ত হইয়া গেল, কৃত্রিম শব্দবিন্যাস এবং রুচিবিলাসিতার ভিতর দিয়া নাগরিক রূপ ইহাদের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রকট হইয়া উঠিল। পূর্বে পল্লীসংগীতের মধ্য দিয়া যেমন সামগ্রিক সমাজ-মানসের অভিব্যক্তি দেখা দিত, ইহাদের ভিতর দিয়া তাহার পরিবর্তে ব্যক্তিবিশেষের রুচি এবং নীতিবোধ উৎকট আকারে আত্মপ্রকাশ করিল। একদিন সকলে মিলিয়া যাহার কাব্য ও ভক্তিরস আস্বাদন করিত, তখন হইতে তাহা ব্যক্তি বা ব্যষ্টির দাসত্বে আত্মনিয়োগ করিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দেশে জমিদারী প্রথা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মূলত বাংলার পল্লীজীবনের যে সংহতি বিনষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, কলিকাতা মহানগরীর নূতন নাগরিক জীবনের প্রতিষ্ঠার মধ্যে তাহার পরিপূর্ণতা দেখা দিল।

মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের বিস্তার এবং বৈচিত্র্য হইতেই সেই যুগে বাংলার পল্লীসাহিত্যও যে কত সমৃদ্ধ ছিল, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। কারণ, মঙ্গলকাব্য মুখ্যত লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও লোক-সাহিত্যের মৌলিক

উপকরণ বহুলাংশে অবলম্বন করিয়াই গঠিত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্য লোকসাহিত্যের উপকরণসমূহ নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করিবার ফলে লোক-সাহিত্যের ধারা যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা নহে, তাহার মৌখিক ঐতিহ্যকে কোনো দিক দিয়াই লুপ্ত করিতে পারে নাই। মধ্যযুগে যেমন শত শত মনসামঙ্গল লিখিতভাবে রচিত হইয়াছে; তেমনই আরও শত শত মনসামঙ্গল মুখে মুখেও প্রচারিত হইয়াছে; তাহাদের কোনো বিবরণ কেহ লিখিয়া রাখিতে পারে নাই সত্য, তথাপি নানা সূত্র হইতেই তাহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হইবার পূর্বেও বাংলার লৌকিক গীতিসাহিত্য যে কত সমৃদ্ধ ছিল, বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' তাহার প্রমাণ। লোকসাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে তদানীন্তন শিল্পসাহিত্যের এক অপূর্ব মিলনক্ষেত্র 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপিয়া এই ধারা অনুসরণ করিয়া লোক-সাহিত্য মঙ্গলকাব্য, এবং বৈষ্ণব কবিতা সমান্তরাল ভাবে রচিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর পল্লীসমাজের সংহতি যে ভাবে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, তাহার পর হইতে ইহার ধারা শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে কলিকাতা মহানগরী সমাজ-জীবনের এক সম্পূর্ণ নূতন নাগরিক আদর্শ লইয়া এই দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। ফলে পল্লীসাহিত্যের সকল প্রবাহ শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু কলিকাতা মহানগরী হইতে বহু দূরবর্তী বাংলার প্রান্তিক অঞ্চলে এখনও ইহার ধারা ক্ষীণস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে। তথাপি বাংলার কোনো কোনো প্রান্তিক অঞ্চলের সমাজ-জীবনও আর একটি সম্পূর্ণ নূতন দিক হইতে সাম্প্রতিক কালে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা যন্ত্রশিল্প। বাংলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী অঞ্চলে যন্ত্রশিল্পের যে ভাবে প্রসার দেখা দিয়াছে, তাহাতে সেই অঞ্চলের সমাজজীবন আজ সর্বাধিক বিপর্যস্ত হইয়াছে। বাংলার পশ্চিম সীমান্তলগ্ন শিল্পনগরী টাটা হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্গাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া আজ জীবনের যে রূপ প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহার মধ্যে সমাজের কোনো বন্ধন নাই, নীতির কোনো শাসন নাই, রুচির কোনো বিচার নাই, মানুষের মনুষ্যত্বের কোনো বিকাশ নাই। এই ভয়াবহ সামাজিক বিপর্যয়ের মধ্যে লোকসাহিত্যের কোনো রূপেরই যে আজ বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। সুতরাং একদিন মহানগরী হইতে বহু দূরবর্তী দেশের প্রান্তিক অঞ্চলে প্রাচীন সমাজ জীবনের যে ধারা বিকাশলাভ করিবার সুযোগ পাইত, পশ্চিম বাংলার পক্ষে সেই সুযোগও লুপ্ত হইয়াছে।

দূরবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা যত সহজ হয়, সেই অঞ্চলের সামাজিক সংহতিও সেই পরিমাণেই শিথিল হয়। উত্তর সীমান্তবর্তী বাংলারও নিভৃত পল্লীর বুকের উপর দিয়া সুদীর্ঘ রাজপথ বহির্জগতের সঙ্গে ইহার যোগাযোগ সহজ করিয়া তুলিয়াছে। ক্রমে সেই সকল অঞ্চলেও শিল্পসভ্যতার দ্রুত সম্প্রসারণ হইতেছে, সুতরাং যে পরিবেশে পল্লীসাহিত্যের জন্ম এবং পুষ্টিলাভ সম্ভব, বাংলা দেশে তাহা দ্রুত লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

॥ ২ ॥ মঙ্গলকাব্য কি?

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি

ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্মবিষয়ক আখ্যান-কাব্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। বাংলার পল্লীর জনসভায় ইহার উদ্ভব হইলেও শেষ পর্যন্ত রাজসভায় ইহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ইহা বাংলাদেশের একটি বিশেষ যুগের সাহিত্যসাধনা হইলেও, ইহার সৃষ্টিপ্রেরণা কোন একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাস হইতে আসে নাই। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হইয়া বাংলাদেশের লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মমতের যে অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে, মঙ্গলকাব্যগুলি তাহারই পরিচয় বহন করিতেছে। বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার-আচারণ, সংস্কার-সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের বিস্তৃত ভিত্তির উপরই ইহাদের প্রতিষ্ঠা।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টপরবর্তী প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যে বিবিধ মহাপুরাণ ও উপপুরাণগুলি যে উদ্দেশ্যে রচিত হয়, বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিও সেই উদ্দেশ্যেই সর্বপ্রথম রচিত হইতে আরম্ভ করে। মহারাজ অশোকের সময় হইতে সমগ্র ভারতময় যে বৌদ্ধধর্মের একাধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল, তাহারই প্রতিক্রিয়ারূপে এতদ্দেশীয় জনগণের অবলম্বিত ধর্মবিশ্বাস ও হিন্দুধর্মের মূলগত আদর্শ এই উভয়ের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ভারতে এক নবসংস্কার-প্রবুদ্ধ হিন্দুধর্মের উন্মেষ হইয়াছিল। সেই যুগে বেদ ও উপনিষদ-বর্ণিত ব্যক্তিসত্তাহীন ভাব-সর্বস্ব দেবতাগণকে তাঁহাদের কল্পিত গুণাবলীর উপর বাস্তব রূপ আরোপ করিয়া ভারতের কর্মভূমিতে অবতীর্ণ করাইতে হইল। কারণ ইতিপূর্বে বুদ্ধদেব ব্যক্তিগত কর্মসাধনার ভিতর দিয়া একটা প্রতিকূল সমাজের বুকে নিজের ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন,—দুশ্চর তপস্যা ও বহু কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্য দিয়া মানবের দুঃখ বেদনাকে আপন অন্তরে অনুভব করিয়াছেন। তাই বৌদ্ধধর্মের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বৈদিক হিন্দুধর্মের যখন সংস্কারের প্রয়োজন হইল, তখন হিন্দুর দেবতাদিগকেও আর কল্পনার স্বর্গলোকবিহারী করিয়া রাখা চলিল না। তাঁহাদিগকেও মূর্তি ধারণ করাইয়া মর্ত্যের সমাজে মানবের মেলায় নিজেদের কর্তব্যসাধন পথে অগ্রসর করাইতে হইল। এইরূপ বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়াই খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে সংস্কৃত পুরাণগুলি রচিত হইতে থাকে—এই ভাবে প্রত্যেক পুরাণেই একজন কল্পিত কর্মশক্তিমান দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দুধর্মে পৌত্তলিকতার জন্ম যে দিনই হইয়া থাকুক, পৌরাণিক যুগেই যে তাহার প্রকৃত প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা সর্ববাদিসম্মত।

বঙ্গদেশের ইতিহাস আলোচনা করিলেও জানিতে পারা যায় যে, এই দেশে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ছিল। ইহার পূর্বে পালরাজগণ এই দেশে প্রায় চারিশত বৎসর রাজত্ব করেন। মধ্যভারতে যে বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল, বঙ্গদেশে সেই বৌদ্ধধর্মেরই শাখাবিশেষ নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। ইহার

কারণ অনুসন্ধান করিতেও অধিক দূর অগ্রসর হইতে হয় না। বঙ্গদেশের অনতিদূরবর্তী বিহার প্রদেশেই বৌদ্ধধর্মের প্রথম উদ্ভব-ভূমি এবং মধ্যভারতের ব্রাহ্মণ্যসংস্কার বহুকাল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের এই প্রথম উদ্ভব-ভূমি বিহার প্রদেশ অতিক্রম করিয়া বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে নাই। অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে আর্যভাষার সহিত আর্যসংস্কারও কিছু কিছু এই দেশে আসিয়া প্রবেশ লাভ করিতেছিল। এমন কি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান চুয়াঙ্, উত্তর বঙ্গে মহাযান-হীনযান বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম ইত্যাদির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মকেও বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী ধর্ম বলিয়াই লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তথাপি ইহাও স্বীকার্য যে, পরবর্তী বৌদ্ধ পালরাজগণের চারিশত বৎসর রাজত্বকালের মধ্যেও এদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম তেমন বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। যদিও পালরাজাগন ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, তথাপি পাল রাজত্বের শেষ অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম কিংবা সংস্কৃত ভাষায় চর্চা তেমন ব্যাপকতা লাভ করে নাই।

পালরাজগণের সময় হইতেই সম্ভবত বঙ্গদেশে প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধধর্মের সহিত স্থানীয় কতকগুলি লৌকিক ধর্ম-সংস্কারের সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়। তাহারই ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মিশ্র কতকগুলি লৌকিক ধর্মমতের উদ্ভব হয়। রাঢ় ভূমির সংলগ্ন পশ্চিম অঞ্চলে সেনরাজদিগের বহুকাল পর পর্যন্তও অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষা-ভাষী জাতির প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। সেনরাজদিগের সময় হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম এই দেশের সামাজিক জীবনের উপর ক্রমে ক্রমে প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম তৎকালীন বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার সম্মুখীন হইয়া বিভিন্ন আদর্শের দিক হইতে আবার নূতন সংস্কৃতি লাভ করিতে লাগিল। এই ভাবেই দেশে বিভিন্ন লৌকিক ধর্মমতগুলির সৃষ্টি হয়। ক্রমে সমাজের উপর মূল হিন্দুধর্মের প্রভাব যতই প্রবল হইতে আরম্ভ করিল ততই এই বিভিন্নমুখী লৌকিক ধর্মসম্প্রদায়গুলি এক কেন্দ্রগত আদর্শের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহারই ফলে বর্তমান বাংলার হিন্দুসমাজে পঞ্চোপাসক হিন্দুসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

সেনরাজগণের সময় হইতেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি সাধারণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিতে আরম্ভ করিলেও এতকালের দেশীয় ধর্ম-সংস্কৃতির যে উপাদানসমূহ এদেশের সমাজের একাবারে মজ্জায় গিয়া স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহা একেবারে পরিত্যক্ত হইল না। সমাজে ক্রমে পুরাতন ধর্ম-বিশ্বাসের মূল শিথিল হইয়া নবাগত আদর্শের উপর আশা ও আশ্বাস স্থাপিত হইল সত্য, তথাপি রক্ষণশীল এই সমাজ পুরাতনকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিল না; তাহারা নূতনকে যে ভাবে গ্রহণ করিল, তাহা পুরাতনেরই রূপান্তর মাত্র হইল—এই প্রদেশের প্রচলিত ধর্মসংস্কারই যুগোচিত পরিমার্জনা মাত্র লাভ করিয়া সমাজের অন্তস্তলে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতে লাগিল।

মধ্যযুগের বাংলার সমাজ এই নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পরস্পর বিপরীতমুখী দুইটি সংস্কারকে একসূত্রে গাঁথিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার যে কি ভাবে একদেহে লীন হইয়া আছে, মঙ্গলকাব্যগুলি তাহারই পরিচয়।

॥৩॥ মঙ্গলকাব্যের গঠন

মঙ্গলগানের এক একটি সুদীর্ঘ গীতিকাহিনী কতকগুলি পালায় পালায় বিভক্ত হইয়া রচিত হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ক মঙ্গলকাব্যের পালা বিভাগও স্বতন্ত্র। যেমন চণ্ডীমঙ্গল আট দিনে গীত হইত, প্রত্যেক দিনের জন্য দিবাপালা এবং রাত্রিপালায় কাহিনী বিভক্ত হইত, তাহাতে ষোল পালায় কাহিনীটি ভাগ করা হইত। ইহাই মঙ্গলকাব্যের সাধারণ রীতি ছিল, আট দিনের ষোল পালার বিভাগই মঙ্গলগানের সাধারণ বিভাগ। 'অন্নদামঙ্গল'ও আটদিনের ষোল পালায় বিভক্ত থাকিত। এই বিভাগ যে সংস্কৃত কাব্যের সর্গ বিভাগের মত তাহা নহে, কারণ সংস্কৃত কাব্যের সর্গ বিভিন্ন ছন্দে রচিত হইত, পূর্ববর্তী সর্গের ছন্দ পরবর্তী সর্গে ব্যবহৃত হইত না। তারপর সংস্কৃত কাব্যের সর্গবন্ধের মধ্যে আর কোন দ্বিতীয় ছন্দ ব্যবহৃত হইত না; কিন্তু মঙ্গলকাব্যের বিশেষ একটি পালার মধ্যে পয়ার ছন্দ ব্যতীত ত্রিপদী, লঘু ও দীর্ঘ কিংবা একাবলী কিংবা অন্য কোন ছন্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। আট দিনে স্থির রাখিয়া গায়েনের সুবিধামত মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর বিভাগ হইত। দিবা দ্বিপ্রহরের পর হইতে গান আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত চলিত, তারপর সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর রাত্রের পালা আরম্ভ হইত। তাহা প্রায় মধ্যরাত্র পর্যন্ত চলিত। এইভাবে গাহিবার সময় অনুযায়ী সংস্কৃত কাব্যের পালাবিভাগ হইত না, কারণ, সংস্কৃত কাব্য কোন দিনই এই ভাবে গাওয়া হইত না। সংস্কৃত পুরাণের বিভাগগুলিকে অধ্যায় বলিত; সুতরাং মঙ্গলকাব্যের পালা বিভাগ সংস্কৃত পুরাণ অনুসারীও নহে।

চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল ইহারা আটদিনের ষোল পালার বিভক্ত থাকিলেও ধর্মমঙ্গল বারদিনের চব্বিশ পালায় বিভক্ত থাকিত। দ্বাদশ সংখ্যাটি ধর্ম পূজার পক্ষে বড় পবিত্র, কারণ, ধর্মপূজা সূর্যপূজা, সূর্যের সংখ্যা দ্বাদশ, দ্বাদশ আদিত্য। সেই জন্য বার দিনের চব্বিশ পালায় তাহা বিভক্ত থাকিত। মনসা-মঙ্গল প্রতিদিন একপালা করিয়াই গান হইত এবং এক মাসের উপযোগী এক একটি সুদীর্ঘ পালার ত্রিশ পালায় বিভক্ত থাকিত। সকল মঙ্গলকাব্যেরই গান শেষ হইবার পূর্ববর্তী রাত্রির পালাকে জাগরণ পালা বলিত। কারণ সেদিন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া গান হইত। পরদিন দিবাপালার ফলশ্রুতি শুনিবার পর গান শেষ হইয়া যাইত।

চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল ব্যতীত আর কোন মঙ্গলকাব্যের পালা বিভাগের সুনির্দিষ্ট কোন রীতি ছিল না; রামকৃষ্ণের 'শিবায়ন' ষড়্‌বিংশতি পালায় এবং রামেশ্বরের 'শিবায়ন' অষ্ট পালায় বিভক্ত।

জাগরণ পালায় মঙ্গলগানের কাহিনী শেষ হইয়া যাইবার পর শেষ দিনের দিবা পালায়

যে কাহিনী-বহির্ভূত ফলশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যাইত, তাহাকে কোন কোন সময় অষ্টমঙ্গলা বলা হইত। তাহাতে অনেক সময় কবি তাঁহার বিস্তৃত আত্মপরিচয়ও দিতেন। অনেক কাহিনীর সংক্ষিপ্তসারও অষ্টমঙ্গলাতে প্রকাশ করা হইত।

পুরাণ পাঠ এবং শ্রবণ করিলে যে কি পুণ্য লাভ হয়, তাহা প্রত্যেক পুরাণের কাহিনীশেষে বর্ণিত হয়, তাহাকে পুরাণের ফলশ্রুতি বলে মঙ্গলগানেরও সেই প্রকার ফলশ্রুতি বর্ণিত হয়। বলাই বাহুল্য যে, পুরাণ হইতেই এই রীতি মঙ্গলকাব্যে আসিয়াছে এবং পুরাণের অনুযায়ীই ইহার সম্পূর্ণ ব্যবহার হইয়াছে। মঙ্গলগানের ফলশ্রুতির মধ্যে ঐহিক কামনা বাসনার সমৃদ্ধিরই আশ্বাস দেওয়া হয়, কোন পারত্রিক কল্যাণের আশ্বাস দেওয়া হইত না। তবে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাববশত কোন কোন পুরাণে তাহারও আশ্বাস অনেক সময় আসিয়া যাইত।

সাধারণত ফলশ্রুতির অংশেই মঙ্গলকাব্যের কবিগণ তাঁহাদের কাব্যরচনার কাল হেঁয়ালীর মত করিয়া উল্লেখ করিতেন। একমাত্র বিদগ্ধ ব্যক্তি ব্যতীত এই হেঁয়ালীর অর্থ গ্রহণ করিতে পারিত না। মঙ্গলকাব্য হইতে এই রীতি অন্যান্য সমসাময়িক বাংলা কাব্যেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। আপাতদৃষ্টিতে যাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায় না, তাহা অনুলিপিকারগণ প্রতিলিপি তৈয়ারী করিবার সময় লিখিতে ভুল করিত, তাহার ফলে পরবর্তী কালে ইহাদের মধ্য হইতে আর কেহ প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করিয়া প্রায়ই অর্থ গ্রহণ করিতে পারিত না। এই রীতি মঙ্গলকাব্যেই প্রথম জন্মলাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, কারণ, চৈতন্যপূর্ববর্তী বৈষ্ণব অনুবাদকাব্যেও যে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র রচনাকাল জ্ঞাপক পদের উল্লেখ আছে, তাহা অনুরূপ হেঁয়ালীপূর্ণ রচনা নহে, সহজ ভাবে প্রত্যক্ষ ভাষায় তাহা লেখা হইয়াছিল, যেমন,

তেরশ পচানব্বই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চৌদ্দ শত দুই শকে হৈল সমাপন।।

কিন্তু প্রায় সমসাময়িক কালেই বিজয় গুপ্ত তাঁহার মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনার কাল এই ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন,

ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন শাহ্ নৃপতি তিলক।।

ঋতু অর্থে ৬, শশী অর্থে ১, বেদ অর্থে ৪, শশী অর্থে আবার এক, এইভাবে যে সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়। তাহা বাম দিক হইতে পড়িয়া ('অঙ্কস্য বামাগতিঃ') ১৪১৬ শকাব্দ হইতেছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। মঙ্গলকাব্য যে পণ্ডিত ব্যক্তির রচনা সাধারণ নিরক্ষর ব্যক্তির রচনা নহে, এই প্রত্যয় সৃষ্টি করাই এই শ্রেণীর রচনার উদ্দেশ্য। সমস্ত ধাঁধা বা হেঁয়ালী রচনার চিরকালই আদর ছিল, ইহারাও নূতন এক শ্রেণীর ধাঁধা মাত্র। ইহাই সমস্ত মঙ্গলকাব্যের রচনাকালজ্ঞাপক পথনির্দেশের একমাত্র রীতি ছিল। এই রীতি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্তও

অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করা হইয়াছিল। রামায়ণ মহাভারত পুরাণের অনুবাদের মধ্যেও এই রীতি ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

মঙ্গলকাব্যের প্রত্যেক কবিই ফলশ্রুতিতে কিংবা ক্বচিৎ অন্যত্রও বিস্তৃত আত্মপরিচয়মূলক পদ রচনা করিয়া তাঁহাদের কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদেও তাঁহার বিস্তৃত আত্মবিবরণী পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র পর্যন্ত এই রীতি সম্পূর্ণ অব্যাহত ছিল। রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিবার ফলে অনেক কবিই আত্মপরিচয় অপেক্ষা রাজবংশ পরিচয়কেও তাঁহাদের রচনায় বিশেষ মর্যাদা দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আত্মপরিচয়ের মধ্য দিয়া অনেক সময় কাব্য ও কবির ঐতিহাসিক পরিচয় কিছু কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে ভবভূতির নাটকে রচয়িতার বিস্তৃত আত্মপরিচয় পাওয়া যায়, তার পর হইতে কোন কোন নাট্যকার এই প্রথা অনুসরণ করিয়াছেন। সংস্কৃত নাটক হইতে ইহা ক্রমে সংস্কৃত কাব্য ও গদ্য রচনাতেও এই রীতি প্রসার লাভ করে। ক্রমে আত্মপরিচয় দান করা সংস্কৃত রচনা মাত্রেরই একটি লক্ষণ হইয়া দাঁড়ায়। এমন কি, বাংলা ভাষার উদ্ভবের সমসাময়িক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তীকাল পর্যন্তও সংস্কৃত রচনায় এই রীতি ব্যাপকভাবে গৃহীত হইয়াছিল। মঙ্গলকাব্যেও যে ইহা তাহারই প্রভাবের ফল, তাহা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না। তারপর কতকগুলি আদর্শ বাংলা রচনা যেমন কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণের অনুবাদ, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতির মধ্যে যখন অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে আত্মপরিচয় দানের রীতি গৃহীত হইয়াছিল, তখন পরবর্তী বাংলা মঙ্গলকাব্যেও এই প্রথা হইয়া উঠিয়াছিল। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গলের এবং রূপরামের ধর্মমঙ্গলের বিস্তৃত আত্মপরিচয় যে তাহাদেরই প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। ব্যক্তিগত বিষয় ব্যতীতও যে এই শ্রেণীর 'আত্ম' বিবরণীতে বৃহত্তর সামাজিক তথ্য অনেক সময় পরিবেশন করা হইয়াছে, তাহাদের জন্যই ইহাদের বিশেষ মূল্য প্রকাশ পাইয়াছে।

বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম নিদর্শন চর্যাপদেই পদমধ্যে রচয়িতার নামের ভণিতা প্রথম শুনিতে পাওয়া যায়। বিষয়নিস্পৃহ বৈষ্ণবগণও তাঁহাদের রচিত পদশেষে নিজেদের নামের ভণিতা যোগ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা বাঙ্গালীর মজ্জাগত সংস্কার। লোকসাহিত্যে ইহার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। এই রীতিটি বাঙ্গালীর নিজস্ব বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। কারণ সংস্কৃতে এই শ্রেণীর রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে বাংলাদেশে যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে তাহা বাঙ্গালীর সংস্কার হইতে গিয়াই প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মনে হইবে। জয়দেবের "গীতগোবিন্দে" সেই সূত্রেই ইহার ব্যবহার হইয়াছে।

ভণিতায় কাহিনী-নিরপেক্ষ কবির ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিসম্পর্কিত নানা বিষয়ের উল্লেখ থাকিতে পারে। যেমন পূর্বেই বলিয়াছি, কবির ব্যক্তিগত পরিচয় ব্যতীতও কবির পৃষ্ঠপোষকের পিতৃকুল মাতৃকুল কোন কোন সময় শ্বশুরকুলের উল্লেখ থাকিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে ব্যক্তিগত বিষয় অপেক্ষা পৃষ্ঠপোষকগণের প্রশংসা করার মূল্য বেশি। কবিগণ

এই বিষয় অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। অনেক সময় পৃষ্ঠপোষকতার আশা করিয়াও কোন স্থানীয় রাজা বা ভূস্বামীর নামোল্লেখ করিয়া প্রশংসা করিতে দেখা যায়। নায়ক বা যাহার গৃহে মঙ্গলগানের অনুষ্ঠান হয়, তাহার উল্লেখ করিয়াও দেবতার কৃপা প্রার্থনা করা হয়।

বৈষ্ণব পদাবলীতে ভণিতা রচনার যে রীতি আছে, তাহা অনুসরণ করিয়া কোন কোন সময় মঙ্গলকাব্যের কোন কবিও ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। অর্থাৎ বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের দাস রূপে কোন কোন ভক্ত কবি ভক্তিমূলক মন্তব্য করিয়া থাকেন, মঙ্গলকাব্যেও দেবদেবীকে লক্ষ্য করিয়া কবিগণ ভণিতায় কোন কোন সময় সেই প্রকার মন্তব্য করেন। এই সকল মন্তব্য কাহিনীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন বৈষ্ণব কবিতায় শুনিতে পাওয়া যায়,

মুরারি গুপেতে কহে পিরীতি এমতি হৈলে
তার যশ তিন লোকে গায়।

তেমনই মনসা-মঙ্গল কাব্যেও শুনিতে পাওয়া যায়,

যে খায় আমার দধি পাশরিতে নারে।
ক্ষেমানন্দে বলে দধি খাইলে সে মরে॥

তারপর ভণিতায় মাতাপিতার নামধামের উল্লেখ থাকে, দৈবাদেশে যে কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ থাকে। এমন কি, কি ভাবে কবি দৈবাদেশ লাভ করিয়াছেন, তাহার খুঁটিনাটি বর্ণনাও বাদ যায় না। ভণিতায় কবিগণ নিজের কাব্যের নিজেই প্রশংসা করেন। এই রীতি রামায়ণ মহাভারত অনুবাদের মধ্যেও গৃহীত হইয়াছিল। যেমন, কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন,

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব মধুর।
শুনিলে পরমানন্দ পাপ যায় দূর॥

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও শুনিতে পাওয়া যায়, 'শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত।' কিংবা 'অনাদি মঙ্গল গীত সুধারস সার' ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণব কবিদিগের যে বিনয়ের অভাব দেখা যায়, মঙ্গলকাব্যে তাহা দেখা যায় না। 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার ভণিতায় লিখিয়াছেন,

চৈতন্য চরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাহার চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে॥

মঙ্গলকাব্যের কবি এবং বৈষ্ণবচরিত কাব্যের কবির মধ্যে ভণিতার ব্যবহারে এই প্রকার মৌলিক প্রভেদ দেখা যায়। মঙ্গলকাব্যের কবির আত্মপ্রশংসামূলক ভণিতার ব্যবহার বাঙ্গালীর একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে হয়। বৈষ্ণব হইয়াও জয়দেব এই শ্রেণীর ভণিতার ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু চৈতন্য আবির্ভাবের পর কোন মহাজন পদ-

রচয়িতাকেই জয়দেবের পথ অনুসরণ করিতেও দেখা যায় নাই।

মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীর নিকট প্রার্থনা জানাইয়া ভণিতা ব্যবহার করা হইত। কোন কোন সময় ইহাদের মধ্যে কবির আত্মনিবেদনের ভাবটি সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে, যেমন,

অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত॥—মুকুন্দরাম

মঙ্গল গান শুনিলে কি ফল লাভ হইবে তাহা উল্লেখ করিয়াও ভণিতা রচিত হইয়াছে। অনেক ভণিতায় পূর্ববর্তী কবির নামও উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই পূর্বসূরীর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেও এক বিজয় গুপ্তই তাহার ব্যতিক্রম। তিনি তাঁহার পূর্বসূরী হরিদত্তকে মূর্খ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, 'প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত! মূর্খে রচিত গীত না জানে মাহাত্ম্য।' এই প্রকার দুর্বিনীত উক্তি আর কোন মঙ্গলকাব্যের কবি করেন নাই।

অনেক সময় কোন কোন কবি আদ্যোপান্ত একই ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাসও তাহাই করিয়াছেন। মনসামঙ্গলের কবিদিগের মধ্যে ষষ্ঠিবর দত্ত সর্বত্র একই ভণিতার পদ বারবার ব্যবহার করিয়াছেন। নারায়ণদেব তাঁহার মনসামঙ্গল কাব্যে যে ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সুকবিবল্লভ কথাগুলি যুক্ত আছে। এগুলি দুইজন ব্যক্তির নাম কি না, তাহা লইয়া অনেক গবেষণা হইয়াছে। একই পদের মধ্যে দুইজন কবির ভণিতা ব্যবহার করিবার রীতি প্রচলিত ছিল, এমন মনে হয় না। কারণ, তাহা থাকিবার কথা নহে। ইহা নারায়ণদেবের উপাধিও হইতে পারে। কিন্তু বিষয়টি খুব স্পষ্ট নহে।

দৈবাদেশ ব্যতীত কোন মঙ্গলকাব্য রচিত হইত না, প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের কবিরই ইহা বক্তব্য এবং এই দৈবাদেশ কি ভাবে কে কখন লাভ করিয়াছিলেন প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যে তাহার উল্লেখ আছে। এই বিষয়ক প্রত্যেকটি কাহিনীই যেমন অলৌকিক, তেমনি চিত্তাকর্ষক। দেব-বন্দনা দিয়া প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেরই সূচনা হইয়াছে। কেহ গণেশাদি পঞ্চদেবতা দিয়া রচনা আরম্ভ করিয়াছেন, কেহ সূর্য দেবতা দিয়াও কাহিনী আরম্ভ করিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই পঞ্চদেবতার আদর্শই মঙ্গলকাব্য রচনার সূচনাতে সুনির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

॥ ৪ ॥ মঙ্গলকাব্যের ছন্দ

মৌখিক প্রচলিত গীতিকাহিনী হইতে মঙ্গলকাব্য রচিত হইলেও মঙ্গলকাব্যে যে লৌকিক ছন্দ বা ছড়ার ছন্দ সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নহে। এমন কি, লৌকিক ছন্দের ব্যবহার তাহাতে যাহা হইয়াছে, তাহা উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই নয়। সর্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে মঙ্গলকাব্যে অক্ষরবৃত্ত পয়ার ছন্দই প্রধানত ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা তানপ্রধান ছন্দের অন্তর্গত। অবশ্য এ কথা সত্য, চৈতন্যযুগের পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যগুলির ছন্দের মধ্যে

দৃঢ়সংবদ্ধতা ছিল না; সুতরাং অক্ষরবৃত্ত পয়ার ছন্দে পদ রচনা করিতে গিয়াও তাহাতে অনেক সময় অক্ষরের মাত্রা কম বেশি হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা গানের প্রয়োজনে রচিত হইত বলিয়া অক্ষর বা কোন মাত্রার অভাব গানের সুরের মধ্য দিয়া পূরণ করিয়া লওয়া হইয়াছে।

অক্ষরবৃত্ত পয়ার ছন্দকে মধ্যযুগে পাঁচালী ছন্দও বলিত। প্রায় আনুপূর্বিক এই ছন্দে মঙ্গলগান রচিত হইত বলিয়া ইহাকে পাঁচালী গান, যেমন মনসার পাঁচালী, মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী ইত্যাদি বলিয়াও উল্লেখ করা হইত। সুতরাং পাঁচালী বা পয়ারই মঙ্গলকাব্যের প্রধান ছন্দ। আখ্যায়িকা বর্ণনা করিবার ইহার একটি অভাবনীয় শক্তি আছে; সেইজন্য সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক বিপুল এবং সমৃদ্ধ অংশই এই ছন্দে রচিত হইয়াছে। মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্য, বৈষ্ণব জীবনী সাহিত্য, নাথ-আখ্যায়িকা সাহিত্য সমগ্রই পাঁচালী বা পয়ার ছন্দে রচিত। তবে এ কথা সত্য, চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগ পর্যন্ত ইহার চৌদ্দ অক্ষরের বাঁধুনি খুব সুদৃঢ় ছিল না, তথাপি চৌদ্দ অক্ষরের আদর্শেই ইহার পদ সর্বত্র গঠিত হইয়াছে। ত্রুটি এবং স্খলনগুলি রচয়িতাদিগেরই রচনার ব্যক্তিগত ত্রুটি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

যদিও মঙ্গল গান বা মঙ্গলকাব্য গানের উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল, তথাপি পাঁচলী বা পয়ারের পদগুলি আনুপূর্বিক গীত হইত না। ইহাদের অনেকটা ছড়ার মত দ্রুত সুর করিয়া আবৃত্তি করা হইত। এই প্রকার আবৃত্তির একঘেয়েমি দূর করিবার জন্য ধুয়া বা ধ্রুবপদগুলি মধ্যে মধ্যে গাওয়া হইত। আবৃত্তি এবং গানে মিলিয়া একটি উপভোগ্য পরিবেশের সৃষ্টি হইত। সুরে আবৃত্তি করিতে গিয়াও পয়ার ছন্দে কোন শৈথিল্য থাকিলে তাহা পূরণ করিয়া লইবার সুযোগ পাওয়া যাইত।

মঙ্গলকাব্যের কাহিনীগুলি লিখিত হইবার পূর্বে যখন মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, তখন ইহাদের মধ্যে যে ছন্দ ব্যবহৃত হইত, তাহার কিছু কিছু নিদর্শন এখনও মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। তবে তাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প। কিন্তু সেই ছন্দের প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহা ছড়ার ছন্দ; অর্থাৎ শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ বা স্বরবৃত্ত ছন্দ বলিয়া পরিচিত। সেই ছন্দ হইতে যে পয়ার ছন্দের জন্ম হইয়াছে, তাহা নহে। কারণ, এই দুই ছন্দের প্রকৃতিই পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মঙ্গলকাব্য লিখিত হইবার যুগেই পয়ার ছন্দ জন্মলাভ করিয়াছে। যতদিন মুখে মুখে এই কাহিনী প্রচলিত ছিল, লিখিত রচনা আত্মপ্রকাশ করে নাই, ততদিন অক্ষরবৃত্ত পয়ার ছন্দের জন্ম হয় নাই, তখন সাধারণত মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত ছন্দেরই প্রচলন ছিল।

মঙ্গলকাব্যের কবিগণ ছন্দ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। সেইজন্য অনেক কবি ভণিতার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তী অংশ কোন্ ছন্দে রচনা করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। অনেক কবি কিংবা গায়ক প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শিরোদেশে ছন্দের নামোল্লেখ করিয়াছেন। পয়ার ছন্দকে পাঁচালী বলিয়া উলেখ করা হইয়াছে।

যে পয়ার ছন্দ সাধারণত মঙ্গলকাব্যে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাকে লঘু বা দ্বিপদী পয়ার বলিয়া উল্লেখ করা যায়। ইহার প্রতিটি পদ আট এবং ছয় মাত্রায় বিভক্ত। প্রত্যেক পদে দুইটি পর্ব থাকে বলিয়া ইহাকে দ্বিপার্বিক বলা হয়, দুইটি পদেই ইহার এক একটি স্তবক গঠিত হয়। ইহা ধীর লয়ের ছন্দ বলিয়া কাহিনী বলিবার পক্ষে ইহার মত উপযোগী ছন্দ আর দ্বিতীয় নাই।

পয়ার বা পাঁচালী ছন্দের পর মঙ্গলকাব্যে আর যে সকল ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ত্রিপদীই প্রধান। ত্রিপদী দুই প্রকার, লঘু ত্রিপদী এবং দীর্ঘ ত্রিপদী। এই ত্রিপদীও প্রধানত অক্ষরবৃত্ত ত্রিপদী, বৈষ্ণব পদাবলীর মত মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদী নহে। অংশ আনুপূর্বিক গানের উদ্দেশ্যেই রচিত হইত। করুণরস কিংবা একান্ত ভাবমূলক যে কোন বিষয়ই ত্রিপদী ছন্দে রচিত হইয়াছে। যেখানে ত্রিপদীর পদ ব্যবহৃত হইয়াছে , সেখানে কাহিনীর গতি রুদ্ধ হইয়া গিয়া কেবলমাত্র মনের সূক্ষ্ম ভাব গানের সুরে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। বিশেষত দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের এই বিষয়ে বিশেষ শক্তি আছে।

অনেক সময় ত্রিপদী ছন্দকে মঙ্গলকাব্যের কবিগণ নিজেরাই লাচাড়ী বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে পরবর্তী ছন্দের পরিচয় দিতে গিয়া মঙ্গলকাব্যের কোন কোন কবি ত্রিপদী ছন্দকে লাচাড়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন,

বিজয় গুপ্ত বলে গাইন হও সাবহিত।
পয়ার এড়িয়া বলি লাচাড়ীর গীত॥

লাচাড়ী শব্দটির উদ্ভব সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেহ কেহ মনে করেন, যে ছন্দ নাচিয়া নাচিয়া গাওয়া হয়, তাহাই নাচাড়ী বা লাচাড়ী। কিন্তু সাধারণত করুণ রসাত্মক ভাব লাচাড়ী ছন্দে গীত হয়, করুণ রসাত্মক গান কখনও নাচিয়া নাচিয়া গাওয়া হইতে পারে না, কারণ, ইহাতে দ্রুত তাল ব্যবহৃত হইবার উপায় নাই। সুতরাং লাচাড়ী শব্দের অন্য কোন অর্থ থাকাই সম্ভব।

কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, 'লাচাড়ী কোন ছন্দ নহে; যে সকল ত্রিপদী এবং পয়ার নৃত্য ছন্দে গীত হইত, তাহাকেই লাচাড়ী বলা হইত।' কিন্তু এই উক্তিটিও স্পষ্ট নহে। নৃত্য ছন্দে গাহিবার জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ কোন পদের নির্দেশ পাওয়া যায় না। পয়ার এবং ত্রিপদীর সকল পদেরই রূপ অভিন্ন। সুতরাং 'যে সকল পয়ার ও ত্রিপদী নৃত্য ছন্দে গীত হইত' তাহাদিগকেই যে লাচাড়ী বলিত, তাহা মনে করা কঠিন। পূর্বেই বলিয়াছি, সাধারণভাবে বিলাপ এবং কাতরোক্তি প্রকাশ করা হইত বলিয়া ত্রিপদী ছন্দ নৃত্যের উপযোগী নহে। সুতরাং নৃত্যের সঙ্গে লাচাড়ী শব্দটির কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করা যায় না।

মঙ্গলকাব্যের দুই শ্রেণীর ত্রিপদীই ব্যবহার করা হইয়াছে—লঘু ত্রিপদী এবং দীর্ঘ ত্রিপদী। ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কবিগণের মধ্যে এই বিষয়ে কেহ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই; সাধারণত ৬+৬+৮ মাত্রায় লঘু ত্রিপদী এবং ৮+৮+১০ মাত্রায় দীর্ঘ ত্রিপদী পদ সকলেই

রচনা করিয়াছেন; আনুপূর্বিক পর্বে পর্বে কেহ মিল ব্যবহার করেন নাই; তবে কোন কোন ক্ষেত্রে মিল আপনা হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র। ভারতচন্দ্রই সর্বপ্রথম আনুপূর্বিক দুই পর্বে কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে তিন পর্বে মিল সৃষ্টি করিয়া লঘু ত্রিপদী এবং দীর্ঘ ত্রিপদীর পদ রচনা করিয়াছেন; সেইজন্য ভারতচন্দ্রের ত্রিপদী রচনায় যে শ্রুতিমাধুর্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আর কাহারও রচনায় প্রকাশ পাইতে পারে নাই।

ত্রিপদী ছন্দের একটি বিশেষ রূপকে কেহ ললিত ছন্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ আবার ইহাকে ত্রিপদীরই নামান্তর বলিয়াছেন। এই ছন্দটিও মঙ্গলকাব্যে ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে যাহাতে তিন পর্বে সাতাশটি বর্ণ দ্বারা এক একটি বৃত্ত রচিত হইয়াছে, তাহাকে ললিত ত্রিপদী বলে। একুশ অক্ষর দ্বারা যাহার বৃত্ত রচিত হইয়াছে, তাহাকে ললিত চতুষ্পদী বলা হয়। মনসামঙ্গলের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত একটি ললিত ত্রিপদীর নিদর্শন এই ঃ

খরতরি ডাকে চলে তিন লাখে
ফণী মণি চলে তার মাথে।
গভীর গর্জন পিঠে তার নলবন
তরু আদি পিছলে যার সাথে।

তবে ইহাতে ললিত ত্রিপদীর অক্ষর বিন্যাসে ত্রুটি আছে। কিন্তু এই সকল ছন্দ গানের উদ্দেশ্যে রচিত হইত বলিয়া অক্ষরের কম বেশি সর্বদাই গীতি-সুরের হ্রস্ব দীর্ঘ দ্বারা পূরণ করা হইত।

যদিও পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দই মঙ্গলকাব্যে ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে, তথাপি আরও কতকগুলি ছন্দও প্রথম হইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে একাবলী ছন্দ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগের মনসা-মঙ্গলের কবি বিজয় গুপ্তের রচনাতেই একাবলী ছন্দ ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। একাবলী ছন্দের প্রত্যেকটি পদ একাদশ অক্ষর কিংবা দ্বাদশ অক্ষর দ্বারা গঠিত হয়, প্রথমোক্ত শ্রেণীর ছন্দকে একাবলী এবং শেষোক্ত শ্রেণীর ছন্দকে দীর্ঘ একাবলী বলা হয়। একাবলী ছন্দের মাত্রাবিভাগ এই প্রকার ঃ ৫+৪ এবং দীর্ঘ একাবলী ছন্দের মাত্রাবিভাগ ৬+৬। বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গল কাব্যে একাবলী ছন্দ ব্যবহারের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়, তবে তাহা খুব সুষ্ঠু নিদর্শন নহে। একথা সত্য, ভারতচন্দ্রই এই বিষয়ে উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। কোন কোন কবি ৮+৮ মাত্রায় যে পদ রচনা করিয়াছেন, একাবলী ছন্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা একাবলী ছন্দ নহে। তাহা সংস্কৃত গজপতি ছন্দের অনুরূপ। ভারতচন্দ্রের একাবলী ছন্দের রচনায় তাঁহার কাব্যের সর্বোত্তম অংশ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি একাবলী এবং দীর্ঘ একাবলী ছন্দ ব্যবহার করিতে প্রত্যেকটি পর্বেই মিল দিবার ফলে রচনা অতীব শ্রুতিমধুর হইয়াছে।

মঙ্গলকাব্যে সাধারণভাবে পয়ার, ত্রিপদী এবং একবলী ছন্দ ব্যবহৃত হইলেও কোন কোন কবি অন্যান্য বিষয়েও নানা প্রকার পরীক্ষামূলক কার্যও করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে দ্বিজ মাধব, দ্বিজ রামদেব এবং ভবানীশঙ্কর তাঁহাদের চণ্ডীমঙ্গলে এবং রামকৃষ্ণ তাঁহার শিবায়নে দিগক্ষরা ছন্দ লইয়াও পরীক্ষা করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যের কবিগণ কেহ কেহ সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণেও বাংলা কাব্য রচনার প্রয়াস পাইয়াছেন। অবশ্য ভাতরচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। বাংলা কবিতার মিল অনুযায়ী ভারতচন্দ্র তাঁহার সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে রচিত বাংলা পদগুলিতেও মিলের ব্যবহার করিয়াছেন। অর্থাৎ একদিকে সংস্কৃত ছন্দের বৈশিষ্ট্য এবং অন্যদিকে বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্য দুইই রক্ষা করিয়া ভারতচন্দ্র বাংলা কবিতা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহা পরীক্ষামূলক কাজ মাত্রই হইয়া রহিয়াছে। বাংলা কবিতার ছন্দপ্রবাহে তাহা কোন দিক দিয়াই স্বাঙ্গীকৃত হইতে পারে নাই। ভারতচন্দ্র ভুজঙ্গপ্রয়াত, তোটক, তূণক প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দের বাংলায় অনুবাদ করিয়া তাঁহার 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন। পরবর্তী কালে তাঁহারই অনুকরণে বাংলা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণ করিবার প্রয়াস ব্যাপকতর হইয়া উঠিয়াছিল; এমন কি, তাহার ধারা বিংশতি শতাব্দীর কয়েকজন আধুনিক কবির রচনা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল।

॥৫॥ ধুয়া বা ধ্রুবপদ

সুদীর্ঘ কাহিনীমূলক গীতির বৈচিত্র্যহীন সুরের একঘেয়েমি দোষ দূর করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে দোহার কর্তৃক ধুয়া ধরিবার রীতি প্রচলিত আছে, তাহাকে ঘোষাও বলে: শুদ্ধ ভাষায় তাহা ধ্রুবপদ বলিয়া পরিচিত। লোকসাহিত্যের অন্তর্গত কাহিনীমূলক রচনা গীতিকার ক্ষেত্রে ইহা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু গীতিকায় (ballad) যে ধুয়া ব্যবহৃত হইত, তাহার সঙ্গে কাহিনীর বিষয়-বস্তুর কোন যোগ থাকিত না। সেই জন্যই একই ধুয়া বিভিন্ন গীতিতে এবং বিভিন্ন গীতিকার বিভিন্ন অংশে ব্যবহৃত হইতে পারিত। তাহাতে অবশ্য কালক্রমে অন্যদিক দিয়াও স্বতন্ত্র প্রকৃতির একঘেয়েমি সৃষ্টি হইয়া থাকে। কারণ, সমগ্র মৈমনসিংহ গীতিকায় বিভিন্ন পালাতেই প্রায় একটি অভিন্ন ধুয়া শুনিতে পাওয়া যায়। অবশ্য কালক্রমেই এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সুরগত এক বৈচিত্র্যহীনতা ইহাদের আকর্ষণ হ্রাস করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল।

মঙ্গলকাব্য রচনার প্রথম হইতেই দেখা গেল, প্রত্যেক পরিচ্ছেদ বা পালার অংশের জন্য স্বতন্ত্র ধুয়া রচিত হইতেছে। কিন্তু লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত গীতিকায় এই ধুয়া রচনার সঙ্গে মূল কবির কোন সম্পর্ক থাকিত না, গায়েন কিংবা তাহার দোহারেরা ইচ্ছামতই তাহা যোগ করিত। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল, মঙ্গলকাব্যের কবি স্বয়ং এই ধুয়াগুলি রচনা করিয়া তাঁহার কাব্যের প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শীর্ষে লিখিতভাবে তাহা নির্দেশ করিয়া দিতেছেন। পূর্বে গীতিকার ক্ষেত্রে ধুয়াগুলি সংক্ষিপ্ত, এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্র একটি পদবিশিষ্ট

ছিল; কিন্তু মঙ্গলকাব্যে তাহা লিখিতভাবে আত্মপ্রকাশ করিবার ফলে তাহার পদসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে তাহা এক একটি খণ্ড গীতি-কবিতায় পরিণত হইল। 'অন্নদা-মঙ্গলে'র কবি ভারতচন্দ্র শেষ পর্যন্ত এই ধ্রুবপদ রচনায় চরম উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন।

লোক-সাহিত্য বা গীতিকায় ব্যবহৃত ধুয়াগুলির কোন সম্প্রদায়গত পরিচয় ছিল না, কিন্তু ইহাদের মঙ্গলকাব্যে ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই ইহারা কতকগুলি সাম্প্রদায়িক রূপ দ্বারা চিহ্নিত হইয়া যাইতে লাগিল। ক্বচিৎ দুই একটি ধুয়াতে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ রূপ রক্ষা পাইয়াছে মাত্র; কিন্তু তাহাও পরবর্তীকালের কিংবা অর্বাচীন পুঁথিগুলির মধ্যে পরিত্যক্ত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের পুঁথিতে ব্যবহৃত ধুয়াগুলিকে সম্প্রদায় অনুযায়ী নিম্নলিখিত কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যেমন,—শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত। বৈষ্ণব বিষয়ক ধুয়ার দুইটি ভাগ, একটি বিষ্ণু বা রাধাকৃষ্ণবিষয়ক, আর একটি গৌরাঙ্গবিষয়ক; শাক্ত পদদ্বারা চণ্ডী এবং কালী উভয় বিষয়ক পদকেই বুঝাইতে পারে। যদিও বাংলাদেশের রামোপাসনার ব্যাপক প্রচলন হয় নাই, কৃষ্ণোপাসনার মধ্যেই তাহা একাকার হইয়াছে, তথাপি রামবিষয়কও কিছু ধুয়া শুনিতে পাওয়া যায়। তবে তাহা ধর্মমঙ্গল কাব্য এবং রাঢ় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ।

কালক্রমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন সমন্বয় সাধনের প্রয়াস অনেকখানি সার্থকতা লাভ করিয়াছিল, তখন দুই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রকৃতির দেবতাকে লইয়া মিশ্র ধুয়ার ব্যবহারও দেখা যাইতে লাগিল, যেমন,—'শিব বলরে রাম বল।' অনেক সময় এক দেবতার মঙ্গলকাব্যের মধ্যে অন্য দেবতার মাহাত্ম্যসূচক ধুয়াও শুনিতে পাওয়া যায়; যেমন, বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলে শিব-বিষয় এই ধুয়া শুনিতে পাওয়া যাইবে, 'আরে ও হর, কাশীনাথ মোরে দয়া কর হে।' ইত্যাদি।

চৈতন্যপরবর্তী যুগে বাংলার সমাজের উপর বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রভাবের ফলে ক্রমে মনসা-মঙ্গলের সকল ধুয়ার উপরই বৈষ্ণব প্রভাব বিস্তার লাভ করিতে থাকে। চণ্ডীমঙ্গলের কয়েকজন কবি বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছেন, সেই সূত্রে চণ্ডীমঙ্গলেও যে সকল ধুয়া ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার এক উল্লেখযোগ্য অংশ বৈষ্ণব পদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বৈষ্ণববিষয়ক ধুয়াকে বিষ্ণুপদ বলিত; এই ভাবে শিবপদ, দেবীপদ, গৌরপদ, রামপদ বলিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর ধুয়াগুলিকে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। গৌরপদ সাধারণত চৈতন্যজীবনীমূলক কাহিনীগীতি, রামপদ সাধারণত রামায়ণ গানের ধুয়া রূপে ব্যবহৃত হইত; কালক্রমে তাহা মঙ্গলকাব্যেও প্রসার লাভ করিয়াছে। কিন্তু ক্রমে বিশেষত সপ্তদশ শতাব্দীর পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলিতে যখন পরিচ্ছেদের বিষয়-বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া কবিগণ নিজেরাই ধুয়া রচনার প্রথার প্রর্বতন করিলেন, তখন স্বতন্ত্র স্থান হইতে আগত ধুয়া ব্যবহারের রীতি প্রায় রুদ্ধ হইয়া গেল। পূর্বে ধুয়া যেমন রচনার একটি বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র ছিল, মূল কাহিনীর ধারায় কোন যোগ ছিল না, ইহার পর হইতে সেই অবস্থা দূর হইল। ধুয়া তখন কাব্যকাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে গণ্য হইতে লাগিল। ইহারা

গঠনের দিক দিয়া স্বতন্ত্র হইয়াও ভাবগত অখণ্ডতা রক্ষা করিয়াছে।

লোক-সাহিত্যের স্তর হইতে মঙ্গলকাব্য রচনার প্রথম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত ধুয়া বা ধ্রুবপদগুলির একটি গঠনগত ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিতে পারা যায়। মঙ্গলকাব্যের মহীরুহের গায়ে ধুয়াগুলি যেন গীতিকবিতার মাধবীলতার মত; ইহাদের সুদীর্ঘ বৈচিত্র্যহীন আখ্যায়িকা বর্ণনার মধ্যে গীতিগুণ (lyric quality) আদ্যোপান্ত রক্ষা করিয়া গিয়াছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় গীতিকবিতা যখন যে ভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে, তখনই তাহা সেই সুরে বাঁধা হইয়াছে। বৈষ্ণবপদাবলী রচনার ঐশ্বর্যময় যুগে মঙ্গলকাব্যের ধুয়াগুলি বিষ্ণু পদে পরিণতি লাভ করিয়া উচ্চাঙ্গের বৈষ্ণব গীতি হইয়াছে। শাক্ত পদাবলী রচনার যুগে ইহারা শাক্ত পদাবলীর রূপ ধারণ করিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে এমনও মনে হইতে পারে যে, ইহা শাক্ত পদাবলীর সম্ভাবনাকেও জাগ্রত করিয়া দিয়াছে। অথচ ইহারা বাংলা গীতিসাহিত্যের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত রচনা। মধ্যযুগের বিশাল আখ্যায়িকা কাব্যধারার প্রাণ-প্রবাহ যে ইহার গীতিপ্রবাহের মধ্য দিয়া কি ভাবে রক্ষা পাইয়াছে, তাহা আমরা অনেক সময় গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখি না।

।।৬।। মঙ্গলকাব্যের লক্ষণ

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যের অস্তিত্ব ছিল একথা স্বীকার করিলেও দেখা যায়, অন্তত চর্তুদশ শতাব্দীর পূর্বে ইহারা কোন বিশিষ্ট রূপ লাভ করিতে পারে নাই। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই মঙ্গলকাব্যগুলি একটা বিশেষ গতানুগতিক রচনাপ্রথার অনুকরণ আরম্ভ করে। তখন বিষয়-বস্তুর পরিকল্পনার দিক হইতে এই শ্রেণীর কাব্য সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য-বর্জিত হইয়া পড়ে। তখন হইতে প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যে.. নায়কই স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশু, বিশেষ কোন দেবতার পূজা-প্রচারের উদ্দেশ্যেই মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য অভিশাপগ্রস্ত হইতেছে। তারপর স্পৃশ্য অস্পৃশ্য নির্বিচারে যে কোন মানবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া মর্ত্যের ধুলোমাটিতে ভূমিষ্ঠ হইতেছে। এই পূজা-প্রচার সম্পর্কে যত প্রকার বাধা-বিপত্তি সমস্ত কিছুর হাত হইতেই সেই মঙ্গলকারী দেবতা তাহাকে রক্ষা করিবেন, এই সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকিয়াই মহাবিপৎসঙ্কুল পথেও সে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হইতেছে না—সেই উদ্দিষ্ট দেবতার ছায়ায় তাহার পার্থিব মনুষ্যত্বটুকু সর্বদাই আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু এবং ধর্মমঙ্গলের লাউসেন। একটা মহীয়সী কবি-কল্পনাকে কী নির্দয় ভাবে যে বিধি-নিয়মের যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া যাইতে পারে, তাহা উক্ত দুই মঙ্গলকাব্যের কবি দেখাইয়াছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যে আর নূতনত্ব একেবারেই চোখে পড়ে না। সমস্ত মঙ্গলকাব্যেরই বিষয়-বস্তুর পরিকল্পনা খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী। পরবর্তী কাব্যগুলি সেই কাহিনীকে মূলত অবলম্বন করিয়া প্রাচীন কাব্যোক্ত

চরিত্রগুলিরই মার্জিত রসরূপ দিয়াছে মাত্র; তাহা ছাড়াও কাহিনীকে যে কোন কোন স্থলে পল্লবিত না করা হইয়াছে অবশ্য এমনও নহে।

প্রথমেই গণেশাদি পঞ্চদেবতার বন্দনা, অতঃপর গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণন, সৃষ্টিরহস্য কথন, মনুর প্রজাসৃষ্টি, প্রজাপতির শিবহীন যজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, উমার তপস্যা, মদনভস্ম, রতিবিলাপ, গৌরীর বিবাহ, কৈলাসে হরগৌরীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষাযাত্রা, পার্বতী-চণ্ডী বা [illegible]বের সম্পর্কিত অন্য কেহ যেমন মনসা প্রভৃতির নিজেদের পূজা-প্রচার-চেষ্টা, নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অবশেষে পূজা প্রচার, স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশুব স্বর্গে প্রত্যাবর্তন—এই সকল বিষয়েই বৈচিত্র্যহীন বর্ণনা সকল পরবর্তী মঙ্গলকাব্যেরই বৈশিষ্ট্য। এই সকল বর্ণনাপ্রসঙ্গে বারমাসী, নারীগণের পতিনিন্দা, চৌতিশা বা বর্ণনানুক্রমিক চৌত্রিশ অক্ষরে দেবতা-স্তব, ইত্যাদি প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যেই অপরিহার্য বিষয়বস্তু হইয়া আছে। কেবল ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে শিব প্রসঙ্গের পরিবর্তে হরিশ্চন্দ্র রাজার উপাখ্যান ও অন্যান্য কতকগুলি স্বতন্ত্র বিষয় দৃষ্ট হয়। এখন মঙ্গলকাব্যের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ও তাহাদের সঙ্গে বাংলার জাতীয় প্রকৃতির কতদূব যোগ রহিয়াছে, তাহাই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

নায়িকার 'বারমাসী' বর্ণনা বাংলার প্রাচীন কাব্যগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বারমাসীর বর্ণনায় প্রাচীন কবিগণ পরিবর্তমান প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর পটভূমিকায় নায়ক-নায়িকার সুখদুঃখের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। একমাত্র মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই যে এই বারমাসীর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে। মনে হয়, মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবের পূর্ব হইতেই এই বিষয়ক খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন লোকগীতি প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত ছিল। অতঃপর তাহা পরবর্তী যুগের এই শ্রেণীর কাব্যসাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া আরও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। মধ্যযুগের কাব্যকাহিনীর মধ্যে ইহাদের যোগ খুব নিবিড় নহে। কোন মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর মধ্যেই ইহাদের বর্ণনা অপরিহার্য বলিতে পারা যায় না। দেশের লৌকিক সাহিত্যে প্রচলিত এই বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড গীতিগুলি মঙ্গলকাব্যকে আশ্রয় করিয়া যেমন পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল, তেমনই দেশের অন্যান্য সামসাময়িক সাহিত্যবস্তুকেও অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এইজন্য কোন কোন রামায়ণের অনুবাদে সীতার বারমাসী, বৈষ্ণব কবিতায় রাধিকার বারমাসী, চৈতন্য-জীবনচরিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাসী, 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় মলুয়ার বারমাসী ইত্যাদির সহিত পরিচয় লাভ করা যায়। ইহাদের ক্ষেত্রেও বিষয়গত বৈচিত্র এত অধিক যে, মধ্যযুগের যে কোন সাহিত্য অবলম্বন করিয়াই ইহা প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব মঙ্গলকাব্যেই ইহা কোন বিশিষ্ট লক্ষণ নহে। তবে ইহাদিগকে নিজেদের মধ্যে স্থান দিয়া মঙ্গলকাব্যগুলি জাতীয় কাব্যেরই মর্যাদা লাভ করিয়াছে। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, সমাজের প্রচলিত বহু বিচ্ছিন্ন পরিণত বা অপরিণত সাহিত্যিক প্রয়াস জাতীয় কাব্যের মধ্যে আসিয়া সুসঙ্গত পরিণতি লাভ করিয়া থাকে। এই বারমাসীগুলির বর্ণনায় যদিও কালক্রমে বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিকতার আশ্রয় লওয়া হইত, তথাপি প্রথম যুগের বারমাসীগুলির মধ্যে বাঙালীর ব্যক্তি-জীবনের সুখদুঃখের অনুভূতি যে ভাবে মূর্ত হইয়াছে,

তাহার জাতীয় মূল্য অস্বীকার করিতে পারা যায় না। ইহাদের প্রকৃতি-বর্ণনার মধ্যেও যেন বাংলার প্রকৃতিরই খুঁটিনাটি বাস্তব চিত্রের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়. ইহাদের পটভূমিকায় অবস্থিত নায়ক-নায়িকার অনুভূতিও তেমনই বাস্তব ও জীবন্ত বলিয়া অনুমিত হয়। প্রকৃতির পটভূমিকায় মানব-মনের সুখ-দুঃখের বর্ণনার রীতি সংস্কৃত কাব্যেও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। কালিদাসের 'মেঘদূতম্' কাব্য এবিষয়ে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার মত। কিন্তু তাহাতেও পরিবর্তমান প্রকৃতির সঙ্গে পরিবর্তনশীল মানব-মনের বর্ণনা পাওয়া যায় না। কালিদাসের 'ঋতুসংহার' কাব্যে ষড়ঋতুর গতানুগতিক ও অলঙ্কারশাস্ত্রানুমোদিত বর্ণনার শ্রোত্রী হিসাবে একটি স্ত্রী-চরিত্র কাব্যের সঙ্গে ক্ষীণতম যোগসূত্রে আবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। কবি-প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া কবি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কোন কোন শ্লোকে এই প্রকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন, 'নদাঘকালোহয়মুপাগতঃ প্রিয়ে!' (১/১) কিংবা 'ঘনাগমঃ কমিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে!' (২/১) অতএব এই চরিত্রটি কাব্যের নায়িকা হয়ে, বিশেষত বাহ্য প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে তাহার অন্তরের যোগও অত্যন্ত কৃত্রিম। অতদ্ব্যতীত সংস্কৃত সাহিত্যে আর কোথাও বারমাসীর মত কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

অতএব সংস্কৃত সাহিত্য হইতে মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের এই বারমাসীর বর্ণনাগুলি আসিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে না। বিহার প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলের লোকসঙ্গীতে এই প্রকার বারমাসীর অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। পাটনা জিলার ভূমিহার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও রাজপুত পরিবারে মেয়েদিগের মধ্যে 'ছৌমাসা' নামক এই প্রকার লোকসঙ্গীতের প্রচলন আছে। 'ছৌমাসা' অর্থ ছয়মাসী; বাংলা মঙ্গলকাব্যে বারমাসের পরিবর্তে নায়িকার ছয় মাসের সুখদুঃখের বর্ণনামূলক রচনাও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই ছয়মাসী বা ছয়মাস্যা বলে। মনে হয়, বাংলা ও বিহারে এই বারমাসী বা ছয়মাসীর বর্ণনায় বাংলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী কোন উপজাতীয় অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের প্রভাব কার্যকর হইয়াছে। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, মধ্যভারতে কোন কোন আদিম জাতির মধ্যেও বাংলাদেশের অনুরূপ বারমাসী গান আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে। এমন কি সুদূর পাঞ্জাব অঞ্চলেও অনুরূপ সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইউরোপের কোন কোন অঞ্চলের লোকসাহিত্যে seasonal song নামক প্রায় অনুরূপ বর্ণনার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। মানবমনের এক শাশ্বত বৃত্তি হইতেই যে সকল দেশেই এই প্রকার রচনার উদ্ভব হইয়া থাকিবে, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য ইহার অপরিহার্য পাক প্রণালীর বর্ণনা। উপযুক্ত কোন অবকাশ পাইলেই এইসকল কাব্যের মধ্যে প্রায় সর্বত্রই রন্ধন-কার্যের বিস্তৃত বর্ণনার অবতারণা করা হইয়াছে। এই সকল বর্ণনায় মধ্যে কবিগণ বাস্তবতার প্রতি যথেষ্ট নিষ্ঠা দেখাইয়াছেন। মধ্যযুগের আখ্যান কাব্যের বাহিরেই ইহাদের উদ্ভব হইয়াছিল; কালক্রমে মঙ্গলকাব্যের কাহিনী অবলম্বন করিয়া তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্য পরিণত রূপ লাভ করিবার পূর্বে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন লৌকিক (popular) রচনা

হিসাবে ইহা এদেশে প্রচলিত ছিল। ডাকের নামে প্রচলিত কতকগুলি বিচ্ছিন্ন লোক-প্রবচনের মধ্যেও এই প্রকার পাক-কার্যের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়; সমাজের জনসাধারণের রুচির অনুগামী বলিয়া চারিদিক হইতে এইসকল বিচ্ছিন্ন লৌকিক রচনাসমূহ কালক্রমে মঙ্গলকাব্যের কাহিনীতে আসিয়া স্থান লাভ করিয়াছে।

বলাই বাহুল্য যে, মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর মধ্যে এই সকল বর্ণনা সর্বত্রই অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু যেহেতু মঙ্গলকাব্যের কাহিনীভাগ গৌণমাত্র, ইহার পারিপার্শ্বিক বর্ণনাই মুখ্য, সেইজন্য কাব্যের মধ্যে ইহার স্থান দোষাবহ বলিয়া মনে হয় নাই। কাহিনীর অগ্রগতিতে এই সকল বৈচিত্র্যহীন দীর্ঘায়িত বর্ণনা বিশেষভাবে বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকে, কিন্তু তথাপি কাব্য-কাহিনীর পরিণতির উপর সেই যুগের শ্রোতৃমণ্ডলীর কৌতূহল নিবদ্ধ থাকিত না; বরং কোন পারিপার্শ্বিক খণ্ডবর্ণনার মধ্যে যদি তাহারা নিজেদের বাস্তব রস ও রুচির অনুগামী দুই একটা কথা শুনিতে পাইত, তাহা হইলে তাহাতেই তাহাদের কৌতূহল নিবদ্ধ হইয়া পড়িত। অতএব ইহাও প্রাচীন কাব্যের একটা অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবেই গ্রহণ করিতে হয়। এই সকল বর্ণনার মধ্যে কৃত্রিমতা যে খুব বেশি আছে, তাহা নহে—সর্বত্রই তাহা কবিদিগের বাস্তব অভিজ্ঞতা-জাত। প্রাচীন কাব্যের শ্রোতৃমণ্ডলীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারাও তাহা বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত। সেই জন্যই ইহা কবি ও পাঠক উভয়েরই সমান ঔৎসুক্য লাভ করিত। কেবলমাত্র মঙ্গলকাব্য অবলম্বন করিয়াই যে এই শ্রেণীর রচনা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা নহে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, 'চৈতন্য-ভাগবত' এবং এই প্রকার সমসাময়িক অন্যান্য রচনার মধ্যেও বাঙ্গালীর জাতীয় রুচির অনুমোদিত এই বিশেষ রীতিটির প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। তবে মঙ্গলকাব্যের মধ্যে যে ইহার বিস্তৃততম বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা সত্য। এই সকল বর্ণনায় প্রাচীন বাঙ্গালী কবিদিগের কৃতিত্ব সম্পূর্ণই মৌলিক; বাস্তবতার প্রতি প্রীতিবশত বিশেষভাবে এই দেশেরই জাতীয় জীবনের প্রেরণা হইতে ইহাদের জন্ম হইয়াছে। কারণ, দেখা যায় যে, ভোজন-বিলাসিতা বাঙ্গালী চরিত্রের একটি বিশিষ্ট ও মৌলিক জাতীয় গুণ।

মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য নারীদিগের পতিনিন্দার বর্ণনা। ইহাতে বিবাহ-সভা কিংবা অন্যত্র কাব্যের নায়ককে দর্শন করিয়া বিবাহিত নারীগণ তাহার সঙ্গে নিজেদের পতিদিগের তুলনা করিয়া নিজেদের স্বামী-দুর্ভাগ্যের কথা পরস্পর আলোচনা করিয়া থাকেন। এই তুলনামূলক আলোচনায় কাব্যোল্লিখিত নায়কের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইলেও, ইহা দ্বারা যে সামাজিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কোন দিক হইতেই প্রশংসার যোগ্য নহে। এই রীতিটি মূলত সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়; বাণভট্ট-রচিত কাদম্বরী নামক গদ্য-কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গুরুগৃহ-প্রত্যাগত রাজকুমার চন্দ্রপীড়ের রূপ-যৌবন দর্শন করিয়া বিদিশা নগরের নারীগণ নিজেদের স্বামি দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিতেছেন। কিন্তু সেখানে বাণভট্টের বর্ণনা বাঙ্গালী কবিদিগের মত এত অসংযত ও স্থূল নহে। তথাপি ইহার ইঙ্গিতটি যে সেখান হইতেই আসিয়া বাঙ্গালীর

তদানীন্তন সমাজের রুচির অনুমোদন লাভ করিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কালিদাস-রচিত 'কুমারসম্ভবম্' কাব্যের সপ্তম সর্গে বর্ণিত হইয়াছে যে বরবেশী মহাদেবকে দেখিয়া পুরস্ত্রীগণ তাঁহার রূপ একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছেন; তাঁহারা বলিতেছেন,

স্থানে তপো দুশ্চরমেতদর্থমপর্ণয়া পেলবয়াপি তপ্তম্।
যা দাস্যমপ্যস্য লভেত নারী সা স্যাৎ কৃতার্থা কিমুতাঙ্কশয্যাম্। ৭.৬৫

অর্থাৎ কোমলাঙ্গী অপর্ণা এই বরের জন্য যে অত কঠোর ও অন্যের পক্ষে অসাধ্য তপস্যা করিয়াছিল, তাহা ঠিকই হইয়াছে। এমন অপরূপ বরের দাসীত্ব করিতে পাইলেও যখন জীবন সার্থক হয়, তখন এমন নয়নমনোহর বরের অঙ্কশয্যায় যে অধিরোহণ করিবে, তাহার কপালের কত জোর, কত সৌভাগ্য সে রমণীর।

ইহার বেশি কালিদাস আর কিছু লিখেন নাই; ইহাই ক্রমে বাণভট্টের মধ্য দিয়া মঙ্গলকাব্যের পতিনিন্দায় পর্যবসিত হইয়াছে।

পাতিব্রত্যের এক অতি কঠোর আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মনসামঙ্গল কাব্যগুলি রচিত হইলেও ইহাদের মধ্যেও পতিনিন্দার এই গতানুগতিক বর্ণনা স্থান লাভ করিয়াছে। ইহাতে একদিকে মৃত পতির অস্থি কয়খানি সম্বল করিয়া অপরিস্ফুট-যৌবনা এক নারী পাতিব্রত্যের শ্বেত-পতাকা উড়াইয়া দুস্তর সংসারগাঙ্গুবে দুঃখের ভেলা লইয়া ভাসিয়াছে, আর একদিকে তাহারই প্রতিবেশিনী নারীগণ নিজেদের পতিদিগের ঐহিক ছোটখাট দোষত্রুটির কথা স্মরণ করিয়া তাহাদিগের প্রতি নির্লজ্জ ধিক্কারে পতিব্রতাকে পদদলিত করিতেছে।

পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে এই বর্ণনায় যে কদর্য মনোভাব কদর্যতম ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে, পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে তাহার কিছু অভাব দেখা যায়। চৈতন্যপরবর্তী যুগের মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে তাহার কিছু অভাব দেখা যায়। চৈতন্যপরবর্তী যুগের মঙ্গলকাব্য মাত্রই নীতির দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত; ই..র কারণ, চৈতন্যদেবের চরিত্রের মধ্যে যে উচ্চ নৈতিক গুণ ছিল, তাহা সমসাময়িক বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমগ্রভাবে বাংলার সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সেকালে স্থূল গ্রাম্যজীবনের বাস্তব চিত্র অবলম্বন করিয়া মঙ্গলকাব্যেগুলি যে কুরুচি ও দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতেছিল, চৈতন্য-সাহিত্যেই সর্বপ্রথম তাহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। তাহারই ফলে চৈতন্যপরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলির নৈতিক সুর উন্নততর হইয়া উঠিয়াছিল। অতএব পরবর্তী মঙ্গলকাব্যের এই শ্রেণীর বর্ণনাগুলিও বাস্তব ভিত্তির উপর রচিত নহে, বরং কেবলমাত্র গতানুগতিকতার মুখরক্ষার জন্যই রচিত। বাস্তবতা যখন ইহার ভিতর হইতে পরিত্যক্ত হইল, তখন ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি দ্বারা এই শ্রেণীর রচনার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করা হইতে লাগিল। ভারতচন্দ্রের মধ্যে এই উৎকর্ষ একেবারে চরমে গিয়া পৌঁছিয়াছে; একান্ত পর্যুষিত একটি বিষয় বর্ণনা করিতেও একমাত্র ভাষার গুণে ভারতচন্দ্র ইহার মধ্যে যে সৌন্দর্য দান করিয়াছেন, তাহা দ্বারা ইহার বস্তুগত কদর্যতা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। 'বিদ্যাসুন্দরে' নায়ক-দর্শনে নারীদিগের পতিনিন্দায় ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

আহা ম'রে যাই,
লইয়া বালাই,
কুলে দিয়া ছাই
ভজি ইহারে।
যোগিনী হইয়া
ইহারে লইয়া
যাই পলাইয়া
সাগর পারে।।
কহে একজন,
লয় মোর মন,
এ' নব রতন
ভুবন মাঝে।
বিরহে জ্বলিয়া
সোহাগে গলিয়া
হারে মিলাইয়া
পরিলে সাজে।।
আর জন কয়,
এই মহাশয়
চাঁপা ফুল ময়,
খোঁপায় রাখি।
হলদি জিনিয়া
তনু চিকণিয়া
স্নেহেতে ছানিয়া
হৃদয়ে মাখি।।

বিবাহাচারের বিস্তৃত বর্ণনা মঙ্গলকাব্যগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের মধ্যে এই বিষয়ক রচনায় বাংলার সমাজের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি সার্থকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে; সুতরাং এই শ্রেণীর বর্ণনা কেবলমাত্র গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যের বাঁধাধরা নিয়মানুবর্তী মাত্র নহে। বাংলার ইতিহাস নামে যে সকল গ্রন্থ আধুনিককালে শিক্ষিত সমাজের নিকট পরিচিত, তাহাদের মধ্যে এ' দেশের রাজনৈতিক বিবরণ ব্যতীত বাঙ্গালীর অতীত জীবনের আর কোনও পরিচয়ই পাওয়া যায় না। কিন্তু কেবলমাত্র রাজনৈতিক চিত্রের ভিতর দিয়া কোন দেশেরই সমাজ জীবনের আভ্যন্তরিক কোন পরিচয় লাভ করিতে পারা যায় না। সুতরাং কেবলমাত্র দেশের

রাজনৈতিক ঘটনার উত্থান-পতনের বর্ণনাই ইতিহাসের উদ্দেশ্য হইতে পারে না—দেশের সাধারণ মানুষের অতীত পরিচয় যদি ইতিহাসের মধ্য দিয়া প্রকাশ না পায়, তবে সাধারণ মানুষও সে বিষয়ে কোনও কৌতূহল অনুভব করিতে পারে না। সেইজন্য আমাদের দেশের ইতিহাসের কেবলমাত্র শিক্ষাগত (academic) মূল্য ব্যতীত আর কোনও মূল্য নাই। বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসের এই ক্রটি দূর করিবার পক্ষে মঙ্গলকাব্যগুলি যে পরম সহায়ক হইতে পারে, ইহাদের বিবাহাচারের বর্ণনাগুলিই তাহার প্রমাণ। পূর্বেই বলিয়াছি, এই বিবাহাচারের বর্ণনাগুলি বাংলার সর্বত্র অভিন্ন নহে—ইহার অর্থ মঙ্গলকাব্যের মৌলিক কাহিনী সম্পর্কে সর্বত্র অভিন্নতা রক্ষা করা হইলেও, ইহার বহিরঙ্গগত বিস্তৃত (details) পরিচয়ের ভিতর দিয়া বাংলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বত্র রক্ষা করা হইয়াছে। কবিগণ নিজস্ব সমাজের মধ্যে যে সকল বিবাহানুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাদেরই উপকরণ তাঁহাদের কাব্য-রচনারও উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হইত। এই বিষয়ে প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের কবিই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন—সেইজন্য যে কবি যে অঞ্চলে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই কবি সেই অঞ্চলেরই সামাজিক প্রথার এক একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব বিভিন্ন কবির এই বিষয়ক রচনাগুলি একত্র সংকলিত করিতে পারিলেই, তাহা হইতেই বাংলার বিশেষ স্তরের একটি সমাজের বিবাহাচারের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। সমাজের ক্রমপরিবর্তনের ধারা যাঁহারা অনুসরণ করিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট এই শ্রেণীর তথ্য পরম মূল্যবান্। আমাদের দেশে নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব কিংবা জাতি-তত্ত্বের আলোচনা আজিও ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই; সেইজন্য ইহাদের মূল্য সম্পর্কে আজিও কেহ সম্যক্ অবহিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু একদিন যখন সেই প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে, তখন মঙ্গলকাব্যের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকিবে না।

বিবাহের আচারগুলি অত্যন্ত রক্ষরশীল; কারণ, বিবাহের উদ্দেশ্য সন্তান লাভ। প্রাচীন সমাজের বিশ্বাস ছিল যে, বিবাহের প্রচলিত আচারে কোনও ব্যতিক্রম ঘটিলে সন্তান-লাভেও বিঘ্ন উপস্থিত হয়; অতএব ইহাদের মধ্য দিয়া সমাজের রক্ষণশীলতার একটি পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। বিবাহ সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান—ইহার ভিতর দিয়া পারিবারিক জীবন-ধারা রক্ষা পায় এবং পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া বৃহত্তর সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠে। বিবাহাচারগুলি মঙ্গলকাব্যসমূহের মধ্যে এত বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহা হইতে বাংলার সমাজ সম্পর্কে এই প্রকার বহু খুঁটিনাটি তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে।

প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই একাধিকবার এই সকল বিবাহাচারের সুবিস্তৃত বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যাইবে। মনসা-মঙ্গল কাব্যে তিনটি বিবাহের অনুষ্ঠান হইয়াছে, যথা—মনসার বিবাহ, চাঁদ সদাগরের বিবাহ, এবং লখীন্দরের বিবাহ; তিনটি বিবাহের বর্ণনাই প্রায় অনুরূপ, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একটি আর একটির পুনরাবৃত্তি মাত্র নহে। এই সকল বর্ণনা পরিবেষণ করিতে কবিদিগের কোনও ক্লান্তি দেখা যায় না, শ্রোতৃবর্গের স্বীকৃতি ছিল

বলিয়াই কবিগণ এই বিষয়ে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। এই বর্ণনার ভিতর দিয়া সে যুগের সমাজ নিজের বিষয়ে নিজেই পর্যালোচনা করিত, ইহাদের শ্রুতি-পরম্পরায় সমাজ আত্মবিস্মৃতি হইতে পরিত্রাণ পাইত।

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে বিবাহাচারের মত আর কোনও সামাজিক আচারেরই এত বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় না। কিন্তু এই বিবাহাচারের বর্ণনার ভিতর দিয়াই মধ্যযুগের সমগ্র সমাজটির প্রকৃত পরিচয় যেন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। পূর্বেই বলিয়াছি, এই বর্ণনার মধ্যে প্রাণহীন গতানুগতিকতার পরিবর্তে, প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবন-চেতনার স্পর্শ আছে। সেইজন্য বর্ণনাগুলি কৃত্রিম না হইয়া সজীব বলিয়া মনে হয়। তবে এ'কথা সত্য, ইহাদের বর্ণনার ভিতর দিয়া নিম্নশ্রেণীর সমাজ-জীবনের কোনও পরিচয় প্রকাশ পাইবে না—কবিগণ যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত, ইলা তাহারই পরিচয়। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ অধিকাংশ উচ্চশ্রেণীসম্ভূত, অতএব তাঁহাদেরই সমাজের পরিচয় ইহাদের ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। যখন কোনও নিম্নশ্রেণীর লেখক মঙ্গলকাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তখন তিনি উচ্চশ্রেণীর লেখকদিগকে অনুকরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন—সেইজন্য তাঁহার রচনার ভিতর দিয়া কোনও মৌলিকতা প্রকাশ পাইতে পারে নাই। অতএব মঙ্গলকাব্যের বিবাহাচারগুলির মধ্য দিয়া বাংলার বিভিন্ন সামাজিক স্তরের পরিবর্তে কেবলমাত্র উচ্চতম স্তরটিরই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে স্বীকার করিতে হয়। এমন কি, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ব্যাধ কালকেতুর বিবাহাচার বর্ণনা করিতে গিয়াও তাঁহার নিজস্ব সমাজের এই সম্পর্কিত আচারের কথাই বর্ণনা করিয়াছেন, অনার্য-ব্যাধ-সমাজের বিবাহাচারের কথা উল্লেখ করেন নাই। ইহার কারণ, মঙ্গলকাব্যের কবিগণ কোনও বিষয়েই প্রত্যক্ষ সমাজটিকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার ফলেই মঙ্গলকাব্যের রচনা বাস্তবধর্মী হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে।

বিশ্বকর্মাব শিল্পকীর্তির বিস্তৃত বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহার মধ্য দিয়া সে' কালের বাংলার স্থাপত্য ও অন্যান্য বিবিধ শিল্পের পরিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিশ্বকর্মার পুরী নির্মাণের মধ্যে এ' দেশের স্থাপত্য-শিল্প, নগর-পত্তনের মধ্য দিয়া নগর-সংস্থাপনা (Town planning), ডিঙ্গা নির্মাণের মধ্য দিয়া সমুদ্রগামী নৌকা-নির্মাণ-কৌশল, কাঁচুলী, টোপর প্রভৃতি নির্মাণের ভিতর দিয়া চারুশিল্পের সাধনার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

বাংলার সদাগরদিগের সমুদ্রযাত্রার বর্ণনায় যেমন একটি প্রাচীনতর ঐতিহ্যের অনুসরণ করা হইয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায়, উল্লিখিত বিষয়গুলি বর্ণনায় তাহার পরিবর্তে কবিদিগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই ভিত্তি করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ পুরী নির্মাণের কথাই ধরা যাউক। কোনও গতানুগতিক রীতি অনুসরণ করিয়া ইহার বর্ণনার অবতারণা করা হয় নাই। পুরী হইলেই যে তাহা বিশাল এবং সুবর্ণহীরকাদি-মণ্ডিত হইবে, ইহার মধ্যে তাহার উল্লেখ নাই—বরং তাহার পরিবর্তে কোনও কোনও মঙ্গলকাব্যে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কাদা দিয়া এই পুরীর ভিত্তি পত্তন করা হয়।

'কাদা তুলি দিল বীর শুভক্ষণ বেলা।'—মুকুন্দরাম

কোদাল দিয়া মাটি কাটিয়া তুলিতে হয়, ইহার জন্য দৈহিক শক্তির প্রয়োজন, সূক্ষ্ম শিল্পবোধের প্রয়োজন নাই—

'যখন কোদালি ধরে বীর হনুমান।
বাসুকি সহিত নাগ হয় কম্পমান॥' —মুকুন্দরাম

অতএব কোদালের সহযোগে কাদা দিয়া মঙ্গলকাব্যের পুরী নির্মিত হয়, সুতরাং ইহা আর যাহাই হউক, অমরাবতী নহে,—স্বর্ণ-লঙ্কাও নহে; ইহা সাধাণ বাঙ্গালী গৃহস্থের মাটির ঘরবাড়ী। মঙ্গলকাব্যের কবিদিগের কল্পনা কখনও আকাশ স্পর্শ করিতে পারে নাই, ইহা আকাশের দিকে মুখ তুলিয়াও মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, স্বর্গ রচনা করিতে বসিয়াও মর্ত্যের কাদামাটি তাহার উপাদান করিয়া লইয়াছে। ইহা অমরাবতীর দেবপুরী সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হইয়াছে সত্য, কিন্তু বাংলার মাটির ঘরগুলি সৌন্দর্যে ভরিয়া দিয়াছে।

পল্লীর সমাজ হইতেই মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি ও বিকাশ হইয়াছে, নাগরিক জীবনের সঙ্গে ইহা কোন যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই। কিন্তু সে'জন্য সেকালের নাগরিক জীবনের সঙ্গে যে মঙ্গলকাব্যের কবিদিগের কোন পরিচয় ছিল না, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে যে নগর পত্তনের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাই ইহার প্রমাণ। ইহাদের বর্ণনার মধ্যে মধ্যযুগের বাংলার এক একটি নগর যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে—এই সকল রচনাও কবিদিগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-জাত, তাহাতে কৃত্রিমতা কিংবা গতানুগতিকতার প্রভাব অনুভব করা যায় না। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ সেকালের একটি নগর বর্ণনা করিতে বসিয়া তাঁহাদের চক্ষু চারিদিকে খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, কেবল মাত্র নিজের সমাজটির উপরই যে সেই দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা নহে। নাগরিক জীবন যে মিশ্র সমাজ-জীবন, ইহার বহু বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে ঐক্য আছে, ইহার বিভিন্ন সমাজ-জীবন, ইহার বহু বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে ঐক্য আছে, ইহার বিভিন্ন সমাজ পরস্পর আপেক্ষিক হইয়াও যে স্বতন্ত্র, মঙ্গলকাব্যের কবিদিগের নগর বর্ণনার ভিতর দিয়া তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। মধ্যযুগের বাংলার নাগরিক জীবনের এমন পূর্ণাঙ্গ চিত্র আর কোথাও পাওয়া যায় না; এমন কি, যে ইতিহাসকে আমরা প্রাচীন তথ্য-সম্পর্কিত একমাত্র নির্ভরযোগ্য অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহার মধ্যেও এই বিষয়ক যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনই অস্পষ্ট। অতএব এই বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাইতে হইলে মঙ্গলকাব্যের বর্ণনার সহায়তা গ্রহণ ব্যতীত আর কোনও উপায় নাই। অথচ এ'কথা সত্য যে, বাংলার কোনও উল্লেখযোগ্য ইতিহাসের মধ্য দিয়া এই সকল তথ্য আজও পরিবেষণ করা হয় নাই। তাহার ফলে এই বিষয়ক আলোচনা কোথাও সার্থকতা কিংবা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

অবশ্য এ'কথা সত্য যে, মঙ্গলকাব্যের পূর্বোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির মত নগর-পত্তন কিংবা নগর বর্ণনা ইহার অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না; মুকুন্দরামের

'চণ্ডীমঙ্গলে'র মত এত বিস্তৃত নাগরিক জীবনের বর্ণনা আর কোন মঙ্গলকাব্যের নাই। ইহার কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, পল্লী-জীবনের নিভৃত ছায়াতলে মঙ্গলকাব্যের পরিবেশ রচিত হইয়া থাকে, সেখানে নাগরিক জীবনের কোলাহল গিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। বর্তমান যুগের মত নাগরিক জীবন সেদিন পল্লী-জীবনকে প্রভাবিত করিতে পারিত না; কারণ, বাংলার পল্লী-জীবনের সংহতি তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল; অতএব নব-প্রতিষ্ঠিত নাগরিক জীবনই পল্লী-জীবন দ্বারা সেদিন প্রভাবিত হইয়াছে। নাগরিক সমাজ-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাও পল্লীবাসীর খুব ব্যাপক ছিল না। সেইজন্যই মঙ্গলকাব্যের কোন কোন কবি নগর-জীবনের বর্ণনার ভিতর দিয়া তাঁহাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রকাশ করিতে পারিলেও, ইহা মঙ্গলকাব্যের একটি একান্ত আবশ্যক রীতি হিসাবে কোনদিনই গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলার সদাগরদিগের উপকূল বাণিজ্যের (coastal trade) বিষয় লইয়া মঙ্গলকাব্যের কাহিনী রচিত হইয়াছে—এই সম্পর্কে ইহাদের মধ্যে সমুদ্রগামী নৌকা বা ডিঙ্গা নির্মাণের বিস্তৃত বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়। এই রচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়, এই সকল বর্ণনা এই সম্পর্কিত একটি প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করিবার ফল, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে নহে। কারণ, যে যুগে এই বর্ণনাগুলি রচিত হইয়াছে, সেই যুগে অর্থাৎ মধ্যযুগে বাংলার সদাগরদিগের উপকূল বাণিজ্য লোপ পাইয়াছিল, সমুদ্রগামী নৌকা-নির্মাণেরও তখন আর কোনও প্রয়োজন ছিল না। সেইজন্য এই বিষয়ক বর্ণনাগুলি এত জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই, কিন্তু ইহাদিগের মধ্য হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার পূর্ববর্তী যুগে এই শিল্প এ'দেশে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল এবং তাহার ফলে এই বিষয়ক সংস্কার মধ্যযুগ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছিল। মধ্যযুগের প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই ইহার বর্ণনা এক অপরিহার্য বিষয় হইয়া রহিয়াছে, কোন কোন কবির এই বিষয়ক রচনায় যে বিস্তৃতিও গভীরতা দেখা যায়, তাহা হইতে মনে হইতে পারে যে, সমাজ-জীবন হইতে ইহার প্রত্যক্ষ পরিচয় তখনও একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

প্রত্যেক শিল্পকর্মের গুরুই বিশ্বকর্মা—স্থাপত্য-শিল্প হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্মতম চিত্রকলাও বিশ্বকর্মারই কার্য। মঙ্গলকাব্যের সকল শিল্পকীর্তিই বিশ্বকর্মার নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। সেইজন্য পুরী, নগর, নৌকা নির্মাণের মত কাঁচুলী, টোপর, ফলা প্রভৃতি নির্মাণ এবং তাহাদিগের চিত্রকরণের কার্যও বিশ্বকর্মারই কীর্তি বলিয়া উল্লেখিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই ইহাদের বর্ণনা অপরিহার্য। অন্ততঃ প্রত্যেকটির না হউক, ইহাদের অন্ততঃ এক কিংবা একাধিক বিষয়ের বর্ণনা প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। বিশ্বকর্মা চণ্ডীর কাঁচুলী নির্মাণ করিয়া ইহার মধ্যে সমগ্র রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ কাহিনী চিত্রিত করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। অপরিসর একখানি কাঁচুলীতে এত বিস্তৃত বিষয়ের চিত্রকরণের কোন অবকাশ আছে কি না, তাহা বিচার না করিয়া বর্ণনার স্তূপীকৃত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব মনে হয়, এই সকল বর্ণনার কোন বাস্তব মূল্য নাই, কিংবা কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতেও ইহারা রচিত নহে। যুদ্ধের ফলা বা ঢাল, বিবাহের শোলার মুকুট প্রভৃতির

মধ্যেও অনুরূপ চিত্রকার্যের বিস্তৃত বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্য দিয়া প্রাচীন বাংলার চিত্র-কলা সাধনার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা পাঠক মাত্রেরই কৌতূহল সৃষ্টি করিতে পারে। উড়িষ্যার মন্দিরগাত্র উৎকীর্ণ ভাস্কর্যে যে শিল্প একদিন পাষাণে রূপায়িত হইয়াছিল, তাহাই মঙ্গলকাব্যের কবিদিগের লেখনীতে ভাষায় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

সমুদ্রপথের বর্ণনা মঙ্গলকাব্য মাত্রেরই অপরিহার্য অঙ্গ। পূর্বেই বলিয়াছি, এই বর্ণনা পড়িলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা ভারত সমুদ্রের উপকূল বাণিজ্যপথ। সমুদ্রপথের বর্ণনার মধ্যে কালীদহের বর্ণনা এই অপরিহার্য বিষয়। কালীদহেই চণ্ডীমঙ্গলের কমলে কামিনী বা সামুদ্রিক মরীচিকার আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহারই উত্তাল তরঙ্গে চাঁদ সদাগরের ভরাডুবি হইয়াছিল। পূর্বে বলিয়াছি, যখন মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয়, তখন বাঙ্গালীর সমুদ্রপথে বাণিজ্যযাত্রার অবসান ঘটিয়াছিল; অতএব এই জাতির বিস্মৃতপ্রায় যুগের একটি সংস্কারের উপর ভিত্তি করিয়া সমুদ্রযাত্রার কথা বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং ইহার বর্ণনার মধ্য দিয়া অস্পষ্ট বাস্তব সত্যের সঙ্গে সঙ্গে অবাস্তব কল্পনারও সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। সমুদ্রপথে প্রতি পদে অনিশ্চয়তা ও দুর্যোগের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়—সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কিত এই সংস্কার মধ্যযুগ পর্যন্ত যে লুপ্ত হইয়া যায় নাই, মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্য দিয়া তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রত্যেক সমুদ্রযাত্রার বর্ণনাই এক একটি উন্মত্ত ঝড়ের বর্ণনায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সমুদ্র ঝড়ে সর্বস্বান্ত সদাগরের করুণ চিত্রের পার্শ্বে মঙ্গলকাব্যের পশ্চিম বঙ্গের কবিগণ একটি হাস্যরসের চিত্রও পরিবেষণ করিতেন, তাহা বাঙ্গাল মাঝিদিগের খেদ। ইহা হইতে বুঝিতে পার যায়, বহু প্রাচীন কাল হইতেই সমুদ্রগামী নৌকা চালনার কার্যে পূর্ববঙ্গের নাবিকগণই অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। আজিও তাহাদের এই বিষয়ক অভিজ্ঞতার পরিচয় সর্বজনবিদিত।

প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের কবিই গ্রন্থমধ্যে আত্মপরিচয় ও গ্রন্থোৎপত্তির একটি বিবরণ দিয়া থাকেন। আত্মপরিচয় অংশে পিতা-পিতামহ মাতা-মাতামহ প্রভৃতির নাম ও বাসস্থানের উল্লেখ থাকে এবং গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ অংশে দেবতার স্বপ্নাদেশই যে কাব্য রচনার মুখ্য কারণ, তাহা উল্লেখ করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই অংশেই কবিজীবনের কোন ব্যক্তিগত বিষয়েরও উল্লেখ থাকে। কিন্তু এই অংশে গ্রন্থরচনার সময়ের উল্লেখ থাকে না। ইহা ভূমিকা বা মুখবন্ধরূপে কাব্যের প্রথম দিকে যুক্ত থাকে। কাব্য যেখানে শেষ হইয়া যায়, কিংবা আরম্ভ হয়, সেইখানেই হেঁয়ালীর আকারে কাব্যরচনার সময় নির্দেশ করা হয়। এই হেঁয়ালী লিপিকার, অনুলিপিকারগণ সহজে বুঝিতে না পারিয়া ক্রমে এমন বিকৃত করিয়া ফেলে যে, ইহা হইতে অর্থোদ্ধার করা আর কিছুতেই সম্ভব হইয়া উঠে না। বিশেষতঃ এই অংশ গ্রন্থের প্রথম কিংবা শেষ দিকে থাকে বলিয়া তাহা সহজেই বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সকল কারণে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বহু গ্রন্থের রচনাকাল নিরূপণ করা সম্ভব হয় না।

এ'দেশের সমাজ জন্মান্তরবাদী। জীবনে যাঁহারা মহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন, তাঁহারা সাধারণ মানুষ নহেন, অভিশপ্ত দেবতা, ইহাও এ'দেশের লোক বিশ্বাস করিয়া

থাকে। সেইজন্য প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেরই নায়ক-নায়িকা যে স্বর্গচ্যুত দেবতা, তাহা বর্ণনা করা হইয়া থাকে। বিশেষ দেবতার পূজা প্রচারের জন্য নামমাত্র অপরাধে তাঁহাদিগকে স্বর্গভ্রষ্ট হইতে হয়—তারপর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গেলে তাঁহারা স্বর্গলোকে ফিরিয়া যান। মর্ত্যলোক কাহারও চিরদিন বাস করিবার স্থান নহে, এখানে সকলেই অতিথি, পূর্বজন্মের সুকৃতি বা দুষ্কৃতির ফলে মানুষ ইহজন্মে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে—ভোগ শেষ হইয়া গেলে নিত্যলোকে ফিরিয়া গিয়া অনন্ত শান্তির অধিকারী হয়। এই কাহিনী হইতে এই সমাজ নিজের জীবনে সর্বদাই এই শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিয়া আসিতেছে।

প্রহেলিকা বা ধাঁধা লোক-সাহিত্যের বিশিষ্ট অঙ্গ। জাতির বিবিধ লৌকিক রসোপকরণ অবলম্বন করিয়া লোক-সাহিত্যের ভিত্তির উপরই মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে বলিয়া লোক-সাহিত্যের বিশিষ্ট উপকরণ প্রহেলিকা বা ধাঁধাও মঙ্গলকাব্যের অপরিহার্য অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মঙ্গলকাব্যের কাহিনী মাত্রই নিতান্ত শিথিল-বদ্ধ—ইহার কাহিনীগত শৈথিল্যের অবকাশে জাতির বিবিধ রসোপকরণ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল কাহিনীর ধারায় সম্পূর্ণ অসংলগ্ন বিবেচিত হইলেও মঙ্গলকাব্যের মধ্যে প্রহেলিকা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে, ইহার অবতারণা ব্যতীত কোন উল্লেখযোগ্য মঙ্গলকাব্যেই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু এই প্রহেলিকাগুলি মৌখিক সাহিত্যের স্তর অতিক্রম করিয়া মঙ্গলকাব্যের লিখিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার ফলে ইহাদের সহজ এবং স্বতঃস্ফূর্ত আবেদন বিনষ্ট হইয়াছে। কবিদিগের পাণ্ডিত্যের স্পর্শ ইহাদিগের স্বচ্ছ রূপ অনেক ক্ষেত্রেই আবিল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহারা লিখিত হইয়া প্রচারিত হইবার ফলে ইহাদিগের মধ্য হইতে এই বিষয়ক একটি প্রাচীন ধারার সন্ধান লাভ করা যায়। প্রহেলিকাগুলি যে একদিন ভারতের অন্যান্য আদিম জাতির মত বাঙ্গালীরও সমাজ-জীবনের আচার-ভুক্ত ছিল, মঙ্গলকাব্যগুলি হইতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন আদিম সমাজে বিবাহোপলক্ষে কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে প্রহেলিকা জিজ্ঞাসা করে, বরপক্ষ প্রহেলিকাগুলির যথাযথ উত্তর দিতে পারিলে তাহারা কন্যার গৃহে উপস্থিত হইবার অধিকার লাভ করে। বাংলার যে সমাজ মঙ্গলকাব্যের ভিত্তি রচনা করিয়াছিল, তাহার মধ্যেও যে এই আচার একদিন প্রচলিত ছিল, ইহাদের মধ্যে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনায় ইহা একটি অতি মূল্যবান্ উপাদান বলিয়াই গৃহীত হইতে পারে।

প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই নারীর সতীত্বের পরীক্ষার একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, ইহা রামায়ণে সীতার অগ্নি-পরীক্ষার অনুকরণ-জাত, কিন্তু এ'কথা সত্য নহে। কারণ, মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সীতার অগ্নি-পরীক্ষার অনুরূপ কোন পরীক্ষার পরিবর্তে একাধিক পরীক্ষার উল্লেখ আছে। মনসা-মঙ্গলে বেহুলার অষ্টপরীক্ষার কথা উল্লেখিত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা লোক-সাহিত্য মাত্রেরই একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ইংরেজিতে ইহাকে chastity test বলে—মঙ্গলকাব্যে ইহা লোকসাহিত্যেরই প্রেরণার ফল। এ' সম্পর্কে পূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

বিপন্ন নায়ক কর্তৃক দেবীর চৌতিশা স্তব বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম-বিশিষ্ট লক্ষণ। ক হইতে আরম্ভ করিয়া হ পর্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ক্রমান্বয় প্রত্যেক পদের আদিবর্ণরূপে ব্যবহার করিয়া রচিত স্তবই চৌতিশা স্তব নামে পরিচিত। ইহাতে ক্রমান্বয়ের চৌত্রিশটি অক্ষর ব্যবহার করিতে পারা যায় বলিয়া ইহাকে চৌত্রিশা বা চৌতিশা বলে। যেমন,

করযোড়ে কবিবর করে পরিহার।
করগো করুণাময়ি কৃপা একবার॥
খট্টাঙ্গ খর্পরা খরা খরতর অসি।
খেণেকে করিবে খুন রক্ষা কর আসি
গিরিসুতা গুণবতি গহনবাসিনি।
গলে নরমুণ্ডমালা গগনবাসিনি॥
ঘোর ঘন বাদিনি শরণ দেহ শিবা।
ঘূশীতে রহুক ক্ষিতীন্দ্র নানা করিবা॥
ঙ (উ) মা তুমি আসিয়া উষারে কৈলা দয়া।
ঙ (উ) রিতে উচিত বিদ্যা মাগে পদছায়া॥ ইত্যাদি—

বলা বাহুল্য, এই সকল রচনার ভিতর দিয়া কোন কবিত্ব প্রাকশ পায় না, দেবতার প্রতি ভক্তির ভাবও যে ইহাদের ভিতর দিয়া সার্থক বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাও মনে হইতে পারে না—ইহাদের রচনার মধ্য দিয়া কেবল মাত্র পাণ্ডিত্যের নিস্ফল আস্ফালন দেখিতে পাওয়া যায়। যে যুগে মঙ্গলকাব্যগুলি মধ্যে ভাবের দৈন্য ও ভক্তির অভাব দেখা দিয়াছিল, সেই যুগেই ইহাদের মধ্য দিয়া এই দৈন্য ও অভাব গোপন করিবার এই প্রয়াস দেখা গিয়াছিল। পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে এই লক্ষণ অত্যন্ত বিকট আকার লাভ করিয়াছে।

এখানে উল্লেখ করিতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে রচিত 'বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ' নামক একখানি উপপুরাণে মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ প্রণালীতে সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি চৌতিশা স্তবের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়।[১] আর কোনও প্রাচীন কিংবা সংস্কৃত পুরাণে অনুরূপ রচনার পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহা হইতে মনে হয়, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতেই বাংলা মঙ্গলকাব্য নিজস্ব রূপ লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলার সদাগরদিগের বৈদেশিক বাণিজ্যের সংস্কারের উপর মঙ্গলকাব্যের কাহিনী পরিকল্পিত হইয়াছে—সেইজন্য প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই বাণিজ্য-রীতির কিছু পরিচয় আছে। যে বিনিময় (barter) প্রথা দ্বারা বৈদেশিক বাণিজ্য সে'কালে নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহার একটি বর্ণনা প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেরই বিষয়ীভূত হইয়াছে। তবে এই

১। বৃহদ্ধর্মপুরাণ (বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩০০ সাল) মধ্যখণ্ড, বিংশ অধ্যায়, শ্লোক ১৩৪-৭১, পৃ. ১৩৯-১৪০।

বর্ণনা সর্বদাই যে বাস্তব, তাহা স্বীকার করিতে পারা যায় না—কারণ, ইহা অবলম্বন করিয়া প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের কবিই তাঁহার পাঠকদিগকে একটু কৌতুকরস পরিবেষণ করিয়াছেন। ইহাদের চিত্রগুলি অতিরঞ্জিত করিয়াই এই কৌতুকরস সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। যাহাই হউক, ইহাই কোন বাস্তব মূল্য প্রকাশ না পাইলেও, এই বিষয়ক একটি সংস্কার যে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ হইতে লুপ্ত হইয়া যায় নাই, এই বর্ণনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয়। তারপর মঙ্গলকাব্যের একঘেয়ে কাহিনীর মধ্যে ইহাদের সহায়তার একটু হাস্যরসের বৈচিত্র্যসৃষ্টি কাব্যের দিক হইতে যে সার্থক হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

যুদ্ধ বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ। এক মনসা-মঙ্গল ব্যতীত সকল মঙ্গলকাব্যেই বিস্তৃত যুদ্ধ বর্ণনার উল্লেখ আছে। বীররসের সঙ্গে সঙ্গে বীভৎস রসেরও ইহাতে পরিবেষণ করা হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সঙ্গে এই সকল বহির্মুখী যুদ্ধের বর্ণনা নিবিড় যোগ স্থাপন করিয়া উঠিতে পারে নাই বলিয়া ইহাদের মধ্য দিয়া কেবলমাত্র গতানুগতিকতায় পরিচয় প্রকাশ পায়, নিষ্প্রাণ কৃত্রিমতাই ইহাদের বৈশিষ্ট্য। কোন কোন মঙ্গলকাব্যে ইহাদের বর্ণনা অত্যন্ত বিস্তৃত এবং নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন; কাহিনীর অগ্রগতির ইহারা দুরপনেয় বাধা। ইহাদের মধ্য দিয়া বাঙ্গালী কবিদিগের সমসাময়িক সামরিক জীবন সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইল বর্ণনাগুলি আরও জীবন্ত হইয়া উঠিত—রামায়ণ এবং মহাভারত অনুবাদের মধ্য দিয়া যে গতানুগতিক যুদ্ধের বিবরণ পরিবেষণ করা হইয়া থাকে, ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ তাহাই অনুকরণ করা হইয়াছে মাত্র। অতএব ইহাদের বর্ণনা গৌণত সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারতের অনুকরণ-জাত—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-জাত নহে। সুতরাং ইহাদিগের মধ্য হইতে মধ্যযুগের বাংলার কোনও ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা সমীচীন হয় না। মঙ্গলকাব্যের যুদ্ধ বর্ণনা যে প্রধানত কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুরূপ বর্ণনার অনুকরণ-জাত, তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে, ইহাদের প্রত্যেক বর্ণনার মধ্যেই হনুমান-চরিত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়। শুধু তাহাই নহে, গন্ধমাদন পর্বত হইতে বিশল্যকরণী আনিয়া কোনও কোনও মৃত চরিত্রের পুনর্জীবন দানের কথাও তাহাতে বর্ণিত হইয়া থাকে। তবে বিশল্যকরণীর প্রসঙ্গ বাংলার লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে আসিয়া রামায়ণ এবং মঙ্গলকাব্য উভয়ের মধ্যে প্রবেশ করাও অসম্ভব নহে।

দেবীর জরতী বা বৃদ্ধার বেশ ধারণ করিয়া নায়ক-নায়িকাকে ছলনা বা রক্ষা করা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয়। পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্যে old lady motif নামক একটি সাধারণ বিষয় আছে—বাংলার লোক-সাহিত্যেও ইহার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। 'এক যে ছিল বুড়ী'—বহু লোক-কথারই ইহা প্রসঙ্গ। আমরা সকলেই জানি চাঁদের মধ্যেও এক বুড়ী বসিয়া চরকা দিয়া সূতা কাটে। অতএব বৃদ্ধা লোক-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট চরিত্র; সেই সূত্র হইতেই ইহার কথা মঙ্গলকাব্যেও আসিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে। লোক-কথার পরিকল্পনায় আপাতদৃষ্টিতে যে অসহায়, অশক্ত অথবা অক্ষম, সেই সর্বাধিক

দৈবশক্তির অধিকারী হয়। 'Successful youngest son' প্রভৃতি বিষয়ের ইহাই মৌলিক উদ্দেশ্য। মঙ্গলকাব্যের জরতী চরিত্রের মধ্যেও সেইজন্যই দৈবশক্তি আরোপ করা হইয়া থাকে। জরতী বেশ ব্যতীতও দেবতাদিগের কাক ও মাছির —কোনও কোনও স্থলে শ্বেত কাক ও শ্বেত মাছি—রূপ ধারণও মঙ্গলকাব্যের একটি অতি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

মশান বা শ্মশান বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। মঙ্গলকাব্যের মধ্য দিয়া সংস্কৃত মহাকাব্যের মত বিবিধ রস পরিবেষণ করা হইয়া থাকে—মশান বর্ণনার ভিতর দিয়াই বীভৎস রসের বর্ণনা মুখ্য হইয়া উঠে। অবশ্য যুদ্ধ বর্ণনার মধ্যে প্রেতের হাট প্রভৃতির প্রসঙ্গ অবতারণার ভিতর দিয়াও বীভৎস রসের অবতারণা করা হয়; কিন্তু মশান বর্ণনার ভিতর দিয়া ইহা আরও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়। এই সকল বর্ণনাও গতানুগতিক এবং অত্যন্ত কৃত্রিম।

মঙ্গলকাব্যের আরও একটি বৈশিষ্ট্য নায়ক বা নায়িকার রূপ-বর্ণনা। মঙ্গলকাব্যগুলিতে রূপ-বর্ণনাচ্ছলে যে উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার করা হইয়াছে, সেগুলি রূপ-বর্ণনায় আদৌ সহায়তা করে নাই। রূপ-বর্ণনায় এত রূপকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য রূপক ব্যবহৃত হইয়াছে যে, অধিকাংশস্থলে সেগুলি কৌতুকপূর্ণ ক্রীড়ায় পর্যবসিত হইয়াছে। উপমা দিয়া উপমাটিকে ধিক্কৃত করিবার প্রথা মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্য যুগের বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠিয়াছিল। মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যযুগের কবিগণ রূপ-বর্ণনাতে স্বর্গমর্ত্য লইয়া ক্রীড়া করিয়াছেন ও বাক্যপল্লবের বিস্তার ঘটাইয়াছেন—তাহাতে আসল রূপ বিন্দুমাত্র ফুটে নাই। ভারতচন্দ্র হইতে এই ধরণের বর্ণনার একটু উৎকলন করা গেল—

> বাহু ভয়ে করী তার সিন্ধুকে ছলে।
> কর্মার্থে না ছাড়ে সঙ্গ বাহু কেশমূলে॥
> মাণিক রচিত কর্ণ গীধিনী দেখিয়া।
> লাজে মৃতমুখ বেড়ায় লুকাএগ॥
> নাসা দেখি নিজ নিন্দা বাঁচাবার আশে।
> খগপতি থাকিলা ক্ষীরোদশায়ী পাশে॥ ইত্যাদি।

এই বর্ণনায় বিদ্যাদেবীর রূপ একবারেই ফুটে নাই। রূপের বিকাশ অপেক্ষা পাণ্ডিত্যের প্রকাশের দিকই কবিদিগের লক্ষ্য ছিল।

সাজ-সজ্জার বর্ণনা দেওয়া ও মঙ্গলকাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই সাজ-সজ্জার বর্ণনার মধ্য দিয়া আমরা সেকালের নরনারীর পরিচ্ছদ ও আভরণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারি। মঙ্গলকাব্যের রমণীরা পদে পাশুলি, কটিতে কিঙ্কিণী, কণ্ঠে শতেশ্বরী হার, বাহুতে তাড়, হস্তে শঙ্খ, কঙ্কণ, কনক মাদুলি ও অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক ব্যবহার করিত। কর্ণাভরণ হিসাবে ব্যবহৃত হইত তাটঙ্ক, কনকবৌলি, রামকড়ি, মদনকড়ি ও মকরকুণ্ডল। মঙ্গলকাব্যের পুরুষগণও অঙ্গে আভরণ ব্যবহার করিত। মঙ্গলকাব্যে পরিচ্ছেদের মধ্যে নানারূপ কাপড়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের নারীগণ গঙ্গাজল, মেঘডম্বুর,

অগ্নিপাট, কমলা-বিলাস প্রভৃতি শাড়ী ব্যবহার করিত। তাহারা খোঁপার মধ্যে দিত মাণিক ও মালতীফুল। কেশ সংস্কারের জন্য আমলকী ব্যবহৃত হইত।

মঙ্গলকাব্যে নগরবর্ণনা ছিল অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রথম যুগের মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত নগরগুলি ছিল অবাস্তব। তাহাদের মৃত্তিকা ও কঙ্কর ছিল রত্ন-মণ্ডিত, গৃহে প্রতি চালে 'সোনার কোমড়া' ঝুলিত, কিন্তু ঐশ্বর্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে অঙ্কিত নগর চিত্রগুলি অধিকতর বাস্তব। নগরের সহিত সরোবরও বর্ণিত হইত। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের পুরবর্ণনায় সেকালের নগরের একটি সম্পূর্ণ চিত্র পাই। এই বর্ণনা অধিকতর বাস্তব। বর্ধমান নগরের বর্ণনায় ভাতরচন্দ্র লিখিয়াছেন—

চৌদিকে সহর পনা দ্বারে চৌকি কতজনা
মুরুচা বুরুজ শিলাময়।
কামানের হুড়াহুড়ি বন্দুকের দুড়দুড়ি
সম্মুখে বাণের গড় হয়॥
বাজে শিঙ্গা কাড়া ঢোল নৌবত ঝাঁঝর রোল
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঘড়ি ঘড়ি।
তীরগুলি শন্‌শনি গজ ঘণ্টা ঠন্‌ঠনি
ঝড় বহে অশ্ব দড়বড়ি॥
ঢালী খেলে উড়াপাকে ঘন হান হান হাঁকে
রায়বেঁশে লোফে রায় বাঁশ।
মল্লগণ মালসাটে ফুটি হেন মাটি ফাটে
দূর হইতে শুনিতে তরাস॥
ননী জিনি গড়খানা দ্বারে হাব্‌সীর থানা
বিকট দেখিয়া লাগে শঙ্কা।
দয়া সর্বমঙ্গলার লঙ্ঘিতে শকতি কার
সমুদ্রের মাঝে যেন লঙ্কা॥ ইত্যাদি।

দেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীকে দেবতার পদতলে নতশীর্ষ করানো মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মনসামঙ্গলে চাঁদসদাগরকে, চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতিকে, ধর্মমঙ্গলে মহামদকে দেবদ্রোহী রূপে চিত্রিত করিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাদিগকে দেবতার চরণতলে অবনত করান হইয়াছে। লাউসেন ধর্মপুত্র বলিয়া ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মহামদকে কুষ্ঠরোগ দিয়া আত্মসমর্পণ করানো হইয়াছে। চাঁদসদাগরের ন্যায় দৃপ্ত চরিত্রের পক্ষে জোড়হাতে মনসার স্তব করা অস্বাভাবিক পরিণতি। তবু কবিপ্রথা অনুসারে চাঁদকে নতশীর্ষ করানো হইয়াছে।

দৈবকার্যে হনুমান ও বিশ্বকর্মার অবতারণাও মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মনসামঙ্গলে হনুমান মনসার সহায়তা করিবার জন্য চন্দ্রধরের নৌকা নিমজ্জনের ভার লইয়াছে; চণ্ডীকাব্যেও হনুমান দৈবকার্যে সখের শ্রমিক সাজিয়া বিশ্বকর্মার নির্মাণকার্যে

সহায়তা করিয়াছে; ধর্মমঙ্গলেও হনুমান ধর্মদেবের অলৌকিক কর্মের সহায়তা করিয়া ধর্মপুত্র লাউসেনকে বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে। দীনেশ সেন যথার্থই লিখিয়াছেন, 'কিন্তু বাল্মীকির এই মহাচরিত্র বঙ্গীয় সাহিত্যে শুধু একটি বানরে পরিণত হইয়াছে।' বিশ্বকর্মা মঠ-মন্দির নির্মাণের কার্য হইতে দেবীগণের কাঁচুলি নির্মাণের পর্যন্ত ভার লইয়াছেন। এই দুই পৌরাণিক চরিত্রকে দিয়া মঙ্গলকাব্যের কবিগণ অসম্ভাবিত কার্য করাইয়াছেন।

গর্ভবর্ণনাও মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ

প্রথমমাসের গর্ভ জানি বা না জানি।
দ্বিতীয় মাসের গর্ভ করে কানাকানি॥

প্রভৃতি লিখিয়া মাসের পর মাস ধরিয়া গর্ভলক্ষণগুলি কিরূপে সন্তান-সম্ভবা রমণীর শরীরে প্রকাশ পাইতেছে, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দিতেন। ইহার পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে জাতকর্মের উল্লেখ করাও মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ বর্ণনা উপলক্ষে কবিগণ জাতকর্মের সংস্কারগুলিও উল্লেখ করিতেন। লাউসেনের জাতকর্ম বর্ণনায় কবি রামদাস আদব লিখিয়াছেন—

তুলিয়া রাখিল লয়ে কাঞ্চনের থালে।
চন্দ্রকান্ত মাণিক জিনিয়া অঙ্গ জ্বলে॥
নাড়ীচ্ছেদ করি দিয়া করাইল স্নান।
চালের খড়েতে আঁতুড় জ্বালায় সাবধান॥
দাইকে পরিতে দিল জোড়া পাট শাড়ী।
গলায় হেমহার দিল কানে কনককড়ি॥
বুড়া রাজা সমাচার পাইল দেয়ানে।
দু হাতে বিলায় ধন যত আসে মনে॥
বেদবিধি যতেক আছিল কুলধর্ম।
যতনে সাধিল রাজা যত জাতকর্ম॥
প্রতিঘরে তৈল বিলায় প্রতি ঘরে মাছ।
প্রতি ঘরে বসন ভূষণ নানা সাজ॥

দাম্পত্য কলহের বর্ণনা দেওয়াও মঙ্গলকাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য। বৃদ্ধ স্বামীর স্কন্ধে যুবতী ভার্যার ক্রোধাগ্নি বর্ষণ, কুলীন স্বামীর হাতে কুলকন্যাদের নির্যাতন ও বিড়ম্বনার কথা কবিগণ দেবদেবীর ভানে বঙ্গসাহিত্যে পরিবেষণ করিতেন। হরপার্বতীর দাম্পত্য জীবনের চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়া মঙ্গলকাব্যের কাবিগণ সেকালের দাম্পত্য প্রেমের বিড়ম্বনার কথা বলিয়াছেন।

শিবের উপাখ্যান বর্ণনা প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য ছিল। এই উপলক্ষে প্রধানত

কালিদাসের 'কুমারসম্ভবকাব্য' অনুযায়ী হর-গৌরীর বিবাহের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইত। মঙ্গলকাব্যে শিবের বিবাহ প্রসঙ্গ লইয়া রঙ্গরস পরিবেষণ করা হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালী সংসারের একটা পারিবারিক জীবন-চিত্রের আভাসও পাওয়া যায়।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের কথা, নানা কুসংস্কারের কথা। ভক্ষ্যভোজ্যের কথা, সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের কথা পরিবেষণ করাও মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। এই সকল বর্ণনা হইতে সেকালের রীতিনীতি, সংস্কার-বিশ্বাসের কথা আমরা স্পষ্টভাবেই জানিতে পারি।

সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা দেওয়াও মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইহা পৌরাণিক প্রভাবজাত, সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণগুলিতে পৌরাণিক, কতকটা লৌকিক, আবার কতকটা বৌদ্ধ প্রভাব মিশিয়াছে। ফলে মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা এক অদ্ভুত তত্ত্বে পর্যবসিত হইয়াছে। তথাপি এই কথা বলিতে হয় যে, মঙ্গলকাব্যের এই সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্য দিয়া ক্রমবিবর্তনবাদের ধারার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

বিভিন্ন প্রকারের নির্ঘণ্ট রচনাও মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য ছিল। এই নির্ঘণ্ট রচনা উপলক্ষে কবিগণ মানুষ পশু পক্ষী, ফুল-ফল ও নানা দ্রব্যের তালিকা দিয়াছেন।

সংস্কৃত কাব্যসমূহ যেমন বিভিন্ন সর্গে বিভক্ত থাকিত, মঙ্গলকাব্যগুলিও বিভিন্ন পালায় বিভক্ত থাকিত। তবে সংস্কৃত কাব্যে যেমন বিভিন্ন সর্গ বিভিন্ন ছন্দে রচিত হইবার রীতি ছিল, মঙ্গলকাব্যে তাহা ছিল না। ইহা আনুপূর্বিক একই পয়ার ছন্দে রচিত হইত, কোথাও করুণ রস বর্ণনা করিবার জন্য মাত্র লঘু কিংবা দীর্ঘ ত্রিপদী ব্যবহৃত হইত। বিষয় বর্ণনার ছেদ বা অবকাশ অনুযায়ী যেমন সংস্কৃত কাব্যসমূহের সর্গবিভাগ হইত মঙ্গলকাব্যের তাহা হইত না, গানের ব্যবহারিক প্রয়োজনে ইহার পালা বিভাগ হইত। যেমন চণ্ডীমঙ্গল কিংবা ধর্মমঙ্গল গান দিনে এক পালা এবং রাত্রে এক পালা গীত হইত, তাহা দিবা পালা এবং নিশা পালা নামে পরিচিত ছিল। চণ্ডীমঙ্গল সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল যে ইহা এক, মঙ্গলবারে আরম্ভ হইয়া আর এক মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রত্যহ দুই পালা করিয়া, গীত হইবে, সেই জন্য চণ্ডীমঙ্গলের পালাগুলি দিনের নামে উল্লেখিত হইত, যেমন মঙ্গলবারের দিবা পালা কিংবা মঙ্গলবারের নিশা পালা ইত্যাদি। কিন্তু ধর্মমঙ্গল, মনসা-মঙ্গল কিংবা শীতলা-মঙ্গল সম্পর্কে এই নিয়ম ছিল না বলিয়া তাহাতে বিশেষ কোন বারের নাম পালার নামে না হইয়া বিষয়ের নামে পালার নাম হইত, যেমন লাউসেনের জন্মপালা, ঢেকুর পালা, কিংবা মনসা মঙ্গলে মথন পালা, হুসন পালা ইত্যাদি। কোন কোন সময় মনসা-মঙ্গলের পালাকে মহাভারতের প্রভাব বশতঃ পর্বও বলিত, যেমন হুসন পর্ব, কিন্তু কোন পালাকেই রামায়ণের অনুরূপে কাণ্ড বলিয়া উল্লেখ করা হইত না।

কোন কোন মঙ্গলকাব্যের শেষ দিনের শেষ পালায় ফলশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যাইত। চণ্ডীমঙ্গলের অষ্টম দিবসের পালাকে যে অষ্টমঙ্গলা বলিত, চণ্ডীমঙ্গলের ফলশ্রুতি তাহারই অংশ। পুরাণের প্রভাব বশতঃই মঙ্গলকাব্যে ফলশ্রুতির কথা আসিয়াছে; সেইজন্য প্রাচীনতর কোন কোন মঙ্গলকাব্যে ইহার বর্ণনা নাই। বলা বাহুল্য এই সকল ফলশ্রুতির

মধ্যে স্বর্গের প্রতি প্রলোভনের কথা আছে, তথাপি ব্রতকথার মত কোন কোন মঙ্গলকাব্যে অকিঞ্চিৎকর ঐহিক বস্তু সম্পর্কেও আশ্বাস শুনিতে পাওয়া যায়।

মঙ্গলকাব্যের প্রত্যেক কবিই তাঁহার বর্ণিত প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের শেষ দুইটি পদে ভণিতা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে নিজের নাম কিংবা কোন উপাধি থাকিলে তাহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাংলা ভাষার জন্মলগ্ন হইতেই বাংলা পদ্য রচনায় যে ভণিতা ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হইয়াছিল, চর্যাপদগুলিই ইহার প্রমাণ। সংস্কৃত কাব্যে ভণিতা ব্যবহারের রীতি নাই, অথচ জয়দেব তাঁহার 'গীত গোবিন্দ' নামক গীতিকাব্যে ভণিতার ব্যবহার করিয়াছেন; সেইজন্য 'গীত-গোবিন্দ' প্রথমতঃ তদানীন্তন বাংলাভাষায় কিংবা অপভ্রংশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছেন। 'গাথাসপ্তশতী'তে কবি হাল অপভ্রংশ ভাষায় ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন, সুতরাং অপভ্রংশ ভাষার যুগ হইতেই এই রীতিটি আসিয়া থাকিবে।

মঙ্গলকাব্যের কবিগণ তাঁহার আশ্রয়দাতা এবং পৃষ্ঠপোষকদিগের নামও নিজের নামের সঙ্গে অনেক সময় ভণিতায় উল্লেখ করিয়াছেন। কবিদিগের আশ্রয়দাতৃগণের নাম ভণিতায় উল্লেখ থাকিবার ফলে অনেক সময় কবিদিগের কালনির্ণয়ে সহায়ক হইয়াছে। অনেক সময় প্রত্যক্ষ ভাবে কোন প্রকার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ না করিয়াও কোন কোন কবি কোন কোন রাজা বা বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও কবিদিগের কাল নিরূপণের সহায়ক হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতেও ভণিতার ব্যবহার হয় সত্য, কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর ভণিতার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের ভণিতা ব্যবহারের পার্থক্য আছে। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ যেমন ভণিতায় নিজের নামধামের সঙ্গে অনেক সময় তাঁহাদের মাতাপিতা পত্নী পুত্র কন্যা পৃষ্ঠপোষক ইহাদেরও নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন, বৈষ্ণব কবিগণ তাহা করেন না, তাঁহারা অত্যন্ত দীন ভাবে নিজেদের ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং স্বাধীন সত্তা বিসর্জন দিয়া ভগবানের দাসানুদাস সেবকরূপে তাঁহারই লীলার অভিভূত দর্শকরূপে নিজেকে জ্ঞান করিয়া ভণিতা দিয়া থাকেন; কিন্তু মঙ্গলকাব্যের ভণিতায় কবির অহমিকা মূর্ত হইয়া উঠে। মঙ্গলকাব্য ভণিতার দিক দিয়া রামায়ণ মহাভারতের বাংলা অনুবাদের সগোত্র—বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে তাহার কোন যোগ নাই।

ভাব এবং উদ্দেশ্যের দিক দিয়া মঙ্গলকাব্যগুলিতে সাধারণতঃ বিশেষ কোন দেবতার মাহাত্ম্যপ্রচার, গার্হস্থ্য ধর্ম ও পাতিব্রত্যের মহিমা কীর্তিত হইত। ইহাদের মধ্য দিয়া অনেক সময় নিম্ন শ্রেণীর চরিত্রের মহিমা প্রচারিত হইত; যেমন চণ্ডীমঙ্গলের অনার্য ব্যাধ দম্পতি এবং ধর্মমঙ্গলের ডোম-ডোমনী কালু লখাই ইত্যাদি, এক চাঁদ সদাগর ব্যতীত উচ্চ জাতির আর কোন চরিত্রের মহিমা প্রচার ইহাদের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায় না—ধনপতি সদাগর অবশ্য চাঁদ সদাগরের ছায়াতলেই পরিকল্পিত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যগুলির প্রধান গুণ এই যে, ইহাদিগের মধ্যে পার্থিব জীবনের জয়গান শুনিতে পাওয়া যায়। এই গুণেই ইহারা বিশিষ্ট সাহিত্যধর্মী। তারপর প্রত্যেক নীতিমূলক আখ্যান কাব্যেরই যাহা বিশিষ্ট গুণ অর্থাৎ পাপীর

শাস্তি এবং ধার্মিকের জয়, শেষ পর্যন্ত তাহাও মঙ্গলকাব্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। বিশ্বাস, ভক্তি এবং সহিষ্ণুতা পরিণামে জয়লাভ করিয়া ইহাদের মধ্য দিয়া ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের কল্যান নির্দেশ করিয়াছে।

কাহিনীর উপসংহারে নায়ক-নায়িকার স্বর্গারোহণ বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের একটি অপরিহার্য বিষয়। স্বর্গারোহণ বর্ণনার পর কোন কোন মঙ্গলকাব্যে ফলশ্রুতি ও কবির ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়া থাকে, ইহাকে অষ্টমঙ্গলা বলে। কাহিনীর সমাপ্তি যতই করুণ হউক না কেন, স্বর্গারোহণের ভিতর দিয়া ইহার মধ্যেও একটা আধ্যাত্মিক সান্ত্বনার সন্ধান পাওয়া যায়; সেইজন্য ইহার অবতারণা হইয়া থাকে।

অকারণ সুদীর্ঘ তালিকা প্রদান মঙ্গলকাব্যের একটি বিশেষ লক্ষণ। এই তালিকার মধ্যে পশুপক্ষীর নাম হইতে আরম্ভ করিয়া গাছপালা কিংবা বিভিন্ন বস্তুর নাম থাকিতে পারে। ইহাদের মধ্য দিয়া মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর ধারা ব্যাহত হইলেও কাহিনী বর্ণনা ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না বলিয়া কবিগণ ইহাদের বর্ণনায় বিশেষ এক আনন্দ লাভ করিতেন। অথচ এই সকল বর্ণনা প্রায়ই কবিত্ববর্জিত হইত। ইহাদের পাঠ যেমন ক্লান্তিকর, ইহারা তেমনই কবিত্ব প্রকাশেরও অন্তরায়। ক্রমে কোন না কোন প্রসঙ্গে যে কোন বিষয় বা বস্তুর তালিকা প্রদান মঙ্গলকাব্য রচনার একটি প্রথার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সাধারণতঃ বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহের তালিকাগুলি পাওয়া যায়; যেমন, পাখীর তালিকা, ফুলের তালিকা, রান্নার তালিকা, অলঙ্কারের তালিকা, তীর্থের তালিকা, দেবদেবীর নামের তালিকা, অস্ত্রের তালিকা, স্ত্রীনামের তালিকা, বিবাহে যৌতুক দ্রব্যের তালিকা, বাদ্য দ্রব্যের তালিকা, বৃক্ষের তালিকা, বিভিন্ন জাতির তালিকা, পণ্যদ্রব্যের তালিকা, বানিজ্যে বিনিময় দ্রব্যের তালিকা, মৎস্যের নাম তালিকা, সর্পের নাম তালিকা ইত্যাদি। এমনই আরও বহু বিষয়ের তালিকার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সময় অকিঞ্চিৎকর বিষয়েরও নামের তালিকা রচিত হইতে দেখা যায়, যেমন, সখী, শাক, মেঘ, ধান, ছাগ, বাঘ ইত্যাদির নামের তালিকা। এই সকল তালিকার মধ্য দিয়া লেখকের বস্তুজ্ঞানের যে একটা সুগভীর পরিচয় প্রকাশ পায়, তাহা নহে, বরং ক্রমে ইহারা অনেকটা গতানুগতিক হইয়া উঠিবার ফলে ইহাদের মধ্যে একটি প্রচলিত পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ মাত্র বুঝায়।

ইহাদের মধ্যে বার মাসের সুখ দুঃখের তালিকাকে বারমাসী বলে, ইহাদের প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র, ইহা একেবারে কাব্যগুণ-বর্জিত নহে। বিরহ-বিচ্ছেদের কাব্য হিসাবে ইহাদের বিশেষ একটি স্থান আছে।

চৌত্রিশ অক্ষরে রচিত দেবস্তোত্রকে চৌতিশা বলে, ইহাকেও গৌণভাবে অক্ষর তালিকারূপে গণ্য করা যায়। তবে অন্যান্য তালিকার সঙ্গে ইহার রচানার দিক দিয়া একটু অভিনবত্ব আছে।

তালিকার মধ্যে নামমাত্র উল্লেখ থাকে, বিষয়-বস্তু কিংবা পশুপক্ষীর কোন বর্ণনা থাকে না। মঙ্গলকাব্যগুলি প্রধানত বর্ণনাত্মক। সুদীর্ঘ বর্ণনার মধ্য দিয়াই ইহাদের রচনার বিস্তার

হইয়া থাকে। সেইজন্য বিভিন্ন বিষয়ের ইহাতে সুদীর্ঘ বর্ণনাও শুনিতে পাওয়া যায়। বিবাহের বর্ণনা ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে; তারপর অন্যান্য বিষয়ের বর্ণনাও ইহাতে স্থান পায়। মাতৃজঠরে আশ্রয় লাভ করা হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গারোহণ পর্যন্ত মানব জীবনে যে বিভিন্ন সংস্কার পালন করা হয়, যেমন গর্ভবাস, জাতকর্ম, সূতিকা, শৈশব, বাল্য ইত্যাদি ইহাদের প্রত্যেকটি বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের অপরিহার্য বিষয়ের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। প্রেমবিষয়ক বর্ণনায় নায়ক-নায়িকার মনোভাবও ইহার বর্ণনার বিষয় হয়। তবে তাহা স্বভাবতই বিস্তৃত হইতে পারে না। যুদ্ধ বর্ণনা, রূপ বর্ণনা, নৃত্যগীতের বর্ণনা, বিলাপ বর্ণনা ইত্যাদিও মঙ্গলকাব্যে স্থান লাভ করে।

বিবাহের বর্ণনাগুলি বিবাহ-নির্ধারণ হইতে আরম্ভ করিয়া কন্যা বিদায় পর্যন্ত সুদীর্ঘ বিস্তারের সঙ্গে বর্ণিত হয়। ইহাদের মধ্য দিয়া মধ্যযুগরে বাংলার সমাজের বিবাহ-বিষয়ের বিভিন্ন খুঁটিনাটির যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা সমাজতাত্ত্বিক এবং জাতিতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান্। বিবাহের বর্ণনাগুলির মধ্যে প্রত্যেক কবিই নিজ পরিবারে প্রচলিত বিবাহ-রীতিই খুঁটিনাটি করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সাধারণভাবে কিছুই বর্ণনা করেন নাই। সেই জন্য এক অঞ্চলের অধিবাসী কবির বর্ণনার সঙ্গে অন্য অঞ্চলের কবির বর্ণনার খুঁটিনাটি বিষয়ে কোন মিল থাকে না। এমন কি, একই অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত কবির পরিবারের বিবাহ-রীতিতে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকে। বিবাহ-বিষয়ক বিভিন্ন বর্ণনাগুলি এক সঙ্গে বিচার করিয়া দেখিলে বাংলাদেশের বিবাহ-প্রথার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাইতে পারে। বাংলা সামাজিক ইতিহাস নির্ণয়ে ইহাদের বিশেষ মূল্য আছে।

বিবাহের আচার প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—প্রথমত বৈদিক, দ্বিতীয়ত স্ত্রী-আচার। ব্রাহ্মণ কবিদিগের বর্ণনায় দুই শ্রেনীর আচারের বর্ণনাই সমান প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; তবে ব্রাহ্মণেতর কবিগণ স্ত্রী-আচার বা লৌকিক আচার বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন।

বিভিন্ন কাহিনী অবলম্বন করিয়া মঙ্গলকাব্য রচিত হইলেও ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ চরিত্র থাকে, ইহাদের মধ্যে প্রথমেই নারদ-চরিত্রের উল্লেখ করিতে হয়। বাংলার প্রত্যেক আখ্যায়িকা কাব্যের মধ্যেই নারদ-চরিত্র কোন্দল সৃষ্টি করিবার জন্য কুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। মঙ্গলকাব্যেও সেই ভূমিকাতেই তিনি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে তিনি ইহাতে ঘটকালীর কাজও করিয়া থাকেন। সামগ্রিকভাবে মঙ্গলকাব্য এক একটি সুবৃহৎ সমাজ-দর্পণ, সেই জন্য সমাজের সকল শ্রেণীর লোক-চরিত্রেরই তাহাতে সন্ধান পাওয়া যায়। শঠ বা villain চরিত্র মঙ্গলকাব্যেব এক অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্থান লাভ করে। চণ্ডীমঙ্গলের ভাঁড়ু দত্ত, মনসা-মঙ্গলের গোদা চরিত্র, এবং ধর্মমঙ্গলের মহামদ পাত্রের চরিত্র ইহার নিদর্শন। মঙ্গলকাব্যেই বাংলা সাহিত্যে প্রথম কুট্টিনী চরিত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল।

শঠ চরিত্রের বিপরীতধর্মী নির্বোধ চরিত্রেরও মঙ্গলকাব্যে কোন কোন সময় স্থান হইয়া থাকে, তবে ইহাদের সংখ্যা খুব আধক নহে। মনসা-মঙ্গলের পাটনের রাজাকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করা প্রত্যেক কবিরই লক্ষ্য ছিল।

মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর মধ্যে কেবলমাত্র চণ্ডীমঙ্গলে দাসী চরিত্র একটি সক্রিয় অংশ অধিকার করিয়াছে। ইহার উপর রামায়ণের মন্থরা দাসী চরিত্রের প্রভাব থাকা অসম্ভব নহে।

রোমান্টিক কবিতায় প্রাকৃতিক দৃশ্য যেভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে, মঙ্গলকাব্যে স্বভাবতই সেভাবে তাহা পাওয়া যায় না। তবে প্রকৃতিবিষয়ক কতকগুলি গতানুগতিক বর্ণনা তাহাতে অপরিহার্য রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে; যেমন কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা দুর্যোগের চিত্র, বন বা উপবনের চিত্র; সেই সূত্রেই নগর-চিত্র, রাজসভার চিত্র, কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রও তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সর্বত্রই চিত্রগুলি প্রাণহীন এবং নিস্পন্দ মাত্র, মনের মধ্যে কোন প্রেরণা সঞ্চার করিবার তাহাদের কোন শক্তি নাই। ইহাদের মধ্যে মনসা-মঙ্গলের সমুদ্রবক্ষে ঝড় বৃষ্টির বর্ণনার মধ্যে সজীব হইয়া উঠিবার প্রয়াস পাইয়াছে মাত্র; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে শেষ রক্ষা করিতে পারে নাই। পল্লী কবিগণ নগর বর্ণনায় গতানুগতিকতার অনুসরণ ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারেন নাই, উপবন কিংবা উদ্যান বর্ণনাতেও তাঁহাদের দক্ষতা ছিল না; সংস্কৃত সাহিত্যকেও কোন কোন সময় অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রীতি রক্ষা করিতে গিয়া সর্বত্রই কবিগণ এই সকল চিত্র-বর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন।

কোন কোন মঙ্গলকাব্যের যুদ্ধ বর্ণনার অন্তর্গত প্রেতের হাটের বর্ণনা এবং মশান চিত্রের বর্ণনা বীভৎস রসের অবতারণা করিয়াছে। পার্থিব জগতের চিত্র ব্যতীতও কবিগণ শিব-লোক, বিষ্ণুলোক, ইন্দ্রলোকের চিত্রও বর্ণনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহাদের বৈচিত্র্যহীনতা বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হয়। মঙ্গলকাব্যে অদ্ভুতকর্মা কতকগুলি চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে। ইহাদের মধ্যে বিশ্বকর্মা, হনুমান, ভীম, ইন্দ্র ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার নাম পুরাণ হইতে আসিয়াছে, তবে পৌরাণিক কোন ক্রিয়া তিনি মঙ্গলকাব্যে সম্পন্ন করেন নাই। তিনি প্রধানতঃ কাঁচুলি নির্মাণ করিয়াছেন, নৌকা গঠন করিয়াছেন, কিংবা পার্থিব জীবনের ব্যবহারের জন্য আরও অনুরূপ দুই একটি কাজ করিয়াছেন মাত্র।

হনুমানের নাম রামায়ণ হইতেই মঙ্গলকাব্যে আসিয়াছে। মঙ্গলকাব্যের উপর ইহা রামায়ণের ব্যাপক প্রভাবেরই পরিচায়ক। অসম্ভব বীরত্ব এবং সাহসিকতাপূর্ণ কাজ মাত্রই হনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। সেই সূত্রে হনুমান কখনও মনসার, কখনও ধর্মঠাকুরের, কখনও চণ্ডীর দুঃসাধ্য কার্যের সহায়ক।

ভীমের নাম মহাভারত হইতেই আসিয়াছে। অসাধারণ শারীরিক শক্তির অধিকারী রূপে কৃষক শিবের কৃষিকার্যের সহায়করূপে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে। ইন্দ্রও দেবরাজ রূপে মঙ্গলকাব্যে স্থান পান নাই। তিনি কেবলমাত্র ঝড় বৃষ্টির কারক রূপেই ইহাতে মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন। যখনই ঝড় বৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ উৎপাদনের প্রয়োজন হইয়াছে তখনই তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে।

॥৭॥ মঙ্গল নামের উৎপত্তি

দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন ভারতীয় রাগরাগিণীর মধ্যে মঙ্গলরাগ অন্যতম। বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীও মঙ্গলরাগে গীত হইত বলিয়া জানিতে পারা যায়। প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্র বিষয়ক পুস্তকাদিতে অবশ্য মঙ্গলরাগের খুব ব্যাপক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না; তাহাতেই মনে হয়, ইহা স্থানীয় একটি রাগ মাত্র ছিল। বলা বাহুল্য, কোন সঙ্গীত-শাস্ত্রকারই মঙ্গলরাগকে ষড়্‌রাগ বা জনক-রাগের অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, ইহা রাগিণী বা উপরাগের পর্যায়ভুক্ত। ক্ষেমকর্ণ পাঠক রচিত 'রাগমালা' গ্রন্থে মঙ্গলরাগকে হিন্দোলরাগের অন্তর্গত একটি উপরাগ (পুত্র) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[১] নারদ রচিত 'চত্বারিংশচ্ছত-রাগ-নিরূপণম্' নামক গ্রন্থে ভৈরবরাগের পুত্রবধূরূপে মঙ্গলকৌশীকী নামক একটি রাগিণীর উল্লেখ করা হইয়াছে।[২] মনে হয়, ইহা উক্ত মঙ্গল রাগ ও কৌশীকী রাগিণীর একটি মিশ্র রূপ। উক্ত পুঁথি দুইখানির একখানিও খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে এবং ইহাদের প্রচারও খুব ব্যাপক ছিল না। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন ও মধ্যযুগের পদ্য-সাহিত্য মাত্রই গানের উদ্দেশ্যই রচিত হইয়াছিল, মঙ্গলকাব্যেও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। সেইজন্যই মনে হইতে পারে, আদ্যোপান্ত মঙ্গলরাগে কিংবা প্রধানত মঙ্গলরাগে যাহা গীত হইত, সাধারণভাবে মঙ্গলগান বলিয়া অভিহিত হইত। কিন্তু মঙ্গলগানের যে সকল প্রাচীন পুঁথির মধ্যে রাগ-রাগিণীর নির্দেশ আছে তাহাই তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, মঙ্গলগান আদ্যোপান্ত যে মঙ্গলরাগেই গীত হইত, তাহা নহে—তাহাতে অন্যান্য রাগ-রাগিণীও ব্যবহৃত হইত। তবে ইহাতে মনে হইতে পারে যে হয়ত, তাহা প্রধানতঃ মঙ্গলরাগেই গীত হইত বলিয়া এই শ্রেণীর গানের নামও মঙ্গলগান হইয়াছে। প্রাচীন বাংলায় পাঁচালীর সুরে যে গান গাওয়া হইত, তাহাও সাধা' 'ভাবে পাঁচালী নামে অভিহিত হইত। যদিও প্রাচীনকাল হইতে উত্তর ভারতীয় রাগসঙ্গীত নানা রূপান্তরের ভিতর দিয়াই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে সত্য, তথাপি বর্তমানে মঙ্গলরাগের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা উক্ত ধারণার পোষকতার অনুকূল নহে; কারণ বর্তমানে মঙ্গলরাগ ভৈরবরাগের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়, সেইজন্য তাহা একমাত্র প্রভাতকালেই গেয়। কিন্তু মঙ্গলগান প্রভাতে আদৌ গীত হইত না। অতএব এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। মঙ্গলগানের মধ্যে পাঁচালীর সুরও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইত বলিয়া একমাত্র পাঁচালী বলিয়াও প্রাচীনতম মঙ্গল-গানগুলিকে উল্লেখ করা হইয়াছে। ক্রমে পাঁচালীর উপর মঙ্গলরাগের ক্রমবর্ধমান

১। স-স।।। D ৬.৫ (খ)

২। O.C. Ganguli. *Rag and Ragini* (Bombay, 1948) 202

প্রভাব বশতঃ সম্ভবত ইহা মঙ্গল নামে পরিচিত হইতে থাকে। পদ্মা বা মনসার গীতের উপর সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব বশত ইহার নাম হয় পদ্মপুরাণ। অবশ্য সাধারণ ভাবে ইহা মনসা-মঙ্গল নামেও পরিচিত।

কিন্তু কোন্ বিষয়ক গান প্রধানতঃ এই মঙ্গলরাগে গাওয়া হইত, এখন তাহাই বিবেচ্য। ব্যাপক অর্থে দেব-মহিমা প্রচারক গীত মাত্রই মধ্যযুগের বাংলায় মঙ্গলগীত নামে অভিহিত হইত। এই অর্থেই জয়দেব গোস্বামী রচিত 'গীত-গোবিন্দ' কাব্যে মঙ্গল শব্দটি এদেশে সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে; যেমন, 'শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদঃ মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি' (।২৫)। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কবি-রচিত ইহার পরবর্তী আরও বহু পদ ইহার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে, যেমন,

'প্রভু কন গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল।
মুকুন্দ গায়েন প্রভু শুনিয়া বিহ্বল।। —চৈতন্য ভাগবত,২।২৫

বিবাহাদি অনুষ্ঠানে যে সকল গীত গাওয়া হইত, সাধারণ ভাবে তাহাদিগকেও মঙ্গল বলিয়া অভিহিত করা হইত বলিয়া মনে হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে শিবদুর্গার বিবাহোপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে।

'নানা মঙ্গল নাট গীত হিমালয়ের ঘরে
পরম আনন্দে লোক আপনা পাসরে।।" (সা. প. সংস্করণ, পৃ-৬)

হিন্দীভাষায় বিবাহ অর্থে কোন কোন সময় মঙ্গল কথাটি ব্যবহৃত হয়। কাশীতে কিছুদিন পূর্বেও 'বুঢ়ুয়া মঙ্গল' নামক যে অনুষ্ঠান হইত, তাহা 'বুঢ়ুয়া' বা শিবের সহিত পার্বতীর বিবাহনুষ্ঠান ব্যতীত আর কিছুই নহে। 'মঙ্গল' শব্দটি সম্ভবতঃ 'আঙ্গুল', 'লাঙ্গুল', 'গঙ্গা' ইত্যাদির ন্যায় ভারতীয় কোন অনার্য ভাষা হইতে আগত। মূলত মিলন অথবা বিবাহ অর্থে শব্দটি দ্রাবিড় ভাষায় আজ পর্যন্তও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মালয়ালাম ভাষায় বিবাহ অর্থে 'মঙ্গল্যম্' শব্দ অদ্যাপি ব্যবহৃত হয়। কুর্গদেশে ব্যাঘ্রের বিবাহ নামক একটি লৌকিক উৎসব আছে। সাধারণ লোকে ইহাকে 'নারী মঙ্গল' বলিয়া জানে। নারী শব্দের অর্থ দ্রাবিড় ভাষায় শৃগাল; কুর্গদেশের শিকারিগণ ব্যাঘ্রকে শৃগাল বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। মালয়ালাম্ দেশের স্থানের নাম ম্যাঙ্গালোর, তীরুমঙ্গল প্রভৃতি শব্দের মধ্যে মঙ্গল শব্দের অস্তিত্ব আছে। এ'কথা অবশ্য সত্য যে, আধুনিক দ্রাবিড় ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কে বলিবে এই মঙ্গল শব্দটি সংস্কৃত হইতে গৃহীত, না কোন প্রাচীন দ্রাবিড়শব্দেরই কোন সংস্কৃত রূপ? যদিও বিবাহ একটি মাঙ্গলিক ব্যাপার সন্দেহ নাই, তথাপি সোজাসুজি বিবাহ অর্থে মঙ্গল শব্দের ব্যবহার ত সংস্কৃত অভিধানেও দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ তামিল ভাষায় মঙ্গল শব্দের অর্থ বিবাহাদি শুভ অনুষ্ঠানে ক্ষৌরকর্মের জন্যব্যবহৃত ক্ষুর। তামিল ভাষায় নাপিতানিকেও 'মঙ্গলৈ' বলা হয়। তেলেগু ভাষায় মঙ্গল শব্দের অর্থ ক্ষৌরকার। বিবাহাচারে ক্ষৌরকারের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

অতএব দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইলেও শব্দটি দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রাবিড় ভাষার বিভিন্ন আধুনিক শাখায় বিবাহ্-সম্পর্কিত কোনও শব্দের অর্থে অদ্যাপি রক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং মনে হইতে পারে যে, দ্রাবিড় ভাষায় মঙ্গল শব্দের অর্থই বিবাহ।

কেহ কেহ অনুমান করেন, 'there were several kinds of *mangalas* and the narrowing down of *mangala* to mean marriage exclusively is a fairly recent phenomenon'[১] কারণ, কিছুকাল পূর্বেও দ্রাবিড় ভাষাভাষীর দেশে. বিশেষতঃ কুর্গ অঞ্চলে, প্রায় প্রত্যেক জাতকর্মকেই মঙ্গল নামে অভিহিত করা হইত; যেমন বয়ঃপ্রাপ্ত বালকের কর্ণভেদ অনুষ্ঠানকে বলিত 'হেম্মিকুট্টি-মঙ্গল' বয়ঃপ্রাপ্ত বালিকার কর্ণভেদ অনুষ্ঠানকে বলিত 'পোলেকণ্ড মঙ্গল', নারীর প্রথম গর্ভধারণ উপলক্ষে যে পারিবারিক অনুষ্ঠান হইত তাহাকে বলিত 'কুলিয়ম্মে মঙ্গল', দশটি জীবিত সন্তানের জন্মদাত্রী জননীর সম্মানার্থে একটি সামজিক অনুষ্ঠান হইত, তাহাকেও 'মঙ্গল' বলিত। গৃহারম্ভকালে যে পূজানুষ্ঠান হইত, তাহাকে বলিত 'মনে মঙ্গল' ইত্যাদি। কিন্তু মনে হয়, বিবাহ অর্থ হইতেই মঙ্গল শব্দটি অন্যত্র প্রসারিত হইয়াছে। অথবা অন্যান্য অর্থ ইহতে কালক্রমে কেবল মাত্র বিবাহ্ বুঝাইতেই দ্রাবিড় ভাষায় ইহার অর্থ সঙ্কুচিত (contracted) হইয়াছে।

অতএব দ্রাবিড় ভাষায় মঙ্গল শব্দের অর্থই বিবাহ এবং ইহা হইতেই বিবাহ উপলক্ষে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের রাগকেই প্রাচীন বাংলায় মঙ্গলরাগ বলা হইত,—পরে ইহার অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া দেব-দেবীর বিবাহ্ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এই অর্থেই শব্দটি হিন্দীভাষায়ও প্রচলিত আছে। অতঃপর বাংলায় দেব-দেবীই মাহাত্ম্য-সূচক রচনা মাত্রই মঙ্গল নামে পরিচিত হইয়াছে।

এখানে আরও একটি কথা মনে হইতে পারে। কোনও অপ্রিয় বিষয় বা নামকে অনেক সময় সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই প্রবৃত্তিকে ইংরেজিতে **euphemism** বলে। মঙ্গলকাব্যের দেবতার চরিত্র মাত্রই অমঙ্গলকারী (malignant)। অতএব ইহাদের অমঙ্গলকারিণী শক্তিকে প্রশমিত (pacify) কারবার কিংবা মনোমধ্যে ইহার বিষয় স্থান না দিবার প্রবৃত্তি হইতেও তাঁহাদিগের মাহাত্ম্যসূচক গীতিকে মঙ্গলগান বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কালক্রমে সকল শ্রেণীর দেবতার মাহাত্ম্যকীর্তনই মঙ্গল নামে পরিচয় লাভ করে।

।। ৮ ।। জাগরণ

মঙ্গলগানকে সাধারণ ভাবে জাগরণ বলা হয়। এই কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য কি? প্রাক্-চৈতন্যযুগে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতেই 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে'র কবি মালাধর বসু কথাটি সর্বপ্রথম এই ভাবে ব্যবহার করেন যথা—'পূজিয়া ত ভগবতী করিল জাগরণে।' ইহার অর্থ

১। Srinivas, *Religion and Society Among the Coorgs of South India*, (Oxford, 1952), pp. 70-71.

স্পষ্টতই মনে হয় যে, সেকালে লোকে দুর্গাপূজা উপলক্ষে গান গাহিয়া রাত্রি জাগরণ করিত। প্রাচীন বাংলার হস্তলিখিত পুঁথিগুলির মধ্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত চণ্ডীমঙ্গলকে সাধারণ ভাবে জাগরণের পুঁথি বলা হইয়াছে। সেইজন্য মনে হইতে পারে যে, চণ্ডীমঙ্গল বুঝি কেবলমাত্র রাত্রি জাগিয়াই গাওয়া হইত, অতএব ইহার এই নাম। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল কেবলমাত্র যে রাত্রেই গাওয়া হইত, দিনে হইত না, এ'কথা সত্য নহে। চণ্ডীমঙ্গলের অধুনা-প্রচলিত রীতি দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয় না। ইহা যে চণ্ডীমঙ্গল গানের প্রাচীনতর রীতি, তাহাও নহে; কারণ, প্রাচীন হস্তলিখিত চণ্ডীমঙ্গল পুঁথির যে পালাবিভাগ আছে, তাহাতে প্রত্যেক দিনের দিবা-পালা ও নিশা-পালা বলিয়া স্বতন্ত্র বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলে জাগরণ কথাটির মূল তাৎপর্য কি?

কেবলমাত্র চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যেই নহে, প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের যে পালা বিভাগ করা হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে একটি পালা জাগরণ পালা নামে উল্লেখিত হয়। ধর্মমঙ্গলের বিভিন্ন বিষয়ক চব্বিশটি পালার মধ্যে একটির নাম জাগরণ পালা। মনসা-মঙ্গলেরও একটি পালার নাম জাগরণ পালা। চণ্ডীমঙ্গল এক মঙ্গলবারে আরম্ভ হইয়া সাতদিন ব্যাপিয়া গীত হইত ও অষ্টম দিবসে সমাপ্ত হইত বলিয়া বিষয় অনুসারে ইহার পালার নামকরণ না হইয়া বার অনুসারে (যথা রবিবারের দিবা-পালা, রবিবারের নিশা-পালা ইত্যাদি) ইহার পালার নামকরণ হইত। চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে সোমবারের নিশা-পালাটি দীর্ঘতম, মনে হয়, ইহা সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া গীত হইত এবং ইহাই চণ্ডীমঙ্গলের জাগরণ পালা। মঙ্গল গানের বিশেষ একটি পালাকে জাগরণ পালা বলা হইয়া থাকে বলিয়াই সমগ্রভাবে মঙ্গলগানকে জাগরণ গান বলা হয়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই শ্রেণীর আখ্যায়িকা সঙ্গীতের একটি অংশ বা পালাকে জাগরণ পালা কেন বলা হয়? দেখিতে পাওয়া যায় যে, মঙ্গলগানের যে পালা বিভাগ করা হইয়া থাকে, তাহাতে সমগ্র কাহিনীর বিষয়বস্তু সমান ভাগে বিভক্ত করা হয় না, বরং বিষয় অনুসারে বিভক্ত করা হয়। এইজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, কোন পালা একবেলা গীত হইবার পক্ষে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত, আবার কোন পালা অতিরিক্ত দীর্ঘ; যদিও নিশা-পালাগুলি সর্বদাই দীর্ঘতর' বিশেষ কোন কোন পালা আদ্যোপান্ত শুনিবার বাধ্যবাধকতাও ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বরিশাল অঞ্চলে মনসা-মঙ্গলের কাহিনী অবলম্বন করিয়া যে রয়ানী বলিয়া পরিচিত লোক-সঙ্গীত গীত হয়, তাহাতে লখীন্দরের সর্পদংশন হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার পুনর্জীবন লাভ পর্যন্ত বৃত্তান্ত প্রত্যেক শ্রোতার পক্ষে অবশ্য শ্রোতব্য—লখীন্দরের সর্পদংশনের বৃত্তান্ত শুনিয়া কোন শ্রোতা তাহার পুনর্জীবন লাভ পর্যন্ত না শুনিয়া আসর ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত মনসা-মঙ্গলের প্রাচীন পুঁথিসমূহে এই অংশকেই জাগরণ পালা বলা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, মনসা-মঙ্গল কাহিনীর মধ্যে এই অংশ সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং এক আসরে ইহা সম্পূর্ণ গাহিতে হইলে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যায়; স্বভাবতই এই জন্যই শ্রোতাকে রাত্রি জাগরণ করিতে হয়। সেই

জন্যই মনসা-মঙ্গলের অন্তর্গত এই পালার নাম যে জাগরণ হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ধর্মমঙ্গলের অন্তর্গত জাগরণ পালাটিও কাহিনীর মধ্যে দীর্ঘতম পালা। মঙ্গলগানের সর্বশেষ রাত্রি পালাটিই দীর্ঘতম—ইহা গাহিতে সমগ্র রাত্রি জাগরণের প্রয়োজন। রাত্রির পালাগুলি ক্রমে দীর্ঘ হইয়া শেষ রাত্রির পালাটি দীর্ঘতম হয়। রাত্রি জাগরণ করিয়া যে লোক-সঙ্গীত গাওয়া হয়, পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে এখনও তাহাকে জাগরণই বলে। বাঁকুড়া জিলায় সারা ভাদ্রমাসে রাত্রি জাগিয়া কুমারী মেয়েরা যে ভাদুগান গাহিয়া থাকে তাহাকে ভাদুর জাগরণ বলে। একটি ভাদুগানে পাওয়া যায়, 'জাগ্‌ব ভাদুর জাগরণে।' আর একটি গানে আছে, 'কি আনন্দ হবে গো আজ, আমার ভাদুর জাগরণে।' অতএব মঙ্গলগানের কোন কোন অংশ রাত্রি জাগরণ করিয়া গাওয়া ও শোনা হইত বলিয়া তাহাকে জাগরণ বলিত। অতএব কেবল মাত্র চণ্ডীমঙ্গলকেই জাগরণ বলে বলিয়া যে বিশ্বাস প্রচলিত আছে, তাহা সত্য নহে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রংপুর অঞ্চলের কৃষকদিগের মধ্যে 'জাগ গান' নামক যে এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহার সঙ্গেও জাগরণ কথার সম্পর্ক আছ; কারণ, 'জাগা' ও 'জাগরণ' উভয়েরই অর্থ এক; জাগ গানও রাত্রি জাগিয়া গাওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র।

কেহ কেহ মনে করেন, চণ্ডীমঙ্গলের গান এক মঙ্গলবারে আরম্ভ হইয়া অষ্টম দিবসে পরবর্তী মঙ্গলবারে সমাপ্ত হইত বলিয়া ইহাকে অষ্টমঙ্গলা বলিত। কিন্তু মনে হয়, এক মঙ্গলবারে আরম্ভ হইয়া পরবর্তী সোমবার পর্যন্ত ইহার মূল কাহিনী গীত হইত এবং অষ্টম দিবস মঙ্গলবারে মূল কাহিনীর বিষয়-বহির্ভূত গীত হইত; অষ্টম দিবসে গীত মূল কাহিনীর বহির্ভূত অংশকে অষ্টমঙ্গলা বলিত। পরে মঙ্গলগানের উপসংহার অর্থে অষ্টমঙ্গলা কথাটি চণ্ডীমঙ্গল হইতে ধর্মমঙ্গলকাব্যে বিস্তৃতি লাভ করে। ধর্মমঙ্গলের একজন কবি তাঁহার গ্রন্থারম্ভে ধর্মঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,—

তোমার কৃপায় যদি গ্রন্থ সাঙ্গ হয়।
অষ্টমঙ্গলায় দিব আত্মপরিচয়॥

কোন প্রাচীন পুঁথির উল্লেখ হইতে মনে হয়; চণ্ডীরই এক নাম অষ্টমঙ্গলা।[১] বস্তুত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অষ্টমঙ্গলা কথাটি যে ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে অর্থ খুব স্পষ্ট হয় না, তবে মনে হয় শুভদিনে কোন শুভকর্ম আরম্ভ হওয়ার পর অষ্টম দিবসের অন্যতম শুভদিনকেই মূলত অষ্টমঙ্গলা বলিত। পরে বিভিন্ন অর্থে শব্দটি ববহৃত হইয়াছে।

॥৯॥ শ্রেণীবিভাগ

বাংলার লৌকিক দেবতাদিগকে অবলম্বন করিয়া যে সকল কাব্যের মধ্যে বাংলার সমাজ জীবনাশ্রিত নরনারী-চরিত্রেরই জয়গান করা হইয়াছে, তাহাদিগকেই বাংলার মঙ্গলকাব্য বলা

১। ব-প্র-পু-বি ১।১, ১৬৩

হইয়া থাকে। অন্যথায় বৈষ্ণব সাহিত্যেও চৈতন্য-মঙ্গল, গোবিন্দ-মঙ্গল, কৃষ্ণ-মঙ্গল, অদ্বৈত-মঙ্গল প্রভৃতি নামে অনেক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা আমাদের আলোচ্য মঙ্গলসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নহে। কারণ, তাহাদের বর্ণিত বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাতে চৈতন্যদেব বা তাঁহার পার্শ্বচরগণের অলৌকিক জীবনী, শ্রীকৃষ্ণের অপার্থিব লীলামাহাত্ম্য ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে এবং সমসাময়িক মঙ্গলকাব্যগুলির প্রভাববশতঃ ইহাদিগকেও মঙ্গল নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের বিকাশ আদৌ হয় নাই। তবে ইহাদেরও কোন কোন বিচ্ছিন্ন চিত্র যে কাব্যোচিত গুণে গৌরবান্বিত তাহা অস্বীকার করা যায় না।

প্রসিদ্ধ চৈতন্য-জীবনচরিতকার বৃন্দাবন দাস তাঁহার অমর গ্রন্থ 'চৈতন্য ভাগবত'কে সর্বপ্রথম 'চৈতন্য-মঙ্গল' নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন, এমন প্রবাদ প্রচলিত আছে। 'চৈতন্য-চরিতামৃত'কার কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার গ্রন্থে বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থকে 'চৈতন্য-মঙ্গল' বলিয়াই সর্বদা উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি লোচনদাসের চৈতন্য-জীবনীর নামও 'চৈতন্য-মঙ্গল', জয়ানন্দের রচিত চৈতন্য-জীবনীও 'চৈতন্য-মঙ্গল' নামেই প্রসিদ্ধ। ইহাদের বিষয়বস্তু হইতেই জানা যায় যে, এই শ্রেণীর সাহিত্য মধ্যযুগের পূর্বোল্লিখিত মঙ্গলকাব্যের অর্ন্তভুক্ত নহে; ইহা বৈষ্ণব জীবনচরিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে ইহা হইতে একটি বিষয় অনুমান করা যায় যে, সেই যুগে শাক্ত সম্প্রদায়ের মঙ্গলকাব্যের প্রচলন সমাজে এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে, শাক্ত-বিদ্বেষী বৈষ্ণবগণও তাঁহাদের বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক সাহিত্যবস্তুকে বাহ্যতঃ এই ভাবে শাক্তপ্রভাব-চিহ্নিত করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মধ্যযুগের সাহিত্যে মঙ্গল অভিধেয় কাব্যে কীর্তিত তিন শ্রেণীর দেবতার সহিত পরিচিত হওয়া যায়, যেমন, (১) বৈষ্ণব (২) পৌরাণিক ও (৩) লৌকিক—

(১) বৈষ্ণব

চৈতন্য-মঙ্গল
অদ্বৈত-মঙ্গল
গোবিন্দ-মঙ্গল
কৃষ্ণ-মঙ্গল
রাধিকা-মঙ্গল
জগৎ-মঙ্গল[১]
কিশোরী-মঙ্গল
স্মরণ-মঙ্গল
গোকুল-মঙ্গল
রসিক-মঙ্গল

১। মেদিনীপুর জিলার দাসপুর গ্রামের শ্রীত্রিপুরারঞ্জন বসুর নিকট ইহার একখানি পুঁথি সংগৃহীত আছে।

		জগন্নাথ-মঙ্গল ইত্যাদি
(২)	**পৌরাণিক**	গৌরী-মঙ্গল
		ভবানী-মঙ্গল
		দুর্গা-মঙ্গল
		অন্নদা-মঙ্গল
		কমলা-মঙ্গল
		গঙ্গা-মঙ্গল
		চণ্ডিকা-মঙ্গল ইত্যাদি
(৩)	**লৌকিক**	শিবায়ন বা শিব-মঙ্গল
		মনসা-মঙ্গল
		চণ্ডী-মঙ্গল
		ধর্ম-মঙ্গল
		কালিকা-মঙ্গল (বা বিদ্যা-সুন্দর)
		শীতলা-মঙ্গল
		রায় মঙ্গল
		ষষ্ঠী-মঙ্গল
		সারদা-মঙ্গল
		সূর্য-মঙ্গল

বৈষ্ণব মঙ্গলকাব্যগুলি অন্তঃপ্রকৃতি ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সেইজন্য ইহারা আমাদের বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নহে। পূর্বে বলিয়াছি, সর্বশেষোক্ত শ্রেণীর কাব্যই সাহিত্যে প্রথম প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল এবং পরবর্তী কালে তাহাদেরই প্রভাব পৌরাণিক বিষয়ক কাব্যসমূহেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল; তাহারই ফলে পৌরাণিক আখ্যানমূলক মঙ্গলকাব্যগুলির সৃষ্টি হইয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণ 'এপিক'-কাব্যকে খাঁটি-'এপিক' (primitive epic or epic of growth) এবং সাহিত্যিক-'এপিক' (literary epic or epic of art) এই দুটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন। খাঁটি 'এপিক' সমগ্রভাবে যে একজনেরই রচনা, তাহা নহে—অনেক সময় ইহা লোক-পরম্পরাগত বিষয়বস্তুর ক্রমবিকাশ ও ক্রমপরিণতির ফল; সমাজের রস-চিত্তে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু লৌকিক সাহিত্যোপকরণ অবলম্বন করিয়াই ইহা দানা বাঁধিয়া উঠে। কিন্তু সাহিত্যিক 'এপিক' ব্যক্তি-প্রতিভার সচেতন শিল্পসৃষ্টি। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিকেও সেইরূপ 'খাঁটি মঙ্গলকাব্য' এবং 'সাহিত্যিক মঙ্গলকাব্য' এই দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। চৈতন্য-পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যগুলি খাঁটি মঙ্গলকাব্যরূপে গ্রহণ করা যায়—কারণ, ইহাদের মধ্যে কবির ব্যক্তি-মানস অপেক্ষা বৃহত্তর সমাজ-মানস অধিকতর প্রত্যক্ষ। প্রায়

প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেরই একটি কেন্দ্রীয় কাহিনী এই যুগে গড়িয়া উঠিলেও বিচিত্র উপকরণ-সম্ভারে ইহার গতি আড়ষ্ট বলিয়া বোধ হয়। ব্যক্তি-প্রতিভার শিল্পক্রিয়া ইহাদের মধ্যে তখনও বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতেই মঙ্গলকাব্যেগুলির উপর ব্যক্তি-রস-চেতনার অনুভূতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ভারতচন্দ্রের মধ্যে সাহিত্যিক মঙ্গলকাব্যের শিল্প-সচেতনতা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যগুলির খাঁটি 'এপিক' ও সাহিত্যিক 'এপিকের' মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থিত। এই যুগের উল্লেখযোগ্য কবি দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরাম। ইহারা জনশ্রুতি (tradition)-র ধারা সহজভাবে অনুসরণ করিয়া আসিয়াও তাহার মধ্যে স্বকীয় অনুভূতিব স্পর্শ দান করিয়াছেন। ইঁহারা সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের মত কাব্যের বহিরঙ্গে কোনও শিল্পরূপ দিতে পারেন নাই, কিন্তু স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা ইহাদের অন্তর্লোকে একটি বিশিষ্ট ঔজ্জ্বল্য দান করিয়াছেন। অতএব ইঁহাদিগকে খাঁটি মঙ্গলকাব্য ও সাহিত্যিক মঙ্গলকাব্য রচনার মধ্যবর্তী কবি বলিয়া নির্দেশ করা যায়।

।। ১০ ।। পুরাণ ও মঙ্গলকাব্য

বাংলা মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন কাহিনী বাংলার যে সামাজিক স্তর হইতেই উদ্ভূত হউক না কেন, কালক্রমে তাহা শিক্ষিত হিন্দুসমাজের অনুশীলনের বিষয় হইবার ফলে তাহাদের উপর সংস্কৃত পুরাণগুলির প্রভাব দুর্নিবার হইয়া উঠে। মঙ্গলকাব্য আখ্যানমূলক রচনা, পুরাণের ভিত্তিও আখ্যায়িকা। এই সূত্রে মঙ্গলকাব্যের লৌকিক আখ্যায়িকার মধ্যে পৌরাণিক কাহিনীসমূহ আসিয়া প্রবেশ করিতে থাকে। কালক্রমে মঙ্গলকাব্যের কাহিনীগুলি নির্দিষ্টসংখ্যক পালায় বিভক্ত হইয়া আটদিন, বারদিন কিংবা একমাস ব্যাপিয়া গীত হইবার একটি বিশেষ রীতি অবলম্বন করিল, তখন এই নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ করিবার জন্য মঙ্গলকাব্যের মৌলিক কাহিনীগুলির মধ্যে নির্বিচারে পৌরাণিক কাহিনী আনিয়া যোগ করা হইতে লাগিল। কিন্তু এই সকল পৌরাণিক কাহিনী কোন দিনই মঙ্গলকাব্যের মূল লৌকিক কাহিনীর সঙ্গে সহজ সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া উঠিতে পারে নাই। কারণ, পুরাণ এবং মঙ্গলকাব্য উভয়ের লক্ষ্য বিভিন্ন। সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলিতে পারা যায় যে, পুরাণের লক্ষ্য দেবতা এবং মঙ্গলকাব্য প্রধানতঃ বাস্তবজীবনাশ্রয়ী। যে মঙ্গলকাব্য বাস্তব জীবন পরিত্যাগ করিয়া পুরাণের মত অলৌকিকতার উপরই একান্ত নির্ভর করিয়াছে, মধ্যযুগের বাংলার বিদগ্ধ সমাজে তাহার কোনও স্থান হয় নাই। অতএব যেখানে পুরাণের ব্যতিক্রম, সেখানেই মঙ্গলকাব্যগুলির সার্থকতা।

কিন্তু বাহিরের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, পুরাণের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের অন্ততঃ একটি বিষয়ে ঐক্য রহিয়াছে। পুরাণ বিশেষ কোন দেবতার মাহাত্ম্য-প্রচারমূলক রচনা, মঙ্গলকাব্যও তাহাই। তবে এই বিষয়েও ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। পুরাণের মধ্যে দেবতার মাহাত্ম্য আনুপূর্বিক দৈব উপায়েই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে—ইহার কোন মর্ত্য

পরিচয় নাই। ইহার নায়ক দেবতা, তাহার আচরণ দৈব, কিন্তু মঙ্গলকাব্যের নায়ক স্বর্গভ্রষ্ট মানুষ, তাহার আচরণ মানবিক। পুরাণে বিরোধের মধ্য দিয়া দেবতার আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হয় না, কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দেবতাকে মানুষের অবিশ্বাসকে জয় করিতে হয়; অতএব ইহার মধ্য দিয়া একটি উচ্চাঙ্গের নাটকীয় দ্বন্দ্ব বিকাশলাভ করিবার সুযোগ পায়। পুরাণের দেবতা তাঁহার মাহাত্ম্যে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ, কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দেবতা মানুষের স্বীকৃতি লাভ করিতে না পারিলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং পরোক্ষ মানুষকেই মঙ্গলকাব্যে বড় করা হইয়াছে। অতএব মঙ্গলকাব্য পুরাণ হইয়াও কাব্য, পুরাণের পুরাণ ব্যতীত আর কোন পরিচয় নাই।

বিভিন্ন পুরাণ পর্যালোচনা করিতে গিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। যে কালক্রমে সংস্কৃত পুরাণগুলির মধ্য দিয়া একটি বাঁধাধরা বিষয়-পরিবেষণের রীতি বিকাশ লাভ করিয়াছিল। 'কর্মপুরাণে' পুরাণের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া ইহার এই পাঁচটি লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, প্রজা সৃষ্টি, রাজবংশ বা ঋষিবংশ, মন্বন্তর, রাজবংশ বা ঋষিবংশজাত চরিত্রের কার্যাবলী বর্ণন পুরাণের এই পাঁচটি লক্ষণ। পুরাণ রচনায় এই পাঁচটি লক্ষণ কালক্রমে অপরিহার্য বলিয়া গণ্য হয়। ইহার মধ্যে কেবলমাত্র 'চরিত্র' বা রাজবংশ বা ঋষিবংশজাত কোনও চরিত্রের কার্যাবলী বর্ণনা করিবার যে সামান্য সুযোগটুকু রহিয়াছে, কেবলমাত্র তাহার মধ্য দিয়াই সামান্য লৌকিক তথ্য পরিবেষণ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা এত দৈবভাব ভারাক্রান্ত যে তাহার ভিতর হইতে কোনও মানবিক পরিচয় উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। মঙ্গলকাব্যগুলিও কালক্রমে রচনা ও বিষয়বস্তু পরিবেষণের দিক হইতে একটি বিশিষ্ট আদর্শ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশু মর্ত্য-জননীর গর্ভে আশ্রয় লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কবির স্বর্গবিহারী কল্পনা মর্ত্যের ধূলামাটিতে নামিয়া আসিয়াছে। পুরাণ-রচয়িতার দৃষ্টি কখনও মর্ত্যাভিমুখী হইবার সুযোগ পায় নাই। বিধিবদ্ধ হইবার ফলে একান্ত দৈব-ভারাক্রান্ত পুরাণগুলি প্রাণ-স্পন্দনহীন হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু মানুষের সঙ্গে সংস্রব রক্ষা করিবার ফলে মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে এই প্রাণ স্পন্দনের অভাব কোনদিনই অনুভব করা যায় নাই। এই প্রাণের পরিচয় কখনও ইহার অন্তরে, কখনও ইহার বাহিরে চিরদিনই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

এ'কথা সত্য যে, পুরাণের পাঁচটি লক্ষণের কিছু কিছু কালক্রমে মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহারা মঙ্গলকাব্যের মূল কাহিনীর সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত কিংবা তাহার অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে নাই—বহিরঙ্গের অনাবশ্যক ভার-স্বরূপই হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক মঙ্গলকাব্য 'দেবখণ্ড' ও 'নরখণ্ড' নামক দুইটি সুস্পষ্ট খণ্ডে বিভক্ত। 'দেবখণ্ড' পুরাণ ও 'নরখণ্ড' কাব্য। প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই পুরাণ ও কাব্য পরস্পর

এই প্রকার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া স্থানলাভ করিয়াছে। কিন্তু পুরাণ পুরাণই, তাহার কাব্যগত কোন পরিচয় নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, পুরাণের প্রেরণা হইতেই মঙ্গলকাব্যের জন্ম হইয়াছিল, কিন্তু শত শত বৎসর অনুশীলনের ফলেও পুরাণ পুরাণই রহিয়া গিয়াছে। কারণ, মানুষের সঙ্গে পুরাণ কখনই কোন সম্পর্ক স্থাপন করে নাই; কিন্তু মানুষের কাহিনী লইয়া সূত্রপাত হইবার ফলে মঙ্গলকাব্য পুরাণের স্তর অতিক্রম করিয়া কাব্যের স্তরে উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু এ'কথাও সত্য যে কাব্যের পথে ইহার ক্রমোন্নয়ন অব্যাহত থাকিতে পারে নাই; মঙ্গলকাব্যের মৌলিক প্রেরণা নিঃশেষিত হইয়া যাইবার ফলে পৌরাণিক আদর্শ ইহাকে কালক্রমে পুনরায় লক্ষ্যচ্যুত করিয়াছিল—তখন কেবল পুরাণের অনুকরণ নহে, পুরাণের অনুবাদও বাংলা সাহিত্যকে ভরাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

পুরাণে-রচনার প্রেরণা হইতেই মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব হইলেও এ'কথা সত্য যে পৌরাণিক আদর্শ কিংবা পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি মঙ্গলকাব্যের কবিদিগের কোনদিনই অটুট নিষ্ঠা প্রকাশ পায় নাই। অর্থাৎ তাঁহারা পৌরাণিক আদর্শ রক্ষা করবিার জন্য কখনও লৌকিক উদ্দেশ্যকে বলিদান করেন নাই। সেইজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, মনসা-মঙ্গলে মহাভারতোক্ত জরৎকারু অতি সহজেই মনসাদেবীতে পরিণতি লাভ করিলেন, চণ্ডীমঙ্গলে যোগীন্দ্র শিব দাম্পত্য জীবনের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীসুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না, শিবমঙ্গলে ত তিনি হাতের ত্রিশূল ভাঙ্গাইয়া লাঙ্গল জোয়াল প্রস্তুত করিতেছেন। অতএব পৌরাণিক আদর্শ মঙ্গলকাব্যের কবিদিগকে কোনদিনই লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। পুরাণের মধ্যে কেবলমাত্র যে কাহিনীই আছে, তাহা নহে—পুরাণ একাধারে স্মৃতিশাস্ত্র ও দর্শন। পুরাণের কাহিনীর দিকটা মঙ্গলকাব্যের উপর কতকটা প্রভাব বিস্তার করিলেও, ইহার যে দিকটায় স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা আছে, মঙ্গলকাব্যের উপর তাহার কোনও প্রভাব অনুভব করা যায় না; অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যের উপর তাহার কোনও প্রভাব অনুভব করা যায় না। অর্থাৎ মঙ্গলকাব্য পুরাণের মত একাধারে আখ্যায়িকামূলক রচনা, স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্র নহে—কেবলমাত্র আখ্যায়িকাই ইহার অবলম্বন। অতএব পুরাণের তত্ত্ব পরিবেশনের যে একটা দাবী আছে, মঙ্গলকাব্য তাহা পালন করিবার দায়িত্ব কোনদিনই গ্রহণ করেন নাই। বাস্তব জীবনের বিশ্লেষণই মঙ্গলকাব্যের লক্ষ্য। পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যের মৌলিক আদর্শ পরস্পর যে কত পৃথক্, ইহা হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। অতএব পুরাণের নিকট হইতে কোন বিষয়ে যদি মঙ্গলকাব্যের ঋণ প্রকাশ পায়, তবে কেবলমাত্রই ইহার আখ্যায়িকা-অংশেই এই ঋণ প্রকাশ পাইতে পারে। আঙ্গিকের দিক হইতেও পুরাণের নিকট মঙ্গলকাব্যের কোন ঋণ নাই, বরং সংস্কৃত কাব্যের নিকট এই বিষয়ে তাহার কিছু ঋণ আছে। সুতরাং পুরাণের উদ্দেশ্য মঙ্গলকাব্য দ্বারা কোন দিন পূর্ণ হইতে পারে নাই—সেইজন্য বাংলার মঙ্গলকাব্য রচিত হইবার জন্য পুরাণরচনার ধারা লুপ্ত হয় নাই। পুরাণরচনার ধারা লুপ্ত হইবার অন্য কারণ আছে—তাহা সমগ্র ভারতবর্ষের

পক্ষেই অভিন্ন, কেবল বাংলাদেশের পক্ষে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কিছু নাই।

হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সংঘাতের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ যেমন সংস্কৃত পুরাণগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল, বাংলাদেশে হিন্দু সমাজের সঙ্গে মুসলমান সমাজের প্রথম সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ তেমনই মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভব হইয়াছিল। প্রাচীনতম সংস্কৃত পুরাণগুলি ছিল ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা-নিরপেক্ষ মানব মাহাত্ম্যকীর্তনমূলক রচনা। পরবর্তী পুরাণের পাঁচটি লক্ষণের পরিবর্তে তাহাদের মধ্যে তখন কেবলমাত্র একটি লক্ষণই ছিল, মানবচরিত্র-মাহাত্ম্য-কীর্তন। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে বীর পুত্রসন্তান লাভ করিবার উদ্দেশ্যে নারীর সীমন্তোন্নয়ন উপলক্ষ্যে মানবচরিত্রের বীরত্ব-কাহিনী কীর্তিত হইত, তাহাই সংস্কৃত পুরাণগুলির ভিত্তি। কালক্রমে ইহার এই মানবচরিত্র-মহিমা-কীর্তন নিতান্ত গৌণ হইয়া পড়িয়া অলৌকিকতাই প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিল। মানবিক সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া একান্ত অলৌকিকতা আশ্রয় করিবার জন্য সংস্কৃত পুরাণগুলি ক্রমে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গেল। মঙ্গলকাব্যের মৌলিক কাহিনীগুলিও অলৌকিকতা-বর্জিত মানবিক কাহিনীমাত্রই ছিল। ক্রমে তাহাও অলৌকিকতা ভারাক্রান্ত হইতে লাগিল সত্য, কিন্তু পুরাণের মত ইহা মানবিক সম্পর্ক একবারে পরিত্যাগ করিল না। পুরাণ তাহার উপলক্ষ্য হইয়া রহিল, মানুষের প্রতি তাহার লক্ষ্য স্থির রহিয়া গেল।

সেনরাজবংশের পতনের পরই এদেশে আর এক বৈদেশিক রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। এই রাষ্ট্রশক্তি এক সম্পূর্ণ নূতন ধর্মমতের পরিপোষক ছিল। তাহা মুসলমান ধর্মমত। এই মুসলমান ধর্মমতের সঙ্গে স্থানীয় লৌকিক ধর্মমতগুলির আদর্শগত বিরোধ এত অধিক ছিল যে, তাহা ক্রমে এই দুই সমাজের মধ্যে এক বিপুল ব্যবধানের সৃষ্টি করিল। রাষ্ট্রপোষিত মুসলমান ধর্মমতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেশের তদানীন্তন আপামর জনসাধারণ আপনাদিগকে অত্যন্ত অসহায় মনে করিতেছিল। তখনই মঙ্গলকাব্যের মৌলিক ধর্ম ও সম্প্রদায়নিরপেক্ষ কাহিনীগুলির মধ্যে এক অলৌকিক দৈবশক্তির পরিকল্পনা করিয়া ঐহিক জীবনের সকল দুঃখদৰ্দশা তাহারই ইচ্ছাধীন বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবার প্রয়াস দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'তখন সমাজের মধ্যে যে উপদ্রব-পীড়ন, আকস্মিক উৎপাত, যে অন্যায়, যে অনিশ্চয়তা ছিল, মঙ্গলকাব্য তাহাকেই দেবমর্যাদা দিয়া সমস্ত দুঃখ অবমাননাকে ভীষণ দেবতার অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিতেছিল এবং দুঃখ-ক্লেশকে ভাঙ্গাইয়া ভক্তির স্বর্ণমুদ্রা গড়িতেছিল। এই চেষ্টা কারাগারের মধ্যে কিছু আনন্দ কিছু সান্ত্বনা আনে বটে, কিন্তু কারাগারকে প্রাসাদ করিয়া তুলিতে পারে না। এই চেষ্টা সাহিত্যকে তাহার বিশেষ দেশকালের বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না।' এই অবস্থায় পরপীড়িত জাতি অল্পকাল মধ্যেই জীবনের সর্বপ্রকার উচ্চতর আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল, নিজের মধ্যে নিজের পরিত্রাণের পথ খুঁজিতে গিয়া সকল রকমে দৈব সহানুভূতির উপর আত্মসমর্পণ করিয়া রহিল। সামাজিক জীবনের এই অবস্থা হইতেই বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির জন্ম হইয়াছিল। বৌদ্ধ ও অন্যান্য নিরীশ্বরবাদী ধর্মের সম্মুখীন হইয়া হিন্দু

সমাজেও একদিন অনুরূপ অবস্থায়ই পুরাণগুলির উদ্ভব হইয়াছিল।

বাংলা দেশে আর্যসভ্যতা স্থাপিত হইবার পূর্বে সাধারণ জনগণের মধ্যে যে ধর্মবিশ্বাস প্রচলিত ছিল, মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সেই সকল ধর্মবিশ্বাসেরই কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। মানব-মনের একটি আদিম বৃত্তি ভয়—মানব-সভ্যতার শৈশবেও সর্বপ্রথম ভয় হইতেই দেবতার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। বাংলার প্রাচীনতম দেব-পরিকল্পনাও এ'দেশের প্রাগৈতিহাসিক আদিম সমাজের এই প্রবৃত্তি হইতেই উদ্ভূত। উন্নত আর্য সমাজ কর্তৃক পরিকল্পিত দেবতাদিগের পরম কারুণিক কল্যাণাদর্শ মঙ্গলকাব্যের নিম্নস্তর সমাজের এই অনুদার ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিদ্বারা সম্যক্ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় নাই। সেইজন্যই মঙ্গলকাব্যের দেবতাগণ নীচ, স্বার্থপর, ক্রূর, প্রতিহিংসাপরায়ণ, অকৃতজ্ঞ ও ছলনাময়। তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধায় ভক্তের মস্তক আপনা হইতে কোনদিন নত হইয়া আসে না, তাঁহাদের মহিমার প্রতি আকর্ষণবশতঃ কেহ তাঁহাদের শরণাপন্ন হয় না, শুধু তাঁহাদের অকারণ নিগ্রহের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া থাকিবার জন্য ভয়ে তাঁহাদের নামোচ্চারণ করে মাত্র। দেবতাদিগেরও এই বিষয়ে সতর্কতার অবধি নাই, কাহার ও এতটুকু অবমাননার প্রতিশোধ লইতে তাঁহাদের মুহূর্তও বিলম্ব হয় না। বাণিজ্য করিয়া বহুদিনের নিরুদ্দিষ্ট সদাগর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছে শুনিয়া কোন মিলনোৎসুক পরিজন যদি দেবতার প্রসাদ অভুক্ত রাখিয়া আগ্রহাতিশয্যে সেই পথের দিকে ধাবমান হয়, তাহা হইলে প্রবাসী সদাগর আর গৃহপ্রত্যাগত হইতে পারিবে না; ঘাটের পাষাণে ঠেকিয়া হইলেও ভরাডুবি হইবে,—দেবতা তাঁহার প্রসাদের অবমাননার প্রতিশোধ-স্বরূপ সেই নিরপরাধ সদাগরের প্রাণ লইতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। কিন্তু এই আশুতোষ দেবতাদিগের এমনই মহিমা যে, যদি অনুতপ্ত ভক্ত পুনরায় গিয়া সেই পরিত্যক্ত প্রসাদ মাটি হইতে তুলিয়া শ্রদ্ধাসহকারে আহার করে, তন্মুহূর্তেই সেই সদাগর বাঁচিয়া উঠিবে। সামান্য অমর্যাদা হইতে আত্মরক্ষার্থে মঙ্গলকাব্যের দেবতাদিগের এত সতর্কতা হইতে কি ইহাই মনে হয় না যে বস্তুতঃ সেকালের সমাজে কোন মর্যাদারই তাঁহারা অধিকারী ছিলেন না? মঙ্গলকাব্যের প্রত্যেক দেবতাই একান্ত অনিচ্ছুক ভক্তের নিকট হইতে এক প্রকার জোর করিয়া পূজা আদায় করিয়া তারপর ছাড়িয়াছেন—স্বেচ্ছায় ভক্তিপরায়ণ হইয়া কেহই বড় তাঁহাদের পূজা করে নাই। শক্তির যথেচ্ছ প্রয়োগ দ্বারা সমাজকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া, স্বপ্নদ্বারা নির্যাতনের হুমকি দেখাইয়া, নানা চক্রান্তে সমুদ্যত দণ্ড হস্তে তাঁহারা নিজেদের পূজা আদায় করিয়াছেন। কিন্তু এই শক্তিদ্বারা আর কিছু করিতে পারা গেলেও অন্ততঃ সমাজের হৃদয় জয় করিতে পারা যায় না। বিভীষিকার আতঙ্ক ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু স্বভাবজ ভক্তি চিরস্থিরা। মঙ্গলকাব্যের দেবতাদিগের প্রতি নব সংস্কার-দীক্ষিত হিন্দু সমাজের এই ভয়ের অস্তিত্ব থাকিলেও কোন কালেই শ্রদ্ধার লেশমাত্রও যে অস্তিত্ব ছিল না, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। শ্রদ্ধা গুণটি মানবের উচ্চতর বৃত্তি-সম্ভূত, কিন্তু যে স্তরের সমাজ-মন হইতে মঙ্গলকাব্যের দেব-পরিকল্পনা সম্ভব হইয়াছিল, তাহার মধ্যে শ্রদ্ধার মত উচ্চতর চরিত্রগুণের

অস্তিত্ব থাকিবার কথা নহে।

কিন্তু এই বিষয়েও কোন কোন মঙ্গলকাব্যোক্ত দেবতার কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। কোন কোন মঙ্গলকাব্যের দেবতা যেমন কাব্যের নায়কের সঙ্গে বিরোধের ভিতর দিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তেমনি আবার দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন মঙ্গলকাব্যের দেবতার সঙ্গে কাব্যের নায়কের কোন বিরোধ নাই। বরং দেবতাদিগের আশীর্বাদ ও সহায়তাই তাহাদের জীবনের সর্ববিধ সাফল্যের মূল। এই শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যের দেব-চরিত্রে নিম্নশ্রেণীর সমাজভুক্ত মানবোচিত দুর্বলতা নাই, উন্নত আর্য দেব-পরিকল্পনার আদর্শে তাঁহাদিগেরও পরম কারুণিক কল্যাণাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। বলাই বাহুল্য যে, মঙ্গলকাব্যের এই শ্রেণীর দেব-পরিকল্পনা পরবর্তী কালে উদ্ভূত হইয়াছিল— তখন পৌরাণিক আদর্শের প্রভাব তাহাদের উপর বিস্তৃত হইয়াছে। পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যের দেবতাদিগের প্রকৃতির সঙ্গে পুরাণ প্রভাবিত মঙ্গলকাব্যের দেবতাদিগের প্রকৃতিগত পার্থক্যের ইহাই কারণ।

।। ১১ ।। লৌকিক ধর্ম ও মঙ্গলকাব্য

বাংলার লৌকিক ধর্মের উপর একটা পৌরাণিক আভিজাত্য আরোপ করা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। মঙ্গলকাব্য-বর্ণিত দেবচরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে উপরে যে আলোচনা করা হইল, তাহার সঙ্গে পৌরাণিক দেবদেবী চরিত্রের মৌলিক পার্থক্যের জন্যই এই প্রয়াস প্রায় সর্বত্রই ব্যর্থ হইয়াছে। এই সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। লৌকিক দেবতাদিগের মধ্যে শিব সর্বপ্রাচীন। ইহার কারণ, পৌরাণিক দেবদেবীদিগের মধ্যে শিবকেই সর্বপ্রথম বাংলার লৌকিক ধর্মমতগুলির প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসিতে হয়। দাক্ষিণাত্যের তামিল অঞ্চলেও লৌকিক ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সম্মুখীন হওয়ায় অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই বিষয়ে উল্লিখিত হইয়াছে, '...there has been a strong tendency in the Tamil country, where Brahmin influence is strong, to connect the old village deities with the Hindu pantheon, and especially with the God Siva, the most popular deity in South India.'[১]

বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের অবসানের পর হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগে সম্পূর্ণ অনুরূপ অবস্থারই উদ্ভব হইয়াছিল। দেশের সাধারণ সমাজ হিন্দু পৌরাণিক শিব-চরিত্রকে নিজেদের জাতীয় আদর্শে পুনর্গঠন করিয়া লইয়াছিল। তাহার ফলে এ দেশে শিব-চরিত্রের পুরাণ-বহির্ভূত এক অভিনব পরিচয় প্রকাশ পাইল। এই শিব বাঙ্গালীর নিজস্ব সৃষ্টি, এক সম্পূর্ণ আভিজাত্যহীন বাংলার কৃষকের লৌকিক দেবতা। বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ,—খনার বচন বলিয়া পরিচিত বাংলার প্রাচীনতম প্রবচনগুলি যেমন কৃষিবিষয়ক, তেমনই বাংলার

১। H. Whitehead, *The village Gods of South India*, Calcutta 1921 p. 133

প্রাচীনতম দেবতাও এই দেশের কৃষিপ্রধান অঞ্চলসমূহে কৃষিকার্যেরই সহায়করূপে কল্পিত হইয়াছেন। বাংলার লোক-সাহিত্যেও এই শিবের চরিত্র নিতান্ত সাধারণ-বুদ্ধি গ্রাম্য কবির স্থূলসৃষ্টি। কোন কোন মঙ্গলকাব্যে তাঁহার উপর পৌরাণিক প্রভাব আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার পৌরাণিক ও লৌকিক চরিত্রের মধ্যে যে কেবলমাত্র সামঞ্জস্যের অভাব ঘটিয়াছে, তাহা নহে—প্রায় সর্বত্রই জাতীয় আদর্শের নিকট পৌরাণিক আদর্শ ম্লান হইয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত রামেশ্বর ভট্টাচার্য-কৃত শিব-মঙ্গল কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিব কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে বিশ্বকর্মাকে দিয়া তাঁহার হাতের ত্রিশূল ভাঙ্গাইয়া জোয়াল, কোদাল, ফাল ইত্যাদি চাষের সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন—

ঈশ্বরীর ইচ্ছায় বিশাই পায় পড়ে।
লাঙ্গল জোয়ালি মই সদ্য দিল গড়ে।।
পূর্বে পরামর্শ ছিল পার্বতীর সাথে।
শূলে হ'তে শূলী শূল দিল তার হাথে।।
শাল পাতি শূল ভাঙ্গি সজ্জা কর বসি।
জোয়ালি কোদাল ফাল দা উখুন পাশী।।
তৌলে ক'রে শূলে ধরে তৌলিল তখন।
ঠিক সারা হৈল খাড়া দু'শ দশ মণ।।
কায় কত দিব? দিবে যার যত সয়।
বিবরিয়া বিশ্বকর্মা বিশ্বনাথে কয়।।
পাঁচ মণে পাশী করি আশী মণে ফাল।
দু মণের দু জলুই অর্ধেকে কোদাল।।
দশ মণের দা অষ্ট মনের উখুন।
দু'শ দশ মণ দেখ করিয়া একুন।।
বুঝে পশুপতি অনুমতি দিলা তারে।
বিশাই বসাইল শাল শিবের গোচরে।।'

এইভাবে কৈলাসেশ্বর শিব শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমিতে পদার্পণ করিয়া কৃষিবৃত্তিদ্বারা জীবিকা অর্জন করিতে লাগিলেন। ইহার অর্থ এই যে, পৌরাণিক আদর্শের উপর বাঙ্গালীর জাতীয় আদর্শ জয়লাভ করিল।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রধানতঃ বৌদ্ধ পালরাজদিগের রাজত্বকালে নাথ সম্প্রদায় নামক এক স্বতন্ত্র ধর্মসম্প্রদায় এ'দেশে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। এই ধর্মসম্প্রদায়ের বিভিন্ন লোকশ্রুতি অবলম্বন করিয়া পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে নাথসাহিত্য নামে এক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক (sectarian) সাহিত্য রচিত হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য, তাহার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের কোন সংস্রব নাই। কারণ, নাথসাহিত্যে সিদ্ধাচার্য কিংবা তাঁহাদিগের শিষ্যা ও শিষ্যদের অলৌকিক জীবনবৃত্তান্ত এবং তাঁহাদের অপার্থিব কার্যকলাপেরই বর্ণনা করা হইয়াছে। অলৌকিকতার বর্ণনায় এই বিশিষ্ট প্রকৃতির সাম্প্রদায়িক সাহিত্য এত ভারাক্রান্ত যে, ইহার মধ্যে বাংলার কোন জাতীয় চিত্র প্রবেশ লাভ করিবার সুযোগ পায় নাই। তবে বাংলার শিব দেবতাটির লৌকিক রূপের সঙ্গে ইহাতেও পরিচয় লাভ করা যায়। নাথধর্ম সম্ভবতঃ বাংলার বাহিরেই উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা এই দেশে আসিয়া প্রসার লাভ করিবার পূর্ব হইতেই এ'দেশের সমাজে এক কৃষকরূপী লৌকিক শিব দেবতার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া মনে হয়। তারপর নাথধর্ম এ'দেশেব সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রচলিত হইবার পর তাহা এতদ্দেশীয় লৌকিক শৈব ধর্মের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গেল। ফলে, বাংলার মঙ্গলকাব্যসমূহ নাথধর্ম-পরিকল্পিত শিব-চরিত্র দ্বারাও কতকটা প্রভাবিত হইয়াছে। সেনরাজত্বের প্রতিষ্ঠার পর হইতেই এই দেশীয় সমাজের উপর যখন হিন্দুধর্মের প্রভাব প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল, তখনই বাংলার সমাজে কৃষক শিবের পরিবর্তে পৌরাণিক শিবের শান্ত সমাহিত মূর্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইল—তখন তিনি বিশেষ হইতে নির্বিশেষে উন্নীত হইয়া গেলেন।

প্রাচীনতম কালে শিব বাঙ্গালী কৃষকের সাহচর্যে আসিয়া যে কর্মতৎপরতা দেখাইয়াছেন, উচ্চতর সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া তৎপরবর্তী যুগেই তিনি ইহার ব্যতিক্রম দেখাইতে লাগিলেন। তখন তিনি আর কৃষকের দেবতা নহেন, বরং পৌরাণিক দেবাদিদেব,—হিন্দু সমাজের Supreme Deity বা পরমেশ্বরের সন্নিকটবর্তী স্থান লাভ করিয়াছেন। তাহারই ফলে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতেই সাধারণ সমাজের মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয়—দেশের লৌকিক সাহিত্যেও তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই যুগে তুর্কী বিজয়ের জন্য বাংলার সামাজিক জীবনের উপর যে তী[illegible]ক বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার মধ্যে নিষ্ক্রিয় দেবতা সম্পর্কিত কোন দার্শনিক বিলাসের অবকাশ ছিল না। এই সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, 'বস্তু সাংসারিক সুখ দুঃখ বিপৎ সম্পদের দ্বারা নিজের ইষ্ট দেবতার বিচার করিতে গেলে, সেই অনিশ্চয়তার কালে শিবের পূজা টিকিতে পারে না। অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার তরঙ্গ যখন চারিদিকে জাগিয়া উঠিয়াছে, তখন যে দেবতা ইচ্ছা-সংযমের আদর্শ তাঁহাকে সাংসারিক উন্নতির উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দুর্গতি হইলেই মনে হয়, আমার নিশ্চেষ্ট দেবতা আমার জন্য কিছুই করিতেছেন না, ভোলানাথ সমস্ত ভুলিয়া বসিয়া আছেন। চণ্ডীর উপাসকেরাই কি সকল দুর্গতি এড়াইয়া উন্নতি লাভ করিতেছিলেন? অবশ্যই নহে। কিন্তু শক্তিকে দেবতা করিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে ভুলাইবার উপায় থাকে। শক্তিপূজক দুর্গতির মধ্যেও শক্তি অনুভব করিয়া ভীত হয়, উন্নতিতেও শক্তি অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। আমারই প্রতি বিশেষ অকৃপা ইহার ভয় যেমন আত্যন্তিক, আমারই প্রতি বিশেষ দয়া ইহার আনন্দও তেমনি অতিশয়। কিন্তু যে দেবতা বলেন, সুখ দুঃখ, দুর্গতি সদগতি ও কিছুই নয়,

ও কেবল মায়া, ও দিকে দৃক্‌পাত করিও না, সংসারে তাঁহার উপাসক অল্পই অবশিষ্ট থাকে;— সংসার মুখে যাহাই বলুক, মুক্তি চায় না, ধনজনমান চায়। ধনপতির মত ব্যবসায়ী লোক সংযমী সদাশিবকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিল না, বহুতর নৌকা ডুবিল, ধনপতিকে শেষকালে শিবের উপাসনা ছাড়িয়া শক্তি-উপাসক হইতে হইল।'[১]

এই উক্তি কবি-কল্পনামাত্র নহে, ইহা উচ্চতর সমাজ-বিজ্ঞান-সম্মত। একজন প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ্ বলিয়াছেন, 'That primitive worship has primarily a practical aim is seen from the fact that the lower peoples generally worship only those spirits or deities who are supposed to influence human affairs. The real reason why the Supreme Beings are not, as a rule, worshipped, is their indifference to the course of nature and the life of man.[২] অর্থাৎ আদিম জাতির ধর্মোপাসনার একটি বাস্তব উদ্দেশ্য আছে; সেইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে-সকল উপদেবতা কিংবা দেবতা মানুষের ব্যবহারিক ব্যাপারে লিপ্ত বলিয়া মনে করা হয়, নিম্নশ্রেণীর লোক সাধারণতঃ তাঁহাদেরই উপাসনা করিয়া থাকে। পরমেশ্বর প্রকৃতির দেবতার যে তাহাতে আরাধনার কোন ব্যবস্থা নাই, তাহার প্রকৃত কারণ এই যে, এই প্রকৃতির দেবতা প্রাকৃতিক নিয়ম ও মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রতি উদাসীন। অতএব নিশ্চেষ্ট ও ভক্তের ঐহিক দুঃখে উদাসীন পরমেশ্বর প্রকৃতির দেবতা (Supreme Being) শিবের বিরুদ্ধে আদিম ধর্ম-প্রবৃত্তিজাত শক্তিদেবতার আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনী লইয়াই মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব হয়।

বাংলার লৌকিক শক্তিধর্ম বাংলার নিজস্ব জাতীয় উপাদানে গঠিত এক অভিনব অধ্যাত্মবোধ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, ইহার সঙ্গে পৌরাণিক শক্তিবাদ কিংবা হিন্দু বা বৌদ্ধ তন্ত্রের কোন সম্পর্ক নাই। ইহাতে আত্মশক্তির উদ্বোধনের কোন কথা নাই, বরং প্রতি পদে বিভীষিকাময়ী শক্তির নিকট আত্মশক্তির বলিদানের কথা আছে। ভারতীয় শক্তিধর্মের একটি মূল কথা দুর্বলের শক্তিসাধনা—দেবতাকে শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপিণী বলিয়া কল্পনা করিয়া ভক্ত তাঁহার সাযুজ্য দ্বারা নিজের মধ্যে সেই শক্তির উদ্বোধন করিয়া থাকে। কিন্তু নিম্নতর জাতির শক্তি-দেবতা বিভীষিকাময়ী মাত্র, তাহারে সহিত সাযুজ্যের কল্পনা ত দূরের কথা, তাহার নিকট হইতে আত্মগোপন করিয়া চলাই বরং সমাজের লক্ষ্য। এই আত্মগোপনের প্রবৃত্তি ভয় হইতে জাত, ভক্তি হইতে নহে।

বাংলার লৌকিক শাক্তধর্ম এ'দেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগের দানবপূজারই পরবর্তী সংস্করণ হইলেও কালক্রমে কতগুলি নূতন বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিল। আদিম সমাজের দানবচরিত্রের মত বাংলার লৌকিক শাক্ত দেবচরিত্রসমূহ সমাজ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া

১। সাহিত্য (১৩০৭), ১৪৪

২। R. Karsten. *The Origins of Religion* (London, 1935) p. 20

পরিকল্পিত হয় নাই। যে সকল আদিম সমাজে দানব-পূজা (Devil-worship) প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে আরাধ্য দানবকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কদাচ অনুভব করা হয় না। সেইজন্য এই সকল চরিত্রের মধ্যে অতিরিক্ত অতিপ্রাকৃতবাদ (Supernaturalism) আসিয়া পড়ে। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলার লৌকিক দেবচরিত্রসমূহ প্রাগৈতিহাসিক যুগের দানবচরিত্রের উগ্রতা ও অতিপ্রাকৃততা পরিহার করিয়া বহুলাংশে মানবিক বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। পূজ্য ও পূজকের পার্থক্য এখানে অনেক সময় ঘুচিয়া গিয়াছে। যে প্রকৃতিরই দেবতা হউক, তাহাকে মানুষের স্তরে নামাইয়া লওয়া বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক সাধনার একটি জাতীয় বৈশিষ্ট্য। সেইজন্যই ভয়ঙ্কর বলিয়াও যে সকল দেবতার এখানে কল্পনা করা হয়, তাহারাও সমাজের কোন বাস্তব খল-চরিত্রের উপর ভিত্তি করিয়া পরিকল্পিত হইয়া থাকে। এইজন্যএ এই দেবতাদিগকে লইয়া রচিত কাব্যসমূহের মধ্যে বাঙ্গালীরই জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালী জাতিরই একটি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বলিতে হইবে, নতুবা দাক্ষিণাত্যের কোন লৌকিক দেবতার সঙ্গে সেখানকার কোন সমাজেরই এই যোগ অনুভব করা যায় না।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর হইতেই বাংলার সমাজের উপর ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিতে থাকে। তাহার ফলে তাহার দেবচরিত্রসমূহ পৌরাণিক আদর্শ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে থাকে। সেইজন্য পরবর্তী দেবচরিত্রসমূহ পূর্ববর্তী দেবচরিত্র হইতে অনেকাংশে স্বতন্ত্র। এমন কি, অনেক দেবতা সমাজের লৌকিক ভিত্তির পরিবর্তে প্রত্যক্ষভাবে পুরাণ হইতেই আসিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সকল দেবচরিত্রে বাঙ্গালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত হইবার অবকাশ পায় নাই এবং তাহাদিগকে লইয়া যে সকল আখ্যানকাব্য রচিত হইয়াছে, তাহা পুরাণের বঙ্গানুবাদ ব্যতীত আর কোন সাহিত্যিক মর্যাদালাভের অধিকারীও নহে।

কিন্তু একটা বিষয় এখানে লক্ষ্য করা যায়—নব আর্য সংস্কারদীক্ষিত পুরুষ যখন ক্রমাগতই পুরাণানুগ ধর্মের প্রতি অধিকতর আসক্ত হইতেছিলেন, তখনও রক্ষণশীল স্ত্রীসমাজের মধ্যে লৌকিক দেবদেবীর পূজার প্রচলন অক্ষুণ্ণ ছিল। সেই ধারারই অনুসরণ করিয়া আধুনিক বাংলার স্ত্রীসমাজে বিবিধ ব্রত ও পার্বণগুলি প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। সেইজন্য ইহাদের মধ্যে বাংলার আদিম ধর্মের কতকগুলি মূল্যবান উপকরণ প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। যে যুগে সর্বপ্রথম বাংলার পুরুষ ও নারীর আধ্যাত্মিক আদর্শ দুই স্বতন্ত্র ধারায় পৃথক্ হইয়া যায়, প্রকৃতপক্ষে সেই যুগেই মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভব হয়। সেইজন্যই কাব্যের নায়কের সঙ্গে নায়িকার আধ্যাত্মিক আদর্শ লইয়া সর্বদাই বিরোধের কথা বলা হইয়াছে। নারী তাহার দুর্বল হৃদয়ে প্রচলিত প্রথাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছে, আর পুরুষ নূতন আদর্শের মোহবশতঃ তাহা বারবারই পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু বাংলার বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে বাংলার লৌকিক দেবদেবীগণের উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া, পরবর্তী কালে বাংলার সমাজের উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্মের সমুচ্চ মন্দিরেও ইঁহাদের জন্য কিঞ্চিৎ

স্থান দান করিবার প্রয়োজন হইল।

বাংলার লৌকিক দেবদেবীগণের উদ্ভবের সম্ভাবিত ইতিহাস এই গ্রন্থের যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে; কারণ, মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ইঁহাদের উদ্ভবের ইতিহাসের সঙ্গেও জড়িত। তবে একটি কথা ইঁহাদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রণিধানযোগ্য এই যে, এই সকল লৌকিক দেবতা নিজের বৈশিষ্ট্য বেশীদিন রক্ষা করিতে পারেন নাই। কারণ, এই দেশে এই সকল সঙ্কীর্ণতা মূলক সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের উপর দিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের কূলপ্লাবিনী বন্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে এই সমাজে প্রায় সমগ্র সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের বৈষম্যের মূল শিথিল হইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে কল্পিত রাধিকার মাধুর্য শাক্ত চণ্ডীর উগ্রতাকে নমনীয় করিয়া দিয়া ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর মনে আগমনী-বিজয়া গানের ঝঙ্কার তুলিয়া দিয়াছে; নৃমুণ্ডমালিনী খর্পরধারিণী কালিকামূর্তি ভক্ত রামপ্রসাদের ভাব-কল্পনায় অপূর্ব স্নেহশালিনী মাতৃমূর্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজন্য পরবর্তী মঙ্গলকাব্যসমূহে বাংলার সমসাময়িক সামাজিক ইতিহাসের কোন ইঙ্গিত অপেক্ষা একটা চিরাচরিত পর্যুষিত প্রথারই নিয়মিত অনুকৃতি মাত্র দেখিতে পাই। সে সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় উদ্দেশ্য লইয়া খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে এই মঙ্গলকাব্যগুলির রচনা আরম্ভ হইয়াছিল, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই প্রায় সেই উদ্দেশ্য পরিত্যক্ত হইয়া যায়। তখন হইতেই মঙ্গলকাব্য সাম্প্রদায়িকতামুক্ত হইয়া একটা বিশিষ্ট সাহিত্য রচনার আদর্শমাত্র হইয়া দাঁড়ায়। সেইজন্য বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলির যে একটা বিশেষ মূল্য আছে, ইহার পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলির সেই মূল্য অপেক্ষাকৃত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচিত হইবে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের দুইটি মৌলিক ধারা—একটি বৈষ্ণব কাব্যের ধারা ও অপরটি মঙ্গলকাব্যের ধারা। বৈষ্ণবকাব্য একান্ত আত্মকেন্দ্রিক ভাবের বাহন, কিন্তু মঙ্গলকাব্য সম্পূর্ণ আত্মনিরপেক্ষ ও বাস্তবধর্মী। বৈষ্ণব ও শাক্তের জীবনদর্শনের পার্থক্যই যে তাঁহাদের কাব্যাদর্শের মধ্যেও এই পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রত্যেক দেশের মতই বঙ্গদেশেও ধর্মকে আশ্রয় করিয়াই সর্বপ্রথম সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সেইজন্যই প্রথম অবস্থায় ইহা সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবের ফলে কালক্রমে সেই ভাব যখন মঙ্গলকাব্য হইতে কতকটা হ্রাস পাইয়া আসিল, তখনই ইহাদের প্রকৃত সাহিত্যিক মূল্যও রসিক-সাধারণের কাছে ধরা পড়িল। বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার বহুকাল পর পর্যন্তও মঙ্গলকাব্যই এই দেশের উচ্চতর হিন্দুসম্প্রদায়ের কবি-প্রতিভা বিকাশের একমাত্র অবলম্বন ছিল। সেইজন্যই পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে আমরা বাংলার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবি-মনের পরিচয় পাই।

।।১২।। বৈষ্ণব ধর্ম ও মঙ্গলকাব্য

শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া বাংলার জাতীয় সাহিত্য রচনার প্রয়াস সার্থক হইলেও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়া যে কেন তাহা সম্ভব

হইল না, তাহাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সমগ্রভাবে বাংলার সমাজকে পরিহার করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম আত্মকেন্দ্রিক (individualistic) যে স্বতন্ত্র ধর্মের আদর্শ গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহার প্রেরণা লইয়া সমগ্র জাতির কাব্য তাহার পক্ষে রচনা করা সম্ভব হয় নাই। বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম যেমন আত্মভাবমূলক ধর্ম, তেমনি তাহার সাহিত্যিক বিকাশও আত্মভাবপরায়ণ (subjective) সাহিত্যের মধ্য দিয়াই সার্থক হইয়াছে। ইহার ফলে বাংলার অপূর্ব বৈষ্ণব গীতিকবিতাগুলির জন্ম হইয়াছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে শাক্তগণ যেমন মঙ্গলকাব্য রচনার ভার লইয়াছিলেন, তেমনই বৈষ্ণব সম্প্রদায় আর এক স্বতন্ত্র প্রকৃতির সাহিত্য-বস্তু সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাই গীতিকাব্য। অতএব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাহিত্য-সৃষ্টির আবেগ গীতিকাব্য রচনার দিকে প্রবাহিত হওয়াতেই জাতীয় কাব্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রয়াস নগণ্য হইয়া রহিয়াছে। তবে একথাও সত্য যে, কোন কোন বৈষ্ণব কবি চৈতন্য-জীবন-চরিত রচনার মধ্য দিয়া জাতীয় কাব্য রচনা করিবার মত শক্তির অস্তিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এই সম্পর্কে 'চৈতন্য-ভাগবতে' কোন জাতীয় বাস্তব চরিত্রের সৃষ্টির প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই ইহাকে জাতীয় কাব্যের মর্যাদা দেওয়া যায় না। ইহার প্রত্যেকটি চরিত্রের সৃষ্টিই আধ্যাত্মিক আদর্শ-প্রণোদিত। ইহাতে চৈতন্য-চরিত্রের বাস্তব দিক অপেক্ষা তাঁহার জীবনের অলৌকিক দিকের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। মানুষ চৈতন্য হইতে দৃষ্টি সরাইয়া কবি অবতার চৈতন্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ফলে, এই সকল কাব্যে মানবতাবোধের একান্ত অভাব দেখা যায়; তবে কোন কোন স্থানে ইহার বাস্তব রূপও যে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও সমগ্রভাবে ইহার কোন চরিত্রই জাতীয় কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। বৈষ্ণব-চরিতকাবদিগের আধ্যাত্মিক বুদ্ধি জাতীয় কাব্য রচনার সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ, যে বাস্তবতার প্রতি সহানুভূতি জাতীয় কাব্যের একটি বিশিষ্ট গুণ, সেই বাস্তবতার প্রতিই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদিগের নিদারুণ বিতৃষ্ণা। তাঁহাদের আদর্শে ঐহিক সংসার কিছুই নহে, একমাত্র পারত্রিক কল্যাণই জীবনের লক্ষ্য; কতকগুলি আচারই জীবনের সর্বস্ব, গার্হস্থ্য জীবন অর্থহীন—জীবনের প্রতি এই মনোভাব বর্তমান থাকিলে জাতীয় কাব্যের সৃষ্টি যে সার্থক হইতে পারে না, তাহা বিস্তৃত করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। এইজন্যই দেখিতে পাই যে, উচ্চশ্রেণীর কবি-গুণ থাকা সত্ত্বেও কোনও বৈষ্ণব চরিত-গ্রন্থই জাতীয় কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে নাই। এমন কি বৃন্দাবনদাসের মধ্যে যে প্রকৃত কবিজনোচিত গুণটুকু দেখা গিয়াছিল, তাহাও তাঁহার পরবর্তী আর কোন বৈষ্ণব-চরিতকারের মধ্যে দেখা যায় নাই।

বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিতর দিয়া বাংলার তদানীন্তন বৈষ্ণব সম্প্রদায় যখন ঐহিক জীবনের সম্বন্ধে নিদারুণ উপেক্ষার ভাব প্রচার করিতেছিলেন, তখনই শাক্ত কবিগণ মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্য দিয়া ঐহিক জীবনের প্রতি চরম আসক্তির বাণী প্রচার করিতেছিলেন। মঙ্গলকাব্যের শাক্ত কবিগণ তাঁহাদের কীর্তিতমহিমা দেবতাদের নিকট হইতে ঐহিক জীবনের সুখসমৃদ্ধির বর প্রার্থনা করিয়া লইয়াছেন;—পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য, সুন্দরী ভার্যা অর্থাৎ ঐহিক জীবনের

সমৃদ্ধির যাবতীয় উপকরণই তাঁহাদের কাম্য ছিল। তাঁহাদের কামনার মূল সুরটি ভারতচন্দ্রের একটি ছত্রের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে; 'অন্নদামঙ্গলে'র ঈশ্বরী পাটনী অন্নদার কাছে বর চাহিতেছেন,

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'

মোক্ষ নহে, স্বর্গ নহে, পারত্রিক কোন কল্যাণ নহে, ঐহিক জীবনের নশ্বর সুখসমৃদ্ধিই এখানে দেবতার কাছে পরম কাম্য বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব আদর্শের সঙ্গে এখানেই মঙ্গলকাব্যের শাক্ত কবিদিগের আদর্শের মূল বিরোধ। মধ্যযুগের বাংলার সমাজে বৈষ্ণব ধর্ম যেমন বৈরাগ্যের বাণী শুনাইয়াছে, তেমনি অপর পক্ষে মঙ্গলকাব্যবর্ণিত লৌকিক শাক্তধর্ম পরম সংসারাসক্তির গুণগান করিয়াছে। ভোগের ভিতর দিয়া সাধনাই ছিল মঙ্গলকাব্যের আধ্যাত্মিক বাণী। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'—ইহাই মঙ্গলকাব্যের ভোগ-দর্শনের স্বরূপ।

এক হিসাবে বৈষ্ণবকাব্যকে মঙ্গলকাব্যের পরিপূরক (complement) বলা যাইতে পারে। বাংলার সমাজের ব্যক্তি-হৃদয়ের যে আবেগ মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে স্তম্ভিত হইয়া ছিল, তাহাই বৈষ্ণব কাব্যের শতমুখী ধারায় স্বতঃস্ফূর্ত হইয়াছে। একদিকে মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে যেমন মধ্যযুগের বাংলার সমষ্টিজীবন প্রতিফলিত হইয়াছে, তেমনি আর এক দিক দিয়া বৈষ্ণব কবিতায় ব্যষ্টি হৃদয়ের একান্ত সুখদুঃখের অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে যে ভাব-রসের অভাব ছিল, বৈষ্ণব সাহিত্য তাহা পূর্ণ করিয়াছে এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে যে ভাব-রসের অভাব ছিল, তাহা মঙ্গলকাব্য পূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু ইহাতে পরস্পরের প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব ছিল বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য পরস্পরকে কতখানি প্রভাবিত করিয়াছে, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই প্রভাব কেবল বহিরঙ্গগত এবং বিচ্ছিন্ন মাত্র—একের প্রভাব অন্যের মর্মমূলে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কারণ ইহাদের পরস্পরের আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী। তবে মঙ্গলকাব্যের মধ্যে যতদিন আদর্শগত শৈথিল্য দেখা দেয় নাই, ততদিন পর্যন্তই পরস্পরের স্বাধীন বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহার আদর্শ যখন শিথিল হইয়া আসিল, তখন ইহার উপর বৈষ্ণব আদর্শের প্রভাব দুর্জয় হইয়া উঠিল, সে কথা অন্যত্রও উল্লেখ করিয়াছি। অতএব কেবলমাত্র মঙ্গলকাব্যের আদর্শগত অধঃপতনের যুগের নিদর্শন দেখিয়াই এই সিদ্ধান্ত করা সমীচীন হয় না যে, 'এই দুইটি কাব্যধারার অন্তর্নিহিত সত্যপ্রেরণা বহুলাংশে অভিন্ন।' মঙ্গলকাব্যের ভক্তি ও বৈষ্ণবীয় জীবনাদর্শের ভক্তির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। দ্রোহবুদ্ধি এবং অবিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে জয় করিয়া যে মঙ্গলকাব্যের ভক্তিবিশ্বাসের জন্ম হয়, তাহা নহে—ভয় হইতে যে ভক্তির জন্ম, তাহার মধ্যে দ্রোহবুদ্ধি ও অবিশ্বাস প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে মাত্র, কখন সম্পূর্ণ দূর হইয়া যাইতে পারে না; কিন্তু বৈষ্ণবীয় জীবনাদর্শজাত ভক্তি অহৈতুকী ভক্তি, কোনও

বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া ইহার জন্ম হয় না, সেইজন্য ইহা যেমন পবিত্র নির্মল তেমনই চিরস্থায়ী। অতএব বৈষ্ণব সাহিত্যের বহিরঙ্গগত কোনও প্রভাব মঙ্গলকাব্যের উপর কার্যকর হইলেও, ইহাদের অন্তর্নিহিত ভক্তির অনুভূতিতে ইহারা পরস্পর সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাবে রচিত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন, 'সমাজের চিত্ত যখন নিজের বর্তমান অবস্থাবলম্বনে বদ্ধ থাকে এবং সমাজের চিত্ত যখন ভাব-প্রাবল্যে নিজের অবস্থার ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়, এই অবস্থায় সাহিত্যের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক।' অতএব ইহাদের 'অন্তর্নিহিত সত্যপ্রেরণা'তে যে সুদূর পার্থক্য থাকিবে তাহাও নিতান্তই স্বাভাবিক।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য মানবতার জয়গানে মুখর। কৃষ্ণলীলার একান্ত আধ্যাত্মিক বিষয়কে কেন্দ্র করিয়াও বৈষ্ণব কবিগণ পরোক্ষে মানবতারই জয়গান গাহিয়াছেন; খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অজয়ের তীরে বাংলার আদি কবির কণ্ঠে যে সুর সর্বপ্রথম ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহাই পরবর্তী প্রায় পাঁচ শত বৎসর ব্যাপিয়া প্রতি বৈষ্ণব কবির কণ্ঠে অনুরণিত হইয়াছে। 'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে' যে বৈষ্ণবের গান নয়, তাহা বাঙ্গালী কবি অতি সহজেই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। মঙ্গলকাব্যে এই মানবিকতার অনুভূতি আরও প্রত্যক্ষ। বৈষ্ণব কবিতায় দেবতাকে বাদ দিয়া মানুষ নহে, বরং এই দুই-ই সেখানে অভিন্ন হইয়া দেখা দিয়াছে এবং তাহার ফলে মানুষ পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তাহাতে সুপরিস্ফুট হইতে পারে নাই—তাহার একটি বিশেষ অংশ শুধু সমুজ্জ্বল হইয়া আছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে প্রাতিটি মানুষ পূর্ণাঙ্গ তাহার দেহের মালিন্য পর্যন্ত তাহাতে প্রত্যক্ষ। শুধু তাহাই নহে, এই মলিনতা লইয়া মানুষ সেখানে তথাকথিত দেবতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে। মঙ্গলকাব্যে মানুষই লক্ষ্য দেবতা উপলক্ষ্য মাত্র; কিন্তু বৈষ্ণব কবিতায় দেবতা লক্ষ্য, মানুষ উপলক্ষ্য। সার্বজনীন মানবতার ভিত্তির উপরই মঙ্গলকাব্যের কাব্যধর্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে

।।১৩।। চরিতকাব্য ও মঙ্গলকাব্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের ভাবেই আর এক শ্রেণীর পাঁচালী প্রচলিত ছিল, তাহা চরিতকাব্য নামে পরিচিত। চৈতন্যদেব এবং তাঁহার পার্ষদ বিশেষত নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, গদাধর ইঁহাদের জীবন-চরিত অবলম্বন করিয়াই মূলত ইহারা রচিত হইয়াছে. এবং ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই প্রত্যেকের ভগবত্তা প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস দেখা যায়। সেই সূত্রেই চৈতন্যজীবনী অবলম্বন করিয়া জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' বা 'চৈতন্যভাগবত', অদ্বৈতাচার্যের জীবনচরিত অবলম্বন করিয়া 'অদ্বৈত-মঙ্গল' ইত্যাদি রচিত হয়। বৈষ্ণব চরিতকাব্যগুলি রচিত হইবার পূর্বেই শক্তি কবিগণের রচিত মঙ্গলকাব্য সমাজে একটি বিশিষ্ট আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে ইহাদের প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল, সেই সূত্রেই চরিতকাব্যগুলিকেও মঙ্গল নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের প্রভাব অনুভব করা যাইবে ইহাই

স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কতকগুলি বিষয়ে ইহাদের মধ্যে ব্যতিক্রম আছে।

মঙ্গলগান গানের উদ্দেশ্যে রচিত, কিন্তু চরিতকাব্য গানের উদ্দেশ্যে রচিত নহে, ইহারা পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্য রচিত হইয়াছিল। সেইজন্য মঙ্গলগান যেমন আট দিনের, বার দিনের কিংবা এক মাসের উপযোগী করিয়া পালায় পালায় বিভক্ত হইয়া রচিত হইয়াছে, চরিতকাব্য তেমন হয় নাই। ইহারা পাঠের উদ্দেশ্যে রচিত বলিয়া সাধারণভাবে পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে মঙ্গল গানের রাগ-রাগিণীর মত সাধারণত কোন রাগ-রাগিণীরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে প্রত্যেক পরিচ্ছেদ শেষে মঙ্গলকাব্যের অনুযায়ী ভণিতা ব্যবহার করা হইয়াছে।

মঙ্গলকাব্য দেব-মাহাত্ম্যসূচক কাব্য, স্বেচ্ছাচারী দৈবের স্বেচ্ছাচার প্রসূত অলৌকিক আচরণকেই এখানে মাহাত্ম্য বলিয়া মনে করা হইত। চরিতকাব্য ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাতে ঐতিহাসিক চরিত্রের স্বাভাবিক মানসিক সত্তা অনেক ক্ষেত্রেই কল্পিত দৈবশক্তির আরোপ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। তথাপি জীবনের ঐতিহাসিক সূত্র তাহার মধ্যে যে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই।

মঙ্গলকাব্যের দেবতাদিগের দৈব মাহাত্ম্য প্রচার করিতে গিয়াও ইহাদের কবিগণ তাহাদিগকে নিতান্ত বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে টানিয়া নামাইয়াছিলেন, দেবতার মধ্যে তাঁহারা মানুষকেই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কিন্তু চরিতকাব্যের বৈষ্ণব সাধক কবিগণ মানুষকে দেবতা করিতে চাহিয়াছেন। তাহার ফলে চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের অবতার, নিত্যানন্দ বলরামের অবতার এবং অদ্বৈতাচার্য শিবের অবতার হইয়াছেন; কিন্তু মঙ্গলকাব্যের মনসা স্বর্গ হইতে মর্ত্যের ধূলিমাটিতে নামিয়া আসিয়াছেন, চণ্ডী মানবীর রূপ ধারণ করিয়া মানুষকে ছলনা করিয়াছেন। সুতরাং চরিতকাব্য এবং মঙ্গলকাব্য উভয়ের গতি সম্পূর্ণ দুইটি বিপরীতমুখী—একটির মর্ত্য হইতে বৈকুণ্ঠের দিকে লক্ষ্য, আর একটির বৈকুণ্ঠ হইতে মর্ত্যের দিকে লক্ষ্য। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের দেবতা যে ভাবে মানুষের সঙ্গে মিশিয়া মানুষের মত নিজের গায়ে ধূলি কাদা মাখিয়া বেড়াইয়াছিলেন, চরিতকাব্যের মহাপুরুষেরা তাহা করেন নাই। তাঁহারা ধূলি কাদার অপবিত্র স্পর্শ হইতে নিজদিগকে বাঁচাইয়া সাত্ত্বিক জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

চরিতকাব্য জীবন-আখ্যায়িকা মূলক কাব্য বলিয়া গৃহীত হইলেও মঙ্গলকাব্যের আখ্যায়িকাগুণ তাহাতে নাই। বিরুদ্ধ অবস্থার ভিতর দিয়া মঙ্গলকাব্যের দেবতাকে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইয়াছে; কিন্তু চরিতকাব্যে সেই প্রকার বিরুদ্ধতার কথা কিছু নাই। কোনও কোনও গ্রন্থে বৈষ্ণববিরোধী কোন ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীর কথা যে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের বিরোধিতা মঙ্গলকাব্যের দেবতাদিগের যে বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহার তুলনায় নিতান্ত উপেক্ষণীয়।

চরিতকাব্য একটি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর রচনা, কিন্তু মঙ্গলকাব্য বৃহত্তর সমাজজীবন

ভিত্তিক রচনা। যদিও এ'কথা সত্য যে, শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে ইহার মূল প্রেরণা আসিয়াছিল, তথাপি কালক্রমে ইহা বাংলার সমাজ-জীবনকে সামগ্রিক ভাবে অবলম্বন করিয়া এক বৃহত্তর জীবন-রূপ ইহার মধ্যে প্রকাশ করিয়াছে। সেই সূত্রে ইহা জাতীয় (national) কাব্য, কিন্তু চরিতকাব্য জাতীয় কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে নাই, ইহা বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় (sectarian) রচনা, মঙ্গলকাব্যের তুলনায় সাহিত্যিকগুণ ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত গৌণ। চরিতকাব্যগুলি বৈষ্ণব সমাজের শাস্ত্রগ্রন্থের পর্যায়ে স্থান পাইয়াছে; কিন্তু মঙ্গলকাব্যগুলির মূল উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, ইহারা কখনও শাস্ত্র কিংবা পুরাণ হইয়া উঠিতে পারে নাই, বরং ইহারা কাব্যের মর্যাদা লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে। ইহার কারণ মঙ্গলকাব্যের চরিত্রগুলি রক্তমাংসের উপাদান এবং পার্থিব অনুভূতি দিয়া গঠিত; কিন্তু চরিতকাব্যের চরিত্রগুলি তাহা নহে, ইহারা আধ্যাত্মিক আদর্শের উপাদানে গঠিত, লৌকিকতার পরিবর্তে অলৌকিকতা ইহাদের নির্ভর।

মঙ্গলকাব্যে যে অলৌকিকতা নাই, তাহা নহে; তবে তাহার অলৌকিকতার সঙ্গত কাব্যগত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, কিন্তু চরিতকাব্যের অলৌকিকতার কোন কাব্যগত ব্যাখ্যা নাই, তাহা ভক্তিমার্গের কথা বলিয়া কেবলমাত্র বিশ্বাস্য, কোন দিক হইতে বিচার্য নহে।

পূর্বেই বলিয়াছি, চরিতকাব্যগুলির উদ্ভবের পূর্বেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করিয়া বাঙ্গালীর ধ্যানধারণার সকল ক্ষেত্রেই তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। চরিতকাব্যগুলি সেইজন্যই ইহাদের বহিরঙ্গ গঠনে সেই আদর্শই সাধারণভাবে অনুসরণ করিয়াছে। সেইজন্য মঙ্গলকাব্যের প্রারম্ভিক দেব-বন্দনার মত কোনও কোনও চরিতকাব্যেও নানা দেবদেবীর বন্দনা শুনিতে পাওয়া যায়। তবে এ'কথা সত্য, যে সকল চরিত-কাব্য বৈষ্ণব সমাজে একান্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ রূপে গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বৈষ্ণব বন্দনা ছাড়া মঙ্গলকাব্যের অনুযায়ী পঞ্চদেবতার কোনও বন্দনা শুনিতে পাওয়া যায় না। তথাপি গ্রন্থারম্ভে বৈষ্ণব বন্দনাও যে মঙ্গলকাব্যের অনুকরণেরই ফল, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। যে সকল চরিতকাব্য মঙ্গলকাব্যকে সর্বাধিক অনুকরণ করিয়াছে, যেমন, জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', কিংবা লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', ইহারা বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। যে দুইখানি চরিতকাব্য সকল চরিতকাব্যের আকর-গ্রন্থ বলিয়া গৃহীত হয়, যেমন বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য-ভাগবত' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত', ইহারা বিষয় বিন্যাসের দিক হইতে মঙ্গলকাব্যের প্রভাব হইতে অনেকখানি মুক্ত, কিন্তু ভাবাদর্শের দিক হইতে বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য-ভাগবতে'র বা 'চৈতন্যমঙ্গলে'র সঙ্গে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর যে কোনও মঙ্গলকাব্যেরই ঐক্য আছে। জয়ানন্দ ও লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' কতকগুলি সুরচিত গীতির সমষ্টি, গীতিসুরে কাহিনীর প্রবাহ পদে পদে রুদ্ধ হইয়াছে। অবশ্য ইহা যে মঙ্গলকাব্যের প্রভাবজাত তাহাও নহে, ইহা সমসাময়িক কালের বৈষ্ণব গীতি-কবিতার প্রভাবেরই প্রত্যক্ষ ফল। মঙ্গলকাব্যের মত ইহাদের মধ্যেও কোন পরিচ্ছেদ দ্বারা বিষয়বস্তুকে বিভক্ত করা হয় নাই, গানের

উদ্দেশ্যে রচিত বলিয়া মঙ্গলকাব্যের অনুযায়ী ইহাদের মধ্যে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে, মঙ্গলকাব্যের মতই পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া উভয় কাব্যেরই সূচনা হইয়াছে। লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গলে' গণেশাদি নানা দেবতার বন্দনা শুনিতে পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণ যেমন মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া নিজেদের পূজার প্রচলন করিয়া যাইতেন, লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গলে'ও দেখা যায়, বিষ্ণু চৈতন্যরূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া নিজের পূজা নিজেই প্রচারের ভার লইয়াছেন। লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' সাধারণ মঙ্গলকাব্যের মতই অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। পরবর্তীকালে অক্ষম কবিদিগের হাতে পড়িয়া মঙ্গলকাব্যের যে অবস্থা হইয়াছিল, লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গলে' যেন তাহারই পূর্বাভাস দেখিতে পাওয়া যায়।

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' বা 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থখানি বৈষ্ণব সমাজে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হয়, ইহা বৈষ্ণব শাস্ত্রীয় গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ইহার মধ্যেও মঙ্গলকাব্যের বস্তু এবং ভাবগত প্রভাব অপ্রত্যক্ষ নহে। ইহাতে চৈতন্যদেবের চরিত্র অনেকটা মঙ্গলকাব্যের শাক্ত দেবদেবীর চরিত্রের আদর্শে পরিকল্পিত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণ যেমন নিজেদের স্বার্থরক্ষায় ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেন, 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবকেও দুই-একবার সেই ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। মাধাই নিত্যানন্দের অঙ্গে যখন আঘাত করিয়া রক্তপাত করিয়াছিলেন, তখন তাহা দেখিয়া চৈতন্যদেব তাহার উপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার জন্য ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। যে ধর্মের প্রবর্তককে এই প্রকার হিংস্র রূপে পরিকল্পনা করিবার মধ্যে বৃন্দাবন দাসের মনে সমসাময়িক মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী চরিত্রের অনুরূপ গুণটির প্রভাব স্বভাবতই প্রকাশ পাইয়া থাকিবে। তারপর কাজি যখন নবদ্বীপে সংকীর্তন নিষেধ করিয়া দিলেন, তখন কাজির উপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার আচরণটির মধ্যেও বৃন্দাবন দাসের মনে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর অনুরূপ প্রতিহিংসা-পরায়ণ ভয়ঙ্কর রূপটির উদয় হইয়াছিল বলিয়াই মনে হইবে।

চরিতকাব্যগুলির মধ্যে একমাত্র বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য-ভাগবতে'র মধ্যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোনও কোনও চরিত্রের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের চরিত্রের অনুযায়ী মানবিক গুণের বিকাশ দেখা যায়। তবে তাহা চৈতন্যচরিত্রের ক্ষেত্রে নহে, বরং অন্যান্য চরিত্রের ক্ষেত্রেই তাহা সম্ভব হইয়াছে। এমন কি, চৈতন্যচরিত্রের ক্ষেত্রেও তাহা কোনও কোনও সময় সম্ভব হইয়াছে। বৃন্দাবনদাস বৈষ্ণব ভাবে দীক্ষিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে জীবন এবং জগৎ সম্পর্কেও বিশেষ সচেতন ছিলেন। সেই জন্যই তাঁহার রচিত চরিতকাব্যে মঙ্গলকাব্যের অনুযায়ী বৃহত্তর বাংলার সমাজের ছায়াপাত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের মতই তাঁহার কাব্য 'এপিক' বা মহাকাব্যধর্মী রচনা। তারপর কেবলমাত্র নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাঁহার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হইয়া ছিল না। বাংলার বৃহত্তর সমাজ-জীবনের পটভূমিকার উপর তাঁহার চরিতকাব্য রচিত হইয়াছে, সেই সূত্রেই ইহার মধ্যে মঙ্গলকাব্যের গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। চরিতকাব্য রচয়িতাদিগের মধ্যে প্রকৃত কবিত্বের সন্ধান দুইজনের মধ্যে পাওয়া যায়,

প্রথমতঃ লোচনদাস, দ্বিতীয়তঃ বৃন্দাবনদাস। দুইজন দুই স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির কবি, একজন গীতিকবি, আর একজন মহাকাব্য বা 'এপিকে'র কবি। 'এপিক' কাব্যের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছে; সেইজন্য একমাত্র বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য-ভাগবত' বা 'চৈতন্যমঙ্গলে'র সঙ্গেই মঙ্গলকাব্যের তুলনা চলিতে পারে।

বৈষ্ণব চরিতকাব্যের মধ্যে একমাত্র বৃন্দাবনেদাসের 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থখানি মঙ্গলকাব্যকে কোনও কোনও বিষয়ে প্রভাবিত করিয়াছে। অনেকে অনুমান করিয়াছেন, চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বৈষ্ণব ছিলেন; সেই জন্যই দেখা যায়, তিনি তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শ্রীমন্তের শৈশবকাল বর্ণনায় 'চৈতন্যভাগবত'—বর্ণিত চৈতন্যদেবের বাল্যলীলার সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়াছেন। এমন কি, শ্রীমন্তের পাঠশালা-জীবনের কথা বলিতে গিয়াও নবদ্বীপের টোলে বিশ্বম্ভর যে ভাবে সর্বসূত্রে কৃষ্ণব্যাখ্যা করিতেন, তাঁহার পাঠশালার পণ্ডিতের মুখেও সেই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' দ্বারা যে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। ক্রমে বৈষ্ণব প্রভাব সমাজের মধ্যে যতই বাড়িতে লাগিল, ততই চরিতকাব্যগুলির প্রভাব মঙ্গলকাব্যের চরিত্রসৃষ্টি প্রভাবিত করিতে লাগিল। চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্ব এবং অটল আদর্শ-নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত দ্বারা মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের চরিত্র দৃঢ়তর হইল, শচীদেবীর মৌন বেদনা কোনও কোনও মনসা-মঙ্গলের কবিকে সনকা-চরিত্র সৃষ্টিতে নূতন প্রেরণা দিল, বিষ্ণুপ্রিয়ার বঞ্চিত জীবনের অব্যক্ত বেদনা কোন কোন মনসা-মঙ্গলের কবির হৃদয় ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়া তাঁহাদের বেহুলা চরিত্র রূপায়ণে নূতন দৃষ্টি খুলিয়া দিল। মঙ্গলকাব্য দ্বারা প্রভাবিত হইয়া একদিন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চরিতকাব্যের জন্ম হইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে চরিত-কাব্যগুলি পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলিকে প্রভাবিত করিতে লাগিল।

মঙ্গলকাব্য যেমন কালক্রমে একটি রচনা এবং ভাব-গত আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছিল, চরিতকাব্য তাহা করিতে পারে নাই। এমন কি, বৃন্দাবনদাস রচিত 'চৈতন্য-ভাগবত' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থ দুইখানি বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধা লাভ করিলেও ইহাদিগের কাহাকেও অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব চরিতকাব্য রচনার একটি আদর্শ স্থিরীকৃত হয় নাই। চরিতকাব্যের উন্নত আদর্শগুলি মঙ্গলকাব্য নিজের মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত করিয়া নিজে পুষ্টি লাভ করিয়াছে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহার ঐশ্বর্য যুগ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, চরিতকাব্যের ধারা মধ্যযুগেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল; কারণ, পরবর্তী চরিতকাব্যগুলি মর্ত্যের সঙ্গে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

॥১৪॥ নাটগীত ও মঙ্গলকাব্য

মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্য রচনার সমসাময়িক কালে নাটগীত নামে পরিচিত এক শ্রেণীর গীতিরচনা বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত ছিল। ইহার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের কি সম্পর্ক ছিল, তাহা

।ঞচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। মধ্যযুগে বাংলার সঙ্গীতের যতদূর পরিচয় উদ্ধার করা যায়, তাহা হইতে মনে হয়, নাটগীত আখ্যানমূলক গীত ছিল। মঙ্গলকাব্যও তাহাই। তবে ম‌ঙ্গলগানের পরিবেশন রীতি এবং নাটগীতির পরিবেশন রীতি এক ছিল না। নাটগীত নাম হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ইহার সঙ্গে নৃত্য এবং গীত দুই-ই যুক্ত ছিল এবং তাহার কাহিনী অনেকটা পাত্রপাত্রীর নাটকীয় সংলাপের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হইত। তবে এই সংলাপ গীতি-সংলাপ, কোনও গদ্য সংলাপ নহে। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাটগীত শ্রেণীর রচনা। ইহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের মধ্যে কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে গীতি-সংলাপ পরিবেশন করা হইয়াছে এবং তাহার মধ্য দিয়াই কাহিনীর ধার শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মঙ্গলগান একজন মাত্র মূল গায়েন আসরে দাঁড়াইয়া প্রথম হইতে শেষপর্যন্ত গাহিয়া যাইত, দুই চারিজন আসরে বসিয়া ধুয়া ধরিত মাত্র। মঙ্গলকাব্যের লাচাড়ী বা নাচাড়ী অংশ যদি নৃত্যসম্বলিত গীত অংশ বলিয়াই মনে করা হয়, তাহা হইলেও এই নৃত্যও মূল গায়েনই করিত; অন্য কোন চরিত্র তাহাতে অংশ গ্রহণ করিত না। নাটগীতের কিছু কিছু রূপ এখন পর্যন্ত বাংলার লোক-সঙ্গীতের ধারায় রক্ষা পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম জিলার অন্তর্গত বোলান গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যদিও এ'কথা সত্য যে, সাম্প্রতিক কালে বোলান গান পরবর্তী কালের যাত্রা এবং নাটক দ্বারাও কিছু প্রভাবিত হইয়াছে, তথাপি বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীনতর বোলান গানে নাটগীতের রূপটি পরিপূর্ণ রক্ষা পাইয়াছিল। মধ্যযুগের নাটগীত গ্রাম্যজীবনে কিছুকালের মধ্যেই ধামালী নামক কুরুচিপূর্ণ এক শ্রেণীর লৌকিক নৃত্যগীতের মধ্যে আত্মবিসর্জন করিয়াছিল, তথাপি ইহার একটি ধারা কোন প্রকারে বোলান গানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। বোলান গান পল্লীসঙ্গীত হইলেও পৌরাণিক নানা বিষয়ই ইহার বিষয়বস্তু বলিয়া রুচির দিক দিয়া উন্নত। কিন্তু ধামালীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয় স্থান লাভ করিবার জন্য গ্রাম্য কবিদিগের পরিকল্পনায় তাহার স্বর্গীয়তা রক্ষা পাইতে পারে নাই, সহজেই তাহা মর্ত্যের মাটিতে নামিয়া আসিয়াছে।

মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে নাটগীতের বিষয়-বস্তুর দিক দিয়াও পার্থক্য ছিল। মঙ্গলকাব্য লৌকিক দেবদেবীর উচ্চতর সমাজে প্রবেশের দাবী লইয়া রচিত হইয়াছে। কিন্তু নাটগীত তেমন কোন উদ্দেশ্যমূলক রচনা ছিল না, তাহাতে পুরাণের কাহিনী সাধারণভাবে প্রচারিত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে শৈবশাক্তের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া কাহিনীর নাটকীয় গুণ বিকাশ লাভ করিয়াছে, নাটগীতে তাহা ছিল না। সেই জন্য তাহার মধ্যে নাট বা নৃত্য থাকিলেও নাটকীয়তা ছিল না। মঙ্গলগানে নৃত্য ছিল না সত্য, কিন্তু কাহিনীর মধ্যে নাটকীয়তা ছিল।

'গীতগোবিন্দ' এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে যদি নাটগীতের আদি-রূপ (prototype) বলিয়া ধরা যায়, তবে এ'কথা মনে হইতে পারে যে, কৃষ্ণপ্রসঙ্গই বুঝি নাটগীতের একমাত্র বিষয় ছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মূলত তাহা ছিল না। ভাগবতের মত রামায়ণ-মহাভারত কিংবা অন্যান্য পুরাণের কাহিনীও ইহার বিষয়-বস্তু হইত, পরবর্তী কালের বোলান গানই তাহার প্রমাণ। তবে এ'কথা সত্য, সমাজে বৈষ্ণব ধর্ম ব্যাপক প্রচারের ফলে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ ইহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়া গিয়া ইহা বহুলাংশে বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছিল। মঙ্গলকাব্য শাক্ত

দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক কাহিনী, বৈষ্ণব ধর্মের কোন আদর্শই ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সুতরাং মঙ্গলকাব্য এবং নাটগীতের বিষয়বস্তুতে যে পার্থক্য ছিল, তাহা একটি মৌলিক পার্থক্য, উভয়ের দিক দিয়া যদি কোন প্রকার ঐক্য থাকিত, তবে একে অন্যাকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া ফেলিবার সুযোগ পাইত। কিন্তু বিষয় এবং আঙ্গিকগত মৌলিক পার্থক্যের জন্য উভয়েই মধ্যযুগের সমাজজীবনে সমান্তরাল ভাবে বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। তবে মঙ্গলকাব্যের ধারায় জাতির সমাজ-জীবন সামগ্রিকভাবে সেদিন স্পন্দিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা এমন পুষ্টি লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল, নাটগীতের ধারাটি রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-কাহিনীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া নীতি এবং রুচির এক উচ্চ আদর্শ হইতে সহজেই ভ্রষ্ট হইয়া গতিশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল।

যে অর্থে মধ্যযুগের দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক কাব্যকে মঙ্গলকাব্য বলা হইয়াছে, সেই অর্থে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। কারণ, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য রূপের এক বিকারগ্রস্ত (perverted) পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, সুস্থ এবং স্বাভাবিক কোনও মহিমা কীর্তিত হয় নাই। বিশেষতঃ সে যুগের সাধারণ সমাজ দেবতার মধ্যে দৈবশক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োগ দেখিতে না পাইলে তৃপ্তি লাভ করিত না, মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীর দৈবীশক্তির যে পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা তাহাদের অত্যাচরিত সমাজ-জীবনের মধ্যে সান্ত্বনা আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে তাহার কিছুই ছিল না; যাহা ছিল, তাহা তাহাদের প্রাত্যহিক জীবনে এত পরিচিত যে তাহা দ্বারা দেবতার প্রতি কোন বিস্ময় কিংবা ভক্তিবোধ জাগ্রত করিতে পারিত না। বিশেষতঃ দেবতার মাহাত্ম্য বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মধ্যে কিছুই প্রকাশ পায় নাই। এমন কি, পৌরাণিক অন্যান্য বিষয়েও যে-সকল নাটগীত রচিত হইত, তাহাদের মধ্যেও সাধারণ পুরাণ কাহিনী বর্ণনা ব্যতীত বিশেষভাবে কোন দেবতার মাহাত্ম্যকীর্তন করিবার কোন প্রয়াস দেখা যায় না। এই সূত্রেই নাটগীত বিষয়বস্তু এবং ভাবাদর্শের দিক দিয়াও মঙ্গলকাব্যের তুল্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

তবে এ' কথা সত্য যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনার সময়ই মঙ্গলকাব্য বিশেষ একটি রূপ লাভ করিয়াছিল, সেইজন্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র উপর মঙ্গলকাব্যের কিছু কিছু আঙ্গিকগত প্রভাব অনুভব করা যায়। কিন্তু ভাবগত আদর্শের কোন প্রভাব তাহাতে সংক্রামিত হইতে পারে নাই। কেহ বলিতে চাহিয়াছেন, মঙ্গলকাব্যের দেবতাগণ যে রকম ছলে বলে কৌশলে পূজা আদায় করিয়াছেন, সেই রকম 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র শ্রীকৃষ্ণও রাধিকার নিকট হইতে ছলে বলে কৌশলে সঙ্গ আদায় করিয়াছেন, কিন্তু উভয়ের মধ্যে এই ঐক্য এক শ্রেণীর নহে, সুতরাং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মধ্যে মঙ্গলকাব্যের সূচনা দেখা দিয়াছে, এ' কথা স্বীকার করা যায় না। উভয়েই আখ্যায়িকা-ভিত্তিক রচনা বলিয়া আখ্যায়িক বর্ণনার বিশেষ কতকগুলি গুণ উভয়ের মধ্যেই সমানভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা পরস্পরের প্রভাবজাত বলিয়া মনে করা ভুল হইবে।

নাটগীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য, ইহা উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক গীতি। কিন্তু মঙ্গলকাব্য তাহা নহে, একটানা পাঁচালীর আকারে ইহাতে কাহিনী পরিবেষণ করা হয়, উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক কোন রচনা ইহার মধ্যে স্থান পাইবার কোন সুযোগ পায় না। উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক রচনার মধ্য দিয়া

যেমন কাহিনী সহজেই একটি গতি লাভ করে, মঙ্গলকাব্যে তাহা হইতে পারে নাই। বর্ণনার পর বর্ণনা দ্বারা কাহিনীর গতি ইহাতে পদে পদে শিথিল হইতে শিথিলতর হইয়াছে। বর্ণনার বিস্তারে এবং কাহিনীর গৌরবে মঙ্গলকাব্য মহাকাব্য বা 'এপিকে'র লক্ষণাক্রান্ত, কিন্তু নাটগীত তাহা নহে, ইহার মধ্যে জীবনের বিস্তার অনুভব করা যায় না, কাহিনীও তেমনই কোনও গুরুত্ব লাভ করিয়া বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হইতে পারে না। তবে কোনও কোনও অর্থে ইহা সার্থক নাটকীয় গুণ লাভ করিতে পারে। মঙ্গলকাব্য মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া সাধারণত গীতিগুণ- (lyric quality) বর্জিত। তবে বিচ্ছিন্নভাবে কোনও কোনও কবির রচিত কোনও কোনও অংশে এই গুণ প্রকাশ পায় মাত্র। কিন্তু নাটগীত শ্রেণীর রচনার একটি প্রধান গুণ ইহার গীতিগুণ। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' একটি কাহিনীর ধারা অব্যাহত থাকিলেও আদ্যোপান্ত ইহাতে গীতিসুরের একটি প্রবাহ অখণ্ডভবে অগ্রসর হইয়াছে। কোনও কোনও বিচ্ছিন্ন অংশ গীতিরসে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়া কাহিনীর গতিকেও শিথিল করিয়াছে। সুতরাং সাধারণভাবে এই কথাই বলিতে পারা যায় যে, নাটগীত গীতিলক্ষণাক্রান্ত, মঙ্গলকাব্য মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। ইহাদের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য আছে, তাহাই ইহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে।

মঙ্গলকাব্যে সামগ্রিকভাবে মধ্যযুগের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি দেখা গিয়াছে বলিয়া ইহা জাতীয় কাব্য বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, কিন্তু কোনও নাটগীত শ্রেণীর রচনাই তাহা হইতে পারে নাই। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মধ্য দিয়া বাংলার বৃহত্তর সমাজ-জীবনের অভিব্যক্তি দেখা যায় না, কেবলমাত্র ব্যক্তিমানসের কামনা-বাসনাই তাহাতে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহার অনুভূতি ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া কোনদিন বৃহত্তর সমাজ-জীবন স্পর্শ করিতে পারে নাই। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের বস্তুধর্মিতা ইহাকে সমাজ-জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে উপকরণের সন্ধান এবং তাহার ব্যবহার করিবার সুযোগ দিয়াছে। মঙ্গলকাব্যে জাতির সমাজ-জীবন প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, কিন্তু নাটগীতে তাহা হয় নাই।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নাটগীত সম্পর্কে যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, বিবাহ কিংবা কোন দেবপূজা উপলক্ষেই নাটগীতের অনুষ্ঠান হইত। কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে,

নাটগীত দেখি শুনি পরম কুতূহলে।
কেহ বেদ পঢ়ে কেহ পঢ়য়ে মঙ্গলে॥
নানা মঙ্গল নাটগীত হিমালয়ের ঘরে।
পরম আনন্দে লোক আপনা পাশরে॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মঙ্গলগান ও নাটগীত অভিন্ন উদ্দেশ্যেই গৃহে অনুষ্ঠিত হইত। উদ্ধৃত অংশে মঙ্গলগান এবং নাটগীতকে একসঙ্গে একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের উভয়ের মধ্যে যদি ভাব এবং রূপগত সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য না থাকিত, তবে একই অনুষ্ঠানে ইহাদের উভয়ের ব্যবহারের কথার উল্লেখ থাকিত না। সেইজন্য বুঝিতে পারা যায়, যদি একই উপলক্ষে উভয়েরই অনুষ্ঠান হইত, তথাপি ইহাদের মধ্যে রূপ এবং ভাবগত সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। গৃহে শুভ উৎসব উপলক্ষেই মঙ্গলগান এবং নাটগীতের

অনুষ্ঠান হইত, একমাত্র এই বর্হির্মুখী বিষয়েই ইহাদের মধ্যে ঐক্য ছিল।

।। ১৫ ।। নাথসাহিত্য ও মঙ্গলকাব্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের যুগে আর এক শ্রেণীর আখ্যায়িকা কাব্য প্রচলিত ছিল, তাহা নাথসাহিত্য বলিয়া পরিচিত। মঙ্গলকাব্য যেমন শাক্ত সম্প্রদায়ের সাহিত্য ছিল, নাথসাহিত্য তেমনই প্রধানত নাথসম্প্রদায়ের মধ্যেই সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে ইহাদের আখ্যায়িকার ভিতর হইতে সাম্প্রদায়িক ভাব অনেকখানি দূর হইয়া গিয়া যখন সহজ মানবিক ভাবের বিকাশ হইয়াছিল, তখনই ইহা জাতিবর্ণনির্বিশেষে প্রচার লাভ করিয়াছিল। তবে এ কথা সত্য, বৈষ্ণব চরিত-সাহিত্য সংস্কৃতজ্ঞ বিদগ্ধ পণ্ডিত সমাজের রচনা ছিল, কিন্তু নাথসাহিত্যের মধ্যে যে গুণই প্রকাশ পাক না কেন, তাহা সেই শ্রেণীর পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক যেমন রচিত হয় নাই, তেমনই উচ্চতর হিন্দু সমাজের মধ্যেও তাহা প্রচলন লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং নাথআখ্যায়িকাকাব্য যখন জাতবর্ণনির্বিশেষে প্রচারিত হইল, তখন বাংলাদেশের সাধারণ সমাজের যে হিন্দু-মুসলমান কৃষক সম্প্রদায় তাহাদের মধ্যেই তাহা প্রচার লাভ করিয়াছিল। ইহাতে হিন্দুশাস্ত্র কিংবা রামায়ণ-মহাভারত পুরাণের কথা কিছু নাই, শাস্ত্রীয় কথা যদি কিছু থাকে, তবে ইহাতে যোগশাস্ত্রের কথা আছে। কারণ, যোগশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করিয়াই নাথ গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য নানাভাবে তাহাতে তাহার কথাই প্রকাশ পাইয়াছে, ধর্মের আর কোন বিষয় ইহার মধ্যে প্রকাশ পায় নাই।

নাথ আখ্যায়িকাকাব্যগুলিকে সাধারণত নাথ-গীতিকা (ballad) বলা হয়, কারণ, যদিও ইহাদের রচনা মঙ্গলকাব্যের মতই বিস্তৃত, তথাপি মঙ্গলকাব্যের মত পালায় পালায় বিভক্ত হইয়া ইহা রচিত নহে; গীতিকা বা ballad-এর আকারে একটানা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রচিত হইয়াছে। সেইজন্য ইহা লোকসাহিত্যধর্মী, শিল্পসাহিত্যধর্মী রচনা নহে; সুতরাং ইহাকে ballad বা গীতিকা বলিয়া পরিচয় দেওয়াই সার্থক হয়। গীতিকা বা ballad লোক-সাহিত্যেরই অন্যতম বিষয়।

নাথ-গীতিকার দুইটি প্রধান ভাগ—একটি ভাগে অলৌকিকতায় সিদ্ধ নাথগুরুদিগের জীবনের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে, দ্বিতীয় ভাগে মাণিকচন্দ্র রাজার পুত্র গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই দুইটি বিষয় ছাড়া আর কোন বিষয় নাথ-গীতিকায় বর্ণিত হয় নাই। বিভিন্ন কবি এই দুইটি বিষয় লইয়াই গীতি রচনা করিয়াছেন।

মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে নাথ-গীতিকায় প্রধান পার্থক্য এই যে, মঙ্গলকাব্য লোকসাহিত্যের স্তর অতিক্রম করিয়া শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া এক শিল্পসম্মত কাব্যরূপ লাভ করিয়াছিল; কিন্তু নাথ-গীতিকা লোক-সাহিত্যের স্তর অতিক্রম করিয়া শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে নাই। নাথগীতিকা লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত; সেইজন্য লোক-সাহিত্যের যাহা গুণ, তাহাই ইহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু মঙ্গলকাব্যের ভিত্তিমূলে লোক-সাহিত্যের প্রেরণা থাকিলেও ইহা বিদগ্ধ কবিকুলের হাতে পড়িয়া শিল্পরূপ লাভ

করিয়াছে। রঙ্গপুর জেলার নিরক্ষর কৃষকদিগের মুখ হইতে শুনিয়া স্যর জন গ্রীয়ারসন নাথ-সাহিত্য প্রথম লিখিয়া লইয়াছিলেন। কেবলমাত্র স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া নিরক্ষর গায়েন নিরক্ষর শ্রোতার সম্মুখে এই গান পরিবেষণ করিয়াছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্য তেমন নহে, সর্বত্রই ইহার লিখিত পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সেই সকল পুঁথি যাঁহারা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বিদগ্ধ পণ্ডিত, অনেক ক্ষেত্রেই উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব শ্রেণীর লোক। কিন্তু নাথ-গীতিকা সমাজের উচ্চতর স্তরে উঠিতে পারে নাই। সেইজন্য শাস্ত্রের কথা ইহাদের মধ্যে কম শুনিতে পাওয়া যায়, সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ইহার মধ্যে বেশি স্থান পাইবার সুযোগ পাইয়াছে।

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী যেমন বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্য দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, নাথ-গীতিকায় তেমন কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার মধ্যে কোনও দেবদেবী নাই; শিবের কথা আছে সত্য, কিন্তু শিবের মাহাত্ম্যের কথা কিছু নাই; বরং তাঁহার চরিত্রেও মানবিক দুর্বলতার সন্ধান করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাঁহাদের মাহাত্ম্য প্রচার করা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই নাথ-সম্প্রদায়ের গুরু, সিদ্ধা বা সিদ্ধাচার্য নামে পরিচিত। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর মত ভক্তের যে তাঁহারা কোনও কল্যাণ করিয়া থাকেন তাহাও নহে। তাঁহারা নিজেরা সাধনভজন দ্বারা অলৌকিক শক্তি লাভ করেন, সাধনার ধারার মধ্যেও কোনও নিগূঢ়তা নাই, ব্রহ্মচর্য দ্বারা যোগ অভ্যাসই এই ধর্মে শ্রেষ্ঠ সাধনা। এই পথে সিদ্ধিলাভ করিয়া নাথগুরুগণ যে নিজেরা কি অলৌকিক শক্তির অধিকারী হইয়াছেন, তাহাই নাথ-গীতিকার একাংশে বর্ণিত হইয়াছে। নাথগুরু গোরক্ষনাথের চরিত্রবলের নিকট স্বয়ং দেবী পার্বতীও যে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা গৌরবের সঙ্গে ইহাতে ঘোষিত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীগণ যে ছলনার আশ্রয় লইয়াছেন, ইহাতে তাহার উল্লেখ নাই। যোগাভ্যাস দ্বারা শক্তি লাভ করিয়াই সিদ্ধাচার্যগণ জীবনে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন; ইহা লৌকিক পথ, কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণ সর্বদাই অলৌকিক পথেই পদক্ষেপ করিয়াছেন। মঙ্গলকাব্য আত্মশক্তিতে বিশ্বাসহীনতা প্রচার করিয়াছে, নাথ-গীতিকা আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের কথা প্রচার করিয়াছে। মঙ্গলকাব্য দৈবের উপর সমাজকে নির্ভর করিয়া থাকিতে বলিয়াছে, কিন্তু নাথসাহিত্যে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়া জীবনের সকল সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশ্বাস দিয়াছে। একান্ত ভোগাসক্ত রাজপুত্র গোপীচন্দ্রের অকালমৃত্যু যখন অনিবার্য হইয়া উঠিল, তখন তাঁহার জননী তাঁহার গলায় রক্ষা কবচ বাঁধিয়া দিয়া দেবতার আশীর্বাদ ভিক্ষা করিলেন না, বরং পুত্রকে সংযম এবং ত্যাগের আদর্শে দীক্ষা দিয়া ভোগজীবন হইতে নিবৃত্ত করিলেন; তাহাতেই পুত্রের পরমায়ু বৃদ্ধি পাইল। মঙ্গলকাব্যের কবি এই ক্ষেত্রে লক্ষ বলি দিয়া দেবতার পূজা করিতে পরামর্শ দিতেন; তারপর ভোগজীবনের অনিবার্য পরিণাম হইতে তাঁহার ভক্তকে তাহা দ্বারা রক্ষা

করিতে না পারিলেও তাহার জন্য স্বর্গবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া সমাজকে সান্ত্বনা দিতেন। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে আদর্শের দিক দিয়া নাথ-গীতিকা অভিন্ন নহে।

মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে নাথ-গীতিকার গঠনগত সাদৃশ্যও কিছু নাই। মঙ্গলকাব্য পয়ার, ত্রিপদী, একাবলী ছন্দে চরিত; কিন্তু নাথ-গীতিকা প্রথম হইতেই শেষ পর্যন্ত স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে রচিত। লোকসাহিত্যের ইহাই বিশেষ ধর্ম, ইহাতে ছন্দের কোন বৈচিত্র্য নাই। ইহাতেও সার্থক করুণ রস প্রকাশ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ প্রকৃতির কোন ছন্দ অর্থাৎ লঘু কিংবা দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ এখানে ব্যবহৃত হয় নাই। কেবলমাত্র সার্থক শব্দ-চয়ন দ্বারা ইহাতে বিভিন্ন রসের যথোচিত অভিব্যক্তি হইয়াছে। মঙ্গলকাব্য যেমন দেব-বন্দনা দিয়া সূচনা হয়, ইহাতে তাহা হয় না; ইহাতে কোন দেবদেবীর বন্দনা নাই। ইহাতে বিনা ভূমিকায় একেবারে প্রথম হইতেই কাহিনীর সূচনা হইয়া যায়। সাধারণত নিরক্ষর মুসলমান গায়েনরা এই গান গাহিয়া থাকে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যদি এই শ্রেণীর গীতিকা পরিবেষণের সময় কোনও বন্দনা করিবার রীতি থাকিত, তবে অনায়াসেই মুসলমান ধর্মের কথা দিয়া বন্দনা করিয়া ইহার সূচনা হইতে পারিত; কিন্তু লোক-সাহিত্যের ধর্মই এই যে, তাহাতে কোনও সম্প্রদায়েরই কোনও ধর্মের কথা থাকিতে পারে না। নাথগীতিকাও সেই ধর্মই রক্ষা করিয়াছে।

মঙ্গলকাব্য বিয়োগান্তক কাব্য; ইহার কাহিনীর শেষে মিলনের কথা আছে সত্য, কিন্তু সে মিলন মর্ত্যের মাটিতে সম্ভব হয় নাই। তাহা সর্বদাই স্বর্গলোকে সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু নাথ-গীতিকা মিলনান্তক রচনা; ইহার মিলন এই পার্থিব লোকেই সম্ভব হইয়াছে। বার বৎসর সন্ন্যাস জীবন যাপন করিবার পরেও গোপীচন্দ্র সংসারে ফিরিয়া আসিয়া গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিলেন। সমগ্র সন্ন্যাস জীবন ব্যাপিয়া তিনি সংসার-জীবনের ধ্যানেই কাটাইয়াছেন। নাথ গীতিকায় পার্থিব জীবন মঙ্গলকাব্য অপেক্ষাও অধিকতর সত্য এবং প্রত্যক্ষ; কারণ, ইহাতে দেবতার অলৌকিকতার কোনও প্রভাব নাই, দেবতার ছায়া ইহাতে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে নাই। নাথ-গীতিকার একটি বিভাগ, অর্থাৎ যে বিভাগটিতে গোপীচন্দ্রের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কেন্দ্রীয় বিষয়-বস্তু প্রেম; এই প্রেম ভগবৎ-প্রেম নহে, বরং পার্থিব নারীপ্রেম। পার্থিব নারীর প্রেম যে কি ভাবে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসধর্ম রক্ষা করিয়াছিল, এই কথা 'গোপীচন্দ্রের গান' শ্রেণীর নাথ-গীতিকার ভিতর দিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যে পার্থিব প্রেমের কথা একেবারেই নাই। তবে কোনও কোনও কবির চরিত্র-সৃষ্টির গুণে আভাসে ইঙ্গিতে তাহা কোনও কোনও স্থানে প্রকাশ পাইয়াছে, তবে তাহা কদাচ মুখ্য স্থান লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু 'গোপীচন্দ্রের গানে'-পত্নীপ্রেম মুখ্য স্থান লাভ করিয়াছে এবং ইহার উপরই গীতিকার কাব্যগুণ সার্থকতা লাভ করিয়া সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে। নাথ-গীতিকার একটি বিভাগ অর্থাৎ

গোরক্ষবিজয় মীনচেতন শ্রেণীর রচনার মধ্যে প্রেমের কথা নাই সত্য, তথাপি তাহাতেও পার্থিব জীবনের পথেই সাধন-ভজনের সফলতার কথা আছে। মঙ্গলকাব্যে স্বর্গের দেবতাকে যেমন মর্ত্যের ধূলিমাটিতে মলিন করা হইয়াছে, নাথ-গীতিকায় মানুষকে দেবতার স্তরে উন্নীত করা হইয়াছে। সেই মানুষ কখনও প্রেমের পথে, কখনও যোগসাধনার পথে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, কোন অলৌকিক উপায়ে কিছুই করে নাই।

বর্ণনার সংক্ষিপ্ততা গীতিকার একটি গুণ, বর্ণনার বিস্তার মঙ্গলকাব্যের গুণ। গোপীচন্দ্রের গান সার্থক প্রেমমূলক গীতিকা হওয়া সত্ত্বেও এ'কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ইহার মধ্যে গীতিকার সংক্ষিপ্ততার গুণটি প্রকাশ পায় নাই; বরং তাহার পরিবর্তে মঙ্গলকাব্যের বিষয়গত বিস্তৃতির যে গুণ, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং নাথ-গীতিকার অন্তর্গত গোপীচন্দ্রের গানে দেখা যায়, ইহাতে মঙ্গলকাব্যের বিশাল দেহে গীতিকার সূক্ষ্ম প্রাণ সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের প্রভাববশতই বাংলার গীতিকা-সাহিত্যে সংক্ষিপ্ততার গুণটি প্রকাশ পাইতে পারে নাই। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র অন্তর্গত কোন পালাগান অনুসরণ করিলেও তাহা অনুভব করা যাইতে পারে।

'গোরক্ষবিজয়-মীনচেতন' শ্রেণীর রচনার মধ্যে গীতিকাসুলভ প্রেমের কথা নাই, বরং উচ্চ নৈতিক আদর্শের কথা আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যেও যে গীতিকার সংক্ষিপ্ততার গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও বলিতে পারা যাইবে না। তবে ইহা 'গোপীচন্দ্রের গান'-এর মত এত বিস্তৃত রচনা নহে।

মঙ্গলকাব্যের মধ্যে যেমন 'এপিক'-ধর্মী বিস্তৃত বস্তুবর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়, গোপীচন্দ্রের গান কিংবা মাণিকচন্দ্র-ময়নামতীর গানের মধ্যেও তাহা আছে; ইহা প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের প্রভাবেরই ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। মঙ্গলকাব্যে জাতকর্ম হইতে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়েরই বর্ণনা থাকে, গোপীচন্দ্রের গানেও তাহা আছে। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে যুদ্ধ বর্ণনা অপরিহার্য, গোপীচন্দ্রের গানেও ময়নামতীর সঙ্গে যমযুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। 'গোপীচন্দ্রের গান'-এ মঙ্গলকাব্যের আরও কতকগুলি প্রত্যক্ষ প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন, ময়নামতীর হেমতালের লাঠি ব্যবহারের কথা মনসা-মঙ্গল হইতে আসিয়াছে, ধবল বস্ত্র পরিধানের কথা ধর্মমঙ্গল হইতে আসিয়াছে, স্ত্রীলোককে গুরু বলিয়া স্বীকার করিবার অনিচ্ছার কথা চাঁদ সদাগর ধনপতি সদাগরের 'স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা' পূজা করিবার অনিচ্ছা চণ্ডীমঙ্গল-মনসামঙ্গল হইতে আসিয়াছে। ময়নামতীর সতীত্বের পরীক্ষার কথা মনসা-মঙ্গলে বেহুলার এবং চণ্ডীমঙ্গলে খুল্লনার পরীক্ষা হইতে আসিয়াছে। তবে এ'কথা সত্য, লোকসাহিত্যের ভিত্তির উপর মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে সেই সূত্রেই লোক-সাহিত্যের কোনও কোনও উপকরণ স্বাভাবিক ভাবেই মঙ্গলকাব্যে রহিয়া গিয়াছে, ইহারা প্রত্যক্ষ ভাবে একে অন্যের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে,

এমন কথা বলিতে পারা যাইবে না।

গীতিকা এবং মঙ্গলকাব্য উভয়ই আত্মনির্লিপ্ত বস্তুনিষ্ঠ রচনা। যদিও বিশেষ সম্প্রদায়ের দেবদেবীর মহিমা প্রচারই মঙ্গলকাব্যের উদ্দেশ্য, তথাপি মঙ্গলকাব্যের কবিগণ ঘটনা এবং চরিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ আত্মনির্লিপ্ত থাকিয়া তাহাদিগকে চিত্রিত করিয়াছেন। নাথ-গীতিকাও তেমনই; ইহাদের যাঁহারা রচয়িতা তাঁহারা অনেকেই নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না, সেইজন্য ধর্মের বিশেষ কোন অনুশাসন সম্পর্কে তাঁহাদের কোনও কৌতূহল ছিল না, তাঁহারা আত্মনির্লিপ্ত থাকিয়া ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে উভয়েরই সাহিত্যগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে গোরক্ষ-বিজয়-মীনচেতন শ্রেণীর কাব্যে যোগ-সাধনার গূঢ়ার্থক ইঙ্গিত অনেক সময় কাহিনীর ধারাকে অস্পষ্ট করিয়াছে এই কথা সত্য। 'গোপীচন্দ্রের গান'-এ তাহা করিতে পারে নাই।

।। ১৬।। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' ও মঙ্গলকাব্য

'মৈমনসিংহ-গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' নাথ-গীতিকার মতই আখ্যানমূলক গীতিরচনা। সেই সূত্রে ইহাদের সঙ্গে মঙ্গলগানের মত আখ্যায়িকা গানের কি সম্পর্ক আছে, তাহাও বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে।

মঙ্গলকাব্য দেব মাহাত্ম্যসূচক রচনা, 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' নরনারীর পার্থিব প্রেম-মূলক রচনা। সুতরাং উভয়ের ভাবাদর্শের মধ্যে এখানেই মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। তবে এ'কথা সত্য, মঙ্গলকাব্যের সমসাময়িক কালেই সমাজে গীতিকাগুলির প্রচলন ছিল বলিয়া বহিরঙ্গের দিক দিয়া পরস্পর পরস্পরকে স্বভাবতই প্রভাবিত করিয়াছে। বিশেষত 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' এবং 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' মাত্রেই লোকসাহিত্যের ক্ষেত্র হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের মধ্যেও লোক-সাহিত্যের কিছু কিছু গুণ রক্ষা পাইয়া গিয়াছে। সেই দিক দিয়া কোনও কোনও বিষয়ে মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' এবং 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'র কতকগুলি বহির্মুখী ঐক্য অনুভূত হইতে পারে।

পূর্বেই বলিয়াছি, গীতিকা সংক্ষিপ্ততম রচনা, কিন্তু মঙ্গলকাব্য বিস্তৃত বর্ণনাধর্মী রচনা। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র সর্বত্র সংক্ষিপ্ততার গুণ যে রক্ষা পায় নাই, তাহা মঙ্গলকাব্যের প্রেরণাজাত বলিয়া মনে হইতে পরে। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' সংগ্রহের কোনও কোনও অংশে, যেমন বারমাসী বর্ণনায়, নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনায়, বিবাহের বর্ণনায় মঙ্গলকাব্যের গুণ প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু গীতিকার ইহা সাধারণ নিয়ম নহে, ব্যতিক্রম মাত্র। গীতিকার এই ব্যতিক্রমগুলির মধ্যেই মঙ্গলকাব্যের প্রভাব অনুভূত হয়, সাধারণ ক্ষেত্রে তাহা অনুভূত হয় না।

মঙ্গলকাব্য দেব-বন্দনা দিয়া আরম্ভ এবং স্বর্গারোহণ দিয়া শেষ হইয়াছে; কিন্তু কোনও গীতিকাই যেমন দেব-বন্দনা দিয়া আরম্ভও হয় নাই, তেমনই স্বর্গারোহণ দিয়াও শেষ হয় নাই। মঙ্গলকাব্য বাহ্যত মিলনাত্মক রচনা, গীতিকা বিয়োগান্তক রচনা। দুই একটি ক্ষেত্রে গীতিকাতেও যে মিলনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা মঙ্গলকাব্যের প্রভাবের ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

মঙ্গলকাব্যে সনাতন হিন্দুধর্মের পাতিব্রত্যের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে, কিন্তু 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র পাতিব্রত্য সনাতন হিন্দুধর্মের ধারা অনুসরণ করিয়া আসে নাই; কেবলমাত্র হৃদয়ের অনুশাসন স্বীকার করিয়া তাহাতে পাতিব্রত্যের নূতন সংজ্ঞা রচিত হইয়াছে; তাহা মঙ্গলকাব্যের সমাজ-কর্তৃক সমর্থিত না হইলেও ব্যক্তি-মানসের সুদৃঢ় সমর্থনে শক্তিশালী। নাথ-গীতিকায় গোপীচন্দ্রের গানে যে প্রেমের কথা আছে, তাহাও সনাতন ধর্মের ধারা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে, কারণ, তাহা পত্নীপ্রেম। কিন্তু 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র প্রেমের অনুভূতি নায়িকার ব্যক্তি-মানসের অনুভূতি—সমাজ, সংস্কার কিংবা বহির্মুখী কোন অনুশাসন ইহা স্বীকার করে নাই। গোপীচন্দ্রের পত্নীপ্রেমের শক্তি অপেক্ষা তাহার শক্তি বেশি, তাহা বলিতে পারা যায় না, উভয়েই তুল্য শক্তির অধিকারী; কিন্তু কোনও মঙ্গলকাব্যেই এই শ্রেণীর প্রেমের কোনও অবকাশই সৃষ্টি হয় নাই। প্রেম ব্যতীতই তাহাতে পাতিব্রত্যের মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে, অথচ 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র নায়িকাদিগের মধ্যে প্রেম ব্যতীত পাতিব্রত্যের কোন পরিচয় নাই; প্রেমজ পাতিব্রত্যে তাহাতে এমন শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে, যাহা প্রেম ব্যতীত পাতিব্রত্যের মধ্যে কখনও সম্ভব হইতে পারে না। সেইজন্য মঙ্গলকাব্যের নায়িকাগণ পাতিব্রত্যের পথে যেমন যন্ত্রে নির্মিত পুতুলের মত পদচারণা করিয়াছেন, 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র নায়িকাগণ প্রেমজ পাতিব্রত্যের মধ্যে সেই ভাবে আচরণ করে নাই। গীতিকা একান্ত প্রেম-নির্ভর রচনা এবং প্রেমের ক্ষেত্রে নারীর বিশেষ অধিকার বলিয়া স্ত্রীচরিত্র-প্রধান রচনা। দুই একটি মাত্র ব্যতীত পুরুষ চরিত্র তাহাতে সম্পূর্ণ নিবীর্য, সেইজন্য অনেক সময় কাহিনী এক-চরিত্র প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে আনুপূর্বিক কোনও স্ত্রীচরিত্র তেমন প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। চাঁদ সদাগরের মত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ চরিত্র সকল মঙ্গলকাব্যেরই নায়ক-চরিত্র পরিকল্পনার আদর্শকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। সেইজন্য কাহিনীর বিভিন্ন অংশে খণ্ড খণ্ড স্ত্রীচরিত্র তাহাদের আচরণের ভিতর দিয়া যে বাস্তব গুণই প্রকাশ করুক না কেন, সামগ্রিকভাবে কাহিনীর উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকা'র স্ত্রীচরিত্রমাত্রই নিজেদের ব্যক্তিত্ব এবং কর্মকুশলতার গুণে কাহিনীর উপর সামগ্রিক অধিকার বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। স্ত্রীচরিত্র তাহাতে স্বাধীনভাব আচরণ করিতে পারিয়াছে বলিয়া গীতিকাগুলির ভিতর দিয়া তাহাদের বিশেষ শক্তিটি প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছে; কিন্তু

মঙ্গলকাব্যে সমাজের প্রতিষ্ঠিত আদর্শ এবং নীতিবোধ দ্বারা নায়িকাদিগের চরিত্র সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। যে প্রেমের ক্ষেত্রে নারীর একটি স্বাধীন অধিকার আছে, তাহা মঙ্গলকাব্যের নায়িকাদিগের সামনে বিস্তৃত হইবার সুযোগ লাভ করে নাই।

গীতিকার মধ্যে কাহিনীর কোনও জটিলতা নাই, মূল কাহিনীর মধ্যে কোনও উপকাহিনী কিংবা শাখা-কাহিনী নাই, কাহিনীর মধ্যে কোথাও কোনও বিরাম কিংবা ছেদও নাই, তাহাতে কাহিনীর দৃঢ় সংবদ্ধতার গুণ বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের কাহিনী অত্যন্ত শিথিলবদ্ধ, কারণ, নানা শাখা কাহিনী, উপকাহিনী, অর্ন্তবর্তী কাহিনী ইত্যাদি দ্বারা অনেক সময় মূল কাহিনীর সূত্র হারাইয়া গিয়াছে, দৃঢ় সংবদ্ধতার গুণ প্রকাশ পাইবার সুযোগ পায় নাই। সেইজন্য মঙ্গলকাব্যের কাহিনীরস এবং গীতিকার কাহিনীরস বিভিন্ন।

মঙ্গলকাব্য এবং গীতিকার মৌলিক পার্থক্যই ইহাদেব বহুমুখী এই পার্থক্যেরও কারণ। কারণ, মঙ্গলকাব্য লিখিত সাহিত্য, গীতিকা মৌখিক সাহিত্য। লিখিত সাহিত্যেই ভাব এবং রূপগত জটিলতা থাকে, কিন্তু মৌখিক বা লোক-সাহিত্যে তাহা থাকে না, কারণ, স্মৃতির পক্ষে তাহা ভারস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং মঙ্গলকাব্য এবং 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র পার্থক্যের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে ইহাদের এই মৌলিক পার্থক্যের কথা সর্বদাই স্মরণ রাখা আবশ্যক হয়।

'মৈমনসিংহ-গীতিকা'য় স্বর্গ নরক পরকালের কথা নাই; অথচ পরকালের স্বর্গবাসের আশ্বাসের উপরই মঙ্গলকাব্যের নির্ভর, কাহিনীও সেই অনুযায়ী পরস্পর পৃথক্। গীতিকায় পার্থিব জীবনেই জীবনের সকল দেনা পাওনা চুকিয়া যায়, কিন্তু মঙ্গলকাব্যের কাহিনী শেষ হইয়াও শেষ হয় না, পরকালের জন্যও কিছু বাকি থাকিয়া যায়। জীবন-দর্শনে এই মৌলিক পার্থক্যের জন্য ইহাদের মধ্যে পরস্পর ভাবগত পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে।

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর চরিত্রগুলির মধ্যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে মানবিক গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু ধর্মমঙ্গল প্রমুখ কাব্যে তাহা পায় নাই, সেইজন্য সেই পরিমাণেই সেই সকল কাব্য অলৌকিকতায় ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু গীতিকায় সকল চরিত্রই পার্থিব নরনারী, সেইজন্য ইহাদের মধ্যে কোন দিক দিয়াই অলৌকিকতার স্পর্শ অনুভব করা যায় না। গীতিকা সর্বধর্মনিরপেক্ষ চিরন্তন মানবতার জয়গানে মুখর, কিন্তু মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীর জয়গান করিতে গিয়া নরনারীর কথা কোনও কোনও সময় মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে মাত্র, সুতরাং উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য স্বীকার করিতেই হয়।

মঙ্গলকাব্য এবং 'মৈমনসিংহ গীতিকা' উভয়েই সঙ্গীতের উদ্দেশ্যে রচিত; কিন্তু ইহাদের সঙ্গীত পরিবেষণের মধ্যে পার্থক্য আছে। মঙ্গলগান একজন মূল গায়েন দুই চারিজন দোহারের সাহায্যে দিবাপালা রাত্রিপালায় বিভক্ত করিয়া দিনের পর দিন গাহিয়া যায় গীতিকার মধ্যে নাথগীতিকা গোপীচন্দ্রের গানই দৈর্ঘ্যে মঙ্গলকাব্যের তুল্য, নাথগীতিকা প্রা

রাত্রিতে কিছু কিছু অংশ করিয়া একজন মূল গায়েন দোহারের সাহায্যে গাহিয়া থাকে। তাহার হাতে মঙ্গলগানের গায়েনের মত চামর মন্দিরা এবং পায়ে নূপুর থাকে না, মৈমনসিংহ গীতিকার গায়েন এক রাত্রেই সকল পালা গাহিয়া শেষ করে। তাহাকেও তিন চারিজন দোহারের সাহায্য লইতে হয়। তাহার হাতেও মঙ্গলগানের গায়েনের মত চামর মন্দিরা কিংবা পায়ে নূপুর থাকে না। চামর ধর্মীয় প্রতীক। ইহা হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত গায়েনের হাতেই দেখা যায়, তবে ধর্মের বিষয় অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ করে না বলিয়া গোপীচন্দ্রের গানের গায়েনের হাতে তাহা থাকে না, ধর্মের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নাই বলিয়াই ইহা 'মৈমনসিংহ-গীতিকার' গায়কের হাতেও থাকে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পর হইতেই মধ্যযুগের আখ্যায়িকা গীতিগুলির পরিবেষণের রীতি কোনও কোনও অঞ্চলে কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়া যায়। তখন নাটকীয় অভিনয়ের রূপ ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার ফলে চণ্ডীমঙ্গল চণ্ডীযাত্রা, মনসা-মঙ্গল ভাসান-যাত্রা ইত্যাদির রূপ লাভ করে। 'মৈমনসিংহ-গীতিকার' পালা গানগুলিও তখন হইতে কুৎসিত যাত্রার আকারে পরিবেষণ করা হইতে থাকে। তাহার ফলে ইহারা সমাজের নিন্দার কারণ হইয়া বিলুপ্তির সম্মুখীন হয়। মঙ্গলগানেরও সেই অবস্থা হইয়াছে। প্রাচীন রীতিতে গীতি পরিবেষণ এখন কদাচ দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাদের যাত্রারূপও বেশিদিন দর্শকের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হয় নাই বলিয়া তাহাও অচিরকাল মধ্যে পরিত্যক্ত হয়। গীতিকাগুলিরও একই পরিণাম হইয়াছে।

মঙ্গলকাব্যগুলি অক্ষরবৃত্ত পয়ার, ত্রিপদী, একাবলী ছন্দে রচিত। কিন্তু 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' এবং 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' আনুপূর্বিক স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের চারি পর্বের (তিনটি পূর্ণ পর্ব একটি অর্ধপূর্ণ পর্ব) চৌদ্দ মাত্রার পদদ্বারা রচিত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের ছন্দ ভারী চালের ছন্দ, কিন্তু গীতিকার ছন্দ হালকা চালের ছন্দ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মঙ্গলকাব্যের তুলনায় গীতিকায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ করিবার শক্তির কিছু অভাব ঘটিয়াছে, তাহা মনে করা যাইতে পারে না।

মঙ্গলকাব্য সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রভাব-জাত রচনা, ইহাদের নায়িকার রূপ বর্ণনায় অলঙ্কার শাস্ত্রের ধারা অনুসরণ করা হইয়াছে। সেইজন্য বর্ণনা অনেকাংশেই অকৃত্রিম এবং প্রাণস্পর্শী হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু গীতিকার উপর বহির্মুখী প্রভাব কিছুমাত্র নাই। পল্লীকবিগণ উপমা অলঙ্কার ব্যবহারের মধ্যে কোনও প্রচলিত ধারা অনুসরণ করিবার পরিবর্তে নিজেদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট জীবন অভিজ্ঞতাকেই প্রয়োগ করিয়াছেন। সেইজন্য সহজ সরলতার একটি বিশেষ গুণ তাহাদের রচনাকে অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের বর্ণনা কৃত্রিম পাণ্ডিত্যের ভারে ভারাক্রান্ত; অনেকসময় কবিদিগের স্বভাব-কবিত্ব বিকাশের পথ তাহা দ্বারা রুদ্ধ হইয়াছে। গীতিকা সহজ কবিত্বের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তিতে সার্থক হইয়াছে।

গীতিকাগুলি আঞ্চলিক ভাষায় রচিত বলিয়া ইহাদের সর্বজনীন আবেদন সত্ত্বেও বাংলা ভাষাভাষী সমাজের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু মঙ্গলকাব্য শিল্প-

সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য সমগ্র বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল ব্যাপিয়াই প্রচার লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। গীতিকাগুলির মধ্যে যে আঞ্চলিক রূপ সুস্পষ্ট হইয়া আছে, তাহাতে ইহাদের মধ্যে গ্রাম্যজীবন-সুলভ সরলতা প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা গ্রাম্য সমাজেরই রসোপলব্ধির বিষয় হইয়াছে; সমসাময়িক বিদগ্ধ সমাজের মধ্যে ইহা প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় নাই। সুতরাং মঙ্গলকাব্যগুলি বাংলাদেশের চণ্ডীমণ্ডপ এবং বারোয়ারীতলায় স্থান লাভ করিয়াছিল এবং সেখানে যাহাদের প্রবেশাধিকার ছিল না, তাহারাই কেবলমাত্র গীতিকার রস আস্বাদন করিয়াছে। সুতরাং বাংলাদেশের সে যুগের সামগ্রিক সাহিত্য বিচার করিতে গেলে মঙ্গলকাব্য এবং গীতিকাগুলিকে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক বলিয়া মনে করিতে হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, মঙ্গলকাব্য অলৌকিক দেবমাহাত্ম্যসূচক কাব্য এবং মৈমনসিংহ - গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ-গীতিকা লৌকিক প্রণয়-কাব্য, ইহা সম্পূর্ণ দেবদেবী নিঃসম্পর্কিত । কিন্তু নামে মাত্র দেবদেবীকে লক্ষ্য করিয়া সেই যুগে অন্তত একখানি লৌকিক প্রণয়াখ্যানমূলক মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহা কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য। ইহা লৌকিক প্রণয়াখ্যানমূলক কাব্য হইলেও সমসাময়িক কালে সমগ্র মঙ্গলকাব্যের প্রবল প্রভাবের ফলে ইহার মধ্যে দেবী কালিকার নাম এক ভাবে যুক্ত করিয়া দিয়ে ইহাকে কালিকামঙ্গল বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র প্রেম-ভাবনার সঙ্গে ইহার মৌলিক পার্থক্য আছে। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'য় প্রকৃত প্রেমের কথাই আছে, কিন্তু কালিকা-মঙ্গল কিংবা বিদ্যাসুন্দর কাব্যে যাহা আছে, তাহাতে প্রেমের স্পর্শ মাত্র নাই, বরং তাহাতে লালসার এক উগ্র রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। এমন কি, দেবতার নামেও তাহা শোধন হইতে পারে নাই। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র প্রণয়-গাথার সঙ্গে ইহার ভাবাদর্শের কোনও দিক দিয়াই যোগ অনুভব করা যায় না।

।। ১৭ ।। মুসলিম আখ্যায়িকাকাব্য ও মঙ্গলকাব্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষত খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে মুসলিম আখ্যায়িকাকাব্য নামে পরিচিত এক শ্রেণীর গীতি-আখ্যায়িকা প্রচলিত ছিল, তাহাদের সঙ্গেও মঙ্গলকাব্যের কি সম্পর্ক ছিল, তাহাও বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। মুসলিম আখ্যায়িকাকাব্য প্রধানত দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত— এক শ্রেণীর রচনায় মুসলিম ধর্মবিষয়ক কাহিনী কিংবা মুসলিম ধর্মপ্রচারকদিগের জীবনবৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায় এবং আর এক শ্রেণীর গীতি-কাহিনী লৌকিক প্রণয়-আখ্যান লইয়া রচিত। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত শ্রেণীর রচনার সঙ্গে চৈতন্য-জীবন-চরিত সাহিত্যের তুলনা করিতে পারা গেলেও দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর রচনা বাংলা সাহিত্যে সে যুগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অভিনব ছিল। কারণ, এই যাবৎ বাংলা সাহিত্যে কেবলমাত্র দেবদেবীর মাহাত্ম্যই কীর্তন করা হইয়াছে, লৌকিক প্রণয়ের কথা কাব্যাকারে প্রকাশ করিবার কোন কল্পনাও কেহ তখন পর্যন্ত করিতে পারে নাই; কেবলমাত্র লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহার

যে একটি ধারা অভিজাত সমাজের দৃষ্টিপথের অন্তরাল দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছিল, লিখিত সাহিত্যে তাহার কোনও প্রভাব ইতিমধ্যে প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু দেশে মুসলমান ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আরব্য এবং পারস্য ভাষায় লিখিত কথাসাহিত্যের মধ্য হইতে যে সকল লৌকিক প্রেমাখ্যান তাহাদের কাহিনীর গুণে ইতিপূর্বেই বিশ্বের মুসলমানধর্ম-প্রভাবিত দেশগুলিতে প্রচার লাভ করিযাছিল, তাহা ভারতবর্ষেও আসিয়া প্রচার লাভ করিতে লাগিল। চট্টগ্রাম বহুকাল পূর্ব হইতেই আরবীয় বণিকগণের একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে ব্যবহৃত হইতেছিল। সেইজন্য প্রধানত পূর্ববাংলার চট্টগ্রাম অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া মুসলমান গীতিকাহিনীগুলি রচিত এবং প্রচার লাভ করিতে লাগিল। চট্টগ্রামের সংলগ্ন অঞ্চল আরাকানও তখন বাঙ্গালী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেখানকার মগরাজ এবং তাঁহাদের মন্ত্রিগণ আরবী-ফারসী ভাষা হইতে বাংলা অনুবাদের পরম উৎসাহদাতা ছিলেন, তাঁহাদের নিকট উৎসাহ ও আনুকূল্য লাভ করিয়া আরাকান বাংলা সাহিত্যচর্চায় সে দিন একটি পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছিল।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের আকারে প্রথম যে মুসলমান কবি লৌকিক প্রণয় বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া গীতি-কাহিনী রচনা করেন, তাঁহার নাম সাবিরিদ খান। তিনি সম্ভবত নোয়াখালি জিলার অধিবাসী ছিলেন, তাঁহার প্রকৃত আবির্ভাবকাল জানিতে পারা যায় না। তিনি তাঁহার কাব্য রচনায় তাঁহার স্বদেশীয় একজন কবি শ্রীধর কবিরাজের 'কালিকা-মঙ্গল'কেই অনুকরণ করিয়াছিলে, এ'কথা সত্য; তবে 'কালিকা-মঙ্গল'-এর বিদ্যা এবং সুন্দরের যে লৌকিক প্রেমের একটি বৃত্তান্ত ছিল, তাহাই তাঁহাকে এই কাব্য রচনায় প্রেরণা দান করিয়াছিল, কালিকার মাহাত্ম্য রচনায় স্বভাবতই তিনি উৎসাহী ছিলেন না। ক্রমে লোর-চন্দ্রাণী, সোহ্‌রাব-রুস্তম, শিরি-ফরহাদ, লয়লা-মজনু, ইউসুফ-জোলেখা ইত্যাদি পারস্য প্রণয়োপাখ্যান বাংলায় অনূদিত হইয়া প্রচার লাভ করিতে লাগিল। ইহারাও মঙ্গলকাব্যের মত বাংলা কবিতায় পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দে রচিত হইল এবং বাংলায় লিখিত পুঁথি পাঠ করিবার যে একটি বিশিষ্ট রীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাই অনুসরণ করিয়া ইহারা মুসলমান সমাজে পঠিত হইতে লাগিল। অর্থাৎ মঙ্গলগান যে প্রকার একজন গায়েন হাতে চামর মন্দিরা লইয়া দোহারের সাহায্যে গান করিত, ইহারা তাহার পরিবর্তে সুর করিয়া যে ভাবে রামায়ণ মহাভারতের পুঁথি পাঠ করা হইত সেই ভাবে পঠিত হইয়া মুসলমান সমাজের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল।

স্বভাবতই ইহাদের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের মত কোন দেবদেবীর বন্দনা থাকিত না, তবে কখনও কখনও এক সৃষ্টিকর্তার বন্দনা থাকিত। মঙ্গলকাব্যের মত ইহারা পালায় পালায় বিভক্তও হইত না। তবে কাহিনীর খণ্ড ও বিভাগ থাকিত। তথাপি এই কথাটি অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে মঙ্গলকাব্যের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব হইতে ইহারা সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। ইঁহাদের কাব্যেও মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ কবিগণ বিস্তৃত আত্মবিবরণী দিয়াছেন, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা করিয়াছেন, পরিচ্ছেদ শেষে নিজের নামের ভণিতা যোগ করিয়াছেন; মঙ্গলকাব্যের ভঙ্গিতেই কাব্যের রচনাকাল অনেক সময় নির্দেশ করিয়াছেন;

এমন কি, পৌরাণিক কোনও কোনও বিষয়ের সঙ্গে তাঁহাদের বর্ণিত বিষয়ের তুলনা এবং উপমা প্রয়োগ করিতেন; যেমন একটি নিদর্শন পাওয়া যায় দৌলৎ কাজী রচিত 'লোর-চন্দ্রাণী' নামক কাব্যে,

বনপাশে নগর এক দ্বারাবতী নাম।
কৃষ্ণের দ্বারিকা যেন অতি অনুপাম॥
দ্বারাবতী উজ্জ্বল করিল ধর্মরাজ।
দ্বারিকাতে শোভে যেন গোবিন্দ-সমাজ॥

মঙ্গলকাব্যের মত ইঁহাদের রচনাতেও নায়িকার বারমাসী বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়। দৌলৎ কাজী তাঁহার 'লোর-চন্দ্রাণী'র বর্ণনায় কালিকা-মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্যকেই যে আদর্শ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত নিম্নোদ্ধৃত পদ দুইটি হইতেও বুঝিতে পারা যাইবে-

চন্দ্রাণীর তোমার মিলন মনোরম।
বিদ্যা সঙ্গে সুন্দরের যেন সমাগম॥

যদিও নানা ক্ষেত্র হইতে তাহাতে বিষয়-বস্তু সংগৃহীত হইয়াছিল, তথাপি ইহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই রচনাগত আদর্শ ছিল বিদ্যাসুন্দর কাব্য বা কালিকামঙ্গল। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচনার পূর্ববর্তী কাল হইতেই এই ধারা চলিয়া আসিলেও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্য মুসলমান কবিদিগের মধ্যেও এই বিষয়ক রচনার এক নূতন প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের মুসলমান কবি বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়াখ্যানের অনুকরণে বহু প্রণয়াখ্যান-মূলক কাব্য রচনা করিতে লাগিলেন। এমন কি, ভারতচন্দ্রের একশত বৎসর পর পর্যন্তও মুসলমান কবিদিগের উপর তাঁহার প্রভাব সক্রিয় ছিল। যে যুগে হিন্দু কবিদিগের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের রচনা অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছিল, সেই যুগে মুসলমান কবিগণ এই শ্রেণীর প্রণয়াখ্যানমূলক রচনার মধ্য দিয়া মঙ্গলকাব্য রচনার ধারা সক্রিয় রাখিয়াছিলেন। মুহম্মদ সিদ্দিকী নামক একজন কবি তাঁহার 'ভাব-লাভ' নামক উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত একটি অনুরূপ কাব্যে মঙ্গলকাব্যের অনুযায়ী আত্মপরিচয়, পিতৃপরিচয় ইত্যাদি উল্লেখ করিয়াছেন; তবে মুসলমান কবি বলিয়া স্বপ্নে দৈবাদেশের কথা উল্লেখ না করিয়া পিতৃআদেশে কাব্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন,

সুন্দর বিদ্যার পুথি কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি
ভারত যেমন রচেছিলো।
তব আজ্ঞা অনুসারে ভাব লাভ পুথি ক'রে
সেই মত ছিদ্দিকি রচিলো॥

মুসলিম প্রেমাখ্যানমূলক গীত-কাহিনী রচনায় মুসলমান কবিগণ যে কি ভাবে মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিক দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝিতে পাবা যাইবে।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের কবিগণ যে রাজা বা ভূস্বামীর অধীনে বাস করিতেন,

তাঁহাদেরও সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন। কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, দ্বিজমাধব প্রভৃতি মধ্যযুগের কবি গৌড়ের সুলতানদিগের গুণ-কীর্তন করিয়াছেন, মুহম্মদ সিদ্দিকী তেমনই বর্ধমানাধিপতি মাহাতাবচন্দ্র বাহাদুরের প্রশংসা করিয়াছেন,

ধর্মাবতার রাজাধিরাজ নৃপতি।
নামেতে মাহাতাবচন্দ্র বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
প্রতাপে দ্বিতীয় ইন্দ্র রাজার প্রধান।
রূপে গুণে নৃপবর রবির সমান॥
অসহ্য কৌরব জিনি ধর্মে যুধিষ্ঠির।
দানে দাতা কর্ণ মত দয়ার শরীর॥
প্রজার পালন করে পুত্রের সমান।
অকাতরে করে দান সমুদ্র প্রমাণ॥

মুহম্মদ সিদ্দিকীর উদ্ধৃত রচানাংশ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ বিষয়ক রচনার সঙ্গে প্রায় অভিন্ন, যেমন,

ঋতু শূন্য বেদশশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন সাহা নৃপতি তিলক॥
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহু বলে রাজা শাসিলা পৃথিবী॥
রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।
মুল্লুক ফতেহাবাদ বাঙ্গারোড়া তকসীম॥

সুতরাং মঙ্গলকাব্যের আদর্শ দ্বারাই যে এই বিষয়ক মুসলমান কবিগণ প্রভাবিত হইয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। তবে এই কথা সত্য, মুসলিম প্রণয়াখ্যানমূলক গাথাকবিতাগুলিতে প্রধানত কালিকা-মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্যটিকেই ভাব এবং আঙ্গিকের দিক হইতে অনুসরণ করা হইয়াছে, অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ভাবাদর্শের সঙ্গে মুসলিম প্রণয়াখ্যান-মূলক গীতি-কাহিনীর ভাবগত কোন সম্পর্ক ছিল না।

মুসলিম কবিদিগের রচিত পীরমাহাত্ম্য-সূচক এক শ্রেণীর কাব্য আছে, মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে ইহাদের বিষয়গত ঐক্য আছে। ইহারা ক্ষুদ্রাকৃতি, পূর্ণাঙ্গ মঙ্গলকাব্যের রূপ ইহাদের নাই, ইহারা পাঁচালী নামে পরিচিত। এই বিষয়ে সর্বাধিক জনপ্রিয় রচনার নাম সত্যপীরের পাঁচালী। সত্যপীর কোনও মুসলমান পীর ছিলেন, পরে হিন্দুসমাজের স্বীকৃতির পর তিনি নারায়ণের সঙ্গে একাকার হইয়া সত্যনারায়ণ রূপে পরিচিত হন। তাঁহার মাহাত্ম্য-প্রচার-মূলক কাহিনী মঙ্গলকাব্যের ভাবাদর্শ-অনুসারী রচনা। ইহার মধ্যেও মঙ্গলকাব্যের মতই দেবতাকে বিরোধের মধ্য দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবার আবশ্যক হইয়াছিল, অবিশ্বাসীর বিরুদ্ধে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী অনুযায়ীই তাঁহার ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসা-পারায়ণ রূপ ধারণ

করিতে হইয়াছিল। তবে সত্যনারায়ণ মূলত সত্যপীর নামক মুসলমান পীর হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সম্পর্কিত রচনা বা সত্যনারায়ণ পাঁচালী হিন্দু কবিরই রচনা; কারণ, হিন্দুসমাজেই তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন হইয়াছিল। তবে অন্যান্য কোনও কোনও পীরের মাহাত্ম্য সূচক রচনা মুসলমান কবিগণও রচনা করিয়াছিলেন, ইহাদের আকৃতি যেমন ক্ষুদ্র, সাহিত্যগুণও নগণ্য।

মুসলিম কবিদিগের কতকগুলি রচনা মুসলিম ধর্মসাধকদিগের জীবন এবং অলৌকিক আচার-আচারণের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে, ইহারা সাধারণত 'বিজয়' নামে পরিচিত। অবশ্য পূর্বে যে বিজয়কাব্য-লইয়া আলোচনা করিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে মুসলিম কবিদিগের বিজয়কাব্যের কোনও সম্পর্ক নাই। আখ্যায়িকা বর্ণনার ভিতর দিয়াই ইহাদের মধ্যে চরিত্রগুলির মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং ইহারাও আখ্যায়িকাকাব্য বলিয়াই গণ্য হইবার যোগ্য। ইহাদের উপরও সমসাময়িক হিন্দু কবিদিগের মঙ্গলকাব্য রচনার বহির্মুখী প্রভাব পড়িয়াছিল। ইহাদের কোনও কোনও রচনার মধ্যে ইসলামধর্ম প্রচার, কাফেরদিগকে বিনাশের বৃত্তান্ত যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অনেকটা সংস্কৃত পুরাণ-আখ্যায়িকার অনুরূপ। পূর্বেই বলিয়াছি, পুরাণের আদর্শেই প্রথমত মঙ্গলকাব্যগুলি সৃষ্টি হইয়াছিল।

॥ ১৮॥ অনুবাদ সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্য

পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে অধিকাংশই সংস্কৃত পুরাণের অনুবাদ মাত্র। দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠানে পুরোহিত কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় যে চণ্ডী পঠিত হয়, তাহাই দশজনের আসরে বাংলা ভাষায় গীত হওয়ার জন্য এই সকল অনুবাদের উদ্ভব হইয়াছিল। অতএব ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালীর কোন জাতীয় চরিত্র বা চিত্র স্থান পাইতে পারে নাই। ইহাদের সঙ্গে বাঙ্গালীর একটা বাহ্যিক ধর্মীয় যোগ থাকিলেও আভ্যন্তরীণ জাতীয় যোগ যে ছিল না, তাহা সত্য। এইজন্য পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যসমূহ জাতীয় পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে নাই। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ ব্যতীতও কোন কোন বিশেষ পৌরাণিক চরিত্র অবলম্বন করিয়া পৌরাণিক কাহিনীরই পরিবেশে আরও বহু মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল; এই সকল রচনার মধ্য দিয়া বাংলা ভাষার অনুশীলন হইলেও সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহাদের কোন প্রকার দান স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না।

সংস্কৃত মহাভারত ও ভাগবত পুরাণের বাংলা অনুবাদগুলিকে উপরোক্ত পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিলেও, এ'কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সংস্কৃতের অন্তত একখানি অনুবাদগ্রন্থ কতকটা বাঙ্গালীর জাতীয় রূপ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহা রামায়ণ। ইহার একমাত্র কারণ, এ-দেশের সম্প্রদায়-নির্বিশেষে পুস্তকখানির ব্যাপক প্রচার। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রামায়ণই সর্বাধিক প্রচলিত কাব্য। প্রচারের ব্যাপকতা এবং সর্বজনীন লোকপ্রিয়তার জন্যই রামায়ণের অনুবাদই সর্বাধিক লৌকিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। তাহার ফলেই ইহার মধ্যে বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্র কতকটা প্রতিফলিত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে যে সকল বিচ্ছিন্ন লৌকিক উপকাহিনী আসিয়া

সংযুক্ত হইয়া ইহাদিগকে জাতীয় কাব্যের মর্যাদা দান করিয়াছে সেই সকল বহু উপাদান গিয়া তাহাতেও আশ্রয় লাভ করিয়াছে। এই হিসাবে বাংলা রামায়ণ কতকটা বাংলার জাতীয় লক্ষণাক্রান্ত। বাঙ্গালীর বিশিষ্ট আচার, ধর্ম-বিশ্বাস, সংস্কৃতি ইত্যাদির পরিচয় বাংলার লৌকিক মঙ্গলকাব্যগুলি যে পরিমাণ বহন করিয়া থাকে, বাংলা রামায়ণগুলিও তদপেক্ষা কম বহন করে নাই। তথাপি এ'কথা সত্য যে, ইহাতে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চিত্রের মধ্যে বাংলার জাতীয় রূপের পরিচয় পাওয়া গেলেও সমগ্রভাবে বাংলা রামায়ণ কাব্যখানি বহির্বাংলার আদর্শের প্রতীক। বিশেষত বিভিন্ন সামাজিক আদর্শের দিক হইতে ইহা প্রভাবান্বিত হওয়ার ফলে, ইহার কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলির মধ্যেও আদর্শগত ঐক্য নাই। বাংলার বৈষ্ণবগণ নিজেদের ধর্মীয় আদর্শের দিক হইতে যেমন ইহার কাহিনী পুনর্গঠন করিয়াছেন, তেমনই শাক্তগণও ইহার উপর নিজেদের দিক হইতে যথেষ্ট কারুকার্য করিয়াছেন। এই দুই স্বতন্ত্র ও পরস্পর-বিরোধী ধর্ম-সম্প্রদায়ের হাতে পড়িয়াই ইহার কাহিনীগত ঐক্য ও সঙ্গতি নির্মমভাবে বিনষ্ট হইয়াছে। মূলত বাংলা রামায়ণের উপর তিনটি আদর্শই অল্পবিস্তর কার্যকর দেখিতে পাওয়া যায়—প্রথমত মূল রামায়ণের মৌলিক আদর্শ, দ্বিতীয়ত বাঙ্গালী বৈষ্ণবের ভক্তিবাদের আদর্শ ও তৃতীয়ত মঙ্গলকাব্যের শক্তিবাদের আদর্শ। এই তিন আদর্শের মধ্যবর্তী হইয়া ইহার কেন্দ্রীয় ঐক্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; বিশেষত চরিত্রসৃষ্টির মধ্যেও সঙ্গতি রক্ষা পায় নাই। তথাপি ইহার মধ্যেও কতকটা যে জাতীয় গুণ বর্তমান রহিয়াছে, তাহাও লক্ষ্য না করিয়া পারা যায় না।

মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি অনেক স্থলেই রামায়ণের স্থান অধিকার করিয়াছে। ধর্মমঙ্গলকাব্যগুলিই রাঢ়দেশের রামায়ণ। রামায়ণের কাহিনী ও আদর্শ সেখানে মঙ্গলকাব্যের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া পরিবেষণ করা হইয়াছে। মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলিও বাংলাদেশে রামায়ণের স্থান অধিকার করিয়াছিল। সীতার পাতিব্রত্যের আদর্শের তুলনায় বেহুলার পাতিব্রত্যের আদর্শই এদেশের সমাজকে অধিকতর মুগ্ধ করিয়াছে। তথাপি রামায়ণের যে সকল উৎকৃষ্ট অংশ বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিতে পারে, তাহাও কালক্রমে মঙ্গলকাব্যগুলির স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লওয়া হইয়াছে।

এ'কথা সত্য যে, রামায়ণ-মহাভারতের আদর্শ দ্বারা পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলি যেমন প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, তেমনই মঙ্গলকাব্য দ্বারাও রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদগুলি বহুলাংশে প্রভাবিত হইয়াছে। বাংলা মহাভারতে দাতাকর্ণের উপাখ্যানটি সর্বজনবিদিত; কিন্তু মূল সংস্কৃত মহাভারতে তাহা নাই। ধর্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র পালাটিই সামান্য রূপান্তরিত হইয়া বাংলা মহাভারতের অনুবাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। লৌকিক রামায়ণের হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ সংগ্রহের কাহিনীটি মনসা-মঙ্গলের শঙ্কর গারড়ীর কাহিনী হইতে গৃহীত। মঙ্গলকাব্য কিংবা রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদগুলি এ'দেশে পূর্ণাবয়ব লাভ করিবার পূর্বেই এই সকল কাহিনী লোক-গাথার আকারে সমাজে প্রচলিত ছিল; তারপর এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত লৌকিক কাহিনীকেই একত্র সমাবেশ করিয়া মঙ্গলকাব্যগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে। ক্রমে রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদসমূহও যখন এ'দেশে ব্যাপক প্রচার লাভ

করিতে লাগিল, তখন তাহারা স্বভাবতই সমসাময়িক এই মঙ্গলকাব্যগুলির প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিল না। ক্রমে মঙ্গলকাব্যের সর্বজয়ী প্রভাব এই সকল অনুবাদ সাহিত্যকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া দিল যে, এই সকল ভাষান্তর হইতে আগত কাব্য নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে বাধ্য হইল। অতএব মূলত বর্হিবাংলা ব্রাহ্মণ্য বাহন হইলেও, যে আকারে তাহাদের অনুবাদগুলি সেকালের সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা বাংলার জাতীয় কাব্য হিসাবে তাহাদের অনুবাদগুগলি সেকালের সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা বাংলার জাতীয় কাব্য হিসাবে তাহাদের দাবী একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তবে ইহাদের মৌলিক আদর্শ মূলত এ'দেশের সমাজ-নিরপেক্ষ ছিল বলিয়া এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্নমুখী প্রভাবের ফলে ইহাদের চরিত্রগত ঐক্য বহুলাংশে বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া এই অনুবাদ কাব্যগুলিকে বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

মঙ্গলকাব্যের বিষয়-বস্তুর উপর যখন বৈষ্ণব পদাবলীর স্নিগ্ধ মধুর রস বর্ষিত হইতে লাগিল, তখনই তাহা খণ্ড খণ্ড গীতি-কবিতায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। বাংলা কাব্যের ধারা তখন হইতে এক স্বতন্ত্র প্রবাহে আপনার পথ খুঁজিয়া পাইল। এই সকল খণ্ড গীতি-কবিতার মধ্যেও বাঙ্গালীর চিরন্তন ভাব-গতি অব্যাহত রহিয়া গেল। আগমনী গানে বাঙ্গালী কবির যে একটি অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়, মঙ্গলকাব্যেই তাহার প্রথম স্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল। এইভাবে দেখিতে পাই, মঙ্গলকাব্য ও তাহার পরবর্তী গীতি-কবিতাগুলি একই যোগসূত্রে আবদ্ধ।

॥ ১৯ ॥ ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্যের দেব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহার সহিত বাংলার স্ত্রী-সমাজ প্রচলিত ব্রতকথার দেব-চরিত্রের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। অতএব ইহাদের পরস্পর কি সম্পর্ক তাহা একটু বিস্তৃতভাবে এখানে আলোচনার প্রয়োজন। ব্রতকথাগুলি মেয়েলী ব্রতাচারের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছে, ব্রতাচার হইতে স্বতন্ত্র ইহাদের কোনও মূল্য কিংবা স্থান নাই। ব্রতকথাগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের এক একটি অপরিহার্য অঙ্গ, তাহার ফলে ইহাদের মধ্যে দিয়া একটি প্রধান গুণ এই প্রকাশ পাইয়াছে যে, বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া ইহারা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইতে রক্ষা পাইয়াছে। অতএব ব্রতকথাগুলি একটি প্রাচীনতর ও অধিকতর রক্ষণশীল ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং কোন কোন সময়ে যে ব্রতকথার কাহিনী পল্লবিত হইয়া মঙ্গল কাব্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে দেখা যায়, ইহার অর্থ এই যে, ব্রতকথা হইতেই মঙ্গলকাব্য রচনার প্রেরণা ও বিষয়-বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে—মঙ্গলকাব্য হইতে ব্রতকথার প্রেরণা কিংবা বিষয়-বস্তু গৃহীত হয় নাই।

ব্রতকথাগুলি ধর্মীয় আচারের অন্তর্ভুক্ত হইবার ফলে ইহারা বহুল প্রচারের ভিতর দিয়াও অপরিবর্তিত থাকিবার যে সুযোগ লাভ করিয়াছিল, মঙ্গলকাব্যগুলি তাহা হইতে বঞ্চিত

হইয়াছে। কারণ, মঙ্গলকাব্যগুলি কোনও বিশেষ পূজাচারের অন্তর্ভুক্ত নহে। কোনও দেবতার পূজা উপলক্ষে সেই দেবতার মঙ্গলগান গীত হইলেও তাহা কখনও প্রকৃত সেই পূজার অন্তর্নিবিষ্ট আচার রূপে গৃহীত হয় নাই। অর্থাৎ আর্থিক সঙ্গতি না থাকিলে কোনও দেবতার পূজা উপলক্ষে সেই দেবতার মঙ্গলগানের অনুষ্ঠান না করিলেও চলিতে পারে। কিন্তু ব্রতকথাগুলি আবৃত্তি না করিলে ব্রত সম্পূর্ণ হয় না। অতএব ব্রতকথাগুলি কোনও আকারেই পরিবর্তিত হইতে পারে না, অথচ মঙ্গলকাব্যের পক্ষে ইহার মূল কাহিনী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কোনও কোনও অংশ পরিবর্তিত ও পরিত্যক্ত হইতে কোনও বাধা নাই। সেইজন্য যুগে যুগে কবিগণ 'নূতন মঙ্গল' রচনা করিলেও 'নূতন ব্রতকথা' কেহ কখনও রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারা যায় না। সুতরাং ব্রতকথাগুলি যে মঙ্গলকাব্য হইতে প্রাচীনতর, এই বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিবার কোনও কারণ নাই। এখানে একটি দৃষ্টান্তেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। চৈতন্য-পূর্ববর্তী কাল হইতেই সমস্ত বাংলাদেশ ব্যাপিয়া মনসা-মঙ্গল কাব্য প্রচারিত থাকা সত্ত্বেও, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতেই মনসার ব্রতকথা নামক একটি ক্ষুদ্র ব্রতকথা সংগৃহীত হইয়াছে—ইহা এক সদাগর ও তাহার সাত পুত্রবধূর কথা। কেবল বাংলাদেশেরই বিভিন্ন অঞ্চল নহে, ইহা উত্তরপ্রদেশের এটোয়া জেলা এবং মহারাষ্ট্র ও গুজরাট হইতেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব কাহিনীটি অত্যন্ত প্রাচীন; তথাপি এখন পর্যন্তও ইহা প্রচলিত আছে। ইহার সহিত মনসা-মঙ্গলোক্ত কাহিনী অর্থাৎ চাঁদ সদাগর ও বেহুলার কাহিনীর কোনও সম্পর্ক নাই। অথচ এ'কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মনসা-মঙ্গলের কাহিনীটি অধিকতর কাব্যগুণ-সমৃদ্ধ। অতএব মঙ্গলকাব্য হইতে যদি ব্রতকথার উৎপত্তি হইত, তবে মনসার ব্রতকথায় চাঁদ সদাগর বেহুলার কাহিনী স্থান না পাইয়া সদাগরের সাত পুত্রবধূর একটি অকিঞ্চিৎকর কাহিনী স্থান পাইবার কোনই কারণ ছিল না। বরং মনসার ব্রতকথাটি হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মঙ্গলকাব্য অপেক্ষা প্রাচীনতর যুগে উদ্ভূত হইয়া মনসার ব্রতকথাটি মেয়েলী মনসাব্রতের আচারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল; সেইজন্য পরবর্তী কালে অধিকতর কাব্যগুণ-সমৃদ্ধ মনসা-মঙ্গলের কাহিনীটি প্রচারিত হইবার যুগেও ইহা তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছে। আচারের অন্তর্ভুক্ত না হইলে ইহা সহজেই পরিত্যক্ত হইত এবং ইহার পরিবর্তে স্বচ্ছন্দে সেখানে মনসা মঙ্গলের কাহিনীটি গৃহীত হইত। অতএব মঙ্গলকাব্য হইতে যে ব্রতকথার উৎপত্তি হয় নাই, তাহা এখানে সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। মনসার ব্রতকথার দৃষ্টান্ত হইতে ইহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে যে সর্বত্রই যে ব্রতকথা হইতেই মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাও নহে। মঙ্গলকাব্য অনেক সময় নূতন বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়াও রচিত হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া একবার কোনও দেবতার মঙ্গলগান সমাজে প্রচারলাভ করিলে সেই দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে গিয়া নূতন কোন বিষয়বস্তু অবলম্বন করা সম্ভব হইত না—শতাব্দীর পর শতাব্দী একই

বিষয়ের পুনরাবৃত্তি চলিতে থাকিত।

ব্রতকথার মৌখিক ধারা (oral tradition) অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া থাকে, মঙ্গলকাব্য লিখিত (written) সাহিত্যের অন্তর্গত। প্রত্যেক দেশেই মৌখিক সাহিত্য ভিত্তি করিয়াই লিখিত সাহিত্য জন্মলাভ করিয়া থাকে, লিখিত সাহিত্য হইতে মৌখিক সাহিত্য সৃষ্টি হইবার নিদর্শন ক্বচিৎ পাওয়া গেলেও ব্রতকথার মৌখিক ধারার উপরই কালক্রমে মঙ্গলকাব্যের লিখিত সাহিত্যের ধারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করিতে হয় যে, ইহার লিখিত ধারা অর্থাৎ মঙ্গলকাব্য রচনার ধারা প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার মৌখিক ধারাটি লুপ্ত হইয়া যায় নাই। কারণ, মঙ্গলকাব্য দ্বারা ব্রতকথার কোনও উদ্দেশ্যই সাধিত হয় নাই। ব্রতকথার প্রতিপালক স্ত্রীসমাজ, মঙ্গলকাব্য পুরুষের সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট এবং তাহা দ্বারাই প্রতিপালিত হইয়া থাকে। ব্রতকথার ভিতর দিয়া নারীজীবনের ব্যক্তিগত নানা ঐহিক কামনার অভিব্যক্তি দেখা যায়—মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে বৃহত্তর সমাজ-চেতনা রূপলাভ করে। ব্রতকথার আবৃত্তি পারিবারিক অনুষ্ঠান মাত্র, কিন্তু মঙ্গলগান বৃহত্তের সামাজিক অনুষ্ঠান। ব্রতকথা অন্তঃপুরের বিষয়, মঙ্গলগান বারোয়ারীতলার বিষয়। একটির ভিতর দিয়া পারিবারিক জীবন ও অপরটির ভিতর দিয়া গোষ্ঠীজীবন প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্র পরস্পর স্বতন্ত্র—একের অভাব অন্য দ্বারা দূর হয় নাই, বাংলার সমাজের বিশেষ অবস্থায় মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও বিকাশ হইয়াছিল, সেই অবস্থা বিলুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার অধঃপতন ও পরিণামে সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটিয়াছে; কিন্তু রক্ষণশীল স্ত্রীসমাজের ভিতর দিয়া ব্রতকথা আজ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছে। সমাজের মধ্য হইতে ভাব সংগ্রহ করিত বলিয়া সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের অন্তর্নিহিত ভাব ক্রমবিবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু শাশ্বত ব্যক্তিস্বার্থবোধের উপর ব্রতকথার ভিত্তি ছিল বলিয়া তাহা শত শত বৎসরের ব্যবধানেও অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে। অতএব মঙ্গলকাব্য ব্রতকথার দাবী পূর্ণ করিতে পারে নাই, সেইজন্য মঙ্গলকাব্যগুলির বহুল প্রচারের যুগেও ব্রতকথাগুলি অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছিল এবং বর্তমান যুগে মঙ্গলকাব্য লুপ্ত হইয়া গেলেও ব্রতকথাগুলি অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছে—পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষা-সংস্পর্শহীন স্ত্রীসমাজ এখনও ইহা প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু পল্লীসমাজেও মঙ্গলগানের আর প্রচলন নাই।

তথাপি এ'কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মঙ্গলকাব্যের চরিত্রের পরিকল্পনা ব্রতকথারই দেব-চরিত্র পরিকল্পনার প্রভাব-জাত। অন্তঃপুরাশ্রিতা অসহায়া নারী দৈব করুণার উপর সর্বতোভাবে আত্মনির্ভর করিয়া যেমন নিজের অবস্থার মধ্যে শান্তি ও সান্ত্বনার সন্ধান পাইয়া থাকে, একদিন তুর্কী আক্রান্ত বাংলার হিন্দু সমাজও অন্তঃপুর-বন্দিনী নারীর মতই তেমনই অসহায় বোধ করিয়াছিল। আত্মশক্তিতে মানুষ যখন বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে তখন সে স্বভাবতই দৈব-শক্তির উপর নির্ভর করে। যে অসহায় অবস্থার ভিতর দিয়া

নারী দৈবশক্তির উপর নির্ভর করিয়া ব্রতকথাগুলির জন্মদান করিয়াছে, সেই অবস্থার ভিতর দিয়াই পুরুষকেও মঙ্গলকাব্যের দেবত্ববোধ জাগ্রত করিতে হইয়াছিল বলিয়া উভয়ের পরিকল্পিত দেবচরিত্রের মধ্যে ঐক্য প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ'কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর উপর মেয়েলী ব্রতকথাগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাবও কিছু কিছু কার্যকর হইয়াছে। সেইজন্য অন্যান্য বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও ব্রতকথার মূল দেব-চরিত্র এবং মঙ্গলকাব্যের মূল দেবচরিত্রের মৌলিক উপাদান বিষয়ে বিশেষ কোন পার্থক্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। উভয়দিকেই উদ্দিষ্ট-দেবতা ভক্তের রক্ষক এবং অভক্তের সংহারক এবং উভয়ক্ষেত্রেই দেবতাদের মর্ত্যলোকে নিজস্ব পূজা প্রচারই লক্ষ্য।

ব্রতকথার অনেক অপরিস্ফুট বিষয় মঙ্গলকাব্যের ভিতর দিয়া সুপরিস্ফুট হইয়াছে; এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে মঙ্গলকাব্যগুলি অনেক সময় ব্রতকথার টীকা বা ভাষ্যের কাজ করিয়াছে। ব্রতকথার মধ্যে সূত্রাকারে যে সকল বিষয় অবস্থান করিয়াছে, মঙ্গলকাব্যে তাহাই বিস্তৃততর বর্ণনালাভ করিয়াছে। ব্রতকথার সূত্র বা ইঙ্গিতগুলিকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য নূতন নূতন চরিত্র ও ঘটনা সন্নিবেশের স্বাধীনতা মঙ্গলকাব্যের কবিগণ সর্বদাই গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্রতকথার চরিত্রগুলি কোনও বিশিষ্ট পরিচয় লাভ করিতে পারে না, তাহাদের নির্বিশেষ পরিচয়মাত্র প্রকাশ পায়; যেমন, এক রাজা, এক সদাগর কিংবা এক বামুন। কিন্তু মঙ্গল কাব্যের চরিত্রগুলি বিশিষ্ট পরিচয় লাভ করিয়া থাকে; যেমন, রাজা বীরসিংহ, রাজা চন্দ্রকেতু, চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগর, সোমাই ওঝা ইত্যাদি। এই জন্যই ব্রতকথায় চরিত্রগুলি সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পায় না, মঙ্গলকাব্যে ব্রতকথার চরিত্রগুলির এই অভাব পূর্ণ হইয়া থাকে—ইহাতে প্রত্যেক চরিত্রই সুস্পষ্ট ব্যক্তিপরিচয় লাভ করিয়া আধুনিক উপন্যাসবর্ণিত চরিত্রের মর্যাদা লাভ করে।

ব্রতকথার প্রধান ধর্ম সংক্ষিপ্ততা, বর্ণনার বাহুল্য ইহাতে সাধারণত পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। ইহা মৌখিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য; কারণ, সংক্ষিপ্ততা স্মরণ করিয়া রাখিবার পক্ষে সহায়ক হইয়া থাকে। মঙ্গলকাব্য লিখিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণনা-বাহুল্য ইহার বৈশিষ্ট্য। মঙ্গলকাব্যের বিষয় বর্ণনা অনেক সময় 'এপিক-ধর্মী' হইয়া উঠে, কিন্তু ব্রতকথায় এই গুণ প্রকাশ পাইবার উপায় নাই। ব্রতকথায় চিত্র-রূপের বৈচিত্র্য নাই; ঐশ্বর্যের পরিচয় দিতে হইলে সকল ব্রতকথাতেই শুনিতে পাওয়া যাইবে 'হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, গোয়াল ভরা গরু, মরাই ভরা ধান'। ইহার চরিত্রগুলি যেমন নির্বিশেষ, তেমনই ইহার কোনও চিত্ররূপও সবিশেষ পরিচয় লাভ করিতে পারে না; সেইজন্য ইহার চরিত্রগুলির মত চিত্রগুলিও মনের উপর কোনও দাগ কাটিতে পারে না।

পারিবারিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ হইতে জাত সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় প্রেরণায় ব্রতকথাগুলির জন্ম; অলৌকিকতা ইহাদের অবলম্বন; কিন্তু মঙ্গলকাব্যগুলি বৃহত্তর সমাজ-চেতনার ফল, ইহাদের বাস্তব ধর্ম অনেক সময় ইহাদের অলৌকিকতাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া উচ্চাঙ্গ সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা দিয়া থাকে। ব্রতকথার পরিকল্পনায় রক্ষণশীল ও মঙ্গলকাব্যের

পরিকল্পনায় প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় প্রকাশ পায়। কারণ, ব্রতকথা কোনদিন নতুন করিয়া রচিত হইবার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু 'নূতন মঙ্গল' রচিত হইয়া সর্বদাই সমাজের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

।। ২০ ।। পাঁচালী ও মঙ্গলকাব্য

ব্রতকথাগুলি প্রধানত গদ্যেই আবৃত্তি করা হইয়া থাকে। কোন কোন সময় ইহাদের গদ্যরূপ পদ্যাকারে পরিবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ইহাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট লোপ পাইয়াছে। গদ্যে আবৃত্তির ভিতর দিয়া কথার (tale-এর) যে একটি বিশিষ্ট রস প্রকাশ পায়, পদ্যের বাঁধাধরা ও একঘেয়ে ছন্দের মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশ পাইতে পারে না। গদ্যেরও যে একটি ছন্দ ও সুর আছে, ব্রতকথার আবৃত্তির মধ্য দিয়া তাহা ধরা পড়ে। মৌখিক সাহিত্য-ধারার অন্তর্গত গদ্য ব্রতকথা গুলি যখন কোনও কোনও ক্ষেত্রে লিখিত হইবার প্রয়োজন দেখা দিল, তখন তাহাদের গদ্যরূপ পরিহার করিয়া বৈচিত্রহীন পয়ার-ত্রিপদী বা পাঁচালী-লাচাড়ী ছন্দে পদ্যাকারে সেগুলি লিখিয়া লইবার প্রবৃত্তি দেখা দিল। ইহার কারণ, সেকালের বাংলা সাহিত্যে গদ্যের কোন লিখিত রূপ ছিল না—যাহা কিছু লিখিত হইত, তাহাই পদ্যে লিখিত হইত। সেইজন্য লক্ষ্মীর ব্রতকথার যখন আমরা মৌখিক আবৃত্তি শুনি , তখন ইহা গদ্যেই শুনিতে পাই, কিন্তু যখন ইহার লিখিত রূপ পাঠ শুনি, তখন তাহা পদ্যেই শুনিতে পাই। পুরুষ পুরোহিতের হাতে পড়িয়া কোনও কোনও ব্রতকথা লিখিত হইয়া পদ্যরূপ লাভ করিয়াছে; অতএব যে সকল দেবতায় পুরুষের প্রয়োজন, একান্তভাবে নারীর স্বার্থের সঙ্গে যাঁহাদের বিশেষ কোনও যোগ নাই, তাঁহাদের সম্পর্কিত ব্রতকথাগুলি অধিকাংই পদ্যরূপ লাভ করিয়া প্রচারিত হইয়াছে। ব্রতকথার পদ্যরূপের নাম পাঁচালী। অবশ্য পাঁচালী কথাটি আরও নানা অর্থে খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই সকল বিভিন্ন অর্থ এখানে বিশ্লেষণ কবিবার প্রয়োজন নাই, তবে সাধারণ ভাবে এ কথা এখানে বলা যাইতে পারে যে, আখ্যায়িকামূলক পদ্য রচনাকেই মধ্যযুগে পাঁচালী বলিত। সেই অর্থেই ব্রতকথার পদ্যরূপকে পাঁচালী বলা হইলেও কালক্রমে ইহা একটি বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। এই শ্রেণীর তিনটি পাঁচালী মধ্যযুগের শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে—তাহা সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শনির পাঁচালী এবং ত্রিনাথের পাঁচালী। ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যের দেবচরিত্রের সঙ্গে ইহাদের পার্থক্য এই যে, ব্রতকথার দেবতা প্রধানত স্ত্রী জাতীয়া, কিন্তু ইঁহারা সকলেই পুরুষ। ব্রতকথার দেব-চরিত্রের সঙ্গে একমাত্র নারীরই সম্পর্ক—নারীর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-সমৃদ্ধিরই তাঁহারা দাত্রী, পুরুষের বহির্মুখী-জীবনের সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তাঁহাদের বিশেষ কোন যোগ নাই। কিন্তু সত্যনারায়ণ, শনি এবং ত্রিনাথ—ইঁহারা সকলেই পুরুষের বহির্মুখী জীবনের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হইয়া পুরুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। ইহাদের কাহারও সম্পর্কে কোন গদ্য ব্রতকথা প্রচলিত নাই; কারণ, স্বতন্ত্র ভাবে

নারীর সমাজে তাঁহাদের কোনও প্রতিষ্ঠা নাই। পুরুষের মনেই তাঁহাদের মাহাত্ম্যের বিকাশ হইয়াছে, সেইজন্য তাহাদের মাহাত্ম্যসূচক পদ্য রচনাই সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, এই পদ্য রচনাই পাঁচালী নামে পরিচিত। মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে ইহাদের মৌলিক সম্পর্ক রহিয়াছে।

বাংলাদেশে লৌকিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্যসূচক যত পাঁচালী প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পাঁচালীর সর্বাধিক প্রচার হইয়াছিল। ইহার উদ্ভব যে খুব প্রাচীন, তাহা বলিতে পারা যায় না; কারণ, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী ইহার কোনও পুঁথিই পাওয়া যায় না, কিংবা প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যেও সত্যনারায়ণের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। 'স্কন্দপুরাণে'র এক স্থলে সত্যনারায়ণের উল্লেখ আছে সত্য, তবে তাহা যে পরবর্তী যোজনা তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব মনে হয়, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী কিংবা তাহার সামান্য পূর্ববর্তী কালের কোনও অলৌকিক-সিদ্ধ মুসলমান ফকির বা পীরকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার সমসাময়িক কাল কিংবা তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পরবর্তী কাল হইতেই সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পাঁচালীগুলি রচিত হইতে আরম্ভ করে।

মুসলমানগণ কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর ভারত হইতে মুসলমান ফকিরগণ বাংলাদেশে আসিয়া প্রবেশ করিতে আরম্ভ করেন এবং রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় তাঁহারা এদেশের সমাজের জনসাধারণের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচারে মনযোগী হন। রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য-পুষ্ট এই সকল মুসলমান সাধু ফকিরদিগের প্রতি হিন্দু জনসাধারণের দৃষ্টি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি তাহাদের যে অবিমিশ্র শ্রদ্ধাভাবের উদয় হয়, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। শ্রদ্ধাভাবটি এখানে ছিল গৌণ; যে ভাবটি মুখ্যত উদয় হইয়াছিল, তাহা ভয়। আত্মশক্তিতে মানুষ যখন বিশ্বাস হারায়, তখনই দৈবশক্তির উপর তাহার নির্ভর করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে, এ'কথা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। মুসলমান রাজশক্তি কর্তৃক শাসিত বাংলার হিন্দু সমাজ সেদিন আত্মশক্তিতে বিশ্বাস রক্ষা করিবার সকল প্রকার অবলম্বন হইতে বঞ্চিত হইয়া একান্ত দৈবনির্ভরশীল হইয়া উঠিয়াছিল। সাহিত্যের ভিতর দিয়াও এই মনোভাবের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল; তাহার ফলেই মধ্যযুগের বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলি যেমন গড়িয়া উঠিয়াছিল, পাঁচালীগুলিও তেমনই গড়িয়া উঠিয়াছিল। সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পাঁচালীর মধ্যেও সেইজন্য মঙ্গলকাব্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যগুলি চারি শত বৎসর ব্যাপিয়া বাংলার আখ্যায়িকা-মূলক কাব্য রচনার যে ধারার প্রবর্তন করিয়াছিল, সেই ধারারই দূরতম শাখারূপে সত্যনারায়ণের পাঁচালী জন্মলাভ করিয়াছিল।

চৈতন্যধর্ম প্রবর্তিত হইবার পর হইতে সমাজে শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণের উপাসনা একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিল। মুসলমান ধর্মের বলিষ্ঠ একেশ্বরবাদ যখন এদেশে প্রসার লাভ করিতেছিল, তখন চৈতন্যধর্ম শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণকে অবলম্বন করিয়া এদেশের মধ্যে এক

সুস্পষ্ট একেশ্বরবাদ গড়িয়া তুলিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ বহির্ভূত তৎকালীন বাংলার হিন্দু সমাজের উপরও তাহার প্রভাব স্বভাবতঃই বিস্তৃতি লাভ করিল। এই যুগে সত্যপীর সত্যনারায়ণরূপে হিন্দুর গৃহে পূজা লাভ করিতে লাগিলেন। ইহার বিজাতীয় সকল উপকরণ নারায়ণের নামে শোধিত হইয়া হিন্দুর দেব-মন্দিরে নিঃসঙ্কোচে প্রবেশাধিকার লাভ করিল।

বাংলাদেশ প্রাচীনকাল হইতেই ধর্মসমন্বয়ের দেশ। কৃত্তিবাস বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রকে দিয়া শক্তিদেবী চণ্ডীর পূজা করাইয়াছেন; বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধিকাকে দিয়া কৃষ্ণকালীর উপাসনা করিয়াছেন,—তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণই কালীরূপে কল্পিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম সমাজের বহু সঙ্কীর্ণতা ও ছোটবড়র পার্থক্য দূর করিয়া দিয়াছে। মুসলমান ধর্ম যখন বাংলাদেশের উপর আপনার একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, তখন হিন্দু সমাজ তাহার সম্মুখ হইতে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিবার পরিবর্তে তাহার সম্মুখীন হইয়া মুসলমান ধর্মের মৌলিক উপাদান গুলিকে নিজের ধর্মের মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লইয়াছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ধর্মসমন্বয়ের আদর্শ সকল দিক দিয়াই পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল এবং তাহারই অবশ্যম্ভাবী ক্রমপরিণতিরূপে আমরা খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণেশ্বরের মূর্তিমান বেদান্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে লাভ করিয়াছি; বাঙ্গালীর সর্বধর্মসমন্বয়ের দীর্ঘ সাধনা তাঁহার মধ্যেই চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। সত্যনারায়ণ উপাসনার মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই প্রয়াসের মৌলিক উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, অল্পদিনের মধ্যেই হিন্দু সমাজ তাহা বিস্মৃত হইয়া সত্যনারায়ণের উপাসনাকে নিজস্ব ধর্মাচারের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিল। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের গবেষকদের মধ্যে ইহার যে তাৎপর্যই অনুভূত হউক না কেন, হিন্দু সমাজের নারায়ণোপাসনার মধ্যেই ইহার পরিণতি আজ সুনির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। সত্যনারায়ণের নামে ভগবানের অহৈতুকী করুণা-শক্তির উদ্বোধনই আজ এই উপাসনার লক্ষ্য। সত্যনারায়ণের পাঁচালী বাংলার জনশ্রুতিমূলক (traditional) সাহিত্যের অন্তর্গত; যে কবিই ইহা বাংলার যে অঞ্চলেই সর্বপ্রথম রচনা করুন না কেন, তাহা আজ বাংলার সর্বত্রই যে কেবলমাত্র প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহা নহে—ইহার মৌলিক বৈশিষ্ট্যও সর্বত্রই সমানভাবে রক্ষা পাইয়াছে। সত্যনারায়ণের পাঁচালী সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষেই পুরোহিত কিংবা তাঁহার সহকারী কর্তৃক পাঠ করা হয়—এই আবৃত্তি পূজাচারেরই অন্তর্ভুক্ত। সেই জন্যই মৌলিক কাহিনীতে ইহার কোনও পরিবর্তন সাধন সম্ভব হয় নাই। তবে শত শত কবি আড়াই শত বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ এই বিষয় অবলম্বন করিয়া পাঁচালী রচনা করিয়া আসিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দুইজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গলী কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য এবং ভারতচন্দ্র রায়ও এই বিষয়ে পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই দুজন কবির রচনা সমগ্র সমাজের এই বিষয়ক পাঁচালী রচনার ধারা রুদ্ধ করিয়া দিতে পারে নাই—দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন কবি বিভিন্ন সময়ে একই বিষয় অবলম্বন করিয়া পাঁচালী রচনা করিয়াছেন। অতএব বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয়ে ইহাদের যে স্থানই থাকুক না-কেন, বাংলার আঞ্চলিক রস ও

অধ্যাত্ম পরিচয়ে যে ইহাদের মূল্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়, তাহা স্বীকার করিতেই হয়।

শনির পাঁচালী সত্যনারায়ণের পাঁচালীর মত ব্যাপক প্রসার লাভ করিতে পারে নাই—প্রধানত পূর্ববঙ্গেই ইহার প্রচার সীমাবদ্ধ। শনির পূজা উপলক্ষেই ইহা পঠিত হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত ইহার কোন স্বাধীন পরিচয় নাই। শনির দশায় মানুষ কি প্রকার অকারণ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া থাকে, তাহারই কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীবৎস-চিন্তার পৌরাণিক আখ্যানের ভিতর দিয়া অনুরূপ ভাব ব্যক্ত করা হইলেও, বাংলার শনির পাঁচালীর কাহিনীটির সঙ্গে পুরাণের কোনও যোগ নাই। ইহা বাঙ্গালীর নিজস্ব সমাজ-জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে জাত। শনি ম্লেচ্ছ গ্রহ—হিন্দুর গৃহাভ্যন্তরে তাঁহার পূজার অনুষ্ঠান হয় না, উন্মুক্ত গৃহাঙ্গিনায় তাঁহার পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে এবং সেখানেই তাঁহার পাঁচালী রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারা যায় না—ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যের অনুযায়ী কোন সদাগর চরিত্র ইহার নায়ক নহে। ইহার নায়ক ব্রাহ্মণ, সুতরাং দরিদ্র এবং ভিক্ষুক। কিন্তু কাহিনীর মধ্যে দিয়া ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যোচিত অন্যান্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। রচনার দিক দিয়া ইহাও অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে।

সর্বশেষে ত্রিনাথের পাঁচালীর কথা উল্লেখ করিতে হয়। ইহার প্রচার সর্বাপেক্ষা সীমাবদ্ধ। কেবলমাত্র দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের অশিক্ষিত নাথসম্প্রদায়ের পুরুষ সমাজেই ইহা প্রচলিত। হিন্দু সমাজের নিম্নতর স্তরে ব্রতকথা কিংবা মঙ্গলকাব্য ও পাঁচালীর প্রচলন নাই। কিন্তু ত্রিনাথের পাঁচালী যাহার মধ্যে প্রচলিত, তাহা সমাজের নিম্নতর স্তর বলিয়াই উল্লেখ করিতে হয়। অবশ্য এ-কথা বলিতে পারা যায় যে, একদিন নাথসম্প্রদায় হিন্দুসমাজ-নিরপেক্ষ এক স্বতন্ত্র সমাজ ছিল; অতএব হিন্দু সমাজের তুলনায় তাহা নিম্ন বিবেচিত হইলেও ইহার নিজস্ব ক্ষেত্রে ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সাধারণত এই সমাজ সম্পূর্ণ নিরক্ষর, অতএব ত্রিনাথের পাঁচালী পদ্যাকারে রচিত হইলেও ইহা মৌখিক সাহিত্যের অন্তর্গত। অতএব এই দিক দিয়া ইহা ব্রতকথার সমধর্মী। ত্রিনাথ অবশ্য কালক্রমে শিবের সঙ্গে অভিন্ন হইয়াছেন, কিন্তু হিন্দু ত্রয়ী (trinity) ও বুদ্ধ ত্রিশরণের মতই এককালে ইহা দ্বারা নাথসম্প্রদায়ের তিনজন শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু অর্থাৎ মীননাথ, গোরক্ষনাথ ও জালন্ধরীনাথকে বুঝাইত বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যের দেব-চরিত্রের প্রভাব ইহার উপর স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, হিন্দু সমাজের প্রত্যক্ষ সংস্রবের বহির্দেশেও মঙ্গলকাব্যের প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ত্রিনাথের পাঁচালীর কাহিনী নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাহাতে দেবতা ত্রিনাথের অহৈতুকী করুণা ও অলৌকিক শক্তির কথা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার মধ্যে দিয়া যে কাহিনীগুলি প্রকাশ পায়, তাহা অক্ষম অনুকরণেরই ফলমাত্র।

।। ২১ ।। বিজয়কাব্য ও মঙ্গলকাব্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'বিজয়' বলিয়া পরিচিত কয়েকখানি কাব্য প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ ইহাদিগকে 'বিজয়-কাব্য' আখ্যা দিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে 'বিজয়-কাব্যে'র

কি পার্থক্য, তাহা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হয়। দেখিতে পাওয়া যায় যে, মঙ্গলকাব্যের মত একই শ্রেণীর বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া 'বিজয়-কাব্য' রচিত হয় না। মালাধর বসু কৃত 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদের নাম 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' বা 'গোবিন্দ-বিজয়'। ইহা অনুবাদ-সাহিত্যের অন্তর্গত। কোনও কোনও মহাভারতের অনুবাদকেও 'পাণ্ডব-বিজয়' বলা হয়। 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে'র অন্তর্গত 'দুর্গাসপ্তশতী' অবলম্বনে রচিত বাংলা পদ্য রচনাকে সাধারণত 'চণ্ডী-বিজয়' বলিয়া উল্লেখ করা হইত। বলা বাহুল্য যে 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়', 'পাণ্ডব-বিজয়', 'চণ্ডী-বিজয়' প্রভৃতির মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্কই নাই—ইহারা বিভিন্ন বিষয়ক সংস্কৃত রচনার বাংলা অনুবাদ মাত্র। তারপর নাথগুরু গোরক্ষনাথের মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়া মধ্যযুগের পল্লীকবিগণ যে আখ্যায়িকা-গীতি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'গোরক্ষ-বিজয়'। ইহা বাংলার নাথ-সম্প্রদায়বিষয়ক রচনা হইলেও, লোক-সাহিত্যের (folk literature) অন্তর্গত। ইহাতে কয়েকজন নাথগুরুর অলৌকিক ভজন-সাধনের কথা বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি ইহার কাহিনী মানবিক গুণ-সমৃদ্ধ। বিষয়বস্তু, আঙ্গিক ও ভাব—ইহাদের কোনদিক হইতেই ইহার সঙ্গে পূর্বোক্ত রচনাগুলির কোনই যোগ নাই। মুসলমান ধর্মবিষয়ক উপকরণ গ্রহণ করিয়া 'রসুল-বিজয়' নামকও একখানি কাব্য রচিত হইয়াছিল—বলাই বাহুল্য যে, ইহার সঙ্গেও পূর্বোল্লিখিত কোন রচনাই কোনও সম্পর্ক নাই। অতএব ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মঙ্গলকাব্য যেমন প্রায় অভিন্ন প্রকৃতির বিষয়বস্তু লইয়া একই আদর্শে অনুপ্রাণিত রচনা, তথাকথিত 'বিজয়-কাব্য' তেমন নহে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'বিজয়-কাব্য' নামে কোন কাব্যের শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব হয় না, 'বিজয়' নাম ধেয় কাব্যসমূহের কোন কোনটি অনুবাদ-সাহিত্যের অন্তর্গত, কোনটি লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত আবার কোনটি মুসলমান-সাহিত্যেরও অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায়। অতএব মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'বিজয়-কাব্য' বলিয়া কাব্যের কোনও শ্রেণীবিভাগ কিংবা মঙ্গলকাব্যগুলির সঙ্গে ইহাদের কোনও সম্পর্কের কথা স্বীকার করা যায় না।

।। ২২ ।। লোক-কথা ও মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্য লিখিত (written) সাহিত্য-ধারার অন্তর্গত এবং লোক-কথা মৌখিক (oral) সাহিত্য-ধারার অন্তর্গত হইলেও উভয়ের মধ্যে বিষয়গত কতকগুলি সাদৃশ্যও দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার কারণ লোক-সাহিত্যের মৌখিক ধারা (oral tradition)-র উপর ভিত্তি করিয়াই মঙ্গকাব্যের লিখিত (written) ধারার সৃষ্টি হইয়াছে। লোক-সাহিত্যের যে বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছে, তাহা প্রধানত ব্রতকথা হইলেও লোক-কথা (folk-tale)-র বহু বিভিন্ন উপাদানও আসিয়া কালক্রমে ইহাতে সংমিশ্রণ লাভ করিয়াছে। কেবলমাত্র 'মনসা-মঙ্গল' কাহিনী হইতে তাহাদের কিছু নিদর্শন এখানে উল্লেখ করা গেল।

লোক-কথয় দেবদেবীর জন্ম একটি অতি উল্লেখযোগ্য বিষয়; দেবতা অলৌকিক চরিত্র, অতএব অলৌকিক উপায়েই ইঁহাদের জন্ম হইয়া থাকে। পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিদ্গণ এই বিষয়টিকে supernatural birth motif বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। মনসা-মঙ্গল কাব্যে মনসার জন্মবৃত্তান্তটি যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, ইহার মধ্যেও এক অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। শিব-বীর্যে পদ্ম-পাতার উপর অযোনি-সম্ভবা মনসার জন্ম হইয়াছে—স্বাভাবিক নিয়মে জননীগর্ভে তাঁহার জন্ম হয় নাই। বিভিন্ন জাতির লোক-সাহিত্যে এই বিষয় অবলম্বন করিয়া অগণিত রূপকথা (fairy tale) রচিত হইয়াছে।

লোক-কথার একটি সাধারণ বিষয় এই যে, ইহাতে কনিষ্ঠ পুত্র, কনিষ্ঠা কন্যা কিংবা কনিষ্ঠা পুত্রবধূ অসাধ্য সাধন করিবে। পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিদ্গণ ইহাকে successful youngest son (daughter or daughter-in-law) motif বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মনসা-মঙ্গল কাহিনীর মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, চাঁদ সদাগরের কনিষ্ঠ পুত্র লখীন্দর এবং কনিষ্ঠা পুত্রবধূ বেহুলা যথার্থই অসাধ্য সাধন করিয়াছে। বাংলাদেশেও কোন কোন রূপকথায় শুনিতে পাওয়া যায় যে, রাজা তাঁহার কনিষ্ঠা রাণী ও তাহার সন্তানকে বনবাস দিয়াছেন, কিন্তু অবশেষে সেই কনিষ্ঠা রাণীর সন্তানই নানা অসাধ্য সাধন করিয়া রাজা ও তাঁহার অন্যানা রাণী সন্তানকে নানা ভাবে রক্ষা করিয়াছে, তাহার ফলে পরিণামে সে রাজার অনুগ্রহ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। লোক-কথায় সাত পুত্রের জনক রাজা কিংবা সদাগরের একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্রই কাহিনীর নায়কত্ব লাভ করিয়া থাকে, অন্যান্য পুত্রদিগের কোন পরিচয় প্রকাশ পায় না। চাঁদ সদাগরের কাহিনীতেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়—তাঁহার সাত পুত্র ও সাত পুত্রবধূ ছিল; কিন্তু তাহাদের ভিতর হইতে একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠা পুত্রবধূই কাহিনীর মধ্য দিয়া নিজেদের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রকাশ করিতে সক্ষম হইল, জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পুত্রবধূগণ পটভূমিকার মধ্যে অস্পষ্ট হইয়া রহিল।

লখীন্দরের পুনর্জীবন-লাভ লোক-সাহিত্যের একটি সাধারণ বিষয়। পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিদ্গণ ইহাকে resuscitation motif বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। বিবিধ উপায়ে এই পুনর্জীবন লাভ সম্ভব হইতে পারে। ইংরাজী লোক কথায়ও শুনিতে পাওয়া যায় 'the parts of the dismembered corpse are brought together and revived.' (Thompson, *The Folktale,* New York, 1946, p. 255.) এই উপায়েই লখীন্দরের পুনর্জীবনলাভ সম্ভব হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, মঙ্গলকাব্যের মূল কাহিনীর পরিণতিতে লোক-সাহিত্যেরই একটি বিষয় অবলম্বন করা হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যে এই বিষয়ে কোনও মৌলিকতা নাই।

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির লোক-সাহিত্যে এই একটি বিশ্বাস প্রচলিত থাকিতে দেখা যায় যে, মানুষের দেহ ধ্বংস হইয়া গেলে তাহার আত্মা ক্ষুদ্রতর কোনও জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে—ইহা একেবারে ধ্বংস হইয়া যায় না। একজন পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিৎ বলিয়াছেন,

'Sometimes it is thought of as having the form of a mouse, or bird or butterfly which leaves the mouth at the supreme moment' (Thompson, *The Folktale*, New York, 1946, p. 258)। মনসামঙ্গল কাব্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, অনিরুদ্ধ ও উষা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া যখন আত্মত্যাগ করিল, তখন—

সোনার পুতুলি দুটি ছাই হঞা গেল।
ভ্রমর-ভ্রমরী দুটি উড়িতে লাগিল॥ (বিষ্ণু পাল)

ইহাদের আত্মা দুটি ভ্রমর-ভ্রমরীর রূপ লাভ করিয়া প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়া পড়িল। পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্যের অনুরূপ ইঁদুর, পাখি কিংবা প্রজাপতির পরিবর্তে এখানে যে মানব-মানবীর আত্মা ভ্রমর-ভ্রমরীর রূপ লাভ করিল, ইহার কারণ, বাংলার লোক-সাহিত্যে ভ্রমর-ভ্রমরী বিশেষ উল্লেখযোগ্য জীব। বাংলার ছেলেভুলানো ছড়াতেও শুনিতে পাওয়া যায়—

হেঁসেল ঘরে ঘুম যায়রে ভ্রমর-ভ্রমরী।
মায়ে কোলে ঘুম যায়রে দুধের কুমারী॥

তারপর বাংলার বহু রূপকথায় শুনিতে পাওয়া যায় যে, কোন দৈত্য স্ফটিক-স্তম্ভের মধ্যে তাঁহার ভ্রমররূপী আত্মাটি গোপনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া আহার অন্বেষণে বাহির হইয়া যায়। তারপর একদিন এক রাজপুত্র আসিয়া স্ফটিকস্তম্ভ ধূলিসাৎ করিয়া ভ্রমরটিকে বিনাশ করে—তাহাতেই দৈত্যের মৃত্যু হয়। অতএব বাংলার লোক-সাহিত্যে ভ্রমর জীবাত্মার প্রতীক রূপে একটি বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে। সেই সূত্রেই মনসা-মঙ্গল কাব্যের অনিরুদ্ধ ও উষার আত্মা এখানে ভ্রমর-ভ্রমরীর রূপ লাভ করিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, এখানেও লোক-সাহিত্যের সাধারণ একটি বিষয় (motif) মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য হইয়াছে।

মনসা-মঙ্গল কাহিনীতে চাঁদ সদাগর এবং শঙ্কর গারুড়ী উভয়কেই মহাজ্ঞানের অধিকারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মহাজ্ঞান কি? এই জ্ঞানের অধিকারী হইলে অসাধ্য সাধন করা যায়। কিন্তু ইহা সাধারণ জ্ঞানের মত নহে। সাধারণ জ্ঞান কেহ হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে না, কেহ কাড়িয়াও লইতে পারে না, কিন্তু কৌশল জানা থাকিলে মহাজ্ঞান হরণ করিয়া লইয়া যায়; ইহা অপহৃত হইলে সকল শক্তি লোপ পায়। পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্যে ইহাকে magic power বা magic wisdom বলে। এই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বিশেষ সাধনার প্রয়োজন। শঙ্কর গারড়ী নেতার সাধনা করিয়া নেতা-প্রদত্ত সর্পমাংস-মিশ্রিত অন্ন আহার করিয়া এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তিনি নিজে যেমন 'আকাট, অকূট' শরীর লাভ করিয়াছিলেন, তেমন স্বর্পবিষ নাশ করিবার শক্তিতে ধন্বন্তরির মত শক্তিশালী রূপে সমাজে গণ্য হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য লোক সাহিত্যেও এই ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক যে, 'one can acquire magic wisdom from eating something, particularly from a part of a serpent.' (Thompson, *The Folktale*, New York. 1946, p. 260)। পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই যে মহাজ্ঞান বা magic power, তাহা অপহৃত

হইতে পারে। মনসা-মঙ্গল কাব্যেও আমরা দেখিয়াছি যে, শঙ্কর গারড়ী এবং চাঁদ সদাগর উভয়েই তাঁহাদের জীবনের এক দুর্বল মুহূর্তে ইহা হরণ করিবার কৌশল এক ছদ্মবেশিনী নারীর নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন—তাহার ফলেই তাহা অপহৃত হইয়াছে। 'Magic power stolen by concubine' এবং 'betrayal of husband's secret by wife'—পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্যের ইহারা সাধারণ বিষয়; বাংলাদেশেও এই শ্রেণীর দুই একটি লোক-কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, লোক সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট এই যে, ইহার কোন ভৌগোলিক সীমা নির্দেশ করা যায় না। বাংলার লোক-সাহিত্য বাংলা ভাষায় রচিত, ইহার এই বহিরঙ্গ পরিচয়ের কথা বাদ দিলে ভাবের দিক দিয়া ইহাতে যে সর্বজনীনত্ব আছে, তাহা ইহাকে বিশ্বের লোক-সাহিত্যের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিতে সহায়তা করিয়াছে; উপরের আলোচনা হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যাইবে।

পূর্বনির্দিষ্ট মত সর্পাঘাতে লখীন্দরের মৃত্যু এবং তাঁহার সাধ্বী স্ত্রীর সহায়তায় তাঁহার পুনর্জীবন প্রাপ্তির বিষয় লোক-কথারই সাধারণ বিষয় (motif) মাত্র। মার্কিনদেশীয় লোকসাহিত্যে Enchanted Prince-নামক একটি কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। 'At the prince's birth it is prophesied that he will meet his death from a serpent. To forestall this fate he is confined to his tower. When he grown up, however, he sets out on adventures and finds a king who will give his daughter in marriage.... ...the marriage takes place. In later parts of the story the princess saves his life from a snake.' (ঐ, পৃ. ২৭৪)। এই রূপকথার সঙ্গে মনসা-মঙ্গল কাহিনীর যে মৌলিক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পারস্পরিক কোনও প্রত্যক্ষ কিংবা অপ্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল নহে—মানব-মনের শাশ্বত ঐক্যেরই ফল। এখানেও একটি মঙ্গলকাব্যের মৌলিক কাহিনী লোক-সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্রে হইতেই যে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা অনুভূত হইবে।

প্রত্যেক দেশেরই লোক-সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সতী নারী কতকগুলি অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী হয়; এই শক্তির বলেই সে তাঁহার সতীত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। এ'দেশের পুরাণেও লক্ষহীরার কাহিনীতে এক সতীর উল্লেখ আছে—তাঁহার চরিত্রেও যে অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহাও লোক-সাহিত্যের প্রেরণা হইতেই জাত। মনসা-মঙ্গলের সতী চরিত্রে বেহুলাও কতকগুলি অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ধনামনা, ঘাটওয়াল, গোদা, টেটন ইত্যাদির পাপ অভিলাষ ব্যর্থ করিয়া যে তিনি নিজের কর্তব্য পথে অগ্রসর হইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছেন, এই অলৌকিক শক্তির বলেই তাহা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু কাহিনীর শেষ ভাগে তাহার সতীত্বের যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার ভিতর দিয়াই তাঁহার চরম শক্তির পরীক্ষা হইয়াছে। এখানে সাধারণ ভাবে মনে হইতে পারে যে, রামায়নে সীতার অগ্নিপরীক্ষার কাহিনী হইতেই মনসা-মঙ্গলেও বেহুলার সতীত্বের পরীক্ষার কথা আসিয়াছে। কিন্তু এ'কথা সত্য নহে। রামায়ণে কেবলমাত্র সীতার

অগ্নিপরীক্ষার কথাই আছে, কিন্তু মনসা মঙ্গলে তাঁহার পরিবর্তে বেহুলার 'অষ্টপরীক্ষা'র কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা লোক-সাহিত্যের সাধারণ বিষয়মাত্র—রামায়ণের প্রভাব-জাত নহে। যদি মনসা-মঙ্গলের উপর ইহা রামায়ণের প্রভাব-জাত হইত, তবে বেহুলার 'অষ্ট-পরীক্ষা'র পরিবর্তে একমাত্র অগ্নিপরীক্ষার কথাই থাকত। পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্য সমালোচকগণ এই বিষয়টি chastity test motif বলিয়া থাকেন। এই সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিৎ বলিয়াছেন, 'Many forms of testing are found in folk-lore and legend ; they are generally connected with ordeal. The test by fire is the most common.' রামায়ণের মধ্যে এই নিতান্ত সাধারণ প্রণালীটিই অবলম্বন করা হইয়াছে, কিন্তু মনসা-মঙ্গলে সর্প-পরীক্ষা (snake ordeal), ক্ষুরধার-পরীক্ষা (razor's edge ordeal), জল-পরীক্ষা (water-ordeal), শূন্য-পরীক্ষা (পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্যে ইহার কোনও প্রতিরূপ পাওয়া যায় না), জৌঘর-পরীক্ষা (fire ordeal), তুলা-পরীক্ষা ইত্যাদি বিবিধ পরীক্ষার কথার উল্লেখ আছে। ইহার অর্থ এই যে, মনসা-মঙ্গলের প্রত্যক্ষ প্রেরণা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ হইতে আসে নাই—লোক-সাহিত্যের বিস্তৃততর ক্ষেত্র হইতে আসিয়াছে।

সর্প বা সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার প্রতিহিংসা গ্রহণের বৃত্তান্ত লইয়াই মনসা-মঙ্গল রচিত হইয়াছে। সর্পের প্রতিহিংসা প্রত্যেক দেশেরই লোক-সাহিত্যের একটি নিতান্ত সাধারণ বিষয়। ইংরাজীতে ইহাকে revengeful serpent motif বলা হইয়া থাকে। 'Injured snake avenges' নামেও লোক-সাহিত্যের যে একটি বিষয় (motif) আছে, তাহাও মনসা-মঙ্গল কাহিনীর ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়; কারণ, injury বা আঘাত যে সর্বদাই শারীরিক হইতে হইবে তাহার কোন কারণ নাই; সর্পের পক্ষে যে আঘাত শারীরিক, সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পক্ষে তাহাই মানসিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। অতএব ইহাও মনসা-মঙ্গল কাব্যের মৌলিক বিষয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে, এখানেও মনসা-মঙ্গলের কাহিনী লোক-সাহিত্যের প্রেরণা হইতে জাত—রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ হইতে জাত নহে।

সমুদ্রমধ্যস্থ পুরীর বর্ণনা মনসা-মঙ্গল কাব্যের অন্যতম বিষয়, কমলে কামিনীর বর্ণনা চণ্ডীমঙ্গলের বিষয়ীভূত। সমুদ্রমধ্যস্থ পুরীর পরিকল্পনা লোক-সাহিত্যেরই প্রেরণা-জাত। একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত এই সম্পর্কে অনুমান করিয়াছেন, 'The literature of chivalry must have been a great stimulus to tales about remarkable castles—castles of gold or silver or even of diamond castles suspended on chains or upheld by giants or built on the sea.' প্রাচীন বাংলাদেশেও বহির্বাণিজ্যের যুগ ইউরোপের Chivalry-র যুগের মতই সমাজের বহির্মুখী কর্মবহুল যুগ ছিল—অতএব সেই যুগেই এ'দেশেরও লোকসাহিত্যের মধ্যে অনুরূপ প্রেরণা কার্যকরী থাকা একান্তই স্বাভাবিক।

ব্রতকথা বাংলার লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। মঙ্গলকাব্যের মত ব্রতকথারও

উদ্দেশ্য লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন; ব্রতকথা হইতে যে মঙ্গলকাব্যের প্রেরণা আসিয়াছে, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

।। ২৩ ।। ইতিহাস ও মঙ্গলকাব্য

বাংলার মধ্যযুগের প্রথম ভাগে বৈষ্ণব ও শাক্তের মিলন পরবর্তী সময়ের মত এত ঘনিষ্ঠ ছিল না। শাক্তগণ বৈষ্ণবদিগকে যে কতদূর অবজ্ঞা ও ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন মধ্যযুগের বৈষ্ণব ও শাক্ত-সাহিত্যে তাহার আভাস পাওয়া যায়। এই সকল সমসাময়িক সামাজিক ইতিহাস ব্যতীতও এই মঙ্গলকাব্যগুলি হইতে দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থারও কতক আভাস পাওয়া যায়। মনসামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত হাসান হোসেনের পালা, চণ্ডীমঙ্গলের অন্তর্গত অনার্য ব্যাধ কর্তৃক শৈবরাজ্য কলিঙ্গ আক্রমণের কাহিনী, ধর্মমঙ্গলের অন্তর্গত ডোম সেনাপতির সাহায্যে লাউসেনের ঢেকুর-বিজয়—ইহাদের মধ্যে সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসেরও একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যগুলির ঐতিহাসিক মূল্য বিচার করিবার কালে এ'কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইহারা সর্বাংশেই সমসাময়িক কালের ইতিহাস নহে। অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে যে বিস্তৃত নৌ-বাণিজ্যের বর্ণনা আছে, তাহা মঙ্গলকাব্যের কবিদিগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল নহে। যে যুগে মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল, অর্থাৎ প্রধানত খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী—সেই যুগে বাংলার সদাগরেরা ভারতের উপকূল অঞ্চল কিংবা বৃহত্তর ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে যে বাণিজ্যরত ছিল, তাহা নহে। কারণ, সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাস হইতে তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ পাল এবং হিন্দু সেন রাজত্বের আমলে বাঙ্গালীর জীবন শিল্পে বাণিজ্যে নানাদিক দিয়ে যেমন বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, এ'দেশে তুর্কী আক্রমনের পর হইতেই তাহা চারিদিক হইতে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল, কালক্রমে তাহার সংস্কার সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছিল। অথচ সকল মঙ্গলকাব্যই তুর্কী আক্রমণের পরে রচিত হইয়াছিল। অতএব মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে যে বাংলার সদাগরদিগের ভারতীয় উপকূল অঞ্চলে বাণিজ্য করিয়া ধনৈশ্বর্য লাভ করিবার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ঐতিহাসিক দিক দিয়া মধ্যযুগের পূর্ববর্তী ঘটনা বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। পাল রাজত্বের শেষভাগ বাংলার বহির্বাণিজ্য নানাদিক দিয়া বিস্তার লাভ করিয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। সেই যুগে সমাজে স্বভাবতই বৈশ্য সদাগরদিগেরই প্রাধান্য ছিল। সেইজন্য মঙ্গলকাব্যের নায়কমাত্রই বৈশ্য সদাগর। ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা তখন সমাজে স্থাপিত হয় নাই। কিন্তু যে যুগে মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছে, সে যুগে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, তাহা সত্ত্বেও মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্য দিয়া একটি প্রাচীনতর ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করা হইয়াছে। পাল ও সেন রাজত্বে বাংলার সদাগরদিগের বহির্জগতের সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্কিত যোগাযোগ স্থাপন করিবার সংস্কার এই সমাজে এত দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছিল যে, সেই বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া প্রায় পাঁচ শতাধিক বৎসর পরও এদেশে জাতীয় কাব্য রচিত হইয়াছে। বাংলার

ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যের উপর বণিক সমাজের যে প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, প্রধানত পাল রাজত্বকালীন বাংলার সমাজ-জীবনের ঐতিহ্যের উপর ইহাদের উভয়েরই কাহিনীর মৌলিক ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু সেই জন্যই তাহা পাল রাজত্বেরই নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যের আধার বলিয়াও গ্রহণ করিতে পারা যায় না। কারণ, পরবর্তী কালের সমাজ-জীবনেরও বহু উপাদান ইহাদের মধ্যে গিয়া স্থান লাভ করিয়াছে। অতএব মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্য হইতে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিবার কালে ইহাদের মধ্যে কি ভাবে যে বিভিন্ন যুগের উপাদান একত্র মিশ্রিত হইয়া এক অখণ্ড রসবস্তুরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে—কোন যুগের ঐতিহাসিক তথ্যই ইহাদের মধ্য হইতে অবিমিশ্রভাবে লাভ করা যাইতে পারে না। মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার পালা এবং হাসান হোসেনের পালা একই ঐতিহাসিক যুগের চিত্র নহে—একটি বাংলার তুর্কী আক্রমণের পূর্ববর্তী বিষয়, অপরটি ইহার পরবর্তী বিষয়। একই কাহিনীর মধ্যে একই উদ্দেশ্যে উভয়েই স্থান লাভ করিলেও ইহাদের মধ্যে কালগত সুদূর ব্যবধান রহিয়াছে। অতএব মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্য হইতে যাঁহারা মধ্যযুগের অবিমিশ্র উপাদান লাভ করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন, তাঁহারা ভুল করিয়াছেন।

মঙ্গলকাব্যগুলি চারিশত বৎসরের অধিককাল ধরিয়া রচিত হইয়াছে, অতএব ইহাদের মধ্যে বিশিষ্ট কোন একটি যুগ-চেতনা যে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। তুর্কী আক্রমণে আকস্মিক সামাজিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়া ইহাদের উদ্ভব হইয়াছিল, অতএব ইহাদের উদ্ভবের যুগে ইহাদের মধ্য দিয়া সমাজ -জীবনের যে এক পরাজয়ের মনোভাব (defeatist mentality) প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সত্য। এই মনোভাবের মধ্য হইতেই দৈবনির্ভরশীলতার জন্ম । প্রত্যক্ষ সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের উপর ভিত্তি করিয়া মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভব হইয়াছিল—ইহাদের উদ্ভবের কালে ইহাদের মধ্যে এই বিশিষ্ট যুগ-চেতনা অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যাইত। কিন্তু ইহার পরবর্তী যুগে যখন চৈতন্যধর্মের প্রভাব বাংলার সমাজের মধ্যে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হইয়া উঠিল, তখন সমাজের মধ্য হইতে পরাজয়ের মনোভাব অনেকখানি দূর হইয়া গিয়া ইহার মধ্যে এক নূতন আশাবাদের জন্ম হল। কিন্তু মঙ্গলকাব্যগুলি ইতিপূর্বেই সমাজের পরাজিত মনোভাবের ভিত্তির উপর একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে; তখন ইহাদের মধ্যে আর নূতন কোন চেতনা সঞ্চার করিয়া দিবার অবকাশ ছিল না। চৈতন্যধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব মঙ্গলকাব্যগুলির অন্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই—কেবল বহিরঙ্গে কোন কোন স্থলে বিচ্ছিন্ন প্রভাব স্থাপন করিয়াছে মাত্র। অতএব চৈতন্যের সমসাময়িক কালের বিশিষ্ট যুগচেতনা সে যুগের মঙ্গলকাব্যগুলির মূল ধারার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। যদি তাহাই হইত, তবে বৈষ্ণব-সাহিত্যে স্বাধীন উদ্ভব ও বিকাশ সে যুগে সম্ভব হইত না, বৈষ্ণব-সাহিত্য এবং মঙ্গলকাব্য উভয়েই যে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়া সে যুগে বিকাশ

লাভ করিয়াছে, তাহাব অর্থ এই যে, একের অভাব অন্য দ্বারা সে দিন পূর্ণ হয় নাই।

কালক্রমে যখন মঙ্গলকাব্যের অধ্যাত্ম আদর্শ শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল, তখনই সেই শৈথিল্যের অবকাশ বৃহত্তর সমাজের বিশিষ্ট যুগ-চেতনা তাহার মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। এই কার্য খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতেই পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। চৈতন্য ধর্মের ক্রমাগত প্রভাবের ফলে এক দিক দিয়া সে যুগে যেমন মানবিকতার প্রতি গৌরববোধ বাড়িয়াছে, অন্য দিকে তেমন মঙ্গল-কাব্যের দৈবশক্তির নিষ্ফলতাবোধ সমাজের মধ্যে দৃঢ়মূল হইয়াছে। মঙ্গল-কাব্যের উদ্ভবের মুহূর্তেই ইহার মধ্যে যে যুগ-চেতনার বিকাশ দেখা গিয়াছিল তাহাই অপরিবর্তনীয় (rigid) থাকিয়া আরও প্রায় তিন শতাব্দীকালের যুগ-চেতনাকে অস্বীকার করিয়াছিল—তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজের হৃদয় দৈবভক্তিহীন হইয়া পড়িবার ফলে সে যুগের মঙ্গলকাব্যের উপর যুগপ্রভাব পুনরায় কার্যকর হইয়া উঠিল—নিজের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মঙ্গলকাব্যগুলি চারিদিক হইতে যুগের উপকরণ দ্বারা নিজেদের অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। তখন একদেশদর্শী সঙ্কীর্ণ ধর্মবোধের পরিবর্তে সর্বধর্মসমন্বয়ের এক উদার আদর্শ মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্য দিয়া যেমন প্রচারিত হইয়াছিল, তেমনই অন্যদিকে এক ঘৃণিত নীতিবোধের পরিচয়ও ইহাদের পবিত্রতা দূর করিয়া দিয়াছিল। অতএব মঙ্গলকাব্য রচনার সর্বশেষ যুগে ইহার ভক্তিহীন শূন্য অন্তঃকরণ চারিদিক দিয়া উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহারই অবারিত পথে সমাজের কেবলমাত্র যে নূতন ভাবসম্পদ তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল তাহাই নহে, ধূলি বালি দ্বারাও তাহা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

।। ২৪ ।। অলৌকিকতা ও মঙ্গলকাব্য

প্রাচীনতর মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে পূর্বালোচিত ঐতিহাসিক ও জাতীয় মূল্য থাকা সত্ত্বেও ইহারা যে অতিরিক্ত অলৌকিক কাহিনীতে ভারাক্রান্ত তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রাচীন সাহিত্যে অলৌকিকতার স্থান সম্বন্ধে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে। অলৌকিকত্বের (Supernaturalism) আশ্রয় না লইয়া যে প্রাচীন কালে উচ্চশ্রেণীর কাব্য-রচনা সার্থক হইত, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া কতক অলৌকিকত্ব-বর্জিত দুই একখানি গল্প রচিত হইয়াছে; অবশ্য তাহা যে কোনই সার্থকতা অর্জন করিতে পারে নাই, তাহাও সত্য। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রাচীন কাব্য রচনায় অলৌকিকত্ব একেবারে অপরিহার্য নহে। তবে এ কথাও সত্য যে, ইউরোপীয় কিংবা ভারতীয় মহাকাব্যের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহে অলৌকিকতার পরিপূর্ণ প্রভাব রহিয়াছে। প্রাচীন কাব্যের মধ্যে ঘটনাগত অলৌকিকত্ব ব্যতীতও অলৌকিক চরিত্রের সমাবেশ করা হইয়া থাকে। অলৌকিক চরিত্র বা দৈব চরিত্রের সাহায্যেই অলৌকিক ঘটনাসমূহের সংঘটন হয়। প্রাচীন কাব্যের একটি বিশিষ্ট গুণ এই যে, ইহা বর্ণনা-বহুল হইবে। প্রাচীন কাব্যের বাস্তব অংশের বাহুল্যপূর্ণ বর্ণনা একদিক দিয়া যেমন প্রাচীন

সাহিত্যের আদর্শে অসম্ভব, তেমনই সমসাময়িক সাহিত্যের পাঠকের নিকটও অপ্রীতিকর ছিল। সেই জন্য মূল কাহিনীর বাহুল্যের অংশটুকু একমাত্র অলৌকিকত্বের বর্ণনা ব্যতীত পূরণ করিবার উপায় ছিল না। বিশেষত এই অলৌকিকতার উপর সেই যুগের লোকের গভীর বিশ্বাস ছিল, বরং প্রত্যক্ষ ও বাস্তব সত্যের উপর তত বিশ্বাস ছিল না। সেই হিসাবে এই সকল মঙ্গলকাব্য তৎকালীন যুগমানসের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। এই সম্পর্কে সেক্সপীয়রের নাট্য-কাব্যগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেশ ও কাল নিরপেক্ষ সর্বজনীন সাহিত্য রচনা করিলেও সেক্সপীয়র তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের সাধারণ সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবমুক্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহার বহু নাটকে অলৌকিকত্ব লক্ষনীয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অতএব বর্তমান যুগের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া প্রাচীন সমাজের রুচি বিচার করা যায় না। দুই একখানি অলৌকিকত্ব-বর্জিত কাব্য সেকালে রচিত হইলেও, তাহা যে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল, তাহা তাহাদের অপেক্ষাকৃত অপ্রচলন হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কাহিনীর মূল পরিণতির সঙ্গে ইহার অলৌকিকত্বের কোন আবশ্যক যোগ না থাকিলেও তাহা কাব্যের মর্যাদায় উন্নীত হইতে পারে। কাব্যের কাহিনীর স্বাভাবিক পরিণতি ইহার কোন অলৌকিক ঘটনার উপর নির্ভর করিলে ইহার কাব্যগুণ ক্ষুণ্ণ হইবে, নতুবা তাহার কাব্যের বাহ্য সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবে। প্রকৃত কথা 'Supernaturalism in epics should be given subordinate place to the natural or rather the human.' অলৌকিকত্বাকে কাব্যের মধ্যে মুখ্যবস্তু না করিয়া গৌণবস্তু মাত্র করিয়া লওয়া প্রাচীন কাব্যমাত্রেরই বৈশিষ্ট ছিল। এই সম্বন্ধে বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যের কাহিনীতে অলৌকিকতা ইহার অনাবশ্যক অংশ মাত্র। মনসা-মঙ্গলে বেহুলার দুর্ভাগ্যের জন্য মনসাকে কেহ প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী করবে না—ইহার নিরবচ্ছিন্ন করুণ রসের প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া মানুষের চিরন্তন দুর্ভাগ্যের কথাই স্মরণ হইবে, মনসার কথা মনেও হইবে না। ইহা বিশিষ্ট কোন দেব-চরিত্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফল বলিয়া বিবেচিত হইলে বেহুলার প্রতি সর্বজনীন মানবিক সহানুভূতি সম্ভব হইত না। চাঁদ সদাগরের লাঞ্ছনার মূলে বিশেষ কোন দেবতার প্রতি তাহার ব্যক্তিগত আক্রোশ বলিয়া যদি বিবেচিত হইত, তাহা হইলে মনসা-মঙ্গল বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য হইতে পারিত না। চাঁদ সদাগরের মধ্যে দৈব-লাঞ্ছিত সমাজের প্রত্যেক পুরুষই আত্মপরিচয় লাভ করিয়াছে। মনসা রূপে কল্পিত দৈব যে বেহুলার জীবনের দুর্ভাগ্যের মূলে প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, মনসা-মঙ্গলের কবিগণ তাহাই নানা লৌকিক (popular) উপায়ে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। বাণিজ্যযাত্রায় দুস্তর সমুদ্রের বুকে স্বামিপুত্রকে ভাসাইয়া দিয়া এই সমাজের নারীদিগের একান্তভাবে একদিন দৈবের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিতে হইয়াছে। অতএব এই দৈব বিশ্বাসের সঙ্গে বাস্তব সমাজ-চেতনারও নিবিড় যোগ রহিয়াছে। উপরন্তু, 'In spite of the fact that we are not seriously asked to believe in it, it does beautifully and strikingly crystallize the poet's determination to show us things that

go past the reach of common knowledge.'

চিরকাল সমাজ অদৃষ্টের রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন সমাজ বিশেষভাবেই এই অদৃষ্টবাদী ছিল; অথচ সংসারের এই অ-দৃষ্ট ও অপরিজ্ঞাতসত্যের কোন প্রত্যক্ষ ও সহজ ব্যাখ্যা তাহার জানা ছিল না। এই জন্য কাহিনীর এই অ-দৃষ্ট অংশটুকু সঙ্গে জড়িত হইয়া দৈব-কাহিনী এই সমস্ত কাব্যের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির দেব চরিত্র সম্বন্ধে একটি কথা আমি পূর্বেও একবার উল্লেখ করিয়াছি যে, তাহা পাশ্চাত্ত্য প্রাচীন কাব্য-সমূহের দেব-চরিত্রের মত মনুষ্য সমাজের সঙ্গে একটি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই। সেই জন্য তাহাদের চরিত্রে দেব-গুণ বিশেষ একটা নাই; তথাপি তাহাদের উপর একটা স্বতন্ত্র আবরণ যে রহিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না। প্রাচীন গ্রীক মহাকাব্যের দেবতাগণ ব্যক্তিত্বে এবং কর্মে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া মনুষ্য সমাজের সঙ্গে মিশিয়াছেন, ভারতীয় পৌরাণিক দেবতাগণও তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু বাংলার মঙ্গলকাব্যের দেবতাদিগের তেমন সুপরিচ্ছন্ন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা পায় নাই। যতটুকু পাইয়াছে, ততটুকু দ্বারা কাহিনীর মধ্যে তাঁহারা প্রায়ই কোন মনুষ্য চরিত্রের অতিরিক্ত শ্রদ্ধা লাভেও সক্ষম হন নাই। অতএব অলৌকিকতার দিকটা মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যে সর্বত্র তত প্রকট হইয়া উঠে নাই; কেবল পরবর্তী কয়েকখানি কাব্যে অক্ষম কবিদের অপরিস্ফুট কল্পনায় ইহার অসংযত নৃত্য দেখিতে পারা যায়।

মঙ্গলকাব্যের কাহিনী কবির স্বকপোলকল্পিত বলিয়া যদি সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ না হয়, সেইজন্য কবি গ্রন্থারম্ভেই গ্রন্থোৎপত্তির একটা দৈব কারণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কাব্যোক্ত দেবতা কাব্যরচনায় কবিকে স্বপ্নাদেশ করিয়াছেন; নতুবা তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী কবির যশ লোপ করিবার উদ্দেশ্যে নিজে এই কার্যে কখনও হস্তক্ষেপ করিতেন না।

দৈবাদেশে কাব্যরচনার রীতি প্রাচীনকালে সকল দেশেই প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক দেশেই মানুষের স্বভাব-সুলভ মনোবৃত্তি হইতে স্বাধীনভাবে এই দৈবভীতির জন্ম হইয়াছে; এই বিষয়ে কোন জাতি যে অপর কোন জাতির নিকট ঋণী, তাহা বলিতে পারা যায় না। কোন কাব্যরচনার মূলে দেবতার ইচ্ছা যদি নির্দেশ করা যায়, তাহা হইলে সেই যুগে সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা সহজ হইত। সমাজে তখনও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, অতএব যে কোন ব্যক্তি যদি কোন কথা বলিত, তাহা কেহ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করিত না। ব্যক্তি-প্রতিভাকে সর্বদাই সে যুগে দৈবশক্তিতে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে হইত। পুরাণ, উপপুরাণ, সমগ্র মহাভারত সমস্তেরই রচনা-গৌরব বেদব্যাসে আরোপ করিবারও ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। এই দেশের সমগ্র প্রাচীন সাহিত্য-কীর্তির মূলেই এই নীতি বর্তমান। সেইজন্যই মঙ্গলকাব্যগুলির রচয়িতা হিসাবে একজন মানবদেহধারী কবিকে স্বীকার করিয়া লইলেও, দেবতার প্রেরনাই যে তাহার মূল—এই বিশ্বাস পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া লওয়া প্রয়োজন বোধ হইত। অতএব প্রত্যেক কাব্যারম্ভেই দৈবাদেশের অবতারণা করা হইত। এই রীতি

মঙ্গলকাব্য হইতে বৈষ্ণব সাহিত্যেও প্রসারিত হইয়াছিল; এমন কি, প্রাক্-চৈতন্য যুগেই মালাধর বসু 'শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের' অনুবাদ করিতে গিয়া বেদব্যাসের স্বপ্নাদেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে এই রীতি প্রাচীনতম কাল হইতেই বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে।

মঙ্গকাব্য রচনার এই নিয়মের প্রতিষ্ঠা এত দূর পর্যন্ত স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গল' যদিও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রত্যক্ষ আদেশেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া কবি প্রথমেই স্বীকার করিয়াছেন, যেমন,

'কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি গীতে দিলা অনুমতি
করিলাম আরম্ভ সহসা।'

তথাপি এই রাজাদেশের পরও একটা স্বপ্নাদেশের অবতারণা করিবার প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল। উপরি-উদ্ধৃত কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশ-বাক্যের পরই কবি বলিতেছেন,

'স্বপনে রজনী শেষে বসিয়া শিয়র দেশে
কহিলা মঙ্গল রচিবারে।
সেই আজ্ঞা শিরে বহি নূতন মঙ্গল কহি
পূর্ণ কর চাহিয়া আমারে॥'

দৈবশক্তি কিংবা দেবতার স্বপ্নাদেশের প্রতি ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক সমাজের যে খুব একটা শ্রদ্ধাভক্তি ছিল, তাহা নহে—ইহাতে সর্বতোভাবেই একটা নির্দিষ্ট প্রাচীন প্রথারই অনুসরণ করা হইয়াছে মাত্র। ইংরাজি সাহিত্যে প্রায় মধ্যযুগ পর্যন্ত প্রত্যেক কবিকেই কোনও আখ্যায়িকা-কাব্য রচনা করিবার কালে কোনও প্রচলিত কাহিনী অবলম্বন করিয়াই কাব্য রচনা করিতে হইত; স্বকপোলকল্পিত স্বাধীন কোনও বিষয়বস্তুর অবতারণা করা কোন কবির পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না। এই সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন, '......it was until at least the end of the Middle Ages with writers like Chaucer, who carefully quoted authorities for their plots—and sometimes even invented originals so as to dispel the suspicion that some new and unwarranted story was being foisted on the public. Through the individual genius of such writers appears clearly enough, they always depended on authority, not only for their basic theological opinions but also plots of their stories. A study of the sources of Chaucer or Boccaccio takes one directly into the stream of traditional narratives.'

মঙ্গলকাব্যের রচনায়ও প্রত্যেক কবিরই পুচ্ছগ্রাহিতা অর্থাৎ বিষয়-বস্তু সম্পর্কে পূর্ববর্তী কবির অনুসরণ করিবার ইহাই একমাত্র কারণ।

।। ২৫ ।। রবীন্দ্রনাথ ও মঙ্গলকাব্য

রবীন্দ্রনাথ গ্রাম্য-সাহিত্য কিংবা লোকসাহিত্য লইয়া যেমন জীবনের প্রথম দিকে

নানাভাবে রস-বিচার করিয়াছিলেন এবং পরবর্তী জীবনেও তাঁহার সাহিত্য-কর্মের মধ্য দিয়া তিনি বাংলার লোক-সাহিত্যের নানা উপকরণকে নানাভাবে আত্মস্থ করিয়া লইয়াছিলেন, বাংলার মঙ্গলকাব্য সম্পর্কেও যে তিনি তাহাই করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। তথাপি তিনি তাহার জীবনে বিভিন্ন বিভাগেই ইহার সম্পর্কে নানাভাবে তাঁহার রচনার মধ্যে উল্লেখ করিযাছিলেন। সেই সকল উক্তি সর্বদা শ্রদ্ধাপূর্ণ না হইলেও ইহাদের মধ্য দিয়া মধ্যযুগের এই বিশিষ্ট সাহিত্যরসবস্তু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তির কি বিশেষ ধারণা ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিভিন্ন বয়সের রচনায় মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দুইখানি মঙ্গলকাব্যই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; একখানি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গলকাব্য' এবং দ্বিতীয়খানি ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গলকাব্য'। এই দুইখানি কাব্যেরই বিষয়বস্তু, রচনা-রীতি, জীবনদৃষ্টি ইত্যাদিই প্রধানত আলোচনার বিষয় হইয়াছে। প্রসঙ্গত দুই-একবার তিনি মনসামঙ্গল কিংবা ধর্মমঙ্গল কাব্যের নামমাত্র উল্লেখ করিলেও ইহাদের বিষয়ে কোন সংক্ষিপ্ত কিংবা বিস্তৃত কোন আলোচনাই তাঁহার কোন রচনাতেই স্থান পায় নাই। অথচ চাঁদ সদাগরের চরিত্রের মত দৃপ্ত পুরুষকারের নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা লাভ করিবার যোগ্য ছিল। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মঙ্গলকাব্যবিষয়ক আলোচনা এই বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। তিনি মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' এবং ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ব্যতীত আর কোন মঙ্গলকাব্যেরই মূল গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। সেই জন্য বার বার এই দুইখানি কাব্যের বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের বিষয় উল্লেখ করিলেও অন্য কোন মঙ্গলকাব্যের উল্লেখযোগ্য কোন চরিত্র কিংবা ঘটনার বিষয় উল্লেখ করেন নাই। অথচ এই কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এই দুইখানি কাব্যের মধ্য দিয়া মধ্যযুগের বাঙ্গালীর চারি শত বৎসর ব্যাপিয়া অনুশীলিত একটি বিশেষ কাব্যশাখার সামগ্রিক পরিচয় কিছুতেই লাভ করা যাইতে পারে না। তবে একথা সত্য, মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কিংবা ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' সম্পর্কে তিনি যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে তাঁহার প্রজ্ঞাদৃষ্টির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্র সম্পর্কিত আলোচনায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহার বিশিষ্ট মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে। তবে মঙ্গলকাব্যের সামগ্রিক পটভূমিকার উপর তাহা স্থাপিত হইলে ইহাদের মধ্যে সাহিত্যের ইতিহাসগত যে মূল্য প্রকাশ পাইত, হয়ত ইহাদের মধ্যে সেই মূল্য প্রকাশ পাইতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাথ লোক-সাহিত্য সম্পর্কে স্বাধীন গ্রন্থ রচনা করিয়া ইহার সম্পর্কে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তেমন কিছু করেন নাই। মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে তাঁহার উল্লেখ বিভিন্ন বিষয়ক তাঁহার রচনার মধ্যেই বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে মাত্র। তাঁহার এই বিক্ষিপ্ত উক্তিগুলিকে একত্র করিয়া বিচার করিলে ইহাদের মধ্যে যে পারস্পরিক কোন যোগসূত্রের অভাব দেখা যাইবে, তাহা নহে, সুতরাং তাঁহার মন্তব্যগুলি

যতই বিক্ষিপ্ত এবং সংক্ষিপ্ত হোক, ইহাদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট মনোভাব ইহাদের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবার পর রবীন্দ্রনাথ ইহার সম্পর্কে একটি আলোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন ('সাহিত্য', শ্রাবণ, ১৩০৯)। এই গ্রন্থখানি হইতেই তিনি প্রধানত মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন বিভাগ এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তখন পর্যন্তও ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ব্যতীত কোন মঙ্গলকাব্যের গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং মূলগ্রন্থ পাঠ করিবার সুযোগ রবীন্দ্রনাথ তখন পর্যন্তও লাভ করিতে পারেন নাই। তারপর ক্রমে বঙ্গবাসী সংস্করণ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রণীত 'চণ্ডীমঙ্গল' প্রকাশিত হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১৯ সন হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যরূপে গৃহীত হইবার পর স্বর্গত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'চণ্ডীমঙ্গল' অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের পরম অনুরাগী ছিলেন। তিনি এই কথা রবীন্দ্রনাথকে জানাইলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গে এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তারপর একদিন তাঁহার নিকট কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম প্রণীত 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর মুদ্রিত একখানি সংস্করণ (বঙ্গবাসী সং) রাখিয়া আসিলেন। রবীন্দ্রনাথ কালকেতুর কাহিনীটিই মাত্র আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া স্থানে স্থানে কিছু পার্শ্ব মন্তব্য লিখিয়া বইখানি ফিরাইয়া দিলেন। ধনপতির কাহিনী সম্পর্কেও সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি মন্তব্য লিখিয়া দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ধর্মমঙ্গল কিংবা মনসামঙ্গল কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অধ্যয়ন আংশিক ছিল। সে যুগে মুদ্রিত মঙ্গলকাব্যের অভাব ইহার অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া থাকিবে। তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যগুলি সেই জন্যই সেই দৃষ্টিভঙ্গি হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে। মন্তব্যগুলি পর পর উদ্ধৃত করিতেছি। অধ্যাপক শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্তব্যগুলি কালানুক্রমিক প্রথম 'কবি ও কবিতার' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১

'অত্যন্ত স্পষ্ট কবিতা নহিলে যাঁহারা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা স্পষ্ট কবিতার একটি নমুনা দিয়াছেন। তাঁহাদের ভূমিকা সমেত উদ্ধৃত করি। "বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলিও জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা। কবিকঙ্কণে দরিদ্র্য-দুঃখ বর্ণনা—যে কখনো দুঃখের মুখ দেখে নাই তাহাকেও দীনহীনের কথা বুঝাইয়া দেয়।

দুঃখ করো অবধান, দুঃখ করো অবধান।
আমানি খাবার গর্ত দেখো বিদ্যমান।।

—এই দুইটি পদের ভাষ্য করিয়া লেখক বলিয়াছেন, 'ইহার সার্থক কবিত্ব; সার্থক কল্পনা; সার্থক প্রতিভা।"—পড়িয়া সহসা মনে হয় এ কথাগুলি হয় গোঁড়ামি, নয়ত তর্কের

মুখে অত্যুক্তি, আমানি খাবার গর্ত দেখাইয়া দারিদ্র্য সপ্রমাণ করার মধ্যে কতকটা নাট্যনৈপুণ্য থাকিতেও পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে কাব্যরস কোথায়? দুটো ছত্র, কবিত্বে সিক্ত হইয়া উঠে নাই; ইহার মধ্যে অনেকখানি আমানি আছে, কিন্তু কবির অশ্রুজল নেই। ইহাই যদি কবিত্ব হয় তবে 'তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে'—সে তো আরো কবিত্ব। ইহার মধ্যে ব্যাখ্যা এবং ভাষ্য করিতে গেলে হয়তো ভাষ্যকারের করুণরস উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেও পারে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও...ইহা কাব্য নহে।'...

সাহিত্য, ১২৯৩, 'কাব্য : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট'

কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজস্ব অভিমত এখানে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঘটনার বিবরণ দান বা 'রিপোর্টিং' কদাচ কাব্য নহে, এখানে পয়ার ছন্দে তাহাই করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অভিমত এই যে ইহাতে বিষয়ের সুস্পষ্ট একটি বর্ণনামূলক চিত্র থাকিলেও যে গুণে রচনা কাব্য হইতে পারে, ইহার সেই গুণ নাই। ইহার মধ্যে কবির সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু সহানুভূতির প্রকাশ কাব্য-গুণান্বিত হইতে পারে নাই। কাব্য কেবলমাত্র জীবনের প্রতি সহানুভূতিই নহে, সহানুভূতির সরস অভিব্যক্তি।

২

'কবিকঙ্কণের কমলে-কামিনীতে একটি রূপসী ষোড়শী হস্তী গ্রাস ও উদ্গার করিতেছে, ইহাতে এমন পরিমাণ-সামঞ্জস্যের অভাব হইয়াছে যে, আমাদের সৌন্দর্যজ্ঞান অত্যন্ত আঘাত দেয়। শিক্ষিত, সংযত, মার্জিত কল্পনায় একটি রূপসী যুবতীর সহিত গজাহার এবং উদ্গীরণ কোনমতেই একত্রে উদয় হইতে পারে না।

অনেকে তর্ক করেন যে গণেশকে দুর্গা একবার করিয়া চুম্বন করিতেছিলেন, তাহাই দূর হইতে দেখিয়া ধনপতি গজাহার ও উদ্গীরণ কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। কারণ, কবিকঙ্কণচণ্ডীতেই আছে যে, চৌষট্টি যোগিনী পদ্মের দলরূপ ধারণ করিল, ও জয়া হস্তিনীরূপে রূপান্তরিত হইল। অতএব গণেশের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কেহ-বা তর্ক করেন যে, যখন কবির উদ্দেশ্য বিস্ময় ভাবের উদ্দীপন করা, তখন বর্ণনা যাহাতে অদ্ভুত হয় তাহারই প্রতি কবির লক্ষ্য। কিন্তু এ কথার কোন অর্থ নাই। সুকল্পনার সহিত বিস্ময়-রসের কোন মনান্তর নাই।

যখন কবি অগাধ সমুদ্রের মধ্যে মরালশোভিত কুমুদ কহ্লার পদ্ম বনের মধ্যে এক রূপসী ষোড়শী প্রতিষ্ঠিত করিলেন—সমস্তই সুন্দর, নীল জল, সুকুমার পদ্ম, পুষ্পের সুগন্ধ, ভ্রমরের গুঞ্জন ইত্যাদি—তখন মধ্য হইতে এক গজাহার আনিয়া আমাদের কল্পনায় অমন একটা নিদারুণ আঘাত দিবার তাৎপর্য কি? সুন্দর পদার্থ যেমন কবিত্বপূর্ণ বিস্ময় উৎপন্ন করিতে পারে, এমন কি আর কিছুতে পারে? অপার সমুদ্রের মধ্যে পদ্মাসীনা ষোড়শী রমণীই কি যথেষ্ট বিস্ময়ের কারণ নহে?'

সমালোচনা, ১২৯৪ সাল, 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি'।

রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণিত কমলে কামিনীর চিত্রটির মধ্যে সৌন্দর্য এবং বীভৎসতা এই দুইটি পরস্পর বিরোধী চিত্র দেখিতে পাইয়া ইহারা নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার পরিকল্পনার জন্য মুকুন্দরামকে ব্যক্তিগত ভাবে কিছুতেই দায়ী করা যায় না। কারণ, একটি ঐতিহ্যমূলক কাহিনীর ধারা অনুসরণ করিয়াই মুকুন্দরাম তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী রচনা করিয়াছেন। সেই পূর্ব-প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে কোনও অংশ পরিবর্তন করা তাঁহার সাধ্য ছিল না। ধর্ম এবং অলৌকিকতা মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর ভিত্তি। ধর্মের ক্ষেত্রে অনেক সময় যে রূপকের ব্যবহার হইয়া থাকে কমলে কামিনীর কাহিনী সেই রূপকের উপর পরিকল্পিত। সাধারণ ভাবে ইহাকে সমুদ্র-মরীচিকা বা sea-mirage (পরে দ্রষ্টব্য) বলা যাইতে পারে। মূলত তাহা হইতেই এই রূপক পরিকল্পনার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

৩

'যেখানে একের সহিত অন্যের, কালের সহিত কালান্তরের, গ্রামের সহিত ভিন্ন গ্রামের বিচ্ছেদ, সেখানে ব্যাপক সাহিত্য জন্মিতে পারে না। আমাদের দেশে কিসে অনেক লোক এক হয়? ধর্মে। সেই জন্য আমাদের দেশে কেবল ধর্মসাহিত্যই আছে। সেইজন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য কেবল শাক্ত এবং বৈষ্ণব কাব্যেরই সমষ্টি। রাজপুতগণকে বীরগৌরবে এক করিত। এইজন্য বীরগৌরব তাহাদের কবিদের গানের বিষয় ছিল।'

সাহিত্য, ১৩০১, 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য'

মিলনের মধ্যেই সহিত্যের সৃষ্টি, বিভেদের মধ্যে নহে। ভারতবর্ষে ভাষা ও আচারগত বহু বিভেদ থাকা সত্ত্বেও এক ক্ষেত্রে মিল আছে, তাহা ধর্ম। সেই জন্য ধর্ম এদেশের সাহিত্যের প্রথম ভিত্তি ছিল।

৪

'সুবৃহৎ অনাবরণের মধ্যে অশ্লীলতা নেই। সেইজন্য সুবৃহৎ শেক্সপীয়র অশ্লীল নয়, রামায়ণ-মহাভারত অশ্লীল নয়। কিন্তু ভারতচন্দ্র অশ্লীল, জোলা অশ্লীল—কেন না তারা কেবল আংশিক অনাবরণ।'

'পত্রালাপ', লোকেন্দ্র পালিতকে, ১২৯৮-৯৯

এই বিষয়ে একজন পাশ্চাত্ত্য মনীষী সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সম্পূর্ণ অনাবৃত নারীদেহ অশ্লীল নহে, কিন্তু তাহার এক পায়েও কেবল মাত্র যদি একটি মোজা পরাইয়া দেওয়া হয়, তবেই তাহা অশ্লীল। রবীন্দ্রনাথ এখানে এই কথাটিই বলিতে চাহেন।

৫

'গীতিকবিতা বাংলাদেশে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং গীতিকবিতাই বঙ্গ সাহিত্যের প্রধান গৌরবস্থল। কবিদের পদাবলী বসন্তকালের অপর্যাপ্ত পুষ্পমঞ্জরীর মতো;

যেমন তাহার ভাবের সৌরভ তেমনি তাহার গঠনের সৌন্দর্য। রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গলগান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।'

—'কবিসংগীত', ১৩০২, লোকসাহিত্য।

রবীন্দ্রনাথ ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গলকাব্য'কে গীতিকবিতার সুরে রচিত বলিয়াই মনে করেন। তবে গীতি কবিতার ভাব-সৌন্দর্য যে তাহাতে নাই তাহাও অনুভব করিয়াছেন। তাই ইহার গঠন-সৌন্দর্যের কথা তিনি বলিয়াছেন। বলাই বাহুল্য অন্নদা-মঙ্গলের ছন্দ ও ভাষায় এই ঔজ্জ্বল্য ও কারুকার্য প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ভাব-সৌন্দর্যের অভাবে তাহা কেবল মাত্র চোখ ভুলাইতে পারে, মন ভুলাইতে পারে না।

৬

'প্রাচীন বাংলা কাব্যেও দেখ। বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে সজীব মূর্তি যদি কাহারও থাকে, তবে সে কেবল বিদ্যার ও মালিনীর; সুন্দর-চরিত্রে পদার্থের লেশমাত্র নাই। কবিকঙ্কণচণ্ডীর সুবৃহৎ সমভূমির মধ্যে কেবল ফুল্লরা এবং খুল্লনা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বিকৃত বৃহৎ স্থাণুমাত্র এবং ধনপতি ও তাহার পুত্র কোন কাজের নহে। বঙ্গসাহিত্যে পুরুষ মহাদেবের ন্যায় নিশ্চলভাবে ধূলিশয়ান এবং রমণী তাহার বক্ষের উপর জাগ্রত জীবন্তভাবে বিরাজমান।'

—'নরনারী', ১৩০৪ সাল, পঞ্চভূত।

রবীন্দ্রনাথ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোনও উল্লেখযোগ্য পুরুষ চরিত্রের সন্ধান পান নাই, ইহাতে মনে হয়, মনসা-মঙ্গল কাব্যের চাঁদ সদাগর চরিত্রের তিনি সংবাদ পান নাই। নতুবা দেখিতেন, চাঁদ সদাগরের মধ্যে যথার্থ পৌরুষের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। শেষ পর্যন্ত যে চাঁদ সদাগর মনসার নিকট নতি স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায়, তাহা মনসার নিকট তাঁহার পরাজয় স্বীকার নয়, মনুষ্যকন্যা বেহুলার নিকট পরাজয়। ইহাতে কাব্যের গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৭

'অন্নদামঙ্গল ও কবিকঙ্কণের কবি যদিচ রাজসভা ধনিসভার কবি, যদিচ তাঁহারা উভয় পণ্ডিত, সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে বিশারদ, তথাপি দেশীয় প্রচলিত সাহিত্যকে বেশি দূর ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। অন্নদামঙ্গল ও কুমারসম্ভবের আখ্যানে প্রভেদ অল্প, কিন্তু অন্নদামঙ্গলও কুমারসম্ভবের ছাঁচে গড়া হয় নাই। তাহার দেবদেবী বাংলাদেশের গ্রাম্য হরগৌরী। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, মনসার ভাসান, সত্যপীরের কথা, সমস্তই গ্রাম্যকাহিনী অবলম্বনে রচিত। সেই গ্রাম্য ছড়াগুলির পরিচয় পাইলে তবেই ভারতচন্দ্র-মুকুন্দরাম রচিত কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবার পথ হয়। রাজসভার কাব্যে ছন্দ মিল ও কাব্যকলা সুসম্পূর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু গ্রাম্য ছড়াগুলির সহিত তাহার মর্মগত প্রভেদ ছিল না।

আমার হাতে যে ছড়াগুলি সঞ্চিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষাকৃত পুরাতন কি নূতন নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না। কিন্তু দুই-এক শত বৎসরে এ সকল কবিতার বয়সের কম বেশি হয় না। আজ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে পল্লীর কবি যে ছড়া রচনা করিয়াছে, তাহাকে এক হিসাবে মুকুন্দরামের সমসাময়িক বলা যায়; কারণ, গ্রামের প্রাণটি যেখানে ঢাকা থাকে কালস্রোতের ঢেউগুলি সেখানে তেমন জোরের সঙ্গে ঘা দিতে পারে না। গ্রামের জীবনযাত্রা এবং সেই জীবনযাত্রার সঙ্গী সাহিত্য, বহুকাল বিনা পরিবর্তনে একই ধারায় চলিয়া আসে।'

'গ্রাম্যসাহিত্য', ১৩০৫, লোকসাহিত্য।

যে সাহিত্য মৌখিক প্রচলিত থাকে অর্থাৎ যাহা লোকসাহিত্য, তাহাই ক্রমে লিখিত হইয়া শিল্পসাহিত্যের রূপ লাভ করে। মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র উভয়েই একদিন যাহা মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, তাহাই নিজেদের প্রতিভা এবং প্রবণতা অনুযায়ী লিখিয়া লইয়া কাব্যরূপ দিয়াছেন। তথাপি এই কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ইঁহারা উভয়েই যে বিষয়ে কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা একটা লিখিত আদর্শও লাভ করিয়াছিল। যেমন মুকুন্দরামের আদর্শ ছিল মাণিক দত্ত এবং ভারতচন্দ্রেরও আদর্শ ছিল মুকুন্দরাম। তথাপি ইঁহারা তাঁহাদের কাব্যের বহিরঙ্গ গঠনে ব্যক্তিগত প্রতিভার যে স্পর্শ দানই করুক না কেন, বিষয়-বস্তুর মধ্যে যে মৌখিক সাহিত্যের ঐতিহ্যের ধারাই অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাই রবীন্দ্রনাথ এখানে বলিতে চাহিয়াছেন। গ্রামের জীবনের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় না বলিয়া গ্রাম্য সাহিত্য বা লোক-সাহিত্যেরও বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয় না।

৮

...'বৈষ্ণব কবিরা সেই বন্ধননাশী প্রেমের গভীর দুর্নিবার আবেগকে সৌন্দর্য-ক্ষেত্রে অধ্যাত্ম লোকে বহমান করিয়া তাহাকে অনেক পরিমাণে সংসার-পথ হইতে মানসপথে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন, আমাদের সমাজের সেই চিরক্ষুধাতুর প্রেতটাকে পবিত্র গয়ায় পিণ্ডদান করিবার আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহাদের রচনার মধ্যে যে ইন্দ্রিয়বিকার কোথাও স্থান পায় নাই তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বৃহৎ স্রোতস্বিনী নদীতে যেমন অসংখ্য দূষিত ও মৃত পদার্থ প্রতিনিয়ত আপনাকে আপনি সংশোধন করে তেমনি সৌন্দর্য এবং ভাবের বেগে সেই সমস্ত বিকার সহজেই শোধিত হইয়া চলিয়াছে। বরঞ্চ বিদ্যাসুন্দরের কবি সমাজের বিরুদ্ধে যথার্থ অপরাধী। সমাজের প্রাসাদের নিচে তিনি হাসিয়া হাসিয়া সুড়ঙ্গ খনন করিয়াছেন। সে সুড়ঙ্গ-মধ্যে পূত-সূর্যালোক এবং উন্মুক্ত বায়ুর প্রবেশ পথ নাই। তথাপি এই বিদ্যাসুন্দর কাব্যের এবং বিদ্যাসুন্দর যাত্রার এত আদর আমাদের দেশে কেন? উহা অত্যাচারীর কঠিন সমাজের প্রতি মানবপ্রকৃতির সুনিপুণ পরিহাস। বৈষ্ণব কবি যে জিনিসটাকে ভাবের ছায়াপথে সুন্দররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন, ইনি সেইটাকে সমাজের পিঠের উপরে দাগার মতো ছাপিয়ে দিয়াছেন; যে দেখিতেছে সে-ই কৌতুক অনুভব করিতেছে।'

'গ্রাম্যসাহিত্য', ১৩০৫, লোকসাহিত্য।

বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় যেখানে রচয়িতার ইন্দ্রিয়-বিকার প্রকাশ পাইয়াছে, ভাববাষ্প আসিয়া তাহা আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া তাহাকে বৈকুণ্ঠের পথে অগ্রসর করিবার সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' ভাবাদর্শের স্পর্শহীন একান্ত বাস্তবধর্মী রচনা। প্রত্যক্ষ সমাজ-জীবনের প্রকৃত অবস্থা সেখানে মঙ্গল-কাব্যে কাহিনীর আকারে বর্ণিত হইয়াছে। সচেতনভাবে সমাজের অসঙ্গতির চিত্রটি কবি তাহাতে পরিবেষণ করিয়াছেন, কোনও কিছুই গোপন করেন নাই। সমাজ-জীবনের রূঢ় সত্য পরিহাসচ্ছলে তাহাতে ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহা সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

৯

এক সময় এই দেবী (কালিকা)-র পূজা যে ভদ্র সমাজের বহির্ভূত ছিল তাহা কাদম্বরীতে দেখা যায়। মহাশ্বেতাকে শিবমন্দিরেই দেখি, কিন্তু কবি ঘৃণার সহিত অনার্য শবরের পূজাপদ্ধতির যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায়, পশুরুধিরের দ্বারা দেবতার্চন ও মাংসদ্বারা বলিকর্ম তখন ভদ্রমণ্ডলীর কাছে নিন্দিত ছিল। কিন্তু সেই ভদ্রমণ্ডলীও পরাস্ত হইয়াছিলেন। সেই সামাজিক মহোৎপাতের দিনে নীচের জিনিস উপরে এবং উপরের জিনিস নীচে বিক্ষিপ্ত হইতেছিল।

বঙ্গসাহিত্যের আরম্ভস্তরে সেই সকল উৎপাতের চিহ্ন লিখিত আছে। তিনি যে ধর্মকলহব্যাপারের সম্মুখে আমাদিগকে দণ্ডায়মান করিয়াছেন, সেখানে বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের দেবতা শিবের দুর্গতি। তাঁহার এতোকালের প্রাধান্য 'মেয়ে দেবতা' কাড়িয়া লইবার জন্য রণভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন : শিবকে পরাস্ত হইতে হইল।

স্পষ্টই দেখা যায় এই কলহ বিশিষ্ট দলের সহিত ইতরসাধারণের কলহ। উপেক্ষিত সাধারণ যেন তাহাদের প্রচণ্ড শাক্ত মাতৃদেবতার আশ্রয় লইয়া ভদ্রসমাজের শান্তসমাহিত নিশ্চেষ্ট বৈদান্তিক যোগীশ্বরকে উপেক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিল।'

শক্তিকে উৎকটরূপে প্রকাশ করিতে গেলে প্রথমে তাহার প্রবলতা, তাহার ভীষণতাই জাগাইয়া তুলিতে হয়। তাহার ভয় হইতে রক্ষা করিবার সময় মাতা ও ভয় জন্মাইবার সময় চণ্ডী। তাহার ইচ্ছা কোনো বিধিবিধানের দ্বারা নিয়মিত নহে, তাহা বাধাবিহীন লীলা, কখন কী করে, কেন কী রূপ ধরে, তাহা বুঝিবার জো নাই, এই জন্য তাহা ভয়ংকর।

—সাহিত্য, ১৩০৯, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

ভারতবর্ষে তান্ত্রিক শাক্ত ধর্ম এককালে প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। কালিকা পূজা তাহারই প্রতীক। কোনক্রমে তান্ত্রিক শাক্তধর্ম হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পরস্পরের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করিয়া লইয়াছে। তাহার ফলে শৈব কিংবা বৈষ্ণব ধর্মের যে নিরঙ্কুশ একাধিপত্য ছিল, তাহা হ্রাস পাইয়াছে। সেই সমন্বয়ের সূত্রেই স্ত্রী-দেবতাদিগের পূজাও সমাজে ক্রমে গৃহীত হইয়াছে। এখানে স্ত্রীদেবতার অর্থ জনসাধারণের দেবতা বা লৌকিক দেবতা।

প্রথম আত্মপ্রতিষ্ঠা কিংবা সমন্বয় সাধনের যুগে লৌকিক বা জনসাধারণের দেবতাকে একটু অতিরিক্ত উৎকট প্রকৃতির শক্তি-সমন্বিত করিয়া তাঁহাদের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করিবার আবশ্যক হইয়াছিল।

১০

' "ধান ভানতে শিবের গীত" প্রবাদে বুঝা যায়, শিবের গীত এক সময়ে প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে সমস্তই সাহিত্য হইতে অন্তর্ধান করিয়াছে, বৌদ্ধধর্মের যে সকল চিহ্ন ধর্মমঙ্গল প্রভৃতির কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়, সে-সকলও বৌদ্ধযুগের বহু পরবর্তী। আমাদের চক্ষে বঙ্গসাহিত্যমঞ্চের প্রথম যবনিকাটি যখন উঠিয়া গেল তখন দেখি সমাজে একটি কলহ বাধিয়াছে, সে দেবতার কলহ। চণ্ডী বিষহরি ও শীতলা...এই স্থানীয় দেবদেবীরা জনসাধারণের কাছে বল পাইয়া কিরূপ দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা বঙ্গসাহিত্যে তাহাদের ব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমেই চোখে পড়ে, দেবী চণ্ডী নিজের পূজাস্থাপনের জন্য অস্থির। যেমন করিয়া হউক, ছলে বলে কৌশলে মর্ত্যে পূজা প্রচার করিতে হইবেই। ইহাতে বুঝা যায়, পূজা লইয়া একটা বাদ-বিবাদ আছে। তাহার পর দেখি, যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া দেবী পূজা প্রচার করিতে উদ্যত তাহারা উচ্চ শ্রেণীর লোক নহে। যে নীচের তাহাকেই উপরে উঠাইবেন, ইহাতেই দেবীর শক্তির পরিচয়। নিম্নশ্রেণীর পক্ষে এমন সান্ত্বনা, এমন বলের কথা আর কী আছে! যে দরিদ্র দুই বেলা আহার জোটাইতে পারে না, সেই শক্তির লীলায় সোনার ঘড়া পাইল, যে ব্যাধ নীচজাতীয়, ভদ্রজনের অবজ্ঞা-ভাজন, সে-ই মহত্ত্বলাভ করিয়া কলিঙ্গরাজের কন্যাকে বিবাহ করিল। ইহাই শক্তির লীলা।'

যাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া দেবী পূজা প্রচার করিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা উচ্চশ্রেণীর লোক ছিলেন না, তাহার অর্থ লৌকিকদেবদেবীর পূজা নিম্নশ্রেণীর সমাজেই প্রচলিত ছিল, তাহাদের মধ্যে যাহারা ইতর বিশেষ ছিলেন, তাঁহারাই পূজা প্রচারের অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছিলেন, কোনও অভিজাত চরিত্র স্বভাবতঃই লৌকিক দেবদেবীর পূজার প্রচারক ছিলেন না, থাকিবার কথাও নহে।

'তাহার পর দেখি, শিবের পূজাকে হতমান করিয়াই নিজের পূজা প্রচার করা দেবীর চেষ্টা। শিব তাঁহার স্বামী বটেন, কিন্তু তাহাতে কোন সংকোচ নাই। শিবের সহিত শক্তির এই লড়াই। এই লড়াইয়ে পদে পদে দয়ামায়া বা ন্যায়-অন্যায় পর্যন্ত উপেক্ষিত হইয়াছে।'

কোনও মঙ্গলকাব্যে শিব যে প্রকৃত হেয় হইয়াছেন, তাহা মনে হইতে পারে না, শিবের প্রতিষ্ঠা লইয়া কেহ সংগ্রাম করেন নাই, তাঁহার বিষয়ে কাহারও কোনও অশ্রদ্ধা নাই, প্রত্যেক দেবীই কেবলমাত্র শিবের সঙ্গে একটা না একটা আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়াছেন, এই মাত্র।

'কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ব্যাধের গল্পে দেখিতে পাই, শক্তির ইচ্ছায় নীচ উচ্চে উঠিয়াছে। কেন উঠিয়াছে, তাহার কোনো কারণ নাই; ব্যাধ যে ভক্ত ছিল এমনও পরিচয় পাই নাই। বরঞ্চ

সে দেবীর বাহন সিংহকে মারিয়া দেবীর ক্রোধভাজন হইতেও পারিত। কিন্তু দেবী নিতান্তই যথেচ্ছাক্রমে তাহাকে দয়া করিলেন। ইহাই শক্তির খেলা।'

'ব্যাধকে যেমন বিনা কারণে দেবী দয়া করিলেন, কলিঙ্গরাজকে তেমনি তিনি বিনা দোষে নিগ্রহ করিলেন। তাহার দেশ ডুবাইয়া দিলেন। জগতে ঝড়-জল প্লাবন-ভূমিকম্পে যে শক্তির প্রকাশ দেখি, তাহার মধ্যে ধর্মনীতিসংগত কার্য-কারণমালা দেখা যায় না এবং সংসারে সুখদুঃখবিপৎসম্পদের যে আবর্ত দেখিতে পাই তাহার মধ্যেও ধর্মনীতির সুসঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। দেখিতেছি, যে শক্তি নির্বিচারে পালন করিতেছে, সেই শক্তিই নির্বিচারে ধ্বংস করিতেছে। এই অহৈতুক পালনে এবং অহৈতুক বিনাশে সাধু-অসাধুর ভেদ নাই। এই দয়ামায়াহীন ধর্মাধর্মবিবর্জিত শক্তিকে বড়ো করিয়া দেখা তখনকার কালের পক্ষে বিশেষ স্বাভাবিক ছিল।

ব্যাধকে দয়া না করিলে অর্থাৎ ব্যাধের জীবিকানির্বাহের জন্য কোনও উপায় করিয়া না দিলে বনের পশুকুল বিনষ্ট হয়, সেইজন্য পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চণ্ডী ব্যাধকে বড়লোক করিয়া দিয়া তাহাকে পশু হত্যার কাজ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন।

'তখন নীচের লোকের আকস্মিক অভ্যুত্থান ও উপরের লোকের হঠাৎ পতন সর্বদাই দেখা যাইত। হীনাবস্থার লোক কোথা হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া অরণ্য কাটিয়া নগর বানাইয়াছে এবং প্রতাপশালী রাজা হঠাৎ পরাস্ত হইয়া লাঞ্ছিত হইয়াছে। তখনকার নবাব বাদশাহদের ক্ষমতাও বিধি-বিধানের অতীত ছিল, তাঁহাদের খেয়ালমাত্রে সমস্ত হইতে পারিত। ইঁহারা দয়া করিলেই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া নীচ মহৎ হইত, ভিক্ষুক রাজা হইত। ইঁহারা নির্দয় হইলে ধর্মের দোহাইও কাহাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারিত না। ইহাই শক্তি।'

'এই শক্তির প্রসন্ন মুখ মাতা, এই শক্তির অপ্রসন্ন মুখ চণ্ডী। ইহারই প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ, সেইজন্য সর্বদাই করজোড়ে বসিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু যতক্ষণ ইনি যাহাকে প্রশ্রয় দেন, ততক্ষণ তাহার সাতখুন মাপ; যতক্ষণ সে প্রিয়পাত্র, ততক্ষণ তাহার সঙ্গত-অসঙ্গত সকল আবদারই অনায়াসে পূর্ণ হয়।'

'এইরূপ শক্তি ভয়ঙ্করী হইলেও মানুষের চিত্তকে আকর্ষণ করে। কারণ ইহার কাছে প্রত্যাশার কোন সীমা নেই। আমি অন্যায় করিলেও জয়ী হইতে পারি, আমি অক্ষম হইলেও আমার দুরাশার চরমতম স্বপ্ন সফল হইতে পারে।'

অবশ্য বৈদান্তিক শিব কোনও কালেই সাধারণের দেবতা ছিলেন না। সেই অবস্থার মধ্যে তাহা হইতেও পারেন নাই; যে সকল দেবদেবীর পরিকল্পনায় হাতে হাতে ফল পাইবার সম্ভাবনা অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনের ক্ষতিবৃদ্ধির সঙ্গে যাঁহারা জড়িত সেই যুগে তাঁহারাই এই সমাজের দেবতা ছিলেন।

'এই সকল কারণে যে-সময় বাদশাহ ও নবাবের অপ্রতিহত ইচ্ছা জনসাধারণকে ভয়ে-বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল এবং ন্যায় অন্যায় সম্ভব অসম্ভবের ভেদচিহ্নকে ক্ষীণ

করিয়া আনিয়াছিল, হর্ষশোক-বিপদসম্পদের অতীত শান্তসমাহিত বৈদান্তিক শিব সে সময়কার সাধারণের দেবতা হইতে পারেন না। রাগদ্বেষ-প্রসাদ-অপ্রসাদের লীলাচঞ্চলা যদৃচ্ছাচারিণী শক্তিই তখনকার কালের দেবত্বের চরমাদর্শ।'

'কবিকঙ্কণে দেবী এই যে ব্যাধের দ্বারা নিজের পূজা মর্ত্যে প্রচার করিলেন, স্বয়ং ইন্দ্রের পুত্র যে ব্যাধরূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করিল, বাংলাদেশের এই লোক-প্রচলিত কথার কি কোন ঐতিহাসিক অর্থ নাই? পশুবলি প্রভৃতির দ্বারা যে ভীষণ পূজা এককালে ব্যাধের মধ্যে প্রচলিত ছিল সেই পূজাই কি কালক্রমে উচ্চসমাজে প্রবেশলাভ করে নাই?...

ধনপতির গল্পে দেখিতে পাই, সে উচ্চজাতীয় ভদ্রবৈশ্য শিবোপাসক। শুধুমাত্র এই পাপে চণ্ডী তাহাকে নানা দুর্গতিব দ্বারা পরাস্ত করিয়া আপন মাহাত্ম্য প্রমাণ করিলেন।

বস্তুত সাংসারিক সুখদুঃখ বিপৎসম্পদের দ্বারা নিজের ইষ্টদেবতার বিচার করিতে গেলে, সেই অনিশ্চয়তার কালে শিবের পূজা টিকিতে পারে না। অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার তরঙ্গ যখন চারিদিকে জাগিয়া উঠিয়াছে, তখন যে-দেবতা ইচ্ছাসংযমের আদর্শ, তাঁহাকে সাংসারিক উন্নতির উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দুর্গতি হইলেই মনে হয়, আমার নিশ্চেষ্ট দেবতা আমার জন্য কিছুই করিতেছেন না, ভোলানাথ সমস্ত ভুলিয়া বসিয়া আছেন। চণ্ডীর উপাসকেরাও কি সকল দুর্গতি এড়াইয়া উন্নতিলাভ করিতেছিলেন? অবশ্যই নহে। কিন্তু শক্তিকে দেবতা করিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে ভুলাইবার উপায় থাকে। শক্তিপূজক দুর্গতির মধ্যেও শক্তি অনুভব করিয়া ভীত হয়, উন্নতিতেও শক্তি অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। আমার প্রতি বিশেষ অকৃপা—ইহার ভয় যেমন আত্যন্তিক, আমারই প্রতি বিশেষ দয়া—ইহার আনন্দও তেমনি অতিশয়। কিন্তু যে-দেবতা বলেন—'সুখদুঃখ দুর্গতি-সদ্‌গতি, ও কিছুই নয়, ও কেবল মায়া, ওদিকে দৃক্‌পাত করিয়ো না'—সংসারে তাহার উপাসক অল্পই অবশিষ্ট থাকে। সংসার মুখে যাহাই বলুক, মুক্তি চায় না, ধনজনমান চায়। ধনপতির মতো ব্যবসায়ী লোক সংযমী সদাশিবকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিল না; বহুতর নৌকা ডুবিল, ধনপতি শেষকালে শিবের উপাসনা ছাড়িয়া শক্তি-উপাসক হইল।'

... ...

'বাংলাদেশে অত্যুগ্র চণ্ডী ক্রমশ মাতা অন্নপূর্ণার রূপে, ভিখারীর গৃহ-লক্ষ্মীরূপে, বিচ্ছেদবিধুর পিতামাতার কন্যারূপে—মাতা পত্নী ও কন্যা, রমণীর এই ত্রিবিধ মঙ্গলসুন্দর রূপে—দরিদ্র বাঙ্গালীর ঘরে...রসসঞ্চার করিয়াছেন...। কালিদাসের কুমারসম্ভব সাহিত্যে দাম্পত্যপ্রেমকে মহীয়ান করিয়া এই মঙ্গলভাবটিকে মূর্তিমান করিয়াছিল। বাংলাসাহিত্যে এই ভাবের পরিস্ফুটতা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তথাপি বাঙ্গালীর দরিদ্রগৃহের মধ্যে এই মঙ্গল-মাধুর্যসিক্ত দেবভাবের অবতারণা কবিকঙ্কণচণ্ডীতে কিয়ৎপরিমাণে আপনাকে অঙ্কিত করিয়াছে, অন্নদামঙ্গলও তাহার উপর রং ফলাইয়াছে। কিন্তু মাধুর্যের ভাব গীতিকবিতার সম্পত্তি। চণ্ডীপূজা ক্রমে যখন ভক্তিতে ও স্নিগ্ধ রসে মধুর হইয়া উঠিতে লাগিল তখন তাহা

মঙ্গলকাব্য ত্যাগ করিয়া খণ্ড খণ্ড গীতে উৎসারিত হইল।'......

প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকাব্যের এই খণ্ড খণ্ড গীতরূপই হইতেছে আগমনী বিজয়া গান কিংবা শাক্ত পদাবলী। বৈষ্ণব গীতিকবিতার প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলেই বাংলা সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই ইহাদের আবির্ভাব দেখা যায়।

'চণ্ডী যেমন প্রচণ্ড উপদ্রবে আপনার পূজা প্রতিষ্ঠা করেন, মনসা শীতলাও তেমনি তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। শৈব চাঁদ-সদাগরের দুরবস্থা সকলেই জানেন। বিষহরি, দক্ষিণরায়, সত্যপীর প্রভৃতি আরও অনেক ছোটোখাটো দেবতা আপন আপন বিক্রম প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। শাক্ত যে পূজা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা তখনকার কালের অনুগামী। অর্থাৎ সমাজে তখন যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, যে শক্তির খেলা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হইতেছিল, যে-সকল আকস্মিক উত্থানপতন লোককে প্রবলবেগে চকিত করিয়া দিতেছিল, মনে মনে তাহাকেই দেবত্ব দিয়া, শাক্তধর্ম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।'

রবীন্দ্রনাথ এখানে সমসাময়িক বাংলাদেশের ইতিহাসের কথা উল্লেখ করিতেছেন এবং বলিতেছে, সেই কালোপযোগী করিয়া মঙ্গলকাব্যের শাক্ত দেবদেবীদিগের কল্পনা করা হইয়াছে। রাষ্ট্রশক্তির স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরশাসনের ফলে সে যুগে ভিক্ষুক যেমন রাজা হইয়াছে, রাজাও তেমনই ভিখারী হইয়াছে। সেই স্বেচ্ছাচারী শক্তিরূপের প্রতিনিধি মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী।

... ...

'সমাজের চিত্ত যখন নিজের বর্তমান অবস্থা-বন্ধনে বদ্ধ থাকে এবং সমাজের চিত্ত যখন ভাবপ্রাবল্যে নিজের অবস্থার ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়, এই দুই অবস্থার সাহিত্যের প্রভেদ অত্যন্ত অধীর।'

'সমাজ যখন নিজের চতুর্দিগ্‌বর্তী বেষ্টনীর মধ্যে নিজের বর্তমান অবস্থার মধ্যেই সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ থাকে, তখন সে বসিয়া বসিয়া আপনার সেই অবস্থাকে কল্পনার দ্বারা দেবত্ব দিয়া মণ্ডিত করিতে চেষ্টা করে। সে যেন কারাগারের ছবি আঁকিয়া কারাগারকে প্রাসাদের মতো সাজাইতে চেষ্টা পায়। সেই চেষ্টার মধ্যে মানবচিত্তের যে বেদনা, যে ব্যাকুলতা আছে, তাহা বড় সকরুণ, সাহিত্যে সেই চেষ্টার বেদনা ও কল্পনা আমরা শক্তিযুগের মঙ্গলকাব্যে দেখিয়াছি। তখন সমাজের মধ্যে যে উপদ্রব-উৎপীড়ন, আকস্মিক উৎপাত, যে অনিশ্চয়তা ছিল, মঙ্গলকাব্য তাহাকেই দেবমর্যাদা দিয়া সমস্ত দুঃখ-অবমাননাকে ভীষণ দেবতার অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করিতেছিল এবং দুঃখক্লেশকে ভাঙাইয়া ভক্তির স্বর্ণমুদ্রা গড়িতেছিল। এই চেষ্টা কারাগারের মধ্যে কিছু আনন্দ, কিছু সান্ত্বনা আনে বটে, কিন্তু কারাগারকে প্রাসাদ করিয়া তুলিতে পারে না। এই চেষ্টা সাহিত্যকে তাহার বিশেষ দেশকালের বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না।'

—সাহিত্য (১৩০৯), ঐ।

১১

'কবিকঙ্কণচণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্তের যে বর্ণনা আছে, সে বর্ণনায় মানুষের চরিত্রের যে একটা বড় দিক দেখানো হইয়াছে তাহা নহে; এরকম চতুর স্বার্থপর এবং গায়ে পড়িয়া মোড়লি করিতে মজবুত লোক আমরা অনেক দেখিয়াছি। তাহাদের সঙ্গ যে সুখকর তাহাও বলিতে পারা যায় না। কিন্তু কবিকঙ্কণ এই ছাঁদের মানুষটিকে আমাদের কাছে যে মূর্তিমান করিতে পারিয়াছেন, তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। ভাষায় এমন এক কৌতুক রস লইয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে যে, সে শুধু কালকেতুর সভায় নয়, আমাদের হৃদয়ের দরবারে অনায়াসে স্থান পাইয়াছে। ভাঁড়ুদত্ত প্রত্যক্ষ সংসারে ঠিক এমন করিয়া আমাদের গোচর হইত না। আমাদের মনের কাছে সুসহ করিবার পক্ষে ভাঁড়ুদত্তের যতটুকু আবশ্যক, কবি তাহার চেয়ে বেশি কিছুই দেন নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ সংসারের ভাঁড়ুদত্ত ঠিক ওইটুকুমাত্র নয়—এইজন্যই সে আমাদের কাছে অমন করিয়া গোচর হইবার অবকাশ পায় না। কোনো-একটা সমগ্রভাবে সে আমাদের কাছে গোচর হয় না বলিয়াই আমরা তাহাতে আনন্দ পাই না। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্ত তাহার সমস্ত অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জন করিয়া কেবল একটি সমগ্র রসের মূর্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে।

ভাঁড়ুদত্ত যেমন, চরিত্রমাত্রই সেইরূপ।'

—সাহিত্য (১৩১৪), 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য'।

১২

মুকুন্দরামের চণ্ডী, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, কেতকাদাস প্রভৃতির মনসার ভাসান, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল...বাংলা ছোটো ছোটো পল্লীসাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বাঁধিবার প্রয়াস।

—সাহিত্যসৃষ্টি, সাহিত্য (১৩১৪)॥

পল্লীসমাজে প্রচলিত মৌখিক সাহিত্য বা লোক-সাহিত্যের উপকরণ লইয়াই মঙ্গলকাব্যরচিত হইয়াছে। জীবনের নিতান্ত তুচ্ছ উপকরণগুলিকে শিল্পসাহিত্যের মধ্যে স্থান দিয়া ইহাদিগকে স্থায়িত্ব দিবার প্রয়াস করা হইয়াছে, ইহাই রবীন্দ্রনাথের অভিমত।

১৩

'আজ পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে যদি কবিকঙ্কণচণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসানের পুনরাবৃত্তি নিয়ত চলতে থাকত তা হলে কী হত। পনেরো আনা লোক সাহিত্য পড়া ছেড়েই দিত। বাংলার সকল গল্পই যদি বাসবদত্তা কাদম্বরী ছাঁচে ঢালা হত, তাহলে জাতে ঠেলার ভয় দেখিয়ে সে গল্প পড়াতে হত।

কবিকঙ্কণচণ্ডী-কাদম্বরীর আমি নিন্দা করছি নে। সাহিত্যের শোভাযাত্রার মধ্যে চিরকালই তাদের একটা স্থান আছে। কিন্তু যাত্রাপথের সমস্তটা জুড়ে তারাই যদি আড্ডা করে বসে, তা হলে সেই পথটাই মাটি, আর তাদের আসরে কেবল তাকিয়া পড়ে থাকবে,

মানুষ থাকবে না।

বঙ্কিম আনলেন সাতসমুদ্র-পারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য-রাজকন্যার পালঙ্কের শিয়রে। তিনি যেমনি ঠেকালেন সোনার কাঠি, অমনি সেই বিজয়বসন্ত লয়লা-মজনুর হাতির দাঁতে বাঁধানো পালঙ্কের উপর রাজকন্যা নড়ে উঠলেন। চলতি কালের সঙ্গে তাঁর মালাবদল হয়ে গেল, তারপর থেকে তাঁকে আজ আর ঠেকিয়ে রাখে কে।

যারা-মনুষ্যত্বের চেয়ে কৌলীন্যকে বড়ো করে মানে তারা বলবে, ঐ রাজপুত্রটা যে বিদেশী। তারা এখনও বলে, এ সমস্তই ভুয়ো। বস্তুতন্ত্র যদি কিছু থাকে তো ঐ কবিকঙ্কণচণ্ডী, কেন না এ আমাদের খাঁটি মাল। তাদের কথাই যদি সত্য হয় তা হলে একথা বলতেই হবে, নিছক খাঁটি বস্তুতন্ত্রকে মানুষ পছন্দ করে না। মানুষ তাকেই চায় যা বস্তু হয়ে বাস্তু গেড়ে বসে না, যা তার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চলে, যা তাকে মুক্তির স্বাদ দেয়।'

—বিচিত্র প্রবন্ধ (১৩২২), 'সোনার কাঠি'।

রবীন্দ্রনাথের নিকট সাহিত্যে একান্ত বাস্তবানুগত্যের কোনও মূল্য নাই। মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণচণ্ডী একান্ত বস্তুতন্ত্র-ভিত্তিক রচনা, আমাদের সমাজ, আমাদের জীবন তাহার মধ্যে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সাহিত্য-পাঠক তাহা লইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না। তাহারা চায় যাহা বস্তুকে অবলম্বন করিয়াও তাহাকে অতিক্রম করিয়া যায় তাহাই। কবিকঙ্কণচণ্ডীর মধ্যে বস্তুর ভার আছে, কিন্তু বস্তুর ধার নাই।

১৪

'একদা আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় উচ্ছৃঙ্খলতার সময় ভীত পীড়িত প্রজা আপন কবিদের মুখ শক্তিরই স্তবগান করিয়েছে। কবিকঙ্কণচণ্ডী, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসান, প্রকৃতপক্ষে অধর্মেরই জয়গান। সেই কাব্যে অন্যায়কারিণী ছলনাময়ী নিষ্ঠুর শক্তির হাতে শিব পরাভূত। অথচ অদ্ভুদ ব্যাপার এই যে, এই পরাভব-গানকেই মঙ্গলগান নাম দেওয়া হল।'

—বাতায়নিকের পত্র, কালান্তর (১৩২৬)।

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে কোনও মঙ্গলকাব্যেই শিবকে পরাজিত করিয়া লৌকিক দেবদেবীর প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয় নাই। বরং শিবের সঙ্গে সব লৌকিক দেব-দেবীই একটা সম্পর্ক স্থাপন করিয়া নিজেদের আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে। সেই সূত্রেই চণ্ডী শিবের ভার্যা, মনসা শিবের কন্যা ইত্যাদি। শৈবধর্মের পার্শ্বেই লৌকিক ধর্মের বিকাশের কথা মঙ্গলগানে কীর্তিত হইয়াছে। একমাত্র নাথসাহিত্যে শিবের সঙ্গে গোরক্ষনাথের বিরোধ দেখা গেলেও মঙ্গলকাব্যে শিব কোথাও পরাভূত দেবতা নহেন, তবে নাথসাহিত্য মঙ্গলকাব্য নহে।

'বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয়টা হচ্ছে, এক দেবতাকে তার সিংহাসন থেকে খেদিয়ে দিয়ে আর এক দেবতার অভ্যুদয়, সহজেই এই কথা মনে হয় যে, দুই দেবতার মধ্যে যদি কিছু নিয়ে প্রতিযোগিতা থাকে তাহলে সেটা ধর্মনীতিগত আদর্শের তারতম্য নিয়ে। যদি মানুষের ধর্মবুদ্ধিকে নূতন দেবতা পুরাতন দেবতার চেয়ে বেশি তৃপ্তি দিতে পারেন তা হলেই তাঁকে বরণ করবার সঙ্গত কারণ পাওয়া যায়।

...এককালে পুরুষ দেবতা যিনি ছিলেন তাঁর বিশেষ কোন উপদ্রব ছিল না। খামকা মেয়ে দেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন, "আমার পুজো চাই।" অর্থাৎ "যে জায়গায় আমার দখল নেই, সেই জায়গা আমি দখল করবই।" তোমার দলিল কী? গায়ের জোর। কী উপায়ে দখল করবে? যে উপায়েই হোক। তারপর যে সব উপায় দেখা গেল, মানুষের সদ্‌বুদ্ধিতে তাকে সদুপায় বলে না। কিন্তু পরিণামে এই সকল উপায়েরই জয় হল। ছলনা অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতা কেবল যে মন্দির দখল করল তা নয়, কবিদের দিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে চামর দুলিয়ে আপন জয়গান গাইয়ে নিলে। লজ্জিত কবিরা কৈফিয়ত দেবার ছলে মাথা চুলকিয়ে বললেন, "কী করব, আমার উপর স্বপ্নে আদেশ হয়েছে।" এই স্বপ্ন একদিন আমাদের সমস্ত দেশের উপর ভর করেছিল।

একদিন অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাস আমাদের সমাজের মধ্যে সর্বব্যাপী ছিল, সেই সূত্রেই কবি দেবতার নামে যাহাই প্রচার করিয়াছেন, তাহাই সমাজ শ্রদ্ধায় হোক, ভয়েই হোক, বিশ্বাস করিয়াছে। মঙ্গলকাব্যগুলি সেই যুগের সৃষ্টি।

'সেদিনকার ইতিহাস স্পষ্ট নয়। ইতিহাসের যে একটা আবছায়া দেখতে পাচ্ছি সেটা এইরকম—বাংলা সাহিত্য যখন তার অব্যক্ত কারণ-সমুদ্রের ভিতর থেকে প্রবালদ্বীপের মতো প্রথম মাথা তুলে দেখা দিলে, তখন বৌদ্ধধর্ম জীর্ণ হয়ে, বিদীর্ণ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে নানাপ্রকার বিকৃতিতে পরিণত হচ্ছে। স্বপ্নে যেমন এক থেকে আর হয়, তেমনি করেই বুদ্ধ তখন শিব হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। শিব ত্যাগী, শিব ভিক্ষুক, শিব সর্বসাধারণের। বৈদিক দক্ষের সঙ্গে এই শিবের বিরোধের কথা কবিকঙ্কণ এবং অন্নদামঙ্গলের গোড়াতেই প্রকাশিত আছে। শিবও দেখি বুদ্ধের মত নির্বাণমুক্তির পক্ষে; প্রলয়েই তাঁর আনন্দ।'

দক্ষের সঙ্গে শিবের বিরোধের কথা মঙ্গলকাব্য রচনার বহু পূর্ববর্তী কালেই পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, এমনকি, বৈদিক সাহিত্যেও তাহার আভাস আছে। মঙ্গল-কাব্য পুরাণ অনুযায়ী রচনা বলিয়া ইহার মধ্যেও কাহিনীর এই ধারা অনুসরণ করা হইয়াছে। বোধহয় রবীন্দ্রনাথও একথা বলিতে চাহেন না যে, এই শিবের সঙ্গে বৈদিক দেবতার বিরোধের কথা মুকুন্দরাম কিংবা ভারতচন্দ্রেরই পরিকল্পনা।

'কিন্তু এই শান্তির দেবতা, ত্যাগের দেবতা টিকল না। য়ুরোপেও আধুনিক শক্তিপূজক বলেছেন, "যিশুর মতো অমন গরিবের দেবতা, নিরীহ দেবতা, অমন নেহাৎ ফিকে রঙের দেবতা নিয়ে আমাদের চলবে না। আমাদের এমন দেবতা চাই, জোর করে যে কেড়ে নিতে পারে; যেমন করে হোক যে নিজেকে জাহির করতে গিয়ে না মানে বাধা, না পায় ব্যথা, না করে লজ্জা।" কিন্তু য়ুরোপে এই যে বুলি উঠেছে সে কাদের পানসভার বুলি? যারা

জিতেছে, যারা লুটেছে, পৃথিবীটাকে টুকরো টুকরো করে যারা তাদের মদের চাট বানিয়ে খাচ্ছে।

আমাদের দেশের মঙ্গলকাব্যের আসরেও ঐ বুলিই উঠেছিল। কিন্তু এ বুলি কোথা থেকে উঠল? যাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই, সম্মান নেই, সেই হতভাগাদের স্বপ্নের থেকে। তারা স্বপ্ন দেখল, কখন? যখন—

নারায়ণ, পরাশর, এড়াইল দামোদর,
উপনীত কুচট্যানগরে।
তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান, করিলু উদকপান,
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।
আশ্রম পুখরি-আড়া, নৈবেদ্য শালুক পোড়া,
পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধাভয় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে,
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।।

সেদিনকার শক্তির স্বপ্ন স্বপ্নমাত্র, সে স্বপ্নের মূল—ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমের মধ্যে।'

সমাজ-জীবনের দারিদ্র্য, অপমান, লজ্জা এবং হতাশার মধ্যেই মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া রবীন্দ্রনাথ এখানে মনে করিয়াছেন। 'শক্তির স্বপ্ন স্বপ্নমাত্র'—ইহার অর্থ এই যে প্রকৃত শক্তি জাতির মধ্যে ছিল না, সেইজন্যই শক্তির কল্পনা করিয়া মনে মনে এই জাতি আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে, চারিদিককার গ্লানিকর অবস্থার মধ্য হইতে পরিত্রানের পথ সন্ধান করিয়াছে।

'শোনা গেছে ইতিহাসের গান অমিত্রাক্ষরে হয় না, এর চরণে চরনে মিল। সেই পাঁচশো বছর পূর্বের এক চরণের সঙ্গে আজ পাঁচশো বছর পরের এক চরণের মিল শোনা যাচ্ছে না কি? য়ুরোপের শক্তিপূজক আজ বুক ফুলিয়ে বড়ো সমারোহেই শক্তির পুজো করছেন—মদে তাঁর দুই চক্ষু জবাফুলের মতো টকটক করছে, খাঁড়া শাণিত, বলির পশু যূপে বাঁধা, তাঁরা কেউ কেউ বলেছেন, "আমরা যিশুকে মানি নে"; আবার কেউ কেউ ভারতচন্দ্রের মতো গোঁজামিল দিয়ে বলছেন, "যিশুর সঙ্গে শক্তির সঙ্গে ভেদ করে দেওয়া ঠিক নয়, অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে দুজনকেই সমান মানবার মন্ত্র আছে।"...

আর আমরাও বলছি, শিবকে মানব না। শিবকে মানা কাপুরুষতা। আমরা চণ্ডীর মঙ্গল গাইতে বসেছি। কিন্তু সে মঙ্গলগান স্বপ্নলব্ধ। ক্ষুধা-ভয়-পরিশ্রমের স্বপ্ন। জয়ীর চণ্ডীপূজায় আর পরাজিতের চণ্ডীগানে এই তফাৎ।'

জয়ীর চণ্ডীপূজা বলিতে পাশ্চাত্ত্য জাতির জড় শক্তিসাধনা আর পরাজিতের চণ্ডীগান বলিতে দুর্বল বাঙ্গালীর দৈবনির্ভরতার কথা রবীন্দ্রনাথ মনে করিয়াছেন।

'স্বপ্নেতেই যে আমাদের চণ্ডীগানের আদি এবং স্বপ্নেতেই যে তার অন্ত, তার প্রমাণ কী? ঐ দেখো না ব্যাধের দশা, তার স্ত্রী ফুল্লরার বারমাস্যা একবার শোনো। কিন্তু, হল কী! হঠাৎ খামখেয়ালী শক্তি বিনা কারণে তাকে এমন-একটা আঙটি দিলেন যে, ঘরে আর টাকা ধরে না। কলিঙ্গরাজের সঙ্গে এই সামান্য ব্যাধ লড়াই করল, তখন খামকা স্বয়ং হনুমান এসে তার পক্ষ নিয়ে কলিঙ্গের সৈন্যকে কিলিয়ে লাথিয়ে একাকার করে দিল। একেই বলে শক্তির স্বপ্ন, ক্ষুধা এবং ভয়ের বরপুত্র। হঠাৎ একটা কিছু হবে। তাই সেই অতি অদ্ভুত আশায় আমরা দলে দলে উচ্চৈঃস্বরে 'মা, মা' করে চণ্ডীগান করতে লেগে গেছি। সেই চণ্ডী ন্যায়-অন্যায় মানে না; সুবিধার খাতিরে সত্যমিথ্যায় সে ভেদ করে না; সে যেন-তেন-প্রকারে ছোটকে বড় , দরিদ্রকে ধনী, অশক্তকে শক্তিমান করে দেয়। তারজন্য যোগ্য হবার দরকার নেই, অন্তরের দারিদ্র্য দূর করবার প্রয়োজন হবে না, যেখানে যা যেমনভাবে আছে আলস্যভরে সেখানে তাকে তেমনি ভাবেই রাখা চলবে। কেবল করজোড়ে তারস্বরে বলতে হবে—মা, মা, মা!'

পৌরুষের ভিতর দিয়া মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠাই রবীন্দ্র-সাধনার লক্ষ্য ছিল, কাপুরুষোচিত দৈবনির্ভরতাকে তিনি জীবনে কোনও দিনই আদর্শ বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। উদ্যমহীন জীবনে দেবভক্তির উপর নির্ভরশীলতাকে তিনি চিরদিনই ধিক্‌কার দিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য কর্মবাদের প্রেরণা তাঁহাকে ধ্যান-ধারণার মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিল।

'যখন মোগল পাঠানের বন্যা দেশের উপর ভেঙে পড়ল, তখন সংসারের যে বাহ্য রূপ মানুষ প্রবল করে দেখতে পেল সেটা শক্তিরই রূপ। সেখানে ধর্মের হিসাব পাওয়া যায় না, সেখানে শিবের পরিচয় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মানুষ যদি তখনো সমস্ত দুঃখ এবং পরাভবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে পাবে "আমি সব সহ্য করব, তবু কিছুতেই একে দেবতা বলে মানতে পারব না", তা হলেই মানুষের জিত হয়। চাঁদ সদাগর কিংবা ধনপতির বিদ্রোহের মধ্যে কিছু দূর পর্যন্ত মানুষের সেই পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। মারের পর মার খেয়েছে, কিন্তু ভক্তিকে ঠিক জায়গা থেকে নড়তে দেয়নি। মিথ্যা এবং অন্যায় চারিদিক থেকে তাদের আক্রমণ কবলে; চণ্ডী বললেন, "ভয়ে অভিভূত করে দুঃখে জর্জর করে, ক্ষতিতে দুর্বল করে, মারের চোটে মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে জোর করে আমার পুজো আদায় করবই।" নইলে? "নইলে আমার প্রেস্টিজ যায়।" ধর্মের প্রেস্টিজের জন্যে চণ্ডীর খেয়াল নেই, তাঁর প্রেস্টিজ হচ্ছে ক্ষমতার প্রেস্টিজ। অতএব মারের পর মার, মারের পর মার।

অবশেষে দুঃখের যখন চূড়ান্ত হল, তখন শিবকে সরিয়ে রেখে শক্তির কাছে আধমরা সদাগর মাথা হেঁট করল। শক্তি তাদের এতদিন যে এত দুঃখ দিয়েছিল সে দুঃখে তেমন

অপমান নেই, যেমন অপমান শেষকালে এই মাথা হেঁট করে। যে আত্মা অভয়, যে আত্মা অমর, সে আপন প্রতিষ্ঠা থেকে নেমে এসে ভয়কে মৃত্যুকে দেবতা বলে, আপনার চেয়ে বড়ো ব'লে মানলে। এইখানেই শক্তির সকলের চেয়ে বীভৎস পরিচয় পাওয়া গেল।'

—কালান্তর (১৩২৬), 'বাতায়নিকের পত্র'।।

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে চাঁদ সদাগরের মত চরিত্র কোনদিন শক্তি বা মনসার নিকট মাথা হেঁট করিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে করেও নাই, মানবীকন্যা বেহুলার প্রতি স্নেহবশত সে মনসাকে তাচ্ছিল্য সহকারে স্বীকার করিয়াছে। ইহাতে চাঁদ সদাগরের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় নাই, তাহার নিকট মানবীকন্যার মহিমা বাড়িয়াছে, কাব্যেরও ধর্মরক্ষা পাইয়াছে। দেবতার নিকট মানুষ মাথা হেঁট করিলে মঙ্গলকাব্য পুরাণ হইত, কাব্য হইত না।

১৬

'আমাদের দেশে শিব এবং শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে দুটি ধারা দেখতে পাই। তার মধ্যে একটিকে শাস্ত্রিক এবং আর একটিকে লৌকিক বলা যেতে পারে। শাস্ত্রিক শিব যতি, বৈরাগী। লৌকিক শিব উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল। বাংলা মঙ্গলকাব্যে এই লৌকিক শিবেরই বর্ণনা দেখতে পাই। এমন কি, রাজসভার কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে শিবের যে-চরিত্র বর্ণিত, সে আর্যসমাজসম্মত নয়।'

'শক্তির যে শাস্ত্রিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, আমি তা স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু বাংলা মঙ্গলকাব্যে শক্তির যে স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে, সে লৌকিক—এবং তার ভাব অনুরূপ। সংসারে যারা পীড়িত, যারা পরাজিত, অথচ এই পীড়া ও পরাজয়ের যারা কোনো ধর্মসঙ্গত কারণ দেখতে পাচ্ছে না, তারা স্বেচ্ছোচারিণী নিষ্ঠুর শক্তির অন্যায় ক্রোধকেই সকল দুঃখের কারণ বলে ধরে নিয়েছে—এবং সেই ঈর্ষাপরায়ণা শক্তিকে স্তবের দ্বারা, পূজার দ্বারা, শান্ত করাব আশাই এই-সকল মঙ্গলকাব্যের প্রেরণা।'

'প্রচণ্ড দেবতার যথেচ্ছাচারের বিভীষিকা মানবজাতির প্রথম পূজার মূলে দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ মানুষ তখনো বিশ্বের মূলে বিশ্বনিয়মকে দেখতে পায়নি এবং তখন সে সর্বদাই ভয়-বিপদের দ্বারা বেষ্টিত। তখন শক্তিমানের আকস্মিক ঐশ্বর্যলাভ সর্বদাই চোখে পড়েছে, এবং আকস্মিকতারই প্রভাব মানবসমাজে সব চেয়ে উগ্রভাবে দৃশ্যমান।

ভয় এবং বিস্ময়বোধ হইতে সমাজে দেবতাপূজার প্রথম উদ্ভব হইয়াছে, এই কথা অনেকে মনে করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও এখানে তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন। ইহার যে কারণ তিনি নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা যে মনোবিজ্ঞানসম্মত তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

'যে সময় কবিকঙ্কণচণ্ডী অন্নদামঙ্গল লিখিত হয়েছে সে সময় মানুষের আকস্মিক উত্থানপতন বিস্ময়কর রূপে প্রকাশিত হত। তখন চারদিকেই শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘাত চলছে, এবং কার ভাগ্যে কোনদিন যে কী আছে তা কেউ বলতে পারছে না। যে ব্যক্তি শক্তিমানকে ঠিকভাবে স্তব করতে জানে, যে ব্যক্তি সত্যমিথ্যা ন্যায়-অন্যায় বিচার করে না,

তার সমৃদ্ধিলাভের দৃষ্টান্ত তখন সর্বত্র প্রত্যক্ষ। চণ্ডীশক্তিকে প্রসন্ন করে তাকে নিজের ব্যক্তিগত ইষ্টলাভের অনুকূল করা তখন অন্তত একশ্রেণীর ধর্মসাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল; তখনকার ধনী-মানীরাই বিশেষত এই শ্রেণীভুক্ত ছিল, কেননা তখনকার শক্তির ঝড় তাদের উচ্চ চূড়ার উপরেই বিশেষ করে আঘাত করত।'

—কালান্তর (১৩২৬), 'শক্তিপূজা'।

১৭

'আর একজন কবি দারিদ্র্যদুঃখ বর্ণনা করেছেন। বিষয় হিসাবে স্বভাবতই মনের উপর তার প্রভাব আছে। দরিদ্র ঘরের মেয়ে, অন্নের অভাবে আমানি খেয়ে তাকে পেট ভরাতে হয়—তাও যে পাত্রে করে খাবে এমন সম্বল নেই, মেজেতে গর্ত করে আমানি ঢেলে খায়—দারিদ্রনারায়ণকে আর্তস্বরে দোহাই পাড়বার মতো ব্যাপার। কবি লিখলেন—

দুঃখ করো অবধান, দুঃখ করো অবধান।
আমানি খাবার গর্ত দেখো বিদ্যমান্।।

কথাটা রিপোর্ট করা হল মাত্র, তা রূপ ধরল না। কিন্তু. সাহিত্যে ধনী বা দরিদ্রকে বিষয় করা দ্বারায় তার উৎকর্ষ ঘটে না, ভাব ভাষা ভঙ্গি সমস্তটা জড়িয়ে একটা মূর্তি সৃষ্টি হল কি না এইটেই লক্ষ্য করবার যোগ্য। 'তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে'—দারিদ্র্যেদুঃখের বিষয় হিসাবে এর শোচনীয়তা অতি নিবিড়, কিন্তু তবু কাব্য-হিসাবে এতে অনেকখানি বাকি রইল।

—সাহিত্যের পথে (১৩৩৫), সাহিত্যরূপ।

এই কথা রবীন্দ্রনাথ পূর্বেও একটি প্রবন্ধ উল্লেখ করিয়াছেন, এমন কি, তাহাতেও এই উদ্ধৃতিটিই ব্যবহার করিয়াছেন। পূর্বে ইহার সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে।

১৮

'মঙ্গলকাব্যের ভূমিকাতেই দেখি, কবি চলেছেন দেশ ছেড়ে। রাজ্যে কোনো ব্যবস্থা নেই, শাসনকর্তারা যথেচ্ছাচারী। নিজের জীবনে মুকুন্দরাম রাষ্ট্রশক্তির যে পরিচয় পেয়েছেন তাতে তিনি সবচেয়ে প্রবল করে অনুভব করেছেন অন্যায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা; বিদেশে উপবাসের পর স্নান করে তিনি যখন ঘুমোলেন, দেবী তাঁকে স্বপ্নে আদেশ করলেন দেবীর মহিমাগান রচনা করবার জন্যে। সেই মহিমা-কীর্তন ক্ষমাহীন ন্যায়ধর্মহীন ঈর্ষাপরায়ণ ক্রুরতার জয়কীর্তন। কাব্যে জানালেন, যে-শিবকে কল্যাণময় বলে ভক্তি করা যায় তিনি নিশ্চেষ্ট, তাঁর ভক্তদের পদে পদে পরাভব। ভক্তের অপমানের বিষয় এই যে, অন্যায়কারিণী শক্তির কাছে সে মাথা করেছে নত, সেই সঙ্গে নিজের আরাধ্য দেবতাকে করেছে অশ্রদ্ধেয়। শিব শক্তিকে সে মেনে নিয়েছে অশক্তি বলেই।

মনসামঙ্গলের মধ্যে এই একই কথা। দেবতা নিষ্ঠুর ও ন্যায়ধর্মের দোহাই মানে না,

নিজের পূজা-প্রচারের অহংকারে সব দুষ্কর্মই সে করতে পারে। নির্মম দেবতার কাছে নিজেকে হীন করে, ধর্মকে অস্বীকার করে, তবেই ভীরুর পরিত্রাণ, বিশ্বের এই বিধানই কবির কাছে ছিল প্রবলভাবে বাস্তব।'

—বাংলাভাষা পরিচয় (১৩৪১)

মনসা-মঙ্গল কাব্যের নায়ক চরিত্র চাঁদ সদাগর 'দেবতার কাছে নিজেকে হীন' করিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে না, দেবী মনসার বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করিয়া দুঃখিনী মানব-কন্যার প্রতি স্নেহের নিকট সে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

১৯

'অন্নদামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গল বাংলার; তাতে মনুষ্যত্বের বীর্য প্রকাশ পায়নি, প্রকাশ পেয়েছে অকিঞ্চিৎকর প্রাত্যহিকতার অনুজ্জ্বল জীবনযাত্রা।

এই কাব্যের পণ্য ভেসেছিল পয়ার ছন্দে। ভাঙাচোরা ছিল ওর পদবিন্যাস। গানের সুর দিয়ে এর অসামান্যতা মিলিয়ে দেওয়া হত, দরকার হত না অক্ষর সাজাবার কাজে সতর্ক হবার। পুরোনো কাব্যের পুঁথি দেখলেই তা টের পাওয়া যায়। অত্যন্ত উঁচুনীচু তাঁর পথ। ভারতচন্দ্রই প্রথম ছন্দকে সৌষম্যের নিয়মে বেঁধেছিলেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃত ও পারসিক ভাষায় পণ্ডিত। ভাষাবিন্যাস ছন্দে প্রাদেশিকতার শৈথিল্য তিনি মানতে পারেন নি।'

—বাংলাভাষা পরিচয় (১৩৪১)।

এই বিষয়ে ভারতচন্দ্রের যে অভিমত ছিল, তাহা তিনি তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন ঃ 'প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন ক'য়ে। যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে।' তিনি বাংলা শব্দের সঙ্গে পারসী শব্দের সংমিশ্রণ করিয়া সার্থক কাব্য রচনা করিয়াছেন।

২০

'একদিন নিশ্চিত স্থির করে রেখেছিলাম, সৌন্দর্যরচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞানকে মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল। ভাঁড়ুদত্তকে সুন্দর বলা যায় না—সাহিত্যের সৌন্দর্যকে প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণায় ধরা গেল না।'

—সাহিত্যের পথে (১৩৪৩), 'উৎসর্গ'।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, বাস্তব হইলেই সুন্দর হয় না।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে যে টীকা টিপ্পনী লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গবাসী সংস্করণটি সর্বত্র ব্যবহার করিয়াছেন।

প্রার্থনা। পৃঃ ৮।

বৈষ্ণব

অর্থাৎ প্রার্থনার পদগুলিতে বৈষ্ণবভাবের প্রভাব আছে। ইহার শেষাংশে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা বর্ণিত হইয়াছে।

সৃষ্টি-প্রকরণ। পৃঃ ৯।

বৈষ্ণব

সৃষ্টি-প্রকরণের পদগুলি বৈষ্ণব প্রভাবিত। ইহাতে বিষ্ণুর দশাবতারের কথা আছে।

হরগৌরীর কথোপকথন ও হরগৌরীর বিবাহ। ২৩-২৪।

'এই কাব্যগান ছেলেমানুষকে রূপকথা শুনাইবার মত। যিনি শুনাইতেছেন তিনি ছেলেমানুষ নহেন, মাঝে মাঝে তাহা তাঁর পাণ্ডিত্যে ধরা পড়ে। কিন্তু যারা শুনিতেছে তারা ছেলেমানুষ, সরল unsophisticated। তাদের মনোরঞ্জনের জন্য সম্ভব অসম্ভবের বিচার বর্জন করিতে হয়।'

কথোপকথন অংশ কালিদাসের 'কুমারসম্ভব কাব্যে'র ৫ম সর্গ অনুযায়ী রচনা।

নারীদিগের বর-দর্শনে গমন। মেনকার খেদ। ২৪।

'পৌরাণিকতা ও গ্রাম্যতার খিচুড়ি। শ্রোতাদের খাতিরে দেবতারকে শুধু মানুষ নয় নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে মানুষ করিতে হইয়াছে।'

মঙ্গলকাব্যের ইহাই বিশেষত্ব।

মহাদেবের ভিক্ষায় গমন। ২৬।

দৈব কাহিনীকে শুধু মর্ত্য করা নয় তাকে মাটি করিয়া ছাড়া। Epic-এর একেবারে উল্টা পিঠ

গণেশের জন্ম। গণেশের দেহে জীবন-সঞ্চার। ২৩।

'অদ্ভুত কিন্তু এই সব স্বপ্নবৎ কাহিনীতে কাহারো আপত্তি নাই। ইহার মধ্যে গৌরীর পুতুল গড়ার চিত্রে যে বাস্তবতা আছে সেইটি শ্রোতার লাগে ভাল। Idealism দেবতাতে দরকার নাই, মানুষেও নয়। অদ্ভুত অসঙ্গতির ভিতর দিয়া পাড়াগাঁয়ের দৈনিক গৃহযাত্রা চিত্র ফোটে। সকলে তাহাতে খুশি।'

গৌরীর সঙ্গে মেনকার কলহ। (প্রথমাংশ) ২৯।

'গ্রাম্যতা। অন্য কোনো দেশের দেবকাহিনীতে ইহার তুলনা মেলে কি? আমার বিশ্বাস ইহা বৌদ্ধ প্রভাবের ফল।'

গৌরীর সঙ্গে মেনকার কলহ। (শেষাংশ) ৩০।

'দৈবিকতা ও মানবিকতার অদ্ভুত মিশাল।'

ইহাই মঙ্গলকাব্যের বিশেষত্ব।

হরগৌরীর কলহ আরম্ভ। শিবের গৃহত্যাগের সংকল্প। গৌরীর খেদ। ৩১।

'দেবতাকে বড় করিয়া চিন্তা করার অভাব। তাহাকে ছোট করার চেয়ে বেশি তাহাকে হীন করা। আজকের দিনে কোনো উপন্যাসে স্বামী স্ত্রীর এমন "বাস্তব" চিত্র যদি আঁকিতাম তবে মাষ্টার মশায়রা আমাকে বেঞ্চে দাঁড় করাইয়া দিতেন।'

বাঙ্গালী চিরকালই দেবদেবীকে মানুষ বানাইয়া লইয়া তাহার অন্তরের একান্ত নিকটবর্তী আসনে বসাইয়াছে; তাহাকে সিংহাসনে বসাইয়া দূরে সরাইয়া রাখে নাই। বৈষ্ণব ধর্মও ইহারই প্রচারক।

পদ্মার উপদেশ। ৩২।

'চণ্ডী নিষাদ শবরদের দেবতা, তাহা বাণভট্টের গ্রন্থে দেখা যায়...আমার কোন প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। এই জন্যই এত দেশ থাকিতে ব্রাহ্মণ কবি ব্যাধের মত অন্ত্যজ জাতিকে দিয়া দেবীর পূজাপ্রচারের গান করিয়াছেন। কলিঙ্গের মধ্যেও নিশ্চই একটা ইতিহাস আছে।'

চণ্ডী ছোটনাগপুরের মৃগয়াজীবী বীরহোড় ও ওরাওঁদের পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

দেবীর আজ্ঞায় পুরী নির্মাণ। ৩২।

ওদিকে দারিদ্র্য লইয়া শিবের সঙ্গে ঘোর ঝগড়া, এদিকে আদেশমাত্রে বিশ্বকর্মা মন্দির গড়িয়া দেয়। সমস্তই যেন অদ্ভুত স্বপ্নের মত সুসঙ্গতিহীন।

কলিঙ্গ রাজার প্রতি স্বপ্নাদেশ। ৩৩।

বৈষ্ণব। কবি নিজে বৈষ্ণব অথচ তাঁর বিষয়টি শাক্ত; এই জন্য ইহাতে বিশুদ্ধ ভক্তির সুর পাওয়া যায় না। বরঞ্চ অভক্তির সুর আছে। এ কাব্যের দেবতা ভক্তির নয় ভয়ের— ইহাতে তখনকার রাষ্ট্রীয় অবস্থা বুঝা যায়।

কলিঙ্গ-ভূপতিকৃত ভগবতীর স্তব। ৩৪।

ইহাতে দুর্গার চেয়ে কৃষ্ণের অংশই অধিক। বৈষ্ণব।

পশুদিগের প্রতি দেবীর বরদান। ৩৫।

'পশুদের সহিত দেবীর সম্বন্ধ কি পুরাণে আছে? মোট কথা ব্যাধ এবং ব্যাধের জন্য পশুদের সঙ্গেই দেবীর association—ইহার মধ্যে একটা ইতিহাসের ভগ্নাবশেষ আছে। কিন্তু ব্যাধ যে শাপভ্রষ্ট ইন্দ্রের ছেলে এইটে কবির আত্মসান্ত্বনা।'

পশুদিগের সঙ্গে দেবদেবীর কোনও প্রত্যক্ষ সংস্রবের কথা পুরাণে নাই সত্য, তথাপি পশুশিকারী কয়েকটি ব্যাধজাতির সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি, দেবদেবীগণ যে সকল পশুপক্ষী বাহনরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাদের সঙ্গে তাঁহাদের একদিন কোনও সম্পর্ক যে ছিল, তাহা অনুমান করা যায়। অনেক সময় পশুপক্ষী দেবদেবীর রূপ লাভ করিয়াছে, তাহাকে anthropomorphism বলে।

নারদের প্রতি ইন্দ্রবাক্য। ৩৭।

'পদ ও সমাজের অনিশ্চয়তা লইয়া নিত্যই ভয়।'

নীলাম্বরের পুষ্পচয়ন। ৩৮-৩৯।

'গাছ ও ফুলের সবিস্তার ফর্দে শ্রেতারা নিশ্চয়ই বিশেষ আনন্দ বোধ করিয়াছেন—তাহাদের প্রতিদিনের পরিচিত বস্তু একে একে প্রত্যেকটি যখন তাহারা মিলাইয়া পাইতে থাকে তখন ভারি খুশি হইয়া ওঠে। একই নাম দুই তিনবার আসে কিন্তু সেজন্য ভাবনা নাই—আসল, শব্দে কান ভরাইয়া দেওয়া চাই।'

ভগবতীর ব্যাধীরূপ ধারণ। ৪০।

'ছলনা।'

'অন্যায় ছলনা নিষ্ঠুরতা খামখেয়ালিতা শক্তির লক্ষণ।'

মহাদেবের কোপ। ৪১।

'ছেলেমানুষী।'

'তবে নীলাম্বরকে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করাইতে হইবে, ইহাতে তাহারই বিধি-নির্দিষ্ট ব্যবস্থা হইয়াছে।'

কালকেতুর ভোজন। ৫০।

'এই অসম্ভব অতিভোজনের ছবি গ্রাম্য শ্রোতাদের পক্ষে ভারি মজার। কবি যেখানে ফাঁক পান সেখানে খুব ঘটা করিয়া ভোজনের বর্ণনা করেন। শ্রোতাদের পক্ষে বড় উপাদেয়।'

সিংহ-নিকটে পশুগণের গমন। পশুগণের প্রার্থনা। পশুরাজের যুদ্ধে গমন। ৫১।

'পশুদের প্রতি মানবিকতার আরোপ। কাব্যটি ঠিক স্বপ্নের মত। বাস্তবতার সঙ্গে উদ্দাম কল্পনার মাখামাখি। শ্রোতারা ছবির পর ছবি দেখিয়া চলিয়াছে—তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ও সঙ্গতি লইয়া প্রশ্নমাত্র করে না। অত্যুক্তি ও পুনরুক্তিতে তাহাদের কিছুই আসে যায় না। বাঘ সিংহ ভালুক বীরের হাতে খুব গুঁতা খাইতেছে। ইহাতে ছেলেমানুষের মত তাহাদের আনন্দ। যাত্রায় হঠাৎ সং আসার মত।—কেন আসিতেছে তাহার ভাল জবাবদিহি অনাবশ্যক।'

পশুরাজের সহিত কালকেতুর যুদ্ধ। ৫৩।

'পশুর এই Episode গল্পের পক্ষে অদ্ভুত ও অনাবশ্যক কিন্তু শ্রোতাদের পক্ষে কৌতুকজনক। কিন্তু কালীপূজার আরণ্যিকতার ইতিহাস যদি থাকে তবে এই প্রসঙ্গের কিছু অর্থ থাকে।'

গোধিকারূপিণী দেবীর চিন্তা। ৬০।

'এদিকে দেবী ইচ্ছারূপিণী অথচ গোধিকারূপে দুঃখ অপমানে তাঁর খেদ, সমস্তই ছেলেমানুষী।'

ফুল্লরা ও কালকেতুর কথোপকথন। ৬১।

'একদিকে realism অন্যদিকে অত্যুক্তি। শ্রোতাদের মনে কোনো কিছুতেই ধোঁকা লাগে না।'

ভগবতীর নিজমূর্তি ধারণ। ৬১।

'সবই হল, কাঁচুলিতে এসে ঠেক্‌ল।'

বিশ্বকর্মার দশাবতার লিখন। ৬১-৬২।

'এই কাঁচুলি অবলম্বনে গ্রাম্যতা হইতে একদম পৌরাণিকতায় আসিয়া উপস্থিত। পণ্ডিত বেশ ক্ষণকালেব জন্য হাঁফ ছাড়িয়া লইলেন তিমি মাছের হাঁফ ছাড়ার মত। আসল কথা, নিম্নস্তরের life যখন উচ্চস্তরকে ভেদ করিল, যখন অনার্য সাধারণের দেবতা আর্যশাস্ত্রের মধ্যে জোর করিয়া প্রবেশ করিল, তখন খিচুড়ি পাকাইয়া গেল—উভয়পক্ষে রফা-নিষ্পত্তি করিতে করিতে একটা অদ্ভুত পাঁচন তৈরি হইয়া গেল। মঙ্গলকাব্যগুলিতে সেই আর্য ও অনার্যের ভিন্ন উপকরণ সম্পূর্ণ মেলে নাই।'

বিশ্বকর্মার দশাবতার লিখন। (পূর্বানুবৃত্তি)। ৬২।

'বৈষ্ণব।'

বিশ্বকর্মার অন্যান্য বিষয় লিখন। ৬৩।

'বৈষ্ণব।'

ফুল্লরার গৃহে চণ্ডীর আগমন। ৬৫।

'Repetitions'

কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি। ৭৩।

'এই হঠাৎ ধনপ্রাপ্তির বর্ণনা দরিদ্র শ্রোতার পক্ষে বড় লোভনীয়।'

কলিঙ্গদেশে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ। ৮২।

'প্রকৃতির মধ্যে যেখানে moral purpose নাই সেইখানকার দেবতা চণ্ডী। অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ মারী ইত্যাদি—গ্রামবাসীদের দুঃখ বিপত্তির ছবি।'

কবিকঙ্কণচণ্ডী। ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। ১১২।

'বণিকজাতি চণ্ডীপূজার বিরোধী ছিল এইরূপ বোধ হয়।'

চৈতন্যদেবের আর্বিভাবের পরই নিত্যানন্দ কর্তৃক বণিক সম্প্রদায় বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা লাভ করে। তাঁহাদের মধ্যে চণ্ডীপূজার কোনও সংস্কার কোনদিনই গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ ইহা যথার্থই অনুভব করিয়াছেন।

বর্তমান গ্রন্থের মুখবন্ধস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের যে একটি মন্তব্য মুদ্রিত হইয়াছে, ইহাই মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ মন্তব্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাহাতে

তিনি উল্লেখ করিয়াছেন,

'মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যেই বাংলা কাব্যভাষার প্রথম আত্মোপলব্ধির অভিব্যক্তি দেখা দিয়াছে।'—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (১৯৩৯) ঃ মুখবন্ধ।।

রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত মন্তব্যগুলি সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে ইহাদের মধ্য হইতে মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কি ধারণা ছিল, সেই বিষয়ে একটি অখণ্ড ধারণা সৃষ্টি হইতে পারিবে।*

।। ২৬ ।। সাহিত্য-গুণ

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মঙ্গলকাব্যগুলিই এককালে বাংলার সমগ্র শক্তি সম্প্রদায়ের সাহিত্য-রচনার একমাত্র আদর্শ ছিল। সেইজন্য সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য নিরপক্ষে মৌলিক সাহিত্যও এককালে এই জাতীয় কাব্যের মধ্য দিয়াই রচিত হইয়াছিল। মুকুন্দরাম, ঘনরাম, ভারতচন্দ্রের মত প্রথম শ্রেণীর কবির কল্পনা এই জাতীয় কাব্যের মধ্য দিয়াই সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে কালক্রমে মঙ্গলকাব্যগুলি একটা নির্দিষ্ট বিশেষত্ব-বর্জিত বাঁধাধরা নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে গিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যেও প্রকৃত কবি-প্রতিভা বিকাশের অন্তরায় কোন দিনও ঘটে নাই। তাহা হইলে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মুকুন্দরামের মত এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ভারতচন্দ্রের মত সত্যকার প্রতিভা-সম্পন্ন দুইজন কবির সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটিত না; মঙ্গলকাব্যের বিধিনিয়মের গণ্ডীর মধ্যেই তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের জীবন-দর্শনে যে বাস্তবতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই ইহাকে উচ্চাঙ্গ সাহিত্যসৃষ্টির উপযোগিতা দান করিয়াছে। প্রত্যেক কবিরই মঙ্গলকাব্যের বাস্তব জীবনোপকরণ যে সমান নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করিবার দক্ষতা ছিল, তাহা নহে—কিন্তু তথাপি প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেরই এক একটি বাঁধাধরা কাহিনী ছিল বলিয়া ইহার বাস্তব ধর্ম সম্পর্কেও একটা আদর্শ এক প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছিল। অতএব কবির প্রতিভা যে স্তরেই থাকুক, প্রচলিত বিষয়বস্তু গতানুগতিক ভাবে ব্যবহার করিয়াও, তাঁহার কাব্যে তিনি কতকটা বাস্তব রস আপনা হইতেই ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। মঙ্গলকাব্যের বাস্তব জীবনচিত্রের পার্শ্বে অলৌকিক চিত্রও আছে সত্য, কিন্তু 'অলৌকিক আখ্যানগুলি ক্রমশ ক্ষীণতর হইয়া কাব্যের অপ্রধান অংশে পরিণত হইয়াছে, ও কেবল অতীতের ধারার সহিত যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায় মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। দেবতা মানুষের অধীন হইয়াছেন—দেবকীর্তি বর্ণনা উজ্জ্বল বাস্তব চরিত্রের নিকট নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে।' (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৯৩৯, পৃঃ ১৫)। পুরাণে মানুষ দেবতার অধীন, কিন্তু মঙ্গলকাব্যে দেবতা মানুষের অধীন। মনসা-মঙ্গল কাব্যই ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

* শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে রবীন্দ্রনাথকৃত এই টীকা-টিপ্পনীগুলি প্রকাশিত হইল।

জীবনের মধ্যে উচ্চভাবের অনুসন্ধান কাব্যের বিষয়, কিন্তু মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে জীবনের নিতান্ত তুচ্ছ সুখদুঃখ, আশাতৃষ্ণা অতিক্রম করিয়া কোনও উচ্চ ভাবের (lofty ideal) অনুসন্ধান করিতে সাধারণত দেখা যায় না। এই গুণে মঙ্গলকাব্যগুলি উপন্যাসধর্মী; ইহাদের মধ্য দিয়া আধুনিক উপন্যাসের অনুরূপ জীবনদৃষ্টির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। অর্থাৎ ইহাদের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ জীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনার করিবার যে প্রবৃত্তি দেখা যায় কোনও উচ্চ ভাব, নীতি বা আদর্শের অনুসন্ধান করিবার সেই প্রয়াস দেখা যায় না। কাব্য অপেক্ষা উপন্যাসের বাস্তবতাগুণ অধিকতর প্রত্যক্ষ; মঙ্গলকাব্য পদ্যকারে রচিত বলিয়াই কাব্য বলিয়া পরিচিত, ইহার রচনা বর্ণনাত্মক, বিশ্লেষণাত্মক নহে। সেজন্য ইহা পদ্য হইয়াও গদ্যধর্মী। সমসাময়িক কালে পদ্যই লিখিত সাহিত্য রচনার একমাত্র রূপ ছিল বলিয়া, মঙ্গলকাব্যগুলি পদ্যাকারেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—ইহাদের মৌখিক প্রেরণা পদ্যের নহে, গদ্যের। বিষয়গুলি অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে ইহাদের ভেতর দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে—সংস্কৃত কাব্যের বহিরঙ্গে যে অলঙ্কারসমৃদ্ধি দেখা যাইত, দীর্ঘকাল মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে তাহারও সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায় নাই। এমন কি, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহাদের মধ্যে যে অলঙ্করণের প্রয়াস দেখা দিয়াছিল, তাহা দ্বারাও ইহাদের প্রত্যক্ষতা-গুণ যে খুব বেশি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহাও বলিতে পারা যায় না। অতএব বর্ণনার প্রত্যক্ষতা মঙ্গলকাব্যের একটি বিশিষ্ট গুণ। এই গুণেও ইহা আধুনিক উপন্যাসের স্বধর্মী।

কিন্তু মঙ্গলকাব্য কেবলমাত্র আধুনিক উপন্যাসের সমধর্মী এই কথা বলিলেই ইহার সাহিত্যিক পরিচয় সম্পর্কে শেষ কথা বলা হয় না। জীবনবিশ্লেষণ উপন্যাসের ধর্ম; উপন্যাসে জীবনের মধ্যে দ্বন্দ্বসংঘাত খুব সুস্পষ্ট হইয়া না উঠিলেও ক্ষতি নাই। দুইটি বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্ব উপন্যাস অপেক্ষা নাটকের মধ্য দিয়াই স্বার্থকতর ভাবে রূপ পাইয়া থাকে। মঙ্গলকাব্যের কাহিনী সাধারণভাবে অনুসরণ করিলেই দেখা যাইবে যে, দুইটি বিরুদ্ধ শক্তির পরস্পর সংঘাত ইহাতে অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে ইহাব মধ্যে উপন্যাসের ধর্ম অপেক্ষা নাটকের ধর্মই অধিকতর স্পষ্ট বলিয়া অনুভূত হইবে। ইহার কাহিনীর প্রথম হইতেই দুইটি বিপরীতধর্মী শক্তি পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে এবং একটির বিরুদ্ধে আর একটি আত্মরক্ষার জন্য জীবনপণ সংগ্রাম করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি শক্তি যে মানুষ তাহা বুঝিতে ভুল হয় না, আর একটি শক্তি আপাতদৃষ্টিতে দৈব বলিয়া ভুল হইতে পারে—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাও মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ, দৈবের নিকট হইতে মানুষ যখন নিগ্রহ সহ্য করিয়া থাকে, তখন মানুষ তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পায় না—জীবনের যে দুঃখদুর্দশার দৃশ্যত কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, তাহাকেই আমরা অদৃষ্ট বা দৈব বলিয়া থাকি; কিন্তু মঙ্গলকাব্যের মধ্যে যাহাকে আমরা দৈব শক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকি তাহা অদৃশ্য নয়; অতএব তাহাকে অদৃষ্ট (fate) বলা যায় না। তাহার দৃশ্য পরিচয় আছে—তাহাই মনসা, চণ্ডী, কালিকা, শীতলা, ধর্মঠাকুর ইত্যাদি। ইহারা নামে দেবতা হইলেও প্রকৃতিতে মানুষ—ইহারা মানুষের মত ঈর্ষা ও প্রতিহিংসাপ্রবণ,

লোভী ও কাপুরুষ। অতএব মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তাহা মানুষের সঙ্গে মানুষেরই দ্বন্দ্ব—অদৃশ্য কোন শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ মানুষের সংগ্রাম নহে। অতএব এই বৈশিষ্টের জন্য মঙ্গলকাব্যগুলি সার্থক নাটকীয় গুণের অধিকারী হইয়াছে। বিশেষত মঙ্গলকাব্যের যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহা ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র পরোক্ষ বর্ণনা ও আত্মভাবমূলক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় নাই—তাহা প্রত্যক্ষ ঘটনার মধ্য দিয়া উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিরুদ্ধধর্মী ঘটনাগুলি পরস্পর সম্মুখীন করিবার যে কৌশল প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া যে যথার্থ নাটকীয় গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আত্মভাবমূলক বস্তুবিশ্লেষণ (subjective interpretation) উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য; নাটকের মধ্যে ইহা থাকিতে পারে না—আত্মনিরপেক্ষ বস্তুধর্মিতা নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট; মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও এই গুণটি প্রকাশ পাইয়াছে, ইহার মধ্যে উপন্যাসের পূর্বোক্ত গুণটি বিন্দুমাত্র প্রকাশ পায় নাই। বর্ণিত বিষয়ের মধ্য হইতে সম্পূর্ণ আত্মনির্লিপ্ত থাকিয়া কবিগণ মঙ্গলকাব্যের ঘটনারাশি পরিবেষণ করিতেছেন—তাঁহাদের নিজস্ব ধ্যানধারণা দ্বারা তাহা কোন দিক হইতেই নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। অবশ্য বাংলা সাহিত্যে subjectivity বা মন্ময়তার যে সেদিন জন্ম হয় নাই, তাহা নহে—বৈষ্ণব পদাবলীই ইহার প্রমাণ। কিন্তু মঙ্গলকাব্য রচনার ক্ষেত্রে আত্মভাব-নিরপেক্ষ বস্তুধর্মিতারই বিকাশ হইয়াছে, এই দিক দিয়া বৈষ্ণব কবিতার কোনও প্রভাবও ইহার মধ্যে স্বীকৃত হয় নাই। এই মনোভাবের ভিতর দিয়া মঙ্গকাব্যের নাটকীয় গুণের বিকাশও সার্থক হইয়াছে। তারপর দেখিতে পাওয়া যায় যে, মঙ্গলকাব্যের কাহিনী যতই শিথিল গতি হউক না কেন, ইহা একটি নাটকীয় ধারা অনুসরণ করিয়া থাকে; নাটকের মতই ইহার ঘটনার ক্রমোন্নয়ন, চরমোন্নয়ন, সংঘাত ও পতন ইত্যাদি অনুভব করা যায়। ইহাতে উপন্যাসের বিশ্লেষণধর্মী গুণ নাই বলিলেই চলে, লোক-সাহিত্যের স্তর অতিক্রম করিয়া যাহা সবমোত্র লিখিত সাহিত্যের পর্যায়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার মধ্যে নাটকীয় গুণই অধিক প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক। কারণ, লোক-সাহিত্য বিশ্লেষণাত্মক নহে—প্রত্যক্ষ ঘটনাত্মক। গীতিকা (ballad)-ই তাহার প্রমাণ, গীতিকা কাহিনী-প্রধান রচনা—বিশ্লেষণ-প্রধান নহে। গীতিকার মৌখিক ধারা অনুসরণ করিয়াই মঙ্গলকাব্যের লিখিত ধারার উৎপত্তি হইয়াছে। সেইজন্য মঙ্গলকাব্য গীতিকার কাহিনীগত গুণের সার্থক উত্তরাধিকারী হইয়াছে। এই সূত্রেই নাটকীয় গুণও ইহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, জীবনের মধ্যে উচ্চ ভাবের অনুসন্ধান কাব্যের বিষয়, মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে এই উচ্চ ভাবের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ জীবনের খুঁটিনাটির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে এবং এইজন্যই ইহাদের মধ্য দিয়া নাটকীয় গুণও প্রকাশ পাইয়াছে। এই বিষয়ে মনসা-মঙ্গল কাব্য একটি ব্যতিক্রম বলিয়া বোধ হইতে পারে। কারণ, ইহার মধ্য দিয়া জীবনের উচ্চ আদর্শের প্রতিষ্ঠাই লক্ষ্য। তথাপি ইহার মধ্যেও বিরূদ্ধ শক্তির পরস্পর যে দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অন্যান্য মঙ্গলকাব্য অপেক্ষাও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এখানে

সংগ্রাম বা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া জীবনের উচ্চ আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; অতএব ইহাও নাটকীয় গুণ বর্জিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, মঙ্গলকাব্যের প্রত্যেকটি চরিত্র সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব লাভ করিতে পারেন নাই—ইহারা এক একটি type বা ছাঁচ মাত্র। অতএব ইহাদের প্রকৃত নাটকীয় পরিচয় সার্থক বলিয়া মনে হইতে পারে না। কিন্তু এ'কথা মনে রাখিতে হইবে, মঙ্গলকাব্যগুলি প্রধানত কাব্য, পুরাপুরি নাটক নহে—ইহাদের কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় গতির অভাব আছে। অতএব কাব্যের বৈশিষ্ট্য যে ইহাদিগের মধ্যে কিছুই থাকিবে না, তাহা নহে। তবে উপরে যে কথা বলা হইল, তাহা এই যে, ইহাদের মধ্যে উপন্যাসের লক্ষণ অপেক্ষা নাটকের লক্ষণই অধিক—ঘটনা-বিন্যাসের দিক হইতেই প্রধানত ঐ কথা বলিতে পারা যায়।

।। ২৭ ।। কাব্যরূপ ও কাব্যভাষা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আখ্যায়িকা-কাব্য মাত্রই পাঁচালী নামে পরিচিত ছিল; মঙ্গলকাব্যও পাঁচালী বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে—সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদও পাঁচালী, মঙ্গলকাব্যও পাঁচালী। অতএব ইহাদের রচনার বহিরঙ্গগত পরিচয়ের মধ্য দিয়া বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। সুদীর্ঘ সপ্তকাণ্ড রামায়ণ কিংবা অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত, বিবিধ পুরাণ প্রভৃতি রচনার আঙ্গিক আনুপূর্বিকই মঙ্গলকাব্যেও অনুসরণ করা হইয়াছে। আখ্যায়িকা-কাব্যের কাহিনীভাগ বর্ণনার প্রধান অবলম্বন ছিল পয়ার ছন্দ; ইহা দ্বারাই কাহিনীর মধ্যে গতি সঞ্চারিত হইত; এই গতি যতই শিথিল হউক, তথাপি ইহা দ্বারাই কাহিনী সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইত। কেবলমাত্র কাহিনীর মধ্যে গতি সঞ্চার করিবার জন্য নহে, নিগূঢ় বিষয় বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিবার যে শক্তি পয়ার ছন্দে আছে, তাহা চৈতন্যচরিতামৃত'-এর মত সার্থক দার্শনিক গ্রন্থ রচনার দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে। পয়ার ছন্দ মধ্যযুগের গদ্য। আধুনিক যুগের গদ্য দ্বারা যেমন সকল ভাবই ব্যক্ত হইতে পারে, মধ্যযুগে পয়ার দ্বারাও তাহা সম্ভব হইত। অতএব পয়ার ব্যতীত অন্য কোন ছন্দের সহায়তায় মঙ্গলকাব্যের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব হইত না। তবে রামায়ণ-মহাভারত অনুবাদের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের রচনা-রূপের কিছুই যে পার্থক্য নাই, তাহা নহে। বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় অনুমানিক চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে রামায়ণ-মহাভারতের বাংলা অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু চারি-পাঁচশত বৎসর ধরিয়া ইহার বহিরঙ্গগত রূপের কোন পরিবর্তন হইতে দেখা যায় নাই। কাহিনীর অংশে ইহাতে পয়ার এবং আবেগমূলক অংশে ইহাতে দীর্ঘ অথবা লঘু ত্রিপদী সর্বদাই ব্যবহৃত হইয়াছে—ইহার কাব্যরূপ আনুপূর্বিক অপরিবর্তিত (rigid) ছিল; কিন্তু মঙ্গলকাব্যের মধ্যে কাব্যরূপের এই অনমনীয়তা ছিল না—যদিও পয়ারই ইহার মুখ্য অবলম্বন ছিল, তথাপি ক্রমবিকাশের পথে ইহা নূতন নূতন ছন্দ লইয়াও পরীক্ষা করিয়াছে

চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি মানিক দত্ত গতানুগতিক ছন্দ অর্থাৎ পয়ার ত্রিপদীর কোনও ব্যতিক্রম করেন নাই; ক্রমে তাঁহার পরবর্তী কবি মুকুন্দরামের মধ্যে দুই একটি নূতন ছন্দের বিকাশ দেখা গেল। তারপর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গল' রচনায় পয়ার-ত্রিপদীর বনিয়াদের উপরই ছন্দের সুরপুরী সৃষ্ট হইল।

এ'কথা সত্য যে, মঙ্গলকাব্য রচনার প্রথম যুগে ইহার উপর সংস্কৃত কাব্যরূপের কোন প্রভাব ছিল না; ক্রমে সেই প্রভাব ইহার উপর কার্যকর হইয়াছে। কেবলমাত্র সংস্কৃত প্রভাবই নহে,—বৈষ্ণব কাব্যরূপের প্রভাবও মঙ্গলকাব্যকে কালক্রমে স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু একটি বিশিষ্ট আদর্শ সম্মুখে থাকিত বলিয়া অনুবাদ-পাঁচালীগুলির কাব্যরূপে ক্রমবিকাশ সম্ভব হইত না। মঙ্গলকাব্যগুলি কেবলমাত্র একটি মৌলিক কাহিনীর দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া ইহার বহিরঙ্গের ক্রমবিকাশের কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছে; সেই জন্য মানিক দত্তের কাব্যের বৈচিত্রহীনতা হইতে মুকুন্দরামের সহজ পথ ধরিয়া আমরা ভারচন্দ্রের কাব্যের বিচিত্র রূপ-লোকে উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছি।

মঙ্গলকাব্য লোক-সাহিত্যের নিতান্ত নিকটবর্তী ছিল বলিয়া ইহাতে মধ্যে মধ্যে ছড়ার ছন্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্য লোক-সাহিত্যের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া গিয়া একটি যে নাগরিক পরিচ্ছন্নতা লাভ করিয়াছিল, তাহার মধ্যে লোক-সাহিত্যের আর কোন প্রভাবই অনুভূত হইতে পারে নাই।

মঙ্গলকাব্যের ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহার প্রথম যুগের ভাষা স্থূল ও গ্রাম্যভাবাপন্ন, মধ্যযুগের ভাষা সহজ ও সাবলীল এবং শেষ যুগের ভাষা অলঙ্কার-সমৃদ্ধ। অতএব ইহার কাব্যরূপের মত কাব্যভাষারও একটি ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করা যায়। এইদিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, ইহার প্রথম যুগের ভাষা কাব্যের উপযোগিতা লাভ না করিলেও অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। মঙ্গলকাব্যের ভাষায় তখনও অলঙ্করণের কৃত্রিমতা প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় নাই, সহজ কথায় প্রত্যক্ষদৃষ্ট জীবন-পরিচয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে মাত্র; সেই জীবনদৃষ্টির মধ্যে যে রস নাই, তাহা নহে—কিন্তু সেই রস অলঙ্কার শাস্ত্রের বাঁধাধরা রস নহে, মানব-মনের সহজাত রসানুভূতি মাত্র। এই রস প্রকাশ করিবার ভাষাও তেমনিই অমার্জিত। কিন্তু তাহাতে কবিত্বের যে অভাব ছিল, তাহ নহে। পরবর্তী যুগের ভাষা মার্জিত অথচ সরল। ভাষার প্রয়োগে পূর্ববর্তী যুগের কবিগণ যেমন নিরঙ্কুশ ছিলেন, সেই যুগের কবিগণ তেমন ছিলেন না; তবে এ'যুগের রচনা আয়াসসাধ্য ছিল না, বরং অনায়াসসৃষ্ট বলিয়াই বোধ হইবে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের শেষ যুগে ইহার ভাষা সচেতন শিল্পবোধের পরিচায়ক হইয়া উঠিল। এই যুগে বিদেশী শব্দও মঙ্গলকাব্যের বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। রসই এই যুগের লক্ষ্য ছিল বলিয়া যাহা দ্বারাই রসসৃষ্টি সম্ভব হইত, তাহাই ইহার অবলম্বন হইত। এই যুগের কবি ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন—

যেমন হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস ল'য়ে।

অতএব রসসৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হইবে ভাবিয়া তিনি 'যাবনী মিশাল' ভাষায় তাঁহার কাব্যের দীর্ঘ অংশ রচনা করিয়াছেন। আরবি-পারসি শব্দ মঙ্গলকাব্যের শেষ যুগের ভাষায় বহুল পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। অনেক সময় সংস্কৃতের অন্ধ আনুগত্য এই যুগের মঙ্গলকাব্যের ভাষা কৃত্রিম করিয়া তুলিয়াছে।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা কিংবা ব্রজবুলির ভাষার যে প্রভাব ছিল না তাহাও বলিবার উপায় নাই। মধুর রস সৃষ্টি করিবার জন্য কোন কোন অংশে আনুপূর্বিক ব্রজবুলিরও সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা কাব্যদেহের বিচ্ছিন্ন ও বাহ্য অলঙ্কারস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, ইহার অন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। প্রথম যুগে মঙ্গলকাব্যের ভাষা ছিল পল্লীকবির সহজ প্রত্যক্ষ গ্রাম্য ভাষা, পরবর্তী যুগে ইহার ভাবুকের ভাষাও শেষ যুগে ইহার শিল্পীর ভাষায় ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে। চৈতন্যপূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যের ভাষা ও চৈতন্যপরবর্তী মঙ্গলকাব্যের ভাষার তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, চৈতন্য-সাহিত্য মঙ্গলকাব্যেকে কি অপরূপ লাবণ্য দান করিয়াছে—ইহার স্থূল গ্রাম্যতা বহুলাংশে বর্জন করিয়া ইহার ভিতর হইতে সুমার্জিত রূপের সন্ধান দিয়াছে।

।। ২৮ ।। জাতীয় মূল্য

প্রথম সাম্প্রদায়িকতার নিম্ন স্তর হইতে উদ্ভূত হইলেও কালক্রমে যখন এই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গলকাব্যগুলি সাহিত্যের উচ্চতর আদর্শের সেবায় নিয়োজিত হইল, তখনই এই শ্রেণীর কয়েকখানি কাব্য জাতীয় কাব্য (National poetry) হিসাবে স্থান পাইবার যোগ্যতা অর্জন করিল। একটা বহুসম্প্রদায়বিশিষ্ট বিরাট জাতির বিভিন্নমুখী চিন্তাধারার সুন্দর সমন্বয় করিয়া এই জাতীয় মঙ্গলকাব্যগুলি বিশৃঙ্খল সমাজের মধ্যে এক ঐক্যের সন্ধান নির্দেশ করিয়া দিয়াছে। তাহারই ফলে দেখা যায়, উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ-কবি অস্পৃশ্য ব্যাধ-সন্তানকে তাঁহার কাব্যের নায়ক করিয়া তাহাকে শৌর্যে বীর্যে মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, জাতিনাশের আশঙ্কা সত্ত্বেও অস্পৃশ্য ডোম-পূজিত ধর্মঠাকুরকে নিজের আরাধ্য বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন করিয়া কল্পনা করিতেছেন। পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলির এই যে মঙ্গল আদর্শ, তাহা পূর্ববর্তী অক্ষম কবিদিগের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া বাঙ্গালী কবির মঙ্গলকাব্যের পরিকল্পনাকে 'পরিণাম-রমণীয়' করিয়া দিয়াছে।

কোনও জাতীয় কাব্যে সেই জাতীয় সমসাময়িক সংস্কৃতির সহিতই আমরা যে পরিচয় লাভ করি, তাহা নহে—তাহাতে জাতীয় জীবনের নিত্যকালের যাহা বিশেষত্ব তাহারও সন্ধান পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর জাতীয় কাব্যের অভাব বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যগুলিই কতক পরিমাণে পূর্ণ করিয়াছে। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সুসঙ্গত জাতীয় চরিত্রসৃষ্টির প্রয়াস সার্থক হইতে দেখা যায়। চণ্ডীমঙ্গলের ফুল্লরা, ভাঁড়ু দত্ত, মুরারি শীল; ধর্মমঙ্গলের কর্পূর

সেন, মহামদ পাত্র; মনসা-মঙ্গলের সনকা,—ইহারা বাঙ্গালীর গৃহের নিত্যকালের চরিত্র। এই সমস্ত চরিত্র চিত্রণে মঙ্গলকাব্যের কবিগণ সুদূর দেবলোকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, বাঙ্গালীর নিত্যপরিচিত গৃহাঙ্গন হইতে ইহাদিগকে তুলিয়া লইয়া সাহিত্যে অমরতা দান করিয়াছে; এই চরিত্রগুলির সহিত পরিচিত হইয়া আমরা প্রাচীন কালের সহিত আধুনিক কালের যোগসূত্র রচনা করিতে পারি এবং এই সুদূর অতীতেও পরিচিত পদধ্বনি শুনিয়া চমকিত হই। সাহিত্যের সঙ্গে মানুষের জীবনের এমন নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ যোগসাধন ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে আর কখনও ঘটে নাই। মঙ্গলকাব্যের মধ্য দিয়াই জাতীয় প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়াছে—এই সকল কাব্যের মধ্য দিয়াই জাতির প্রকৃত আত্মসাক্ষাৎকার ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই হিসাবে ইহাদিগকে সমগ্র বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য বলা যাইতে পারে।

কেহ কেহ মঙ্গলকাব্যগুলিকে জাতীয় মহাকাব্য আখ্যা দিয়া থাকেন। কিন্তু সাহিত্যিক রস-বিচারে মহাকাব্যের একটি বিশেষ সংজ্ঞা নির্দিষ্ট রহিয়াছে। মঙ্গলকাব্যে ঐ সংজ্ঞানির্দিষ্ট উপাদানগুলি একান্তই অভাব। যে সর্বব্যাপী বিশালতা ও ব্যাপকতা মহাকাব্যগুলিকে বিশিষ্ট মর্যাদা দান করিয়াছে, মঙ্গল-কাব্যে তাহা নাই। বিশেষত বীররসই মহাকাব্যের লক্ষণীয় সুর, কিন্তু মঙ্গলকাব্যের করুণ রসের অতিশয় প্রাধান্য। ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে যুদ্ধের বর্ণনা আছে সত্য, কিন্তু গতানুগতিক ও বিচ্ছিন্ন যুদ্ধবর্ণনা দ্বারা কোন কাব্যকেই মহাকাব্যের মর্যাদায় উন্নীত করা যায় না, মহাকাব্যোক্ত বীররসের সুর ইহার নায়ক চরিত্রের মধ্যেই সমাহিত থাকে; তাহার চরিত্র-বিকাশের অপরিহার্য পরিণতির পথে সেই যুদ্ধবিগ্রহ যেন আপনা হইতেই ঘটিয়া থাকে। ধর্মমঙ্গলের নায়ক-চরিত্রে সেই প্রেরণা নাই; অতএব বিচ্ছিন্ন কতকগুলি যুদ্ধবর্ণনার দ্বারা ইহার বীররস সৃষ্টি সম্ভব হয় নাই। ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর পক্ষে মহাকাব্য রচনা সার্থক হয় নাই। এখানেও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। মঙ্গলকাব্যগুলি গীতোদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল; ইহার ছন্দ, ধ্বনি, শব্দবিন্যাস গীতিকাব্য সৃষ্টির পক্ষেই অনুকূল হইয়াছে—ইহার মধ্যে মহাকাব্যের উদাত্তগম্ভীর সমুদ্রকল্লোল শুনিতে পাওয়া যায় না।

ধর্মমঙ্গল-কাব্যগুলিকে পশ্চিমবঙ্গেরই জাতীয় কাব্য (National poetry) বলা যাইতে পারে। এখানে কি ভাবে যে একটা জাতীয় কাহিনী মঙ্গল-কাব্যের রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা লক্ষ করা যায়। বহু প্রাচীন কাল হইতে রাঢ়ভূমিতে বাংলার অন্যান্য অঞ্চল হইতে স্বতন্ত্র একটা সামাজিক জীবনের আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি বিশেষ করিয়া রাঢ়ভূমিরই সম্পদ। সেইজন্য এই কাব্যে চরিত্রসৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য বিষয় বস্তুতেও একটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ়দেশ বহু প্রাচীন কাল হইতেই প্রবল অনার্য জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত। বিহার প্রদেশ হইতে আর্যসভ্যতা সর্বপ্রথম উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত হইয়াছিল; উত্তরবঙ্গ পথেই আর্যসভ্যতা য়ুয়ান্ চুয়াঙের সময়েই কামরূপ পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। সেইজন্য বহুকাল পর্যন্ত রাঢ় প্রদেশের অভ্যন্তর অনার্য জাতিরই বাসভূমি রহিয়া গিয়াছিল; এমন কি, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের ব্যাধ কালকেতু নিজের সম্বন্ধে এই প্রকার পরিচয় দিতেছে,—

'অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়।।'

তারপর আরও বলিতেছে,—'ব্যাধ গোহিংসক রাঢ়, চৌদিকে পশুর হাড়।' রাঢ়ের ডোম জাতিও ইহার প্রাচীন অধিবাসী। ডোম জাতির বীরত্বের কথা সারা বাংলার ছেলেভুলানো ছড়ায় আজিও শুনিতে পাওয়া যায়,—যেমন, 'আগডুম, বাগডুম, ঘোড়াডুম সাজে', অর্থাৎ অগ্রবর্তী ডোমসৈন্যদল, বাগ বা পার্শ্বরক্ষক ডোমসৈন্যদল ও ঘোড়াডুম অর্থাৎ অশ্বারোহী ডোমসৈন্যদল ইত্যাদি। ধর্মমঙ্গলকাব্যগুলি এই বীর ডোমজাতির বিজয়-গাথা।

ইহা হইতেই জানা যাইবে যে, বাংলার কেন্দ্রীয় যে সংস্কৃতি তাহার সহিত ঐ অনার্য-অধ্যুষিত রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রায় কোনই যোগ ছিল না। তাহারা দৈবশক্তি অপেক্ষা আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী ছিল বেশি; কারণ, কোনও দৈব প্রলোভন তাহাদিগকে বহুকাল পর্যন্ত প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। রাঢ় চিরদিনই বীরের ভূমি,—বীরভূম, মল্লভূম, শূরভূম—সেইজন্যই ইহার এই সকল নামকরণও সার্থক। ব্যক্তিচরিত্রের এই যে মহান আদর্শ, তাহা হইতে স্খলিত করিয়া দুর্বল দেবতার পাদমূলে মানুষকে আনিয়া সেখানে বলি-উপহার অর্পণ করা হয় নাই। মানুষ নিজের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব লইয়া দেবতার যে ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে, এই কাব্যগুলিতে তাহারই নিদর্শন রহিয়াছে। অবশ্য ধর্মমঙ্গল-কাব্যসমূহের নায়ক লাউসেন এই জাতীয় মনুষ্য নহেন। লাউসেন স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা; কিন্তু কবির কল্পনায় সাধারণ মনুষ্যচরিত্রগুলির নিকট এই দেবচরিত্র ম্লান হইয়া গিয়াছে; দেবতা যে মানুষের বুদ্ধি ও পরাক্রমের নিকট কত অসহায়,—মানুষকে ছলনা, ভয় ও প্রবঞ্চনা করিয়া যে দেবতার দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, লাউসেনের ভিতর তাহাই দেখিতে পাইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা অপেক্ষা সমবেদনাই অধিক হয়। অতএব আমাদের এই আলোচনার প্রসঙ্গে দেবতার ছায়াচ্ছন্ন এই লাউসেনকে ত্যাগ করিয়াই লইতে হয়। ধর্মমঙ্গলকাব্যের ডোমজাতীয় পুরুষ ও নারী চরিত্রগুলিই রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গই মধ্যযুগে বাংলায় প্রবেশের দ্বারা ছিল। পাঠানের আক্রমণ, মুঘলের আক্রমণ সমস্তই পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। সেনরাজগণ দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া রাঢ়দেশেই সর্বপ্রথম তাঁহাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। পালরাজগণও বাহির হইতেই এদেশে আসিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। উপর্যুপরি এই সকল বিপদের মধ্যবর্তী হইয়া এই প্রদেশের অধিবাসিগণ আত্মরক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট রহিয়াছে। শুধু পুরুষ নয়, স্ত্রীলোককেও তাহার মান, মর্যাদা ও সতীত্ব রক্ষার জন্য বলসঞ্চয় করিতে হইয়াছে—নির্ভীক ভাবে পুরুষের সম্মুখীন হইয়া সম্মুখ সমরানলে আত্মাহুতি দান করিতে হইয়াছে। সেইজন্য স্ত্রী-চরিত্রেরও একটা বিশেষ দিক আমরা ধর্মমঙ্গলকাব্যসমূহে লক্ষ্য করি। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। এই সম্পর্কে ইহাও সম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই অঞ্চলে মানবজাতির যে শাখা বসতি স্থাপন

করিয়াছিল, তাহার মধ্যে নারী ও পুরুষ সমান সামাজিক অধিকার ভোগ করিত এবং সেই ঐতিহ্যের ধারাই এই অঞ্চলে এখন পর্যন্ত অব্যাহত চলিয়া আসিতেছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হইবে, কি ভাবে মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া একটা বিশিষ্ট জাতীয় মনোভাব সাহিত্যের ভিতর এককালে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। মঙ্গলকাব্য এখানেই জাতীয় কাব্যের গৌরব লাভ করিয়াছে।

মনসা-মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবায়ন প্রভৃতি কাব্যগুলিতেও এইভাবেই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের একটা নিত্যকালের চিত্রের সহিত আমাদের সহসা মুখোমুখি হইয়া যায়। জামাতা শিবের দারিদ্র্য কল্পনায় বাঙ্গালী পিতা চিরদিন নিজের কন্যারই দুর্ভাগ্যের বিভীষিকা কল্পনা করিয়াছে; ছয় বিধবা পুত্রবধূবেষ্টিত শোকাতুরা সনকার মাতৃহৃদয়ের হাহাকার অকালবৈধব্যপীড়িত এই সমাজে নিত্যকালই ধ্বনিত হইয়াছে।

একজন আধুনিক সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন, 'এই সমস্ত চিত্র এত জীবন্ত এবং এমন নিখুঁত বলেই এগুলো উপেক্ষিত হবার নয়। সত্যকে আশ্রয় করে এদের জন্ম বলেই রচনার সহস্র ত্রুটি সত্ত্বেও এগুলো সুখপাঠ্য—কিন্তু এর ভেতর থেকে কোন আধ্যাত্মিকতা আবিষ্কার করতে গেলেই বিপদ ঘটবে। কারণ তা' এতে নেই।' এই দিক দিয়া মঙ্গলকাব্যগুলি সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শ হইতেও ভ্রষ্ট হয় নাই।

।। ২৯ ।। প্রচার

বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলি মধ্যযুগে বাংলার বাহিরেও প্রচার লাভ করিয়াছিল। চৈতন্যদেবের কিছু পূর্ববর্তী কালে মনসা-মঙ্গলের একজন শ্রেষ্ঠ কবি পূর্ববঙ্গে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম নারায়ণদেব। তাঁহার সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। নারায়ণদেবের মনসা-মঙ্গল সমগ্র আসাম প্রদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, এমন কি, এখন পর্যন্ত আসামের অধিবাসিগণ নারায়ণদেবকে তাঁহাদের দেশের অধিবাসী বলিয়া জানেন। মনসা-মঙ্গলের বেহুলা-লখীন্দরের উপাখ্যান উত্তর বিহারে প্রচলিত আছে। সেখানকার ভাষায় এই পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে চৌপাই নগরের রাজা চান্দো সৌদাগর। তাহার স্ত্রী সোনিকা। উভয়ের পুত্র লখিন্দর। বেহুলার মাতা পিতার নাম বাসু সৌদাগর ও মাণিক্য, বাসস্থান উজানীনগর। বিহারী ও অসমীয় লোক-সাহিত্যে মনসার উপাখ্যান বাংলারই অনুরূপ।

বিভিন্ন জাতীয় মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসা-মঙ্গলই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচার লাভ করিয়াছিল। বঙ্গদেশের সর্বত্র হইতেই ইহার প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তবে পূর্ববঙ্গেই মনসামঙ্গলের অধিকতর প্রচার হইয়াছিল, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পশ্চিমবঙ্গেই অধিক প্রচলিত ছিল; কিন্তু সেখানেও ইহার পূর্ববঙ্গের মনসা-মঙ্গলের মত এত ব্যাপক প্রচার ছিল না। ইহার কারণ, পূর্ববঙ্গে মনসা-মঙ্গলই একপ্রকার একমাত্র মঙ্গলকাব্য; পশ্চিমবঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলের পাশাপাশি আর একটি বিরাট মঙ্গলসাহিত্য প্রচলিত ছিল, তাহা ধর্মমঙ্গল। পশ্চিমবঙ্গে

চণ্ডীদাস-লোচনদাস-গোবিন্দদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণের অপূর্ব পদাবলী-সাহিত্যের সম্মুখে অন্য কোন বিশেষ এক সাম্প্রদায়িক কাব্যের প্রতিষ্ঠা কষ্টসাধ্য ছিল; কিন্তু পূর্ববঙ্গে মনসা-মঙ্গল কাব্যের সঙ্গে তেমন ভাবে প্রতিযোগিতা করার মত অন্য কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যবস্তু না থাকার জন্যই মনসা-মঙ্গলের প্রচার বিস্তৃততর হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও একটা কথা কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মনসা-মঙ্গলের চরিত্রগুলির মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যাহা বাঙ্গালীর অন্তস্থল স্পর্শ করিত। চাঁদ সদাগরের মত দৈবলাঞ্ছিত সমুন্নত পুরুষকারের চরিত্র বাংলার আর কোন মঙ্গলকাব্যে নাই। মানুষের জীবনে দৈব যে কত বলবান, চাঁদ সদাগরের তথাকথিত পরাজয়ে তাহাই যেন দেখানো হইয়াছে। জীবনের সর্বত্রই এই পরাজয়ই বাঙ্গালী হিন্দুর সেই যুগে নিত্য অভিজ্ঞতার বিষয় ছিল। তাহারা চাঁদ সদাগরের চরিত্রে নিজেদের পরাজয়ের সান্ত্বনা সন্ধান করিত। তারপর বেহুলা। সাংসারিক দুঃখ-কষ্টে চিরঅভ্যস্ত এই সমাজ একমাত্র নিজের আদর্শকে চিরদিন উচ্চ করিয়া ধরিয়া লইয়া পথ চলিয়াছে। পরাজয় যে জীবনে মানিয়া লইল, সেই ত দুর্ভাগা। নৈরাশ্যমথিত হৃদয়ে আশার একটি দীপশিখাকেও যে অনির্বাণ রাখিয়া দুস্তর সংসার-গাঙ্গুরে ভেলা ভাসাইয়া দিয়াছে, তাঁহার জীবনের বাঁচিবার মত বলের তো অভাব হয় না এবং পরিণামে বাঁচিয়া উঠিতেও পারে সে-ই। কাব্যের সমস্ত ট্রাজিক কল্পনাকে ব্যর্থ করিয়া বেহুলার বিজয়িনী মূর্তিই অনির্বাণ দীপালোকে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। চাঁদ সদাগরের সংসার-শ্মশান-অধিষ্ঠাত্রী শোকাতুরা সনকার দুর্নিবার অশ্রুধারার অনন্ত উৎস বাংলার শত শত মাতৃহৃদয়েই বিরাজমান। সেইজন্য তাহাদের অন্তরের যোগ ইহার সহিত অতি সহজেই স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল। রোগ-শোক-দুঃখ-বেদনা জর্জরিত বাঙ্গালী জীবন এই সকল চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া পরম সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে। গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে মনে হইবে যে, সকল মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে মনসা-মঙ্গল কাব্যেই আধুনিক মনোভাবের পরিচয় সার্থকতমভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে দৈবের সঙ্গে পুরুষকারের যে কঠিন সংগ্রামের কথা আছে, তাহাই ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রেরণা দান করিয়াছিল। দেবতার উপরে মানুষের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় মনসা-মঙ্গলের কাহিনী সার্থক হইয়াছে। আধুনিক সাহিত্যের মানবিকতা-বোধ ইহার মত কোন মঙ্গলকাব্যের মধ্যে দিয়া এত স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই।

এই সকল গুণে মনসা-মঙ্গল অন্যান্য মঙ্গলকাব্য অপেক্ষা অধিক প্রচার লাভ করিয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাধ আমাদের সামাজিক জীবনের অন্তর্ভুক্ত চরিত্র নহে; ফুল্লরাও বড় সংক্ষিপ্ত—দুঃখ-দারিদ্র্য-সহনশীলতার একটা সুন্দর সহজ চিত্র সেখানে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার বাস্তব সমাধানের ইঙ্গিত কোথাও পাওয়া যায় না। মনসা-মঙ্গলের পরিণাম শিক্ষাপ্রদ, সান্ত্বনাদায়ক; ইহার মানবিকতার আবেদন অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। কিন্তু অন্য কোন মঙ্গলকাব্যের মধ্যে এই গুণগুলি লক্ষিত হয় না। ধর্মমঙ্গলকাব্য শুধু রাঢ়ভূমিতেই

আবদ্ধ ছিল এবং ইহা একমাত্র রাঢ়দেশেরই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের বাহন; সেইজন্য রাঢ়দেশে ইহার ব্যাপক প্রচার হইলেও অন্যত্র ইহার প্রচার সম্ভব হয় নাই। সমগ্র মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ধর্মমঙ্গলেরই প্রচার-ক্ষেত্র সর্বাপেক্ষা অল্প-পরিসর।

বর্তমান যুগে মঙ্গলকাব্যোক্ত দেবতাদিগের স্থান কোথায় এই সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে। পূর্বেই বলিয়াছি, যে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে মঙ্গলকাব্যগুলির রচনা আরম্ভ হয়, তাহা কতক সিদ্ধ হইয়াছে। লৌকিক দেবতাদিগকে হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে সেই যুগে একমাত্র বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিই যে সাহায্য করিয়াছিল, তাহা নহে—কতকগুলি পরবর্তী অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণও সেই কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার প্রমাণ-স্বরূপ 'ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে'র মনসাদেবীর উপাখ্যান ও 'বৃহদ্ধর্ম-পুরাণোক্ত' কালকেতু উপাখ্যানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত ষষ্ঠী, শীতলা ইত্যাদির উপাখ্যানও পরবর্তী সংস্কৃত উপপুরাণগুলির মধ্যে স্থান পাইতে লাগিল। এইভাবে একদিকে সংস্কৃত পুরাণ ও অপরদিকে বাংলা মঙ্গলকাব্য ইহাদের যুগপৎ প্রচেষ্টায় অনার্য দেবতাগণ হিন্দু সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া লইতেছিল। কিন্তু এমন সময় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ রঘুনন্দনের স্মৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া নব হিন্দু আদর্শে দীক্ষা লাভ করিল। হিন্দুর সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন যে সকল বিধিনিয়ম ও আচার-সংস্কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক, রঘুনন্দন মনু এবং তৎপরবর্তী সংহিতাকারদিগের গ্রন্থ হইতে তাহা সংকলন করিয়া বাঙ্গালীর সম্মুখে স্থাপন করিলেন। বলাই বাহুল্য যে, তাহাতে বাঙ্গালীর লৌকিক ধর্মাচরণের প্রতি বিশেষ কোন সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয় নাই। শ্রীনাথাচার্য কৃত 'কৃত্যতত্ত্বার্ণব', রঘুনন্দন রচিত অষ্টবিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত 'তিথিতত্ত্ব' প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের গ্রন্থে মনসা,মঙ্গলচণ্ডী বাংলার লৌকিক দেবতাদিগের পূজা-বিধানের নির্দেশ থাকিলেও, তাঁহারা তাঁহাদের লৌকিক রূপ পরিহার করিয়া নূতনভাবে তাহাতে প্রবেশ করিয়াছে। বহির্বাংলার আর্য নাগপূজার মধ্যে মনসা-পূজা আপনার স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়াছে; মঙ্গলচণ্ডীও পৌরাণিক চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। ইহাতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিন্দুর উচ্চতর কোন সামাজিক আচারের মধ্যে মঙ্গল দেবতাগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত লৌকিক মঙ্গলচণ্ডী পৌরাণিক অন্নদা, ধর্মঠাকুর পৌরাণিক বিষ্ণু, মনসা 'ব্রহ্মণা মনসা সৃষ্টা' এই সমস্ত কষ্টকল্পিত আভিজাত্যের সৃষ্টি দ্বারা নিজেদের উদ্ভবের অখ্যাতিতে পৌরাণিক গরিমায় সমাচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব আমরা দেখিতে পাই, ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতে বাঙ্গালী হিন্দুর সামাজিক জীবনে নব সংস্কার প্রবর্তিত হওয়াতে সমাজের লৌকিক দেবতাদিগের প্রাধান্য হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে। ইহার পর হইতে ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত যে সকল মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে, তাহা কোন সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া রচিত হয় নাই—ইহা সাহিত্য রচনার একমাত্র আদর্শ রীতি ছিল বলিয়াই এ দেশের সমসাময়িক সাহিত্যরসবস্তুগুলি মঙ্গলকাব্যের রূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

।। ৩০ ।। যুগবিভাগ

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীকে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব যুগ (age of origin) বলা যাইতে পারে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে রচিত 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে'র চণ্ডী স্তোত্রের একটি শ্লোকে (বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৩. ১৬. ৪৫) উল্লিখিত হইয়াছে,

'ত্বং কালকেতু বরদা চ্ছলগোধিকাসি
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।
শ্রীশালবাহন নৃপাদ্ বণিজঃ সসূনো
রক্ষেঽম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী।।'

এই একই শ্লোকে চণ্ডী যে কালকেতুকে বর দিয়াছিলেন, তিনি যে গোধিকারূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সিংহলের রাজা শ্রীশালবাহন যে বণিকপুত্রকে নিজের কন্যা দান করিয়াছিলেন, চণ্ডী যে কমলে-কামিনী রূপ ধারণ করিয়া হস্তী একবার গ্রাস করিয়া পুনরায় বমন করিয়াছিলেন ইত্যাদি প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতেই মনে হয়, 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' রচিত হইবার কালে চণ্ডীমঙ্গল ইহার নিজস্ব রূপ লাভ করিয়াছিল। কালকেতু ব্যাধ ও ধনপতি সদাগরের কাহিনীযুক্ত যে চণ্ডী-মঙ্গলের বিষয়বস্তু আমরা শুনিতে পাই, 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে'র উক্ত শ্লোকটিতে তাহারই ইঙ্গিত প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষজ্ঞদিগের মতে 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত হয়।* চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ইতিপূর্বেই যে একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে'র উল্লেখ হইতেই তাহা জানিতে পারা যাইবে। কালকেতু ব্যাধের কাহিনী ও ধনপতি সদাগরের কাহিনী পরস্পর স্বতন্ত্র দুইটি কাহিনী হওয়া সত্ত্বেও ইহারা যে তখন হইতেই একই চণ্ডীমঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে'র একই শ্লোকে উভয়ের প্রসঙ্গে উল্লেখ হইতেও তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

এই যুগের সাহিত্যিক নিদর্শন প্রায় কিছুই হস্তগত হয় নাই, তবে এই যুগে মঙ্গলকাব্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পরবর্তী কবিগণের রচনার মধ্যেও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মনসামঙ্গলের কবি বিজয় গুপ্ত তাঁহার পূর্ববর্তী মনসামঙ্গল রচয়িতা কানা হরি দত্ত সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন যে,

'মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরি দত্ত।।
হরি দত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে।।
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।

* R. C. Hazra, 'The Brihad-dharma Purana, A Thirteenth Century work of Bengal', *The Journal of the University of Gauhati*, Vol. VI (1955), p. 258.

এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর।।
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফ ফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল।।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিলীয়মান-স্মৃতি হরি দত্তের বৈশিষ্ট্যহীন রচনার উপর বিজয় গুপ্ত নূতন করিয়া মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁহার পূর্ববর্তী কবি মানিক দত্তকে যথোচিত বৈষ্ণব বিনয় সহকারে স্মরণ করিতেছেন,—

'মানিক দত্তেরে বন্দোঁ করিয়া বিনয়।
যাহা হইতে হইল গীত-পরিচয়।।

এখানেও দেখিতে পাওয়া যায় চণ্ডীমঙ্গলের প্রাচীনতম কবি মানিক দত্ত এই জাতীয় কাব্য-রচনার পথপ্রদর্শক মাত্র। মানিক দত্ত সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তীও ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি ময়ূর ভট্টের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছে,—

'ময়ূর ভট্টেরে বন্দি সঙ্গীত আদ্য কবি।'

তাহাতেও দেখিতে পাওয়া যায়, ময়ূর ভট্টের কৃতিত্বের মধ্যে ইহাই যে তিনি ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি—তাঁহার কাব্যের অন্য কোন বিশেষত্বের উল্লেখ নাই। বৈষ্ণব-প্রভাবিত সমাজে বাস করিয়া বিনয়-অভ্যাস-গুণে চৈতন্যপরবর্তী যুগের কবিদ্বয় তাঁহাদের পূর্বসূরিগণের কাব্য সমালোচনায় যে অপ্রিয় অংশ ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাই প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি বিজয় গুপ্ত অত্যন্ত রূঢ় মন্তব্যে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার এই অসংযত উক্তি হইতেই আমরা সেই যুগের ঐ জাতীয় কাব্যের একটা মূল্য বিচার করিতে পারি।

অবশ্য কোন বিষয়েরই উদ্ভবকালেই তাহার পরিপূর্ণতা আমরা আশা করিতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীই মঙ্গল-কাব্যের সৃজন যুগ (age of creation)। পরবর্তী যুগের বিশিষ্ট আখ্যায়িকাগুলি এই যুগে আসিয়া সংহতি (compactness) লাভ করিয়াছে। এই যুগেই প্রসিদ্ধ মনসা-মঙ্গল রচয়িতা বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, দ্বিজ বংশী দাস; চণ্ডীমঙ্গলকার দ্বিজ মাধব, মুকুন্দরাম; ধর্মমঙ্গলকার মানিক গাঙ্গুলী, খেলারাম প্রভৃতি আবির্ভূত হন। এই সময়ে এই সকল শক্তিমান কবিদের হাতে মঙ্গলকাব্যগুলি পরিপূর্ণ অববয় লাভ করে সত্য, কিন্তু এই পরিপুষ্ট অবয়বের উপর তখনও কারুকার্য করিবার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। এই যুগেই ইহাদের উপর সংস্কৃত পুরাণের ও কাব্যের প্রভাব প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন উচ্চতর হিন্দুসমাজের নিকট পুরাণ-বহির্ভূত লৌকিক কাহিনীর কোন আবেদন ছিল না; সেইজন্য তখন বিভিন্ন লৌকিক কাহিনীর সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীর অংশ মিশ্রিত করিয়া লৌকিক কাহিনীর মধ্যবর্তিতায় পৌরাণিক দেবতাদিগের মহিমা প্রচার

করিবার প্রয়াস দেখা দিল। এই ভাবে সেই যুগে মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একটি আভিজাত্যের ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। তথাপি তখনও ইহারা ভাষায় এবং কল্পনায় সম্পূর্ণ গ্রাম্যতা-মুক্ত হইয়া সাহিত্যিক সমুন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। সেই কাজ অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘনরাম চক্রবর্তী এবং ভারতচন্দ্রের জন্য অবশিষ্ট রহিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীকে মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যের যুগ (age of glory) বলা যাইতে পারে। পূর্ববর্তী যুগের ভাষা যেমন সরল সহজ ছিল, তেমনি ভাবও কষ্ট-কল্পনা-প্রসূত ছিল না; সহজ কথায় প্রত্যক্ষ সত্যটি অন্তরের নিভৃততল একেবারে স্পর্শ করিত। কিন্তু এইযুগে সেই একই বিষয়বস্তুর উপরই শব্দঝঙ্কার ও রচনা-পারিপাট্য মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে এক কৃত্রিম বাহ্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিল। পরবর্তী যুগকে যদি ভাবযুগ বলা যায়, তবে এই যুগকে শব্দযুগ বলিতে হয়। এই যুগেই সর্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্য কি ভাষায়, কি ভাবে গ্রাম্যতামুক্ত হইল। ঘনরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র রায় ইহারাই এই যুগের স্রষ্টা। বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া এই যুগে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিবার প্রয়াস হয় নাই; কিন্তু ইহাতে চরিত্রগুলিকে অভিনব রূপ দান করিয়া কাব্যদেহে অলঙ্কার-সজ্জার যে নিপুণ ব্যবস্থা করা হইল, তাহা সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্যের এক অতি মূল্যবান্ সম্পদ হইয়া রহিল।

পূর্বেও বলিয়াছি, মঙ্গলকাব্য-রচনার মধ্যযুগ—যাহাকে আমরা সৃজনযুগ বা age of creation বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি—সেই যুগে লৌকিক দেবতাদিগের সমাজে প্রবেশাধিকার অনেকটা সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। সেইজন্য নূতন মঙ্গলকাব্য-সৃষ্টির উপাদানের জন্য বাঙ্গালী কবিদিগকে বাধ্য হইবা সংস্কৃত পুরাণোক্ত দেবতাদিগের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে। সেই সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গসাহিত্যে পৌরাণিক দেবতার মাহাত্ম্যসূচক পূর্বালোচিত পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইতে আরম্ভ করে। মঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক দেবতাগণ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই ব্যাপক ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকেন। রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ', রূপনারায়ণ ঘোষের 'দুর্গামঙ্গল' ইত্যাদি এই যুগেই উদ্ভূত হয়। কিন্তু এই সকল রচনায় মৌলিক কল্পনার অভাব সর্বত্রই দৃষ্ট হয়; উচ্চতর রুচি-অনুমোদিত কাব্যের প্রসাদগুণ এই জাতীয় মঙ্গলকাব্যে একেবারেই নাই। এই মঙ্গলকাব্যগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কৃত পুরাণাদির ভাবানুবাদ মাত্র। রূপনারায়ণের 'দুর্গামঙ্গল' 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে'র ভাষানুবাদ, এবং রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ' শিবপুরাণোক্ত কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। এইভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, সত্যকার মৌলিক কবিত্ব-বিকাশ সেই মধ্য যুগে একমাত্র লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য-সূচক মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রেই সম্ভব হইয়াছে। স্বর্গত রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় এই যুগের মঙ্গলকাব্যকেই 'first original poem in Bengali, apart from songs and translations' বলিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে বাংলার মধ্যযুগের জাতীয় কাব্যসাহিত্যের উপরই যবনিকাপাত হইয়া গেল, তাহা নহে—সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর নিজেস্ব জাতীয় বৈশিষ্ট্য-চিহ্নিত যে একটা বিরাট সাহিত্য প্রায় পাঁচ শত বৎসরের সাধনার ফলে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা চিরতরে গতিশক্তিহীন হইয়া পড়িল। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বেই ইংরেজগণ

পলাশীতে জয় লাভ করিয়া রাজ্যের কর্তা হইয়াছেন। তারপর বাঙ্গালীর জীবনে এক আমূল পরিবর্তনের যুগ আসিয়াছে। এই রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার অবসান প্রায় একশত বৎসর পরে বাঙ্গালী জাতি যখন একটা অবস্থার মধ্যে গিয়া স্থৈর্য লাভ করিল, তখন পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে নব সভ্যতার আলোক ধীরে ধীরে এই সমাজের উপর বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ করিল। তাহার সমুজ্জ্বল প্রভায় আকৃষ্ট হইয়া জাতি ক্রমে ক্রমে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতে লাগিল।

অতএব দেখা যাইতেছে, সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মত মঙ্গলকাব্যের বিলোপ মঙ্গলকাব্যের বহিরঙ্গগত অধঃপতনের ভিতর দিয়া আসে নাই—রচনাগত শৈথিল্য ইহার বিলুপ্তির কারণ নহে—দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তনই ইহার বিলোপের কারণ। ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের ভিতর দিয়া সেই পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। কারণ, মঙ্গলকাব্যের যে যুগে ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই যুগ যে ইহার সর্বাঙ্গীন অধঃপতনের যুগ, তাহা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? তবে, এ'কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সে যুগে মঙ্গলকাব্য-রচনায় শিল্পগুণ বৃদ্ধি পাইলেও অন্তরের দিক দিয়া ইহার দৈন্য দেখা দিয়াছিল—ইহার বহিরঙ্গের রসপুষ্টি ইহার অন্তরগত ভাবদৈন্য কিছুতেই ঘুচাইতে পারে নাই। অতএব রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত না হইলেও মঙ্গলকাব্য অধিক দূর অগ্রসর হইবার প্রাণশক্তি ইতিমধ্যেই হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং ইহার বিনাশ সকল দিক হইতেই অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রথম অধ্যায়

লৌকিক শৈবধর্ম—শিবের গীত—শিবমঙ্গল কাব্য

লৌকিক শৈবধর্ম

ভারতীয় যে সকল প্রাগ্‌-বৈদিক দেবতা পরবর্তী হিন্দু সমাজেও নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শিবই সর্বপ্রধান। ইহা হইতে স্বভাবতই অনুমিত হইবে যে, এ দেশের প্রাগ্‌-বৈদিক সমাজে তৎকালীন শৈবধর্মের অত্যন্ত ব্যাপক প্রভাব ছিল। মহেঞ্জোদরোর সাম্প্রতিক আবিষ্কার হইতেও এই বিষয় সমর্থিত হয়। সেইজন্যই মনে করা হয় যে, বর্তমানে ভারতের যে অঞ্চলে আর্যেতর জাতির লোক অধিক সংখ্যায় বসবাস করে, সেই অঞ্চলেই শৈবধর্মের ও যে অঞ্চলে আর্যভাষী জাতিব বংশধরগণ অধিক পরিমাণে বাস করে, সেই অঞ্চলেই বৈষ্ণব ধর্মেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাংলাদেশ হইতে বহু দূরবর্তী অঞ্চলে উদ্ভূত হইয়াছিল, কালক্রমে তাহা বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইবার পূর্বেই ইহাকে প্রাগার্য (Pre-Aryan) শৈবধর্মের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছিল। অতএব বাংলাদেশে প্রথম হইতেই যে শিবধর্মের প্রচার হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে আর্যেতর সমাজের উপাদান পূর্ব হইতেই মিশ্রিত ছিল। শুধু তাহাই নহে, অনার্য দেবতা শিব ইতিপূর্বেই আর্য সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়া স্বকীয় মহিমায় স্বয়ম্প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

বৈদিক রুদ্র দেবতার মধ্যেই অনার্য উপকরণ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। অতএব দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৈদিক দেব-সমাজের মধ্যেই এই অনার্য দেবতা নিজের স্থান করিয়া লইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পরবর্তী পৌরাণিক সাহিত্যে রুদ্র দেবতার এই বৈদিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানী বুদ্ধের অনুকরণে তাঁহার এক শান্ত সমাহিত শিবমূর্তির পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। মহেঞ্জোদরোতে আবিষ্কৃত শীলমোহরগুলির মধ্যে যোগাসনারূঢ় এক দেবমূর্তির পরিচয় হইতে মনে হয় যে, যোগীন্দ্র শিবেব পবিকল্পনা প্রাগার্য (Pre-Aryan) সমাজ হইতে উদ্ভূত; কালক্রমে তাহাও আসিয়া পৌরাণিক পরিকল্পনার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়। এইভাবে ভারতীয় পৌরাণিক সমাজ রুদ্র, শিব ও যোগী চরিত্রের মধ্যে কোন প্রকার সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। সেইজন্য একদিকে এই দেবতা যেমন ঘোর, ভৈরব এবং রুদ্র, আবার তেমনই অন্যদিকে অঘোর, শিব এবং দক্ষিণ—আবার তিনিই যোগীশ্বর ও যোগীন্দ্র। পৌরাণিক সাহিত্যের ভিতর দিয়াই প্রধানত আর্যধর্ম বাংলাদেশে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া এই দেবতার চরিত্রগত বিভিন্নমুখী এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথম হইতেই এই দেশে প্রচার লাভ করিয়াছিল, সেইজন্য কোথাও তিনি মঙ্গলকারী দেবতা, আবার কোথাও রুদ্র ভয়ানক। শিবের এই দুইটি প্রধান চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের উপরই বাংলার লৌকিক শৈবধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

বহিরাগত শৈবধর্ম বাংলার সমাজের উচ্চতর স্তরেই সর্বপ্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা

হইতেই ক্রমে তাহা নিম্নতর সমাজেও প্রসার লাভ করে। কিন্তু নিম্নতর সমাজের মধ্যে প্রচারিত হইয়া এই শৈবধর্ম ইহার পৌরাণিক আদর্শ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। নিম্নতর সমাজ নিজস্ব সংস্কারের ভিত্তির উপর উচ্চতর সমাজ হইতে সর্বদা তাহার সকল বিষয়ে প্রেরণা লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত মানসিক শিক্ষার অভাবে যে সকল উপকরণ উচ্চতর সমাজ হইতে তাহাতে গৃহীত হয়, তাহার মধ্যে তাহাদের যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হইতে পারে না—নিম্নতর সমাজের সংস্কারানুযায়ী তাহারা নূতন রূপে পুনর্গঠিত হয়। অনেক সময় তাহা এমনভবে পরিবর্তিত হইয়া থাকে যে, তাহাদের মৌলিক পরিচয়ই উদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়ে। পৌরাণিক শৈবধর্ম যখন উচ্চতর হিন্দু সমাজ হইতে ক্রমে নিম্নতর সমাজের মধ্যেও প্রচার লাভ করিল, তখন ইহা এই ভাবে নূতন রূপ লাভ করিল—তাহা বাংলাদেশের সর্বত্রই যে অভিন্ন হইল তাহা নহে; কারণ , বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়াই এই নূতন পরিকল্পনার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই জন্য ইহার মধ্যে আদর্শগত অনৈক্যও অনেক সময় গড়িয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে মূল পৌরাণিক আদর্শ হইতে এই সকল স্থানীয় পরিকল্পনা অত্যন্ত দূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছিল।

বাংলাদেশে আর্যসভ্যতা বিস্তৃতির ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, উত্তর বিহার বা মগধ হইতে ইহার সংলগ্ন অঞ্চল উত্তরবঙ্গেই আর্যসভ্যতা সর্বপ্রথম বিস্তৃতি লাভ করে, উচ্চতর সমাজ হইতে তাহা তদানীন্তন উত্তবঙ্গের অধিবাসী নিম্নতর জাতির মধ্যেও প্রচারিত হয়। শৈবধর্ম বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করিবার পূর্বেই উত্তরবঙ্গে সাধারণ জন-সমাজের মধ্যে প্রচারিত হইয়া সেই অঞ্চলে একটি স্থানীয় রূপ লাভ করিয়াছিল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শিব একজন কৃষক। বলা বাহুল্য যে, উত্তরবঙ্গের সাধারণ কৃষক সমাজেই শিবের এই অভিনব পরিকল্পনা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু কৃষক হইলেও প্রত্যক্ষ কৃষিকার্যে তাঁহার অসীম অনাসক্তি। অবশ্য এই অনাসক্তির ভাবটুকু তাঁহার চরিত্রের উপর পৌরাণিক চরিত্রেরই প্রভাবের ফল বলিতে হয়। কৃষিকার্যের ঔদাসীন্যের জন্যই তিনি নিত্য সাংসারিক অভাব-অনটনের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন। এই অসচ্ছলতার জন্য তিনি কৃষিকার্যে মনোযোগী না হইয়া বরং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই-ভাবে বাংলার কৃষকগণ একদিকে যেমন কৃষিকার্য দেব-বৃত্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়া ইহার উপর এক অপরূপ গৌরব দান করিয়াছিল, আবার অন্যদিকে তেমনি ভিক্ষাকার্যকেও দেব-বৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়া নিষ্ক্রিয় জীবনের মহিমা কীর্তন করিয়াছিল।

পৌরাণিক অকিঞ্চন শিবের পরিকল্পনার উপরই ভিক্ষুক শিবের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, অবশ্য ইহার মধ্যে বৌদ্ধধর্ম হইতে আগত ভিক্ষুজীবনের আদর্শও কতক কার্যকরী হইয়াছিল বলিয়া অনুভব করা যায়। বলা বাহুল্য, ইহাদের সঙ্গে শিবের কৃষক-চরিত্রের কোন রকম সমাঞ্জস্য স্থাপন করা যায় না। কৃষিকার্য ব্যতীতও বাংলাদেশের শিবচরিত্রের উপর আরও কয়েকটি গুণ আরোপ করা হইয়াছিল, তাহা তাঁহার ভাঙ্ ও গাঁজায় আসক্তি। শিব কর্তৃক বিষপানের পৌরাণিক কাহিনীকেই সেকালের বাঙ্গালী কৃষকগণ নিজেদের অভিজ্ঞতা

ও রুচি অনুযায়ী এইভাবে রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছিল; এইভাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাংলার শিব একদিকে একজন অলস কৃষক, আবার অন্যদিকে গাঁজা এবং ভাঙে পরম আসক্ত।

এদেশে আর্যসভ্যতা বিস্তারের পূর্বে উত্তরবঙ্গে কোচ নামক এক জাতি বাস করিত। কৃষিকার্যই ইহাদের প্রধান বৃত্তি ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক আদিম জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল জাতির মধ্যে কৃষিকার্য প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে কৃষিকার্যের জন্য এক দেবতার পরিকল্পনা করা হইয়া থাকে। কোন কোন জাতির মধ্যে ইনি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির দেবতা (Fertility god) বলিয়া পূজিত হন। ইনি কখনও স্ত্রীরূপে, কখনও বা পুরুষরূপে পরিকল্পিত হন। উক্ত কোচ জাতির মধ্যেও এই শ্রেণীর এক দেবতার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। এখনও উত্তরবঙ্গে বিশেষত দিনাজপুর জেলার সদর মহকুমায় কৃষকদের মধ্যে মাহারাজা নামক এক দেবতার পূজা হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসে নবান্নের সময় স্থানীয় কৃষকগণ নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া বারোয়ারীভাবে এই দেতার পূজা করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, এই মহারাজের আশীর্বাদেই তাহারা কৃষিকার্যে সুফল লাভ করিতে পারে। অতএব ইনি উক্ত ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির দেবতা ব্যতীত আর কিছুই নহেন। ইঁহার মহারাজা নামকরণ বহু পরবর্তী। মনে হয় এই এই অঞ্চলে আর্যসভ্যতা বিস্তৃতির পর স্থানীয় কৃষকদিগের এই উর্বরতা বৃদ্ধির দেবতা (Fertility god) কোন কোন স্থানে মহারাজা বলিয়া উল্লিখিত হইলেও ব্যাপকভাবে শিব বলিয়াই পরিচিত হইতে থাকেন। সেইজন্য প্রাচীন বাংলার কবিগণ শিবকেই সর্বত্র কৃষিকার্যের সহায়ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে উত্তরবঙ্গের এই মহারাজা ঠাকুর, পশ্চিমবঙ্গের ধর্মঠাকুর (পরে দ্রষ্টব্য) ও শিব ঠাকুরের মধ্যে কোনও মৌলিক পার্থক্য নাই। তাঁহাদের পূজোপলক্ষে প্রায় অভিন্ন লৌকিক ছড়া আবৃত্তি করা হইয়া থাকে।

কোচ কৃষক সমাজেই বাংলার লৌকিক শৈবধর্মের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল বলে মনে হয়; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে বাংলার বহু দূরবর্তী অঞ্চলের প্রাচীন সাহিত্যেও শিবকে কোচ রমণীদিগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বাংলার সর্বত্র প্রচলিত লৌকিক শিবের ছড়ায় কোচনী রমণীর প্রতি শিবের আসক্তির বিস্তৃতি বর্ননা পাওয়া যায়। অতএব মনে হয়, কোচ জাতীয় কৃষক দিগের সমাজেই পৌরাণিক শিব সর্বপ্রথম আসিয়া প্রবেশ লাভ করেন; অতঃপর সেখানেই তাহার চরিত্র স্থানীয় কোচদিগের সামাজিক জীবনের উপাদানে মিশ্রিত হইয়া একটি স্থানীয় ও লৌকিক রূপ পরিগ্রহ করে; কালক্রমে তাহাই বাংলার সর্বত্র প্রচার লাভ করে। কিন্তু বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে তাহা প্রচার লাভ করিবার পরও কোচ-সংস্রবের লোক-রুচিকর উপকরণগুলি কখনও তাহার মধ্য হইতে পরিত্যক্ত হয় নাই। বিশেষত সংস্কৃত শৈব পুরাণগুলির মধ্যেও শিবচরিত্রের অনুরূপ দুর্নীতিপরায়ণতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে, দিগম্বর শিব এক ঋষির আশ্রমে প্রবেশ করিলে পর ঋষি-পত্নিগণ তাঁহার সহিত অশ্লীল রসপরিহাস করিতেছেন।*

অতএব তাঁহার সহিত উক্ত কোচ-রমণীর সম্পর্কের পরিকল্পনায় কিছুটা পৌরাণিক প্রভাব থাকাও আশ্চর্য নহে। কোচ-রমণীর সঙ্গে শিবের সম্পর্কের অর্থ এই যে, হিন্দুধর্মের মধ্যস্থতায় শৈবধর্মের প্রভাব যখন কোচ সমাজের উপর বিস্তার লাভ করিল, তখনও কোচ সমাজের মাতৃতান্ত্রিক ভিত্তি শিথিল হইয়া যায় নাই—সামাজিক ও পারিবারিক পূজাপার্বণে কোচ পুরুষদিগের পরিবর্তে কোচ নারীরাই পৌরহিত্য করিত। এখনও উত্তরবঙ্গের পূর্বসীমান্ত-সংলগ্ন অঞ্চল গারো ও খাসি অঞ্চলে যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহাতে পুরুষদিগের পরিবর্তে নারীরাই পৌরহিত্য করিয়া থাকে। উড়িষ্যার শবর জাতির মধ্যে পুরোহিত এখনও নারীই, পুরুষ নহে। কোচ নারীগণ আর্যেতর দেবতা শিবের পূজায় বিশেষ উৎসাহ দেখাইত, ইহা হইতে শিবের সঙ্গে কোন নারী সংস্রবের কথা কল্পিত হইয়া থাকে। মাতৃতান্ত্রিক কোচ সমাজে নারীর নৈতিক আদর্শ খুব উচ্চ ছিল না বলিয়াই এই সম্পর্কের সূত্র ধরিয়া শিব-চরিত্রেও নৈতিক বিচ্যুতির কথা আসিয়াছে।

পারিবারিক জীবনের সহস্র বন্ধনের মধ্যে নিবিড় সুখ উপভোগ করিতে বাঙ্গালী চিরদিন অভ্যস্ত। দুঃখ-দারিদ্র্য ও ঐহিক অসচ্ছলতা কিছুতেই তাহার এই বন্ধন শিথিল করিতে পারে না। এদেশের নারীজীবনের আদর্শও স্বতন্ত্র। সহস্র দুঃখ-দারিদ্র্য অভাব-অসন্তোষের মধ্যে তাহাদের দাম্পত্য জীবন অশিথিল থাকিয়া যায়। শিবের মত স্বামীই নারীর আশৈশব জীবনের কাম্য। নিজের স্বামীর মধ্যে এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহারা নারী জীবনের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে। সেইজন্য ব্যক্তি হিসাবে স্বামী যাহার যেমনই হউক না কেন, তাহার জন্য কাহারও মনে ক্ষোভ বোধ হয় না। এদেশের স্বামীও যে কোন অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও ভাগ্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া লইয়া অতি সহজেই দাম্পত্য জীবনের পথে অগ্রসর হইয়াছে। বাঙ্গালী কবিগণ শিবকে দাম্পত্য জীবনের আদর্শ স্বামী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। গৃহধর্মের আদর্শই বাঙ্গালীর নিকট সর্বাপেক্ষা বড়, সেইজনাই তাহার পরিকল্পিত দেবতা আদর্শ গৃহধর্মে প্রতিষ্ঠিত। পৌরাণিক শিবের মত তিনি প্রমথনাথ হইয়া শ্মশানবিহারী নহেন, বরং তিনি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত,—তিনি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিবেষ্টিত গৃহী। যদিও তাঁহারও আবাস কৈলাস বলিয়াই উল্লিখিত হয়, তথাপি অতি সহজেই অনুভব করা যায় যে, এই কৈলাস বাংলারই এক নিভৃত পল্লী ব্যতীত আর কিছুই নহে। দুই পুত্র, দুই কন্যা ও এক সর্বংসহা পত্নী লইয়া এই পল্লীতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাস। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। যদি তাঁহারা নিজ নিজ অভ্রভেদী মূর্তি ধারণ করিবার চেষ্টা মাত্র করিতেন, তাহা হইলে বাংলার গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের স্থান হইত না।' (গ্রাম্য সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, ১৩৪৭, পৃঃ ৬৪৮)। একজন আধুনিক সমালোচকও বাংলার হরগৌরীবিষয়ক কাহিনী সম্পর্কে যথার্থই বলিয়াছেন যে, 'এ দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং জগন্মাতা পার্বতীর কৈলাস জীবন নয়, এ

* স্কন্দপুরাণ (বঙ্গবাসী, ১৩১৮), মহেশ্বর খণ্ড, কেদার খণ্ড, অধ্যায় ৬, শ্লোক ১৮-১৯

অতীত বাংলার কোন শিবদাস ভট্টাচার্য এবং তথ্য ভার্যা পার্বতী ঠাকুরাণীর জীবন কাহিনী।'* গৃহধর্ম পালনের মধ্যেও যে আধ্যাত্মিক চরিতার্থতা সার্থক হইতে পারে এ'দেশের কবিগণ তাঁহাদের লৌকিক শিবের পরিকল্পনায় তাহা প্রমাণ করিয়াছেন, অতএব বাংলার শিব পৌরাণিক আদর্শানুযায়ী যোগী নহেন, বরং আদর্শ গৃহী।

কৃষকের কল্যাণকর দেবতা রূপে উত্তরবঙ্গের কোচ সমাজে যে শিবচরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পরিকল্পিত শিবের চরিত্রে তাহারই ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। ইহার কারণ, এই দুই অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে মৌলিক জাতিগত পরিচয়ে পার্থক্য আছে। বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল সাধারণত রাঢ় নামে পরিচিত। এই অঞ্চলে প্রাচীন কাল হইতে মৃগয়াজীবী কোল মুণ্ডা জাতির এক শাখা বসবাস করিতেছিল। উত্তরবঙ্গের কোচ জাতীয় অধিবাসীদিগের মত তাহারা কৃষিজীবী ছিল না। সেইজন্যই স্বভাবতই কৃষিকার্যের সহায়ক কোন দেবতারও তাহাদের মধ্যে কোন স্থান ছিল না। এই কোল-মুণ্ডা জাতির প্রধান দেবতার নাম ছিল মরাং বুরো, ইনি পর্বতের অধিষ্ঠাতা দেবতা। ইনি মানবের মহা অনিষ্টকারী; উপযুক্ত পূজা না পাইলে নানা দুর্বিপাক সৃষ্টি করিয়া ইনি গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করিয়া ফেলেন। কালক্রমে হিন্দু ধর্ম যখন এই কোল-মুণ্ডা জাতি অধ্যুষিত বাংলার এই পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিল, তখন স্বভাবত এ'দেশে এই অনার্য-জাতি-প্রভাবিত হিন্দুসমাজের অন্যতম প্রধান দেবতা শিবকে এইপ্রকার রক্তপিপাসু ও ভয়ঙ্কর বলিয়া কল্পনা করিল। অতএব তাঁহাকেও তাহারা তাহাদের মরাং বুরোর মত পশুবলি দ্বারা পূজা করিয়া পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। এমন কি এই অঞ্চলে পরবর্তী কালে আর্যসভ্যতার প্রভাব অধিকতর হওয়া সত্ত্বেও সাধারণের মধ্যে শিবসম্পর্কিত এই মনোভাবের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিল না। বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম—এই সকল অঞ্চলের বহুস্থলেই আজ পর্যন্তও বার্ষিক শিবপূজা বা চৈত্র-সংক্রান্তির সময় শিবের সম্মুখে পশুবলি দেওয়া হয়। এই অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক গ্রাম্য শিবমন্দিরের আঙ্গিনার মধ্যেই 'ভৈরব থান' নামক একটি স্থান আছে। আধুনিক কালে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের প্রভাববশত অনেক স্থলে শিবের সম্মুখে পশুবলি না দিয়া এই ভৈরব থানে আনিয়া পশুবলি দেওয়া হয়। তামিল দেশেও হিন্দুপ্রভাববশত বর্তমানে গ্রাম্য দেবতাদিগের সম্মুখে পশুবলি দিবার প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। তথাপি তাঁহাদের সম্মুখে একটি পর্দা টানিয়া দিয়া তাঁহাদের আবরণ-দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে এখনও পশুবলি দেওয়া হইয়া থাকে। বাংলাদেশে ভৈরব শিবের আবরণ-দেবতার স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। বীরভূম জেলার বারমল্লিকা, পাইকর, দক্ষিণ গ্রাম প্রভৃতি গ্রামে এখনও শিবের সম্মুখেই প্রতি বৎসর পশুবলির ব্যবস্থা করা হয়। শিবচরিত্রের এই অভিনব পরিচয় কেবলমাত্র পৌরাণিক শিবধর্মের যে বিরোধী তাহা নহে, ইহা বাংলাদেশের আর কোন অঞ্চলে দৃষ্টিগোচর হয় না।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম এ'দেশে প্রচার লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের বহু উপাদান

* নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা (১৯৪০, ২৬-২৭)

আসিয়া লৌকিক শৈবধর্মের সঙ্গে মিশ্রিত হইতে আরম্ভ করে। পৌরাণিক শিবের পরিকল্পনাও বুদ্ধদেবের চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত, অতএব বাংলার তদানীন্তন বৌদ্ধ সমাজ শিবের চরিত্রের মধ্যেই নিজেদের আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিল। জৈন তীর্থঙ্করদিগের জীবনাদর্শ গৌতম বুদ্ধ ও পৌরাণিক শিব হইতে বিশেষ স্বতন্ত্র নহে, এইজন্যই কালক্রমে তদানীন্তন বাংলার বিরাট বৌদ্ধ ও জৈন সমাজ নিজেদের ধর্মীয় উপকরন দ্বারা এ'দেশের শৈবধর্মকে অভিনবরূপে পুনর্গঠন করিয়া লইয়াছিল। বাংলাদেশের তদানীন্তন আর একটি ব্যাপক প্রচলিত ধর্ম নাথধর্ম। শৈব কিংবা বৌদ্ধধর্মের বাহিরে ইহার উদ্ভব হইলেও শৈবধর্মের ব্যাপক প্রসারবশত কালক্রমে ইহার মধ্যে গিয়াও শৈবধর্মের উপকরণরাশি প্রকাশ লাভ করিল। কালক্রমে নাথসিদ্ধাগণও শিবকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। ক্রমে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, নাথ ও অনার্য—এই সকল ধর্মমত হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বাংলার লৌকিক শৈবধর্ম এক অভিনব সঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করিল।

বিভিন্ন আদর্শ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নিজস্ব ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তির উপর নাথধর্ম যে কিভাবে শিবচরিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছিল, এখানে সংক্ষেপে তাহারই পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

নাথধর্মের আদি গুরু মীননাথ যখন কদলীপত্তনে গিয়া ষোড়শ সহস্র কামিনীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া কাল কাটাইতেছেন, তখন গোরক্ষনাথ তাঁহার উদ্ধারমানসে তাঁহার নিকট নানা নীতি-কথার অবতারণা করিতেছেন। তাহার উত্তরে মীননাথ বলিতেছেন,

'মোর গুরু মহাদেব জগত ঈশ্বর।
গঙ্গা গৌরী দুই নারী থাকে নিরন্তর।।
যার দুই নারী তার সাক্ষাতে দিগম্বর।
হেনরূপে করে গুরু কেলি নিরন্তর।।
তান আছে গৃহবাস আহ্মি কোন হই।
ভবে মোর একগতি শুন আমি কই।।'

মীননাথের কথা শুনিয়া গোরক্ষনাথ বলিলেন, 'শিব মনুষ্য নহেন, তিনি দেবতা, তাঁহার সঙ্গে তোমার তুলনা দেওয়া বৃথা।' যাহাই হউক, গোরক্ষনাথ নিজের চরিত্র ও সাধনার দ্বারা তাঁহার গুরুর উদ্ধারসাধন করিলেন। এদিকে শিবানী পার্বতী গোরক্ষনাথের চরিত্র-বলের কথা শুনিয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল কৌশলই ব্যর্থ হইল, শুধু তাহাই নহে, গোরক্ষনাথ দেবীর চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে রাক্ষসী করিয়া ছাড়িয়া দিলেন,—প্রতিদিন একটি মনুষ্য আহার করিয়া রাক্ষসীর দিন কাটিতে লাগিল। এদিকে শিব পত্নীর বিরহে কাতর হইয়া তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইলেন। মহাদেব ধ্যানবলে গোরক্ষনাথের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া পত্নীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,

'তথাতে না পাইল শিব দেবী অন্বেষণ।

গোর্খেরে ধরিয়া শিব করে কদর্থন।।
কোথা গেলে মোর নারী তুহ্মি কি করিলা।
শিবের বচন শুনি গোর্খ যে হাসিলা।।
ভাঙ ধুতুরা খাও কি বলিব তোরে।
কোথা ত হারাইছ নারী ধর আসি মোরে।।'

যাহাই হউক, অবশেষে গোরক্ষনাথের সহায়তায় শিব উদ্ধার সাধন করিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। কিন্তু গোরক্ষনাথের নিকট নিজের পত্নীর পরাজয়ের দুঃখ ভুলিতে পারিলেন না।

এদিকে গন্ধর্ব রাজার কুমারী কন্যা, বিবহিণী স্বামী লাভের জন্য শিবপূজা করিতেছিলেন। তিনি শিবের নিকট মৃত্যুঞ্জয় স্বামীর বর প্রার্থনা করিয়া দুশ্চর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভক্তবৎসল শিব আবির্ভূত হইয়া গোরক্ষনাথকে তাঁহার পতিরূপে পাইবার জন্য বর দিলেন; কারণ, মর-সংসারে একমাত্র গোরক্ষনাথই যোগবলে অমরত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এদিকে গোরক্ষনাথ মহাসঙ্কটে পড়িলেন,—তিনি যোগী ব্রহ্মচারী; তিনি বুঝিতে পারিলেন, শিব তাঁহার পত্নীকে অপমানিত করিবার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য এই অভিনব কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। গোরক্ষনাথ যোগবলে ছয় মাসের শিশুতে পরিবর্তিত হইয়া গিয়া কন্যাকে মাতৃ-সম্বোধন করিলেন। এইভাবে গোরক্ষনাথ শিবের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিজের চরিত্রবল অক্ষুণ্ণ রাখিলেন।

নাথ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে শৈবধর্মের পূর্বোল্লিখিত সম্পর্কের ফলে বাংলায় এবং বাংলার বাহিরে এমন কি তিব্বতী ভাষায়ও নাথ-সাহিত্যে এই প্রকার শিব-কাহিনীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে নাথদিগের গুরু সিদ্ধাচার্য ও তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত প্রধান প্রধান শিষ্যের অলৌকিক জীবন-কাহিনী বর্ণনাই নাথ-সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শিবকে তাহারা পরবর্তীকালে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহার প্রসঙ্গ তাহাদের সাহিত্যে গৌণ অংশ মাত্র অধিকার করিয়া আছে।

পশ্চিমবঙ্গের একটি লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের নামে এককালে যে বিস্তৃত সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল (পরে দ্রষ্টব্য) তাহার মধ্যে শিবচরিত্রের এইভাবে পরিকল্পনা করা হইয়াছে,—

ধর্মঠাকুরের ঘর্ম হইতে আদি জননী আদ্যাশক্তির জন্ম হইল। আদ্যাশক্তিকে গৃহে রাখিয়া ধর্ম বল্লুকা নদীতীরে তপস্যা করিতে গেলেন। দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর ব্যাপিয়া তিনি তপস্যায় নিমগ্ন রহিলেন। তারপর তাঁহার বাহন উলুকের কথায় তিনি তপস্যা ত্যাগ করিয়া গৃহে আদ্যাশক্তির সংবাদ লইতে গেলেন। এদিকে আদ্যাশক্তি যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া ধর্মঠাকুর তাঁহার বরের সন্ধানে পুনরায় বহির্গত হইলেন। গৃহমধ্যে এক পাত্রে মধু ও আর এক পাত্রে বিষ রাখিয়া গেলেন। ক্রমে যৌবন-ভার আদ্যার অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া বিষ পান করিয়া ফেলিলেন, ফলে তিনি গর্ভবতী হইলেন।

কালক্রমে তাঁহার গর্ভ হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব—এই তিন জনের জন্ম হইল। তাঁহারা জন্ম লাভ করিয়াই কারণসমুদ্রের তীরে গিয়া তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব তিনজনই জন্মান্ধ ছিলেন, তাঁহাদিগের ভক্তি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ধর্মঠাকুর দুর্গন্ধ শবরূপে কারণ-জলে ভাসিতে ভাসিতে একে একে তাঁহাদেব প্রত্যেকের নিকটবর্তী হইলেন,—

দুই চক্ষু অন্ধ বহ্মা যোগে বসে আছে।
ভাইসিতে ভাইসিতে পরভু গেলা তার কাছে।।
দুর্গন্ধ পাইয়া বহ্মা ভাইসিতে লাগিল।
তিন অঞ্জলি জল দিয়া ভাসাইয়া দিল।।

সেখান হইতে শব ভাসিতে ভাসিতে বিষ্ণুর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল,—

দুর্গন্ধ পাইয়া তবে বিষ্ণু মহাবলী।
ভাসাইয়া দিল তারে দিয়া তিন অঞ্জলি।।

এবার শব ভাসিতে ভাসিতে শিবের সম্মুখে আসিয়া ঠেকিল,—

দুর্গন্ধ পাইয়া শিব ভাবে মনে মন।
কুথা নাহি কার জন্ম মরিল কুন জন।।

শিব তত্ত্বজ্ঞ; তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইহা নিরঞ্জনের মায়া ব্যতীত আর কিছুই নহে; কারণ, কোথাও কাহারও তখন পর্যন্ত জন্মই হয় নাই, অতএব শবগন্ধ কোথা হইতে আসিবে?

দু'হাতে ধরিঅা মড়া তুলিয়া লইল।
দুর্গন্ধিত শব লএ শিব নাচিতে লাগিল।।
পচা গন্ধ মড়া হএ আইলা নারাঅন।
চিনিতে নারিল আহ্মার ভাই দুইজন।।

ধর্মঠাকুর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তিনটি চক্ষু দান করিলেন,—

শ্রীধর্ম বলেন তুহ্মি আহ্মারে চিনিলে।
দুহি চক্ষু অন্ধ ছিল ত্রিলোচন হইলে।।

সংস্কৃত পুরাণাদিতে শিবের ত্রিলোচন হইবার কারণের উল্লেখ আছে, পুরাণ-বহির্ভূত এখানে এই আর একটি স্বতন্ত্র কারণের পরিচয় লাভ করা গেল।

কিন্তু শিব কেবলমাত্র নিজের দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন না, তিনি ধর্মঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিলেন -

আর এক নিবেদন করি নারাঅনে।
চক্ষুদান দেহ তুহ্মি ভাই দুহিজনে।।

এত শুনি পরাৎপর বলে ত্রিলোচনে।
তব মুখামৃতে চক্ষু পাইব দুহিজনে।।
মুখর অমৃত দিয়া দোহার চক্ষু দিল।
অমৃত পাইয়া দুহার দিব্য চক্ষু হইল।।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিবের অনুগ্রহে দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া আদ্যাশক্তি ও ধর্মঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য চলিলেন। ধর্মঠাকুর ব্রহ্মাকে সৃষ্টির, বিষ্ণুকে পালনের ও শিবকে জগৎ ধ্বংসের কার্যে নিয়োজিত করিলেন। তিনি আদ্যাশক্তিকে জীবজন্মের জন্য মনোনিবেশ করিতে আদেশ করিলেন। তাহার উত্তরে আদ্যাশক্তি বলিলেন, আমি অযোনি-সম্ভবা, আমি কি করিয়াই বা কাহাকে বিবাহ করিব? ধর্মঠাকুর বলিলেন, 'জন্মজন্মান্তরে শিব তোমাকে বিবাহ করিবে, তাহার ঔরসেই তোমার গর্ভে প্রজাসৃষ্টি হইবে।

মধ্যযুগের অন্যতম মঙ্গল-সাহিত্য চণ্ডীমঙ্গলেও অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। বাংলার এইসকল লৌকিক আখ্যান কালক্রমে কতকগুলি অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণেও গিয়া স্থানলাভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' ও 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' উল্লেখযোগ্য।

একটি প্রাগৈতিহাসিক লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান কালক্রমে এ'দেশে কোন কোন অঞ্চলে শৈবধর্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—তাহা গাজন নামে পরিচিত। শৈবধর্ম প্রভাবিত অঞ্চলে ইহা শিবের গাজন, ধর্মঠাকুর প্রভাবিত অঞ্চলে ইহা ধর্মের গাজন ও লৌকিক বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত অঞ্চলে ইহা আদ্যের গাজন নামে পরিচিত। কোন কোন অঞ্চলে ইহা নীলের গাজন নামেও কথিত হয়। শিবের পৌরাণিক এক নাম নীলকণ্ঠ, তাহা হইতে সংক্ষেপে নীল হইয়াছে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু নীল শব্দের অন্য কোন তাৎপর্য থাকাও সম্ভব। কোন কোন স্থলে এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় দেলপূজা; দেউল (মন্দির) শব্দ হইতে দেল শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন; কিন্তু এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে দেউল বা মন্দিরের এমন কোন সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না, যে জন্য ইহার নামই দেউল পূজা বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। অতএব মনে হয়, দেল শব্দও স্বতন্ত্র কোন সাংস্কৃতিক ধারা হইতে আসিয়াছে। মালদহ জিলার প্রায় অনুরূপ একটি অনুষ্ঠান আছে, তাহার নাম আদ্যের গম্ভীরা। গম্ভীরা শব্দের অর্থটি খুব স্পষ্ট নহে। পশ্চিমঙ্গের ধর্মঠাকুরের আসনরূপে ব্যবহার করিবার জন্য একপ্রকার কাঠ ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম গামার কাঠ, ইহাকে গম্ভীরা কাঠও বলা হয়। ওড়িয়া ভাষায় গম্ভীরা শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র নির্জন কক্ষ। পুরীতে কাশীমিশ্রের গৃহে চৈতন্যদেব যে ক্ষুদ্র কক্ষটিতে বাস করিতেন তাহাকে বলা হইয়াছে গম্ভীরা; এই অর্থেই ওড়িয়া ভাষায় গম্ভীরা শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু মালদহের আদ্যের গম্ভীরার ক্ষেত্রে উপরোক্ত কোন অর্থ প্রযুক্ত হইতে পারে কিনা, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। ছোটনাগপুরের ওঁরাও মুণ্ডা জাতির মধ্যেও অনুরূপ ধর্মানুষ্ঠান প্রচলিত আছে, সেখানে ইহা মাণ্ডা পরব নামে পরিচিত। উড়িষ্যার কোন কোন অঞ্চলেও এই শ্রেণীর অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে ইহার নাম সাহী যাত্রা। মহীশূরের সাত ভগিনী মারীর

(বা মারী সাত ভগিনীর) বাৎসরিক উৎসবের নাম মারী যাত্রা। মাঘ মাসে ইহা অনুষ্ঠিত হয়, ইহা কতকটা বাংলাদেশের গাজনের অনুরূপ।

শিবের গাজনের মধ্যে শিব-সম্পর্কিত কতকগুলি লৌকিক ছড়া আবৃত্তি করা হইয়া থাকে। সাধারণ লোকের হাতে পড়িয়া শিবের চরিত্র ইহাতেও এক অভিনব রূপ লাভ করিয়াছে, এখানে তাহার সামান্য পরিচয় দেওয়া যাইবে—পশ্চিমবাংলার প্রায় সর্বত্রই যে গ্রাম্য শিবমন্দির আছে তাহার সংলগ্ন আঙ্গিনায় সাধারণত চৈত্র-সংক্রান্তির দিন এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যাহারা বিশেষভাবে পূজায় যোগ দিবার জন্য প্রতি বৎসর মানসিক বা মানত করে, তাহাদিগকে সন্ন্যাসী বলা হয়, ইহাদের মধ্যে একজন মূল সন্ন্যাসী হয়, তাহার নির্দেশেই অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ পালন করিয়া থাকে; শিবমন্দিরের দ্বারোদঘাটন হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিন পর অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্যন্ত শিব-সম্পর্কে কতকগুলি ছড়া আবৃত্তি করিয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে যে শিবের ছড়া গীত হইয়া থাকে তাহাতেও শিবের কৃষক-চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। কোন কোন গীতের বিষয়বস্তু এই—শিব কার্পাস তুলার চাষ করিয়া থাকেন। কার্পাস তুলা দ্বারা গঙ্গাদেবী সুতা কাটিয়া দেন, শিব নিজেই সেই সুতা দিয়া তাঁতে নিজের জন্য কাপড় বুনিয়া লন। আনকোরা কাপড়খানি নেতা ধোপানী ক্ষীরসমুদ্রের জলে কাচিয়া দেয়।

গাজন উপলক্ষে গ্রাম্য শিবতলা হইতে 'বড় তামাসা'র যে শোভাযাত্রা বাহির হয়, তাহাতে গাজুনে শিব নামে একখণ্ড কাষ্ঠ কিংবা প্রস্তরকে বাদ্যভাণ্ড সহকারে গ্রামান্তরের শিবতলায় লইয়া যাওয়া হয়। এই শোভাযাত্রার মধ্যে নৃত্যগীত সহকারে শিব-সম্পর্কিত বিবিধ লৌকিক গীত হইয়া থাকে। কোন কোন বিষয় অভিনীতও হয়। যেমন শিবের কৃষিকার্যের বিষয়টি কোন কোন স্থলে এইভাবে অভিনীত হইতে দেখা যায়—একজন বীজ ছড়ায়, একজন লাঙ্গল দিয়া মাটি চাষ করে, দুই ব্যক্তি হালের বলদের অভিনয় করিয়া জোয়াল কাঁধে লইয়া টানে, কোন ব্যক্তি পাকা ধান কাটিবার অভিনয় করে; তাহাতে মূল সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করে, 'বলি শিবঠাকুর, কত ধান হ'লো?' উক্ত ব্যক্তি তাহার একটি জবাব দেয়, ইহা হইতেই সকলে সেই বৎসরের ধান্য উৎপাদনের পরিণাম বুঝিয়া লয়। সাঁওতালদিগের মধ্যেও ফাল্গুন-চৈত্র মাসে যে 'বহা পরব' অনুষ্ঠিত হয়, সেই উপলক্ষে, 'On arriving at the *jahen*, Jaherera sweeps the *thanas*, the naeka asks the *bongas*, i.e. those personating the gods, for the things they have brought, and places them on a mat. He next proceeds to ask them questions, a proceeding which probably was originally an attempt to find out something about the coming year.' (*Bengal District Gazetteer, Santal Parganas*, Calcutta, 1910, p. 128.)

এতদ্ব্যতীত গৌরীর শঙ্খ পরিধানের একটি লৌকিক কাহিনীও উপলক্ষে এই গীত হয়। তৃতীয় দিবসে এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়, এই উপলক্ষে গাজুনে বাসুল বা পুরোহিত আসিয়া

শিবপূজা করে, সন্ন্যাসিগণ শিব, গৌরী, ভূত, পিশাচ ইত্যাদি সাজিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে নৃত্য করে, তারপর বাদ্যভাণ্ড সহকারে নর্তকের দল গৃহে গৃহে ঘুরিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করে। কোন কোন স্থানে চড়ক হয়, চড়কের পর এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত হুগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগণা জেলার ভাগীরথীর দুই তীরে পাচুঠাকুর নামে এক দেবতা আছেন। পেঁচো নামক কোন বৃক্ষবাসী অপদেবতা হইতেই তিনি ক্রমে পাঁচুঠাকুর ও অবশেষে পঞ্চানন ঠাকুর নামে পরিচয় লাভ করিয়া বর্তমানে শিবরূপে পূজিত হইতেছেন। এই অঞ্চলে ভূতে পাওয়া অর্থে পেঁচোয় পাওয়া কথাটি আজিও প্রচলিত আছে। সংস্কৃত ও বাংলা কবিতায় এই দেবতার মাহাত্ম্যসূচক কয়েকটি কাহিনী রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে শিবের সঙ্গে তাঁহার অভিন্নতা সম্পাদনের প্রয়াস প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরের আলোচনা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, নাথ ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন লৌকিক ধর্মের উপাদানের উপর ভিত্তি করিয়া এই দেশে শিবের এক অভিনব সঙ্কর-রূপ পরিকল্পিত হইয়াছিল। এই প্রকার বিভিন্নমুখী ও বিপরীতধর্মী কতকগুলি আদর্শের একত্র সংমিশ্রণের ফলে বাংলার শৈব উপাদান দ্বারা কোন বিশিষ্ট্য সাহিত্য এদেশে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, ইহার বিভিন্ন উপাদানগুলি এমনভাবে পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র যে, ইহাদের দ্বারা কাহিনী ও আদর্শগত কোনও অখণ্ডতা সৃষ্টিও সম্ভব হয় নাই, পরবর্তী আলোচনাই ইহার প্রমাণ।

শিবের গীত

বাংলায় একটি সুপরিচিত প্রবচন আছে, 'ধান ভানতে শিবের গীত'। ইহা হইতেই এদেশে একটি লৌকিক শিব-গীতিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সমগ্রভাবে এই গীতিকা আজ পর্যন্ত কোথা হইতেও আবিষ্কৃত হইয়া মুদ্রিত হয় নাই। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে এই শিব-গীতিকার কোন কোন অংশের সঙ্গে আজিও পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্তও যে বাংলার সমাজে ইহার একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ রূপ বহুল প্রচলিত ছিল, সে যুগের বাংলা সাহিত্যে তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ চৈতন্যচরিতকার কবি বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ইতিহাসের তথ্যরাশিতে পরিপূর্ণ। তাঁহার বর্ণনায় পাওয়া যায়—

একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায়—গায় শিবের কথন॥
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাইয়া শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে॥
শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।

হইলা শঙ্কর মূর্তি দিব্য জটাধর।।
এক লাফে উঠে তার কান্ধের উপর।
হুঙ্কার করিয়া বলে মুই যে শঙ্কর।।
কেহো দেখে জটা শিঙ্গা ডমরু বাজায়।
'বোল', 'বোল', মহাপ্রভু বোলয়ে সদায়।।
সে মহাপুরুষ যত শিবগীত গাইল।
পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল।।[১]

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, খ্রীষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই শীবের গীত মুখে মুখে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল। শৈব বলিয়া পরিচিত এক শ্রেণীর ভিক্ষুক এই গীত গাহিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। এই শিবের গীত সমাজের নিম্নতর স্তরের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই শিব-গীতিকার পূর্ণাঙ্গ রূপ কি ছিল, তাহা উদ্ধৃত অংশ হইতে জানিতে পারা যায় না।

রংপুর জিলার কৃষকদিগকেব মধ্যে শিব সম্পর্কে কতকগুলি লৌকিক ছড়া আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে। যোগিসম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকগণই সাধারণত এই সকল গান গাহিয়া থাকে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কালক্রমে নাথ যোগিগণও শিবকে নিজদিগের গুরু বলিয়া স্বীকার কবিয়া লইয়াছিলেন, এই সূত্রেই তাঁহাদের রচিত লোক-গীতিকায় শিবের মহিমাকীর্তন করা হইয়া থাকে। মনে হয়, সেকালের সমাজে এই শ্রেণীর গানই শৈব ভিক্ষুকগণ দ্বারে দ্বারে গাহিয়া বেড়াইত। নিম্নে দুই-একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে,—

চণ্ডী বলে শুন গোঁসাই জটিয়া ভাঙ্গেড়া।
তোমার সঙ্গে আও করিলে নাগিবে ঝগড়া।।
চার ছেইলার মাও হৈলাম তে ই দ্যাবের ঘরে।
দয়া করি চারখানা শাঁখা নাই পিন্ধাইস্‌ মোরে।।
ভাসুর আইসে শ্বশুর আইসে রন্ন আন্ধি দ্যাওঁ তারে।
আমার হাত মুড়া, গোঁসাই, তা নজ্জা নাগে তোরে।।
শিব বলে, 'শুন চণ্ডী, দক্ষরাজার বেটি।
শাঁখা দিবার না পাইন আমি যাক বাপের বাড়ী।।'
এ কথা শুনিয়া চণ্ডী আনন্দিত মন।
নাইওর লাগিয়া চণ্ডী করিল গমন।।
কার্তিক গণেশ নিল ডাইনে বাঁয়ে সাজাইয়া।
অগ্নিপাটা শাড়ী নিল পরিধান করিয়া।।
নাইওরক নাগিয়া চণ্ডী যায় ত চলিয়া।
পালঙ্কেতে বুড়া শিব আছে শুতিয়া।।

১। বৃন্দাবনদাস, 'চৈতন্যভাগবত' (বসুমতী, ৪র্থ সংস্করণ), ১৩২-১৩৩

নারদমুনি ডাকে তারে 'মামা, মামা' বলিয়া।
'ওহে মামা, ওহে মামা, তুমি বড় আসিয়া।।
পাকা দ্যাড় পহর বেলা আছে পালঙ্কে শুতিয়া।
ঝগড়া নাগাইয়া চণ্ডী যায় গোসা হইয়া।।'
নারদ ভাইগ্না তাকে ডাকায় কান্দিয়া কাটিয়া।।
'ওহে মামী, ওহে মামী, কার্তিক গণেশের মাও।
এক পাও আগাইবা যদি মামী, কার্তিকের মুণ্ডু খাও।।
ফির পা আগাইবা যদি গণেশের মুণ্ডু খাও।
ফির পা আগাইবা মামী আমার মাথা খাও।।'
নারদ ভাইগ্নার বাক্যেত মহল ফিরিয়া গেল।
মহল যাইয়া চণ্ডী মাতা কামের ব্যাখ্যা দিল।।[১]

উত্তরবঙ্গের প্রচলিত আরও একটি শিবের ছড়া এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে; ইহাতে দেখা যাইবে কি ভাবে একই বিষয়বস্তু বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ লাভ করিয়াছে,—

'আমার জাতের কথা শিব তুই কলু ভাঙ্গিয়া।
তোমার জাতের কথা কইলে নাগিবে ঝগড়া।।
ভাসুর আইসে শ্বশুর আইসে রণ-পরশুম তাকে।
হাতে শাঙ্কা নাই দ্যান গোঁসাই নজ্জা পাছু তাতে।।
শাঙ্কা কিনিয়া দ্যাও হে মদন মুরলী।
দশ হাতে দশ মুট শাঙ্কা কানে মদন কড়ি।।
শাঙ্কা না পাইলে তবে যাব বাপের বাড়ী।
বাপের বাড়ী যাব দুর্গা ভাইয়ে বাড়ী যাব।
কাটনি কাটিয়া তবে দুই ছেইলকে পালিব'।।[২]

ধর্মমঙ্গল সাহিত্যে[৩] রামাই পণ্ডিত সঙ্কলিত 'শূন্য-পুরাণ' নামক একখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্মপূজা উপলক্ষে যে গাজন হইয়া থাকে, তাহাতেও তাহার বিবিধ অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। এই গাজন উপলক্ষে শিবের চাষ বিষয়ক যে একটি অনুষ্ঠান পালন করা হইয়া থাকে, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই বিষয়ক নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি উক্ত 'শূন্য-পুরাণে' সংকলিত হইয়াছে; মনে হয়, ইহাও প্রাচীন শিব-গীতিকার একটি অংশ,—

১। গোপীচাঁদের গান, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সঙ্কলিত (১৯২৪) ২, ৩৬-৩৭ ভূমিকা

২। গোপীচাঁদের গান, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সঙ্কলিত, ৩৯

৩। পরে দ্রষ্টব্য।

যখন আছেন গোসাঞি হয়া দিগম্বর।
ঘরে ঘরে ভিখা মাগিয়া বুলেন ঈশ্বর।।
রজনী পরভাতে ভিক্খার লাগি যাই।
কুথাএ পাই কুথাএ না পাই।।
হর্তুকী বএড়া তাহে করি দিন পাত।
কত হরস গোসাঞি ভিক্খাএ ভাত।।
আহ্মার বচনে গোসাঞি তুহ্মি চষ চাষ।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস।।
পুখরি কাদাএ লইব ভূমখানি।
আরসা হইলে ছিচএ দিব পানি।।
আর সব কিষাণ কাঁদিব মাথায় হাত দিয়া।
পরম ইচ্ছায় ধান্য আনিব দাইআ।।
ঘরে অন্ন থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুঃখ পাব।।
কাপাস চষহ পরভু পরিব কাপড়।
কত না পরিব গোঁসাই কেওদা বাঘের ছড়।।
তিল সরিষা চাষ কর গোসাঞি বলি তব পাএ।
কত না মাখিব গোসাঞি বিভূতিগুলো গাএ।।
মুগ বাটলা আর চষিহ ইখু চাষ।
তবে হবেক গোসাঞি পঞ্চামর্ত্তর আশ।।
সকল চাষ চষ পরভু আর রুই ও কলা।
সকল দব্ব পাই যেন ধর্ম পূজার বেলা।।
এতেক সুবিধা হর মনে ত ভাবিল।
মন পবন দুই-হেলএ সিজন করিল।।
সুনার যে লাঙ্গল কৈল রূপার যে ফাল।
আগে পিছু লাঙ্গলেতে এ তিন গোজাল।।
আগে জোতি পাশ জোতি আভদর বড় চিন্তা। (!)
দুদিগে দুসলি দিআ জুআলে কৈল বিন্ধা।।
সকল সাজ হৈল পরভুর আর সাজ চাই।
গটা দশ কুআ দিয়া সাজাইল মই।।
তাকর দুগুিতে চাই দুগাছি সলি দড়ি।
চাষ চষিতে চাই সুনার পাচন বাড়ি।।
মাঘ মাসে গোঁসাই পিথিবি মঙ্গলিল।

যতগুলি ভূম পরভু সকলি চষিল'।।[১]

ইহার সহিত মৈথিল কবি বিদ্যাপতি রচিত এই পদটির তুলনা করা যাইতে পারে; ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে শিব সম্পর্কিত এই বিশ্বাস মিথিলা হইতে উত্তরবঙ্গ পথে বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছিল; কিংবা প্রাচীন বাংলাদেশ হইতেও তাহার মিথিলায় যাওয়া অসম্ভব নহে—

বেরি বেরি অরে শিব মোএঁ তোকেঁ বোলএঁ
কিরিষি করিয় মন লাই।
বিনু সমরে হর ভিখিএ পত্র মাগিয়
গুণ গৌরব দূর জাই।।
নিরধন জন বোলি সবে উপহাসএ
নাহি আদর অনুকম্পা।
তোহেঁ শিব পাওল আক ধুথুর ফুল
হরি পাওল ফুল চাম্পা।।
খটগ কাটি হরে হর যে বঁধাওল
ত্রিশুল ভাঁগয় কক ফারে।
বসহা ধুরন্ধর হর লএ জোতিঅ
পাএট সুর সরিধারে।।
ভণই বিদ্যাপতি সুনহ মহেশ্বর
ই জানি কইলি তুঅ সেবা।
এতএ জেবরু সে বরু হোঅও
ওতএ সরন দেবা।।[২]

অর্থাৎ—'হে শিব, বার বার তোমাকে আমি বলি, কৃষিকার্য কর; হে হর, তুমি নির্লজ্জ হইয়া ভিক্ষা মাগ, তাহাতে তোমার গুণ-গৌরব দূর হয়। নির্ধন বলিয়া সকলে উপহাস করে, সমাদর কিংবা অনুকম্পা প্রকাশ করে না; হে শিব, তুমি আকন্দ ও ধুতুরা ফুল পাইলে, হরি চাঁপা ফুল পাইল; হে হর, খট্টাঙ্গ কাটিয়া লাঙ্গল বানাও, ত্রিশূল ভাঙ্গিয়া ফাল কর। হে হর, ভাল দেখিয়া (ধুরন্ধর) বৃষ লইয়া জুতিয়া দাও, তোমার জটায় যে গঙ্গার ধারা আছে তাহা দিয়া (ক্ষেতের) পাট কর। বিদ্যাপতি বলে, শুন মহেশ্বর, এই জানিয়া তোমার সেবা করিলাম। ইহলোকে যাহা হইবার তাহা হউক, পরলোকে শরণ দিও।'

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'বিদ্যাপতির শিবগীত' নামক যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে (সুধীরকুমার মজুমদার সম্পাদিত), তাহাতে এই শ্রেণীর গীত আরও বহু উদ্ধৃত হইয়াছে।

১। রামাই পণ্ডিত, শূন্যপুরাণ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (১৩৩৬), ১৮২-৮৫

২। বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৩১৬), ৫১৪-১৫

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলেই গাজন উৎসব প্রচলিত আছে, তাহাতে শিব-বিষয়ক যে সকল গীত গাওয়া হয়, তাহা সকল সময়ে এক ও অভিন্ন নহে। বাখরগঞ্জের একটি গীত এই—

শিব চইলাছেন বিয়ার বেশে নারদ বাজায় বীণা।
পাড়াপড়শী দেখতে এল বিয়ার কথা শুইনা।।
টিপ্ টিপ্ ডম্বুরা বাজে শিঙায় গুন্ গুন্ করে।
খৈস্যা পড়ল মৃগ চর্ম শিব ল্যাঙ্টা হইয়া নাচে।।
মেনকা সুন্দরী এল জামাই দেখিবারে।
পাগ্‌লা জামাই দেখ্যা সবে আউয়া ছিয়া করে।।
কিবা আকৃতি জামাইর কিবা জামাইর রূপ।
দুইটা চক্ষু ফুট্যা রইছে পঞ্চখানি মুখ।।
না দিব গৌরারে বিয়া কার বা বাপের ডর।
ডক্কা মাইরা পাগল জামাই বাড়ীর বাইর কর।।[১]

এই সম্পর্কে শিবের বিবাহে এয়োগণের গীত, শিব পূজার জন্য পুষ্প-চয়নের গীত, ভগবতীর শঙ্খ-পরিধান বিষয়ক গীত ও শিব-সম্পর্কে আরও বহুবিধ গীত গাওয়া হয়। ভগবতীর শঙ্খ-পরিধানের কাহিনীটি বাংলার সর্বত্র প্রচলিত। পূর্বে রংপুর জিলার কৃষকদিগের মধ্যে ইহা যে ভাবে প্রচলিত আছে, তাহা উল্লেখ করিয়াছি; তাহার সঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত বরিশাল অঞ্চলে প্রচলিত গীতটি তুলনা করিয়া দেখা যাইতে পারে,—

শঙ্খ পরিতে গৌরাইর মনে বড় সাধ।
করযোড়ে কন কথা শিবের সাক্ষাৎ।।
'বৃদ্ধ হইয়াছি গৌরাই কখন যেন মরি।
কিসেব লাইগ্যা কর বেশ দ.যার-সুন্দরী।।
কুচনী নগরে আছে তোমার বাপভাই।
সেইখানে যাইয়া পর শঙ্খ আমার কিছু নাই।।
বৃদ্ধ হইয়াছি গৌরাই আমি লড়ি করি ভর।
ভিক্ষা মাগি যাই আমি দেশ দূরান্তর।।'
নারদ বলে, 'মামা আমার কথা রাখ।
যৌবন কালে স্ত্রীলোক নাইওর পাঠাও কেন।।'
শিব বলে, 'শুন ভাইগ্‌না আমার কথা রাখ।
শঙ্খ বণিক হইয়া গৌবাইর মন বুঝিতে যাও।।'

উপরি-উদ্ধৃত শিব-বিষয়ক এই সকল বিচ্ছিন্ন ছড়া ও গীতিকা ব্যতীতও অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যেরই সূচনায় সুসংবদ্ধ শিব-কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যাইবে। শিব সম্পর্কিত ছড়া

১। ব-সা-প ১, ১৬৮

ও বিবিধ লোক-গীতিকা হইতে প্রধানত উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাহার সহিত পৌরাণিক উপাদান মিশ্রিত করিয়া অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে বিভিন্ন বিষয়ক মঙ্গলকাব্যের মধ্যে এই প্রকার শিব-কাহিনী সংকলিত হইয়াছিল। শৈবধর্মের ধ্বংসস্তূপের উপর যেমন পরবর্তী লৌকিক ধর্মের দেউল গড়িয়া উঠিতেছিল, তেমনিই শিব-কাহিনীর উপরই সেই সকল লৌকিক দেবতার কাহিনীমূল প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। কেবল লৌকিক দেবতার কাহিনীমূলেই যে শিব-কাহিনী বর্ণিত হইত, তাহা নহে—সমাজে এই শিব-গীতিকার প্রভাব এত ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছিল যে, কৃত্তিবাস-রচিত রামায়ণ - কাব্যের মূল কাহিনীর সঙ্গে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে আনিয়া শিব-কাহিনী যুক্ত করা হইয়াছে। তৎকালীন বাংলার সমাজে একমাত্র সুপ্রতিষ্ঠিত দেবতাই ছিলেন শিব। সেইজন্য লৌকিক দেবতাগতও সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া শিবের সঙ্গে একটা সম্পর্কের কল্পনা করিয়া লইতেন।

তথাপি আনুপূর্বিক শিব-কাহিনী লইয়া অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে কয়েকখানি শিব-মঙ্গল কাব্যও রচিত হইয়াছিল। এখন তাহাদেরই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

শিবমঙ্গল কাব্য

পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদান মিশ্রিত করিয়া শিবমঙ্গলকাব্যগুলিতে যে কাহিনীটি সাধারণত পরিকল্পিত হইয়াছিল তাহা এইরূপ—

একদিন সমবেত দেবতাদিগের সভায় শিব তাঁহার শ্বশুর দক্ষ প্রজাপতিকে কোন সম্মান দেখাইলেন না; এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য দক্ষ এক যজ্ঞের আয়োজন করিলেন; তাহাতে সকল দেবতা নিমন্ত্রিত হইলেন, দক্ষ কেবলমাত্র শিবকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। পিতৃগৃহে যজ্ঞের কথা শুনিয়া সতী বিনা নিমন্ত্রণেই সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দক্ষ তাঁহার সম্মুখে শিবের নিন্দা করিতে লাগিলেন, শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করিলেন; শিব একথা শুনিতে পাইয়া যজ্ঞস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহাব অনুচরগণ যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া দিল। সতী গিরিরাজের ঔরসে মেনকার গর্ভে গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। আশৈশব তিনি শিবকে পতিরূপে কামনা করিতে লাগিলেন। গিরিরাজ ভিক্ষুক শিবের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিলেন। প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া গৌরী স্বামীর সঙ্গে কুটীরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। কিন্তু দিন আর কাটে না; ভিক্ষুকের ঘরের সম্বল ফুরাইয়া আসিয়াছে, নিশ্চিত অনাহাব সম্মুখে। গৌরী শিবকে চাষ করিবার যুক্তি দিলেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত অলস প্রকৃতির; সেইজন্য এই পরিশ্রমের কার্যে কোন উৎসাহ দেখাইলেন না। তিনি বলিলেন, চাষের ফল অনিশ্চিত। তিনি ব্যবসা করিতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার পুঁজি কোথায়?

অগত্যা স্থির হইল তিনি চাষই করিবেন। ইন্দ্রের নিকট হইতে তিনি ভূমি পাট্টা লইলেন; বিশ্বকর্মার হাতে ত্রিশূলটি দিয়া বলিলেন, 'ইহার লোহা গালাইয়া লাঙ্গল, জোয়াল, মই গড়িয়া দাও।' বিশ্বকর্মা ত্রিশূল গালাইয়া চাষের সকল সরঞ্জাম গড়িয়া দিলেন। এবার বীজ ধান কোথায় পাওয়া যাইবে? শিব গৌরীকে বলিলেন, 'কুবেরের কাছে যাও, গিয়া বীজ ধান

ধার কর, ধান ঘরে উঠিলে শোধ দিব, বলিও।' গৌরী নিজে যাইতে অস্বীকার করিলেন, অগত্যা শিব নিজেই কুবেরের নিকট হইতে বীজ ধান ধার করিয়া আনিলেন।

মাঘ মাসের শেষের দিকে খুব বৃষ্টি হইল। অনুচর ভীমকে লইয়া শিব জমি চাষ করিলেন, যথাসময়ে ধান রোপণ করা হইল, প্রচুর ধান হইল; নারদের নিকট হইতে ঢেঁকিটি ধার করিয়া আনিয়া ভীম ধান ভানিল, গৌরীর সংসারে আর অভাব রহিল না। কিন্তু শিব মর্ত্যলোকে গিয়া চাষে এমন মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, আর কৈলাসে ফিরিবার নামও করেন না। এদিকে মর্ত্যলোকে তাঁহার কতকগুলি কুচনী সঙ্গিনী জুটিয়াছে। গৌরী তাঁহাকে কৈলাসে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। কিন্তু উপায়? উঙানি মশা দিয়া পার্বতী মর্ত্যলোক ছাইয়া ফেলিলেন, মশার কামড়ে শিব অস্থির হইয়া পড়িলেন, তথাপি কৈলাসে ফিরিবার মন নাই; পার্বতী এবার ডাঁশ ও মাছি পাঠাইলেন; সর্বাঙ্গে ঘৃত মাখিয়া শিব তাহাদের কামড় হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন; তারপর জোঁকের উপদ্রব আরম্ভ হইল; তথাপি শিব পার্বতীর প্রতি উদাসীন, কৃষিকার্যে মত্ত হইয়া আছেন।

অবশেষে পার্বতী বাগ্দিনীর রূপ ধারণ করিয়া শিবের কৃষিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। শিবের ক্ষেতে তিনি মাছ ধরিতে লাগিলেন; তাহাতে ছড়া হইতে ধান ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তথাপি বাগ্দিনীকে শিব কিছু বলিলেন না; বরং তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন—বিবাহ করিলে তিনি ক্ষেতের জল সেচিয়া বাগ্দিনীকে মাছ ধরিতে সাহায্য করিবেন। শিব বাগ্দিনীকে খুশী করিবার জন্য ক্ষেতের জল সেচিয়া মাছ ধরিতে লাগিলেন। বাগ্দিনী শিবের নিকট হইতে একটি পিতলের অঙ্গুরী চাহিয়া লইলেন। শিব এইবার বাগ্দিনীর নিকট আলিঙ্গন প্রার্থনা করিলেন; আলিঙ্গন দিবার ছলনা করিয়া বাগ্দিনী কৈলাসের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, শিব তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন, বাগ্দিনী পার্বতীরূপ ধারণ করিয়া কৈলাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পার্বতী শিবকে গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন, কারণ, তিনি বাগ্দিনীর প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে অঙ্গুরী উপহার দিয়াছেন; শিব অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন, চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, পার্বতী তাঁহার কাছে স্বামীর ব্যভিচারের কথা জানাইলেন। ঝগড়া আরও পাকা করিবার জন্য নারদ পার্বতীকে পরামর্শ দিলেন, 'স্বামীর কাছে একজোড়া শাঁখা চাও, শাঁখা পরিলে স্বামী চিরদিন বশ থাকিবে।' পার্বতী শিবের নিকট শাঁখা পরিবার অভিলাষ জানাইলেন। কিন্তু শিব ভিক্ষুক, তিনি স্ত্রীর শাঁখা কি করিয়া জোগাইবেন? এক বিপদের উপর আর এক বিপদ দেখা দিল। তিনি ভাবিয়া কোন কূল পাইলেন না।

অভিমানে পার্বতী পিতৃগৃহে চলিয়া গেলেন। পিতৃগৃহে তখন দুর্গোৎসব। নারদ শিবকে পরামর্শ দিলেন, 'পার্বতীকে যদি ফিরাইয়া আনিতে চাও তবে শাঁখারী সাজিয়া হিমালয়ে যাও, নিজে তাঁহার হাতে শাঁখা পরাইয়া তাঁহাকে ঘরে লইয়া আস।'

শিব অগত্যা তাহাই করিলেন, শাঁখারীর বেশ ধরিয়া তিনি হিমালয় যাত্রা করিলেন। শাঁখা

দেখিয়া পার্বতীর আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। শাঁখার মূল্য জিজ্ঞাসা করায় শিব বলিলেন, 'ইহার মূল্য আত্মসমর্পণ।' পার্বতী শিবকে চিনিলেন; তিনি দশ হাত বাড়াইয়া দিলেন, শিব নিজের হাতে তাহাতে শাঁখা পরাইয়া দিলেন। পার্বতীর অভিমান দূর হইল। তাঁহারা কৈলাসে ফিরিয়া আসিলেন।

উল্লিখিত কাহিনী হইতে একটি বিষয় সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে, ইহার মধ্যে চরিত্র ও ঘটনা-গত ঐক্য বড় নাই। ফলে ইহার প্রধান চরিত্রগুলি বর্ণিত ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া স্বাভাবিক পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। নাগাধিরাজ হিমালয়ের জামাতা ত্রিলোকেশ্বর শিব বিবাহের অব্যবহিত পরই এমন অন্নকষ্টে পাড়লেন যে তাহা দূর করিবার জন্য তাঁহাকে স্বয়ং কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইল। কৃষিকার্য করিতে করিতেই তিনি কুচনী সঙ্গিনীদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিতে লাগিলেন। তারপর একদিন এক বাগ্দিনীকে দেখিয়া তাহারই প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে একদিন শিব শাঁখারী সাজিয়া শাঁখা বিক্রয় করিতে চলিলেন। বলা বাহুল্য, এই সকল ঘটনা পরস্পর সামঞ্জস্যহীন; সেইজন্য ইহা হইতে শিবের চরিত্রগত ঐক্যের সন্ধান দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। শিব চরিত্রের এই স্বতন্ত্র গুণগুলির উদ্ভবের ইতিহাসও যে স্বতন্ত্র তাহাও সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বাংলার বিভিন্ন লৌকিক সংস্কার হইতে বিভিন্ন কালে পরস্পর স্বাধীনভাবে বিভিন্ন স্থানীয় (local) দেবতার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। পরবর্তী কালে যখন এ'দেশের বিভিন্ন লৌকিক ধর্মসংস্কারগুলি এক হিন্দুধর্মের বিরাট পক্ষছায়ায় আসিয়া সমবেত হইল, তখনই পৌরাণিক ও এই সকল লৌকিক বিভিন্ন দেব-কল্পনার মধ্যে একটা ঐক্যের সন্ধান করিয়া লইবার প্রয়াস দেখা গিয়াছিল, তাহারই ফলে পৌরাণিক শিব কৃষক, লম্পট, শাঁখারী এই সকল বিভিন্ন দোষ-গুণের সহিত সংমিশ্রণ লাভ করিলেন। এই সকল স্বতন্ত্র উপকরণের একত্র সংমিশ্রণের ফলে বাংলা শৈব সাহিত্য একটি নিজস্ব সুসমঞ্জস সাহিত্য-বস্তুতে পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই। এমন কি ভারতচন্দ্র রচিত 'অন্নদামঙ্গলে'র প্রথম খণ্ডেও এইজন্যই চরিত্র-সৃষ্টির সম্পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায় না।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহোদয় শিবমঙ্গলকাব্যের কাহিনীগত অসংলগ্নতার রহস্য সন্ধান করিতে না পারিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে শিবচরিত্রের পুরাণ-বহির্ভূত অংশ 'কবির স্বকপোলকল্পিত'। অবশ্য তাঁহার সময় উপরি-উদ্ধৃত বিচ্ছিন্ন শিবগীতিকাগুলি আবিষ্কৃত হয় নাই, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে, শিবসম্পর্কিত এই সকল পুরাণ-বহির্ভূত কাহিনী বহুকাল হইতেই এ'দেশের সমাজে প্রচলিত ছিল; শিবমঙ্গলকাব্যগুলিতে তাহাই উপজীব্য করা হইয়াছে।

উদ্ধৃত শিব-কাহিনীর মধ্যে যে দুইটি স্থূল পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা পৌরাণিক ও লৌকিক। প্রাচীন শিব-গীতিকার মধ্যে পৌরাণিক অংশ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল। কিন্তু মঙ্গলকাব্য রচনার যুগে তাহাই প্রাধান্য লাভ করিল।

শিবমঙ্গলের কবিগণ

রামকৃষ্ণ রায়

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামকৃষ্ণ রায় শিব-বিষয়ক বিভিন্ন পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যান অবলম্বন করিয়া তাঁহার সুবৃহৎ শিব-মঙ্গল কাব্য রচনা করেন।[১] এ'পর্যন্ত অনুসন্ধানের ফলে যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহাই সর্বপ্রথম সুসংবদ্ধ শিব-মঙ্গল কাব্য—ইহার বহু পূর্ব হইতেই মঙ্গলকাব্যের একটি বিশিষ্ট ধারার উদ্ভব হইয়া ইতিমধ্যেই একটি সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করা সত্ত্বেও, শিব-বিষয়ক কোনও কাহিনী লইয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনও শিবমঙ্গলকাব্য ইতিপূর্বে রচিত হয় নাই। ইহাকে শিব-বিষয়ক একটি কোষ-গ্রন্থ (encyclopaedia) বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে শিব-প্রসঙ্গের এমন সুনিপুণ সংকলন বাংলা সাহিত্যে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দিক দিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাব্যখানির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। রামকৃষ্ণ তাঁহার কাব্যকে সর্বত্র 'শিবায়ন' অথবা 'শিবের মঙ্গল' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং মঙ্গলকাব্য রচনার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী স্বপ্নাদেশে যে তাঁহার কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাও এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,

'ভারতী দিলেন উক্তি নহে মোর নিজ শক্তি
স্বপ্নের ইঙ্গিত অনুগ্রহ।'

কবি তাঁহার কাব্যমধ্যে এইভাবে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন,

পিতামহ রায় যশশ্চন্দ্র মহামতি।
তাঁর পদাম্বুজে মোর অশেষ প্রণতি॥
পিতামহী বন্দিলাঙ নাম নারায়ণী।
সরস্বতী বন্দিলাঙ তাঁহার সতিনী॥
মাতামহ বন্দিলাঙ নাম সূর্য মিত্র।
তেয়জ কুলীন তিঁহো পবিত্র চরিত্র॥
পিতা কৃষ্ণরায় বন্দো সর্বশাস্ত্রে ধীর।
যাহার প্রসাদে এই মনুষ্য শরীর॥

১। 'শিবায়ন', রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র রচিত, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা (১৩৬৩)।

মাতা রাধাদাসীর চরণে দণ্ডবৎ।
যাঁর গর্ভবাস হইতে দেখিল জগৎ॥
কায়স্থ দক্ষিণ রাঢ়ি বংশেতে উৎপত্তি।
গোত্র কাশ্যপ আমার দেবতা প্রকৃতি॥
মিরাস বন্দিনু বাস্তু বসপুর দেশ।
এতদূরে ভাইরে বন্দনা হৈল শেষ॥
রামকৃষ্ণ দাস গান শিবের মঙ্গল।
ভক্তজনে প্রভু তুমি করিবে কুশল॥

রামকৃষ্ণের 'মিরাস' বাস্তু রসপুর গ্রাম হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতা থানার অধীন; ইহা আমতা হইতে মাত্র তিন মাইল উত্তরে দামোদর নদের তীরে অবস্থিত। কবির বংশধরগণ আজও সেই গ্রামে বসবাস করিতেছেন। কবির পিতামহ যশশ্চন্দ্র পাঠান আমলে মুসলমান নবাব প্রদত্ত রায় পদবী লাভ করেন, তিনি উচ্চ সামাজিক মর্যাদারও অধিকারী ছিলেন। এই বংশের আভিজাত্যের ধারা আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কবি রামকৃষ্ণ তাঁহার নিজের পিতাকে 'সর্বশাস্ত্রে ধীর' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শিবমঙ্গলকাব্য-রচনায় রামকৃষ্ণ যে বিস্তৃত শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার পিতৃপ্রদত্ত শিক্ষার ফল বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। বিষয়-বৈভবের সঙ্গে সুগভীর শাস্ত্রজ্ঞানের যোগাযোগ সর্বত্র সুলভ নহে—পিতাপুত্র উভয়েই এই দুর্লভ গুণের অধিকারী ছিলেন।

কাব্য রচনা কালে রামকৃষ্ণের যৌবন অতীত হয় নাই বলিয়া মনে হয়; কারণ, অন্যান্য পারিবারিক তথ্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, কবির দুই পত্নী ছিল এবং তাহাতে সাত পুত্রের জন্ম হয়। কিন্তু তিনি তাঁহার গ্রন্থমধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র জগন্নাথ ও দ্বিতীয় পুত্র বলরামের নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন, আর কাহারও নাম উল্লেখ করেন নাই। ইহা হইতেই মনে হয়, তাঁহার আর কোনও পুত্রের তখনও জন্ম হয় নাই। যৌবনেই রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, কারণ, তিনি তাঁহার শিব-মঙ্গল কাব্যের প্রথম হইতেই প্রায় সর্বত্র ভণিতায় নিজের নামের পরিবর্তে এই উপাধিও ব্যবহার করিয়াছেন। মনে হয়, তিনি যৌবনের আরম্ভ হইতেই কবিযশ লাভ করিয়াছিলেন এবং কবিচন্দ্র উপাধি লাভ করিবার পরই শিবমঙ্গলকাব্য-রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন—এই কাব্য রচনা করিয়া যে তিনি এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। কবির বংশধরদিগের গৃহে রক্ষিত এই কাব্যের পুঁথিতে তাঁহার ভণিতায় একটি মালসী গান পাওয়া গিয়াছে। হয়ত এই শ্রেণীর বিচ্ছিন্ন ভক্তিমূলক সঙ্গীত রচনায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। এই ভক্তিমূলক সঙ্গীতগুলিও যে তাঁহার যৌবনের রচনা, তাহাও সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন, চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' তাঁহার যৌবনের রচনা এবং পদাবলী তাঁহার পরিণত বয়সের

রচনা। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদেরও 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' তাঁহার যৌবনের রচনা, 'শাক্ত পদাবলী' তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা। সেইজন্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং 'বিদ্যাসুন্দর কাব্যে'র মধ্যে লালসার উদ্দাম নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রামকৃষ্ণের রচনা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, যৌবনের রচনা হইলেই যে তাহাতে লালসার স্পর্শ থাকিবে, তাহা নহে—কারণ রামকৃষ্ণের উক্ত মালসী গানটি যেমন ভক্তিচন্দনের নির্মল সুরভিতে পবিত্র, তাঁহার আনুপূর্বিক শিবমঙ্গলকাব্যও তেমনই মঙ্গলকাব্যোচিত রুচিবোধ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। রুচির দিক দিয়া সংস্কৃত শিব-বিষয়ক পুরাণগুলিই সর্বাধিক কুরুচির পরিচায়ক। সেই পুরাণগুলি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া কাব্য রচনা করা সত্ত্বেও রামকৃষ্ণ কোন দিক দিয়াই তাঁহার কাব্যের মধ্যে কুরুচির প্রশ্রয় দেন নাই, ইহা রামকৃষ্ণের উচ্চ নীতিবোধের ফল। এই নীতিবোধ তাঁহার ব্যক্তিগত গুণ ছিল, সমগ্রভাবে সে যুগের সমাজগত গুণ ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। বৈষ্ণব ধর্মের উচ্চ নৈতিক আদর্শ তাঁহার জীবনে কার্যকর হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার উচ্চ নীতিবোধ জন্মিয়াছিল। তিনি শিবমঙ্গলকাব্য রচনা করিলেও বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা-গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; কারণ, তিনি তাঁহার কাব্যে শ্রদ্ধাভরে চৈতন্য-নিত্যানন্দের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের সর্বত্র ব্রাহ্মণ ও গুরুর প্রতি সশ্রদ্ধ উল্লেখ রহিয়াছে। এই বিনয়-গুণ বৈষ্ণবধর্মসুলভ বলিয়া সহজেই অনুভব করা যায়। চৈতন্যধর্মের প্রভাবের ফলে ধর্মসমন্বয়ের যে উদার আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, রামকৃষ্ণের কাব্যের মধ্যে তাহার সূত্রপাত দেখিতে পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যের শৈবধর্মের প্রধান নীতি এই ছিল যে, 'যে হাতে পূজেছি আমি দেব শূলপাণি। সে হাতে পূজিব পুনি চেঙ্গমুড়ি কাণী?' অর্থাৎ পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যে শৈবধর্ম সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছিল—শিবকে বাদ দিয়া সেখানে অন্য কোন দেবতাকে স্বীকার করা হয় নাই; কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই ইহাদের মধ্য হইতে সাম্প্রদায়িকতার এই সঙ্কীর্ণবোধ দূর হইয়া গিয়াছিল; রামকৃষ্ণের কাব্যের মধ্যে তাহার প্রথম ও সার্থক অভিব্যক্তি দেখা গিয়াছে। 'রাম বল রে ভাই শিব বল', 'ভাই, বল হরি হরি, অপার সংসার-সিন্ধু রামনামে তরি'—রামকৃষ্ণ তাঁহার শিবমঙ্গল কাব্যের সর্বত্রই এই প্রকার ধূয়া বা ঘোষা ব্যবহার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে কোথাও বিষ্ণু কিংবা শক্তিকে খর্ব করেন নাই। এই ধারাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া গিয় উনবিংশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনায় পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। রামকৃষ্ণের কাব্য এইভাবে বাংলার আধ্যাত্মিক সাধনার ক্রমবিকাশের ধারায় নিজের যোগ স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ হিন্দুশাস্ত্রে বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন,

> শুনিল দর্শন ছয়   বেদ শাস্ত্র মত কয়
>
> অষ্টাদশ পুরাণ ভারত।

তিনি 'কাশীখণ্ড', 'হরি-বংশ', 'কালিকা-পুরাণ', 'বৃহন্নারদীয়', 'শান্তি পর্ব', 'স্কন্দ পুরাণ'

প্রভৃতি পুরাণ হইতে বিবিধ শিব-প্রসঙ্গ সংকলন করিয়া তাঁহার শিবমঙ্গলকাব্যের ভিতর দিয়া পরিবেষণ করিয়াছেন; কোথাও পৌরাণিক কাহিনীর ব্যতিক্রম করিয়া চিরাচরিত সংস্কারের মূলে তিনি আঘাত করেন নাই। তবে এই সকল পুরাণ হইতে তিনি যে নির্বিচারে শিব-প্রসঙ্গ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নহে—এই কার্যে তাঁহার একটি উচ্চ নীতি বোধ অত্যন্ত সজাগ ছিল, এই নীতিবোধ দ্বারাই তাঁহার কাহিনী-নির্বাচন নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। এমন ব্যাপক শাস্ত্রজ্ঞান রামকৃষ্ণ কোথা হইতে লাভ করিয়াছিলেন? গুরু-বন্দনায় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন,

তবে ত বন্দিনু নিজ গুরুর চরণ।
ইহকালে পরকালে যাহার শরণ॥
গৌর শরীর তাঁর শুক্ল উপবীত।
শুক্ল বস্ত্র পরিধান পরম পণ্ডিত॥
প্রফুল্ল কমল মুখ কথা সুধাবৃষ্টি।
যাঁহার প্রসাদে মোর হৈল জ্ঞানদৃষ্টি॥

অতএব মনে হইতে পারে যে, তিনি তাঁহার গুরুর নিকট হইতেই এই বিপুল শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু মনে হয়, এই বিষয়ে তিনি তাঁহার সভাপণ্ডিতের নিকটও সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কাব্যে তাঁহার সম্বন্ধেও উল্লেখ করিয়াছেন—

সভাসদ পণ্ডিতেরে আমার ভকতি।
কৃপা কর প্রভু এই সভার পণ্ডিতে॥

সভাপণ্ডিতের দ্বারাই সেকালে বাংলার সর্বত্র শাস্ত্রানুশীলনের ব্যবস্থা হইত। গুরুর নিকট হইতে উচ্চ জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া রামকৃষ্ণ নিজ সভাপণ্ডিতের মুখ হইতে বিস্তৃত শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কবি রামকৃষ্ণ পরলোক গমন করেন। কিন্তু এই নিষ্ঠাবান জ্ঞানতপস্বীর জীবনের অন্তিম মুহূর্ত একটি মর্মান্তিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে। বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরায় ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রসপুরে কবির বাটী আক্রমণ করেন। পারিবারিক দেব-বিগ্রহ অধিকার করাই সে-কালে বিজয়ের নিদর্শন রূপে গণ্য হইত। বিজয়ী বর্ধমানরাজের লোকজন রামকৃষ্ণের পারিবারিক রাধাকান্ত ঠাকুরের বিগ্রহ অধিকার করিয়া লইল; তিনি ঘুঁটের গাদায় বিগ্রহটি গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানেও তাহা রক্ষা পাইল না, বিগ্রহটি বর্ধমানে নীত হইল। এই ঘটনায় মর্মাহত হইয়া বৃদ্ধ কবি প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার প্রায় ৯০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। কবির আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্বেই তাঁহার পুত্রগণ 'ধড়া গলায়' বর্ধমান রাজসরকারে উপস্থিত হইয়া নূতন বিগ্রহ প্রকাশের অনুমতি ও তাহার দেবোত্তর সম্পত্তির সনদ লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সকল ঘটনা-সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি কবির বংশধরদিগের গৃহে রক্ষিত আছে। এই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা

যাইতেছে যে, কবি রামকৃষ্ণের ব্যাপক সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল; সেইজন্য তাঁহার কুল-বিগ্রহ অধিকার করিয়া বর্ধমানরাজ গৌরবান্বিত বোধ করিয়াছিলেন। রাজতুল্য ঐশ্বর্য-ভোগের মধ্যেই কবি রামকৃষ্ণের জ্ঞানতপস্যা এবং কবিত্বের সাধনা সার্থকতা লাভ করিয়াছিল।

রামকৃষ্ণের গ্রন্থরচনার কালসম্পর্কে যে সকল বিভিন্ন প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, আনুমানিক ১৫৯০-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে বা ইহার দুই এক বৎসর পূর্বে বা পরে তাঁহার শিবমঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত (১৩৬৩ সাল) রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের 'শিবায়ন' কাব্যে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা স্থান পাইয়াছে (পৃ. ।।৹-।।৯০), এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণের 'শিবায়ন' মোট ২৬টি পালায় বিভক্ত। চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলে পালা-বিভাগের যে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল, শিবমঙ্গলের তেমন কিছু ছিল বলিয়া বোধ হয় না। রামকৃষ্ণের পালা-বিভাগ তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত। বিশেষত এই ২৬টি পালার ভিতর দিয়া কাহিনীগত কোন ঐক্যসূত্র নাই। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত শিবমঙ্গলের মধ্যে কোনও কেন্দ্রীয় কাহিনী নাই। বিভিন্ন পৌরাণিক ও লৌকিক শিব-প্রসঙ্গ একত্র গ্রথিত করিয়া শিবমঙ্গলকাব্য রচিত হয়—সেইজন্য অধিকাংশ পালাই এখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বাধীন ও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন। ইহা বিভিন্ন শিব-প্রসঙ্গের একটি সংকলন মাত্র—তবে এই সংকলনের পরিকল্পনায় শিব-কাহিনীর পারম্পর্য যে রক্ষিত হয় নাই, তাহাও বলিতে পারা যায় না—কিছুদূর পর্যন্ত পুরাণানুযায়ী ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা করিবার পর ইহাতে কিছু কিছু লৌকিক উপাদানও অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। নিম্নে পালা অনুযায়ী ইহার একটি সংক্ষিপ্ত সূচী দেওয়া হইল।

প্রথম পালা—বন্দনা ও সৃষ্টি-বর্ণনা; দ্বিতীয় পালায় শিবের জন্ম হইতে শিবের বিবাহ; তৃতীয় পালায় ব্রহ্মাবিষ্ণুর বিবাদ, কালভৈরব প্রসঙ্গ, কাশীমাহাত্ম্য বর্ণনা; চতুর্থ পালায় দক্ষযজ্ঞ উপাখ্যান; পঞ্চম পালায় সতীর দেহত্যাগ, দক্ষের পরিণাম; ষষ্ঠ পালায় ময়তারকোপাখ্যান, গৌরীর জন্ম; সপ্তম পালায় হিমালয়ের কাহিনী; মেনকার কথা; অষ্টম পালায় গৌরীর তপস্যা; শিবের পরীক্ষা; নবম পালায় শিবের উদ্যানে গৌরী, হরগৌরীর মিলন; দশম পালায় হিমালয়গৃহে শিব; একাদশ পালায় কুমারের জন্ম ও মহিষবধ; দ্বাদশ পালায় শিবের বিবাহ উদ্যোগ; ত্রয়োদশ পালায় শিব-বিবাহের অনুষ্ঠান, বৈদিক ও লৌকিক বিবাহচার পালন; চতুর্দশ পালায় হরগৌরীর ফুলশয্যা, প্রহেলিকা, শিবের যোগসাধন; পঞ্চদশ পালায় পাশাখেলা, বিবিধ শিব-তত্ত্ব, কৈলাসযাত্রা; ষোড়শ পালায় মনসার উপাখ্যান; সপ্তদশ পালায় সমুদ্রমন্থন উপাখ্যান; অষ্টাদশ পালায় বলিরাজার উপাখ্যান; ঊনবিংশতি পালায় অগস্ত্য ও সগর রাজার উপাখ্যান; বিংশতি পালায় গঙ্গার উপাখ্যান; একবিংশতি পালায় ত্রিপুর ও তারকের উপাখ্যান; দ্বাবিংশতি পালায় দুর্গার কোন্দল;

ত্রয়োবিংশতি পালায় অন্ধক উপাখ্যান; চতুর্বিংশতি পালায় অন্ধক বধ; পঞ্চবিংশতি পালায় পরশুরাম ও রাবণ উপাখ্যান; ষড়বিংশতি পালায় বাণ রাজার উপাখ্যান।

রামকৃষ্ণ-রচিত শিবমঙ্গলকাব্যের এই সংক্ষিপ্ত সূচী হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, প্রথম হইতে পঞ্চদশ পালা পর্যন্ত কাহিনী একটি নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। ইহার পর হইতে প্রত্যেকটি পালা কাহিনীর মূল ধারার সঙ্গে কোন যোগ রক্ষা করিতে পারে নাই। এই সুদীর্ঘ কাব্যটিতে একমাত্র একটি পালা অর্থাৎ ষোড়শ পালাটি পুরাণবহির্ভূত লৌকিক উপকরণ দ্বারা রচিত। এমন কি, ইহারও শেষ অংশে মহাভারতের কিছু কাহিনী আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের শিবমঙ্গল কাব্যের অন্যান্য লৌকিক বিষয় যেমন, শিবের চাষ, মৎস্য ধরা, গৌরীর শঙ্খ পরা ইত্যাদি ইহার মধ্যে আদৌ নাই। অথচ শিব সম্পর্কিত এই বিষয়গুলি যে অত্যন্ত প্রাচীন, তাহা 'শূন্যপুরাণ' ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত শিবের ছড়া হইতেও জানিতে পারা যায়। কিন্তু উক্ত লৌকিক পালাগুলি নিতান্ত গ্রাম্য রুচির ও দুর্নীতির পরিচায়ক বলিয়া কবি ইহাদিগকে তাঁহার রচনা হইতে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

প্রত্যেক শিবমঙ্গলকাব্যেরই যাহা প্রধান ত্রুটি, রামকৃষ্ণের কাব্যেরও তাহাই প্রধানতম ত্রুটি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়—তাহা হইল, কোনও কেন্দ্রীয় কাহিনীর অভাব। এইজন্যই রামকৃষ্ণের রচনা আয়তনের দিক দিয়া বিপুল হওয়া সত্ত্বেও একটি সামগ্রিক কাব্যরূপ লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং ইহার মধ্যে কাহিনীর গুণাগুণ বিচার কিংবা চরিত্র বিশ্লেষণের বিস্তৃত কোনও অবকাশ নাই। তবে ইহার বিচ্ছিন্ন অংশের ভিতর দিয়া কবির যে কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

শিবের লৌকিক চরিত্রের উল্লেখ এই কাব্যে তত প্রাধান্য লাভ করিতে না পারিলেও, শিবের বিবাহ, হরগৌরীর কোন্দল প্রভৃতির বিষয় বর্ণনায় বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবন অপূর্ব বাস্তব রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। গৌরীর বিবাহে শিবকে দেখিয়া এয়োগণ নিজেরা এই বলিয়া কৌতুক অনুভব করিতেছে—

দোজ বর্যা বরে সই কিছু নহে হারা।
উর্ধ্বমুখে আছে চক্ষে দেখিবেক তারা॥
মোরা নাহি যাব কেহ বরের নিকট।
চৌদিকে চরায় চক্ষু চাহে কটমট॥
আইহ বলে হের দেখ নারদের নাট।
উঠানে দাণ্ডাল্য বর যেন ইন্দ্রকাঠ॥
বরিব বার্ধক বর বল কোন্ সুখে।
সুতলি খুঁজিবে রাণী কোন্ কোন্ মুখে॥

কয় হাতে অঞ্জন পরাবে এক দিঠে।
হাত বাড়াইয়া পাব যদি উঠ উটে॥

হর-গৌরীর কোন্দলের বর্ণনায় নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের চিরন্তন দারিদ্র্যের চিত্রই অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একটি আশাহতা দুঃখিনী পত্নীর মর্মান্তিক অন্তর্বেদনার কি অপূর্ব ব্যঙ্গচিত্র কবি এখানে রচনা করিয়াছেন,—

শয়নে তোমার পাশে নিদ্রা নাহি হয় ত্রাসে
জটায় জলের কুলকুলি।
সাপের ফোঁস ফাঁস শুনি সাত পাঁচ মনে গুণি
পালাইতে পরম আকুলি॥
হস্ত পদ যদি নাড়ি চামড়ার খড় খড়ি
শয্যে সাপ করে ইলিমিলি।
এমত সুখের শয্যা ইতে পতি পরিচর্যা
যদি করে নারী তারে বলি॥
ভোলানাথ, আমি যেই তেঁই সে সম্বরি।
অন্যে সহে হেন তাপ স্বামীরে বলিয়া বাপ
পলাইত হৈয়া দিগম্বরী॥
ধ্যানে যদি পাও সুখ ক্ষণপ্রায় যায় যুগ
বলদের না মিলে আহার
জিয়ে পরমায় বলে ক্ষীরগুণে নাহি চলে
ভৃঙ্গি দেখ অস্থিচর্ম সার॥
যাও যদি ভিক্ষাটন ঘর হয় পাশরণ
কোচের নগরে নাটগীত।
কোচিনী ভুলাও তালে নাগরালি বুড়াকালে
লোকমুখে শুনি বিপরীত॥
উদয় করিতে ভানু কার্তিক পাতিয়া জানু
খাইবারে চাহে ছয় মুখে।
গণেশ তুলিয়া শুণ্ড ধায় প্রসারিয়া তুণ্ড
নন্দি নিত্য আছে শোষে ভোখে॥

বড়াই না কর বালু পাঁচ বর্ণে আন চালু
পাঁচ মুঠা বাঁটিতে না আঁটে।
মায়ে পোয়ে ঝুলি ঝাড়ি পাই কড়া দশ কড়ি
সেহ কাণা নাহি চলে হাটে॥

দারিদ্র-পীড়িত সংসারের গৌরবহীন গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিষয়বুদ্ধিহীন স্বামী লইয়া এ দেশের নারীগণ যে কি ভাবে সুখদুঃখের দিন যাপন করিয়া থাকে, রামকৃষ্ণের পার্বতী-চরিত্রের ভিতর দিয়া তাহারই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। রামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বাস্তবতার স্পর্শ ছিল।

রামকৃষ্ণের ভাষা মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্য-যুগের ভাষা, ইহা পূর্ববর্তী যুগের গ্রাম্যতামুক্ত হইয়া উচ্চতর কাব্যরচনার উপযোগিতা লাভ করিয়াছে। রামকৃষ্ণের রচনায় বৈষ্ণব কবিতার ভাষার প্রভাবও যথেষ্ট অনুভব করা যায়। তিনি বিষয়োপযোগী করিয়া সুললিত ব্রজবুলি ভাষায়ও কতকগুলি পদ রচনা করিয়া তাঁহার কাব্যমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

ছন্দের মধ্যেও তাঁহার বৈচিত্র্যসৃষ্টির প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। দৃঢ়সংবদ্ধ বর্ণনাত্মক রচনার অবকাশেও তিনি মধ্যে মধ্যে এই প্রকার গীতধর্মী সুললিত রচনার সন্নিবেশ করিয়াছেন; মেনকা উমাকে তপস্যায় বিরত হইবার জন্য পরামর্শ দিতে গিয়া বলিতেছেন—

তনু তোর যেন কাঁচ লুনি।
রৌদ্রে মিলাবে হেন জানি॥
স্বভাবে তুমি সে কমলিনী।
হিমপাতে হারাবে পরাণি॥
তপেরে না যাইয় মা গ উমা।
গলায় বান্ধিয়া থাকো তোমা॥
আধ অষ্ট বৎসর বএসে।
বনে যাবে কেমন সাহসে॥
কি বুদ্ধি জন্মিল তোর বাপে।
কি লাগি পঠায় তোমা তপে॥
শিবের কঠিন বড় সেবা।
সেবাতে মানাতে পারে কেবা॥
বর কি নাহিক ত্রিভুবনে।
তপস্যা করিবে কি কারণে॥

বয়স দেখিয়া দিব বরে।
বসাইব অদরিদ্র ঘরে॥

আরও একটি নিদর্শনের উল্লেখ করা যাইতেছে—

যত বিলাসিনী রচিল বেশ
বান্ধিল লোটন কুটিল কেশ
অলক তিলক অপরিশেষ
চিত্র বসন ওড়নি।
কনক মুকুর বদন কাঁতি।
বসন ভূষণ বিবিধ ভাতি
চলুনি বর বরটা পাতি
ভঙ্গিমা কর দোলনী॥

ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল রচনার একশত বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে বাংলা সাহিত্যে এই কাব্যভাষার জন্ম বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। অবশ্য ইহার উপর বৈষ্ণব কবিতার ভাষার প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ।

কবি রামকৃষ্ণের রচনায় পরবর্তী শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের আবির্ভাবের যে পূর্বাভাস সূচিত হইয়াছে, তাহা রামকৃষ্ণের নিম্নোদ্ধৃত রচনাংশ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যার রূপ বর্ণনার সঙ্গে রামকৃষ্ণের এই গৌরীর রূপ বর্ণনার তুলনা করা যাইতে পারে—

দেখিয়া কন্যার কেশ চমরী ছাড়িল দেশ
প্রবেশিল অরণ্য ভিতরে।
তাহাতে বিচিত্র বেণী দেখিয়া সঙ্কোচ ফণী
হস্ত পদ লুকাইল উদরে॥
সিন্দুর তিলক ভালে যেন অবস্থিতা কালে
সীমন্তে না দেখি তার রেখা।
দেখিয়া উজ্জ্বল রঙ্গ অরুণের উরুভঙ্গ
উড়িতে নাহিক আখা পাখা॥
অমরনাথ মালঞ্চে দেখিল কমলিনী।
কুন্দল কনক-কান্তি কুঙ্কুম কুসুম ভ্রান্তি

কি বর্ণিব সে বরবর্ণিনী।
ভ্রূযুগ কামান জনু অতনু লুকাইল ধনু
সম তাহে পাইয়া পরাভব।
নাসিকা গঠন দেখি লজ্জিত গরুড় পাখী
অভিমানে ভজিল মাধব॥
নেত্র দেখি ইন্দীবর প্রবেশিল সরোবর
কুরঙ্গিণী শৃঙ্গ নাহি বহে।
সফরী প্রবেশ জলে খঞ্জন উড়িয়া বুলে
কথো কাল নাহি দেশে রহে॥

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রভাব এই বর্ণনার মধ্যে কার্যকর হইলেও ইহার ভাষায় যে পারিপাট্য দেখা দিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া মঙ্গলকাব্য সৃজনযুগ অতিক্রম করিয়া ঐশ্বর্যযুগে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। এই কাব্যভাষার ধারা অনুসরণ করিয়াই পরবর্তী শতাব্দীতে শব্দশিল্পী ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের সাহিত্যিক বাংলা গদ্যের কোনও উল্লেখযোগ্য নিদর্শন আমরা এই পর্যন্ত লাভ করিতে পারি নাই বলিলেই চলে। দলিল কিংবা চিঠিপত্রে যে গদ্য ব্যবহৃত হইত, তাহা সাহিত্যিক ভাষার নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। 'শূন্যপুরাণে'র মধ্যেও যে গদ্যের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও তত্ত্বমূলক ও ধর্মবিষয়ক ; অতএব তাহাও সাহিত্যিক গদ্য নহে। সাহিত্যে গদ্য ব্যবহার করিবার রীতি তখনও প্রচলিত হয় নাই, অতএব সাহিত্যিক গদ্যের নিদর্শন কোথা হইতেও সন্ধান পাইবার কথাও নহে। কিন্তু রামকৃষ্ণের 'শিবায়নে'র মধ্যে মধ্যযুগের সাহিত্যিক গদ্যের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহাদিগকে 'বচনিকা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পয়ার ও ত্রিপদীর অবকাশে মধ্যে মধ্যে গদ্যের সহায়তার কোনও কোনও প্রসঙ্গের সূত্র নির্দেশ করা হইয়াছে। গীত বন্ধ রাখিয়া গায়েন এই অংশ গদ্যে পরিবেষণ করিত, ইহাকেই বচনিকা বলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্য দিয়া প্রায়ই এক বা একাধিক পূর্ণবাক্য ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহাই সে যুগের সাহিত্যিক গদ্যের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ইহাদের বিশেষ স্থান আছে বিবেচনা করিয়া ইহার সব কয়টি নিদর্শনই এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

১। ভাই রে নন্দি গিয়া শিবের সাক্ষাতে দুর্গার কেমত রূপ বলিতেছেন অবধান করহ॥

২। মহিষ পর্বত গিয়া পূর্বকল্পের কথা ক্রৌঞ্চকে কহিতেছেন অবধান করহ॥

৩। ভাই রে নারদের পরিহাসে মেনকা রোদন করিতেছেন এমত সময়ে কেমন স্ত্রীলিঙ্গ

দেবতা সকল আসিতেছেন অবধান করহ॥

৪। অতঃপর তারা প্রভৃতি দেবতারা সকল শিবের তরে প্রহেলিকা প্রবন্ধে গৌরীকে সমর্পণ করিয়া কথোপকাল যাপন করিয়া হরকে ইঙ্গিত করিতেছেন অবধান করহ॥

৫। পার্বতী ভাগীরথী স্নান করিতে গেলেন এতে সময়ে শঙ্কর মনের দুঃখ নারদকে কহিতেছেন অবধান করহ॥

শিবদুর্গার বিবাহানুষ্ঠান বর্ণনা-প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ নিজ পরিবারের মধ্যে প্রচলিত বিবাহ-প্রথারই একটি বিস্তৃত ও বাস্তব বর্ণনা দিয়াছেন। নানাদিক হইতে এই বর্ণনাটি বিশেষ মূল্যবান। ইহার মধ্যে একটি অধুনা-বিলুপ্ত সামাজিক প্রথার উল্লেখ আছে, তাহা আর কোনও মঙ্গলকাব্যের বিবাহ-বর্ণনায় পাওয়া যায় না—ইহা বাসরে এয়োগণকর্তৃক বরকে প্রহেলিকা জিজ্ঞাসা। যদিও প্রহেলিকা মঙ্গলকাব্যের একটি অপরিহার্য বিষয়, তথাপি বাসরগৃহে বরকে প্রহেলিকা জিজ্ঞাসা করিবার প্রসঙ্গ আর কোনও মঙ্গলকাব্যের কবি উল্লেখ করেন নাই। রামকৃষ্ণের এই প্রসঙ্গের উল্লেখ সুগভীর সামাজিক তাৎপর্যমূলক। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, বিবাহাচারে প্রহেলিকা জিজ্ঞাসা বাংলা ও বাংলার বাহিরে বিভিন্ন নিম্নজাতি ও উপজাতির সমাজে আজিও প্রচলিত আছে। ছোটনাগপুরের দ্রাবিড় ভাষাভাষী ওরাওঁ উপজাতির বিবাহ প্রথায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, বরপক্ষ কন্যাপক্ষের গ্রামের সীমানায় প্রবেশ করিবার পূর্বে তাহাকে কন্যাপক্ষীয়দের কতকগুলি প্রহেলিকার উত্তর দিয়া লইতে হয়, পশ্চিমবঙ্গের বাউরীদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। বাংলার উচ্চশ্রেণীর বিবাহের লৌকিক আচারসমূহের ভিত্তি যে বাংলা ও বাংলার প্রান্তবর্তী আদিম সমাজ, রামকৃষ্ণের এই প্রসঙ্গের অবতারণা হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায়। কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও কলিকাতার কোনও কোনও অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত সমাজের মধ্যেও বরপক্ষীয় ও কন্যাপক্ষীয়দিগের মধ্যে ধাঁধার জিজ্ঞাসা ও উত্তর শুনিতে পাওয়া যাইত। অতএব রামকৃষ্ণের এই প্রসঙ্গের অবতারণা যে তাঁহার ব্যক্তিগত কৌতুকবোধের কোনও ফল নহে,—বিস্তৃত সামাজিক অভিজ্ঞতারই পরিচায়ক, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

বিষয়গত সমৃদ্ধি এবং উচ্চ সাহিত্যগুণ থাকা সত্ত্বেও রামকৃষ্ণের শিবমঙ্গল কাব্য যে বাংলা সাহিত্যে এই বিষয়ে কোন নূতন ধারার প্রবর্তন করিতে পারে নাই, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহার প্রধান কারণ, রামকৃষ্ণ আত্মকেন্দ্রিক সাধক ছিলেন—জ্ঞান-সাধনা কিংবা সাহিত্য-সাধনা এই উভয় ক্ষেত্রেই তিনি বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিকা পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে ব্যক্তিগত নীতি ও রুচিবোধের উপর নির্ভর করিয়াছেন। তাঁহার যে ব্যক্তিগত জীবনেতিহাস পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতেই তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে। তিনি অভিজাত বংশের সন্তান, তাঁহার নীতি ও রুচিবোধের মধ্যেও সেইজন্যই আভিজাত্যের পরিচয় গোপন থাকিতে পারে নাই। কিন্তু

মঙ্গলকাব্য সাধারণ মানুষের জীবন-চিত্র—সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ আশানৈরাশ্য দ্বারা যেমন ইহা চিহ্নিত, তেমনই সাধারণ মানুষেরই নীতি ও রুচিবোধের অভিব্যক্তিতেই ইহা বাস্তব। অতএব যাঁহারা সাধারণ মানুষের জীবনবোধের সঙ্গে সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না, তাঁহারা সার্থক মঙ্গলকাব্য রচনা করিতে পারেন নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, রামকৃষ্ণ শিব-সম্পর্কিত সর্বাধিক জনপ্রিয় ও লৌকিক প্রসঙ্গ তাঁহার কাব্য হইতে পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তাহার পরিবর্তে ব্যক্তিগত জ্ঞানলব্ধ ও রুচিসম্মত বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়াই কাব্য রচনা করিয়াছেন; সেইজন্য তাঁহার কাব্য পরবর্তী কবিদিগের আদর্শরূপে গৃহীত হইতে পারে নাই। বিশেষত মঙ্গলকাব্যের দেব-চরিত্রের যাহা প্রধানতম বৈশিষ্ট্য, শিবমঙ্গলের শিব-চরিত্রের মধ্যে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। মঙ্গলকাব্যের দেব-চরিত্র মাত্রই অত্যন্ত সক্রিয়, কিন্তু পৌরাণিক শিব-চরিত্র নিতান্ত নিষ্ক্রিয়, ভক্তের সুখদুঃখে নির্লিপ্ত ও উদাসীন। রামকৃষ্ণ এই পৌরাণিক শিবকেই তাঁহার কাব্যের আদর্শ করিয়া লইয়াছিলেন, বাংলার জলবায়ুতে তাঁহার চরিত্র স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লন নাই। সেইজন্যই ইহা বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। তারপর মঙ্গলকাব্যের কাহিনীগত যে একটি আবেদন আছে, রামেশ্বরের শিবমঙ্গলের তাহা নাই—কোন কেন্দ্রীয় কাহিনীর অভাবে ইহার গতি অত্যন্ত শিথিল ও মন্থর, সেইজন্য ইহার আয়তন ইহার ভারস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। রামকৃষ্ণের পরবর্তী কালে যাঁহারা শিব-মঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার লৌকিক উপকরণগুলি বহুল সদ্ব্যবহার করিয়াছেন; সেইজন্যই তাঁহাদের কাব্য যে পরিমাণ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে, বামকৃষ্ণের কাব্য সেই তুলনায় তাহা কিছুই লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু রামকৃষ্ণের ভাষা মধ্যযুগের বাংলা কাব্যভাষার ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

শঙ্কর কবিচন্দ্র

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একাধিক বিষয় লইয়া কাব্য রচনা করিয়া যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর অঞ্চলের কবি শঙ্কর কবিচন্দ্র চক্রবর্তী অন্যতম। তিনি রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ ব্যতীত ও দুইখানি মঙ্গলকাব্য ও একখানি পাঁচালী রচনা করিয়াছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এত অধিক সংখ্যক গ্রন্থ অল্প কবিই রচনা করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার মঙ্গলকাব্য দুইখানির মধ্যে একখানি শিবমঙ্গল ও আর একখানি শীলতামঙ্গল। শিব-মঙ্গল রচনায় তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী কবি রামকৃষ্ণের পৌরাণিক ধারা অনুসরণ করিবার পরিবর্তে ইহার লৌকিক ধারাই অনুসরণ করিয়াছিলেন; সেইজন্যই তাঁহার কাব্য এই বিষয়ক তাঁহার পরবর্তী কবিদিগেরও পথ-প্রদর্শন করিয়াছে।

শঙ্কব কবিচন্দ্র মল্লভূমির অধিপতি রাজা বীরসিংহের আমলে আনুমানিক ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'শিবমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। তিনি বিষ্ণুপুরের অনতিদূরবর্তী পানুয়া নামক গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের সময় নির্দিষ্টভাবে জানিতে পারা

না গেলেও তিনি যে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। তিনি কবিচন্দ্র উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং ভণিতার নামের পরিবর্তে অনেক স্থলে এই উপাধিই ব্যবহার করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক জীবনেও তিনি উচ্চ মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন—বিবিধ প্রামাণ্য বৈষ্ণব গ্রন্থে তাঁহার সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র সার সংকলন করিয়া তিনি অনুবাদকাব্য রচনা করেন, তাহা 'ভাগবতামৃত' নামে বৈষ্ণব সমাজে শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হইত; এই সূত্রেই বৈষ্ণব সমাজে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আধুনিক কৃত্তিবাসী রামায়ণে অঙ্গদ রায়বার নামক যে অংশটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কবিচন্দ্র শঙ্করেরই রচনা।

দ্বিজ শঙ্কর কবিচন্দ্র তাঁহার শিবমঙ্গল কাব্যমধ্যে এই প্রকার ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন,

১। বীরসিংহ মহারাজা অবনীতে মহাতেজা
সদা মত ইষ্টের চরণে।
সংকীর্তন অভিলাষী তাঁহার দেশেতে বসি
দ্বিজ কবিচন্দ্রে রস ভণে॥

২। শিবের চরণ আশে শ্রীকবিচন্দ্র ভাষে
যারে কৃপা হৈল শূলপাণি॥

৩। শ্রীকবিশঙ্কর গায় হরপদ আশে।
যারে কৃপা কৈলে প্রভু আসি যোগিবেশে॥

৪। সুকবি শঙ্কর গান ভাবি ত্রিলোচন।
হরি হরি বল পাপ হোক্ বিমোচন॥

৫। বাগ্দিনীর কথা শুনি প্রভু দিল সায়।
হরপদ আশে দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়॥

দ্বিজ শঙ্কর কবিচন্দ্রের শিব-মঙ্গল কাব্যে 'মৎস্য ধরা পালা' ও 'শঙ্খ পরা পালা' নামক যে দুইটি পরিচ্ছেদ আছে, তাহা এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য। উভয় অংশই পুরাণবহির্ভূত লৌকিক বিষয় মাত্র। কিন্তু তিনি তাহা নিজের কাব্যের মধ্যে গ্রহণ করিয়া ইহার একটি লৌকিক আবেদন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শিবমঙ্গলের পরবর্তী কবিগণ তাঁহার এই ধারা অনুসরণ করিয়া বহুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার 'মৎস্য ধারা পালা'র বিষয়বস্তু এইরূপ—

শিব ভাগিনেয় ভীমকে সঙ্গে লইয়া মর্ত্যলোকে চাষ করিতে গিয়াছেন, আজ ছয় মাস যাবৎ তাঁহার কোন সংবাদ নাই। কৈলাসে পার্বতী আকুল হইয়া উঠিলেন; তারপর একদিন শিবকে স্বপ্নেও দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া তাঁহার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি

মর্ত্যলোকে তাঁহার অনুসন্ধানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পদ্মার পরামর্শে তিনি বাগ্দিনীর রূপ ধারণ করিয়া মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইলেন; তারপর শিবের কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া মাছ ধরিতে লাগিলেন। বাগ্দিনীকে দেখিয়া শিব মুগ্ধ হইলেন। তারপর বাগ্দিনী শিবকে ছলনা করিয়া কৈলাসে লইয়া আসিলেন। 'শঙ্খ পরা পালা'র মধ্যে পার্বতীর শঙ্খ পরিবার সাধ ব্যক্ত হইয়াছে; এই সম্পর্কিত লৌকিক ছড়া পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি।

কবিচন্দ্র শঙ্করের রচনা নিতান্ত সহজ ও সরল। তাঁহার বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোনও বিষয়েই তাঁহার পাণ্ডিত্যের অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য তাঁহার সহজ কবিত্ব বিকাশের পক্ষে কোনও অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তাঁহার 'ভাগবতামৃতে'র ভিতর দিয়া যেমন তিনি 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র দুরূহ সংস্কৃত শ্লোকগুলি অতি সহজ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহার শিবমঙ্গলের মধ্যেও তিনি প্রচলিত গ্রাম্য শব্দ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিয়া তাঁহার রচনার সরলতা রক্ষা করিয়াছেন। শিবমঙ্গলের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতেই তাহা প্রমাণিত হইবে—

সাক্ষাতে হইলা মাতা বাগ্দিনী বেশ।
সই সই বলি প্রভু হাসে ব্যোমকেশ॥
বিরলে শিবের সঙ্গে বঞ্চিলেন নিশা।
দেখিতে দেখিতে মূর্তি হইলা সুবেশা॥
শ্রুতিমূলে পিঠে দোলে দুই কাণে সোনা।
কপালে সিন্দূর সাজে নাকে নাকচনা॥
বাগ্দিনী বেশ করি উভ করি খোঁপা।
ফুলমালা তাথে শোভে সুবর্ণের ঝাঁপা॥
কান্ধেতে ঘুন্‌সিজাল ইসাদের বাড়ি।
পরিপাটি কান্ধে সাজে মৎস্যের চুপুড়ি॥
ঠমক করি দণ্ডাইল শিব পড়ে ভোলে।
সই সই বলি প্রভু করিলেন কোলে॥[১]

রামেশ্বর ভট্টাচার্য

শিব-কাহিনীর পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদান মিশ্রিত করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামেশ্বর চক্রবর্তী ভট্টাচার্য 'শিবায়ন' বা 'শিব-সংকীর্তন' নামে একখানি কাব্য রচনা

১। সা-প-প ৬১, পৃ ৫০

করেন।[১] শিবমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে ইহাই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।

রামেশ্বর তাঁহার রচিত কাব্যমধ্যে প্রাচীন রীতি অনুযায়ী এইভাবে নিজের পরিচয় দিয়াছেন,—

ভট্ট নারায়ণ মুনি সন্তান কেশরকোনি
যতি চক্রবর্তী নারায়ণ।
তস্য সুত কৃতকীর্তি গোবর্ধন চক্রবর্তী
তস্য সুত বিদিত লক্ষণ॥
তস্য সুত রামেশ্বর শম্ভুরাম সহোদর
সতী রূপবতীর নন্দন।
সুমিত্রা পরমেশ্বরী পতিব্রতা দুই নারী
অযোধ্যানগর নিকেতন॥
পূর্ব্ববাস যদুপুরে হেমৎসিংহ ভাঙ্গে যারে
রাজা রামসিংহ কৈল প্রীত।
স্থাপিয়া কৌশিকী তটে বরিয়া পুরাণ পাঠে
রচাইল মধুর সঙ্গীত॥

এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার কাব্যমধ্যে 'মেদিনীপুরাধিপতি' ও কর্ণগড়ের অধিবাসী রামসিংহের পুত্র যশোবন্ত সিংহের বিদ্যোৎসাহিতা ও শৌর্য-বীর্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। যশোবন্ত সিংহ রামেশ্বরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যশোবন্তের আদেশেই কবি 'শিব-সংকীর্তন' রচনা করেন।

তিনি লিখিয়াছেন—

রঘুসিংহ মহারাজা রঘুবীর সমতেজা
ধার্মিক রসিক রণধীর।
যাহার পুণ্যের ফলে অবতীর্ণ মহীতলে
রাজা রামসিংহ মহাবীর॥
তস্য সুত যশোবন্ত সিংহ সর্বগুণযুত
শ্রীযুত অজিত সিংহ তাত।

১। রামেশ্বর ভট্টাচার্য, 'শিবায়ন' (বঙ্গবাসী, ১৩১০)
রামেশ্বর গ্রন্থাবলী, পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত (১৯৬৪)

মেদিনীপুরের পতি কর্ণগড়ে অবস্থিতি
ভগবতী যাহার সাক্ষাৎ॥
রাজা রণে ভৃগুরাম দানে কর্ণ রূপে কাম
প্রতাপে প্রচণ্ড যেন রবি।
শক্রের সমান সভা জ্বলন্ত অনলপ্রভা
সুবেষ্টিত পণ্ডিত সৎ কবি॥
দেবীপুত্র নৃপবরে স্মরণে পাতক হরে
দরশনে আনন্দ বর্ধন।
তস্য পোষ্য রামেশ্বর তদাশ্রয়ে কর্য্যা ঘর
বিরচিল শিব-সংকীর্তন॥

রামেশ্বরের পূর্বনিবাস মেদিনীপুর জিলার মধ্যে ঘাঁটালের নিকটবর্তী বরদা পরগণার অন্তর্গত যদুপুর গ্রাম। বর্ধমানের শোভাসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমৎ সিংহ কর্তৃক তিনি সেই গ্রাম হইতে কোন কারণে বিতাড়িত হইয়া সেই জেলারই অন্তর্গত কর্ণগড় নামক স্থানের তৎকালীন রাজা রামসিংহেব আশ্রয়ে চলিয়া আসেন।

পূর্ব্ববাস যদুপুরে হেমৎসিংহ ভাঙ্গে যারে
রাজা রামসিংহ কৈল প্রীত।
স্থাপিয়া কৌশিকী তটে বরিয়া পুরাণ পাঠে
রচাইল মধুর সঙ্গীত।

অল্পকাল মধ্যেই রামসিংহ পরলোকগমন করেন, তখন যশোবন্তসিংহ রাজা হন। বিদ্যোৎসাহী রাজা যশোবন্তসিংহ রামেশ্বরকে শিব-সংকীর্তন কাব্য রচনায় নিয়োজিত করেন। রামেশ্বর একখানি 'সত্যপীরের পাঁচালী'-ও রচনা করিয়াছিলেন। যদুপুরে বাসকালীনই ইহা রচিত হয় বলিয়া জানিতে পারা যায়।

'শিব-সংকীর্তন' রচনার কাল সম্বন্ধে কবি যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, পাঠদুটির জন্য তাহার অর্থ উদ্ধার করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে; তাহা এই,—

'শকে হল্য চন্দ্রকলা রাম করতলে।
বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥
সেইকালে শিবের সঙ্গীত হইল সারা।'

স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, 'রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নের ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং শিবায়ন ঐ সময়ের পূর্বেই

রচিত হইয়াছিল।'[১]

কবির প্রতিপালক রাজা যশোবন্তসিংহের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ১৬৫৬ শকে বা ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া ঢাকায় যান।[২] এই দেওয়ানি গ্রহণের পূর্বে যশোবন্ত সিংহ মুর্শীদকুলি খাঁর অধীনে বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি সহ চাকুরি করিতেন। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে মুর্শীদকুলি খাঁর অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিবার পূর্বেই তাঁহার নিজ জমিদারী মেদিনীপুরে বাসকালে 'শিব-সংকীর্তন' গ্রন্থ রচিত হয়। তাহা হইলে ১৬৫৬ শকের ১৫।২০ বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থ রচিত হওয়ার সম্ভাবনা। রামেশ্বরের শিব-সংকীর্তন গ্রন্থ যখন একশত বৎসর পূর্বে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়, তখন উপরি-উদ্ধৃত পদগুলির নিম্নে তাহাদের টীকা-স্বরূপ ১৬৩৪ শকাব্দের উল্লেখ করা হইয়াছিল। অবশ্য উদ্ধৃত পদ সমষ্টি হইতে এই কাল কিভাবে নির্ণয় করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তবে একশত বৎসর পূর্বে গ্রন্থ-সম্পাদক গ্রন্থ রচনার কাল সম্বন্ধে যে সময়ের নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি সম্ভবত কোনও অনুসন্ধানের ফলেই জানিতে পারিয়াছিলেন। এই ১৬৩৪ শকাব্দের সঙ্গে রাজা যশোবন্তের মেদিনীপুর বাসের পূর্বোক্ত আনুমানিক সময় তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এই সময়ই অর্থাৎ ১৬৩৪ শকাব্দ (১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ) কিংবা তাহার সন্নিকটবর্তী কোন সময়ে এই গ্রন্থ রচিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব নহে। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, '১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা যশোবন্তসিংহ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন এবং সেই সময়ই শিবায়ন গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়া তাঁহার রাজসভায় পঠিত হয়।'[৩]

যশোবন্তের রাজধানী কর্ণগড় মেদিনীপুর শহর হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্তী। এখনও তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, এইখানে যশোবন্ত-প্রতিষ্ঠিত মহামায়ার মন্দির ছিল, তাহাতেই কবি রামেশ্বর যোগাসনে বসিয়া শিবমন্ত্র জপ করিতেন।

রামেশ্বরের কাব্যের প্রকৃত নাম 'শিব-সংকীর্তন'। গ্রন্থমধ্যে ইহাকে কোথাও 'শিবায়ন' বা 'শিব-মঙ্গল' বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু তথাপি ইহা মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ প্রত্যেক দিনের দুই পালা করিয়া আটদিনের ষোল পালায় স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বিভক্ত। অন্যান্য বিষয় বিচার করিলেও ইহাতে মঙ্গলকাব্যের প্রায় সকল লক্ষণই বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ মেদিনীপুর অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত এবং সেখানে সর্বত্র ইহা 'শিবায়ন' নামেই প্রসিদ্ধ। রামায়ণের প্রভাববশতঃ ইহার নাম 'শিবায়ন' হইয়াছে।

১। দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৩৯১), ১৩৯৩

২। রামগতি ন্যায়রত্ন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৩৪২), ১৩০; কিন্তু এই তারিখ কোথা হইতে জানিতে পারা গেল, তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৩। রামেশ্বর রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

রামেশ্বরের 'শিবায়ন' বিগত শতাব্দীতেই বটতলায় মুদ্রিত হইয়া বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। এমন কি, হরিচরণ আচার্য নামে অত্যন্ত আধুনিক কালের একজন কবিও রামেশ্বরেরই পথানুসরণ করিয়া 'শিবায়ন' নামে একখানি কাব্য রচনা করিয়াছেন; তাহাতে তিনি এই প্রকার ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন,

'শ্রীহরিচরণ করিল রচন
রামেশ্বর পদ-স্মরণে।'[১]

কবি রামেশ্বর তাঁহার কাব্যের ভণিতায় বলিয়াছেন,

'যশোবন্ত সিংহে দয়া কর হরবধূ।
রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু॥'

আবার কোথাও বলিয়াছেন,

'ভব ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর।'

কিন্তু তিনি তাঁহার নিজের রচনাকে মধুক্ষরা ও ভদ্রকাব্য বলিয়া যে কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত করিয়াছেন তাহা তাঁহার কাব্যের নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

লেখকের সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তাহারই ফলে বাংলার অপ্রচলিত বহু সংস্কৃত শব্দ যোজনা দ্বারা তিনি কাব্যমধ্যে বহু অনুপ্রাস সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছেন। এই সকল অনুপ্রাস অধিকাংশ সময়েই কষ্টসৃষ্ট বলিয়া শ্রুতি সুখাবহ হয় নাই, যেমন,—

'ভাত নাই ভবনে ভবানী বাণী বাণ।
চমৎকার চন্দ্রচূড় চণ্ডীপানে চান॥
পদ্মাবতী পার্বতীকে প্রবোধিয়া আনে।
প্রাণনাথে কি প্রকারে ভেটিব সেইখানে॥
জলহীন যেন মীন শিবহীন শিবা।
ভণে রামেশ্বর ভবে ভাবি রাত্রিন্দিবা॥'

পৌরাণিক কাহিনীর বর্ণনার অনেক স্থলেই কবি সংস্কৃত পুরাণাদি, এমন কি, কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' প্রভৃতিও—বাংলায় অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। ভাষার দিক দিয়া এই পৌরাণিক অংশ অনেকটা আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শিবের লৌকিক কাহিনীর অংশ রচনায় কবিকে সংস্কৃত আদর্শের অভাবে সর্বত্রই নিজের মৌলিক কল্পনা ও রচনা-শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে লেখকের একটি সরল কবি-চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। শেষোক্ত চিত্রগুলি নিতান্ত বাস্তবধর্মী বলিয়া ইহাদের মধ্য হইতে গ্রাম্যতার ভাব

১। হরিচরণ আচার্য, 'শিবায়ন' (বসুমতী, কলিকাতা ১৩৩৮)

সম্পূর্ণ দূর হইতে পারে নাই ; তাহা প্রকৃতপক্ষে শৈব কৃষকেরই গান। সেইজন্যই বলিতেছিলাম, তাঁহার রচনা যেমন 'মধুক্ষরা'-ও নহে তেমনি আবার 'ভদ্রকাব্য' বলিয়াও দাবী করিতে পারে না। তবে পৌরাণিক কাহিনীর অংশ চরিত্র-সৃষ্টি ও রচনার দিক দিয়া বৈশিষ্ট্যবর্জিত হইলেও লৌকিক কাহিনীর অংশ এই সকল বিষয়ে কতকটা উল্লেখযোগ্য।

পার্বতীর গৃহস্থালী বর্ণনায় কবি একটি দরিদ্র বাঙালী পরিবারের সুন্দর আলেখ্য চিত্রিত করিয়াছেন। ইহাতে দেব-চরিত্রগুলি দেবত্ব-বর্জিত হইয়া সাধারণ লোভক্ষুধাতুর মনুষ্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। শিবের ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল রন্ধন করিয়া পার্বতী উপবাসী স্বামিপুত্রকে পরিবেষণ করিতেছেন। এই চিত্রটির মধ্যে একটি চিরদরিদ্র এবং লোভী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পরিবারের পরিচিত চিত্রই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, —দেবমহিমার বিন্দুমাত্র অস্তিত্বও ইহাতে অনুভূত হইবে না—

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটি সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি॥
তিন জন একুনে বদন হইল বার।
গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার॥
তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়॥
দেখি দেখি পদ্মাবতী বসি একপাশে।
বদন বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে॥
সুক্ত খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাক।
অন্ন আন অম্ল আন রুদ্র মূর্তি ডাকে॥
কার্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য হয়ে খা॥
মুষগ মায়ের বোলে মৌনে হয়ে রয়।
শঙ্কর শিখায়ে দেয় শিখিধ্বজ কয়॥
হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে।
ঈষদুষ্ণ সূপ দিল বেশরির পরে॥
শঙ্কর বলেন শুন নগেন্দ্রের ঝি।
সূপ হইল সাঙ্গ আন আর আছে কি॥
দড় বড় দেবী এনে দিল ভাজা দশ।

খেতে খেতে গিরিশ গৌরীর গান যশ॥

একজন আধুনিক সমালোচক উল্লিখিত চিত্র হইতে কবির হাস্যরস সৃষ্টিনৈপুণ্যের সন্ধান পাইয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে কবির একটি অসচ্ছল গার্হস্থ্য জীবনের বাস্তবচিত্র অঙ্কনের নৈপুণ্যই অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছে।

ভিক্ষুকের গৃহে নিত্য অভাব এবং এই অভাবকে কেন্দ্র করিয়াই দাম্পত্য জীবনেও নিত্য-অশান্তি ঘনাইয়া থাকে। ইহাই হরগৌরীর কোন্দলরূপে কবি প্রকাশ করিয়াছেন। দরিদ্র স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর দীনতম আকাঙ্ক্ষাটি পূর্ণ করাও যে কত কষ্টকর, কবি রামেশ্বর পার্বতীর শঙ্খ পরিধানের আকাঙ্ক্ষার লৌকিক কাহিনীটি অবলম্বন করিয়া তাহা অতি সহজ সমবেদনার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। স্বামীর নিকট সধবা রমণীর দীনতম দাবি একজোড়া শাঁখা। তাহাও দরিদ্র স্বামীর যোগাইবার সামর্থ্য নাই। দুঃখ-দারিদ্র্য-পীড়িত বাংলার নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের ইহা নিত্য অনুভূতির বিষয়।

অসচ্ছল সংসারের একজন গৃহিণীর স্বামীর কাছে দুইগাছি শঙ্খ প্রার্থনার যে চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার দরিদ্র নারী-চরিত্র পরিকল্পনায় সার্থকতার পরিচায়ক—

প্রণমিয়া পার্বতী প্রভুর পদতলে।
রঙ্কিনী সে রঙ্কনাথে শঙ্খ দিতে বলে॥
গদ গদ স্বরে হরে করে কাকুর্বাদ্।
পূর্ণ করে পশুপতি পার্বতীর সাধ॥
দুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেহ দুটি বাই।
কৃপা কর কান্ত আর কিছু নাহি চাই॥

তারপর পার্বতী পশুপতির নিকট তাঁহার জীবনের একটি অতি গোপন দুঃখের কথা প্রকাশ করিলেন, এ কথা ত একমাত্র স্বামী ছাড়া আর কাহারও নিকট খুলিয়া বলিবার নহে; এ যে কত বড় লজ্জা, তাহা নারী ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিবেও না,—

লজ্জায় লোকের মাঝে লুকাইয়া রই।
হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই॥

হাত দুইটি শূন্য, সেইজন্য লোকের মাঝখানে গিয়াও হাত নাড়া দিয়া একটি কথা বলিতে পারি না। নারী হইয়া এই দুঃখ কি করিয়া সহ্য হয়!

কিন্তু ভোলানাথ পারিবারিক সুখদুঃখে নির্বিকার, তথাপি রসনার ধার তাঁহার কিছুমাত্র কম নহে। তিনি বলিলেন,

ভিখারীর ভার্যা হয়ে ভূষণের সাধ।
কেন অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ॥

বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে॥

অক্ষয় স্বামীর মুখ হইতে এই অন্যায় গঞ্জনা লাভ করিয়া সর্বংসহা পত্নীও ধৈর্যহারা হইয়া গেলেন,

একথা ঈশ্বরী শুনি ঈশ্বরের মুখে
শূন্য হইল সব যেন শেল মাইল বুকে॥

তিনি তৎক্ষণাৎ সন্তান দুইটিকে সঙ্গে করিয়া দুঃখে দারিদ্র্যে বাঙ্গালী বধূর শেষ আশ্রয়স্থল পিতৃগৃহে রওয়ানা হইলেন। ভোলানাথ সহসা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন, তারপর 'ভায়ের কিরা', 'বাপের কিরা' দিয়া ক্রুদ্ধা পত্নীকে কোনমতে নিজের গৃহবাসে ফিরাইয়া আনিলেন।

এই সকল চিত্রের মধ্যে কবিচিত্তের একটি সহজ আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবের সঙ্গে এই সকল চিত্রের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ; সুদূর আদর্শলোক অপেক্ষা প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বাস্তব-লোকই কবির উপজীব্য ছিল। সেইজন্য বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়ও ইহা অতি সহজেই স্পর্শ করে। এই সকল দিক দিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, রামেশ্বরের মধ্যে সরল কবিপ্রাণতার অভাব ছিল না, কিন্তু তাহা তাঁহার কাব্যের পৌরাণিক অংশ রচনায় আদর্শ ও ভাষা এই উভয়ের দিক দিয়াই সংস্কৃতের প্রভাবে সম্পূর্ণ আড়ষ্ট হইয়া আছে এবং মৌলিক অংশ রচনাও সকল প্রকারে গ্রাম্যতা-যুক্ত হইতে পারে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাষার পরিচ্ছন্নতা তাঁহার রচনায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

দ্বিজ কালিদাস

দ্বিজ কালিদাস রচিত 'কালিকা-বিলাস' কাব্যখানিও শিবমঙ্গল কাব্যের অন্তর্ভুক্ত।[১] যদিও কাব্যখানির নাম 'কালিকা-বিলাস', তথাপি কালিকা কিংবা কালীর সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। সম্ভবতঃ গ্রন্থকারের নাম কালিদাস ছিল বলিয়া তাঁহার কাব্যের তিনি এই প্রকার নামকরণ করিয়াছেন।

কবির সময় সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে ইহার মধ্যে নানা বিষয়ে আধুনিকতার যথেষ্ট প্রভাব আছে। তথাপি ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর পরবর্তী রচনা নহে বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার মধ্যে কবি রামপ্রসাদ সেনের প্রভাব অনুভূত হয়।

দ্বিজ কালিদাস পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার রচনার বহু অংশ কালিদাস রচিত 'কুমার-সম্ভবম্' কাব্যের ভাবানুবাদ বলিয়া মনে হইবে; এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত পুরাণ হইতেও বহু অংশ তিনি তাঁহার কাব্যমধ্যে অনুবাদ করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

১। ব-সা-প ১, ১৩৭—৫৫

বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের মূলে তাঁহার একটি সুগভীর সহানুভূতি ছিল, তাহাই তাঁহার আগমনী বিজয়ার গানগুলি রচনায় সার্থকতা দান করিয়াছে। বহু হস্তস্পর্শে বটতলা হইতে পুনঃপুনঃ প্রকাশের ফলে দ্বিজ কালিদাসের অকৃত্রিমতা বহুলাংশে বিনষ্ট হইয়াছে; অতএব তাঁহার বর্তমান কোনও রচনা হইতে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করা দুঃসাধ্য।

দ্বিজ মণিরাম

দ্বিজ হরিহরের পুত্র দ্বিজ মণিরাম 'বৈদ্যনাথ-মঙ্গল' নামক একখানি শিবলিঙ্গ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।[1] তিনি অধিকাংশ স্থলে 'সুন্দর রায়', 'সুন্দর দ্বিজ' ও একবার 'সুন্দর রাম' ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। মনে হয়, দ্বিজ সুন্দর তাঁহার নামান্তর ছিল। কোন কোন পুঁথির পাঠে 'সুন্দর রায়' স্থলে 'শঙ্কর রায়' ও 'সুন্দর দ্বিজ' স্থলে 'শঙ্কর দ্বিজ' পাঠ দেখিয়া কেহ কেহ শঙ্কর নামক একজন স্বতন্ত্র কবির অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছেন; কিন্তু ইহা লিপিকর-প্রমাদ বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে, সুন্দরই লিপিকর-প্রমাদে শঙ্কর হইয়াছেন, বস্তুতঃ শঙ্কর নামক 'বৈদ্যনাথ-মঙ্গল' রচয়িতা স্বতন্ত্র কোনও কবি ছিলেন না। মণিরামের কাব্যের মোট ১১ খানি পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ৯ (নয়) খানি পুঁথিই শ্রীহট্ট জেলা হইতে আবিষ্কৃত। অতএব তিনি শ্রীহট্ট অঞ্চলেরই লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। এতদ্ব্যতীত কবির আর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

মণিরাম তাঁহার কাব্যরচনার কোনও কাল নির্দেশ করিয়া যান নাই। তবে তাহার ভাষা ও কাব্যোক্ত অন্যান্য বিষয় বিচার করিয়া তাঁহাকে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী লোক বলিয়া মনে হয় না।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেওঘরের বৈদ্যনাথ শিবের কাহিনীই তাঁহার বর্ণিতব্য বিষয়। কিন্তু তিনি নিজে কখনও বৈদ্যনাথধামে যাইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই,—

প্রভুর মহিমা শুনি মনে লাগে সুখ।
চক্ষু ভরি না দেখিনু হেন চন্দ্রমুখ॥

তাঁহার এই কাব্যে বৈদ্যনাথের মহিমাজ্ঞাপক মোট ছয়টি কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম কাহিনীটি শিবপুরাণের অন্তর্গত 'জ্ঞান-সংহিতা'র বৈদ্যনাথোৎপত্তি-বর্ণন' অংশ হইতে গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য ইহার সঙ্গে কিছু কিছু প্রচলিত জনশ্রুতিরও সংমিশ্রণ হইয়াছে। ইহার পর এক কাব্যে যথাক্রমে 'মন্ত্রবীর্য' নামে এক ওঝার কাহিনী, মুনিব্রহ্ম নামক এক রাজা ও তাঁহার রোগমুক্তির কাহিনী, সন্দক নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বৈদ্যনাথের বরে অর্থলাভের কাহিনী এবং সর্বশেষে এক অন্ধ ব্রাহ্মণীর বৈদ্যনাথের বরে দৃষ্টিশক্তি পুনর্লাভের কাহিনী বর্ণিত

১। স-প-প ৪, ৩৩৮

হইয়াছে। কাহিনীগুলির মধ্যে বৈদ্যনাথের যে গুণকীর্তন করা হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি প্রধানতঃ রোগাপহারক, একস্থলে মাত্র ধনদাতা। তিনি অন্ধতা ও কুষ্ঠরোগ দূর করিয়া থাকেন, যথা—

অন্ধরোগী জরা ব্যাধি কুষ্ঠেত বিখ্যাত।
দরশন মাত্রে মুক্ত করে জগন্নাথ॥

সাধারণতঃ রোগ, বিশেষতঃ অন্ধতা ও কুষ্ঠ দূর করিবার ক্ষমতা একমাত্র সূর্য দেবতারই দেখিতে পাওয়া যায়, এই সম্পর্কে এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। অতএব মনে হয়, বৈদ্যনাথ পূর্বে সূর্য দেবতাই ছিলেন, পরে শৈব ধর্মের প্রভাববশতঃ তিনি বৈদ্যনাথ বা শিবরূপেই পরিণতিলাভ করিয়াছেন।

বিনয়লক্ষ্মণ

শিবায়ন কাব্যশাখায় বিনয়লক্ষ্মণের 'শিবের গীত' একটি সংযোজন। বিনয়লক্ষ্মণের নাম পূর্বে শোনা যায় নাই। অধুনা-আবিষ্কৃত তাঁহার কাব্যটি হইতে কবির ব্যক্তি পরিচয় সামান্যই জানা যায়। প্রাপ্ত পুঁথির আদ্যন্ত খণ্ডিত থাকায় কবির আত্মপরিচয়জ্ঞাপক কোনও শ্লোক পাওয়া যায় নাই, গ্রন্থরচনার কালও অজ্ঞাত।

বিনয়লক্ষ্মণ নামটি লইয়া সন্দেহের অবকাশ আছে। অনুমান হয়, কবির প্রকৃত নাম লক্ষ্মণদেব, ভণিতায় এই নাম ৭ বার ব্যবহৃত হইয়াছে। কবি বিনয়বশতঃ লিখিতে চাহিয়াছে — 'বিনয়ে লক্ষ্মণ গায়' বা 'বিনয়ে লক্ষ্মণ বলে'। লিপিকরপ্রমাদে তাহাই হইয়াছে বিনয়লক্ষ্মণ।

কবি লক্ষ্মণদেব জাতিতে দ্বিজ। কাব্যের প্রমাণে বা ভণিতাংশ হইতে তাঁহাকে ঐকান্তিক শিবভক্ত বলিয়াই মনে হয়। কবির নিবাস সম্পর্কে জানা যায়—

'পুষ্পগ্রামে ঘর বটে জাহ্নবীর তীরে'।

লক্ষ্মণের কাব্যটি মঙ্গলকাব্যজাতীয় পালাবদ্ধ সুবৃহৎ কোনও রচনা নয়। বরং এদেশে বহুকাল হইতে লৌকিক শিব-গীতিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে আভাস পাওয়া যায়, ইহা তাহারই একটি সুগ্রথিত কাব্যরূপ। পুরাণানুসরণ পরিত্যাগ করিয়া লোকায়ত শিবকথাকেই কবি স্বকীয় কল্পনায় বিশিষ্টতা দান করিয়াছেন। কাব্যের কাহিনীটি এই—

একদিন হিমালয়দুহিতা পার্বতী পূজার ফুল সংগ্রহ করিতে আসিয়া পথিমধ্যে তাঁহার রূপে কামোন্মাদ চারিজন দৈত্যের উপযুক্ত শাস্তিবিধান করিলেন। পরে শিবের মালঞ্চে প্রবেশ করিয়া তিনি নানা পুষ্প চয়ন করিলেন এবং সরোবরে স্নান করিয়া ভক্তিভরে শিবার্চনা করিলেন। কিন্তু শিবের আগমন সম্ভাবনা বুঝিয়া পার্বতীর অশোক পত্রে

১। স প প ২৭ ৬৮

আত্মগোপন করা ছাড়া উপায় রহিল না। দৈত্যদের মুখে পার্বতীর অপরূপ রূপের কথা শুনিয়া বৃষবাহন মহেশ্বর নন্দী-ভৃঙ্গীর সঙ্গে আসিয়া অশোকতলে উপস্থিত হইলেন। পার্বতীর সঙ্গে তাঁহার গন্ধর্বমতে বিবাহ হইল এবং উভয়ের মিলন হইল। রাত্রি অবসানে শিবের নিকট বিদায় লইয়া পার্বতী পিতৃগৃহে ফিরিলেন। কিন্তু মুনিগণ তাঁহার সতীত্ব সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করিলেন। শিবের কৃপায় পার্বতী একের পর এক সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন; সর্বশেষে জতুগৃহ-পরীক্ষায় তাঁহার মহিমা নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হইল।

এইদিকে শিবের বাসনা তখনও চরিতার্থ হয় নাই। তিনি ভিখারীর বেশে হিমালয়-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মেনকার নিকট তাঁহার কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন। ছদ্মবেশী শঙ্করকে মেনকা কোনও উপায়েই নিরস্ত করিতে পারিলেন না। সুতরাং বিবাহের আয়োজন শুরু হইল। বলা বাহুল্য, জটাধারী সর্পবিভূষণ জামাতাকে দেখিয়া মেনকার দুঃখের অন্ত রহিল না। তাহার উপর আবার নারদের রঙ্গে শিব দিগম্বর হইলে বিবাহ সভায় তুমুল আলোড়ন উঠিল। অবশেষে দুর্গার অনুরোধে শিব সুবেশ ধারণ করিলেন। তাঁহার রূপের আভায় চারিদিক আলোকিত হইল। হৃষ্টচিত্তে গিরিরাজ তাঁহার কন্যাকে শিবের হাতে সমর্পণ করিলেন। হরগৌরীর আনন্দের সীমা রহিল না।

উল্লিখিত কাহিনীতে স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়, প্রথমাংশটি কবির মৌলিক পরিকল্পনার ফল। পার্বতীর সতীত্ব-পরীক্ষার ব্যাপারটিও অভিনব সন্দেহ নাই। তবে কাব্যের শেষাংশে শিবের বিবাহ-বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক রীতিকেই স্মরণ করায়।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, পৌরাণিক কাহিনী অনুসরণ না করিলেও পার্বতী এবং মহেশ্বরের দেবত্ব সম্পর্কে পৌরাণিক সংস্কার কবি বর্জন করেন নাই। কাব্যের সূচনাতে পার্বতীর মধ্যে আমরা পৌরাণিক দৈত্যদলনী রূপটিই প্রত্যক্ষ করি—

'চারি দৈত্যের চারি কথা শুনি ভগবতী।
দশভুজা হইল মাতা প্রচণ্ডা মূরতি॥
ভৈরবী গর্জন মাতা দশন কড়মড়ি।
দশ হস্তে অস্ত্র ধরে হেমন্ত ঝিআরি॥
জটা পিঙ্গল মায়ের নয়ান পিঙ্গল।
ঝলকে ঝলকে মুখে উগারে অনল॥'

এই পৌরাণিক দেবীকেই তাঁহার ভয়ংকরী রূপ হইতে মুক্ত করিয়া মুনিমনোমোহিনীরূপে কবি হিমালয়গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

লক্ষ্মণদেব বিদগ্ধ কবি ছিলেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার কাব্যভাষা গ্রাম্যতামুক্ত। ভাব ও ভাষাগত রুচিহীনতাকে কবি প্রশ্রয় দেন নাই। গৌরীর রূপ বর্ণনায় তিনি সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন। যেমন—

'জিনিএঞা কেশরী মাজ কি কব অদ্ভুত সাজ

ভুবনমোহন শঙ্খধারী

অঙ্গুলি চম্পক জিনি পুষ্প হেতু মালিনী

উর্বশী সমান সেই নারী।

রাজহংসগতি জায় মরাল নূপুর পায়

চলিতে মধুর শব্দ শুনি।'

রূপবর্ণনায় শিবায়নের কবি রামকৃষ্ণ রায়ের সঙ্গে তাঁহার তুলনা করা চলে। ছন্দের ক্ষেত্রে তিনি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে পারেন নাই; প্রচলিত পয়ার এবং ত্রিপদীই তাঁহার কাব্যবাহন। কিন্তু গতানুগতিক ছন্দের মধ্যেও লক্ষ্মণদেবের কবিত্বের আভিজাত্যটুকু ধরা পড়ে। রামকৃষ্ণ রায়ের ভাষার মধ্যে যদি আমরা মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যযুগের সন্ধান পাইয়া থাকি, তবে কবি লক্ষ্মণদেবও সেই কাল হইতে অধিক দূরবর্তী নহেন।

শেখ চান্দ

মধ্যযুগে যখন মুসলমান শাসন এদেশে প্রচলিত ছিল, তখন বহু মুসলমান কবি হিন্দু পুরাণের বিষয়বস্তু লইয়া যে সকল কাব্য রচনা করিয়া তাঁহাদের উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কবি শেখ চান্দ অন্যতম। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 'হরগৌরী-সংবাদ' নামে একখানি যোগশাস্ত্র সম্পর্কিত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সেই পুঁথির একটি অনুলিপি বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত হইয়াছিল। বইখানির বিষয়বস্তু হইল—গৌরীর অনুরোধে শিব যোগশাস্ত্র ব্যাখা করিয়া তাঁহাকে বুঝাইতেছেন। পুঁথিখানির অনুলিপিকারকও মুসলমান; তাঁহার নাম 'শ্রীফকির সিং' বলিয়া উল্লেখ করা আছে। তবে ফকির সিং হিন্দুর নাম হওয়াও অসম্ভব নয়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবি শেখ চান্দের নাম পরিচিত নয়, তবে তিনি আর কোনও হিন্দুধর্ম-বিষয়ক কাব্য রচনা করেন নাই। তিনি 'রসুল বিজয়', 'শাহদৌলা পীর' বা 'তালিব নামা' নামে দুইখানি মুসলমান ধর্মবিষয়ক বই রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু যোগশাস্ত্রবিষয়ক তাঁহার একমাত্র কাব্যই 'হরগৌরী-সংবাদ'। তাঁহার গ্রন্থের সূচনাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। সেইজন্য একটু অংশ উদ্ধৃত করি। আরম্ভ —

নমো মহেশায় নমঃ।

অথ হরগৌরী সংবাদ লিখ্যতে॥

প্রথমে প্রণাম করি সৃষ্টি অধিকার।

স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আদি সৃজন যাহার॥

হস্ত পদ নাহি তার নাহিক মস্তক।

ছায়া কায়া নাহি রাখে পতিত বারক॥
জনম না হইয়াছে তাহার নাহিক মরণ।
ই তিন ভুবনে তার অঘট লিখন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন আদি দেবা।
এ' তিনে না পাইল অন্ত, আর পাবে কেবা॥
ধরিতে না মুষ্টি ভজিতে নাহি অঙ্গ।
চিনিতে না পারে সে যে সদাএ যাবে সঙ্গ॥

এইবার কবি দেব-বন্দনা করিতেছেন—

ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাশন।
ত্রিশ কোটি দেবগণ বন্দো জনে জন॥
চন্দ্র সূর্য প্রণমোহ্ অষ্ট লোকপাল।
আকাশ পৃথিবী বন্দো সপ্ত পাতাল॥
দেব ঋষি নর ঋষি সিদ্ধা সাধু জন।
ব্যাস বৃহস্পতি বন্দো যত মুনিগণ॥
প্রণমোহ্ মহামায়া জগত জননী।
জাহ্নবী যমুনা বন্দো সলিল বাহিনী॥
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দো হরের কুমারী।
অষ্ট সিদ্ধা প্রণমোহ পুরাণ উয়ারি॥
ইত্যাদি যতেক দেব কবিলাম বন্দন।
হরগৌরী সংবাদ কিছু শুনহ্ শ্রবণ॥

তারপর কবি নিজের নাম এইভাবে ভণিতায় ব্যবহার করিয়াছেন।

যোগ সাধন-তত্ত্ব শুনহ্ সানন্দে।
মহেশ গৌরীর বরে ভণে হীন চান্দে॥

বইখানির আদ্যোপান্ত মহাদেবের মুখে যোগশাস্ত্রের কথা কীর্তিত হইয়াছে। যোগশাস্ত্রের সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বর্ণনায় মুসলমান কবি কোথাও অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, এ'কথা কেহ মনে করিতে পারিবেন না। অথচ সর্বত্রই সহজবোধ্য তত্ত্বকথাও পয়ার ছন্দে সহজ ভাষায় রচিত হইয়াছে।

সামান্য উদ্ধৃত করি—

পবনের গুরু শূন্য শূন্যের গুরু নির্গুণ।
হৃদয়ের গুরু ভুবন, মনের গুরু লজ্জা॥
প্রাণের গুরু ভাব ভক্তি, জিহ্বার গুরু সত্য।
অজ্ঞানের গুরু জ্ঞান, জ্ঞানের গুরু ধ্যান॥

ইত্যাদি সকলই যোগশাস্ত্রের কথা।

এই পুঁথিটি চট্টগ্রামের প্রাচীন পুঁথি-সংগ্রাহক মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। ত্রিপুরা জিলায় কবির বাস ছিল বলিয়া মনে করা হইয়াছে। দেখা যায়, কবি শেখ চান্দ মুসলমান ধর্মবিষয়ক আরও দুইখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'শাহাদৌলা পীর' নামক বই হইতে জানা যায়, তিনি ফকির অথবা দরবেশ ছিলেন। তাঁহার রচিত 'রসুল বিজয়' গ্রন্থখানি সুবৃহৎ এবং তাহা হইতে তিনি মুসলমান ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কেও যে সুগভীর জ্ঞানী ছিলেন, তাহাও অনুভব করা যায়।

যোগশাস্ত্রে এমন কতকগুলি আচার আছে, যা মুসলমান ফকির দরবেশগণও জীবনে গ্রহণ করিতে পারিতেন। কারণ, ধ্যান, যোগ এবং ব্রহ্মচর্য সাধনা ইত্যাদির উপর যোগসাধনায় যেমন জোর দেওয়া হইয়াছে, দরবেশদিগের জীবনেও তাহাই গ্রহণ করা হইয়া থাকে। দরবেশের জীবন এবং যোগীর জীবনে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই—উভয়ের সাধন-ভজনই প্রায় এক মুখী। সেই সূত্রে একজন মুসলমান দরবেশ কবি হরপার্বতীর প্রসঙ্গে তাঁহার কাব্যে আমাদিগকে যোগশাস্ত্রের কথা শুনাইয়াছেন, এই কথা স্বাভাবিকভাবেই আমরা মানিয়া লইতে পারি।

পূর্ব-বাংলায় প্রধানতঃ নোয়াখালি চট্টগ্রাম শ্রীহট্ট ত্রিপুরা জিলায় একদিন নাথযোগীদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল; তাঁহাদের সাধনা যোগসাধনা, তাঁহাদের আচার যোগাচার। সেইজন্য মধ্যযুগে যোগশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ সে অঞ্চলে রচিত হইয়াছিল। 'হরগৌরী সংবাদ' ও তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত রচনা। বলাই বাহুল্য, এই শ্রেণীর রচনা শিবমঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। যোগশাস্ত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে হরপার্বতীর নাম সর্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়; কারণ, শিবকে যোগীশ্বর মনে করা হয়।

বিবিধ কবি

দ্বিজ রামচন্দ্র প্রণীত 'হর-পার্বতীমঙ্গল' নামক একখানি কাব্য ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা ৩৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ছিল বলিয়া লঙ্-এর তালিকায় উল্লিখিত আছে।[১] এতদ্ব্যতীত 'হরগৌরী বিলাপ' (১৮১৪), 'হরিহর মঙ্গল' (?), 'মহেশ

১. *J. Long, Descriptive Catalogus of Bengali Works*

(Calcutta, 1855) III

মঙ্গল' (?) নামক আরও কয়েকটি শিবমঙ্গলকাব্য রচনা লঙ্-এর তালিকায় উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'হরিহর-মঙ্গলে'র একখানি সম্পূর্ণ পুঁথি এসিয়াটিক সোসাইটির প্রাচীন পুঁথিশালায় সংগৃহীত হইয়াছে।[১] ইহার রচয়িতার নাম প্রাণচন্দ্র। কবি বর্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্রের আদেশে কাব্যরচনা করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দেব-মাহাত্ম্য রচনা কাব্যের উদ্দেশ্য নহে, রাজপুত্র জয়সেন ও রাজকুমারী জয়ন্তীর প্রণয়কাহিনী বর্ণনাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কুবেরের শাপে এক যক্ষ সাময়িকভাবে নপুংসকত্ব প্রাপ্ত হইয়া কি ভাবে শিবকে তপস্যা দ্বারা তুষ্ট করিয়া জন্মান্তরে বিজয়নগরের রাজা বিজয়সেনের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল ও তাহার পূর্বজন্মের পত্নী দীর্ঘকেশী অবন্তীরাজের গৃহে জয়ন্তী নামে জন্মগ্রহণ করিলে কি ভাবে তাহাকে এই জন্মেও পত্নীরূপে লাভ করিল তাহারই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিখানির তারিখ ১২৩৭ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে।[২] মনে হয়, পুঁথিখানি ইহার অনতিকাল পূর্বে রচিত। কারণ, দেবতার উপর হইতে যখন সমাজের দৃষ্টি মানুষের উপর আসিয়া ন্যস্ত হয়, ইহা সেই যুগের রচনা।

এতদ্ব্যতীত 'শিবরামের যুদ্ধ' নামকও একখানি লৌকিক-বিষয়ক আখ্যানকাব্য রচিত হইয়াছিল। ইহার বিষয়টি এই—লক্ষ্মণ শিবের উদ্যান হইতে ফুল তুলিতে গেলে, উদ্যানের প্রহরী হনুমান তাঁহাকে বাধা দিল। লক্ষ্মণ ও হনুমানে যুদ্ধ বাধিল; অবশেষে লক্ষ্মণের পক্ষ হইয়া রাম ও হনুমানের পক্ষ হইয়া শিব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধ আর কিছুতেই শেষ হয় না—ত্রিভুবন রসাতলে যাইবার উপক্রম হইল। অবশেষে পার্বতীর মধ্যস্থতায় উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। কবিচন্দ্র[৩] ও অন্যান্য কয়েকজন কবির নামে এই কাব্য প্রচলিত আছে।

বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাববশতঃ কালক্রমে লৌকিক শিব-চরিত্রের উপরও বৈষ্ণব প্রভাব কার্যকর হয়। তাহার ফলে শিবকে কোন কোন স্থলে কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। 'শিব-শঙ্করীর রাস' নামক একখানি ক্ষুদ্র পুঁথিতে ইহার প্রকৃত নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহাতে শিব ও পার্বতীর রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে। পুঁথিখানি রচয়িতার নাম ও পরিচয় জানা যায় না।[৪] দ্বিজ সৃষ্টিধরের ভণিতায় 'কাশীখণ্ড' অবলম্বনে রচিত 'মহেশ-মঙ্গল' নামক একখানি শিবমাহাত্ম্য বিষয়ক ক্ষুদ্র কাব্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে।

'মৃগলুব্ধ'

শিবমঙ্গলের স্বতন্ত্র একটি ধারা বাংলার সুদূর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবর্তী অঞ্চলে এককালে উদ্ভূত হইয়া প্রধানতঃ সেই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল

১। গ-স ৩৮৬০

২। গ-স ৩৬২২

৩। ঐ, ৫৪৪৬

৪। নাটোর-ভবন পুঁথি

চট্টগ্রাম। ইহার অন্তর্গত বর্তমান হিন্দুতীর্থ চন্দ্রনাথ এককালে বৌদ্ধতীর্থরূপেই প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু কালক্রমে সুদূর ভারতের পূর্বসীমান্ত পর্যন্তও যখন হিন্দুধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হইল, তখন এই অঞ্চলের বৌদ্ধতীর্থগুলি হিন্দুতীর্থেই রূপান্তরিত হইয়া গেল। বৌদ্ধদেবতা তারানাথ হিন্দুর শিব বা চন্দ্রনাথে পরিবর্তিত হইয়াছেন। চন্দ্রনাথ তীর্থে এখন পর্যন্তও বৌদ্ধকীর্তির ধ্বংসাবশেষ বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম জিলার অন্যতম প্রধান তীর্থস্থানের নাম আদিনাথ। আদিনাথ বা আদিদেব পরবর্তী বৌদ্ধধর্মের উপাস্য দেবতা ছিলেন, অতএব আদিনাথও প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধতীর্থ; চন্দ্রনাথ ও আদিনাথে এখন পর্যন্তও বৌদ্ধ-উৎসবাদির সময় চট্টগ্রামের সুদূর অঞ্চল হইতে বৌদ্ধতীর্থযাত্রীগণ আসিয়া সমবেত হইয়া থাকেন।

চন্দ্রনাথও আদিনাথ শৈবতীর্থে পরিণত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলে ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত শৈবপুরাণগুলিও প্রচার লাভ করে; সাধারণ জন-সমাজের মধ্যে শিবমাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য তখনই স্থানীয় কয়েকজন কবি বাংলা মঙ্গলকাব্যের অনুকরণে কয়েকখানি শিবমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। বিষয়বস্তুর দিক দিয়া ইহাদের সঙ্গে পূর্বালোচিত শিবমঙ্গল কাব্যগুলির কোনও যোগ ছিল না; সংস্কৃত পুরাণ হইতে প্রত্যক্ষভাবে ইহাতে বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়া কেবলমাত্র মঙ্গলকাব্যের আদর্শে ইহারা রচিত হইয়াছিল। ইহাদের কাহিনীর মধ্যে মৃগ ও লুব্ধ (ক)-এর কথা আছে বলিয়া সাধারণত ইহাদের নাম 'মৃগলুব্ধ' বা 'মৃগলুব্ধ-সংবাদ'। কাহিনীটি নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

হস্তিনার রাজা মুচুকুন্দ পরম শৈব। তিনি একদা সস্ত্রীক শিব-চতুর্দশী ব্রত উদ্‌যাপন করিতে গিয়া রাত্রিজাগরণ করিতেছিলেন; রাণী রাজাকে শিবের মাহাত্ম্য শুনাইতে গিয়া এই গল্পটি বলিলেন।

চিত্রসেন নামে এক বিদ্যাধর একদিন দেব-সভায় নৃত্য করিতেছিল, নৃত্য করিতে করিতে সহসা এক ব্যাধের দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; ব্যাধ একটি মৃগকে লক্ষ্য করিয়া শরসন্ধান করিতেছিল। চিত্রসেনের তালভঙ্গ হইয়া গেল। অমনি ইন্দ্র অভিশাপ দিলেন, 'মর্ত্যলোকে গিয়া ব্যাধ হইয়া জন্মগ্রহণ কর।' চিত্রসেন তাহার শাপমুক্তির উপায় জানিতে চাহিল; ইন্দ্র বলিলেন, 'ভদ্রসেন মৃগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে শাপ মোচন হইবে।'

চিত্রসেন ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করিল। পশুহত্যাই তাহার জীবিকার একমাত্র উপায় হইল। তাহার অব্যর্থ সন্ধানে বন ক্রমে পশু-শূন্য হইতে লাগিল। একদিন সে শিকারের সন্ধানে দূর বনে গমন করিল। সমস্ত দিনের সন্ধানে কোন শিকার মিলিল না। সন্ধ্যার সময় আকাশে ঝড় উঠিল। অনাহারে ক্লান্ত ও বন্য পশুর ভয়ে ভীত হইয়া সে এক বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিল। সেই বৃক্ষটি ছিল বিল্ববৃক্ষ। রাত্রিজাগরণের জন্য এক একটি করিয়া বিল্বপত্র ছিঁড়িয়া সে নীচে ফেলিতে লাগিল; বৃক্ষের পাদমূলে এক শিবলিঙ্গ ছিল; ছিন্ন বিল্বপত্রগুলি সবই সেই শিবলিঙ্গের উপর পড়িল। শিব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিতে চাহিলেন; সে মৃগয়ায় সাফল্য লাভ করিবার বর চাহিল।

প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাধ পুনরায় বনের ভিতরে প্রবেশ করিল। সেইদিন ব্যাধের জালে এক মৃগ বন্দী হইল। মৃগী স্বামীর আসন্ন মৃত্যু জানিতে পারিয়া শোকে দুঃখে কাতর হইয়া পড়িল। মৃগ তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে বলিল, কিন্তু মৃগী ব্যাধের নিকট নিজেকে সমর্পণ করিয়া মৃগের প্রাণরক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিল। ব্যাধের নিকট মৃগী স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাহিল; মৃগকে সে জাল হইতে মুক্ত করিয়া দিল। ভদ্রসেন ও রত্নাবলী মৃগ ও মৃগীরূপে পৃথিবীতে শাপভোগ করিতেছিল; তাহাদের শাপভোগ শেষ হইল, তাহারা উভয়েই শিবলোকে চলিয়া গেল।

ব্যাধ চন্দ্রভাগা নদীতীরে গিয়া শিব-পূজা করিবার আয়োজন করিল। ব্রাহ্মণ পূজারী তাহাকে মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিল। পূজারীর অনুমতি লইয়া সে ব্যাসকুণ্ডে স্নান করিয়া পবিত্র হইল। এইবার তাহার শিব-পূজার আর কোন বাধা রহিল না। ভক্তিভরে শিব-পূজা করিয়া ব্যাধ-জীবন হইতে মুক্তি পাইয়া শাপমুক্ত হইয়া সে শিব-লোকে চলিয়া গেল।

রাণীর কাহিনী শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাত্রি প্রভাত হইল। মুচুকুন্দ মনে করিলেন, তিনিও চন্দ্রভাগা নদীতীরে শিব-পূজা সম্পন্ন করিবেন। পূজার আয়োজন করা হইল। তিনি বিপুল আড়ম্বরে শিব-পূজা সম্পন্ন করিলেন। শিব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিলেন, তিনিও সস্ত্রীক শিবধামে চলিয়া গেলেন।

সংস্কৃত মহাভারত, শিবপুরাণ, হরিবংশ, দেবীভাগবত, ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ ইত্যাদিতে মুচুকুন্দ রাজার বিবিধ উপাখ্যান বর্ণিত আছে। মুচুকুন্দ রাজা পরম শৈব ছিলেন, কাশীধামে মুচুকুন্দেশ্বর শিবলিঙ্গ এখনও বর্তমান আছে। উদ্ধৃত কাহিনী সমগ্রভাবে কোন শিবপুরাণ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, বিবিধ পুরাণ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাহা বাংলা মঙ্গলকাব্যের আদর্শে রূপায়িত করিয়া লইয়া উক্ত কাহিনী পরিকল্পিত হইয়াছে।

উদ্ধৃত কাহিনী হইতে দেখা যাইবে যে, ইহার মধ্যে লৌকিক শিব-চরিত্রের কোন প্রভাব নাই। পূর্বালোচিত আদ্যোপান্ত পৌরাণিক কাহিনীকে ভিত্তি করিয়াই ইহা রচিত। ইহার প্রধান কারণ এই যে, লৌকিক শিবের উদ্ভবভূমি হইতে বহু দূরবর্তী অঞ্চলে এই মৃগলুব্ধকের কাহিনী প্রচলিত হইয়াছিল, সেইজন্যই ইহার উপর লৌকিক প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে নাই।

'মৃগলুব্ধ' নামক পুঁথির আদি রচয়িতার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহার পরবর্তী কয়েকজন কবি সম্বন্ধেও বিস্তৃত পরিচয় সহজ-লভ্য নহে। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম রামরাজা।[১] রামরাজা রচিত মৃগলুব্ধ পুঁথিতে বিস্তৃত পরিচয় কিংবা পুঁথি রচনার সম্যক্ সময় নির্দেশ কিছুই নাই। তবে, এই জাতীয় অন্যান্য পুঁথির সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে রামরাজা-

১। রামরাজা, 'মৃগলুব্ধ-সংবাদ', মুন্সী আব্দুল করিম সম্পাদিত (সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩২২)

বিরচিত পুঁথিকেই নানা কারণে প্রাচীন মনে হয়। রামরাজা তাঁহার পুস্তকে এই প্রকার ভণিতা দিয়াছেন,

শঙ্কর কিঙ্কর শিশু রামরাজে গাএ।
মৃগলুব্ধ গাইল প্রথম অধ্যায়॥
শঙ্কর কিঙ্কর রামরাজ ভণে।
দ্বিতীয় অধ্যায় নরক লক্ষণে॥
হরষিত হইয়া রামরাজা গাএ।
ব্যাধের গমন শুনি তৃতীয় অধ্যায়॥

এতদ্ব্যতীত তাঁহার পুস্তকে কবির আত্মপরিচায়ক আর কোনও উক্তি নাই। অতএব এই অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর উপকরণের উপর নির্ভর করিয়া কবির সম্বন্ধে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। কেহ অনুমান করিয়াছেন, কবি জাতিতে মগ ছিলেন। কারণ, চট্টগ্রামের বৌদ্ধ মগদিগের মধ্যে রাজা ও বড়ুয়া পদবী ব্যবহার করিতে দেখা যায়। কিন্তু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মগ কবি কেন শিবমাহাত্ম্য সূচক কাব্য রচনা করিবেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এমনও হইতে পারে যে, তিনি বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করিয়া শৈব বলিয়া দাবী করিতেছিলেন, নামের পদবীর মধ্যে তখনও বৌদ্ধরূপ লুপ্ত হয় নাই। যাই হউক, এই অনুমান ব্যতীত এই কবি সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে।

রামরাজার রচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ। সংস্কৃত পুরাণের ভাষার প্রতিধ্বনি তাঁহার রচনায় শুনিতে পাওয়া যায়। বনমধ্যে নিঃসঙ্গ ব্যাধ শিব-চতুর্দশীর ঘন অন্ধকারময় রাত্রিতে যে মহাদুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহার চিত্রটি কবির রচনায় সুন্দর ফুটিয়াছে,—

বিজুলি চমকে মেঘ করিল গর্জন।
মুষল সমান ধার হইল বরিষণ॥
ঠাঠারের ঘায় অগ্নি পড়ে নিরন্তর।
ঘোর অন্ধকার হইল বনের ভিতর॥
দেখিয়া ব্যাধের মনে ভয় উপজিল।
তরাসে মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িল॥
ভয়ে আকুল ব্যাধ চিন্তিতে লাগিল।
ঘোর অন্ধকার রাত্রি বনে ত রহিল॥
উদ্দেশ না পাইলে মোর বন্ধু পরিকর।
কেমতে গোএাইমু যুই বনের ভিতর॥

সিংহ ব্যাঘ্র জন্তু সব বৈসে সেই বনে।
এ সবার ভয় আমি এড়াইমু কেমনে॥

মৃগলুব্ধ কাব্যের অন্যতম কবির নাম রতিদেব।[১] রতিদেব রচিত কাব্যই এই জাতীয় কাব্যের মধ্যে সর্বাধিক প্রচার লাভ করিয়াছিল। ইহার পুঁথি সুদূর শ্রীহট্ট জিলা অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।[২] রতিদেব তাঁহার পুঁথিতে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন,

পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা বসুমতী।[৩]
জন্মস্থল সুচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি॥
জ্যেষ্ঠ দুই ভাই বন্দম রাম-নারায়ণ।
ধরণী লোটাইআ বন্দম যত গুরুজন॥
অন্নপূর্ণা শাশুড়ী বন্দম মহেশ শ্বশুর।
মন্ত্রগুরু দয়াশীল মোক্ষদা ঠাকুর॥

চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত পটিয়া থানার অনতিদূরবর্তী কয়েকটি গ্রাম চক্রশালা নামে এখনও পরিচিত, পটিয়া মহকুমা শহরের উপকণ্ঠে সুচক্রদণ্ডী গ্রাম ও বর্তমান রহিয়াছে। রতিদেব তাঁহার কাব্য-রচনার কাল সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন—

রস অঙ্ক বাউ[৪] (বায়ু) শশী শাকের সময়।
তুলা মাসে সপ্তবিংশতি গুরুবার হএ॥
মৃগলুব্ধ পোথারম্ভ মহাদেবের পাএ।
ভব তরিবার হেতু রতিদেব গাএ॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ১৫৯৬ শকাব্দ বা ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্য রচিত হয়।

রতিদেব সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচনার অনেক স্থলে সংস্কৃত পুরাণগুলির একেবারে ভাষানুবাদ লক্ষ্য করা যায়। এই উপলক্ষে স্কন্দপুরাণোক্ত শিবলিঙ্গের উৎপত্তি কাহিনীর সহিত তাঁহার রচনার অনুরূপ বিষয়টি তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

রতিদেবের রচনা পূর্বোল্লিখিত রামরাজার রচনা হইতে সরল এবং কবিত্বপূর্ণ। ব্যাধের

---

১ রতিদেব, 'মৃগলুব্ধ', মুন্সী আব্দুল করিম সম্পাদিত (সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩২২)।

২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালায় সংগৃহীত রতিদেব রচিত মৃগলুব্ধের ৮৯১ সংখ্যক পুঁথি শ্রীহট্ট জিলা হইতে সংগৃহীত।

৩ পাঠান্তর 'মধুমতী'।

৪ পাঠান্তর 'শর', ঢা পত্র ২ (ক), ইহাতে সময়ের কোন ব্যতিক্রম হয় না।

জালে আবদ্ধ মৃগের সম্মুখে মৃগীর কাতরোক্তির বর্ণনাটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী,—

কেনে কাল বনে আইলা ব্যাধ হাতে প্রাণ দিলা
মোকে বাম হইলো ভগবান।
বনে খাই তৃণ পাণি অপকার নাহি জানি
কেনে বিধি এত বিড়ম্বন॥
উঠ উঠ প্রাণনাথ অখনে আসিবো ব্যাধ
ঝাটে উঠ চলি যাই ঘর।
মোর প্রভু সঙ্গে রঙ্গ কেনে বিধি কৈল ভঙ্গ
পলকে হরিল প্রাণেশ্বর॥

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই কাব্য সর্বাংশেই সংস্কৃত পুরাণের অনুকারী, অতএব ইহাতে বাঙ্গালী কবির সহজ কবিত্ব স্ফূর্তির বাধা হইয়াছে। ইহাতে চরিত্র-সৃষ্টির প্রয়াস নাই, দৈব ছায়া হইতে বিমুক্ত করিয়া কোনও চরিত্রের উপর জাতীয় স্বাতন্ত্র্য আরোপ করা হয় নাই। এই সকল কারণে এই জাতীয় মৃগলুব্ধ নামীয় বাংলা শিবাখ্যানকে প্রকৃতপক্ষে অনুবাদ-সাহিত্যেরই অন্তর্ভূক্ত করা সমীচীন বলিয়া বোধ হইবে।

একমাত্র চট্টগ্রামের অন্তর্গত চন্দ্রনাথ ও আদিনাথের নব-প্রতিষ্ঠিত শৈবতীর্থগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই এই সাহিত্য পুষ্টি লাভ করিয়াছিল, অন্যত্র ইহার প্রসার সম্ভব হয় নাই। চট্টগ্রাম অঞ্চলের শৈবধর্ম পরবর্তী কালে বৈষ্ণব ও মুসলমান ধর্মের সম্মুখীন হইয়া ব্যাপক লোকপ্রীতি হইতে স্বভাবতঃই বঞ্চিত হয়, তাহারই ফলে এই শৈব সাহিত্যও ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া পড়ে।

পরবর্তী বাংলার সমাজে লৌকিক শৈব ধর্ম নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ক্রমে বাংলার হিন্দু সমাজে লৌকিক শিবের প্রাধান্য একেবারেই লোপ পাইতে আরম্ভ করিল। বাঙ্গালীর নৈতিক জীবনের যে স্তর হইতে লৌকিক শিবের জন্ম হইয়াছিল, তাহা হইতে বাঙ্গালীর সামাজিক জীবন ক্রমে অনেক ঊর্ধ্বে আসিয়া উপনীত হইল। সেইজন্য বাংলার প্রাচীনতম সমাজ হইতে জাত দেবচরিত্রসমূহ পরবর্তী বাংলার উন্নততর সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইল না। ইতিমধ্যে সমাজের সকল স্তরে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব কার্যকর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার ফলে শিবের পার্শ্বে নারায়ণের সিংহাসন স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। অতএব শিবকেও তখন এই পুরাণাগত নারায়ণের সমমর্যাদায় উন্নীত করিতে গিয়া তাঁহা হইতে লৌকিক চরিত্র-কল্পিত সর্ববিধ গ্রাম্য উপকরণ পরিত্যক্ত হইতে লাগিল। ক্রমে যুগোচিত সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শে হরি ও হর সম্মিলিত রূপেও আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতচন্দ্র রায় রচিত 'অন্নদা-মঙ্গলে'র শিবকাহিনী এই আদর্শেই রচিত। ইহার মধ্যে শিবের

প্রাচীনতম লৌকিক এবং মধ্যযুগের তথাকথিত পৌরাণিক এই উভয় চিত্রেরই ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গলো'ক্ত শিব-কাহিনীতে কতকগুলি শৈব ও বিষ্ণুমাহাত্ম্যসূচক পুরাণের আখ্যানই অনুকীর্তিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিভিন্ন আদর্শোদ্ভুত দেব-চরিত্রগুলির মধ্যে ঐক্যসন্ধান করিয়া সর্বধর্মসমন্বয়-চেষ্টার কল্যাণাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। তাহাতে এই কথাই বলা হইয়াছে যে, যে-অবিশ্বাসী এক দেবতায় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিয়া অপর দেবতার অবহেলা করে তাহার কোনও দেবতার পূজাই সার্থক হয় না। পঞ্চোপাসক হিন্দু সম্প্রদায়ের ইহাই সেই যুগে ধর্মগত আদর্শ হইয়াছিল এবং ইহার উপরই ঊনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক সর্বধর্মসমন্বয়বাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গলে' বিষ্ণুভক্ত ব্যাসকে শিব-নিন্দার জন্য বিষ্ণুই তিরস্কার করিয়া কহিতেছেন,—

যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব।
শিবের করিলা নিন্দা কি আর বলিব॥
শিবের প্রভাব বলে আমি চক্রধারী।
শিবের প্রভাব হৈতে লক্ষ্মী মোর নারী॥
শিবের যে নিন্দা করে আমি তারে রুষ্ট।
শিবের যে পূজা করে আমি তারে তুষ্ট॥

বাংলার যে মঙ্গল কাব্য শিবের সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে উচ্ছেদ করিবার জন্যই সর্বপ্রথম উদ্ভুত হইয়াছিল, পরিণামে তাহা এই শিবকেই এক স্বতন্ত্র রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতে সর্পপূজার উৎপত্তি—বাংলার মনসা-পূজা, মনসা-মঙ্গলকাব্য—মনসা-মঙ্গলের কবিগণ

সূচনা

ভারতে শাক্তধর্মের দুইটি বিশিষ্ট ধারার মধ্যে যে ধারাটি বৈদিক আর্যধর্ম হইতে উদ্ভুত হইয়াছিল, তাহার কোনও প্রভাব বাংলার জনসাধারণের সমাজ পর্যন্ত আসিয়া বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। মধ্যযুগে বাংলার জনসাধারণ তাহাদের অনার্য প্রতিবেশীদিগের সামাজিক জীবন হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নিজস্ব অধ্যাত্মবোধ দ্বারা যে বিশিষ্ট প্রকৃতির শাক্তধর্মের আদর্শ গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহা আর্য আদর্শ হইতে শুধু যে স্বতন্ত্র তাহাই নহে, তাহা আর্য আদর্শের কতকটা বিরোধীও বটে। আর্যসমাজ শক্তি-দেবতার যে পরিকল্পনা করিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার সৃষ্টিশক্তির উপরই জোর দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু অনার্য-পরিকল্পনায় শক্তিদেবতার ধ্বংসাত্মক গুণের উপরই জোর দেওয়া হয়। এই উভয় আদর্শের মৌলিক বিরোধের মধ্যেই ইহাদের উদ্ভবেরও ইতিহাস যে পরস্পর স্বতন্ত্র, তাহা অনুভব করা যায়।

আর্যভাষাভাষিগণ ছিল প্রকৃত দৈহিক শক্তিমান জাতির বংশধর। শক্তির সাধনা দ্বারা তাহারা চিরকালই ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে বিজয় ও কল্যাণেরই সন্ধান পাইয়াছে, সেইজন্য তাহাদের শক্তি-দেবতার পরিকল্পনায় দেবতার সৃষ্টি ও কল্যাণ-গুণেরই জয়গান শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় অনার্যদিগের ইতিহাস স্বতন্ত্র। প্রাগৈতিহাসিক যুগে অরণ্যচারী অনার্য জাতি হিংস্র বন্য পশু ও অপরিজ্ঞাতরহস্য বিশ্বপ্রকৃতির নিকট হইতে সর্বদা আতঙ্ক ও বিভীষিকাই লাভ করিয়া আসিয়াছে। সেইজন্য সেই যুগ হইতেই তাহারা আত্মরক্ষায় সচেষ্ট থাকিতে গিয়া তাহাদের অপেক্ষা শক্তিমান জীবসমূহ হইতে সর্বদা দূরে সরিয়া রহিয়াছে। তাহাদের পরিকল্পনায় তখন দেবতা ছিল অনিষ্টকারী দানব-শক্তিরই প্রতীক মাত্র। হিংস্র-বন্য-পশু-উপদ্রুত ভারতীয় অনার্য সমাজকে আরও এক প্রকার আধিভৌতিক শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহা আক্রমণকারী জাতিসমূহ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া কত দিক হইতে যে কত জাতি ভারতবর্ষে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সমস্ত আক্রমণকারী জাতিসমূহ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া আদিম অনার্য জাতিগুলিকে দেশের বাসোপযোগী সমতল ভূমি হইতে পর্বত ও অরণ্য প্রদেশে বিতাড়িত করিল। অধিকতর দৈহিক শক্তিসম্পন্ন এই সমস্ত আক্রমণকারী জাতিসমূহের সম্মুখীন হইতে

অসমর্থ হইয়া ভারতের আদিম অনার্যগণ অরণ্য ও দুর্গম পর্বত প্রদেশের অভ্যন্তরে গিয়া আশ্রয় লইল। এই ভাবে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সর্বদা বিপর্যস্ত হইয়া এ'দেশের অনার্য সমাজ শক্তির হিতকারী কোনও গুণের আভাস লাভ করিতে পারিল না। সেইজন্য ইহার পরিকল্পনায় শক্তিদেবতা অহিতকর অনর্থেরই মূল বলিয়া গৃহীত হইল।

বাংলাদেশে লৌকিক শাক্তধর্মের পুনরুত্থানের অনুরূপ ইতিহাসই লক্ষ্য করা যায়। শৈবধর্ম যখন বাংলার স্থিতিশীল নিরুপদ্রব সমাজের উপর নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার উপযুক্ত অবকাশ পাইয়াছিল, তখন এ'দেশের সমাজের উপর বাহির হইতে এক বিক্ষোভের কারণ আসিয়া দেখা দিল। এ'দেশের তুর্কবিজয়ের পর জনসাধারণের রক্ষণশীল ধর্মমতের উপর যে রাষ্ট্রশক্তির জোরজুলুম কিছু চলিয়াছিল, সমসাময়িক বাংলার ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখনই নিষ্ক্রিয় শৈবধর্মের আদর্শ এ'দেশের সমাজ হইতে বিদায় লইল। প্রবল রাষ্ট্রশক্তির সম্মুখে সমগ্র সমাজ নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় বিবেচনা করিয়া তাহার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য এক ভয়ঙ্করী শক্তি-দেবতার উদ্বোধন করিল। এই ভাবে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর সূচনা হইতেই সমগ্রভাবে বাংলার সমাজ নূতন করিয়া পুনরায় এই লৌকিক শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিল। এমন কি, সেই যুগের বৈষ্ণব ধর্মের কথাও যদি আমরা বিচার করি, তাহা হইলেও দেখিতে পাইব যে, তাহা একদিকে নৈয়ায়িক এবং স্মার্ত হিন্দু সম্প্রদায় ও অপরদিকে মুসলমান সম্প্রদায় এই উভয় কর্তৃক যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া চৈতন্যদেবের চরিত্রেরও এক ভয়ঙ্কর শক্তিরূপেই উদ্বোধন করিয়াছিল। বাংলার বৈষ্ণবধর্ম যদিও মূলতঃ বিষ্ণু বা কৃষ্ণের পরম কারুণিক দয়া-গুণের উপরই প্রতিষ্ঠিত, তথাপি 'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' গীতার এই বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া কৃষ্ণের অবতার বলিয়া কীর্তিত চরিত্র চৈতন্যদেবের উপরও দুষ্কৃত-ধ্বংসকারী রুদ্র-গুণ আরোপ করিয়া লইয়াছে। একমাত্র বাংলায় সমসাময়িক লৌকিক শাক্তধর্মের আদর্শই যে ইহাতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা নহে—এমনই অসহায় এবং দুর্বল সমাজ নিজের পরাজয়ের গ্লানি হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্যই অদৃশ্য দেবতার কল্পিত ধ্বংস শক্তির উদ্বোধন করিয়া জীবনে বাঁচিয়া থাকিবার সাধনা করে।

বাংলার রাষ্ট্র এবং সমাজ জীবনের এই প্রকার বিপ্লবাত্মক যুগে এ'দেশে লৌকিক শক্তিধর্মের পুনরভ্যুত্থান হইয়াছিল। সমসাময়িক মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্য দিয়া বাংলার এই বিশিষ্ট অধ্যাত্ম-চৈতন্যেরই বিকাশ হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকৃতির লৌকিক শক্তি দেবতাদিগের মাহাত্ম্যকীর্তন করাই এই মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্দেশ্য ছিল। মনসা-মঙ্গলও সেই উদ্দেশ্যেই রচিত।

বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলির ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে সহজেই দেখা যায় যে, মনসা-মঙ্গল কাব্যই ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে একজন মনসা-মঙ্গলের কবির কাব্য-রচনায় আগ্রহের আতিশয্য দেখিয়া এই ধারণা বদ্ধমূল হয়।

মনসা-মঙ্গলের বিষয়বস্তুও মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন। ব্রাহ্মণ্য সমাজের বহির্ভাগে এই কাব্যের উদ্ভব হয়। সমগ্র মনসা-মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একটিও উল্লেখযোগ্য ব্রাহ্মণ চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। কাহিনীর নায়ক বৈশ্য সদাগর, এমন কি, এই কাব্যোক্ত চরিত্রের নামগুলির মধ্যে পর্যন্ত তখনও সংস্কৃত প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই। 'বেহুলা', 'সোনেকা', 'লখাই', 'সায়বেনে' ইত্যাদি তাহার প্রমাণ। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-সমাজের বাহিরে এই কাব্যের মূল কাহিনী উদ্ভূত হইয়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই ইহা যে কেবল এক সম্পূর্ণ সাহিত্য-অবয়ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা নহে—ঐ সময়ের মধ্যেই তাহা ব্রাহ্মণ্য-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই ব্রাহ্মণ কবিগণও এই বিষয়ক কাব্য-রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

মনসা-মঙ্গলকাব্যের প্রকৃত উদ্ভবকাল নিরূপণ করিতে হইলে ভারতের সর্পপূজার ও মনসা-পূজার ইতিহাস আলোচনা করিতে হয়। কারণ, সমাজে সর্পপূজা আশ্রয় করিয়াই এই জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। অতএব সমাজে সর্পদেবতার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে মনসা-মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস জড়িত আছে। ভারতের সর্বত্র সর্প দেবতার পরিকল্পনা একই অভিন্ন ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া বিকাশ লাভ করে নাই। ইহা বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে, সেইজন্য ইহার প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল।

ভারতে সর্পপূজার উৎপত্তি

সভ্যতা উন্মেষের বহু পূর্বেই মানব-হৃদয়ের ভয় ও বিস্ময় আদি জন্মলব্ধ প্রবৃত্তিগুলি হইতে সমাজের প্রাচীনতম দেবতাদিগের কল্পনা করা হইয়াছিল। সেইজন্য প্রত্যেক সমাজের প্রাচীনতম দেবতা প্রত্যক্ষদৃষ্ট প্রকৃতিরই অঙ্গীভূত আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভয় বা বিস্ময়ের বস্তু। প্রাচীন মানব জাতি সাধারণত অরণ্যে বা পর্বতগুহায় বাস করিত, সেইজন্য অরণ্যচারী জীবজন্তুর সঙ্গে তাহাদিগকে সর্বদা সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে হইত। অরণ্যচারী জীবজন্তুর মধ্যে সর্প সর্বাপেক্ষা ভীষণ, ভারতবর্ষের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইহারা সংখ্যায়ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক। সম্মুখযুদ্ধে ইহাদিগকে পরাজিত করিবার উপায় নাই, ইহাদের সন্ধান অলক্ষ্যগোচর; বিশেষত ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি অন্যান্য জীবজন্তু হইতে স্বতন্ত্র—ইহারা পাদহীন অথচ দ্রুতগতি, জীর্ণ খোলস ত্যাগ করিয়া ইহারা বারবার নব জীবন লাভ করে; সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, ইহারা অমর—দীর্ঘকাল নিঃশ্বাস রোধ করিয়া নিরাহারে কালযাপন করিতে পারে,—এই সমস্ত কারণে এই বিশেষ জীবটি সম্বন্ধে প্রাক্-সভ্যতা যুগের সমাজভুক্ত মানবমাত্রেরই হৃদয়ে একটি কৌতূহলমিশ্রিত ভয়ের অস্তিত্ব ছিল। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই ভয়ই তথাকথিত ভক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে সর্পপূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদের আর অন্ত নাই। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত জে. ফার্গুসন তাঁহার *Tree and Serpent Worship* নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বলিয়াছেন, সর্পপূজা সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের বাহিরে তুরাণীয় জাতির মধ্যে উদ্ভূত হয়; অতঃপর তুরাণীয় জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম পথে এ'দেশে প্রবেশ করিয়া সর্পপূজা প্রবর্তিত করে,—সর্পপূজার সঙ্গে আর্যজাতির মৌলিক কোন সম্পর্ক ছিল না। আর্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়া তুরাণী জাতির নিকট হইতে এই সর্পপূজা শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু এই সম্পর্কে আর একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, 'Fergusson worte in 1869, and his use of terms presents difficulties. He employs the word Turanian in the sense of non-Aryan; the Turanians being a people who were ousted by the Aryans. Persians and settled Iranians gave the name Turanian to nomads of the steppe region of Central Asia, ..Fergusson, however, disregards the fundamental fact that culture elements may be borrowed without racial mixture when he claims that, "eventually the worship of the serpent may become a valuable test of the presence of Turanian blood in the veins on people among whom it is found to prevail".[১]

কেহ আবার মনে করেন, ভারতীয় নাগগণ একটি জাতি বিশেষ, তাহারা হয়ত সর্পকে জাতীয় অভিজ্ঞান (totem) রূপে ব্যবহার করিত, ইহা ছাড়া সর্পের সঙ্গে তাহাদের আর কোনও সম্পর্ক ছিল না; সর্প এবং নাগ একার্থবাচক শব্দও নহে।

আবার কেহ মনে করেন, নাগ বলিতে সর্প-নর নামক একজাতীয় অর্ধনর ও অর্ধনাগ জাতীয় জীবকে বুঝায়। কেহ আবার মনে করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে জল-দেবতাকেই সর্প বলা হইত। বলা বাহুল্য, এই সকল মতবাদ এতই একদেশদর্শী ও অনুমানাত্মক যে ইহাদের কোনটিই সমগ্রভাবে গ্রহণ করা যায় না। তবে এ'কথা সত্য যে, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারে নাগ এবং সর্প একার্থবাচক ছিল না। নাগ বলিতে সম্ভবত গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ এই শ্রেণীর কোনও উপজাতিকে বুঝাইত, সর্প বলিতে প্রকৃত প্রাণীটিকে বুঝাইত। এই সম্পর্কে হিন্দুদিগের নিত্যস্নানের তর্পণ-মন্ত্রটি উল্লেখযোগ্য। তাহাতে নাগ এবং সর্পকে যে কেবল পরস্পর স্বতন্ত্র বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা নহে—ইহাতে ইহাদের প্রকৃতিও যে পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহারও আভাস পাওয়া যায়। মন্ত্রটি এই,

দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ॥
বিদ্যাধরাজলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।

১। W. D. Hambly, 'Serpent Worship in Africa', *Field Museum of Natural History*, Chicago, XXI (1931), p. 18.

নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্মে রতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নয়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥

এখন দেখা যাইতেছে যে, নাগকে যক্ষ গন্ধর্ব অপ্সরা ইত্যাদির সহিত এক সঙ্গে উল্লেখ করিয়া সর্পকে 'ক্রুর' বিশেষণ দ্বারা তাহা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। ক্রুর সর্পকে পুনরায় 'জিহ্মাগ' অর্থাৎ নির্বিষ সর্প হইতেও স্বতন্ত্র করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; যে ভাবে ইহাদিগকে এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় না যে গোঁড়া হিন্দু সমাজে তখনও ইহাদের উপর কোনও প্রকার দেবত্বের আরোপ করা হইয়াছে। অতএব দেখা যায়, নাগ এবং সর্প সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আর্যেতর সমাজের মধ্যে সর্পপূজা প্রচলিত থাকিলেও প্রথমত ইহার সঙ্গে যে আর্যসমাজের কোনই সম্পর্ক ছিল না, তাহা স্পষ্টতঃই অনুভব করিতে পারা যায়। মহাভারতের মধ্যে নাগ একটি জাতি—ইহারা আর্য-বিরোধী—আর্যদিগের সঙ্গে সর্বদা বিবাদে মত্ত। ইহারা তখনও সমাজে দেবতা বলিয়া পূজা পাইতে আরম্ভ করে নাই। ইহার পরবর্তী কালে আর্যেতর সমাজ হইতে জীবিত সর্প পূজার স্বতন্ত্র ধারাটি, খুব সম্ভবত নাগ ও সর্প এই দুইটি শব্দের অর্থ-সাদৃশ্যের জন্য নাগজাতির ঐতিহ্যের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হয়। তাহার ফলেই সমাজে নাগপূজার প্রবর্তন হয়। তখন হইতেই মহাভারতোক্ত নাগজাতির অধিপতি বাসুকি সর্পরাজরূপে পূজা পাইতে থাকেন। মহাভারতের অন্যান্য কোনও কোনও নাগচরিত্রও সর্পরূপ লাভ করেন। এমন কি, নাগরাজ বাসুকির ভগিনী জরৎকারু মুনির পত্নী বাংলাদেশে আসিয়া সর্পদেবী মনসায় রূপান্তরিত হইয়া যান। মহাভারতের মধ্যে যাহা তৎকালীন মানব-সমাজেরই একটি স্বতন্ত্র শাখা মাত্র ছিল, তাহাই সেই যুগে সরীসৃপ রূপ লাভ করিল। কিন্তু তথাপি এ'কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের সাহিত্য কিংবা ভাস্কর্য বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, এই নাগ ও সর্পের মধ্যে ব্যবধান কোনদিনই সুস্পষ্ট ভাবে তিরোহিত হয় নাই।

এই দেশে প্রচলিত জীবিত সর্পের পূজার একটি আদর্শ নাগপূজার সঙ্গে পরবর্তী কালে মিলিত হইয়াছে বলিয়াই আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতীয় ধর্মসংস্কারের মধ্যে নাগপূজা ও সর্পপূজা দুইটি স্বতন্ত্র ধারার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্কর্যে এক ধারে নরনারীরূপ নাগনাগিনীমূর্তি ও অন্য ধারে সরীসৃপরূপ সর্পমূর্তি—এই উভয়েরই অস্তিত্বের হয়ত ইহাই কারণ।

একজন পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন যে, নাগ বলিতে সরীসৃপ ত দূরের কথা, কোনও দৈত্য কিংবা দানব কিছুই বুঝায় না। নাগ বলিতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বিশেষতঃ তক্ষশীলা অঞ্চলের এক জাতির লোককে বুঝায়। তাহারা সর্পফণাকে জীবক (totem) রূপে ব্যবহার করিত বলিয়াই তাহাদিগকে নাগ বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইত। এই অনুমান আমাদের উপরোক্ত মতের কতকটা সমর্থক। মহাভারতের নাগজাতি বুঝাইতে ইহাদিগকেও বুঝাইতে পারে। যাঁহারা মনে করেন, সর্পপূজা ভারতবর্ষের বাহির হইতে এ'দেশে

আসিয়াছে, তাঁহারা ইহার বিশেষ কোনও যুক্তি দেখাইতে পারেন না। সেইজন্যই মনে হয়, ভারতীয় সর্পপূজার মূলে বহির্ভারতীয় কোন প্রভাব নাই—এ দেশেই সর্পপূজার উদ্ভব হইয়াছিল। কারণ, সর্প গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জীব, ভারতবর্ষ ও আফ্রিকা মহাদেশেই প্রধানত গ্রীষ্মমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত। আদিমকাল হইতেই এই দুই দেশ অগণিত সর্পের বাসভূমি। ভারতবর্ষে সর্পের জাতি-সংখ্যা আফ্রিকা হইতেও অধিক। এই দেশে যত বিভিন্ন জাতীয় সর্পের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, পৃথিবীর আর কোথাও তত পাওয়া যায় না। এই জন্যই কেহ যথার্থই মনে করিয়াছেন যে, আদিম যুগ হইতেই সর্প এই দেশে ভয় ও পূজার লক্ষ্য হইয়া আসিতেছে। এই জন্যই মনে হয়, জীবিত সর্পের পূজা দিয়াই এইদেশে সর্পপূজার সূত্রপাত হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, নাগ-পূজা অপেক্ষা সর্পপূজার ধারাটিই প্রাচীনতর। সর্পপূজার বর্তমান আচারগুলি পরবর্তী হিন্দু প্রভাবের যুগে বিধিবদ্ধ হয় বলিয়া ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম আচারগুলির বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

জীবিত সর্পের পূজা খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতেও যে উত্তর পশ্চিম ভারত অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রীক্ বীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে আসিবার সময় তাঁহার সঙ্গে যে সকল সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে এলিয়েন নামক একজন গ্রীক্ সেনাপতি লিখিয়াছেন, যখন আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া একের পর অন্য নগর ক্রমাগত অধিকার করিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি অনেক স্থানেই অন্যান্য পশুর সঙ্গে এক জাতীয় বিরাটকায় সর্প দেখিতে পান—এই সর্পকে ভারতীয়গণ পবিত্র জ্ঞান করিত এবং ইহাকে এক গিরিগুহায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া ভক্তি সহকারে পূজা করিত।

ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে এখনও জীবিত সর্পের পূজা প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষের বাহিরেও কোনও নর কিংবা নারীর আকৃতি পরিকল্পনা করিয়া সর্পের পূজা করিবার পরিবর্তে সাধারণত জীবন্ত সর্পের উদ্দেশ্যেই পূজা করা হইয়া থাকে। কেবল মাত্র মধ্য এশিয়ার মেসপটামিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হইতে একটি সর্পদেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহার দুই বাহুতে তাগার মত দুইটি সর্প ও গলদেশে আর একটি সর্প হারের মত বেষ্টন করিয়া আছে।[১] দাক্ষিণাত্যের কানাড়া প্রদেশের কোনও কোনও স্থানে এখনও জীবিত সর্পের পূজা হইয়া থাকে। নির্দিষ্ট দিনে সর্পের খাদ্য গ্রহণ করিয়া পূজারিগণ সর্প যে জায়গায় বাস করিতে পারে বলিয়া বিবেচিত হয়, বিশেষত উই ঢিপি, সেই সমস্ত স্থানে গিয়া মন্ত্রদ্বারা সর্পকে আহ্বান করে। দাক্ষিণাত্যের বিশেষ কোনও কোনও অঞ্চলে বিশেষ কোনও কোনও মন্দিরে জীবিত সর্প পালন করিয়া তাহাদিগের নিকট প্রত্যহ পূজা দেওয়া হয়। গৃহ্যসূত্রে নাগপঞ্চমী পূজার যে বিধি নির্দেশ রহিয়াছে, তাহা জীবিত সর্পের পূজা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভারতের প্রায় সর্বত্র, বিশেষত বাংলাদেশে, বাস্তুসর্প বলিয়া পরিচিত এক

১। *Field Museum of Natural History*, Chicago, Vol XXI (1931), p. 62

জাতীয় গৃহবাসী সর্প গৃহস্থের নিকট পরম শ্রদ্ধা লাভ করিয়া থাকে। এখনও বাংলা দেশে ও অন্যত্র মৃত গোক্ষুর সর্পের ব্রাহ্মণোচিত পূর্ণ অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল নিদর্শনের ভিতর দিয়াই জীবিত সর্প পূজার ধারাটি আজ পর্যন্ত এইদেশে অব্যাহত চলিয়া আসিয়াছে।

সর্পপূজা ভারতের কোন্ জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা বলিবার উপায় নাই। তবে কতকগুলি বিষয় এই সম্পর্কে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথমত সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা, শবর প্রভৃতি প্রোটো-অস্ট্রালয়েড্ বা আদি অস্ত্রাল বলিয়া পরিচিত ভারতীয় যে আদিম জাতিগুলি মধ্য-পূর্ব ভারতে আজও বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যে সর্পপূজার বিশেষ কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্প ইহাদের অধিকাংশেরই ভক্ষ্য এবং ইহার সম্বন্ধে ইহাদের কোন প্রকার শ্রদ্ধা বোধ নাই। এই সমস্ত জাতি সম্ভবতঃ ভারতের বাহির হইতে আসিয়াছে। অতএব মনে হয়, ইহাদের মধ্যে কোনও দিনই সর্পপূজার প্রচলন হয় নাই। ভারতীয়-মোঙ্গলীয় জাতিগুলির মধ্যেও খাসি জাতির মধ্যে এক সর্পদেবতার বিশেষ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নিকট এখনও নরবলি দেওয়া হইয়া থাকে বলিয়া সর্বসাধারণের বিশ্বাস। এতদ্ব্যতীত আসামের বোড়ো, মিস্‌মি প্রভৃতি জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে মধ্যযুগের অসমীয় ভাস্কর্যে সর্পপূজার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। মোঙ্গলীয় জাতিও অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে উত্তর-পূর্ব পথে ভারতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। বিচ্ছিন্নভাবে ইহাদের দুই-একটি জাতির মধ্যে সর্পপূজার প্রচলন দেখিতে পাওয়া গেলেও, সমগ্রভাবে ইহাদের মধ্যে কোনদিন সর্পপূজা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়া উঠিতে পারে নাই। নেগ্রিটো বলিয়া পরিচিত ভারতের প্রাচীনতম জাতির লোকসংখ্যা বর্তমানে এত বিরল হইয়া পড়িয়াছে যে তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে আর কোনও প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন অনুসন্ধান করা কঠিন। বিশেষত বৃহত্তর ভারতীয় কৃষ্টির মধ্যে ইহাদের দান নিতান্তই নগণ্য। কিন্তু দ্রাবিড় জাতির যে সকল বংশধর এখনও মধ্যভারত ও দক্ষিণ ভারত অঞ্চলে বসবাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যেই সর্পপূজার সর্বাধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব মনে হয়, সর্পপূজা দ্রাবিড়-সংস্কৃতিরই একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল, ইহার ব্যাপক প্রভাববশত পরবর্তীকালে আর্যসমাজও ইহা নিজ সভ্যতার মধ্যে বহুলাংশে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আর্যসভ্যতার প্রাচীনতম যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে সর্পপূজার কোন ইঙ্গিত পাওয়া না গেলেও আর্যজাতির আগমনের অনতিকাল ব্যবধানে রচিত সাহিত্যিক নিদর্শনের মধ্যেই এই সর্পপূজার ব্যাপক পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল। এইজন্যই মনে হয়, আর্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অনতিকাল মধ্যেই সর্পপূজক দ্রাবিড়ভাষী জাতির সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে এই নূতন সংস্কারে দীক্ষা লাভ করে।

প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যে অর্থাৎ ঋগ্বেদের মধ্যে সর্পের উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু সর্পপূজার উল্লেখ নাই। ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলে দমনযামায়ন ঋষি রচিত একটি সূক্তে সর্প

শব্দটির উল্লেখ আছে ঃ—

যৎতে কৃষ্ণঃ শকুন আতুতোদ পিপীলঃ সপ উত বা শ্বাপদঃ

(ঋ. ১০. ১৬.৬)

ইহা ছাড়া ঋগ্বেদের ১০.১৮৯ সূক্তটির নামই সর্প-রাজ্ঞী সূক্ত এবং রচয়িত্রীর নাম—উপক্রমণিকা মতে—সর্পরাজ্ঞী ঋষিকা, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের মতে কদ্রুবংশীয় কসর্নীর ঋষি; সর্পার্থবাচক অহি, পৃদাকু, হ্বার শব্দের ব্যবহার ঋগ্বেদের বহু স্থলে আছে। সর্পরাজ্ঞী সূক্তে স্পন্দন বা বাক্‌বিজ্ঞানের আলোচনা করা হইয়াছে। তৃতীয় মণ্ডলের ঋষি বিশ্বামিত্র সূর্যরশ্মির অন্তর্নিহিত স্পন্দনপ্রকৃতিকে 'সসপরী বাক্' 'সূর্য-দুহিতা' (৪৫৩.১৫১৬) নামে অভিহিত করিয়াছেন। দশম মণ্ডলের আর একটি সূক্তে বলা হইয়াছে—সূর্যদুহিতার বিবাহ হয় সোমের সহিত এবং তিনি দ্যুলোক-ছাদ যুক্ত মনের রথে চড়িয়া পতিগৃহে গমন করেন (১০.৮৫.১৫)। সোমের সহিত সর্পের উপমা ঋগ্বেদে বহুস্থানে আছে। এমন কি, অনেকে মনে করেন, ঋগ্বেদের মধ্যে পরোক্ষ ভাবেও সর্পের বহু উল্লেখ রহিয়াছে। ঋগ্বেদে 'অহির্বুধ্ন্য' নামক এক শক্তিমান জীবের দুই-একবার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। একজন ইংরেজ পণ্ডিত মনে করেন, এই অহির্বুধ্ন্য সর্পরূপী এক দেবচরিত্র। কিন্তু প্রকৃত সর্প অর্থে অহি শব্দের ব্যবহার আরও পরবর্তী বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ মনে করেন, বৈদিক ইন্দ্রের চিরশত্রু বৃত্র অথবা অহি কোনও শক্তিমান সর্প ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু ইহারই পরবর্তী রচনা যজুঃ ও অথর্ববেদে সর্পের বিস্তৃততর উল্লেখ পাওয়া যায়। যজুর্বেদে সর্প-সম্পর্কিত শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় প্রকাশ পাইলেও প্রকৃত পূজা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার উল্লেখ ইহাতেও পাওয়া যায় না। অথর্ববেদে সর্প-সম্পর্কিত কতকগুলি মন্ত্রের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে দুইটি বিষয় অনুমান করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ আর্যভাষিগণ ভারতবর্ষে আসিয়া প্রবেশ করিবার পূর্বে এই জীবটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। হয়ত যে দেশ হইতে তাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, সেই দেশে জীবটি তেমন পরিচিত ছিল না। তাঁহারা শীতপ্রধান কোনও দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, অতএব ইহা একেবারে অসম্ভব নাও হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ আরও দেখা যাইতেছে যে, আর্যগণ যে পথ দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, সেই পথিমধ্যস্থ অঞ্চল হইতেও তাঁহারা সর্প সম্বন্ধে কিছু সংস্কার সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অথর্ববেদে সর্পের যে নাম পাওয়া যায়, তাহাদের সঙ্গে প্রাচীন বেবিলনিয়ার কতকগুলি সর্পের নামের ঐক্য রহিয়াছে। তারপর ভারতবর্ষে আসিয়া প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই এ'দেশের সেই সময়কার যে সকল অধিবাসীর সংস্পর্শে তাঁহাদিগকে প্রথম আসিতে হইয়াছিল, তাহারাই ছিল সর্পপূজক দ্রাবিড় জাতি। তাহাদের সংস্পর্শে আসিবার ফলেই অচিরকালের মধ্যে রচিত তাঁহাদের অন্যান্য বৈদিক সংহিতাগুলিতে ইহার উল্লেখ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

যাহা হউক, প্রকৃতপক্ষে অথর্ববেদের যুগেই সর্পের কতকগুলি মন্ত্র রচিত হইতে দেখা

যায়। ইহা হইতেই মনে হয়, সর্পপূজা ইতিমধ্যেই ভারতীয় আর্যসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছে। বৈদিক যুগের পরবর্তী যুগ অথবা ব্রাহ্মণের যুগে 'সর্পবিদ্যা' ও সর্পবেদ' দুইটি জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই যুগেই সর্পপূজা আর্যসমাজে বিধিবদ্ধ হয়। গৃহ্যসূত্রের মধ্যে যে গার্হস্থ্য বিধি আচারের নির্দেশ রহিয়াছে, তাহাতে সর্পপূজার বিস্তৃত ব্যবস্থার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্পপূজার প্রকরণ হিসাবে 'আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে' উল্লেখ আছে যে, 'কলস হইতে শক্তু একটি মৃৎপাত্রে পূর্ণ করিয়া লইয়া কোনও পবিত্র স্থলে গমন করিয়া পূর্বে পার্থিব, অন্তরীক্ষস্থ, দিব্য, দশদিকস্থ ও অন্যান্য পূজ্য সর্পদেবতাগণকে "স্বাহা" এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া নমস্কার করিবে এবং তৎপর উপহার প্রদান করিবে।' ইহাই অধুনা প্রায় সমগ্র ভারতব্যাপী অনুষ্ঠিত সর্পপূজা নাগপঞ্চমী ব্রতের প্রাচীনতম রূপ।

গৃহ্যসূত্রে বর্ষার চারিমাস প্রত্যেক গৃহস্থেরই সপরিবারে মৃত্তিকার উপর শয়ন নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থকেই শ্রাবণ-পূর্ণিমা তিথিতে একটি অনুষ্ঠান পালন করিয়া উচ্চ শয্যায় শয়ন করিতে হইত; তারপর অগ্রহায়ণ-পূর্ণিমা তিথিতে 'প্রত্যবরোহণ' নামক আর একটি আচার পালন করিয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে পুনরায় ভূমিশয্যায় শয়ন করিতে হইত। শ্রাবণ-পূর্ণিমা হইতে মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ-পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রতিদিন গৃহে সর্পভয় নিবারণের জন্য সর্পের উদ্দেশ্যে ভোজ্য বা বলি নিবেদন করিতে হইত—চারিমাসের মধ্যে একদিনের জন্যও ইহার ব্যতিক্রম করিবার উপায় ছিল না। অধুনা এই প্রথা লুপ্ত হইলেও নাগপঞ্চমীর অনুষ্ঠানের মধ্যে ইহার কিছু অবশেষ রহিয়া গিয়াছে।

প্রাঙ্‌মহাভারতীয় যুগে সর্প ও নাগের সুস্পষ্ট পার্থক্য সর্বত্র রক্ষিত হইয়াছে। অবশ্য বৈদিক ও তৎপরবর্তী সাহিত্যের মধ্যে মহাভারতের প্রায় সমসাময়িক কালের রচনা ব্যতীত নাগের সঙ্গে বড় একটা সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায় না। কিন্তু তাহা হইলেও তখনও সরীসৃপ অর্থে নাগ শব্দের ব্যবহার অপ্রচলিত ছিল।

মহাভারতের মধ্যেই নাগ একটি জাতি হিসাবে সর্বপ্রথম বিস্তৃত ভাবে উল্লিখিত হয়। সম্ভবতঃ সর্পপূজক হিসাবে তাহারা সর্পের কোন অভিজ্ঞানধারী ছিল, ক্রমে তাহা হইতেই তাহারা সর্পের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন হইয়া যায়। নাগ জাতি আকৃতি এবং প্রকৃতিতে আর্য ভাষাভাষী জাতি হইতে স্বভাবতই স্বতন্ত্র ছিল। তাহারা সর্পপূজক ছিল বলিয়া কালক্রমে তাহাদের উপর সর্প-চরিত্রের সমগ্র বৈশিষ্ট্যই আরোপ করা হয়। তাহাদের প্রকৃতি সর্পের মতই খল বলিয়া বর্ণনা করা হয়; সর্প মাটিতে গর্ত করিয়া বাস করে বলিয়া তাহাদিগকে পাতালের অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কিন্তু তাহারা আর্যবংশ-সম্ভূত—তাহাদের পিতা কশ্যপ মুনি ও মাতা কদ্রু বলিয়া দাবী করা হয়। মহাভারতের মধ্যে আর্যদিগের সঙ্গে তাহাদের বিবাদের যে বিস্তৃত কাহিনী আছে, তাহা সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি।

মহামুনি কশ্যপের দুই পত্নী—কদ্রু ও বিনতা। কদ্রুর গর্ভে বাসুকি-প্রমুখ নাগগণ

জন্মগ্রহণ করে ও বিনতার গর্ভে গরুড় ও অরুণের জন্ম হয়। বাসুকি নাগজাতির অধিপতি নিযুক্ত হন। বাসুকির ভগিনীর নাম জরৎকারু।

যাযাবর ব্রতাবলম্বী এক ঋষিবংশে জরৎকারু নামক এক মুনি জন্মগ্রহণ করেন। সংসারাশ্রমের প্রতি তিনি আজন্ম বীতস্পৃহ ছিলেন। একদিন তীর্থভ্রমণ ব্যপদেশে তিনি এক স্থানে আসিয়া উপনীত হন এবং দেখিয়া বিস্মিত হন যে তাঁহার পিতৃপুরুষগণ বৃক্ষশাখায় অধোমুখে লম্ববান রহিয়াছেন। পিতৃলোকের এই দুর্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন, তিনি দারপরিগ্রহ ও সংসার-ধর্ম উদ্‌যাপন না করার জন্যই তাঁহাদের এই অবস্থা হইয়াছে। পিতৃপুরুষগণের অনুরোধে তিনি দারপরিগ্রহ করিতে সম্মত হইলেন; কিন্তু সর্ত রহিল যে, তিনি উপযাচক হইয়া কাহারও কন্যা প্রার্থনা করিবেন না; কন্যা তাঁহার স্বীয় নামীয় হইবে; পত্নীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাঁহার থাকিবে না এবং যেদিন ইচ্ছা সেদিনই তিনি পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন।

অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে সর্পদংশনের পর মহারাজ জনমেজয় সর্পসত্রের আয়োজন করিয়া সর্পকুল নির্মূল করিতে উদ্যত হইলেন। পাতালে নাগকুলের মধ্যে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। কিন্তু তাহারা জানিয়া আশ্বস্ত হইল যে, বাসুকির ভগিনী জরৎকারুর গর্ভে কোন মহাতপা মুনির ঔরসে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, সে জনমেজয়ের এই অনুষ্ঠান পণ্ড করিবে।

এদিকে মুনি জরৎকারু একদিন মহারণ্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া একাকী চিৎকার করিয়া তাঁহার বিবাহ করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার সর্তগুলিও প্রচার করিলেন। শুনিতে পাইয়া বাসুকি নিজের ভগিনীকে লইয়া গিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

একদিন মুনি জরৎকারু তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিবার অপরাধে পত্নীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইতিপূর্বেই পত্নীর গর্ভে জরৎকারুর সন্তান আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। যথাসময়ে শিশু ভূমিষ্ঠ হইল. তাহার নাম হইল আস্তিক। তাহার বিদ্যা বুদ্ধি ও কৌশলে জনমেজয়ের সর্পসত্র রহিত হইল।

জনমেজয়ের সর্পসত্রে নাগকুলের আতঙ্ক হইতেই সর্প ও নাগের অভিন্নতা সম্বন্ধে ধারণার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, নাগজাতি সর্পপূজক ছিল বলিয়া সর্পকুলের বিনাশের আশঙ্কায় তাহাদের আতঙ্ক নিতান্তই স্বাভাবিক, সর্পসত্র রহিত করিবার জন্য সেইজন্যই তাহাদের এই ব্যগ্রতা। যাহা হউক, ইহা সত্ত্বেও মহাভারতের পরবর্তী কাল হইতেই নাগ ও সর্প কখনও স্বতন্ত্র, কখনও অভিন্ন হইয়া দেখা দিতে আরম্ভ করে।

মহাভারতের উক্ত কাহিনী ব্যতীতও বৌদ্ধ সাহিত্য ও ভারতীয় অন্যান্য কথাসাহিত্যের নাগ ও সর্প বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। বলা বাহুল্য, মহাভারতের কাহিনীই

ইহাদেরও প্রধান অবলম্বন ছিল বলিয়া ইহাদিগের মধ্যেও নাগ ও সর্প-বিষয়ক এই অনিশ্চয়তার ভাব দূর হয় নাই।

বাংলার মনসা-পূজা

বৈদিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভারত কিংবা বৌদ্ধ সাহিত্যের কাল পর্যন্ত সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী কোন বিশেষ স্ত্রীদেবতা কিংবা কোন প্রধান সর্পিণী চরিত্রের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্বপ্রথম মহাভারতের মধ্যে নাগরাজ বাসুকির ভগিনী জরৎকারুর উল্লেখ এবং তাঁহার বিস্তৃত পরিচয় আছে সত্য, কিন্তু তাঁহার উপর কোনও প্রকার দেবত্ব আরোপ করা হয় নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে নাগরাজ বাসুকির উপর দেবত্ব আরোপিত হইলেও জরৎকারুর উপর কোনদিনই দেবীত্ব আরোপ করা হয় নাই। অবশ্য আরও পরবর্তী কালে তিনি বাংলাদেশে মনসাদেবীর সঙ্গে অভিন্ন হইয়া গিয়া দেব-মর্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহাভারতের কাহিনী অনুযায়ী দেখিতে পাওয়া যায় যে, জরৎকারুর গর্ভ হইতে আস্তিকের জন্মের পরই জরৎকারুর প্রাধান্য এক প্রকার লোপ পাইয়া যায়। প্রাঙ্‌মহাভারতীয় যুগের 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র এক স্থলে 'সর্পরাজ্ঞী' কথাটির উল্লেখ আছে। কিন্তু 'সর্পরাজ্ঞী' অর্থে সেখানে পৃথিবী, সর্পকুলের রাজ্ঞী নহে।

আর্যভাষীদের সমাজে স্ত্রী-দেবতার বিশেষ কোনও স্থান ছিল না। মোহেন-জো-দারো ও হরপ্পার আবিষ্কার হইতে জানিতে পারা যায় যে, সেখানে প্রাক্‌বৈদিক যুগেই মাতৃকা-পূজা (cult of Mother Goddess) বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। অতএব মনে হয়, আর্যভাষিগণ ভারতীয় প্রাগ্‌-আর্যসভ্যতা হইতেই মাতৃকাপূজার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আর্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এতদ্দেশীয় পূর্বতন সভ্যতার আদর্শও যে আর্যসমাজ হইতে একেবারে লোপ পায় নাই, ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যে শক্তিদেবতার পরিকল্পনা হইতে তাহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বাংলার সর্পদেবী মনসার পরিকল্পনায় এই অনার্যধর্মসম্ভূত মাতৃকা-পূজা বা শক্তিপূজারই অন্যতম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা ও আসাম প্রদেশে এবং দক্ষিণে সমগ্র দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে আর্যসংস্কৃতির প্রভাব বিশেষ কার্যকর হইতে পারে নাই। বাংলা-আসামের ভাষায় আর্যপ্রভাব বিস্তৃত হইলেও ইহাদের আভ্যন্তরীণ লৌকিক ধর্মের মধ্যে ইহাদের প্রাচীনতম সংস্কারগুলি অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ আছে। দাক্ষিণাত্যে আর্যপ্রভাবের ফল বাংলা ও আসাম প্রদেশ হইতে আরও অনেক অকিঞ্চিৎকর। ইহার ভাষায় এবং আভ্যন্তরীণ লৌকিক ধর্মসংস্কারে আজ পর্যন্তও দ্রাবিড় প্রভাবই অক্ষুণ্ণ আছে। সেইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, বাংলা প্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যই ভারতবর্ষের মধ্যে প্রাচীনতম কতকগুলি সামাজিক সংস্কারের অধিকারী। শক্তি বা মাতৃকাপূজা তাহাদের অন্যতম। এইজন্যই বাংলাদেশ ও দাক্ষিণাত্য ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে এত অধিক সংখ্যক লৌকিক স্ত্রী-দেবতার পূজা দেখিতে পাওয়া যায় না।

মহাভারতোত্তর যুগে আর্য-প্রভাবিত ভারতের প্রায় সর্বত্রই সর্পকেও পুংদেবতা নাগরাজ বাসুকিরূপেই পূজা করা হইয়া থাকে; কিন্তু বাংলাদেশ ও দাক্ষিণাত্যের প্রায় সর্বত্র ইহার পরিবর্তে কয়েকটি স্ত্রী-সর্পদেবতা পূজা পাইয়া আসিতে থাকে। তাহাদের মধ্যে বাংলাদেশে পূজিতা মনসাদেবীই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

জীবিত সর্পের পূজার পরবর্তী অবস্থাই বিশেষ কোন বৃক্ষকে সর্পাধিষ্ঠিত বিবেচনা করিয়া সেই বৃক্ষের পূজা। বৃক্ষের সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন ও ব্যাপক। কারণ, উভয়ই উর্বরতাশক্তির প্রতীক। দাক্ষিণাত্যে অশ্বত্থবৃক্ষের সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করা হয়। সেইজন্য অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে মৃৎ কিংবা প্রস্তর নির্মিত নাগমূর্তি উপহার দেওয়া হয়—অপুত্রক বা বন্ধ্যা নারীগণ সন্তান কামনা করিয়া অশ্বত্থতলে নাগমূর্তি উপহার দেয় কিংবা নাগপূজা করিয়া ১০৮ বার সেই বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। ইহাতে বৃক্ষ ও সর্পের সঙ্গে উর্বরতাবাদ বা fertility cult-এর সম্পর্কটি অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া চোখে পড়ে। মনে হয়, জীবিত সর্পের পূজক কোনও জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে কালক্রমে বৃক্ষমধ্যে সর্পোপাসক বা বৃক্ষোপাসক কোনও জাতির সংস্কৃতি একত্র মিশিয়া গিয়াছিল। সেইজন্য একসময়ে বৃক্ষমধ্যে সর্পপূজার ব্যাপক প্রচলন ভারতের সর্বত্রই দেখা গিয়াছিল। মনে হয়, সেই সময়ই বাংলাদেশে উক্ত বৃক্ষোপাসক জাতির প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাবে এদেশেও বিশেষ এক শ্রেণীর বৃক্ষের মধ্যেই সর্পের পূজা করিবার রীতি প্রথম প্রবর্তিত হয়। এই বৃক্ষের নাম মনসা বৃক্ষ, ইহাকে সংস্কৃতে স্নুহীবৃক্ষ বলা হইয়াছে।

স্নুহীবৃক্ষের কতকগুলি রোগ-প্রতিষেধক গুণ আছে, তাহা হইতেই আদিম সমাজে ইহার পূজার সূত্রপাত হয় বলিয়া মনে হয়, পরে কালক্রমে ইহার সঙ্গেই কোনও কারণে বৃক্ষমধ্যে সর্পপূজার ধারাটি আসিয়া মিশিয়া যায়। স্নুহী কিংবা ইহার যতগুলি প্রতিশব্দ সংস্কৃতে পাওয়া যায়, যেমন—সেহুণ্ড, সিংহতুণ্ড, বজ্রী, বজ্রদ্রুম, সুধা, সমন্তদুগ্ধা, স্নুব, গুড়া ইত্যাদি—তাহাদের কতকগুলি প্রত্যক্ষভাবে দেশজ ভাষা হইতে গৃহীত ও কতকগুলি পরবর্তীকালে পরিকল্পিত। প্রত্যক্ষভাবে সর্পবিষ না হইলেও অন্যান্য গুণের মধ্যে স্নুহীবৃক্ষের বিষনাশ করিবারও গুণ আছে বলিয়া 'ভাবপ্রকাশে' উল্লিখিত হইয়াছে। 'ভাবপ্রকাশে' স্নুহীবৃক্ষের এইভাবে গুণকীর্তন করা হইয়াছে—'স্নুহী বা সীজ বৃক্ষ তীক্ষ্নরেচক, দীপক, কটু ও গুরু। ইহা শূল, আম, অষ্ঠীলা, আধ্মান, কফ-গুল্ম, উদর, অলিন্দ, উন্মাদ, মোহ, কুষ্ঠ, অর্শ, শোথ, মেদ, অশ্মরী, ব্রণশোথ, জ্বর, প্লীহা, বিষ ও দূষীবিষ নাশ করে। স্নুহীক্ষীর উষ্ণবীর্য, স্নিগ্ধ, কটুরস ও লঘু, গুল্ম কুষ্ঠ ও উদর ও অন্যান্য দীর্ঘরোগে বিবেচনার্থ ইহা শ্রেষ্ঠ। আবার কেহ কেহ মনে করেন, সীজগাছ বজ্রপাতনিবারক। সেইজন্য কলিকাতা ও বড় বড় শহরের বাড়ির ছাদে টবের মধ্যে সীজ গাছ পুঁতিয়া রাখা হয়। মনে হয়, স্নুহীক্ষীরের বিষ-প্রতিষেধক গুণ হইতেই স্নুহীবৃক্ষের প্রতি আদিম সমাজে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়বোধের উৎপত্তি হইয়াছিল; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, দাক্ষিণাত্যেও পালা বলিয়া পরিচিত এক শ্রেণীর অনুরূপ ক্ষীরযুক্ত

বৃক্ষেই সর্প ও অন্যান্য গ্রাম্যদেবদেবীর পূজা হইয়া থাকে (M.N. Srinivas, *Religion and Society among the Coorgs of South India*, Oxford, 1952, p.77)। পরে বৃক্ষমধ্যে সর্পপূজার ধারাটিও ইহার মধ্যে আসিয়া মিশ্রিত হয়।

সুহীবৃক্ষে সর্পপূজার ধারাটি আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে অব্যাহত চলিয়া আসিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সীজমনসা গাছের এই প্রকার বিভিন্ন নাম পাওয়া যায় ঃ ইহাকে উত্তর-প্রদেশে মেহগু, থুহর ও সীজ এবং বোম্বাইয়ে নিবড়ুঙ্গ বা থোর বলে। গুজরাটে থোরডাং ডলিয়ো কটালী, হাতলোতরধারী, নানোপরদেশী; মহারাষ্ট্রে নিবড়ুঙ্গ, কাংটে নিবড়ুঙ্গ, ফনীচেং নিবড়ুঙ্গ, বিকাংডী; কর্ণাটে নিবডিংগু; তৈলঙ্গে চেংমুড় বলে। বাংলাদেশেই কেবল ইহার মনসা নাম। বলা বাহুল্য, উদ্ধৃত নামগুলির কোনোটিই সংস্কৃত হইতে জাত নহে, প্রত্যেকটি দেশজ শব্দ। ইহাদের মধ্যে তৈলঙ্গ দেশে প্রচলিত চেংমুড় নামটির কথা পরে আরও বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইবে। কারণ, বাংলাদেশে পূজিতা সর্পের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া কল্পিত একমাত্র দেবীকে চেংমুড়ী বলিয়াও কোনও কোনও জায়গায় উল্লেখ করা হইয়াছে। আসামের বোড়ো নামক ইন্দোমোঙ্গলীয় জাতির এক শাখার মধ্যে সীজ বৃক্ষের পূজার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা বাঘন ও বুড়ীমা নামক দেবতার সীজ বৃক্ষেই পূজা করিয়া থাকে। প্রস্তরক্ষোদিত সীজ বৃক্ষ আসামের বোড়ো অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব বঙ্গে বোড়ো সংস্কৃতির দান অনস্বীকার্য। অতএব সীজ বৃক্ষে মনসা পূজা বোড়ো জাতির দান হইতে পারে। উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের ভাষায় এই জাতীয় বৃক্ষকে Cactus বলে, ইহার শতাধিক genera এবং প্রায় ১৩০০ species আছে। সীজমনসার গাছ Cactus Indianis নামে পরিচিত। ভারতবর্ষের বাহিরেও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ইহার ব্যবহার প্রচলিত আছে। যেমন, 'The Cactus is of special religious significance among American Pueblo Indians. It is one of the plants that "give of themselves" to the people. The Zuni Cactus Society is a war Society functioning also for the control of game and the curing of wounds; it approaches the cactus with a special beaded prayer feather. In the ritual whipping of chiefs being installed, the Cactus Societies of Zuni and Jemez both use cacti. This gives those who are whipped great power and luck in hunting and gambling. Members of the Hans Cactus Society also whipped each other with cacti to induce bravery and endurance, and to make the ground freeze so that their warriors would leave no tracks. At Tewa, Cactus Grand-mother is passed from hand to hand with song within the Winter Kiva. If she is dropped it portends bad luck. During this "journey" thrice round the circle she becomes smaller and smaller and in the fourth round she finally vanishes and has returned to her own people. When people go to look, there she is growing in her own place as fresh as ever.

Pieces of Cactus are put in the corners of each new Hopi house "to give the house roots". At Acoma during certain kachina activities men rule themselves against the Cactus (carried by other) to attain manliness.' *Dictionary of Folklore Mythology and Legends*, Ed. Maria Leach ; New York, 1949, vol. I, p. 178.)

প্রত্যক্ষভাবে বৃক্ষমধ্যে সর্পপূজার পরের অবস্থাই প্রস্তরে ক্ষোদিত সর্পমূর্তির পূজা। সর্পের অধিষ্ঠাতা কোন নরাকৃতি দেবতা কিংবা দেবীর পরিকল্পনা আরও পরবর্তীকালীন। পৌরাণিক যুগে যখন বৈদিক নৈসর্গিক দেবদেবীগণ নর-নারীর প্রত্যক্ষ মূর্তি লাভ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখনই আর্যসমাজবহির্ভূত অঞ্চল হইতে আগত পশুদেবতাগণও তাঁহাদেরই অনুকরণে নানা প্রকার বিচিত্র দেবদেবীর রূপ লাভ করিতে আরম্ভ করিল। সিদ্ধিদাতা গণেশ ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পৌরাণিক যুগে দেবতার নর-নারী আকৃতির মূর্তি গঠনই যখন দেব-পূজার প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিল, তখন অনার্য দেবতাগণও এই আদর্শের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না। সেইজন্য সর্পমূর্তির পরিবর্তে এইবার ইহাদের নরাকৃতি দেবতা ও সর্পের অধিষ্ঠাত্রী নারীরূপা দেবীরও পরিকল্পনা হইতে লাগিল। এই যুগ হইতেই সর্পমূর্তির পরিবর্তে সর্পদেবরী মূর্তি পূজিতা হইয়া আসিতে থাকিলেও এখনও ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে প্রকৃত সর্পমূর্তি পূজার প্রাচীনতম ধারাটির সঙ্গে ও সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে এখনও সর্পমূর্তির প্রচলন ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতে অধিক।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ আর্যসাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও আর্যধর্ম ও সংস্কৃতি এই দেশে যে তাহার পরও কখনই সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। পশ্চিম-ভারতে আর্যদিগের আক্রমণের পর পরাজিত দ্রাবিড়গণ সর্বপ্রথম সম্ভবতঃ গঙ্গার দুই তীর ধরিয়া পূর্বদিকেই অগ্রসর হইয়া আসিতে থাকে। কারণ, দাক্ষিণাত্য তখনও নিবিড় অরণ্যাকীর্ণ ছিল। রামায়ণের কাহিনীই তাহার প্রমাণ। বঙ্গদেশই উত্তর-ভারতের মধ্যে দ্রাবিড়দিগের সর্বশেষ আশ্রয়-স্থল। এই দেশে বহুকাল বসবাস করিয়া মহাভারত বা আর্যভূমি হইতে বহু দূরে নিরুপদ্রবে তাহারা যে নিজস্ব সংস্কার পালন করিয়া গিয়াছিল, আধুনিক বাংলার সমাজে তাহারই বহু চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। সর্পপূজাও তাহাদের অন্যতম। দ্রাবিড়গণ পূর্বভারতে আসিয়া ক্রমে মোঙ্গলজাতির সহিত মিশ্রিত হয় এবং এই মিশ্রণের ফলে উভয়ের মধ্যে সংস্কৃতির আদানপ্রদান আরম্ভ হয়। মোঙ্গলজাতির নিকট হইতে এদেশে আগমণ বা তন্ত্রশাস্ত্র প্রচারিত হয় বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা পরে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে।

পূর্ব-ভারতীয় মহাযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে জাঙ্গুলী নামক এক দেবীর অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। মহাযান বৌদ্ধদিগের মতে জাঙ্গুলী দেবী অত্যন্ত প্রাচীনা—এমন কি, ভগবান বুদ্ধ তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য আনন্দকে এই দেবী-পূজার গোপন মন্ত্র

শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, অত্যন্ত প্রাচীনকাল হইতেই পূর্বভারতীয় বৌদ্ধ-সমাজে জাঙ্গুলীর পূজা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার সূত্রগন্থ 'সাধন-মালা'তে জাঙ্গুলীদেবীর পূজার প্রকরণ ও তাঁহার মন্ত্রের সম্বন্ধে বিস্তৃত উল্লেখ রহিয়াছে। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন যে, জাঙ্গুলীর সঙ্গে বাংলার সর্পদেবী মনসা বা বিষহরীর সাদৃশ্য আছে। শুধু তাহাই নহে, তাঁহারা অনুমান করেন যে, জাঙ্গুলীদেবীর সঙ্গে মনসাদেবীর মৌলিক সম্পর্ক রহিয়াছে।

'সাধন-মালা'য় জাঙ্গুলীর চারি প্রকার সাধনার কথার উল্লেখ আছে। প্রথম দুই প্রকার সাধনার মন্ত্র হইতে দেবীর যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানিতে পারা যায়, জাঙ্গুলীদেবী সর্বশুক্লা, চতুর্ভূজা, একমুখা, শুক্ল সর্প-বিভূষিতা ও বীণাপাণি—কোন প্রাণীর উপর তাঁহার আসন সংস্থাপিত, দুই হস্তে ধৃত সর্প ও অপর হস্তে অভয় মুদ্রা। দ্বিতীয় সাধন মন্ত্রে দেবীর যে পরিচয় রহিয়াছে, তাহা অনেকাংশেই প্রথমেরই অনুরূপ, তবে ইহাতে দেবী ত্রিশূল, ময়ূরপুচ্ছ (সম্ভবত লেখনী) ও সর্পহস্তা এবং অবশিষ্ট হস্তে অভয়দাত্রী।

'সাধন-মালা'য় দেবীর যে আর এক প্রকার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা একটু স্বতন্ত্র; কিন্তু তথাপি মূল প্রকৃতিতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ইহাতে জাঙ্গুলীদেবী ত্রিমুখা ও ষড়্‌ভুজা। তিনি এখানে পীতবর্ণা ও সর্পের বিস্তৃত ফণাতলে আসীনা, তিনটি দক্ষিণ হস্তে খড়্গ, বজ্র, বাণ ও তিনটি বামহস্তে পাশ, নীলোৎপল ও ধনু ধৃত, দেবী সর্বালঙ্কারভূষিতা ও উজ্জ্বল কুমারী-লক্ষণাক্রান্তা। মহাযান তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ এই পরিচয়-অনুযায়ী জাঙ্গুলীদেবীর মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করিতেন। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু উড়িষ্যার অন্তর্গত ময়ূরভঞ্জ হইতে এই প্রকার একটি মূর্তি আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মূর্তিটি ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত হরিহরপুরের প্রাচীন দুর্গে রক্ষিত ছিল। ইহার প্রকৃত নাম জাঙ্গুলীতারা। মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ শ্রমণগণ এই দেবীর অর্চনা করিতেন। মূর্তিটি দ্বিভূজা, 'সাধন-মালা'য় দ্বিভুজা জাঙ্গুলী মূর্তি নির্মাণেরও বিধি আছে। এই মূর্তি ব্যতীতও স্বর্গত বসু মহাশয় ময়ূরভঞ্জে অনুরূপ আরও মূর্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংবাদ পাইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। জাঙ্গুলীতারার প্রভাব যে পূর্ব-ভারতের ভৌগোলিক সীমার বাহিরেও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বাণভট্ট কর্তৃক রচিত 'হর্ষচরিত' ও খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত একখানি সংস্কৃত নাটক হইতেও জানিতে পারা যায়। সাপুড়ে অর্থে বাণভট্ট 'জাঙ্গুলিক' কথাটির ব্যবহার করিয়াছেন।[১] নাটকখানির নাম 'কৌমুদী-মিত্রানন্দ'। ইহার রচয়িতার নাম রামচন্দ্র।[২] তিনি জৈনাচার্য হেমচন্দ্রের শিষ্য। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গুজরাটের কাথিয়াবাড় অঞ্চলে রামচন্দ্র তাঁহার এই নাটকখানি রচনা

১। 'হর্ষচরিত', নির্ণয়সাগর প্রেস (বোম্বাই, ৪র্থ সংস্করণ), ৪২

২। মুনি পুণ্যবিজয় সম্পাদিত, জৈন আত্মানন্দ গ্রন্থমালা (ভবনগর, ১৯১৭)

করেন। ইহা দশ অঙ্কে সম্পূর্ণ একটি শৃঙ্গাররসাত্মক নাটক। পরবর্তী সংস্কৃত নাটকের আদর্শে ইহা রচিত। ইহাতে সর্পবিষ নিরাকরণের জন্য জাঙ্গুলীদেবীর নিকট কতকগুলি ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রোচ্চারণের কথা আছে।

ইহা হইতেই এই জাঙ্গুলীদেবীর পূজা যে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, তাহাই অনুমিত হয়। পালরাজদিগের সময় পর্যন্ত বাংলার সমাজে মহাযান তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। অতএব এই সময় পর্যন্ত বাংলার সমাজেও যে এই প্রাচীন সর্পদেবী জাঙ্গুলীর প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত ব্যাপকভাবেই প্রচলিত ছিল, তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় এই সর্পদেবীর কল্পনার জন্য বেদের নিকট ঋণী বলিয়া কেহ অনুমান করিয়াছেন। অথর্ববেদে এক সর্পবিদ্যা-পারদর্শিনী কিরাত-কন্যার উল্লেখ আছে। এই কিরাত-কন্যা সর্পদংশনের প্রতিকার করিতে অভিজ্ঞা। কিন্তু অথর্ববেদে তাহার উপর তখন পর্যন্ত দেবীত্ব আরোপ করা হয় নাই। সে সাধারণ অনার্য কিরাত-দুহিতা, তবে সে সর্পবিদ্যা সম্বন্ধে কতকগুলি অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী। তাহার চরিত্রগত এই অলৌকিকতার জন্য তাহার উপর পরবর্তী কালে দেবীত্ব আরোপিত হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নহে। অথর্ববেদে বিষনাশিনী আর একটি চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। তাহার নাম ঘৃতাচী। অনেকে মনে করেন, ঘৃতাচী ও পূর্বোক্ত কিরাত-দুহিতা অভিন্না। কিন্তু এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই। অথর্ববেদে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবী সরস্বতীর একটি গুণের মধ্যে এই যে, তিনি বিষনাশিনী। পূর্বে 'সাধন-মালা' হইতে জাঙ্গুলী-তারার যে স্তব-মন্ত্র উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইবে যে, তাঁহাকে একস্থানে 'সর্বশুক্লাং শুক্লোত্তরীয়াং সিতরত্নালঙ্কারভূষিতাং বীণাং বাদয়ন্তীম্' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং অন্যত্র ময়ূরপুচ্ছ অর্থাৎ 'লেখনীহস্তা'ও বলা হইয়াছে। জাঙ্গুলীদেবীর বাহন হংস, সরস্বতীদেবীর বাহনও হংস, প্রাচীন ভাস্কর্যে উভয়েই চতুর্ভুজা। জাঙ্গুলীদেবীর স্তবোক্ত সকল গুণই অধুনা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া পূজিতা সরস্বতীদেবীর উপর প্রযোজ্য। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, যজুর্বেদের যুগেই সঙ্গীতবিদ্যার মত সর্পবিদ্যাও একটি অবশ্যপাঠ্য বিশেষ বিদ্যা বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। সেইজন্য সেই যুগে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর পরিকল্পনার সহিত সঙ্গীত-বিদ্যার প্রতীক বীণার সঙ্গে সরস্বতীদেবীর হস্তে সর্পবিদ্যার প্রতীকরূপে সর্পও স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু বৈদিক সরস্বতীর পরবর্তী সংস্কারে তাঁহার সর্প-সংস্রবের এই অনার্য অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছিল; তথাপি তাহাই যে আবার মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের বহির্ভাগেও অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল, জাঙ্গুলীমাতার বৃত্তান্ত হইতে তাহাই জানিতে পারা যায়। এইভাবে মূলতঃ এক হইয়াও জাঙ্গুলী ও সরস্বতী একজন বৌদ্ধ তান্ত্রিক সমাজ ও অপরজন বৈদিক সমাজ অবলম্বন করিয়া ক্রমে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল।

উল্লিখিত জাঙ্গুলীদেবীই যে অথর্ববেদোক্ত সর্পবিষনাশিনী কিরাত-কন্যা, বৈদিক সরস্বতীর প্রাথমিক পরিকল্পনার সঙ্গে অভিন্ন হইয়া তিনি পরে পূর্বভারতীয় মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে অবলম্বন করিয়া জাঙ্গুলী নামে পূজিতা হইতেন এবং আরও পরবর্তী কালে বৌদ্ধধর্ম বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে মনসাদেবী নামে পরিচিতা হইয়াছেন, এই বিষয় এখন আরও আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে। জাঙ্গুলীতারার পূর্বোদ্ধৃত বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে আধুনিক কাল পর্যন্ত এই দেশে প্রচলিত বিষহরী বা মনসাদেবীর ধ্যানটি তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, পূর্বোক্ত জাঙ্গুলীতারাই ক্রমে বিষহরী বা মনসাতে পরিণত হইয়াছেন। এই ধ্যান-মন্ত্রটিতে জাঙ্গুলীকেই স্পষ্টতঃ বিষহরী বা মনসা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—

কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং সুবদনাং পদ্মাননাং শোভনাম্
নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরাং ফণীময়ীং দিব্যাঙ্গরাগান্বিতাম্।
চার্বঙ্গীং দধতীং প্রসাদমভয়ং নিত্যং করাভ্যাং মুদা
বন্দে শঙ্কর-পুত্রিকাং বিষহরীং পদ্মোদ্ভবাং জাঙ্গুলীম্॥

আধুনিককালে বাংলাদেশে প্রচলিত আরও একটি মনসার ধ্যান পূর্বোদ্ধৃত জাঙ্গুলীতারার বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে,

দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদান্যাম্
হংসারূঢ়ামুদারামরুণিতবসনাং সর্বদাং সর্বদৈব।
স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগণৈর্নাগরত্নৈরনেকৈ
র্বন্দেহহং সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাং যোগিনীং কামরূপাম্॥

সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, দ্বিতীয় ধ্যান-মন্ত্রটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইহার মধ্যে মহাভারতের অষ্টনাগ আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। ইহাতেও মনসাদেবীকে হংসারূঢ়া বলা হইয়াছে, এই হংস জাঙ্গুলী ও সরস্বতীর বাহন। এতদ্ব্যতীত খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর একজন মনসা-মঙ্গলের কবি বিপ্রদাস রচিত কাব্যে মনসাদেবীর এক নাম 'জাগুলি' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত ধর্মপূজা বিধানে মনসা বা বিষহরীর স্তোত্রে বিষহরীর নাম জাগুলি। অতএব বৌদ্ধতান্ত্রিক জাঙ্গুলি, এই জাগুলি ও মনসা যে সম্পূর্ণ অভিন্ন, তাহা এক রকম নিশ্চিতভাবেই বলা যাইতে পারে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতেও বাংলার সমাজে এই সর্পদেবী কোনও কোনও স্থানে জাগুলি নামেও পরিচিতা থাকিলেও তাঁহার মনসা নাম ইতিমধ্যেই ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল। মনে হয়, তাহার অন্তত দুই শত বৎসর পূর্বে বাংলার সর্পদেবীর এই জাঙ্গুলী নামের পরিবর্তে মনসা নামটির প্রচলন হয়। বৌদ্ধ পালরাজত্বের অবসানে যখন সেনরাজগণ কর্তৃক এই দেশে হিন্দুরাজবংশ স্থাপিত হয়, তখন এই দেশে যে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয় হয়, সেই সময় বৌদ্ধধর্ম নানাভাবে আত্মগোপন করিতে আরম্ভ করে। বৌদ্ধধর্ম তখন এ'দেশের সমাজে সামাজিক প্রতিষ্ঠা

হইতে ভ্রষ্ট হওয়ার ফলে বৌদ্ধ দেবদেবীগণও তাঁহাদের বৌদ্ধ-পরিচয় পরিত্যাগ করিয়া নূতন পরিচয় গ্রহণ করিতে থাকেন। বাংলায় বৌদ্ধরাজত্বের অবসান ও হিন্দুরাজত্বের প্রতিষ্ঠার যুগেই মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়কর্তৃক পূজিত সর্পদেবী জাঙ্গুলীর মনসা নামকরণ হয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মুসলমান আক্রমণের সময় বৌদ্ধদিগের উপর মুসলমানদিগের নির্যাতনের ফলে যখন এই দেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের ধর্মবিষয়ক সমস্ত পুঁথিপত্র লইয়া নেপালে পলাইয়া যান, তখন হইতে এই দেশে জাঙ্গুলীতারার নাম সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায়। সেইজন্য পঞ্চদশ শতাব্দীতে মনসাদেবী-বিষয়ক একাধিক মঙ্গলকাব্য রচিত হইলেও তাহাদের একটির মধ্যে মাত্র একবার জাঙ্গুলী বলিয়া মনসাদেবীকে উল্লেখ করা হইয়াছে—আর সর্বত্রই তাঁহার মনসা নামেরই পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

মনসা নামটি কোথা হইতে আসিল, তাহাই এখন বিচার করিয়া দেখিতে হয়। প্রাচীন কোনও সংস্কৃত অভিধানে কিংবা পাণিনির ব্যাকরণেও মনসা নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। রামায়ণ-মহাভারত কিংবা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পুরাণগুলিতেও মনসা নামের কোনও উল্লেখ নাই। পরবর্তী কয়েকটি সংস্কৃত উপপুরাণ এবং অর্বাচীন কয়েকটি সংস্কৃত অভিধানে মনসা নামের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। এই সকল পুরাণ এবং অভিধান কোনটিই খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কালে রচিত নহে। অতএব মনে হয়, খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতেই এই শব্দটি সংস্কৃত পুরাণ ও অভিধানে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু ইহা কোথা হইতে আসিল?

অর্বাচীন সংস্কৃত অভিধানগুলিতে মনসা শব্দের যে ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা হইয়া থাকে, তাহা অত্যন্ত অসন্তোষজনক; সেইজন্যই মনে হয়, শব্দটি ভারতীয় কোনও অনার্য ভাষা হইতে আসিয়াছে। সংস্কৃত অভিধানগুলিতে এইভাবে ইহার ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা হইয়াছে, যেমন, 'মনসা সৃষ্টা ইতি' মনসা, অলুক সমাস। ইহার ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা হইয়া থাকে যে 'কশ্যপেন মনসা সৃষ্টা।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনসা-মঙ্গলের প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে মনসাদেবীর উৎপত্তির যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে মনসাদেবী যে কশ্যপ কর্তৃক তাঁহার মন হইতে সৃষ্ট তাহার আভাস মাত্র নাই। অতএব শব্দটি যে অনার্য-ভাষা হইতে আগত এই বিষয়ে সংশয়ের কোনও কারণ নাই। তাহা হইলে ইহা কোন্ অনার্য ভাষা হইতে কি ভাবে বাংলা দেশে আসিয়াছে, তাহাই বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

এই বিষয় আলোচনা করিবার কালে ভারতের আর কোনও অঞ্চলে সর্পদেবী অর্থে মনসা কিংবা ইহার অনুরূপ কোনও নাম প্রচলিত আছে কিনা, তাহাও সন্ধান করিয়া দেখিতে হয়। উত্তর-ভারত অঞ্চলে সর্পদেবীর পূজার প্রচলন খুব বেশী নাই। সর্বত্রই প্রায় সর্পদেবতা নাগরাজ বাসুকিরই পূজা প্রচলিত। দুই-একটি স্থানে ইহার ব্যতিক্রম আছে, তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

বিহারের অন্তর্গত প্রাচীন রাজগৃহের ধ্বংশাবশেষ যে স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই স্থানটির নাম রাজগীর; খননকার্যের ফলে এখানে একটি সর্পমন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। মন্দির-মধ্যে কয়েকটি নারীরূপা নাগিনীমূর্তি অক্ষতভাবে পাওয়া গিয়াছে। মনে হয়, এই নাগিনীগণ সর্পদেবীরূপে এখানে এককালে পূজা পাইতেন। যদিও প্রাচীন হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদিতে নাগিনীপূজার কোনও উল্লেখ নাই, তথাপি মনে হয়, স্থানীয় কোনও লৌকিক সর্পদেবী এইভাবে হিন্দু কিংবা বৌদ্ধধর্মের মধ্যে গিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। মন্দিরটি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন। কিন্তু এই মন্দিরের ঐতিহ্যের ধারা কোনদিনই একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। ইহা এখনও 'মনিয়ার মঠ' বলিয়া পরিচিত। স্থানীয় অধিবাসিগণ এখনও ইহাতে মনিয়ার নামক নাগের অর্চনা করিয়া থাকে। বিহারের জনশ্রুতি অনুযায়ী মনিয়ার নামক সর্পই বাসরগৃহে লখিন্দরকে দংশন করিয়াছিল। মনিয়ারের সঙ্গে মনসার উচ্চারণগত যে সামান্য সাদৃশ্যটুকু আছে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া মনিয়ার শব্দ হইতেই যে মনসা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে এমন ধারণা করা অসঙ্গত হইবে। তথাপি একটি বিষয় এখানে স্পষ্ট হইয়াছে যে, পূর্ব-ভারত অঞ্চলে নারীরূপা সর্পদেবীর পূজা বহু প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, বর্তমানে এই নাগিনীমূর্তিগুলিকে পূজা করিবার পরিবর্তে এই মঠে মনিয়ার নামক সর্পের উদ্দেশ্যেই পূজা নিবেদন করা হইয়া থাকে।

পূর্ব-পাঞ্জাবের আম্বালা ও গুরগাঁও জিলায় দুইটি সর্পমন্দির আছে; মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম মনসা।[১] পশ্চিম যুক্তপ্রদেশে হরিদ্বার শহরের উপর মনসা পাহাড় নামক একটি টিলা ও তদুপরি মনসাদেবীর মন্দির নামক এক ক্ষুদ্র মন্দির আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে এক ক্ষুদ্র দেবীমূর্তি আছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সর্পের কোন সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় না। উত্তর-প্রদেশে নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে এখনও অনেকে 'মনসা' নাম শুনিতে পাওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশের কোনও জাতির মধ্যে এক পুং-দেবতা অর্থে মনসা কথাটি প্রচলিত আছে ; কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সর্পের সঙ্গে তাঁহার কোনও সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না। 'Mansa deo is also a household god, but is usually worshipped outside the home A small platform of mud is raised by the wall just in front of the house, and on the wall some daubs (usually four) of *sendur* are put, and two small red flags are set up.' (Griffiths, W.G., *The Kol Tribe of Central India*, Calcutta, 1940, p. 146)

দেবীর মনসা নামটি বাংলাদেশ হইতে সেই সুদূর পূর্ব-পাঞ্জাব ও পশ্চিম-যুক্তপ্রদেশ অঞ্চলে নীত হইয়াছে; কিংবা তাহা সেখানেই মূলত উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলিবার উপায় নাই। কারণ, এককালে বাঙ্গালী সাপুড়েরা সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া

১। H. A. Rose, *A Glossary of the Tribes and Castes of the Punjab and North-Western Frontier Province* (Lahore, 1919), p. 318.

জীবিকা অর্জন করিত; এখনও বহুস্থানেই তাহাদেরই বংশধরগণ তাহাদের জাত-ব্যবসায় পালন করিয়া যাইতেছে। উত্তর-প্রদেশে এক শ্রেণীর সাপুড়িয়া আছে, তাহারা এখনও 'বাঙ্গালী' বলিয়া পরিচিত; কিন্তু তাহাদের মাতৃভাষা এখন হিন্দী।

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত রাঁচি জিলার ওরাওঁ নামক আদিম জাতির মধ্যে সর্পদেবীরূপে 'মনসা'র নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে সাপের ওঝাকে 'নাগমতি' বলে। নাগমতি ও তাহার শিষ্যগণ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে 'মনসা'র নিকট মুরগী বলি দিয়া 'মনসা'র পূজা করিয়া থাকে। মতি ও তাহার শিষ্যগণ এই উপলক্ষে সারাদিন উপবাস করিয়া থাকে এবং সন্ধ্যার সময় নাগমতির জন্য একটি এবং তাহার প্রত্যেক শিষ্যের জন্য একটি করিয়া মুরগী বলি দেয়। সকলে মিলিয়া একসঙ্গে মনসার মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়া গান গায় ও তালে তালে হাতে তালি বাজাইয়া থাকে। এই উপলক্ষে সাপের বিষ ঝাড়িবার নানা প্রকার মন্ত্র আবৃত্তি করা হয় এবং নানা জাতির সাপের নাম করা হয়। মন্ত্র দ্বারা বিষ প্রথমত উপরের দিকে ও পরে নীচের দিকে চালাইয়া দেওয়া হয়। ওরাওঁদিগের মধ্যে প্রচলিত মনসার মাহাত্ম্যকথা কিংবা বিবিধ সাপের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই, তাহা হইলে বাংলা দেশের সঙ্গে ইহাদের কোন যোগ আছে কিনা জানা যাইত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, মনসা নামটি বাংলাদেশ হইতেই রাঁচির ওরাওঁ অঞ্চলে গিয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মানভূম ও হাজারিবাগ জিলার সংলগ্ন অঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর লোক বিশেষত কুর্মীদিগের মধ্যে সর্পদেবী রূপে মনসা নামটি সুপরিচিত। সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদিগের মধ্যেও মনসার নাম অপরিচিত নহে।

সিংহভূম জিলার অন্তর্গত কম্বন অঞ্চলের হো জাতির মধ্যেও মনসা দেবীর নাম প্রচলিত আছে। সেখানেও বাংলাদেশ হইতেই যে নামটি গিয়াছে এই বিষয়ে কোন ভুলও নাই। কিন্তু বাংলাদেশের মত মনসার পূজা সেখানে প্রচলিত হইতে পারে নাই, বরং মনসাকে তাহারা নিজস্ব উপজাতীয় সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। সেখানে মনসার কোনও প্রতিমা কিংবা ঘট গড়া হয় না, ক্ষুদ্র একটি মাটির ঢিপি নির্মাণ করিয়া তাহাতেই মনসাদেবীর উদ্বোধন করা হইয়া থাকে। হো যুবকগণ ওড়িয়া ওঝার নিকট হইতে সাপের মন্ত্র শিক্ষা করে; এই মন্ত্রগুলি সাঁওতাল পরগণায় ব্যবহৃত সাঁওতাল ওঝাদিগের মন্ত্রের মতই বাংলা, 'they are muttered and sung in such a sing-song tune that very few could understand they were mostly in Bengali spoken in Oriya style.'

এমন কি, দেওঘরে বৈদ্যনাথ শিবমন্দিরের আঙ্গিনায়ও একটি মনসাদেবীর মন্দির আছে, কিন্তু মন্দিরটি যে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের পর অর্থাৎ নিতান্ত আধুনিককালে নির্মিত তাহা বুঝিতে পারা যায়।

অতএব বাংলাদেশের বাহিরে মনসা নামটির সন্ধান পাওয়া গেলেই তাহাই বাংলায় প্রচলিত

মনসা নামটির উৎপত্তির মূল বলিয়া নির্দেশ করা সমীচীন হইবে না।

বাংলার আর্য-পূর্ব সভ্যতার সহিত দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় সভ্যতার অনেকাংশেই ঐক্য ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। সেইজনাই বাংলার সর্পদেবী জাঙ্গুলীর মত দাক্ষিণাত্যেও বিভিন্ন নামীয় সর্পদেবীয় অস্তিত্ব ছিল এবং এখনও আছে। জাঙ্গুলী শব্দটি যেমন সম্ভবত অনার্য শব্দ 'জঙ্গল' বা বন হইতে উদ্ভূত (জঙ্গল বা অরণ্যের অধিবাসিনী এই অর্থে), এই সকল সর্পদেবীর নামও অনার্যভাষা-উদ্ভূত ছিল। যেমন মুদামা, মঞ্চাম্মা ইত্যাদি। অন্ধ্রদেশে, বিশেষত ভিজাগাপত্তন জিলার দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় নেলোর প্রভৃতি জিলায়, নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে নাগম্মা বা বালনাগম্মার কাহিনী নামক এক সর্পকাহিনী প্রচলিত আছে। ইহাতে মৃত্তিকাদ্বারা একটি নারীমূর্তির উপরার্ধ গঠন করা হয় এবং তাহাই নাগম্মা নামে পরিকল্পিত হয়। পুতুলনাচ সহযোগে নাগম্মার মাহাত্ম্যসূচক কাহিনী গান করিয়া এক শ্রেণীব ব্যবসায়ী (তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রী) অন্ধ্রদেশের প্রায় সর্বত্র, এমন কি, মাদ্রাজ শহরেও জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। তবে নাগম্মার কাহিনীর মধ্যে যে সকল ঘটনা বিবৃত হয়, তাহাদের সঙ্গে বাংলাদেশের মনসা-কাহিনীর কোনও যোগ দেখিতে পাওয়া যায় না। নাগিনীচরিত্রেব নাগম্মা কিংবা বালনাগম্মা নামটি কোনও অধুনা-লুপ্ত তেলুগু নামের পরিবর্তে বর্তমানে ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

মহীশূরে সাধারণত ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে মুদামা নামে এক সর্পদেবী আজ পর্যন্ত পূজা পাইয়া আসিতেছেন। উচ্চতর হিন্দুসমাজের মধ্যে আর্য-সংস্কৃতিব প্রভাববশত পুংদেবতা নাগরাজেরই পূজা প্রচলিত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্নতর সমাজে এই লৌকিক স্ত্রী-দেবতার পূজার বিশেষ প্রাধান্য লক্ষিত হয়। মহীশূরের প্রাচীন ভাস্কর্যে মুদামা-র বহু মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শ্রেণীর মূর্তির নিম্নভাগ সর্পাকৃতি এবং উপরের ভাগ স্ত্রী-আকৃতি। মৎস্যকন্যার মত ইহারা অর্ধনাগিনী ও অর্ধনারী-মূর্তি[illegible]স্পষ্ট। বহু প্রাচীনকালে মধ্য-এশিয়ার স্কাইথীয় জাতির মধ্যে এলা নামে অনুরূপ আকৃতির এক নাগকন্যা পূজিতা হইত। স্কাইথীয়গণ ভারতবর্ষে আসিবার পর তাহারা এই পূজার প্রথা ভারতবর্ষে প্রচলন করিয়া থাকিবে। কারণ, মহাভারত ও বৌদ্ধ সাহিত্যে এলাপাত্র নামক এক নাগের বিস্তৃত উল্লেখ আছে। এই আদর্শের নাগকন্যার মূর্তি ভারতের আরও বহু অঞ্চল হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। উড়িষ্যায় ময়ূরভঞ্জে পাঁচপীরের অন্তর্গত খিচিং নামক স্থানে কিঞ্চকেশ্বরী (কঞ্চুকেশ্বরী? কুঞ্চক—সর্পখোলস) বা খিচিঙ্গেশ্বরী নামে এক সর্পদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত কোপ্তিপন্দা ও রায় বনিয়াতে বৈরাট-পাটঠাকুরাণী নামেও এক সর্পদেবীর সহিত পরিচয় লাভ করা যায়। ইহাদেরও আকৃতি সম্পূর্ণভাবেই মহীশূরের মুদামা মূর্তিরই অনুরূপ। এই মূর্তিগুলি দ্বিভুজা, উভয় বদ্ধমুষ্টিতে সর্পশিশু ধৃত, মস্তকোপরি বিস্ফারিত সর্পফণার ছত্র, মুখে ধ্যানভঙ্গি। দক্ষিণাপথের এই মুদামা মূর্তির আদর্শের সঙ্গে বাংলার প্রাচীন মনসা-মূর্তিগুলির তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ইহাদের উপরিভাগের গঠনাকৃতি প্রায় অভিন্ন। মনে হয়, ভাস্কর্যে এই প্রকার সর্পদেবী নির্মাণের একটি আদর্শ

দক্ষিণাপথ হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, তবে বাংলাদেশের তদানীন্তন স্থানীয় দেবীমূর্তি নির্মাণের আদর্শের প্রভাব এখানকার মূর্তিগুলির উপর কতকটা কার্যকর হইয়াছিল; তাহারই ফলে ইহা হইতে ইহাদের নাগসংস্রবের অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই বিষয়ে পরে বিস্তৃততর আলোচনা করা যাইতেছে।

মাদ্রাজ শহরে প্রাদেশিক সরকারের প্রত্নাগারে বিভিন্ন রূপের কয়েকটি নাগমূর্তি রক্ষিত আছে—এতদ্ভিন্ন মাদ্রাজের সমুদ্রোপকূল অঞ্চলে ভ্রমণ করিলে অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে সরীসৃপাকৃতি নাগমূর্তি প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা দেশের নাগঘটে,পটে মেড়ে বা করণ্ডীতে যে সকল নাগ-নাগিনী রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, ইহাদের মধ্যে তাহাদের বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না; বরং অনেক সময় নিখুঁত ঐক্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

দাক্ষিণাত্যের লৌকিক ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, মুদামা ভিন্ন অন্যান্য লৌকিক সর্পদেবীর পূজাও সেখানে আজ পর্যন্তও প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে কানাড়া প্রদেশের এক স্থানে পূজিতা মনে মঞ্চাম্মার নাম উল্লেখযোগ্য। মনে মঞ্চাম্মা প্রকৃতপক্ষে কোনও দেবদেবীর নাম নহে, ইহা একটি অদৃশ্য সর্পের নাম। তবে নামটি স্ত্রীঅর্থ-জ্ঞাপক বলিয়া এই দেব-কল্প সর্পকেও স্ত্রীসর্প বলিয়া কল্পনা করা হয়। এই সর্পিণীর উপর দেবীত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে এবং বৎসরে এক দিন মাত্র (নাগপঞ্চমীর দিন নহে) তাহার উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করা হয়। তাহার পূজা-স্থানকে 'মনে মঞ্চাম্মার স্থান' বলে। পূজাস্থানে ক্ষুদ্র একটি গৃহ আছে, তন্মধ্যে অবশ্য কোন দেব-মূর্তি নাই— বল্মীকস্তূপের আকৃতি একটি নাতিবৃহৎ স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তূপের সম্মুখে মনে মঞ্চাম্মার পূজা নিবেদন করা হইয়া থাকে। সর্প সাধারণত বল্মীকস্তূপেই বাস করে বলিয়া এই অদৃশ্য সর্পিণীকে বল্মীকবাসিনী বলিয়াই কল্পনা করা হইয়া থাকে।

কেহ কেহ মনে করেন, এই মঞ্চাম্মা প্রাদেশিক উচ্চারণে 'মনচা অম্ম' অর্থাৎ 'মন্চা মাতা' হয়। সেখানে 'চ'-কে 'স'-র মত উচ্চারণ করা হয়; তাহার ফলেই মন্চা অম্মা, মনসা মা-তে গিয়া দাঁড়ায়। এই মনসা মা হইতেই বাংলার মনসা মাতা বা মনসাদেবীর উৎপত্তি হইয়াছে।[১] এই মতের সমর্থন করিতে গিয়া কেহ আবার ঐতিহাসিক নজীর উল্লেখ করিয়া বলেন,—একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেনরাজগণ দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া বাংলা দেশে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহারা খুব সম্ভবত মঞ্চাদেবীর পূজার সমর্থক ছিলেন, এই দেশে তাঁহারা প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত এই মঞ্চাদেবীরও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এতকাল জাঙ্গুলীদেবী যে সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছিলেন, বৌদ্ধধর্মের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে তাহা মঞ্চাদেবীর ভাগ্যে গিয়া পড়ে। এই মঞ্চাদেবীই ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারদিগের হাতে

১। ক্ষিতিমোহন সেন, 'বাংলার মনসা পূজা', প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২৯, পৃঃ ৩৯১

পড়িয়া অনতিকাল মধ্যে মনসায় পরিবর্তিত হইয়া যান।...এই মত সত্য হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বাংলার মনসাদেবীর দ্রাবিড়, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য এই তিন স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের ধর্মগত আদর্শের সঙ্কর সৃষ্টি। মঞ্চাম্মা হইতে মনসা মাতা শব্দের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু তাহা হইতেই একথা প্রমাণিত হয় না যে, কানাড়া প্রদেশের একটি গ্রাম্য সর্পদেবতা বাংলা দেশে আসিয়া মনসাদেবীতে পরিণত হইয়াছে। সেনরাজবংশের সঙ্গে মঞ্চাদেবীর সম্পর্ক কল্পনা করাও কতদূর সঙ্গত হয়, তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্বে মনে মঞ্চাম্মার প্রকৃতি সম্বন্ধেও একটু স্পষ্ট ধারণা করিয়া লওয়া আবশ্যক। কারণ, কর্ণাট হইতে বাংলাদেশ পর্যন্ত যে দেবতার প্রতিষ্ঠা প্রচারিত হইয়াছে, নিজের দেশে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত ব্যাপক থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মনে মঞ্চাম্মা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার কোনও মূর্তি নাই। কর্ণাটদেশের তোরিয়ার, চক্র প্রভৃতি নামে পরিচিত কতকগুলি অস্পৃশ্য জাতি বল্মীকস্তূপে এই সর্পদেবতার উদ্দেশ্যে পূজা করে। সেনরাজগণ ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ-বংশসম্ভূত; দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ ও অস্পৃশ্য জাতির মধ্যে যে কি সম্পর্ক তাহা সর্বজনবিদিত। অতএব সর্পদেবী মনে মঞ্চাম্মার সঙ্গে সেনরাজদিগের কোন সম্পর্ক কল্পনা করা নিতান্ত ভুল হইবে। সেইজন্য যাঁহারা মনে করেন, সেনরাজগণের আনুকূল্যে বঙ্গদেশে মনসাদেবী নামে মনে মঞ্চাম্মার পূজা প্রচারিত হয়, তাঁহাদের যুক্তি সমর্থন করা যায় না। অতএব সেনরাজদিগের মধ্যস্থতায় দাক্ষিণাত্যের এই মঞ্চাম্মা নামটি বাংলা দেশে আসিয়া মনসায় রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। যদি মঞ্চাম্মা হইতেই মনসা মাতার উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে আরও একটি সূত্র আছে, যাহার মধ্যস্থতায় এই নামটি বাংলাদেশে আনীত হইয়া থাকিতে পারে। তাহা বাঙ্গালী সাপুড়ের দল। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এক কালে বাঙ্গালী সাপুড়ের দল সাপ ধরিয়া, খেলা দেখাইয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করিত। বহু অঞ্চলেরই মধ্যযুগের প্রাদেশিক সাহিত্যে বাঙ্গালী সাপুড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'আইন-ই-আকবরী'তেও বাঙ্গালী সাপুড়ে সম্বন্ধে বিস্তৃত উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত উত্তর ও মধ্যপ্রদেশ হইতেও গোরখনাথের শিষ্য বলিয়া পরিচিত যোগিসম্প্রদায়-ভুক্ত-এক শ্রেণীর সাপুড়ে প্রতি বৎসর বাংলাদেশের উপর দিয়া কামরূপ কামাখ্যা পর্যন্ত ভ্রমণ করিত; কারণ, তাহাদের বিশ্বাস, কামাখ্যা সিদ্ধপীঠ, এখানে না আসিলে সর্পমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। তাহারা বাংলাদেশ হইতে মনসা নামটি মধ্যভারতে লইয়া প্রচারের সহায়তা করিয়াছে, কিংবা মধ্যভারত হইতে তাহা বাংলাদেশে আনিয়াছে। অতএব মঞ্চাম্মা শব্দটিই যদি বাংলাদেশে আসিয়া মনসা হইয়া থাকে, তবে বাঙ্গালী সাপুড়ের দলের মধ্যস্থতায়ই তাহা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, সেনরাজদিগের মধ্যস্থতায় তাহা কদাচ হয় নাই।

অতএব বাংলায় মনসা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া গেল। প্রথমত পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশে পূজিতা সর্পদেবী মনসার প্রত্যক্ষ প্রভাব ও দ্বিতীয়ত কর্ণাট প্রদেশের গ্রাম্য সর্পদেবী মঞ্চাম্মার (প্রকৃত নাম মনে মঞ্চাম্মা) প্রভাব। কিন্তু ইহাদের মধ্যে

কোনটিই নিঃসংশয়ে গ্রহণযোগ্য নহে।

সর্বপ্রথম সংস্কৃত পদ্মপুরাণ, দেবীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এই কয়খানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপপুরাণে মনসা নামটির সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। উল্লিখিত পুরাণ প্রায় কোনটিই খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী রচনা নহে। এই উপপুরাণগুলিতে মনসার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখিয়া ইহাই মনে হয়, এই দেবতার পূজা সমাজে অধিক দিন ধরিয়া প্রবর্তিত হয় নাই। তবে ইহার অন্তত শতাধিক বৎসর পূর্বে প্রবর্তিত হইয়াছিল, এমন অনুমান করা যাইতে পারে।

এই সিদ্ধান্ত প্রাচীন বাংলার কতকগুলি পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার দ্বারাও সমর্থিত হইতেছে। বাংলা ও ইহার সংলগ্ন প্রদেশগুলি হইতে অসংখ্য মনসামূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের নির্মাণের সময় খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বলিয়া অনুমিত হয়। বিশেষত বীরভূম জিলার পাইকর গ্রামে প্রাপ্ত একটি মূর্তির নিম্নভাগে সেন বংশের প্রথম রাজা বিজয় সেনের নাম উৎকীর্ণ দেখিয়া ইহার সময় সম্বন্ধে কতকটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতেছে। বিজয় সেন খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। উত্তরবঙ্গে পাহাড়পুর খননের ফলেও একটি মনসামূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহাও খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। দিনাজপুর জিলার মরাইল গ্রামে প্রাপ্ত একটি মনসা-মূর্তিতেও একটি উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়। এই লিপির ভঙ্গি দেখিয়াও বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করিয়াছেন যে, ইহাও খ্রীষ্টীয় ১০ম-১১শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ। পাইকরে প্রাপ্ত মূর্তিটির একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ইহার সময় সম্বন্ধে নির্ভুল ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় বলিয়াই যে ইহার মূল্য, তাহা নহে, ইহার সঙ্গে সেন বংশের রাজা বিজয় সেনের নাম জড়িত বলিয়া ইহার আরও বিশেষ একটু মূল্য আছে। ইহা দেখিয়া এমনও মনে হইতে পারে যে, এই দেবী দাক্ষিণাত্য হইতে আগত রাজবংশের পৃষ্ঠপোষিত এবং সম্ভবত তাঁহাদিগের দ্বারাই এই দেবীপূজার প্রথা দাক্ষিণাত্য হইতে এই দেশে আনীত হয়; অথবা এমনও মনে হইতে পারে যে, এই দেবীর পূজা সেনরাজগণের স্বদেশীয় ধর্মমতের অনুকূল বলিয়া তাঁহারা ইহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। মূর্তিটির একটু বর্ণনা দিয়া ইহার সম্বন্ধে অন্যান্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

বীরভূম জিলার অন্তর্গত পাইকর গ্রামে এই মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়। মূর্তিটির মস্তকের দিক ভগ্ন বলিয়া বহুদিন ইহার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পাইতে পারে নাই; অতঃপর ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ১৯২১-২২ সনের বার্ষিক বিবরণীতে ইহার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হয়।

ইহা প্রকৃতপক্ষে একটি মূর্তি-লিপি (Image inscription)। মূর্তির নিম্নভাগে প্রাচীন অক্ষরে একটি লিপি উৎকীর্ণ আছে। এই লিপি হইতেই মূর্তিটির সময় নির্ধারণ করা হইয়াছে। প্রস্তরের একটি স্তম্ভগাত্রে মনসার একটি মূর্তি ক্ষোদিত। মূর্তিটি দ্বিভুজা,

প্রফুল্লকমলাসনা, মস্তকের দিক ভগ্ন, ডান পাশে ক্ষুদ্রাকৃতি একটি পুরুষ মূর্তি, সম্ভবত ইহা জরৎকারু মুনির মূর্তি। দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ হাঁটুর উপর স্থাপিত; বাম হস্তের মুষ্টিতে একটি সর্পশিশু ধৃত। মূর্তির নিম্নভাগে প্রাচীন অক্ষরে এই লিপি উৎকীর্ণ—

.......রাজেন শ্রীবিজয়সে (নেন?)

মনে হয়, লিপির প্রথম ও শেষ ভাগ বিনষ্ট হইয়াছে। উল্লিখিত বিজয় সেন বাংলার সেন রাজবংশের রাজা বিজয়সেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। মূর্তিটিও মনসার বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তখনও এই দেবীকে মনসা বলিয়াই অভিহিত করা হইত কিনা, তাহা জানিতে পারা যায় না। এখন প্রশ্ন এই যে, বিজয়সেনের নাম ইহার সঙ্গে কেন যুক্ত হইল? মনে হয়, যে মন্দিরের স্তম্ভগাত্রে এই দেবীমূর্তি ক্ষোদিত সেই মন্দির বিজয়সেনের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়। মন্দিরে অন্য স্বতন্ত্র কোন প্রধান দেবমূর্তি ছিল, ইহার স্তম্ভগাত্রে নানা লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি মাত্র উৎকীর্ণ হইয়াছে, মনসার মূর্তি তাহাদেব অন্যতম। প্রাচীন মন্দির নির্মাণের ইহাই সাধারণ নিয়ম। এই মনসাদেবীর সঙ্গে বিজয়সেনের প্রত্যক্ষ কোন সংস্রব না থাকিবারই কথা। কিন্তু এই বিষয়টিই ভুল কবিয়া অনেকে বিজয়সেনের সঙ্গে এই মনসাদেবীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কল্পনা করিয়াছেন। সেনরাজদিগের আনুকূল্যে বাংলাদেশে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু-ভাস্কর্যের পুনরুত্থান হইলে স্থানীয় নানা লৌকিক দেবদেবীও পৌরাণিক মর্যাদা লাভ করিয়া অভিজাত দেব-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইবার প্রয়াস পান। সেইজন্যই সেই যুগের বাংলার হিন্দু-ভাস্কর্যে অ-পূর্বপরিচিত বহু নূতন দেবদেবী রূপ লাভ করেন। মনসা তাঁহাদের অন্যতম।

উক্ত স্তম্ভলিপিটির প্রায় সমসাময়িক কালে বীরভূম অঞ্চলে আরও বহু মনসার মূর্তি নির্মিত হয়। কারণ, বীরভূম অঞ্চলে সর্পদেবীর পূজা কেবলমাত্র যে এক অতি প্রাচীন প্রথা তাহা নহে, আজ পর্যন্তই বীরভূমেই মনসা পূজা সর্বাত্মক প্রচলিত। বীরভূমের এই লোক-সংস্কৃতির ধারা বহু প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্তও অব্যাহত চলিয়া আসিতেছে। সেই অঞ্চলে হিন্দু-ভাস্কর্যেব পুনরুত্থান হইবার পর স্বভাবতই সেইজন্য সর্পদেবী ইহার প্রধান বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উক্ত বার্ষিক বিবরণীতে আর একটি পূর্ণাঙ্গ মনসামূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার সঙ্গে অবশ্য কাহারও নাম জড়িত নাই বলিয়া ইহার সময় সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানিতে পারা যায় না। তবে এই মূর্তিটির গঠনভঙ্গিও পাইকরে প্রাপ্ত মনসা-মূর্তির সহিত প্রায় অভিন্ন দেখিয়া ইহাই বিবেচিত হয় যে, এই উভয় মূর্তিই অনতিকাল ব্যবধানেই নির্মিত হইয়াছিল। আলোচ্য মূর্তিটি বীরভূম জেলার অন্তর্গত মুরারৈ রেলস্টেশনের অদূরবর্তী ভাদীশ্বর নামক গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মূর্তিটি সম্পূর্ণ অক্ষত ভাবেই পাওয়া গিয়াছে। দেবীর মস্তকের উপর সাতটি সর্প ফণা বিস্তার করিয়া আছে, বাম হস্তের মুষ্টিতে ধৃত আর একটি সর্প। সর্পনির্মিত কাঁচুলিতে বক্ষ আচ্ছাদিত; এক পার্শ্বে

তাহার একটি সহচরী (নেতা?), অপর পার্শ্বে পাইকর মূর্তির অনুরূপ একটি পুরুষমূর্তি, সম্ভবত জরৎকারু মুনির মূর্তি। ললিতাসন ভঙ্গিতে প্রফুল্লকমলাসনে দেবী আসীনা, অঙ্গে অলঙ্কার-সম্ভার। আসনের নিম্নভাগে পূজাঘট, তাহার উপর দেবীর পদ স্থাপিত। এই মূর্তিটি প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্য-শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য দান বলিয়াই মনে হয়। ইহা স্তম্ভগাত্রে ক্ষোদিত নহে, পাথর কাটিয়া সম্পূর্ণ মূর্তির আকৃতিতে স্বতন্ত্র করিয়া গঠিত। এই মূর্তির গঠনাদর্শ সর্বাংশেই পাইকর মূর্তির অনুরূপ। অতএব মনে হয়, একাদশ শতাব্দীর নিকটবর্তী কোন সময়ে এই মূর্তিও নির্মিত হইয়াছিল। রাজসাহী হইতে ধাতুনির্মিত একটি মনসা-মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মূর্তিটি পালরাজত্বের প্রথমভাগে নির্মিত বলিয়া অনুমিত হইলেও এই সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিতে পারা যায় না। মূর্তিটির গঠন-ভঙ্গি অনুপম, প্রস্তরমূর্তিগুলি হইতে ইহার নির্মাণ-কৌশল অধিকতর সূক্ষ্ম। ললিতাসনে দ্বিভুজা দেবী সপ্তসর্পবিধৃত ফণাছত্রতলে আসীনা, বামাঙ্কে একটি ক্ষুদ্র শিশু, সম্ভবত ইহা অষ্টম নাগ আস্তিকের নররূপ; দেবীর দক্ষিণ হস্তের পশ্চাদ্দিকে একটি সপত্র বৃক্ষশাখা, সম্ভবত ইহা সীজ-মনসার শাখা। এ'কথা সত্য যে, মনসার প্রস্তরমূর্তিগুলি নির্মাণের এক বিশিষ্ট আদর্শ এই দেশের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত ছিল, তাহার সঙ্গে ইহার পরিকল্পনার বিশেষ সামঞ্জস্য নাই—মনসা-মূর্তি নির্মাণের এক স্বতন্ত্র আদর্শের ধারা ইহাতে অনুসৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই ধারা পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে ইহা ষষ্ঠী দেবীর মূর্তি হওয়াও বিচিত্র নহে। কলিকাতা মিউজিয়মের পুরাতত্ত্ববিভাগে এই মূর্তিটি রক্ষিত আছে। কলিকাতার ভারতীয় প্রত্নাগার, ঢাকা প্রত্নাগার ও রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রত্নাগার প্রভৃতি স্থানে মনসা ও ষষ্ঠী দেবীর বহু মূর্তি সংরক্ষিত আছে।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আদর্শে গঠিত মনসা-মূর্তিও বাংলা ও তৎপার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহ হইতে একাধিক আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে হস্তীর উপর আসীনা এক মনসা-মূর্তি উল্লেখযোগ্য। মূর্তিটি আসাম হইতে প্রাপ্ত। সর্প অপেক্ষা বন্য হস্তীর উৎপীড়নই আসামে অধিক। এইজন্য কিংবা হস্তীর আর এক নাম নাগ (পূর্বোদ্ধৃত একটি মনসা-ধ্যানে মনসাদেবীকে 'নাগেন্দ্রেঃ কৃতশেখরাম' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে) এইজন্য মনসাদেবীকে গজাসীনা করা হইয়া থাকিবে। এই মূর্তি ঢাকা প্রত্নাগারে রক্ষিত আছে। ইহা ছাড়াও শিশুক্রোড়া এক প্রকার মনসা-মূর্তি উত্তরবঙ্গ ও উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু শিশুক্রোড়া মূর্তিগুলিকে মনসাদেবী বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়া গেলেও, তাহা প্রকৃত মনসার মূর্তি না হইয়া ষষ্ঠীদেবীর মূর্তিও হইতে পারে। প্রাচীন ভাস্কর্যে ষষ্ঠীদেবী ও মনসাদেবী প্রায়ই এক হইয়া গিয়াছেন। বর্তমান কালেও পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র মনসাতলা ও ষষ্ঠীতলা অভিন্ন স্থান। ময়মনসিংহ জিলার ত্রিশাল থানার অন্তর্গত রসুলপুর গ্রাম হইতে ধাতুনির্মিত একটি মনসা-মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১] মূর্তিটি প্রায় এক হাত উচ্চ।

১। ইহা কলিকাতা ল্যান্সডাউন রোড, নাটোর ভবনে রক্ষিত আছে।

গ্রাম হইতে ধাতুনির্মিত একটি মনসা-মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১] মূর্তিটি প্রায় এক হাত উচ্চ। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার এক পার্শ্বের উর্ধ্বভাগে গণেশ ও নিম্নভাগে একটি নাগিনী এবং অপর পার্শ্বের উর্ধ্বভাগে কার্তিকেয় ও নিম্নভাগে আর একটি নাগিনী মূর্তি আছে। দেবীর মস্তকের উপর সাতটি সর্ব ফণাছত্র বিস্তার করিয়া আছে, তাঁহার ক্রোড়স্থিত শিশুর মস্তকটিও একটি সর্পফণায় আচ্ছাদিত। ক্রোড়স্থ শিশু যে আস্তিক তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। দেবীর দুই স্কন্ধের উপরের দিকে দুইটি সীজ-মনসাবৃক্ষের শাখা। ইহা মূর্তিটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লীলাসন ভঙ্গিতে দেবী আসীনা। পাদনিম্নে কোনও ঘট কিংবা দেবীর কোনও বাহন নাই। জরৎকারু মুনির মূর্তিও নাই। মূর্তিটির গঠনভঙ্গি অনুপম—এই আদর্শে নির্মিত মূর্তি বাংলাদেশের আর কোনও অঞ্চল হইতেই আবিষ্কৃত হয় নাই। পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রভাববশতই যে অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি আসিয়া ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। মূর্তিটি একাদশ শতাব্দীর পরবর্তী কালে নির্মিত হওয়া সম্ভব নহে।

এই মূর্তিগুলি আবিষ্কারের ফলে কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে প্রধান একটি এই যে, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্বেই মনসা-পূজা এই দেশের সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কারণ, এই সময়ের মধ্যেই ভাস্কর্যে মনসার মূর্তিগঠনের একটি বিশেষ আদর্শ স্থিরীকৃত হইযা গিয়াছে। এমন কি, দেশের রাজার আদেশে নির্মিত দেবমন্দিরের স্তম্ভগাত্রে পর্যন্ত মনসাদেবীর মূর্তি খোদাই হইতেছিল।

একাদশ শতাব্দীর বাংলার ভাস্কর্যে মনসা-মূর্তির ব্যাপক অস্তিত্ব হইতেই জানা যাইতেছে যে, সমাজে এই দেবী ইতিমধ্যেই রীতিমত আধিপত্য স্থাপন করিয়া লইয়াছেন। সেইজন্য সমসাময়িক সংস্কৃত পুরাণগুলিতেও তাঁহার মহিমা কীর্তিত হইবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।

কেহ কেহ জৈন দেবী পদ্মাবতীকে মনসাব সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। বাংলাদেশে মনসার এক নাম পদ্মা বা পদ্মাবতী। মনে হয়, জৈন ধর্ম হইতে পদ্মাবতীর ঐতিহ্যের ধারাটি আসিয়া কালক্রমে মনসার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। তাহার সঙ্গে ক্রমে মহাভারত হইতে জরৎকারুর কাহিনীটিও আসিয়া যুক্ত হইযাছে।

মহাভারতের কোন স্থলেই বাসুকির ভগিনী জরৎকারু সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কিংবা সর্পমাতা বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। সর্পমাতা বলিতে মহাভারতে একমাত্র কশ্যপের পত্নী কদ্রুকেই বুঝায়, জরৎকারুকে নহে। মহাভারতের নাগকুল জরৎকারুকে কোনও স্থানেই যে বিশেষ কোনও শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাইয়াছে এমন কোথাও উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু ইহাও ভগিনীকে দেবতা ভাবিয়া নহে, তাঁহার গর্ভস্থ সন্তান আস্তিক কর্তৃক জনমেজয় অনুষ্ঠিত সর্পযজ্ঞ পণ্ড হইবে, ইহা জানিতে পারিয়া বাসুকি ভগিনীর উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কালোচিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। মহাভারতের এই একটি মাত্র শ্লোকে ইহার উল্লেখ আছে—

সান্ত্বমানার্থদানৈশ্চ পূজয়া চানুরূপয়া।
সোদরাং পূজয়ামাস স্বসারং পন্নগোত্তমঃ॥

আস্তিকের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই জরৎকারুর এই ক্ষণিক প্রাধান্যটুকুও লুপ্ত হইয়া গেল। অতএব বাসুকির ভগিনী জরৎকারুর সহসা মনসা নাম গ্রহণ করিয়া সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া বসিবার কোনও সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। এই অনার্যদেবী মনসা সমাজে আর্যপ্রভাববশত মহাভারতের কাহিনীর পটভূমিকায় নিজেকে স্থাপন করিয়া লইয়া আভিজাত্য লাভের প্রয়াস পাইয়াছেন মাত্র।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মহাভারতের মধ্যে মনসা নামের কেবল যে কোনও উল্লেখ নাই, তাহা নহে, তাহাতে অনুরূপ কোন চরিত্রের সঙ্গেও সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। মহাভারতের যুগের দীর্ঘকাল পরে পরবর্তী উপপুরাণগুলি যখন রচিত হয়, তখন অনার্য সমাজ হইতে আগত এই দেবী যে আর্যসমাজে প্রবেশ লাভ করিলেন, পূর্বোক্ত ভাস্কর্যের প্রমাণ ব্যতীতও কতকগুলি অর্বাচীন পুরাণ হইতেও এই বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। এই পুরাণগুলিতে মনসার জন্ম-কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহাতে এই দেবীর আভিজাত্য কোনও দিক দিয়া খর্ব না হয়, সেইজন্য নাগকুলের পিতা কশ্যপের সঙ্গেও তাঁহার সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে; যেমন,—

পুরানাগভয়াক্রান্তা বভূবুর্মানবা ভুবি।
যান্ যান্ খাদন্তি নাগাশ্চ ন তে জীবন্তি নারদ॥
মন্ত্রাংশ্চ সসৃজে ভীতঃ কশ্যপো ব্রহ্মণার্থিতঃ।
বেদবীজানুসারেণ চোপদেশেন ব্রহ্মণঃ॥
মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবীং তাং মনসাং সসৃজে ততঃ।
তপসা মনসা তেন বভূব মনসা চ সা॥

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় শৈবধর্মের প্রভাববশত মনসা-মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনসা শিবের কন্যা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; কিন্তু সংস্কৃত উপপুরাণগুলিতে মহাভারতের প্রভাববশত মনসা নাগ-পিতা কশ্যপ কর্তৃক সৃষ্ট বলিয়া সর্বত্রই উল্লেখ করা হইয়াছে। একখানি উপপুরাণেও পাওয়া যায়,—

সা চ কন্যা ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী।
তেনৈব মনসা দেবী মনসা যা চ দীব্যতি॥
মনসা ধ্যায়তে যা চ পরমাত্মানমীশ্বরম্।
তেন যা মনসা দেবী তেন যোগ্যেন দীব্যতি॥
জগদ্গৌরীতি বিখ্যাতা তেন সা পূজিতা সতী।
শিবশিষ্যা চ যা দেবী তেন শৈবী প্রকীর্তিতা॥

এই ভাবে মনসার জন্ম হইলে পর তিনি বেদাদি অধ্যয়নের নিমিত্ত কৈলাসে শঙ্কর-ভবনে গমন করিলেন; সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা দ্বারা চন্দ্রশেখরকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে 'মহাজ্ঞান' লাভ করিলেন; সামবেদ পাঠ করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতেই কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা-লাভ করিয়া তাঁহারই আদেশে পুষ্করতীর্থে তপস্যা দ্বারা কৃষ্ণকে তুষ্ট করিতে গমন করিলেন,—

ত্রিযুগঞ্চ তপস্তপ্তা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
সিদ্ধা বভূব সা দেবী দদর্শ পুরতঃ প্রভুম্॥

এই ভাবে সিদ্ধি লাভ করিবার পর কৃষ্ণ ও শঙ্কর উভয়েই মনসাকে পূজা করিলেন,—

প্রথমে পূজিতা যা'চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
দ্বিতীয়ে শঙ্করেণৈব কশ্যপেন সুরেণ চ॥
মনুনা মুনিনা চৈব নাগেন মানবাদিনা।
বভূব পূজিতা সা চ ত্রিষু লোকেষু সুব্রতা॥

এই ভাবে মনসাদেবী ত্রিলোকের পূজা লাভ করিবার পর পিতা কশ্যপ তাঁহাকে জরৎকারু মুনির সঙ্গে বিবাহ দিলেন,—

জরৎকারুমুনীন্দ্রায় কশ্যপস্তাং দদৌ পুরা।
অযাচিত মুনিশ্রেষ্ঠো জগ্রাহ ব্রাহ্মণাজ্ঞয়া॥

এইখানে মনসার লৌকিক কাহিনীর সঙ্গে মহাভারতোক্ত বাসুকির ভগিনী জরৎকারুর কাহিনী আনিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মনসা-প্রণামের প্রচলিত মন্ত্রটির মধ্যে বাসুকির ভগিনী জরৎকারু ও মনসা এক হইয়া গিয়াছেন,—

জরৎকারুমুনেঃ পত্নী ভগিনী বাসুকেরপি।
আস্তিকস্য মুনের্মাতা মনসাদেবি নমোঽস্তুতে॥

উপপুরাণগুলির মধ্যে মনসার যে বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তাহাতে মহাভারতোক্ত জরৎকারু ও মনসা এইরূপ অভিন্ন হইয়া দেখা দিয়াছেন।

মনসার সঙ্গে মহাভারতোক্ত জরৎকারুর সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাংলায় মনসার কাহিনীর মধ্যে মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত সমগ্র নাগ-কাহিনী আসিয়া সংক্ষিপ্তভাবে স্থান লাভ করিয়াছে, অবশ্য তাহা হইলেও ইহা কোনদিনই মূল কাহিনীর অঙ্গ হইতে পারে নাই।

মনসা-মঙ্গলের কাহিনী

এইখানে মনসা-মঙ্গলের কাহিনীটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়া ইহার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে

আলোচনা করা যাইতেছে—

চাঁদ সদাগর একজন পরম শৈব। তিনি স্বর্গের অরণ্যে একদিন শিব-পূজার জন্য ফুল আহরণ করিতে করিতে গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে মনসাদেবী নাগাবরণ-ভূষিতো হইয়া আসীনা ছিলেন। চাঁদের সাড়া পাইয়া নাগগণ ভয়ে পলাইয়া গেল, মনসাদেবী নিরাবরণা হইয়া পড়িলেন। এইজন্য তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া চাঁদকে অভিশাপ দিলেন, 'মর্ত্যে গিয়া মানব হইয়া জন্মগ্রহণ কর।' চাঁদ বলিলেন, 'যদি বিনা অপরাধে আমাকে অভিশাপ দিয়া থাক, তবে তুমিও স্মরণ রাখিও, আমি পূজা না করিলে মর্ত্যলোকে তোমার পূজা প্রচারিত হইবে না।' চাঁদ মর্ত্যলোকে গিয়া বিজয় সাধুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম সনকা। চাঁদ নিত্য শিবপূজা করেন, সনকা গোপনে মনসাদেবীর ঘট পূজা করেন; একদিন জানিতে পারিয়া চাঁদ পদাঘাতে সনকার মনসার ঘট ভাঙ্গিয়া দিলেন। মনসা ক্রুদ্ধ হইয়া ইহার প্রতিশোধ লইবার সঙ্কল্প করিলেন। নন্দন-কানন সদৃশ চাঁদের গুয়াবাড়ী ধ্বংস হইয়া গেল। রাজ্যের নরনারী সর্পদংশনে প্রাণ হারাইতে লাগিল। কিন্তু চাঁদ 'মহাজ্ঞানে'র অধিকারী ছিলেন, তাহা দ্বারা তিনি গুয়াবাড়ী পুনরুজ্জীবিত করিলেন। চাঁদের এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, তাহার নাম শঙ্কর গারুড়ী, সে নেতার শিষ্য; নেতার বরে তাহার দেহ অমর, অজয়; সর্পদংশনে তাহার মত ওঝা আর নাই। শঙ্কর গারুড়ী সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তিদিগকে পুনরায় জীবন দান করিল। মনসার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতে লাগিল। মনসা কৌশলে শঙ্কর গারুড়ীর পত্নীর নিকট হইতে তাহার মৃত্যুর উপায় জানিয়া লইয়া তাহাকে বধ করিলেন— চাঁদের দক্ষিণ হস্ত খসিয়া পড়িল। মনসা চাঁদকে ছলনা করিয়া তাঁহার 'মহাজ্ঞান'ও হরণ করিলেন। এইবার মনসা চাঁদের ছয় শিশুপুত্রের অন্নের মধ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিলেন। মনসা আবির্ভূত হইয়া চাঁদকে বলিলেন, 'আমার পূজা কর, পুত্র ফিরিয়া পাইবে, মহাজ্ঞান ফিরিয়া পাইবে।' চাঁদ মনসাকে হেঁতালের লাঠি লইয়া তাড়া করিয়া গেলেন, লাঠির এক আঘাতে মনসার কাঁকালি ভাঙ্গিয়া গেল। সনকা চোখের জলে আসিয়া স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'মনসার পূজা কর, আমার সোনার চাঁদেরা ফিরিয়া আসুক।' চাঁদ তাঁহাকে অন্য কথায় সান্ত্বনা দিয়া বিদায় দিলেন। ঝালু মালু দুই অন্ত্যজ মনসা পূজার আয়োজন করিল। সনকা গোপনে পূজাস্থানে গিয়া দেবীর নিকট স্বামীর জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন। মনসা সনকাকে পুত্রবর দিলেন। কিন্তু কথা রহিল, বিবাহের রাত্রে পুত্রের সর্পদংশনে মৃত্যু হইবে। সনকা ভাবিলেন, বিবাহ না করাইলেই হইবে; আবার পুত্রমুখ দর্শন করিবেন ভাবিয়া উৎফুল্ল হইয়া গৃহে ফিরিলেন। চাঁদ চৌদ্দ ডিঙা সাজাইয়া বাণিজ্য যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। যাত্রাকালে মনসা পুনরায় আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, 'আমার পূজা করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হও।' চাঁদ পুনরায় তাঁহাকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। চাঁদ চৌদ্দ ডিঙা লইয়া পাটনে গিয়া পৌঁছিলেন, নিজের অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময়ে বহু মূল্যবান্ দ্রব্যাদি দ্বারা চৌদ্দ ডিঙা পূর্ণ করিয়া দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে মনসা পুনরায় আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন, 'মোর তরে ফুল জল দেও একবার।' চাঁদ ক্রুদ্ধ

হইয়া বলিলেন, 'যে হাতে শিবপূজা করিয়াছি, সেই হাতে চেমুড়ী কাণীর পূজা করিব।' দেবীর আদেশে মাঝ-সমুদ্রে অসময়ে বান ডাকিল। চারিদিকে জল উত্তাল হইয়া উঠিল। একে একে চাঁদের চৌদ্দ ডিঙা অতলে ডুবিয়া গেল। চাঁদ সমুদ্রের জলে ভাসিতে লাগিলেন। চাঁদ ডুবিয়া মরিলে মনসার পূজার প্রচার হয় না। মনসা তাঁহার নিকট তীরে পৌঁছিবার জন্য একটি আশ্রয় ফেলিয়া দিলেন। চাঁদ তাহা ধরিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু যখনই বুঝিতে পারিলেন, ইহা মনসার দান, তখনই মুখ ফিরাইয়া লইলেন। তবু চাঁদ তীরে গিয়া পৌঁছিলেন; প্রবাসে বার বৎসরকাল নানা দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে ভিক্ষুকের বেশে নিজের দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দর তখন পূর্ণ যুবক। পুনরায় পুত্রমুখ দর্শন করিয়া চাঁদ সকল দুঃখ ভুলিলেন। নূতন আশায় বুক বাঁধিয়া পুত্রের বিবাহেব জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উজানীনগরের সায়বেনের কন্যা বেহুলার সঙ্গে তাহার বিবাহ স্থির হইল। বিবাহের রাত্রে সর্পদংশনে তাহার মৃত্যু লেখা আছে জানিয়া এক নিশ্ছিদ্র লৌহ-বাসর নির্মাণ করিলেন। কিন্তু নির্মম নিয়তিকে রোধ করা গেল না। বিবাহের রাত্রে লৌহ-বাসরেই লখিন্দর সর্পদংশনে প্রাণ হারাইল। সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তিকে নদীর জলে ভাসাইয়া দিবার প্রথা ছিল। লখিন্দরের দেহেরও সেই ব্যবস্থা করাই স্থির হইল। বেহুলা বলিল, সে মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া আনিবে। আত্মীয়স্বজন তাহাকে এই দুরূহ কার্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিল। সে তাহাতে কর্ণপাত করিল না। মৃত স্বামীর দেহ কোলে লইয়া গাঙ্গুরের জলে ভেলায় ভাসিয়া চলিল। ভেলা আসিয়া গোদার ঘাটে ঠেকিল। গোদা সেই ঘাটে বঁড়শীতে মাছ ধরিত। বেহুলার রূপে মুগ্ধ হইয়া গোদা তাহাকে বিবাহ করিয়া ঘরে তুলিয়া লইতে চাহিল। বেহুলা তাহাকে অভিশাপ দিল, সে যতদিন পর্যন্ত দেবপুর হইতে ফিরিয়া না আসে, ততদিন পর্যন্ত তাহার পায়ে বঁড়শী বিঁধিয়া থাকিবে। ভেলা আপু ডোমের ঘাটে আসিল। সেও অনুরূপ বাসনা জানাইলে, বেহুলা তাহাকে অভিশাপ দিল। সে নদীতীরে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিল। এইভাবে বেহুলা ধোনা-মোনার ঘাটও পার হইয়া গেল। তারপর নেতা মনসার আদেশে ব্যাঘ্রের রূপ ধারণ করিয়া লখিন্দরের গলিত মাংস ভক্ষণ করিতে চাহিল। বেহুলা নিজেকে বলি দিয়া ব্যাঘ্রের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে চাহিল। নেতা চিলের রূপ ধরিয়া লখিন্দরের পাঁজর ছোঁ মারিয়া হরণ করিতে চাহিল। বেহুলা অঞ্চলে ঢাকিয়া স্বামীর পাঁজর কয়টি রক্ষা করিল। ভেলা নেতা ধোপানীর ঘাটে পৌঁছিল। নেতা স্বর্গের ধোপানী, দেবতাদিগের কাপড় কাচিত। বেহুলা দেখিল, সে একটি ছোট ছেলে লইয়া ঘাটে আসিয়াছে। কাপড়ের বোঝা মাথা হইতে নামাইয়া নেতা কাপড় কাচিতে লাগিল। ছেলেটি দুরন্তপনা করিতেছে দেখিয়া তাহাকে এক আঘাতে মারিয়া ফেলিয়া রাখিল। যাইবার সময় কানের কাছে কি মন্ত্র বলিয়া তাহাকে জীয়াইল, তারপরে ঘরে লইয়া চলিল। বেহুলা বুঝিতে পারিল, এ মৃতকে প্রাণ দিতে পারে, অতএব সে তাহার স্বামীকেও বাঁচাইতে পারিবে। পরের দিন নেতা যখন ঘাটে আসিল, তখন বেহুলা গিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিল। নেতা বলিল, 'মনসার শাপে তোমার স্বামী মরিয়াছে, আমি কিছু করিতে পারিব না। তোমাকে দেবপুরীতে

গিয়া দেবতাদিগকে খুশী করিতে হইবে। দেবগণ যদি বলিয়া দেন, তবে মনসা তোমার স্বামীব প্রাণ ফিরাইয়া দিতে পারেন, আমার কথায় হইবে না। দেবতাগণ নৃত্য দ্বারা বড় সন্তুষ্ট হন। তুমি যদি নৃত্য দেখাইয়া দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পার, তবে তোমার কার্য উদ্ধার হইতে পারে।' বেহুলা বলিল, 'আমি তাহাই করিব। তুমি আমাকে লইয়া চল।' সমবেত দেবতাদিগের সম্মুখে বেহুলা তাহার নৃত্য দেখাইল। দেবতাগণ মুগ্ধ হইয়া গেলেন। মহাদেব তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'কি বর চাও?' বেহুলা স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাহিল। মহাদেব বলিলেন, 'তাহাই হইবে। মনসাকে বল, আমার আদেশ—সে তোমার স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া দিক।' মনসা বলিল, 'দিতে পারি, কিন্তু চাঁদ আমার পূজা করিবে এই সর্তে।' বেহুলা বলিল, 'তাহাই হইবে। আমার ছয় ভাসুর, স্বামী, শ্বশুরেব চৌদ্দ ডিঙা সব ফিরাইয়া দাও, আমি তাঁহাকে দিয়া তোমাব পূজা করাইব।' মনসা সবই ফিরাইয়া দিলেন; তারপর বেহুলা ধনরত্নপূর্ণ চৌদ্দডিঙা সাজাইয়া গৃহের দিকে ফিরিল। চাঁদের সাত পুত্র সহ চৌদ্দ ডিঙা আসিয়া গাঙুরের ঘাটে ভিড়িল। চাঁদ উন্মাদ হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে শুনিতে-পাইলেন, তাঁহাকে মনসার পূজা করিতে হইবে, সেই মুহূর্তে কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। বেহুলা গিয়া কাঁদিয়া তাঁহার পায়ে পড়িল, বলিল, 'আমার দিকে একবার তাকাও।' তিনি বেহুলার মুখের দিকে তাকাইতে পারেন না। অভ্রভেদী শালতরু বুঝি একটু স্নেহকোমল দক্ষিণ বাতাসেব স্পর্শেই ধরাশায়ী হয়। চাঁদের জীবনে এত বড় দ্বন্দ্ব আর কোনদিন দেখা দেয় নাই। বেহুলা বলিল, 'তুমি বাম হাতে মনসাকে একটি ফুল দাও, তাহা হইলেই মনসা খুশী হইবে।' চাঁদ বলিলেন, 'আমি মুখ ফিরাইয়া থাকিব, দেখিব না কাহাকে ফুল দিলাম।' বেহুলা বলিল, 'তাহাতেই হইবে।' অবশেষে চাঁদ মুখ ফিরাইয়া বাম হাতে একটি ফুল ছুঁড়িয়া দিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা পাইল; তিনি যে হাতে শিবপূজা করেন, সেই হাতে মনসাকে পূজা করিয়া সে হাত কলঙ্কিত করিলেন না। ইহাতেই মনসা খুশী হইলেন। মর্ত্যে তাঁহার পূজা প্রচার হইল।

মনে হয়, মনসা-মঙ্গলের উক্ত কাহিনীর মধ্যে দুইটি স্বতন্ত্র লৌকিক-কাহিনীর ধারা আসিয়া একসঙ্গে মিলিত হইয়াছে। একটি শঙ্করগারুড়ী-নেতার কাহিনী ও অপরটি চাঁদ সদাগর-বেহুলার কাহিনী। প্রথম কাহিনীটি প্রাচীনতর এবং ইহাব সঙ্গেই আসিয়া পরবর্তীকালে চাঁদসদাগর-বেহুলার কাহিনীটি যুক্ত হইয়াছে। শঙ্করগারুড়ী-নেতাব কাহিনীটিও একটি স্বতন্ত্র কাব্যেব বিষয়বস্তু হইবার যোগ্য। সম্ভবত পূর্বে এই বিষয়ে লৌকিক ছড়া কিংবা লোকগাথার আকারে স্বতন্ত্র কাহিনী লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। শঙ্কর গারুড়ীর চরিত্র কতকটা লৌকিক রামায়ণ কাব্যের রাবণ-চরিত্রের অনুরূপ, খুব প্রাচীন একটি জনশ্রুতি হইতে ইহা উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায়। সেইজন্যই মনে হয়, লৌকিক রামায়ণেব কাহিনী শঙ্কর গারুড়ীর কাহিনী দ্বারাই প্রভাবিত হইয়াছে। সাঁওতাল পরগণার অধিবাসী সাঁওতাল জাতির মধ্যে কামরু ওঝার একটি কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা শঙ্কর গারুড়ীর কাহিনীর অনেকটা অনুরূপ (*Memoirs of the Asiatic Society of Bengal*,

X, 1, pp. 124-25)।

শঙ্কর গারুড়ীর কাহিনীর মধ্যে যে লৌকিক দেবচরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তাহার নাম নেতা। শঙ্কর গারুড়ী নেতার শিষ্য এবং তাহারই বরে (মনসার বরে নহে) তাহার দেহ অজর ও অমর। নেতাকে মনসা-মঙ্গলকাব্যের সর্বত্র রজক-কুমারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার আভিজাত্য বৃদ্ধি করিবার জন্য শেষ পর্যন্ত বলা হইয়াছে, সে স্বর্গের দেবতাদিগের ধোপানী, সর্বত্রই তাহার রজক-সম্পর্ক বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। মনসা-মঙ্গল কাহিনীর প্রচারের যুগে এই রজক-কুমারী মনসা-মঙ্গল কাহিনীর একাংশে স্থানলাভ করিয়া মনসার সহচরী রূপে পরিচিতা হইয়াছে। মনে হয়, কোন রজকের কন্যা বিষনাশকারী কতকগুলি প্রক্রিয়ায় জ্ঞান লাভ করিয়া কালক্রমে সাধারণ জনগণের মধ্যে দেবীত্বে উন্নীত হইয়া গিয়াছিল। স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা মনসা হইতে প্রাচীনতর; কারণ, তাহা না হইলে মনসাচরিত্রের সর্বব্যাপক প্রতিষ্ঠার উপর এই কাহিনীতে তাহার কোন ভাবেই স্থান পাওয়া সম্ভব ছিল না। চাঁদ সদাগর-বেহুলার কাহিনী প্রবর্তিত হওয়ার পর নেতা মনসার সহচরীর পদ প্রাপ্ত হইয়া মনসা-মঙ্গল কাব্যের সামান্য একটি অংশ মাত্র অবলম্বন করিয়া টিকিয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া চাঁদ সদাগর-বেহুলার মূল কাহিনীর মধ্যে তাহার অস্তিত্বের আর কোনও অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সংস্কৃত পুরাণগুলি অগণিত লৌকিক কাহিনীতে পূর্ণ হইলেও কোনও সংস্কৃত পুরাণেই মনসা-মঙ্গলের অনুরূপ কোন কাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। ইহা রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-নিরপেক্ষ একটি স্বাধীন লৌকিক কাহিনী। মনসা-মঙ্গল ইহার মূল উৎস। ভাস্কর্যে মনসামূর্তি ক্ষোদিত হইবার পূর্ব হইতেই মনসার এই লৌকিক কাহিনী সমাজে প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। সম্ভবত তখন লোকমুখে পল্লী-গীতিকা বা ছড়ার আকারে মনসা-মঙ্গলের সংক্ষিপ্ততম মূল কাহিনীটি লোকের মুখে মুখে গীত হইত। তারপর ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে কোনও কোনও শক্তিশালী কবির নিপুণ হস্তে পড়িয়া তাহা কাব্য-কাহিনীবদ্ধ হইয়াছে। তারপর ক্রমে লৌকিক কাহিনীর সংক্ষিপ্ততম অংশটির মধ্যে প্রথমত নেতা ধোপানী, শঙ্কর গারুড়ী ও পরে মহাভারতের নাগ-কাহিনীও আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই ভাবেই মধ্যযুগের মনসা-মঙ্গল কাব্যখানি এক জটিল রূপ এবং বিপুলায়তন লাভ করিয়াছে।

এখন বিচার করিতে হয়, এই কাহিনী কোথা হইতে আসিল? ইহার মূলে কোনও ঐতিহাসিক সত্য আছে কি না। এই দুই প্রশ্নের মধ্যে কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া সহজ-সাধ্য নহে। বাংলার মনসা-মঙ্গলের কবিগণ প্রত্যেকেই নিজের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক জ্ঞানের মধ্যে এই কাহিনীর ঘটনাস্থান সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। তাহার ফলে বাংলা, আসাম ও বিহারের বহু স্থানই চাঁদ সদাগরের নিবাস-ভূমি বলিয়া সমান দাবী করিতেছে। বলা বাহুল্য, ইহাদের কাহারও দাবী সমর্থন করিবার পক্ষে কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। সেইজন্যই ইহাদিগকে

জনশ্রুতি মাত্র বলিয়াই উড়াইয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বিশ্বাস, 'চাঁদবেনের গল্পটি আগা-গোড়া কল্পনা-মূলক।' কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। ইহার মূলে নগণ্য হইলেও যে কোনও না কোনও সত্য প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, এই কাহিনীটি উদ্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা অত্যন্ত ব্যাপক লোকপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। ইহা বাংলাদেশের রামায়ণ। সর্পপূজার জনপ্রিয়তা ইহার ব্যাপক প্রচারের অন্যতম কারণ হইলেও, ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, সম্পূর্ণ একটি কাল্পনিক কাহিনী সেই যুগে বাংলা, বিহার ও আসামের সর্বত্র কাহিনীগত ঐক্য রক্ষা করিয়া এমন প্রচার লাভ করিতে পারিত না। বিশেষত সেই যুগে কোনও কবিবিশেষের স্বকপোলোদ্ভাবিত কোনও সম্পূর্ণ অলীক কাহিনীর সমাজে এমন সমাদর লাভ করা সম্ভব ছিল না। উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টির সাহায্যে যে ইহার প্রচার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাও নহে। কারণ, এ'কথা সত্য যে, 'চণ্ডীমঙ্গলে'র কবি মুকুন্দরাম ও 'অন্নদা-মঙ্গলে'র কবি ভারতচন্দ্রের মত প্রথম শ্রেণীর কবি-শক্তি মনসা-মঙ্গল কাব্য-রচনায় কদাচ নিয়োজিত হয় নাই। তাহা সত্ত্বেও কোনও মঙ্গলকাব্যই মনসা-মঙ্গলের মত এত ব্যাপক প্রচার লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। ইহাতে উচ্চাঙ্গের চরিত্রসৃষ্টির প্রয়াস বহুল পরিমাণে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কোন বাস্তব আদর্শ চোখের সম্মুখে না থাকিলে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি দ্বারা এমন চরিত্র পরিকল্পনা সম্ভব হইত বলিয়াও মনে হয় না। বিশেষত ইহার চরিত্রগত আদর্শসৃষ্টি যতই উচ্চ হউক, ইহার মূলে অন্তত কিছু সত্য না থাকিলে ইহা জাতির মানসক্ষেত্রে এমন সুদৃঢ় শিকড় গাড়িয়াও তুলিতে পারিত না।

তাহা হইলে এই কাহিনীর মধ্যে কতটুকু সত্য থাকিতে পারে? স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, 'চাঁদ সদাগরের উপাখ্যানের এইটুকু সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদের আপত্তি নাই যে, যাঁহারা শৈবধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া লৌকিক ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, চাঁদ সদাগর তাঁহাদের এক দলের নেতা ছিলেন ও শেষে তিনি মনসাদেবীর পূজা অনুমোদন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।' কিন্তু ইহার অতিরিক্ত আরও একটু কাহিনী স্বচ্ছন্দে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পাবে। অভিবেকোৎসুক রাজপুত্রের উপর দীর্ঘ বনবাসের নিদারুণ আদেশ যেমন ভারতের এক করুণ মহাকাব্যের মূল সত্য, তেমনই বিবাহিত জীবনের আনন্দোৎসুক কোন অতুল ঐশ্বর্যবান্ যুবক শ্রেষ্ঠিপুত্রের বাসরগৃহেই দৈবাৎ সর্পদংশনে মৃত্যুর মত কোন মর্মান্তিক সত্য ঘটনাও হয়ত এই মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলিরও মূল সত্য। সেদিন অপরিস্ফুট-যৌবনা বেহুলার বাসর-রাত্রেরই বৈধব্যের কথা শুনিয়া বাল-বৈধব্য-পীড়িত এই হিন্দুর সমাজও হয়ত শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তরুণ-তরুণীর প্রস্ফুটনোন্মুখ জীবনের মূলে ক্রুর নিয়তির নিদারুণ এই পরিহাস যে কোন উচ্চতর কাব্যের রস-প্রেরণা দান করিতে সক্ষম। তারপর এতদ্দেশীয় সাহিত্যিক প্রথা অনুযায়ী কাহিনীটিকে

একটি মিলনান্তক রূপ দিবার জন্য ইহার অবশিষ্টাংশ কবি কর্তৃক কল্পিত হইয়াছে।

অতএব গল্পটিকে 'আগাগোড়া কল্পনামূলক' বলিতে পারা যায় না। তাহা হইলেই প্রশ্ন হয়, চাঁদ সদাগর কোথাকার লোক ছিলেন? তাঁহার পরিচয়ই বা কতটুকু জানিতে পারা যায়? কাহিনী-ভাগ বিশেষভাবে অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চাঁদ সদাগর গোঁড়া শৈব ছিলেন। বাংলার উচ্চতর সমাজে তখন বৌদ্ধধর্ম শৈবধর্মের মধ্যেই আত্মগোপন করিতেছিল। কিন্তু সাধারণ জনসমাজের মধ্যে লৌকিক দেবদেবীর পূজার তখনও বিশেষ প্রাধান্য ছিল। বিবাহের রাত্রে চাঁদ সদাগরের পুত্রের সর্পদংশনে যে মৃত্যু ঘটিল, সেইজন্য সাধারণ জনসমাজ মনে করিল, শৈবধর্মাশ্রিত বৈশ্য জাতি লৌকিক দেবতা মনসার পূজা করে না বলিয়া দেবতা এইভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতেই মনসাদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা সাধারণ লোকের শতগুণ বৃদ্ধি পাইল এবং তাহা হইতেই চাঁদ সদাগরের কাহিনীটিও ক্রমে কবি-কল্পনার পত্রপুষ্পে সমাকীর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

তবে চাঁদ সদাগর কোথাকার লোক ছিলেন? ইতিহাসে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় কি না? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। পূর্ববঙ্গের চন্দ্ররাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা শ্রীচন্দ্রদেবকে কেহ চাঁদ সদাগরের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। রাজা শ্রীচন্দ্রদেবের আনুমানিক কাল খ্রীষ্টীয় ৯৭৫ অব্দ হইতে ১০০০ অব্দ। চাঁদ সদাগরের কাহিনী এই সময়ের মধ্যে উদ্ভূত হওয়া অসম্ভব নহে। আবার কেহ এই বংশেরই অন্যতম রাজা হরিশ্চন্দ্রকেও হরিশ্চন্দ্রধর রূপে কল্পনা করিয়া লইয়া তাঁহাকে চন্দ্রধর বা চাঁদ সদাগরের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্র নাথসাহিত্যের গোপীচন্দ্র কাহিনীর নায়ক গোবিন্দচন্দ্রের শ্বশুর বলিয়াও কেহ অনুমান করিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্রই যে চাঁদ সদাগর তাহার আর কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। কেবলমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া এই মতবাদ সৃষ্টি করা হইয়াছে।

কেহ আবার অনুমান করেন, 'চাঁদ সদাগর বাংলার লোক নহেন।' বেহুলার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলির উপর দাক্ষিণাত্যের প্রভাব অনুমিত হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রে বাঙ্গালী নারীসুলভ কমনীয়তার অভাবও লক্ষিত হইয়াছে—'বেহুলার তেজ ও নির্ভীকতা বিবাহ-কাল হইতে, তাহার স্বামীসহ সমুদ্রে ভাসিয়া পড়াও কম সাহসের কথা নয়। তারপর শ্বশুরবাড়ি স্বামীসহ ডোম সাজিয়া যাওয়ার মধ্যে যে একটি পরিহাস-প্রিয়তা আছে, তাহা খুব স্বাধীনভাবে চলাফেরার অভ্যাস না থাকিলে আশা করা যায় না। দেবপুরীতে নৃত্য করিয়া দেবতাকে প্রসন্ন করা দেবদাসীর কাজ। তাহা বাংলাদেশের প্রথা নয়। তাহা তৈলঙ্গেরই বস্তু।'[১] কেহ আবার এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বেহুলা-চরিত্র যে বাংলাদেশের

১। ক্ষিতিমোহন সেন, ৩৯৪-৯৫

২। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'মনসা-পূজা', প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৯, ৭৩৩

নারীচরিত্রের প্রতিকূল নয়—তাহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন।[২] কাহিনীর উদ্ভবমূলে যিনি দাক্ষিণাত্যের বা তেলেগুর দাবী উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহার একটি যুক্তি এই যে, নৃত্যদ্বারা দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার রীতি সেই দেশেই প্রচলিত, বঙ্গদেশে নহে। অথচ সকল মনসা-মঙ্গল কাব্যেই বেহুলা-চরিত্রের এই গুণটির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে, এক হিসাবে ইহার উপরই কাহিনীর পরিণতিও নির্ভর করিয়াছে। কিন্তু তুর্কী আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার সমাজে নৃত্য বাঙ্গালী নারীর যে অবশ্য-শিক্ষণীয় একটি বিদ্যা ছিল, তাহা নানা সূত্র হইতে জানিতে পারা যায়। মনসা-মঙ্গলে শিব সর্বত্রই নটরাজ, নৃত্যেই তাঁহার আনন্দ। সুতরাং এই গুণ বাঙ্গালী নারীরও ছিল।

আবার কেহ মনসা-মঙ্গলের চম্পকনগরীকে প্রাচীন মগধের রাজধানী চম্পক অনুমান করিয়া 'বিহারই এই গীতির আদিস্থান বলিয়া গণ্য' করিতে চাহেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে য়ুয়াঙ্ চুয়াঙ্ ভারত-ভ্রমণে আসিয়া বর্তমান উত্তর-বিহারের অন্তর্গত গঙ্গার দক্ষিণ-তীরবর্তী চম্পা নামক নগরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সময় চম্পা নগরীতে 'there were scores of ruined convents, in which about 200 monks still continued to reside—the Brahmanical temples were many and well-frequented'. (Elphinstone, *History of India*, 1874, p. 294)। চম্পা বর্তমান ভাগলপুর শহরের সংলগ্ন চম্পা নগর বলিয়াই মনে হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন পাটলিপুত্র হইতে গঙ্গা নদী দিয়া চম্পা ও পরে তাম্রলিপ্ত পৌঁছিয়াছিলেন। এই চম্পা ও ভাগলপুরের নিকটবর্তী চম্পা হওয়াই সম্ভব।

মনসা-মঙ্গলের একজন কবি চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সনকাকে 'বেহারিয়া রাজার কন্যা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও একজন কবির রচনায় মনসা-মঙ্গলের নদনদী সম্পর্কে 'বিহারিয়া' নদীর উল্লেখ আছে। বঙ্গদেশের বাহিরে 'উত্তরে নিষধ ও দক্ষিণে কালঞ্জর'; ইহার মধ্যবর্তী স্থানে নিম্নশ্রেণীর হালুয়া চাষী সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে মনসা-পূজা সর্বপ্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, একজন মনসা-মঙ্গলের কবির রচনায় তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। আর একজন মনসা-মঙ্গলের কবির রচনায় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যে, লখিন্দরের নিমিত্ত কন্যা দর্শনে বহির্গত হইয়া 'বেহার পাটনে চাঁদ মিলিলেক গিয়া।' অতএব দেখা যাইতেছে, কাহিনীর ঘটনাস্থান বিষয়ে বিহার সম্বন্ধে একটি সংস্কার সেকালের মনসা-মঙ্গলের কবিদিগের মধ্যে বর্তমান ছিল। অবশ্য এই সংস্কার যে খুব ব্যাপক ছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না—মাত্র কোনও কোনও কবির রচনায় ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

এই বিষয়ে অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারা যায় যে, উত্তর-বিহারের প্রায় সর্বত্র জনসাধারণের মধ্যে সর্পদেবী মনসার পূজার ব্যাপক প্রচলন আছে। সেখানকার অধিবাসিগণ সমস্ত শ্রাবণমাস ব্যাপিয়া রাত্রিযোগে প্রত্যেক গ্রামের এক-একটি স্থানে সমবেত হইয়া লখিন্দর-বেহুলার কাহিনী গান করিয়া রাত্রি জাগরণ করে। মানভূম, হাজারীবাগ ও গয়া

জিলার কেওট, কুর্মী প্রমুখ নিম্নজাতি প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে এখনও বাড়ি বাড়ি মনসার গীত গাহিয়া বেড়ায়। উত্তর বিহারে প্রায় বাংলার মনসা-মঙ্গলের অনুরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে—দেবনাগরী অক্ষরে বিহারী ভাষায় এই কাহিনী একাধিক স্থান হইতে মুদ্রিত হইয়াও প্রকাশিত হইয়াছে।[১] তাহাতে কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—

সোনাদহ নামক হ্রদে মহাদেব প্রত্যহ স্নান করিতে যান। একদিন তিনি স্নানকালে তাঁহার মাথার পাঁচটি জটা খুব রগড়াইয়া জলে ডুব দিলেন; যখন পুনরায় ভাসিয়া উঠিলেন, দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পাঁচটি জটায় পাঁচটি পদ্ম ফুটিয়াছে। মহাদেব খুশী হইয়া ফুল কয়টি তুলিয়া লইয়া গৃহে চলিলেন। একটি সাজির মধ্যে ফুল কয়টি রাখিয়া তিনি নিত্যপূজা সারিবার জন্য দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। গৌরী সাজি হইতে ফুল কয়টি হাতে লইয়া দেখিতে লাগিলেন, এমন সময় সহসা পাঁচটি কুমারী কন্যা পাঁচটি ফুল হইতে বাহির হইয়া আসিল। ইহাদের মধ্যে একজনের এক চোখ কানা। তাঁহার নাম বিষহরী বা মনসা। বিষহরী গৌরীকে বলিলেন যে, তিনি তাঁহার কন্যা, মহাদেব তাঁহার পিতা। গৌরী শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলেন এবং এই সম্পর্ক অস্বীকার করিলেন। মনসা তথাপি তাঁহার কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। গৌরী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। মনসা নিজেকে দারুণ অপমানিত বোধ করিলেন এবং গৌরীকে দংশন করিয়া চলিয়া আসিলেন। গৌরী অচৈতন্য হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

পূজা সমাপনান্তে আসিয়া মহাদেব গৌরীকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, গৌরীকে সর্পে দংশন করিয়াছে। তিনি সত্বর একজন ওঝা ডাকাইলেন, কিন্তু ওঝা তাঁহার কিছুই করিতে পারিল না। অবশেষে মনসা ভগিনীদিগকে সঙ্গে লইয়া সেখানে আসিয়া পুনরায় উপস্থিত হইলেন। তিনি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া গৌরীর দেহ হইতে বিষ ঝাড়িয়া দিলেন। গৌরী চক্ষু মেলিয়া তাকাইলেন। মহাদেব প্রীত হইয়া মনসাকে বর দিতে চাহিলেন। মনসা বলিলেন, 'চাঁদ সদাগর যেন আমাকে পূজা করে, যদি না করে তবে তাহার উপর যেন প্রতিশোধ লইতে পারি—সে তোমার ভক্ত, তুমি অনুমতি না দিলে আমি তাহার কিছুই করিতে পারিতেছি না।' মহাদেব বলিলেন, 'তাহাই হউক।' মনসা ভগিনীদিগকে সঙ্গে লইয়া চাঁদ সদাগরের নিকট গিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে বলিলেন। চাঁদ সদাগর বলিলেন, 'কে তুই, ডাইনী? দূর হ, নহিলে তোর পিঠ ভাঙ্গিয়া দিব।' মনসা বলিলেন, 'আমার কথা না শুনিলে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।' চাঁদ বলিলেন, 'দেখি, তুই আমার কি করিতে পারিস্।' মনসা বলিলেন, 'আচ্ছা, তবে তাহাই হউক।' বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া মনসা চলিয়া গেলেন।

১। 'বেহুলা কী কথা', হিন্দী প্রচারক পুস্তকালয়, কলিকাতা (?); মনসা পূজা তথা বিষহরী গীত, সালকিয়া, হাওড়া।

চাঁদেব ছয় পুত্রের সর্পদংশনে মৃত্যু হইল। অবশেষে আর এক পুত্রের জন্ম হইল, তাহার নাম লখিন্দর। একদিন লখিন্দর গঙ্গায় বঁড়শীতে মাছ ধরিতে গেল। এক বিরাট মাছ তাহার টোপ গিলিল। অতি কষ্টে ইহাকে তীরে তুলিয়া সে দেখিল যে, ইহা একটি লোহার মাছ। লখিন্দর আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেল। ইহা লইয়া সে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। গঙ্গাদেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'এই লোহার মাছ দিয়া আমি কি করিব, বলিয়া দাও।' গঙ্গাদেবী আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, 'মাছটি বাড়ি লইয়া যাও, যখন তোমার পিতা তোমার জন্য কন্যা সন্ধান করিতে বাহিং হইবেন, তখন এই মাছটি তাঁহাকে দিয়া বলিও, যে-কন্যা ইহা স্বহস্তে কাটিয়া রন্ধন করিতে পারিবে, তাহার সঙ্গেই যেন তোমার বিবাহ ঠিক করা হয়।' লখিন্দর মাছটি লইয়া গৃহে গেল এবং মাতা পিতার কাছে সকল কথা খুলিয়া বলিল।

অল্পদিনের মধ্যেই চাঁদ তাঁহার পুত্রেব জন্য কন্যার সন্ধানে বাহির হইলেন। সঙ্গে করিয়া লোহার মাছটিও লইলেন। অনেক কন্যাই দেখিলেন, কিন্তু কেহই লোহার মাছ কুটিতে পারিল না; বঁটি ভাঙ্গিয়া গেল। চাঁদ এইবার সাহু সদাগর নামক এক বণিকের গৃহে আসিলেন। তাহাব এক কন্যা ছিল, নাম বেহুলা। সে জাতিস্মর ছিল। সে লোহার মাছটি কাটিয়া ইহা দ্বারা উত্তম ব্যঞ্জন রন্ধন করিল, চাঁদ প্রসন্ন হইয়া তাহার সঙ্গেই নিজের পুত্রের বিবাহ স্থির করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

বিবাহের দিন স্থির হইল। বেহুলা পিতাকে বলিল, 'বাসরের জন্য লৌহগৃহ নির্মাণ করিতে শ্বশুরকে বলিও।' পিতা উদ্বিগ্ন হইয়া ইহার কারণ জানিতে চাহিলেন। বেহুলা বলিল, 'বাসরে আমার স্বামীর সর্পদংশনে মৃত্যু লেখা আছে।' সাহু চাঁদকে এ কথা জানাইলেন। চাঁদ এক নিশ্ছিদ্র লৌহবাসর নির্মাণ করিবার জন্য স্থপতিকে আদেশ দিলেন। বাসর নির্মাণ করিয়া স্থপতি যখন গৃহে ফিরিতেছিল, তখন মনসা তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন, 'যদি জীবনের মমতা কর, তবে লৌহবাসরে একটি গোপন ছিদ্র রাখিয়া আইস।' ভয় পাইয়া স্থপতি তাহাই করিল।

বিবাহের পর রাত্রিযাপন করিবার জন্য নবদম্পতি লৌহবাসরে গিয়া প্রবেশ করিল। বেহুলা চারিটি নকুল সঙ্গে করিয়া লইল, নকুল চারিটি খাটের চারিটি খুরায় বাঁধিয়া নিজেও লখিন্দরের পায়েব কাছে জাগিয়া বসিয়া রহিল। রাত্রি গভীর হইতে লাগিল। মায়ানিদ্রায় বেহুলার চোখ আচ্ছন্ন হইয়া গেল, সেও পালঙ্কের উপর শুইয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল; তাহার মাথার খোলা চুল মাটিতে লুটাইতে লাগিল।

লৌহবাসরের গোপন ছিদ্রপথে মনিয়াব নামক সর্প প্রবেশ করিল। মনিয়ার দেখিল, পালঙ্কের খুরা বাহিয়া উপরে উঠিবার উপায় নাই, নকুলেরা পাহারা দিতেছে। তবে কি করিয়া উপরে উঠিতে পারা যায়? সে দেখিল, বেহুলার খোলা চুল পালঙ্ক হইতে মাটিতে পড়িয়া লুটাইতেছে—সেই চুল বাহিয়া পালঙ্কে উঠিয়া গেল; তারপর লখিন্দরকে দংশন করিয়া চক্ষের পলকে ছিদ্রপথে অদৃশ্য হইয়া গেল। তীব্র বিষের জ্বালায় লখিন্দরের ঘুম

ভাঙ্গিয়া গেল, তাহার আর্তনাদে বেহুলা জাগিল। কিন্তু লখিন্দর সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণত্যাগ করিল। রাজ্যে কান্নার রোল পড়িয়া গেল।

স্থির করা হইল, লখিন্দরের দেহ ভেলায় করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইবে। বেহুলা জানাইল, সে স্বামীর দেহের অনুগমন কবিবে। সকলে তাহাকে এই দুরূহ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বলিল; কিন্তু কিছুতেই কোনও ফল হইল না। ভেলায় করিয়া লখিন্দরের দেহ নদীর জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। ভেলায় বসিয়া বেহুলা স্বামীর দেহ কোলে করিয়া নদীস্রোতে দ্রুত অদৃশ্য হইয়া গেল। ভাসিতে ভাসিতে ভেলা নেতুলার ঘাটে গিয়া ঠেকিল। নেতুলা স্বর্গের দেবতাদিগের কাপড় কাচিত। বেহুলা তাহার সহায়তায় দেবপুরে গিয়া পৌঁছিল। নৃত্যদ্বারা দেবতাদিগের সন্তুষ্ট করিয়া বেহুলা স্বামীর প্রাণ ফিরিয়া পাইল. কিন্তু তাঁহাকে শপথ করিতে হইল যে চাঁদকে দিয়া সে মনসার পূজা করাইবে। মনসা চাঁদের ছয় পুত্রের জীবনও ফিরাইয়া দিলেন। বেহুলা সকলকে লইয়া দেশে ফিরিয়া চাঁদকে দিয়া মনসার পূজা করাইল।

উল্লিখিত কাহিনী হইতে জানা যাইতেছে যে, উত্তর-বিহারে প্রচলিত বেহুলার কাহিনীটি বাংলা মনসা-মঙ্গল কাব্যের মত এত জটিল ও অনাবশ্যক পৌরাণিক কাহিনীতে ভারাক্রান্ত নহে। বেহুলা-লখিন্দরের মূল কাহিনীর ধারাটি এখানে অক্ষুণ্ণ থাকিলেও, ইহার মধ্যে বাংলাদেশের মনসা-মঙ্গল কাব্যের মত কবি-কল্পনার এমন উদ্দাম নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায় না। মনসা-মঙ্গলের লৌকিক কাহিনীটি আপনার পূর্ণতা ও সংযম রক্ষা করিয়াই এখানে প্রচলিত আছে। ইহার কারণ এই মনে হইতে পারে যে, কাহিনীর মূল ধারাটিই বিহারে প্রচলিত আছে এবং সে দেশের ধর্মীয় অবস্থার অনুকূল না হওয়ার জন্যই হয়ত ইহাতে অবাস্তব মহাভাবতীয় ও পৌরাণিক আখ্যানসমূহ আসিয়া যুক্ত হইতে পারে নাই। কিংবা এমনও মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, মনসা-মঙ্গলের এই কাহিনীটি বিহার হইতে বাংলাদেশে আসিয়া এখানকার অধিকতর কল্পনা-শক্তি-সমৃদ্ধ কবিদিগের হাতে পড়িয়া এখানে পল্লবিত হইয়াছে। তবে এ'কথা সত্য, বাংলাদেশে প্রচলিত কাহিনীটির মধ্যে যেমন চরিত্র-সৃষ্টির সার্থকতা ও কাব্যগুণ আছে, বিহারে প্রচলিত কাহিনীতে তাহা নাই।

বিহারে প্রচলিত মনসা-কাহিনীর সঙ্গে বাংলায় প্রচলিত মনসা-বিষয়ক সংস্কারের কতকগুলি অপূর্ব ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিহারে মনসা পাঁচ ভগিনীর অন্যতম, অন্যান্য ভগিনীরা সর্বদা তাঁহার সহচরী। বীরভূম জেলার সর্বত্র মনসা-সম্পর্কিত অনুরূপ ধারণা প্রচলিত আছে। সেখানে পাঁচটি কিংবা সাতটি ঘট মনসা বলিয়া সর্বদা পূজিত হয় এবং তাহারা পরস্পর ভগিনী সম্পর্কে আবদ্ধ বলিয়া কথিত হয়। মনসা-মঙ্গল কাব্যের প্রাচীনতর যে একটি স্বতন্ত্র ধারার উল্লেখ করিয়াছি অর্থাৎ শঙ্কর গারুড়ী ও নেতার কাহিনী, বিহারে প্রচলিত মনসা-মঙ্গলে তাহার উল্লেখ নাই—নেতুলা চরিত্রটির উল্লেখ আছে মাত্র। বাংলার মনসা-মঙ্গলে কাব্যে হাসান-হোসেনের পালা, কিংবা হাসান পর্ব বলিয়া পরিচিত একটি

উপকাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু বিহারে প্রচলিত মনসার কাহিনীতে তাহা নাই। এই সকল কারণে এমন ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, বিহার হইতেই কাহিনীটি বাংলাদেশে আসিয়া প্রচারিত হইয়াছে। এবং এখানে স্থানীয় কতকগুলি লৌকিক কাহিনী ইহার মধ্যে সংযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই মত গ্রহণ করিবার পক্ষে কিছু অন্তরায় দেখা যায়।

প্রথমত, বিহারে প্রচলিত মনসা-কাহিনীর মুদ্রিত সংস্করণে পরিষ্কার বাংলায় রচিত কতকগুলি পদ পাওয়া যায়। নিম্নে একটি উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

ওরে পূবরে খোজিলাম বংগলা রাজ হে।
বালা জোগে কন্যা না দেখিলাম কুমারী হে॥
ওরে পাছিম খোজিলাম দেব করতাল হে।
বালা জোগে কন্যা না দেখিলাম কুমারী হে॥
ওরে উত্তরে খোজিলাম মোরঙ্গ রাজ হে।
বালা জোগে কন্যা না দেখিলাম কুমারী হে॥
ওরে দক্ষিণে খোজিলাম পূর্ব জগবন্নাথ হে।
বালা জোগে কন্যা না দেখিলাম কুমারী হে॥

এতদ্ব্যতীত বিহারে প্রচলিত মনসার কাহিনীর মধ্যে একটি স্থান ও তাহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, এই কাহিনী ধর্মপূজার দেশ রাঢ়ভূমি হইতে বিহার প্রদেশে গিয়াছে। মনসা বেহুলাকে তাহার বিবাহের পূর্বে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, সে বিবাহের রাত্রেই স্বামীকে হারাইবে এবং ছয় মাস জলে ভাসিয়া ময়নানগরে গিয়া উপস্থিত হইবে,—সেখানে তেত্রিশ কোটি দেবতার চরণ বন্দনা করিয়া তারপর স্বামীর পুনর্জীবন লাভ করিবে। বাঁকুড়া জিলায় ধর্মপূজার পীঠস্থান ময়নাপুর বা ময়নানগরে সেই যুগে যে দুশ্চর তপস্যা দ্বারা অসাধ্য সাধিত হইত, এই কাহিনীতে তাহারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। ময়নানগরের এই প্রকার উল্লেখ হইতে এই কাহিনী যে ধর্মপূজার দেশ রাঢ়ভূমি হইতে বিহারে গিয়া প্রচার লাভ করিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়। এতদ্ব্যতীত হুগলি জেলায় ত্রিবেণী তীর্থ সম্বন্ধেও তাহাতে বিস্তৃত উল্লেখ আছে, এই সম্পর্কে আরও একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভাগলপুর জেলার দক্ষিণস্থ সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালগণ সাপের যে ঝাড়ন মন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা বাংলা। তাহারাও মনসার পূজা করে এবং মনসাদেবীকে তাহাদের দেব-গোষ্ঠী বা 'বোঙ্গা'র সমাজে স্থান দেয়। চাঁদ সদাগরের কাহিনী তাহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই, তবে শঙ্কর গারুড়ীর কাহিনীর অনুরূপ এক কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, বিহার হইতেই মনসা-মঙ্গলের মৌলিক কাহিনীটি বাংলাদেশে আসিয়াছে, বাংলাদেশ হইতে বিহারে যায় নাই। মনসা-

মঙ্গলের মৌলিক কাহিনীভাগের মধ্যে একটি সর্বজনীন আবেদন আছে, ইহার অন্যান্য অংশ লৌকিক উপাদানে ভারাক্রান্ত। মনে হয়, বেহুলা-লখিন্দরের মূল কাহিনীটি মুখে মুখে যখন বিহারে প্রচলিত ছিল, তখনই তাহা বাংলাদেশে আসিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তারপর বাঙ্গালী ও বিহারীর মধ্যে এই বিষয়ক উপাদানের আরও কিছু আদান-প্রদান হইয়াছে। মনসা-মঙ্গলের পরবর্তী কবিদিগের বিহার সম্পর্কিত উল্লেখ হইতে কাহিনী বিহার হইতে বাংলাদেশে আসিয়াছে এমন ধারণা করাই সমীচীন হইবে।

এখানে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সম্প্রতি উত্তর-বিহারের অন্তর্গত মিথিলার কবি বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত একখানি পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।[১] ইহার নাম 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী'। ইহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং বিদ্যাপতির নামে আরোপিত হইলেও একমাত্র পূর্ববঙ্গে মৈমনসিংহ জিলা হইতে ইহার একমাত্র পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহা প্রকৃতই আদি মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি রচিত কি না সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায় না। ইহা বিদ্যাপতিরই পৃষ্ঠপোষক মিথিলার রাজা দর্পনারায়ণের আদেশেই রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে বাংলাদেশে প্রচলিত মনসা পূজার একটি বিবরণ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে মনসাদেবীর নাম ব্যাড়ী বলিয়া উল্লিখিত আছে। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, গ্রন্থখানি বাংলাদেশের বাহিরে মিথিলাতেই রচিত হওয়া সম্ভব—কোনও উপায়ে তাহা মৈমনসিংহের এক বিদ্যোৎসাহী ভূস্বামীর পাঠাগারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা হইতেও উত্তর-বিহারে যে মনসাপূজার ব্যাপক প্রচার ছিল, তাহাই বুঝিতে পারা যায়।

সম্প্রতি পুঁথিখানি একটি পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।[২] ইহা মনসাপূজার একটি বিধি, ১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মিথিলার কবি বিদ্যাপতি কর্তৃক ইহা রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় এবং বিদ্যাপতির 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'র নাম অনুযায়ী ইহার 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী' নামকরণ হয়। ব্যাড়ী শব্দের অর্থ সর্পিণী, সংস্কৃত ব্যাল শব্দের অর্থ সর্প, তাহাই উচ্চারণ-বিকৃতিতে ব্যাড় এবং তাহার স্ত্রীলিঙ্গে ব্যাড়ী হইয়াছে। ব্যাড়ী ব্যতীতও ইহাতে মনসা, বিষহরী এবং সুরসা—সর্পদেবীর এই বিভিন্ন নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে মনসাপূজাকে 'রয়হানি' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা অত্যন্ত তাৎপর্যমূলক; কারণ, বরিশাল জিলায় মনসাপূজাকে রয়ানি বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, ইহার সঙ্গে 'রয়হানি'র যে সম্পর্ক আছে, তাহা নিশ্চিত। পুঁথিখানিতে বেহুলা-লখিন্দরেরও উল্লেখ আছে, সুতরাং খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বেই যে বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী মিথিলায় প্রচলিত ছিল, ইহা হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। পুঁথিখানি বিদ্যাপতির সর্বশেষ রচনা

১। Vyadi-Bhakti-tarangini, G.C. Basu, *New Indian Antiquary*, Vol. VII. No. 3, pp. 49-57.

২। আহমদ শরীফ, 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী', ইতিহাস (ঢাকা), ১৩৭৫ পৃ. ১৫৬-১৯৬

বলিয়া মনে করা হয়।

মিথিলাতে ইহার কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই, ইহার একখানি মাত্র পুঁথি মৈমনসিংহের জমিদার কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরীর সংগ্রহে রক্ষিত ছিল; তাঁহার সংগ্রহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালায় প্রদত্ত হইয়াছে।[১]

মিথিলা হইতে পুঁথিটি কোনও উপায়ে পূর্ববাংলায় স্থানান্তরিত হয়। ইহার কারণ, মিথিলায় পরবর্তীকালে উচ্চশ্রেণীর সমাজে মনসাপূজা ব্যাপক প্রচার লাভ করিতে পারে নাই; সেইজন্য পুঁথিখানি সেখানে আর পুনর্লিখিত হয় নাই, তারপর ইহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল বলিয়া পূর্ব বাংলায় নীত হইবার পরও আর পুনর্লিখিত হয় নাই। ইহার প্রাসঙ্গিক অংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তাহা এই—

'লোকবাদ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। আকাশ হইতে দেবতাদের সৌহার্দ্যবশত পৃথিবীর এবং অপ্রতিলোকে লোকবাদ বলা হইয়াছে। ভূত, ডাকিনী প্রভৃতির শান্তির জন্য লৌকিক ঔষধ, মন্ত্র প্রভৃতি, বিষহরী মঙ্গলচণ্ডিকা সম্বন্ধীয় গীতসমূহ লোকবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। লক্ষ্মীধর যেহেতু মধুকর নামে একটি নৌকা দিয়াছিল, সেইজন্য সুন্দর নৌকা নির্মাণ করিয়া তাহাতে পূজার ব্যবস্থা করিবে। সমস্ত দেবতা পারবৃত মৃন্ময়ী প্রতিমা তৈরী করিয়া তাহাকে বিচিত্ররূপ দিয়া নৃত্যগীত সহকারে পূজা করিবে। "দেবতাদ্যৈঃ"—এই বাক্যাংশের "আদি" শব্দের দ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে সিদ্ধ, নাগ, কিন্নর, গন্ধর্ব, যক্ষ এবং রাক্ষসদেরও গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাঁহাদেরও পূজা করিতে হইবে। ২০ হাত নৌকা অধম, ৪০ হাত মধ্যম, ৬০ হাত নৌকা উত্তম, ১০০ হাত অতি উত্তম। নৌকা কমপক্ষে ১৪ হাত দীর্ঘ হইতে হইবে। ভূতনাথের সম্মুখে বিপুলার নৃত্যে উহা দেখিতে যাঁহারা সমাগত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও সেখানে পূজা করিবে। ব্রহ্মা, মাধব, রুদ্র, সরস্বতী, লক্ষ্মী, পার্বতী, কার্তিক, গণেশ, কালীয়, অষ্টনাগ, জরৎকারু, আস্তিক, মর্ত্যে চন্দ্রধর, তৎপত্নী স্বর্ণরেখা, তৎপুত্র লক্ষ্মীধর, তৎপত্নী বিপুলা, দ্বিজ শ্রীধর, দৈবজ্ঞ যশোধর, দুর্লভ কর্ণধারকে পূজা করিতে হইবে। অগ্রে গণেশ এবং নৌকার অষ্ট মনোহর পত্তিকে (মাল্লাকে) এবং অস্ত্রধর ভাণ্ডারীকে মধ্যে, অগ্রে ও মূলে পূজা করিবে। লেখ্যা, রজকী, সুগন্ধা, সুরেশ্বরী, দুর্গা এবং চতুর্দিকস্থ দেবতাদেরকে পূজা করিবে। আয়ুধ (অস্ত্র) এবং বাহনস্থ ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালদিগের পূজা ও হোম দ্বারা দ্বিজগণ অর্চনা করিবে। বাসনা ও শক্তি অনুযায়ী বিধিমতে বলিদানও করিতে হইবে। নৃত্যগীত ও বাদ্য সহকারে আবতি করিতে হইবে; তারপরে উত্তম ভেলায় দেবীকে স্থাপন করিবে এবং তারপরে যথাবিধি দক্ষিণা প্রদান করিয়া গীতবাদ্য সহকারে পূজা সমাপন করিবে। সেই গৌহারী পৃথিবীতে নাগ নামে বিখ্যাত। এই সুরসা দেবীকে যে ভক্তি সহকারে সংযত হইয়া পূজা করে, সে ইহজীবনে সমস্ত কাম্যফল লাভ করে, দেহান্তে (মৃত্যুর পর)

১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন পুঁথি সংখ্যা কে-৫৩১.১

উত্তম স্বর্গ প্রাপ্ত হয় এবং পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র অবধি সৌভাগ্য ও নীরোগতা প্রাপ্ত হয়। তাহার ডাকিনী প্রভৃতি হইতে, অথবা সর্প হইতে ভয় থাকে না।

গৌড়ীয়-মৈথিলকৃত্যসারেও বলা হইয়াছে—সুরসাকে কালীয় প্রভৃতি অষ্টনাগের সহিত যে পূজা করে, সে ইহজগতে নানারূপ ভোগের অধিকারী হয় এবং স্বর্গেও আনন্দ ভোগ করে এবং মর্ত্যবাসিগণ সাপের ভয়ে উদ্বেলিত হয় না এবং পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র অবধি বিত্ত এবং নীরোগতা প্রাপ্ত হয় এবং সর্বপাপমুক্ত হয়।

সর্প হইতে ভয় পাইয়া ঐহিক বিবিধ ভোগ প্রাপ্তি এবং স্বর্গবাস কামনা করিয়া মনসা দেবীর প্রীতি-উৎপাদনের জন্য পূজা করিবে ইহাই লক্ষ্য।

ইহার পরে "রয়হানি" বলা হইতেছে।

যাহার দর্শন হইতে অখিল রয়হানি প্রাপ্ত হইয়া যায়, সেই মঙ্গলদায়িনী প্রতিমাকে রয়হানি বলা হইয়া থাকে।

ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্য সাধ্যানুসারে সুবর্ণ, রজত, তাম্র ও মৃত্তিকার দ্বারা প্রতিমা তৈরী করিবে। গৌড়মৈথিলপ্রাচ্যাদিকৃত্যসারে প্রতিমায়, চিত্রে, মণ্ডলে অথবা ঘটে সাধকগণ পৃথিবীতে সুরসাদেবীকে দুর্গার মত পূজা করিবে। দুর্গার মত পূজার কথা বলার উদ্দেশ্য হইতেছে, বলিদান প্রভৃতি আচার প্রতিপালনীয়। মুনির প্রিয় জগদ্গৌরীকে যে নিরামিষ দ্বারা অর্চনা করে, তাহার সংবৎসরে মধ্যে পদে পদে নিত্য হানি হইতে থাকে। শাস্ত্রবিশারদ্গণ যে বলিয়াছেন যে, ছাগাদি বলিদান প্রশস্ত নহে, তাহা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। পঞ্চমী তিথিতে বৃহস্পতি ও রবিবারে অথবা কাহারও মতে, শুক্লপক্ষে দশমী এবং ত্রয়োদশী তিথিতে সর্বশান্তিপ্রদায়িনীকে বৈশাখ ইত্যাদি মাসে পূজা করিবে। ইহার দ্বারা শ্রাবণ মাসেও পূজা করা যাইতে পারে এরূপ অভিমত দেওয়া হইল। সেইরূপ পদ্মপত্রে অথবা ক্ষুদ্র পাত্রে দেবীকে নৈবেদ্য দিবে। প্রতিমা নির্মাণের প্রযাসবাহুল্যের জন্য এবং পূজার ফল শ্রবণের জন্য উহা সুফলজনক। ছান্দোগ্য-পরিশিষ্টে এরূপ বলা হইয়াছে, যেখানে মনীষিগণও শ্রেয়ঃ কার্যের জন্য কৃচ্ছ্র বাহুল্য করিয়া থাকেন, সেখানে কৃচ্ছ্রই লাভ করিয়া থাকেন। এখানে যদিও একবার করিলেই শাস্ত্রার্থ করা হইল, এই ন্যায় অনুসারে একবার পূজা করিলেই ফলসিদ্ধি লাভ হইবে, তথাপি ফলবাহুল্যলাভের জন্য তিন দিনেরও বেশী প্রত্যহ পূজা করিবে। জৈমিনীও বলিয়াছেন, লোকে যে পরিমাণ কর্ম করে, সেইভাবেই তাহার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। যেমন কর্ষণাদি কার্যের বাহুল্যবশত বেশী শস্য সঞ্চয় হয়, সেই প্রকার বৈদিক কর্ম সম্বন্ধে জানিবে এরূপই অর্থ করিতে হইবে। এইরূপ কর্ম করিলেও যদি উপযুক্ত ফল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কলির প্রভাবেই এরূপ হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে।

গৌড়মৈথিকলৃত্যসারে মণ্ডল সম্বন্ধে এরূপ বলা হইয়াছে। মাটিতে এক হস্ত পরিমিত মণ্ডল তৈরী করিবে। উহা চতুষ্কোণ ও চতুর্দ্বারবিশিষ্ট এবং রক্তপদ্ম-বিভূষিত হইবে। এইরূপ

মণ্ডলে অষ্টনাগের সহিত মনসাদেবীকে পূজা করিবে।

অপর পক্ষে (জনার্দন যখন সুপ্ত থাকেন সেই পক্ষে) পঞ্চমী তিথিতে সিজ (মনসা) বৃক্ষাস্থিতা মনসাদেবীকে গৃহাঙ্গনে পূজা করিবে। দেবীকে পূজা করিলে এবং প্রণাম করিলে সর্প হইতে ভয় থাকিবে না। পঞ্চমী তিথিতে অনন্ত প্রভৃতি মহানাগদের পূজা করিবে।

সর্পবিষ নষ্টকারী ক্ষীর এবং সর্পি (ঘৃত) নৈবেদ্য হিসাবে প্রদান করিবে। গরুড়পুরাণেও উক্ত হইয়াছে। অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট ও শঙ্খ—ইঁহারা অষ্টনাগ বলিয়া প্রকীর্তিত। কালীয়, ধৃতরাষ্ট্র, পিঙ্গল, মণিভদ্র, ঐবাকত, ধনঞ্জয় প্রভৃতিকেও অর্চনা করিবে। এই চতুর্দশটি বরদ এবং কামরূপী বলিয়া বিশেষভাবে আখ্যাত হইয়াছেন। 'মনসাদেবীকে পূজা করিবে' ইহার অর্থ হইতেছে, দেবীপুরাণ দৃষ্টে মনসা সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে। তাহাতে 'ওঁ মনসাদৌব্য নমঃ' এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র। অথবা 'মং মনসাদেব্যৈ নমঃ' ইহাও হইতে পারে। 'ওঁ বিষহরায়ৈ নমঃ' এইরূপ সপ্তাক্ষর মন্ত্রও রহিয়াছে। 'বিং বিষহরায়ৈ নমঃ' এইরূপ মন্ত্রও আছে।

অধিবাস গৃহে দেব যথাবিধি শয্যায় শয়ন করেন। সেইজন্য ইহাকে অধিবাস বলে। এক, দুই বা তিন রাত্রি যাবৎ কর্তা নিজের বৃত্তি অনুসারে সদ্য অধিবাস করিবেন। গন্ধ-মাল্যাদি দ্বারা যে সংস্কার সাধিত হয়, তাহাকে অধিবাস বলে, ইতি অমরকোষ। শ্রীপতি বলেন, পঙ্কজ, মনসাদেবী, পদ্মনাভ, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি। সেজন্য 'ওঁ মনসা দেব্যৈ নমঃ'—এই মন্ত্র 'মনসাদেবী'—এই পঞ্চাক্ষর নামের জন্য হইয়াছে।

নাগদের প্রতিমার অভাব হইলে দেবীর মুকুটে অনন্তদেবকে ধ্যান করিবে। অনন্ত প্রভৃতি ত্রিনাগের দ্বারা পণ্ডিত ব্যক্তি মুকুটকে ভাবিবেন। কর্কট এবং কুলীর নাগের দ্বারা রচিত কর্ণাভরণভূষিতা হস্তধৃত শঙ্খ ও পদ্মনাগ এবং নাগ হার ও কাঞ্চীশোভিতা মনসাদেবীকে পূজা করিবে। তাঁহার সম্মুখে গণনায়ককে, দক্ষিণে চণ্ডিকাকে, বাসুদেবকে পৃষ্ঠে এবং বামভাগে সর্বকামফলপ্রদ মহাদেবকে ধ্যান করিবে। শিবের নিকটস্থ গঙ্গাকে এবং বাসুদেবের নিকটস্থা লক্ষ্মীকে পূজা করিবে। ইহার পরে অবতারদেবকে এবং ইন্দ্রাদি লোকপালদিগকে স্ব স্ব দিকে অবস্থিত মনে করিয়া পূজা করিবে। তারপরে চন্দ্রধর প্রভৃতিকে ক্রমান্বয়ে পূজা করিবে। তারপরে হোম করিবে।

সেজন্য 'ওঁ মনসাদেব্যৈ নমঃ স্বাহা'—এই দশাক্ষর মন্ত্র হোমে প্রযুক্ত হইবে। ঘৃত প্রভৃতির আহুতি শ্রুবকে (যজ্ঞপাত্রকে) অধোমুখী করিয়া দিতে হইবে। লাজের (খৈয়ের) আহুতি 'চিত' হাত করিয়া দিতে হইবে। জপ প্রভৃতিতে ১০৮, বা ১০০৮ সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে। শান্তি দান করে বলিয়া অগ্নি বরদ। শান্তিক এবং বরদ সমার্থক। 'কশ্যপস্য' এই মন্ত্রের দ্বারা শিরঃ, কণ্ঠ প্রভৃতিকে বন্দনা করিবে। তারপরে শান্তি ও অবধারণাবাচন করিবে এবং দক্ষিণা দিবে এবং প্রতিমার বিসর্জন দিবে। শান্তি বলিতে 'বামদেব্য গান' বুঝায়। 'অবধারণ' শব্দের অর্থ অচ্ছিদ্রাবধারণ। নারদীয়ে উক্ত হইয়াছে,—হে শুভে, যে মানুষ বৃথা

বিপ্রবাক্য গ্রহণ করে অথবা দক্ষিণা না দিয়া যায় সে নিশ্চয়ই নরকে গমন করে। বিসর্জনের পরে নদীতে দেবীকে স্থাপন করিবে না। এই প্রকার লোকপ্রবাদ আছে এবং অসমর্থ হইলেও এইরূপই করিবে।

তার পরে ইচ্ছারূপী বলে দাক্ষিণাত্যের জনগণ কালবিষ হরণ করে বলিয়া অকৃষ্ণবর্ণারূপেও পূজিতা হন। পূজার বিভিন্ন প্রকারও আছে। দুইদিন অথবা চারিদিন বা একরাত্রি বা দুইরাত্রি হলীপূজা করিবে। কৃদৃশী সমূহের দ্বারা অর্চিতা আরোগ্যদায়িকা 'কৃম্' ইতি দৈব ক্লীংকার তাহাতে কার্য যাহার পূজার সেই ক্লীংকৃতিকে পূজা করিবে—এইরূপ কথার কোন অর্থ হয় না। কুস্কতি (বীক্ষণ) যাহার পূজায়, তাহাই লেখা হইতেছে, অর্থাৎ তাহারই পূজা করিতে হইবে, এই অর্থ। অন্য যাহা কিছু লেখা হইল না, তাহার জন্য 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' নামক গ্রন্থ অনুসন্ধান করিবে। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় পুনরায় লেখা হইল না। ইতি সমস্তপ্রক্রিয়ালঙ্কৃত ভূপতিবর সমরবিজয়ী বীর শ্রীদর্পনারায়ণদেবের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া শ্রীবিদ্যাপতিকৃত শ্রীব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থের প্রথম তরঙ্গ। শ্রীব্যাড়ীচরণ আমার যেন ভক্তি থাকে।

ওঁ মনসাদেবীকে নমস্কার। স্মৃতি, আগম, পুরাণ এবং লোকপ্রবাদ অনুসরণ করিয়া ব্যাড়ীপূজা বিধানের প্রয়োগ লিখিয়াছি। এখন অধিবাসের নিয়ম বলিতেছি। পূর্বদিন সংযত হইয়া অধিবাস দিনে সন্ধ্যাকালে অধিবাস করিবে, পূর্বে প্রাতঃকালে স্নানাদি সমাপন করিয়া গোময়-লিপ্ত স্থানে কুশহস্তে আচমন করিয়া উত্তরমুখে কুশাসনে বসিয়া ব্রাহ্মণদেবকে স্বস্তি বলিয়া 'ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ'—এই মন্ত্রের দ্বারা বিষ্ণু স্মরণ করিয়া 'ওঁ তৎসৎ'—এইরূপ উচ্চারণ করিয়া কুশত্রয় এবং তিলজলপূর্ণ তাম্রপাত্র অথবা যা কিছু পাওয়া যায় তাহা গ্রহণ করিয়া অন্য অমুক মাসে, অমুক পক্ষের অমুক তিথিতে এবং অমুক বারে তিনদিন যাবৎ প্রতিদিন অমুক গোত্র, অমুক দেবশর্মা পুত্র পৌত্র এবং প্রপৌত্রসহ ঋষি এবং নৈরুজ্য প্রাপ্তির জন্য এবং সর্পভয় হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঐহিক বিবিধ ভোগ এবং পারত্রিক স্বর্গলাভের জন্য এবং শান্তিকামী হইয়া মনসাদেবীর প্রীতি উৎপাদনের জন্য আমি মনসাদেবীকে পূজা করিব।

'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী'তে উল্লিখিত মনসাপূজার পদ্ধতি অনুসরণ করিলে দেখা যায়, বাংলাদেশে ইহাই মোটামুটি মনসাপূজার বিধি। এমন কি, বরিশাল জেলায় মনসাপূজার বিশেষ অনুষ্ঠানকে যে রয়ানি বলিয়া উল্লেখ করা হয়, ইহাতে তাহারও বিস্তৃত উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং মনসাপূজার এই বিধি বাংলাদেশেই রচিত হইয়া ইহার উপর আভিজাত্য আরোপ করিবার জন্য তাহাতে বিদ্যাপতির নাম যোগ করা হইয়াছে কি না, এমন সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নবদ্বীপে স্মৃতির টোল স্থাপিত হইবার পূর্বে বাঙ্গালী ছাত্রগণ স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করিবার জন্য মিথিলায় যাইত এবং সেই সূত্রে ইহা সেখান হইতে অনুলিপি করিয়া আনিয়া বাংলাদেশে প্রচলিত করা কিছুই আশ্চর্য নহে। বিদ্যাপতি, রচিত 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' নামক দুর্গাপূজার বিধি বাংলাদেশেও প্রচলিত ছিল,

সেই সূত্রে তাঁহার 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী' অর্থাৎ মনসাপূজার বিধিও প্রচলিত থাকিবে তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। বাংলাদেশে যে মনসাপূজা প্রচলিত, তাহার মূল বিধি কবি বিদ্যাপতি রচিত ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহার ভিতর দিয়া মিথিলার সঙ্গে বাংলার আর একটি সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়; বাংলার মনসা-পূজার বিধি এবং এমন কি, বরিশালের রয়ানি উৎসব মিথিলা হইতে আসিয়াছে মনে করিতে হয়।

'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী'তে চাঁদ সদাগরের পত্নী সনকার মূল সংস্কৃত নামটির সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা স্বর্ণরেখা, তাহাই ধ্বনিগত পরিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী লোকমুখে সনকা বা সুনুকায় পরিবর্তিত হইয়াছে। কোন মনসা-মঙ্গলেই এই নামটিব উল্লেখ নাই। ইহা 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী'র প্রাচীনত্বের একটি বিশেষ নিদর্শন। সুতরাং বাংলার মনসাপূজার ইতিহাসে এই পুঁথিখানির একটি বিশেষ মূল্য আছে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কেহ মনে করিয়াছেন, চাঁদ সদাগর দাক্ষিণাত্যের কোনও স্থানের অধিবাসী ছিলেন; অতএব তাঁহাদের মতে লখিন্দর-বেহুলার কাহিনীটি দাক্ষিণাত্য হইতে বাংলাদেশে আসিয়াছে। এই মতবাদ যে-সকল যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে এই—মনসা-মঙ্গলের কাহিনীটি গভীরভাবে অনুসরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার সঙ্গে দক্ষিণ সমুদ্রের যোগ বড় নিবিড়। তেলেগু ভাষায় সিজ-মনসা গাছের নাম চেংমুড়। সিজ-মনসা গাছের নীচেই মনসাদেবীর পূজা হয়। বাংলা মনসা-মঙ্গল কাহিনীতে চাঁদ সদাগর তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া মনসাকে চেংমুড়ী বলিয়া উল্লেখ করিতেন। বাংলায় চেংমুড়ী শব্দের কোন অর্থ নাই। অতএব অনুমিত হয়, তেলেগু হইতে চেংমুড়ী কথাটি আনীত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মনসা-মঙ্গলের সমস্ত গল্পটিই সেখান হইতে আসিয়া থাকিবে। দাক্ষিণাত্যের আধুনিক লোক-সাহিত্যে প্রায় মনসা-মঙ্গলের অনুরূপ এক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। তাহাতে শিবের সহিত অম্মবরু নামক এক লৌকিক দেবীর বিবাদের কথা আছে; এই কাহিনীটির সঙ্গে বাংলার মনসা-মঙ্গল কাহিনীর কিছু সম্পর্ক থাকিতে পারে বলিয়া মনে করা হইয়াছে। কাহিনীটি এইরূপ—

'অম্মবরু এক গ্রাম্যদেবী,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তাঁহার প্রসূত অণ্ড হইতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহাদের বাসের জন্য তিনটি পুরী নির্মাণ করিয়া দিলেন; বলিয়া দিলেন, তাঁহারা যেন তাঁহাকে ছাড়া আর কাহারও পূজা না করেন। অম্মবরু জানিতে পারিলেন, তাঁহার কথা অমান্য করিয়া তাঁহারা নিজেদের পূজা প্রবর্তন করিতেছেন। দেবী ইহাতে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের পুরী ধ্বংস করিতে মনস্থ করিলেন। শৃগালে আরোহণ করিয়া সর্পরূপ যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া দেবী শিবপুরীর দিকে অগ্রসর হইলেন। এক দ্বাদশ মস্তক বিশিষ্ট বিরাটকায় সর্প শিবপুরীর সিংহদ্বার রক্ষা করিতেছিল। কিন্তু দেবীকে কিছুতেই রোধ করিতে পারা গেল না; তিনি পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া একে একে শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা তিনজনকেই বধ করিলেন, পরে পুনরায় তাঁহাদিগকে জীবন দান করিয়া তাঁহার পূজা করিবার আদেশ দিয়া

চলিয়া গেলেন। এবার অম্মবরু দেখিতে পাইলেন, তাঁহার ভক্ত এক নৃপতি শিবপূজা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে শাস্তি দিতে মনস্থ করিলেন। তিনি জরতীর বেশ ধারণ করিয়া কাঁধে একটি ফলের ঝুড়ি লইয়া রাজ-প্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দ্বারিগণ তাঁহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল। এবার দেবী এক লিঙ্গায়তের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নগরমধ্যে সহজেই প্রবেশ করিলেন। তারপর এক তোতার রূপ ধারণ করিয়া এক স্তম্ভের উপর বসিলেন। পূজারিগণ শিব-পূজা করিতে গেল, তাহাদের হাত হইতে পূজার সামগ্রী পড়িয়া গেল। অমঙ্গলকারীর সন্ধানের জন্য চারিদিকে লোক প্রেরিত হইল। তোতাবেশিনী অম্মবরু ধৃত হইয়া শিবের নিকট আনীত হইল। শিব তাহাকে নির্মমভাবে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু ঘাতকের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। অম্মবরু নিজের রূপ প্রকাশ করিয়া নগরবাসীদিগকে তাঁহার পূজা করিবার আদেশ করিলেন। তাহারা স্ত্রীদেবতার পূজা করিতে অস্বীকার করিল। দেবী ইহার প্রতিশোধ লইতে মনস্থ করিলেন। বসন্তরোগে নগরবাসী প্রাণ হারাইতে লাগিল। কিন্তু শিবের বিভূতিস্পর্শে তাহারা সকলে পুনরায় জীবন লাভ করিল। অম্মবরু ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। একবার শিবপূজারিগণ পূজার জন্য ফুল আহরণ করিতে তাঁহার পুরীতে আসিল, তিনি তাহাদিগকে বন্দী করিলেন; তাঁহার প্রতিহিংসার নিবৃত্তি হইল।

এখন এই যুক্তিগুলি বিচার করিয়া দেখা যাক। একটি কথা এই সম্পর্কে বিশেষভাবে মনে রাখা কর্তব্য যে দাক্ষিণাত্যের কোনও সামাজিক আচার, কিংবা সেখানকার ভাষার কোনও শব্দ বাংলার সমাজে কিংবা বাংলা ভাষায় প্রচলিত থাকিতে দেখিলেই তাহা যে দাক্ষিণাত্য হইতেই পরবর্তী কালে এ'দেশে আনীত হইয়াছে, এমন ধারণা করা সমীচীন হয় না। কারণ, দ্রাবিড় সংস্কার বাংলারও কতক নিজস্ব প্রাচীন সংস্কার। বাংলার ভাষায় বহু দ্রাবিড় শব্দ প্রচলিত আছে; এমন কি, 'পূজা' 'পুষ্প' এই শব্দগুলিই দ্রাবিড়। অতএব ইহা হইতেও কেহ যদি মনে করেন যে, পুষ্পদ্বারা দেবতার্চন করিবার রীতি পরবর্তী কালে দ্রাবিড় দেশ হইতে আসিয়াছে, তাহা নিতান্তই হাস্যকর হইবে। বাংলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসী মালে ও মাল পাহাড়ী জাতি এখনও দ্রাবিড় ভাষাভাষী। অতএব বাংলা ভাষার প্রচলিত দ্রাবিড় শব্দগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যে দাক্ষিণাত্যের কোন অঞ্চল হইতে আসিয়াছে, তাহা অনুমান করা সমীচীন হইবে না। বিশেষত যাঁহারা মনে করেন, সেনরাজদিগের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের কতকগুলি লৌকিক সংস্কার এদেশে আসিয়াছে, তাঁহাদের মত কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, সেনরাজগণ ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী। তাঁহাদের দাক্ষিণাত্যের লৌকিক সংস্কারগুলি সঙ্গে পরিচিত থাকিবার কোনও কথাই নহে, কিংবা তাহা থাকিলেও তাঁহারা সেই সংস্কারগুলি এই দেশে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উৎসুক ছিলেন, এ'কথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য সংস্কারেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেনরাজদিগের সময় হইতেই বাংলার সমাজ নূতন আর্যসংস্কারে দীক্ষা লাভ করিয়াছিল। অতএব যাঁহারা মনে করেন,

সেনরাজদিগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার লৌকিক দেবদেবীগণও দাক্ষিণাত্য হইতে এই দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদের মত সমর্থনযোগ্য নহে। উদ্ধৃত কাহিনীর সঙ্গে বাংলা মনসা-মঙ্গল কাহিনীর কোনও প্রকার সম্পর্ক আছে, এমন কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। ভারতের যে অঞ্চলেই প্রাচীন লৌকিক ধর্মের উপর ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে গিয়াছে, সেখানেই অনার্য দেবতার সঙ্গে আর্য দেবতার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, এই বিরোধের কাহিনী প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সংস্কৃত পুরাণ, বিশেষত উপপুরাণগুলিও এই প্রকার কাহিনীতে ভারাক্রান্ত। অম্মবরুর কাহিনীও গতানুগতিক গ্রাম্য দেবতা ও পৌরাণিক দেবতার কলহের বৃত্তান্ত লইয়াই রচিত; দেবতাদিগের কলহের মধ্যে এখানে কোনও মানব-মানবীর জীবনের ভাগ্যকে আনিয়া জড়িত করা হয় নাই। অতএব, বাংলা মনসা-মঙ্গল কাহিনীর উপর এই কাহিনীর প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব স্বীকার করা যায় না। বিশেষত বাংলা মনসা-মঙ্গলের কাহিনী দাক্ষিণাত্যেই যদি সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইত, তাহা হইলে দাক্ষিণাত্যের কোনও না কোনও অঞ্চলের লোক-সাহিত্যে এই অপূর্ব বিষয়-বস্তুটি রক্ষা পাইত। ইহার বিষয়-গৌরবের জন্যই সাধারণের মধ্যে ইহা অতি সহজে প্রচার লাভ করিতে পারিত। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের বিচিত্র এবং সমৃদ্ধ লোক-সাহিত্যসংগ্রহের কোনখানেই চাঁদসদাগর-বেহুলার কাহিনীটির কোনপ্রকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং এই হিসাবে দাক্ষিণাত্য অপেক্ষা বিহারের দাবী অগ্রগণ্য।

এখন কাহিনীর উদ্ভবের মূলে রাঢ়ের দাবী সম্পর্কে আলোচনা করিতে হয়। বিহারে প্রচলিত মনসা-কাহিনী যে রাঢ় হইতে নীত হইয়াছে, তাহার সম্ভাবনা সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনসা-মঙ্গলের প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য কবিই রাঢ় হইতে পূর্ববঙ্গে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান আক্রমণ হওয়ার পর সেনরাজগণ পূর্ববঙ্গে চলিয়া যান এবং সেখানে আরও দেড়শত বৎসরকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুপরিবার তখন পশ্চিমবঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু সেনরাজগণের আশ্রয়ে পূর্ববঙ্গে গিয়া বসতি স্থাপন করেন। দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনসা-মঙ্গল কাব্যের কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবিও প্রায় সেই সময়ে রাঢ়দেশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহারাই মুখ্যতঃ সেখানে গিয়া মনসা-মঙ্গলের কাহিনী সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছেন। পূর্ব বঙ্গের মনসা-মঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নারায়ণ দেব লিখিয়াছেন,—

> পূর্বপুরুষ মোর অতি শুদ্ধ মতি।
> রাঢ় ত্যজিয়া মোর বোরগ্রামে বসতি॥

পূর্ববঙ্গের দক্ষিণাংশে বিজয় গুপ্তই মনসা-মঙ্গল কাব্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি। বরিশাল জিলার গৈলা ফুল্লশ্রী গ্রামে বিজয় গুপ্তের নিবাস ছিল। রাঢ়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোন সংস্রবের কথা অবশ্য তিনি তাঁহার কাব্যে উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার রচিত কাব্য

বিশেষভাবে অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, তিনিও তাঁহার রচনায় রাঢ়ের প্রচলিত কাহিনীর ধারাটিকেই অনুসরণ করিয়াছেন।

বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গল কাব্যে নেতার জন্ম সম্পর্কে যে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শূন্য-পুরাণ বা ধর্মসাহিত্য বর্ণিত আদ্যাশক্তির জন্মবৃত্তান্ত হইতে আসিয়াছে। শূন্য-পুরাণ বা ধর্মসাহিত্য রাঢ়দেশেরই বিষয়-বস্তু, পূর্ববঙ্গে কোথাও ইহার প্রচলন নাই। অতএব ইহা পরবর্তী কালে বিজয় গুপ্তের কাব্যে সেখান হইতে প্রক্ষিপ্ত হইবারও কথা নহে। মনে হয়, মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর সঙ্গে রাঢ়ের এই বিশিষ্ট লৌকিক ধর্মমূলক জনশ্রুতিটিও পূর্ববঙ্গে আসিয়া প্রচার লাভ করিয়াছে। ইহা পূর্ববঙ্গের লৌকিক ধর্মের অনুকূল না হওয়ার জন্যই পরবর্তী কবিগণ তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বিজয় গুপ্তের কাব্যে রায়বাঁশিয়া পাইকেরও বর্ণনা রহিয়াছে। রাঢ়-ভূমি ব্যতীত রায়বাঁশিয়া পাইকের কোথাও অস্তিত্ব নাই, পূর্ববঙ্গে ইহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি খুঁটিনাটি বিষয় লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিজয় গুপ্ত তাঁহার কাহিনী রচনায় রাঢ়ের জনশ্রুতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে বরের আসনরূপে গামারিয়া পিঁড়ির ব্যবহার বিশেষরূপেই উল্লেখযোগ্য। গামারিয়া পিঁড়ি পশ্চিমবঙ্গে পূজিত লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের আসন। রাঢ় অঞ্চলে ইহার একটি বিশেষ ধর্মসম্পর্কিত মূল্য আছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গে ইহার প্রচলন অজ্ঞাত। তারপর বিজয় গুপ্ত লিখিয়াছিলেন যে, শ্বেতবর্ণের কাকের মুখে বেহুলা মাতার নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। শ্বেত কাক রাঢ়দেশে ধর্মঠাকুরের দ্বাররক্ষী বলিয়া উল্লিখিত হয়। পূর্ববঙ্গে এই প্রকার কোনও জনশ্রুতি নাই। ইহা ছাড়াও বিজয় গুপ্ত সর্বত্র উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'ধর্মের প্রভাবে বেহুলা নিরাহারে যায়।' ইহাতেও ধর্মপূজার কৃচ্ছ্রসাধনার বিষয়েরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ধর্মপূজা পূর্ববঙ্গে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং ইহা পশ্চিমবঙ্গেরই একটি লৌকিক ধর্ম মাত্র। অতএব এই সকল বিষয়ের সঙ্গে বেহুলা ও চাঁদ সদাগরের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বিচার করিয়া দেখিলে মনসা-মঙ্গলের কাহিনী যে রাঢ় পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। সমগ্র বাংলা দেশের মধ্যে রাঢ়-ভূমির অন্তর্গত বর্তমান বীরভূম জেলায় আধুনিক কাল পর্যন্তও মনসা পূজার সর্বাধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। বীরভূম জেলায় এমন কোনও গ্রাম নাই, যেখানে এক কিংবা একাধিক মনসার 'মন্দির' নাই। এই সকল 'মন্দিরে' নিম্নজাতির লোক কর্তৃক মনসাপূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। তাহা ছাড়াও বার্ষিক পূজা উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণও পূজা করেন। বীরভূম জেলার প্রায় প্রত্যেক গ্রামে কোনও না কোনও নিম্ন শ্রেণীর বিশেষত কেওট (কৈবর্ত) বা বাগ্দী জাতীয় লোকের বাড়ীতে মাটির দেওয়াল দেওয়া কোন খড়োঘরে মনসাদেবীর 'মূর্তি' প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায়। অবশ্য ইহাদিগকে মূর্তি বলা ভুল, প্রকৃতপক্ষে ইহারা মৃত্তিকা-নির্মিত ঘট। বাহিরের দিক হইতে ঘটের গায়ে কতকগুলি সর্পফণা

গড়িয়া তোলা হয়। ঘটের শীর্ষদেশে প্রত্যহ পূজারী কর্তৃক একটি সিজ-মনসার ডাল আনিয়া স্থাপন করা হয়। প্রত্যহ এই ঘটের সম্মুখে পূজা হয়, কাহারও মানসিক থাকিলে পাঁঠা, কবুতর ইত্যাদি বলিও দেওয়া হয়। দশহরা, শ্রাবণ-সংক্রান্তি, ভাদ্র-সংক্রান্তি ও নাগপঞ্চমীতে বিশেষ সমারোহের সঙ্গে উৎসব হয়। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ পূজা করিয়া থাকেন। জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেব-পূজিত রাধামাধব দেবতার মন্দির সমস্ত বৎসর প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকে, কেবলমাত্র মাঘমাসে মেলার সময় জনসমাগম হইয়া থাকে। কিন্তু রাধামাধবের মন্দিরের অদূরবর্তী এক বাগ্দীর বাড়ীতে এক মনসাদেবীর 'মন্দির' আছে। ইহা 'চিন্তামণি মনসার বাড়ী' নামে পরিচিত। চিন্তামণি মনসার বাড়িতে প্রায় প্রত্যহ সাত আট ক্রোশ দূর হইতেও লোক অজয়ের তপ্ত বালু পার হইয়া মানসিক পাঁঠা কিংবা কবুতর বলি দিয়া পূজা দিবার জন্য আসে। মন্দিরের আয়ে বাগ্দীর বৃহৎ পরিবার স্বচ্ছন্দভাবে চলিয়া যায়। জয়দেব-পূজিত রাধামাধবের মন্দির জীর্ণ ইতিহাসের পাতায় আশ্রয় লইয়াছে, কিন্তু চিন্তামণি-মনসার বাড়ী এখনও স্থানীয় অধিবাসীর নিত্য সংস্কারের মধ্যে জাগরূক আছে।[১] এই প্রকার সমগ্র বীরভূম জিলার কত যে মনসার বাড়ী আছে তাহা ইয়ত্তা নাই। শিউড়ীর নিকটবর্তী কড্ডে-কালীপুর নামক একই গ্রামে এমন ছয়টি মনসার বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক মনসা বাড়ীতেই নিত্যপূজা হয়। কড্ডে কালীপুরের মনসার কেওট দেয়াসিগণ মনসা-মঙ্গলের সুগায়ক। বিষম ঢাকীর (ডম্বরু জাতীয় এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র) তালে ইহারা যখন মনসা-মঙ্গল গান করে, তখন প্রকৃতই মনে হয়, এই সঙ্গীত সাধনা তাহাদের পুরুষানুক্রমিক সংস্কার, তাহা না হইলে কণ্ঠস্বরের মধ্যে এমন সুগভীর আবেগ ফুটিয়া উঠিতে পারে না।

বীরভূম জেলার সংলগ্ন দক্ষিণে বর্ধমান জেলায় চম্পাইনগর নামক একটি গ্রাম আছে; যে নদীর তীরে এই গ্রাম অবস্থিত তাহার নাম বেহুলা। বেহুলা নদীর তীরে বেহুলার একটি মন্দির আছে। এই সম্পর্কে জনশ্রুতি এই যে বেহুলা নদীর ধারে ধারে চম্পাইনগরে বিষহরীর আটন। নাগ পঞ্চমীতে বিষহরীর পূজার দিন আজও গ্রামের বধূরা শ্বশুর বাড়ীতে থাকে না, সেদিন তাদের বাপের বাড়ী যাওয়ার ব্যবস্থা। চম্পাইয়ের বধূরা বেহুলার বাসরের কথা স্মরণ করে সেদিন চম্পাইনগর ছেড়ে চলে যায়। বাপের বাড়ীতে গিয়ে উপবাস করে, চম্পাইনগরের বিষহরীর দরবারে পূজা পাঠায়।'[২]

এখনও প্রতি বৎসর বেহুলার মেলা নামে এই গ্রামে এক বিরাট মেলার অধিবেশন হয়।

১। এখানে উল্লেখযোগ্য যে চিন্তামণি এক জাতীয় সর্পের নাম। বাংলা দেশে এই নামটি এখন আর কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু মালয় উপদ্বীপে এই নামটি এখনও রক্ষিত আছে (W. W. Skeat, *Malaya Magic*, London, 1900, 303)। বাংলাদেশ হইতে যে এই নামটি কোনও উপায়ে মালয়ে গিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নাগিনীকন্যার কাহিনী', পৃ. ২৫৩

মেলার চারিদিক হইতে বহু বেদের দল আসিয়া সমবেত হয়। তবে জনশ্রুতি জনশ্রুতিই— ইহাকে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না।

বীরভূমের সুবর্ণবণিকদিগের বিবাহানুষ্ঠানের একটি আচারকে 'গাছবেড়া' বলা হয়। এই আচারটি বিবাহের দিন বা বিবাহের পূর্বদিন কিংবা গাত্রহরিদ্রার দিন সম্পূর্ণরূপে মনসাদেবীকে লইয়া অনুষ্ঠিত হয়। ইহার দুই তিন দিন পূর্বেই সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসাকে তাঁহার 'স্থান' বা মন্দির হইতে আনিয়া অষ্টমঙ্গলা পর্যন্ত বিবাহ-বাড়ীতে রাখা হয় এবং দেবীর গৃহাগমনের জন্য এই কয়েকটি দিন প্রতি সন্ধ্যায় মনসা-মঙ্গল গাওয়া হয়; মূল গায়েন এবং দুইজন খোল ও দুইজন মন্দিরা-বাদক— মোট পাঁচজন দলে থাকেন, বাদক চারিজন 'দোহারে' অংশ গ্রহণ করেন। গাছবেড়ার দিনটিতে পাত্রপাত্রীর উপবাসে থাকা কর্তব্য। এই দিন প্রভাতে কয়েকটি 'মেয়েলী আচারে'র প্রথা আছে, তন্মধ্যে 'জুয়াখেলা' উল্লেখযোগ্য। ইহার পর দ্বিপ্রহরে গাছবেড়া অনুষ্ঠানটি পালন করিবার জন্য একটি বিরাট মিছিল বাহির হয়। মিছিলটির পুরোভাগে থাকেন চামরহস্তে মনসা-মঙ্গলের মূল গায়েন, গায়ক ও বাদ্যকারগণ এবং ইহাদের পশ্চাতে মনসাদেবীর ঘট থাকে 'দেয়াশী'র ক্রোড়ে; দেবীর পার্শ্বে পুরোহিত থাকেন। ইহার পর কয়েকজন এয়োস্ত্রী নানা অলঙ্কার ও পট্টবস্ত্রে সজ্জিতা হইয়া কুম্ভকক্ষে অগ্রসর হন। দুইটি কিশোর-কিশোরী পথিপার্শ্বের জনতার উপর খৈ ছড়ায়। এয়োস্ত্রীগণের হুলুধ্বনি ও কিশোর-কিশোরীর শঙ্খধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া মিছিলটি অগ্রসর হইতে থাকে। এয়োদিগের মধ্যে বা পশ্চাতে বর কনে চলিতে থাকে, পাত্রের হস্তে থাকে জাঁতি বা দর্পণ, পাত্রীর হস্তে থাকে কাজলসতা। পাত্রী বামহস্তে এক কাষ্ঠের নৌকা টানে ও একটি ঝুনা নারিকেল দক্ষিণ হস্ত দিয়া গড়াইয়া দিতে থাকে। ইহা ব্যতীত আর একটি বাদকদল ঢাক, ঢোল, কাঁসি, সানাই বাজাইয়া ঐ মিছিলের অগ্রে কিংবা পশ্চাতে যাইতে থাকে। মিছিল মধ্যে মধ্যে দেবীকে লইয়া দাঁড়াইয়া জনসাধারণের জন্য মনসা-মঙ্গলের গান করে। এই অবসরে সামান্য পয়সার বিনিময়ে প্রাচীনাগণ পুরোহিতের নিকটে দেবীর ফুল বা বিল্বপত্রের জন্য প্রার্থনা জানায়, তাহাদিগের মধ্যে অনেকে প্রণাম করিয়া দেবীর চরণধূলা গ্রহণ করে। এই সময়ের বিশেষ ঘটনা হইল 'ভর'— অর্থাৎ এয়োগণের মধ্যে যাহাকে দেবী 'ভর' করেন, তাহাকে পুরোহিত জিজ্ঞাসা করেন যে, কোনও অপরাধ হইয়াছে কিনা। ঐ এয়োর মুখেই দেবীর উত্তর পাওয়া যায় এবং ত্রুটি হইলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান জানিতে পারা যায়। ক্রমে মিছিলটি গ্রামের প্রান্তে একটি বিশেষ, অশ্বত্থ বৃক্ষের নিকটে আসিয়া অল্পক্ষণ মনসা-মঙ্গল গান করে; পরে বর-কনে ও এয়োগণ বৃক্ষটিকে প্রদক্ষিণ করে; এই সময় এয়োস্ত্রীগণ হুলুধ্বনি দিতে থাকে ও বৃক্ষগাত্র সূতা দ্বারা বেষ্টন করা হয়। পরে পূর্বের ন্যায় তাহারা গৃহে ফিরিয়া দেবীকে তাঁহার আসনে স্থাপন করে ও 'গাছবেড়া' আচারটি শেষ হওয়ার জন্য পুনরায় মনসা-মঙ্গল গান করা হয়।

বিষ্ণু পাল বীরভূম জেলার কবি, একমাত্র তাঁহার মনসা-মঙ্গলেই এই 'গাছবেড়া'

অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়—অন্যত্র তাহা নাই। বীরভূমের সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় আজও ইহা পালন করেন এবং এই অনুষ্ঠানে তাঁহারা বিষ্ণু পালের মনসা-মঙ্গলই গান করিয়া থাকেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলার প্রাচীন ভাস্কর্যে কয়েকটি মনসা-মূর্তি বীরভূম জেলা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বীরভূমের সমস্ত লৌকিক সংস্কারের মধ্যে মনসাদেবীর ব্যাপক প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কারণে মনসা-মঙ্গলের কাহিনীটি বীরভূম জেলার কোন অঞ্চলে একদিন বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিযাছিল এবং সেখান হইতেই ক্রমে পূর্ববঙ্গে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এমন অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীই যে বাংলাদেশে প্রচলিত মনসার মাহাত্ম্যসূচক একমাত্র কাহিনী, তাহা নহে। মেয়েলী ব্রতকথায় মনসার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া স্বতন্ত্র এক কাহিনী রচিত হইয়াছিল। মনসার ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া বাংলার মেয়েরা সর্বত্র এই ব্রতকথা কহিয়া থাকে। এই কাহিনী অতি সাধারণ বৈশিষ্ট্যহীন ব্রতকথার রীতিতে রচিত। কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে—

এক সদাগর; তাহার সাত পুত্র-বধূ। সকল বউয়ের বাড়ী হইতেই তত্ত্ব আসে, ছোট বউয়ের বাড়ী হইতে কিছু আসে না, শাশুড়ী সেইজন্য ছোট বউয়ের উপর বিরূপ। এক বাদ্‌লার দিনে বউয়েরা যে যাহার মনোমত দ্রব্য খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। ছোট বউ গর্ভবতী ছিল, সে পান্তা ভাত দিয়া মাছের টক খাইতে চাহিল। বউয়েরা সন্ধ্যার সময় পুকুরে গা ধুইতে গেল। ছোট বউ দেখিতে পাইল জলের উপর এক ঝাঁক মাছ। নিকটবর্তী বনে অষ্টনাগ বাস করিত। বনে দাবানল উপস্থিত হওয়ায় তাহারাই পুকুরে মাছ হইয়া লুকাইয়া ছিল। ছোট বউ গামছা ছাঁকিয়া মাছগুলি ধরিল। জায়েরা দেখিয়া বলিল, ছোট বউয়ের সাধ পূর্ণ হইল। ছোট বউ মাছগুলি লইয়া বাড়ীতে গেল। পরদিন কুটিরে গিয়া দেখিল, তাহারা সকলে সাপ হইয়া রহিয়াছে। ছোট বউ দুধ আর কলা দিয়া সাপগুলিকে পুষিতে লাগিল। কিছুদিন পরে সাপেরা স্বর্গে তাহাদের মাতা মনসাদেবীর নিকট চলিয়া গেল। ছেলেরা গিয়া মনসার কাছে ছোট বউয়ের উপকারিতার কথা বলিল। মনসা তাহাদের কথায় ছোট বউকে তাঁহার কাছে আনিতে চলিলেন। শাঁখা সিঁদুর-চুপড়ি, নোয়া, নথ পরিয়া মনসা সদাগরের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছোট বউয়ের শাশুড়ীর নিকট নিজেকে তাহার মাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহাকে কিছুকালের জন্য লইয়া যাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। ছোট বউকে লইয়া রথে চড়িয়া মনসা রওয়ানা হইলেন। রথে তুলিয়াই মনসা তাহাকে বলিলেন, 'তুমি চোখ বুজিয়া থাক, যখন চোখ খুলিতে বলিব, তখন খুলিও'। মনসা নিজের পুরীতে প্রবেশ করিয়া ছোট বউয়ের চোখ খুলিয়া দিলেন। সে দেখিল, মস্ত বড় বাড়ী। সেইখানেই সে অষ্টনাগকেও দেখিতে পাইল। মনসা তাহাকে বলিয়া দিলেন, 'তুমি রোজ আমার পূজার আয়োজন করিবে, তোমার এই আট ভাইয়ের জন্য গরম দুধ রাখিবে, আর কখনও দক্ষিণ

দিকে চাহিবে না।' ছোট বউ মনে করিল, না জানি দক্ষিণ দিকে কি আছে! সে একদিন দক্ষিণ দিকে তাকাইয়া দেখিল, মনসা নাচিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে তন্ময় হইয়া গেল। ভাইদের দুধ গরম করিয়া রাখার কথা ভুলিয়া গেল। তারপর যখন মা মনসার নাচ ভাঙ্গিল, তখন তাড়াতাড়ি আসিয়া দুধ গরম করিল; গরম দুধে মুখ দিতেই অষ্টনাগের মুখ পুড়িয়া গেল। ক্রোধে অষ্টনাগ ছোট বউকে দংশন করিতে গেল, মনসা তাহাদিগকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, 'এখানে আমার বাড়ীতে তাহাকে কামড়াইবার প্রয়োজন নাই, বরং তাহাকে আমি মর্ত্যলোকে তাহার বাড়ীতে রাখিয়া আসি, সেখানে গিয়াই তাহাকে কামড়াইও।' মনসা ছোট বউকে লইয়া পুনরায় মর্ত্যলোকে চলিলেন। মনসা তাহাকে বলিয়া দিলেন, 'তোমার ভাইয়েরা তোমার উপর খুব রাগিয়াছে, মর্ত্যলোকে গিয়া তুমি তাহাদের খুব সুখ্যাতি করিও, তবেই তাহারা তোমার উপর খুসী হইবে।' অর্ধেক গায়ে গয়না দিয়া মনসা ছোট বউকে তাহার শ্বশুর বাড়ীতে দিয়া গেলেন। সকলে দেখিয়া নিন্দা করিয়া বলিল, 'এ আবার কি ঢং, অর্ধেক গায়ে গয়না, বাকি অর্ধেক গায়ে কিছু নাই?' ছোট বউ বলিল, আমার অষ্টনাগ ভাইয়েরা বাঁচিয়া থাকুক, আমার গয়নার অভাব কি? অর্ধেক গায়ে গয়না দিয়াছে, বাকি অর্ধেক গায়েও তাহারাই গয়না দিয়া ভরাইয়া দিবে।' অষ্টনাগ বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরিতেছিল। ছোট বউয়ের মুখে তাহাদের প্রশংসা শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত খুসী হইল এবং তাহাকে দংশন করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে ফিরিয়া গিয়া মা মনসার নিকটও তাহার প্রচুর প্রশংসা করিতে লাগিল। অষ্টনাগের ইচ্ছায় মনসা ছোট বউয়ের বাকি অর্ধেক দেহও গয়নায় ভরাইয়া দিলেন। মনসা তখন স্বরূপে আবির্ভূতা হইয়া ছোট বউকে বলিলেন, 'আমি তোমার মাসী নই, আমি মনসা, আমি সিজ-মনসা গাছে থাকি, তুমি আমার পূজা পৃথিবীতে প্রচার করিও। দশহরা, নাগপঞ্চমীর দিনে ঐ গাছ আনিয়া পূজা করিও, আর ভাদ্রমাসে অরন্ধনের দিন শুদ্ধাচারে পূজা করিয়া আমাকে পান্তা ভাতের সাধ দিও। তা' হইলে আর কখনও সাপের ভয় থাকিবে না।' এই বলিয়া মনসা অন্তর্হিত হইলেন। ছোট বউ তখন সকলকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। তখন হইতেই সকলে পরম শ্রদ্ধাভরে মনসার পূজা করিতে লাগিল। ক্রমে মর্ত্যলোকে মনসার পূজার প্রচার হইল।

কাহিনীটি পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে এই ভাবে প্রচলিত আছে, রাঢ়ে ইহার সামান্য একটু ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। কি ভাবে নাগশিশুর সঙ্গে ছোট বউয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হইল, কেবলমাত্র এই অংশটুকুর মধ্যেই রাঢ়ের প্রচলিত আখ্যায়িকায় একটু ব্যতিক্রম আছে, তাহা এখানে বর্ণনা করিতেছি। সদাগরের বাড়ীতে এক রাখাল ছেলে ছিল—সে মাঠে মাঠে গরু রাখিত, একদিন সে এক গাছের নীচে দুইটি ডিম কুড়াইয়া পাইল। ডিম দুইটি তাহার পুড়াইয়া খাইবার বড় সাধ হইল, সে বাড়ীতে আসিয়া সদাগরের ছোট বৌকে ডিম দুইটি তাহাকে পুড়াইয়া দিবার জন্য বলিল। ডিম দুইটি দেখিয়া বউটির বড় মায়া হইল; ভাবিল, 'আহা কোন্ জীবের ডিম!' ভাবিয়া এক কোণে ইহাদিগকে একটি ঢাক্না দিয়া রাখিয়া দিল, রাখাল ছেলেকে কাঁঠাল-বীচি পুড়াইয়া ডিম বলিয়া খাইতে দিল। একদিন বৌটি দেখিল,

ঢাক্‌নার ভিতর কি নড়িতেছে। ঢাক্‌না খুলিয়া দেখিল, দুইটি নাগশিশু। সে ইহাদিগকে ভয় না করিয়া পরম যত্নে লালন-পালন করিতে লাগিল। ইহার পর কাহিনীর আর বিশেষ কোনও ব্যতিক্রম নাই।

মনসা-বিষয়ক প্রাচীন একটি সংস্কার হইতেই যে এই ব্রতকথার বৃত্তান্ত সংগ্রথিত হইয়াছে, তাহা এই কাহিনীটির বিশেষত্ব লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়। মনসা তখন পর্যন্তও বৃক্ষেতেই পূজিত হইতেন। বিপ্রদাসের মনসা-মঙ্গলে যে সংস্কার হইতে মনসার 'জাগিয়া জাগুলি নাম সিজ বৃক্ষে স্থিতি' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (পরে দ্রষ্টব্য), এই ব্রতকথার সংস্কারও তাহা হইতেই আসিয়াছে। অতএব এই কাহিনী মনসা-বিষয়ক চাঁদসদাগর-বেহুলার কাহিনীর পূর্ববর্তী সন্দেহ নাই। ব্রতকথার এই কাহিনীটি পূর্ববঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন—ইহা কাহিনীগত ঐক্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাংলার উভয়ত্রই সমান প্রচার লাভ করিয়াছে। চাঁদসদাগর-বেহুলার কাহিনীর ব্যাপক প্রচার সত্ত্বেও ইহার মধ্যে তাহার কোনই প্রভাব অনুভব করা যায় না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উত্তর প্রদেশের ব্রতকথার মধ্যেও এইরূপ একটি কাহিনী আছে এবং তাহা এটোয়া জেলা হইতে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।[১] অতএব আপাত দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, কাহিনীটি পশ্চিম ভারত হইতে বাংলা দেশে আসিয়া থাকিবে।

লখিন্দর-বেহুলার কাহিনীর উদ্ভব-কাল কি হইতে পারে? এ' বিষয়ে কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, 'নবোদিত পূজাপদ্ধতি, দেবীর মাহাত্ম্যসূচক গল্প ইত্যাদি দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেই পরে গীত-রচয়িতাগণ অগ্রসর হইয়া দেবীর মাহাত্ম্যসূচক পালা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কাজেই দেবীর পূজার প্রথম প্রচার এবং তাঁহার মাহাত্ম্য বিস্তারের জন্য গীতের পালা-রচয়িতা-গণের আবির্ভাবের মধ্যে ১৫০।২০০ বৎসরের ব্যবধান থাকা সম্ভবপর। এই হিসাবে খ্রীষ্টের নবম শতাব্দে মনসাদেবীর পূজা বাংলায় প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল ধরিতে হইবে।' আমরা পূর্বে অনুমান করিয়াছি যে, সেনরাজবংশের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থানের যুগে বৌদ্ধ দেবদেবীগণ যখন নূতন পরিচয় লাভ করিতেছিলেন, তখন বৌদ্ধ জাঙ্গুলীতারা মনসা নামে পরিচিত হন। তাহা খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর কথা। অতএব মনে হয়, দ্বাদশ শতাব্দীতে দেবীর মাহাত্ম্যসূচক সংস্কৃত পুরাণের আখ্যানসমূহ রচিত হইয়াছিল এবং আনুমানিক ইহার পরবর্তী শতাব্দী অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলা মঙ্গলগানের পালারূপে বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

১। মহারাষ্ট্রদেশীয় পণ্ডিত বি. এ. গুপ্তে তাঁহার *Hindu Holidays and Ceremonies* (Calcutta, 1919) নামক গ্রন্থে নাগপঞ্চমীর বর্ণনা উপলক্ষে প্রায় অনুরূপ একটি ব্রতকথার উল্লেখ করিয়াছেন (পৃঃ ১৭৬-১৭৭); তবে তাঁহার কাহিনীর নায়ক শেষ বা অনন্ত নাগ, মনসা নহে—তাহাতে মনসার কোনও উল্লেখ নাই। অতএব মহারাষ্ট্র দেশেও অনুরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে বলিয়া মনে হইতেছে।

মনসা-মঙ্গলের কবিগণ

মনসা-মঙ্গলের আদি রচয়িতা কে? অবশ্য এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই। তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে কবি বিজয় গুপ্ত হরিদত্ত নামে তাঁহার পূর্ববর্তী একজন কবির নামোল্লেখ করিয়াছেন। মধ্যযুগের মঙ্গল-কাব্যের কবিদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের পূর্ববর্তী কবিদিগের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, ইহারই সূত্র অনুসরণ করিয়া প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদির সম্বন্ধে অনেক সময় অনুসন্ধানের সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। হরিদত্ত সম্বন্ধে এ'পর্যন্ত বিজয় গুপ্তের উল্লেখ মাত্র ব্যতীত আর কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। কিছুকাল যাবৎ অনুসন্ধানের ফলে হরিদত্ত রচিত মনসা-মঙ্গলের অনেকগুলি নূতন পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং মনসা-মঙ্গলের একজন আদি কবির বিষয়ে অনেকটা স্পষ্ট ধারণায় আসিয়া পৌছান গিয়াছে।

হরিদত্ত

বরিশাল অঞ্চলের মনসা-মঙ্গলের কবি বিজয় গুপ্ত হরিদত্ত সম্বন্ধে যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতেই জানিতে পারা যায় যে, হরিদত্ত খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী লোক ছিলেন। মনসা-মঙ্গল রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে বিজয় গুপ্তের যতটুকু জ্ঞান ছিল, তাহাতে তাঁহার মতে হরিদত্তই এই শ্রেণীর কাব্যের আদি কবি,—

প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।[১]

বিজয় গুপ্ত আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহারই সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগেই হরিদত্তের গীত 'লুপ্ত' হইয়া গিয়াছিল,—

হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।—

ইহা হইতেই স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন যে, বিজয় গুপ্তের সময়ে 'যে গীত বহুকাল প্রচলিত থাকিয়া লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা অন্ততঃ দুই তিন শত বৎসর পূর্বে বিরচিত হওয়ার সম্ভাবনা।' সুতরাং তাঁহার মতে 'কানা হরিদত্ত মুসলমানকর্তৃক বঙ্গবিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার মনসা-মঙ্গল রচনা করিয়াছেন।' কিন্তু মনে হইতেছে, সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হরিদত্ত বিদ্যমান ছিলেন। কারণ, বিজয় গুপ্তের সময় পর্যন্ত হরিদত্তের পদ যে লুপ্ত হয় নাই, তাহা বিজয় গুপ্ত কর্তৃক হরিদত্ত রচিত কাব্যের নিম্নোদ্ধৃত আলোচনা হইতেও বুঝিতে পারা যাইবে—

হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।
জোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাগে বোলে চালে॥
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥

১। বিজয় গুপ্ত, মনসা-মঙ্গল, প্যারীমোহন দাশগুপ্ত সম্পাদিত (১৩০৭), ৪

গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফ ফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল॥[১]

হরিদত্তের কাব্যসম্বন্ধে বিজয় গুপ্তের এই অশ্রদ্ধেয় উক্তি সত্ত্বেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরুষোত্তম নামক একজন কবি সম্ভবত বিজয় গুপ্তের পরবর্তী কাল পর্যন্তও হরিদত্তের পদ গান করেন বলিয়া তাঁহার নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়াছেন,

কানা হরিদত্ত হরির কিঙ্কর
মনসা হউক সহায়।
তাঁর অনুবন্ধ লাচারীর ছন্দ
কবি পুরুষোত্তমে গায়॥[২]

অতএব দেখা যাইতেছে, অন্তত বিজয় গুপ্তের সময় পর্যন্ত হরিদত্তের পদ আদৌ লুপ্ত হয় নাই। বিজয় গুপ্ত নিজের কাব্যরচনার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করিতে গিয়া তাঁহার পূর্বসূরীর মুখে কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হরিদত্তেরই বহু উপাদান নিজে আত্মসাৎ করিয়াছেন,—ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হইয়াছে।

'দাস' পদবীবিশিষ্ট এক হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত 'কালিকা-পুরাণে'র তিনখানি পুঁথি ময়মনসিংহ জেলা হইতে আবিষ্কৃত হইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালায় সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা প্রকৃতপক্ষে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অন্তর্গত 'সপ্তশতী'-অংশের বাংলা অনুবাদ। ইহাদের মধ্যে দুইখানি পুঁথি খণ্ডিত ও একখানি সম্পূর্ণ[৩] পাওয়া যায়। তাহার একখানি পুঁথি এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারেও সংগৃহীত হইয়াছে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, পুরুষোত্তম নামক একজন কবি একটি পদে হরিদত্তকে 'হরির কিঙ্কর' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মনসা-মাহাত্ম্য রচয়িতা কি ভাবে 'হরির কিঙ্কর' হইতে গেলেন, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। এদিকে 'কালিকা-পুরাণে'র অধিকাংশ ভণিতায় দাস হরিদত্তকে একজন পরম বৈষ্ণব এবং হরির ভক্তরূপেই দেখিতে পাওয়া যায়। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে,—

যে শুনে তারকবধ কার্তিক নিধন।
তারে পূর্ণ কৃপা হরি করে অনুক্ষণ॥
মৎস্য কূর্ম বরাহ নরহরি বামন।
পঞ্চ অবতার সত্য করিলা নারায়ণ॥
ত্রেতাযুগে ভৃগুরাম রাম রঘুবর।
দ্বাপরে হইলা প্রভু রাম হলধর॥
বৌদ্ধরূপ ধরি হরি জগত বিহারে।
কাল সহযোগে বৌদ্ধ আপন সংহারে॥

১। বিজয় গুপ্ত, ঐ, ৪
২। ঐ ২৩৫
৩। ঢা, কে, ১০১। এই পুঁথিখানি ১৭০৪ শকাব্দে নকল করা হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা আছে।

এহি দশ অবতার পৃথিবী শাসন।
আর যত অবতার করিলা নারায়ণ॥
কোটি সূর্য গ্রহণেতে গো-দান করয়।
সমকাল নহে যেবা শ্রীহরি কীর্তয়॥
হরিগুণ-কথামৃত শ্রবণ মঙ্গল।
* * *
নিজ কণ্ঠে বাণী সহ থাকিয়া শ্রীহরি।
রচিলা পুরাণ কথা মূর্খ মুখ ভরি॥[১]

অতএব পুরুষোত্তম যে 'হরির কিঙ্কর' হরিদত্তের মনসা-মঙ্গলের অনুবন্ধ গান করেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই হরিদত্ত ও 'কালিকা-পুরাণে'র হরিদত্ত অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। উদ্ধৃত অংশ হইতে দেখা যাইবে যে, ইহা চৈতন্যের পূর্ববর্তী রচনা ; কারণ, ইহার মধ্যে বিষ্ণুর ঐশ্বর্যরূপেরই বন্দনা শুনিতে পাওয়া যায়, চৈতন্য-প্রবর্তিত মাধুর্যের আদর্শ তখনও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। হরিদত্তের কাল-নিরূপণে এই বিষয়টিরও একটু বিশেষ মূল্য আছে। হরিদত্তের একটি পদ নারায়ণদেবের মনসা-মঙ্গলের মধ্যেও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইনি সেখানে নিজেকে 'দাস' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। 'দাস' তাঁহার কুলপদবী নহে, বৈষ্ণব ভক্তগণ সর্বদাই নিজেদের দাস বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। নারায়ণদেবের মনসা-মঙ্গলে উদ্ধৃত হরিদত্তের পদটি মনসা-মঙ্গলের পদ নহে, দেবী-মাহাত্ম্যের পদ। মন হয়, ইহা তাঁহার পূর্বোল্লিখিত 'কালিকা-পুরাণে'র বঙ্গানুবাদেরই অংশ।

হরিদত্তের পদ ময়মনসিংহ জেলা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু বরিশাল জেলার বিজয় গুপ্ত তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য পুরুষোত্তম কোথাকার লোক তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারা যায় না। অতএব হরিদত্ত কোথাকার অধিবাসী ছিলেন, তাহাও স্থির করিতে পারা যায় না। এক অঞ্চলের কবির রচনা স্বতন্ত্র দূরবর্তী অঞ্চলে গিয়া প্রচার লাভ করে এবং অনেক সময় তাঁহার নিজের দেশে তিনি সম্পূর্ণই অপরিচিত থাকিয়া যান—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অতএব হরিদত্তের বাসস্থান সম্বন্ধেও নিশ্চিত করিয়া কিছু বলিতে পারা যায় না।

বিজয় গুপ্ত বলিয়াছেন যে, হরিদত্তের কবিতা 'জোড়া-গাঁথা', 'মিত্রাক্ষর-' ও 'কথার সঙ্গতি'-হীন; কিন্তু এ'যাবৎকাল আবিষ্কৃত তাঁহার পদ হইতে এই উক্তি সমর্থন করিতে পারা যায় না। হরিদত্তের রচনায় মনসার কাহিনী এই ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল,—

ওলা শুনি আদ্যের কাহিনী।
মুই হেন সেবক শরণ লইলাম গো

১। প.স. ৩৬০২

ঘাটে লামি লও ফুলপানি।।
নেতা বলে বিষহরী এথা রহিয়া কিবা করি
মর্ত্য ভুবনে চল যাই।
মর্ত্য ভুবনে যাইয়া ছাগ মহিষ বলি খাইয়া
সেবকেরে বর দিতে চাই।।
নেতারে সঙ্গতি করি মাও লামে বিষহরী
হাসে পদ্মা রচনা দেখিয়া।
হেটে ধান্যের সরা উপরে বিচিত্র ঝরা
সে না ঘটে চন্দন দিয়া।।
ধূপ ধরে কেহ স্তব পঠে রে
ঘৃতের প্রদীপ সুললিত।
বিষাণের বাদ্য— মনসা হরিষ রে
সম্মুখে গায়েন গায় গীত।।
চারি চতুর্বেদ [পড়ে] নিশি জাগরণ করে
পূজা হইলে ছাগ বলিদান।
কবি কহে হরিদত্ত যে জানে পরম তত্ত্ব
মনসা দেখিল বিদ্যমান।[১]

শিবের ঔরসে মনসা পাতালে নাগলোকে গিয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরই মনসা নিজের প্রকৃত রূপ ধারণ করিয়া পিতার নিকট আগমন করিলেন। তখন দেবী বিবিধ সর্পে তাঁহার অঙ্গাভরণ ধারণ করেন। হরিদত্ত রচিত দেবীর সর্পসজ্জার এই পদটি প্রকৃত কবিত্ব এবং পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক—

বিচিত্র নাগে করে দেবী গলায় সুতালি।
শ্বেত নাগে করে দেবী বুকের কাঁচুলী।।
অনন্ত নারায়ণে পদ্মার মাথার মণি।
বেত নাগে করে দেবী কাঁখালি কাছুনি।

১। ঢা.১০৯১, পত্র ১ (ক-খ); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালায় রক্ষিত আটখানি বিজয় গুপ্ত ও অন্যান্য কবির মনসা-মঙ্গলের মধ্যে ছয়খানিতেই (ঢা-১০৯১A, ক-এ, ঢা-১০৯১ B.C.D.E.) হরিদত্তের ভণিতায় এই পদটি পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত দুইখানি আধুনিক পুঁথিতে ইহা বিজয় গুপ্তেরই ভণিতাযুক্ত। আধুনিকতা-প্রভাবিত মুদ্রিত পুস্তকে ইহা স্বভাবতঃই বিজয় গুপ্তেরই ভণিতাযুক্ত পাওয়া যায়.। অধিকতর সংখ্যক এবং প্রাচীনতর পুঁথিগুলিতে ইহা হরিদত্তেরই ভণিতাযুক্ত। অতএব পদটি হরিদত্তেরই বলিয়াই নিঃসংশয়ে গ্রহণযোগ্য।

সোনা নাগে দেবী করিলা চাকী বলি।
মকর নাগে করে দেবী পায়ের পাসুলী।।
কর্কট নাগে পদ্মার গলার হার।
অঙ্গুরি হইল তবে নাগ ব্রহ্মজাল।।
দুই হস্তের শঙ্খ হইল গরল শঙ্খিনী।
মণিময় নাগে শোভে সুন্দর কিঙ্কিনী।।
সখিগুয়া নাগে করিল হাতের তাড়।
কজ্জলিয়া নাগে কজ্জল শোভে ভাল।।
নীল নাগে দেবী বান্ধিল কেশ পাশ।
অঞ্জনিয়া নাগে করে অঞ্জন বিলাস।।
বাসুকি তক্ষক দুই মুকুট উজ্জ্বল।
এলাপাত্র নাগে করিল তোড়ল মল।।
হেমন্ত বসন্ত নাগে পৃষ্ঠের থোপনা।
সর্বাঙ্গ হইতে বাহির হয় যার অগ্নি কণা কণা।।
অমৃত নএগান এড়ি দেবী বিষ-নএগানে চায়।
চন্দ্রসূর্য গিয়া তবে আভেতে লুকায়।।
দর্পণ হাতে করি দেবী বেশ বানায়।
মনসার চরণে লাচারী হরিদত্তে গায়।।[১]

হরিদত্ত সম্বন্ধে বিজয় গুপ্ত লিখিয়াছেন, 'মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।' উদ্ধৃত অংশ যে কোন মূর্খের রচনা হইতে পারে না, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অতএব বিজয় গুপ্তের এই উক্তি হইতেই হরিদত্তের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোনও কারণ নাই।

বরিশাল অঞ্চলে হরিদত্তের প্রচলিত পদগুলি ক্রমে বিজয় গুপ্ত, পুরুষোত্তম প্রভৃতি কবিগণ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। তথাপি কোনও কোনও প্রাচীনতর পুঁথিতে এখনও হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত পদ পাওয়া যায়। আধুনিক পুঁথিগুলিতে পদের ভণিতার স্থলে প্রাচীনতর কবি হরিদত্তের নাম পরিত্যক্ত হইয়া অধিকতর পরিচিত পরবর্তী কবি বিজয় গুপ্তের নাম অনেক সময় গৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এই ভাবে একের রচনা-স্বত্ব (copyright) অপর কর্তৃক অপহরণের বহু দৃষ্টান্ত আছে।

ময়মনসিংহ জেলায়ও হরিদত্তের পদের অনুরূপ পরিণতিই ঘটিয়াছিল। দ্বিজ বংশীদাস, দ্বিজ জগন্নাথ, চন্দ্রপতি প্রভৃতি পরবর্তী কবি ও গায়েনগণ হরিদত্তের বহু পদের মধ্যে

১। ঢা, ৩২৪, পত্র ১১৩ (খ)

নিজেদের ভণিতা যোগ করিয়া ক্রমে হরিদত্তের নাম বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। অনেক সময় কবিগণই যে ইচ্ছা করিয়া এমন করিতেন, তাহা নহে, পুঁথির পরবর্তী অনুলিপিকারগণ এবং অনেক সময় গায়েনগণও আসরে দাঁড়াইয়া পদমধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও প্রচলিত কোন কবির ভণিতা সংযোগ করিয়া অপ্রচলিত ও প্রাচীন কবির নাম লুপ্ত করিয়া দিতেন।

নারায়ণ দেব

মনসা-মঙ্গলের একজন শ্রেষ্ঠ কবির নাম নারায়ণ দেব।[১] তাঁহার রচিত, কাব্যের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না কিন্তু কতকগুলি পারিপার্শ্বিক কারণে হরিদত্তের পরই তাঁহার নাম উল্লেখ করিতে হয়। এই কারণগুলির মধ্যে তাঁহার কাব্যের ব্যাপক প্রচার অন্যতম। তিনি তাঁহার কাব্যে এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন,—

নারায়ণ দেবে কয় জন্ম মগধ।[২]
মিশ্র পণ্ডিত নহে ভট্ট বিশারদ।।
অতি শুদ্ধ জন্ম মোব কায়স্থের ঘর।
মৌদ্‌গোল্য গোত্র মোর গাঁই্‌ গুণাকর।।
পিতামহ উদ্ধব নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা।।
পূর্ব পুরুষ মোর অতি শুদ্ধ মতি।
রাঢ় ত্যজিয়া মোর বোরগ্রামে বসতি।[৩]

রাঢ় হইতে আসিয়া নারায়ণ দেব পূর্ববঙ্গে ময়মনসিংহ জিলার মধ্যে কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন তাড়াইল থানার অন্তর্গত নসিরুজিয়াল পরগণায় বোরগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। বোরগ্রাম পূর্বে নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত ছিল, ১৩০০ সালের পর হইতে কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত হইয়াছে। এই গ্রামে আজ পর্যন্তও 'নারায়ণের ভিটা' নামক একটি স্থান নির্দেশ করা হইয়া থাকে। তাঁহার বংশধরগণ এখন পর্যন্ত এই গ্রামেই বসবাস করিতেছেন। তাঁহারা নারায়ণ দেব হইতে বর্তমানে অষ্টাদশ পুরুষ। বর্তমানে তাঁহাদের কুল-পদবী বিশ্বাস এবং লস্কর। তাঁহাদের গৃহে নারায়ণ দেবের একটি পুঁথি রক্ষিত আছে। পুঁথিখানি খুব প্রাচীন নহে, তবে অন্তত দুইশত বৎসর পূর্বে পুনর্লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। নারায়ণ

১। নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ, চারুপ্রেস সংস্করণ (ময়মনসিংহ, ১৩১৪ সাল) ; তমোনাশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪২)।

২। মগধ শব্দের অর্থ এখানে মগধদেশ (দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গ সাহিত্য-পরিচয়' ১,১৭৬) নহে, কিংবা শ্রীহট্টের অন্তর্গত কোন পর্বতও (অচ্যুতচরণ চৌধুরী, 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত', শিলচর, ১৩২৪, ৪,৯৯-১০০) নহে, মগধ শব্দের অর্থ মূর্খ, সংস্কৃত মুগ্ধ শব্দ হইতে ইহা জাত।

৩। নারায়ণ দেব ৫ ; পাঠ সংশোধন করিয়া লওয়া হইয়াছে।

দেবের বংশধরগণের গৃহে রক্ষিত বংশ-লতিকার একটি অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে কবির সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাইতে পারিবে,—

উদয়রাম
|
উদ্ধবরাম
|
নরসিংহ
|
১। নারায়ণদেব
|
২। চতুর্ভুজ
|
৩। অভিমন্যু
|
৪। চূড়ামন্য
|
৫। অনন্তরাম
|
৬। ভবদেব
|
৭। গৌরপ্রসাদ
|
৮। নিমাই
|
৯। কৃষ্ণরাম
|
১০। রূপরাম
|
১১। মোহন গোপাল
|
১২। নরোত্তম
|
১৩। কৃষ্ণচন্দ্র
|
১৪। শ্রীচন্দ্র
|
১৫। রামচন্দ্র
|

১৬। জগচ্চন্দ্র
|
১৭। ভারতচন্দ্র
| | |
১৮। হরিপদ সুবোধ কালীপদ

চারি পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া লইলে নারায়ণ দেব আনুমানিক সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে।

আসামে নারায়ণ দেবের মনসা-মঙ্গলের বহুল প্রচারের জন্য আসামের অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও সুর্মা উপত্যকা উভয় অঞ্চলের অধিবাসিগণই তাঁহাকে নিজেদের প্রদেশবাসী বলিয়া দাবী করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রাচীন অসমীয়া ভাষার নিদর্শনের মধ্যে নারায়ণ দেবের রচনাকে প্রাচীন অসমীয়া ভাষার নিদর্শনরূপেই গ্রহণ করা হইয়াছে।[১] 'সুকবি নারায়ণ'কে সংক্ষেপ করিয়া আসামবাসিগণ 'সুকনান্নি' বা অসমীয়া ভাষায় 'হুকনান্নি' বলিয়া থাকেন। পূর্ববঙ্গবাসিগণও কোনদিনই কবির উপর নিজেদের দাবী পরিত্যাগ করেন নাই। এই উপলক্ষে উভয় পক্ষে কিছুকাল তুমুল বাদানুবাদ চলিয়াছিল।[২] কিন্তু নারায়ণ দেবের জন্মভূমি বোরগ্রামে বর্তমানে ময়মনসিংহ জিলারই অন্তর্গত। আসামবাসিগণের দাবী ছিল এই যে, পূর্বে তাহা শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত ছিল।[৩] সম্ভবত ছিলও তাহাই। ময়মনসিংহের পূর্ব ও শ্রীহট্টের পশ্চিম সীমান্ত প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বেও সুস্পষ্ট সীমারেখা দ্বারা বিভক্ত ছিল না। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে সর্বপ্রথম ময়মনসিংহ জিলা স্থাপিত হওয়ার পরও শ্রীহট্ট জিলার পশ্চিমে তরফ প্রভৃতি অঞ্চল ময়মনসিংহের কালেক্টরের শাসনাধীন ছিল।[৪] ইহার পর ক্রমে এই দুই জিলা বর্তমান আকারে স্বতন্ত্র হইয়া পৃথক পৃথক শাসনকর্তার অধীন হয়। অতঃপর শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ এই দুই জিলা বিভিন্ন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাওয়াতেই প্রাদেশিক অভিমানের ফলে এই অকারণ বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। বঙ্গ-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য শ্রীহট্টের পূর্ববঙ্গভুক্তির পর এই বিষয়ে সকল বিতর্কের সমাধি হইয়া গিয়াছে। অবশ্য একটা কথা এখানে স্বীকার করিতেই হয় যে, বোরগ্রামের সঙ্গে শ্রীহট্টের যোগ যত নিবিড়, ময়মনসিংহের তত নহে। ইহা ময়মনসিংহ জিলার একান্তে অবস্থিত এবং বিস্তৃত হাওর বা জলাভূমি দ্বারা ময়মনসিংহের কেন্দ্রীয় যোগ হইতে বিচ্ছিন্ন। ইহার সহিত পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক যোগ থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ভৌগোলিক যোগ শ্রীহট্টেরই। সেইজন্যই

১। 'অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি', হেমচন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৯২৪), ২ ভাগ ২।

২। ব.সা.প.প, ১৩১৮, ৮০-৯৭, ১১৩-১৪২, ১৩১৯, ৬১-৭৬।

৩। অচ্যুতচরণ চৌধুরী, ৯৮।

৪। কেদারনাথ মজুমদার, 'ময়মনসিংহ বিবরণ' (ময়মনসিংহ, ২য় সংস্করণ)।

নারায়ণ দেবের মনসা-মঙ্গল আসামে সহজেই প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিল।

আবার কেহ বলেন, নারায়ণ দেব শ্রীহট্ট জিলার অন্তঃপাতী জলসুখা পরগণার নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর 'কোন কারণে নগর হইতে উঠিয়া ময়মনসিংহের বোরগ্রামে গমন করেন।[১] ইহা শ্রীহট্টের একটি স্থানীয় অনৈতিকহাসিক জনশ্রুতি মাত্র। অবশ্য ইহার প্রমাণস্বরূপ বলা হইয়াছে, নগর গ্রামে দেব উপাধিধারী বহু বংশের বাস আছে। সম্ভবত ইহাই এই জনশ্রুতির উৎপত্তির মূল। কিন্তু দেব যে নারায়ণের কুলপদবী, তাঁহার নামেরই সংশ্লিষ্ট কোন শব্দ নহে, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না এবং ইহাই কবির বাসস্থান নিরূপণের একমাত্র যুক্তি হইতে পারে না। আবার কথিত হয় যে নারায়ণ দেব আসামে কোচবংশীয় দরঙ্গরাজসভায় থাকিয়া নিজের বাংলা মনসা-মঙ্গলখানি অসমীয়াতে অনুবাদ করেন। স্বর্গত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় অনুমান করেন যে, সম্ভবত নারায়ণ দেব বোরগ্রামে উপনিবিষ্ট হইবার পূর্বে এক সময়ে আসাম অঞ্চলে গিয়া রাজসভার সম্মান লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন।[২] কিন্তু দরঙ্গরাজগণ আসামে সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। নারায়ণ দেব তাহার বহু পূর্ববর্তী লোক।[৩] কোনও কোনও সমালোচক নারায়ণ দেবকে দরঙ্গরাজসভায় আনিয়া উপস্থিত করিবার উদ্দেশ্যেই কবির বংশ-লতিকাটি একেবারে অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন।[৪] কিন্তু বংশ-লতিকাটির কথা বাদ দিলেও এই উক্তি অন্য আর কোনও দিক হইতেও সমর্থিত হয় না।

কেহ আবার অনুমান করিয়াছেন যে, নারায়ণ দেবের একটি উপাধি ছিল সুকবিবল্লভ।[৫] অবশ্য এই বিষয়ে সকলেই একমত হইতে পারেন নাই।[৬] নারায়ণ দেব ও সুকবিবল্লভের মিশ্র ভণিতাযুক্ত কতকগুলি পদ হইতেই এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নারায়ণ দেবের মুদ্রিত পদ্মাপুরাণে একটি পদ পাওয়া যায়, তাহাতে কবি নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে, তাঁহার 'সুকবিবল্লভ' নামে খ্যাতি লাভ হইয়াছিল।[৭] কিন্তু নিম্নলিখিত আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই পদটি প্রক্ষিপ্ত এবং কবিবল্লভ মনসা-মঙ্গলের একজন স্বতন্ত্র লেখক।

বল্লভ ঘোষ নামে মনসা-মঙ্গলের একজন কবির উল্লেখ পাওয়া যায়।[৮] তিনি নিজেকে সুকবি বলিয়া পরিচয় দিয়া মনসা-মঙ্গলের একাধিক লেখকের ভণিতার সঙ্গে নিজের নাম যোগ করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'কবি-বল্লভ' নামেও তিনি ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। কেবল নারায়ণ দেবের ভণিতার সঙ্গেই যে তাঁহার নাম যুক্ত হইয়াছে, তাহাই নহে, অন্যান্য কবির ভণিতায়ও তাঁহার নাম যুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তবে নারায়ণ দেবের সঙ্গে তাঁহার মিশ্র ভণিতাই সর্বাপেক্ষা অধিক। অবশ্য নারায়ণ দেবের কাব্যের প্রচারাধিক্যই ইহার কারণ।

১। অচ্যুতচরণ চৌধুরী ৯৮ ; ২। ঐ ১০৪ পাদটীকা ; ৩। E. Gait, *A History of Assam* (Calcutta 1926) 67 ; ৪। ব-সা-প-প ৯, ১০৯-১১৬ ; ৫। ঐ ৭, ৬১ ; ৬। ঐ ১১৩ ; ৭। নারায়ণ দেব ১; ৮। দীনেশচন্দ্র সেন, ৩৯৫ ;

এতদ্ব্যতীত বল্লভ ঘোষের স্বাধীন ভণিতার পদও পাওয়া যায়।[১] নারায়ণ দেবের সঙ্গে বল্লভ ঘোষের মিশ্র ভণিতার ব্যবহার সর্বত্রই প্রায় এইপ্রকার, যথা '—নারায়ণ দেব কয়, সুকবি বল্লভে হয়।'[২] কবি কমল নয়নের সঙ্গে তাঁহার এই প্রকার মিশ্র ভণিতা পাওয়া যায়,—'কমল নয়ন কয়, সুকবি বল্লভ হয়' ;[৩] কবি রামনিধির সঙ্গেও কবির অনুরূপ মিশ্র ভণিতা পাওয়া যায়,—'রামনিধি দেব কয়, সুকবি বল্লভ হয়'।[৪] এই প্রকার আরও বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শুধু কবি বল্লভই যে নারায়ণ দেবের সঙ্গে মিশ্র ভণিতার ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা নহে, নারায়ণ দেবের সঙ্গে মিশ্র ভণিতাযুক্ত আরও বহু কবির নাম পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা যাইতেছে,—'মিলি যদুনাথ সনে, কহে দেব নারায়ণে';[৫] 'কবি নারায়ণ রচে সরস পয়ার। ভট্ট অনুপেতে কহে লাচারীর সার';[৬] 'নারায়ণ দেব রচে সরস পয়ার। কহিবে বিজয় গুপ্ত লাচারীর সার'।।[৭] 'বংশীধর বলে থাকি চন্দ্রধর পাশে ; নারায়ণ দেব কয় মনসার দাসে।।[৮] নারায়ণ দেবের বাণী, বিফুলা কহিলা পুণি, ভণিলেক বংশীবদন।'[৯]

এই প্রকার মিশ্র-ভণিতা ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন হইতেই অনুমিত হইবে যে, বল্লভ নামক কোন মনসা-মঙ্গলের লেখকই নিজেকে সুকবি বলিয়া পরিচয় দিয়া নারায়ণ দেবের ভণিতার সঙ্গে নিজের নাম ব্যবহার করিয়াছেন। সম্ভবত এই বল্লভ মনসা-মঙ্গলের অন্যতম কবি বল্লভ ঘোষ। ইহার সম্বন্ধে কতকগুলি জনপ্রবাদও প্রচলিত আছে, কিন্তু ইহাদের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, সুকবিবল্লভ নারায়ণ দেবের উপাধি নহে। নারায়ণ দেবের অন্য কোন উপাধি ছিল বলিয়াও জানিতে পারা যায় না। তাঁহার পারিবারিক জনশ্রুতি হইতেও তাঁহার কোন উপাধি ছিল, এ'কথা জানিতে পারা যায় না।

মঙ্গলকাব্য রচনার মূল নীতি অনুবর্তন করিয়া নারায়ণ দেবও তাঁহার কাব্য প্রেরণার মূলে দেবতার স্বপ্নাদেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—

বারয় বৎসর কালে দেখিলাম স্বপন।
মহা পরিশ্রম মনে হইল দরশন।।
শিশুকালে গোপরূপে হাতে লইয়া বাঁশী।
আলিঙ্গন দেন মোকে বড় সুখে হাসি।।
তৎপরে পদ্মা মোরে দেখাইল স্বপন।
কবিত্বের আশা মোর সেহি ত কারণ।।

১। প-স ৪৯৭০ ; ২। শ্রীশ্রীপদ্মাপুরাণ বাইশ কবি-মনসা, অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত (কলিকাতা, ৭ম সং) ২৭ ;

৩। নারায়ণ দেব....... ; ৪। শ্রীশ্রীপদ্মাপুরাণ বাইশ কবি মনসা, ৮০ ; ৫। ঐ ১১৪, ৬। ঐ ১৫১ ; ৭। ঐ ১৩৪ ও ১৪০ ; ৮। ঐ ৩২৯ ; ৯। নারায়ণ দেব ৪৫৫

গুণীর সাক্ষাতে আমি কি বলিব বাণী।
কোকিল সাক্ষাতে যেন কাকে করে ধ্বনি।।
মুনি মুখে শুনিয়াছি সৃষ্টির পত্তন।
পদ্মাপুরাণ কথা শুন জ্ঞানিজন।[১]

কোনও বাংলা মনসা-মঙ্গলের লেখককে নারায়ণ দেব আদর্শরূপে ব্যবহার করিতে পারেন নাই বলিয়াই মনে হয়। তবে তাঁহার কাব্যের পৌরাণিক অংশের রচনায় যে তিনি সংস্কৃত পুরাণগুলিকেও মুখ্যত অবলম্বন করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণ' তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে কবির আত্মপরিচয় ও দেব-বন্দনা ইত্যাদি, দ্বিতীয় খণ্ডে পৌরাণিক আখ্যানসমূহ ও তৃতীয় খণ্ডে চাঁদ সদাগরের কাহিনী সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ড অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত, দ্বিতীয় খণ্ডের পৌরাণিক আখ্যানসমূহই নারায়ণ দেবের কাব্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। মহাভারতের আস্তিক পর্ব, বিবিধ শৈব পুরাণ ও কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম' কাব্য প্রভৃতিই নারায়ণ দেব রচিত মনসা-মঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ডের ভিত্তি। এই সকল পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে পরবর্তী খণ্ডে বিবৃত চাঁদ সদাগরের লৌকিক কাহিনীর স্বভাবতই কোনও সহজ সংযোগ স্থাপিত হইতে পারে নাই। তথাপি প্রাচীনকালে এই ভাবে বাংলা ভাষায় লৌকিক কাহিনী বর্ণনা-প্রসঙ্গে পৌরাণিক কাহিনী অবতারণা করিবার ফলে দুরূহ সংস্কৃতের প্রাচীর অতিক্রম করিয়া জনসাধারণের মধ্যে পৌরাণিক কাহিনীসমূহ প্রচারিত হইত। নারায়ণ দেবের মনসা-মঙ্গল কাব্য বাংলা ভাষায় পৌরাণিক কাহিনীর এক বিশাল ভাণ্ডার।

নারায়ণ দেবের রচনায় স্বভাব-স্ফূর্ত সরস কবিত্বের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই তাহাতে পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও দুর্লভ নহে। তাঁহার রচনার মধ্য হইতেই ইহা লক্ষ করা যায়। সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যে নারায়ণ দেবের অপরিসীম পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু এই পাণ্ডিত্য-বোধ তাঁহার অনুভূতি-সজাগ কবি-হৃদয়ের উপর দুর্ভার বোঝা হইয়া পড়ে নাই। সহজ কবিত্বের স্রোতে তাঁহার অন্তরসঞ্চিত জ্ঞানোপলরাশি স্বচ্ছন্দপ্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে। ছদ্মবেশী ব্রহ্মচারীর নিকট হইতে শিবের কটূক্তি শ্রবণ করিয়া উমা বলিতেছেন,—

না বোল না বোল দ্বিজ হেন কুবচন।
মহাজন নিন্দার এথা নাহিক প্রয়োজন।।
নিরঞ্জন অব্যয় নির্গুণ ভগবান্।
যাহার স্মরণ মাত্র হয় পরিত্রাণ।।
চারি বেদ কণ্ঠে যিনি সর্ববেদময়।
যাহার মুখের অগ্নি সংসার প্রলয়।।

১। নারায়ণ দেব ১

প্রলয়ের কালে শিব আপনি যোগ বলে।
বটপত্রে শয়ন করি ভাসিলেক জলে।।
সৃষ্টির কারণে শিব আপনি একাকী।
তাহা হইতে সৃষ্টি কৈলা সকল প্রকৃতি।।
কীট পতঙ্গ আদি যত সব শিবময়।
নিশ্চয় জানিও দ্বিজ নাহিক সংশয়।[১]

ইহার সঙ্গে কালিদাস-রচিত 'কুমারসম্ভব'-এর পঞ্চম সর্গের কোনও কোনও অংশ তুলনা করা যাইতে পারে।

মনসা-মঙ্গলকাব্য করুণ রসের আকর। এই করুণ রসের স্বাভাবিক বর্ণনায় নারায়ণ দেবের সমকক্ষ বড় কেহ নাই। তিনি তাঁহার কাব্যের পরিসমাপ্তিতে এক অতি অপূর্ব করুণ রসের অবতারণা করিয়াছেন, অন্যান্য কবির রচনায় তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার পরিকল্পনা যেমন উচ্চাঙ্গ কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক, তেমনই ইহার রচনাতেও নারায়ণ দেব ইহার বিষয়গত মর্যাদা সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াছেন। স্বামীর পুনর্জীবন লইয়া প্রত্যাগতা বেহুলা সুমিত্রার নিকট মুহূর্তের জন্য মাত্র দেখা দিল, কিন্তু তাঁহার কাছে ধরা দিল না। একখানি পত্রে আত্মপরিচয় লিখিয়া রাখিয়া স্বামীর সঙ্গে স্বর্গারোহণ করিল। এই দীর্ঘ ও আশঙ্কাসঙ্কুল বিরহের অবসানে সন্তানকে ফিরিয়া পাইয়া সুমিত্রার মাতৃ-হৃদয়ের রুদ্ধ স্নেহ সহসা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু স্নেহেব কন্যাকে নিজের বাহুবন্ধনে আর ধরিতে পারিলেন না। যেদিন বেহুলা প্রথম গাঙ্গুরের ভাসানে মৃতের সহযাত্রিণী হইয়াছে, সেইদিন হইতেই সে চিরতরে জীবিতের সমাজেব বাহিরে চলিয়া গিয়াছে ; সেইদিন তাহার সহমরণ হইয়াছে। অতএব তাহার প্রত্যাবর্তন একটা রূপকের মত। কবি নারায়ণ দেব ইহাই কল্পনা করিয়া প্রত্যাগত বেহুলাকে মুহূর্তের জন্য মাত্র সমাজের কল্পনা-চক্ষুর সম্মুখীন করিয়া পুনরায় স্বর্গলোকে নিরুদ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহা কি আদর্শবাদী সমাজের আদর্শ সতীচরিত্র কল্পনার ফল? বেহুলার প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা কি স্নেহময়ী সুমিত্রার সন্তান-স্নেহাতুর জননী-হৃদয়ে প্রতিফলিত অলীক সুখ-স্বপ্নের ছায়া? নারায়ণ দেব তাঁহার অশ্রুভারাক্রান্ত পাঠকের নিকট এই জিজ্ঞাসা রাখিয়া গিয়াছেন।

নারায়ণ দেবের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার কাব্যের পরিসমাপ্তির পরিকল্পনা চাঁদ সদাগরের চরিত্রের আনুপূর্বিক সামঞ্জস্য রক্ষায় সার্থক হইয়াছে। তিনিই চাঁদ সদাগরকে দিয়া বাম হস্তে মুখ না ফিরাইয়া একটি ফুল দিয়া 'পূজা' করাইয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য কোন কোন কবি, এমন কি, বিজয় গুপ্তও তাঁহাকে দিয়া ঘটা করিয়া মনসার পূজা করাইয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। এই দিক দিয়া নারায়ণ দেবের রচনায় কাব্যগুণ অধিক প্রকাশ পাইয়াছে বলিতে হইবে।

১। নারায়ণ দেব ৫১

নারায়ণ দেবের মনসা-মঙ্গলকে কেহ অশ্লীলতার দোষে দোষী করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নারায়ণ দেবের মুখ্য উপাদান ছিল সংস্কৃত পুরাণ।

সেই যুগে সংস্কৃত পুরাণগুলি নৈতিক আবহাওয়া অত্যন্ত দূষিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ যে শৈব পুরাণগুলির উপর নারায়ণ দেব বিশেষভাবে নির্ভর করিয়াছিলেন, তাহা এই বিষয়ে আরও একটু অগ্রসর ছিল। অতএব এই আর্দশের প্রভাব বাঙ্গালী কবির পক্ষেও অনেক স্থলেই অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু নারায়ণ দেবকেই বা এই বিষয়ে দায়ী করিলে চলিবে কেন? প্রাক্-চৈতন্যযুগের সমগ্র বাংলা সাহিত্যই এই বিষয়ে দোষী। কারণ, ইহাদের প্রেরণা যে কেবল নীতি ও রুচির বন্ধনহীন সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্য হইতেই আসিয়াছিল, তাহা নহে—বিলয়োন্মুখ বৌদ্ধধর্মের অধঃপতিত নৈতিক আদর্শ ও ইহাদের পরিকল্পনার মূলে কার্যকর হইয়াছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে নারায়ণ দেবের কাব্যই সর্বাধিক প্রচারের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। সেইজন্য পরবর্তী বহু মনসা-মঙ্গলের কবি এবং গায়েন নারায়ণ দেবকেই আদর্শ করিয়া তাঁহারই পদ কিংবা পদাংশ ভিত্তি করিয়া তাঁহার সঙ্গে যুগ্মভণিতা দিয়া নূতন পদ রচনা করিয়াছেন। এইরূপ কতকগুলি পদ পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গের কবি ক্ষেমানন্দ তাঁহার মনসা-মঙ্গল রচনার প্রারম্ভে বাণী-বন্দনায় নিম্নোদ্ধৃত পদে ব্যাস-বাল্মীকির সঙ্গে নারায়ণ দেবেরও সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া কেহ অনুমান করিয়াছেন,—

ব্যাস-বাল্মীকি মুনি নারায়ণ তত্ত্ব জানি
তোমাকে সেবিয়া হৈল কবি।[১]

ক্ষেমানন্দের নিম্নোদ্ধৃত পদ-ভাগেও নারায়ণ দেবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে,—

দেব নারায়ণ যথা আ'.. গো ভারতী মাতা
ত্যজি দেবী বৈকুণ্ঠ নগর।
অবোধ বালকে ডাকে দেহ পদছায়া তাকে
বৈস মোরে কণ্ঠের উপর।।[২]

অষ্টাদশ শতাব্দীর বগুড়ার কবি জীবন মৈত্রের রচনার কোন অংশের সহিত 'নারায়ণ দেবের রচনার যেন এক দূর সাদৃশ্য আছে বলিয়া অনুমিত' হইয়াছে।

নারায়ণ দেবের স্বদেশবাসী পরবর্তী কবি দ্বিজ বংশীদাসের রচনা যে বহুলাংশে নারায়ণ দেব দ্বারাই প্রভাবিত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।[৩] এই বিষয়ে কেহ উল্লেখ করিয়াছেন যে, বংশীদাস 'নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের উপাখ্যানে রূপকচ্ছলে হিন্দুধর্মের অত্যাচার প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত করিয়া তাঁহার পদ্মাপুরাণ রচনা করিয়াছেন।'[৪]

১। বংশীদাস, 'পদ্মপুরাণ', দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ও রামকান্ত চক্রবর্তী সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৩১৮ সাল)। ? ; ২। বংশীদাস, ঐ

৩। মোহিনীমোহন মৈত্রের 'কবি জীবন মৈত্র', ব-সা-প-প, ৪। (১৩১৬), ১৯৩ ; ৪ বংশীদাস ;

বর্তমানে বঙ্গদেশ অপেক্ষা আসামেই নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ অধিক প্রচলিত আছে। ইহার কারণ, নারায়ণ দেবই প্রকৃতপক্ষে আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রচারিত একমাত্র মনসা-মঙ্গলের কবি। আসামবাসিগণ এই কবিকে নিজেদের প্রদেশবাসী জ্ঞানেই শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া থাকেন। আসামের গোয়ালপাড়া, কামরূপ, মঙ্গলদৈ প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।[১] এমন কি, প্রাচীন অসমীয়া ভাষার লেখকদিগের মধ্যে তাঁহারও স্থান নির্দেশ করা হইয়া থাকে। আসামে গিয়া নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। নারায়ণদেব-রচিত প্রাচীন বাংলা পদগুলি আসামে গিয়া কি ভাবে পাঠান্তরিত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পদটির বাংলা ও অসমীয়া পাঠ তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে,—

বাংলা

ওঠ ওঠ ওহে প্রিয়া কত নিদ্রা যাও।
কাল নাগে খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও।।
তুমি হেন অভাগিনী নাহি ক্ষিতি তলে।
অকারণে রাঁড়ি হৈলা খণ্ড ব্রত ফলে।।
কত খণ্ড তপ তুমি কৈলা গুরুতর।
সে কারণে তোমা ছাড়ি যায় লক্ষ্মীন্দর।।
মাও সোনকা মোর মৃত্যুকথা শুনি।
অগ্নিকুণ্ড করি মায়ে ত্যজিব পরাণি।।
আমার মরণে মায়ে বড় পাবে তাপ।
পুত্র শোকে মাও মোর সাগরে দিবে ঝাঁপ।।
আমার মরণে মাও হইবে পাগল।
মাগনি হইয়া মায়ে বেড়াবে সহর।।
ছয় পুত্র পাশরিল আমারে দেখিয়া।
কেমনে ধরিবে দুঃখ মা ঘরে রৈয়া।।
খেয়াতি রাখিল মায়ে সংসার জুড়িয়া।
মায়ে পুত্রে মরিবেক চিতায় পুড়িয়া।।
চিতা সাজাইবে নিয়া গুঙ্গরীর তীরে।
আমা সঙ্গে প্রবেশিবে অগ্নির মাঝারে।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাঁচালী।
পয়ার ছাড়িয়া এক বলিব লাচারী।[২]

১ Eastern Anthropologist, IV (1951): p.159
২ নারায়ণ দেব ৩৮২-৩৮৩

অসমীয়া

উঠা উঠা প্রাণেশ্বৰী কত নিদ্রা যাস্।
মোক খাইল কালনাগে চক্ষু মেলি চাস্।
তোৰ সম অভাগী নাহিক ক্ষিতি তলে।
অকালতা বাঁৰী ভৈলী খণ্ড ব্রতৰ ফলে।।
কতো জন্মে খণ্ড ব্রত কৈলি বহুতৰ।
সেহি দোষে তোক এৰি যাওঁ লখিন্দৰ।।
মাও সনেকা মোৰ মৰণ শুনিলে।
অগণি জ্বালিয়া মাও গাওৰ অঞ্চলে।।
আমাৰ মৰণে মাও মৰিব পুৰিয়া।
খ্যাতি ৰাখিবো মায়ে সংসাৰ জুড়িয়া।।
বিষৰ জালত লখাই বিনায়ে বচন।
কাল নিদ্রা হৈল বেহুলাৰ নাহিক চেতন।।
কায়া আঙ্গুলিৰ বিষে ব্রহ্মাৰ দ্বাৰ পাইলা।
বেহুলা বেহুলা লখাই ডাকিতে লাগিলা।।
সুকবি নাৰায়ণদেবৰ সৰস পাঞ্চালী।
লখাইৰ করুণা বুলি এক যে লেচাৰী।।[১]

এই উদ্ধৃত উভয় অংশই যে একই কবির রচনা, কালক্রমে এবং দেশান্তর ভেদে বাহ্যত কোন কোন স্থানে সামান্য পরিবর্তিত হইয়াছে মাত্র, এই বিষয়ে কোনও সংশয় থাকিতে পারে না।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, বাংলার প্রাচীন কবিগণের নামে বহু কৃত্রিম রচনা সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে। যে কবি যত প্রাচীন ও যত জনপ্রিয়, সেই কবির কাব্যমধ্যে তত বেশি প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। নারায়ণ দেবের পক্ষেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। নারায়ণ দেবের মনসা-মঙ্গলের বহুল প্রচারের জন্য আজ এই চারি শতাব্দীর ব্যবধানে তাঁহার একটি অকৃত্রিম প্রাচীন পুঁথি দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। নারায়ণ দেবের কাব্যে বিপ্র জগন্নাথ, বৈদ্য জগন্নাথ, জগন্নাথ দাস, বিপ্র জানকীনাথ, দ্বিজ বংশীদাস, শিবানন্দ, চন্দ্রপতি, দ্বিজ মনোহর, চন্দ্রাবতী, চন্দ্রধর, পদ্মাবতী, এবং শ্রীকৃষ্ণচরণ—এই সমস্ত বিভিন্ন কবি ও গায়েন নিজেদের ভণিতা যোগ করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হরিদত্তের একটি পদও তাঁহার রচনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। আসামে প্রচলিত নারায়ণ দেবের পুঁথিতেও চন্দ্রপতি, জানকীনাথ প্রমুখ কবিদিগের ভণিতা পাওয়া যায়। অতএব নারায়ণ দেবের পুঁথি আসামে প্রচারিত

১। 'অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি', ৫৮৯-৯০

হইবার পূর্বেই ইঁহাদের রচনা তাঁহার কাব্যের মধ্যে গিয়া প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

বিজয় গুপ্ত

মনসা-মঙ্গলের কবিদিগের মধ্যে নারায়ণ দেবের পরই বিজয় গুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য।[১] এমন কি, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে সুস্পষ্ট সন-তারিখ-যুক্ত মনসা-মঙ্গল কাব্যের কবিদিগের মধ্যে বিজয় গুপ্তের নামই সর্বপ্রথম উল্লেখ করিতে হয়। এই হিসাবে চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবিদিগের মধ্যে বিজয় গুপ্তের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তাঁহার কাব্যমধ্যে এই সকল ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ রহিয়াছে ; তাহা হইতেই তাঁহার বিস্তৃত পরিচয়ও সুলভ হইয়াছে।

ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন সাহা নৃপতি তিলক।।
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহু বলে রাজা শাসিল পৃথিবী।।
রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গারোড়া তক্‌সিম্।।
পশ্চিমে ঘাঘর নদী পুবে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর।।
চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্যাজাতি বসে নিজ শাস্ত্রেতে কুশল।।
কায়স্থ জাতি বসে তথা লিখনের শূর।
অন্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সচতুর।।
স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুল্লশ্রীগ্রামে বসতি বিজয়।।

উদ্ধৃত অংশে গ্রন্থরচনার কাল সম্পর্কে যে নির্দেশ পাওয়া যাইতেছে, অর্থাৎ 'ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক', তাহাতে দেখা যায়, ১৪০৬ অর্থাৎ ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্য রচিত হয়। কিন্তু এই সময়ের সঙ্গে ইহাতে উল্লিখিত অপর একটি ঐতিহাসিক তথ্যের মিল হইতেছে না। উদ্ধৃত অংশে গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের নামোল্লেখ করা হইয়াছে। হুসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন।[২] অতএব কবির সময়-নির্দেশক উদ্ধৃত পদটিতে কোন ভুল রহিয়াছে। বিজয় গুপ্তের

১। বিজয় গুপ্ত, 'পদ্মাপুরাণ', প্যারীমোহন দাশগুপ্ত (কলিকাতা, ১৩৩৭) ; জয়ন্ত কুমার দাশগুপ্ত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২), ঢা-১০৯১ ; A, B, C, D, E.

২। H. B. II. 142-52.

মনসা-মঙ্গলের কোনও কোনও হস্তলিখিত পুঁথিতে তাহার কাব্যরচনার কালনির্দেশক উক্ত 'ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক' পদটির পরিবর্তে 'ছায়া শূন্য বেদ শশী পরিমিত' কিংবা 'ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক' এই প্রকার আরও দুইটি পাঠ পাওয়া যায়।[১] ইহাদের মধ্যে প্রথম পদটি হইতে ১৪০০ শকাব্দ বা ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, ইহাও হুসেন শাহের সময়ের অনুকূল নহে। শেষোক্ত পদটি হইতে ১৪১৬ শকাব্দ বা ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যাইতেছে। এই সময় হুসেন শাহ্ গৌড়ের সুলতান ছিলেন। অতএব এই সময়টিই বিজয় গুপ্তের কাব্যরচনার কাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অতএব বিজয় গুপ্তের মুদ্রিত পুঁথিতে গ্রন্থ-রচনার কাল-নির্দেশক যে পদটি আছে, তাহা সামান্য ভুল। তাহার 'শূন্য' স্থলে 'শশী' হইবে। তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, বিজয় গুপ্ত ১৪১৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দেবীর স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া মনসা-মঙ্গলকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। গৈলাফুল্লশ্রী গ্রাম বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত। এই গ্রামে বিজয় গুপ্তের পূজিত বলিয়া কথিত মনসাদেবীর মূর্তি অদ্যাপি বর্তমান আছে। কবির নিজস্ব বংশধারা লুপ্ত হইয়া গেলেও তাঁহার সাক্ষাৎ সম্পর্কিত আত্মীয়বর্গের বংশধরগণ সেই গ্রামে এখনও বসবাস করিতেছেন। ফুল্লশ্রী গ্রামের বৈদ্যবংশের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

বিজয় গুপ্তের কবি-প্রতিভায় তাঁহার পূর্ববর্তী কবিগণের যশ প্রায় সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি যে, মনসা-মঙ্গল রচয়িতাদিগের কবিত্ব শক্তি যে খুব উচ্চাঙ্গের ছিল, তাহা নহে ; একমাত্র বিষয়-গুণে এই কাব্য এত অধিক প্রচার লাভ করিয়াছিল। বিজয় গুপ্তের কবিত্ব-শক্তি মধ্যযুগের কোন প্রথম শ্রেণীর কবিরই সমকক্ষ ছিল না। মনসা-মঙ্গল প্রধানত করুণ রসের আকর। এই করুণ-রসপ্রধান কাব্য-সৃষ্টিতে সার্থকতা লাভ করিতে হইলে, যে সুগভীর ভাব-প্রবণতার প্রয়োজন হয়, বিজয় গুপ্তের মধ্যে তাহার কতকটা অভাব ছিল। বিজয় গুপ্তের দৃষ্টি ব্যষ্টি-চরিত্রের অন্তস্তল অপেক্ষা সমষ্টি-চরিত্রের বহির্ভাগের দিকেই অধিকতর আকৃষ্ট ছিল। ভাব-প্রবণতা অপেক্ষা তাঁহার মধ্যে বস্তু-বিশ্লেষণ-প্রবণতা অধিক ছিল। সেই জন্য তিনি এই করুণ-রসাশ্রিত কাহিনীর উদ্দাম ভাব-প্রবাহে ভাসমান না হইয়া ইহার এক একটি বিচ্ছিন্ন খণ্ড বস্তু আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। তাহার ফলে বিচ্ছিন্ন সামাজিক চিত্রগুলি তাঁহার কাব্যে সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। এই দিক দিয়া বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গল তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসেও একটি মূল্যবান উপাদান হইয়া রহিয়াছে। এমন কি, তাঁহার পরিকল্পিত দেব-চরিত্রগুলিও তৎকালীন সমাজের এক একটি জীবন্ত মানব-চরিত্ররূপেই অঙ্কিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে দেবত্বের লেশ মাত্র নাই। বাংলার ধূলিমলিন গৃহাঙ্গিনায় তাঁহার কাহিনীর পরিবেশটি রচনা করা হইয়াছে ; ইহার মধ্যে আদর্শবাদের স্পর্শমাত্রও নাই। পদ্মা, চণ্ডিকা, শিব প্রভৃতি দেব-চরিত্রগুলি নিখুঁত বাস্তব

১। নিশিকান্ত সেন, 'বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলের সময় নির্ণয়', প্রবাসী (১৩২৮) ফাল্গুন, ৬৬৩, বিজয় গুপ্ত [ম]।

দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই চিত্রিত হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যা'ক। কন্যার বিবাহ স্থির করিয়া আসিয়া শিব যখন চণ্ডীকে ইহার আয়োজন করিতে বলিলেন, তখন অসচ্ছল সংসারের গৃহিণী চণ্ডী স্বামীর দারিদ্র্যের উপর কটাক্ষ করিয়া বলিলেন,—

হাসি বলে চণ্ডী আই তোমার মুখে লজ্জা নাই,
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
এ'য়ো আইসে মঙ্গল গাইতে তারা চাইবে পান খাইতে,
আর চাইবে তৈল সিন্দুরে।।

ইহার উত্তরে 'শূলপাণি' যাহা বলিলেন, তাহা কবির গ্রাম্য হাস্যরস-সৃষ্টির ক্ষমতার পরিচায়ক হইলেও তাঁহার পক্ষে দেবত্বের পরিচায়ক নহে ;—

হাসি বলে শূলপাণি এয়ো ভাণ্ডাইতে জানি,
মধ্যে দাঁড়া'ব নেংটা হ'য়ে।
দেখিয়া আমার ঠান, এয়োর উড়িবে প্রাণ,
লাজে সবে যা'বে পলাইয়ে।।

এই নিখুঁত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই বিজয় গুপ্ত প্রাক্-চৈতন্য সমাজের যে অকৃত্রিম একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র প্রাচীন লোকসাহিত্যের দিক হইতেই নহে, বাংলার প্রাচীন সামাজিক ইতিহাসের দিক হইতেও পরম মূল্যবান হইয়া আছে।

বিজয় গুপ্তের রচনার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন করুণ-রসের প্রবাহ অনুভব করিতে পারা না গেলেও, মধ্যে মধ্যে ইহার স্পর্শটুকু একেবারে উপেক্ষণীয় বলিয়া বোধ হইবে না। কিন্তু তাঁহার কাব্যে করুণ-রসের অবতারণা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। কাহিনীর মধ্যে এত অবকাশ থাকা সত্ত্বেও, সরস লাচারীতে গতানুগতিক বিলাপোক্তি তাঁহার রচনায় প্রায় স্থান পাই নাই বলিলেই হয়। মধ্যে মধ্যে দুই একটি মাত্র পদে গভীর বেদনার অনুভূতি ফুটিয়া উঠে। লৌহ-বাসরে লখিন্দরের মৃত্যুর পর মাতা সনকার অবস্থা বর্ণনায় কয়টি মাত্র পদ সুগভীর বেদনাদ্যোতক,—

কবাট করিয়া দূর বাসরে সামায়।
দেখিল সোনার তনু ধূলায় লুটায়।।
দুই হস্তে ধরি রাণী লাখাই নিল কোলে।
চুম্বন করিল রাণী বদন-কমলে।।

ইহার মধ্যে আকস্মিক দুঃসংবাদপ্রাপ্তা জননীর যে ব্যাকুল ব্যথাতুর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে ; সুদীর্ঘ বিলাপোক্তি দ্বারা তাহা অনেক সময় এমন ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না।

বিজয় গুপ্তের রচনাতেই বাংলা কাব্যসাহিত্যে সর্বপ্রথম ছন্দের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। পয়ার ও লাচারী ভিন্ন সেই যুগে অন্য কোনও ছন্দের অস্তিত্ব ছিল না ; অবশ্য আধুনিক বাংলা ছন্দের উৎপত্তি তখনও হয় নাই। বাংলা ছন্দের সেই অপরিণত অবস্থাতেই বিজয়

গুপ্তের রচনায় ইহার ভবিষ্যৎ কয়েকটি সম্ভাবনার নির্দেশ পাওয়া গিয়াছিল। নিম্নোদ্ধৃত রচনাটিতে আধুনিক স্বরবৃত্ত ছন্দের সুর ধ্বনিত হইতে শোনা যায়,—

প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সইতে পারি।।
আগুন লাগুক কান্ধের ঝুলি ত্রিশূল লউক চোরে।
গলার সাপ গরুড় খাউক যেমন ভাণ্ডাল মোরে।।

আবার কোনও কোনও একাবলী ছন্দ রচনায় বহু দূরাগত ভারতচন্দ্রের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়,—

জগত মোহন শিবের নাচ।
সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ।।
রঙ্গে নেহারিয়া গৌরীর মুখ।
নাচেরে মহাদেব মনেতে কৌতুক।।

সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যে বিজয় গুপ্তের সুগভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার মনসা-মঙ্গলকাব্যের প্রথমাংশে মনসাদেবীর উৎপত্তির যে বিস্তৃত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যে পূর্ণ অধিকারের ফল বলিতে হইবে। অবশ্য এই বিষয়ে তিনি হরিদত্তকেই কতক পরিমাণে আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও পরে ভারতচন্দ্র রায় যে তাঁহাদের রচনায় ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার ব্যবহার করিয়াছিলেন, বিজয় গুপ্তের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যে তাহার সর্বপ্রথম প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও ভাষার দিক দিয়া চৈতন্য-পরবর্তী যুগের পারিপাট্য তখনও দেখা দেয় নাই, তথাপি ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের ব্যবহার পরবর্তী উদ্ধৃত বিজয় গুপ্তের রচনাংশে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, এক কথায় বলিতে পারা যায় যে, ভারতচন্দ্র রায় তাঁহার অন্নদা-মঙ্গলের ঈশ্বরী পাটনীর সমগ্র চিত্রটির জন্য মনসা-মঙ্গলের এই পরিকল্পনাটির নিকট ঋণী। শিব চণ্ডীর সঙ্গে কলহ করিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছেন। চণ্ডী তাঁহার সন্ধানে বাহির হইয়া সরযূ-তীরের খেয়াঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, এক ডোম্‌নী খেয়া পারাপার করিতেছে,—

ঘাটে দাঁড়াইয়া দেবী মনে মনে পাঁচে।
হাসিতে খেলিতে গেলা ডোম্‌নীর কাছে।।
কপট করিয়া সাঁচা মিছা কথা কই।
এক নাম জানিয়া তাহারে বলে সই।।[১]
তোমার মত সই আমি বড় ভাগ্যে পাই।
আমার দুঃখের কথা তোমাকে জানাই।।

১। তুলনীয়, 'ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী'—ভারতচন্দ্র (পরে দ্রষ্টব্য)

চণ্ডী বলে সখী মোর দুঃখের নাহি ওর।
বৃদ্ধকালে স্বামী মোর পরনারী চোর।।[১]

বিজয় গুপ্তের এই চিত্রটি পরবর্তী আরও কয়েকটি মনসা-মঙ্গলে গৃহীত হইয়াছিল। ভারতচন্দ্র মুখ্যত বিজয় গুপ্তের নিকট ঋণী না হইলেও বিজয় গুপ্তের পরবর্তী কোন কবির রচনা হইতে তাঁহার অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রার অনুরূপ চিত্রটি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

বিজয় গুপ্তের উপমা প্রয়োগের মধ্যেও একটি অপূর্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার কাব্যে গতানুগতিক অলঙ্কার-শাস্ত্রানুমোদিত উপমার কোনও স্থান নাই, প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান হইতেই সেগুলি নিজের রসবোধ দ্বারা সৃষ্ট। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিবার লোভ সংবরণ করা কঠিন। মনসা চণ্ডীর নিকট দুর্ভাগ্যের কথা বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন,—

জনম দুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল।।
শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে।
পাষাণ আগুন হয় মোর কর্মফলে।।

ইহার সঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র এই পদটি তুলনীয়,

যে ডালে করো মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিঞাঁ পড়ে
নাহি হেন ডাল যাত করো বিসরামে।

কিংবা জ্ঞানদাসের এই পদটিও তুলনা করা যাইতে পারে, যথা—

শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ পেখি।

লখিন্দরের বিবাহোপলক্ষে বরযাত্রীর দল যখন কন্যাপক্ষীয় দলের সঙ্গে মিলিত হইল, তখনকার দৃশ্যের বর্ণনায় বিজয় গুপ্ত লিখিয়াছেন—

দুই কটকে মিশামিশি হইল বোলচাল।
দুই সমুদ্রের জল যেন হইল উথাল।।

লখিন্দরের সর্বাংশে যোগ্য পাত্রী বেহুলা—এই কথা বর্ণনা করিতে বিজয় গুপ্ত লিখিয়াছেন,—

বেহুলা যেন কন্যা লখাই তেন দারা (মত)।
পাতিল জুখিয়া যেন কুমারে গড়ে শরা।।

লখিন্দরের সর্পদংশনের পর বেহুলা এই বলিয়া বিলাপ করিতেছে,—

আম ফলে থোকা থোকা নুইয়া পড়ে ডাল।
নারী হইয়া এ যৌবন রাখিব কতকাল।।

১। তুলনীয়, 'অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ'—ভারতচন্দ্র (পরে দ্রষ্টব্য)

সোনা নহে রূপা নহে অঞ্চলে বান্ধিব।
হারাইলাম প্রাণপতি কোথা যাইয়া পাব।।

যে যুগে সংস্কৃত হইতে অনুবাদই বাংলা সাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন ছিল, প্রধানত সেই যুগেই আবির্ভূত হইয়া এবং সংস্কৃত পুরাণের পরিবেশে নিজের কাব্য রচনা করিয়াও সংস্কৃতের আলঙ্কারিক প্রভাব হইতে বিজয় গুপ্ত নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিতে পারিয়াছিলেন।

কোন কোন স্থলে বিজয় গুপ্তের ভাষা প্রাক্-চৈতন্য যুগের গ্রাম্যতা উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াস পাইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়,—

সরযূর ঘাট যুড়ি খেয়া দিতে হৈলাম বুড়ি
আজু বড় দেখিলাম কৌতুক।
এক বুড়া হৈল পার, তিন নয়ন তার
দেখিতে সুন্দর পঞ্চমুখ।।
কপালে চান্দের ফোঁটা, আকাশে পরশে জটা,
বাম কান্ধে লোহার ত্রিশূল।
বলদে চড়িয়া যায় শিঙা ডম্বরু বাজায়,
দুই কর্ণে ধুতুরার ফুল।।
গলায় হাড়ের মালা, পিন্ধন বাঘের ছালা,
সকল শরীর ভস্মময়।
হৃদয়ে ফোঁপায় ফণী, তার শিরে জ্বলে মণি।
তাহারে দেখিতে করে ভয়।।

একই বিষয়-বস্তু লইয়া কাব্য রচনা করিলেও নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্তের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির যে পার্থক্য ছিল, তাহার জন্যই তাঁহাদের কাহিনী পরিকল্পনায়ও কোন কোন স্থলে সামান্য ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। আদর্শবাদের উপরই মনসামঙ্গল কাহিনীর ভিত্তি-ভাগ প্রতিষ্ঠিত ; অতএব সমগ্রভাবে বিচার করিতে গেলে বস্তুনিষ্ঠ বিজয় গুপ্ত অপেক্ষা আদর্শবাদী নারায়ণ দেব কর্তৃকই কাহিনী-ভাগ অধিকতর সুপরিকল্পিত হইয়াছে। বেহুলা-লখিন্দর স্বর্গে নিরুদ্দিষ্ট হইয়া যাওয়ার পর বিজয় গুপ্তের রচনাতে পাওয়া যায়,—

পুত্রবধূ শোকে চান্দ দুঃখ ভাবে মন।
জোড় হাতে মনসার করয়ে স্তবন।।
তোমার প্রসাদে আমি ভুঞ্জিলাম সুখ।
পুত্রবধূ শোকে মোর বিদরিছে বুক।।

বিজয় গুপ্তের এই পরিকল্পনাটির মধ্যে চাঁদ সদাগরের আকাশস্পর্শী পুরুষকারের চিত্রটি একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। চাঁদ সদাগরের যে চরিত্রের সঙ্গে আমরা পরিচয় লাভ করিয়াছি, তাহার পক্ষে কোনও অবস্থাতেই তাঁহাকে জোড় হাতে মনসার স্তব করিবার কথা কল্পনাও করিতে পারা যায় না। বিশেষত তাঁহার সুখ-সমৃদ্ধির জন্য মনসার নিকট কৃতজ্ঞতা

জ্ঞাপন করিবার কথা আরও অস্বাভাবিক। বেহুলার প্রতি চাঁদের স্নেহ প্রকাশ করিতে গিয়া বিজয় গুপ্ত চাঁদের চরিত্র-মূলেই কুঠারাঘাত করিয়াছেন। কিন্তু সমগ্রভাবে কাহিনীর উপর লক্ষ্য রাখিয়াই অগ্রসর হওয়া বিজয় গুপ্তের কবিধর্মের বিরোধী ছিল। সেইজন্য তাঁহার কাব্যের এই শেষাংশ যেন তাঁহার সমগ্র কাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। কিন্তু নারায়ণ দেব এই প্রসঙ্গে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এক দিক দিয়া যেমন স্বাভাবিক, অন্য দিক দিয়া তেমনি কাহিনীর মর্যাদা-রক্ষায় সার্থক হইয়াছে। বেহুলা-লখিন্দর স্বর্গে নিরুদ্দিষ্ট হইবার পর চাঁদ আর কোন প্রকার নূতন দুর্বলতা প্রকাশ করিলেন না। শোকে দুঃখে তিনি চিরদিন যেমন অটল ও নির্বিকার, তখনও তিনি তেমনি রহিলেন। সুমিত্রার মাতৃহৃদয়ের ভিতর দিয়া স্বভাবতই এই ব্যথার অভিব্যক্তি হইল। কন্যার শোকে সুমিত্রার মাতৃহৃদয়ের হাহাকার নারায়ণ দেবের এই রচনার ভিতর দিয়া সহজস্ফূর্তি লাভ করিয়াছে,—

কি করিব ঘরে আসি বিফল বসতি।
বিপুলার শোকে মরিব গলায় দিয়া কাতি।।
মায়ের দুর্লভ ঝি বিপুলা সুন্দরী।
হেন মাও ভাড়িয়া বেউলা গেলা কার পুরী।।
অনেক দুঃখে মাও পুষিলাও তোমারে।
আমারে এড়িয়া তুমি গেলা কার ঘরে।।
কোথা গেল বিপুলা রহিলা কোন দেশে।
সেই ঠাঞি চলি যাব তোমার উদ্দেশে।।
কোথা গেলে বিপুলা তোমার লাগ পামু।
পক্ষী হইয়া তথায় উড়া দিয়া যামু।।

নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণে'র কাব্যাংশ বিজয় গুপ্ত অপেক্ষা স্বাভাবিক। বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ লইয়া মান্দাসে ভাসিয়া চলিয়াছে। বেহুলাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বেহুলার মাতা সংবাদ পাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিসাধুকে পাঠাইলেন। বিজয় গুপ্তের রচনায় বেহুলার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বেহুলাকে ফিরিবার জন্য অনুনয় করিয়া কহিতেছে,—

হরিসাধু বলে, 'বেহুলা যাও কোন ঠাঁই।
আসিয়াছি অভাগিয়া তব জ্যেষ্ঠ ভাই।।
আসিয়াছি তোমাকে নিতে মায়ের আজ্ঞা পাইয়া।
মাঞ্জুস চাপাও ঘাটে কথা কও রইয়া।।
বাপ ভাই তেজি বেহুলা কোন দেশে যাও।
বাপ মায়ের ঘরে বসি ঘৃত অন্ন খাও।।
সাহেব কুমারী তুমি নহ ছোট জনা।
মায়ের নিকটে বসি কর যতিপনা।।

শঙ্খ বদলে দিব সুবর্ণের চুড়ি।
সিন্দুর বদলে দিব ফাড়ুগের গুঁড়ি।।'

নারায়ণের 'পদ্মাপুরাণে' এই অংশ ইহা অপেক্ষা অনেক স্বাভাবিক ও করুণ। বিজয় গুপ্তের কাব্যাংশে ভগ্নী-বিচ্ছেদের কাতরতা নাই বরং ঐশ্বর্যের দাম্ভিকতার ছাপ রহিয়াছে। কিন্তু নারায়ণ দেবের নিম্নোক্ত কাব্যাংশে ভ্রাতার প্রিয়জন-বিচ্ছেদের করুণ আর্তি যেন ছন্দে সুরে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। নারায়ণের কাব্যে বেহুলার ভ্রাতা নারায়ণী এই সম্পর্কে বলিতেছেন,—

নারায়ণী শুনি বোলে বিপুলা বচন।
'কি কারণে কৈলা ভইন অশক্য কথন।।
বিষম সাহস ভইন কইলা কি কারণ।
দেবতা মনিষ্য কোথা হইছে দরশন।।
কেমতে ছাড়িয়া দিমু সাগর ভিতর।
কথাতে পাইবে তুমি দেবর নগর।।'
কাঁদে নারায়ণী সাধু কহএ বিপুলা চাইয়া।
'প্রাণে সয় দুঃখ দিমু এড়িয়া।।
অবুদ্ধিয়া সদাগর বুদ্ধি অতি ছার।
জিয়তা ভাসাইয়া দিছে সহিতে মরার।।
বিষম সাগরে ঢেউ তোলপাড় করে।
জলেতে পড়িলে খাইব মৎস্য মকরে।।
মাএ জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর।
কি কথা কইব আমি উজানী নগর।।'

মনসা-মঙ্গল কাহিনীর মধ্যে সনকার চরিত্রটিই সর্বাপেক্ষা বাস্তব। বিজয় গুপ্তের বাস্তবদৃষ্টি দ্বারা এই চরিত্রটিই সুপরিকল্পিত হইয়াছে। মনসা-মঙ্গল কবিদিগের রচনার মধ্যে বিজয় গুপ্তের সনকা-চরিত্রই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া অনুমিত হয়। চাঁদসদাগর-বেহুলা অনেক সময় ধূলি-মাটির উর্ধ্বে উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু সনকার প্রতিটি পদক্ষেপ ধরণীর ধূলি-মাটির উপর অঙ্কিত হইয়াছে। সনকার মাতৃ-হৃদয়ের একটি সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস সমগ্র মনসা-মঙ্গল কাহিনীটি আচ্ছন্ন করিয়া আছে। বিজয় গুপ্তের কাহিনীটি পাঠ করিতে করিতে এই দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দটি যেন অনুভব করিতে পারি। পুত্রশোকোন্মাদিনী এমন সজীব নারীমূর্তি প্রাচীন বাংলা সাহিত্য আর বড় সৃষ্ট হয় নাই। বিজয় গুপ্তের কাব্য পাঠ করিতে করিতে একটি আলুলায়িতকুন্তলা অশ্রুমুখী মাতৃমূর্তি পাঠকের চোখের সম্মুখে আপনা হইতেই ভাসিয়া উঠে , তাহার প্রতিটি দীর্ঘনিঃশ্বাস, প্রতিটি কাতরোক্তি যেন হৃদয়ের দ্বারে আসিয়া আঘাত করে।

মানব-চরিত্রের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি বিজয় গুপ্তের কাব্যের আর একটি বিশিষ্ট গুণ। অপার্থিব দেব-চরিত্র মনসার হৃদয়হীনতাকে তিনি কোনও আধ্যাত্মিক গৌরব দিয়া মণ্ডিত করিবার প্রয়াস পান নাই। তাঁহার নির্মমতাকে তিনি সর্বদাই অনাবৃত করিয়া দিয়া তাহার জন্য দেবতাকেই বারবার এই বলিয়া অভিসম্পাত দিয়াছেন,—

পাপিষ্ঠ মনসা পাষাণ তার হিয়া।

কিন্তু মানুষের প্রতি তাঁহার সহানুভূতির অন্ত নাই। মুমূর্ষু লখিন্দরের মুখ দিয়া দুই একটি কথায় তাঁহার সহানুভূতি কি অপূর্ব আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশ পাইয়াছে—

চাঁদ হেন বাপ মোর সোনা হেন মাই।
তাহাকে ত্যজিয়া আমি যমপুরে যাই।।
আহা মাতা সোনেকার গুণের অন্ত নাই।
মা বলিয়া ডাকে আর হেন লক্ষ্য নাই।।

একদিকে মনসার হৃদয়হীনতা ও অন্যদিকে সনকার একান্ত মানবিক স্নেহশীলতা এই উভয়ের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া বিজয় গুপ্তের কাহিনী উচ্চাঙ্গের কাব্যরস সৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছে। বিজয় গুপ্ত দেবতার মাহাত্ম্য রচনা করেন নাই, মানবেরই মঙ্গল-গান গাহিয়াছেন। চাঁদ কর্তৃক মনসার অপমানকে সর্বদাই তিনি এত বড় করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহার ফলে তাঁহার কাব্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়া উঠে নাই, মানুষেরই বিজয় ঘোষিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব পদ-সঙ্কলনের রীতি কালক্রমে মনসা-মঙ্গল রচনা-সঙ্কলন সম্পর্কেও অনুসরণ করা হইয়াছিল বলিয়া যে সকল কবির রচনা ব্যাপক প্রচারের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল, একমাত্র তাঁহাদের রচনা-সম্বলিত বিশিষ্ট পুঁথি কালক্রমে প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বিজয় গুপ্তেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সেইজন্য আদ্যোপান্ত বিজয় গুপ্তের ভণিতাযুক্ত কোনও পুঁথি কোথা হইতেও আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত বিজয় গুপ্তের পূর্বোল্লিখিত মুদ্রিত পুঁথিতে বহু পদের মধ্যেই বিভিন্ন কবির ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কবি কর্ণপুর, বর্ধমান দাস, চন্দ্রপতি, হরিদত্ত, পুরুষোত্তম, জানকীনাথ, দ্বিজ কমলনয়ন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত হরিদত্তের কিছু কিছু পদও যে বিজয় গুপ্তের নামে কি ভাবে প্রচলিত হইয়াছে, তাহাও হরিদত্তের আলোচনায় পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। উল্লিখিত বিজয় গুপ্তের মুদ্রিত গ্রন্থের বহু পদে কাহারও কোন ভণিতা দৃষ্ট হয় না। এই সকল পদ যে প্রকৃত কাহার রচিত, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। ইহাদের অধিকাংশ বিজয় গুপ্তের রচনা হওয়াই সম্ভব, তথাপি যে পুঁথিতে অন্যান্য কবির রচনাও স্থান পাইয়াছে, তাহার মধ্যে নিশ্চিত প্রমাণের অভাবে কোন্ পদ কাহার রচিত, তাহা স্থির করিয়া বলিবার উপায় নাই। এই সম্পর্কে স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, 'বিজয় গুপ্তের ছদ্মবেশে "জয়গোপালগণ" ঐতিহাসিক মরীচিকা উৎপাদন করিতেছেন। সেই গাঢ় ভ্রম-সমুদ্র হইতে রত্ন উঠাইতে যাইয়া অনেক সময় শঙ্খ লইয়া ফিরিতে হয়। পূর্ববর্তী কাব্যগুলির ন্যায় বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণও নানা হস্তস্পর্শে নানা তুলির কর্ক্ষেপে পরিশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে।

বিপ্রদাস

বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গল রচনার এক বৎসর পরের তারিখ-যুক্ত বিপ্রদাস নামক একজন কবি রচিত বলিয়া উল্লিখিত মনসা-মঙ্গলের দুইখানি খণ্ডিত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১] পুঁথির অক্ষর দেখিয়া দুইখানি পুঁথিই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।[২] ইহাদের মধ্যে যে পুঁথিখানি বৃহত্তর তাহার মধ্যে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য-যাত্রা পর্যন্ত ঘটনা মাত্র বর্ণিত আছে। মনসা-মঙ্গলের মূল কাহিনী অর্থাৎ বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী ইহাদের কোনটির মধ্যেই নাই।[৩] দুইখানি পুঁথির একখানি চব্বিশ পরগণা জিলার জাগুলিয়া গ্রামে ও অপরখানি 'দত্তপুখরিয়া' গ্রামে অনুলিখিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করা আছে।[৪] কবি এই প্রকার আত্মপরিচয় দিয়াছেন,—

মুকুন্দ পণ্ডিত সুত বিপ্রদাস নাম।
চিরকাল বসতি বাদুড়্যা[৫] বটগ্রাম।।
বাৎস্যগোত্র পিপিলাই পঞ্চপ্রবর।
সামবেদ কৌথুম শাখা চারি সহোদর।।[৬]

এই 'বাদুড়্যা বটগ্রাম' কিংবা 'নদুড়্যা বটগ্রাম' কোথায়, তাহা জানিতে পারা যায় না। তবে ২৪ পরগণা জিলায় বাদুড়িয়া নামে গ্রাম এবং নাদুড়্যা বা নাদুরিয়া বলিয়া গ্রাম আছে। নদীয়া জেলায়ও নাদুড়্যা বা নাদুরিয়া বলিয়া গ্রাম আছে।[৭] তবে ইহাদের মধ্যে কোনও গ্রামের নামই বাদুড়িয়া বটগ্রাম বা নাদুড়্যা বটগ্রাম নহে। কাব্য-রচনার কাল-সম্পর্কে কবি উল্লেখ করিয়াছেন,

শুক্লা দশমী তিথি বৈশাখ মাসে।
শিয়রে বসিয়া পদ্মা কৈলা উপদেশে।।
পাঁচালী রচিতে পদ্মা করিলা আদেশ।
সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ।।
কবিগুরু ধীরজনে করি পরিহার।
রচিল পদ্মার গীত শাস্ত্র অনুসার।।

১। গ-স. ৩৫২৯, ৩৫৩০ ; ২। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *D. C. V. M. IX*, ৩৩৮-৩৩৯ ; ৩। অতি সাম্প্রতিক কালে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী প্রাচীন পুঁথিশালা কর্তৃক ইহার একখানি সম্পূর্ণ পুঁথি (পুঁথি সংখ্যা ১৮৯৩) সংগৃহীত হইয়া কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। (*Vipradasa's Manasa-Vijaya*, edited by Sukumar Sen, Calcutta, 1953) ইহার ভাষা ও ভঙ্গি উক্ত খণ্ডিত পুঁথি দুইখানি হইতে আরও আধুনিক। অতএব ইহাও প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন।

৪। ৩৫২৯, ২৯ (ক), ৩৫৩০, ১৩৮ (খ) ; ৫। পাঠান্তর নদুড়্যা ; ৬। ৩৫৩০ ৩ (ক) ; ৭। যতীন্দ্রমোহন দত্ত, 'বিপ্রদাস কি প্রাচীন কবি?' কথাসাহিত্য, ১৩৭১, পৃ. ১৩৯১ ;

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন শা গৌড়ের সুলতান।।[১]
হেনকালে রচিল পদ্মার ব্রতগীত।
শুনিয়া ত্রিবিধ লোক পরম পীরিত।।[২]

এই উক্তি অনুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৈশাখ মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া ১৪১৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন হুসেন শাহ গৌড়ের সুলতান, তখন কবি পদ্মার এই ব্রতগীত রচনা করেন। বৈশাখ মাসের শুক্লা দশমী তিথি কোনও নাগপূজার তিথি নহে। তবে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে দশহরা উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে মনসা পূজার অনুষ্ঠান হয়। দশহরার পর হইতে আশ্বিন পর্যন্ত, বর্ষার এই চারিমাস বাংলাদেশে নাগ পূজার কাল, এই সময়েই বিভিন্ন তিথিতে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অষ্টনাগ ও মনসার পূজা হইয়া থাকে। শ্রাবণ মাসে নাগ-পঞ্চমী তিথিতে বিজয় গুপ্ত মনসার স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়াছিলেন ; অতএব বৈশাখ মাসের শুক্লা দশমীতে মনসার আবির্ভাবের তাৎপর্য সহজে বোধগম্য নহে। সুতরাং মনে হয়, ইহার শুদ্ধ পাঠ 'জ্যৈষ্ঠ মাসে' হইবে।

কবি তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভে তাঁহার বর্ণিতব্য বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্তসার দিয়াছেন, তাহার শেষে উল্লেখ করিয়াছেন,

সংক্ষেপে পদ্মার ব্রত কহিল মঙ্গলগীত
বিস্তারে কহিব সপ্তনিশি।[৩]

ইহাতে মনে হয়, সাতটি পালায় তিনি তাঁহার গীত সম্পূর্ণ করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত বৃহত্তম পুঁথিখানিতে নয়টি পালা পর্যন্ত রচিত হইয়াছে এবং যেখানে নবম পালা শেষ হইয়াছে, সেখানে পুঁথিও খণ্ডিত হইয়াছে।[৪] তাহাতেও চাঁদের বাণিজ্য-যাত্রা পর্যন্ত মাত্র কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমত কোন মঙ্গলকাব্যই সাত পালায় রচিত হইতে দেখা যায় না। ন্যূনতম আট পালায় চণ্ডীমঙ্গল রচিত হইয়া থাকে ; তথাপি কোনও কোনও অঞ্চলে সাত পালায় মনসা-মঙ্গল রচিত হইত স্বীকার করিয়া লইলেও, কবি গ্রন্থারম্ভে সাত পালায় কাহিনী রচনা করিবেন, এ কথা বলা সত্ত্বেও, তাঁহারই নামে প্রচলিত পুঁথিতে নয় পালা পর্যন্ত কাহিনী রচিত হইয়াও কাহিনী অসম্পূর্ণ কেন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না।

অতএব এই সকল উক্তির কোনও কোনটি যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা অনুমান করা ভুল হইবে না। কিন্তু ইহাদের কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত এবং কোন্ অংশ মৌলিক বিস্তৃততর তথ্যের অভাবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলিবার উপায় নাই। চাঁদের বাণিজ্য-যাত্রা সম্পর্কে কয়েকটি প্রাচীন গ্রামের নামের সঙ্গে কুমারহাট, হুগলী, ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, মূলাজোড়া, পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, ইছাপুর, খড়দহ শ্রীপাট, খড়দহ, রিষড়া, কোন্নগর, কোতরং, কামারহাটি, এঁড়েদহ, ঘুষুড়ি, চিৎপুর, কলিকাতা, বেতড় ইত্যাদি নিতান্ত আধুনিক স্থানের নামোল্লেখ রহিয়াছে।[৫] ইহা

১। উভয় পুঁথিতেই ভ্রান্ত পাঠ 'সুলক্ষণ' ; ২। ৩৫৩০, ৩ (ক)।
৩। ৩৫২৯, ৪ (ক), ৩৫৩০, ৩ (খ) , ৪। ৩৫৩০, ১৩৮ (খ) ; ৫। ঐ ১৩৩ (ক)।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ববর্তী হওয়া অসম্ভব।

পুঁথি দুইখানির ভাষা আদ্যোপ্রান্ত নিতান্ত আধুনিক। ইহাদের উত্তম পুরুষে 'বাহিনু' (লুঁ নহে), 'ডাকিনু', 'কহিনু', 'দিনু', 'দিলাম', ইত্যাদি আধুনিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার পাওয়া যায় ; এতদ্ব্যতীত বহু আধুনিক শব্দ ও আধুনিক শব্দশৈলীর সহিতও সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। পুঁথির কোনও অংশেই ভাষার প্রাচীনত্বের কোনও লক্ষণই অনুভব করা যায় না। পুঁথি দুইখানির আদ্যোপ্রান্ত ভাষাগত কোন অনৈক্য নাই ; অতএব ইহার কোনও অংশ প্রাচীন এবং কোনও অংশ আধুনিক কালে প্রক্ষিপ্ত, তাহা বলা যাইতে পারে না। বহুল প্রচারের জন্য সাধারণত প্রাচীন ভাষা আধুনিকতায় রূপান্তরিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিপ্রদাসের কাব্য ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায় না। কারণ, প্রায় একই অঞ্চলে তাঁহার এই দুইখানি অসম্পূর্ণ পুঁথি ব্যতীত আর কোথাও তাঁহার প্রামাণ্য রচনার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন কোনও মনসা-মঙ্গলের পদ-সঙ্কলনেও বিপ্রদাসের কোনও পদ ধৃত হয় নাই। যে অঞ্চলে এই পুঁথি দুইখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই অঞ্চলে মনসা-মঙ্গল কাব্যের বিশেষ কোনও প্রচলন ছিল বলিয়া আর কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই সকল কারণে তাঁহার ভাষা আধুনিকতা-প্রাপ্ত হওয়ার কোনও সঙ্গত কারণ ছিল না। অতএব বর্তমান কাব্যখানি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। মনসা-মঙ্গল কাহিনীর মূল ধারাটিও যে ইহাতে অনুসরণ করা হয় নাই, তাহা এই খণ্ডিত পুঁথি দুইখানি হইতেও বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও নাথ সাহিত্যের কথাও আছে এবং তাহাদের দ্বারা ইহার কাহিনী বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাদের সকলই অপেক্ষাকৃত আধুনিকতার লক্ষণ। যে পুঁথিতে পরবর্তী হস্তক্ষেপ এত সুস্পষ্ট, তাহার রচনা-কালজ্ঞাপক পদ দুইটির উক্তিও পুঁথির অন্য কোন তথ্য দ্বারা সমর্থিত না হইলে প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না ; অথচ উক্ত পদ দুইটি সমর্থিত হয়, এই পুঁথি দুইখানির মধ্যে এমন কি অন্যত্রও এমন আর কোনও তথ্য পাওয়া যায় না।

অতএব এই খণ্ডিত পুঁথি দুইখানির উপর নির্ভর করিয়া কবি-সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তেই আসিয়া পৌঁছান যায় না ; বিশেষত যে পুঁথিতে মনসা-মঙ্গলের মূল কাহিনী অর্থাৎ বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীর সঙ্গেই সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না, আমাদের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহার মূল্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

কেহ কেহ নদীয়া সম্পর্কে চৈতন্যদেবের অনুল্লেখকে বিপ্রদাসের প্রাচীনত্বের লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। চৈতন্যভাগবত হইতে দেখা যায় যে চৈতন্যধর্মের পূর্ব হইতেই নবদ্বীপ প্রসিদ্ধ স্থান রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সুতরাং চৈতন্যের উল্লেখ না করিলেও নবদ্বীপের উল্লেখ করা বিপ্রদাসের পক্ষে অপরিহার্য ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে নবদ্বীপের প্রাধান্য হ্রাস পায়, ইহার পূর্ব হইতেই সাহিত্যে নবদ্বীপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, অষ্টাদশ শতাব্দীতেই শান্তিপুর কৃষ্ণনগর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ; সুতরাং সেই যুগের রচনায় চৈতন্যের

উল্লেখ না থাকাই স্বাভাবিক।

গঙ্গাদাস সেন

ষষ্ঠীবর সেনের পুত্র গঙ্গাদাস সেন ষোড়শ শতাব্দীতে মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা করেন।[১] গঙ্গাদাস সেন ১৪৭৫ শকাব্দ বা ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মহাভারতের অন্তর্গত 'অশ্বমেধপর্ব'-এর বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই জানিতে পারা যায় ; যথা,—

সড় মোনি বেদ সসি সকল পালিত (?)
যেই মতে অশ্বমেধ রচিল কবিত্ব।।
কুলপতি সেন সুত কবি ষষ্ঠীবর।
সর্বলোকে জানে তান দিনিদীপে ঘর।।
তাহান তনয়ে শিশু করি পরিহার।
ছিদ্র পাইলে সমে দোষ ক্ষেমিবা আমার।।[২]

ইহার প্রথম পদটি অনুলিপিকার কর্তৃক বিকৃত হইয়াছে। ইহাতে যে গঙ্গাদাসের অশ্বমেধপর্ব রচনার কাল নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত। পদটি শুদ্ধ করিয়া লিখিলে এই প্রকার হইবে,—

শর মুনি বেদ শশী শক গণিত।

তাহা হইতেই গঙ্গাদাসের অশ্বমেধপর্ব রচনার কাল ১৪৭৫ শকাব্দ (শশী ১, বেদ ৪, মুনি ৭, শর ৫) বা ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। তিনি ইহার পূর্বে কিংবা পরে মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় না। তাঁহার মনসা-মঙ্গল কাব্য আংশিক মাত্র পাওয়া গিয়াছে, সমগ্র পাওয়া যায় নাই।

'অশ্বমেবপর্বে'র অনুবাদে গঙ্গাদাস যে কুলপরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই,—

পিতামহ নৃপতি (কুলপতি?) পিতা ষষ্ঠীবর।
যাহার কীর্তি ঘোষে দেশ দেশান্তর।।
জ্যেষ্ঠ ভাই সত্যবান্ নানা বুদ্ধিবন্ত।
নানা শাস্ত্র বিশারদ গুণে নাই অন্ত।।
গঙ্গাদাস সেন কহে অনুজ তাহার।
অশ্বমেধ পুণ্য কথা রচিল পয়ার।।[৩]

দিনিদীপ গ্রাম ঢাকা জিলার মহেশ্বরদি পরগণার অন্তর্গত বর্তমান জিনারদি। গঙ্গাদাস বণিক্য-তনয় বলিয়াও এক স্থানে নিজের পরিচয় দিয়াছেন। জিনারদি গ্রামে সেন পদবীবিশিষ্ট বণিক্য জাতির আজও বাস আছে। অশ্বমেধপর্বের অনুবাদ রচনায় গঙ্গাদাস যে পাণ্ডিত্য

১। ব.সা-প ১, ২৫৮ ; ২। ঢা, ৪৪৩৬, ২ (ক)।
৩। সা-প-প ১০, ১৩৪।

দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার মনসা-মঙ্গল রচনাতেও কতক অনুভব করিতে পারা যায়। দ্বিজ রামকৃষ্ণ নামক কোনও ব্যক্তি গঙ্গাদাসের কোনও কোনও পদের মধ্যে নিজের ভণিতাও সংযোগ করিয়া দিয়াছেন।[১]

দ্বিজ বংশীদাস

মনসা-মঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি দ্বিজ বংশীদাস[২] ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তঃপাতী পাতুয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পাতুয়ারী গ্রাম নারায়ণ দেবের জন্মস্থান বোরগ্রাম হইতে তিন ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত ও বাংলাদেশ রেলপথের নীলগঞ্জ স্টেশনের আধ মাইলের মধ্যবর্তী। বংশীদাসের কাল সম্বন্ধে যতদূর আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে জানিতে পারা যায় যে, ইনি নারায়ণ দেব এবং বিজয় গুপ্ত প্রভৃতির পরবর্তী। এই পর্যন্ত যে সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই কবির কাল-নিরূপণের চেষ্টা হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

বংশীদাসের মুদ্রিত পুঁথিতে নিম্নলিখিত পদ দুইটি পাওয়া যায়,—

জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার।
শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার।।

ইহা হইতে দেখা যায় যে, ১৪৯৭ শক (ভুবন ১৪, দ্বারা ৯, জলধি ৭) অর্থাৎ ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বংশীদাস তাঁহার 'পদ্মাপুরাণ' বা মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

বংশীদাসের মনসা-মঙ্গলে নিম্নোদ্ধৃত পদ দুইটিও দৃষ্টিগোচর হয়—

রাঢ় হৈতে আসিলেন লৌহিত্যের পাশ।
হাজরাদি পাতুয়ারী গ্রামেতে নিবাস।।

হাজরাদি ময়মনসিংহ জিলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমার পূর্বাঞ্চলের একটি পরগণার নাম। পাতুয়ারী গ্রাম এই হাজরাদি পরগণারই অন্তর্গত। কিন্তু এই বিষয় যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে মনে হয়, ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হাজরাদি পরগণার সৃষ্টি হয় নাই। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের রাজস্বসচিব টোডরমল্ল যখন এতদ্দেশের ভূমি এবং রাজস্ব সংক্রান্ত বন্দোবস্ত করেন, তখন তিনি বর্তমান ময়মনসিংহ জিলা সরকার বাজুহার নামে ৩২টি মহাল বা পরগণায় বিভক্ত করেন। 'আইন-ই-আকবরি'তে এই ৩২টি মহালের নামোল্লেখ আছে; কিন্তু তাহাতে হাজরাদি পরগণার নাম নাই। 'টোডরমল্লের বন্দোবস্ত সময়ে হাজরাদি সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল না। তৎকালে এই অঞ্চলে লক্ষ্মণ হাজরা নামক এক কোচ রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। ঈশা খাঁ এতদ্দেশে উপস্থিত হইলে লক্ষ্মণ হাজরা পলায়ন করেন। লক্ষ্মণ হাজরার নামানুসারে ঈশা খাঁ এই প্রদেশকে হাজরাদি নামে পরিচিত করেন।[৩] ঈশা

১। ১-সা প ১, ১৫; ২। বংশীদাস, পদ্মাপুরাণ, দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ও রামনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৩১৮)।

৩। কেদারনাথ মজুমদার ৩১

খাঁ ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দের পর ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে লক্ষণ হাজরাকে পরাজিত করেন। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করিয়া ঈশা খাঁকে পরাজিত করেন। অতঃপর ঈশা খাঁ মানসিংহের সঙ্গে দিল্লী গিয়া তথা হইতে যে বাইশ পরগণার আধিপত্য লইয়া জঙ্গলবারী প্রত্যাবর্তন করেন, হাজরাদি পরগণা তাহাদের অন্যতম বলিয়া উল্লিখিত হয়। সরকারী দলিলপত্রে ইহাই হাজরাদি পরগণার সর্বপ্রথম উল্লেখ। অতএব দ্বিজ বংশী যদি ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মনসা-মঙ্গল রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে হাজরাদি পরগণার নামোল্লেখ করা অসম্ভব। সুতরাং উপরি-উদ্ধৃত পদ দুইটির একটি কিংবা দুইটিই প্রক্ষিপ্ত, এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

বংশীদাসের কাব্য-মধ্যে মঘ-ফিরিঙ্গিদের উল্লেখ আছে,—

মঘ ফিরিঙ্গি যত, বন্দুক পলিতা হাত
একেবারে দশ গুলি ছোটে।
সিলই হাওই দবা, স্থানে স্থানে করে শোভা
গণ্ডগোল কালঞ্জিয়া ঠাটে।

ফিরিঙ্গি বলিতে পর্তুগীজদিগকেই মনে করা হইয়াছে ; কারণ, মধ্যযুগের শেষে বিধ্বস্ত পর্তুগীজগণই বাংলার পল্লী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়া এই বৃত্তিদ্বারা জীবিকা অর্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম পর্তুগীজ জাহাজ ভারতের পশ্চিম উপকূল কালিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। বাংলাদেশের মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পর্তুগীজগণ বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে সবে মাত্র এই দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দেশের আভ্যন্তরিক সমাজের সঙ্গে এত ব্যাপকভাবে তাহাদের সংমিশ্রণ তখনও সম্ভব হইয়া উঠে নাই। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আওরঙ্গজেব পর্তুগীজদিগের বাণিজ্য কুঠিগুলি ভাঙ্গিয়া দিলে পর তাহারা অনন্যোপায় হইয়া জলদস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে। এই উদ্দেশ্যেই তাহারা আরাকানের মঘদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া নিম্নবঙ্গে যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে থাকে। এই সময়ে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুঘল সৈন্যের নিকট পরাজিত হইয়া এই পর্তুগীজ ও মঘ দস্যুদল একেবারে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া যায় এবং পূর্ব ও নিম্ন বঙ্গের সর্বত্র গুলিবারুদের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে আরম্ভ করে। এখনও পূর্ববঙ্গের অনেক স্থলেই বারুদের ব্যবসায়ী এই ফিরিঙ্গিদিগের বহু বংশধর তাহাদের জাতিগত ব্যবসায় পালন করিতেছে।' অতএব উপরি-উদ্ধৃত পদ যদি দ্বিজ বংশীর রচনা হয়, তবে তিনি কখনও খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী লোক হইতে পারেন না।

'বংশীদাসের বংশ বর্তমান সময়ে সপ্তম পুরুষে অবতীর্ণ হইয়াছে' বলিয়া কেহ উল্লেখ করিয়াছেন।[১] সুতরাং 'তিনি ১৭৫ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন' বলিয়া অনুমিত

১। কেদারনাথ মজুমদার ৭২

হইয়াছে। এই বিষয়ে আরও জানিতে পারা যায় যে, 'বংশীদাস নামক তালুক এখনও পাতুয়াইরের রায়দের দখলে আছে।'[1] কিন্তু এই জন্যই যে 'বংশীদাস লর্ড কর্ণওয়ালিসের সমসাময়িক ছিলেন' তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, বংশের গৌরবান্বিত কোন পূর্বপুরুষের নামে যেমন তালুকের নামকরণ অসম্ভব নহে, তেমনই এই তালুকোক্ত বংশীদাস স্বতন্ত্র কোন ব্যক্তি হওয়াও কিছুই আশ্চর্য নহে।

অতএব এই কবির কাব্য-রচনার সময়-জ্ঞাপক প্রথম-উদ্ধৃত পদদ্বয়কে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। বিশেষত বিজয় গুপ্তের কাল-নির্দেশক পদ দুইটি যেমন একাধিক প্রাচীন পুঁথি হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, বংশীদাসের পদ দুইটি তাহা হয় নাই। মুদ্রিত পুঁথি ভিন্ন ইহা অদ্যাপি অন্য কোথা হইতেও আবিষ্কৃত হয় নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালায় বংশীদাসের একাধিক সম্পূর্ণ পুঁথি সংগৃহীত আছে ; তাহাদের একখানির মধ্যেও এই পদ দুইটি পাওয়া যায় না। পূর্ব ময়মনসিংহের পল্লীগীতিকার সংগ্রাহক স্বর্গত চন্দ্রকুমার দে মহাশয় লিখিয়াছেন, 'এই শ্লোক ধরিয়া হিসাব করিলে দেখা যায়, বংশীদাস ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মাপুরাণ রচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহারও পূর্বের হস্তলিখিত পদ্মাপুরাণ আমাদের কাছে আছে। কিন্তু তাহার পাতা উল্টাইতে গেলে ভয় হয়। এরূপ কোনও পুস্তকে এই শ্লোকটি দৃষ্টিগোচর হয় না।'[2] এই কারণে অনেকেই এই পদদ্বয়ের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব যাঁহারা উক্ত পদদ্বয়ের উপর নির্ভর করিয়া দ্বিজ বংশীকে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী লোক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মত নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না। পারিপার্শ্বিক সমস্ত ঘটনা বিবেচনা করিয়া দ্বিজ বংশীকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থাপন করাই সমীচীন বোধ হয়। দ্বিজ বংশীর ভাষা ও স্থানীয় জনশ্রুতি এই সময়েরই অনুকূল।

দ্বিজ বংশী তাঁহার কাব্যমধ্যে এই প্রকার আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন,—

> কন্দ্যঘটি গাঁই গোত্র রাঢ়ীর প্রধান।
> শাণ্ডিল্য গোত্র বলি যাহার বাখান।।
> গৌতম মুনির শাখা তৃতীয় প্রবর।
> দাস উদ্ধব ধারা সামবেদ পর।।
> বংশে বীজ পূর্বে গোঁসাই চক্রপাণি।
> ভূত ভবিষ্যৎ আদি ত্রিকাল যে জ্ঞানী।।

কবি দ্বিজ বংশীদাস বাংলার সুপরিচিত মহিলা-কৃত্তিবাস চন্দ্রাবতীর পিতা। বিদুষী কন্যা তাঁহার রচিত রামায়ণের অনুবাদে পিতার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

> ধারা স্রোত ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়।
> বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়।।

১। ব-সা-প-প, ১১৯, ১৪৮।

২। চন্দ্রকুমার দে, 'ময়মনসিংহের কবিকথা', আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ই চৈত্র, রবিবার ১৩৪৫, ১৪

ভট্টাচার্য বংশে জন্ম অঞ্জনা ঘরণী।
বাঁশের পালার ঘর ছনের ছাউনী।।
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছাড়ি যায়।।
দ্বিজ বংশী পুত্র হৈলা মনসার বরে।
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে।[১]

পাতুয়ারী গ্রামে দ্বিজ বংশীর বংশধারা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পূজিত শিবের মন্দির এখনও সেই গ্রামে বর্তমান আছে। দ্বিজ বংশী বংশীধর, বংশীবদন, বংশীদাস এই প্রকার বিভিন্ন ভণিতার ব্যবহার করিয়াছেন,—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মনসা-মঙ্গল রচয়িতা ইঁহারা একই ব্যক্তি।

দ্বিজ বংশীর সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। চন্দ্রাবতী লিখিয়াছেন,—

ঘরে নাই ধান চাল, চালে নাই ছানি।
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি।।

জীবিতকালেই দ্বিজ বংশীর কবিত্ব-খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার কারণ, তিনি কাব্যরচনার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই তাহা সর্বত্র গাহিয়া বেড়াইতেন। চৈতন্যের ধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার পর সঙ্কীর্তন করিয়া নাম-প্রচারের রীতি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল ; দ্বিজ বংশীদাসও সঙ্কীর্তনের দল বাঁধিয়া স্বরচিত ভাসান গান সর্বত্র গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ; ইহাতেই তাঁহার সাংসারিক অনটন কোনও মতে দূর হইত। ক্রমে শুধু কবি বলিয়া নহে, সুকণ্ঠ গায়ক বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কথিত আছে, একবার তিনি তাঁহার গানের দল লইয়া এক হাওরের (বিস্তৃত জলাভূমি) মধ্য দিয়া নৌকা করিয়া গ্রামান্তরে গান গাহিবার জন্য যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি নরহন্তা দস্যু কেনারামের হাতে পড়িলেন। কেনারাম তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। বৃদ্ধ কবি জন্মের শেষ, একবার ভাসান গাহিয়া লইবার অনুরোধ জানাইলেন, কেনারাম তাহাতে সম্মত হইল। ভক্ত কবির কণ্ঠে বেহুলার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া নরহন্তা দস্যুর হৃদয়ও বিগলিত হইল। সে হাতের খড়্গ ফেলিয়া দিয়া বৃদ্ধ কবির পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। কেনারাম দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিল।

দ্বিজ বংশীর মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। তাঁহার চাঁদ সদাগরের ইষ্টদেবতা শিব নহেন, বরং চণ্ডী—শিবের পত্নী। সপত্নী-কন্যা মনসার সঙ্গে চণ্ডীর বিবাদ। চৈতন্য-পরবর্তী যুগে মঙ্গলকাব্যগুলির সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক (sectarian) আবেদন লুপ্ত হইয়া গিয়া তাহার স্থলে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের উদার আদর্শ স্থান লাভ করিয়াছিল। দ্বিজ বংশীদাসের মনসা-মঙ্গল এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার যুগেই রচিত হয়। অতএব তাঁহার কাহিনীতে শুনিতে পাওয়া যায় যে, চাঁদ সদাগর চণ্ডীর ভক্ত হইলেও অন্য দেবতার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ

১। চন্দ্রকুমার দে, 'মহিলা কবি চন্দ্রাবতী' সৌরভ (ময়মনসিংহ) ২,১৪৮

নহেন—তিনি যখন সনকাকে প্রথম মনসা-পূজা করিতে দেখিলেন, তখন ক্রুদ্ধ হইলেন না ; বরং চণ্ডী ও মনসা যে অভিন্না এই বলিয়া স্তব করিলেন। কিন্তু রাত্রিকালে চণ্ডী স্বপ্নে আবির্ভূতা হইয়া সপত্নী-কন্যা মনসার বিরুদ্ধে তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। ইহাতে শৈব চাঁদ সদাগরের লৌকিক দেবতার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিবার কথা নাই, বরং তাহার পরিবর্তে চণ্ডী-মনসার পারিবারিক কলহের নিতান্ত মানবিক পরিচয়ের কথাই আছে। উভয়ের বিবাদের মধ্যে পড়িয়া চাঁদ সদাগরের লাঞ্ছনার একশেষ হইল। অবশেষে শিব মধ্যস্থ হইয়া উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া দিলেন।

চাঁদ সদাগরের এই চরিত্র পরিকল্পনা মঙ্গলকাব্যের মূল আদর্শের বিরোধী। কারণ, প্রাচীন মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে স্ত্রীদেবতার পূজার বিরুদ্ধেই কাব্যোক্ত নায়কের অভিযান দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বংশীদাসের কাহিনীতে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হইয়াছে। ইহা দ্বিজ বংশীর অপেক্ষাকৃত আধুনিকত্বেরই নির্ভরযোগ্য প্রমাণ।

দ্বিজ বংশী একাধারে কবি ও সাধক। এই কাব্যের ভিতর দিয়াই তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার পিপাসাও চরিতার্থ করিয়াছিলেন। এই হিসাবে বাংলার আর একজন পরবর্তী কবির সঙ্গে তাঁহার তুলনা হয়, তিনি রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত যেমন বাঙ্গালীর প্রাণের জিনিস, তেমনই দ্বিজ বংশীর গানও পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রিয়তম সঙ্গীত। এই সম্পর্কে ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ গীতিকাব্য-সংগ্রাহক স্বর্গত চন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের নিজের উক্তি কতক উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। তিনি লিখিয়াছেন, 'কবি দ্বিজ বংশী ছিলেন পূর্ব ময়মনসিংহের প্রাণের কবি। প্রায় তিনশত বৎসর অতীত হইতে চলিয়াছে, আজও ময়মনসিংহবাসী তাহাদের প্রাণের কবিকে ভুলে নাই। ঘরে বাহিরে, মনের মধ্যে, আজও তাঁহাকে দেবতার পাশে ঠাঁই দিয়া রাখিয়াছে। বিবাহে, উপনয়নে, অন্যান্য উৎসবে আজও দ্বিজ বংশীর গান তাহাদের ক্রিয়া অনুষ্ঠানাদির একটি প্রধান অঙ্গ। মেয়ের বিবাহে সোহাগ সাধিতে, তৈল রাঁধিতে, পাড়ার মেয়েরা আজও বংশীদাসের গান গাহিয়া থাকে। অধিবাসকালে বরকন্যাকে হলুদজলে নাইয়া তোলার যে রীতি ও অন্যান্য যে স্ত্রী-আচার আছে, তাহাতে তাঁহারা বংশীদাসেরই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। মা'র নিকট হইতে মেয়ে সেই গান, আচার অনুষ্ঠান ক্রমেই শিক্ষালাভ করিয়া চলিয়াছে। পল্লীতে পল্লীতে আজও বংশীদাসের নামে উলুধ্বনি পড়ে। আজ কোন দুর্বার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যদি বংশীদাসের সেই সুবৃহৎ পদ্মাপুরাণ সকল সমূলে নষ্ট হইয়া যায়, তবু কালের কবল হইতে একটি অক্ষরও মুছিবে না। এদেশে এমন গায়ক আজও জীবিত আছেন, যাঁহারা এই দেড় হাজার পৃষ্ঠার অতিকায় পুঁথিখানা আগাগোড়াই একদম কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন।'[১]

বংশীদাসের এই ব্যাপক লোক-প্রিয়তার কারণ, তাঁহার অনুভূতির আন্তরিকতা ও ভাষার প্রত্যক্ষতা। সহজ নিরলঙ্কার ভাষায় ব্যক্ত মনের গভীর ভাবটি পাঠকের মর্মতল স্পর্শ করে।

১। চন্দ্রকুমার দে 'ময়মনসিংহের কবিকথা', ঐ।

ভক্ত সাধকের দৃষ্টির সঙ্গে সহজ কবিত্বের শুচিদৃষ্টি মিলিত হইয়া তাঁহার কাব্যে মণিকাঞ্চন যোগ সৃষ্টি করিয়াছে। মনসা-মঙ্গল কাব্য যে করুণ রসের আকর, অন্তরের সহজ ভাবানুভূতি হইতে বংশীদাস তাঁহার কাব্যে তাহা উৎসারিত করিয়াছেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও কৃত্রিমতা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই ভাবানুভূতির অকৃত্রিমতাই দ্বিজ বংশীকে ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর কাছে এত জনপ্রিয় করিয়া রাখিয়াছে।

চরিত্রসৃষ্টিতে বংশীদাস এই গতানুগতিক কাহিনীভাগের মধ্যেও কোন কোন স্থলে অভিনবত্ব দেখাইয়াছেন। সমগ্র মনসা-মঙ্গল কাব্যের মধ্যে তাঁহার চাঁদ সদাগরের চরিত্রসৃষ্টি অভিনব। চাঁদের চরিত্রের কঠোরতা তিনি বিন্দুমাত্রও হ্রাস হইতে দেন নাই। দুর্বার নিয়তির বিরুদ্ধে নিঃসঙ্গ সংগ্রাম করিয়াও যিনি নিজের আদর্শকে অটল রাখিয়াছিলেন, দৈবশক্তি যাঁহার পৌরুষের নিকট বারংবার সমুচ্চ মস্তক নত করিয়াছে, সেই চাঁদ সদাগরের চরিত্র সকল বাঙ্গালী কবির কল্পনাতেই যে সমান মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছে—তাহা নহে, কিন্তু দ্বিজ বংশীদাস চাঁদ সদাগরের এই দৃপ্ত পৌরুষকে আরও শতগুণ উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন। বেহুলার দুঃখের চিত্র বর্ণনায় তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ কবিহৃদয়ের যে পরিচয়টুকু লাভ করা যায়, তাহাই চাঁদ সদাগরের চরিত্রের দৃঢ়তা বর্ণনা করিতে আবার সময়োচিত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মার চক্রান্তে চাঁদ সদাগরের ছয় পুত্র সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিল। পুত্রশোকাতুরা সনকার মাতৃহৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। কিন্তু চাঁদ অটল রহিলেন, মৃত পুত্রদিগের দেহ শীঘ্র জলে ভাসাইয়া দিবার আদেশ দিয়া কহিলেন, 'কাণীর উচ্ছিষ্ট পুত্র শীঘ্র কর পার'। পদ্মার আক্রোশ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল।

চৌদ্দ ডিঙ্গি ডুবি হইবার পর ভাগ্যবিপর্যস্ত সর্বহারা চাঁদ যখন একাকী দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার অনুচরদিগের পরিবারবর্গ নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের নিধন-সংবাদ শুনিয়া বিলাপ করিতে লাগিল,—

বিলাপ করয়ে লোকে স্বামীর মরণ শোকে
ফেলায়ে কেহ শঙ্খ সিন্দুর।।
বাড়ী বাড়ী উঠে রোল রাজ্যময় গণ্ডগোল
এক ধাইতে সহস্রেক ধায়।
চান্দর চরণে পড়ি যায় লোকে গড়াগড়ি
স্ত্রী পুরুষে ধূলায় লুটায়।।
চান্দ বলে প্রজাগণ কেন কান্দ অকারণ
যে করিমু শুন কহি কথা।
যত ডিঙ্গা ডুবাইছে সকলে লইব পাছে
সে কাণীর লাগ পাই যথা।।

কিন্তু এই প্রবোধবাক্যেও যখন প্রজাবর্গ সান্ত্বনা লাভ করিল না, তখন চাঁদ সদাগর দৃঢ় হইয়া উঠিলেন। কারণ, প্রজাবর্গের এই আকুল ক্রন্দনে শত্রু মনসা হাসিবে, ইহা তাহার

অসহ্য,—

যে কান্দে আমার এথা　　তাহার মুড়িব মাথা
দেশে রাখি তারে নাহি কাজ।
কাতর হইলুঁ জানি　　হাসিবেক লঘু কাণী
সেহি মোর বড় দুঃখ লাজ।।

কালিদাস

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কবি কালিদাসের মনসা-মঙ্গল রচিত হয়।[১] কালিদাস পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার কাব্যে যে সকল স্থানের নামোল্লেখ আছে, তাহা সমস্তই বর্ধমান ও বীরভূম জিলার অন্তর্গত। নিজের পরিচয়-প্রসঙ্গে কবি এই মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন,—

কহে কবি কালিদাস　　গৌড়দেশে যার বাস
বিরচিল মনসা-মঙ্গল।

গ্রন্থরচনার কাল সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন,—

গ্রহ বিধু ঋতু শশী শকের গণনা।
এই শকে এই কাব্য করিল রচনা।।

ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ১৬১৯ শকাব্দ অথবা ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা সম্পূর্ণ হয়। কবি তাঁহার কাব্য রচনা প্রসঙ্গে দুই জনের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। প্রথমত কার্তিক নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ; তাঁহার আদেশেই তিনি কাব্য-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন বলিয়া উল্লেখ করেন। দ্বিতীয়ত গোলোকনাথ। সম্ভবত গোলোকনাথ তাঁহার পূর্ববর্তী কোনও কবি। প্রত্যেক পদের শেষেই নিজের ভণিতার সঙ্গে তাঁহারও এই প্রকার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—

গোলোকনাথের পদ-পঙ্কজ স্মরণে।
মনসা-মঙ্গল কবি কালিদাস ভণে।।

কবি কালিদাসের রচনা সরল ও পাণ্ডিত্যের দুর্ভার-মুক্ত। তাঁহার ভাষায়ও লালিত্য আছে,—চরিত্র-চিত্রণ মৌলিকতাহীন হইলেও রচনার দিক দিয়া তাঁহার কাব্যখানি সুখপাঠ্য। পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থলেই ইহা বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। পতির মৃত্যুতে বেহুলার শোকের চিত্রটি অত্যন্ত করুণ,—

কান্দে বালি করিয়া বিলাপ।
ললাটে হানিয়া কর　　অঙ্গ এড়ি অনাদর

১। স.-প-প ৮, ভোলানাথ ব্রহ্মচারী, 'কবি কালিদাসের মনসা-মঙ্গল', সা-প-প ১৯, ১৩৯-৪৬

উপজিল বিষম সন্তাপ।।
পড়িয়া ভূমির তলে ভাসিল নয়ান জলে
ধৌত হৈল উজ্জ্বল কাজল।
পড়িছে আনন মাঝে যেন দেখি দ্বিজরাজে
শোভিত করয়ে কলেবর।।

কালিদাস 'শনির পাঁচালী নামক একখানি পাঁচালী রচনা করেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।[১]

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মনসা-মঙ্গলের একজন শ্রেষ্ঠ কবি।[২] তিনি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হইলেও সমগ্র বাংলাদেশেই তাঁহার পুঁথি প্রচার লাভ করিয়াছিল এবং মনসা-মঙ্গলের প্রায় প্রত্যেক পদসংগ্রহেই তাঁহার পদ ধৃত হইয়াছে। ভাগীরথীর পশ্চিমতীর-সংলগ্ন অঞ্চলে মনসা-মঙ্গলের কবি হিসাবে কেতকাদাস ভিন্ন অন্য কোনও কবির নাম প্রায় অবিদিত বলিলেও চলে। স্বর্গত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় যখন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' নামক গ্রন্থ রচনা করেন (১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ), তখন তিনি ক্ষেমানন্দ ব্যতীত আর কোন পদ্মাপুরাণের কবির নাম জানিতেন না। ইহাতেই মনে হয়, পূর্বালোচিত মনসা-মঙ্গলের কবিগণ তখনও পশ্চিমবঙ্গের বিদ্বজ্জনসমাজে কোনও পরিচয় স্থাপন করিতে পারেন নাই, ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গলই সেখানে এই বিষয়ক একমাত্র গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইত।

ক্ষেমানন্দের বিস্তৃত কুল-পরিচয় জানিতে পারা যায় না, তবে এক স্থানে তিনি কায়স্থ-সমাজের জন্য দেবীর কৃপাপ্রার্থনা করিয়াছেন দেখিয়া মনে হইতে পারে যে, তিনি নিজেও জাতিতে কায়স্থ ছিলেন,—

কেতকার বাণী রক্ষ ঠাকুরাণী
কায়স্থ যতেক আছে।

ক্ষেমানন্দ তাঁহার স্বদেশবাসী ও অগ্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর সুপ্রসিদ্ধ আত্মবিবরণীটির অনুকরণ করিয়া তাঁহার কাব্য-মধ্যেও নিজের একটি আত্মবিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইতে তাঁহার সময় ও অন্যান্য কতকগুলি ব্যক্তিগত বিবরণ সম্বন্ধে কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য জানিতে পারা যায়। তাহা বিস্তৃত ভাবে নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

শুন ভাই আদ্য কথা দেবী হৈলা বরদাতা
সহায় পূর্বক বিষহরি।

১। শিবরতন মিত্র, বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক (১৩১১). ৩৬।

২। কেতকদাস ক্ষেমানন্দ, মনসা-মঙ্গল, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪০)।

বলভদ্র মহাশয় চন্দ্রহাসের তনয়
তাঁহার তালুকে ঘর করি।।
তাঁহার রাজত্যি শেষ চলি গেলা স্বর্গদেশ
তিন পুত্রে দিয়ে অধিকার।
শ্রীযুত আস্কর্ণ্য রায় পুণ্যের অবধি তায়
রণে বনে বিজয়ী সংসার।।
তিন পুত্র অল্প বয় প্রসাদ গুরু মহাশয়
তালুকের করে লিখাপড়া।
তাহার কলম বশে প্রজা নাহি চাষ চষে
শমন নগর হইল কাঁথড়া।।
রণে পড়ে বারাখাঁ বিপাকে ছাড়িল গাঁ
যুক্তি করি জননী জনক।
দিন কতক ছাড়ি যাই তবে সে নিস্তার পাই
দেয়ানে হইল বড় ঠক্।।
শ্রীযুত আস্কর্ণ্য রায় অনুমতি দিল তায়
যুক্তি দিল পালাবার তরে।
শুনহ মণ্ডল তুমি উপদেশ বলি আমি
গ্রাম ছাড় রাত্রির ভিতরে।।
প্রসাদ তাহার পাত্র ইঙ্গিত পাইবা মাত্র
পলাইবে শঙ্কর মণ্ডল।
প্রসাদ হরিষ হয়্যা যুক্তি দিল আশ্বাসিয়া
ধান্য কিছু না দিলা সম্বল।।
নিজ গ্রাম ছাড়ি যাই জগন্নাথপুর পাই
প্রাতঃকাল নিশি অবসান।
তথায়েতে নীলাম্বর উত্তরিতে দিল ঘর
হাঁড়ি চাল সিদা গুয়া পান।।
রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই তাঁহারে ভেটিতে যাই
নাম তাঁর ভারামল্ল (খান)।
তিনি দিলেন ফুল পান আর তিনখানি গ্রাম
লিখাপড়া বসতির স্থান।।
এই মত কতক দিন আমার (অদৃষ্ট হীন)
কপালে কি লিখিল বিধাতা।

শুন পুত্র ক্ষেমানন্দ কতেক করিব দ্বন্দ্ব
খড় কাটিবারে বলে মাতা।।
তোমরা কি রাজার বেটা ঘরে নাই খড়কুটা
দেখ পুত্র পরের আশ্রম।
মনে করি সবিস্ময় বেলা আছে দণ্ডছয়
সঙ্গে লয়্যা অভিরাম ভাই।
অবসান দেখি বেলা গ্রামের উত্তরে জলা
খড় কাটিবারে তথা যাই।।
যথায় ছাওয়াল পাঁচে খোলা দিয়া জল সিচে
মৎস্য ধরে হৈয়া হরষিত।
আমার কৌতুক বড় ছাওয়ালগণ যথা জড়
সেখানে হইলাম উপনীত।।
আগে আমি কহি গিয়ে মৎস্য ধর আমা লৈয়ে
তারা বলে ইয়া নাহি হয়।
যত মৎস্য ধরেছিল সকল কাড়িয়া লৈল
অল্পবুদ্ধি মনে নাহি ভয়।।
গালাগালি দিল তারা মৎস্য ছিল হাঁড়িভরা
সকল নিলেক ক্ষেমানন্দ।
যতেক শিশুতে মেলি দেয় তারা গালাগালি
পথ আগুলিয়া করে দ্বন্দ্ব।।
মৎস্য লৈয়া অভিরাম চলিল আপন ধাম
যত শিশু গেল নিজ ঘরে।
আমি হৈলাম একেশ্বর প্রাণে না করিলাম ডর
রহিলাম খড় কাটিবারে।।
সন্ধ্যাকাল হৈল যদি খড় না মিলায় বিধি
কপালে লিখিল ইহা লাগি।
আচম্বিতে আইল ঝড় পগাড় গড়ায় খড়
সমুখে দেখিলাম মুচিমাগী।।
মুচিনীর কেশ ধরি বলেন দেবী বিসহরি
কাপড় কিনিতে আছে টাকা।
এতেক কহিয়া মোরে কপট চাতুরী করে
যত্নে একাইয়া দেই টাকা।।

চরণে পিপীড়া খায় ক্ষেমানন্দ ফির্যা চায়
সমুখে মুচিনী অদর্শন।
মুচিনীরে না দেখিয়া মনেতে বিস্ময় হয়্যা
ভাবি মনে এই কোন জন।।
বেষ্টিত ভুজঙ্গ ঠাটে আর তাহে মাঝ মাঠে
দেখি মোর মুখে উড়ে ধুলা।
পাইলাম মনস্তাপ দেখিলাম অনেক সাপ
আমারে বেড়িল কথোগুলা।।
যেরূপ দেখিলা দৃষ্টে মানা কৈল প্রকাশিতে
কহিলে না হবে তোর ভাল।
ওরে পুত্র ক্ষেমানন্দ কবিতা কর প্রবন্ধ
আমার মঙ্গল গায়্যা বোল।।
ব্রাহ্মণী চরণ আশে গাইল কেতকাদাসে
তোমা বিনে অন্য নাহি গতি।
যেই পড়ে যেই শুনে রাখিবে তারে সর্বক্ষণে
অন্তরালে হইবে সারথি।।

উদ্ধৃত কবির আত্মবিবরণীতে কাব্য-রচনা কালের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ নাই। তবে কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের ইহাতে যে উল্লেখ আছে, তাহা হইতে তাঁহার কাল সম্বন্ধে একটা অনুমান করা যায়, এই অনুমান নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমত উদ্ধৃত অংশে তিনি বারা খাঁর উল্লেখ করিয়াছেন। বারা খাঁ দক্ষিণ রাঢ়ে অবস্থিত সেলিমবাদে সরকারের শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে বারা খাঁ প্রদত্ত একটি দানপত্র পাওয়া গিয়াছে। এই সময়ের পর তিনি যুদ্ধে নিহত হন এবং তাহার পর কেতকাদাসের মনসা-মঙ্গল রচিত হয়।[১] অতএব খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার কাব্য রচিত হয় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই আত্মবিবরণীতে উল্লিখিত বিষ্ণুদাস ও ভারামল্ল ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁহারাও সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন বলিয়া প্রমাণিত হয়। কেতকদাসের এই কাব্য যে চৈতন্য ও মুকুন্দরামের পরবর্তী তাহা স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে বহুস্থলেই চৈতন্যদেবের উল্লেখ আছে এবং মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের অনুকরণে ইহার বহু চিত্র রচিত হইয়াছে।[২] অনেক স্থলেই মুকুন্দরামের ভাষার সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনিও শুনিতে পাওয়া যায়।

ক্ষেমানন্দের মতে মনসাদেবীর আর এক নাম কেতকা। তিনি লিখিয়াছেন, 'কিআ পাতে জন্ম হৈল কেতকা সুন্দরী'। অন্যান্য মনসা-মঙ্গলের কবিগণ পদ্মপত্রে মনসার জন্ম হইয়াছিল

১। দীনেশচন্দ্র সেন, ৩৯৮। ২। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ (১৫)।

বলিয়া তাঁহার নাম পদ্মা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মনসার কেয়াপাতায় জন্ম হইবার বৃত্তান্ত ক্ষেমানন্দ ব্যতীত আর কোন কবির রচনায় পাওয়া যায় না। ক্ষেমানন্দ নিজেকে কেতকাদাস অর্থাৎ মনসার দাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের কোনও কোনও স্থলে কেবল কেতকাদাস ভণিতা দেখিয়া তাঁহাকে স্বতন্ত্র লোক বলিয়া ভ্রম করিবার কোনও কারণ নাই।

ক্ষেমানন্দের কাব্যে উচ্চাঙ্গের কবিত্বের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও দুর্লভ নহে। বেহুলার দুঃখ-বেদনা বর্ণনায় তিনি সার্থক করুণ রসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার ভাষা সুপরিচ্ছন্ন ও বহুলাংশে পূর্ববর্তী যুগের গ্রাম্যতা-মুক্ত। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' ও রামায়ণ কাহিনীর প্রভাব তাঁহার উপর অত্যন্ত স্পষ্ট ; এই দুইটি উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তিনি কাব্যরচনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মধ্যে আদর্শ ও রচনাগত শৈথিল্য প্রকাশ পাইতে পারে নাই।[১]

ক্ষেমানন্দের ভণিতাযুক্ত মনসা-মঙ্গলের একখানি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র কাব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেবনাগরী অক্ষরে অনুলিখিত। লিপিকারের নিবাস পুরুলিয়ার নিকটবর্তী ডিস্‌সিহা গ্রাম। পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।[২]

এই ক্ষেমানন্দ কে? তাঁহার সঙ্গে মনসা-মঙ্গলের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কোনও সম্পর্ক আছে কি না? গ্রন্থ-সম্পাদক মনে করেন, এই কাব্যখানিই মূল ক্ষেমানন্দের। কিন্তু এই মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। এই পুঁথিখানির বহুল প্রচার ছিল না, ইহার একখানি মাত্র পুঁথি ব্যতীত দ্বিতীয় পুঁথি কিংবা পুঁথির কোনও বিচ্ছিন্ন অংশও আবিষ্কৃত হয় নাই। পুরুলিয়া অঞ্চলে আজ পর্যন্ত শ্রাবণ মাসে প্রত্যহ মনসার কাহিনী গীত হয়। বর্তমানে এই অঞ্চলের অধিবাসীগণ এই উপলক্ষে বিভিন্ন কবির ভণিতাযুক্ত কলিকাতার বটতলার ছাপা পুঁথি ব্যবহার করিয়া থাকেন। আলোচ্য ক্ষেমানন্দের পুঁথির বহুল প্রচারের কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের প্রচার খুব ব্যাপক ছিল। ইহা হইতেই মনে হয়, সম্ভবত কোনও পরবর্তী কবি ক্ষেমানন্দের নাম গ্রহণ করিয়া বর্তমান কাব্যখানি রচনা করিয়া থাকিবেন। এই ক্ষুদ্র কাব্যখানির রচনা-কাল জানিতে পারা যায় না। ইহার যে পুঁথিখানির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ১২২৪ সাল বা ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত, অতএব কবি ইহার সমসাময়িক কিংবা পূর্ববর্তী। ইহার ভাষায় আধুনিকতার যথেষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। রচনা দেখিয়া ইহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলিয়া মনে করা কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না।

বিষয়-বর্ণনায় কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের সঙ্গে এই ক্ষেমানন্দের কোনই ঐক্য নাই। ইহা

১। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ সম্পর্কিত বিস্তৃততর আলোচনা মৎসম্পাদিত 'বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৪, ২য়,১০৩) দ্রষ্টব্য।

২। বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৩১৬)।

একখানি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রচনা। ইহার আকার ক্ষুদ্র হইলেও ইহা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ইহার বিষয়-বস্তু বিচার করিয়া দেখিলেও ইহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী রচনা বলিয়া কিছুতেই মনে হইবে না। ইহার মধ্যে রামায়ণের কাহিনী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। ইহার রচনায় কোন কবিত্বের পরিচয় নাই। তবে চাঁদ সদাগরের চরিত্রগত দৃঢ়তার পরিকল্পনায় ইহার কবি পূর্ববর্তী একজন মনসা-মঙ্গলের কবির সমান দক্ষতা দেখাইতে পারিয়াছেন। ক্ষেমানন্দের চাঁদ সদাগর চরিত্রের পরিকল্পনা পূর্বালোচিত দ্বিজ বংশীদাসের চাঁদ-চরিত্রের সমুন্নত পরিকল্পনার সম্পূর্ণ অনুরূপ। দ্বিজ বংশী দ্বারা ক্ষেমানন্দ প্রভাবিত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করিতে পারা যায় না।

কাহিনীর দিক দিয়া ক্ষেমানন্দের কাব্যে কোনও কোনও স্থানে অন্যান্য মনসা-মঙ্গল হইতে সামান্য পার্থক্য আছে। কতকগুলি নামের মধ্যে নূতনত্ব পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বেহুলার মাতার নাম চুহিলা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যান্য কবির মনসা-মঙ্গলকাব্যের মত ইহাতে পৌরাণিক আখ্যানের বর্ণনা পাওয়া যায় না। ইহা কেবলমাত্র বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী-ভাগ লইয়াই রচিত। উত্তর বিহারে প্রচলিত কাহিনীর সঙ্গে ইহার বহুলাংশে ঐক্য আছে।

তন্ত্রবিভূতি

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গে তন্ত্রবিভূতি বলিয়া পরিচিত একজন মনসা-মঙ্গল কবির আবির্ভাব হয়।[১] সম্ভবত কবির নাম বিভূতি। তিনি তান্ত্রিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া তন্ত্রবিভূতি নামে পরিচয় লাভ করেন। তন্ত্রবিভূতির মনসা-মঙ্গলের নাম 'মনসা-পুরাণ' ; কিন্তু কাব্যখানি কবির নামেই অর্থাৎ তন্ত্রবিভূতি নামে উত্তর বঙ্গে পরিচিত।

কবি তান্ত্রিক ছিলেন বলিয়াই কাব্যখানির সর্বত্র তান্ত্রিক ধর্ম-বিশ্বাসের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, ভণিতায় তিনি নিজের পরিচয় দিতে গিয়া কোথাও 'দ্বিজ', কোথাও 'দ্বিজ সুত' ইত্যাদি কথা ব্যবহার করিয়াছেন। নিজের নাম উল্লেখ করিতে গিয়া 'বিভূতি', 'তন্ত্রবিভূতি', 'তন্ত্রবিভূতে' ইত্যাদি উল্লেখ করিয়াছেন। ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই তাঁহার কাব্য রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। উত্তরবঙ্গের অনেক পরবর্তী কবি, যেমন জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবন মৈত্র, ইঁহারা তন্ত্রবিভূতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন ; তাহার ফলে তাঁহাদের রচনায় তন্ত্রশাস্ত্রের বিষয়ও কিছু কিছু প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং উত্তর বাংলার জনশ্রুতিতে তন্ত্রবিভূতির একদিন ব্যাপক পরিচয় ছিল। এমন কি,

১। ডক্টর আশুতোষ দাস মালদহ জেলা হইতে তাঁহার একখানি আনুপূর্বিক পুঁথি আবিষ্কার করেন। ক্রমে তাঁহার অনুসন্ধানের ফলে আরও তিনখানি পুঁথি আবিষ্কৃত হয়। একখানি পুঁথির লিপিকাল ১৮শ শতাব্দী।

তাঁহার কাব্যকে উত্তর বাংলার মনসা-মঙ্গল কাব্যের ভিত্তি স্বরূপ বলা যাইতে পারে। কারণ, উত্তর বাংলার প্রায় সকল মনসা-মঙ্গল কাব্যের কবিই তন্ত্রবিভূতির কাব্য দ্বারা যে কেবল মাত্র প্রভাবিতই হইয়াছেন তাহাই নহে, তাহার বহু অংশ আত্মসাৎ করিয়াছেন.

'তন্ত্রবিভূতির রচনার মনোহারিত্ব আছে, তাঁহার বৈদগ্ধ্য কেবল কবির আত্ম-প্রশস্তিতে নয়, বাণী-বয়নশিল্পেও সমর্থিত। বর্ণনার কারুণ্য ও রূপবর্ণনার সামর্থ্যে মুকুন্দরামের বাণীকণ্ঠ যেন তাঁহার কাব্যে শ্রুতিগোচর হয়। কি কাহিনী বয়নে কি চরিত্র চিত্রণে তাঁহার নৈপুণ্য ছিল। কবিত্ব শক্তিতে তিনি প্রায় প্রথম শ্রেণীর মনসা-মঙ্গলের কবিদের সমগোত্রীয়। মুকুন্দরামের ন্যায় তন্ত্রবিভূতিও দুঃখ বর্ণনায় বড়।[১]

মঙ্গলকবিদের চিরাচরিত প্রথার অনুবর্তনে দেববন্দনায় তন্ত্রবিভূতির কাব্য আরম্ভ। মনসার আবাহন, ধর্মকে স্মরণ ও বন্দন, মনসার বন্দনা এবং সবাহন দেব-দেবীগণের বন্দনা ইত্যাদি অভিনবত্বে এবং কবির শব্দচয়নের সামর্থ্যে চিত্তাকর্ষক।

তেতালা সর্বেশ্বরী নমো দেবী বিষহরি
বালকের যদি কর দয়া।
নাট নাটেশ্বরী ত্রিপুরাসুন্দরী
তুয়া গতি পদে দেহ ছায়া।।

নম নম নম মাতা নম নারায়ণী।
শিবকন্যা বট মাতা বিজয়া ব্রাহ্মণী।।
প্রথমে বন্দিএ্যা গাইব ধর্ম নৈরাকার।
যাহার সৃজন হৈল জগৎ সংসার।।
* * *
নাট নাটেশ্বরী বন্দ সর্বমঙ্গলা।
নপুরের ধ্বনি যেন বাজএ রসালা।।
* * *
খানিক তেজহ মাতা অবিরত কোল।
মোর কণ্ঠে আসি করহ কল্লোল।।

চতুর্ভুজ মূর্তি সুন্দরী মনসার অষ্টনাগ সজ্জায় অষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনায় পদ্মার প্রচণ্ড মনোহর রূপ—

চতুর্ভুজ মূর্তি পদ্মা দেখিতে সুন্দর।
নানা আভরণ সর্প অঙ্গের উপর।।

১। ডাঃ আশুতোষ দাস রচিত অপ্রকাশিত ডি. লিট 'থিসিস',—উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম মনসাপুরাণ ও তন্ত্রবিভূতি।'

ই কালনাগিনী দেবীর শিরে কেশভার।
সেতিতে লাগিল দেবীর আগুন্যা চিঞর।।
সিন্দুরিয়া নাগ দেবীর সিন্দুর উজল।
পুঞাচিঞা নাগ দেবীর নঞানে কাজল।।
যুঞা নাগে দেবীর যুগল হইল ওষ্ঠ।
পাতগুা নাগ দেবীর হৈল জিহ্বা গোট।।
দশনিঞা নাগ দেবীর দশন হইল।
দন্তমধ্যে ভ্রমর যেন গুঞ্জরিতে লাগিল।।
গোয়ানি মুগুলিঞা করিঞা সাজনি।
মাথায় ধরিল ছত্র অহিরাজ ফণি।।

মঙ্গলকাব্যের সাধারণ লক্ষণ অনুরূপ স্বপ্নপ্রত্যাদেশে তন্ত্রবিভূতি তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন—

পদ্মার আদেশে গীত পাইল স্বপনে।
তন্ত্রবিভূতে গায় মনসার চরণে।।

* * *

তন্ত্রবিভূতি কবি বুধ্যে বৃহস্পতি।
সপনে পাইল গীত সেবি পদ্মাবতী।।

* * *

মনসার পাঞা বর পদ্মমুখা প্রাণেশ্বর
রচিল বিভূতি পদে গান

বিমাতার বিরূপতায় নির্বাসিতা মনসার দুঃখের বর্ণনা—

চন্দন বৃক্ষের তলে কান্দে দেবী ব্যাকুলে
কেনে পিতা গেলেন ছাড়িঞা।।
চৌদিকে গহন বন পদ্মা করে নিরীক্ষণ
দশ দিকে নাগে শূন্যকার।
ব্যাঘ্র ভল্লুক আইসে হরিণ শূকর বৈসে
তা দেখি নাগিলা কান্দিবার।।

* * *

কান্দেন বৃক্ষের তলে বসন তিতিল জলে
এত দুঃখ দিল দুর্গা মায়।

কাব্যে ক্ষীরোদ সাগরের উদ্ভব-বর্ণনা পুরাণ অনুসারী হইলেও কবির নিজস্ব শক্তির পরিচয়দীপ্ত। মালাবতী কাহিনী কবির নিজস্ব সৃষ্টি এবং উত্তরবঙ্গের মনসা-মঙ্গলে অভিনব।

জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার বিবাহে ব্রহ্মার হংস ও রাজমণি, বিষ্ণুর শঙ্খধ্বনি, শিবের রাজ্য, বাসুকির সাতলহরী হার, সাগরের অষ্ট অলঙ্কার প্রভৃতি উপহার ও বিবাহে উপঢৌকনাদি দানের বর্ণনায় সমাজ-জীবনের প্রতিবিম্বন তন্ত্রবিভূতি দেখাইয়াছেন, তাহা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিরল।

চাঁদ-মনসার বিবাদ প্রসঙ্গে চাঁদের মনসা-বিদ্বেষের বর্ণনা—

চান্দ বোলে কানী　　সহায় শূলপাণি
ডর নাহি তোর অহঙ্কারে।
প্রতিজ্ঞা শুনহ মোর　　সংসারের ভিতর
নাহি দিব পূজা করিবারে।।
ওহে সাধু অধিপতি　　তোমাকে নাগিল বিধি
কোন গুণে গন্ধেশ্বরী পূজে।
বাপার পাইয়া বর　　ধনমত্ত সদাগর
আমা সনে বাদ নাহি সাজে।।

কাব্যে চাঁদ সদাগরের সৈন্যদের সঙ্গে মনসার যুদ্ধের বর্ণনায় অতীত বাংলার শৌর্যচেতনার পরিচয় পরিস্ফুট—

রাজ্যখণ্ড আসি চান্দোর হৈল আগুসার।
দক্ষিণেতে ছত্র নঞা জোগায় ছত্রধর।।
ই জয়হাট বিজয়হাট করঞাহাট দিয়া।
সৈন্যেতে লক্ষের বাড়ী বেড়িল আসিলা।।
মার মার করি ডাকে হাজরা তেজবল।
তথাএ সাবধান হৈল ব্রাহ্মণী তোতল।।
* * *
দেবী বোলে মেঘ তাম্বুল ধর খাও।
চান্দোর কটকে যাঞা বিষ বরিষাও।।
দেবীর আজ্ঞা পায়া মেঘ অন্তরীক্ষে যায়।
ঘোর ঘোর শব্দ করি মেঘ ই গা তোলয়।।
গগনমণ্ডলে মেঘ গর্জ্জেন আসিঞা।
অহিরাজ সর্পের বিষ দিলেন ছাড়িঞা।।"

ইত্যাদি বিষ-বর্ষণের কাহিনী মঙ্গলকাব্যে অভিনব—যেন এই যুগের বিষ-বাষ্প বিচ্ছুরণ। কল্পনা ও মানবীয় সহানুভূতির সামর্থ্যে তন্ত্রবিভূতি উচ্চস্তরের কবি বলিয়া মনে হইবে।

চাঁদ সদাগরের বদল-বাণিজ্য প্রসঙ্গে নারিকেলের জন্য আকুল সিংহলরাজের উক্তি—

ছাড়িলাঙ রাজ্য আমি আর যুবতীর কাছ।
কোথা গেলে পাব আমি নারিকেল গাছ।।

এবং চাঁদের প্রত্যুক্তি—

চান্দো বলে শুন মিতা রাজা লঙ্কেশ্বর।
পর্বতের মধ্যে গাছ প্রহরী বিস্তর।।
সাতকোটি নরে রাখে উনকোটি নাগ।
ফল তুলিতে সঙ্কট বড় ঘাড়ে ধরে বাঘ।।

কবির উচ্চাঙ্গের পরিহাস-রসিকতার নিদর্শন। কবি নিজে প্রাণ ভরিয়া হাসিতে পারেন, অন্যকে হাসাইতে জানেন।

বাহু মৃণাল যেন দেখিতে সুছান্দ।
মুখপদ্ম দেখি যেন দুতিয়ার চান্দ।।
নএন কটাক্ষ যেন দেখিতে সুঠান।
নাসা দীঘল যেন গরুড় সমান।।
চাপার পাখুরি যেন কন্যার সর্ব গাও।
বিশ্বকর্মার নির্মিত যেন কন্যার হাত পাও।।

ইত্যাদি বেহুলার রূপ-বর্ণনা বেশ কবিত্বপূর্ণ।

বেহুলার বিবাহ বেশ প্রসঙ্গে—

দর্পণ ধরিয়া বালী করে দিব্য বেশ।
রচিল বিচিত্র খোঁপা আচড়িএগ কেশ।।
চাকি কড়ি মকর কুণ্ডল কর্ণমূলে।
নাসিকার বেসর পড়ে মুকুতার ফুলে।।
কপালে সিন্দুর বেড়ি চন্দনের বিন্দু।
অরুণ বেড়িয়া যেন শত শত ইন্দু।।
বিচিত্র কাঞ্চন কি উপমা দিব তার।
গলাএ প্রবাল শোভে মুকুতার হার।।

ইত্যাদি বর্ণনা কবিত্বপূর্ণ ও কবির রূপসৃষ্টির সফল প্রয়াস।

কালিনাগদষ্ট লখিন্দরের করুণ আর্তনাদ—

আইসো বেদনী মা ধরিএ তোর পা
মোর অপরাধ কর ক্ষেমা।
অঙ্গুলির ঝনঝনি মুখে না নিঃস্বরে বাণী
আর কি দেখিতে পাবে আমা।।

বেহুলার করুণা অংশে বর্ণনা—

হাহাকার ক্রন্দন করি কান্দে বেহুলা সুন্দরী
বিষ উঠে কাল কেশ বাএগ।

বেহুলা অক্ষেমা করি চান্দোকে পাড়এ গালি
মাথে হাত স্বশুরে বিষহরি।।
* * *
দুতিয়ার চন্দ্র হেন উদয় হএগ্রা অস্ত গেল
যাব আমি প্রভুর পাছুত নাগিএগ্রা।
কঙ্কণ কেয়ূর হার মিছা সব অলঙ্কার
স্বামী বিনে সব অকারণ।।

রূপসী বেহুলাকে কুলক্ষণী বলিয়া সনকার তিরস্কারের উত্তরে বেহুলার তেজোদৃপ্ত উক্তি—

বেহুলা বোলেন মাও কি করিবে রূপে।
দেবতা মনুষ্যে বাদ খাইল পদ্মার সাপে।।
তৈল ঘৃত থাকিতে প্রদীপ নিভাইল।
শ্বশুরের কারণে প্রাণনাথ হারাইল।।
এমত শুনিএ নাই বড় অসম্ভব।
মনুষ্য হইয়া করে দেব সঙ্গে বাদ।।

মনসা-মঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগরের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে বেহুলার সনকার নিকট দেবদ্রোহিতার অভিযোগ তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।

জগজ্জীবন ঘোষাল

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কবি জগজ্জীবন ঘোষাল মনসা-মঙ্গলকাব্য[১] রচনা করেন। দিনাজপুর জেলাব অন্তর্গত কোচ আমোরা বা কুড়িয়া মোড়া গ্রামে জগজ্জীবনের বাসভূমি ছিল। কবি দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথের সমসাময়িক ছিলেন। প্রাণনাথ ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হইয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।[২] তিনি কতকাল রাজত্ব করেন, তাহা জানা যায় না। কিন্তু তাঁহার পুত্র রামনাথ ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে কান্তনগরে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, ইহা রামনাথের রাজত্বকালের শেষভাগেও হইতে পারে। সেই জন্য মনে হয়, জগজ্জীবনের কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই রচিত হয়।

কবি এইভাবে তাঁহার কাব্যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন,

চৌধুরী রূপ রায় সর্বদেশে গুণ গায়
জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন।

১। ব-সা-প-প, ৩১-৩২ সাহিত্য (১৩১০), ৬৫৬-৬২
২। ব-সা-প-প ১, ২৮৬

তার পুত্র ঘনশ্যাম তার পুত্র অনুরাম
বিরচিল জগৎ জীবন।।
ঘোষাল ব্রাহ্মণ রাঢ়ী কোচ আমোরাত বাড়ী
প্রাণনাথ নরপতি দেশে।
বন্দিয়া মনসা পায় জগৎ জীবন গায়
পুরাণ সমাপ্ত তার শেষে।।

কবির মাতার নাম রেবতী। এই সম্পর্কে তিনি কোনও কোনও ভণিতায় উল্লেখ করিয়াছেন, 'জগৎ জীবন গায় রেবতী-নন্দন।'

মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনায় উত্তরবঙ্গের একটি নিজস্ব ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু উত্তরবঙ্গের কোনও কবির মনসা-মঙ্গল আনুপূর্বিক আবিষ্কৃত হইয়া প্রকাশিত না হওয়ার জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-অনুসন্ধানকারীদিগের নিকট আজ পর্যন্ত এই বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে নাই। সম্প্রতি মালদহ জেলার সিমলা দুর্গাপুর গ্রামে জগজ্জীবন ঘোষালের একখানা সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[১] পুঁথিখানি সম্পূর্ণ বলিয়াই মনে হয়, তবে লিপিকারের অসাবধানতায় কিছু কিছু অংশ বাদ পড়িয়াছে দেখা যায়। জগজ্জীবনের 'মনসা-মঙ্গল' দুই খণ্ডে বিভক্ত—দেব খণ্ড ও বণিক খণ্ড ; এই পুঁথিতে দুই খণ্ডই সম্পূর্ণ আছে। ইহার মধ্যে কাহিনীগত একটু বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাইবে।

জগজ্জীবনের পুঁথির প্রথমে ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাস নামক দুইজন গায়ক পাঁচালী গানের পূর্বে আসরে দেবতা বন্দনা করিয়াছেন। ইহারা বিখ্যাত মনসা-মঙ্গলের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ হইতে ভিন্ন বলিয়াই মনে হয়।

মূল পুঁথি এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে—

নমগো নমগো পদ্মা নমো নাগেশ্বরি।
তুমি যারে নিদারুণ মা বিধি তারে বাম।
তুমি নিতে তুমি দিতে তুমি সুখ দাতা।
মা তুমি যদি দিবে দুঃখ নিবেদিব কোথা।

সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবী জলময়—

জলময় সংসার সকল জলময়।
সজড় অজড় নাহি সংসার প্রলয়।
স্বর্গ মর্ত্য নাহি ছিল অষ্টলোকপতি।
অদুপতি প্রলয় নাহি পুরুষ প্রকৃতি।

১। পুঁথির আবিষ্কারক শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ ; তাঁহারই সম্পাদনায় জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসা-মঙ্গল' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৬০)।

দিবস রজনী নাহি রবি দিবাকর।
ইন্দ্র আদি দেবতা নাহি এ সমস্ত সাগর।
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বট পত্রের উপরে।
জল মধ্যে ভাসে দেব অনাদি ঈশ্বরে।

তাঁহার মনে সৃষ্টির বাসনা হইব—

জলের উপরে নির্ম্মিল নিরঞ্জন।
এক মন দিয়া শুন সৃষ্টির পত্তন।
অনাদি আদেশ কৈল শুন চারি ভাই।
প্রলয় ঘুচাএ্যা সৃষ্টে মন কর ভাই।

পুঁথিতে এই 'চারি ভাই' কে কে, সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই ; মনে হয়, পুঁথি নকল করিবার সময় এই অংশ বাদ পড়িয়াছে।

চারি দিকে চারি জন ভ্রমিয়া বেড়ায়।
সৃষ্টি করিতে কিছু না পায় উপায়।

*   *   *

চারি ভাই বৈসে পুন প্রলএর জলে।
ধর্ম্ম নামে পুরুষ সৃজিল সেই স্থলে।।

প্রলয়ের মধ্যে ধর্ম্মরাজ জন্মগ্রহণ করিয়া সর্বত্রই জলময় দেখিতে পাইলেন। জগৎ কিরূপে সৃষ্ট হইবে চিন্তা করিতেছেন, তখন—

অনিলে বোলেন ধর্ম্ম   করিবেক কোন কর্ম্ম
জনমিলা কেমন উপায়।
ডাকিয়া বোলেন ধর্ম্ম   অনাদি আমার জন্ম
আপনে সে পিতামাতা আমি।

*   *   *

সৃষ্টির অধিকার   করিবারে রাজ্যভার
আমি হই জগতের স্বামী।

ধর্ম্মের এই গর্বিত বাক্য শুনিয়া 'অনিল' বলিলেন, তুমি প্রথমে গুরুনিন্দা করিয়াছ, তোমাকে অভিশাপ দিলাম,—

মড়া পচা হইএ্যা তুমি ভাসিয়া যাবে নীরে।
লাগিবে পাণ্ডুর পোকা তোমার শরীরে।

এই অভিশাপ দিয়া ধর্মকে জগৎ সৃষ্টি করিতে আদেশ করিলেন—

প্রথমে সৃজিবা তুমি যত চরাচর।
স্বর্গ মর্ত্ত্য সৃজিবা দেব নর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু সৃজিবা তবে দেব শূলপাণি।

অবশেষে সৃজিবা মনসা কন্যাখানি।
মনসার রূপ দেখি হবে অচেতন।
বিভা করি মনসাকে দিবে আলিঙ্গন।
লাজ পায়া শরীর ছাড়ি ধর্মমতি।
তুমি হবে মৃতক মনসা হবে সতী।।
মহেশের অঙ্গেতে করিয়া প্রবেশ।
অর্ধেক হইবে ধর্ম অর্ধেক মহেশ।
ব্রহ্মা যে সকল সৃষ্টি করিবে সৃজন।
ক্ষেত্রী রূপে পালন করিবে নারায়ণ।
বাক্য-অধিকারী হবে দেব শূলপাণি।
মনসা সুন্দরী হবে তাহার গৃহিণী।
সত্য দ্বাপর ত্রেতা কলিযুগ শেষে।
মহাপাপী অধর্ম দুর্জন হবে দেশে।

কলিযুগে ধর্মভ্রষ্ট হইয়া লোক কিরূপ আচরণ করিবে তাহার সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে—

পুত্রে না করিবে পিতা মাতার পালন।
শিষ্যে না মানিবে গুরু গর্বিতের জন। ইত্যাদি
এই বলি চারিজন দেব হইল অন্তর্ধান।
সৃষ্টিতে মন তবে করিল ধর্মজ্ঞান।

ধর্ম সৃষ্টিকার্যে মনোনিবেশ করিলেন—পৃথিবী, স্বর্গ, মর্ত্য, দেব, নর, গন্ধর্ব, কিন্নর, অসুর, সূর্য, চন্দ্র, ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি, পশু, পক্ষী, পর্বত, বন, জলচর প্রাণী প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ সৃজিল তিন জন।
তিন পুরুষে করিবে পৃথিবী পালন।

প্রসঙ্গক্রমে এইস্থানে বিষ্ণুর দশ অবতারের বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন ভাই পিতার চরণে প্রণাম করিয়া—

তিন ঘাটে তিন জন তপস্যাকে দিল মন
বসিলা আবেগ করি।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন, বহু বৎসর অতীত হইল, ধর্ম দীর্ঘকাল পুত্রমুখ দেখিতে না পাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন—

নিশ্বাস ত নিঃস্বরিল মনসার জন্ম হইল
বসিলা উঠিয়া বাম পাশ।

মনসা সে সুন্দরি রূপে গুণে বিদ্যাধরী
চাঁচর মস্তকের কেশ।

মনসা নারীও নয়, পুরুষও নয়—'নপুংসক হইএগ হইল সৃষ্টি'।

ধর্ম তখন মনসাকে নারীরূপে সৃষ্টি করিলেন। মনসার রূপে মুগ্ধ হইয়া ধর্ম তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মনসা বাধা দিলেন। তখন—

গোসাঞি বোলে মনসা থাকহ এই ঠাঁই।
যাবত ডাকিয়া আনি পুত্র তিন ভাই।

ধর্ম তিন পুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

কহ এক কথা তিন পুত্র মোর কাছে।
উপার্জিয়া খাইলে ফল দোষ নাহি আছে!
বাপের চরণে কথা কহে তিন ভাই।
উপার্জিয়া খাইলে ফল দোষ কিছু নাই।

পুত্রদিগের এই কথা শুনিয়া ধর্ম কহিলেন—

ভগ্নি এক সৃজিলাম মনসা কুমারী।

তাঁহার সঙ্গে আমার বিবাহের ব্যবস্থা কর। তখন তিন ভাই মনসার সহিত পিতার বিবাহ দিলেন। বিবাহ দিয়া তিন ভাই পুনরায় তপস্যায় গমন করিলেন। বিবাহের কিছুকাল পরে ধর্ম—

তেজিএগ মনসা সতী সৃষ্টির অধিপতি
করে প্রভু মরণ উদ্দেশ্য।
অনিলের অভিশাপ গুরুনিন্দা মহাপাপ
ধর্মকে ফলিল সেই ক্ষণে।
সাড়া পচা তনু ধরি ভাসে দেব মায়া করি
পোকায় বেষ্টিত সর্ব গায়।

ধর্ম এইরূপে জলে ভাসিতে ভাসিতে প্রথমে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন—

মরা দেখি চতুর্মুখ হইএগ রহে ঊর্ধ্বমুখ
ভাসাইল জলের হিন্দোলে।

তারপর বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলে বিষ্ণুও—

জলের হিন্দোল দিয়া দিলো জলে ভাসাইয়া
ভাসিয়া চলিল কতদূর।

ভাসিতে ভাসিতে মহেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলে মহেশ্বর ধ্যানে সমস্ত জানিতে পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার মৃতদেহ উঠাইলেন—সংবাদ পাইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুও তথায় আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—

পুত্রের ক্রন্দনে ধর্মের হইল চেতন।
না কান্দো না কান্দো মোর পুত্র তিনজন।
পূর্বে মোকে আছিল অনিল দেবের শাপ।
সৃজিলেক মৃত্যু বাপ না কান্দ অপার।
এক কথা কহি না করিহ উপহাস।
মুখ মেলি সত্বরে উদরে দেহ বাস।।
মহেশ্বর বলে বাপু ইহা নাকি হয়।
ধর্ম বলে বাপু এ মিথ্যা কথা নয়।
তুমি আমি অর্ধ অঙ্গ হইব শূলপাণি।
মনসা কামিনী হবে তোমার গৃহিণী।

* * *

তখন বাপের আদেশে মুখ মেলিল শঙ্কর।
প্রবেশ করিল ধর্ম অন্তর ভিতব।

তার পর তিন ভাই মৃত পিতার দেহ—

আগর চন্দন খড়ি চাপায় অনেক করি
অনল ভেজায় তিন ভায়।
মন্ত্র পড়ে ব্রহ্মা হর অগ্নি দিলা মহেশ্বর
পুড়িয়া হইল ধর্ম ছায়।

মনসা প্রভাতে উঠিয়া গৃহে স্বামীকে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলেন। স্বামী বোধ হয় পুত্রের নিকট গিয়াছেন মনে করিয়া প্রথমে ব্রহ্মার নিকট যাইয়া তাঁহার পিতা কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'ব্রহ্মা বোলে পিতা নাহি আইসে মোর ঠাঁই'। বিষ্ণুর নিকটেও এইরূপ উত্তর পাইয়া মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলে মহেশ্বর বলিলেন—

মরণ সৃজিয়া বাপ তেজিল জীবন।।
এ ঘাটে পড়িল অনাদি সুরপতি।
বাপ হইলা মরা মাগো তুমি হইলা সতী।।

মনসা এই কথা শুনিয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন—'তোমার পিতার সঙ্গে যাব অনুমৃতা।' মনসার আদেশে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর চিতা নির্মাণ করিলেন—মনসা স্নান করিয়া চিতা প্রদক্ষিণ পূর্বক চিতায় প্রবেশ করিলেন—

অনলে পুড়িয়া মরে মনসা কামিনী।।
অনলের মধ্যে হইল শিশুকন্যা খানি।
জনম হইল কন্যা শিবের গৃহিণী।।

এই কন্যাই গৌরী—'গৌরীর জনম হইল জানে ত্রিভুবন'। ব্রহ্মার পরামর্শে তাহারা এই কন্যাকে—'লোহার মঞ্জুসী করি সাগরে ভাসায়।' সমুদ্রতীরে ঋষি হেমন্ত (হিমালয়) তপস্যা

করিতেছিলেন, ভাসিতে ভাসিতে কন্যা তথায় উপস্থিত। ঋষি কন্যা পাইয়া সন্তানহীন মেনকাকে আনিয়া দিলেন। মেনকা নিজ কন্যারূপে পরিচয় দিয়া পালন করিতে লাগিলেন।

এদিকে শিব গৌরীর জন্য ব্যাকুল, কিরূপে গৌরীর দেখা পাইবেন তাহার জন্য নারদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন, নারদ বলিলেন—

বিশ্বকর্মা আনিয়া কর বৃষভ নির্মাণ।
গঙ্গা মালিনী ঘরে করহ পয়ান।।
ব্যাল্লিশ ফুলের বিচি আনহ ত্রিলোচন।
হাল বাহিঞা করহ মালঞ্চ সৃজন।।

গৌরী সেই মালঞ্চ দেখিতে আসিবেন, তথায় মিলন হইবে। নারদের উপদেশে শিব চাষ করিয়া উদ্যান রচনা করিলেন, তাহাতে নানারূপ ফুল শোভা পাইতে লাগিল। এই স্থানে কবি কিরূপে চাষ করিতে হয় ও বীজ বপনের পূর্বে কিরূপে জমি তৈয়ার করিতে হয় তাহার বিশদ বিবরণ দিয়াছেন।

গৌরী দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করিলেন, শিবের মালঞ্চও নানা ফুলে সুশোভিত, তথাপি গৌরীর দেখা নাই। পুনরায় নারদের উপদেশে সমস্ত দেবতা ও ঋষিদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার গৃহে কন্যা আছে? সকলেই অস্বীকার করিলেন। শিব তখন গণনা করিতে লাগিলেন—

ধর্ম খড়ি পাতি দেব হর মহেশ্বর।
খড়িতে পড়িল ধরা হেমন্ত মুনিবর।।
গোঁসাই বোলে মুনি তোমার এমনি গিয়ান।
আছে কন্যা কেনে তুমি করিলে আমান।।[১]

শিব ঋষিকে বলিলেন, 'তোমার কন্যা আমার এই মালঞ্চের ফুল তুলিবে, তাহাকে মালঞ্চে পাঠাইয়া দিবে।'

ঋষি বোলে শিশু কন্যা কেহ সঙ্গে নাই।
একেশ্বরে কি মতে আসিবে গোঁসাই।।
গোঁসাই বোলে একেশ্বরে আসিবে পার্বতী।
সিংহ ব্যাঘ্র করি দিব তাহার সংহতি।।

অভিশাপের ভয়ে ঋষি গৌরীকে মালঞ্চে যাইতে অনুমতি দিলেন—

সিংহের উপরে দেবী হইয়া আরোহণ।
পুষ্পের মালঞ্চ বনেতে দেবী দিল দরশন।।

গৌরী মালঞ্চে আসিয়াছেন, মালঞ্চের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া ফুল তুলিতে তুলিতে পরিশ্রান্ত

১। আমান—অস্বীকার করা। দিনাজপুর ও রংপুর জিলায় অস্বীকার করা অর্থে 'আমান' শব্দ ব্যবহার হয়।

হইয়া বৃক্ষের ছায়া ঘুমাইতেছেন। শিবও অনুসন্ধান করিতে করিতে তথায় উপস্থিত, নিদ্রিত গৌরীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। শিবের স্পর্শে গৌরীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, গৌরী সম্মুখে শিবকে দেখিয়া ভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন, শিব সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—

না চিনহ আমারে দুর্গা আমি তোমার স্বামী।
সপ্ত জনমের কথা কহিয়া দিব আমি।।
এক জন্মে জন্মিলা কৃষ্ণের শরীরে।
বধিলে কেউর আর মধু মহাবীরে।।
দেবতার তেজে জন্ম নিলে আর বার।
বধিলে মহিষাসুর দেবের উপকার।।
ভীমাদেবী বোলি নাম হইল প্রচার।
দুর্গা নামে অসুর বধিলে আর বার।।
আর বারে জনমিবে দক্ষের ভুবনে।
তোমারে করিব বিয়া কুতুহল মনে।।
তোমার বাপ পাপিষ্ঠ করিবে অপমান।
অপমানে তুমি প্রিয়া তেজিবে পরাণ।।
তোমার শোক সন্তাপে হইবে তনু কালা।
গাঁথিয়া পড়িব তোমার তবে হাড়ের মালা।।
প্রথম জনম তোমার ঋষির ভুবন।
তোমার কারণে বিরচিল পুষ্পবন।।
তবে সে তোমার সঙ্গে হইল দরশন।
বিরচিল দ্বিজ কবি জগত জী[illegible] ।।

শিবের কথা শুনিয়া গৌরী করজোড়ে বলিলেন, শূলপাণি, তোমার প্রকৃত পরিচয় জানিলাম—

তুমি দেব আমি দেবী ত্রিভুবনে আর।
করিবে যেমত প্রভু উচিত ব্যবহার।।
গোসাঞ বোলেন ভয়, দুর্গা, না করিহ মনে।
তোমাকে করিব বিভা এই পুষ্পবনে।।

সেই মালঞ্চে ঐ দিন হরগৌরীর বিবাহ হইল।

হরগৌরী দুই জনে রহিল মালঞ্চ বনে।

সিংহ গৌরীর জন্য অপেক্ষা করিল, গৌরীর বিলম্ব দেখিয়া ঋষির নিকট আসিয়া সকল বৃত্তান্ত বলিল। পরদিন গৌরী গৃহে ফিরিবেন, মাতা-পিতা সন্দেহ করিবেন, নানারূপ পরীক্ষাও করিবেন, সেজন্য শঙ্কিত হইলেন। তখন শঙ্কর বলিলেন—

যে পরীক্ষা চাহে দিবে তাহার গোচর।।

পরীক্ষাতে স্মরণ যে করিহ আমারে।
হইবে সর্বত্র জয় কহিনু তোমারে।।

কবি এই স্থানে হরগৌরীর মিলনের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণব কবির রাধাকৃষ্ণের মিলন দৃশ্যকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

গঙ্গা নারদের নিকট হরগৌরীর এই বিবাহ-বৃত্তান্ত জানিয়া বিলাপ করিতেছেন। ঠাকুর মহানন্দ দুই ভাই আসিয়া মাতার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে—

গঙ্গা বোলে আমিত বয়সে হৈনু হীন।
বৃদ্ধকালে দিল মোরে দারুণ সোতিন।।
পুষ্পবনে আসিয়াছে হেমন্ত ঝিয়ারি।
তার সঙ্গে আছে হর রঙ্গ ক্রীড়া করি।।

গঙ্গা তাহাদিগকে বলিলেন, 'গৌরী নদীপারের জন্য নদী তীরে আসিবে, তোমরা নৌকা লইয়া নদীর তীরে যাও'—

আর যত লোক আইসে তাকে কর পার।
হেমন্ত নন্দিনীকে জলে ডুবাইয়া মার।।
মায়া নাও গঙ্গাদেবী সৃজিল সেই ঠাঁই।
আগে পাছ কান্দারি ধরিল দুই ভাই।।

গৌরী নদীতীরে আসিয়াছেন—

হেন জল বহে গঙ্গা স্থান কূল নাই।
কেমনে হইব পার নাহিক উপায়।।

এমন সময় গৌরী নদীতে নৌকা দেখিয়া পার করিতে বলিলেন ; গৌরী নৌকায় উঠিলেন—

মধ্য নদীতে দুই ভাই করে চারাচারি।
মা-এর সোতিন দুর্গাকে ডুবাইয়া মারি।।

গৌরী আত্মরক্ষার জন্য দশ হাতে দশ অস্ত্র ধারণ করিলেন ; এইরূপ দেখিয়া ভয়ে দুই ভাই নৌকা ত্যাগ করিয়া জলে ঝাঁপ দিল, তখন গৌরী—

পঞ্চ করে বাহে নাও হস্ত ছিচে পানি।
পার হইয়া গেলত চণ্ডিকা ত্রিনয়ানী।।

গৌরী গৃহে আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া ঋষি বলিতেছেন—

অল্প বয়স বাছা হইলা কলঙ্কিনী।
ঋষির কুলের কাঁটা হইলা তুমি ঝি।
দাস বেস লৈয়া গেলা তাহা কৈলা কি।।

হেমন্ত ঋষির বোলে ভগবতী কোপে জ্বলে
বোলে দেবী অতি খরসা।

গৌরীর উত্তরে ঋষির সন্দেহ দূর হইল না—

ঋষি বোলে, মায়াবতি, এ মায়া শিখিলে কথি
চিত্তে আমার নাহি পাতি যায়।
অল্প বয়সে বালি হইলা সে কলঙ্কিনী
অষ্ট পরীক্ষা দিতে চাও।।

গৌরী ক্রমে আট প্রকার পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হইলেন। ইহাতেও ঋষির সন্দেহ দূর হইল না, তখন বলিলেন—

অঙ্গিকার করি আমি সভা বিদ্যমানে।
রজনী প্রভাতে দিব কয়ালিকে দানে।।

প্রাতঃকালে শিব কয়ালির ছদ্মবেশে বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে তথায় আসিয়াছেন। অনেকেই তাঁহাকে ভিক্ষা দিতে আসিল, সকলের দানই প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন মেনকা—

সোবর্ণের থালে করি লইয়া চাইল কড়ি
আনিঞা দিলেন ঋষিয়ানি।

সে দানও প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন—

কুমারীর বিনে দান আর কেহ দেয় দান
তার দান দেয় ফিরাইয়া।
তোমার নন্দিনী বালি অকুমারী কন্যা খানি
তার হাতে দিয়া পাঠাও দান।।

গৌরী ভিক্ষা দিতে আসিয়াছেন, ভিক্ষা লইবার সময় শিব গৌরীর অঙ্গ স্পর্শ করিলেন—

দেখিল ঋষির পুরের পড়পড়শি।
পাড়াপরশি লোক করে চাড়াচাড়ি।।
শুনিঞা রোষাইল ঋষি ক্রোধে কম্পবান।
ঘর হইতে বাহিরায় অগ্নির সমান।।
কয়ালিকে ধরিয়া হেমন্ত বন্দী করে।
কয়ালিকে বন্দি করে কাচারিয়া ঘরে।।

কয়ালিকে বন্দী করিয়া সরোবর তীরে ঋষি তপস্যা করিতেছেন, কিন্তু—

যত ফুলে পূজে ঋষি সরোবর জলে।
সে ফুল আইল কয়ালির পদতলে।।

পূজা সমাপন করিয়া ঋষি গৃহে আসিলেন। খাইতে বসিবেন, এমন সময় বন্দীর কথা মনে পড়িল—'বন্দিয়াকে বান্ধি অন্ন খাইব কেমনে।' বন্দীকে আনিতে যাইয়া দেখিলেন, যে সমস্ত ফুলদ্বারা তিনি তাঁহার ইষ্টদেবতাকে পূজা করিয়াছেন, সেই সব ফুল কয়ালির পদতলে। বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—

অন্তরে এমত কয় এজনা কয়ালি নয়
রূপ দেখি অতি বিপরীত।
নাহি চিন্ত পরলোক কপটে ভাঁড়িল মোক
ত্রিদেব ঈশ্বর পশুপতি।

মহাকবি ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়ম্' কাব্যে অর্জুনের পূজাও কিরাতবেশী মহাদেবের নিকটেই পৌঁছিয়াছিল। নিজ কর্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া ঋষি শিবের স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া—

গোসাই বলে ঋষিবর প্রাণে না করিহ ডর
অকুমারী কন্যা আছে তোর।
বিবরণ কহিনু তোকে তাকে বিভা দেহ মোকে
সেই জন রমণী আমার।।

শিবের বাক্যে ঋষি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—

কন্যার ভাগ্যের ফলে তোমা হেন বর মিলে
অবশ্য করিব কন্যা দান।

আনন্দিত হইয়া শিব কৈলাসে চলিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। শিব কৈলাসে আসিয়া গঙ্গাকে বলিলেন—

যাইতে মালঞ্চ বন মিলিলেক একজন
ঘরে নাহি আনি তোমার ডরে।
গঙ্গা বোলে শুন স্বামী কহিতে বুঝিনু আমি
যে ধন পাইলা গুনমণি।
বয়সে হইনু হীন রূপে হইনু নির্ঘিন
বৃদ্ধকালে দিলেন সৌতিন!
পাছে না করিহ রোষ দুই নারীর যত দোষ
নিরবধি এ দ্বন্দ্ব কাচাল।

শিব গঙ্গাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'ঋষি হেমন্ত তাহার কন্যা আমাকে দান করিবে, সেই কন্যা'—

বয়সেতে শিশুজন সুবেশ বিলস হীন
তোমা হইতে নহে রূপবান।

গঙ্গাদেবী বিবাহে অনুমতি দিলেন, বিবাহ করিয়া গৌরীকে গৃহে লইয়া আসিলেন, কিন্তু প্রথম দিন হইতেই গঙ্গা গৌরীর সঙ্গে কলহ আরম্ভ করিলেন।

শিব বোলে দ্বন্দ্ব তোরা কর দুই জনে।
সাজ, নন্দি, বৃষ আমি যাব পুষ্পবনে।

প্রস্থান সময়ে

সাজিয়া চলিল হর　　　গঙ্গাকে সঁপিএগ ঘর
দুর্গা সমর্পিল গঙ্গার হাতে।

শিব মালঞ্চে চলিয়াছেন, পথে পশুপক্ষীরাও তাঁহাকে সাদরে সম্বর্ধনা করিতেছে। সরোবরে স্নানরত অপ্সরাগণকে দেখিয়া তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। চাঞ্চল্যের ফলে পদ্মপত্রে রক্ষিত শিবতেজ পদ্মনাল দ্বারা পাতালে নীত হইল, তথায় পদ্মার জন্ম হইল—

পাইয়া সে বাসুকি　　　হইলেন মহাসুখী
পুসিলেন নিজ ভগ্নী করি।
করিলেন নাড়িচ্ছেদ　　　আর করি কর্ণভেদ
নাম থুইলেন জয় বিষহরি।।

শিব মালঞ্চে আছেন। এক বৎসর অতীত হইল। গৌরী গঙ্গাকে বলিলেন—

পুষ্পবনে বৎসরেক রহিল ব্যোমকেশ।
পুনরপি আমা সভার না করে উদ্দেশ।।
যদি আমি গঙ্গাদেবী তোমার আজ্ঞা পাই।
গোয়ালিনী রূপে শিবকে দেখিবারে যাই।।

গঙ্গা অনুমতি দিলেন। গৌরী গোয়ালিনী বেশে দধির পসরা লইয়া মালঞ্চে আসিয়াছেন। শিবের সহিত মিলন হইল। প্রাতঃকালে গৌরী 'নিদর্শন' লইয়া গৃহে ফিরিলেন। গণেশের জন্ম হইল। তারপর বার বৎসর কাটিল, শিব ফিরিলেন না—গৌরী পুনরায় কোচনী বেশে শিবকে ছলনা করিতে যাইবেন, গঙ্গার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন—

গঙ্গা বোলে যাও তুমি হেমন্ত ঝিয়ারি।
নিশান আনিহ তুমি শিবের অঙ্গুরি।।

মালঞ্চে শিবের সহিত কোচনী বেশে গৌরীর মিলন হইল। পরদিন গৌরী শিবের অঙ্গুরীয় লইয়া গৃহে আসিলেন, তারপর কার্তিকের জন্ম হইল।

শিব মালঞ্চ হইতে গৃহে ফিরিতেছেন, পথে সরোবর তীরে পদ্মার সহিত দেখা, পদ্মার নিকট তাহার জন্মবৃত্তান্ত জানিয়া—

শিব বোলে মোর কন্যা হইল পদ্মাবতী।
ফিরিয়া ধরহ তুমি আপন মুরতি।

তখন পদ্মা নানারূপ সর্পের আভরণে সজ্জিত হইলেন। পদ্মাও শিবের সহিত কৈলাসে যাইবেন। শিব বলিলেন—

গঙ্গা দুর্গা সঙ্গে তোমার নাহি পরিচয়।
তুমি সঙ্গে গেলে হবে বড়ই সংশয়।

পদ্মা বলিলেন—

তোমার আজ্ঞা পিতা যদি আমি পাই।
পানের অধিক আমি পাতল হইয়া যাই।।

শিবের বচনে পদ্মা পাতল হইয়া গেলো।
করণ্ডিতে করিয়া ভোলা মহেশ্বর নিল।।

শিব কৈলাসে আসিয়াছেন—'গঙ্গা দুর্গা প্রণমিল হরের চরণে।' গঙ্গার পুত্র পিতার চরণে প্রণাম করিল। কার্তিক গণেশ আসিয়া প্রণাম করিল। গঙ্গার নিকট ইহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে গঙ্গা বলিলেন—

গোয়ালিনীর পুত্র দুই কার্তিক গণেশ।
কোচনীর গর্ভে জন্ম কার্তিক ষড়ানন।।

এই সময় গৌরীও শিবপ্রদত্ত নিদর্শনগুলি লইয়া আসিলেন, এই নিদর্শন দেখিয়া সমস্ত ঘটনা মনে পড়িল, তখন তিনি 'হস্তেতে ধরিয়া দুই পুত্র নিল কোলে'। শিব কৈলাসে আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া মুনিরা দেখা করিতে আসিয়াছেন, নারদের নিকট জানিয়া শিব মুনিদিগের নিকট চলিলেন। এই সময়ে গৌরীও কৌতূহলে ফুলের সাজি দেখিতে আসিলেন। সাজির মধ্যে পদ্মাকে দেখিয়া ক্রোধে সতীন বলিয়া গাল দিতে লাগিলেন, পদ্মা আপন পরিচয় দিলেও বিশ্বাস করিলেন না।

পদ্মাকে দেখিয়া দেবী ক্রোধে কম্পবান।
অঙ্গুলের ঘাটে তার চক্ষু কৈল কান।।

পদ্মাও ক্রোধে গৌরীকে সর্পদ্বারা দংশন করাইলেন। গৌরীকে মৃত দেখিয়া গঙ্গা, কার্তিক, গণেশ বিলাপ করিতে লাগিলেন। নারদের নিকট সংবাদ পাইয়া শিব আসিয়া শোকে কাঁদিতে লাগিলেন। দেবতারা পদ্মাকে অনুরোধ করিলে পদ্মা গৌরীকে বাঁচাইয়া দিলেন। গৌরী জীবন পাইয়া ক্রোধে শিবকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তারপর—

গঙ্গা দুর্গা দুইজনে করিয়া যুকতি।
বিদেশে চলিলা তবে হরের যুবতী।।

যাইতে যাইতে তাঁহারা সমুদ্রতীরে উপস্থিত, পদব্রজেই দুইজন সমুদ্র পার হইতেছেন—সমুদ্র মধ্যে ব্রহ্মা তপস্যা করিতেছেন, গৌরীকে দেখিয়া মনোবিকারে সমুদ্রজলে তাঁহার পরিত্যক্ত তেজ ভাসিতে লাগিল, দুর্গা সেই পথেই যাইতেছিলেন, সেই তেজ স্পর্শে—"গর্ভ হৈল দুর্গার শরীর হৈল ভারি।" গঙ্গার উপদেশে বালুচরায় দুর্গা গর্ভপরিহার করিলেন—বালুর উপরে গর্ভ হৈল দুর্বাঘাস।

গঙ্গাদুর্গা-শূন্য কৈলাসে শিব অত্যন্ত দুঃখে দিন কাটাইতেছেন। পদ্মাকেও বনবাসে পাঠাইবেন—

দুর্গার শোকেতে হর আকুল হৈল মন।
পদ্মাকে লইয়া গেল গহীন কানন।

পদ্মাকে বনে রাখিয়া শিব কৈলাসে ফিরিয়া আসিলেন। পদ্মা এক ব্রাহ্মণের বাড়ী দাসীবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। গঙ্গা দুর্গা দুইজনে সমুদ্রতীরে বাস করিতে

লাগিলেন। শিবের আদেশে নারদ গঙ্গা ও গৌরীকে আনিতে যাইতেছেন—সমুদ্রতীরে উপস্থিত, সমুদ্র দুগ্ধময় দেখিয়া শিবের নিকট যাইয়া বলিলেন—

আনিবারে গেলাম মামা মামির তলাস।
অদ্ভুত দেখিলাম এক কথা উপহাস।
যাইয়া পাইলাম আমি জলনিধি তীর।
জলনিধি সাগরে সমস্ত বহে ক্ষীর।

শিব ধ্যানে জানিলেন—

মনোরথ পান কৈল সাগরের নীর।
কপিল সমস্ত সিন্ধু ভরাইল ক্ষীর।।

শিবের আদেশে সমুদ্র মন্থন করা হইল। প্রথমে কৃষ্ণের নামে মন্থনে লক্ষ্মী সরস্বতী উঠিলেন ; ইন্দ্রের নামে উঠিল নর্তকী, অপ্সরা, তারপর চন্দ্র ; দেবতা সকলের নামে উঠিল অমৃত।

আপন নামে মথন জুড়িল মহেশ।
জন্মিয়া উঠিল তাতে কালকূট বিষ।

কালকূট বিষে জগৎ ধ্বংস হয় দেখিয়া দেবতারা চিন্তিত হইলেন—

দেবতার বিকল দেখিয়া দিগ্‌বাস।
গণ্ডুস করিয়া বিষ করিলেন গ্রাস।।
কালকূট দাবিতে না পারিল মহেশ।
টলিয়া পড়িল দেব ধরণী উপর।।

দেবতারা হায় হায় করিতে লাগিলেন। নারদের নিকট সংবাদ পাইয়া গঙ্গা দুর্গা আসিয়া শোকে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পদ্মা প্রাতঃকালে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলেন। ধ্যানে শিবের অমঙ্গল জানিয়া ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় লইয়া তথায় আসিয়াছেন—

দেবতা সকলে বোলে পদ্ম কুমারী।
তুমি ত জিয়াহ বাছা দেব ত্রিপুরারি।।

পদ্মা তখন "মহামন্ত্রে ঝাড়িয়া জিয়ায় ত্রিলোচন।" শিবকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া দেবতারা আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, একমাত্র পদ্মাই বিষণ্ণ—এই আনন্দে যোগ দিলেন না। শিব তাঁহাকে বিষণ্ণ কেন জিজ্ঞাসা করিলে—

পদ্মা বোলে ত্রিপুরারি মাঙ্গিয়া খাইয়া মরি
কি কহিব দেবতা ভুবনে।
মোর প্রাণপতি নাই রহি আমি কার ঠাঁই
এই অভিমানে আমি মরি।।

শিব তখন বলিলেন, এই স্থানে সমস্ত দেবতা ও অসুর উপস্থিত, যাহাকে ইচ্ছা পতিত্বে বরণ কর। এই সময় বাসুকি আসিয়া বলিল, জরৎকারু মুনির বিবাহ হইবে, জন্মেজয়

সর্পযজ্ঞে যখন নাগকুল ধ্বংস করিবেন, তখন পদ্মার গর্ভজাত পুত্র আস্তিক নাগকুল রক্ষা করিবে। এই কথা শুনিয়া জরৎকারু মুনির সহিত পদ্মার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর জরৎকারু বলিলেন—

মোক যদি গরহিত করিবেক কদাচিত
এড়িয়া পলাইব তবে।

জরৎকারু পদ্মাকে লইয়া গৃহে যাইতেছেন। সমুদ্রতীরে কিছুদিন বাস করিলেন, তার নিজ গৃহে যাইবেন। পদ্মা তাঁহাব পশ্চাতে যাইতেছেন, পরিশ্রান্ত হইয়া পথে বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন—

পদ্মার উরুতে মুনি করিল শিয়র।
তরুতলে নিদ্রাতে পড়িল মুনিবর।

সন্ধ্যা বন্দনার কাল অতীত হয় মনে করিয়া পদ্মা স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করিলেন, অসময়ে নিদ্রাভঙ্গে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অরণ্য মধ্যে পদ্মাকে পরিত্যাগ করিয়া মুনি চলিয়া গেলেন। এইভাবে পরিত্যক্ত হইয়া—

মাথে হাত দিয়া দেবী করএ রোদন।
প্রাণনাথ ছাড়ি গেল কিসের কারণ।।
কান্দিতে কান্দিতে পদ্মা ক্ষেমা দিল মনে।
সন্ধ্যা আর ছিল পদ্মা গহন কাননে।।

পদ্মা বনেই বাস করে, গাছের বাকল পরে, ফলমূল খায়, বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়—এই ভাবে দিন কাটে। পদ্মা অন্তঃসত্ত্বা, যথা সময়ে পদ্মার পুত্র হইল, নাম রাখিল আস্তিক। এখন পুত্রকে কিরূপে লালন করিবে, পদ্মার মনে খুব দুঃখ—

অন্যের ছাওয়াল হৈলে দুগ্ধভাতে খায়।
আমার ছাওয়াল কিনে ক্ষিধায় লালায়।।
পুত্র লইয়া যাই আমি নরলোকের পাস।
মনুষ্য ভুবনে পূজা করিব প্রকাশ।।

পুত্র-ক্রোড়ে পদ্মা যাইতেছেন, পথে রাখালদিগের সঙ্গে দেখা, তাহারা মাঠে গরু চরাইতেছে, তাহাদিগের নিকট পদ্মা পুত্রের জন্য দুগ্ধ চাহিলেন, তাহারা অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল।

ক্রোধ হইয়া বিষহরি চলিল ফিরিয়া।
রাখালের যত গাভি রাখিল লুকাএগ।।

রাখালেরা গরু না দেখিয়া কাঁদিতেছে, বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী বেশে পদ্মা তথায় আসিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে রাখালেরা তাঁহাকে বলিল, এক ব্রাহ্মণীর অভিশাপে আমাদের সমস্ত গরু হারাইয়াছে—

বুড়ি বোলে কি কলে ব্রাহ্মণী নহে সেই।
শঙ্কর ঝিয়ারি পূজ পাবে তবে গাই।।

বৃদ্ধার উপদেশে তাহারা বনমধ্যেই মনসা পূজা করিয়া কপোত বলি দিল—

ব্রাহ্মণী পূজিয়া ঘট দিল বিসর্জন।
হেন কালে যত গাভি দিল দরশন।।

আনন্দে গরু লইয়া তাহারা গৃহে আসিল, মনসাপূজা প্রচার করিতে লাগিল। মনসাও জালোমালোর নিকট আসিয়া পুত্রের জন্য মাংস চাহিলেন ; তাহারা বলিল—

সাতদিন মারি মৎস্য করি পরবাস।
সপ্তদিন না পাই মৎস্যের পরকাশ।।

পদ্মা তাঁহার নাম লইয়া জাল ফেলিতে বলিলেন ; প্রথম বারে নানারূপ মৎস্য উঠিল, দ্বিতীয় বারে সুবর্ণ ঘট উঠিল, মনসা সেই ঘট পূজা করিতে বলিলেন। এই ঘট পূজা করিলে—

পুত্র হইল জালো মালোর মনসার বরে।
অচলা হইলা লক্ষ্মী জালো মালোর ঘরে।।

দেবখণ্ড এই স্থানে সমাপ্ত হইয়াছে। তারপর চাঁদ সদাগরের কাহিনী এই ভাবে আরম্ভ হইয়াছে—গৌড় নগরে বিক্রমকেশরী যখন রাজা তখন তাঁহার রাজ্যের অন্তঃপাতী চম্পাই বা চম্পানি নগরে কোটীশ্বর নামে এক ক্ষুদ্র রাজা রাজত্ব করিতেন। চন্দ্রপতি কোটীশ্বরের পুত্র। মাতুলানীর সঙ্গে লখিন্দরের কুব্যবহারের বর্ণনা করিয়া জগজ্জীবন তাঁহার রচনাকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু কে বলিবে ইহার ভিতর দিয়াই হয়ত কবি তাঁহার পারিপার্শ্বিক সমাজের রস ও রুচির পরিচয় দিয়াছেন। জগজ্জীবনের বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত শূন্য পুরাণের এবং নাথ সম্প্রদায়ের বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। এই পুঁথিতে ভণিতার মধ্যে কবির যে আত্মপরিচয় পাওয়া যায়, তাহা পূর্বোদ্ধৃত পাঠ অপেক্ষা স্পষ্ট ও নূতন ; সেই জন্য এই স্থানে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

ঘোষাল রসাল বংশে গুণান্বিত সর্ব অংশে
রূপরায় চৌধুরির পুত।
জগত জীবন নাম নানাগুণে অনুপাম
রচিল পাঁচালি অদভূত।
ঘোষাল ব্রাহ্মণ রাঢ়ি কুচিয়া মোরাতে বাড়ি
মহারাজা প্রাণনাথের দেশে।
জগত জীবন পদ রচিলেন বিদগাদ
কবি দুর্গাচন্দ্র পতির দেশে।

কবি দুর্গাচন্দ্র পতি কে? তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই।

ষষ্ঠীবর দত্ত

মনসা-পূজা শ্রীহট্ট জেলায় সর্বাধিক প্রচলিত ও সর্বাধিক জনপ্রিয় লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান।

দুর্গোৎসব অপেক্ষাও স্থানীয় অধিবাসীর উপর ইহার প্রভাব অধিকতর।[১] এই জন্যই পদ্মাপুরাণ বা মনসা-মঙ্গল কাব্যের প্রভাবও এই অঞ্চলে পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল হইতে অনেক বেশি। শ্রীহট্ট জেলার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় মনসা-মঙ্গলের কবি নারায়ণ দেব ; তারপরই ষষ্ঠীবরের নাম উল্লেখযোগ্য। নারায়ণ দেব তাঁহার কবিত্বশক্তির গুণে শুধু শ্রীহট্টবাসীদিগের মধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন নাই, সমগ্র পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে তিনি পদ্মাপুরাণের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবির গৌরব অর্জন করিয়াছেন। কিন্তু ষষ্ঠীবরের কবিত্বখ্যাতি শ্রীহট্ট জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, শ্রীহট্ট জেলার কোন কোন স্থানে নারায়ণ দেব অপেক্ষা ষষ্ঠীবরের কাব্যই অধিক প্রচলিত। পদ্মাপুরাণের একজন শ্রেষ্ঠ কবি নারায়ণ দেবের সহিত প্রতিযোগিতায় ষষ্ঠীবরের কাব্য যে এতকাল ধরিয়া এক বিস্তৃত অঞ্চলে লোকপ্রিয়তা রক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছে, ইহাই এই কাব্যের আভ্যন্তরীণ মূল্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-সন্ধানকারীদিগের মধ্যে নারায়ণ দেব সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, শ্রীহট্টের একজন বিশিষ্ট জনপ্রিয় কবি ষষ্ঠীবর দত্ত সম্বন্ধে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয় নাই। এই পর্যন্ত দুই চারিটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা তাঁহার সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, কিম্বা কোন কোন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকের গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে, তাহা সমস্তই ভ্রমাত্মক।[২]

পূর্বেই বলিয়াছি, ষষ্ঠীবরের কাব্য অদ্যাপি শ্রীহট্ট জেলার সর্বত্র প্রচলিত আছে। শিক্ষিত লোক হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ কৃষকদিগের মধ্যে পর্যন্ত ষষ্ঠীবরের কাব্য ও তাঁহার বাসস্থানের কথা না জানে, এমন লোক শ্রীহট্ট জেলায় অতি বিরল। এখনও প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত গয়গড় গ্রামে ষষ্ঠীবরের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত উমা-মহেশ্বরের শিবের বাটীতে কবির বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে স্থানীয় ও বিদেশাগত শিক্ষিত জনসাধারণ সমবেত হইয়া কবির জীবনী ও কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা

১। বিপিনচন্দ্র পাল, 'সত্তর বৎসর' প্রবাসী, ১৩৩৪, বৈশাখ, ২১-২২

২। শ্রীহট্টবাসিগণ এই বিষয়ে বহুদিন যাবৎ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থ হইতে এই বিষয়ক ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবার জন্য তাঁহাকে বারবার অনুরোধ করা হয়। ১৯৩৯ সনের ২০শে নভেম্বর তারিখের 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় শ্রীহট্ট হইতে প্রচালিত এক সংবাদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেখানকার এক সভায় এই বিষয়ে স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু ইহাতে কোনও ফলোদয় হয় নাই। পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদিগের ভ্রমের অনুসরণ করিয়া আমিও এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে এই বিষয়ে ভ্রমে পতিত হই। শ্রীহট্টবাসিগণ এই বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে আমি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। বর্তমান আলোচনা এই অনুসন্ধানেরই ফল। এই বিষয়ক প্রচলিত ভ্রান্ত মত দূর করিবার জন্য এখানে বিষয়টি একটু বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

করিয়া থাকেন।

ষষ্ঠীবর যে সময় তাঁহার কাব্য রচনা করেন, তখন তাঁহার কাব্যের প্রকৃত রূপ কি ছিল, আজ তাহা বলিবার উপায় নাই ; প্রচারের ব্যাপকতার জন্য লোক-মুখে তাঁহার কাব্য অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছে এবং এখন এত প্রাদেশিকতাদোষে-দুষ্ট হইয়াছে যে, শ্রীহট্টের বর্তমান কথ্য-ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকের নিকট অনেক সময় তাহার অর্থ পরিগ্রহ দুর্ঘট হইয়া উঠে। কাব্যের এই ব্যাপক পাঠ-বিকৃতি এবং ইহার পাঠান্তরের আধিক্য এই কাব্যের ব্যাপক লোকপ্রিয়তারই পরিচায়ক। শ্রীহট্ট হইতে পদ্মাপুরাণের যত পুঁথি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহা নারায়ণ দেবেরই হউক, দ্বিজ বংশীরই হউক কিংবা বাইশ কবির মনসা-মঙ্গলই হউক—তাহাতে ষষ্ঠীবরের ভণিতাযুক্ত কোন পদ নাই, এমন কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায়ও শ্রীহট্ট হইতে যে সকল প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের প্রায় সবগুলিতেই ষষ্ঠীবরের ভণিতাযুক্ত বহু পদ দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীহট্ট কিংবা তাহার একান্ত সংলগ্ন স্থান ব্যতীত কোন অঞ্চল হইতেই ষষ্ঠীবরের ভণিতাযুক্ত পদ্মাপুরাণের কোনও পদ আবিষ্কৃত হয় নাই।

ষষ্ঠীবরের একাধিক পুঁথি মুদ্রিত হইয়া শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ১৩৩২ সালে শ্রীহট্ট হইতে বিরজাকান্ত ঘোষ সম্পাদিত কবি ষষ্ঠীবরের 'পদ্মাপুরাণ' ও ১৩৪৩ সালে শ্রীহট্ট হইতে ফণীন্দ্রচন্দ্র দাস ও গিরিশচন্দ্র দাস সম্পাদিত ষষ্ঠীবরের 'পদ্মাপুরাণ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১] এতদ্ব্যতীত স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ষষ্ঠীবরের কাব্যের কতক নির্বাচিত অংশ ১৯১৪ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়' (১ম ভাগ, পৃ. ২৫০-২৫৭) নামক সঙ্কলন গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যে পুঁথি হইতে ষষ্ঠীবরের রচনার উক্ত অংশ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই ; তবে আমাদের পূর্ব আলোচনা হইতে ইহাও সহজেই সিদ্ধান্ত করা যাইবে যে, তাহাও শ্রীহট্ট হইতেই সংগৃহীত।

ষষ্ঠীবরের উল্লিখিত দুইখানি মুদ্রিত পদ্মাপুরাণে, স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক 'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়ে' উদ্ধৃত নির্বাচিত অংশে, কিংবা অন্য কোন হস্তলিখিত পদ্মাপুরাণের পুঁথিতে কবি কিংবা তাঁহার গ্রন্থরচনার কাল সম্বন্ধে বিস্তৃত কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। উক্ত রচনাগুলি হইতে তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে যৎসামান্য যাহা জানিতে পারা যায়, তাহা

১। এই মুদ্রিত পুঁথি দুইটি আদ্যোপান্ত ষষ্ঠীবরের খাঁটি রচনা বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। উভয় পুঁথির ভাষাই অত্যন্ত আধুনিকতা-প্রাপ্ত এবং তাহাদিগের মধ্যে স্থানে স্থানে অন্যান্য কবির রচনার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। শেষোক্ত পুঁথিটির উপর অনেক স্থলে বরিশালের কবি বিজয় গুপ্তের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বলা বাহুল্য, পুঁথির সম্পাদকগণ মূল ভাষার উপর কারুকার্য করিয়াছেন এবং বিভিন্ন পুঁথি মিলাইয়া কবির একটি নির্ভুল সংস্করণ সম্পাদন করিবার পরিবর্তে হাতের কাছে যে পুঁথি যে রকম পাইয়াছেন, তাহাই ছাপাইয়া দিয়াছেন।

নিম্নে আলোচনা করা যাইতেছে।

কবি ষষ্ঠীবরের এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, গ্রন্থের বন্দনা-ভাগে ষষ্ঠীবর তাঁহার এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,—

'জ্যেষ্ঠ ভাই বন্দি গাই পিতার সমান'।[১]

অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, কাব্যারম্ভের এই প্রকার বন্দনা-ভাগ সাধারণত কাব্যের গায়েন কর্তৃকই রচিত হইয়া কাব্যমধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। তবে এই পদটি প্রক্ষিপ্ত নহে বলিয়াই মনে হয়। কারণ, একাধিক পুঁথিতে ইহা পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীতও গায়েনের প্রক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক দেব-বন্দনার পদ সাধারণত যেমন লৌকিক ছন্দ ও স্থানীয় বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে, ইহা তেমন হয় নাই; দেব-বন্দনার অংশটি বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা এবং সমগ্র কাব্যের অঙ্গীভূত বলিয়া মনে হয়। অতএব এই পদটিকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া কবি ষষ্ঠীবরের এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতেছি।

ষষ্ঠীবরের উপাধি ছিল গুণরাজ খাঁ। তাঁহার কাব্যের ভণিতায় পাওয়া যায়,—'ভণে গুণরাজ খানে কাজীর বড়াই'।[২] প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে গুণরাজ খান উপাধিধারী আরও কয়েকজন কবির সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। কিন্তু তাঁহাদের কেহই মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা করেন বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই। প্রথমতঃ বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কুলীন গ্রামের প্রসিদ্ধ মালাধর বসু। তিনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে 'শ্রীমদ্ভাগবত', দশম ও একাদশ স্কন্ধের বাংলা অনুবাদ করিয়া সম্ভবত গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দীন বার্‌বাক শাহের নিকট হইতে 'গুণরাজ খান' উপাধি প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয়ত, 'লক্ষ্মীচরিত্র' রচয়িতা শিবানন্দ কর নামক এক কবির উপাধি 'গুণরাজ খান' ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়।[৩] গুণরাজ খানের ভণিতায় একটি সাধন-ভজনের পদ চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৪] কবির নাম মনে হয় হরিদাস রায়, উপাধি গুণরাজ খান।[৫] দেখা যাইতেছে, ইঁহাদের মধ্যে কেহই পদ্মাপুরাণ রচনা করেন নাই। অতএব ষষ্ঠীবরের কাব্যে পদ্মাপুরাণ বিষয়ক পদগুলিতে প্রাপ্ত

১। ষষ্ঠীবরের পদ্মাপুরাণ, ফণীন্দ্রচন্দ্র দাস ও গিরিশচন্দ্র দাস সম্পাদিত (শ্রীহট্ট, ১৩৪৩), ১।

২। ব-সা-প ১, ২৫৫; H. B. II., 135-36.

৩। গ-স ৪৯৫৬; গ-স ৪৭৫৬ (খ)

৪। বা-প্রা-পু-বি ১-১, ১৭

৫। স্বর্গত ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় গুণরাজ উপাধিবিশিষ্ট হৃদয় মিশ্র নামে এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন (ঐ, ৪২৮); কিন্তু তাঁহার কোন পরিচয় কিংবা রচনার কথা তিনি উল্লেখ করেন নাই। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে হৃদয় মিশ্র নামে কেহ কোন বিষয়ে কোন কাব্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। এ যাবৎ প্রকাশিত অন্য কোন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও এমন কোন নাম পাওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর পিতামহের নাম ছিল হৃদয় মিশ্র, কিন্তু প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তাঁহার কোন রচনার উল্লেখ পাওয়া যায় না; কিংবা তাঁহার গুণরাজ উপাধি ছিল বলিয়াও জানা যায় না।

এই উপাধিটি ষষ্ঠীবর ব্যতীত যে অন্য কাহারও হইতে পারে না, তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়। এই উপাধিটি ষষ্ঠীবর কাহার নিকট হইতে লাভ করেন, তিনি নিজেও কোথাও তাহা উল্লেখ করেন নাই। তবে ইহা স্থানীয় কোন বিদ্যোৎসাহী রাজা কিংবা নবাব কর্তৃক প্রদত্ত হইতে পারে। মালাধর বসুর 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র অনুবাদ পুস্তক 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' বা 'গোবিন্দ-বিজয়' চৈতন্যধর্ম-প্রভাবিত শ্রীহট্ট জেলায় ব্যাপক প্রচলিত ছিল। শ্রীহট্ট হইতে ইহার অনেক পুঁথিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব মনে হয়, মালাধর বসুর নবাব-প্রদত্ত গুণরাজ খান উপাধির অনুকরণেই কবি ষষ্ঠীবরকেও স্থানীয় কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি গুণরাজ খান উপাধিতে ভূষিত করেন।[১]

ষষ্ঠীবর তাঁহার কাব্যের সর্বত্র শ্রীষষ্ঠীবর, কবি ষষ্ঠীবর, ষষ্ঠীবর এই প্রকার ভণিতাই শুধু ব্যবহার করিয়াছেন, কোথাও কোন কৌলিক পদবী ব্যবহার করেন নাই। রজনীমোহন চক্রবর্তী সম্পাদিত একখানি 'বাইশ কবির মনসা-মঙ্গলে' ষষ্ঠীবরের কতকগুলি পদ পাওয়া যায়। তাহার একস্থলে এই প্রকার ভণিতা পাওয়া যাইতেছে —

শ্রীহট্টের দত্তগ্রাম হয় ষষ্ঠীবর ধাম
মাতৃদেবী অতি পুণ্যশীলা।
তার গর্ভে জনমিয়া পদ্মাপুরাণ বিরচিয়া
দত্তবংশ কীর্তি প্রকাশিলা।।[২]

বলা বাহুল্য, এই পদটির ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গি অত্যন্ত আধুনিক। মনে হয়, বিংশতি শতাব্দীর ছন্দ, মাত্রা ও মিল বিষয়ে লব্ধজ্ঞান কোনও আধুনিক কবির ইহা অত্যন্ত সুপরিণত রচনা। বিশেষত এই পদটি ষষ্ঠীবরের অন্য কোনও মুদ্রিত কিংবা হস্তলিখিত পুঁথিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য এই পদটির কৃত্রিমতা হইতেই ষষ্ঠীবর যে শ্রীহট্টের অধিবাসী কিংবা দত্ত-বংশজ ছিলেন না, এমন প্রমাণিত হয় না। ষষ্ঠীবর সম্বন্ধে প্রচলিত লোকশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া অত্যন্ত আধুনিক কালে কেহ হয়ত এই পদটি রচনা করিয়াছেন। অতএব ইহাকে কবির নিজ প্রদত্ত আত্মপরিচয় বলিয়া গণ্য করিলে নিতান্তই ভুল করা হইবে।

ভণিতা হইতে ষষ্ঠীবরের কোন পরিচয়, এমন কি, কুলপরিচয় পর্যন্ত পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু ষষ্ঠীবরের কাব্যোক্ত ভণিতাগুলির একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে লক্ষ করা যায়। লাচারী ছন্দের পদগুলির মধ্যে তাঁহার ভণিতা প্রায় সর্বত্রই অভিন্ন; যথা,

কহে ষষ্ঠীবর কবি কণ্ঠে ভারতী দেবী
সরস্বতী (কিংবা বিষহরী) যারে দিলা বর।

অভিন্ন ভণিতা ব্যবহারের রীতি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে আরও কয়েকজন কবি অবলম্বন

১। কবি ষষ্ঠীবরের বংশধরদিগের বিশ্বাস উপাধিটি গৌড়ের নবাব কর্তৃক প্রদত্ত। অবশ্য এই গৌড় শ্রীহট্টেরই অন্তর্গত।

২। বটতলায় প্রকাশিত (কলিকাতা, ১৩৪৫), ২৪২

করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে 'চৈতন্য-ভাগবত'-এর কবি বৃন্দাবন দাস ও মহাভারতের অনুবাদকার কাশীরাম দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। অতএব অভিন্ন ভণিতা ব্যবহারের রীতি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অপ্রচলিত ছিল না। ষষ্ঠীবর অন্যত্র না হউক অন্তত ত্রিপদী বা লাচারী ছন্দের পদগুলিতে ভণিতা ব্যবহার কালে সর্বত্র এই অভিন্নতা রক্ষা করিয়াছিলেন। ষষ্ঠীবরের পদের প্রামাণিকতা বিচার করিবার কালে এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখার যোগ্য; কারণ, কোন লাচারী ছান্দের পদ এই প্রকার ভণিতায় লিখিত না হইলে তাহা প্রকৃতই ষষ্ঠীবরের রচনা কিনা, এই বিষয়ে যথার্থ সন্দেহের সৃষ্টি হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই যুক্তি দ্বারাও রজনীমোহন চক্রবর্তী সম্পাদিত 'পদ্মাপুরাণ' বা 'মনসা-মঙ্গলে' ষষ্ঠীবরের নামে উদ্ধৃত উক্ত ত্রিপদী ছন্দের পদটিকে অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। অতএব এই পদটিকে ভিত্তি করিয়া কবির বাসস্থান ও কুলপদবী সম্বন্ধে কোন নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে না। কবি ষষ্ঠীবরের নামে প্রচলিত এ যাবৎ আবিষ্কৃত কোন হস্তলিখিত পুঁথিতে তাঁহার বাসস্থান, কাল ও কুল সম্বন্ধে কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালায় রক্ষিত একখানি 'বাইশ কবির পদ্মাপুরাণে'-এ ষষ্ঠীবরের একটি পদের শেষে নিম্নলিখিত রূপ একটি ভণিতা পাওয়া যায়—

শিশুমতি কবি কাণে বিক্রমখানে ভণে
পাটলী নদীর তীরে ঘর।
শ্রীষষ্ঠীবর কবি কণ্ঠে ভারতী দেবী
আপনে শঙ্কর দিলা বর।।[১]

এই বিক্রমখানই বা কে, কোন্ নদীকেই বা পাটলী নদী বলা হইয়াছে, তাহা কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে ষষ্ঠীবর যে শিবের ভক্ত ছিলেন, সে সম্বন্ধে এখনও জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত উমা-মহেশ্বরের মন্দিরের কথা পরে আলোচিত হইয়াছে।

একমাত্র শ্রীহট্ট অঞ্চলে ষষ্ঠীবর রচিত কাব্যের ব্যাপক প্রচার হইতেই নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, শ্রীহট্ট জেলাই কবির বাসভূমি ছিল। এই সম্বন্ধে শ্রীহট্ট জেলায় প্রচলিত জনশ্রুতি হইতে তাঁহার জীবনী সম্পর্কিত কতকগুলি তথ্যের উদ্ধার করিতে হইবে। প্রাচীন সামাজিক কুলপঞ্জীগুলিও এই বিষয়ে কতক সাহায্য করিত পারে। কবি কৃত্তিবাসের কাল ও কুল-পরিচয় উদ্ধারে সামাজিক কুলপঞ্জীগুলি যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছে। কবি ষষ্ঠীবরের পরিচয় উদ্ধারেও শ্রীহট্টের সম্ভ্রান্ত কতকগুলি পারিবারিক কুলপঞ্জী আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্যদান করিতে পারে। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, কুলপঞ্জীগুলি হইতে সর্বাংশেই নির্ভুল ঐতিহাসিক তথ্য অনেক সময় পাওয়া যায় না, তথাপি ইহাদের সঙ্গে স্থানীয় বহুল প্রচলিত লোকশ্রুতিগুলি পরীক্ষা করিয়া প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করিতে কোন বেগ পাইতে হয় না।

১। ঢা-৪৭৭০, ৩ (খ)

'বৈদ্যজাতির ইতিহাস' প্রণেতা বসন্তকুমার সেনগুপ্ত তাঁহার প্রণীত অন্যতম পুস্তক 'চক্রপাণি দত্ত' নামক গ্রন্থে কবি ষষ্ঠীবর সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।[১] অবশ্য তাঁহার আলোচনার ভিত্তি 'বৈদ্যজাতির ইতিহাস', 'বৈদ্যকুলপঞ্জী', 'কবি কণ্ঠহার', 'চন্দ্রপ্রভা' প্রভৃতি কুলজী গ্রন্থ। তিনি 'চক্রপাণিদত্ত' গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, 'ষষ্ঠীবর দত্ত শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত মৌলবীবাজার মহকুমার গয়গড় গ্রামের প্রসিদ্ধ দত্তবংশের পূর্বপুরুষ। গরগড়ের দত্তবংশ বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজে একেবারে অপরিজ্ঞাত নহেন। মহারাজ বল্লাল সেন দ্বারা উপদ্রুত হইয়া যে সব বৈদ্যগণ রাঢ় ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বসতি স্থাপন করেন, তন্মধ্যে ষষ্ঠীবরের পূর্বপুরুষ অন্যতম। পশ্চিম রাঢ়ে বটগ্রাম নিবাসী শাণ্ডিল্যগোত্রীয় মেদিনীধর দত্ত, চক্রধর দত্ত, ধরাধর দত্ত নামক তিন সহোদর বল্লাল সেন কর্তৃক উপদ্রুত হইয়া তাঁহাদের গুরু ও পুরোহিত শুক্লাম্বর মিশ্র সহ সুদূর পূর্বাঞ্চল শ্রীহট্টে আসিয়া প্রথম ইটা পরগণায় বসবাস করেন। মেদিনীধর দত্তের বংশধরগণ গৌড়াধিপতি (এই গৌড় শ্রীহট্ট জেলার অংশ বিশেষ, প্রাচীন শ্রীহট্ট তিন ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা—লাউড়, গৌড় ও জয়ন্তীয়া) সুবুদ্ধি নারায়ণ (প্রচলিত সুবিদ নারায়ণ) হইতে বহু ভূসম্পত্তি ও কানুনগু (প্রচলিত কানুনগো) উপাধি প্রাপ্ত হন। উক্ত মেদিনীধর দত্তের বংশধরগণ পরে হংসখলা (প্রচলিত হাঁসখলা) হইতে উক্ত পরগণার গরগড় মৌজায় বাস করিতে থাকেন। দ্বিতীয় ভ্রাতা চক্রধর দত্ত উক্ত পরগণার নিকটবর্তী দত্তগ্রামে ও তৃতীয় ভ্রাতা ধরাধর দত্ত ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত সরাইল পরগণার কালীকচ্ছ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন। আমাদের আলোচ্য কবি ষষ্ঠীধর দত্ত মেদিনীধর দত্তের অধস্তন সন্তান।'

এই গ্রন্থেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ষষ্ঠীবরের উপাধি ছিল গুণরাজ, ইহাও রাজদত্ত উপাধি। কিন্তু কোন্ গুণগ্রাহী রাজা তাঁহাকে এই উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন, তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাঁহার এই উপাধি যে তৎকা[illegible] সর্বজনবিদিত ছিল, তাহা এই উক্তি হইতেই জানিতে পারা যায়,—'ষষ্ঠীবর বা গুণরাজের কন্যা "বৈদ্যকুলপঞ্জী" প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ চতুর্ভুজ সেনকে বিবাহ করেন।[২] অন্যান্য কয়েকখানা রাঢ়ীয় বৈদ্যজাতির কুলগ্রন্থেও গুণরাজের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—'অন্যো গুণাকরোনামা যে গুণরাজ খানকঃ'।[৩] কুলপঞ্জিকাগুলি অনুসারেও দেখিতে পাওয়া যায়, ষষ্ঠীবরের এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার বিষয় যে কবি গ্রন্থের প্রারম্ভিক বন্দনায় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। অবশ্য ষষ্ঠীবর উক্ত বন্দনায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কোন নামের উল্লেখ করেন নাই—শুধু 'জ্যেষ্ঠ ভাই' বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কুলপঞ্জিকাগুলিতে তাঁহার নাম পাইতেছি হৃদয়ানন্দ। ষষ্ঠীবরের কাব্যে হৃদয়ানন্দের ভণিতায়ও অনেকগুলি লাচারী ছন্দের পদ পাওয়া যায়। কথিত আছে,

১। বসন্তকুমার সেনগুপ্ত, চক্রপাণি দত্ত (১৩২৬), ৫ম অধ্যায়।

২। 'কবিকণ্ঠহার' (২য় সংস্করণ), ১০৮, ৩। 'চন্দ্রপ্রভা' (?) ২০৩।

হৃদয়ানন্দ একজন সুগায়ক ছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার রচিত পদ সম্ভবত তিনি নিজেও গান করিতেন, ইহাতেই তাঁহার নামও ষষ্ঠীবরের কতকগুলি পদে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে ; কিংবা তিনি নিজেই হয়ত এই সকল পদ রচনা করিয়া থাকিবেন। হৃদয়ানন্দ সম্বন্ধে একটি সুন্দর জনশ্রুতি গয়গড় অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। তাহা এই প্রকার— 'হৃদয়ানন্দ দত্ত কানুনগো একদা এক বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন করেন। কথিত আছে, তদনুসারে পরদিন প্রভাতে এক ব্রাহ্মণ ও ব্যক্তিসহ স্বীয় পুষ্করিণীর ঘাটে গিয়া ব্রাহ্মণক জলে নামাইলেন। ব্রাহ্মণ জলে অন্বেষণ করিতে করিতে গৌরীপাট সহ উমা-মহেশ্বরর এক পাষাণ-মূর্তি প্রাপ্ত হইলেন। তৎসহ গায়কের ব্যবহারোপযোগী 'তালচর' প্রভৃতি আরও কয়েকটি দ্রব্য ও তাম্রপত্রে লিখিত উমা-মহেশ্বরের ধ্যানাদি প্রাপ্ত হন। হৃদয়ানন্দ নিজ ভ্রাতা ষষ্ঠীবর দত্ত সহ পরামর্শক্রমে বহির্বাটিকায় এক গৃহ নির্মাণ করিয়া দেবতাকে সংস্থাপিত করেন। চৈত্রসংক্রান্তি যোগে এই দেবতার সম্মুখে চড়ক পূজা হইত।'[১] এই শিব এখনও প্রতিষ্ঠিত আছেন। উমা-মহেশ্বরের শিবের বাড়ি এই অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। চড়ক পূজার সময় এখনও এখানে বড় মেলা হইয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন, ইহারই উল্লেখ করিয়া কবি তাঁহার কাব্যের কোন কোন স্থলে ভণিতায় লিখিয়াছেন—

শ্রীষষ্ঠীবর কবি, কণ্ঠে ভারতী দেবী
আপনি শঙ্কর দিলা বর।

এই সকল লোকশ্রুতির মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য যদি নাও থাকে, তথাপি ইহাদের দ্বারা কবির জনসাধারণের মধ্যে কতদূর প্রতিষ্ঠা ছিল, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। ষষ্ঠীবরের পিতার নাম ভুবনানন্দ (কোন কোন বংশলতা অনুসারে ভূমানন্দ), পিতামহের নাম পুরুষোত্তম ; এই নাম হৃদয়ানন্দের বংশধর বলিয়া পরিচিত দত্তপদবীধারী গয়গড় গ্রামের অধিবাসীদিগের গৃহে রক্ষিত বংশাবলীতে পাওয়া যাইতেছে।

কেহ কেহ অনুমান করেন, ষষ্ঠীবরেরই উপাধি ছিল হৃদয়ানন্দ, তাঁহার কোন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিল না। কিন্তু আমরা পূর্বেই কবির গ্রন্থারম্ভের বন্দনা-ভাগ হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, তাহাতে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উল্লেখ করিয়াছেন ; অতএব ষষ্ঠীবরের একজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হয়। কেহ আবার অনুমান করেন, হৃদয়ানন্দও 'মনসা-মঙ্গলের কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।' কিন্তু ইহাও ভুল। কারণ, এই অঞ্চলে এমন কোন জনশ্রুতি প্রচলিত নাই। তাঁহার রচিত কোন স্বতন্ত্র কাব্য, কিংবা শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রচলিত কোন বাইশাতেও তাঁহার কোন বিচ্ছিন্ন পদও পাওয়া যায় না। কেবল ষষ্ঠীবরের পুঁথিতে ষষ্ঠীবরের সঙ্গে তাঁহার ভণিতার কয়েকটি পদ পাওয়া যায়। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, স্থানীয় জনশ্রুতি এই যে তিনি একজন সুগায়ক ছিলেন ; সম্ভবত তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতার রচনা নিজেও গান করিতেন, তাহারই ফলে ষষ্ঠীবরের সঙ্গে কয়েক স্থলে হৃদয়ানন্দের

১। অচ্যুতচরণ চৌধুরী, ৩, ২৯৫।

ভণিতাও স্থান পাইয়াছে।

ষষ্ঠীবরের সম্বন্ধে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' পুস্তকে আরও বলা হইয়াছে—'ষষ্ঠীবর স্বয়ং "তালচর" হাতে লইয়া পদ্মাপুরাণ গান করিতেন। তাঁহার গান অত্যন্ত সুন্দর শুনাইত। ষষ্ঠীবর কর্তৃক মনসাদেবীর পূজার জন্য যে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার বংশধরেরা বর্তমানে লংলা পরগণার "রায়ের গাঁও" নামক গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহারা অদ্যাপি পদ্মাপুরাণ গান করিয়া থাকেন।'[১] ষষ্ঠীবরের দীঘি এখন অনেকটা অসংস্কৃত অবস্থায় আছে। দীঘির নিকটেই উমা-মহেশ্বরের শিবের বাড়ি। পূজকেরা দেবোত্তর ভোগ করিতেছেন। তাঁহারা পদ্মাপুরাণ রয়চিতা কবি ষষ্ঠীবর প্রতিষ্ঠিত উমা-মহেশ্বরের শিবের পূজক বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকেন। শ্রীহট্ট জেলায় বিশেষত মৌলভীবাজার মহকুমায় কবি ষষ্ঠীবর ও তাঁহার সাধনা সম্বন্ধে আরও বহু লোকশ্রুতি অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ইহা হইতেই নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, কবি শ্রীহট্ট জেলার মৌলভী বাজার মহকুমার অন্তর্গত গয়গড় গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন। অদ্যাপি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বংশধরগণ এই গ্রাম ও এই জেলার অন্যত্র বসবাস করিতেছেন।

পূর্বোদ্ধৃত কুলপঞ্জিকার একটি উক্তি হইতে জানিতে পারা যায় যে, কবি ষষ্ঠীবরের এক কন্যা ছিল। 'বৈদ্যকুলপঞ্জী' প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ চতুর্ভুজ সেনের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। ষষ্ঠীবরের আর কোন সন্তানাদি ছিল কিনা জানিবার উপায় নাই। সম্ভবত ছিল না ; কারণ, কুলপঞ্জীগুলিতে তাঁহার অধস্তন বংশাবলী নির্ণয় করা হয় নাই। হৃদয়ানন্দের চারি পুত্র ছিল, আধুনিকতম কাল পর্যন্ত তাঁহাদেরই বংশাবলী নির্ণীত হইয়াছে। এই জন্যই সম্ভবত কেহ কেহ হৃদয়ানন্দকেই ষষ্ঠীবরের উপাধি অনুমান করিয়া আধুনিকতম কাল পর্যন্ত কবির বংশধারা যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহা দেখাইতে চাহেন। কিন্তু আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি, হৃদয়ানন্দ ষষ্ঠীবরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ; ষষ্ঠীবরের উপাধি ছিল গুণরাজ খাঁ, একজনের দুই উপাধি থাকাও এখানে সম্ভবপর নহে। বিশেষত তিনি তাঁহার একজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা গ্রন্থ-বন্দনায় উল্লেখও করিয়াছেন, অতএব মনে হয়, ষষ্ঠীবর নিঃসন্তান না থাকিলেও অপুত্রক ছিলেন, তাঁহার কন্যার দিকেরই বংশ বর্তমান আছে।

কবি ষষ্ঠীবর তাঁহার কাব্যমধ্যে গ্রন্থ-রচনার কাল সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করিয়া যান নাই ; কাব্যের ভাষা বিচার করিয়াও কাল-নিরূপণের কোনও উপায় নাই ; কারণ, বহুল প্রচারের জন্য তাঁহার প্রায় প্রত্যেক পুঁথিরই ভাষা আধুনিকতায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার কাব্যমধ্যে অন্যান্য কবির রচনাও প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাঁহার কাব্যমধ্যে সমসাময়িক কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিরও নামোল্লেখ নাই। অতএব কবির আবির্ভাব কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে কয় পুরুষ অতিবাহিত হইয়াছে, তাহারই একটা আনুমানিক হিসাব দ্বারা কবির সময় নিরূপণ করা ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। হৃদয়ানন্দের বংশধরদিগের গৃহে

১। অচ্যুতচরণ চৌধুরী, ঐ

তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের যে বংশলতা রক্ষিত আছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ষষ্ঠীবরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হৃদয়ানন্দের সময় হইতে বর্তমানে নবম পুরুষ চলিতেছে।[১] (১৩২৪ সালে লিখিত বিবরণী মতে ; সম্ভবত ইহার পর হইতে বর্তমানে আরও এক পুরুষ অতিবাহিত হইয়াছে।) গড়ে চারি পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া হিসাব করিলে দেখা যায়, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে কবি ষষ্ঠীবর জীবিত ছিলেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেই সম্ভবত তাঁহার কাব্য রচিত হয়। তিনি 'পদ্মাপুরাণ' ব্যতীত আর কোন কাব্য রচনা করেন বলিয়া জানা যায় না।

স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইত প্রকাশিত (১৯২৪) 'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়', প্রথম খণ্ডে কবি ষষ্ঠীবরের 'পদ্মাপুরাণ' হইতে কতক মনোনীত অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কবির পরিচয় প্রসঙ্গে ডক্টর সেন মহাশয় সেখানে উল্লেখ করিয়াছেন, ষষ্ঠীবর সেন ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন ৩৫০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। ইহারা উভয়েই প্রাচীন বঙ্গের বিখ্যাত কবি। পূর্ব বঙ্গের ৩০০ বৎসরের প্রাচীন পুঁথিগুলিতে ইহাদের বহুসংখ্যক কবিতা পাওয়া গিয়াছে। ইহারা রামায়ণ, মনসা-মঙ্গল, মহাভারত প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাদের জন্মভূমি বিক্রমপুর দীনারদি গ্রাম। এখন এই গ্রামের নাম ঝিনারদি।[২] এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকেও এই কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন।[৩] কিন্তু এই উক্তি যে সম্পূর্ণই ভ্রমাত্মক, তাহা নিম্নলিখিত আলোচনা হইতেই প্রতীয়মান হইবে।

পদ্মাপুরাণের যে অংশ স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয় তাঁহার সংকলিত পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার কোনও স্থলে তাঁহার এই উক্তির সমর্থক কোনও পদ পাওয়া যায় না। এতদ্ব্যতীত ষষ্ঠীবরের যে সকল মুদ্রিত কিংবা হস্তলিখিত পুঁথি ও বিচ্ছিন্ন পদ আজ পর্যন্তও প্রচলিত আছে, তাহাদের কোনটির মধ্যেই এই উক্তির সমর্থক কোনও পদ নাই। ষষ্ঠীবরের পদবী যে 'সেন' ছিল, ষষ্ঠীবরের কাব্যমধ্যে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কর্তৃক উদ্ধৃত অংশে কিংবা অন্যত্রও কোন স্থলেই তাহার উল্লেখমাত্র নাই। তবে তিনি কোন্ যুক্তির মোহে এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইলেন?

দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ষষ্ঠীবর সেন নামক একজন কবি মহাভারতের কোন কোন অংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটির প্রাচীন পুঁথিশালায় রক্ষিত সঞ্জয়-রচিত মহাভারতের পুঁথিতে প্রাপ্ত এই পদের ভণিতাটি হইতে মনে হয়, এই ষষ্ঠীবর 'স্বর্গারোহণ পর্ব' সম্পূর্ণ অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং জগদানন্দ (হৃদয়ানন্দ নহে) নামক কোন ব্যক্তি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—

১। অচ্যুতচরণ চৌধুরী, ঐ, পৃঃ ২৯৬, পাদটীকা।

২। পৃঃ ২৫০ ; দীনারদি বা জিনারদি গ্রাম বিক্রমপুরে নহে, ইহা ঢাকা জেলার মহেশ্বরদি পরগণায় অবস্থিত, ৩। দীনেশচন্দ্র সেন, ৪২৮

অমৃত লহরী ছন্দ, পুণ্যভারতের বন্ধ, কৃষ্ণের চরিত্র শেষ পর্ব।
শ্রীযুক্ত জগদানন্দে অহর্নিশি হরি বন্দে কবি ষষ্ঠীবর কহে সর্বে।।[১]

এতদ্ব্যতীত আরও পাওয়া যায়—

পাঞ্চালী প্রবন্ধে পোথা রচিল সংসারে।
নারায়ণ পদতলে ভণে ষষ্ঠীবরে।।[২]

অতএব দেখা যাইতছে, এই ষষ্ঠীবরের ভণিতা ব্যবহারের রীতিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মহাভারতের অনুবাদকার এই ষষ্ঠীবরের পুত্রের নাম গঙ্গাদাস সেন। তিনি সংক্ষেপে রামায়ণ ও সমগ্র অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন। এতদ্ব্যতীত পদ্মাপুরাণেও তাঁহার কতকগুলি পদ পাওয়া যায়। গঙ্গাদাস সেন তাঁহার রচনার প্রায় প্রতি পত্রে তাঁহার কুল-পরিচয় দিয়া গিয়াছেন,—

পিতামহ কুলপতি পিতা ষষ্ঠীবর।
যার যশ ঘোষে লোকে পৃথিবী ভিতর।।

কোন কোন স্থলে তাঁহার এই প্রকার পরিচয় পাওয়া যায়,—

কুলপতি সেন সুত কবি ষষ্ঠীবর।
সর্বলোকে জানে তান দিনিদিপে ঘর।।[৩]

আবার অন্যত্র পাওয়া যায়,—

পিতামহ কলপতি পিতা ষষ্ঠীবর।
যাহার কীর্তি ঘোষে দেশ দেশান্তর।।
জ্যেষ্ঠ ভাই সত্যবান নানা বুদ্ধিমন্ত।
নানা শাস্ত্রে বিশারদ গুণে নাহি অন্ত।।
গঙ্গাদাস সেন কহে অনুজ তাহার
অশ্বমেধ পুণ্য কথা রচিল পয়ার।।[৪]

গঙ্গাদাস প্রায় সর্বত্রই তাঁহার ভণিতায় নিজের কৌলিক উপাধি 'সেন' ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার পদ্মাপুরাণেও একটি পদে পাওয়া যায়,—

রামকৃষ্ণ দ্বিজে কয়   নারীগণে জয় জয়
গঙ্গাদাস সেনে সুরচন।[৫]

কিংবা,—

১। পত্র সংখ্যা ৭৮৯ ২। বা-প্রা-পু-বি ১-১, ১৭২
৩। ঢা ৪৪৩৬, ২ (ক)
৪। বা-প্রা-পু-বি, ১৩৪
৫। ব-সা-প, ১, ২৫৯ ;

ষষ্ঠীবর সুত সেন পদ বন্দে সঙ্কেতেন
গঙ্গাদাসে রচিল পয়ার।[১]

গঙ্গাদাস রচিত রামায়ণের অনুবাদেও পাওয়া যায়,—

গঙ্গাদাস সেন কহে ষষ্ঠীবর সুত।
সীতার চরিত্র কথা শুনিতে অদ্ভুত।।[২]

গঙ্গাদাস সেনের সময় সম্পর্কে আমি পূর্বে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, তিনি খ্রীষ্টীয় ১৫৫৩ অব্দে অশ্বমেধ পর্বের বাংলা অনুবাদ করেন বলিয়া নিশ্চিত জানিতে পারা যায়। পিতা ষষ্ঠীবর সেন তাহারও অন্তত ৩০ বৎসরর অগ্রবর্তী অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই বর্তমান ছিলেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। বলা বাহুল্য, নামের সামঞ্জস্য হেতু ষষ্ঠীবর দত্তকেই দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ষষ্ঠীবর সেন বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। তিনি কবির পরিচয়-জ্ঞাপক যে সকল পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন[৩] তাহাদের কোনটিই ষষ্ঠীবরের স্বরচিত নহে, কিংবা কোন পদ্মাপুরাণের পুঁথিতেও প্রাপ্ত নহে, তাহাদের প্রায় সমুদয়ই গঙ্গাদাস সেনের অশ্বমেধ পর্ব হইতে উদ্ধৃত। গঙ্গাদাস আত্মকুল-পরিচয় প্রসঙ্গে পিতা ষষ্ঠীবরের নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং গঙ্গাদাসের ষষ্ঠীবর সম্পর্কিত এই উল্লেখই স্বর্গত ডক্টর সেনের উক্ত মতপোষকতার একমাত্র ভিত্তি। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইতেন যে, গঙ্গাদাস সেনের পিতা ষষ্ঠীবর ও পদ্মাপুরাণ-রচয়িতা ষষ্ঠীবর পরস্পর স্বতন্ত্র ব্যক্তি—বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন কালে আবির্ভূত হইয়া বিভিন্ন বিষয়বস্তু লইয়া তাঁহারা কাব্য রচনা করিয়াছেন। স্বভাবতই তাঁহাদের পিতৃপরিচয়ও বিভিন্ন। মহাভারতের অনুবাদক ষষ্ঠীবর সেন ছিলেন সুবর্ণ বণিক জাতীয় এবং পদ্মাপুরাণ-রচয়িতা ষষ্ঠীবর ছিলেন কুলীন বৈদ্যবংশোদ্ভূত—তাঁহার কৌলিক উপাধি ছিল দত্ত। গঙ্গাদাস তাঁহার পিতাকে সর্বত্র যশস্বী বলিয়া বর্ণনা করিলেও কোথাও 'গুণরাজ' যে তাঁহার উপাধি ছিল, তাহা বলেন নাই ; মহাভারতের অনুবাদে ষষ্ঠীবর কোথাও 'গুণরাজ' উপাধি নিজেও ব্যবহার করেন নাই। জগদানন্দ নামক কোন ব্যক্তি ষষ্ঠীবর সেনের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, কিন্তু পদ্মাপুরাণে তাঁহার কোনও উল্লেখ নাই। এক ষষ্ঠীবর উভয় কাব্যের রচয়িতা হইলে উভয় স্থলেই তাঁহার নাম পাওয়া যাইত। ষষ্ঠীবর সেনের বাসস্থান জিনারাদি অঞ্চলে ষষ্ঠীবর দত্তের পদ্মাপুরাণ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। পূর্বেই বলিয়াছি, একমাত্র শ্রীহট্টেই ইহার প্রচার হইয়াছিল এবং বর্তমানেও আছে। অতএব শ্রীহট্টের স্থানীয় কোনও কবি ব্যতীত ইহা অন্য কাহারও রচনা হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং ষষ্ঠীবর সেন নামক কোনও ব্যক্তি যে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পদ্মাপুরাণ বলিয়া পরিচিত কোন কাব্য রচনা করেন নাই, তাহা এ যাবৎ আবিষ্কৃত তথ্যের উপর নির্ভর

১। ঐ ৬৯৩ ;
২। *D. C. B. M. C. U. I;* ১৩২
৩। দীনেশচন্দ্র সেন, ৪২৮

করিয়া নিশ্চিতরূপেই বলা যাইতে পারে।

স্বর্গত ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পথ অনুসরণ করিয়া কেহ কেহ মনসা-মঙ্গলের অন্যতম কবি হিসাবে গঙ্গাদাস সেনের পিতা 'ষষ্ঠীবর সেন'-এর নামোল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য তথ্যের অভাবে এই বিষয়ক আলোচনা বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। কেহ কেহ পদ্মাপুরাণের কবি হিসাবে ষষ্ঠীবর সেনের পরও ষষ্ঠীবর দত্তের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, ষষ্ঠীবর সেন ও ষষ্ঠীবর দত্ত নামে স্বতন্ত্র দুইজন পদ্মাপুরাণের কবির অস্তিত্ব অনুমিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্বের আলোচনা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, এই অনুমানও সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন ষষ্ঠীবর সেনের নামে যাহা 'বঙ্গ সাহিত্য-পরিচয়', প্রথম ভাগে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাই ষষ্ঠীবর দত্তের মুদ্রিত পদ্মাপুরাণেও যে কি ভাবে পাওয়া যাইতেছে, তাহা এখানে একটু উদ্ধৃতি সহযোগে দেখা যাইতে পারে। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্ধৃতাংশের প্রথম দিক হইতে দেখা যাউক—

'সোনেকাতে জিজ্ঞাসা করিল সদাগর।
বিবাহ নি করিয়াছে পুত্র লক্ষীন্দর'।।
সোনেকা-এ বলে পুত্র বিবাহ নাঞি করে।
কেমতে হইব বিহা তুমি নাহি ঘরে।।
সদাগর বোলে শুভ গো পোহাক রজনী।
কালিকা কহিব পুত্রবধূর কারণী।।[১] ইত্যাদি।

ষষ্ঠীবর দত্তের মুদ্রিত পুঁথিতে এই স্থানের পাঠ—

'সুনুকাতে জিজ্ঞাসা করিল সদাগর।
কোথা বিয়া করাইছ পুত্র লক্ষ্মীন্দর।।
সুনুকায় বলে পুত্র বিয়া নাহি করে।
কেমতে করাইমু বিয়া তুমি নাহি ঘরে।।
চান্দে বলে শুভে শুভে পোহাউক রজনী।
কালি প্রভাতে যাইমু বধূর যুড়ানী।।[২]

এই উভয় অংশ যে একই কবির অভিন্ন রচনার দুইটি স্বতন্ত্র পাঠ মাত্র, এ বিষয়ে কাহারও কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। তবে শ্রীহট্টের মুদ্রিত পুঁথিগুলি প্রায় সম্পূর্ণই বহুলাংশে আধুনিকতায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেন যে পুঁথি হইতে তাঁহার নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে প্রাচীনতা-দ্যোতক ; এই জন্য

১। ব-সা-প, ২৫৫
২। ফণীন্দ্রনাথ দাস ও গিরীশচন্দ্র দাস সম্পাদিত ষষ্ঠীবর দত্তের পদ্মাপুরাণ, (শ্রীহট্ট, ১৩৪৩) ১০১

ইহাদের মধ্যে কোনও কোনও স্থলে সামান্য ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গিগত ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। অতএব স্বর্গত ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন ও তাঁহার পরবর্তীদিগের কল্পিত পদ্মাপুরাণের কবি ষষ্ঠীবর সেনই যে ষষ্ঠীবর দত্ত এই বিষয়ে আর কোনও সংশয়ের কারণ থাকে না।

নারায়ণ দেব ষষ্ঠীবর হইতে শতাধিক বৎসরের অগ্রবর্তী এবং শ্রীহট্ট অঞ্চলে নারায়ণদেবের কাব্যের ব্যাপক প্রচলন থাকা সত্ত্বেও ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, ষষ্ঠীবরের কাব্যে নারায়ণ দেবের কোনও প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। একমাত্র ষষ্ঠীবরের কাব্য ব্যতীত এমন কোন পদ্মাপুরাণ কাব্য এই অঞ্চলে প্রচলিত নাই যে, তাহাতে অন্তত নারায়ণ দেবের ভণিতাযুক্ত কোনও পদ পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় ষষ্ঠীবর নারায়ণ দেবের প্রভাব হইতে যে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। বিষয়ের দিক দিয়াও ষষ্ঠীবরের কাব্যে এমন সব বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়, যাহাতে সহজেই মনে হয়, ষষ্ঠীবরের আদর্শ নারায়ণ কিংবা এতদ্দেশীয় অন্যান্য পদ্মাপুরাণের কবি হইতে স্বতন্ত্র ছিল। কাব্যের মধ্যে সম্ভবত তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত কয়েকটি অভিনব চরিত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। প্রধান চরিত্রের মধ্যে বেহুলার মাতার নাম কমলা, প্রায় সমগ্র পূর্ববঙ্গের অন্যান্য পদ্মা পুরাণে সুমিত্রা নাম পাওয়া যায়, উত্তরবঙ্গের কোন কোন পুঁথিতে অমলা ও মেনকা নাম পাওয়া যায়। কমলা নাম এ'যাবৎ আমি অন্য কোনও পুঁথিতে পাই নাই। ষষ্ঠীবরের কাব্যে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য করিবার স্থান লঙ্কা, অন্য কোন কাব্যে লঙ্কার নাম নাই ; নদীর নাম গণ্ডকী, অন্যত্র প্রায় সর্বত্রই গাঙ্গুরী ; ষষ্ঠীবরের কাব্যে গণ্ডকী গাঙ্গ, গণ্ডকী সাগর (এক স্থলে গুঞ্জরী) এই সকল প্রয়োগ পাওয়া যায়। নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে বেহুলার ভ্রাতার নাম নারায়ণী, ষষ্ঠীবরের কাব্যে হরিসাধু, বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণেও এই নামটি হরিসাধু। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া মনে হয়, নারায়ণদেবের রচিত পদ্মাপুরাণের সঙ্গে ষষ্ঠীবরের আদৌ পরিচয় ছিল না ; তাঁহার কাহিনী-পরিকল্পনার স্বতন্ত্র কোনও আদর্শ ছিল ; কিন্তু তাহা কি, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। এই বিষয়টি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য। ইহাতে এমন মনে করা কি অসঙ্গত হইবে যে, ষষ্ঠীবরের সময় পর্যন্ত নারায়ণ দেবের কাব্য পূর্ব ময়মনসিংহ হইতে শ্রীহট্ট পর্যন্ত প্রসার লাভ করে নাই?

অবশ্য অধুনা প্রচলিত ষষ্ঠীবরের পদ্মাপুরাণ যে ভাবে বিকৃত হইয়াছে, তাহা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নির্ভুল হইতে পারে না। ফণীন্দ্রচন্দ্র দাস সম্পাদিত ষষ্ঠীবরের পুঁথিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ষষ্ঠীবরের একটি পদ আদ্যোপান্ত বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ হইতে গৃহীত। অবশ্য এই অংশটির জন্য ষষ্ঠীবর বিজয় গুপ্তের নিকট যে প্রত্যক্ষভাবে ঋণী, তাহা বলিতে পারা যায় না ; কারণ, তাহা হইলে ষষ্ঠীবরের উপর বিজয় গুপ্তের অন্যান্য স্থলেও প্রভাব অনুভব করা যাইত। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, ষষ্ঠীবরের কাব্যে বিষয়বস্তু দিক দিয়া কতকগুলি স্বাতন্ত্র্য আছে। এই বিশিষ্ট পরিকল্পনাগুলি ষষ্ঠীবরের মৌলিক সৃষ্টি বলিয়া বিবেচনা না করিলেও অন্তত বিজয় গুপ্তের নিকট যে তাঁহার কোন ঋণ ছিল না, তাহা বেশ

অনুভব করা যায়। অতএব মনে হয়, আধুনিক কালে অনুলিপিকারগণ কিংবা গায়েনগণ এইভাবে কোনও কোনও স্থানে একের রচনা অন্যের নামে চালাইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহার ফলেই বিজয় গুপ্তের রচনা ষষ্ঠীবরের নামে মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার মুদ্রিত কাব্যে অন্যান্য কবিরও প্রভাব বর্তমান রহিয়াছে।

ষষ্ঠীবরের কাব্য তিনখণ্ডে বিভক্ত,—দেবখণ্ড, বাণিজ্যখণ্ড ও স্বর্গারোহণ খণ্ড। দেবখণ্ড 'গরুড় পুরাণ', 'শিব-পুরাণ', মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত 'আস্তিক পর্ব' ও অন্যান্য লৌকিক কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া রচিত। নারায়ণ দেবের মত ষষ্ঠীবরের পৌরাণিক অংশ এত অনাবশ্যক বিস্তৃত কাহিনীতে পূর্ণ নহে, এই অংশ বেশ সংক্ষিপ্ত। এই পৌরাণিক অংশের কাহিনী-পরিকল্পনায়ও অনেক স্থলেই ষষ্ঠীবর মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। এই বিষয়ে তিনি সাধারণত গতানুগতিকতার ক্ষেত্র পরিহার করিয়া গিয়াছেন।

বাণিজ্য খণ্ডে বিষয়ের দিক দিয়া কোনও বৈচিত্র্য নাই। পদ্মাপুরাণের গতানুগতিক কাহিনীই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গারোহণ খণ্ড সংক্ষিপ্ত, ইহাতে বেহুলা-লখিন্দররূপী উষা-অনুরুদ্ধের স্বর্গারোহণের ইচ্ছা প্রকাশ ও তৎপূর্বে যোগিবেশে উজানী নগরে গিয়া বেহুলার জননী কমলাকে দর্শন দানের কথা বর্ণিত আছে। এই খণ্ডটি সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত হইলেও পদ্মাপুরাণের সমগ্র কাহিনীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা করুণ। ষষ্ঠীবর এই অংশ রচনায় স্বভাবকবিত্ব গুণে বিষয়ের মর্যাদা সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াছেন। দীর্ঘকাল নিরুদ্দিষ্ট জামাতা ও কন্যা যখন যোগী ও যোগিনীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া উজানী নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—তখন কমলা,—

লখাই বিপুলার রূপ দেখিয়া সুন্দরী।
উচ্ছ্বাসি উচ্ছ্বাসি কান্দে ঝিউ ঝিউ করি।।
যোগিস্থানে কমলায় বিনয়ে জিজ্ঞাসে।
কহ কহ যোগী তোরা বৈস কোন দেশে।।
যোগী বলে মোদের বসতি স্থিতি নাই।
হইয়া বৈরাগী নানা দেশেতে বেড়াই।।
শুনিয়া কমলা বলে যোগীর গোচর।
তোমরা নি আইস যাও চম্পকনগর।।
যোগী বলে চম্পকনগরে নিতি যাই।
কি কারণে সেই কথা জিজ্ঞাস গো মাই।।
কমলায় বলে মুই অভাগীর ঝি।
না পাইনু বার্তা আর জিজ্ঞাসিমু কি।।
চম্পকনগরে থাকে চান্দ সদাগর।
তার পুত্রে কন্যা বিয়া কর্যাছিল মোর।।
বিয়া রাত্রি জামাই খাইল কালনাগে।

মড়ার সহিত বেউলা গেলা কোন ভাগে।।

যোগী-যোগিনী আত্ম-পরিচয় গোপন করিল। কিন্তু স্নেহময়ী জননীর নিকট বেহুলার এই প্রতারণা তাহার নিজের বিবেক-মূলে গিয়া দংশন করিল। অথচ বেহুলা নিরুপায়, স্বর্গপুরীর চরম বিস্তৃতি-লোক হইতে তাহাদের আহ্বান আসিয়া গিয়াছে, আর তাহারা মর্ত্যের পরিচয়ে জড়াইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু স্নেহাতুরা জননীর চোখের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সন্তান এ কি প্রাণহীন অভিনয় করিতেছে?

বিপুলায় বলে, প্রভু, চল হেথা হনে।
মায়ের করুণা মোর না সহে পরাণে।।
আমি হনে মার কিছু না হইল সুখ।
আর না শুইমু-মায়ের বুকে দিয়া মুখ।।

এক করুণ রূপকের ভিতর দিয়া পদ্মাপুরাণের কাহিনীর পরিসমাপ্তি কল্পনা করা হইয়াছে। কোনও বাস্তব-লোকে কাব্যের এই শেষাংশ সংঘটিত হইতে পারে না। ইহা কল্পলোকের স্বপ্ন-কামনা মাত্র। ইহা মনসা-মঙ্গল কাব্যের ভাবসম্মিলন। ষষ্ঠীবরের রচনায় কাহিনীগত এই রূপকের মর্যাদা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে। কমলার স্বপ্নদৃষ্টির সম্মুখে যোগি-যোগিনীর এই স্মৃতি-অবশেষ মায়ামূর্তি মুহূর্তে কখন অন্তর্হিত হইয়া গেল।

রামজীবন

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যেই চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবি রামজীবন বিদ্যাভূষণ তাঁহার মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা করেন।[১] কাব্যমধ্যে তিনি এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

অল্প বয়স মোর দ্বিজ কুলে জাত।
পণ্ডিত না হম্ মুই কহিলু সভাত।।
মনসার নাম মাত্র হৃদয়ে ভাবিয়া।
মহাসিন্ধু খেবা দিছি উড়ুপ লইয়া।।
জনক আম্মার জান গঙ্গারাম খ্যাতি।
তাহান চরণ বন্দো করিযা ভকতি।।
তাহান অনুজ বন্দো নামে নারায়ণ।
করজোড়ে তান পদে করিম বন্দন।।
গুরুর চরণ বন্দো করিয়া ভকতি।
গ্রামেশ্বরী দেবী বন্দো যে গ্রামে বসতি।[২]

মনসা-মঙ্গল ব্যতীত তিনি 'সূর্যমঙ্গল' বা 'আদিত্য-চরিত' নামে আরও একখানি কাব্য

১। সাহিত্য (১৩১০), ৯-২২, ব-প্রা-পু-বি ১, ১২০
২। সাহিত্য (ঐ) ১০ ;

রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কথা যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে। 'সূর্যমঙ্গল' কাব্যে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিল।[১] তাঁহার পূর্ণ নাম রামজীবন ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণ ; চট্টগ্রাম জিলার বাঁশখালি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মনসা-মঙ্গল কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন,

শর কর ঋতু বিধু শক নিয়োজিত।
মনসা-মঙ্গল রামজীবন রচিত।।[২]

তাহা হইতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৬২৫ শকাব্দ বা ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মনসা-মঙ্গল কাব্য রচিত হয়। ভণিতায় তিনি তাঁহার নামের পরিবর্তে বিদ্যাভূষণ কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন ; মনে হয়, তাঁহার উপাধি ছিল বিদ্যাভূষণ।

পূর্বোক্ত 'সূর্যমঙ্গল' কাব্যে তিনি বিদ্যাভূষণ উপাধির কোথাও উল্লেখ করেন নাই ; মনে হয়, এই উপাধি তিনি 'সূর্যমঙ্গল' রচনাব পর লাভ করেন। তাঁহার কাব্যে গৌরচন্দ্র, কবিচন্দ্র ও শিবচরণ দাস নামক তিনজন স্বতন্ত্র কবি বা গায়েনের ভণিতাও প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। রামজীবনের মনসা-মঙ্গল কাব্যখানি পরবর্তী মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলির বৈশিষ্ট্যহীন রীতিতে রচিত হইলেও তাহা মধ্যে মধ্যে স্নিগ্ধ রসোজ্জ্বল ; লাচাড়ী ও পয়ারের বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে দুই একটি নূতন ছন্দ রচনারও তাঁহার সার্থক প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। কাব্যখানি বিশেষ প্রচার লাভ করিতে পারিয়াছিল বলিয়াও মনে হয় না। একমাত্র চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশেই ইহার প্রচার হইয়াছিল। ইহা এই অঞ্চলে 'বিদ্যাভূষণী মনসা' নামে পরিচিত।

জীবন মৈত্র

বগুড়া জেলার অন্তর্গত করতোয়া নদীর তীরে লাহিড়ীপাড়া গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে মনসা-মঙ্গলের অন্যতম কবি জীবনকৃষ্ণ মৈত্র জন্মগ্রহণ করেন।[৩] তাঁহার পিতার নাম অনন্ত, মাতার নাম স্বর্ণমালা,—

স্বর্ণমালা সুত কবি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
শ্রীমৈত্র জীবন গায় অনন্ত নন্দন।।

অনন্তের পাঁচ পুত্র, জীবন তাঁহাদের এইভাবে পরিচয় দিয়াছেন,

সর্বাগ্রজ দুর্গারাম তস্যানুজ আত্মারাম
সর্বেশ্বর প্রাণকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ।
শ্রীকবি-ভূষণ নাম বাস লাহিড়ীপাড়া গ্রাম
জীবন মৈত্র চতুর্থের কনিষ্ঠ।

১। বা-প্রা-পু-বি ২, ৪১;
২। ঐ ১, ১২০।
৩। ব্র-সা-প-প, ২ (১৩১৬ সাল), ১৮৪-২০৩

জীবনের উপাধি ছিল কবিভূষণ। তাঁহার কাব্যরচনার কাল সম্বন্ধে তিনি তাঁহার মনসা-মঙ্গলে নিম্নলিখিত নির্দেশ রাখিয়া গিয়াছেন,

মহীপৃষ্ঠে শশী দিয়া বাণ বিধু সমর্পিয়া
বুঝহ সনের পরিমাণ।

ইহা হইতেই জানিতে পারা যায় যে, ১১৫১ বঙ্গাব্দে বা ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জীবন মৈত্রের মনসা-মঙ্গল রচিত হয়। কবি নিজেকে নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের রাজ্যের প্রজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—

সে সতী পুণ্যবতী রাণী ভবানী;
মহারাণী বলি তাকে ভুবনে বাখানি।।
যার পুত্র রামকৃষ্ণ রাজা রাজ্যেশ্বর।
অপার মহিমা যশ ভুবনে যাহার।।
তাহার রাজ্যেত বাস ভিক্ষা করি খাই।
কহে কবি জীবন মৈত্র নির্দয় গোঁসাই।।

কবি সাংসারিক বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। সেইজন্য পণ্ডিত হইয়াও নিজের প্রচার করিয়া বেড়াইতে পারিতেন না। লাহিড়ীপাড়া গ্রাম নাটোরের জমিদারি-ভুক্ত ছিল। ব্রাহ্মণ জীবন মৈত্র কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের জন্য উক্ত জমিদারের নিকট হইতে যে কোন সম্মান প্রাপ্ত হন নাই, তাহা তাঁহার কাব্যপাঠেই জানা যায়। শুধু তাহাই নহে, রাজা রামকৃষ্ণের বিবাহের সময় ব্রাহ্মণ হইয়াও তাঁহার ভাগ্যে 'বেগার' খাটিবার উপক্রম হইয়াছিল,—

রামকৃষ্ণ রায়ের বিভা তাত বেগার ধুম।
লেখা ছাড়ি র'লাম পড়ি চক্ষে চাপিল ঘুম।।

কোনমতে ঘুমের ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া কবি সেইবার বেগার খাটিবার অপমান হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। জীবনের সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত অসচ্ছল ছিল। সাংসারিক অসচ্ছলতা বিস্মৃত হইয়া থাকিবার জন্য কবি সর্বদা তাঁহার কল্পনা-কুঞ্জে বিচরণ করিতেন, কিন্তু ইহার মধ্যে কবি-পত্নী আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাদ সাধিতেন,—

তত্ত্ব দিল পুরদারা সকল বুদ্ধি হৈল হারা
পুথি বান্ধি হাটে চলি যাই।

সংসার-অনভিজ্ঞতার জন্য কবি জীবন মৈত্র সমাজে 'পাগলা জীবন' নামে পরিচিত ছিলেন।

জীবন মৈত্রের মনসা-মঙ্গল কাব্য দুই খণ্ডে বিভক্ত,—দেবখণ্ড ও বণিকখণ্ড। দেবখণ্ডে মঙ্গলকাব্যের সাধারণ গৌরচন্দ্রিকাসমূহ, মহাভারত ও পুরাণোক্ত নাগ এবং মনসার জন্ম ও বিবাহ-কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বণিকখণ্ডে চাঁদ সদাগর ও বেহুলার কাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বণিকখণ্ডই প্রকৃতপক্ষে মনসা-মঙ্গলের মূল লৌকিক কাহিনী; ব্রাহ্মণ্য প্রভাববশত পরবর্তীকালে দেবখণ্ড আসিয়া ইহাতে সংযুক্ত হইয়াছে। কাহিনীর এই সুস্পষ্ট

বিভাগ হইতে ইহাদের পরস্পর স্বতন্ত্র উদ্ভবই সূচিত হইতেছে।

জীবন মৈত্রের ভণিতায় 'উষা-হরণ' নামক একখানি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র কাব্য পাওয়া যায়।[১] কিন্তু 'উষা-হরণ'-এর বৃত্তান্ত মনসা-মঙ্গলের উক্ত দেব-খণ্ডের অন্তর্গত। কালক্রমে কোনও কারণে জীবন মৈত্রের মূল মনসা-মঙ্গলের পুঁথি হইতে উক্ত অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেও, ইহা তাঁহার উক্ত কাব্যেরই অন্তর্ভুক্ত। জীবনের কাব্যে অন্যান্য মনসা-মঙ্গল হইতে কতকগুলি বিষয়ে অনৈক্য লক্ষ করা যায়। তাঁহার মতে বেহুলার পিতার নাম বাহো সদাগর, মাতার নাম মেনকা, ভ্রাতার নাম শঙ্খধর, বেহুলাব নাম বেললি। বাংলাদেশে প্রচলিত আর কোনও মনসা-মঙ্গলে এই প্রকার নাম পাওয়া যায় না। দুই এক স্থলে তাঁহার কাব্যোক্ত কাহিনীর সঙ্গে বিহারে প্রচলিত কাহিনীর মিল দেখা যায়। জীবনের কাব্যের দুই একটি উপকাহিনীও অন্যান্য মনসা-মঙ্গলের কাহিনী হইতে একটু স্বতন্ত্র। এক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, বেহুলা মৃত স্বামী লইয়া কলার মান্দাসে করিয়া নদীতে ভাসিয়া চলিয়াছেন, পথে বাণিজ্য-প্রত্যাগত সহোদর ভ্রাতা শঙ্খধরের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। শঙ্খধর ভগিনীকে চিনিতে পারিলেন না, বরং সুন্দরী যুবতীকে নিঃসঙ্গ পাইয়া তাহার নিকট প্রণয় নিবেদন করিলেন। বেহুলা যখন আত্মপরিচয় দিল, তখন শঙ্খধরের লজ্জার আর সীমা রহিল না। তিনি কৃতকর্মের জন্য অন্তরে অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন এবং স্নেহের ভগিনীকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেহুলা ভ্রাতার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া নিজের দুর্গম কর্তব্য-পথে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। এই প্রসঙ্গটি জীবন মৈত্রের মৌলিক রচনা নহে—ইহা বাংলার চির-পরিচিত রূপকথা 'কাজল রেখা'র কাহিনী হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহা লোক-কথার একটি সাধারণ বিষয় (motif)।

সংস্কৃত পুরাণ হইতে নির্বিচারে অশ্লীল অংশসমূহ গ্রহণ করিবার ফলে জীবনের কাব্য আদিরসের বর্ণনায় ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে। জীবনের রচনা সর্বত্র সরল নহে, কবিত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্যই তাঁহার অধিক ছিল। তাঁহার কাব্যে সংস্কৃত অলঙ্কার ও উপমার যথেচ্ছ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। শব্দচয়নে কবি তাঁহার কাব্যমধ্যে নীরস পাণ্ডিত্যের অবতারণা করিয়া কবিত্বস্ফূর্তির পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন। রচনা অনেক স্থলেই লালিত্যহীন, ক্বচিৎ কোন স্থলে তিনি পাণ্ডিত্যমুক্ত হইয়া সহজ ভাষায়ও অন্তরের ভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু সেই ভাষাও সর্বাংশে অষ্টাদশ শতাব্দীর পারিপাট্য লাভ করিতে পারে নাই। ভ্রাতা শঙ্খধর ভগিনীকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে বলিতেছেন,—

> সাধু বলে তুমি ভগ্নী সোহাগিনী মাও।
> নির্দয় নিষ্ঠুর হৈয়া কোন দেশে যাও।।
> বাপ বড় দুরন্ত জানিনু এতদিনে।

১। সা-প-প ১৩, ১৬৩

তার কারণে জলে ভাসে দয়ার বহিনে।।
কি দণ্ড লাগিল পিতার কোন দুঃখে মরে।
কি দেখিয়া বিভা দিল সর্পখাউকার ঘরে।।
একখানি ভগিনী ছয় ভায়ের দুলালী।
শূন্য কৈল ঘর মায়ের কোল কৈল খালি।।

অনেক অনাবশ্যক ও অবান্তর রচনায় জীবনের কাব্য ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে; কাহিনীর সহজ গতি ইহাতে বহুল পরিমাণে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। জীবন নিঁখুত চিত্রকর ছিলেন। প্রত্যক্ষ সংসারের প্রত্যেকটি বাস্তব অভিজ্ঞতা রচনায় তিনি ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। সেইজন্য স্তূপীকৃত উপকরণের নীচে হইতে তাঁহার কাব্যের মূল বক্তব্য সহজে স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে নাই। তাঁহার কাব্য আজও প্রকাশিত হয় নাই।

দ্বিজ রসিক

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে দ্বিজ রসিক নামে একজন কবি একখানি সুবৃহৎ মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা করেন।[১] তাঁহার সময় সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছুই জানিতে পারা যায় না; তবে ভাষা বিচার করিয়া তাঁহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের কবি বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কাব্যের ভণিতা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে মাত্র নিম্নলিখিত পরিচয়টুকু পাওয়া যায়,—

কবির প্রপিতামহের নাম কালিদাস, পিতামহের নাম মহেশ মিশ্র, পিতার নাম শিবপ্রসাদ। সেনভূম ও মল্লভূমের মধ্যবর্তী আখড়াশাল নামক স্থানে কবির নিবাস ছিল। কবির দুই ভ্রাতা ছিল, রাজারাম ও অযোধ্যা; এক ভগিনী, তাহার নাম সাবিত্রী। কবির দুই উপাধি ছিল, কবিকঙ্কণ ও কবিবল্লভ।

দ্বিজ রসিকের মনসা-মঙ্গল কাব্যে রামায়ণ ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের সুস্পষ্ট প্রভাব অনুভব করিতে পারা যায়। ইহাতে রামায়ণের হনুমান চরিত্রটিকে মনসা-মঙ্গল কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কাহিনীর অন্যান্য অংশেও রামায়ণ ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের কোনও কোনও চিত্র ও চরিত্র অবলম্বন করা হইয়াছে, উক্ত দুই কাব্য হইতে দ্বিজ রসিক অনেক কাহিনীও তাঁহার রচনায় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা পশ্চিমবঙ্গের শেষ যুগের মঙ্গলকাব্যগুলির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। দ্বিজ রসিক পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার রচনায় কবিত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্যই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে।

বিষ্ণু পাল

বীরভূম জেলায় আজ পর্যন্তও মনসা-পূজার যে ব্যাপক অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে আজও

১। ব-সা-প ১. ২৯২-৯৯

বিষ্ণু পাল নামক একজন কবির মনসা-মঙ্গলই প্রধানত গীত হইয়া থাকে। এ'যাবৎ বিষ্ণু পালের একখানি সম্পূর্ণ ও একাধিক খণ্ডিত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে,[১] মাত্র সম্প্রতি তাঁহার একখানি পুঁথি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে।

পুঁথি হইতে কবির সম্পর্কে কোনও পরিচয় পাইবার উপায় নাই। তবে বীরভূম অঞ্চলের জনপ্রবাদ হইতে জানিতে পারা যায় যে, 'কবি জাতিতে কুম্ভকার ছিলেন এবং তাঁহার নিবাস রাণীগঞ্জের নিকটবর্তী সেরগড় পরগণা মধ্যে কোনও গ্রাম।'[২] বীরভূম জেলা ও তাহার সন্নিকটবর্তী অঞ্চলের লোকদিগের মধ্যে কুম্ভকার সম্প্রদায়ের লোক মনসার বিশেষ অনুগৃহীত বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ, তাঁহারই মনসার ঘট বা 'মূর্তি' নির্মাণ করিয়া থাকেন। ঘট নির্মাণ করিবার জন্য তাঁহারা মনসাদেবী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হন বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। অতএব উক্ত জনপ্রবাদ-মূলে কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকা অসম্ভব নহে।

ধর্মমঙ্গল সাহিত্যের অনুরূপ বিষ্ণু পালের মনসা-মঙ্গলে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় যে, যখন রাঢ়দেশে ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি ব্যাপকভাবে রচিত হইতেছিল, তখনই অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই কাব্য রচিত হইয়াছিল। অবশ্য সৃষ্টিতত্ত্বের আখ্যান পরবর্তীকালে কোনও গায়েন কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত হওয়াও বিচিত্র নহে। চণ্ডীমঙ্গল আট পালায় বিভক্ত করিয়া আট দিনে গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত হইত। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, মনসা-মঙ্গল সাধারণত এক মাসে গীত হইবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইত। আট দিনে গীত হইত বলিয়া চণ্ডীমঙ্গলকে অষ্টমঙ্গলাও বলিত। বিষ্ণু পালের মনসা-মঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল রচনার আদর্শে আট পালায় বিভক্ত হইয়া রচিত। এইজন্য ইহা মনসার 'অষ্টমঙ্গলা গান' নামে পরিচিত।

বিষ্ণু পালের ভাষা নিতান্ত আধুনিক গ্রাম্য ভাষা। বীরভূম অঞ্চলে তাঁহার কাব্যের ব্যাপক প্রচারের ফলেই ভাষা আধুনিকতায় রূপান্তরিত হইয়া থাকিবে। হয়ত এই জন্যই ইহার মধ্যে বীরভূম অঞ্চলের কথ্যভাষারও নির্বিচার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য বিষ্ণু পালের সময় সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে কিছু জানিতে পারা না গেলে এই বিষয়ে কিছুই নিশ্চিত করিয়া বলিবারও উপায় নাই।

বিষ্ণু পালের রচনা দৃঢ়সংবদ্ধ নহে, ছন্দোবন্ধন অনেক স্থলেই অত্যন্ত শিথিল। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়,—

শুন শুন ওগো দুর্গা শুনগো সুন্দরী।
আজ জলে ডুবে মরিল তোমার চাঁদ অধিকারী।।
একথা শুনিয়া মায়ের প্রাণ উড়ে গেল।
পদ্মার সহিত মাতা কালীদহে আইল।।
দূর হৈতে মহামায়াকে দেখিবারে পেয়ে।
নৌকার উপরে রাজা 'বেড়ান নাচিয়ে।।[৩]

১। গ.স ১৬৩৩-৩৬, গ-স ৪১১৩ ; ২। শিবরতন মিত্র, ৪৬৭
৩। ঐ ৪৬৮

বিষ্ণু পালের রচনায় লৌকিক ছন্দ বা আধুনিক স্বরবৃত্ত বা ছড়ার ছন্দের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়,—

ভালই কল্লাম সুবেশ কল্লাম এসেছিলাম জলে।
"লে এসে ভালই কল্লাম স্বামী পেলাম কোলে।।
ৌরী পূজা করেছিলাম জন্ম জন্মান্তরে।
মৃত পতি পাইলাম মা মনসার বরে।।
বিষহরি হরেছিলেন কোলেব দণ্ডধব।
আজি নিদয় বিধি সদয় হৈলা নৌকার উপর।।[১]

বিষ্ণু পালের কাব্যে ছন্দের এই প্রকার আরও বহু বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল রচনা পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত, কিংবা কবির নিজস্ব রচনা তাহা বলিবার উপায় নাই। যদি ইহা কবির নিজস্ব রচনাই হইয়া থাকে, তবে কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্ববর্তী হইতে পারেন না।

বিষ্ণু পালের কবিত্ব খুব উচ্চাঙ্গের ছিল না, তাঁহার মধ্যে ভাষার পারিপাট্য একেবারেই নাই ; পূর্বেই বলিয়াছি, ইহাতে বীরভূম অঞ্চলের কথ্যভাষার নির্বিচার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিষ্ণু পালের পাণ্ডিত্য প্রশংসনীয়। তাঁহার কাব্যখানি বিভিন্ন পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীর একটি বৃহদায়তন সঙ্কলন বলা যাইতে পারে। সহজ গ্রাম্যভাষায় পৌরাণিক রস তিনি সাধারণ লোকের মধ্যে পরিবেষণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তিনি অনতিকালপূর্বে আবির্ভূত হইয়াও সমগ্র বীরভূম জেলায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি বিষয়-নির্লিপ্ত সংসার-অনভিজ্ঞ আদর্শবাদী কবি ও সাধক মাত্রই ছিলেন না, তাঁহার সমাজ-বোধ অত্যন্ত প্রবল ছিল। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এ দেশের নিরক্ষর পল্লীকবিদিগের মধ্যেও সমাজসচেতনতা যে কত প্রবল, ইহা তাহারই একটি নিদর্শন। মনসার পূজা মর্ত্যে প্রচার করিবার জন্য বেহুলারূপে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে উষা মনসাকে দিয়া তিনটি সত্য বা শপথ করাইয়া লইতেছেন—

গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে।
তোমা (তুমি) না তরাল্যে, বাছা, সেই পাপ ধরে।।
শূদ্র না হইএগ্র যেবা নীল বস্ত্র পরে।
তোমা না তরাল্যে, বাছা, সেই পাপ ধরে।।
কুইলা বলদ যেবা রাখয়ে গোহালে।
তোমা না তরাল্যে, বাছা, সেই পাপ ধরে।।

ইহাতে হিন্দু সনাতন পাপবোধের পার্শ্বে লৌকিক পাপবোধের কথা একই সঙ্গে প্রকাশ পাইয়াছে। এক দিক দিয়া শাস্ত্র যেমন নিজস্ব নীতি ও ধর্ম দ্বারা সমাজকে শাসন করিতেছে,

১। ঐ ৪৬৯

আর এক দিক দিয়া প্রত্যেক সমাজ নিজস্ব একটি নৈতিক আদর্শ নিজেও রচনা করিয়া তাহার অনুশাসন স্বীকার করিয়া চলিয়াছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ প্রায়শ্চিত্তবিধির মধ্যে লৌকিক পাপবোধকে অস্বীকার করিয়া শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথটিই অনুসরণ করিয়াছেন। এখানে উভয়কেই তুল্য মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। কবি বিষ্ণু পালের সমাজ-অভিজ্ঞতায় গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, দ্বিজের নীলবস্ত্র ধারণ[১] প্রভৃতি পাপাচরণের মতই কইলা বাছুর (২১ দিনের কম বয়স্ক) গোয়ালে বাঁধিয়া রাখাও পাপ—গুরুত্বের দিক দিয়া ইহারা সকলই সমান। মঙ্গল-কাব্যের সমাজদর্শনের ভিতর দিয়া শাস্ত্রীয় ও লৌকিক সংস্কারকে এইভাবে সর্বত্র সমানাধিকার দেওয়া হইয়াছে।

বাণেশ্বর রায়

১৬৪১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে বাণেশ্বর রায় নামক একজন কবি মনসা-মঙ্গল রচনা করেন।[২] তাঁহার একখানি মাত্র অসম্পূর্ণ পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে, তথাপি কাব্যখানি একটি কারণে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত ; তাহা পরে উল্লেখ করিতেছি।

বাণেশ্বর আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে কাব্যমধ্যে তাঁহার ঊর্ধ্বতন চারি পুরুষের উল্লেখ করিয়াছেন—সংরামের পুত্র আত্মারাম, আত্মরামের পুত্র বংশীরায়, বংশীরায়ের তিন পুত্র—প্রতাপ, হরিনারায়ণ ও রঘুনাথ ; হরিনারায়ণের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ সদাশিব ও কনিষ্ঠ বাণেশ্বর। কবির বাসস্থান বিষয়ে ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই জানিতে পারা যায় না,—'নিবাস চম্পকপুরী জন্ম রায়পুরে'।[৩]

রচনা-কাল সম্বন্ধে কোন হেঁয়ালী না করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—

মনসা-মঙ্গল ভাষে প্রথম বৈশাখ মাসে
ষোল শ এক চল্লিশে।
ভাবিয়া ভবানী হর ভণে দ্বিজ বাণেশ্বর
মনসার মঙ্গল-প্রকাশে।।

বাণেশ্বরের ভাষা সুপরিচ্ছন্ন ও রচনা সুসংবদ্ধ ; বেহুলার চরিত্র পরিকল্পনায় তাঁহার

১। তুলনীয়—

সংখ্যা স্নানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্
বৃথা তস্য মহাযজ্ঞা নীলীরক্তস্য ধারণাৎ।।
নীলীরক্তং যদাবস্ত্রং বিপ্রো দেহেষু ধারয়েৎ।
অহোরাত্রোবিতো ভুত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি।।
—অঙ্গিরঃ স্মৃতি, শ্লোক ৩৩, ৩৫

২। গ-স ৫৪০৫ ;

৩। ঐ ১৭ (ক)

অভিনবত্ব আছে। সম্পূর্ণ বাস্তব দৃষ্টিকোণ হইতে তিনি বেহুলার চরিত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ইহার মধ্যে আদর্শবাদকে তিনি কোনও স্থান দেন নাই। এই হিসাবে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ইহা একটি বিশেষ মূল্য দাবী করিতে পারে।

লখিন্দরের মৃত্যুর পর বেহুলার দুঃসাধ্য সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য ভ্রাতা সুমতি তাহাকে অনুরোধ করিয়া বলিতেছে,—

সুমতি কহেন শোকে শোন গো রোহিণী।
সলিলে ভাসিয়া কেনে যাও একাকিনী।।
পাইয়া তোমার বার্তা কি করে জননী।
বাঁচিবে ভবনে পুন বল বুঝি বাণী।।
বাপের জীবন তুমি মায়ের পরাণ।
ছয় ভায়ের বোন তাহে ঘরের প্রধান।।
চাপিয়া মঞ্জুষে যাহ মৃত পতি কোলে।
সলিলে ভাসিয়া তুমি যাহ কার বোলে।।
বিধির লিখন এই মনুষ্যের নহে।
মরিলে বাঁচএ পুন কেবা কোথা কহে।[১]

ইহার উত্তরে বেহুলা বলিল,—

যে কিছু বলিলে ভাই মোরে নাহি সাজে।
ভবনে বিধবা হইয়া যাব কোন লাজে।।
যদি যাই ওরে ভাই তব সঙ্গে বাড়ী।
ধাইবে বনিতা সব দেখিবারে রাঁড়ি।।
ভবনের বার্তা মোর কিছু নয় হারা।
বিষম বনিতা বড় তোমাদের দারা।।
বাজিলে কোন্দল বড় সভে দিবে গালি।
বাসরে ভাতার খালি কেন হেথা আলি।।
নারিব সহিতে ভাই সে সব বচন।
অতেব বলিএ ভাই কররে গমন।।[২]

ছদ্মবেশিনী মনসা গাঙ্গুরের জলে ভাসমান বেহুলাকে যখন তাহার পরিচয় ও দুর্ভাগ্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন বেহুলা বলিতেছে,—

কান্দিতে কান্দিতে কন বেহুলা যুবতী।
ভুবনে আমার সম নাঞি ভাগ্যবতী।।

১। ঐ ১২ (ক);
২। ঐ ১২ (খ)

বিবাহ্ করিয়া নাথ লয়্যা আইল মোরে।
প্রভুর সঙ্গেতে ছিলাম লোহার বাসরে।।
জন্মে জন্মে কত আমি ভগ্নব্রত করি।
তাহাতে কুপিত কিবা দেবী বিষহরী।।
না জানি তাহার ঠাঞি হইল কোন পাপে।
যামিনীতে মোর নাথে বিনাশিল সাপে।।
পতির যতেক লোক—চান্দ সনকা জননী।
শ্বশুর কহিল মোরে দুরক্ষর বাণী।।
বণিক-বনিতা মাঝে গালি দিল মোরে।
আপনি সাপিনী হঞা খালি বংশধরে।।
হইল আমার মনে অতি অনুতাপ।
লইয়া প্রাণের নাথ জলে দিলাঙ ঝাঁপ।।[১]

মৃত স্বামীর সঙ্গিনী হইয়া ভেলায় ভাসিয়া স্বর্গপুরে যাত্রা করা তো বেহুলার জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন করাবই রূপক। এমন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি মনসা-মঙ্গলের আর কোন কবিই বেহুলা চরিত্রকে প্রত্যক্ষ করেন নাই। এই বৈশিষ্ট্যর গুণে বাণেশ্বরের রচনার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে।

বিবিধ কবি

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আরও কয়েকখানি মনসা-মঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে জগমোহন মিত্রের মনসা-মঙ্গল ১২৫১ সালে (১৭৬৬ শকাব্দ) বা ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়।[২] যাহাতে রচনা-কাল বুঝিবার পক্ষে কোনও গোলযোগ না হয়, সেজন্য তিনি তাহা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায়ই উল্লেখ করিয়াছেন। কাব্যের মধ্যে তাঁহার বিস্তৃত বংশপরিচয়ও দেওয়া হইয়াছে।[৩]

অতঃপর ১২৬৭ সাল বা ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলার অন্তর্গত মল্লিকপুর গ্রামের দ্বিজ কালীপ্রসন্নের মনসা-মঙ্গল প্রকাশিত হয়।[৪] শ্রীহট্টের রাধানাথ রায় চৌধুরী উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে একখানি মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা করেন।[৫] তাঁহাকেই বাংলা মনসা-মঙ্গল কাব্যের সর্বশেষ কবি বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। কুচবিহার অঞ্চলে বৈদ্যনাথ নামক একজন কবির মনসা-মঙ্গলের পুঁথি একখানি পাওয়া যায়। কিন্তু কবির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। নানা কারণে পুঁথিখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১। ঐ ২৩ (খ) ২১ (ক);.
২। সা-প-প ৩, ৩২৬-২৭ ; ৩। ঐ
৪। য়-সা-প-প ২, ১৮৭-৮৮ ; ৫ অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি ৩, ২৩৩

মনসা-মঙ্গলের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন কবির সম্বন্ধে উপরে যথাসম্ভব আলোচনা করা গেল। এতদ্ব্যতীত বহু অজ্ঞাত-পরিচয় কবিও মনসা-মঙ্গল রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের আলোচনা সহজসাধ্য নহে। ইহাদের মধ্যে অনেক কবিই, এমন কি, দুই তিন শত বৎসরের প্রাচীন ছিলেন তাহাও স্পষ্টতর বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু কোনও পরিচয়ের অভাবে তাঁহাদের সম্পর্কে কিছুই আলোচনা করা যাইতে পারে না।[১] অনেক কবিই তাঁহাদের রচনার মধ্যেও নিজেদের কোনও পরিচয় দিয়া যান নাই, কিংবা দিয়া গেলেও কালক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। কারণ, প্রাচীন বাংলার সমাজে কাব্য-বিশেষের রচয়িতার ব্যক্তিগত জীবনীর কোনও মূল্য ছিল না ; কাব্যগত কাহিনীই তাহার প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল। সেইজন্য অনেক কবি বহু উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়াও তাহা পূর্ববর্তী কোন প্রতিষ্ঠাবান কবির নামে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। সেইজন্যই প্রত্যেক প্রাচীন ও প্রথিতযশা কবির রচনাতেই প্রক্ষিপ্ত অংশ ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছিল। অবশ্যও অপেক্ষাকৃত অল্পখ্যাতি-সম্পন্ন কবিগণ এই উপদ্রব হইতে প্রায় সর্বদাই রক্ষা পাইয়াছেন। এই ভাবে জন কয়েক মুষ্টিমেয় লব্ধকীর্তি কবির বিস্তৃত পক্ষচ্ছায়ায় অপেক্ষাকৃত অল্প প্রতিভাবান কবিদিগের পরিচয় চিরতরে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোন সময় অন্য প্রকার ব্যাপারও ঘটিয়াছে। মনসা-মঙ্গলের কোনও কোনও গায়েন আসরে গান গাহিতে দাঁড়াইয়া ভণিতার স্থলে আসিয়া কোনও কোনও সময় কোন বিস্মৃতপ্রায় অপরিচিত প্রাচীনতর কবির নামের পরিবর্তে তদানীন্তন কালে প্রচলিত অপেক্ষাকৃত আধুনিক কোনও কবির নামও সংযোগ করিয়া দিয়াছে। গায়েনদিগের খামখেয়ালীর উপর অনেক সময় অনেক প্রাচীন কবির খ্যাতি ও অখ্যাতি নির্ভর করিত। কারণ, প্রকৃত পক্ষে তাহারাই এই সকল রচনার একমাত্র প্রচারক ছিল। এইজন্য প্রাচীন কোনও রচনার উপরই নির্ভর করিয়া কোনও কবিরই প্রতিভা সম্বন্ধে বিচার সম্পূর্ণ নির্ভুল হইতে পারে না।

মনসা-মঙ্গলের পদসংকলন

অসংখ্য কবি যখন মনসা-মঙ্গলের একই বিষয়-বস্তু লইয়া একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কাব্য রচনা নিষ্পন্ন করিলেন, তখন হইতেই গানের আসরে কোনও বিশেষ কবির রচিত একই কাহিনী আদ্যোপান্ত গীত হওয়ার রীতি লুপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। তখন হইতে বৈষ্ণব পদ-সংকলনের রীতি অনুযায়ী মনসা-মঙ্গলের পদ-সংকলনও গ্রথিত হইতে লাগিল। এইভাবে বিষয়-বস্তুর পারম্পর্য রক্ষা করিয়া প্রত্যেক কবির রচনা হইতেই উৎকৃষ্ট অংশ আহরণ করিয়া মনসা-মঙ্গলের পদ-সংকলন রচিত হইতে লাগিল। পদ-সংকলনের এই রীতি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষ ব্যাপক হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র বৈষ্ণব কবিতা ও মনসা-মঙ্গলের ক্ষেত্রেই নহে—রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি অনুবাদের ক্ষেত্রেও

১। D. C. B. M. C B. MS 19

পদ-সংকলনের রীতি ব্যাপকভাবে গৃহীত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।[১] প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এই পদ-সংকলনের রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকার জন্যই কোনও দৈব উপায়ে রক্ষিত না হইলে আদ্যোপান্ত একই কবির ভণিতাযুক্ত প্রাচীন কবির কোনও পুঁথি আবিষ্কৃত হইতে পারে না। অতএব মনসা-মঙ্গলের পদ-সংকলনের মধ্যে যে সকল কবির রচনা গৃহীত হয় নাই, কিংবা আদ্যোপান্ত ভণিতাযুক্ত যে সকল কবির পুঁথি পরবর্তী কালে সাধারণ পুঁথিসংগ্রহের মধ্যেও আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রচার ও খ্যাতি যে নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

মনসা-মঙ্গলের পদ-সংগ্রহকে বলিত 'বাইশা', 'বাইশ কবি-মনসা', 'বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল' বা 'ষট্‌কবি'। 'বাইশ কবি' অর্থে বাইশজন কবিরই যে রচনা কিংবা 'ষট্‌কবি' অর্থে ছয়জন কবিরই যে রচনা ইহাদের মধ্যে সংকলিত হইত, তাহা নহে—বাইশ কিংবা ষট্‌ এখানে বহু অর্থে ব্যবহৃত হইত। অতএব বাইশজনের অধিক কিংবা অনধিক কবির রচনা ইহাতে সংকলিত হইত। তবে 'ষট্‌কবি মনসা-মঙ্গলে' সাধারণতঃ ছয়জন কবির রচনাই স্থান পাইত—কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও হইত। এই পদসংগ্রহের রীতি অবলম্বনের ফলে অনেক অখ্যাতকীর্তি কবির নামও বিস্মৃতি হইতে রক্ষা পাইয়াছে সত্য, আবার অনেক সময় অনেক প্রকৃত খ্যাতকীর্তি কবিরও ইহাতে ন্যায্য মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। ইহাতে সাধারণত দুই-তৃতীয়াংশ রচনা একজন বিশেষ কবির কাব্য হইতে গ্রহণ করা হইত, অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ অন্যান্য কবির রচনা সংকলিত হইত। অতএব পদ-সংকলনের যথার্থ যে উদ্দেশ্য, তাহা অনেক সময়ই ইহাতে সিদ্ধ হইত না। বাইশা সংকলনে একটি বিশিষ্ট ভৌগোলিক রীতিও অনুসরণ করিতে দেখা যায়। বরিশাল অঞ্চলে সঙ্কলিত বাইশা সমূহে একমাত্র সেই অঞ্চলের কবিদিগেরই রচনা সংকলিত হইত ; ময়মনসিংহ শ্রীহট্ট অঞ্চলের বাইশা সমূহে বরিশাল অঞ্চলের কবিদিগকে সাধারণত পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র নিজস্ব অঞ্চলের কবিদিগের রচনাই সংকলিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রাঢ় অঞ্চলে যে সকল বাইশা প্রচলিত ছিল, তাহাতে পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও কবির রচনা সংকলিত হইলেও কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ প্রমুখ পশ্চিমবঙ্গের কবিদিগের রচনাই অধিক পরিমাণে স্থান পাইয়াছে। ব্যবসায়ী গায়েনগণ প্রধানত এই সকল বাইশার সংকলয়িতা ছিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, সমগ্র মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসা-মঙ্গল কাব্যই সর্বাধিক প্রচার লাভ করিয়াছিল। সর্পদেবী মনসার পূজার ব্যাপকতাই যে ইহার একমাত্র কারণ তাহা নহে। ইহার চরিত্রগুলির মধ্যেই এমন আকর্ষণীয় কাব্যগুণ আছে যে তাহা স্বভাবতই বাঙ্গালীর হৃদয় হরণ করিয়াছিল। এইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের উপরও এই কাব্যের কাহিনী নানা দিক দিয়া প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বাংলাদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে শ্রাবণ মাস বিবাহের পক্ষে নিষিদ্ধ। কারণ, সাধারণের বিশ্বাস, শ্রাবণ মাসে বিবাহ

১। ব-সা-প ১, ১ (ভূমিকা)

অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া বেহুলা বাসর রাত্রে বিধবা হইয়াছিল। বর্ধমান জেলার কসবা চম্পকনগর গ্রামে এখনও প্রতি বৎসর সতী বেহুলার স্মৃতি-উৎসব বলিয়া পরিচিত এক বিরাট মেলার অধিবেশন হয়। বাংলার সর্বত্র সাপুড়িয়ারা সাপ খেলাইবার সময় সুর করিয়া টানিয়া টানিয়া যে গান গাহে, তাহাতেও অভাগিনী বেহুলার অকাল বৈধব্যের করুণ কাহিনীই শুনিতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগের সমগ্র আখ্যানমূলক গীতিসাহিত্য এই চাঁদসদাগর-বেহুলার কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে।

চরিত্র-বিচার

মনসা-মঙ্গলের চাঁদ সদাগর চরিত্রের মত এমন সমুন্নত পুরুষকারের আদর্শ সমগ্র মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে আর দ্বিতীয় নাই। একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, চাঁদ সদাগরের চরিত্রের আদর্শেই পরবর্তী মঙ্গলকাব্যের দেববিদ্রোহী নায়কদিগের চরিত্রগুলির পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সদাগর চাঁদ সদাগরেরই অনুকরণে সৃষ্ট চরিত্র। ধর্মমঙ্গলের ইছাই গোয়ালাও এই প্রভাব হইতে একেবারে মুক্ত নহে। পরম শৈব চাঁদ অবজ্ঞাভরে মনসা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,

যে হাতে পূজেছি আমি দেব শূলপাণি।
সে হাতে পূজিব পুনি চেংমুড়ি কাণী।।

দাক্ষিণাত্যের অম্মবরুর কাহিনীতেও অনুরূপ উক্তি শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল— The rajas and princes all creid out, O Ammavaru, we will not worship a female deity ; we will not lift our hands and salute a goddess ; we will not chant any other name except *'Lingh nama Sivaya'* ;[১] কারণ, সেখানেও বাংলাদেশের অনুরূপ সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতিও চাঁদ সদাগরের প্রতিধ্বনি করিয়া চণ্ডীর সম্বন্ধে অবজ্ঞাভরে বলিয়াছিলেন,

যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী।
মহেশ ঠাকুর বিনা অন্য নাহি জানি।।

শীতলা-মঙ্গলের শৈব রাজা চন্দ্রকেতু চাঁদ সদাগরের আদর্শেই শীতলার প্রতি অবজ্ঞাসূচক অনুরূপ উক্তি করিয়াছিলেন,

রাজা বলেন শীতলা করেছে যদি বাদ।
কদাচিৎ আমি তার না ল'ব প্রসাদ।।

অতএব দেখিতে পাওয়া যায়, পরবর্তী প্রায় সমস্ত মঙ্গলকাব্যই তাহাদের নায়কচরিত্র পরিকল্পনার জন্য মুখ্যত মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর নায়ক চাঁদ সদাগরের নিকট গভীরভাবে ঋণী ; এই বিষয়ে তাঁহাদের নিজস্ব প্রায় কোনই মৌলিকতা নাই ; তৎকালীন বাঙ্গালীর

১। H. Whitehead, *The Village Gods of South India,* Calcutta ; 1921, p. 134

সামাজিক জীবনে মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর ব্যাপক প্রভাবেরই ইহা প্রমাণ।

বাংলার মধ্যযুগের অতীত অন্ধকারের মধ্যে কর্ণপাত করিয়া থাকিলে যে একটিমাত্র চরিত্রের পদশব্দ সর্বপ্রথম শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই এই চাঁদ সদাগরের। যে যুগে দৈবানুগ্রহই জাতির জীবনে পরম প্রসাদ বলিয়া বিবেচিত হইত, সেই যুগে দৈবানুগ্রহকেই সকল প্রকারে উপেক্ষা করিয়া একমাত্র নিজের পুরুষকারের উপর এই চরিত্রটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার প্রতি প্রত্যেকেরই সুগভীর সহানুভূতি সর্বপ্রথম সঞ্চারিত হইয়াছিল। এই সমাজ চিরদিনই আদর্শবাদী, অন্তরের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সংসারের কোনও বিপদকেই ইহা কোনদিন বিপদ বলিয়া মনে করে নাই। নিজস্ব আদর্শের উপাসনায় লাঞ্ছিত চাঁদ সদাগর চিরলাঞ্ছিত আদর্শ-পূজারী এই সমাজের যেন মূর্ত প্রতীক। সেইজন্য চাঁদ দেব-বিদ্রোহী চরিত্র হইয়াও সাধারণ জনসমাজের শ্রদ্ধা হইতে কোনদিন বঞ্চিত হন নাই। সকলেই চাহিয়াছে, তাঁহার এই লাঞ্ছনার অবসান হউক, ধনে পুত্রে সুখী হইয়া পুনরায় তিনি সংসারে প্রতিষ্ঠিত হউন, তাঁহার নিজের আদর্শের প্রতি এই ঐকান্তিক নিষ্ঠার জন্য দুঃখের ভিতর দিয়াই যেন তাঁহার জীবন শেষ না হয়। এখানে আরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, তাহা এই যে, মধ্যযুগের সমগ্র হিন্দু সমাজটি চাঁদ সদাগরের চরিত্রের মধ্যে রূপ লাভ করিয়াছে। মনসা অত্যাচারী রাষ্ট্র-শক্তির প্রতীক্ এবং চাঁদ সদাগর অত্যাচারিত হিন্দু সমাজের প্রতীক। সেইজন্য দেবতা বলিয়া কল্পনা করা সত্ত্বেও যেমন এক দিক দিয়া মনসার প্রতি সমাজের ঘৃণা দুর্বার হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে তেমনি অন্যদিক দিয়া অত্যাচারিত চাঁদ সদাগরের প্রতি সহানুভূতি অতলস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। সেইজনাই দেখিতে পাওয়া যায়, মনসা-মঙ্গলের কবিগণ তাঁহাদের কাব্যের উপসংহারে চাঁদের চরিত্রে কি এক অসম্ভব পরিবর্তন কল্পনা করিয়াছেন। তথাপি চাঁদ তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন, তিনি যে হাতে তাঁহার আরাধ্য দেবতা শূলপাণির পূজা করেন, সে হাত তিনি মনসাকে ফুল দিবার কাজে নিয়োজিত করিয়া 'অপবিত্র' করেন নাই; তিনি তাঁহার বাম হাতকেই এই কাজে নিয়োগ করিয়াছিলেন। চাঁদের বাম হস্তে মনসাকে একটি পুষ্প দিতে স্বীকৃত হওয়ার বিবরণ তাঁহার মূল চরিত্রগত আদর্শের বিরোধী নহে— কাহিনীর উপসংহারের জন্য ইহার পরিকল্পনা অপরিহার্য ছিল।

কিন্তু চাঁদ সদাগরকে আদর্শের পূজারী বলিয়া অঙ্কিত করিতে গিয়া মনসামঙ্গলের কবিগণ কি তাঁহাকে রক্তমাংসের সম্পর্কহীন করিয়া কল্পনা করিয়াছেন? যদি তাহাই হয়, তবে এই চরিত্র পরিকল্পনার সার্থকতা কোথায়? কিন্তু এই বিষয়েও আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চাঁদকে যথার্থ রক্তমাংসের মানুষরূপেই মনসা-মঙ্গলের কবিগণ চিত্রিত করিয়াছেন, মানবিক সুখ-দুঃখ-আশা-নৈরাশ্য দ্বারাই তাঁহার হৃদয় মথিত হইয়াছে। লখিন্দরের মৃত্যুর পর এই একটি মাত্র কথায় মনসা-মঙ্গলের একজন কবি সন্তান-শোকাতুর পিতৃহৃদয়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন,—'স্তব্ধ প্রায় হৈল সাধু নাহি বোলচাল।' —সাংসারিক ঝড়-ঝঞ্ঝায়

অবিচল-চিত্ত চাঁদ সদাগরের তৎকালীন মনের অবস্থা ইহা অপেক্ষা সার্থকভাবে বোধ হয় বর্ণনা কবা অসম্ভব হইত। চৈতন্যের গৃহত্যাগের পর বৃন্দাবন দাস শচীদেবী সম্বন্ধেও এমনই সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছিলেন, —'পৃথিবী স্বরূপা হইলা শচী জগন্মাতা।' যেখানে অনুভূতি সুগভীর সেখানে বেদনা-বোধও বিমূঢ় হইয়া যায়। যে অমিত তেজস্বিতা দ্বারা চাঁদ সদাগর নিজের আদর্শগত নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, তাহা দ্বারাই তিনি এই লৌকিক পুত্রশোক জয় করিয়া লইলেন,

স্বভাবে বৈষ্ণব সাধু যোগমন্ত্র জানে।
কারণ জানিয়া শোক পাশরিল মনে।।

কাব্যের উপসংহারে চাঁদ সদাগরের যে পরাজয় বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা মানুষের নিকটই মানুষের পরাজয়—দুঃখিনী পুত্রবধূর নিকট স্নেহশীল এক পিতৃতুল্য হৃদয়ের নির্বিচার আত্মসমর্পণ। ইহা রক্তমাংসে গঠিত মানুষেরই দুর্বলতার পরিচায়ক। সেইজন্য আদর্শবাদী হইয়াও চাঁদ ধরণীর ধূলিমাটির স্পর্শ হইতে উর্ধ্বে উঠিতে পারেন না। ইহাই চাঁদ চরিত্রের সার্থকতার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ। মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে চাঁদ সদাগরের চরিত্রের আর একটি বড় সুন্দর সার্থকতা রহিয়াছে। একদিকে তাঁহার সুদৃঢ় চরিত্র ও অপর দিকে সনকা-বেহুলার সকরুণ চিত্র—ইঁহাদের বিপরীতমুখী আদর্শের পরস্পর সংঘাতে মনসা-মঙ্গল কাব্য এক অপূর্ব রসরূপ ধারণ করিয়াছে,—বৈচিত্র্যহীন করুণ-রসের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ হইয়া উঠে নাই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ন্যায় প্রাচীন বাংলা কাব্যেও 'নায়িকারই প্রাধান্য' দাবী করিয়া দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন 'কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মধ্যে কেবল ফুল্লরা এবং খুল্লনা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বিকৃত বৃহৎ স্থাণু মাত্র এবং ধনপতি ও তাহার পুত্র কোন কাজের নহে।' কিন্তু মনসা-মঙ্গলের নায়ক চাঁদ সদাগর সম্পর্কে এই দাবী প্রযোজ্য নহে। এমন কি, মনসা-মঙ্গলের নারী-চরিত্রগুলিও কেবল যে নিজেরাই নড়িয়া বেড়ায়, তাহাই নহে—পাঠকের চিত্তকেও নাড়া দিয়া যায়। আর চাঁদ সদাগরের তো কথাই নাই।

আদর্শবাদী সমাজের অন্যতম আদর্শ চরিত্র-সৃষ্টি বেহুলা। বেহুলা একাধারে রামায়ণের সীতা ও মহাভারতের সাবিত্রী, —দুঃখ-সহনশীলতায় সে সীতা ও মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করিবার শক্তিতে সে সাবিত্রী। আমাদের সমাজের যে নিয়ম তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে; ইহার দুঃখের ভাগটা অধিকাংশই নারীর দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। নীরবে সকল দুঃখ সহ্য করিবার ক্ষমতাও এই নারীজাতির অসীম; সেইজন্য কোনো ব্যবস্থাই সে কোনদিনই মাথা পাতিয়া লইতে অস্বীকার করে নাই, কোনো ব্যবস্থার জন্য তাহার কোনদিন কোন প্রতিবাদও শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বেহুলার চরিত্রের মধ্যে এমন একটি গুণের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহা হইতে মনে হয় যে, এই নিয়মানুবর্তিতার মূলে তাহারও

একটু বিদ্রোহের ভাব সুপ্ত রহিয়াছে। বিবাহ রাত্রেই লখিন্দর সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিলে পুত্র-শোকাতুরা সনকা বেহুলাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। বেহুলা তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুত্তর দিল,

নাগিনী দংশিল প্রভু মোরে কর রোষ।
তোমার ছয় পুত্র মৈল সেও কি আমার দোষ।।

শোকোন্মত্তা জননী পুত্রের মৃত্যুর জন্য পুত্রবধূর দুর্ভাগ্যকে বারবার দায়ী করিতে লাগিলেন, তাঁহার বাক্যে বেহুলা অন্তরে ক্রুদ্ধ হইয়াও বাহিরে এই বলিয়া প্রতিবাদ করিল,—

সোনেকার বচনে বেহুলা কোপে জ্বলে।
যোড় হাত করিয়া শাশুড়ীর আগে বলে।।
পাপ কর্মের ফলে বিধাতা পাষণ্ডী।
বিয়ার রাত্রে মৈল স্বামী হৈলাম কাঁচা রাণ্ডী।
অভাগিনী বেহুলারে মাতা কেন কর রোষ।
কর্মদোষে মইল প্রভু নহে মোর দোষ।।

তারপর মৃত স্বামীকে কোলে করিয়া বেহুলা যখন গাঙ্গুরের স্রোতে এক অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা করিল, তখন সনকা তাঁহার সকল রোষ ভুলিয়া তাহাকে গৃহে ফিরিতে বলিলেন; সনকার নিকট বেহুলা তখন আর তাঁহার পুত্রবধূ নহে, ব্যথিত মানবাত্মার প্রতীক মাত্র; তখন তাহার প্রতিও তাঁহার যে সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা ব্যথিত মানবতার প্রতি শাশ্বত মানবতার চিরন্তন সহানুভূতিরই অংশ বলিয়া গ্রহণ কবিতে হয়। ভাইয়েরা সংবাদ পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ঘরে ফিরিতে বলিল; বেহুলা কাহারও অনুরোধে কর্ণপাত করিল না। কাহারও কোন অনুনয় বিনয় ও স্নেহানুরোধ তাহাকে তাহার লক্ষ্যপথ হইতে বিচলিত করিতে পারিল না। লৌকিক আকর্ষণ অপেক্ষা একটা অনির্দিষ্ট আদর্শের আকর্ষণই তাহার কাছে বড় হইয়া উঠিল এবং তাহার উপরই তাহার জগজ্জয়ী সতীত্বেরও প্রতিষ্ঠা হইল। আজ যদি বেহুলা শাশুড়ী ও ভ্রাতার নির্দেশ মত সমাজের সাধারণ নিয়মানুযায়ী মৃত স্বামীর সৎকার করিয়া আসিয়া সমাজের আরও দশজন বিধবার মতই পরম নিষ্ঠার সহিত তাহার অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়া যাইত, তাহা হইলে কেমন করিয়া তাহার সতীত্বের এই দীপ্তি প্রকাশ পাইত? কিন্তু আজ সে যে এই সমাজ-নির্দেশেরই প্রতিবাদ করিয়া পরিস্ফুট যৌবনেও মৃত স্বামীর সঙ্গিনী হইয়া নির্মম মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে চলিয়াছে, তাহাতেই তাহার প্রকৃত গৌরব প্রকাশ পাইয়াছে। বেহুলার দুঃখ-সহনশীলতা অপেক্ষাও তাহার নির্ভীক তেজস্বিতাই যেন সকলের মন অধিক আকৃষ্ট করে। সহনশীলতা নারীর ধর্ম। ছয় অকাল-বিধবা পুত্রবধূর গভীর মৌন বেদনা চাঁদ সদাগরের সংসারে যেন এই গতানুগতিক দুঃখ-সহনশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে আসিল।

নির্মম মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার অসীম শক্তি লইয়াই যেন সে চাঁদ সদাগরের

সংসারে পদার্পণ করিল। অত্যাচার অবিচার নীরবে মাথা পাতিয়া বহন করিয়া যাওয়াও কাপুরুষতা; আত্মশক্তিকে জাগ্রত করিয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করিতে জানে, সে-ই সংসারে প্রকৃত বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারী। দৈবশক্তি বেহুলার একাগ্র সাধনার নিকট যেন মাথা নত করিতে বাধ্য হইল।

কিন্তু কেবলমাত্র আদর্শবাদের উপরই বেহুলা-চরিত্রের প্রতিষ্ঠা নয়, ইহার মধ্যে মানবিক অনুভূতির স্পর্শও অনুভব করা যায়। লখিন্দরের মৃত্যুর পর চাঁদ সদাগর যখন বেহুলার নিকট জানিতে চাহিলেন,—

বধূর ঠাঁই জিজ্ঞাসা কর কি আছে সাহস।
লখাইর সঙ্গে পুড়িয়া মরুক ঘুচুক অপযশ।।

তখন,

শ্বশুরের কথায় বেহুলার প্রাণে লাগে ভয়।
হস্ত যোড় করিয়া শ্বশুরের আগে কয়।।
বেহুলা বলে শ্বশুর তুমি দেবতা সমান।
অভাগিনী বেহুলার কথা কর অবধান।।
পূর্বকালের কথা কহিছে বুড়া বুড়ী।
সর্পাঘাতে মৈলে লোক অগ্নিতে না পুড়ি।।
কলার মাঞ্জুষে করি ভাসাও গাঙ্গরী।
আমি অভাগিনী যাব প্রভুর সংহতি।।

নির্মম সমাজের হৃদয়হীন ভ্রূকুটির সম্মুখে অসহায়া বালিকার এই কাতর প্রার্থনা কী করুণ! ইহার মধ্যেও প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বেহুলার প্রতিবাদের সুর প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। শ্বশুরের এই কথার পর তাহার নদীর জলে ডুবিয়া মরা ছাড়া আর কি সহজ উপায় ছিল? তাহার স্বর্গের পথে ভাসান যাত্রা জলে ডুবিয়া মৃত্যুর রূপক ছাড়া আর কি?

মনসা মঙ্গল কাব্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বাস্তব চরিত্রই সনকার। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দুইটি জননী-চরিত্র অনবদ্য হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, একটি লখিন্দর-জননী সনকা, আর একটি উমা-জননী মেনকা। ইহাদের সঙ্গে যদি চৈতন্য-জননী শচীমাতার চরিত্রটি আনিয়া যোগ করা যায়, তাহা হইলেই চিত্রটি পরিপূর্ণ হয়। এই চরিত্র কয়টি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মধ্যযুগের বাংলার কবিদিগের আদর্শনিষ্ঠা যত উচ্চাঙ্গেরই হউক, বাস্তব অনুভূতিও তাহা অপেক্ষা তাঁহাদের কোন অংশেই কম ছিল না। জননী-চরিত্র পরিকল্পনায় এ'দেশের কবিগণ বাংলার গৃহাঙ্গিনার বাস্তব পরিবেশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। সাধক রামপ্রসাদও তাঁহার অধ্যাত্ম-সাধনার লক্ষ্য-স্বরূপিণীকে জননীরূপে কল্পনা করিয়া তাহারও বাস্তব পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন।

ছয় বিধবা পুত্রবধূ ও দেবদ্রোহী স্বামী লইয়া সনকার নিত্য সংসার, দুঃখের মধ্যে দৈবের নিকট যে সান্ত্বনা সন্ধান করিবে তাহারও উপায় নাই। এই নারীর তাহা হইলে অন্তরের জ্বালা জুড়াইবার স্থান কোথায়? স্বামী সুখ-দুঃখে নির্বিকার, কিন্তু তিনি নারী, তাঁহার দুঃখের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার জন্যই তাঁহার গর্ভে অভিশপ্ত সপ্তম পুত্র লখিন্দর জন্মগ্রহণ করিল। এই পুত্রের বিবাহের দিনই তাঁহার জীবনের চরম দুঃখ লেখা ছিল। পুত্র-পুত্রবধূকে বরণ করিয়া লইবার মুহূর্তে আকাশের কোন অদৃশ্য কোণ হইতে এক নিদারুণ বজ্রাঘাত তাঁহার উপর পতিত হইল। সনকা চির সন্তান-দুঃখিনী, কিন্তু এমন কঠিন দুঃখও কি তাঁহার সহ্য করিতে বাকি ছিল? ইহাও কি তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে?

কি শুনালে সখীগণ শুনাও আবার।
সত্য কি মরেছে আমার বাছা লক্ষীন্দর।।
আলুথালু চুলে ধায় পাগলিনীর বেশে।
ত্বরিতে চলিয়া গেল বাসরের পাশে।।

তারপর তাঁহার সে কি পুত্র-শোকোন্মাদিনী মূর্তি,—

কবাট করিয়া দূর বাসরে সামায়।
দেখিল সোনার তনু ধূলায় লুটায়।।

পুত্র-শোকাতুরা বাঙ্গালী জননী তারপর স্বভাবতই পুত্রের দুর্ভাগ্যের জন্য সদ্যবিবাহিতা পুত্রবধূকে দায়ী করিলেন,—

সোনা বলে বধূ তুমি পরম রূপসী।
আমার বাছা খাইতে আইলা কপট রাক্ষসী।।

তারপর যখন অভিমানিনী বেহুলা মৃত স্বামীকে কোলে করিয়া গাঙ্গুরের জলে ভাসিল, তখন তাহার জন্য সনকার মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল,—

সোনা বলে বধূ তুমি আমার কথা রাখ।
লখাইর বদলে মোরে মা বলিয়া ডাক।।

কিন্তু অবিচলিত বেহুলা যখন তাঁহার নিকট চারিটি নিদর্শন রাখিয়া যাত্রার জন্য উদ্যত হইল, তখন সনকা মাতৃহৃদয়ের স্নেহোচ্ছ্বাস আর রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না; এই স্নেহগুণেই পরের গর্ভজাত সন্তানকে বাংলার মায়েরা আপনার সন্তানের সঙ্গে অভিন্ন করিয়া দেখিয়া থাকেন,—

যত্ন করি সোনেকা রাখিল নিদর্শন।
বেহুলারে কোলে করি যুড়িল ক্রন্দন।।
ধারা শ্রাবণের হেন চক্ষে বহে পানী।
চরণে পড়িয়া বেহুলা মাগিল মেলানি।।

চক্ষের পলকে মাঞ্জুস গাঙ্গুরের স্রোতে অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন নিজের শূন্য সংসারের দিকে চাহিয়া সনকা কী মর্মভেদী আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন,—

তোমাবে বিদায় দিয়া খাড়া হইয়া চাই।
মা বলিয়া কে ডাকিবে হেন লক্ষ্য নাই।।

এই রিক্তা জননীর একটি সকরুণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস মনসা-মঙ্গলের সমগ্র কাহিনীটিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

এই করুণ বিয়োগান্তক কাব্যের চরম অভিশপ্ত চরিত্র লখিন্দর। সে এই কাহিনীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত, অথচ তাহাকে লইয়াই কাহিনী। কাহিনীর মধ্যে কোনদিন সে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নাই, —জননীর সতর্ক স্নেহ-দৃষ্টির ছায়ায় তাহার জীবন অলক্ষ্যগোচর রহিয়া গিয়াছে। অকস্মাৎ একটি দিনের জন্য সে কাহিনীর নায়ক হইয়া উঠিয়াছিল—সেদিন তাহার পরম ও চরম দিন—সেই দিনই তাহার বিবাহ ও তাহার মৃত্যু। অমলিন বরসজ্জা লইয়া সেদিন সে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিল। তাহার মুখ হইতে একবার মাত্র যে কথা বলিতে শুনিলাম, তাহাও তাহার মৃত্যুযন্ত্রণার করুণ আর্তনাদ,—

ওঠ ওঠ প্রাণেশ্বরি কত নিদ্রা যাও।
মোক খাইল কালনাগে চক্ষু মেলি চাও।।

একটি উন্মুখ জীবন অকস্মাৎ ছিন্নমূল তরুর মত ধূলিতে লুটাইয়া পড়িল— অতৃপ্তির একটি সুগভীর হতাশা লইয়া সে এক উৎসব-দীপালোকিত জন-কোলাহলপূর্ণ রাজপুরী হইতে বিদায় লইল—তারপর এই বিয়োগান্তক কাব্যের করুণ কাহিনীর উপলক্ষটুকু মাত্র হইয়া শ্মশানের দগ্ধ অঙ্গারের মতো ইহার এক প্রান্তে পড়িয়া রহিল।

আর একটি চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। তিনি মনসা। মনসাকে দেবতা বলিয়াই সর্বত্র উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীন বাংলা সমাজের পরিকল্পিত নিজস্ব এই দেবতা যে কোনও বিষয়েই সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই, এই চরিত্রটি আলোচনা করলে তাহাই বুঝিতে পারা যায়। মানুষেব কতকগুলি সামাজিক দায়িত্ব আছে বলিয়া তাহাকে সর্বদাই সমাজের বিধি-নির্দিষ্ট গতিপথেই অগ্রসর হইতে হয়, সেইজন্য একটা নির্দিষ্ট নৈতিক মানের নীচে তাহার নামিবার উপায় নাই। কিন্তু এই তথাকথিত দেবতার তেমন কোন সামাজিক কিংবা নৈতিক দায়িত্ব নাই; সেইজন্য তাঁহার চরিত্রের মধ্যে যথেচ্ছাচারিতা প্রবলভাবে প্রশ্রয় পাইয়াছে—এই দিক দিয়াই তিনি মানুষের চাইতে হীন। নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য মনসা হীনতম উপায়ে অন্নের সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করিয়া চাঁদের ছয়টি শিশুপুত্রের প্রাণ নাশ করিলেন। এই শিশুহত্যার ব্যাপারে পুতনা চরিত্রের সঙ্গে তাঁহার কোনও পার্থক্য নাই। সামান্য অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য তিনি হীনতম প্রতিহিংসার পথ সর্বদাই সন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছেন। এই হীন চরিত্রটিকে

যথার্থই চরম কাপুরুষ বলিয়াও চিত্রিত করা হইয়াছে। যখন তিনি চাঁদ সদাগরের প্রাসাদ-বাটী বিনষ্ট করিতেছিলেন, সেই সময় সহসা চাঁদ হিন্তালের লাঠি কাঁধে করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ 'প্রাণ লইয়া পদ্মাবতী উঠি দিলা রড়।'

অতএব তিনি আদর্শের অমৃতলোক-বিহারিণী নহেন। আবার ঝালু মালুর বাড়িতে যখন মনসা-পূজা হইতেছিল, দৈবাৎ চাঁদ সদাগর সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহার স্কন্ধে হিন্তালের যষ্ঠি দেখিয়া,—'ভয়ে চমকিত হৈল মনসার মন'। এই তথাকথিত দেবতা বাঙ্গালী কবির কল্পনায় মানুষের সম্মুখে প্রাণভয়ে ভীত।

চাঁদ সদাগর তাঁহার আরাধ্য দেবতাদিগকে পূজা করিয়া যখন বাণিজ্য-যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন, তখন মনসার একটি বড় করুণ চিত্র প্রকাশ পাইয়াছে। দেব-দেবীগণ যখন চাঁদ সদাগরের পূজা গ্রহণ করিতেছেন, তখন মনসা বৃদ্ধার বেশে কাঙালিনীর মত সেই পূজাস্থানের এক প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিবার জন্য চাঁদ তাঁহার ভৃত্যকে আদেশ দিলেন,—

চান্দর কোপ দেখি পদ্মার ভয় অতিশয়।
যোড় হাতে কহে দেবী করিয়া বিনয়।।

মানুষের নিকট দেবতার এই 'যোড় হাত' করিবার চিত্রটি কেবলমাত্র বাঙ্গালী কবির পরিকল্পনায়ই সম্ভব হইয়াছে। যে দেশের কবি ভগবানকে দিয়া ভক্তের 'পদ-পল্লব' মস্তকে ধারণ করাইয়াছেন, সেই দেশেরই কবি দেবতাকে মানুষের সম্মুখে এমনভাবে যোড় হাতে দাঁড়াইবার কথা কল্পনা করিতে পারেন। মনসা বিনীতভাবে যোড় হাত করিয়া চাঁদ সদাগরকে বলিলেন,—

পদ্মা বলে কোপ এড় সাধুর তনয়।
অবধান কর আমি হই পরিচয়।।
কোপ পরিহর সাধু আমি নাগজাতি।
মহাদেবের কন্যা আমি নাম পদ্মাবতী।।
যাত্রাকালে দেব পূজ ফুলে আর ধূপেতে।
তেকারণে আসিলাম তোমার পূজা খাইতে।।
মোর তরে কোপ এড় সাধুর কুমার।
মোর তরে ফুল জল দেও একবার।।

চাঁদ সদাগর ব্যতীত অন্য কেহ হইলে হয়ত দেবতার এই কাতর প্রার্থনায় তাহার মানব-হৃদয় বিগলিত হইত। কিন্তু চাঁদ ইহার কি প্রত্যুত্তর দিলেন?

চান্দ বলে কাণী তোর লাজ নাই চিতে।
কোন মুখে আইলি তুই মোর পূজা খাইতে।।

যেই হাতে পূজি আমি শঙ্কর ভবানী।
সেই হাতে পূজা খাইতে চাহ দুষ্ট কাণী।।

শুধু এই পর্যন্তই নহে,—

তর্জে গর্জে চান্দ হেতাল লইয়া লাফে।
কলার বাকল হেন পদ্মার প্রাণ কাঁপে।
দন্তে দন্তে দশনে করে কড়মড়।
প্রাণ লইয়া মনসা উঠিয়া দিল রড।।
ত্রাসে যায় পদ্মাবতী আলুথালু চুলি।
পাছে পাছে ধায় চান্দ ধর ধর বলি।।

দেবতার মাহাত্ম্য রচনা করিতে বসিয়াও বাঙ্গালীর প্রাচীন কবিগণ দেবতাকে যে কি চক্ষে দেখিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আর কোথায় পাওয়া যাইবে? মনসা-মঙ্গল কাব্যে ইহাই যদি দেবতার পরিচয় হইয়া থাকে, তবে বলিতে হয়, মনসা-মঙ্গল কোনও দেবমাহাত্ম্যসূচক কাব্য নহে, ইহা প্রকৃতপক্ষে মানুষেরই মহিমা-কীর্তন। ইহার একটি কারণের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মনসাকে দেবতা বলিয়া কল্পনা না করিয়া তাঁহাকে মধ্যযুগের অত্যাচারী রাষ্ট্রশক্তির প্রতীকরূপেই কল্পনা করা হইয়াছে। সেইজন্য আত্মরক্ষায় নিরুপায় সমাজের সমগ্র ঘৃণা তাঁহার উপর পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। অত্যাচারিতের নিকট বার বার সেই দেবতার অপমান ও পরাজয় বর্ণনা করিবার ভিতর দিয়া লাঞ্ছিত সমাজ সেদিন নিজের দুর্গতির মধ্যে এইভাবেই মানসিক সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেরই অল্পাধিক এই দাবী আছে।

মধ্যযুগ হইতেই বাঙ্গালী কবিগণ মানুষের মনুষ্যত্ব, তাহার শৌর্যবীর্য এবং পৌরুষের যে জয়গান গাহিয়া আসিতেছেন, সে ভাবে দেবতার জয়গান গাহেন নাই। বৈষ্ণব কবিতার কথা তুলিয়া কেহ কেহ এই বিষয়ে প্রতিবাদ করিতে পারেন, কিন্তু বৈষ্ণব কবিতাও বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য, কান্তা প্রভৃতি নিতান্ত মানবিক অনুভূতি আশ্রয় করিয়াই ইহার সামগ্রিক আধ্যাত্মিক দর্শন গঠন করিয়াছে—শ্রীমদ্ভাগবতের সূত্র অনুসরণ করে নাই। তথাপি এ'কথা সত্য, বৈষ্ণব কবিতায় তাহা কতকটা অস্পষ্ট হইয়া আছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ইহার কোনও অস্পষ্টতা নাই। দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিবার নাম করিয়া ইহার কবিগণ দেবতাকে সাধারণ মানুষের স্তরে নামাইয়া আনিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, সাধারণ মানুষের গুণটুকু বর্জন করিয়া তাহার দোষটুকুই মাত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কেবল মাত্র দোষটুকু প্রত্যক্ষ করিবার কারণ এই যে, অত্যাচারী শাসকের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া সমাজে তাহাদের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। সেইজন্য অত্যাচারী শাসককে তাহারা যে প্রকৃতির মানুষ রূপে প্রত্যক্ষ করিতেন, দেবতাকেও সেই প্রকৃতির মানুষ বলিয়াই তাঁহারা মনে করিয়াছেন। সেইজন্য মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণ মানুষ হইয়াও অমানুষ—দেবতা তো নহেনই।

তৃতীয় অধ্যায়

লৌকিক চণ্ডীপূজার ইতিহাস—চণ্ডীমঙ্গল কাব্য—চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ

লৌকিক চণ্ডীপূজার ইতিহাস

বাংলা লৌকিক শক্তিদেবতাদিগের মধ্যে চণ্ডীর প্রকৃতিই সর্বাপেক্ষা জটিল। ইহার কারণ, বিভিন্ন সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় অবস্থা হইতে অনেক সময় পরস্পর স্বতন্ত্র প্রকৃতির যে সকল স্ত্রীদেবতার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, তাহাই কালক্রমে এক সাধারণ চণ্ডী নামের মধ্যে আসিয়া স্থান লাভ করিয়াছে। পুরাণের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, সকল শক্তি-দেবতাই কালক্রমে শিবের একমাত্র পত্নীরূপে পরিণতি লাভ করিলেও, ইহাদের উদ্ভবের ইতিহাস পরস্পর স্বতন্ত্রই ছিল। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' (প্রকৃতি খণ্ড, ৫৭ অধ্যায়) শক্তিদেবতার এই বিভিন্ন নামগুলি পাওয়া যায়,—যেমন দুর্গা, নারায়ণী, ঈশানী, বিষ্ণুমায়া, শিবা, সতী, নিত্যা, সত্যা, ভগবতী, সর্বাণী, সর্বমঙ্গলা, অম্বিকা, বৈষ্ণবী, গৌরী, পার্বতী, সনাতনী। ইঁহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, 'the critical eye will see that they are not merely names, but indicate different goddesses who owed their conception to different historical conditions but who were afterwards identified with the one goddess by the usual mental habit of the Hindus.'[১]

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও এই প্রকার বিভিন্ন প্রকৃতির লৌকিক চণ্ডীর পূজা হইয়া থাকে, যেমন, নাটাই চণ্ডী, ঘোর চণ্ডী, উড়ন চণ্ডী, কুলুই চণ্ডী, শুভচণ্ডী (চলতি কথায় সুবচনী), খাড়া শুভচণ্ডী, রখাই চণ্ডী, উদ্ধার চণ্ডী, রণচণ্ডী, ওলাই চণ্ডী, বসন চণ্ডী, অবাক চণ্ডী, কলাই চণ্ডী, ককাই চণ্ডী, ঢেলাই চণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী—মঙ্গলচণ্ডীর আবার কতকগুলি প্রকার-ভেদ আছে, যেমন, বারমেসে মঙ্গলচণ্ডী বা নিত্যা মঙ্গলচণ্ডী, জয়মঙ্গলচণ্ডী, হরিষ মঙ্গলচণ্ডী, কুলুই মঙ্গলচণ্ডী, সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী, সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডী, উদয় মঙ্গলচণ্ডী, ভাউত্তা মঙ্গলচণ্ডী, মঙ্গল সংক্রান্তি ইত্যাদি।[২] বর্ধমান জেলার মেমারি রেল স্টেশনের দুই মাইল

১। R. G. Bhandarkar, *Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems*, 1913, 143-44.

২। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পূজিত কয়েকটি বিভিন্ন প্রকৃতির মঙ্গলচণ্ডী পূজার বিবরণ ও তাঁহাদের সম্ভাবিত অনার্য সম্ভব সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—Tarak Chandra Roy Chaudhuri and Sarat Chandra Mitra, 'On the Cult of the goddess Mangal Chandi in Eastern Bengal', *J. Anth. S. B.* XIII (1927), 103-112.

দূরবর্তী কলসপুর নামক গ্রামে শিবা চণ্ডী নামে এক দেবী আছেন; তিনি শৃগালের উপর আরূঢ়া। বর্তমানে প্রস্তর নির্মিত শৃগাল মূর্তিটি স্থানান্তরিত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে পূজিত হইলেও দেবীর ধ্যানে 'বামপাদস্থ ফেরুপৃষ্ঠোপরি স্থিতাম্' বলিয়া উল্লেখ করা হয়; ইহাতে বাংলার শৃগাল পূজা যে লৌকিক চণ্ডী পূজার মধ্যে আসিয়া কি ভাবে পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

চণ্ডীকে মঙ্গল বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, চণ্ডী ভীষণা প্রকৃতির (malignant) দেবী, তাঁহার নিকট হইতে অমঙ্গলেরই আশঙ্কা বেশি—সেইজন্য তাঁহাকে প্রসন্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে কিংবা তাঁহাব অপ্রিয় নামটি এড়াইবার প্রবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ একটি বিপরীতার্থক শব্দ দ্বারা তাঁহার উল্লেখ করা হয়। ইহাকেই ইংরেজীতে euphemism বলে। বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে শীতলা বলিয়া উল্লেখ করিবার ইহাই উদ্দেশ্য। উপরি-উদ্ধৃত লৌকিক স্ত্রী-দেবতাসমূহ এক চণ্ডী নামের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইঁহাদের প্রকৃতি যে পরস্পর স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন জনশ্রুতি ও ঐতিহাসিক পটভূমিকা হইতে যে তাঁহাদের উদ্ভব হইয়াছে, ইহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

বাংলার প্রতিবেশী আদিবাসী সমাজের মধ্যে এখনও গভীরভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উল্লিখিত স্ত্রী-দেবতাদিগের অনেকেই এখনও তাহাতে অনুরূপ উদ্দেশ্যে পূজিত হইতেছেন। প্রতিবেশী আদিবাসী সমাজের সঙ্গে যখন বাংলার সমাজের আভ্যন্তরীণ যোগ নিবিড়তর ছিল, তখনই তাহা হইতে এই দেবতাদিগের পরিকল্পনা বাংলার উচ্চতর সমাজেও গৃহীত হইয়াছে। আদিবাসী সমাজ হইতে যে দুই একটি এই শ্রেণীর দেবতা বা উপদেবতার পরিচয়ের এখনও সন্ধান পাওয়া যায়, নিম্নে তাহাদের উল্লেখ করা যাইতেছে; বলা বাহুল্য, বাংলদেশে সংস্কৃতের প্রভাববশত এই সকল অনার্য দেবতার নাম পরবর্তীকালে এমনভাবে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে যে, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদের মৌলিক পরিচয় প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি দুই একটি ক্ষেত্রে ইঁহাদের যে সন্ধান পাওয়া যায়, সেই সম্বন্ধেই এখানে উল্লেখ করা যাইবে।

এখানে চণ্ডীর কথাই আলোচনা কবা যাক। অন্যান্য নামে দেবীচরিত্র থাকিলেও বৈদিক সংহিতায় চণ্ডী নাম নাই; রামায়ণ, মহাভারত কিংবা প্রাচীন কোন পুরাণেও এই দেবতার উল্লেখ মাত্র নাই। অর্বাচীন কয়েকখানি সংস্কৃত উপ-পুরাণ, যথা 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ', 'দেবীভাগবত', 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', 'মার্কণ্ডেয়পুরাণ', 'হরিবংশ' প্রভৃতিতে চণ্ডী নামটির সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। ইহা হইতেই মনে হয়, আর্যেতর কোনও সমাজ হইতে এই নামটি কালক্রমে পূর্ব ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

চণ্ডী শব্দটি অর্বাচীন সংস্কৃত, অর্থাৎ কোনও অনার্য ভাষা হইতে পরবর্তী কালে সংস্কৃত শব্দকোষে স্থান লাভ করিয়াছে। চণ্ডী শব্দটি সম্ভবত অস্ট্রিক কিংবা দ্রাবিড় ভাষা হইতে আগত। দ্রাবিড় ভাষাভাষী দৃশ্যত আদি-অস্ত্রাল (Proto-Australoid) জাতীয় ছোট

নাগপুরের অধিবাসী ওরাওঁ নামক উপজাতির মধ্যে 'চাণ্ডী' নামে এক শক্তিদেবীর পরিচয় লাভ করা যায়। তাঁহার বৃত্তান্ত এই প্রকার[১]—

চাণ্ডী স্ত্রী-দেবতা, তিনি প্রসন্ন হইলে পশু-শিকারে কৃতিত্ব ও যুদ্ধে জয় লাভ করা যায়। অবিবাহিত ওরাওঁ যুবকদিগের এই দেবতাই প্রধান দেবতা। গোলাকৃতি এক খণ্ড পাথরের টুকরার মধ্যে তাঁহার পূজা হয়। যখন ওরাওঁ যুবকগণ শিকারে বাহির হয়, তখন তাহারা চাণ্ডীশিলা নিজেদের সঙ্গে রাখে—তাহাদের বিশ্বাস ইহা সঙ্গে থাকিলে শিকারে ব্যর্থকাম হইবার আশঙ্কা নাই। প্রত্যেক ওরাওঁ পল্লীতে, সাধারণত কোনও পর্বতের ঢালু জায়গায়, চাণ্ডী- টাঁড় নামক এক কিংবা একাধিক স্থান থাকে; সেখানে এক টুকরা পাথরের মধ্যে চাণ্ডীর অধিষ্ঠান কল্পনা করা হইয়া থাকে। একটি বড় চাণ্ডীশিলার চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক শিলা থাকে, তাহাদিগকে চাণ্ডীর ছেলেপিলে বলা হয়। (পশ্চিমবঙ্গে শিলারূপী গ্রাম্য দেবতার চারিপার্শ্বেও এই শ্রেণীর শিলাখণ্ড থাকে, তাহা আবরণ দেবতা নামে পরিচিত)। ওরাওঁ দিগের বিশ্বাস চাণ্ডীশিলা বৎসরের পর বৎসর অলক্ষে বাড়িতে থাকে। চাণ্ডী সাধারণত অবিবাহিত যুবকদিগেরই দেবতা, তাহারাই প্রধানত তাঁহার পূজা করিয়া থাকে।

মাঘী-পূর্ণিমার দিনে ইঁহার বাৎসরিক পূজার অনুষ্ঠান হয়। সাত আট দিন পূর্ব হইতেই পূজার আয়োজন করা হইয়া থাকে, তখন হইতেই ওরাওঁ যুবকগণ বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া সকলকে এই উৎসবের জন্য ধেনো মদ তৈয়ারী করিবার জন্য অনুরোধ করিতে থাকে। হাটের দিন একটি ছাগল ক্রয় করা হয়। মাঘী-পূর্ণিমার দিন সকাল হইতেই ওরাওঁ যুবকগণ গ্রাম্য আখড়া বা নৃত্যাঙ্গিনায় সমবেত হইতে থাকে। গ্রাম্য পাহানের (মোড়লের) স্ত্রী স্থানটি পূর্ব হইতেই গোবরমাটি দিয়া নিকাইয়া রাখে। সমবেত যুবকদিগের মধ্যে একজনকে পাহান বা সেই দিনকার অনুষ্ঠানের পুরোহিত নির্বাচন করা হয়। পাহান-যুবক সঙ্গীদের, পূজা ও ভোজের উপকরণ এবং বাদ্যভাণ্ড সহ চাণ্ডীটাঁড়ে যায়। সেখানে গিয়া পাহান-যুবক চাণ্ডী-শিলায় তিনটি সিঁদুরের ফোঁটা আঁকিয়া দেয়। অন্যান্য যুবকগণ চাণ্ডী-শিলার উপর কিছু আতপ চাউল ছড়াইয়া দেয়। বলির ছাগলটিকে কিছু আতপ চাউল খাইতে দেওয়া হয়; যখন ইহা চাউল খাইতে থাকে, তখন এক কোপে ইহার শিরশ্ছেদ করা হয়। সেইখানেই ইহার মাংস রান্না করা হয় এবং তাহা দ্বারা ভোজ নিষ্পন্ন হয়। অবিবাহিত ওরাওঁ যুবক ব্যতীত অন্য কেহ এই ভোজে যোগদান করিতে পারে না। সন্ধ্যা পর্যন্ত চাণ্ডীটাঁড়ে এই প্রকার উৎসব চলিতে থাকে। সন্ধ্যার পর বাদ্যভাণ্ডসহ যুবকগণ গ্রামে ফিরিয়া আসে। যুবক ও যুবতীগণ গ্রামের আখড়া বা নৃত্যাঙ্গিনায় আসিয়া সমবেত হয়, অন্যান্য সকলে ঘরে ফিরিয়া যায়। শেষ রাত্রি পর্যন্ত যুবক-যুবতীগণ সমবেত ভাবে আখড়ায় নৃত্য-গীত করিয়া থাকে।

উল্লিখিত চাণ্ডী ব্যতীত ওরাওঁদিগের সহরুল উৎসবের সময় আর এক চাণ্ডীর পূজা হইয়া থাকে, তাঁহার নাম মূর্তি চাণ্ডী। কোনও বৃক্ষের নীচে অর্ধ-প্রোথিত প্রস্তর খণ্ডে মূর্তি

১। S. C. Roy, *Oraon Religion and Customs* (Ranchi, 1928), 60-65

চাণ্ডী অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহার পূজার আচার পূর্বোল্লিখিত চাণ্ডী-শিলার পূজার আচার হইতে স্বতন্ত্র।

এখন বিচার করিয়া দেখিতে হয় যে, এই চাণ্ডী বা মূর্তি চাণ্ডীর সঙ্গে বাংলাদেশে পূজিত লৌকিক চণ্ডীর কোনও সম্পর্ক আছে কিনা। দেখিতে পাওয়া যায় যে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যে দুইটি কাহিনী আছে, তাহাদের একটির নায়ক এক অনার্য ব্যাধ-যুবক, তাহাতে চণ্ডী নামক যে দেবতার মহিমা কীর্তিত হইয়াছে, তাহাব সঙ্গে উল্লিখিত চাণ্ডীর চরিত্রগত অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এই চাণ্ডীও মৃগয়াজীবীদিগেরই দেবতা, পশু-শিকারে সাফল্য কামনা করিয়াই তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হইয়া থাকে। উক্ত চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীতে সুস্পষ্টই বর্ণিত আছে যে, এই দেবী পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং অস্পৃশ্য ব্যাধ সমাজই তাঁহার অনুগৃহীত। তিনি ইচ্ছা করিলে শিকারীর দৃষ্টি হইতে বনের পশু লুকাইয়া রাখিতে পারেন; অতএব তিনি প্রসন্ন থাকিলেই মৃগয়ায় সাফল্য লাভ করা যায়। এই দেবতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, 'some of the spirits, however, such as Chandi, the Goddess of hunting and war, are remarkable for shape-shifting which is indeed a characteristic of the spirits and deities of the Oraon pantheon,'[১] অর্থাৎ কতকগুলি উপদেবতা, যেমন, মৃগয়া ও যুদ্ধের দেবতা চাণ্ডী, বিভিন্নরূপ পরিগ্রহণ করিয়া থাকেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে—ওরাওঁ দেব-সমাজের দেবতা ও উপদেবতাদিগের ইহা একটি বৈশিষ্ট্য। এখানে লক্ষ করিবার বিষয় যে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ব্যাধ-কাহিনীর দেবতা চণ্ডীও একাধিকবার রূপ পরিবর্তন করিয়া ব্যাধ-যুবককে ছলনা করিয়াছিলেন। প্রথমত সুবর্ণ-গোধিকা ও পরে ষোড়শী যুবতী মূর্তিতে এই দেবী ব্যাধ যুবকের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ওরাওঁ সমাজের উপরি-বর্ণিত চাণ্ডী ও চণ্ডী-মঙ্গলের ব্যাধকাহিনী-বর্ণিত চণ্ডীদেবীর মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই—উভয়েই অভিন্ন।

ছোটনাগপুরের মুণ্ডাভাষী মৃগয়াজীবী বীরহোড় জাতির মধ্যে মৃগয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে চাণ্ডী বা চাণ্ডীবোঙ্গা নামক এক দেবতা আছেন। তাঁহার কোন মূর্তি নাই। বীরহোড়গণ যে পর্ণকুটীরে বাস করে, তাহার নিকটবর্তী কোনও স্থানের বৃক্ষতলে এক কিংবা একাধিক প্রস্তরখণ্ড চাণ্ডীবোঙ্গা কর্তৃক অধিষ্ঠিত বলিয়া মনে করা হয়। গোষ্ঠীগতভাবে দল বাঁধিয়া (communally) শিকারে বাহির হইবার পূর্বে চাণ্ডীবোঙ্গার নিকট শিকারের সকল সরঞ্জাম, যথা, জাল, দড়ি, কুঠার, কাঠি ইত্যাদি স্তূপীকৃত করিয়া আনিয়া রাখা হয় এবং শিকারে সাফল্যের জন্য চাণ্ডীদেবী বা চাণ্ডীবোঙ্গার নিকট মোরগ বলি দেওয়া হয়। তারপর শিকার হইতে ফিরিয়া 'চণ্ডীতলা'য় আসিয়াই শিকারে নিহত পশুর মাংস ভাগ করা হয়।[২] মৃগয়াজীবী বীরহোড় জাতির চাণ্ডীই একমাত্র মৃগয়ায় সাফল্যদাত্রী দেবতা।[৩] পালামৌ

১। S. C. Roy, p. 3

২। S. C. Roy, The Birhora, (Ranchi, 1925), p. 50, এই গ্রন্থে এই বিষয়ের একটি আলোকচিত্র দেওয়া আছে।

৩। ঐ, PP. 298-99

জেলার অস্ট্রিক্‌ভাষী করোয়া উপজাতির মধ্যে চাণ্ডীদেবীর নাম শুনিয়াছি।

বিহারের অন্তর্গত ছোটনাগপুর বিভাগের বিভিন্ন উপজাতি অঞ্চলে পূজিতা মৃগয়ার অধিষ্ঠাত্রী এই দেবীর নাম চাণ্ডী; S. C. Roy (শরৎচন্দ্র রায়) প্রণীত ছোটনাগপুরের বিভিন্ন উপজাতির পরিচয়মূলক গ্রন্থে ইঁহার নাম 'চিহ্নবর্জিত ইংরেজী অক্ষরে' লিখিত হইয়াছে Chandi।[১] কিন্তু ইহার উচ্চারণ চাণ্ডী—'চান্দী' কিংবা 'চণ্ডী' নহে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় নৃতত্ত্ববিৎ আজীবন ওরাওঁ অধ্যুষিত অঞ্চল রাঁচি জেলার অধিবাসী রায় বাহাদুর স্বর্গত শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার একটি বাংলা প্রবন্ধেও লিখিয়াছেন,— 'ওরাওঁ প্রভৃতি জাতির "চাণ্ডী" নামক দেবতার সহিত হিন্দু চণ্ডীদেবীর সাদৃশ্য দেখা যায়। অর্ধরাত্রে উলঙ্গ হইয়া "চাণ্ডী"র অবিবাহিত যুবক পূজারী "চাণ্ডীস্থানে" গিয়া পূজা করে,' (শরৎচন্দ্র রায়, রাঁচি, 'ভারতের মানব ও মানবসমাজ', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৫শে বর্ষ [১৩৪৫ সাল], ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ২৪৭)। এই কথা একটু বিস্তৃতভাবে বলিবার প্রয়োজন এই যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত দ্বিজ মাধব প্রণীত 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'-এর সম্পাদক মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন, 'আমরা অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে বিহার, উড়িষ্যা এবং দিনাজপুর ও মালদহ অঞ্চলের ওরাওঁগণ চান্দী নামে এক দেবীর পূজা করে বটে, কিন্তু চাণ্ডী-উচ্চারিত দেবী তাহাদের অজ্ঞাত। চিহ্ন-বর্জিত ইংরেজি অক্ষরে চান্দীকে লেখা হয় Chandi; ইহাকে চাণ্ডী পড়া যাইতে পারে। এই ভাবেই চাণ্ডীর উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ('দ্বিজমাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত' [১৯৫২], ভূমিকা, পৃষ্ঠা ২।/°)।' কিন্তু উক্ত স্বর্গত শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের উক্তি হইতে ও বুঝিতে পারা যাইবে যে, দেবীর নাম চাণ্ডী, অতএব 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'-এর সম্পাদক মহাশয়ের উক্তি সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের ফলে আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে এই অঞ্চলে 'চান্দো' নামক এক দেবতা আছেন, কিন্তু চান্দী নামে কোন দেবতা নাই। 'চান্দো' দেবতার প্রকৃতি স্বতন্ত্র।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, আদিবাসী ওরাওঁ সমাজ এই দেবতার পরিকল্পনা এবং চাণ্ডী নামের জন্য তাহার পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু প্রতিবেশী সমাজের নিকট ঋণী, না পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজই এইজন্য তাহার এই আদিবাসী প্রতিবেশীর নিকট ঋণী? এ'কথা সত্য যে, ছোটনাগপুরের ওরাওঁ জাতির সমাজ বহুকাল যাবৎ হিন্দু সমাজের সঙ্গে প্রতিবেশী রূপে বাস করিবার ফলে হিন্দুধর্মেরও কিছু কিছু উপকরণ তাহার মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। অবশ্য এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ কিংবা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম রচিত হইয়াছিল—সেই সময়ে এই দুই সমাজের মধ্যে সম্পর্ক বর্তমান কালের মত এত ঘনিষ্ঠ ছিল না। অতএব বর্তমানে ওরাওঁ সমাজের মধ্যে কিছু কিছু হিন্দুধর্মের উপকরণ দেখিতে পাওয়া গেলেও, ইহা দ্বারা সাত শত কিংবা আট শত বৎসর পূর্বেকার অবস্থা অনুমান করা যায় না।

১। S.C Roy, p.3

আগেই বলিয়াছি, বৈদিক দেবদেবীর মধ্যে চণ্ডী নামক কোনও দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। রামায়ণ, মহাভারত কিংবা প্রাচীন কোনও পুরাণে এই দেবতার উল্লেখ মাত্র নাই; প্রাচীনতর সংস্কৃত অভিধানেও এই নামটির সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। কিন্তু দুর্গা, উমা, কালী, করালী, কাত্যায়নী, কন্যা কুমারী, হৈমবতী, সতী, অদ্রিজা, গৌরী ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়। এমন কি, 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' হইতে উদ্ধৃত শক্তিদেবতার নামের তালিকার মধ্যেও চণ্ডী নামটির উল্লেখ নাই, অর্থাৎ 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে'ও দুর্গা, নারায়ণী ইত্যাদি নামের সঙ্গে চণ্ডী নামটি স্থান পায় নাই। আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী কালে রচিত কয়েকখানি সংস্কৃত উপ-পুরাণ, যেমন 'দেবী-ভাগবত', 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ', 'হরিবংশ' প্রভৃতিতে চণ্ডীর নাম উল্লেখিত আছে। ইহাদের মধ্যে কোনও কোনও পুরাণ একেবারে অর্বাচীন না হইলেও, ইহাদের যে-সকল অংশে চণ্ডী কিংবা চণ্ডিকার নামের উল্লেখ আছে, তাহা যে পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ইহা হইতেই মনে হয়, আদিবাসী সমাজ হইতে উদ্ভূত হইয়াই এই দেবী কালক্রমে উচ্চতর হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন। তারপর বৈদিক দেবী দুর্গা, উমা ইত্যাদি দ্বারা কালক্রমে প্রভাবিত হইয়া ইহাদের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। চণ্ডী শব্দটির গঠন দেখিয়াই মনে হয় যে, ইহা দ্রাবিড় শ্রেণীর ভাষা হইতে আগত। মৌলিক শব্দটি সম্ভবত চণ্ডীই ছিল—ক্রমে অর্বাচীন সংস্কৃতে তাহা চণ্ডী, চণ্ডিকা, চণ্ডেশ্বরী, চণ্ডা ইত্যাদি রূপ লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহারা মূলত যে এক, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী যে ব্যাধ ও পশুকুলেরই দেবতা, কালকেতুর কাহিনী হইতে তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। 'গোহিংসক' রাঢ় ব্যাধ-সন্তান কালকেতুই তাঁহার প্রথম পূজারী। কালকেতুর বিক্রমে পরাজিত হইয়া পশুকুল এই চণ্ডীরই শরণাপন্ন হইয়াছে। শূকর মাংসের মত অস্পৃশ্য মাংসও চণ্ডীপূজারই উপকরণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই ভাবে অস্পৃশ্য ব্যাধ-সমাজে জন্ম লাভ করিয়া ক্রমে আর্য সমাজের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে এই দেবতার প্রভাব স্থাপিত হইতে লাগিল এবং ক্রমে পৌরাণিক একটি প্রসিদ্ধ স্ত্রীদেবতার চরিত্র পার্বতীর সঙ্গে এক হইয়া এই চণ্ডী পরবর্তীকালে হিন্দুর দেব-সমাজে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছেন। পরবর্তী কালে হিন্দু ভাস্কর্যে গঠিত কোনও কোনও চণ্ডী দেবীর মূর্তির মধ্যে পশুরাজ সিংহ, হস্তী ও গোধিকা ক্ষোদিত দেখিয়া এই দেবতা যে মূলত আরণ্য কোন জাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাংলার প্রাচীন (obsolete) ঐন্দ্রজালিক (magical) ছড়ায় চণ্ডীকে হাড়ীর ঝি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে মনসার উৎপত্তি সম্পর্কে বলিয়াছি যে, মনসার সহচরী নেতাকেও ধোপার ঝি বলিয়া উল্লেখ করা হইত। চণ্ডীকে হাড়ীর ঝি বলিবার তাৎপর্য কি? পশ্চিমবঙ্গের নিম্নশ্রেণীর হাড়ী জাতি যে এতদ্দেশীয় কোনও আদিম অনার্যভাষী জাতির শাখা হইতে উদ্ভূত, এই বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। ইহা হইতেও চণ্ডীর মৌলিক অনার্য সংস্রব সূচিত হয়। এখানে মনে হইতে পারে যে, কোন হাড়ী জাতীয় লোকের কন্যা তাহার কতকগুলি অলৌকিক (mystic)

শক্তির জন্য নিম্নশ্রেণীর সমাজে দেবী বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে, কালক্রমে সে স্ত্রীদেবী চণ্ডীর সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পিতা হয়---সেই জন্যই চণ্ডীকে সাধারণ সমাজে হাড়ীর ঝি চণ্ডী বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

এ'কথা সত্য যে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে যে দুইটি স্বতন্ত্র কাহিনী আছে, তাহাদের মধ্যে কালকেতু ব্যাধ কাহিনীর চণ্ডী উক্ত ব্যাধ সমাজ হইতে আগতা হইলেও, কালক্রমে বাংলার সমাজে চণ্ডী নামটি অন্যান্য সূত্র হইতে আগত স্ত্রী দেবতার উপরও প্রয়োগ করা হইতে থাকে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় কাহিনী বা ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে ব্যাধ ও পশুর সংস্রবহীন যে মঙ্গলচণ্ডীর উল্লেখ আছে, তিনি কোন্ সূত্র হইতে কবে আসিয়া বাংলার সমাজে পূজিতা হইতেছেন তাহা খুব স্পষ্ট করিয়া জানিবার উপায় নাই। এই বিষয়ে যাহা অনুমান করা হইয়া থাকে, তাহা এখানে ক্রমে ক্রমে উল্লেখ করিয়া তাহাদের যৌক্তিকতা বিচার করা যাইতেছে।

বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রে সকল স্ত্রীদেবতাকেই শক্তিরূপিণী বলিয়া কল্পনা করা হইত। তাঁহাদের মধ্যে বৌদ্ধ তন্ত্রোক্ত বজ্রতারার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেকে অনুমান করেন, বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী বজ্রতারা পরবর্তী কালে বাংলার লৌকিক দেবী মঙ্গলচণ্ডীতে পরিণত হইয়াছেন।[১] কিন্তু 'সাধনমালা'য় বজ্রতাবার যে সাধনার কথা আছে, তাহাতে তাঁহাকে পরিপূর্ণ শক্তিদেবতা বলিয়া কল্পনা করা হইলেও, তাঁহার মধ্যে বাংলার লৌকিক দেবী চণ্ডী ও মঙ্গলচণ্ডীর বিশেষ কোনও বৈশিষ্ট্য বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায় না; বজ্রতারার নিম্নোদ্ধৃত ধ্যান হইতেই তাহা প্রতীয়মান হইবে,—

মাতৃমণ্ডলমধ্যস্থাং তারাদেবীং বিভাবয়েৎ।
অষ্টবাহুং চতুর্বক্ত্রাং সর্বালঙ্কার-ভূষিতাম্॥
কনকবর্ণনিভাং ভব্যাং কুমারীলক্ষণোজ্জ্বলাম্।
পঞ্চবুদ্ধমহাকুটীং বজ্রসূর্যাভিষেকজাম্॥
নবযৌবনলাবণ্যাং চলৎকনককুণ্ডলাম্।
বিশ্বপদ্মসমাসীনাং রক্তপ্রভাবিভূষিতাম্।।
বজ্রপাশতথাশঙ্খসচ্ছরোদ্যতদক্ষিণাম্।
বজ্রাঙ্কুশোৎপলধনুস্তর্জনীবামধারিণীম্॥[২]

উদ্ধৃত ধ্যানে দেবীর একটি মাত্র বিশেষণে মঙ্গলচণ্ডীর একটি গুণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—তাহা অষ্টবাহু। বজ্রতারা দেবী অষ্টবাহুবিশিষ্টা। চণ্ডীমঙ্গলকাব্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, অষ্ট বা আট সংখ্যাটি মঙ্গলচণ্ডীর পক্ষে শুভসূচক এবং ঐন্দ্রজালিক (magic) গুণ-সম্পন্ন। অষ্ট দূর্বা-তণ্ডুল দ্বারা মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিতে হয়, তাঁহার মঙ্গলগানের নাম অষ্টাহ

১। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯০০ ২। সাধনমালা, ৯৩

গীত, অর্থাৎ আট দিনে তাহা গাহিয়া শেষ করিতে হয়। অতএব মঙ্গলচণ্ডীর এই একটি গুণ বৌদ্ধ বজ্রতারার পরিকল্পনা হইতেই হউক, কিংবা অন্য কোনও ক্ষেত্র হইতেই হউক আসিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। মঙ্গলচণ্ডী দেবী 'রক্তপ্রভা-বিভূষিতা'ও বটেন, তবে ইহা শক্তি দেবতা মাত্রেরই একটি সাধারণ গুণ হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত উদ্ধৃত ধ্যানে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডী কিংবা মঙ্গলচণ্ডীর আর কোনও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় না।

বজ্রযান বৌদ্ধসমাজে বজ্রধাত্বীশ্বরী নামে এক শক্তি দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। এই দেবী ষষ্ঠ ধ্যানী বুদ্ধ বজ্রসত্ত্বের শক্তিস্বরূপিণী। তান্ত্রিক বৌদ্ধ সমাজে এই দেবীর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বজ্রসত্ত্বের সঙ্গে তাঁহার মূর্তিও সর্বত্রই পূজিত হইত। 'সাধনমালা'য় বজ্রধাত্বেশ্বরীর যে সাধনার কথা উল্লেখ আছে, তাহাতে তাঁহার সহিত সর্প, ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতি পশুরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—

বজ্রধাত্বীশ্বরীং মারীচীং দ্বাদশভুজাং রক্তাং ষন্মুখীং লম্বোদরাং জ্বলৎপিঙ্গলোর্ধ্বকেশাং কপালমালিনীং সর্পমণ্ডিতমেখলাং ব্যাঘ্র-চর্মাম্বরধরাং .... নানাবরাহাকৃষ্যমাণরথাং .... ঊর্ধ্বকৃষ্ণবরাহৈকমুখীং ..... ত্রিনেত্রাং লোলজিহ্বাং করালবদনামতিভয়ানকাকারাং চিন্তয়েৎ।[১]

মনে হয়, দেবীর এই পরিকল্পনা অনার্য প্রভাব-প্রসূত, তথাপি ইঁহার সঙ্গে পূর্বোক্ত চণ্ডীর কোনও মৌলিক সম্পর্ক আছে কিনা বলা কঠিন। তবে এ'কথা সত্য যে, ইঁহার সঙ্গে ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের দ্বিতীয় কাহিনীর দেবতা মঙ্গলচণ্ডীর কোনও সম্পর্ক নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই বজ্রধাত্বীশ্বরীই বাংলার লৌকিক শক্তি দেবী বাসুলী নামে অভিহিত হন। তাঁহাদের মতে বজ্রেশ্বরী হইতে বাসুলী নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু 'সাধনমালা'য় বজ্রেশ্বরী নামে কোন দেবীর উল্লেখ নাই, বজ্রধাত্বেশ্বরী বা বজ্রধাত্বীশ্বরীই উক্ত শাক্ত দেবীর প্রকৃত নাম। এই বজ্রধাত্বেশ্বরী দেবীর সহিত কতকগুলি হিংস্র পশুর সংস্রব দেখিয়া ইহাই মনে হয় যে, সম্ভবত অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ভাষী মৃগয়া-জীবীর সমাজ হইতেই এই দেবী বজ্রযান বৌদ্ধ সমাজে গিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বাসুলীর পরিচয় স্বতন্ত্র; তাঁহার কথা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

মধ্যযুগের বাংলার, বিশেষত রাঢ়ের সমাজে বাসুলীর বিশেষ প্রভাব বর্তমান ছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাক্-চৈতন্যযুগের অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলীরই সেবক ছিলেন বলিয়া তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথিতে বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন তন্ত্রে বাসুলীকে মহাবিদ্যাসমূহের অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু কতকগুলি কারণে মনে হয়, বাসুলী লৌকিক গ্রাম্যদেবতা; পরবর্তী কালে ইঁহার উপর পৌরাণিক প্রভাববশত ইনি হিন্দু ও বৌদ্ধ পূজায় স্থান পাইয়াছেন। উড়িষ্যার কেওট, রাঢ় প্রমুখ জাতির মধ্যে

১। সাধনমালা, ১৩৬ ২। প্রিয়রঞ্জন সেন, সা প-প, ৩৫, ১০৪

প্রচলিত ঘোড়ামুখ বাসুলী নামক এক দেবতার পরিচয় পাওয়া যায়।[২] মনে হয়, উড়িষ্যার ঘোড়ামুখ বাসুলী ও বাংলার বাসুলী একই অনার্য সমাজ হইতে আসিয়াছেন। এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে, 'হয়ত ইনি প্রথমে গ্রাম্য-দেবতা ছিলেন, পরে হিন্দু দেবদেবীর পংক্তিতে স্থান পাইয়াছেন, হয়ত বা ইনি দ্রাবিড়-দেশাগত।' এই অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয়। সমাজে পৌরাণিক দেবতাদিগের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, পৌরাণিক পার্বতী ও বাসুলী অভিন্ন হইয়া আত্মপ্রকাশ করেন। তখন হইতেই বাসুলী দেবীর উপর পৌরাণিক গুণাবলী আরোপ করা হইতে থাকে এবং বাসুলীও তখন চণ্ডী নামে পরিচিত হন। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে গিয়া যে এই মিলন কার্য সম্পূর্ণ হয়, ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গলে'র নিম্নোদ্ধৃত পদ হইতেই স্পষ্ট তাহা বুঝিতে পারা যাইবে—

বাসুলী বলেন বাছা শুন প্রাণ জোড়া।
কোথা পাব জোয়ান আপনি ভজি বুড়া॥

বাসুলী নিজেকে বৃদ্ধ স্বামীর বা শিবের পত্নী বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, অর্থাৎ এখানে বাসুলী ও পার্বতী সম্পূর্ণ অভিন্ন। কিন্তু বাসুলীর কোন ধ্যানমন্ত্রেই তাঁহাকে শিবের পত্নী বলা হয় নাই। কালক্রমে সমাজে হিন্দু পৌরাণিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন পৌরাণিক দেবতার আবরণে সকল লৌকিক দেবতাই আত্মগোপন করিতেছিলেন, তখন পৌরাণিক পার্বতীর মধ্যে বিভিন্ন লৌকিক শাক্তদেবীর পরিকল্পনা শেষ পরিণতি লাভ করিতেছিল। কিন্তু তাহার পূর্বে কি ভাবে যে বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে আগত পরস্পর বিপরীতধর্মী আদর্শগুলি ঐক্য সন্ধান করিতেছিল, তাহাই এখানে উল্লেখ করিব।

বাসুলীদেবীর উৎপত্তির ইতিহাস যাহাই থাকুক, তিনি যে প্রথমত চণ্ডী হইতে স্বতন্ত্র দেবী ছিলেন, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে বাসুলীর সহিত চণ্ডী আসিয়া প্রথম মিলিত হন। নিম্নোদ্ধৃত বাসুলীর ধ্যান ও আবাহন মন্ত্রের মধ্যে এই উভয় দেবতারই একত্র সংমিশ্রণ অনুভব করা যায়,—

ওঁ আয়াতা স্বর্গালোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপুরে
সিন্দুরাভাসন্ধ্যা প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।
ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগলকমলে নূপুরং বাদয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গং পিব পিব রুধিরং বাসুলী পাতু সা নঃ॥

ওঁ বাসুলৈঃ নমঃ।

ওঁ আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাম্।
সরিত্তীরে সমুৎপন্নাং সূর্যকোটিসমপ্রভাম্।।
রক্তবস্ত্রপরিধান্যং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্।

অষ্টতণ্ডুলদূর্বাক্তাং অর্চ্চয়েন্মঙ্গলকারিণীম্।।
অসিদ্ধসাধিনীং দেবীং কালীং কিল্বিষনাশিনীম্।
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সান্নিধ্যমিহ।।[১]

এই ধ্যান ও আবাহন যে মূলত এক দেবতার ছিল না, তাহা উদ্ধৃত অংশ দুইটি একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। প্রথমোক্ত ধ্যানমন্ত্রের উদ্দিষ্টা দেবী বাসুলী ও শেষোক্ত আবাহন মন্ত্রের উদ্দিষ্টা দেবী মঙ্গলচণ্ডী, ইঁহারা পরস্পর স্বতন্ত্র।

পুরাণে মঙ্গলচণ্ডীর যে ধ্যানের উল্লেখ আছে, তাহাও উদ্ধৃত আবাহন-মন্ত্রের প্রায় অনুরূপ, কিন্তু ধ্যান-মন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত, যথা—

দেবীং ষোড়শবর্ষীয়াং রম্যাং সুস্থিরযৌবনাম্।
সর্বরূপগুণাঢ্যাঞ্চ কোমলাঙ্গীং মনোহরাম্।।
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং চন্দ্রকোটিসমপ্রভাম্।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং রত্নভূষণ-ভূষিতাম্।।
বিভ্রতীং কবরীভারাং মল্লিকামাল্যভূষিতাম্।
বিম্বোষ্ঠীং সুদতীং শুদ্ধাং শরৎপদ্মনিভাননাম্।।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং সুনীলোৎপল-লোচনাম্।
জগদ্ধাত্রীঞ্চ দাত্রীঞ্চ সর্বেভ্যাং সর্বসম্পদাম্।
সংসারসাগরে ঘোরে পোতরূপাং বরাং ভজে।।[২]

মনে হয়, 'ধর্মপূজা বিধান' সংকলনের সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বাসুলী ও মঙ্গলচণ্ডী এক হইয়া গিয়া পৌরাণিক চণ্ডীর বেদীতলে আত্মবিসর্জন করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন।

কেহ কেহ অনুমান করেন, তান্ত্রিক শক্তি দেবী বিশালাক্ষী ও বাসুলী অভিন্না।[৩] কিন্তু তাহা সত্য নহে। যদিও সংস্কৃতের প্রভাববশত বাসুলীকে বর্তমান সময়ে কোনও কোনও স্থানে বিশালাক্ষী বলা হইয়া থাকে, তথাপি 'ধর্মপূজা বিধানে' দেখা যায়, বিশালাক্ষী ও বাসুলী ধর্মের দুই স্বতন্ত্র আবরণ দেবতা।[৪] উক্ত পুস্তকেই বিশালাক্ষীর যে ধ্যান-মন্ত্র আছে, তাহা বাসুলীর উপরি-উদ্ধৃত ধ্যানমন্ত্র হইতে স্বতন্ত্র। দেবী বিশালাক্ষীর ধ্যান এই প্রকার,

ওঁ প্রাতঃকালে কুমারী কুমুদ-কলিকয়া জাপ্যমালা জপন্তী
মধ্যাহ্নে প্রৌঢ়রূপা বিকশিতবদনা চারুনেত্রবিশালা।
সন্ধ্যায়াং বৃদ্ধরূপা গলিতকুচযুগা মুণ্ডমালা-পতাকা

১। রামাই পণ্ডিত, ১০২-৩
২। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রভৃতি, ৪৪
৩। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯০০
৪। রামাই পণ্ডিত, ৫

সা দেবী হেমবর্ণা ত্রিজগত-জননী যোগিনীযোগমুদ্রা।।
ওঁ বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ।।
ওঁ বিশালবদনে দেবি বিশালনয়নোজ্জ্বলে।
দৈত্য-মাংসস্পৃহে দেবি বিশালাক্ষি নমোহস্তু তে।।
ওঁ বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ।।[১]

ইহা হইতেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বাসুলী কিংবা পূর্বোল্লিখিত চণ্ডীর সহিত বিশালাক্ষীর কোনই সাদৃশ্য নাই। পরবর্তী চণ্ডীর মিশ্র পরিকল্পনায়ও বিশালাক্ষীর কোনও প্রভাব বাসুলীর উপর স্থাপিত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়।

চণ্ডীদাসের জীবনী সম্বন্ধে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাসুলী কোনো দেবী নহেন, তিনি রক্তমাংসে গঠিতা মানবী, নিত্যা নামক কোন বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবীর সিদ্ধা বা ডাকিনী,—

শালতোড় গ্রামে অতি পীঠ স্থান
নিত্যের আলয় যথা।
ডাকিনী বাসুলী নিত্যা সহচরী
বসতি করয়ে তথা।।
চণ্ডীদাস কহে সে এক বাসুলী
প্রেম প্রচারের গুরু।
তাহারি চাপড়ে নিদ ভাঙ্গিল
পীরিত হইল শুরু।।

কেহ অনুমান করেন, এই বাসুলী দ্বিজকন্যা ছিলেন। অতঃপর বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী নিত্যার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া ডাকিনী হইয়া যান।[২] চণ্ডীর আর্বিভাবের পূর্বে সমাজে বাসুলীর অত্যন্ত ব্যাপক প্রভাব বর্তমান ছিল— বাংলার প্রাচীন সাহিত্য হইতেও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই দেবীর প্রকৃত উদ্ভবের ইতিহাস কি? এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিবাব উপায় নাই। কারণ, 'ধর্মপূজাবিধান' হইতে তাঁহার যে ধ্যান উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা নিশ্চিতই পরবর্তী কালের রচনা, বিশেষত এই ধ্যানের অনুরূপ বাসুলী মূর্তি আজ পর্যন্ত অধিক আবিষ্কৃত হয় নাই। চণ্ডীদাসের বাসুলী বলিয়া নান্নুরে যে দেবীর এখনও পূজা হইয়া থাকে, তাহার সহিত 'ধর্মপূজা-বিধান'-উক্ত বাসুলীর ধ্যানের কোন মিল নাই। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন, 'বোধ হয় প্রকৃত মূর্তি লুপ্ত হইয়াছে।' কিন্তু তাহা

১। রামাই পণ্ডিত, ৯৭
২। নব্যভারত ১২, ২৮৩

না্ও হইতে পারে; হয়ত বর্তমান মূর্তিটি প্রকৃতই প্রাচীন। পরবর্তী কালে দ্বিজ চণ্ডীদাসের নান্নুরে বড়ু চণ্ডীদাসের জনশ্রুতি যখন প্রচার লাভ করিল, তখন বড়ু চণ্ডীদাসের সহিত বাসুলীর সম্বন্ধ হইতেই স্থানীয় এই প্রাচীন সরস্বতীর মূর্তিটি বাসুলী নামেই পরিচিত হইতে লাগিল। কেহ সরস্বতীর এই মূর্তিটি বাগীশ্বরী নাম কল্পনা করিয়া তাহা হইতে বাসুলী শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ধারণ করিতে চাহিয়াছেন।[১] কিন্তু কোনও শব্দের কষ্টকল্পিত ব্যুৎপত্তি অনুমান করিয়া কোনও মূর্তির পরিচয় সন্ধান করা যায় না। মূর্তির যথার্থ পরিচয় তাহার গঠনাকৃতিতে। পূর্বেই বলিয়াছি, নান্নুরের তথাকথিত বাসুলীর মূর্তি 'ধর্মপূজা-বিধান'-এর পূর্বোদ্ধৃত বাসুলীর ধ্যানের অনুরূপ নয়; অতএব ইহা বাসুলীর মূর্তি নহে। ইহা বৈদিক সরস্বতীর মূর্তি। কিন্তু বাঁকুড়া জিলার ছাতনায় প্রাপ্ত ও বড়ু চণ্ডীদাসের পূজিত বলিয়া পরিচিত বাসুলীর মূর্তিই প্রকৃত বাসুলীর মূর্তি; ইহা পূর্বোদ্ধৃত ধ্যানমন্ত্রেরও সম্পূর্ণ অনুরূপ। এই মূর্তির ঐতিহ্য প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয়।

দাক্ষিণাত্যের মহীশূর ও কর্ণাট অঞ্চলে বিসলমরী বা বিসল মরীআম্মা নামে এক অতি শক্তিশালিনী গ্রাম্য-দেবী আছেন।[২] মরী অথবা মরীআম্মা বাংলাদেশের চণ্ডী কথাটির মত দাক্ষিণাত্যের বহু গ্রাম্য স্ত্রী-দেবতার নামের পরেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব উক্ত গ্রাম্য দেবতাটির প্রকৃত নাম বিসল; বাংলায় স্ত্রী-দেবতা বুঝাইতে হইয়াছে বিসলী, অতঃপর বিসুলী, বাসুলী। ধ্বনিতত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়মেই এই পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে তাহা বিসল মরী বলিয়া পরিচিত। উড়িষ্যাতেও এই দেবী বাসুলী বলিয়াই পরিচিত। ইনিও প্রকৃতপক্ষে একটি প্রস্তরখণ্ড মাত্র, তবে তাঁহার অনেকটা নির্দিষ্ট গঠন পাওয়া যায়। প্রস্তরটি ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া ঊর্ধ্ব দিকে উঠিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের এই বিসল মরীই যে বাংলায় বাসুলী এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উড়িষ্যার অস্ট্রিক্‌ভাষী জুয়াঙ্ নামক উপজাতির মধ্যেও বাসুলী নামক এক দেবীর পূজা হইয়া থাকে।[৩] প্রতিবেশী কোন অনার্য জাতি হইতে তাহারা এই দেবীর নামটি পাইয়া থাকিবে, কিংবা ইহা তাহাদের নিজস্ব কোনও মৌলিক দেবীও হইতে পারে। কেহ আবার অনুমান করিয়াছেন, দক্ষিণ ভারতের গ্রাম্য দেবী সাত ভগিনীর অন্যতমা বাসুআলী দেবাই বাংলার বাসলী। কিন্তু বাসুআলী দেবার প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র; তিনি বৃষবাহনা, কিন্তু বিসল মরীর সাধারণ প্রকৃতির সঙ্গে বাংলার বাসুলীর বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। বিশেষত বিসল মরীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা বাসুআলী দেবা হইতে অধিক। অতএব মনে হয়, বিসল মরীই বাংলার বাসুলী—বাসুআলী দেবা বাসুলী নহেন। কেহ আবার অনুমান করেন, বাসুলের পুত্র বাসুলকুমারই বাসুলী। কিন্তু বাসুলী সর্বত্র দেবী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, অতএব এই উক্তিও গ্রহণীয় নহে।' এই লৌকিক দেবতার পূজাও আদিম সমাজের প্রস্তরোপাসনার প্রবৃত্তি (fetishism) হইতেই জাত। পৌরাণিক আদর্শ

১। চণ্ডীদাস, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত (১৩৫৬), দ/.
২। H. Whitehead, The Villages of South India (Calcutta, 1921), 29, 80, 81, 83
৩। H. H. Risley, Tribes and Castes of Bengal. Vol. I (Calcutta, 1891), p. 359

সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে এই দেশেও প্রস্তরখণ্ড রূপেই এই দেবতার পূজা হইত। দাক্ষিণাত্যের নিম্নশ্রেণীর সমাজ ও উচ্চতর বর্ণের হিন্দু সমাজের সুদূর পার্থক্য হেতু নিম্ন শ্রেণীর সমাজে এই দেবতাটির অক্ষত স্বরূপটি আজিও রক্ষা পাইয়াছে; কিন্তু বাংলার সকল স্তরের সমাজেই পৌরাণিক চণ্ডীর প্রভাবের ফলে ইহার পরবর্তী পবিকল্পনায় এই লৌকিক দেবতাটি কতকটা উন্নত হইয়া গিয়াছে। তবে উভয়েই যে এক সূত্র হইতে উদ্ভূত, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বাংলার লৌকিক দেবী বাসুলী ও দাক্ষিণাত্যের লৌকিক দেবী বিসল মরীর অভিন্নতা হইতেও বাংলায় দ্রাবিড় সংস্কারের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। উড়িষ্যার বাসুলীর অস্তিত্বও তদ্দেশে দ্রাবিড় সংস্কারের অস্তিত্বের অন্যতম নিদর্শন।

ক্রমে চণ্ডী নামটি দাক্ষিণাত্যে মরী বা মরী আম্মা কথাটির মত বিশেষ কোনও দেবতার নাম না হইয়া স্ত্রী-দেবতা মাত্রেরই প্রায় একটা সাধারণ পদবীর মত হইয়া দাঁড়াইল। অতএব, দেখা যাইতেছে, চণ্ডীর বিশিষ্ট কোনও একটি পরিচয় লাভ করা দুষ্কর। ইহার কারণ, মুণ্ডা, দ্রাবিড়, বৌদ্ধ, আর্য প্রভৃতি বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন শক্তি-দেবতার পরিকল্পনা এই চণ্ডীর ভিতর দিয়াই সর্বশেষে পৌরাণিক পার্বতী, অন্নদা বা অন্নপূর্ণায় পরিণতি লাভ করিয়াছিল। বাংলা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

চণ্ডীর পরিচয়ের এই অনিশ্চয়তার জন্যই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবির লিখিত চণ্ডীমঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যেও তাঁহার চরিত্রে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। লৌকিক কাহিনী বা কালকেতু-ফুল্লরা, ধনপতি-লহনা-খুল্লনার কাহিনীই প্রাচীনতম কবিদিগের বর্ণিতব্য বিষয় ছিল। কিন্তু পরবর্তী কবিগণ চণ্ডীমঙ্গলের এই লৌকিক অংশ পরিত্যাগ করিয়া মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর কাহিনীকেই মুখ্য স্থান দিয়াছেন। এই শ্রেণীর কাব্যগুলি 'দুর্গামঙ্গল', 'ভবানীমঙ্গল' বলিয়া অভিহিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীর পুরাণের অনুবাদকাব্যগুলি আমাদের বর্তমান গ্রন্থে আলোচনার বিষয়ীভূত নহে। তাহা অনুবাদ সাহিত্যে অন্তর্গত।

চণ্ডী নামধেয় বিভিন্ন প্রকৃতির স্ত্রী-দেবতার মধ্যে বিশিষ্ট কোনও স্ত্রী-দেবতাই যে মঙ্গলচণ্ডী নামে অভিহিতা হইতেন, এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় কাহিনীর দেবতা বিশেষ করিয়াই এই মঙ্গলচণ্ডী।

তাঁহার নাম কেন যে মঙ্গলচণ্ডী হইল এই বিষয়ে কোনও কোনও সংস্কৃত পুরাণে পাওয়া যায়, 'মঙ্গলেষু চ যা দক্ষা সা চ মঙ্গলচণ্ডিকা।'[১] যিনি ভক্তের মঙ্গল-সাধনে দক্ষ তিনিই মঙ্গলচণ্ডী। পুরাণকার যদি এই কথা বলিয়াই নিরস্ত থাকিতেন, তাহা হইলে অবশ্য এই ব্যাখ্যাই মানিয়া লওয়া যাইত, কিন্তু যেহেতু এই অবচীন পুরাণগুলি রচনার বহু পূর্বেই মঙ্গলচণ্ডীর উদ্ভব ও তাঁহার দেবীত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য পুরাণগুলিও এই দেবীর সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিতে পারে নাই, এই সম্বন্ধে অনেকগুলি ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছে মাত্র। এই সম্পর্কে 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'-এর নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলি

১। 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ', প্রকৃতি খণ্ড, ৪৪ অধ্যায়

প্রণিধানযোগ্য,—

হর্ষমঙ্গলদক্ষে চ হর্ষমঙ্গলদায়িকে।
শুভে মঙ্গলদক্ষে চ শুভে মঙ্গলচণ্ডিকে।।
মঙ্গলে মঙ্গলার্হে চ সর্বমঙ্গলমঙ্গলে।
সতাং মঙ্গলদে দেবি সর্বেষাং মঙ্গলালয়ে।।
পূজ্যে মঙ্গলবারে চ মঙ্গলাভীষ্টদেবতে।
পূজ্যে মঙ্গলবংশস্য মনুবংশস্য সন্ততম্।।
মঙ্গলাধিষ্ঠাতৃ-দেবি মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলে।
সংসারমঙ্গলাধারে মোক্ষমঙ্গলদায়িনি।।
সারে চ মঙ্গলাধারে পারে চ সর্বকর্মণাম্।
প্রতিমঙ্গলবারে চ পূজ্যে ত্বং মঙ্গলপ্রদে।।
স্তোত্রেণানেন শম্ভুশ্চ স্তুত্বা মঙ্গলচণ্ডিকাম্।
প্রতিমঙ্গলবারে চ পূজাং কৃত্বা গতঃ শিবঃ।।
প্রথমে পূজিতা দেবী শিবেন সর্বমঙ্গলা।
দ্বিতীয়ে পূজিতা সা চ মঙ্গলেন গ্রহেণ চ।।
তৃতীয়ে পূজিতা ভদ্রা মঙ্গলেন নৃপেণ চ।
চতুর্থে মঙ্গলে বারে সুন্দরীভিঃ প্রপূজিতা।।
পঞ্চমে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষনরৈর্মঙ্গলচণ্ডিকা।
পূজিতা প্রতিবিশ্বেষু বিশ্বেশপূজিতা সদা।।[১]

উদ্ধৃত অংশে ইহাও বলা হইয়াছে যে, মঙ্গলগ্রহ কর্তৃক পূজিতা হইয়াছিলেন বলিয়া এই চণ্ডীর নাম মঙ্গলচণ্ডী। শুধু তাহাই নহে, আরও বলা হইয়াছে যে, মঙ্গল নামে কোনও নৃপতি এই চণ্ডীর পূজা করেন, সেইজন্যও তাঁহার নাম মঙ্গলচণ্ডী হইয়া থাকিবে। অথবা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মানব কর্তৃক মঙ্গলবারে পূজিতা হন বলিয়াও তাঁহার নাম মঙ্গলচণ্ডী হইয়াছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনার যে ঐতিহ্য পূর্ববঙ্গ বা প্রধানত চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মঙ্গল নামক এক দৈত্যকে বধ করিয়া চণ্ডী মঙ্গলচণ্ডী আখ্যা প্রাপ্ত হন। তাহারই অনুসরণ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত ভবানীশঙ্কর দাসের 'মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালিকা'য় উল্লিখিত হইয়াছে—

১। 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ', প্রকৃতি খণ্ড, ৪৪ অধ্যায়

মঙ্গল নামে দনুজেক হৈয়া উতপতি।
সুরগণ হিংসা করে সেই দুষ্টমতি।।
নির্জ্জরা সভার ক্লেশ দেখিয়া প্রচুর।
ভয়ঙ্করীরূপে দেবী বধিলা অসুর।।
আনন্দ হইল শক্র পাই সিংহাসন।
ভক্তিভাবে অর্চিলেক চণ্ডিকা চরণ।।
বন্দম ত্রিজগদম্বা দেবী নারসিংহী।
মঙ্গলচণ্ডী নাম হৈল মঙ্গলাসুর হৃঙ্গি।।[১]

দ্বিজ মাধব, দ্বিজ রামদেব, মুক্তারাম সেন প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের সকল কবিরই চণ্ডীমঙ্গলে এই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এখানে দেখা যাইতেছে যে, মঙ্গলাসুরকে বধ করিয়া চণ্ডীর মঙ্গলচণ্ডী নাম হইয়াছে। এই আখ্যায়িকা কোনও পুরাণে নাই। সম্ভবত বহু পরবর্তী কালে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর কাহিনীর অনুকরণে এই কাহিনী রচিত হইয়াছে। কারণ, প্রাচীনতর চণ্ডীমঙ্গল, এমন কি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলেও এই কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায় না। মঙ্গলচণ্ডীর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে 'শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ'-এ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি আছে বলিয়া 'বিশ্বকোষ'-এ উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ভাগবতের কোন্ স্থানে শ্লোকটি আছে, তাহার নির্দেশ না থাকায় এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা গেল না। মনে হয়, ভাগবতে এই শ্লোকটি থাকিলেও পরবর্তী কালে তাহা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে,—

সৃষ্টৌ মঙ্গলরূপা চ সংহারে কোপরূপিণী।
তেন মঙ্গলচণ্ডী সা পণ্ডিতৈঃ পরিকীর্ত্তিতা।।

যখন বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের মধ্যে আত্মগোপন করিতেছিল, তখন কোনও কোনও তান্ত্রিক-বৌদ্ধ দেবী মঙ্গলচণ্ডীর নামের মধ্যে আসিয়া আত্মগোপন করেন। মাণিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গলে' দেখিতে পাওয়া যায়, আদিদেব বা ধর্মের শক্তিস্বরূপিণী আদ্যাই চণ্ডীতে পরিণত হইয়াছেন। বিশ্বসৃষ্টি করিয়া আদিদেব ভাবিলেন, 'একেশ্বর রাজ্যভার পালিব কেমনে'। এই ভাবনা মাত্র আদিদেবের,

হাস্যেতে জন্মিয়া আদ্যা পড়ে ভূমিতলে।
উঠিঞা দাঁড়াইল আদ্যা দেখেন সকলে।।

কিন্তু তখনও তাঁহার 'স্ত্রী আকার নাই চণ্ডিকা হবে কিসে'। আদিদেব আদ্যাকে স্ত্রীরূপে সাজাইয়া দিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সৃষ্টি করিয়া আদিদেব শিবকে আদ্যার পতিরূপে নির্বাচিত করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে বলিলেন। শিব বলিলেন, আদ্যা সপ্তবার জন্মগ্রহণ করিয়া আসিলে তারপর তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারিবেন, তৎপূর্বে নহে।

১। পৃঃ ১-২

আদ্যাদেবী তাহাতেই সম্মত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। অতঃপর আদ্যা কর্মকার, কুম্ভকার, দক্ষরাজ প্রভৃতির গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া অবশেষে এক ঋষির আশ্রমে প্রতিপালিতা হইতে লাগিলেন। একদিন শিব ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়া এক ঋষির আশ্রমে আদ্যাকে দেখিতে পাইলেন এবং বিবাহ করিয়া সঙ্গে লইয়া গেলেন। শিবের পত্নী হইয়া আদ্যা চণ্ডীতে পরিণত হইলেন। কিন্তু তখনই চণ্ডী নিজের পূজা প্রচারে মনোনিবেশ করিলেন। কলিঙ্গ নগরে দেহারা নির্মাণ করাইয়া দিবার জন্য বিশ্বকর্মারূপী হনুমানকে আদেশ করিলেন। সাঁতালি পর্বত হইতে চারি খণ্ড পাথর আনিয়া হনুমান কলিঙ্গ নগরে চণ্ডীর দেহারা তুলিয়া দিল।

এই কাহিনী হইতেই কেহ কেহ মনে করেন যে, বৌদ্ধ আদ্যা ক্রমশ হিন্দুর চণ্ডী হইয়া শিবের ভার্যা হইলেন।'[১] বৌদ্ধ ধর্ম যখন হিন্দু ধর্মের মধ্যে আত্মগোপন করিতেছিল, তখনই বৌদ্ধ আদ্যাকে এইভাবে চণ্ডীরূপে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস দেখা দিয়াছিল।

কোনও কোনও স্থলে মঙ্গলচণ্ডীকে ডাকিনী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। খুল্লনাকে চণ্ডীপূজা করিতে দেখিয়া লহনা ধনপতির নিকট গিয়া বলিতেছে,

তোমার মোহিনী বালা শিখিয়া ডাইনী কলা
নিত্য পূজে ডাকিনী দেবতা।

তিব্বতী ভাষায় ডাক শব্দের অর্থ প্রজ্ঞা বা জ্ঞান—তাহার স্ত্রীলিঙ্গ রূপ ডাকিনী। তাহা হইতেই এক সম্প্রদায়ের তান্ত্রিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে ডাকিনী বলিত। ডাকিনীরা নানাপ্রকার তান্ত্রিক আচার দ্বারা কতকগুলি ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিত। ইহা দ্বারাই তাহারা সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। চণ্ডীদাসের প্রেম-প্রচারের গুরু বাসুলীও যে সম্ভবত এই প্রকার ডাকিনী ছিলেন, সেই সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ডাকিনীরা ক্রমে সিদ্ধিলাভ করিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ সমাজে প্রায় দেবত্বে অধিষ্ঠিত হইত। অতঃপর তাহারা দেহরক্ষা করিলে তাহাদের জীবনের লৌকিক কাহিনীর সঙ্গে নানাপ্রকার অলৌকিক কাহিনী মিশ্রিত হইয়া তাহাদের দেবত্বকে আরও সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিত। ডাকিনীদিগের এক এক জনের এক একটি বিশিষ্ট গুণ থাকিত এবং তাহারই সূত্র অবলম্বন করিয়া তাহাদের জীবনের অলৌকিক কাহিনীসমূহ রচিত হইত। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল ডাকিনীরাই পরবর্তীকালে নিম্নতর সমাজে দেবতায় পরিণত হইয়া গিয়া সমাজের বিশেষ প্রভাবশালী অপর কোন দেবতার সহিত একেবারে অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। বিশেষ শক্তি-সম্পন্না কোনও ডাকিনীর পরবর্তীকালে মঙ্গলচণ্ডীর সঙ্গে অভিন্ন হইয়া যাওয়াও কিছুই আশ্চর্য নহে। ডাকিনীরা তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের জন্য হিন্দু সমাজে বিশেষ নিন্দনীয় হইত। কিন্তু হিন্দুর রক্ষণশীল স্ত্রী-সমাজে তাহারা বিশেষ শ্রদ্ধা লাভ করিত। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্যন্ত মুকুন্দরাম ধনপতির মুখে এই দেবতার প্রতি যে প্রকার অশ্রদ্ধা প্রকাশ করাইয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার সমাজে যে কি স্থান ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। খুল্লনাকে চণ্ডীপূজা করিতে দেখিয়া—

১। শূন্য পুরাণ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (১৩৩৬), ৪২, ভূমিকা

পূজা গৃহে উপনীত হৈল ধনপতি।
জয় দিয়া পূজে চণ্ডী খুল্লনা যুবতী।।
বাম পথী হইয়া করিস্ কার পূজা।
ইহা শুনি যদি মোরে ক্রোধ করে রাজা।।
পুনর্বার জ্ঞাতি বন্ধু যদি ছল ধরে।
পরীক্ষা তোমারে কত দিব বারে বারে।।
কারো ঘরে নাহি আছে হেন পাপ বধূ।
খুল্লনা গর্জিয়া তবে ক্রোধে বলে সাধু।।
এতেক বলিয়া সাধু জ্বলে কোপানলে।
লঙ্ঘিয়া দেবীর ঘট ধরে তারে চুলে।।
ভূমিতে দেবীর ঝারি গড়াগড়ি যায়।
নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায়।।
কেমন দেবতা এই পূজিস ঘট ঝারি।
স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি।।

অতঃপর মশানে শ্রীমন্তকে রক্ষা করিয়া, কিংবা কারাগার হইতে ধনপতিকে উদ্ধার করিয়াও এই মঙ্গলচণ্ডী দেবী যে সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী সমাজে যে চণ্ডীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি লৌকিক মঙ্গলচণ্ডী নহেন, তিনি পৌরাণিক চণ্ডী। অবশ্য পরবর্তী কোনও কোনও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পৌরাণিক চণ্ডীর আখ্যানের সঙ্গে লৌকিক দেবতার আখ্যানও সংক্ষিপ্তভাবে সংযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু নামের সামঞ্জস্য হেতুই উভয়ের এই সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, অন্য কোনও কারণে তাহা হয় নাই। মঙ্গলচণ্ডীর স্থান স্ত্রী-সমাজে আজ পর্যন্তও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এখনও কোনও কোনও পল্লীবাসী হিন্দুর গৃহে বিশেষ কোনও কোনও মঙ্গলবারে অকিঞ্চিৎকর উপচারে স্ত্রীলোক কর্তৃকই এই দেবতার ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে; ব্রত সাঙ্গ হইলে মেয়েলি ব্রতকথায় দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়। প্রায়ই পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না; অবশ্য পুরোহিত হইলেও আপত্তি নাই; অত্যন্ত সাধারণ পূজামন্ত্রেই পুরোহিত এই দেবীর পূজাকার্য সম্পন্ন করিতে পারে।

'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ',[১] 'দেবীভাগবত' প্রভৃতিতে উল্লিখিত আছে যে, এই দেবী স্ত্রীলোকেরই দেবতা,—'কৃপারূপাতিপ্রত্যক্ষা যোষিতামিষ্টদেবতা।' ইহা হইতে মনে হয়, অনার্য সমাজ হইতে এই দেবতা সর্বপ্রথম হিন্দু-সমাজের স্ত্রী-জাতির মধ্যেই নিজের

[১] ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ৪৪ অধ্যায়; দেবী ভাগবত, ৪৭ অধ্যায়

পূজাধিকার স্থাপন করেন। ইহার অর্থ এই যে, হিন্দু ধর্মের প্রভাববশত যখন নবসংস্কার-দীক্ষিত পুরুষ-সমাজ লৌকিক দেবতার সহিত সমস্ত সংস্রব কাটাইয়া একমাত্র পৌরাণিক দেবতার পূজায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, তখনও রক্ষণশীল স্ত্রী-সমাজ তাহাদের পূর্বতন আরাধ্য দেবতাদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এই দেশীয় প্রাচীনতম সংস্কারের ধারা তাহাদের মধ্যে আজ পর্যন্তও সঞ্জীবিত দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য প্রত্যেক লৌকিক দেবতাই 'যোষিতামিষ্টদেবতা' অর্থাৎ স্ত্রী-সমাজের দেবতা। সনকা-বেহুলা মনসার পূজা করিলেও চাঁদ সদাগর মনসার শত্রু, খুল্লনা চণ্ডীর পূজা করিলেও স্বামী ধনপতি তাহার বিরোধী। ইহার একটি গূঢ় সামাজিক তাৎপর্য এই যে, বিজিত জাতির নিকট হইতেই বহিরাগত বিজয়ী জাতি স্ত্রী লাভ করিয়া থাকে। সেইজন্য স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে সংস্কারগত একটি মৌলিক পার্থক্য থাকিয়া যায়। কিন্তু এক গৃহতলে বাস করিয়া স্ত্রী-পুরুষের এই বিরোধ কালক্রমে প্রায় লঘুক্রিয়াতেই পর্যবসিত হয়; এই ক্ষেত্রেও পুরুষই পরাজয় স্বীকার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই এই স্ত্রী-দেবতার মাহাত্ম্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে যেমন কাহিনীগত ঐক্য আছে, চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে তেমন নাই। ইহা হইতেও মনে হয়, বিভিন্ন লৌকিক স্ত্রী-দেবতার পরিকল্পনা এই চণ্ডীর মধ্যে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, চণ্ডীমঙ্গলে দুইটি মূল কাহিনী বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। একটি কালকেতুর কাহিনী, অপরটি ধনপতি সদাগরের কাহিনী। কালকেতুর কাহিনীতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই চণ্ডী প্রকৃতই পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং ব্যাধজাতির আরাধ্যা। কিন্তু ধনপতির কাহিনীর মধ্যে চণ্ডীর এই বিশিষ্ট গুণের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে তাঁহার সহিত ব্যাধ কিংবা পশুকুলের সংস্রব নাই, এখানে তিনি 'যোষিতামিষ্টদেবতা', তিনি এখানে প্রধানত হারানো জিনিস ফিরিয়া পাইবার দেবতা; কালকেতুব্যাধ-কাহিনীর চণ্ডীর যেমন একটি আরণ্য (sylvan) পরিচয় আছে, ধনপতিসদাগর-কাহিনীর চণ্ডীর তেমনই একটি গার্হস্থ্য পরিচয় আছে। মনে হয়, স্বতন্ত্র দেব-পরিকল্পনা হইতে এই উভয় কাহিনীর ভিত্তি পরবর্তী কালে আসিয়া এক সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। কালকেতু-কাহিনীর দেবতার নাম চণ্ডী এবং ধনপতি সদাগরের কাহিনীর দেবতার নাম মঙ্গলচণ্ডী। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের চণ্ডীমঙ্গল রচনার ঐতিহ্য অনুসরণকারী প্রথম কবি দ্বিজ মাধব মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুকরণে মঙ্গলদৈত্যবধের একটি লৌকিক কাহিনীর ভিতর দিয়া চণ্ডীমঙ্গলের উভয় কাহিনীর দেবীচরিত্র চণ্ডীকে মঙ্গলচণ্ডী বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইলেও, সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, কালকেতু-কাহিনীর সঙ্গে মঙ্গলচণ্ডীর কোনও যোগ নাই। চট্টগ্রামের ঐতিহ্য অপেক্ষা এই বিষয়ে রাঢ় ও বারেন্দ্রের ঐতিহ্য প্রাচনীতর। তাহাদের মধ্যে এই কাহিনী নাই। এমন কি, চট্টগ্রামের কবিদিগের মধ্যেও কালকেতু কাহিনীর চণ্ডীর আরণ্য গুণ (sylvan quality) রক্ষা পাইয়াছে। যে সময় হিন্দু সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া এক সূত্রে মিলনের পথ অনুসন্ধান করিতেছিল, সেই সময়ই এক দেবতার নামে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন দেবতার স্বাতন্ত্র্য দূর হইয়া গিয়াছিল। মনে হয়, লোকমুখে প্রচলিত পাঁচালী

বা ছড়ার আকারে যতদিন এই কাহিনীগুলি প্রচলিত ছিল, ততদিন ইহারা পরস্পর স্বতন্ত্র আকারেই ছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সৃজন-যুগে ইহারা যখন আট দিনের গানের পালার আকারে গ্রথিত হইল, তখনই এই দুইটি বিভিন্ন কাহিনী আসিয়া একত্র মিলিত হইল। এক চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে এই দুই স্বতন্ত্র কাহিনী সমাবেশের ইহাই ইতিহাস।

উপরের আলোচনা হইতে মঙ্গলচণ্ডীর উৎপত্তি সম্বন্ধে লৌকিক কিংবা পৌরাণিক কোন্ ব্যাখ্যা যে গ্রহণযোগ্য, তাহা স্থির করা যাইতেছে না। ইহা হইতেই মনে হয়, পুরাণকারদিগের মধ্যে এই সম্বন্ধে ধারণার অনিশ্চয়তা ছিল। মঙ্গলচণ্ডী পুরাণের নিজস্ব দেবতা হইলে এই অনিশ্চয়তা থাকিবার কোন কারণ ছিল না। অর্বাচীন পুরাণগুলি রচনার বহু পূর্বেই মঙ্গলচণ্ডী, মনসা, ষষ্ঠী প্রভৃতি লৌকিক দেবতার প্রতিষ্ঠা সমাজে সুদৃঢ় হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য ইহাদের উৎপত্তির ইতিহাস সন্ধান করা এই পুরাণগুলির পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। অতএব মঙ্গলচণ্ডী নামের উৎপত্তি নিরূপণ করিতে সংস্কৃত পুরাণগুলির নিকট কোনও সাহায্য লাভের আশা নাই। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, অমঙ্গলকারিণী (malignant) দেবতা বলিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রকৃতির বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহার করিয়া (euphemistically) তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে—সেইজনাই তাঁহার মঙ্গলচণ্ডী নাম হইয়াছে। তাঁহার এই নাম সম্বন্ধে পৌরাণিক ব্যাখ্যার অনিশ্চয়তা হইতেই এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়। কেহ মনে করিয়াছেন যে, মঙ্গলচণ্ডী বা লৌকিক চণ্ডী 'একজন তান্ত্রিক বা পৌরাণিক মিশ্র-দেবতা'। এই উক্তি অর্থহীন। বেদ-রামায়ণ-মহাভারত-মহাপুরাণ প্রভৃতিতে যাঁহার নাম মাত্র উল্লেখ নাই, তাঁহাকে পৌরাণিক দেবতা বলা যায় না। অর্বাচীন পুরাণ কিংবা উপপুরাণগুলি এই বিষয়ক কোনও প্রমাণ হইতে পারে না। সুতরাং মিশ্রই হউক কিংবা অবিমিশ্রই হউক, চণ্ডীকে 'পৌরাণিক' দেবী বলা যায় না। তন্ত্র আরও অর্বাচীন। তন্ত্র কিংবা উপপুরাণ অবিমিশ্র বৈদিক উপাদানে রচিত নহে। ইহাদেরও ভিত্তিমূলে অনার্য-জীবনের সাংস্কৃতিক উপকরণের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতর তান্ত্রিক বা পৌরাণিক দেবী বলিলেই তাঁহার অনার্য উদ্ভবের কথা অস্বীকার করা হয় না। বাংলায় যে সকল লৌকিক দেবদেবী হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগে হিন্দুভাবাপন্ন তন্ত্র বা পুরাণ কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছেন, চণ্ডী বা মঙ্গলচণ্ডী তাঁহাদের অন্যতম। সেই জন্য অর্বাচীন তন্ত্র, পুরাণ ও স্মৃতিতে নানাভাবে তাঁহার সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য বিধান করিবার প্রয়াস দেখা যায়। ইহা ছাড়া তন্ত্রই হউক, কিংবা পুরাণই হউক, কাহারও সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক নাই।

লৌকিক চণ্ডীর পূজা কবে হইতে সমাজে প্রবর্তিত হইল? এই জাতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে দুই প্রকার প্রমাণের আলোচনা করা যায়। প্রথমত সাহিত্যিক প্রমাণ, দ্বিতীয়ত ভাস্কর্যের প্রমাণ। সাহিত্যিক প্রমাণ এই ক্ষেত্রে প্রচুর না হইলেও ভাস্কর্যের প্রমাণ ইহাতে দুর্লভ নহে। প্রথমত সাহিত্যিক প্রমাণ সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাউক।

চৈতন্যের সমসাময়িক নবদ্বীপের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া 'চৈতন্য-ভাগবত'-এর কবি বৃন্দাবন দাস ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বলিয়াছেন,

ধর্ম কর্ম লোকে সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।।[১]

এই গ্রন্থেরই অন্যত্র উল্লিখিত আছে যে, পাতকী জগাই মাধাই একদিন,

প্রভুরে দেখিয়া বলে নিমাই পণ্ডিত।
করাইবা সম্পূর্ণ মঙ্গলচণ্ডীর গীত।।
গায়েন সব ভাল মুঞি দেখিবারে চাউ।
সকল আনিয়া দিব যথা যেই পাউ।।[২]

ইহাতে অনুমান হয়, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই এই লৌকিক দেবতার পূজা সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, সমাজে যাঁহারা ধনে মানে বিশেষ প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তখন এই দেবতার পূজার প্রচলন হইয়া গিয়াছিল। নবদ্বীপবাসী দরিদ্র শ্রীধরকে শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেন তুমি।
অন্নবস্ত্রে কষ্ট পাও কহ দেখি শুনি।।
দেখ এই চণ্ডী বিষহরীরে পূজিয়া।
কে না ঘরে খায় পরে যত নাগরিয়া।।[৩]

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে যে দেবতা সমাজে এতখানি প্রাধান্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহার পূজা আরও অন্তত তিনশত বৎসর পূর্বেও যদি সমাজে প্রথম প্রচলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, কিংবা তাহারও কিঞ্চিৎ পূর্বে সর্বপ্রথম সমাজে এই পূজা প্রবর্তিত হয়—এমন অনুমান করা যাইতে পারে। ইহাতেই মনে হয়, মঙ্গলচণ্ডীর পূজা মনসা পূজা প্রবর্তিত হওয়ার কিছু পরবর্তী কালে সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার আরও প্রমাণ এই যে, চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই যেমন হরিদত্ত, নারায়ণদেব, বিজয় গুপ্ত প্রমুখ কবিগণ মনসাদেবীর মাহাত্ম্যসূচক মঙ্গলকাব্য রচনা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, প্রাক্‌চৈতন্য যুগের তেমন কোনও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবির পরিচয় লাভ করা যায় না। ইহাতেই মনে হয়, মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলির অনুকরণে পরবর্তী কালে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলি রচিত হয়।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম তাঁহার পূর্ববর্তী কবি মাণিক দত্তকে বন্দনা করিয়া লইয়া নিজের কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন,

মাণিক দত্তেরে বন্দোঁ করিয়া বিনয়।

১। বৃন্দাবন দাস ১।২
২। বৃন্দাবন দাস ২।১৩
৩। বৃন্দাবন দাস ১।৮

যাহা হইতে হৈল গীত-পথ-পরিচয়।।

ইহা হইতেই কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, মাণিক দত্ত খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য প্রণয়ন করেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কোনও কবি তাঁহার পূর্ববর্তী কোনও কবির নামোল্লেখ করিলে, তাঁহার সময় তিন শত বৎসর পূর্বে নির্দেশ করা সমীচীন হয় না। বিশেষত মাণিক দত্তের যে কাব্য বর্তমানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের বহু পদ মিশ্রিত দেখিয়া তাঁহাদিগকে অনতিকাল ব্যবধানে আবির্ভূত লোক বলিয়াই অনুমান করা হয়; সেইজন্য মাণিক দত্তকে পঞ্চদশ শতাব্দীর কিংবা অন্তত চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বেকার লোক বলিয়া নির্দেশ করা সঙ্গত নহে। ষোড়শ শতাব্দীতে মঙ্গলচণ্ডীর গীত যে বিশেষ প্রচলন লাভ করিয়াছিল তাহা 'চৈতন্য-ভাগবত'-রচয়িতার উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। অতএব, এই গীত প্রচলনের দুই শত বৎসর পূর্বেও যদি এই দেবীর পূজা সমাজে প্রথম প্রবর্তিত হয় বলিয়া বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই দেবী সর্বপ্রথম হিন্দু সমাজের পূজা লাভ করিতে আরম্ভ করেন। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ', 'দেবীভাগবত', 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' ইত্যাদিতে যে মঙ্গলচণ্ডীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও এই সমসাময়িক কালেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

মনসাদেবীর পূজার উদ্ভবকাল নির্দেশ করিতে যেমন বাংলার প্রাচীন ভাস্কর্যের সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল, চণ্ডীর সম্পর্কেও তাহার সন্ধান করা যাইতেছে। পৌরাণিক চণ্ডীর মূর্তি নির্মাণের একটা বিশিষ্ট আদর্শ প্রাচীন বাংলার ভাস্করসমাজে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার সঙ্গেই এই লৌকিক দেবতার আদর্শও গিয়া মিশ্রিত হইয়াছিল। সেইজন্য প্রাচীন ভাস্কর্যে মঙ্গলচণ্ডীর স্বতন্ত্র কোন মূর্তি পাওয়া না গেলেও, পৌরাণিক চণ্ডীর সহিত মিশ্র অবস্থায় তাহার মূর্তি উদ্ধার করা কঠিন নহে। আধুনিক বাসুলীর যে মূর্তি পাওয়া যায়, পূর্বোদ্ধৃত বাসুলীর ধ্যানের সহিত তাহাদের কোনও কোনটির মিল দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয়, গ্রাম্য-দেবতা বাসুলীর মূর্তি নির্মাণেরও বিশিষ্ট একটি আদর্শ প্রচলিত ছিল। তাহা লৌকিক চণ্ডী মূর্তি নির্মাণের আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র।

পণ্ডিত গোপীনাথ রাও তাঁহার Elements of Hindu Iconography (Vol. I, Part II) গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রাচীন মূর্তিশিল্প-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ 'রূপমণ্ডন' হইতে যে 'প্রতিমা-লক্ষণ' অর্থাৎ প্রতিমা নির্মাণের আদর্শ উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃঃ ১১৩ ও ১২০), তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও কোনও গৌরী প্রতিমার একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, তাহা গোধাসনা হইবে,—

গোধাসনা ভবেদ্‌গৌরী লীলয়া হংসবাহনা।
সিংহারূঢ়া ভবেদ্দুর্গা মাতরস্স্বস্ববাহনা।।

চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীতে শুনিতে পাওয়া যায় যে, গোধারূপ ধারণ করিয়াই চণ্ডী কালকেতুর ভবনে গমন করেন। অতএব, এই গোধাসনা যে গৌরী তিনিই প্রকৃতপক্ষে কালকেতু-

কাহিনীর চণ্ডী। পরবর্তী কালে পৌরাণিক প্রভাববশত তিনি গৌরী নাম ধারণ করিলেও, গোধার সহিত তাঁহার এই সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত তাঁহার এই গোধা-সংস্রবের আর কোনও অর্থ হইতে পারে না।

গোধাসনা গৌরীই যে পূর্বোদ্ধৃত 'যোষিতামিষ্টদেবতা' ও 'গৃহে পূজ্যা', প্রতিমালক্ষণে তাঁহার অন্যান্য পরিচয়ের সহিত ইহারও উল্লেখ রহিয়াছে; যথা,—

অক্ষসূত্রং তথা পদ্মম্ অভয়ং চ বরং তথা।
গোধাসনাশ্রিতা মূর্তি গৃহে পূজ্যা শ্রিয়ে সদা।।

শ্রী, ঐশ্বর্য বা মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায় গোধাসনা যে মূর্তি গৃহে পূজিতা হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলচণ্ডীরই মূর্তি। মনে হয়, ভাস্কর্যে গৌরী মূর্তি নির্মাণের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় ব্যাধসমাজ হইতে আগত চণ্ডী ও স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের ধারা হইতে আগত মঙ্গলচণ্ডী এক হইয়া গিয়াছিলেন। উক্ত প্রতিমা-লক্ষণের উল্লেখ অনুযায়ী দেখা যায়, অনেক মূর্তি প্রাচীন ভাস্কর্যে গঠিত হইয়াছিল। তাহা সাধারণত গৌরীর মূর্তি বলিয়াই পরিচিত হইলেও তাহার সহিত এই গোধা-সংস্রবের জন্যই তাহাকে কালকেতু-কাহিনীর চণ্ডী বলিয়া চিনিতে পারা যাইতেছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্নাগারে এই শ্রেণীর কয়েকটি চণ্ডীর মূর্তি রক্ষিত আছে। মূর্তিগুলি চতুর্ভুজা, অক্ষসূত্র-পদ্ম-অভয়-বরহস্তা, প্রসন্ন মুখ, প্রফুল্ল পদ্মপাদপীঠ, তন্নিম্নে ক্ষুদ্র গোধিকা। মূর্তিগুলি দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বেই নির্মিত বলিয়া অনুমিত হয়।

যদিও স্মার্ত রঘুনন্দনের নামে প্রচলিত একখানি স্মৃতির গ্রন্থে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ঘটে, পটে বা প্রতিমায় নিষ্পন্ন করিতে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে,[১] তথাপি সাধারণত এই দেবতার পূজা একমাত্র ঘটেই সম্পন্ন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক কালেও যে মঙ্গলচণ্ডী ব্রত হইয়া থাকে, তাহাও ঘটেই নিষ্পন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গের কোনও কোনও অঞ্চলে মঙ্গলচণ্ডীর প্রস্তর মূর্তি স্থাপিত আছে এবং কোনও কোনও স্থলে মৃন্ময়ী মূর্তিও পূজিত হয়।

অর্বাচীন পুরাণগুলিতে বলা হইয়াছে যে, মঙ্গলচণ্ডী 'মূর্তিভেদেন সা দুর্গা', সেইজন্য পরবর্তী কালে দুর্গার সহিত মঙ্গলচণ্ডিকা অভিন্ন হইয়া গেলেন। অনেক স্থলেই শারদীয় দুর্গোৎসবের সময় দুর্গা প্রতিমার সম্মুখেই মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী বা চণ্ডীমঙ্গল গান করা হইত, অনেক স্থলেই এখনও তাহা হইয়া থাকে। কিন্তু পৌরাণিক চণ্ডিকা ও মঙ্গলচণ্ডীর মধ্যে মৌলিক কোনও সাদৃশ্য নাই।

মঙ্গলচণ্ডীর সঙ্গে পৌরাণিক চণ্ডীর যেমন কোনও মৌলিক সম্পর্ক নাই, তাঁহার সঙ্গে পৌরাণিক উমারও কোনও সম্পর্কের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। পৌরাণিক উমা-রূপের মধ্যে একটি শান্ত গার্হস্থ্য পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে; মঙ্গলচণ্ডীর মধ্যে তাহার একান্ত অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মাণিক দত্ত ও মুকুন্দরাম শিব-প্রসঙ্গ চণ্ডীমঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন

১। 'তিথিতত্ত্ব', রঘুনন্দন, চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ সম্পাদিত (১৩১৩), ১৫৭

সত্য, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া হরপার্বতীর জীবনের কোনও গার্হস্থ্য পরিচয় প্রকাশ করিতে পারেন নাই। দ্বিজ মাধব কিংবা চট্টগ্রামের ঐতিহ্য অনুসরণকারী কোনও কবি পৌরাণিক শিব-প্রসঙ্গ তাঁহাদের চণ্ডীমঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। সুতরাং তাঁহারাও উমার সঙ্গে মঙ্গলচণ্ডীর কোনও সম্পর্কের অস্তিত্ব অনুভব করেন নাই।

মঙ্গলচণ্ডীর সঙ্গে কেহ আবার পৌরাণিক কিংবা লৌকিক কোজাগরী লক্ষ্মীর সাদৃশ্য অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু মঙ্গলচণ্ডী উগ্রা প্রকৃতির অনিষ্টকারিণী (malignant) দেবী; লক্ষ্মী পৌরাণিকই হউন, কিংবা লৌকিক হউন, তিনি শান্ত প্রকৃতির কল্যাণীরূপিণী দেবী—ইঁহাদের প্রকৃতি পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত; ইঁহাদের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য কল্পনারও অতীত।

চণ্ডীমঙ্গলকে চট্টগ্রামের কবিগণ কোনও কোনও স্থলে 'সারদা-মঙ্গল' বলিয়া উল্লেখ করায় কেহ কেহ মঙ্গলচণ্ডীর সঙ্গে সরস্বতীরও সম্পর্কের অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু দুর্গা বা চণ্ডীরও এক নাম সারদা। উপরন্তু বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে অবলম্বন করিয়া মঙ্গলকাব্য রচনার একটি স্বতন্ত্র ধারার জন্ম হইয়াছিল—তাহার সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল ধারার কোনও যোগ নাই। প্রকৃতির দিক দিয়া বিচার করিলেও দেখা যায় মঙ্গলচণ্ডী উগ্রা এবং পৌরাণিক সরস্বতী শান্ত—উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য নাই।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

এখানে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী দুইটি বর্ণনা করিয়া ইহার উদ্ভবের ইতিহাস সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি, সকল মঙ্গলকাব্যেরই যেমন একটিই কাহিনী, চণ্ডীমঙ্গলের তেমন নহে; চণ্ডীমঙ্গলের দুইটি কাহিনী। এই দুইটি কাহিনী যে স্বতন্ত্র দেবতার এবং পরবর্তী কালে এক পৌরাণিক দেবতার প্রভাববশত আসিয়া একত্র মিলিত হইয়াছে, তাহাও বলিয়াছি। কাহিনী দুইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে ইহা প্রমাণিত হইবে।

১ কালকেতুর উপাখ্যান

চণ্ডী মর্ত্যলোকে নিজের পূজা প্রচার করিতে মনস্থ করিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বরকেই এই কার্যের ভার দিবেন। তিনি শিবকে গিয়া বলিলেন, 'নীলাম্বরকে শাপ দিয়া মর্ত্যে পাঠাও, তাহা দ্বারাই আমার পূজা প্রচার করাইব।' শিব বলিলেন, 'বিনা অপরাধে আমি নীলাম্বরকে শাপ দিতে পারিব না।' চণ্ডী কীটরূপ ধারণ করিলেন। নীলাম্বর ইন্দ্রের আদেশে তাহার শিবপূজার জন্য ফুল তুলিতেছিল, কীটরূপিণী চণ্ডী ফুলের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন, নীলাম্বর সেই ফুল তুলিয়া আনিল। ইন্দ্র তাহা দ্বারা শিব পূজা করিল। ফুলের মধ্য হইতে বাহির হইয়া কীট শিবকে দংশন করিল। বিষের জ্বালায় শিব অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি নীলাম্বরকে অভিশাপ দিলেন, 'মর্ত্যে গিয়া ব্যাধ হইয়া জন্মগ্রহণ কর।' চণ্ডীর অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। ধর্মকেতু নামক এক ব্যাধের গৃহে কালকেতু নাম লইয়া নীলাম্বর জন্মগ্রহণ করিল। পত্নী ছায়া তাহার অনুগামিনী হইল, সে ফুল্লরা নাম লইয়া অন্য এক ব্যাধের কন্যারূপে জন্ম লইল। কালকেতু শৈশবাবধিই বীর ও বলিষ্ঠ, অমিত তাহার শক্তি, দুর্জয় তাহার সাহস। সে শশারু তাড়িয়া ধরিত, পক্ষীগুলির দিকে বাঁটুল ছুঁড়িয়া মারিত; ভল্লুক, ব্যাঘ্র লইয়া খেলা করিত। এগার বৎসর বয়সে কালকেতু ফুল্লরাকে বিবাহ করিল। ফুল্লরা সুন্দরী গৃহকর্মে নিপুণা,—বস্তুত সর্বাংশে কালকেতুর গৃহিণী হইবার উপযুক্ত। কালকেতুর দারিদ্র্যের সংসার, কিন্তু শান্তিময়। শিকারে তাহার অদ্ভুত দক্ষতা। শিকারই তাহার জীবিকার একমাত্র উপায়। প্রতিদিন যাহা শিকার করিয়া আনে, তাহা বাজারে বিক্রয় করিয়া যাহা পায়, তাহাতে কোনও রকমে সংসার চলিয়া যায়।

এদিকে বনের পশুরা কালকেতুর অত্যাচারে অস্থির হইয়া চণ্ডীর শরণাপন্ন হইল। চণ্ডী তাহাদিগকে অভয় দিলেন। একদিন চণ্ডী ছলনা করিয়া বনের পশুদিগকে লুকাইয়া রাখিলেন। ব্যাধ-দম্পতির সেদিন আর অন্নের সংস্থান হইল না। পরদিন আবার কালকেতু ধনুক লইয়া বনে যাত্রা করিল; পথে অনেক মঙ্গলচিহ্ন দেখিল। কিন্তু হঠাৎ এক স্বর্ণগোধিকা দেখিয়া তাহার সকল আশা নির্মূল হইয়া গেল; কারণ, গোধিকা যাত্রার পক্ষে অশুভ। কালকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ধনুর্গুণে বাঁধিয়া লইল; মনে মনে বলিল, যদি আজ অন্য

শিকার না পাই, তবে ইহাকেই পোড়াইয়া খাইব। সমস্ত বন ঘুরিয়া কালকেতু সেদিন যখন একটিও শিকারের সন্ধান পাইল না, তখন গোধিকা লইয়া বাড়ি ফিরিল। ফুল্লরা শিকারের আশায় অপেক্ষা করিতেছিল, শূন্য হস্তে স্বামীকে ফিরিতে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কালকেতু গোধিকার ছাল ছাড়াইয়া ফুল্লরাকে রাঁধিতে বলিল এবং প্রতিবেশিনী বিমলার গৃহ হইতে কিছু ক্ষুদ ধার করিয়া আনিতে বলিয়া নিজে বাসি মাংসের পসরা মাথায় লইয়া বাজারে বাহির হইয়া গেল। এদিকে গোধিকারূপিণী চণ্ডী সুন্দরী যুবতীর রূপ ধারণ করিলেন। ফুল্লরা বিমলার গৃহ হইতে ফিরিয়া দেখিল, এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতী তাহার গৃহের আঙিনায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ফুল্লরা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, কালকেতুই তাঁহাকে এখানে আনিয়াছে এবং তিনি সেই ব্যাধকুটিরেই থাকা স্থির করিয়াছেন। ফুল্লরার দুঃখের সংসারে তাহার স্বামীপ্রেমই ছিল একমাত্র সম্বল। চণ্ডীর মুখ দেখিয়া তাহার নিজের মুখ শুকাইয়া গেল। ফুল্লরা সীতা-সাবিত্রীর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, অনেক নৈতিক বক্তৃতা দিয়া, পরগৃহবাস হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল। তারপর তাহাদের সংসারের সাংবাৎসরিক দারিদ্র্যের কাহিনী শুনাইল; কিন্তু যখন কিছুতেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না, তখন কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর নিকট ছুটিল। কালকেতু গৃহে আসিয়া চণ্ডীর অপূর্ব লাবণ্যময়ী মূর্তি দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেল। সেও তাঁহাকে পরগৃহবাস হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া কালকেতুর ক্রোধ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু যখন কিছুতেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না, তখন ধনুকে শর জুড়িল। চণ্ডী এইবার স্ব-মূর্তি প্রকাশ করিলেন। চণ্ডীর অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া কালকেতু ও ফুল্লরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল। চণ্ডী তাহাদিগকে সাত ঘড়া ধন ও একটি অঙ্গুরী দিয়া নগর-পত্তন করিতে পরামর্শ দিলেন। কালকেতু চণ্ডীর আদেশে গুজরাট বন কাটাইয়া নগর পত্তন করিল। সংসারে এক প্রকার লোক আছে, যাহারা পরের অনিষ্ট করিতেই আনন্দ পায়। ভাঁড়ুদত্ত সেই প্রকৃতির লোক ; সে ধূর্ততার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। সে কালকেতুর নিকট মন্ত্রীর পদ প্রার্থনা করিয়া অপমানিত হইল। এই আক্রোশে কলিঙ্গাধিপতিকে কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্ররোচনা দিল। কলিঙ্গাধিপতি কালকেতুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কালকেতু যুদ্ধে পরাস্ত হইল। সে বন্দী হইয়া কারাগৃহে চণ্ডীর স্তব করিল। কলিঙ্গাধিপতিকে চণ্ডী স্বপ্নে আদেশ করিলেন যে, কালকেতু তাঁহার ভক্ত—তাহাকে মুক্তি দিয়া তাহার রাজ্য ফিরাইয়া দিতে হইবে। কালকেতু মুক্তিলাভ করিল। কলিঙ্গরাজের সাহায্যে সুদৃঢ়ভাবে রাজ্য স্থাপন করিয়া কালকেতু ফুল্লরাকে লইয়া রাজত্ব ভোগ করিতে লাগিল; তারপর একদিন শুভ মুহূর্তে-কালকেতু ও ফুল্লরা নীলাম্বর ও ছায়া-রূপে স্বর্গে ফিরিয়া গেল।

২. ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান

উজানিনগরে এক বিলাসী যুবক ছিলেন। তাঁহার নাম ধনপতি সদাগর। তিনি একদিন

জনার্দন ওঝা নামক এক ব্যক্তির সহিত ক্রীড়াচ্ছলে পায়রা উড়াইতেছিলেন। ধনপতির পায়রা শ্যেন পক্ষীর তাড়ায় ভীত হইয়া অদূরে ক্রীড়াশীলা খুল্লনার বস্ত্রাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পায়রার অনুসন্ধানে ধনপতি আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ধনপতি পায়রা চাহিলেন, খুল্লনা তাহা ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার করিল—সে ধনপতিকে তাহার খুড়তুত ভগিনীর স্বামী জানিয়া তাঁহার সহিত কৌতুক করিয়া পায়রা লইয়া চলিয়া গেল। খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হইয়া ধনপতি জনার্দন ওঝাকে খুল্লনার সহিত তাঁহার বিবাহ প্রস্তাব করিতে পাঠাইলেন। কুলে ও ধনে শ্রেষ্ঠ ধনপতি সহজেই সম্মতি লাভ করিলেন। কিন্তু ধনপতির প্রথমা স্ত্রী লহনাসুন্দরী এই বিবাহের কথা শুনিয়া অভিমান করিয়া বসিল। ধনপতি তাহাকে অনেক প্রবোধ দিলেন, শেষে লহনা একখানি পাটশাড়ি ও চুড়ি গড়াইবার জন্য পাঁচ তোলা সোনা পাইয়া তাহাতে সম্মতি দিল। বিবাহের পর ধনপতিকে রাজাজ্ঞায় সুবর্ণপিঞ্জর আনিতে গৌড়ে যাইতে হইল। গৌড়ে যাইবার সময় ধনপতি খুল্লনাকে লহনার হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন। লহনাও স্বামীর কথায় খুল্লনাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। এদিকে দুই সতীনের মধ্যে এইরূপ পরস্পর প্রীতির ভাব দেখিয়া দুর্বলা দাসীর বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। একজনের সহিত আর একজনের ঝগড়া বাধাইতে না পারিলে তাহার কোনরূপ সুবিধা নাই ভাবিয়া সে লহনাকে খুল্লনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য অনেক কূট পরামর্শ দিল। দুর্বলার উপদেশ কাজে লাগিল। খুল্লনাকে স্বামীর চক্ষে বিষ করিতে লহনা নানারূপ মন্ত্রপূত ঔষধের ব্যবস্থা করিল। কিন্তু তাহাতে যখন কোন কাজ হইল না, তখন লহনা তাহার স্বামীর নামাঙ্কিত এক জাল পত্র লইয়া খুল্লনার নিকট হাজির হইল। পত্রের মর্ম এই—অদ্য হইতে তুমি ছাগল চরাইবে, ঢেঁকিশালে শয়ন করিবে, এক বেলা আধ পেটা আহার করিবে এবং খুঁয়া বস্ত্র পরিবে। বুদ্ধিমতী খুল্লনা বুঝিল, পত্রটি তাহার স্বামীর লেখা নহে। পত্রানুযায়ী কার্য করিতে সে প্রথমেই অস্বীকার করিল। তর্কবিতর্ক কলহে দাঁড়াইল এবং শারীরিক বলের প্রভাবে লহনারই জয় হইল। খুল্লনাকে বাধ্য হইয়া ছাগল চরাইতে যাইতে হইল, ঢেঁকিশালে শয়ন করিতে হইল এবং খুঁয়া বস্ত্রও পরিতে হইল। যুবতী খুল্লনা গৃহ হইতে বনের শ্যামল প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বসন্ত কালের বনের শ্যামলতা, কোকিলের কুহুরব, ভ্রমরের মধুর গুঞ্জন, প্রকৃতির তরুপল্লব দর্শন করিয়া খুল্লনার হৃদয়ে স্বামিপ্রেম উচ্ছলিয়া উঠিল; সে কোকিলকে বলিল—'সদাগর আছে যথা, কেন নাহি যাও তথা, এই বনে ডাক অকারণ।' একদিন পথশ্রান্তা খুল্লনা বসন্ত বাতাসের নব হিল্লোলে বনমধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল। এমন সময় চণ্ডী খুল্লনাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন,—'তোর সর্বশী ছাগল শৃগালে খাইয়াছে।' স্বপ্ন দেখিয়া খুল্লনার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—জাগিয়া দেখিল সত্য সত্যই সর্বশী ছাগল নাই। লহনার তিরস্কারের ভয়ে সে ছাগল অন্বেষণ করিতে করিতে বনমধ্যে পঞ্চ দেবকন্যার দেখা পাইল। তাহারা খুল্লনাকে চণ্ডীপূজা শিক্ষা দিল। খুল্লনা চণ্ডীর পূজা করিল। চণ্ডী খুল্লনাকে দেখা দিলেন। দেবী তাহাকে স্বামীপত্র লাভের বর দিলেন। চণ্ডী

আবির্ভূতা হইয়া স্বপ্নে লহনাকে খুল্লনার প্রতি পূর্বের ন্যায় আদর যত্ন করিতে আদেশ দিলেন। স্বপ্ন দেখিয়া লহনার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তাহার মনে অনুতাপ উপস্থিত হইল। প্রভাতে যখন খুল্লনা গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন চণ্ডীর স্বপ্নাদেশের কথা স্মরণ করিয়া সে পূর্বের ন্যায় তাহাকে আদর যত্ন করিতে লাগিল। এদিকে ধনপতি গৌড়ে 'অসঙ্গত সুখে মত্ত' হইয়া বাড়ির কথা ভুলিয়া ছিলেন। চণ্ডী সেই রাত্রে ধনপতিকে স্বপ্ন দেখাইলেন যে খুল্লনার প্রতি লহনা দুর্ব্যবহার কবিতেছে। ধনপতির বাড়ির কথা মনে হইল। তিনি আর বিলম্ব না করিয়া বাড়ি ফিরিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদে লহনা তাড়াতাড়ি সুন্দর বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া স্বামীসন্দর্শনে গেল। এদিকে সেদিন সাধুর গৃহে বহু লোক নিমন্ত্রিত; ধনপতি খুল্লনাকে রন্ধন করিতে বলিলেন। লহনা আপত্তি করিল এবং রন্ধনকার্যে খুল্লনার নৈপুণ্যের অভাবের কথা তুলিয়া তাহাকে রন্ধন হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিল। এই আপত্তিতে কোনও ফল হইল না, খুল্লনাই রাঁধিতে গেল। চণ্ডী খুল্লনাকে বর দিলেন। রন্ধন খুব উত্তম হইল, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ খুব সুখ্যাতি করিলেন। ইহার পর ধনপতিব পিতৃ-শ্রাদ্ধে নানা স্থান হইতে স্বজাতিবর্গ আসিলেন। মালা-চন্দন দেওয়া লইয়া সভায় গণ্ডগোল বাধিল। খুল্লনা বনে ছাগল চরাইত—এই কলহের সুযোগে তাঁহারা খুল্লনার সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণে আপত্তি তুলিলেন। খুল্লনার সতীত্বের পরীক্ষা না হইলে কিংবা তৎপরিবর্তে ধনপতি এক লক্ষ টাকা দণ্ড না দিলে তাঁহারা কেহই আহার করিবেন না এইরূপ দাবী করিলেন। এই অবস্থায় ধনপতি লহনাকে তাহার কার্যেব জন্য ভর্ৎসনা করিলেন এবং এক লক্ষ টাকা দিয়া সভাসদ্‌গণের মুখ বন্ধ করিবেন বলিয়া খুল্লনাকে আশ্বাস দিলেন। খুল্লনা তাহাতে সম্মত হইল না। সে জানিত যে, এক লক্ষ টাকায় বর্তমানে তাঁহাদের মুখ বন্ধ হইলেও অন্য নিমন্ত্রণ উপলক্ষে পুনরায় এই প্রশ্ন তুলিয়া তাঁহারা দ্বিগুণ অর্থ চাহিবেন। সে পরীক্ষা দিতেই মনস্থ করিল।

খুল্লনার সতীত্বের পরীক্ষা হইল। তাহাকে জলে ডুবাইতে চেষ্টা করা হইল, সর্প দ্বারা দংশন করানো হইল, প্রজ্বলিত লৌহদণ্ডে বিদ্ধ করা হইল, অবশেষে তাহাকে জতুগৃহে রাখিয়া অগ্নি সংযোগ করা হইল—কিন্তু তাহার কিছুই হইল না। সে সতী, সতীত্বের ধ্বজা উড়াইয়া সকল পরীক্ষায় সে জয়লাভ করিল। কিছুদিন পরে রাজ-ভাণ্ডারে চন্দনাদি দ্রব্যের অভাব হওয়ায় ধনপতিকে সিংহল যাত্রা করিতে হইল। খুল্লনা তখন গর্ভবতী। যাত্রার নির্ধারিত সময় অশুভ ছিল; কিন্তু ধনপতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সাত ডিঙ্গা বোঝাই করিয়া যাত্রার আয়োজন করিলেন। খুল্লনা পতির মঙ্গল কামনা করিয়া চণ্ডীপূজা করিতে বসিল।

ধনপতি ছিলেন পরম শৈব; স্বামীর চক্ষে খুল্লনাকে বিষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য লহনা ধনপতিকে খুল্লনার চণ্ডীপূজার কথা বলিল। ধনপতি ক্রোধে অন্ধ হইয়া 'ডাকিনী দেবতা' বলিয়া চণ্ডীর ঘটে লাথি মারিয়া গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন। ধনপতি চণ্ডীর ঘটে লাথি

মারিয়াছিলেন, অকূল সমুদ্রে পাইয়া চণ্ডী ধনপতির উপর তাহার প্রতিশোধ তুলিলেন। তাঁহার ছয় ডিঙ্গা ডুবিল, সুরূপ নষ্ট হইল; একমাত্র মধুকর ডিঙ্গা লইয়া তিনি পথে অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়া সিংহলে পৌঁছিলেন। সিংহলের পথে চণ্ডী তাঁহাকে 'কমলে-কামিনী'র মূর্তি[১] দেখাইলেন। সিংহলরাজ ধনপতির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট আদর যত্ন করিলেন। কিন্তু ধনপতির মুখে 'কমলে-কামিনী'র অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়া বিশ্বাস করিলেন না। ধনপতির বারংবার উক্তিতে সিংহলরাজ তাঁহাকে অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন যে, 'কমলে-কামিনী' দেখাইতে পারিলে তাঁহাকে অর্ধেক রাজত্ব দিবেন, নতুবা ধনপতিকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ থাকিতে হইবে। ধনপতি স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু সিংহলরাজকে তিনি সে দৃশ্য দেখাইতে পারিলেন না। চণ্ডী তাঁহাকে ছলনা করিলেন। অঙ্গীকার-অনুযায়ী কারাগৃহে অবরুদ্ধ থাকিতে হইল।

এদিকে খুল্লনার এক পুত্র জন্মিল। মালাধর গন্ধর্ব শিবের শাপে খুল্লনার গর্ভে শ্রীমন্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। শ্রীমন্ত ক্রমে বড় হইল; পাঠশালায় পড়িতে গেল। একদিন গুরু মহাশয়কে পরিহাস করায় গুরু রাগিয়া তাহার জন্ম সম্বন্ধে কটাক্ষ করিলেন। সেইদিনই তরুণ শ্রীমন্ত পিতার সন্ধানে সিংহল যাত্রা করিতে মনস্থ করিল। রাজার অনুরোধ, মাতার অশ্রু তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না। শ্রীমন্ত সাত ডিঙ্গা সাজাইয়া সিংহল যাত্রা করিল।

শ্রীমন্তও জলরাশির মধ্যে সেই 'কমলে-কামিনী'র মূর্তি দেখিয়া সিংহলরাজকে গিয়া তাহা বলিল। এবারেও এ'কথা কেহ বিশ্বাস করিল না। রাজা বলিলেন, 'যদি তুমি ইহা আমাকে দেখাইতে পার, তাহা হইলে তোমাকে অর্ধেক রাজ্য ও তোমার সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব, নচেৎ দক্ষিণ মশানে তোমার শিরশ্ছেদ হইবে।' শ্রীমন্তকেও চণ্ডী অকারণেই ছলনা করিলেন—শ্রীমন্ত সিংহলরাজকে 'কমলে-কামিনী'র মূর্তি দেখাইতে পারিল না। রাজার লোকেরা তাহাকে মশানে লইয়া গেল। মশানে উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্ত চণ্ডীর স্তব করিতে লাগিল। চণ্ডী মশানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজার সৈন্যগণ চণ্ডীর ভূতপ্রেতের হস্তে পরাজিত হইয়া পলাইল। চণ্ডী শ্রীমন্তকে কোলে লইয়া বসিলেন। চণ্ডীর

১। কমলে-কামিনীর প্রকৃত অর্থ সমুদ্র-মরীচিকা। আধুনিক কালেও সামুদ্রিক নাবিকগণ ইহা দেখিয়া থাকেন। ১৯৫১ সনের ২৭শে জানুয়ারী রয়টারের মেলবোর্ণ হইতে প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—'The Chinese crew of the 7,746-ton Australian freighter "Nankin", 70 miles off the the south-west coast of Victoria, looked round the open horizen today to find themselves surrounded by houses, animals and ships, some of them upside down.

"We are surrounded by mirages", the Captain radioed the Melbourne Weather Bureau asking for an explanation.

"The mirages were caused by unevenly heated air layers bending light rays resulting in the crew seeing objects normally out of sight many miles away," the Weather Bureau replied'. (P.T.I.- Reuter)

কৃপায় সিংহলরাজ অবশেষে 'কমলে-কামিনী'র মূর্তি দেখিতে পাইলেন। পিতা-পুত্রের মিলন হইল—শ্রীমন্তের সহিত সিংহল-রাজকন্যা সুশীলার বিবাহ হইল। পিতাপুত্রে বাড়ি ফিরিলেন। উজানি নগরে আসিয়া শ্রীমন্ত উজানি নগরের রাজাকে 'কমলে-কামিনী'র মূর্তি দেখাইয়া মুগ্ধ করিল এবং তাঁহার কন্যা জয়াবতীকে বিবাহ করিল। তারপর স্বর্গভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ সকলেই স্বর্গে ফিরিয়া গেলেন।

মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনায় যেমন সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী একটি কাহিনীগত ঐক্য সৃষ্টি হইয়াছিল, চণ্ডীমঙ্গল রচনায় কাহিনীগত ঐক্য তেমন গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। রাঢ়, বারেন্দ্র ও বঙ্গ—বাংলাদেশের এই তিনটি অঞ্চলে এই বিষয়ক তিনটি ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। তবে এ'কথা সত্য যে, লৌকিক কাহিনী অংশে ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম প্রায় কিছুই ছিল না। কাব্যের ভূমিকা-ভাগ বা সৃষ্টিতত্ত্ব, দেব-বন্দনা ইত্যাদি বর্ণনায় উত্তরবঙ্গ প্রধানত মালদহ অঞ্চলে যে ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিযাছিল, তাহাই অনুসরণ করিয়াছে; তাহাতে নাথ-সাহিত্যের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। এই অংশ বর্ণনায় রাঢ়ের ঐতিহ্যে পৌরাণিক প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ববঙ্গের ঐতিহ্য প্রধানত চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে কাহিনীর প্রথমাংশ বর্ণনায় লৌকিক প্রভাব বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মঙ্গলদৈত্য শিবের বর লাভ করিয়া পরম শক্তিশালী হইয়া উঠিল, সে স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া দেবতাদিগকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল। বিপন্ন দেবগণ শিবের নিকট ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে বলিলে শিব তাঁহাদিগকে চণ্ডীর সাহায্য প্রার্থনা করিতে বলিলেন। দেবতাদিগের অনুরোধে চণ্ডী রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া মঙ্গলদৈত্যকে নিধন করিলেন। মঙ্গলদৈত্যকে বধ করিয়া দেবী মঙ্গলচণ্ডী নাম গ্রহণ করিলেন। এখানে দেখা যাইতেছে যে, মঙ্গলচণ্ডী নামটির একটি লৌকিক ব্যাখ্যা দিবার জন্য 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ'-এর চণ্ডীর আখ্যায়িকাটিকে এই অঞ্চলের কবিগণ তাঁহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত করিয়া লইয়া চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ভূমিকা-ভাগ রচনা করিয়াছেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলের ঐতিহ্য অনুযায়ী রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে রাঢ়ের ঐতিহ্যানুযায়ী রচিত বিস্তৃত শিব-কাহিনী সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

চণ্ডীমঙ্গলের এই কাহিনী দুইটি কোথা হইতে আসিল? সর্পপূজা সমগ্র ভারতবর্ষময় ব্যাপক বলিয়া মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর উদ্ভব প্রকৃত কোথায় হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা যেমন দুঃসাধ্য, চণ্ডীমঙ্গলের তেমন নহে। মঙ্গলচণ্ডীর পূজা একমাত্র বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ; সেইজন্য ইহার কাহিনীও এই দেশেই উদ্ভূত হইয়াছিল, মনে করা যাইতে পারে।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে রচিত 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'-এর একটি শ্লোকে চণ্ডীমঙ্গলের উভয় কাহিনীরই সংক্ষিপ্ত উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন—

ত্বং কালকেতু-বরদাচ্ছলগোধিকাসি
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।
শ্রীশালবাহননৃপাদ্ বণিজং স্বসূনো
রক্ষোহম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী।[১]

অনেকে মনে করেন, এই শ্লোকটি হইতে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে।[২] কিন্তু তাহা সত্য নহে। বরং প্রচলিত চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী অবলম্বন করিয়াই পরবর্তী কালে 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'-এ এই শ্লোকটি রচিত হইয়াছে। অতএব, একটি অত্যন্ত অর্বাচীন পুরাণের এই শ্লোকটির সহিত বাংলা চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর উদ্ভবের কোনও সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করা সমীচীন নহে। ইহাতে শুধু লৌকিক দেবতা মঙ্গলচণ্ডীকে একটা পৌরাণিক আভিজাত্য দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র।

এতদ্ব্যতীত 'দেবীপুরাণ'-এর একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতে 'চণ্ডিকাখণ্ড' নামক এক স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বাংলা চণ্ডীমঙ্গলের দুইটি কাহিনীই সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে।[৩] ইহাও যে বাংলা কাহিনী হইতেই পরবর্তী কালে গিয়া সংস্কৃতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। 'দেবীপুরাণ'ও একখানি অর্বাচীন পুরাণ, তাহারও সকল পুঁথিতে চণ্ডিকাখণ্ডটি পাওয়া যায় না, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালায় রক্ষিত একমাত্র একখানি পুঁথিতেই এ'যাবৎ তাহা পাওয়া গিয়াছে। এতএব ইহা যে পরবর্তী কালে মূল 'দেবীপুরাণ'-এ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। অতএব ইহা হইতেও বাংলা চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে, এমন বলিতে পারা যায় না। পূর্বেই বলিয়াছি, চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী দুইটি যে শুধু পরস্পর স্বতন্ত্র, তাহাই নহে, ইহাদের উদ্ভবের কালও স্বতন্ত্র। ইহাদের মধ্যে কালকেতুর কাহিনীটি প্রাচীনতর। প্রত্যেক চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, কলিঙ্গদেশেই চণ্ডীপূজার প্রথম প্রবর্তন হইয়াছিল। ইহা হইতেই অনুমিত হইতে পারে যে, কলিঙ্গদেশ হইতে আসিয়াই লৌকিক মঙ্গলচণ্ডীর পূজা কালক্রমে বঙ্গের সর্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছিল এবং কাহিনী দুইটিও সেখান হইতেই আসিয়া থাকিবে।

কিন্তু এই কলিঙ্গদেশ কোথায়? প্রাচীন বাংলার কবিদিগের ভৌগোলিক জ্ঞান যে খুব সুস্পষ্ট ছিল না, তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অতএব, কলিঙ্গের উল্লেখ হইতেই প্রাচীন ভৌগোলিক বিভাগোক্ত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের কলিঙ্গ অর্থাৎ উড়িষ্যা বিবেচনা করিবার কোনও কারণ নাই। ইহা দ্বারা এইটুকু মাত্র মনে করা যাইতে পারে যে, চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ মনে করিতেন, বাংলাদেশের বাহিরে লৌকিক চণ্ডীপূজা প্রথম প্রবর্তিত

১। বৃহদ্ধর্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড (বঙ্গবাসী, ১৩০০), ২১০;

২। র-সা-প-প, (১৩২২), ১০৭

৩। ঢা. ১৬১৭ক; পুঁথিটি ১৭২৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত বলিয়া উল্লেখ করা আছে।

হইয়াছিল, বাংলাদেশে তখনও ইহার বহুল প্রচলন হয় নাই। এই কাহিনী হইতে ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন কবিদিগের ভৌগোলিক জ্ঞান খুব স্পষ্ট ছিল না। অতএব কলিঙ্গরাজ্যে সর্বপ্রথম চণ্ডীর দেহারা নির্মিত হইয়াছিল নির্দেশ করিয়া, তাহারা প্রকৃতপক্ষে ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, এই দেবতা এই দেশে তখনও অপরিচিত হইলেও অন্যত্র তাঁহার বিশেষ প্রভাব বর্তমান। ইহা দ্বারা সন্দিগ্ধ লোকের মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি উৎপাদনের চেষ্টা করা হইত। অতএব, প্রাচীন কলিঙ্গের ভৌগোলিক সীমা সন্ধান করিয়া এই দেবতা ও তাঁহার সম্পর্কিত কাহিনীর উদ্ভবক্ষেত্র নিরূপণ করিবার চেষ্টা নিষ্ফল।

চণ্ডীমঙ্গলের সঙ্গে যোগ-তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বহু উপাদান মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়।[১] এই বিষয়ে চণ্ডীমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, চণ্ডীমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব ও রাঢ়ের অন্যতম লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য-প্রচারক কাব্য ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পূর্ণ এক এবং বৌদ্ধ শূন্যবাদের সমর্থক। ইহার সহিত আবার পরবর্তীকালে নাথ-সম্প্রদায়ের সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীও আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই বিষয়ে পুরাণের কোনও প্রভাব ইহাদের উপর একেবারেই দৃষ্টিগোচর হয় না। অবশ্য নাথপন্থ ও ধর্মপূজা উভয়ই বৌদ্ধধর্মকর্তৃক প্রভাবিত বলিয়া উভয়ের কাহিনীর মধ্যে স্বভাবতই কতকটা ঐক্য রহিয়াছে এবং মঙ্গলচণ্ডীও বৌদ্ধ সমাজের ভিতর দিয়া আগত বলিয়া তাহার সহিত বৌদ্ধসমাজসম্মত সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীও সংযুক্ত হইয়া আসিয়াছে।

মাণিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডীর গীতে যে সৃষ্টিতত্ত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারই ধারাটি রাঢ় এবং বারেন্দ্রের প্রত্যেক চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ভিতর দিয়া একেবারে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। ধর্মমঙ্গলেও সংক্ষিপ্ত আকারে সৃষ্টিতত্ত্বের একই বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদা-মঙ্গলে'ও সৃষ্টিপ্রকরণ বৌদ্ধধর্মসম্মত ও নাথ-সম্প্রদায়ের সাহিত্যের অনুকূল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাহিত এই চণ্ডীর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। চণ্ডীমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব-বিষয়ক পুরাণ-বহির্ভূত কাহিনী সর্বত্র প্রচলিত ছিল। অতএব ইহা হইতেও হিন্দুধর্ম-বহির্ভূত কোন অঞ্চল হইতে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ও তাঁহার সম্পর্কিত কাহিনী এদেশে সর্বপ্রথম আসিয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু নানা কারণেই চণ্ডীমঙ্গলের উভয় কাহিনীই অনৈতিহাসিক ও কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়। ধনপতি সদাগরের কাহিনীটি প্রধানত মনসা-মঙ্গল কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক রীতিতে রচিত। কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন, ইহার মূলেও ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে।[১] এমন কি, মালদহ জেলার সরকারী বিবরণে পর্যন্ত এই

১। সা-প-প, ১৭, ২৫৫

বিষয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 'In Firozpur is the Dhanchak mosque ascribed to Dhanapat Saudagar. He and his brother Chand Saudagar were the bankers of Gaur in the sixteenth century (?) and lived near the small Sagardighi east of the Lotan masjid.'[২]

বলা বাহুল্য, কোনও নিশ্চিত ঐতিহাসিক প্রমাণদ্বারা সমর্থিত না হইলে কেবলমাত্র লোক-প্রবাদের উপর কোনও আস্থা স্থাপন করা যায় না। বাংলাদেশে ভগ্নস্তূপের অভাব নাই, এবং এই সমস্ত ভগ্নস্তূপকে অবলম্বন করিয়া পরবর্তী কালে যে যাহার প্রয়োজন মত কাহিনী রচনা করিয়া লইতেও লোকের কোনদিন অভাব হয় নাই। অতএব, মঙ্গলচণ্ডীর কাহিনীর মূলে কোনপ্রকার ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া আস্থা স্থাপন করা যায় না। কালকেতু ব্যাধের কাহিনী আপাতদৃষ্টিতে বাংলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী উপজাতীয় অঞ্চলের লোক-কথা হইতে আগত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই পর্যন্ত ভারতীয় উপজাতি অঞ্চলের যে সকল লোক-কথা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া এই প্রকার কোনও কাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় নাই। অতএব ইহাও কোনও বাঙ্গালী কবির স্বকপোলকল্পিত বলিয়া মনে হয়।

আট দিনের ষোল পালায় ভাগ করিয়া চণ্ডীমঙ্গল যখন প্রথম বর্তমান কাব্যাকারে রচিত হয়, তখন ব্যাধ কালকেতু এবং সদাগর ধনপতির কাহিনী দুইটি একত্র আসিয়া যুক্ত হইলেও, এ'কথা সত্য যে, উভয় কাহিনী একই সময়ে সমাজে উদ্ভূত হয় নাই। ইহাদের মধ্যে ব্যাধ কালকেতুর কাহিনীটি যে প্রাচীনতর, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়; মঙ্গলকাব্যের সাধারণ আঙ্গিক ইহার মধ্যে ব্যবহৃত হয় নাই। ইহার অর্থ এই যে, মঙ্গলকাব্য রচনার সুস্পষ্ট কোনও ভাবগত কিংবা বহিরঙ্গগত আদর্শের তখনও জন্মই হয় নাই। অথচ ধনপতি সদাগরের কাহিনীর মধ্যে মঙ্গলকাব্য রচনার অঙ্গ ও ভাবগত আদর্শকে অনুসরণ করিবার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি, ধনপতি সদাগরের কাহিনী যে মনসা-মঙ্গল কাব্যের রচনা ও তাহার প্রচারের পরবর্তী কালে জন্মলাভ করিয়াছিল, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাধ কালকেতুর কাহিনী মনসা-মঙ্গল কাহিনী উদ্ভবের পূর্ববর্তী, কিন্তু সদাগর ধনপতির কাহিনী মনসা-মঙ্গলের পরবর্তী। ব্যাধ কালকেতুর কাহিনীর উপর মনসা-মঙ্গল কাহিনীর কোনও প্রভাবের পরিচয় নাই, অথচ সদাগর ধনপতির কাহিনী যে মনসা-মঙ্গল কাহিনীর প্রত্যক্ষ প্রভাব-জাত, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

১। ব-সা-প-প, (১৩২২), ৯৭

২। Bengal District Gazetteer—Malda, Calcutta, 1918, p. 91

চণ্ডীমঙ্গলের দুইটি কাহিনীর মধ্যে একটি কাহিনী উড়িষ্যাতে উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন। কাহিনীটি ধনপতি সদাগরের কাহিনী। একটি ওড়িয়া মেয়েলী ব্রতকথায় প্রায় অনুরূপ একটি কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। বাংলার মেয়েলী ব্রতকথায় কাহিনীটি বারমেসে মঙ্গলচণ্ডী ও ওড়িয়া ভাষায় 'খুদুরুকুনী ওষা' বলিয়া পরিচিত। ওড়িয়া ব্রতকথাটি এই প্রকার—

রুক্মিণী নামে একটি ছোট মেয়ে ছিল, সে দেবী মঙ্গলার নিকট একদিন কামনা জানাইল যে তাহার নামে যেন একটি ব্রত চালু করা হয়। দেবী সম্মত হইলেন। ব্রতটি কি ভাবে প্রচারিত হইল তাহার বৃত্তান্তটি এই প্রকার—

জম্বুদ্বীপে অস্তগিরি নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার চারি ধারে দধি সমুদ্র ও ক্ষীর সমুদ্র ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। সেখানে তালধ্বজ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী গুণনিধি, রাজপুত্র সুবুদ্ধি। তাঁহার রাজ্যে এক ধনী বণিক বাস করিতেন, তাঁহার নাম তনয়বন্ত, স্ত্রীর নাম শকুন্তলা। তাঁহাদের সাতটি ছেলে ও একটি মেয়ে। মেয়ের নাম তপোঈ, সে সকলের ছোট, সকলেই তাহাকে সেজন্য আদর করিত। যখন তাহার বয়স মাত্র পাঁচ বছর তখন একদিন এক বিধবা ব্রাহ্মণী তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, সে ধনীর দুলালী, ইচ্ছা করিলেই সোনার ভাঁটা লইয়া খেলা করিতে পারে, ধূলাবালি লইয়া তাহার খেলা করা শোভা পায় না।

ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া তপোঈ বাড়ি ফিরিল। অভিমান করিয়া বিছানায় শুইয়া রহিল। পিতা যখন শুনিলেন সোনার ভাঁটার জন্য তাহার অভিমান তখন তিনি তাহাকে হীরক-খচিত সোনার চাঁদ গড়িয়া খেলা করিতে দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন।

কিন্তু প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবার পূর্বেই পিতার মৃত্যু হইল, অল্পদিনের মধ্যে মাতারও মৃত্যু হইল; তপোঈর সাধ পূর্ণ হইল না।

তপোঈর সাত ভাই সাত ডিঙ্গা সাজাইয়া বাণিজ্যে বাহির হইল। সাত বৌকে বলিয়া গেল, তাহারা যেন তপোঈকে যত্ন করে।

আবার তপোঈর সামনে সেই বিধবা ব্রাহ্মণী আসিয়া হাজির হইল। সাত বধূ তাহাকে দেখিবা মাত্র অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিল। কারণ, সে-ই সোনার চাঁদ লইয়া খেলিবার পরামর্শ দিয়াছিল, সোনার চাঁদ গড়িতে গড়িতে রাজা ও রানী দু'জনেরই মৃত্যু হইল। তাই ব্রাহ্মণী আবার কি অনিষ্ট করিতে আসিয়াছে, এই বিষয়ে সকলের মনে আশঙ্কা দেখা দিল।

সকলে মিলিয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল। প্রহারে জর্জরিত হইয়াও সে তাহাদিগকে পরামর্শ দিল, যে ননদ চিরশত্রু, তাহাকে এত আদর করিতে নাই, বরং তাহাকে ছেঁড়া কাপড় পরিতে, ছাই খাইতে দিতে এবং বনে ছাগল চরাইতে দিতে হয়। সাত বৌকে তাহাই পরামর্শ দিয়া সে বিদায় হইল।

বড় ছয় বৌ ব্রাহ্মণীর কথামত কাজ করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিল, কেবল ছোট বৌ সে কাজ করিতে অস্বীকৃত হইল। কিন্তু ছোট বৌয়ের ইচ্ছামত কাজ হইল না; বড় ছয় বৌ

তাহার কোনও কথা না শুনিয়া তপোঙ্গীকে ছেঁড়া কাপড় পরিতে দিল, ছাই খাইতে দিল, তারপর বনের মধ্যে ছাগল চরাইতে পাঠাইল।

সব চাইতে ভাল ছাগলটির নাম ছিল ঘরমণি। ছয় বৌ তপোঙ্গীকে বলিয়া দিল, ঘরমণি যদি ঘরে ফিরিয়া না আসে তবে তোমার মুখের উপর দরজা চিরদিনের মতো বন্ধ হইয়া যাইবে। তোমার মুখে চুন কালি দিয়া নাক কাটিয়া লওয়া হইবে।

বনের মধ্যে ছাগল চরাইবার সময় ক্ষুধা লাগিলে খাইবার জন্য ছয় বৌ তপোঙ্গীর সঙ্গে একটি কৌটা দিয়াছিল। কৌটা খুলিয়া তপোঙ্গী দেখিল, তাহাতে কয়েকটি ভাতের কণা পড়িয়া আছে, তাহার নীচে সব ইঁদুরের মাটি, আর নুন বলিয়া কিছু পাথরের কুচি।

এক একদিন ছোট বৌ খাবার সাজাইয়া দেয়। সেদিন সে পেট ভরিয়া খাইতে পায়।

দুর্ভাগ্যক্রমে ঘরমণি একদিন সত্য সত্যই হারাইয়া গেল। তপোঙ্গী বাড়ি ফিরিয়া যাইতে সাহস পায় না, কোনও মতে ভয়ে জড়সড় হইয়া গিয়া বাড়ির দরজায় দাঁড়াইল। সে অপরাধ স্বীকার করিল। কিন্তু ছয় বৌ তাহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে আবার বনের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। দেখিল এক জায়গায় পূজা হইতেছে। দেবকন্যারা মঙ্গলার ব্রত করিতেছে। সব শুনিয়া তাহারা তপোঙ্গীকে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিবার পরামর্শ দিল, তপোঙ্গী পূজা করিয়া ঘরমণিকে ফিরিয়া পাইল।

কিন্তু তপোঙ্গী আর ঘরে ফিরিল না। সে বনেই বাস করিতে লাগিল। এই ভাবে বছর দশেক কাটিয়া গেল। একদিন সাত ভাই সেই পথ দিয়াই বাণিজ্য হইতে ফিরিতেছিল, ভাইয়েরা ভগিনীকে চিনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইল।

শুনি আনন্দ তপোঙ্গী
অন্ধ কি চক্ষুদান পাই।
চাতক পাইলা কি নীর
চন্দ্র কি দেখিলা চকোর।।

তপোঙ্গী ভাইদের কাছে সকল দুঃখের কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া ভাইয়েরা ক্রুদ্ধ হইল এবং তাহাদের বৌদিগকে শাস্তি দিবার সঙ্কল্প করিল। তাহারা যত ধনরত্ন সঙ্গে আনিয়াছিল, তাহা সবই তপোঙ্গীকে দিল। তাহার হাতে একটি ক্ষুর দিয়া তাহাকে ডিঙ্গির গলুইর উপর বসাইয়া দিল, বলিল, বৌয়েরা যখন নৌকা বরণ করিতে আসিবে তখন যাহারা তাহার উপর অত্যাচার করিয়াছিল, সে যেন তাহাদের নাক কাটিয়া দেয়। তপোঙ্গী একে একে ছয় বধূর নাক কাটিল। তারপর যখন ছোট বৌ তাহার সামনে আসিল সে তখন তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। স্বামী-পরিত্যক্তা কর্তিতনাসা ছয় বৌ বনে চলিয়া গেল। সেখানে সদাশিবের বরে সকলেই নাক ফিরিয়া পাইয়া যে যাহার পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।

মহা ধুমধাম করিয়া ধনবান এক বণিক-পুত্রের সঙ্গে তপোঙ্গীর বিবাহ হইল। বিবাহের ষোল বৎসর পরে সহসা একদিন স্বর্গ হইতে এক রথ আসিল, রথে চড়িয়া তপোঙ্গী স্বর্গে চলিয়া গেল। সে মর্ত্যলোকে মঙ্গলার ব্রত প্রচার করিবার জন্য আসিয়াছিল। ব্রত সাঙ্গ

করিয়া স্বর্গের দেবকন্যা স্বর্গে ফিরিয়া গেল। অনুতপ্তা ছয় বৌকে পিত্রালয় হইতে ফিরাইয়া আনা হইল। তাহারা মঙ্গলার ব্রত গ্রহণ করিল।[১]

ধনপতি সদাগরের কাহিনীর সঙ্গে এই কাহিনীর পার্থক্যও নিতান্ত অল্প নহে, যদিও ঐক্যও লক্ষ্য করিবার মত। মনে হয় ব্রতকথার আকারে কাহিনীটি বাংলা এবং উড়িষ্যা উভয় প্রদেশেই প্রচলিত ছিল। এমন কি, অনুসন্ধান করিলে কাহিনীটি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও, বিশেষত অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কেরল, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট প্রদেশেও পাওয়া যাইতে পারে। বাংলাদেশে এই কাহিনীটি একটি বিশেষ আঞ্চলিক রূপ লাভ করিয়া মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যের আকারে রচিত হইয়াছে, অন্যান্য প্রদেশে তাহা হয়ত ক্ষুদ্র ব্রতকথার আকারেই রহিয়া গিয়াছে। কারণ, ব্রতকথাগুলির মূল ভিত্তি সন্ধান করিবার জন্য আরও প্রাচীন যুগ, এমন কি, জৈন ধর্ম প্রচারের যুগ পর্যন্ত যাইবার প্রয়োজন হয়। তবে ইহার সেই প্রাচীনতম উৎসটির কোনও সন্ধান এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ

চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর আদি রচয়িতা কে? ইহা বলাই বাহুল্য যে, পাঁচালী বা লোক-কথার ক্ষুদ্র গীতিকাব আকারে ইহা বহুকাল হইতেই হয়ত সমাজে মৌখিক প্রচলিত ছিল। অতঃপর নিপুণ কাব্যশিল্পীদিগের হাতে পড়িয়া পরবর্তী কালে ইহা মঙ্গলকাব্যের রূপ লাভ করিয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরাম তাঁহার পূর্ববর্তী কবিদিগের বন্দনা করিতে গিয়া বাল্মীকি, বেদব্যাস, জয়দেব, বিদ্যাপতির সঙ্গে মাণিক দত্ত ও শ্রীকবিকঙ্কণ নামক দুই কবির উল্লেখ করিয়াছেন,

জয়দেব বিদ্যাপতি বন্দোঁ কালিদাস।
আদি কবি বাল্মীকি বন্দিলুঁ মুনি ব্যাস।।
মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীত-পথ-পরিচয়।।
বন্দিলুঁ গীতের গুরু শ্রীকবিকঙ্কণ।
প্রণাম করিয়া মাতা পিতার চরণ।।[২]

ইহা হইতে মনে হয়, মুকুন্দরামের মতে মাণিক দত্তই এই গীতি রচনার প্রবর্তক এবং শ্রীকবিকঙ্কণ উপাধিধারী কোনও ব্যক্তি মুকুন্দরামের সঙ্গীত-শিক্ষক। কেহ কেহ মনে করেন, এই কবিকঙ্কণও মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী একজন কবি, তাঁহার প্রকৃত নাম বলরাম—মেদিনীপুর অঞ্চলে তাঁহার মঙ্গলচণ্ডীর গীত বিশেষ প্রচলিত ছিল, মুকুন্দ তাঁহার কাব্যরচনায় তাঁহা কর্তৃকও প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিতেছি। মুকুন্দরাম

১। রণেন্দ্রনাথ দেব, 'চণ্ডীমঙ্গল', সাহিত্য ও বিজ্ঞান, ৪র্থ বর্ষ (১৩৭৭) পৃ. ২৩-২৪

২। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ চণ্ডী (বঙ্গবাসী, ১৩৩২), ৬

কর্তৃক মাণিক দত্তের এই উল্লেখ হইতেই কেহ কেহ তাঁহাকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করেন। মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে সৃষ্টিতত্ত্ববর্ণনা-সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতেও প্রতীয়মান হইবে যে, এই দেশের সমাজে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্বেই মাণিক দত্তের কাহিনী রচিত হইয়াছিল। গতানুগতিক পঞ্চদেবতার বন্দনা দিয়া মাণিক দত্তের কাব্যের আরম্ভ নহে। তাঁহার সৃষ্টিতত্ত্ব রচনার অংশ পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ও নাথসাহিত্য হইতে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করিবারও আপাতত কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা মাণিক দত্তের মৌলিক রচনা বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। মুকুন্দরাম নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, 'বিচারিয়া অনেক পুরাণ' তিনি তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন, তখন সমাজের মধ্যে সংস্কৃত পুরাণের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল এবং এই যুগের কবিগণ তাঁহাদের পূর্বতন কবিদিগের রচনাগুলিকে সংস্কৃত পুরাণের আদর্শে পুনর্গঠন করিয়া ইহাদের মধ্যে এক অভিনব বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাণিক দত্তের রচনা এই যুগের এই পৌরাণিক অনুকরণের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। ইহা হইতে স্বভাবতই মনে হইবে যে মাণিক দত্ত মুকুন্দরামের অগ্রবর্তী, তবে একেবারে তিন শত বৎসরের অগ্রবর্তী কিনা, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। সে কথা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

মাণিক দত্ত

মাণিক দত্তের নামে প্রচলিত একখানি মাত্র হস্তলিখিত পুঁথির বর্তমানে সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।[১] যদিও ইহার প্রথম অংশে একটি ও শেষদিকে কয়েকটি পাতা নাই, তথাপি পুঁথিখানিকে এক প্রকার সম্পূর্ণই বলিতে পারা যায়—ইহাতে কালকেতুর কাহিনী সম্পূর্ণ ও ধনপতি সদাগরের কাহিনীরও সামান্য শেষাংশ ব্যতীত অন্যান্য অংশ প্রায় সম্পূর্ণ আছে। কিন্তু আলোচ্য পুঁথিখানি ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; কারণ, ইহাতে কালকেতুর নগর পত্তন উপলক্ষে 'ফিরিঙ্গি' শব্দেরও উল্লেখ আছে,[২]—

আইল ফিরিঙ্গি সব বসিল একত্তরে।[৩]

পুঁথির দো-ভাঁজ করা পাতার বিপরীত সাদা পৃষ্ঠায় একটি অসম্পূর্ণ জমা-খরচের হিসাব লেখা আছে, তাহাতে ১১৯১ সাল তারিখটি দেওয়া আছে।[৪] পুঁথিটি ঐ সালে অর্থাৎ ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত হইয়াছিল। ইহার অন্তত একশত বৎসর পূর্বে পুঁথিটি রচিত হওয়া সম্ভব। ইহাতে সপার্ষদ চৈতন্যদেবের বিস্তৃত বন্দনা পাওয়া যায়।[৫] কতকগুলি পদে মুকুন্দরামের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, যেমন নিদয়ার গর্ভবর্ণনা উপলক্ষে

১। ক, ৬১৮৫; ২। 'ফিরিঙ্গি শব্দটির উৎপত্তি ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য— Hunter, *History of British India*, Vol. I, p. 184.

৩। ঐ, ৬৬ (খ), ৪। ঐ, পত্রসংখ্যা ৯১; ৫। ৬০ (খ)

মুকুন্দরামে আছে,

প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি।

লক্ষপতির স্ত্রী গর্ভবর্ণনা উপলক্ষে মাণিক দত্তেও পাওয়া যায়,

এক মাসের হইল গর্ভ জানাজানি।

এই প্রকার খুল্লনার রন্ধন বর্ণনায় উভয় কবিরই প্রায় একইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহা হইতে মুকুন্দরাম মাণিক দত্তকে এইসব ক্ষেত্রে অনুকরণ করিয়াছেন, এমন অনুমান করা ভুল হইবে; বরং মুকুন্দরামের অনুকরণেই মাণিক দত্তের নামে পরবর্তী কালে কোন কবি কর্তৃক ইহা রচিত হইয়াছে, ইহাই মনে করা যুক্তিসঙ্গত হইবে। অতএব মনে হয়, মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী কবি মাণিক দত্তের কোন জীর্ণ ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই বর্তমান কাব্যখানি রচিত হইয়াছিল। যদিও ইহা হইতে মুকুন্দরাম-বন্দিত মাণিক দত্তের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাইবার উপায় নাই, তথাপি চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর একটি স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের ধারা যে মূলত ইহাতে অনুসরণ করা হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়—সম্ভবত প্রাক্‌চৈতন্য যুগের মাণিক দত্তই এই ধারাটির প্রবর্তক।

ধর্মমঙ্গলকাহিনীর অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনাদ্বারা মাণিক দত্তের কাহিনীর আরম্ভ,— গতানুগতিক অন্য কোনও দেব-বন্দনা নাই,

হস্ত নাহি পদ নাহি কন্ধ নাহি মাথা।
ধর্ম গোসাঞি জন্মিল যেন কুসুম্বের ফল গোটা।।
আচম্বিতে ধর্ম গোসাঞি গোলোক ধিয়াইল।
গোলোক ধিয়াইতে গোসাঞির মুণ্ড জন্মিল।
আচম্বিতে ধর্ম গোসাঞি জুত (?) ধ্যাইল।।
জুত ধিয়াইতে প্রভুর দুই চক্ষু হইল।।[১]

এইভাবে ধর্মের মুণ্ড, চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ ইত্যাদি কি ভাবে সৃষ্টি হইল, তাহা পর পর বর্ণনা করিবার পর এইভাবে জলের উৎপত্তি বর্ণনা করা হইয়াছে,—

মুখের অমৃত তাহার খসিয়া পড়িল।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে জল উপজিল।।
জলেত আসন ধর্মের জলেত বৈসন।
জলে ভর করিয়া ভাসেন নিরঞ্জন।।[২]

১। ঐ ১ (খ)　　২। ঐ

তারপর ধর্মগোসাঞি হইতে কি ভাবে আদ্যার জন্ম হইল, শিবের সঙ্গে আদ্যার বিবাহের ফলে প্রজাসৃষ্টি হইল, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

এই আদ্যাই চণ্ডী। চণ্ডীর উৎপত্তি নির্দেশ করিতে গিয়াই এই বিস্তৃত সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা করা হইয়াছে।

সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনার পরই চণ্ডীমঙ্গলের গতানুগতিক কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে। দক্ষযজ্ঞের বর্ণনায় কবির বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মাণিক দত্তের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, প্রসূতিও শিব-নিন্দায় পঞ্চমুখ ছিলেন; অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ইহা পাওয়া যায় না। প্রসূতির মুখ হইতে স্বামীর নিন্দা শুনিয়া,—

অঝোরে কান্দিয়া চক্ষুর মোছে পানি।
মোর স্বামীর নিন্দা কর অধম জননী।।
যত কন্যা আছে তোমার জগত-সংসারে।
কেহ দাসী কেহ দাস কি কব তাহারে।।
শক্তিরূপী দেবী যাহার বাহন।।
বিষ্ণুরূপী বসোয়া যাহার সন্ধান।
তোমার জ্ঞান—না জানিলে সে দেব কেমন।
ভূত ভূত বলি তুমি বোল কার তরে।
পঞ্চভূত আত্মা দেখ তোমার শরীরে।।
সংসারে যত দেখ তাহাতে ব্যাপন।
এমত দেবতাকে বোলে কেমনে অধম।।
যেখানে স্বামীর নিন্দা না বহিব আমি।
আজি হৈতে তোর মুখ না দেখোঁ জননী।।[১]

ধনপতি সদাগরের কাহিনীতে লহনা-খুল্লনার সম্পর্কটি বর্ণনা করিতে কবি যথার্থ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়াছেন। যখন ধনপতির জাল পত্রটি খুল্লনা অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিল, তখন,

খুল্লনার বচনে লহনা উঠিল জ্বলিয়া।
লড় দিয়া চুলের মুঠ ধরিল চাপিয়া।।
চুলেত ধরিয়া গালেত দিল চড়।
চাপিয়া বসিল খুলনাইর বুকের উপর।।

১। ঐ ৯ (খ),

কাড়িয়া লইল তার অষ্ট আভরণ।

পরিবার আজ্ঞা দিল খুঞিএগার বসন।।[১]

তারপর হইতে খুল্লনার দুঃখের জীবন আরম্ভ হইল,—ইহার বর্ণনাটি যেমন বাস্তব, তেমনই করুণ। বনের মধ্যে খুল্লনা, 'তিক্ত মিষ্ট না বুঝে খায় বৃক্ষের ফল।' সারাদিন বনে ছাগল রাখিয়া সন্ধ্যায় ক্লান্তদেহে, 'নিজপুরে আনিয়া ছাগলগুলি দিল।' কিন্তু তখনও নিষ্কৃতি নাই, 'দুয়ারে প্রহরী থাক লহনা কহিল।' এই বলিয়া লহনা তাহাকে সাবধান করিয়া দিল, 'শৃগালে ছাগল খাইলে নাকে দিব দাও।' তারপর,

পোড়া ধোড়া অন্ন খাই রাত্রি নিশাকালে।

খুদিয়া মানের পাতে তিন দিকে পড়ে।।

ছাগলে করিল লঘ্‌ঘী মাথার উপর।

হরিদ্রার বর্ণ হইল গায়ের কাপড়।।[২]

ধনপতির কাহিনীটি কালকেতুর কাহিনী হইতে অধিকতর সুপরিকল্পিত, ইহার বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সর্বত্র প্রশংসনীয়। কিন্তু পুঁথির রচনা সর্বত্রই অত্যন্ত শিথিলবদ্ধ, ছন্দ ও মিল সম্বন্ধে সর্বত্রই দায়িত্বহীনতা দেখা যায়।

তবে মাণিক দত্তের রচনা সরল ও অনাড়ম্বর, এই রচনা সরলপ্রাণ ভক্তের মর্মস্পর্শী হইলেও সাহিত্য-রসিকের হৃদয়গ্রাহী হইবার ধৃষ্টতা রাখে না। মঙ্গলচণ্ডী পূজার বিধান নির্দেশ করিতে তিনি লিখিয়াছেন,—

ঘট স্থাপিয়া বৈসে গৌরী পার্বতী

নাট গীতে বড় হৈল রঙ্গ।।

দুয়ারে ব্রহ্মা পাতালে বাসুকি

নবগ্রহ বৈসে স্থানে স্থানে।।

অষ্ট নাগকুল লৈএগা আইল মনসাদেবী

সেহ বসে এক স্থানে।

পূজহি মঙ্গলচণ্ডিকা এক মন চিত্তে

হইয়া হরষিত মনে।।

দুর্গারে পূজিলে বিঘ্ন খণ্ডিবে

লক্ষ্মী হবে পরসন্ন।

১। ঐ ৯৯ (ক)

২। ঐ ৯৯ (খ)

বারি অবলম্বনে নানা নাট শুভক্ষণে
অষ্টরাত্রি সপ্তদিন পূজন।।

মাণিক দত্তের কাব্যে চরিত্রসৃষ্টির কোনও প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে কেবল কাহিনী দুইটি পাঁচালী ও লাচারীর ছন্দদ্বারা গ্রথিত করা হইয়াছে। তিনি ছড়া-পাঁচালীর আকারে লোকমুখে প্রচলিত কাহিনীটিকেই হয়ত একটা যৎসামান্য কাব্য-গৌরব দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অধিকাংশ রচনা তাঁহার ছড়ার লক্ষণাক্রান্ত। এই সম্পর্কে তাঁহার একটি পদ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—

আমারে বোল ডানরে বুড়িরে আমারে বোল ডান।
কার খাইনু ভাতার পুত কার করিনু হান।।
ডান নইবে ডান নই হইএ মুখদোষী।
দ্বারে বোসে খাইনু মুই চৌদ্দ ঘর পড়শী।।
ডাইন বোলিএগ্র মোরে বোলে বার বার।
দ্বারে বোসে খাইনু মুই বুঢ়া পোদ্দার।।
উত্তরে দেশে গেনু খাইএগ্র আইনু কাঙ্গাল।
দুয়ারে বসিয়া খাইনু তিন লক্ষ বাঙ্গাল।।
ডাইন বোলিয়া মোরে বোলে বার বার।
আজিকা হইনু ডান তোমা খাইবার।।

রচনার দিক দিয়া প্রাচীন ছড়ার আদর্শ হইতে ইহা মুক্ত না হইলেও' বিষয়বস্তুর দৃষ্টিভঙ্গিতে কবি এখানে সামান্য স্বকীয়তার দাবী করিতে পারেন মাত্র।

মাণিক দত্তের রচনা পাঠ করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে, তিনি প্রাচীন গৌড় বা মালদহ অঞ্চলের লোক। তাঁহার কাব্য এখনও মালদহ অঞ্চলেই প্রচলিত আছে। তাহাতে যে সমস্ত স্থানের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা সমস্তই মালদহ বা গৌড়ের সন্নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। চণ্ডীর চক্রান্তে মগরা নদীর জলে যখন শ্রীমন্তের সমস্ত ডিঙ্গি ডুবিল, তখন তাহাতে মহানন্দা, কালিন্দী, পুনর্ভবা ও টাঙ্গন প্রভৃতি নদীও আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। এই সমস্ত নদীই গৌড়ের সন্নিকটে অবস্থিত। অন্য কোন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ইহাদের উল্লেখমাত্র নাই। এতদ্ব্যতীত ধনপতি সদাগরের গৌড়ে আগমন উপলক্ষে মাণিক দত্ত এই সমস্ত স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন,

মোড় গ্রামে করি স্নান, রন্ধন ভোজন পান,
ছাত্যা ভাত্যা এড়াইল তথি।

বড়গাছা আগলা সকল গঙ্গা পার হৈলো
বুধ রাত্রে বানিয়া ধনপতি।।
কাঞ্চন নগর আইল সদাগর
আইলে বান্যা সন্ন্যাসী পাটন।
যায় সাধু গঙ্গাজলে স্নান করিয়া চলে
রাজদ্বারে দিল দরশন।।

মোড়গাম, বড়গাছা, আগলা, কাঞ্চননগর ও সন্ন্যাসীপাটন—এই গ্রামগুলি প্রাচীন গৌড়ের ইতিহাসে নদীতীরবর্তী প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া পরিচিত। ছেতে ভেতের বিল বা ছাত্যা ও ভাত্যাব বিল গৌড়েব পূর্বদিকে অবস্থিত সুবৃহৎ বিল। বহু প্রাচীন গ্রন্থে ইহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ছেতে বা ভাত্যার বিল পদ্মার গর্ভ হইতে জন্মিয়াছে, প্রসিদ্ধ 'আইন-ই-আকবিব'তেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

গৌড় হইতে বিদায় হইয়া ধনপতি সদাগব,

গৌড়েশ্বরী প্রণমিএগ গঙ্গাপুর হইল পার।
গঙ্গাস্নান করিএগ করিল ফলাহার।।

গৌড়েশ্বরীর মন্দির গৌড়েই অবস্থিত, কবি সেই অঞ্চলের লোক না হইলে এই গৌড়েশ্বরীর উল্লেখ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। মাণিক দত্ত শ্রীমন্তের চৌতিশায় ভগবতীকে দ্বারবাসিনী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, এখন পর্যন্তও প্রাচীন গৌড়ের নিকটবর্তী চণ্ডীপুর গ্রামে দ্বারবাসিনী গৌড়েরই বিশিষ্ট দেবতা।

চণ্ডীব রূপ বর্ণনায় মাণিক দত্ত বলিয়াছেন:

মাজাখানি দেখি তোর কেন্দুয়ার নালা।

কেন্দুয়ার নালাও মালদহ জেলায় অবস্থিত।

মাণিক দত্ত তাঁহাব পুঁথিতে যে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন যে, তাঁহার নিবাস ফুলুয়া নগর। ফুলুয়া নগর মালদহ জেলার বর্তমান ফুলবাড়ী বলিয়া অনেকে সন্দেহ করেন। কবির উল্লিখিত স্থানসমূহ ফুলবাড়ীর চতুস্পার্শ্বেই অবস্থিত বলিয়া এই ধারণা অনেকটা সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

মাণিক দত্তের আত্মবিবরণী হইতে জানা যায়, তিনি কানা ও খোঁড়া ছিলেন। দেবীর অনুগ্রহে তাঁহার এই উভয় দোষই ঘুচিয়া যায়। চণ্ডী তাঁহাকে অষ্টমঙ্গলার পুঁথি রচনা করিতে স্বপ্নাদেশ করেন। দেবীর প্রসাদে তিনি কবিত্বশক্তি লাভ করেন। এই পুঁথি পাইয়া তিনি গানের দল বাঁধেন। তাঁহার দুইজন দোহার ছিল। তাহাদের নাম রঘু ও রাঘব। তাহাদিগকে লইয়া তিনি নানা জায়গায় বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে চণ্ডীর গান গাহিয়া বেড়াইতেন,

রঘু রাঘব 'পাইল' দিনু সহিতি করিয়া।
বায়েন তাম্বুর দিনু সম্প্রদা গোছায়া।।
তিন চারি জনে সবে সম্প্রদা হইয়া।
দুর্গার মণ্ডপে সবে উত্তরিল গিয়া।।

কথিত আছে যে, মাণিক দত্তের গানে কলিঙ্গরাজের উল্লেখ থাকাতে তৎকালীন কলিঙ্গ রাজ তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজের রাজ্যে ধরিয়া আনেন ও কারাগারে নিক্ষেপ করেন। চণ্ডীর কৃপায় কবি মুক্তিলাভ করেন। কলিঙ্গরাজও চণ্ডীর মাহাত্ম্য দর্শনে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিজেও তাঁহার পূজার অনুষ্ঠান করেন। এইভাবে কলিঙ্গরাজ্যে চণ্ডীর পূজা প্রচলিত হয়।

মাণিক দত্ত বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তৎকালীন গৌড়ীয় সমাজে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। মঙ্গলচণ্ডী দেবী যে এই বৌদ্ধধর্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, সেকথা পূর্বেই বলিয়াছি, সেইজন্য হিন্দু পুরাণবহির্ভূত বৌদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্বের আখ্যান তাঁহার চণ্ডীমঙ্গলে আসিয়া স্থানলাভ করিয়াছে। মালদহে প্রচলিত জগজ্জীবনের মনসার পাঁচালীতেও অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নতুবা অন্য সমস্ত পদ্মাপুরাণেই সৃষ্টির কাহিনী স্বতন্ত্র।

এত প্রাচীন একজন কবির একেবারে খাঁটি রচনার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা দুষ্কর। এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। মুকুন্দরামের চণ্ডীর বহুল প্রচারের জন্য পরবর্তীকালে মাণিক দত্তের কাব্যেও মুকুন্দরামের অনেক পদ আসিয়া প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। পরবর্তী গায়েনগণ মাণিক দত্তের পদের মধ্যে মুকুন্দরামের পদেরও যোজনা করিয়া লইত, তাহাতেই মাণিক দত্তের পুঁথির মধ্যে অনেক স্থলেই মুকুন্দরামের পদের সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে। মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে একটি পদ পাওয়া যায়,—

মাণিক দত্ত রচিয়া মাণিক দত্ত কৈল।
রঘুর রচনা কবিকঙ্কণ হইল।।

ইহার অর্থ এই হয় যে, মাণিক দত্তের রচিত পদ মাণিক দত্ত নিজে গান করিতেন, কিন্তু তাহার মধ্যে রঘু নামক কোন গায়েন কবিকঙ্কণের রচনা সংযোগ করিয়া দিল। অবশ্য এই পদটিও যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা হইতেও মূল কবির রচনা-বিকৃতিতে গায়েনদিগের যথেচ্ছাচারিতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

একমাত্র সৃষ্টিতত্ত্বের আখ্যান ব্যতীত মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আর কোনও বিষয়ে নূতনত্ব নাই। ইহাতেও দুইটি কাহিনী,—কালকেতু ব্যাধের কাহিনী ও ধনপতি সদাগরের কাহিনী। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, পরবর্তী কালে মুকুন্দরামের ব্যাপক প্রভাবের ফলে এই কাহিনীগত সমগ্র অনৈক্য একপ্রকার বিদূরিত হইয়া গিয়াছিল। অতএব মাণিক

দত্তের মূল গ্রন্থের সন্ধান যতদিন না পাওয়া যায়, ততদিন এই সম্পর্কে তাঁহার বৈশিষ্ট্যের কথা নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। একমাত্র তাঁহার সৃষ্টিতত্ত্ব রচনাটিই কালের দুর্জয় পরীক্ষা উপেক্ষা করিয়াও বর্তমান রহিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বর্ধমানের কবি মুকুন্দরামের নিকট ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগেও মাণিক দত্তের নাম অপরিচিত না হইলেও, তৎপরবর্তী যুগেই তাঁহার প্রচার একমাত্র তাঁহার নিজের অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

দ্বিজ মাধব

সুস্পষ্ট সনতারিখযুক্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বপ্রথম পুঁথি যাঁহার আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাঁহার নাম দ্বিজ মাধব।[১] প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি মাধবাচার্য বা মাধব আচার্য নামে পরিচিত, কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতার এই পরিচয় ভ্রমাত্মক, তাহা পরে আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে। হস্তলিখিত পুঁথিগুলির প্রারম্ভিক বন্দনা-ভাগে তাঁহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়,—

পঞ্চগৌড় নামে এক গ্রামের প্রধান।
একাব্বর অধিকারী অর্জুন সমান।।
প্রতাপে তপন সম জ্ঞানে বৃহস্পতি।
কলিযুগে তার তুল্য রাজা নাহি ক্ষিতি।।
সেই পঞ্চ গৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল।[২]
ধরায় ত্রিবেণী গঙ্গা বহে নিরন্তর।।[৩]
সপ্তদ্বীপ মাঝারে নদীয়া এক স্থান।
ব্রহ্ম ক্ষেত্রি বৈশ্য শূত্র অনেক প্রধান।।
পরাশর সুত হয় মাধব তার নাম।
কলিযুগে ব্যাস তুল্য গুণে অনুপাম।।[৪]

১। ঢা ৫৯৫এ, ব ১৯১১, ক ২৩১৬; একখানি পুঁথি মুদ্রিত হইয়াও প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা নির্ভরযোগ্য নহে—ইহাতে পুঁথির সম্পাদক ইচ্ছামত নূতন পদ যোজনা ও প্রাচীন ভাষার পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' এই কাল্পনিক নাম দিয়া ইহার আর একখানি পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছে (কলিকাতা, ১৯৫২)।

২। ব ১৯১১ পুঁথিতে পাঠ, 'সেই পঞ্চগৌড় সম দ্বিজ সমসর।' কিন্তু এই পাঠ ভুল। অন্য পুঁথি হইতে বর্তমান পাঠ লওয়া হইয়াছে।

৩। ইহার পর কোন কোন পুঁথিতে আরও দুইটি পদ পাওয়া যায়,—'মর্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু। ধার্মিক আচারে রাজা বুদ্ধি সুরগুরু।।' বা-প্রা-পু-বি ১।১, ১৩৯।

৪। ব ১৯১১, ২য় ৩ক,

বিভিন্ন পুঁথিতে উদ্ধৃত অংশে পাঠের কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে, তবে এই বিষয়-সম্পর্কে সকল পুঁথিতেই এক মত দেখিতে পাওয়া যায় যে, মাধব পঞ্চ গৌড়ের অধীন সপ্তগ্রামের অধিবাসী পরাশরের পুত্র। নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সপ্তগ্রামের অধিবাসী পরাশরের পুত্র মাধব 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' নামক 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর একখানি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন[১] এবং তাঁহার এই পরিচয় দ্বিজ মাধব রচিত চণ্ডীমঙ্গলের এই প্রারম্ভিক বন্দনাভাগের কবি-পরিচয়ের সঙ্গে অভিন্ন।

'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-রচয়িতা দ্বিজ মাধব কেবলমাত্র বাংলা সাহিত্যে নহে, প্রাচীন বাংলার বৈষ্ণব সমাজেও অত্যন্ত সুপরিচিত। তাঁহার কাব্যের কোনও কোনও ভণিতা দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন ও তাঁহার সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যে তাঁহার পিতার নাম পরাশর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত দ্বিজ মাধবের একখানি 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-এর পুঁথিতেও পাওয়া যায়—

পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার।
মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার।।[২]

পরাশরের পুত্র মাধবের বংশধারা আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। তাঁহার বংশধরগণ বর্তমানে ময়মনসিংহ জেলার সদর মহকুমায় গোঁসাই চান্দুড়া গ্রামে এবং কিশোরগঞ্জ মহকুমায় যশোদল গোঁসাইগঞ্জ গ্রামে বসবাস করিতেছেন। ইহাদের সম্পর্কিত কোনও জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়াই ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিজ মাধবের পরিচয় সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন, 'কথিত আছে, "মাধবাচার্য" ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণে মেঘনা নদীর তীরস্থ নবীনপুর (ন্যানপুর) গ্রামে বাস স্থাপন করেন। এই ন্যানপুর এখন গোঁসাইপুর নামে পরিচিত।'[৩] কিন্তু ইহা সত্য নহে; ন্যানপুর এবং গোঁসাইপুর বা গোঁসাইগঞ্জ পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্থান এবং ইহাদের মধ্যে প্রায় ত্রিশ মাইলের ব্যবধান। সুতরাং গোঁসাইপুরের সঙ্গে মেঘনাতীরবর্তী ন্যানপুর বা নবীনপুরের কোনও যোগ নাই; ন্যানপুর ইতিপূর্বেই মেঘনা গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, গোঁসাইপুর বা গোঁসাইগঞ্জ মেঘনাতীর হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে এখনও ইহার ঐতিহ্যের ধারা রক্ষা করিয়া বর্তমান আছে। 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-প্রণেতা মাধবাচার্যের বংশধরদিগের গৃহে 'মাধব-বংশ-তত্ত্ব' নামে একখানি পুঁথি রক্ষিত আছে।[৪] তাহাতে মাধবাচার্যের পরিচয় এবং জন্মবৃত্তান্তের যে উল্লেখ দেখা যায়, তাহা এই—

১। গ-স ৫৪৪৭, গ-স ৩৬০৭ ২। ব-প্রা-পু-বি ৩৭৫. ৭৭ ৩। দীনেশচন্দ্র সেন ৩৬৬০;
৪। পুঁথিখানির সন্ধান দিবার জন্য গ্রন্থকার স্বর্গত সীতানাথ গোস্বামী ভক্তিভূষণ মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। পুঁথিখানি বর্তমানে শ্রীমুরারিমোহন গোস্বামী কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট রক্ষিত আছে; তাঁহারা উভয়েই মাধবের বংশধর এবং উক্ত গোঁসাইগঞ্জ গ্রামের অধিবাসী।

শ্রেষ্ঠা বিশখিকাযূথে রূপে গুণৈশ্চ মাধবী।
শ্রীকৃষ্ণার্পিতচিত্তা সা প্রেমানুগা প্রিয়ম্বদা।।
গৌরলীলানুগতার্থং আবির্ভূতা কলৌ হি সা।
স্বর্গীয়ভাবমাসাদ্য ধৃত্বা পুরুষবিগ্রহম্।।
পরাশরাত্মজঃ শ্রেষ্ঠো মাধবাচার্যসংজ্ঞকঃ।
শ্রীচৈতন্যার্পিতপ্রাণঃ প্রেমিকো ভক্তবল্লভঃ।।
হেমক্ষেত্রে পবিত্রে চ সাধুজনোপসেবিতে।
শ্রীনবীনপুরে প্রাচ্যে মেঘনাদতটস্থিতে।।
আষাঢ়স্যত্বমাবস্যা শুভগ্রহসুসংযুতা।
আবির্ভূতোহভবত্তস্যাং শ্রীভক্তশক্তিবিগ্রহঃ।। ইত্যাদি

কালক্রমে মেঘনাতটবর্তী নবীনপুর গ্রাম নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গেলে মাধবাচার্যের পুত্র জয়রামচন্দ্র গোস্বামী মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমা শহরের নিকটবর্তী জঙ্গলবাড়ী গ্রামে এবং মাধবাচার্যের ভ্রাতা শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য তন্নিকটবর্তী যশোদল গ্রামে ও অন্যান্য ভ্রাতারা সুবন্দী, মুড়াকইর, পত্তন, সর্ষপুর প্রভৃতি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। জঙ্গলবাড়ীতে ঈশা খাঁর বংশধরগণ তখন দেওয়ান ছিলেন; তাঁহাদের নিকট হইতে বংশধরদিগের জাতিনাশের আশঙ্কা করিয়া জয়রাম গোস্বামী সেখানকার বাস পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে মৈমনসিংহ জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত গোঁসাই চান্দুড়া নামক গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। জয়রাম গোস্বামীর ভ্রাতা স্থানীয় হিন্দু রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় যশোদল গ্রামে বাস করিতে থাকেন; অতঃপর যশোদলের হিন্দুরা[illegible]র আগ্রহে জয়রাম গোস্বামীর দুইটি পুত্র যশোদলে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা যে অঞ্চলে বাস করিতেন, সেখানে তাঁহাদের বংশধরগণ আজিও বসবাস করিতেছেন এবং তাহাই গোঁসাইগঞ্জ নামে পরিচিত। সুতরাং দীনেশচন্দ্র সেন যে বলিয়াছেন, 'ন্যানপুর এখন গোঁসাইপুর নামে পরিচিত', তাহা সত্য নহে। গোঁসাই চান্দুড়া ও গোঁসাইগঞ্জ গ্রামের অধিবাসী মাধবের বংশধর গোস্বামিগণের স্বধর্মনিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্যের ধারা আজ পর্যন্তও অক্ষুণ্ণ আছে। এইজন্য তাঁহারা এখনও পর্যন্ত বাংলার বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ সম্মানিত স্থান অধিকার করিয়া আছেন। উভয় গ্রামেই এখন পর্যন্ত প্রতি বৎসর তাঁহাদের মধ্যে শ্রাবণী অমাবস্যা তিথিতে মাধবের আবির্ভাব উৎসব এবং পৌষ অমাবস্যা তিথিতে তিরোধান উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে— এই উপলক্ষে তিন দিন ব্যাপী উৎসব হয়, উৎসব উপলক্ষে মাধবাচার্য রচিত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' পাঠ, কীর্তন ও পূজাদি হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই মাধব চৈতন্যদেবের শ্যালক মাধবাচার্য নহেন; কারণ, তাহা উক্ত বংশলতা দ্বারা কিংবা এই গোস্বামীদের কৌলিক জনশ্রুতি দ্বারাও সমর্থিত হয় না।

উক্ত গোস্বামিগণ রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কিন্তু চৈতন্যদেবের শ্যালক মাধবাচার্য বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত। অতএব উক্ত উদ্ধৃত অংশে যে একাব্বর নামক রাজার উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি যদি দিল্লীশ্বর আকবরই হন, তাহা হইলেও এই মাধব তাঁহার সমসাময়িক লোক হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। এই মাধবের বংশধরদিগের মধ্যে তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' গ্রন্থরচনার কথা প্রচলিত থাকিলেও তিনি যে কোনও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ কোন ঐতিহ্য একেবারেই প্রচলিত নাই। শুধু তাহাই নহে, চণ্ডীমঙ্গলের মত বিষয়বস্তু রচনা ইহাদের কৌলিক সংস্কারের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁহারা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব এবং কোনও শাক্ত পূজাচার আজিও তাঁহাদের কুলক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। অতএব পরাশরের পুত্র মাধবের সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলের কবি দ্বিজ মাধবের কোন সম্পর্ক কল্পনা করা কঠিন—তাঁহারা পরস্পর স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা উভয়ে প্রায় সমসাময়িক কালেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং উভয়েই তাঁহাদের স্বরচিত বিভিন্ন বিষয়ক কাব্যে দ্বিজ মাধব ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া পরবর্তী কালে এই নামটি লইয়া অনুলিপিকার ও গায়েনদের মধ্যে গোলযোগ (confusion) সৃষ্টি হওয়ার ফলেই হয়ত দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-এর দ্বিজ মাধবের আত্মপরিচয়টি আসিয়া যুক্ত হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথির যে অংশে ইহার কবির এই তথাকথিত আত্মবিররণীটি পাওয়া গিয়াছে, তাহা পুঁথির প্রারম্ভিক বন্দনার অংশ,—এই অংশ সাধারণত গায়েন কর্তৃকই রচিত কিংবা তাহার ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তিত হইয়া থাকে—মূল পুঁথির অন্য কোন স্বাধীন তথ্যদ্বারা ইহার বিষয়সমূহ সমর্থিত না হইলে, তাহা কবির নিজস্ব রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। বিশেষত দেখিতে পাওয়া যায়, দ্বিজ মাধবের কাব্যের এই প্রথমাংশে দুইটি গণেশ-বন্দনা আছে। একই মঙ্গলকাব্যে দুইটি গণেশ-বন্দনা থাকিবার কোনও কারণ নাই, এ'রকম কোনও নিদর্শন বাংলার আর কোনও মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায় না। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, অতিরিক্ত গণেশ-বন্দনাটি গায়েন কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে—সুতরাং গায়েনের হস্তক্ষেপের যে-ক্ষেত্রে অন্য প্রমাণও রহিয়াছে, সেখানে এই অংশও যে গায়েনের হস্তক্ষেপের ফল, তাহা কষ্টকল্পনা বলিয়া মনে হইতে পারে না। যে পুঁথি আসরে গীত হইয়া থাকে, এই পুঁথির রচয়িতা সম্বন্ধে আসরে দাঁড়াইয়া একটা পরিচয় দেওয়া মঙ্গলগানের গায়েন মাত্রেরই একটি সাধারণ রীতি (convention)। অতএব মনে হয়, এই অংশ রচনায় গায়েন 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-রচয়িতা দ্বিজ মাধবের সুপরিচিত নামটির সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহা কর্তৃক গীত চণ্ডীমঙ্গলের গৌরব বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। কাব্যমধ্যে দ্বিজ মাধবের মূল রচনা, 'না আছিল রবি শশী, সন্ন্যাসী তপন, না আছিল হে মেরুমন্দার'[১] —এখান হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, চণ্ডীমঙ্গলের বিভিন্ন পুঁথিতে কবির

১। ব ১৬১১ ৩ (ক)

আত্মপরিচায়ক পদগুলির মধ্যে বহু পাঠভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের কবি দ্বিজ মাধবের পরিচয় সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট ধারণা তৎকালীন সমাজে প্রচলিত থাকিলে ইহার পাঠের এত ব্যতিক্রম থাকিবার কথা ছিল না। অতএব একমাত্র চট্টগ্রাম অঞ্চলে তাঁহার পুঁথি অধিক আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক বলিয়া অনুমান করা ব্যতীত তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন নিশ্চিত পরিচয় পাওয়া যায় না।

কিন্তু এ সম্পর্কে আরও একটি বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক হইতেছে। 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' রচয়িতা এবং 'চণ্ডীমঙ্গল' রচয়িতা উভয়েরই নাম, পিতৃপরিচয় এবং আবির্ভাব কাল যখন অভিন্ন, তখন ইহাদিগকে পরস্পর স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিবার পক্ষেও কতকগুলি বাধা আছে। সুতরাং ইহাদের অভিন্নত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কি না, তাহাও বিচার করা প্রয়োজন। কারণ, দেখা যায়, যে-রামপ্রসাদ অপূর্ব মাতৃভক্তিমূলক নানা সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তিনিই বিদ্যাসুন্দরের মত শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন, যে-চণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন'-এর মত আদিরসাত্মক কাব্যের রচয়িতা, তাঁহারই লেখনীতে সুগভীর দিব্য প্রেমমূলক পদাবলীও রচিত হইয়াছিল—আপাতদৃষ্টিতে ইহাদিগকেও স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস তাহা নহে। সুতরাং এই ক্ষেত্রেও আমাদিগের আরও অনুসন্ধান এবং গভীরতর বিচার বিশ্লেষণ ব্যতীত কেবলমাত্র কয়েকটি বহির্মুখী প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন হয় না। বৈষ্ণব বলিয়াই মাধবাচার্য শক্তি কাব্য রচনা করিতে পারিবেন না, অন্তত বাংলাদেশের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারা এ'কথা স্বীকার করিতে চাহিবেন না। কারণ, মুকুন্দরামও বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া অনেকেই সন্দেহ করিয়াছেন, অন্তত তাঁহার বংশ যে বৈষ্ণবেরই বংশ—তাঁহার পিতামহ যে 'মীন মাংস' ত্যাগ করিয়া দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে উপাসনা করিয়াছিলেন, সে কথা তিনি নিজেও বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং মাধবাচার্য সম্পর্কেও এই যুক্তিটি একটু বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। এ'কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মাধবাচার্য 'চৈতন্যার্পিতপ্রাণ' হইয়া চৈতন্যধর্মে দীক্ষা লাভ করিলেও তাঁহার পিতা পরাশর মিশ্র, তাঁহার পূর্বপুরুষগণ এবং তাঁহার অন্যান্য সহোদর সকলেই শাক্ত ছিলেন। মাধবাচার্যেরই ভ্রাতা শাক্তাচার্য শ্রীনিবাস ভট্টাচার্যের সন্ততিগণ মৈমনসিংহ জেলার যশোদল গ্রামের ভট্টাচার্যপাড়ার অধিবাসী এবং পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট জেলার বহু শাক্ত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ পরিবারের কুলগুরু। স্বয়ং মাধবাচার্যও চৈতন্যচরণাশ্রয়ের পূর্ব পর্যন্তও পিতৃ-পুরুষের শক্তি-সাধন-ধারারই অনুবর্তী ছিলেন। সুতরাং প্রথম যৌবনে শাক্ত থাকা কালে স্বভাবকবি মাধবাচার্যের পক্ষে চণ্ডীমঙ্গল রচনা অসম্ভব নহে। এমন কি, মাধবাচার্যের বর্তমান বংশধরদিগের মধ্যেও কেহ কেহ শক্তি-রহস্য উদ্ভেদের জন্য তাঁহাদের পাণ্ডিত্য ও মনীষা নিয়োজিত করিয়াছেন দেখিতে

পাওয়া যায়।[১] সুতরাং মাধবাচার্যের বংশধারার মধ্যেও শাক্ত সংস্কারের প্রভাব এখনও পর্যন্ত একেবারে দূর হইয়া যাইতে পারে নাই। মাধবাচার্য তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-এর দেবদেবী বন্দনায়ও 'গিরিসুতা' বা দুর্গার উল্লেখ করিয়াছেন,

আনন্দে বন্দিনু ব্রহ্মা সৃজন কারণ।
গিরিসুতা সহিত বন্দিনু ত্রিলোচন।।

মাধব-বংশধরগণ মনে করেন, তাঁহাদের দুর্গাপূজা করিতে কোন আপত্তির কারণ নাই; এমন কি, অন্যে পশুপ্রোক্ষণ করিয়া বলি দিলে, পশুবলিযুক্ত দুর্গাপূজাও আপৎকালে মাধব-বংশধরগণ অকর্তব্য বলিয়া মনে করেন না। কেহ কেহ দুর্গাপূজায় পৌরোহিত্যও করিয়া থাকেন। কারণ, তাঁহাদের বিশ্বাস দুর্গাও বৈষ্ণবী শক্তি। চণ্ডীতেও ইহার সমর্থন আছে। সুতরাং যদিও রাজসিক এবং তামসিক পূজাচার বৈষ্ণবের কর্তব্য নহে, তথাপি প্রকৃতপক্ষে মাধবাচার্যের বংশধারায় নানা ভাবে ইহাদের প্রভাব সক্রিয় আছে। সুতরাং চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা এবং শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতার পক্ষে এক ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব কিছুই নহে।

পূর্বেই বলিয়াছি, চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিজ মাধব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সাধারণত মাধবাচার্য বা মাধব আচার্য নামে পরিচিত। তাঁহার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থে যে আত্মবিবরণীটি প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে এই দুইটি পদ পাওয়া যায়,

তাহার তনুজ আমি মাধব আচার্য।
ভক্তিভরে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য।।

স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' এই মুদ্রিত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই দ্বিজ মাধবের আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উদ্ধৃত অংশ হইতে কবির মাধব আচার্য বা মাধবাচার্য নামই অধিক প্রচার লাভ করিয়াছে। মনে হয়, মুদ্রিত পুঁথির সংস্কর্তা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত মাধবাচার্যের সঙ্গে এই চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতার নামের গোলযোগ করিয়া এখানে তাঁহারও মাধব আচার্য নামই কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু কোনও হস্তলিখিত পুঁথিতে উক্ত পদ দুইটি দেখিতে পাওয়া যায় না এবং এই মূল চণ্ডীমঙ্গল কাব্যমধ্যেও কবি কোথাও মাধব আচার্য কিংবা মাধবাচার্য ভণিতা ব্যবহার করেন নাই। চণ্ডীমঙ্গলের মাধব সর্বত্র দ্বিজ মাধব, মাধবানন্দ, দ্বিজ মাধবানন্দ এই প্রকার ভণিতাই ব্যবহার করিয়াছেন।

বৈষ্ণবী দীক্ষা লইয়া মাধবাচার্য বৈষ্ণবাচার্যরূপে প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্ব পর্যন্তও যে তিনি মাধবানন্দ নামেই পরিচিত ছিলেন, তাহা যশোদল ভট্টাচার্যপাড়ার মাধবাচার্যের শাক্ত ভ্রাতা

১। মাধব-বংশধর শিক্ষাব্রতী শ্রীসুধীরচন্দ্র গোস্বামী, বি.এ., কাব্যতীর্থ, কাব্যভূষণ, কাব্যভারতী মহাশয় 'শ্রীশ্রীশক্তিরহস্য' নামক একখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালীর ধমনী হইতে শাক্তের সংস্কার যে কিছুতেই দূর হইতে পারে না, ইহা তাহারই প্রমাণ।

শ্রীনিবাস ভট্টাচার্যের বংশধর কালীহর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের মুদ্রিত 'ঈশান মিশ্র বংশম্' নামক গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়। সুতরাং মনে হয়, বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিবার পূর্বেই দ্বিজ মাধব তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

তেষান্তু প্রথমো নাম মাধবানন্দ বৈষ্ণবঃ।
গৃহীত্বা বৈষ্ণবীং দীক্ষাং বিষ্ণুভক্তিপারঙ্গমঃ।।
মাধবানন্দ সন্তানা গোস্বামিখ্যাতিমাগতাঃ।
চান্দুড়া নামক গ্রামে তেষাং কেচিজ্জগামহ।।

কেহ কেহ মনে করেন, দ্বিজ মাধব আচার্য উপাধিধারী গ্রহবিপ্র ছিলেন; কারণ, সূর্য-বন্দনা দিয়া তিনি তাঁহার গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। এ'কথাও স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না; কবির স্বহস্তলিখিত কিংবা সমসাময়িক কালে প্রচলিত পুঁথি যখন আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া কেহই দাবী করেন না, এই অবস্থায় সূর্য বন্দনায় তাঁহার গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা কি করিয়া বলা যায়? তাঁহার প্রাচনীতম পুঁথিও তাঁহার সময় হইতে প্রায় একশত বৎসর ব্যবধানে অনুলিখিত। বিশেষত তাঁহার মুদ্রিত গ্রন্থের এই বন্দনা-ভাগে বিভিন্ন অংশ যে ভাবে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহাতে ইহার কোনও অংশ কবির মৌলিক রচনা বলিয়া নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। তবে সূর্যের বন্দনা দিয়া তাঁহার কোনও কোনও পুঁথি (সকল পুঁথি নহে) আরম্ভ হইয়াছে, এ'কথা সত্য। দেখিতে পাওয়া যায় যে, চট্টগ্রাম হইতে আবিষ্কৃত একখানি অতি প্রাচীন পূর্ণাঙ্গ পুঁথিতে সূর্য-বন্দনার পরিবর্তে গতানুগতিক গণেশ বন্দনা ও সরস্বতী বন্দনা দিয়া এই ভাবে তাঁহার পুঁথি আরম্ভ হইয়াছে, যথা,—

'নমো গণেশায়! নমো সরসত্যৈ নমোঃ।
নমো ২ নমো দেবি নে. নারাঅনি।
প্রসিদ্ধ চণ্ডিকা মাতা বিপদ নাসীনী।।'[১] ইত্যাদি

বিশেষত অনুলিপিকার কর্তৃক লিখিত ও গায়েন কর্তৃক ব্যবহৃত কোন পুঁথির বন্দনা-ভাগ হইতে মূল পুঁথির রচয়িতার ধর্মবিশ্বাস-সম্পর্কিত কোন পরিচয় পাইবার উপায় নাই। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, এই প্রকার বন্দনা রচনা পুঁথির গায়েনদিগের ব্যক্তিগত ধর্মবোধ দ্বারা সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে,—তাহারা তাহাদের নিজেদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী নূতন দেবতার বন্দনা ইচ্ছামত যোজনা ও পুরাতন বন্দনা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অতএব চণ্ডীমঙ্গলের কোনও কোনও পুঁথি যদি সূর্য-বন্দনা দিয়াই আরম্ভ হইয়া থাকে, তবে সেই গ্রন্থের মূল কবি আচার্য ব্রাহ্মণ ছিলেন, এ'কথা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় না। বিশেষত এ'যাবৎ আবিষ্কৃত সকল পুঁথিতেই যখন সূর্য-বন্দনার পদ পাওয়া যায় না, তখন এ'বিষয়ে

১। ব ১৬১১ ১(ক)

কোনও সন্দেহ প্রকাশ করিবার অবকাশও নাই। পূর্ববঙ্গে মঙ্গলগানের গায়েন-বৃত্তি প্রধানত আচার্য ব্রাহ্মণ কিংবা ভাট ব্রাহ্মণগণেরই কাজ, কোনও কোনও পুঁথিতে এই সূর্য-বন্দনা পুঁথির মালিক কোনও আচার্য ব্রাহ্মণ শ্রেণীর গায়েন কর্তৃকই সংযোজিত হইয়া থাকিবে। অতএব ইহা দ্বারাও দ্বিজ মাধবের মাধবাচার্য বা মাধব আচার্য নাম সমর্থনযোগ্য হয় না। সূর্য বিশেষত পঞ্চোপাসক হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম নিত্য উপাস্য দেবতা, অতএব উচ্চবর্ণের হিন্দু গায়েন কর্তৃক সূর্য-বন্দনা রচিত হওয়া কিছুই আশ্চর্য নহে। সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিজমাধব রচিত কোনও কোনও পুঁথির প্রারম্ভিক বন্দনা-ভাগ ব্যতীত, তাঁহার মূল কাব্যের মধ্যে আর এমন কোনও বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না, যাহা দ্বারা এই কাব্যের কবি আচার্য ব্রাহ্মণ শ্রেণীর ছিলেন বলিয়া দাবী করা যাইতে পারে। দ্বিজ মাধব ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী ছিলেন, তথাপি একমাত্র চট্টগ্রাম অঞ্চলেই তাঁহার পুঁথি অধিক আবিষ্কৃত হইয়াছে, দুই একখানি পুঁথি কুচবিহার ও রংপুর অঞ্চলেও পাওয়া গিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গে তাঁহার কোনও পুঁথি পাওয়া যায় নাই। এই সমস্ত কারণে মনে হয়, চট্টগ্রাম অঞ্চলেরই অধিবাসী তাঁহার কোন শিষ্য কর্তৃক তাঁহার কাব্য সেই অঞ্চলে প্রচারিত হইয়াছিল।[১]

দ্বিজ মাধব তাঁহার কাব্যমধ্যে ইহার রচনার কাল সম্পর্কে এই ভাবে নির্দেশ দিয়াছেন,—

ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধব গায় সারদা চরিত।।[২]

এই পদ দুইটি তাঁহার সকল পুঁথিতেই পাওয়া যায়; অতএব ইহা নিঃসন্দেহে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই পদ অনুসারে হিসাব করিয়া পাওয়া যায় যে, ১৫০১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিজ মাধব তাঁহার কাব্য রচনা করেন।

দ্বিজ মাধব তাঁহার কাব্যকে কোন কোন স্থলে 'সারদা-চরিত' বলিয়া উল্লেখ করিলেও 'সারদা-মঙ্গল' বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন; যথা--

সারদা-মঙ্গল দ্বিজ মাধবে রস গায়।[৩]

কিংবা দ্বিজ মাধবে গায় সারদা-মঙ্গল।।[৪]

কবি যে-ক্ষেত্রে তাঁহার কাব্যের নাম সুস্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সে-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রদত্ত নাম পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোলকল্পিত কোনও নাম যদি তাঁহার গ্রন্থের কোনও সম্পাদক গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার সে কার্য কিছুতেই সমর্থন করিতে পারা যায় না। ইহাতে কবির প্রতি অশ্রদ্ধা এবং নিজের বুদ্ধিবিবেচনার উপর অতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। সুতরাং দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলের নাম 'সারদা-চরিত' অথবা 'সারদা-মঙ্গল'; ইহা ব্যতীত আর

১। কুচবিহার অঞ্চলের 'চণ্ডিকার ব্রতকথা' নামক এই বিষয়ক একখানি ক্ষুদ্র কাব্যের লেখকের নাম মাধবচন্দ্র (DOBMCB 29) ; ইহার সঙ্গে দ্বিজ মাধবের কোন সম্বন্ধ নাই।

২। ব-৬১১ ; ১০২ (ক) ৩। ঐ ৭০ (ক) ৪। ঐ ১০৬ (ক)

কিছুই হইতে পারে না। অতএব ইহার দ্বিতীয় মুদ্রিত সংস্করণের সম্পাদক যে ইহার 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' এই নামকরণ করিয়াছেন, তাহা সমীচীন হয় নাই।

দ্বিজ মাধবের অধিকাংশ ভণিতাই প্রায় এই প্রকার,—

সারদার চরণ-সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধব তথি অলি হৈয়া শোভে।।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর কবি বলিতে কেবল মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্রকেই বুঝায়। দ্বিজ মাধবকে যদিও একজন প্রথম শ্রেণীর কবি বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না, তথাপি আনুপূর্বিক সঙ্গতি রক্ষা করিয়া পূর্ণাঙ্গ চরিত্রসৃষ্টির এমন মৌলিক প্রয়াস তাঁহার পূর্বে আর খুব বেশি কবি দেখাইতে পারেন নাই। এ'কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাংলা সাহিত্যে তখনও মুকুন্দরামের আবির্ভাব হয় নাই—অতএব তাঁহার আদর্শের সুযোগ গ্রহণ করা তাঁহার দ্বারা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং এই বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব প্রশংসনীয় বলিতেই হইবে। কালকেতুর কাহিনীর মধ্যে ব্যাধ নায়ক ও তাহার পত্নীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যটুকু বিকাশ করিয়া তোলা একমাত্র কবিত্ব-গুণ থাকিলেই যে সম্ভব হয়, তাহা নহে—কবির মধ্যে সেই অনার্যজীবনের প্রতি সহানুভূতি-মূলক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকারও প্রয়োজন। দ্বিজ মাধবের যে সেই অভিজ্ঞতা ছিল, তাহার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না সত্য; কিন্তু তাহা না থাকিলেও তাঁহার মানব চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষমতা এত নিপুণ ছিল যে, তাহা দ্বারাই তিনি নিজের সমাজ-বহির্ভূত অনার্য জীবনের চিত্রটিকে বাস্তব ও সজীব করিয়া তুলিয়াছেন। তথাপি এ'কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত এবং একান্ত ব্রতকথাধর্মী হইয়া আছে। তবে নিরলঙ্কার ভাষা ও অনাড়ম্বর ভাববর্ণনার গুণে এই চিত্রগুলি সংক্ষিপ্ত হইলেও স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাধশিশু কালকেতুর বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন,

বাড়ে হে বীরবর, যেন মত্ত করিবর
গজশুণ্ড জিনি দুই কর।
আখেটির সুত সব, তারা সব পরাভব
খেলায় জিনিতে নাহি পারে।।
বাঁটুল বাঁশ লৈয়া করে পশু বধিবার তরে
তার ঘাও বৃথা নাহি যায়।
কুঞ্চিত করিয়া আঁখি ডাকিয়া পাড়য়ে পাখী
ঘুরি ঘুরি পড়য়ে তথায়।।[১]

১। ঐ, ১৯ প

বর্ণনার স্বাভাবিকত্বই দ্বিজ মাধবের বিষয়বস্তুকে কতকটা বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। কালকেতুর কাহিনীর মত ধনপতি সদাগরের কাহিনীও তাঁহার সমাজের ব্যক্তি-চরিত্রে গভীর অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। লহনা খুল্লনার বিবাদে সপত্নী-বিদ্বেষের যে শোচনীয় চিত্রখানি কবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা এই বহুবিবাহ-পীড়িত বাঙ্গালী গার্হস্থ্য জীবনের কলঙ্ক রূপে চিরদিন অম্লান হইয়া থাকিবে। স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া অতিক্রান্ত-যৌবনা পত্নী যুবতী সতিনীর উপর যে নির্যাতন করিতেছে, তাহার এই চিত্রখানি কেবল স্বাভাবিক বলিয়াই মর্মস্পর্শী,—

খুল্লনা বসিলা ছেলী খুইয়া অজাশালে।
মানের পাতে লহনায় ক্ষুদের অন্ন বাড়ে।।
অল্প অন্ন দিল ছেঁছা পোড়াই বহুল।
পাট শাক রান্ধি দিল পাকা কলার মূল।।
ভাঙ্গা নারিকেলে জল দিল সুবদনী।
ভোজন করিতে বৈসে খুল্লনা বাণ্যানী।।
অন্ন লইয়া লহনায় দুহাতে ধরে পাত।
খুলনারে দিল নিয়া ঢেঁকিশালে ভাত।।
ছেঁছা পোড়া অন্ন দেখি নাড়ি চাড়ি চায়।
ক্ষুধার কারণে রামা তাহা কিছু খায়।।
ঘৃণা জন্মিল শেষে পিপীলিকা দেখি।
অন্ন ত্যজিয়া তখন উঠে চন্দ্রমুখী।।
দুই হাতে ধরি পাত্র পেলাইল অন্তরে।
খুইএল বাস পরিয়া শুইল ঢেঁকিশালা ঘরে।।
অপমান পাইয়া বিধিরে পাড়ে গালি।
ক্ষুদের গন্ধে কামড়ায় খুদিয়া পিপড়ি।।
সমস্ত যামিনী রামা কান্দি গোয়াইল।
প্রভাত সময়ে মাত্র কিছু নিদ্রা হইল।।
বিভাবরী অস্ত গেল উদিত অরুণি।
চৈতন্য পাইয়া উঠে লহনা বাণ্যানী।।
জাগিয়া দেখিল রামা ছেলী আছে ঘরে।
খুলনা খুলনা বলি ঘন ডাক্ক ছাড়ে।।

নিদ্রার কারণে কিছু না শুনে খুলনি।
মুখেতে ঢালিয়া দিল ছুয়া ঝারির পানি।।
আস্তে ব্যস্তে উঠে রামা ভয়েত আকুল।
কাপড় টানিয়া পরে ভিরে বান্ধে চুল।।
লহনায় বলে শুন খুলনা রূপসী।
এতক্ষণ ছেলী মোর রৈছে উপবাসী।।
খুলনায় বলে দিদি গায়ে মোর জ্বর।
হস্ত দিয়া চাহ মোর ললাট উপর।।
অবসাদ মাত্র দেহ আজি না যাইমু।
কালিকা প্রভাতে দিদি ছেলী লইয়া যাইমু।।
লহনায় বলে বিটি লজ্জা নাই তোর গায়।
আপনা গৌরব রাখি ছেলী লইয়া যায়।।
লহনার বাক্য রামা সহিতে না পারে।
ছাগল লইয়া চলে কানন ভিতরে।।[১]

ইহাতে রচনার পরিপাট্য নাই, উন্মাদিনী কবি-কল্পনার লাস্য নৃত্যও নাই, একমাত্র অনাড়ম্বর ভাব ও ভাষার ভিতর দিয়া একান্ত প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্যের সহানুভূতিপূর্ণ সহজ বর্ণনা আছে; সুনিপুণ বস্তুবিশ্লেষণ গুণের সঙ্গে এখানে কবিমনের সহজ সমবেদনাটুকু যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু বর্ণনার সংক্ষিপ্ততার জন্য এবং কেবলমাত্র গতানুগতিক পথ অবলম্বন করিবার জন্য কবি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোনও বিশিষ্ট স্থান লাভ করিতে পারেন নাই।

দ্বিজ মাধবের অন্যতম প্রধান গুণ, তাঁহার রচনা যতই সংক্ষিপ্ত হউক, তিনি প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বাঙ্গালী জীবনের বিচিত্র বাস্তব পটভূমিকার উপর একটি পূর্ণাঙ্গ গার্হস্থ্য চিত্র বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিয়াছেন। এই চিত্রটি বর্ণনার মধ্যে তাঁহার যে বস্তুনিষ্ঠা ও সহজ সাবলীলত্বের ভাব সর্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সেই যুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম বিস্ময়। দ্বিজ মাধবের কাব্যেই সর্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায় যে, কবি তাঁহার বর্ণিতব্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত নহেন, একটি পরম সহানুভূতিসজাগ হৃদয় লইয়া তিনি ইহার মধ্যে নিজেও লিপ্ত হইয়া গিয়াছেন। পরবর্তী কবি মুকুন্দরামের সঙ্গে তাঁহার একটি প্রধান পার্থক্য এই যে, মুকুন্দরামের কাব্যে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের বহু ছায়াপাত হইয়াছে

১। ঐ ৫১খ-৫২খ

এবং সেই সূত্রেই তিনি তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে গ্রথিত; কিন্তু দ্বিজ মাধবের সঙ্গে তাঁহার কাব্য-বর্ণিত বিষয়ের ব্যক্তিগত কোন যোগ ছিল না, তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতি-প্রবণতা কিংবা মানব-চরিত্র সৃষ্টির কৌশলই তাঁহাকে এই বিষয়ে সার্থকতা দান করিয়াছে। দ্বিজ মাধবের ভাঁড়ু দত্ত চরিত্র তাঁহার সৃষ্ট অন্যান্য চরিত্রের মত সংক্ষিপ্ত নহে— সেইজন্য ইহার মধ্যে তাঁহার বাস্তব জীবনদর্শন সর্বাপেক্ষা সার্থক হইয়াছে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মাধবের রচনার মধ্যে বিশেষ পারিপাট্য নাই, সহজ ভাবে তিনি ঘরের কথা বলিয়াছেন, তবে তাঁহার রচনার সর্বত্র একটি অনাড়ষ্ট ও সাবলীল ভাব আছে, তাহাই কাহিনী দুইটিকে সহজ ভাবে শেষ পর্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। দুই এক স্থানে তিনি ছন্দেরও কিছু কিছু বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন। এখানে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে--

ভাল হইল আসিয়া এথায়।
দোষগুণ বিচার সভায়।।
ছেলী রাখে সাধুর আরতি।
হয় না হয় পড়ি চাও পাতি।।
আপনার কপাল নহে ভাল।
তে কারণে তুমি মন্দ বল।।
শরীর পোড়় এ এই বিষে।
এই জ্বালা ঘুচাইব কোন দেশে।।
দ্বিজ মাধবে এই ভণে।
হাসে কাম লহনা বচনে।।[১]

দ্বিজ মাধবের কবি-যশ যে তাঁহার পরবর্তী কবি মুকুন্দরাম হরণ করিয়া লইয়াছেন, এ'কথা সত্য নহে। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুকুন্দরাম দ্বিজ মাধবকে আদর্শ করিয়া রচনা করেন নাই, তাঁহার আদর্শ ছিলেন মাণিক দত্ত। যে অঞ্চলে দ্বিজ মাধবের কাব্য প্রচলিত ছিল, সেই অঞ্চলে মুকুন্দরামের কাব্য অপরিচিত এবং যে অঞ্চলে মুকুন্দরামের কাব্য প্রচলিত ছিল, সেই অঞ্চলে দ্বিজ মাধবের কাব্য অপ্রচলিত ছিল। দুই কবি মধ্যযুগে বাংলার দুই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরস্পর দুইটি স্বতন্ত্র অঞ্চলে নিজেদের কাব্যের প্রচার করিয়াছিলেন। চণ্ডীমঙ্গল রচনার মূল ধারাটি উভয়েই অনুসরণ করিলেও পরস্পর পরস্পর দ্বারা যেমন প্রভাবিত হন নাই, তেমনই একজনের কাব্যও আর একজনের কাব্যকে লুপ্ত করিয়া দিতে পারে নাই। দ্বিজ মাধবের কাব্য পূর্ববঙ্গের প্রধানত চট্টগ্রাম অঞ্চলের

১। ঐ ৫৪ (ক)

কবিদিগের যেমন আদর্শস্থানীয় ছিল, মুকুন্দরামের কাব্যও রাঢ়ের কবি দিগের তেমনই আদর্শস্থানীয় ছিল। দ্বিজ মাধবের সঙ্গে মুকুন্দরামের তুলনামূলক কোনও আলোচনার অবকাশ নাই। কারণ, দ্বিজ মাধব চট্টগ্রামের ঐতিহ্য অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন, মুকুন্দরাম রাঢ়ের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়াছেন। কাহিনীর দিক দিয়া অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য আছে। একই ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া উভয়েই কাব্য রচনা করিলেও ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যে তুলনার সুযোগ পাওয়া যাইত, এই ক্ষেত্রে তাহা পাওয়া যায় না। তবে আপাত দৃষ্টিতে ইহাদের উভয়ের মধ্যে মুকন্দরামের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিতে বেগ পাইতে হয় না।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের ঐতিহ্য অবলম্বন করিয়া রচিত চণ্ডীমঙ্গলগুলির মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর অণুরূপ ঘোষা বা ধুয়ার মত কতকগুলি গীতি-রচনাও স্থান পাইয়াছে। দ্বিজ মাধব ইহাদিগকে 'বিষ্ণুপাদ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবত দ্বিজ মাধবই এই রীতির প্রবর্তক। ইহা দ্বারা সে-যুগের মঙ্গলকাব্যের উপর বৈষ্ণব প্রভাব যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনই আখ্যানমূলক কাব্যরচনার অন্তরালেও মঙ্গলকাব্যের কবিদিগের যে গীতি-প্রাণতার ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাও অনুভব করিতে পারা যায়। তবে সকল বিষ্ণুপদই যে মঙ্গলকাব্যের কবিগণ রচনা করিতেন, তাহা নহে—অনেক সময় সমসাময়িক কালে প্রচলিত কোনও সুপরিচিত বৈষ্ণব পদও এই অঞ্চলের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের বিষ্ণুপদ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অনেক সময় এই সকল বিষ্ণুপদ গায়েন কর্তৃক সংযোজিত হওয়াও অসম্ভব নহে। দ্বিজ মাধবের পুঁথিতে দ্বিজ মাধব, দ্বিজ মাধবানন্দ ইত্যাদি ভণিতাযুক্ত বিষ্ণুপদ ব্যতীত দ্বিজ লক্ষ্মীনাথ, দ্বিজ রামদেব, দ্বিজ পার্বতী, রায় অনন্ত ও অনন্ত দাসের ভণিতাযুক্ত বিষ্ণুপদও পাওয়া যায়। তাঁহার একটি বিষ্ণুপদে কবীরের একটি দোঁহার বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায়। তবে এই অনুবাদটি কে কবিয়াছেন, তাহা জানিতে পারা যায় না। দ্বিজ মাধবের পুঁথির অনেক বিষ্ণুপদে কাহারও ভণিতা পাওয়া যায় না—এগুলি যে কাহার রচনা, তাহাও বুঝিবার উপায় নাই। দ্বিজ মাধবের পুঁথিতে ব্যবহৃত বিষ্ণুপদগুলি মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীর কতকগুলি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কোনও বৈষ্ণব-পদ-সংগ্রহে দ্বিজ মাধবের বিষ্ণুপদগুলি স্থান লাভ করিতে পারে নাই। মনে হয়, বৈষ্ণব বিষয়ক পদ হওয়া সত্ত্বেও ইহারা 'মহাজন' কর্তৃক রচিত নহে বলিয়াই বৈষ্ণব-পদ-সংগ্রহে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। এই দ্বিজ মাধব যদি পরাশর-পুত্র রাঢ়ীয় গোস্বামী শ্রেণীভুক্ত কিংবা চৈতন্যপার্ষদ বৈদিক শ্রেণীভুক্ত মাধবাচার্য হইতেন, তবে এই পদগুলি নিঃসন্দেহে বৈষ্ণব-পদ-সংকলনে স্থান লাভ করিত। পদগুলি মাধবের বৈষ্ণবদীক্ষার পূর্ববর্তী রচনা।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী বর্ণনা-প্রসঙ্গে যখন কৃষ্ণলীলার অনুরূপ কোনও প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইত, তখনই সেইখানে একটি অনুরূপ বিষয়ক বিষ্ণুপদ রচিত হইত। বিষ্ণুপদ রচনায় দ্বিজ মাধব ভাষায় ও ভাবে সর্বতোভাবে বৈষ্ণব পদাবলীকেই আদর্শরূপে

গ্রহণ করিয়াছিলেন। খুল্লনার বাসরে গমন বর্ণনার ভূমিকারূপে এই বিষ্ণুপদটি রচিত হইয়াছে—

কহ কহ কলাবতী কাহারে পয়ান।
ও রূপ বাজস যেন পঞ্চবাণ।।
রূপে জামগ গোরিয় গাতে।
অঙ্গের সৌরভ গগনে সুজাতে।।
নাসা নিরমল-কনক বেশরী।
অঞ্জনে রঞ্জিত খঞ্জন-যুড়ি।।
ভুরুর ভঙ্গিমা চাহনি ছান্দে।
ধনু-শর পেলাইয়া মদন কান্দে।।
হাসে আধ আধ মধুর বোল।
গাহে মাধব কেশ খসি পড়ে ফুল।।

দ্বিজ মাধবের এই প্রকার বিষ্ণুপদ ব্যবহারের রীতি চট্টগ্রাম অঞ্চলের তাঁহার পরবর্তী কবিগণও অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু রাঢ় কিংবা বারেন্দ্র ভূমির চণ্ডীমঙ্গলের কবিদিগের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত হইতে পারে নাই।

কেহ কেহ মনে করেন, মুকুন্দরামের পূর্বে বলরাম কবিকঙ্কণ নামক একজন কবি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন—মেদিনীপুর অঞ্চলে তাঁহার কাব্য প্রচলিত ছিল।[১] কিন্তু এই বিশ্বাসের যে কোন ভিত্তি নাই, তাহাও বহু পূর্বেই দেখান হইয়াছে।[২] কবিকঙ্কণ উপাধিকারী প্রত্যেক কবিই মুকুন্দরামের অনুকরণেই এই উপাধি ধারণ করিয়াছেন, মুকুন্দরামের প্রচার হইতেই এই উপাধিটিরও এত প্রচার হইয়াছিল যে অসমীয়া ভাষায়ও একজন কবি কবিকঙ্কণ ভণিতায় কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।[৩]

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।[৪] তিনি তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তাঁহার গ্রন্থোৎপত্তির যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, নানা দিক দিয়াই তাহা

১। দীনেশচন্দ্র সেন, ৩৫৯; বিশ্বকোষ ১২, ৬৭৭, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ৯০৫

২। সা-প-প, ৩, ১০৮-১০

৩। P. Goswami, 'Assamese Phakars and Riddles', The Journal of the Assam Research Society, XII (1942), 13.

৪। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ চণ্ডী (কলিকাতা, বঙ্গবাসী, ১৩৩২)

অত্যন্ত মূলবান। সেইজন্য তাহা আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিতেছি,—

শুন ভাই সভাজন, কবিত্বের বিবরণ,
এই গীত হৈল যেন মতে।
উরিয়া মায়ের বেশে কবির শিয়র দেশে
চণ্ডিকা বসিল[১] আচম্বিতে।।
সহর সেলিমাবাজ তাহাতে সজ্জন রাজ
নিবসে নেউগি[২] গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি দামিন্যাতে চাষ চষি,
নিবাস পুরুষ ছয় সাত।।
ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণু পদাম্বুজ-ভৃঙ্গ[৩]
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ।[৪]
সে[৫] মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিফ।।
উজির হৈল রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে হল্য অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া[৬] পনর[৭] কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি।।
কায়েস্থ[৮] হইল কাল খিলভূমি লেখে লাল,
বিনি উপকারে খায় ধুতি
পোতদার হইল যম টাকায় আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয়[৯] তঙ্কে[১০] প্রতি।।
ডিহিদার অবোধ খোজ কড়ি দিলে নাহি রোজ[১১]

১। উরিলা—স-পু (স্বামী সত্যানন্দের পুঁথি)
২। নিবাস নেউগি—ঐ
৩। কৃষ্ণপদে মধুভৃঙ্গ—ঐ
৪। সমীপ—ঐ
৫। রাজা—স-পু
৬। কোনাকুনি দিয়া দড়া—ঐ
৭। পন্দর—ঐ
৮। স-পু, সরকার—বঙ্গবাসী সং
৯। খায়—স-পু
১০। দিন—বঙ্গবাসী সং
১১। কাঁটা দিলে নেয় বোড়—স-পু

ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে।

প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে[১] হইয়া বন্দী

হেতু কিছু নাহি[২] পরিত্রাণে।।

পেয়াদা সবার কাছে,[৩] প্রজারা পালায় পাছে

দুয়ার[৪] চাপিয়া দেয় থানা।

প্রজা হৈল[৫] ব্যাকুলি,[৬] বেচে ঘরের কুড়ালি[৭]

টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা।।

সহায় শ্রীমন্ত খাঁ, চণ্ডীবাটী যার গাঁ

যুক্তি কৈলা মুনিব খাঁর[৮] সনে।

দামুন্যা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রমানাথ[৯] ভাই

পথে চণ্ডী দিলা দরশনে।।

ধনজন যতস্থিত[১০] রূপ রায় নিল[১১] বিত্ত

যদু কুণ্ডু তিলি কৈল রক্ষা।

দিয়া আপনার ঘর, নিবারণ কৈল ডর

দিবস তিনের[১২] দিল ভিক্ষা।।

বহিয়া গোড়াই নদী সদাই স্মরিয়ে বিধি

তেউট্যায় হইলু উপনীত।

দারুকেশ্বর তরি পাইল বাতন-গিরি

গঙ্গাদাস বড় কৈলা হিত।।

নারায়ণ পরাশর[১৩] এড়াইল[১৪] দামোদর

উপনীত কুচট্যা[১৫] নগরে।

১। প্রকারে—ঐ;
২। তার হেতু চিন্তে—ঐ
৩। জানদার (?) প্রতি নাহে—ঐ;
৪। দ্বার—ঐ
৫। হৈয়া—ঐ;
৬। ব্যোয়াকুলি—ঐ
৭। ঘর প্রতি কুলি—ঐ
৮। গম্ভীর খাঁয়ের সনে—ঐ
৯। রামানন্দ—ঐ.
১০। ভেটনায় উপনীত (বঙ্গবাসী)
১১। বেচিয়া—ঐ;
১২। তিন দিবসের—ঐ
১৩। নৌকা বাহিয়া—স.পু.
১৪। পার হৈলা—ঐ
১৫। কেচট্যা—ঐ

তৈল বিনে কৈলুঁ স্নান করিলুঁ উদক পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে।।
আসন পুষ্করিণি[১] আড়া নৈবেদ্য শালুক পোড়া[২]
পূজা কৈলুঁ কুমুদ-প্রসূনে।[৩]
ক্ষুধা-ভয়-পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই খানে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।।
হাতে লইয়া পত্রমসী আপনি কলমে বসি
নানা ছন্দে লিখেন কবিত্ব।
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা সেই মন্ত্র করি শিক্ষা
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য।।
দেবী চণ্ডী মহামায়া[৪] দিলেন চরণ ছায়া[৫]
আজ্ঞা দিলা রচিতে সঙ্গীত।
চণ্ডীর[৬] আদেশ পাই শিলাই বাহিয়া[৭] যাই
আড়বায় হইলুঁ উপনীত।।
আড়রা[৮] ব্রাহ্মণ-ভূমি ব্রাহ্মণ যাহার[৯] স্বামী
নরপাত ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ব[১০] বাণী সম্ভাষিল নৃপমণি,
পাঁচ আড়া মাপি দিলা ধান[১১]।।
সুধন্য[১২] বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল[১৩] সকল দায়
সুত পাশে[১৪] কৈল নিয়োজিত।

১। আশ্রম পুষ্করি—বঙ্গবাসী সং
২। ডাঁড়া—স-পু:
৩। কুমুদের দলে—ঐ
৪। চণ্ডী মোরে কৈল দয়া—ঐ
৫। দিল পাদপদ্ম ছায়া—ঐ;
৬। তাহার—ঐ
৭। তরিয়া—ঐ;
৮। আড়রার—ঐ
৯। পুরুষে পুরুষে—ঐ
১০। রচিয়া কবিত্বে—ঐ
১১। 'রাজা দিল দশ আড়াধান'—ঐ
১২। ধন্য—ঐ
১৩। হরিল,
১৪। শিশু পাছে—বঙ্গবাসী সং

তার সুত রঘুনাথ[১] রাজগুণে অবদাত[২]
গুরু করি করিল পূজিত।।
সঙ্গে দামোদর[৩] নন্দী যে জানে স্বরূপ[৪] সন্ধি
অনুদিন করিত যতন।
নিজে দেন অনুমতি রঘুনাথ নরপতি
গায়েনেরে দিলেন ভূষণ।।[৫]
বীর মাধবের[৬] সুত রূপেগুণে অদভুত
বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান্।
তার সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
শ্রীকবিকঙ্কণে রস গান।।

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত দামুন্যা গ্রামে কবির পৈতৃক বাসস্থান ছিল। ডিহিদার মাহ্‌মুদ সরিপের অত্যাচারে তিনি সাত পুরুষের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আড়রা গ্রামের পালধি বংশজাত ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে গমন করেন। বিদ্যোৎসাহী রাজা বাঁকুড়া রায় কবিকে নিজের পুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার জীবিকার সংস্থান করিয়া দেন। বাঁকুড়া রায় অল্পকাল মধ্যেই দেহত্যাগ করেন, অতঃপর তাঁহার পুত্র রঘুনাথ রাজা হন। রঘুনাথেরই সভাসদরূপে বাসকালীন তাঁহারই অভিলাষে মুকুন্দরাম তাঁহার প্রসিদ্ধ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তিনি বলিয়াছেন,—

রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত, রসিক মাঝে সুজান।
তাঁর সভাসদ, রচি চারুপদ, শ্রীকবিকঙ্কণ গান।।

বর্তমান সময়ে রাজা রঘুনাথের বংশধরগণ আড়রা গ্রামের চারি মাইল দূরবর্তী সেনাপতি নামক গ্রামে অত্যন্ত দীন অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন; তাঁহাদের জমিদারীর সর্বস্ব বর্ধমানরাজের জমিদারিভুক্ত হইয়াছিল। তাঁহারা বর্তমানে রঘুনাথ রায় হইতে অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ।

মুকুন্দরামের বংশধরগণ বর্তমানে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়না থানায় ছোট বৈনান

১। তিঁহো অতি গুণবান—ন-পু;
২। রাজকুলে উপদান—ঐ
৩। ডামানি—ঐ,
৪। সর্পের
৫। গায়েনে দিলেন বিভূষণ—স-পু
৬। দোবর—ঐ

গ্রামে বাস করিতেছেন বলিয়া জানা যায়। কেহ বলেন, মুকুন্দরামের বংশধরগণ বর্তমানে তিন স্থানে বসবাস করিতেছেন,—কবির পৈতৃক বাসস্থান দামুন্যায়, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহে ও হুগলী জেলার অন্তঃপাতী বাধাবল্লভপুরে। তাঁহারাও বর্তমানে কবিকঙ্কণ হইতে অধস্তন দ্বাদশ কিংবা ত্রয়োদশ পুরুষ।

মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্য-মধ্যে নিজের পরিচয় সম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন,

মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।।

তাঁহার পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, পিতা হৃদয় মিশ্র, জ্যেষ্ঠ সহোদর কবিচন্দ্র; সম্ভবত কবিচন্দ্র উপাধি, নাম নহে। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে কবিচন্দ্র উপাধি-বিশিষ্ট বহু কবির সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, ইহাদের মধ্যে মুকুন্দরামের অগ্রজ যে কে, তাহা নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা যায় না। কবি তাঁহার পরিচয়-প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করিয়াছেন,

কয়্যরি কুলেতে জাত মহামিশ্র জগন্নাথ
একভাবে পূজিল গোপাল।
কবিত্ব মাগিয়া বর মন্ত্র জপি দশাক্ষর
মীন মাংস ছাড়ি বহুকাল।।

কবির পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, কয়ারি গাঞি। দেখা যাইতেছে যে, তিনি কবিত্ব-বর লাভ করিবার জন্য সাত্ত্বিক বৈষ্ণবাচারে দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রে উপাসনা করিয়াছিলেন। কবির পিতা হৃদয় মিশ্রকেও কবি গুণিরাজ মিশ্র বলিয়া ভণিতায় উল্লেখ করিয়াছেন; মনে হয়, গুণিরাজ হৃদয় মিশ্রের উপাধি ছিল। কবি তাঁহার কাব্যমধ্যে পুত্র, পুত্রবধূ ও কন্যা-জামাতার জন্যও চণ্ডীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন,

উর মা কবির কামে কৃপা কর শিবরামে
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে।

তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম শিবরাম, কন্যার নাম যশোদা, পুত্রবধূর নাম চিত্রলেখা ও জামাতার নাম মহেশ। গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে গ্রন্থের মধ্যে যে সমস্ত নির্দেশ রহিয়াছে, তাহা হইতে এই বিষয়ে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইবার উপায় নাই। তবে আনুমানিক একটা সময় সম্বন্ধে ধারণা করিয়া লইতে বেগ পাইতে হয় না।

মুকুন্দরামের কাব্যের কোনও কোনও মুদ্রিত পুঁথির শেষভাগে এই দুইটি পদ দেখিতে

পাওয়া যায়,—

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা।।

কোনও হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিতেই এই পদ দুইটি পাওয়া যায় না। ইহা হইতে গ্রন্থ রচনার একটা সময়ের নির্দেশ পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু কতকগুলি কারণে এই পদটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধেই সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাহা ক্রমে উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমত এই পদ দুইটি বিশ্লেষণ করিলে ইহাদের এই অর্থ হয় যে, ১৪৯৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হয়। কিন্তু পূর্বোদ্ধৃত কবির আত্মবিবরণীতে কবি রাজা মানসিংহকে গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলার ইতিহাস হইতে নিশ্চিতভাবে জানিতে পারা যায় যে, মানসিংহ ৪ঠা মে ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলার সুবাদার বা শাসনকর্তা ছিলেন।[১] অতএব ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ-রচনা সম্পন্ন করিয়া মুকুন্দরাম মানসিংহের উল্লেখ করিতে পারেন না। শুধু তাহাই নহে, মানসিংহকে গৌড়, বঙ্গ ও উৎকল বা উড়িষ্যার অধিপ বলা হইয়াছে। জানিতে পারা যায় যে, ওসমান্ মোগলের হস্ত হইতে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা পুনরধিকার করিয়া লন।[২] অতএব ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোনও সময়ে এই কাব্য-রচনা সম্পন্ন হইয়াছে বলিতে হয়।

অনেকে মনে করেন, 'ঐ ১৪৯৯ গ্রন্থের আরম্ভ কালের শক,—সমাপ্তি-কালের শক নহে। ঐ শকে তিনি আড়রা নগরে অবস্থানপূর্বক চণ্ডী রচনার আরম্ভ করিয়া ১২।১৪ বৎসর পরে অর্থাৎ যখন মানসিংহের আধিপত্য দেশমধ্যে সুবিদিত হইয়াছিল, তৎকালে রচনার শেষ করিয়া থাকিবেন এবং এখনকার গ্রন্থকারেরা যেরূপ রচনা সমাপ্তি করিয়া শেষে ভূমিকা লিখিয়া থাকেন, বোধ হয় তিনিও সেইরূপ গ্রন্থ রচনা সমাপনের পর পরিশেষে "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ" শীর্ষক সূচনাভাগটি লিখিয়া গ্রন্থের প্রথমভাগে যোজনা করিয়া দিয়াছেন।'[৩]

কিন্তু যে স্থলে সাধারণত গ্রন্থ রচনার উপরি-উদ্ধৃত সময়-নিরূপক পদ দুইটি পাওয়া যায়, সেই স্থলটি পূর্বাপর একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, তাহা মুকুন্দরামের রচনা নহে; স্থানটি একটু বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে,—

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা।।

১। H. B. II: 211-15, কাহারও হিসাবে ৫ই মে হইতে, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, 'মতাপাদিত্যের কথা', ভারতবর্ষ, ফাল্গুন (১৯০৩), ৩৫৯-৬০

২। ঐ ৩৬০; ৩। রামগতি ন্যায়রত্ন ৯০; দীনেশচন্দ্র সেন ৩৬৬

অভয়া-মঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ।
আসোর সহিত মাতা হইবে সানন্দ।।
কলি কালে চণ্ডিকার হইল প্রকাশ।
যার যেবা মনোরথ পূরে তার আশ।।
ব্রাহ্মণ শুনিলে ধর্মশাস্ত্রের ভাজন।
যুদ্ধেতে পারগ যে শুনিবে ক্ষত্রিগণ।।

ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এই অংশ প্রকৃতপক্ষে চণ্ডীমঙ্গলের শ্রবণমাহাত্ম্য। এই শ্রেণীর মাহাত্ম্য কীর্তন সাধারণত পুস্তকের শেষ ভাগে গায়েন কর্তৃক সংযোজিত হইয়া থাকে। বিশেষত উদ্ধৃত পদভাগের ভাষা দেখিয়াও মনে হয়, ইহা স্বতন্ত্র হস্তের রচনা, মুকুন্দরামের মত নিপুণ কবির রচনা নহে,—ইহা মুকুন্দরামের সুপরিচিত রচনাশৈলীরও অনুগামী নহে। পরবর্তী কালে কোনও গায়েন হয়ত সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া একটা সময়জ্ঞাপক পদ রচনাপূর্বক এই গ্রন্থের শেষ ভাগে জুড়িয়া দিয়াছেন। অতএব এই পদটিকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। বিশেষত মুকুন্দরামের মত সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি 'রস' শব্দের অর্থ ছয় ধরিয়া ইহার একটা নিতান্ত ব্যবহারিক অর্থ করিবেন, এমনও মনে হয় না; অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে 'রসে'র সংখ্যা নয়। মুকুন্দরাম তাহা জানিতেন, একস্থানে নিজেই লিখিয়াছেন,—

প্রবেশিলে একাদশে মদন হৃদয়ে বসে
নব রস হয় এক স্থানে।

অন্যত্রও পাওয়া যায়—'যশ অপযশে কাব্য নবরসে আপনি তুমি প্রমাণ'।

অথচ 'রস' অর্থে ছয় ধরিয়া লইলে উপরি-উদ্ধৃত সময়জ্ঞাপক পদ দুইটির কোন সঙ্গত অর্থ হয় না।

এই পদ দুইটির অপ্রামাণিক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাও এই স্থলে উদ্ধৃত করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। তিনি বলিতেছেন, 'এই শ্লোকটি কিরূপে কোথায় পাওয়া যায়, অগ্রে তাহাই বলা কর্তব্য। কলিকাতা বটতলার মুদ্রাকরগণ, এ দেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত হইবার পর হইতে অনেকগুলি বাংলা পুঁথি মুদ্রিত করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা ইংরেজি ১৮২০ অব্দে যে চণ্ডীকাব্য সর্বপ্রথম মুদ্রিত করেন, তাহাতেই এই শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর বটতলার চণ্ডীকাব্যের পুনঃ পুনঃ যে সকল সংস্করণ হইয়া আসিতেছে, তাহা প্রথম সংস্করণেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র, তবে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় চণ্ডীকাব্যের যে একটি সংস্করণ প্রচারিত করেন, তাহার পাঠ অনেকটা নির্ভরযোগ্য বটে, সেরূপ অনেক পুঁথিই আমরা এতদঞ্চলে দেখিয়াছি। তৃতীয় সংস্করণ গ্রন্থখানি বঙ্গবাসীর পূর্বতন স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক যোগেশচন্দ্র বসুজ মহাশয় দ্বারা প্রকাশিত, তাহা দামুন্যা গ্রামের

একখানি পুঁথির আদর্শে মুদ্রিত। আমরা দামুন্যা গ্রামের তিন মাইল দূরে অবস্থিতি করি, এ অঞ্চলের অনেকেরই বাড়িতে হস্তলিখিত চণ্ডী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় পঞ্চাশ ষাট খানি পুঁথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাদের কোন খানিতে বা অক্ষয় বাবুর ও বঙ্গবাসীর মুদ্রিত পুস্তকে আমরা উপরি-উক্ত শ্লোক দেখিতে পাই নাই। অধিকন্তু কবির জন্মভূমি দামুন্যা গ্রামস্থ বর্তমান বংশধরগণের নিকট তাঁহার স্বহস্তলিখিত যে পুঁথিখানি আছে ও কবির আশ্রয়দাতা মেদিনীপুর জিলার আড়রা ব্রাহ্মণ ভূমির নরপতি রঘুনাথ দেবরায়ের বর্তমান বংশধরগণ কবির হস্তলিখিত বিশ্বাসে যে পুঁথিখানি যত্নপূর্বক রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, এতদুভয়ের কোনখানিতেই উক্ত কাব্যের শেষাংশ না থাকায় ঐ শ্লোকের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায় না।'[১]

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল প্রকৃত যেখানে সম্পূর্ণ হইয়াছে অর্থাৎ অষ্টমঙ্গলা যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে কাব্যের রচনাকাল নির্দেশক এইরূপ একটি পদ কোনও কোনও পুঁথিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—

অষ্টমঙ্গলা সায় শ্রীকবিকঙ্কণ গায়
অমর সাগর মুনিবরে।[২]

'অমর' শব্দে চৌদ্দ ধরিয়া লইলে এই পদ হইতে পাওয়া যায় যে, ১৪৭৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দ। অবশ্য ইহাতেও মানসিংহের সময় পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু একই গ্রন্থে দুই জায়গায় দুই প্রকার সময় নির্দেশ দেখিয়া উভয় পদেরই প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। অতএব ইহা হইতেও পুস্তক রচনার কোনও নির্দিষ্ট সময়ের সন্ধান পাওয়া যায় না।

এখন একমাত্র আনুমানিক কালের উপর নির্ভর করা ব্যতীত উপায় নাই। কবির প্রতিপালক রাজা রঘুনাথ দেবের রাজত্বকাল ১৪৯৫ শকাব্দ হইতে ১৫২৫ শকাব্দ বা ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।[৩] অবশ্য এই অনুমান সত্য হইলে মানসিংহের সময়েই কবির কাব্য-রচনার কাল নিরূপিত হয়; তবে ইহাতে কোন নির্দিষ্ট সময়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই অনুমান সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়াও কিছু বলিবার প্রমাণাভাব রহিয়াছে; অতএব ইহার উপর নির্ভর করাও সমীচীন নহে। যে কুলপঞ্জী অনুসারে এই সময় নিরূপণ করা হইয়া থাকে তাহা নির্ভরযোগ্য নহে বলিয়াই কেহ কেহ মনে করেন।[৪]

কবির পুত্র শিবরাম বাংলার তদানীন্তন সুবাদার কুতুব খাঁর নিকট হইতে এক জায়গীরের সনন্দ প্রাপ্ত হ'ন। এই সনন্দের তারিখ ১৫২৮ শক অথবা ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ। তখন মুকুন্দরাম

১। সা-প-প ১৩, ১১৫;
২। মুকুন্দরাম, ৩০৪
৩। দীনেশচন্দ্র সেন, ৩৮০
৪। *J. D.L.* Vol. XVI (1927), 22 f.n.

নিশ্চিতই জীবিত ছিলেন না। ইহা হইতে অনুমান করা ভুল হইবে না যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি বৃদ্ধ বয়সেই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তিনি গ্রন্থমধ্যে তাঁহার জামাতা পুত্রবধূ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন; লহনার ঔষধ-প্রকরণ দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, 'বুঢ়ারে না করে গুণ মোহন ঔষধ।' অতএব মনে হয়, মানসিংহ বাংলার শাসনভার গ্রহণ করার অব্যবহিত পরে, কিংবা অন্তত সমসাময়িক কালে তাঁহার কাব্য রচিত হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার ৬০ বৎসর বয়স হইয়া থাকিলেও তিনি অন্তত ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এমন একটা আনুমানিক সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছান যাইতে পারে।

কবির জন্ম ও রচনাকাল সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কিছু অনুমান করিয়াছেন। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুমান, মুকুন্দরাম ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[১] স্বর্গত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন, '১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভূমিষ্ঠ হন'।[২] স্বর্গত রাজনারায়ণ বসু মনে করেন, ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্যের রচনা আরম্ভ করেন, ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ করেন। স্বর্গত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ১৫৯৪ কিংবা ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যরচনা শেষ করেন।[৩] এই মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়; কারণ ইহা মানসিংহের সমকালীন।

আবার কেহ মনে করিয়াছেন, '১. মুকুন্দরাম বিধর্মী শাসকের অত্যাচারে বিতাড়িত হন নাই। কিন্তু কেন্দ্র হইতে নির্দিষ্ট সামগ্রিক পরিবর্তনমূলক নূতন ভূমি ও শাসন ব্যবস্থায় নানা অসুবিধা অনুভূত হওয়ায় গোপনে পলাইয়াছিলেন। ২. তিনি যে আড়রা গেলেন, তার কারণ, উহাই সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থান যেখানে পুরাতন মুদ্রামান বজায় ছিল এবং পুরাতন জমিদারির অধিকারের আশ্রয়ে সাময়িক নিশ্চিন্ততা বর্তমান ছিল; ৩. তাঁহাকে দুর্বিপাক ভোগ করিতে হইয়াছিল ঠিকই, কিন্তু তাহা বেশি দিনের জন্য নহে, পথযাত্রার কষ্ট ১০।১২ দিনের হইতে পারে। ৪. তাঁহার চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের রচনায় হস্তক্ষেপ ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কখনও হইতে পারে না।'[৪] ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র চতুর্থ দাবীটি নির্ভরযোগ্য। দরিদ্র মুকুন্দরামকে নূতন মুদ্রামান ও ভূমি-ব্যবস্থায় বিচলিত করিতে পারে নাই।

মুকুন্দরামের জীবন সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। কেহ মনে করেন, শিবরাম ব্যতীত মুকুন্দরামের আর এক পুত্র ছিল এবং গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণে 'শিশু কান্দে ওদনের তরে' এই পদে শিবরামের কনিষ্ঠকেই মনে করা হইয়াছে।[৫] তাহা হইলে কাব্যমধ্যে

১। দীনেশচন্দ্র সেন, ৩৬৭
২। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, 'বঙ্গভাষার লেখক' (বঙ্গবাসী), ১৪৯
৩। *J. D.L.* Vol. XVI (1927), 22
৪। ক্ষুদিরাম দাস, 'মুকুন্দরামের গ্রাম ত্যাগ ও কাব্য রচনা প্রসঙ্গ।' বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৭৫।
৫। সা-প-প, ১২, ১১০

এই পুত্রেরও উল্লেখ থাকিবার কথা ছিল, বিশেষত যে ব্যক্তি জামাতা ও পুত্রবধূর উল্লেখ করিতেছেন, তাঁহার নিজের শিশুপুত্র না থাকাই সম্ভব মনে হয়, এই শিশু শিবরামের পুত্র ও কবির পৌত্র। কোন পুঁথিতে কবির পৌত্রেরও এই প্রকার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে,— 'শিবরাম বংশধর, কৃপা কর মহেশ্বর, রক্ষ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ান।'[১]

লহনা ও খুল্লনার কলহ বর্ণনা-প্রসঙ্গে একস্থলে কবি বলিয়াছেন, 'এক জন সহিলে কোন্দল হয় দূর। বিশেষিয়া জানেন চক্রবর্তী ঠাকুর।।" ইহাতে মনে হয়, তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল। লহনা-খুল্লনার জীবনবর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি নিজের গার্হস্থ্য জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেও সাহায্য পাইয়াছিলেন।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের ধর্মমত সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। 'চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী' প্রণেতা স্বর্গত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমত এই যে, তিনি বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন।[২] অধ্যাপক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহার প্রতিবাদ করিয়া বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, 'Kavikankan Mukundaram Chakrabarti was neither a Vaisnava, nor a Sakta, nor a Saiva, nor a Ganapata; but he was everything. In other words, he was a believer in all the deities of the Smarta cult.'[৩] মুকুন্দরামের কাব্যে সমস্ত দেবতার সম্বন্ধেই সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখিতে পাইয়া ইহাই সত্য বলিয়া মনে হয় যে, তিনি পঞ্চোপাসক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। পঞ্চোপাসক অর্থে পাঁচটি প্রধান দেবতার উপাসক। এই পাঁচ দেবতা কাহারও মতে 'সূর্যো বহ্নিঃ শিবো দুর্গা ততো বিষ্ণুশ্চ পঞ্চমঃ', আবার কাহারও মতে 'গণেশঃ সবিতা বিষ্ণুঃ শিবো দুর্গা ইতি ক্রমাৎ'। তবে কবির ভণিতা হইতে জানিতে পারা যায়, তাঁহার পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র বহুকাল মীন-মাংস পরিত্যাগ করিয়া গোপালমন্ত্রে উপাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কৌলিক ধর্ম পরিত্যক্ত নাও হইতে পারে। বস্তুত সেকালের গোঁড়া বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চণ্ডীর মাহাত্ম্য রচনা করিবার মত উদারতা ছিল না। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' হইতে এই বিষয় আরও বিস্তৃত ভাবে জানিতে পারা যায়।

মূলত মাণিক দত্তের চণ্ডীকে অবলম্বন করিয়াই মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্য-রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও মাণিক দত্তের ঋণ এই বিষয়ে স্বীকার করিয়াছেন। ইতিপূর্বে মঙ্গলকাব্য রচনার বিশিষ্ট একটি রীতি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল; সেইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যদিও রাজা রঘুনাথের আদেশেই কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি গতানুগতিকতা অনুসারে তাঁহার কাব্য-রচনার মূলে অতিপ্রাকৃত দেবতার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে, কাব্যের বহিরঙ্গ গঠনের মধ্যে তাঁহার মৌলিক কোন কৃতিত্ব নাই। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণাদি হইতে অশেষ বস্তু আহরণ করিয়া

১। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯১০

২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সং, পৃঃ ২৪

৩। I. H. Q., (1928), 482

তাঁহার কাব্যকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তিনি নিজেও লিখিয়াছেন,

গুণিরাজমিশ্র-সুত সঙ্গীত কলায় রত
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
দামুন্যা নগরবাসী সঙ্গীত অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।।

তাহার জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতা এবং এই শ্রমলব্ধ পাণ্ডিত্যই তাঁহার কাব্যকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

মুকুন্দরামের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির গুণে পৌরাণিক প্রভাব দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়াও লৌকিক চণ্ডীর কাহিনীটি বাংলার বিশিষ্ট জাতীয় একটি জীবনবাণী প্রচার করিয়াছে। প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্যকে তাঁহার কাব্যে তিনি নিজের স্বকীয় উপলব্ধি দ্বারা অনুভব করিয়া লইয়াছিলেন। আভিজাত্যের গৌরবহীন সাধারণ বাঙ্গালী জীবন হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া যে সাহিত্যিক চরিত্রসৃষ্টি সে যুগেও সম্ভব হইত, মুকুন্দরামের রচনা পাঠ করিলে তাহাই জানিতে পারা যায়। তাঁহার পরিকল্পিত কালকেতু-ফুল্লরা তাহারই প্রমাণ। প্রাচীন সাহিত্যে দেবদেবী কিংবা অভিজাত চরিত্রই কাব্যের নায়ক-নায়িকার স্থান গ্রহণ করিত; কারণ, সমগ্রভাবে সমাজের দৃষ্টি তাঁহাদেরই উপর ন্যস্ত থাকিত। কিন্তু মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যের এই দুইটি নায়ক-নায়িকাকে সর্বপ্রকার আভিজাত্য হইতে দূরে রাখিয়াও ইহাদের মধ্যে যে অপূর্ব মানবিক গৌরব দান করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পরম বিস্ময়।

মুকুন্দরাম তাঁহার ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাকে কাব্যের অঙ্গীভূত করিয়া ইহাকে এক অপূর্ব রসরূপ দিয়াছেন। এই হিসাবে মুকুন্দরামের কাব্য তাঁহার নিজস্ব জীবনালেখ্য। তাঁহার এই কাব্যের মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনার ইতিহাস ব্যক্ত হইয়াছে, সেইজন্যই ইহা আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। অত্যাচারী ডিহিদার মাহ্মুদ সরিপ কর্তৃক তিনি নিজের জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন; অতএব গৃহ হইতে নির্বাসনের যে কি দুঃখ, তাহা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। সেইজন্যই গুজরাট নগর-পত্তন উপলক্ষে তাঁহার কালকেতু গৃহহীন বুলান মণ্ডলকে বলিতেছে—

শুন ভাই বুলান মণ্ডল।
আইস আমার পুর সন্তাপ করিব দূর
কানে দিব সোনার কুণ্ডল।।
আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ
তিন সন বহি দিও কর।।
হাল পিছে এক তঙ্কা কারে না করিহ শঙ্কা

পাট্টায় নিশান মোর ধর।।
খন্দে নাহি নিব বাড়ি, রহে বসে দিও কড়ি
ডিহীদার নাহি দিব দেশে।
সেলামী বাঁশগাড়ী নানাভাবে যত কড়ি
না লইব গুজরাট বাসে।।

মানবচরিত্র সম্পর্কে মুকুন্দরামের যে সুগভীর ও সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাহা অভিনব। এইজন্যই তাঁহার কাব্যের মধ্যে সুপরিণত চরিত্রসৃষ্টি সার্থক হইয়াছে। মুকুন্দরামের ফুল্লরা, মুরারি শীল ও ভাঁড়ু দত্ত তাঁহার এই জটিল মানবচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার ফল। মুকুন্দরাম গৃহধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া গার্হস্থ্য জীবনের অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সকল দিক হইতে লক্ষ করিয়াছিলেন এবং তাহার দায়িত্ব সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন ছিলেন; তাঁহার কাব্যে তাঁহার নিজস্ব ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতারও পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণভাবে বিচার করিতে গেলে মুকুন্দরামকে কবি হিসাবে বস্তুতান্ত্রিক বলিয়া মনে হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে একটি কথা কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারা যায় না যে, তিনি সম্পূর্ণ আত্মনির্লিপ্ত হইয়া বাস্তব জীবন ও জগৎকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। অথচ বস্তুতান্ত্রিকতার ইহাই বিশিষ্ট লক্ষণ। মুকুন্দরাম বাস্তব জীবনকে রূপায়িত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু যে জীবন তাঁহার নিজস্ব অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাহার সুখ দুঃখ তিনি ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করিয়া নিজে হাসিয়াছেন কাঁদিয়াছেন, তাহাই তাঁহার রচনায় জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত ব্যক্তিগত জীবনও একটি কাব্যের বিষয়। মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক বিষয় বাদ দিলে যে সকল ক্ষেত্রে মুকুন্দরামের চিত্র ও চরিত্রগুলি যথার্থ বাস্তব ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই সকল ক্ষেত্র মুকুন্দরামের নিজস্ব জীবনভিত্তিক রচনা। তাহা হইলে এ'কথা সহজেই মনে হইতে পারে, নিজস্ব জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে তাঁহার বাস্তব জীবনবোধ সীমায়িত। সুতরাং তাঁহার বাস্তবরোধ সম্পূর্ণ আত্মনির্লিপ্ত নহে—বরং কতকটা আত্মভাবপরায়ণ (subjective)। দ্বিজ মাধবের বাস্তববোধের সঙ্গে এইখানেই তাঁহার পার্থক্য। এই দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে মুকুন্দরামকে পুরাপুরি বস্তুতান্ত্রিক বলিতে পারা যায় কিনা, তাহা বিবেচনার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। একান্ত নিজস্ব জীবনের বিশেষ অনুভূতি দ্বারা যিনি বাস্তব জীবনকেই রূপায়িত করিয়াছেন, তাঁহাকে পুরাপুরি রোমাণ্টিকও যেমন বলিতে পারা যায় না, তাঁহাকে পুরাপুরি বস্তুতান্ত্রিকই যে কি ভাবে বলা যাইতে পারে, তাহাও বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। বৃহত্তর জাতীয় কাব্য অপেক্ষা মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনকাব্য হইয়া উঠিয়াছে বলিলে খুব বেশি ভুল করা হয় না। গতানুগতিক বিষয় পরিবেষণের ভিতর দিয়াও আত্মনিবেদনের সুচতুর শিল্প-কৌশল মুকুন্দরামের পূর্ণায়ত্ত ছিল,

তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল তাহারই পরিচয়ে সার্থক।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত কবি বলিতে মাত্র দুইজন,—এক মুকুন্দরাম ও দ্বিতীয় ভারতচন্দ্র। মুকুন্দরাম বাঙ্গালীর ঘরের কবি, ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি। ঘরের মধ্যে জীবনের ভালমন্দ সকল উপকরণই বিশৃঙ্খল হইয়া থাকে, রাজসভায় কেবলমাত্র মনোরম বস্তুগুলিই সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা হয়; ঘরের মধ্যে প্রয়োজনের কাজ, রাজসভায় শোভাবর্ধনের কাজ। ঘরের মধ্যে মনের বিকাশ হইয়া থাকে, রাজসভার মধ্যে ঐশ্বর্যের পরিচয় প্রকাশ পায়। গার্হস্থ্য পরিবেশের মধ্যেই বাঙ্গালী জীবনের যথার্থ পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, রাজসভার মধ্যে তাহার ঐশ্বর্যের দিকটাই ক্ষণে ক্ষণে চোখ ঝল্‌সাইয়া দিয়াছে। একটি অন্তরের জিনিস, অপরটি বাহিরের জিনিস। মুকুন্দরামের দৃষ্টি অর্ন্তমুখী, অন্তরের বিচিত্র সৌন্দর্য উদ্ধার করিয়া লইয়া তাহা দিয়া তিনি কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য রচনা করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র বাহিরের জগৎ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া একটি শব্দের তাজমহল রচনা করিয়াছেন। ইহাকেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'রাজকণ্ঠের মণিমালা—যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনই তাহার কারুকার্য।' ভারতচন্দ্রের রচনা মণিমালা, মুকুন্দরামের রচনা বনমালা—একটি রাজকণ্ঠে শোভা পাইবার যোগ্য, আর একটি ব্রীড়ানতা পল্লীবালার কণ্ঠশোভা। একটি অনুভূতিসাপেক্ষ, আর একটি দৃষ্টিসাপেক্ষ। মুকুন্দরাম প্রাণের ক্ষুধা মিটাইবার কবি, ভারতচন্দ্র দেহের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার কবি,—একজন লোকালয়ের ভক্তিশ্রদ্ধায় আপ্লুত, আর একজন রাজসভার অভিনন্দন লাভ করিয়া গৌরবান্বিত।

কবির ব্যক্তিগত সুখদুঃখ-বেদনা সাহিত্যের মধ্য দিয়া যথার্থ রূপ লাভ করিয়াও তাহা যে সর্বজনীন হইয়া উঠিতে পারে, বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দরামই তাহা সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে মুকুন্দরাম আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদিগের অগ্রদূত; মুকুন্দরামের কাব্য-প্রেরণার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের বীজ নিহিত ছিল। অতএব যাঁহারা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই আধুনিক যুগের সূত্রপাত বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহার এই মৌলিক বনিয়াদটির কথা বিস্মৃত হন। সাহিত্যিক প্রেরণা কোনও জাতির মধ্যে কেবলমাত্র বাহির হইতে আসিয়া জুড়িয়া বসিতে পারে না। জাতির নিজস্ব রসচৈতন্যের মধ্যে যদি তাহার প্রেরণা না থাকে, তবে তাহার মূলে যতই সত্য থাকুক, তাহা বাহির হইতে আসিয়া জাতির সৃষ্টি-প্রেরণার মধ্যে এমন শক্তিসঞ্চার করিতে পারে না। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' রচনার যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব-কবিতা ও মঙ্গলকাব্যের ভিতর দিয়া তাহা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ভাবে আসিয়াছে—উনবিংশ শতাব্দীতে তাহা পাশ্চাত্ত্য আদর্শের সংস্পর্শে আসিয়া এক নূতন রূপ লাভ করিয়াছে মাত্র। যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আনুপূর্বিক ধারাটির সঙ্গে পরিচিত

নহেন, তাঁহারই কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সাহিত্যসাধনাকে এক বিচ্ছিন্ন ও আকস্মিক কীর্তি বিবেচনা করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন।

মুকুন্দরামকে আধুনিক বাংলার বস্তুতান্ত্রিক ঔপন্যাসিকদিগেরও অগ্রদূত বলা যায়। উপন্যাসের প্রধান দাবী চরিত্রসৃষ্টি। মুকুন্দরামের কাব্য এই দাবী কতদূর মিটাইতে পারে, তাঁহার সৃষ্ট কয়েকটি চরিত্র বিচার করিয়া দেখা যাউক। প্রথমই মুরারি শীল চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। এই চরিত্রটি আনুপূর্বিক মুকুন্দরামের নিজস্ব সৃষ্টি। মাধব কিংবা তাঁহার পূর্ববর্তী কোনও কবির রচনাতে ইহা নাই। অতএব ইহার পরিকল্পনার মধ্য দিয়াই মুকুন্দরামের স্বকীয় প্রতিভার সম্যক বিকাশ হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

মুরারি শীল জাতিতে বেণে—সে 'লেখা জোখা করে টাকা কড়ি'। সে বাংলার 'শাইলক'। সরল প্রকৃতির নিরক্ষর ব্যাধসন্তান কালকেতু তাহার নিকট একটি অঙ্গুরী ভাঙ্গাইতে লইয়া গেল। তাহার সঙ্গে মুরারির পরিচয় ছিল, এমন কি সে মাংসের জন্য 'দেড় বুড়ি' কালকেতুর নিকট ধারিত। কালকেতুর আগমনের আভাস পাইবা মাত্র, সে তাহার দেড় বুড়ি ধার শোধ করিতে হইবে এই ভয়ে বাড়ির ভিতরে পলাইয়া গেল। বাণ্যানীটিও যে তাহারই উপযুক্ত পত্নী, এই বিষয়টিও কবির দৃষ্টি এড়ায় নাই; কারণ, ইহা যে এই জাতিরই বৈশিষ্ট্য। সে মিথ্যা করিয়া বলিল,

ঘরেতে নাহিক পোতদার।
প্রভাতে তোমার খুড়া গিয়াছে খাতকপাড়া
কালি দিব মাংসের উধার।।
আজি কালকেতু যাহ ঘর।
কাষ্ঠ আন্য একভার, একত্র শুধিব ধার,
মিষ্ট কিছু আনিহ বদর।।

বাণ্যানীর এই কথাগুলির মধ্যে তাহার দেড় বুড়ি ধার শোধ দিবার আপাতত অনিচ্ছাটিকে যে কি কৌশলে ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইহাতে বুঝিতে কোনই বেগ পাইতে হয় না যে, বাণ্যানী জ্বালানি কাষ্ঠের অভাবের জন্য তাহারই মুখ চাহিয়া বসিয়া ছিল না, কিংবা 'মিষ্ট বদরে'র জন্যও তাহার তেমন কোন ব্যগ্রতা নাই। ইহা শুধু উপস্থিত পাওনাদারকে এড়াইবার একটি চিরাচরিত অভ্যস্ত ও মুখ্য কৌশল। 'একত্র শুধিব ধার' কথাটি এখানে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। যে ব্যক্তি ধারে মাংস খাইয়া, তাহার 'দেড় বুড়ি' মাত্র শোধ দিবার ভয়ে ভিতর বাড়িতে গিয়া আত্মগোপন করে, সে এই দেড় বুড়ি সহ এক ভার কাষ্ঠের ও তৎসহ কিছু মিষ্ট বদরের মূল্য একত্র শোধ করিবে তাহা কল্পনারও অতীত। ইহাও উপস্থিত ধার শোধ করিবার অনিচ্ছার একটি গতানুগতিক উপায় মাত্র। সে নিজে এক ধূর্ত মহাজনের স্ত্রী—অতএব ধার না শোধ করিবার বাচনিক

আঙ্গিকসমূহে সেও সুপরিচিত। কারণ, এই ব্যবহার তাহার মহাজন স্বামীও খাতকের নিকট হইতে নিত্য লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু এই নারীর কথাগুলির মধ্য দিয়া এই পরিবারটির ব্যবসায় ও বৃত্তির একটি যে পরিচয় পাওয়া গেল, তাহা এমন সার্থকতার সঙ্গে আর কি উপায়ে প্রকাশ করা যাইত, তাহা কল্পনাও করিতে পারা যায় না। উচ্চাঙ্গের পর্যবেক্ষণগুণ থাকিলে একমাত্র ভাষা দ্বারাই বিষয়কে যে কত জীবন্ত করিয়া তোলা যায়, ইহাই তাহার প্রমাণ। কালকেতু এ'কথা শুনিয়া বলিল,

শুন গো শুন গো খুড়ি, কার্য কিছু আছে ডেড়ি
অঙ্গুরী ভাঙ্গায়্যা নিব কড়ি।
আমার জোহার খুড়ি, কালি দিহ বাকি কড়ি
যাই অন্য বণিকের বাড়ী।।

কালকেতু যেন মুরারির ছলনাটুকু বুঝিতে পারিয়াছে এবং মুরারি গৃহমধ্যে আছে এই কথা নিশ্চিত জানিয়াই সে তাহাকে শুনাইবার উদ্দেশ্যেই যেন কৌতুক করিয়া মাত্র বলিয়াছে, 'যাই অন্য বণিকের বাড়ী'। কিন্তু যাইবার জন্য তাহার আর ব্যগ্রতা দেখা গেল না। এইখানে মুকুন্দরাম পুরাপুরি রিয়ালিস্ট নহেন, নিজস্ব মনোভাব এই চিত্রটির উপর আরোপ করিয়া ইহাকে একটু আত্মভাবমূলক করিয়া তুলিয়াছেন। 'যাই অন্য বণিকের বাড়ী'—ইহা কালকেতুর কথা নহে, মুকুন্দরামের কথা,—সরলবুদ্ধি ব্যাধসন্তানের পক্ষে ইহা অসম্ভব। যাই হোক, ইহা শুনিয়া,

ধনের পাইয়া বাস আসিতে বীরের পাশ
ধায় বেগে খিড়কীর পথে।
মনে বড় কুতূহলী কান্ধেতে কড়ির থলি
সাপ্‌ড়ি তরাজু লইয়া হাতে।।

এই বর্ণনাটির মধ্যে মুরারি শীলের চিত্রটি যেন জীবন্ত হইয়া চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল;—ন্যুব্জপৃষ্ঠ, কোটরগত ক্ষুদ্র চক্ষুতে কুটিল দৃষ্টি একটি প্রৌঢ় আমাদের কল্পনা-চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এইবার তাহার নিজের কণ্ঠোচ্চারিত ভাষাটি যেন কানে শুনিতে পাইতেছি—

বেণে বলে ভাইপো, এবে নাহি দেখিতো,
এ তোর কেমন ব্যবহার।

নম্রকণ্ঠে একটু মৃদু স্নেহ-তিরস্কার। এইবার কালকেতুর উত্তরটি একান্ত স্বাভাবিক হইয়াছে; এখানে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সে মুরারির পূর্ব ছলনা বুঝিতে পারে নাই, সে তাহার কথা ও আচরণে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে—

খুড়া, প্রভাতে পরিয়া ধড়া   শরাসনে দিয়া চড়া

হাতে শর চারি পর ভ্রমি।

ফুল্লরা পসার করে   সন্ধ্যাবেলা আস্যে ঘরে

এই হেতু নাহি আসি আমি।।

খুড়া, ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী।

হয়্যা মোরে অনুকূল,   উচিত করিবে মূল,

বিপদ সমুদ্রে যেন তরি।।

ধূর্ত মুরারি হাতের মুঠির মধ্যে একটি মূল্যবান অঙ্গুরী পাইয়াছে, অতএব তাহার আচরণ এখন বিশেষভাবেই লক্ষ করিবার মত। মুকুন্দরামের বর্ণনায় এখানে মুরারির যেন একটি চলচ্চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে লোভ ও আনন্দ গোপন করিবার জন্য বাহিরে সংগ্রাম করিতেছে; অঙ্গুরীটির মধ্যে যে কোনও রকম বিশেষত্ব নাই, ইহা যে নিতান্ত একটি সাধারণ জিনিস, তাহার কথা ও আচরণে এই ভাবই প্রকাশ করিতে ব্যগ্র। তারপর অত্যন্ত শান্ত ও সংযত কণ্ঠে মৃদু তিরস্কারের সুরে সে কালকেতুকে বলিল,

সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।

ঘসিয়া মাজিয়া বাপু কর‍্যাছ উজ্জ্বল।।

এই কথা কয়টি যেন ধূর্ত বেণের নিজের কণ্ঠ হইতে শুনিতে পাইলাম। স্থানোপযোগী শব্দের যথার্থ যোজনা দ্বারা যে রসের ব্যঞ্জনা কত উচ্চগ্রামে উঠিতে পারে, ইহা তাহারই প্রমাণ। এখানে যে শব্দ কয়টি প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা বাদ দিয়া অন্য কোন শব্দ দ্বারা এই ভাবটি এমন সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। পর পর শব্দগুলির একটিকেও এখান হইতে তুলিয়া লইয়া গিয়া, তাহা অন্য যে কোন প্রতিশব্দ দ্বারা পূরণ করিলেও চিত্রটির অঙ্গহানি হয়। কথাগুলি একটানা সুরের মত পরস্পর এমন ভাবে মিশিয়া আছে যে, একটি হইতে আর একটিকে বিচ্ছিন্ন করিবার উপায় নাই। ইহার নামই রচনা-শৈলী বা স্টাইল—তাহার কথা পরে বলিব। এই কথাগুলির ভিতর দিয়াই ধূর্ত বণিকের গোপন দুরভিসন্ধির ইঙ্গিতটি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। সে এই বিষয়ে যেন সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ—এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্যই কালকেতুকে এই বিষয়ে মুহূর্ত মাত্র ভাবিবার অবকাশ না দিয়া ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ইহার একটা মূল্য হিসাব করিয়া ফেলিল,—

রতি প্রতি হয় যদি দশ গণ্ডা দর।

দুই ধানের কড়ি তায় পাঁচ গণ্ডা ধর।।

অষ্ট পণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি।

মাংসের পিছিলা ধার ধারি দেড় বুড়ি।।

একুণে হইল অষ্ট পণ আড়াই বুড়ি।
চাল খুদ কিছু লহ কিছু লহ কড়ি।।

কিন্তু কালকেতু জানে যে, ইহা দৈব-প্রদত্ত ধন; অতএব মুরারির কথা সত্য হইতে পারে না। কিংবা এই দৈব ব্যাপার যদি ইহা হইতে সম্পূর্ণ বাদও দেওয়া যায়, তথাপি বুঝিতে পারা যায় যে, হয়ত পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্যই সে বলিল, 'খুড়া, মূল্য নাহি চাই। যে জন দিয়াছে বস্তু দিব তার ঠাঁই।' এইখানে মুকুন্দরামের রোমান্টিক প্রেরণাও কিছু কার্যকরী হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। মুরারি অঙ্গুরীটি হাতছাড়া হইয়া যায় দেখিয়া আরও 'পঞ্চবট' ইহার মূল্য বাড়াইল। তারপর কালকেতুর পিতার সঙ্গে তাহার কি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া কালকেতুর অতিরিক্ত বিষয়বুদ্ধির জন্য মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিল—

ধর্মকেতু দাদা সনে কৈলুঁ লেনাদেনা।
তাহা হৈতে ভাইপো হয়্যাছ সিয়ানা।।

কিন্তু পিতা ধর্মকেতুর সঙ্গে যে অন্যান্য বিষয়ে 'লেনাদেনা' হইলেও কোনও দিন কোন মূল্যবান অঙ্গুরী লইয়া কোন 'লেনাদেনা' হইবার কোন কারণ হয় নাই, তাহা কালকেতুও বুঝিল। সে এই কথায় কর্ণপাত মাত্র করিল না, পিতার নামোল্লেখে মুরারির প্রতি তাহার কোন শ্রদ্ধাবোধও জন্মিল না; সে সহজ ভাবেই বলিল, 'অঙ্গুরী লইয়া আমি যাব অন্য পাড়া।' কালকেতুর এই দৃঢ়তায় মুরারি যেন চমকাইয়া উঠিল, অথচ সে প্রকৃত ব্যবসায়ী, অঙ্গুরীটির মূল্যও সে যথার্থ বুঝে— সেইজন্য সে ইহা হাতছাড়াও করিতে চাহে না। সে তখন সমস্ত মুখ ভরিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, 'এতক্ষণ পরিহাস কৈলুঁ ভাইপোরে'। যেন ভাইপো তাহার কতই না পরিহাসের পাত্র। মনে হয়, এই ধূর্ত বণিক ও তাহার সহধর্মিণীকে যেন চিনি, তাহারা আমার প্রতিবেশী। মুকুন্দরামের কাব্য পাঠ করিয়া আমার পরিচিত প্রতিবেশীদিগের সঙ্গে নূতন করিয়া পরিচয় হইল।

মঙ্গলকাব্যের ধরা-বাঁধা কাহিনীর মধ্যে কবির ব্যক্তি-প্রতিভা বিকাশের অবকাশ খুব বেশি নাই। তথাপি মুকুন্দরাম তাঁহার প্রবল সৃজনী প্রেরণার বশবর্তী হইয়া তাহার মধ্যেও যে দুই একটি অবকাশ নিজ হইতে সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহার মধ্যেই তাঁহার স্বকীয় কবি-প্রতিভার বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। মুরারি শীলের চরিত্রের পরিকল্পনা তাহাদেরই একটি।

এই সম্পর্কে ইহার পরই মুকুন্দরামের ভাঁড়ুদত্তের চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। ইহার পরিকল্পনায় মুকুন্দরাম এমন সূক্ষ্ম মানব-চরিত্র-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, যাহা আধুনিক লেখকগণের মধ্যেও খুব সুলভ নহে। ভাঁড়ুদত্ত নিঃস্ব ও নীচাত্মা, শঠ ও ধূর্ত,—থাকিবার মধ্যে একমাত্র আছে তাহার আত্মাভিমান, তাহার মত লোকের পক্ষে ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। অতএব সে জাত্যভিমানী। সংসারে অভিমান করিবার মত যাহার কিছুই নাই, সেই নিজের

জাতি লইয়া অভিমান করিয়া থাকে। কালকেতু নীচ জাতি এবং নিতান্ত দীন অবস্থা হইতে সে রাজ্য লাভ করিয়াছে—এই বিষয়ে সে সর্বদা সজাগ। কালকেতু ছোট হইতে বড় হইল আর তাহার নিজের দুরবস্থা কিছুতেই ঘুচিল না,—এইজন্য বাহিরে কালকেতুর সঙ্গে সে যে আচরণই করুক, ভিতরে তাহার প্রচ্ছন্ন ঈর্ষার ভাব কিছুতেই গোপন করিতে পারিল না। প্রতি মুহূর্তেই এই বিষয়টি যেন তাহার মনের মধ্যে খোঁচা দিতেছে। কুলে শীলে সে কত মহৎ, এই কথাই বার বার কালকেতুর কানে তুলিয়া সে তাহার নিকট নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। কিন্তু কালকেতু অনার্য ব্যাধ, সে তথাকথিত উচ্চ জাতির মর্যাদা দিতে শিখে নাই; অতএব তাহাকে দিয়া তাহার এই বিষয়ে বিশেষ সুবিধা হইল না। সে কালকেতুর কানের কাছে নিজের বংশমহিমা কীর্তন করিয়া গিয়াছে, কিন্তু কালকেতু তাহাতে স্বভাবতই নির্বিকার রহিয়া গিয়াছে। তারপর প্রজার সঙ্গে কি প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে, এই বিষয়েও যখন সে কালকেতুকে গায়ে পড়িয়া পরামর্শ দিতে লাগিল,

যখন পাকিবে খন্দ পাতিবে বিষম দ্বন্দ্ব
দরিদ্রের ধানে দিবে নাগা।

তখনও তাহার পরামর্শে কালকেতু নির্বিকার।

অতএব বুঝা যায়, ভাঁড়ুকে কালকেতু গোড়া হইতেই চিনিয়া লইয়াছিল। ভাঁড়ুদত্তের আচরণসমূহ এত প্রত্যক্ষ যে তাহাকে চিনিয়া লইতে কাহারও বেগ পাইবার কথা নহে। যখন হাটুরিয়াগণের উপর অত্যাচার করিবার জন্য কালকেতু ভাঁড়ুদত্তকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিল, তখনই ভাঁড়ুর প্রকৃত রূপ প্রকাশ পাইল,—মনের মধ্যে যে ঈর্ষাগ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল, তাহা অনুকূল অবসর পাইয়া দপ করিয়া এইবার বাহিরে জ্বলিয়া উঠিল। সে কালকেতুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার মনের একান্ত গোপন কথাটি এইবার সুস্পষ্ট অথচ সংযত ভাষায় এইভাবে প্রকাশ করিয়া বলিল,

খুড়া, তিন গোটা শর ছিল একখান বাঁশ।
হাটে হাটে ফুল্লরা পসরা দিত মাস।।
দৈববশে যদি আমি ছিলাম কাঙাল।
দেখিয়াছি, খুড়া হে, তোমার ঠাকুরাল।।

এইখানেই ভাঁড়ুদত্তের জ্বালা। কালকেতুর একখানি ধনু ও তিনখানি মাত্র শর সম্বল ছিল; তাহা লইয়া বনে শিকার করিত, তাহার পত্নী ফুল্লরা হাটে হাটে মাংসের পসরা দিত। কালকেতু ভাঁড়ুর মতই দরিদ্র ছিল, কিন্তু দৈববলে সে বড় হইয়া গেল, আর ভাঁড়ু যেমন ছিল তেমনই পড়িয়া রহিল। শুধু তাহাই নহে, কালকেতু আজ বড় হইয়া উঠিয়া তাহাকেই শাসন করিতেছে, ইহা ভাঁড়ু কি করিয়া সহ্য করিবে? রক্তমাংসের মানুষ হইয়া ইহা কেই বা সহ্য করিতে পারে? ভাঁড়ুদত্তের মনের ভাবটি প্রকাশ করিতে মুকুন্দরাম উদ্ধৃত পদগুলির

ভিতর দিয়া কি অপূর্ব রচনাকৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, ভাবিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। রাজসভার মাঝখানে তিরস্কৃত ও অপমানিত ভাঁড়ু, নিজের অবস্থার প্রতিবিধান করিতে অসমর্থ, সংযত কয়েকটি বাক্য দ্বারা কি তীব্রভাবে এখানে কালকেতুকে আক্রমণ করিল! ভাঁড়ুদত্তের শক্তি রসনায়, তাহা এখানে কি তীব্র হইয়া উঠিয়াছে! 'দেখিয়াছি খুড়া হে তোমার ঠাকুরাল'—ব্যঙ্গমিশ্রিত এই বক্রোক্তি কি জ্বালাময়ী! চিত্রটি একান্ত বাস্তব বলিয়াই এখানে এত শক্তিশালী।

এইবার ভাঁড়ুদত্তের অন্য পরিচয় প্রকাশ পাইল—কালকেতুর প্রতি যে মনোভাব এতদিন সে গোপন করিয়া চলিয়াছিল, আজ তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। তাহার সেই জাত্যভিমান ও কালকেতুর প্রতি ঈর্ষা এইবার প্রকাশ্য রূপ লাভ করিল। সে ঘোষণা করিল,

হরিদত্তের বেটা হঙ্ জয় দত্তের নাতি।
হাটে যদি বেচাঙ্ বীরের ঘোড়া হাথি।।
তবে সুশাসিত হবে গুজরাট ধরা।
পুনরপি হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা।।

একটি অপ্রধান চরিত্রও পূর্বাপর কি অপূর্ব সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এখানে পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মুকুন্দরাম ভাঁড়ুদত্তকে একটি আদর্শ চরিত্র হিসাবে কল্পনা করেন নাই। যে মুহূর্তে কবির মনে ভাঁড়ুদত্তের চিত্রটি উদিত হইয়াছিল, সেই মুহূর্তেই তিনি তাহাকে একটি স্বকীয় রক্তমাংসের রূপ দিয়া লইয়াছিলেন; সেইজন্যই ইহার সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠ হই, তাহার বিশিষ্ট রূপটির সঙ্গে পরিচয় ততই নিবিড় হইয়া উঠে,—কেবলমাত্র নাম শুনিয়াই তাহাকে সবটুকু চিনিতে পারি না।

তারপর কলিঙ্গরাজ গুজরাট আক্রমণ করিলেন। বিভীষণরূপী ভাঁড়ুদত্তের এখানে আর এক নূতন পরিচয় প্রকাশ পাইল। সে ফুল্লরাকে চিনিত; কেবলমাত্র চিনিতই না, খুব ভাল করিয়াই চিনিত। যখন ফুল্লরা হাটে হাটে মাংসের পসরা দিত, তখন হইতেই সে তাহাকে চিনিত। অতএব এই চেনায় তাহার ভুল হইতে পারে না। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এইবার সে ফুল্লরার নিকট গিয়া কৌশলে কালকেতুর সন্ধান জানিতে চাহিল। ফুল্লরা বুদ্ধিমতী, কিন্তু নারীবুদ্ধির কতকগুলি নিজস্ব ক্ষেত্র আছে—তাহার বাহিরে নারী শিশুর মত নির্বোধ। ভাঁড়ুদত্তের কৌশলের নিকট ফুল্লরা তেমনই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিল। অতএব ভাঁড়ুদত্তের কৌশল ব্যর্থ হইল না, কালকেতু বন্দী হইল। তারপর কালকেতু যখন দেবীর বরে মুক্তিলাভ করিয়া পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন ভাঁড়ুদত্ত নিজের দোষ গোপন করিয়া আসিয়া তাহার নিকট বলিল,—

খুড়া তুমি হৈলে বন্দী অনুক্ষণ আমি কান্দি,
বহু তোমার নাহি খায় ভাত!

মুকুন্দরামের বর্ণনা-গুণে ভাঁড়ুদত্তের এই কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জনের চিত্রটি যেন চোখের উপর ভাসিতেছে। চরিত্রসৃষ্টির ইহা অপেক্ষা বড় সার্থকতা আর কি হইতে পারে?

এইবার মুকুন্দরামের ফুল্লরা চরিত্রটির সম্বন্ধে কিছু বলিব। মুকুন্দরামের ফুল্লরা সুন্দরী, কিন্তু এই সৌন্দর্য সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রানুমোদিত পদ্মিনী নারীর সৌন্দর্য নহে। কৃষ্ণপ্রস্তরে গঠিত নারীমূর্তির যে সৌন্দর্য, ইহা তাহাই। কোন অলঙ্কারশাস্ত্রে ইহার বর্ণনা পাওয়া যাইবে না—তাহার সম্বন্ধে কোন গতানুগতিক বর্ণনারীতি প্রবর্তিত হয় নাই; অতএব এই বিষয়ে বাঁধাধরা পথে চলিবার কবির কোনও উপায় ছিল না। সেইজন্য এইখানেই মুকুন্দরামের মৌলিকতার স্বাধীন বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ফুল্লরা বন্যা নারী। সঞ্জীবচন্দ্র বলিয়াছেন, 'বন্যেরা বনে সুন্দর'। মুকুন্দরাম এই বন্য পরিবেশের মধ্যেই ফুল্লরাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া তাহার যথার্থ সৌন্দর্যের প্রকাশ হইয়াছে। এইখানেই মুকুন্দরামের প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কবি তাঁহার প্রতিবেশী অনার্য জীবনকে গভীর মমতার সহিত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার সমগ্র রস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই নারী-চরিত্রটি এখানে চিত্রিত করিয়াছেন। তবে কবির নিজস্ব শুচি দৃষ্টি এই অনার্য নারীকে স্পর্শ করে নাই এমন নহে। ইহার নিজস্ব পরিবেশের মধ্যে ইহাকে তিনি সর্বত্র নিঃসঙ্কোচ ও স্বাধীন গতিবিধির অধিকার দিতে পারেন নাই—এইজন্যই এই চরিত্রটির সকল দিক এত জীবন্ত হইয়া উঠে নাই। ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে নিজের কুটিরের সম্মুখে একাকিনী দেখিয়া যেখানে ফুল্লরা রামায়ণ মহাভারত হইতে পাতিব্রত্যের নজির গাহিতেছে, সেখানে তাহার প্রকৃত পরিচয় কিংবা মুকুন্দরামেরও মৌলিক প্রতিভার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না—অর্থাৎ সেখানে ফুল্লরা ফুল্লরাই নহে, কিংবা সেই ফুল্লরা কবি মুকুন্দরামের সৃষ্টি নহে, সেখানে সমগ্র সমাজনীতি যেন একটি কৃত্রিম যন্ত্রের মুখ দিয়া হিতবাণী প্রচার করিতেছে—এই তথাকথিত ফুল্লরা সমাজের সৃষ্টি, মুকুন্দরামের নহে। মঙ্গলকাব্য রচনা করিতে গিয়া মুকুন্দরামকে কতকগুলি সামাজিক দাবীও মিটাইতে হইয়াছে,—এখানে তাঁহার লেখনী দিয়া ব্যক্ত কতকগুলি সামাজিক দাবীই প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তাহারও মধ্যে কবি মুকুন্দরামের সৃষ্ট ব্যাধ-নারী ফুল্লরা মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। সতিনীর জ্বালায় চণ্ডী স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া যেখানে ফুল্লরা তাঁহাকে বলিতেছে,

> সতিনী কোন্দল করে দ্বিগুণ বলিবে তারে
> অভিমানে ঘর ছাড় কেনি।
> কোপে করি বিষ পান আপনি ত্যজিবে প্রাণ
> সতিনের কিবা হবে হানি।।

এইখানেই ফুল্লরা ফুল্লরা, উপরে এই ফুল্লরার কথাই বলিতেছিলাম। মুকুন্দরামের রচনার মধ্য হইতে কেবলমাত্র সজাগ রসদৃষ্টি দ্বারা ইহাকে চিনিয়া লইতে হইবে। নতুবা মঙ্গলকাব্যের জনতা-চিত্রের মধ্যে তাহার সন্ধান খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

ফুল্লরার বারমাসীটির কথা এখানে উল্লেখ করিব। মঙ্গলকাব্যে বারমাসী দুই প্রকার—সুখের বারমাসী ও দুঃখের বারমাসী। ফুল্লরার বারমাসীটিকে সুস্পষ্টভাবে দুঃখের কিংবা সুখের, কিছুই বলা যায় না। কারণ, সুখেরই হউক, দুঃখেরই হউক, বারমাসী মাত্রেরই ভিতর দিয়া নারী হৃদয়ের অকপট অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু ফুল্লরা যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মাঝখানে দাঁড়াইয়া তাহার এই বার মাসের দুঃখের গান গাহিতেছে, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে কি নিতান্তই অকপটতা ও স্বতঃস্ফূর্তির আশা করা যায়? তাহার এই দুঃখ কি তাহার জীবনে একান্তই সত্য? ফুল্লরার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিলে তাহা কিছুতেই মনে হইতে পারে না। বিশেষত মুকুন্দরাম নিজেই এখানে বলিয়াছেন, 'হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা'; অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ফুল্লরার মনে এক ও মুখে আর। কবি এখানে ফুল্লরার মনে এক অপূর্ব দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার সংসার, তাহার স্বামী,—তাহা যেমনই থাকুক, তাহা একান্ত তাহারই। বারমাসী নায়িকার নিজস্ব মনোদর্পণ—তাহার জীবনের সুখদুঃখের অনুভূতির চিত্রগুলি সেখানে একান্তভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, ইহা তাহার নিভৃত আত্মবিশ্লেষণ মাত্র। ইহার কোন শ্রোতা থাকে না, থাকিলেও সেই শ্রোতা নায়িকার প্রিয়তম ও একান্ত বিশ্বাসভাজন ব্যতীত আর কেহই হইতে পারে না। ইহার মধ্যে শত দুঃখ থাকিলেও নারী কদাচ ইহা অন্যের কাছে এ'ভাবে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। বিশেষত তাহা তাহার প্রণয়-ভাগিনী বলিয়া আশঙ্কিতা তাহারই সমবয়সী ও তাহা হইতে অনেক বেশি সুন্দরী এক যুবতীর নিকট কদাচ খুলিয়া বলিবার নহে। ইহাতে নারীত্বের অপমান আছে। অতএব এখানে সে যাহা বলিতেছে, তাহা তাহার প্রকৃত অবস্থার একটি বিভ্রমোৎপাদনকারী চিত্র ছাড়া আর কিছুই নহে—সেইজন্য ইহা একটানা অতিরঞ্জিত দুঃখের সুরে বাঁধা। এই বর্ণনা দ্বারা সে ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে তাহার পতির প্রতি কোনও আসক্তি পোষণ হইতে নিবৃত্ত করিতে চাহিতেছে। তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে ফুল্লরার পতিপ্রেমই বৃথা। একটি বিষয় এখানে এই সম্পর্কে আরও লক্ষ করিয়া দেখিবার মত আছে যে, ফুল্লরা তাহার দুঃখের জন্য ভগবানকে বার বার অভিসম্পাত দিলেও, এমন কি মৃত্যু কামনা করিলেও, সেইজন্য তাহার স্বামীকে এতটুকুও দায়ী করে নাই। স্বামীর ও স্বামীর সংসারের প্রতি যথার্থ প্রেম আছে বলিয়াই তাহা সে কদাচ করিতে পারে না। নারীদিগের পতিনিন্দা যে মঙ্গলকাব্যের অন্যতম লক্ষণ, তাহারই নায়িকা হইয়া ফুল্লরাকে এই বিষয়ে অটুট সংযম রক্ষা করিতে দেখিয়া তাহার এই দুঃখের জীবনের মধ্যেও স্বামিপ্রেম যে কত গভীর ছিল, তাহাই অনুমিত হয়। অতএব স্বামিপ্রেম যেখানে সত্য, সেখানে সাংসারিক দুঃখ এই ব্যাধ-নারীর কাছে কিছুই নহে।

মুকুন্দরাম অতি কৌশলে এখানে ফুল্লরাকে দিয়া এই অপূর্ব অভিনয়টি করাইয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ'কথাও স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই অভিনয়ের মধ্যে ফুল্লরার অবচেতন মন হইতে যে দুই একটি কথা অলক্ষিতে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে,

কেবলমাত্র তাহাতেই তাহার অন্তরের পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। অতএব ইহা নির্জ্জলা দুঃখেরও বারমাসী নহে, নিরবচ্ছিন্ন সুখেরও বারমাসী নহে—ইহা ফুল্লরার এক সাময়িক অশুভ আশঙ্কাজাত অন্তর্দ্বন্দ্বের বহিরভিব্যক্তি মাত্র। মুকুন্দরাম ইহাতে অপূর্ব কৌশলে ফুল্লরার এই মনোভাবটি ব্যক্ত করিয়াছেন—অতএব ইহাকে গতানুগতিক বারমাসীয় সংজ্ঞায় ফেলিয়া বিচার করা ভুল হইবে, ইহার মধ্যেও মুকুন্দরামের ঔপন্যাসিক চরিত্রসৃষ্টির কৌশলই প্রকাশ পাইয়াছে।

কালকেতুর চরিত্র-পরিকল্পনার ভিতর দিয়াও মুকুন্দরামের অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার জীবনে তাহার সহজাত ব্যাধ-সংস্কারের সঙ্গে উচ্চতর কোনও জীবনাদর্শের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় নাই—সেজন্য তাহার চরিত্রটি নিতান্ত সহজ ও সরল। মুকুন্দরাম এক কথায় তাহার পরিচযটি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,

শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিট্‌কাল।
গ্রাসগুলি তুলে যেন তে-আঁটিয়া তাল।।

মানব-জীবনের আদিম সংস্কারসুলভ বৃত্তিগুলির মধ্যেই তাহার জীবন সীমাবদ্ধ. ইহার মধ্যে কোনও কৃত্রিম-সমাজ-সুলভ লৌকিকতা প্রবেশ করিতে পারে নাই। সে অরণ্যচর ব্যাধ, সুতরাং অরণ্য-প্রকৃতির সঙ্গে তাহার একটা সহজ সংযোগ আছে। প্রকৃতির মধ্যে যে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার জীবনেও তাহারই বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সে বীর, কিন্তু বীরত্ব তাহার কৃত্রিম অনুশীলনের বিষয় ছিল না, ইহা তাহার সহজাত গুণ মাত্র ছিল। সেইজন্য বীরত্ব সম্পর্কিত কোনও সমাজ-নির্দিষ্ট আদর্শকে সে স্বীকার করে নাই, এই বিষয়ে সে তাহার জন্ম-সংস্কারকেই অনুসরণ করিয়াছে। তাহার চরিত্রের এই গূঢ় তাৎপর্যটি বুঝিতে না পারিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে, কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সে যে পত্নীর পরামর্শে ধান্যগৃহে আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহাতে তাহার চরিত্রটি অস্বাভাবিক হইয়াছে। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, আর্য বা ক্ষাত্র বীরত্বের আদর্শ ও অনার্য বীরত্বের আদর্শ এক নহে। ক্ষত্রিয়গণ বীরত্ব সম্পর্কিত যে উচ্চ নৈতিক আদর্শ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন, ব্যাধযুবক কালকেতুর পক্ষে তাহা লাভ করা সম্ভব হয় নাই। তাহার বীরত্ব তাহার আত্মরক্ষার ধর্মের অন্তর্নিবিষ্ট একটি গুণ। সে আত্মরক্ষার জন্য পশু বধ করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে এবং আত্মরক্ষার জন্যই বিজয়ী শত্রুর নিকট হইতে পলাইয়া আসিয়া ধান্যগৃহে আত্মগোপন করে। সে অনার্য, সুতরাং তাহার বীরত্ব কাপুরুষতামিশ্র, আত্মরক্ষার ধর্ম তাহার জীবনধর্ম—সুতরাং ক্ষাত্র বীরত্বের আদর্শ তাহার সম্মুখে স্থাপন করিলেই বরং তাহার চরিত্রটি অস্বাভাবিক হইয়া উঠিত।

চরিত্র-পরিকল্পনায় এই সকল সার্থকতার জন্যই বলা হইয়াছে যে 'মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে, স্ফুটোজ্জ্বল বাস্তব-চিত্রে. দক্ষ চরিত্রাঙ্কনে, কুশল ঘটনা সন্নিবেশে, ও সর্বোপরি, আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্বন্ধ স্থাপনে, আমরা

ভবিষ্যৎ কালের উপন্যাসের বেশ সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পাইয়া থাকি। মুকুন্দরাম কেবল সময়ের প্রভাব অতিক্রম করিতে, অতীত প্রথার সহিত আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিতে, অলৌকিকতার হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই বলিয়াই একজন খাঁটি ঔপন্যাসিক হইতে পারেন নাই। দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।'[১]

গদ্যই হউক পদ্যই হউক, উচ্চাঙ্গের রচনামাত্রেরই একটি বিশিষ্ট রচনাশৈলী বা স্টাইল আছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ইহা খুব সুলভ নহে, মুকুন্দরামের মধ্যে ইহার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়। সেইজন্য মুকুন্দরামের রচনা গভীরভাবে যিনি অনুশীলন করিয়াছেন, তিনি অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন, তাঁহার নামে প্রচলিত কাব্যের মধ্যে কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত এবং কোন্ অংশ কবির নিজস্ব রচনা—মুকুন্দরামের কাব্যের প্রক্ষিপ্ত অংশ প্রমাণ করিবার জন্য অন্য কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণের প্রয়োজন করে না। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তাঁহার পরবর্তী আর মাত্র দুই তিন জন কবি সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে—তাঁহারা ঘনরাম ও ভারতচন্দ্র। তবে মুকুন্দরামই নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে ইহার আদি স্রষ্টা।

রচনাশৈলী কবির মৌলিক প্রতিভার একটি বিশিষ্ট গুণ। সৃজনী প্রতিভা মৌলিক না হইলে ইহার বিকাশ অসম্ভব। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অধিকাংশ কবিই পুচ্ছগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের কাহারও মধ্যে রচনার এই বিশিষ্ট মৌলিক গুণটি প্রকাশ পাইতে পারে নাই। কিন্তু মুকুন্দরামের প্রতিভা অন্য স্তরের। মৌলিক সৃজনী প্রতিভা বিকাশের যেখানে অবকাশ আছে, গতানুগতিকতার মধ্যেও মুকুন্দরাম তাহার যথার্থ সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু স্টাইল বা রচনাশৈলীর প্রয়োগ কেহ যে সজ্ঞানে করিয়া থাকেন, তাহা নহে—তাহা প্রকৃত প্রতিভাবান লেখকের রচনায় অজ্ঞাতেই সৃষ্ট হইয়া থাকে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে বক্তব্য বিষয়টি সুপরিস্ফুট হইবে।

'ভাব ও শব্দার্থের ঐকান্তিক সারূপ্য' যদি রচনাশৈলীর একটি লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে মুকুন্দরামের এই পদ দুইটি ইহার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়—

সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘষিয়া মাজিয়া বাপু কর‍্যাছ উজ্জ্বল।।

এই পদ দুইটির মধ্যে বাক্য এবং অর্থের যে অপূর্ব মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছে, তাহা পূর্বে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি; কেবলমাত্র বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির জন্য নহে, রচনাগুণেও এই পদ দুইটি মুকুন্দরামের মৌলিক প্রতিভার পরিচায়ক।

১। শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৩৯), ১৫

ভাষার মধ্য দিয়াই রচনাশৈলীর পরিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে—ভাষার সুস্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতা ইহার অন্যতম প্রধান গুণ। মুকুন্দরামের নিম্নোদ্ধৃত রচনার মধ্যে ভাবের সঙ্গে শব্দার্থের সারূপ্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার সুস্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতা কি রকম রূপ পাইয়াছে দেখুন। পশুগণ কালকেতুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে চণ্ডীর নিকট নালিশ করিতেছে। প্রত্যেক চণ্ডীমঙ্গলের কবিই এই প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। মুকুন্দরামের রচনায় হস্তী বলিতেছে—

বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর।
লুকাইতে নাহি ঠাঁই বীরের গোচর।।
কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে তরি।
আপনার দন্ত দুটা আপনার অরি।।
শুণ্ডে ধরি মহাবীর উপাড়ে দশন।
এত অপমান মাতা সহে কোন জন।।

ভালুক বলিতেছে,

উইচারা খাই পশু নামেতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক।।

'বড় নাম, বড় গ্রাম, বড় কলেবর'—হস্তীর দেহের বিপুলত্ব বুঝাইতে পর পর এই তিনটি 'বড়' শব্দের প্রয়োগ এমন সার্থক হইয়াছে যে, এখানে বিশালবপু হস্তীটি যেন চোখের সম্মুখে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এখানে পর পর তিনটি 'বড়' কথার আদ্য বর্ণে যে ধ্বনি সংযুক্ত হইয়াছে, তাহা যেন এই বিপুলকায় হস্তীটিরই তিনটি পদধ্বনি। কয়েকটি যথাযথ নির্বাচিত সহজ সরল শব্দদ্বারা এখানে একটি অপূর্ব বস্তুরস সৃষ্ট হইয়াছে। অথচ বস্তুটিকে প্রত্যক্ষ ভাবে বর্ণনা করা হয় নাই। দ্বিতীয় উদ্ধৃত পদ দুইটিও তাহাই। ফল-মূলাহারী বনের ভালুক, সে কাহারও কিছুতে নাই—এই ভাবটি প্রকাশ করিতে 'নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক' কথা কয়েকটির সার্থকতা বিস্ময়কর। প্রত্যক্ষভাবে কথাটি এখানে বলা হয় নাই—বিষয়টি প্রকাশ করিবার এখানে একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি বা কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছে, ভাবপ্রকাশে এইপ্রকার বিশিষ্ট ভঙ্গির প্রয়োগ মুকুন্দরামের একটি বিশিষ্ট গুণ—এখানেই তাঁহার নিজস্ব রচনাশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নোদ্ধৃত পদ দুইটির সুস্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতা আরও প্রত্যক্ষ,—

শাশুড়ী ননদী নাই নাই তোর সতা।
কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কইলি রাতা।।

ইহাতে অনেক কথা বলা হইল; এমন কি, বাঙ্গালী বধূ-জীবনের সমস্ত পরিবেশটি চোখের সামনে যেন জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল, কিন্তু সংক্ষেপে, কত সহজে এই কাজটি সম্পন্ন হইল। জীবনের প্রতি দৃষ্টি কত গভীর ও রচনাশৈলী কত উচ্চাঙ্গের হইলে যে ইহা সম্ভব

হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই সব ক্ষেত্রে কবি বিষয়কে প্রত্যক্ষ বর্ণনা দ্বারা না বুঝাইয়া পারিপার্শ্বিক ইঙ্গিত দ্বারা আপনা হইতেই আপনি ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ দিয়াছেন। মুকুন্দরামের রচনা হইতে এই প্রকার আরও বহু পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে।

পূর্বেই বলিয়াছি, মুকুন্দরামের কাব্য তাঁহার নিজস্ব জীবন-রসে রসায়িত। ইহাতে বুলান মণ্ডলের গুজরাট আগমন উপলক্ষে, লীলাবতীর ঔষধ-করণ সম্পর্কে, লহনা-খুল্লনার সপত্নী-বিবাদ উপলক্ষে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাই যে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের স্বীকৃতি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। তাহা ছাড়াও ফুল্লরার দুঃখের বারমাসী বর্ণনাতেও হয়ত তাঁহার নিজের অসচ্ছল সাংসারিক জীবনের ছায়াপাত হইয়া থাকিবে। হয়ত 'চালু সেরে বান্ধা দিলুঁ মাটির পাথরা' তাঁহার নিজেরই অভাবগ্রস্ত জীবনের একটি দিনের করুণ অভিজ্ঞতার কথা। তাহা না হইলে, এই কথা কয়টির ভিতর দিয়া এমন এক মর্মান্তিক বেদনার স্পর্শ এত সহজভাবে অনুভূত হইত না। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী-মধ্যে গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র রচনার যে বিস্তৃত অবকাশ পাওয়া গিয়াছে, তাহার সবখানি জুড়িয়াই হয়ত কবি তাঁহার নিজস্ব পারিবারিক জীবনের চিত্রটিই অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রথম কাহিনীটির মধ্যে দুঃখিনী ফুল্লরার যে অসচ্ছল সংসারটির চিত্র এত জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা হয়ত তাঁহার নিজেরই অসচ্ছল জীবনের চিত্র—দ্বিতীয় কাহিনীটিতে লহনা-খুল্লনার সপত্নী-বিবাদের মধ্যে যে নিজেরই দাম্পত্য জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা তো তিনি নিজেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। বিভিন্নমুখী নারীচরিত্রের তিনি যে এত সুনিপুণ স্রষ্টা, তাহার কারণ হয়ত ইহাই। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে নারীচরিত্রের সবগুলি দিক হয়ত তিনি সুনিপুণভাবে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। যে কবি এতখানি জীবন-রসিক, তিনি প্রত্যক্ষ জীবনকে অতিক্রম করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইতে পারেন না। সেইজন্য তাঁহার কাব্য লঘুভার কল্পনার পক্ষবিহারী না হইয়া বাস্তব জীবনের গুরুভারে মন্থরগামী হইয়াছে। কাব্যের সঙ্গে জীবনের এমন নিবিড় যোগ ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে আর দেখা যায় নাই—এমন কি, সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপিয়া তাঁহার পরবর্তী কালেও আর কোনও কবির রচনায়ও তাহা প্রকাশ পায় নাই। ভারতচন্দ্রের সঙ্গে মুকুন্দরামের এইখানেই স্থূল পার্থক্য।

মুকুন্দরাম দুঃখবর্ণনার কবি, কিন্তু দুঃখবাদী কবি নহেন। তাঁহার 'অভয়া-মঙ্গল' পরম আশাবাদীর জীবন-সঙ্গীত। মনসা-মঙ্গলের মত চণ্ডীমঙ্গল আনুপূর্বিক দুঃখ-ভারাক্রান্ত এবং বিয়োগান্তক কাব্য নহে সত্য, কিন্তু তথাপি জীবনের খণ্ড খণ্ড দুঃখের কাহিনীতে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ভারাক্রান্ত। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, দুঃখের ভিতর দিয়াই ইহার কোনও জীবনেরই সমাপ্তি নির্দেশ করা হয় নাই, ইহাতে দুঃখ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়া সুখের আস্বাদন লাভের কথাও আছে। নিজের জীবনের দুঃখ-কাহিনীর বর্ণনা দিয়াই মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্য রচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। তাঁহার সাতপুরুষের ভিটা ত্যাগ করিয়া যাইবার দুঃখ-কাহিনী

লইয়া এই কাব্যরচনার আরম্ভ। ব্যক্তিজীবনে এই সুকঠিন দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াও তাঁহার অনুভূতিশীল কবিহৃদয় তাঁহার অবশিষ্ট জীবন ব্যাপিয়া সেই দুঃখ-স্মৃতিরই যে রোমন্থন করিয়াছে, তাঁহার সমগ্র কাব্য তাহার প্রমাণ। পশুকুলের দুঃখ নিবেদনের মধ্যে তদানীন্তন সমাজের সঙ্গে তাঁহার নিজের অসহায় অবস্থার কথা বর্ণিত হইয়াছে। ফুল্লরার দুঃখজীবনের মধ্যে তাঁহার নিজের অভাবগ্রস্ত জীবনের ছায়াপাত হইয়াছে; এমন কি, সমৃদ্ধ সদাগরের পরিবারেও খুল্লনার যে দুঃখ আকস্মিক বিপৎপাতের মত একদিন উদয় হইয়া পরিণামে বিলীন হইয়া গিয়াছিল, তাহাও তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের ছায়াপাতে করুণ হইয়া উঠিয়াছে। মুকুন্দরামের রচনায় দুঃখ-বর্ণনা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার কাব্যে দুঃখেই দুঃখের শেষ নহে, দুঃখ উত্তীর্ণ হইবার পরম আশ্বাস বাণীও ধ্বনিত হইয়াছে।

আন্তরিকতাই মুকুন্দরামের কাব্যের প্রাণ। যে কোন একটি চিত্র নিখুঁতভাব চিত্রিত করিতে পারিলেই যে তাহার সার্থকতা, তাহা নহে—তাহার সহিত কবিহৃদয়ের একটু সহানুভূতিও মিশ্রিত হওয়া প্রয়োজন। মুকুন্দরামের হৃদয়ে সহানুভূতির অভাব ছিল না। ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ-বর্ণনায় যখন তিনি বলিয়াছেন,—

বৈশাখে অনল সম বসন্তের খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা।।
পায় পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন।।
নিযুক্ত করিল বিধি সভার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়।।

তখন ব্যাধ-জীবনের মূলে তাঁহার যে শুধু নিবিড় অভিজ্ঞতার পরিচয়ই প্রকাশ পায়, তাহা নহে, তাহার ভিতরে একটি দুঃখ-কাতর কবিমন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। এই নিপুণ সামাজিক অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতা লইয়াই মুকুন্দরামের কবিত্ব।

বিচ্ছিন্ন চরিত্র-সৃষ্টিতে মুকুন্দরাম যেমন কালকেতুর কাহিনীতে কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনই সামগ্রিক ভাবে কাহিনীর বিন্যাসে ধনপতি সদাগরের কাহিনীতেও তিনি কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে, ধনপতি সদাগরের কাহিনীটি মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর গৃহস্থ জীবনের ভিত্তির উপর রচিত হইয়াছে, ইহার চিত্র এবং চরিত্রগুলিকে মুকুন্দরামের যেমন প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ হইয়াছিল, কালকেতুর ব্যাধজীবনকে ততখানি নিকট হইতে তিনি প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন নাই। বিশেষত হিন্দুসমাজের সংস্কার লইয়া তিনি কালকেতুর ব্যাধজীবনকে রূপায়িত করিতে গিয়া অনেক ক্ষেত্রেই ইহার বাস্তব ধর্ম ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, সম্পূর্ণ আত্মনির্লিপ্ত হইয়া তিনি ব্যাধ-জীবনকে লক্ষ করিতে পারেন নাই। সেইজন্য তিনি কালকেতুর হিন্দু সমাজোচিত নামকরণ এবং কর্ণবেধ, তাহার বিবাহ প্রথায় উচ্চতর হিন্দু-সমাজের বিবাহ প্রথা, বার্ধক্যে ধর্মকেতুর

বারাণসী বাস, কালকেতু ও ফুল্লরার মুখে রামায়ণ মহাভারতের নীতিকথা ইত্যাদি উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্য দিয়া যে 'ব্যাধ গোহিংসক রাঢ়'-এর জীবন মূর্ত হইয়া উঠিবার পরিবর্তে উচ্চতর হিন্দুসমাজ-প্রভাবিত একটি জীবন রূপায়িত হইয়াছে, তাহাই অনুভূত হয়। ফুল্লরার দারিদ্র্যের মধ্যেও অনার্য ব্যাধ-নারীর দারিদ্র্যের পরিচয় প্রকাশ পায় নাই—নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দারিদ্র্যের রূপই তাহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। হরগৌরীর গৃহস্থালীর বর্ণনার মধ্য দিয়াও অনুরূপ দারিদ্র্যের বর্ণনাই প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যেই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ধনপতি সদাগরের কাহিনীর মধ্যে এই রূপটি দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার জীবন বাংলার সাধারণ সামাজিক জীবন, ইহার সঙ্গে মুকুন্দরামের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের কোনদিক হইতেই বাধা ছিল না বলিয়া ইহার বস্তুধর্মিতা কোনদিক হইতে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে নাই।

চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে যে দুইটি কাহিনী আছে, তাহাদের মধ্যে ধনপতি সদাগরের কাহিনীটিই প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয়। কারণ, মেয়েলী বারমেসে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথায় এই কাহিনীটিই বর্ণনা করা হইয়া থাকে, কালকেতুর কাহিনী তাহাতে বর্ণিত হয় না। চণ্ডীমঙ্গলের একটি ষোল পালার রূপ দিবার উদ্দেশ্যে এই কাহিনীটি স্বতন্ত্র একটি ঐতিহ্য হইতে আসিয়া পরবর্তী কালে ধনপতির কাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে। ধনপতির কাহিনীর মধ্যে মঙ্গলকাব্যের সকল বৈশিষ্ট্যেরই সন্ধান পাওয়া যায়, কালকেতুর কাহিনীতে সকল বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। ধনপতির কাহিনীটি দীর্ঘতর কাল ধরিয়া প্রচলিত থাকিবার জন্যই হোক, কিংবা ব্যাপকতর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে প্রচলিত থাকিবার জন্যই হোক, ইহার একটি রূপ নির্দিষ্ট (standardised) হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং মঙ্গলকাব্যের গুণও ইহার মধ্যে অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। কালকেতুর কাহিনীতে বিভিন্ন কবি যেমন ছোটখাট বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি করিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন, ধনপতি সদাগরের কাহিনীতে তাহা পাওয়া যায় নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে বৈষ্ণব ভাবাদর্শের যে প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল, কালকেতুর কাহিনী অপেক্ষা ধনপতির কাহিনীতে মুকুন্দরাম তাহার বিস্তৃততর পরিচয় দিবার অবকাশ পাইয়াছেন। বাংলার বৃহত্তর সমসাময়িক সমাজ-জীবনের সামগ্রিক রূপ ইহার মত আর কোথাও এত স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পায় নাই। কালকেতুর কাহিনীতে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা খণ্ডিত মাত্র।

কালকেতুর কাহিনীতে দেবতার একটি প্রত্যক্ষ অংশ আছে, তাহার ফলে কাহিনী হইতে অলৌকিকতার ভাব অনেক ক্ষেত্রেই দূর হইতে পারে নাই। এমন কি, ইহার নায়কের ভাগ্য পরিবর্তনের মূলেই রহিয়াছে দেবতার অহৈতুকী করুণা। কিন্তু ধনপতি সদাগরের কাহিনীর মধ্যে দেবতা থাকিলেও তাহা কাহিনীর ধারা এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে নাই। ইহাতে নর-নারীর স্বাভাবিক জীবন-ধারার মধ্যে কোনও অলৌকিক শক্তি আসিয়া অন্যায় ভাবে তাহা নিয়ন্ত্রিত করে নাই; ইহার শেষাংশের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত কাহিনীর মূল অংশ নহে, ইহা কেবল মাত্র দেবীমাহাত্ম্য কীর্তনের জন্যই আসিয়াছে, কাহিনীর অনিবার্য ধারায় আসে নাই। ইহা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াও কাহিনীর একটি মানবিক ব্যাখ্যার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে;

কিন্তু কালকেতুর আকস্মিক ভাগ্য পরিবর্তনের মূলে কোন লৌকিক ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। সেই জনাই ধনপতি কাহিনীর কাব্যগুণ অধিক এবং মুকুন্দরামও তাহার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার কাহিনী এবং চরিত্রগুলি একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

ধনপতি সদাগরের কাহিনীর মধ্যে যে বিষয়টি আছে, তাহা দেশদেশান্তরেরই লোক-সাহিত্যের একটি নির্দিষ্ট বিষয় (motif)—তাহা নিরুদ্দিষ্ট পিতার সন্ধানে পুত্রের অভিযান। এই সকল ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পুত্র মাতৃগর্ভে থাকিতেই পিতা নিরুদ্দিষ্ট হইয়া যায়, পরিণত বয়সে পুত্রের মনে নিরুদ্দিষ্ট পিতার প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণ অনুভূত হয়; এই আকর্ষণের কারণ মনস্তাত্ত্বিক, সুতরাং নিতান্ত সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। এই সূত্রেই ইহার মধ্যে একটি জীবন-সত্য বিধৃত হইয়া থাকে, তাহা কেন্দ্র করিয়াই কাহিনীটি আবর্তিত হয়। প্রাচীন গ্রীক কবি হোমারের 'ওডিসি' কাব্য, পারস্য ভাষায় সোরাব-রোস্তমের কাহিনীমূলক কাব্য প্রায় অনুরূপ বিষয়-বস্তুই বিস্তৃততর ভাবে বর্ণনা করিয়াছে। লোকসাহিত্যের মৌখিক ব্যবহারের ক্ষেত্র হইতেই ক্রমে বিষয়টি উচ্চতর বা লিখিত সাহিত্যের মধ্যেও গৃহীত হইয়াছে, বাংলাদেশেও ব্রতকথা হইতে তাহা গিয়া মঙ্গলকাব্যের অভিজাত সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সুতরাং ধনপতি সদাগরের কাহিনী এবং ইহার বিষয়-বস্তুর গুণ সাহিত্যের মধ্য দিয়া নানা ভাবেই পরীক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। ধনপতি সদাগরের কাহিনীর মূল বিষয়ও পুত্র কর্তৃক নিরুদ্দিষ্ট পিতার সন্ধান এবং নিরুদ্দিষ্ট পিতাকে ফিরিয়া পাইবার ভিতর দিয়া জীবনে পুত্রের প্রতিষ্ঠা। ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়াই মুকুন্দরাম কাহিনীটি রচনা করিলেও ইহার মধ্যে তিনি চরিত্র সৃষ্টিতে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার মৌলিক প্রতিভার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। সেই চরিত্রগুলিই এখন বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় কাহিনীর নায়ক ধনপতি সদাগর। মনসা-মঙ্গলে সদাগর চরিত্রের এক রূপের আমরা পরিচয় পাইয়াছি, তাহার দৃপ্ত পৌরুষ এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সেখানে আকাশস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু ধনপতি সদাগরের চরিত্র সেই উপাদানে গঠিত নহে। সে ধনশালী, কিন্তু বিলাসী প্রকৃতির লোক। লঘু কৌতুক ক্রীড়ায় তাহার উল্লাস, সে পরিজন সঙ্গী লইয়া পারাবত ক্রীড়ায় কালহরণ করিয়া থাকে।

> সখা সঙ্গে ধনপতি আনন্দে পূর্ণিত মতি
> পায়রা উড়ায় সদাগরে।
> ছাড়িয়া পাটের দোলা একে একে করে খেলা
> পায়রী রাখিয়া বাম করে।।

এক হাতে পায়রা এবং আর এক হাতে পায়রী লইয়া তাহার কৌতুক ক্রীড়া। এই লঘুচিত্ত ব্যক্তি পায়রা লইয়া ক্রীড়াচ্ছলে খুল্লনাকে দেখিতে পাইল, দেখিয়া তাহার রূপ-যৌবনে আকৃষ্ট হইল, গৃহে তাহার পত্নী আছে তাহার কথা বিস্মৃত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিল। বহুবিবাহ সে যুগের ধনশালী ব্যক্তির বিলাস ছিল, বিবাহে তাহার কিছুমাত্র বাধা হইল না। কিন্তু ধনপতি দৃঢ়ভাবে কোন বস্তুতে আকৃষ্ট হইয়া থাকিবার ব্যক্তি নহে, সে ভোগী, লঘুপদে সে জীবনের পথে বিচরণ করে; প্রেমেও তাহার নিষ্ঠা নাই, খুল্লনার প্রতি আসক্ত হইবার পূর্বেই তাহার দীর্ঘদিন গৃহ হইতে অনুপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন হইল এবং প্রবাসে গিয়া সে নূতন করিয়া বিলাস-জীবন রচনা করিল, গৃহের কথা ভুলিয়া গেল। তাহার মত চরিত্রের ব্যক্তির পক্ষে তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক। তারপর দীর্ঘদিন পর প্রবাস হইতে আবার যখন গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখনও নবোদ্ভিন্নযৌবনা খুল্লনার রূপের দিকেই সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল, বলিল—

বয়ান বিমল কনক-কমল
গজমতি-হার সাজে।
পাটের সাড়ী করাছে পরিধান
চলিতে নূপুর বাজে।।
কামের ধনুক কামের শর
ছাড়াছে সাধুর ঘরে।
শ্রীকবিকঙ্কণ করিল রচন
দেবী অভয়ার বরে।।

সুতরাং এই চরিত্রের মধ্যে চাঁদ সদাগরের মত উচ্চ আদর্শ কিংবা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কোন আচরণ প্রত্যাশা করা যায় না। ধনপতির আর এক দুর্ভাগ্য যে গৃহসুখ তাহার ভাগ্যে ছিল না, সেইজন্যও সে রূপমোহ অতিক্রম করিয়া জীবনে স্থায়ী কল্যাণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। পুনরায় তাহার বিদেশ যাত্রার ডাক পড়িল এবং এই বারই সে নিরুদ্দিষ্ট হইল। সুতরাং যদিও ধনপতির কাহিনী বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনাশ্রিত রচনা, তথাপি ইহার মধ্যে সুনিবিড় দাম্পত্য জীবনের কোন পরিচয় প্রকাশ পাইতে পারে নাই; বরং সে পরিচয় কালকেতু-ফুল্লরার জীবনে প্রকাশ পাইয়াছে।

খুল্লনাকে ধনপতি-কাহিনীর নায়িকা বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। খুল্লনার একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, সমগ্র মঙ্গলকাব্যের নায়িকা-চরিত্রের মধ্যে সেই একমাত্র জননী। ফুল্লরা কিংবা বেহুলার মধ্যে আমরা এই পরিচয়টি লাভ করিতে পারি নাই। মেনকা কিংবা সনকার

মধ্যে জননীরূপের পরিচয় থাকিলেও তাঁহারা কোনও মঙ্গলকাব্যের নায়িকা নহেন। বিশেষত কুমারী জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া নারীচরিত্রে মাতৃত্বের বিকাশ পর্যন্ত খুল্লনার মধ্য দিয়া যে ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, মধ্যযুগের আর কোন স্ত্রীচরিত্রের মধ্য দিয়া তাহা সে ভাবে প্রকাশ পায় নাই। বিশেষত মাতৃত্বেই নারীচরিত্রের পরিপূর্ণতা প্রকাশ পায়। সুতরাং খুল্লনাই মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ নারীচরিত্র; কন্যা, জায়া এবং জননী নারীর এই তিনটি রূপই তাহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়া তাহার চরিত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রকাশ করিয়াছে। সেইজন্য অন্য কোন মঙ্গলকাব্যের স্ত্রী চরিত্রের সঙ্গেই তাহার তুলনা হইতে পারে না। মুকুন্দরাম এই পরিচয় কতদূর সার্থক ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই এখন বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

খুল্লনা ধনী পিতার কন্যা। একদিন 'সাত পাঁচ সখি মেলি, খুল্লনা খেলেন ধূলি, পারাবত পড়িল অঞ্চলে।' একদিন সখীদিগের সঙ্গে ধূলি-খেলা করিতে করিতে শ্যেন-তাড়িত ধনপতির পাবাবত আসিয়া তাহার বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইল। খুল্লনা ধূলি-খেলা করিলেও বালিকা নহে; ধনপতি যখন পারাবত ফিরিয়া চাহিল, তখন তাহাকে তাহার জ্যেঠতুত ভগিনীর স্বামী বলিয়া চিনিতে পারিয়া কহিল—

প্রাণভয়ে পারাবত লইল শরণ।
প্রাণ দিয়া রক্ষা করি অনুগত জন।।

দৈবে দিল পারাবত নাহি করি চুরি।

মিছা কাজে কয় সাধু কপট চাতুরী।।

তুমি যে রাজার সাধু কে তোমাকে টুটা।

যদি লবে পারাবত দাঁতে কর কুটা।।

পারাবত খুঁজিতে আসিয়া সাধু খুল্লনার নিকট নিজেকে হারাইয়া ফেলিল। তারপর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর খুল্লনার নূতন জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সূচনা দেখা গেল। সপত্নী লহনার নিকট হইতে প্রথমে সে স্নেহ পাইল; দুর্বলা দাসীর ষড়যন্ত্রে সেই স্নেহ যখন গরলে পরিণত হইল, তখন তাহাকে এক মর্মান্তিক অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইল। সপত্নীর চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়াও কেবলমাত্র দৈহিক বলের নিকট সে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। তাহাকে জীবনে দুঃসহ কষ্টের সম্মুখীন হইতে হইল। কিন্তু দুঃখের মধ্যেও স্বামীর প্রতি তাহার বিশ্বাস অটল এবং অবিচল রহিল। পরিপূর্ণ স্বামিপ্রেম লইয়া সে

বিশ্বাস করিল, স্বামী কখনও তাহাকে নিষ্ঠুর আদেশ দিতে পারেন না; এই বিশ্বাসের শক্তিতেই সে দুঃখ-তপস্যার তিমির রাত্রি উত্তীর্ণ হইয়া গেল। সে যে নিতান্ত বুদ্ধিহীনা বালিকা নহে, লহনার সঙ্গে ব্যবহারের মধ্য দিয়া তাহা এখানে প্রকাশ পাইয়াছে—লহনার কথার সে প্রতিবাদ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে কলহ করিয়াছে, অবশেষে লহনার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই। কিন্তু দৈহিক বলে সে লহনা অপেক্ষা দুর্বল; লহনা তাহার এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তাহাকে দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ করিল,—'খুল্লনার বিধি বাম, দু'জনার সংগ্রাম, লহনার হইল জয়।' খুল্লনার দুঃখভোগ খুল্লনার তপস্যা। কন্যার বৈধব্য দোষ ছিল বলিয়া পিতা ধনপতি দোজবরে তাহাকে বিবাহ দিয়াছিলেন, এই দুঃখ এবং বিচ্ছেদের ভিতর দিয়া খুল্লনা তাহার দুরদৃষ্টের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। ইহার বর্ণনা যেমন বাস্তব, তেমনই করুণ।

তারপর বণিক সভায় পরীক্ষাদানের মধ্য দিয়া খুল্লনা চরিত্রের আর একটি দিকের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার আত্মপ্রত্যয়ের শক্তি যে কত প্রবল ছিল, ইহার মধ্য দিয়া তাহারই পরিচয় পাই। বেহুলা-চরিত্রের আত্মপ্রত্যয়ের যে দিক তাহার চরিত্রকে একটি বিশেষত্ব দান করিয়াছিল, খুল্লনার চরিত্রও সেই আত্মপ্রত্যয়ের শক্তিতে শক্তিশালী ছিল। ধনপতি যখন অর্থ দ্বারা বণিক-সভার মুখ বন্ধ করিতে চাহিয়াছিল, তখন খুল্লনা তাহাকে বলিয়াছিল,

> অবোধ পরাণ-নাথ বলিয়ে তোমারে।
> আজি ধন দিলে দিবে বৎসরে বৎসরে।।
> নিজ ধন দিতে দিতে তুমি হবে রঙ্ক।
> ভুবন ভরিয়া মোর রহিবে কলঙ্ক।।

নিজের চরিত্রের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস লইয়াই খুল্লনা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইল এবং সেই বিশ্বাসের শক্তিতেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তারপর খুল্লনার আর এক রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তখন সে জননী, স্বামী দীর্ঘকাল যাবৎ বাণিজ্যের জন্য নিরুদ্দিষ্ট। একদিকে প্রবাসী স্বামীর, অপর দিকে শিশু সন্তানের কল্যাণ কামনা, উভয়ের মধ্য দিয়া তাহার চরিত্র এক অভাবনীয় রূপ লাভ করিল। বাণিজ্য যাত্রার সময় স্বামী দেবতাকে অবহেলা করিয়া গিয়াছে, সেইজন্য তাহার জন্য আশঙ্কা, আর একদিকে আত্মমর্যাদা রক্ষা করিয়া নিরুদ্দিষ্ট পিতার সন্তানের পরিচর্যা, এই দুই কাজই সে করিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু এমন সময় তাহার উপর আবার আঘাত আসিয়া পড়িল। অপমানিত পুত্র পিতৃসন্ধানে বাহির

হইতে চায়। খুল্লনা তাহাকে বাধা দিবে কি করিয়া? ইহার সঙ্গে নিজের সম্ভ্রম এবং সন্তানের আত্মসম্মান জড়িত হইয়া আছে। কিন্তু একমাত্র সন্তানকে দীর্ঘকাল নিরুদ্দিষ্ট পিতার সন্ধান করিবার জন্য অনির্দিষ্ট কালের জন্য প্রবাসে পাঠাইতে তাহার অন্তর একেবারে ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল। তাহা সত্ত্বেও

খুল্লনা সুধীরমতি,   বুঝিয়া কার্যের গতি
আজ্ঞা দিল সিংহল গমনে।

খুল্লনা অন্ধ মাতৃস্নেহ দ্বারা সন্তানের আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল না। এখানে কর্তব্য-পরায়ণা জননীর মতই সে আচরণ করিল। স্বামী-বিচ্ছেদের দুঃসহ দুঃখ এবং অপমানের মধ্যে আসিয়া একমাত্র পুত্র-বিচ্ছেদের আঘাত কঠিনতর বেদনার সঞ্চার করিল। বিচ্ছেদের দুঃখ-জীবনে অভ্যস্ত খুল্লনা এই আঘাতও মাথা পাতিয়া সহ্য করিল। দুঃখ-বর্ণনার কবি মুকুন্দরামের রচনায় খুল্লনার দুঃখ-বেদনার কথাই তাহার ক্ষণিক সুখভোগের অস্পষ্ট চিত্রগুলিকে সম্পূর্ণ মলিন করিয়া দিয়াছে।

দুর্বলা এই কাহিনীর খল (villain) চরিত্র। বহুপত্নীক পরিবারের মধ্যে এই শ্রেণীর চরিত্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ পূর্ণ করিবার জন্য যে কি ভাবে অন্যের সুমহান দুঃখের কারণ হয়, সে তাহার একটি জীবন্ত প্রমাণ। কালকেতুর কাহিনীর মুরারি শীল কিংবা ভাঁড়ুদত্ত কাহিনীর অনিবার্য ধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নহে, কিন্তু ধনপতির কাহিনীর মধ্যে দুর্বলা দাসীর একটি সক্রিয় অংশ আছে, তাহার আচার আচরণ কাহিনীর ধারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। সুতরাং যথার্থ অর্থে সেই এই কাব্যের খল বা villain চরিত্র। সরলমতি লহনার মনের মধ্যে সে বিষ ঢালিতে লাগিল—

নানা উপহার দিয়া পোষহ সতিনী।
আপনার কর্মনাশ করিলে আপনি।।
সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে।
অবশেষে ওই তোরে বধিবে পরাণে।।

যে সরল বিশ্বাসে লহনা খুল্লনাকে সপত্নী করিয়া ঘরে আনিয়াছিল, সেই সরল বিশ্বাসেই দুর্বলার কথায় সে প্ররোচিত হইল। দুর্বলা অতি কৌশলে এই কার্যটি সাধন করিল। কারণ, দুর্বলা জানে—

যেই ঘরে দু সতীনে না হয় কন্দলী।
সেই ঘরে দাসী বৈসে বড়ই পাগলী।।

বাংলার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে মুকুন্দরামের এই বাস্তব জ্ঞান, তাঁহার এই

কাহিনীতে নিয়োজিত হইবার ফলেই ধনপতির কাহিনী নানা দিক দিয়া বিশেষত্ব পূর্ণ হইয়াছে।

লহনার চরিত্রটিও মুকুন্দরামের কল্পনায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার প্রকৃতি সরল, জীবন সম্পর্কে গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিবার শক্তি তাহার নাই। যখন শুনিতে পাইল, স্বামী তাহার সপত্নী আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন সে পা ছড়াইয়া বসিয়া নিতান্ত বালিকার মত কাঁদিতে লাগিল। আবার পর মুহূর্তেই চুড়ি গড়াইবার জন্য স্বামীর নিকট হইতে পাঁচ পল সোনা এবং পরিধানের জন্য একখানি পাটশাড়ি পাইয়াই আশ্বস্ত হইল। অলঙ্কার ও শাড়ি সম্পর্কিত নারীর চিরন্তন দুর্বলতার সুযোগ লইয়া স্বামী তাহার দাম্পত্য জীবনের স্বার্থের পথে যে কন্টক স্থাপন করিতেছেন, তাহা সে অনুমানও করিতে পারিল না।

রত্ন পাইয়া যত্নে লইল লহনা যুবতী।
বিবাহের তরে তবে দিল অনুমতি।।

এই বালিকা-সুলভ সরল প্রকৃতির জন্যই সপত্নী খুল্লনাকে সে সরল ভাবে নিজের গৃহে বরণ করিয়া লইল। কিন্তু যাহার নিজের বুদ্ধির অভাব, সে অতি সহজেই পরের বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়; লহনারও তাহাই হইল। দুর্বলা দাসীর প্ররোচনায় সহজেই সে খুল্লনার বিরুদ্ধে বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া উঠিল এবং যে সরল বিশ্বাসে তাহাকে নিজের কনিষ্ঠা ভগ্নীর মত গ্রহণ করিয়াছিল, সেই সরল বিশ্বাসেই দাসীর প্রতিটি কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিল। তারপর খুল্লনার কোনও সর্বনাশ করিতেই তাহার আর বাকি রহিল না—সে জাল পত্র রচনা করিল, তাহার সপত্নী-বিদ্বেষের জীবন্ত রূপ নানা ভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, লহনা নিঃসন্তানা—সন্তানের অভাবে তাহার নারীত্ব অপূর্ণ রহিয়াছে; সেইজন্য যে কোনও প্রকৃতির ক্রূর এবং নিষ্ঠুর আচরণই তাহা দ্বারা সম্ভব হইতে পারিতেছে। অতিক্রান্তযৌবনা নিঃসন্তানা নারীর অতৃপ্ত মাতৃত্ব অসহায় সপত্নীর বিরুদ্ধে এক আদিম হিংস্র রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। মুকুন্দরামের রচনায় ইহা যেমন বাস্তব, তেমনই জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মুকুন্দরামের লহনা-খুল্লনার সপত্নী বিবাদ বিষয়ক দুইটি পদ হইতে অনুমান করিতে পারা যায় যে, তাঁহার সংসারেও দুই সপত্নী ছিল; তিনি লিখিয়াছেন,—

একজন সহিলে কোন্দল হয় দূর।
বিশেষিয়া জানেন চক্রবর্তী ঠাকুর।।

সুতরাং লহনা এবং খুল্লনার সম্পর্কের প্রত্যক্ষ পরিচয় তিনি তাঁহার নিজের পারিবারিক

জীবন হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্যই ইহাদের সপত্নী বিবাদের চিত্র এমন জীবন্ত করিয়া তিনি আঁকিতে পারিয়াছেন।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কবি লহনাকে দানবী করিয়া চিত্রিত করেন নাই, যে শিশুসুলভ সরলতার সঙ্গে তাহার চরিত্রে প্রথম হইতেই আমরা পরিচিত হইয়াছি, তাহা সকল পারিপার্শ্বিক প্রবোচনা সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মানবিক সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। খুল্লনাকে ছাগল চরাইতে পাঠাইয়া তাহার ফিরিতে বিলম্ব হইলেও সে ভাবিতে বসে,—

পরের বচনে তারে দূর কৈলুঁ দয়া।
অন্ন কষ্ট দিয়াছি আপন মাথা খায়্যা।।

এখানে তাহার স্বাভাবিক নারী-প্রকৃতি আবার সে ফিরিয়া পাইল। অনুতপ্ত হৃদয়ে খুল্লনাকে পুনরায় স্নেহ ও ভালবাসা দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য সে অগ্রসর হইয়া গেল। এইবার দুর্বলা দাসীর ভ্রূকুটিকেও সে আর লক্ষ্য করে না—'দুর্বলা দাসীকে হইল যেন পুত্র শোক।' দোষেগুণে লহনা বাংলার একটি সার্থক বাস্তবধর্মী নারীচরিত্র।

শ্রীমন্ত এই কাব্যে মুখ্যত অপরিণতবয়স্ক কিশোর চরিত্র—শৈশব হইতে কৈশোর পর্যন্তই সে এই কাহিনীতে স্থান লাভ করিয়াছে, কিন্তু অভিজাত বংশের সন্তান বলিয়া তাহার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল। প্রকৃত 'ভালো' ছেলে বলিতে আমরা যাহা বুঝি, সে তাহা নহে, অল্প বয়সেই তাহার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়াছে, তাহা লইয়াই সে গুরুর অর্থহীন ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার দুঃসাহস করিয়াছিল। গুরু যখন তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া কেবল মাত্র বলিলেন, 'কৃষ্ণ ইচ্ছা ব্যতিরেকে নাহি সমাধান,' তখন বালক হইলেও সে গুরুকে বলিল,—

গুরু টীকার বিচার কর না বল উচিত।
কেন বা প্রভুর ইচ্ছা হবে অনুচিত।।

ইহা শুনিয়াই গুরু ক্রোধে ধৈর্যহারা হইয়া গেলেন। পাঠশালার গুরুর চিরন্তন বৃত্তি তাঁহার মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিল। শ্রীমন্তকে তিনি ঢেমন, বেদুয়া ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি দিতে লাগিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রকৃত ভালো ছেলে বা গোপাল বলিতে যাহা বুঝায়, শ্রীমন্ত তাহা নহে, সে প্রতিবাদ করিতে জানে, গুরুর অন্যায় বাক্য সে সহ্য করিল না; বরং তাঁহার মুখে মুখে প্রতিবাদ জানাইল—

পঞ্চাশ কাহন কড়ি লও মাসে মাস।
আমি যদি ঢেমন তোমার জাতি নাশ।।
বুঝিয়া না কহ কথা হইয়া পণ্ডিত।
কোপেতে উন্মত্ত হয়ে বল অনুচিত।।

তারপর গুরু যখন তাহাকে জারজ বলিয়া গালাগালি দিলেন, তখন তাহার মৌখিক প্রতিবাদ সে করিতে পারিল না, কারণ, পিতাকে সে কখনও দেখে নাই। সে তখন পিতৃ-সন্ধানে বাহির হইয়া, হয় পিতাকে ফিরাইয়া আনিব, নতুবা প্রাণ-বিসর্জন দিব এই সঙ্কল্প করিল—সেই সঙ্কল্প হইতে কেহ তাহাকে বিচ্যুত করিতে পারিল না। অভিমান-রুদ্ধ কণ্ঠে জননীর নিকট গিয়া সে বলিল,—

যদি পিতাপুত্রে মোর হয় দরশন।
পুন আসি করিব তোমার চরণ বন্দন।।
যদি বা পিতার সনে নহে দরশন।
কামনা করিয়ো মোর সাগরে মরণ।।

পিতার সন্ধান না পাইলে তাহার জীবনের যে কি মূল্য, বালক হইলেও সে তাহা বুঝিতে পারিল। এই সুদৃঢ় তেজস্বিতা এবং নির্ভীক সত্যবাদিতা তাহার চরিত্রের বিশিষ্ট গুণ।

যাঁহারা মুকুন্দরাম বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া মনে করেন, ধনপতি সদাগরের কাহিনীই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন। ধনপতি সদাগরের কাহিনীর বণিক সম্প্রদায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, তাহাদের আচার আচরণ বর্ণনা করিতে গিয়া স্বভাবতই মুকুন্দরামকে এখানে বৈষ্ণব ধর্ম এবং সমাজের কথা উল্লেখ করিতে হইয়াছে। মনসা-মঙ্গলের বণিক চাঁদ সদাগর শৈব ছিলেন; মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর যখন উদ্ভব হয়, তখনও চৈতন্য ধর্ম এদেশে প্রবর্তিত হয় নাই, বরং অধঃপতিত বৌদ্ধধর্মের উপর তখন সবেমাত্র হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই সময় শৈবধর্মই সর্বপ্রথম আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইয়াছিল; চাঁদসদাগর তাহারই প্রতিনিধি সেইজন্য মনসা-মঙ্গলে বৈষ্ণব প্রভাব অত্যন্ত গৌণ। কিন্তু মুকুন্দরাম যখন ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মাত্র কিছুকাল পূর্বে সপ্তগ্রামের যে বণিক সম্প্রদায় বল্লাল সেনের সময় হইতে হিন্দুসমাজে পতিত হইয়াছিল, তাহা নিত্যানন্দের বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ফলে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষালাভ করে। মুকুন্দরাম বাংলার সমাজ-জীবনের সমসাময়িক রূপটিকেই তাঁহার কাব্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, সেই সূত্রেই নূতন বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত বণিক সম্প্রদায়ের কথাই তাঁহার কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং পারাবত ক্রীড়ায় ধনপতির সহচরদিগের সকলেরই বৈষ্ণব নাম শুনিতে পাওয়া যায়,—

মুকুন্দ মাধব বনমালী নারায়ণ।
রামকৃষ্ণ জগন্নাথ ভরত লক্ষ্মণ।।
কংসারি গোপাল হরি শ্রীধর অজিত।
হরিহর জনার্দন কুলপুরোহিত।।—ইত্যাদি

বণিক-সভায় 'হরিবংশ কথা' পাঠ হয়, 'রামায়ণ-কথা'র বর্ণনা হয়, স্বামী শীঘ্র গৃহে ফিরুন এই কামনা করিয়া খুল্লনা প্রতিদিন ভাগবত শুনেন। শিশু শ্রীমন্ত এই জন্যই কৃষ্ণলীলার অনুরূপ লীলা প্রকাশ করিয়া থাকে,—

> নগরিয়া শিশু লয়ে নিত্য করে লীলা।
> কৃষ্ণলীলা অনুরূপ শিশু করে খেলা।।
> অনুরূপে রহে কেহ চরণ নিকটে।
> বৃক্ষের আবেশে ছিরা ভাঙ্গিল শকটে।।—ইত্যাদি

শ্রীমন্তের শৈশব লীলা শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা এবং 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত-এর চৈতন্যদেবের বাল্যলীলার অনুযায়ী করিয়া রচিত হইয়াছে। বৈষ্ণব প্রভাববশত শ্রীমন্ত চরিত্রের এই অংশ রচনায় মুকুন্দরাম মৌলিকতা বিসর্জন দিয়া সম্পূর্ণ ভাবে ভাগবতকেই অনুসরণ করিয়াছেন। তারপর গয়া হইতে প্রত্যাগত চৈতন্যদেব যেমন নিজস্ব টোলে ব্যাকরণ পড়াইতে গিয়া সর্ব সূত্রেই কৃষ্ণব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, শ্রীমন্তের প্রশ্নের উত্তরেও তাঁহার পাঠশালার গুরু এই বলিয়া তাহার প্রশ্নের ব্যাখ্যা করিতে চাহিলেন, 'কৃষ্ণ-ইচ্ছা ব্যতিরেকে নাহি সমাধান।' শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রা উপলক্ষে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নে যাত্রা', 'জহ্নুমুনি হইতে গঙ্গার উদ্ধার', 'সগর বংশ উদ্ধার', 'শ্রীমন্তের জগন্নাথ দর্শন', 'গজেন্দ্র মোক্ষণ', 'অজামিলের মুক্তি', 'হরিনামের মাহাত্ম্য' প্রভৃতি প্রসঙ্গ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও মুকুন্দরামের উপর বৈষ্ণব প্রভাবেরই ফল বলিতে হইবে; কারণ, ইহাদের মধ্যে চণ্ডীর মাহাত্ম্যের কথা কিছুমাত্র নাই। ধনপতির কাহিনীর শেষাংশে হনুমান কর্তৃক ঔষধ আনিয়া মৃত সৈন্যদিগের পুনর্জীবনদান বৃত্তান্তের মধ্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রভাব অনুভব করা যায়। কিন্তু এখানে আরও একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে—কালকেতুর কাহিনীতে যেমন হিন্দুসমাজের পটভূমিকাতেই ব্যাধজীবন রচিত হইয়াছে, তেমনই ধনপতি সদাগরের কাহিনীর বৈষ্ণব সমাজও হিন্দু সমাজের পটভূমিকাতেই সৃষ্ট হইয়াছে।

মুকুন্দরাম সমসাময়িক সমাজ-জীবনের একজন সুনিপুণ দ্রষ্টা ছিলেন। মঙ্গলকাব্যের অধিকাংশ কবিই কেবল মাত্র তাঁহাদের পূর্ববর্তী কবিকে অনুসরণ করিয়াই কাব্য রচনা করিবার ফলে সমাজ ও জীবন সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে গতানুগতিকার বৈচিত্র্যহীন যে লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, মুকুন্দরামের কাব্যে তাহা পায় নাই। তিনি তাঁহার 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণে' যে আত্মজীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার কাব্যকাহিনীর সর্বশেষ বৃত্তান্তটিও তাঁহার সমসাময়িক সমাজ-জীবনটিকে প্রত্যক্ষ রাখিয়া তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই রচনা করিয়াছেন। সেইজন্য ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার সমাজ-জীবনের নিখুঁত একটি আলেখ্য তিনি আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। কালকেতুর কাহিনীর

মধ্যে মুরারি শীল চরিত্রের মত চরিত্র পূর্বে কেহ পরিকল্পনা করেন নাই, কিন্তু পারিপার্শ্বিক সমাজ-জীবনের রূপটি স্বীকার করিতে গিয়াই তিনি তাঁহার কাব্যে ইহার এত খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়াছেন। ভাঁড়ুদত্ত সেই যুগেরই একজন প্রতিনিধি বলিয়া তাহার চরিত্রটিও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। হর-পার্বতী দারিদ্র্য এবং তজ্জাত দাম্পত্যজীবনের অসন্তোষ, খুল্লনার দারিদ্র্য, খুল্লনার দুঃখ-ভোগ—ইহাদের মধ্য দিয়া সে-যুগের দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত সমাজটিরই কথা তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যক্ষ সমাজ-জীবনেব এই দুঃখ-দুর্দশার চিত্রটিই তাঁহার অন্তর অধিকার করিয়াছিল বলিয়া দুঃখের কথাতেই তিনি বড় হইয়াছেন। সে-যুগ বাংলার হিন্দু সমাজের গৌরবময় যুগ ছিল না, উহার অগৌরবের কথায়ই তাঁহার কাব্য ভারাক্রান্ত হইয়াছে।

মধ্যযুগের কবিদিগের মধ্যে মুকুন্দরামের সম্বন্ধেই ইদানীং কিছু আলোচনাও হইয়াছে, সেইজন্য তাঁহার সম্বন্ধে অধিক মন্তব্য প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি; কেবল একজন সমালোচকের মত উদ্ধৃত করিয়া এই অংশের উপসংহার করিব।

এই কাব্য সম্বন্ধে স্বর্গত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, 'Its most remarkable feature is its intense reality. Many of the incidents are superhuman and miraculous, but the thoughts and feelings and sayings of his men and women are perfectly natural, recorded with a fidelity which has no parallel in the whole range of Bengali Literature.'[১]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উপকরণ অত্যন্ত নগণ্য ছিল। ঘটনাগুলির কেন্দ্রীয় ঐক্য ও চরিত্রগুলির কার্যাবলীর পূর্বাপর সামঞ্জস্যের অভাবে সমগ্রভাবে মুকুন্দরামের কাব্যের মধ্যে কোনও সংহত সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু এই ত্রুটি মুকুন্দরামের নহে। কাহিনীগত গতানুগতিকতা যথেচ্ছ লঙ্ঘন করিয়া, নিজের রসরুচি ও উচ্চতর কাব্যাদর্শের প্রেরণায় নূতন করিয়া কাহিনী পরিকল্পনায় মুকুন্দরামের কোনই ক্ষমতা ছিল না। কারণ, ইতিপূর্বেই ইহার এই বিশিষ্ট কাহিনী একপ্রকার বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। আট দিনের ষোলটি পালায় এই দুইটি কাহিনী সংবদ্ধ করিতে হইত—তাহার ফলে বিষয়বস্তুর বর্ণনায় কোনও সংযম অবলম্বন করিবারও তাঁহার অধিকার ছিল না। নির্দিষ্ট পালার মধ্যে নির্দিষ্ট কাহিনীভাগ বা বিষয়টিকে শেষ করিতে হইত,—অতএব কোন বিশেষ পরিবেশ বা চিত্রের প্রতি কবির নিজস্ব সহানুভূতি থাকিলেও তাহা নানা দিক হইতে সংযত করিয়া চলিতে হইত। কিন্তু মুকুন্দরামের অপূর্ব ক্ষমতাগুণে কাহিনীর এই অসংলগ্ন চিত্রগুলিও স্বতন্ত্রভাবে

১। R. C. Dutt, *Literature of Bengal* (Calcutta, 1895), 116

হইলেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীকে সমগ্রভাবে বিচার না করিয়া ইহার চিত্র ও চরিত্রগুলিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচার করিলেই কবির উপর মর্যাদা দান করা হইবে।

রাঢ়ভূমিতে মুকুন্দরামের কাব্যের প্রভাব এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, পরবর্তী সমস্ত মঙ্গলকাব্যের কবিরই নিকট এই মুকুন্দরামই একপ্রকার আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিষয়-বর্ণনা ও ভাব-কল্পনায় মুকুন্দরামের পরবর্তী রাঢ়ভূমির মঙ্গলকাব্যগুলি এক বিশিষ্ট রীতির সন্ধান পাইয়াছিল। এই প্রভাবের ফলেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র পর্যন্ত এই বাঁধি-নিয়মের বৈচিত্র্যহীন গণ্ডীর মধ্যে তাঁহার অন্নদা-মঙ্গলের কাহিনীকে আনিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন।

মুকুন্দরামের কাব্যের প্রকৃত নাম 'অভয়া-মঙ্গল' বলিয়াই মনে হয়। কোনও কোনও স্থানে ইহাকে তিনি 'অম্বিকা-মঙ্গল' নামেও অভিহিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, দুই এক জায়গায় 'গৌরী-মঙ্গল' ও 'চণ্ডিকা-মঙ্গল' নামও পাওয়া যায়, তবে 'অভয়া-মঙ্গল' নামই তিনি অধিক ব্যবহার করিয়াছেন।

দ্বিজ রামদেব

চণ্ডীমঙ্গল রচনায় চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত ঐতিহ্য অবলম্বন করিয়া যে সকল কাব্য রচিত হয়, তাহাদের মধ্যে দ্বিজ রামদেবের 'অভয়া-মঙ্গল' কাব্যখানি অন্যতম। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই কবির পরিচয় এ যাবৎ অজ্ঞাত ছিল, মাত্র কিছুদিন পূর্বে তাঁহার দুইখানি পুঁথি ত্রিপুরা অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি কাব্যখানি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।[১] গ্রন্থমধ্যে কবি মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য রচনার সাধারণ প্রথা অনুসরণ করিয়া কোনও আত্মবিবরণী দিয়া যান নাই; কিংবা তিনি স্বপ্নাদেশের কথাও কিছু উল্লেখ করেন নাই। ভণিতায় তিনি কেবলমাত্র নিজের পিতার নামটি এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,

দেবীপদ দ্বন্দ্ব নিন্দিয়া অরবিন্দ
আনন্দ কন্দ মনোহর।
কবিবিধুসুত ভাবিয়া অবিরত
রোপিত মনোসরোবর।।

প্রায় সর্বত্রই ভণিতায় তিনি নিজেকে 'কবিবিধুসুত' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে

১। আশুতোষ দাস সম্পাদিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭)

তাঁহার পিতার নাম কবিচন্দ্র ছিল, এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক। তাঁহার কাব্যের উপসংহারে তিনি একটি পদে কাব্যরচনার কাল নির্দেশ করিয়াছেন,—

ইন্দু বাণ ঋষি বেদ মণজিত (?)।
রচিলেক রামদেবে সারদা-চরিত।।

এখানে প্রথম পদটির কোনও সুস্পষ্ট অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পরবর্তী আলোচনা হইতে দেখা যাইবে, দ্বিজ রামদেব পদে পদে দ্বিজ মাধবের অনুকরণ করিয়াছেন। অতএব দ্বিজ মাধবের কাব্য-রচনার কাল-নির্দেশক পদের অনুকরণে তিনিও তাঁহার কাব্য রচনার কাল নির্দেশ করিয়াছিলেন। দ্বিজ মাধব নিজের কাব্য রচনার কাল সম্পর্কে লিখিয়াছেন,

ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবে গায় সারদা-চরিত।।

দ্বিজ রামদেবও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন,—

ইন্দু বাণ ঋষি বাণ শক নিয়োজিত।
রচিলেক রামদেব সারদা-চরিত।।

'শক নিয়োজিত' পাঠটিই লিপিকর-প্রমাদে 'বেদ মণজিত' হইয়াছে। তাহা হইলেও আরও একটি বিষয়ের মীমাংসার প্রয়োজন আছে। মঙ্গলকাব্যের রচনাকাল-নির্দেশক পদ হইতে যে সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়, তাহাদিগকে ডান হইতে বামদিকে পড়িতে হয়। ইহাকেই 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' বলে। দ্বিজ মাধব এই নিয়ম রক্ষা করিয়াই তাঁহার কাব্য-রচনার কাল-নির্দেশক পদটি রচনা করিয়াছেন, কিন্তু দ্বিজ রামদেবের উক্ত পদটির রচনায় এই নিয়ম রক্ষা পায় নাই—তাঁহার রচিত পদটি হইতে যে সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়, তাহাদিগকে ডান হইতে বামদিকে লিখিয়া গণনা করিলে ইহার কোন সঙ্গত অর্থ হয় না। তবে এই রীতির ব্যতিক্রম করিয়া যদি বামদিক হইতে ডানদিকে সংখ্যাগুলি পড়া যায়, তবে ইহাতে ১৫৭৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। শেষ যুগের মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে যখন ইহাদের রচনাগত আদর্শের মধ্যে নানাপ্রকার শৈথিল্য দেখা দিয়াছিল, তখন ইহাদের কাল-নির্দেশক পদ-রচনায় সর্বদাই যে 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' রীতিটি রক্ষা পাইত, তাহা নহে—দ্বিজ রামদেবের কাব্যেও মঙ্গলকাব্য রচনার আদর্শ নিতান্ত শিথিল ভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে; তবে তাঁহার 'অভয়া-মঙ্গল' ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে কোনও আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না।

গ্রন্থমধ্যে কালকেতুর নগর-পত্তন উপলক্ষে মগ-ফিরিঙ্গিদের আগমনের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে; দ্বিজ মাধব ইহাদের উল্লেখ করেন নাই,—

ফেরাঙ্গি বান্ধিল টঙ্গি গোলন্দাজ তার সঙ্গী
মগ তেলঙ্গ ত্রিপুরার ঠাট।
দ্বিজ রামদেবে ভণে সারদা ভাবিয়া মনে
নগর পত্তন গুজরাট।।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দ্বিজ বংশীদাসের কাল নিরূপণ সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া মগ-ফিরিঙ্গিদিগের বাংলাদেশে বসতিস্থাপনের সময় সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পূর্ববর্তী কালে তাহা সম্ভব হয় নাই। একমাত্র এই তথ্যটি ব্যতীত গ্রন্থের কাল নিরূপণের আর কোনও আভ্যন্তরিক প্রমাণ নাই। তবে দ্বিজ রামদেব খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই তাঁহার 'অভয়া-মঙ্গল' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এ কথা স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ করিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে, রামদেব সকল বিষয়েই যে ভাবে দ্বিজ মাধবকে পদে পদে অনুসরণ করিয়াছেন, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এমন ভাবে পূর্ববর্তী কবিকে অনুসরণ করিবার রীতি সুলভ নহে। রামদেব তাঁহার কাব্যমধ্যে নিজের কোনও পরিচয় দিয়া যান নাই; তবে তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত চণ্ডীমঙ্গল রচনার ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়াছেন এবং সর্ববিষয়ে দ্বিজ মাধবকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলেরই লোক ছিলেন, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। অবশ্য পুঁথিতে চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত কিছু কিছু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিয়াই তাঁহাকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া স্থির করা সমীচীন হয় না; তাঁহার একখানি পুঁথি ত্রিপুরার বিলোনিয়া হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তবে মনে হয়. নোয়াখালি কিংবা চট্টগ্রাম হইতে কোনও উদ্বাস্তু বিভাগোত্তর কালে পুঁথিখানি ত্রিপুরার বিলোনিয়াতে লইয়া আসিয়া থাকিবে। তাঁহার যে দুই তিনখানি মাত্র পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের একখানিও কবিকর্তৃক স্বহস্তলিখিত বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই; অতএব চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত কয়েকটি প্রাদেশিক শব্দ স্থানীয় লিপিকর কর্তৃকও প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে।

এখন দ্বিজ মাধবের রচনার সঙ্গে দ্বিজ রামদেবের রচনার ঐক্যের বিষয় আলোচনা করিয়া ইহার প্রকৃত তাৎপর্য কি, তাহা বিচার করিতে হয়। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, দ্বিজ মাধব তাঁহার কাব্যকে 'সারদা-চরিত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, দ্বিজ রামদেব কোনও কোনও স্থলে তাঁহার কাব্যের নাম 'সারদা-চরিত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভণিতা রচনা করিবার দ্বিজ মাধবের বিশিষ্ট একটি রীতি ছিল—পয়ারে সর্বদাই তিনি প্রায় এই প্রকার ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন,

সারদার চরণ-সরোজ মধু লোভে।
দ্বিজ মাধব তথি অলি হইয়া শোভে।।

তাঁহাকে অনুকরণ করিয়া দ্বিজ রামদেবও পয়ারে প্রায় সর্বত্র এক প্রকার ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন—

দেবীপদ সরোজ সৌরভ অতিশয়।
দ্বিজ রামদেব তথি অলি হইয়া রয়।।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনেক কবিই যে ভণিতা ব্যবহার করিবার বিশিষ্ট একটি ভঙ্গি গ্রহণ করিতেন, নারায়ণ দেবের আলোচনা সম্পর্কেও তাহা উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রকার নারায়ণ দেব, ষষ্ঠীবর, বৃন্দাবন দাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস প্রভৃতি কবির ভণিতা ব্যবহার করিবার বিশিষ্ট এক একটি নিজস্ব ভঙ্গি ছিল—তাহাদের সঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যের পাঠক মাত্রই পরিচিত আছেন। দ্বিজ রামদেব দ্বিজ মাধবের এই বিষয়ক নিজস্ব রীতিটি অনুকরণ করিয়াছেন, নিজে কোনও রীতি গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, দ্বিজ মাধবের অধিকাংশ পুঁথি সূর্যবন্দনা দিয়া আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিজ রামদেবের পুঁথিও সূর্যবন্দনা দিয়া আরম্ভ হইয়াছে। গণেশ-বন্দনার পরিবর্তে সূর্যবন্দনা দিয়া পুঁথি আরম্ভ হইবার জন্য দ্বিজ মাধবকে কেহ কেহ আচার্য ব্রাহ্মণ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। সেই অনুসারে দ্বিজ রামদেবও আচার্য ব্রাহ্মণ বলিয়া অনুমিত হইতে পারেন।

দ্বিজ মাধবের পুঁথিতে দুইটি গণেশ-বন্দনা আছে, ইহা মঙ্গলকাব্যের রীতি-বিরুদ্ধ। একই আখ্যায়িকা-কাব্যের মধ্যে একই দেবতার পর পর দুইটি বন্দনা থাকিবার কোনও সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায় না, কোনও মঙ্গলকাব্যেই এই রীতি প্রচলিত নাই। যে কোনও কারণেই হউক, দ্বিজ মাধবের পুঁথিতে এই বিষয়ক একটি ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। দ্বিজ রামদেবের পুঁথিতেও দ্বিজ মাধবের এই ভ্রান্তি অনুসরণ করিয়া কাহিনীর সূত্রপাতেই দুইটি গণেশ-বন্দনার স্থান দেওয়া হইয়াছে। যেখানে পূর্ববর্তী কবির রচিত পুঁথির ভুলগুলিও পরবর্তী কোনও কবির রচনায় অনুসরণ করিতে দেখা যায়, সেখানে পরবর্তী কবির কৃতিত্ব সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। দ্বিজ মাধবের পুঁথির দুইটি গণেশ-বন্দনার ভ্রান্তিটিই যে দ্বিজ রামদেব অনুকরণ করিয়াছেন, তাহাই নহে—তিনি এই বিষয়ে দ্বিজ মাধবের ভাষা এবং রচনার আঙ্গিকটি পর্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন। প্রথম গণেশ বন্দনায় দ্বিজ মাধব লিখিয়াছেন,—

প্রণমোহ গণপতি গৌরীর নন্দন।
ভকত-বৎসল দেব বিঘ্ন-বিনাশন।।

দ্বিজ রামদেব লিখিয়াছেন,—

প্রণমহ গণাধীপ গৌরীর নন্দন।
স্মরণে আপদ খণ্ডে বিঘ্ন-বিনাশন।।

দ্বিতীয় গণেশ-বন্দনায় দ্বিজ মাধব যেখানে লিখিয়াছেন,—

হেরম্ব মহাশয় হইয়া সদয়
ঘটেতে কর অধিষ্ঠান।
বিঘ্ন করয়ে নাশ রক্ষয়ে নিজ দাস
সুচারু হউক মোর গান।।

দ্বিজ রামদেব লিখিয়াছেন,—

বন্দহু লম্বোদর সিন্দুরে সুন্দর
ঘটেতে কর অধিষ্ঠান।
সৃজিয়া মধু বৃষ্টি নায়কেরে কর দৃষ্টি
গায়েনেরে কর অবধান।।

বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনায় দ্বিজ রামদেব যে কেবল দ্বিজ মাধবের এই প্রকার ছন্দেরই অনুকরণ করিয়াছেন, তাহাই নহে—তিনি অনেক ক্ষেত্রেই দ্বিজ মাধবের ভাষা পর্যন্ত অনুকরণ করিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কাহিনীকে বিভিন্ন পালায় ভাগ করিতে গিয়া দ্বিজ মাধব কাহিনীর যেখানে আসিয়া এক এক দিনের দিবা কিংবা রাত্রি পালা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, দ্বিজ রামদেবও সেখানেই আসিয়া তাঁহারও এক এক দিনের দিবা কিংবা রাত্রি পালা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দ্বিজ মাধব যে ভাবে তাঁহার কাহিনী শেষ করিয়াছেন, দ্বিজ রামদেবও সম্পূর্ণ সেই ভাবেই তাঁহারও কাব্যের সমাপ্তি নির্দেশ করিয়াছেন। মঙ্গলকাব্য রচনায় পুচ্ছগ্রাহিতা কিংবা পরানুকরণের যে নিদর্শনই পাওয়া যা'ক না কেন, এই প্রকার অনুকরণের দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ এই দুইজন কবির সময় সম্পর্কে পূর্বালোচিত সিদ্ধান্তই যদি গ্রহণ করিতে হয়, তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উভয়ের গ্রন্থ-রচনার কালের মধ্যে প্রায় পঁচাত্তর বৎসরের ব্যবধান। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দ্বিজ মাধবের প্রতিষ্ঠা সমাজের মধ্যে স্থাপিত হইবার পর, তাঁহারই রচনার ভাব এবং অঙ্গগত আদর্শ অনুকরণ করিয়া দ্বিজ রামদেব তাঁহার কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হ'ন—কোনও মৌলিক প্রেরণার বশবর্তী হইয়া তিনি তাঁহার কাব্য রচনা করেন নাই। সেইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রধানত চট্টগ্রাম এবং পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলেও দ্বিজ মাধবের কাব্য প্রচার লাভ করিলেও, দ্বিজ রামদেবের পুঁথি চট্টগ্রামে বিস্তৃত প্রচার লাভ করিতে পারে নাই; অথচ চট্টগ্রামের ঐতিহ্য অবলম্বন করিয়াই এই পুঁথি রচিত হইয়াছিল। যে অঞ্চলে চণ্ডীমঙ্গল রচনার বিশিষ্ট কোনও ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, সেই অঞ্চল হইতেই নিতান্ত সাম্প্রতিক কালে তাঁহার মাত্র দুই তিনখানি পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব পশ্চিম এবং উত্তর বঙ্গ হইতে বাংলা প্রাচীন পুঁথির এ যাবৎ যে বিস্তৃত সংগ্রহ হইয়াছে, তাহার মধ্যে দ্বিজ রামদেবের কোনও পুঁথির সন্ধান, কিংবা তাঁহার নামেরও উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। দ্বিজ মাধবের তুলনায় দ্বিজ রামদেবের কাব্য যে একেবারেই প্রচার লাভ করিতে পারে নাই, ইহার কারণ, অধিকতর কাব্যগুণসমৃদ্ধ

দ্বিজ মাধবের পুঁথি তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম যেমন তাঁহার রচনা-গুণে তাঁহার পূর্ববর্তী চণ্ডীমঙ্গলের কবিদিগের যশ লুপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন, দ্বিজ রামদেবের সেই প্রতিভা ছিল না বলিয়া তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী কবি দ্বিজ মাধবের যশ লুপ্ত করিয়া দিতে পারেন নাই, বরং তাঁহার নিজেরই পরিচয় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যে চট্টগ্রাম অঞ্চলের ঐতিহ্য অবলম্বন করিয়া তিনি তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সেই চট্টগ্রাম অঞ্চলে পূর্ব হইতেই দ্বিজ মাধবের প্রতিষ্ঠার ফলে তিনি নিজে কোনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই—তাঁহার একখানি পুঁথিরও সেই অঞ্চলে সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাঁহার রচনার মৌলিক কাব্যগুণ থাকিলে দ্বিজ মাধবের পার্শ্বে তাঁহার পরিচয়ও রক্ষা পাইত।

মুকুন্দরামের পরবর্তী কালে আবির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও দ্বিজ রামদেব যে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এমন বোধ হয় না। কারণ, মুকুন্দরামের কোনও প্রভাব তাঁহার রচনায় অনুভব করা যায় না। কিন্তু দ্বিজ রামদেবের বণিক চরিত্রটি এখানে এই সম্পর্কে লক্ষ করা যাইতে পারে। দ্বিজ রামদেব যদিও সর্বত্র দ্বিজ মাধবকেই পদে পদে অনুসরণ করিয়াছেন, তথাপি কালকেতু কাহিনীর বণিক চরিত্রটি সম্পর্কে তিনি একটু ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিয়াছেন। দ্বিজ মাধবে বণিকের নাম পাওয়া যায় সোম দত্ত, মুকুন্দরামে মুরারি শীল। দ্বিজ রামদেব ইহাদের একটি নামও গ্রহণ না করিয়া বণিকের নাম দিয়াছেন সুশীল। তবে তিনি দ্বিজ মাধবের অনুকরণে অঙ্গুরীর মূল্য 'ছয় অযুত ধন' বলিয়াই নির্ধারণ করিয়াছেন। বণিক মুরারি শীলের চরিত্র সম্পর্কে স্বভাবতই মুকুন্দরাম উল্লেখ করিয়াছিলেন, 'বেণে বড় দুঃশীল', এবং তাহার দুঃশীলতার একটি বাস্তব চিত্র কাব্যের মধ্য দিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। মুকুন্দরামের এই 'দুঃশীল' কথাটি কি কোনও দিক দিয়া দ্বিজ রামদেবের বণিক চরিত্রের সুশীল নামকরণের কারণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে? কারণ, রামদেব হয়ত মনে করিয়া থাকিবেন, দেবী-প্রদত্ত অঙ্গুরী লইয়া মানুষ এইরূপ প্রতারণা করিতে পারে না, সেইজন্য মুকুন্দরামের ত্রুটি সংশোধন করিতে গিয়া তাঁহার 'দুঃশীল' বণিককে তিনি 'সুশীল' রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। মুকুন্দরামের তুলনায় দ্বিজ রামদেবের বাস্তব জীবন-বোধের যে কত অভাব ছিল, ইহা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

দ্বিজ মাধবের অনুকরণে দ্বিজ রামদেবও তাঁহার কাব্যে বিষ্ণুপদ ব্যবহার করিয়াছেন। দ্বিজ মাধবের বিষ্ণুপদগুলির মধ্যে যেমন কিছু কিছু পদ তাঁহার স্বরচিত এবং কিছু কিছু অন্যের রচনা হইতে গৃহীত, তেমনই দ্বিজ রামদেবের কাব্যেও কয়েকটি বিষ্ণুপদ তিনি নিজে রচনা করিয়া যোজনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রচিত বিষ্ণুপদগুলির মধ্যে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব-পদাবলী-সুলভ গীতি-মাধুর্যের প্রকাশ যে খুব সার্থক হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। নিম্নের কয়েকটি দৃষ্টান্ত তাহার প্রমাণ। নিম্নোদ্ধৃত বিষ্ণুপদটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা বর্ণনা-ধর্মী, গীতধর্মী নহে—

ভাই রে মধুবনে আর ভয় নাই।
আনন্দে বিহরে তথা রাম কানাই।।
আজ আপনি মাঠেতে আইলে নন্দের দুলাল।
না ধাইঅ না থাইঅ বোলে রঙ্গিয়া রাখোয়াল।।
দেখনা কদম্বতলে ও দীন দয়াল।
আনন্দে বিহরে রঙ্গে নন্দের দুলাল।।
রামদেব বোলো আজু ধন্য হইল ক্ষিতি।
গোধন রাখিতে আইল গোকুলের পতি।।

নিম্নোদ্ধৃত বিষ্ণুপদটির মধ্যে বৈষ্ণব-পদাবলীর সামান্য একটু ক্ষীণ সুর শুনিতে পাওয়া যাইবে মাত্র,—

কালিন্দীকূলে কি লাগি আইলুম।
সজল জলদ শ্যাম বারেক না দেখিলুম।।
দেখিব দেখিব কালা মনে ছিল আশা।
কালিন্দীর কূলে আসি হইলুম নিরাশা।।
রামদেব বলে আশা মনে মাত্র সার।
আশারে ভরসা করে সকলি সংসার।।

বিষ্ণুপদ-রচনায় দ্বিজ রামদেব দ্বিজ মাধবকে কোন দিক দিয়া অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের যে প্রভাব আসিয়াছিল, দ্বিজ রামদেবের রচনা তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না। সেইজন্যই ব্যাধ কালকেতুর মুখে ছদ্মবেশিনী চণ্ডীর এই রূপ বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়,—

মাতা তোমারে জিজ্ঞাসম বারে বারে।
স্বরূপে পরিচয় দেয় আহ্মারে।।
তোহ্মারে কে বিধি করিছে এত রূপে।
হেরিতে হরের মন ভোলে।।
তোহ্মার মুখের নিছনি হেমকর।
নয়ান নিন্দিছে ইন্দিবর।।
এ রূপ মজ্জিত (?) বারে বারে।
কমল অস্থির হইছে ভালে।।
সর্বথাএ মানুষ তুহ্মি নহয়।
কোন পাপে ব্যাধের আলয়।।
বীর জিজ্ঞাসিয়া না পায় উত্তরে।
ক্রোধে বীর জোরে গণ্ডিশ্বর।।
দ্বিজ রামদেব এই গায়।
সেবক সম্বোধে সারদায়।।

কালকেতুর কাহিনী রচনায় দ্বিজ রামদেব যেমন কোনও মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন নাই, ধনপতির কাহিনী রচনাতেও তাঁহার মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না; সেখানেও তিনি মুকুন্দরাম কিংবা দ্বিজ মাধব কাহাকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই। ধনপতির খুল্লনাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাবটি উভয় কবি প্রায় অভিন্ন ভাষায় লহনার নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। যেমন, দ্বিজ মাধব লিখিয়াছেন,—

ধনপতি বোলে প্রিয়া শুন মোর বাণী।
তোহ্মার আজ্ঞা পাইলে বিহা করিব খুলনী।।
যেন মাত্র কৈল সাধু বচন প্রকাশ।
লহনার মুণ্ডে যেন পড়িল আকাশ।।

দ্বিজ রামদেব সেখানে লিখিয়াছেন,—

ধনপতি বোলে প্রিয়া শুনছি কাহিনী।
বিবাহ করিমু তোমার খুলনা ভগিনী।।
এই মাত্র শুনে বামা সাধুর বচন।
লহনার মুণ্ডে যেন ঠেকিল গগন।।

অনুকরণ-জাত রচনায় যে স্বাভাবিক ত্রুটি ও দৌর্বল্য দেখা যায়, এখানেও তাহার পরিচয় আছে। দ্বিজ রামদেব খুল্লনার বাৎসল্যরসের চিত্রগুলি দ্বিজ মাধব অপেক্ষা বিস্তৃততর করিয়া লইয়াছেন। গুরুর গঞ্জনায় বালক শ্রীমন্ত আত্মগোপন করিয়া থাকিলে তাহার অনুসন্ধানরত খুল্লনার বাৎসল্য রসের অভিব্যক্তির বর্ণনায় যেখানে দ্বিজ মাধব এইটুকু মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন,—

খুলনায়ে বোলে দিদি করোঁ নিবেদন।
কথায়ে দেখিলা তুহ্মি ঐ চান্দ-বদন।।
গঞ্জনা ছাড়িয়া দিদি লক্ষ লাথি মার।
দাসী করি রাখ ঘরে দিয়াত কুমার।।

দ্বিজ মাধবের খুল্লনার এই সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্য দিয়া তাঁহার সন্তানস্নেহের গভীরতার কোনও অভাব বোধ না হইলেও, দ্বিজ রামদেব খুল্লনার এই উক্তিটিকে সামান্য একটু বিস্তৃততর করিয়া লইয়া বিষয়টি স্পষ্টতর করিয়া লইয়াছেন—দ্বিজ রামদেব এই অংশে লিখিয়াছেন,—

খুলনাএ বোলে দিদি করম জোড় হাত।
গঞ্জনা ছাড়িয়া মোরে কর পদাঘাত।।
না দেখি ছিরার মুখ খাইছি আপনা।
কুলশীল লাজ মোর কি আর বাসনা।।
জনম অবধি দুঃখ যতেক পাইলুম।
দেখিয়া ছিরার মুখ সব পাসরিলুম।।

কাল ছিরা হৈল মোর পরাণের বৈরী।
তিলেক বিচ্ছেদে প্রাণ ধরাইতে নারি।।

কিন্তু এ'ক্ষেত্রেও দ্বিজ মাধবই যে তাঁহার ভিত্তি, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই ভাবেই দ্বিজ রামদেব দ্বিজ মাধবকে অনুসরণ করিয়া তাঁহার রচনার শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার রচনায় বিশেষ কোনও মৌলিকতা প্রকাশ পায় নাই।

রামানন্দ যতি

মুকুন্দরামের একান্ত গ্রাম্যতা এবং ভারতচন্দ্রের স্থূল নাগরিকতা হইতে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে উদ্ধার করিবার সাধু সঙ্কল্প লইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রামানন্দ যতি নামক একজন রামায়েৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী একখানি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।[১] ইহার দুইখানি মাত্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে—একখানি মূল পুঁথি, লেখক কর্তৃক স্বহস্তে পরবর্তী কালে সংশোধিত এবং আর একখানি তাঁহার ভক্তশিষ্য কর্তৃক নিজস্ব রচনার সংযোজন সহ পুনর্লিখিত। রামানন্দের গ্রন্থ-রচনার সমাপ্তি কাল সম্পর্কে কবি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন,–

গজ বসু ঋতু চন্দ্র শাকে গ্রন্থ হয়।
চণ্ডীর আদেশ পায়্যা রামানন্দ কয়।।

ইহা হইতে ১৬৮৮ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং দেখা যায়, ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল রচনার (১৭৫২) চৌদ্দ বৎসর পর রামানন্দ যতি তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

রামানন্দ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের তীব্র সমালোচনা করিয়া ইহাকে গ্রাম্যতা এবং অশ্লীলতা দোষ দুষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মুকুন্দরামের দোষ-ক্রটির বিস্তৃত তালিকা দিয়া শেষ পর্যন্ত বলিয়াছেন- –

বুঝ্যা দেখ মুকুন্দের মতে দোষ যত।
প্রত্যেকে লিখিয়া আমি বুঝাইব কত।।
যে যে ঠায় লিখিলাম তার বিপরীত।
যদি বলে বিবেচনা করিবা পণ্ডিত।।

ভারতচন্দ্রের কাব্যও তিনি পাঠ করিয়া নিজের কাব্য মধ্যে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন সতীর পিতৃগৃহ যাত্রা উপলক্ষে ইহাতে বলিয়াছেন—

বৃহদ্ধর্ম মতে ইতে বহু বিবরণ।
ভাষাতে ভারতচন্দ্র কর্য়াচে রচন।।

১। রামানন্দ যতি-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৯৬৯)

কিংবা একান্ন পীঠের বর্ণনায় মুখ্যাত ভারতচন্দ্রের নাম উল্লেখ না করিয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নাম এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—

মতভেদে পীঠের বর্ণনা নানারূপ।
বর্ণহিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভূপ।।

রামানন্দ মুকুন্দরামের রচনার কোনও কোনও অংশ সংক্ষিপ্ত করিয়া কিংবা কোনও কোনও অংশ আত্মসাৎ করিয়া লইয়া নিজের রচনা প্রকাশ করিয়াছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই ভাবে মুকুন্দরামের নিকট ঋণও স্বীকার করিয়াছেন—

মুকুন্দের বিরচন 	ইন্দ্রপুরে কাণ্টাবন
ইন্দ্রসুত তাহে তোলে ফুল।
সর্পভূষা শোভে যাঁকে 	পুষ্পের কণ্টকে তাঁকে
দংশিয়া করিল বেয়াকুল।।

অনেক ক্ষেত্রেই কোনও ঋণ স্বীকার না করিয়া মুকুন্দ-রচিত উত্তম পদগুলি রামানন্দ এইভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন; যেমন, মুকুন্দরাম দক্ষের শিবনিন্দায় যেখানে লিখিয়াছেন—

নাহি জানি আদিমূল 	কিবা জাতি কিবা কুল
নাহি জানি কেবা মাতাপিতা।
অঙ্গরাগ চিতা ধূলি 	কান্ধেতে ভাঙ্গের ঝুলি
হেনজন আমার জামাতা।।

সেখানে রামানন্দ যতি লিখিয়াছেন—

নাহি জানি আদমূল 	কোন জাতি কোন কুল
নাহি জানি কেবা পিতামাতা।
অঙ্গরাগ চিতাধূলি 	কক্ষেতে ভাঙ্গের ঝুলি
শ্মশানেতে থাকেন জামাতা।।

এই প্রকার বহু পদ উদ্ধৃত করা যায়। অথচ পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, রামানন্দ মুকুন্দরামের উপর এমন নিন্দার ভাষা নাই, যাহা প্রয়োগ করেন নাই এবং শেষপর্যন্ত এই কথাও বলিয়াছেন যে, মুকুন্দরামের রচনার ত্রুটি মুক্ত করিবার জন্যই তিনি নিজে চণ্ডীমঙ্গল রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

মঙ্গলকাব্য সে যুগে আদিরসে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া তিনি সকল রসের শ্রেষ্ঠ রস 'ভক্তি জ্ঞান করুণা' রস অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং আদিরসকে এই ভাবে নিন্দা করিয়াছেন—

আদিরস প্রকাশে মূঢ়ের মন মজে।
তেঁঞি কবি সকলেই সেই রসে ভজে।।
শিহ্লন কহেন তাহে জগত মোহিত।
কুকাব্যেতে মত্ত কর‍্যা দেয় আবোচিত।।

কিন্তু তাঁহার মতে 'ভক্তি জ্ঞান করুণা সকল রসের শ্রেষ্ঠ।' তিনি তাঁহার কাব্যে সেই রসই পরিবেষণ করিয়াছেন বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ করিতে পারা যায় যে, কবি যদিও মুকুন্দরামকে আদিরসাত্মক কাব্য রচনা করিবার জন্য নিন্দা করিয়াছেন, তথাপি মঙ্গলকাব্যের আদিরসের যিনি চূড়ান্ত নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, সেই ভারতচন্দ্রের কথা অন্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করা সত্ত্বেও তাঁহার আদিরস-প্রবণতা বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাত্র করেন নাই।

কেহ অনুমান করিয়াছেন, রামানন্দ যদি হয়ত কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বে বাস করিতেন, সেইজন্য তাঁহার সভাকবি ভারতচন্দ্রকে নিন্দা করিতে সাহস পান নাই। কিন্তু রামানন্দ যে কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীতে বাস করিতেন তাহা তিনি কোথাও উল্লেখ করেন নাই; বিশেষত তিনি সন্ন্যাসী, সর্বতীর্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন; সেইজন্য কৃষ্ণচন্দ্রের বিরাগভাজন হইতে তাঁহার কোনও ভয়ের কারণ ছিল না।

কেহ বলিয়াছেন, ভারতচন্দ্র-রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্য তিনি পাঠ করেন নাই, সেইজন্য তিনি ভারতচন্দ্রের নিন্দা করেন নাই। কিন্তু তিনি যে অন্নদা-মঙ্গল কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন তাঁহার কাব্যে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন, অথচ তাহারই অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাসুন্দর অংশ বাদ দিয়া পড়িয়াছিলেন, এই কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বিশেষত মঙ্গলকাব্যের আদিরসাত্মক রচনার বিরুদ্ধে তাঁহার যে ক্রোধ প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা অন্নদা-মঙ্গল কাব্যের বিদ্যাসুন্দর অংশ পাঠ না করিলে এমন তীব্র হইয়া উঠিতে পারিত না।

সুতরাং মনে হয়, ভারতচন্দ্রের তিনি গুণমুগ্ধ ছিলেন, তাঁহার নাগরিক শিল্পকৌশল তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল; কারণ, তিনি তাঁহার প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু দুই শতাব্দীর পূর্ববর্তী কবি মুকুন্দরামের স্থূল গ্রাম্যতা তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। রচনার গুণে ভারতচন্দ্র সে যুগে সকল প্রকার নিন্দার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

রামানন্দের রচনা একান্ত কবিত্ববর্জিত; কেবলমাত্র কাহিনীটি তিনি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, রসের অংশ সর্বত্রই পরিত্যাগ করিয়া নৈতিক আদর্শের পথ ধরিয়া চলিয়াছেন। তাহার ফলে তাঁহার রচনায় পার্থিব জীবনরসের স্পর্শ অনুভব করা যায় না। রচনার মধ্যেও তাঁহার মৌলিকতা নাই; তিনি সুযোগ পাইলেই মুকুন্দরামের পদগুলির মধ্যেও নিজের কিছু কিছু শব্দ অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহাদের পদের গঠন পর্যন্ত অপরিবর্তিত রাখিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব-কালকে অতিক্রম করিয়াও যে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে সেদিন সক্রিয় ছিল, রামানন্দ তাহার প্রমাণ। কিন্তু রামানন্দ মুকুন্দরামের কবিত্ব যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, তাহা উপলব্ধি কিংবা কোনও প্রকার কবিত্ব উপলব্ধি করিবার মত প্রতিভা রামানন্দের ছিল না।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল মধ্যযুগের একটি সমাজ-দর্পণ; সেদিনকার বাঙ্গালীর সামগ্রিক জীবনটি যেন তাহার নানা চরিত্র ও চিত্রের মাধ্যমে কথা কহিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু রামানন্দের কাব্য তাঁহার নিজের যুগেরও কোনও চরিত্র কিংবা চিত্র অস্পষ্ট করিয়াও আঁকিতে পারে

নাই। এমন কি, এই সমাজের এই চিত্র কিভাবে জীবন্ত করিয়া তোলা যায় সেই দৃষ্টিও রামানন্দের ছিল না। মুকুন্দরাম যেখানে অত্যাচারিত পশুকুলের বেদনা ব্যক্ত করিতে গিয়া সেদিনকার সমাজে দুর্বলের উপর সবলের পীড়নের চিত্রটি গভীর সহানুভূতির সঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সম্পর্কে রামানন্দ বলিয়াছেন, 'কুরসে কঙ্কণ কবি ভাল।' মুকুন্দরামের এই বর্ণনার মধ্যে 'কুরস' বলিয়া যে কিছু নাই, তাহা যে কোনও পাঠক স্বীকার করিবেন। অথচ কোনও সমালোচক রামানন্দকে সমর্থন করিতে গিয়া মুকুন্দরামের পশুদিগের দেবীর নিকট অভিযোগ বিষয়ক বর্ণনাটিকে 'বিরক্তিকর বাড়াবাড়ি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ একথা সকলেই স্বীকার করিবেন, মুকুন্দরামের রচনায় ইহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংশ।

সংক্ষিপ্ততা মঙ্গলকাব্যের যেমন কোনও গুণ নহে, তেমনই নীতিকথাও ইহার কোনও ধর্ম নহে। বিষয়ের বিস্তারের মধ্য দিয়াই মঙ্গলকাব্যের বস্তুরস আকর্ষণীয় হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের বিষয় লইয়া যাঁহারা সংক্ষিপ্ত রচনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের রচনা মঙ্গলগান নহে, বরং পাঁচালী বা পঞ্চালিকা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানা ব্যবহারিক কারণে মঙ্গলকাব্যকে সংক্ষিপ্ত রূপ দান করিবারও প্রবণতা দেখা দিয়াছিল; ভবানীশঙ্কর দাসের 'মঙ্গলচণ্ডীর পঞ্চালিকা' তাহার একটি নিদর্শন। রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গল আটদিনে প্রতিদিন দুই পালা করিয়া আসরে গান হইবার উপায় ছিল না; পালাগুলি সেই প্রয়োজনে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, কারণ, নির্দিষ্ট সময় ব্যাপিয়া এক একটি পালা গান করিতে হইত। মুকুন্দরাম যেভাবে কাহিনীর বিস্তার করিয়া এক একটি পালা বাঁধিয়াছিলেন, তাহাই পালার আদর্শ বিস্তার। সুতরাং কাহিনীর বিস্তার গানের প্রয়োজনেই আবশ্যক, আর এই সকল রচনা গানের উদ্দেশ্যেই রচিত। সুতরাং রামানন্দ যে ভাবে কাহিনী সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে মঙ্গলগানের এক একটি পালার দাবী পূরণ হইতে পারে নাই। তাহা না হইলে রচনা মঙ্গলগান না হইয়া পাঁচালী বা পঞ্চালিকা হইয়া থাকে। রামানন্দের রচনায় যদিও পালার নির্দেশ আছে, তথাপি পালার সুনির্দিষ্ট বিস্তার তাহাতে রক্ষা পায় নাই। সেই জন্য বলিয়াছি, সংক্ষিপ্ততা মঙ্গলকাব্যের গুণ নহে, সুতরাং চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করিবার ফলে রামানন্দ তাঁহার রচনাকে মঙ্গলগানের পর্যায়ে তুলিতে পারেন নাই। আকারের দিক দিয়া রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গল মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের অর্ধেকেরও অনেক কম। সুতরাং মুকুন্দরামের কাব্য যদি আটদিনে ষোল পালায় গাহিবার উপযোগী হইয়া থাকে তবে তাঁহার অর্ধেকেরও কম যাহার আয়তন তাহা দ্বারা পুরাপুরি অষ্টাহ সঙ্গীতের প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে না। অথচ মঙ্গলগানের এই আচারগত মূল্যটুকু রক্ষা না পাইলে তাহা আর যাহাই হউক, অন্তত মঙ্গলগান নহে; কারণ, তাহা দ্বারা মঙ্গলগানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। সেইজন্যই রামানন্দ যতির রচনাকে মঙ্গলগান বলা সমীচীন হইবে না, কারণ, তিনি 'সংক্ষেপে করিল বিরচন।'

একই কারণে রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গল কোনও প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। কারণ, মঙ্গলগান হিসাবে ব্যবহার করিবার যোগ্যতা ইহা কোনও দিক দিয়াই লাভ করিতে পারে

নাই।

রামানন্দ নিজেই তাঁহার কাব্যের কোনও আগ্রহী পাঠক না থাকিবারও আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস তিনি পণ্ডিতের ভাষায় পণ্ডিতদের জন্য তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন 'মূর্খে'র জন্য রচনা করেন নাই—

(১) যতি কহে পরিহার ছন্দজ্ঞান থাকে যার
থাকে মিত্র অক্ষরের জ্ঞান।
সেই করো্যা বিবেচনা লইয়া পণ্ডিত জনা
মূর্খ হৈতে হৈয় সাবধান।।

(২) পণ্ডিতের ভাষা কর্য়া না করিও দ্বেষ।

(৩) যতি বলে মা তোমাকে এই ভিক্ষা চাই।
ভাল মন্দ বুঝে হেন লোক যেন পাই।।

(৪) রামানন্দের বড় দুঃখ—
রামানন্দ করে খেদ কি কব শাস্ত্রের ভেদ
আট দিবসের সবে গান।
তাহে আর পাই শোক নাহি দেখি বিজ্ঞ লোক
মূর্খের হাতেতে যাবে প্রাণ।

কিন্তু দেবী কবির অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন এমন মনে হয় না। কারণ, কোনও ভাল-মন্দ জ্ঞানসম্পন্ন কিংবা পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার কাব্যের পাঠক হইয়াছিলেন, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে কবির একটি মাত্র শিষ্য তাঁহার পাঠক ছিলেন।

রামানন্দ লোকহিতের জন্য তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

রামানন্দ যতি জগতে বিদিত।
লোকহিত হেতু করে ভাষা গীত।।

সুতরাং সমাজ-সেবার সাধু উদ্দেশ্য লইয়া রামানন্দ যদি তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সমাজ যে তাঁহার রচনা গ্রহণ করে নাই তাহাও সুস্পষ্ট। সুতরাং তাঁহার এই উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় নাই।

চণ্ডীমঙ্গল গার্হস্থ্য জীবনের কাব্য, মঙ্গলচণ্ডী 'যোষিতাম্ ইষ্টদেবতা', অর্থাৎ স্ত্রীজাতি কর্তৃক আরাধ্যা দেবী। কিন্তু রামানন্দ যতি সন্ন্যাসী, গার্হস্থ্য জীবনের রস তিনি নিজের জীবনে যেমন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, তেমনি 'যোষিতাম্' অর্থাৎ স্ত্রী-চরিত্রেরও যে আশা-আকাঙ্ক্ষা কি, তাহাও বুঝিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার কাব্য কোনও আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে নাই। জীবন-রস অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া জীবনের যে নীতি প্রকাশ পায়, তাহাই মঙ্গলকাব্যের নীতি। জীবনেব মধ্য দিয়া সেই নীতিবোধের বিকাশ; যেখানে

জীবনবোধের সার্থক অভিব্যক্তি নাই, সেখানে কেবল শুষ্ক নীতিকথায় মঙ্গলগানের আসরে শ্রোতা আকর্ষণ করিবার উপায় নাই। রামানন্দ যতি এই কথা বুঝিতে পারেন নাই।

সন্ন্যাসীর রচনায় মঙ্গলকাব্য সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। কারণ, সন্ন্যাসীর দৃষ্টিভঙ্গির সহিত মঙ্গলকাব্যের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য আছে। ভারতচন্দ্র সন্ন্যাস ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পর 'অন্নদা-মঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন, রামানন্দ যতি সন্ন্যাস জীবনেই তাঁহার 'কাব্য' রচনা করিয়াছেন। সুতরাং রামানন্দের নিকট বেশি কিছু আশা করা যায় না।

ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক কাল পর্যন্তও মঙ্গলকাব্য রচনার যে একটি বহির্মুখী আদর্শ প্রচলিত ছিল, রামানন্দ তাহা অনুসরণ করিয়া তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন নাই। যেমন, তাঁহার কাব্যে স্বপ্নাদেশে কাব্যরচনার কথা নাই, কোনও রাজাদেশের কথারও উল্লেখ নাই। গ্রন্থোৎপত্তির কোনও বিবরণ নাই, কবির আত্মবিবরণীও নাই।

সন্ন্যাসাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া তিনি পূর্বাশ্রমের কোন পরিচয় দেন নাই, এ'কথা সত্য। তবে তিনি সর্বতীর্থ ভ্রমণ শেষ করিয়া গৌড়দেশে ফিরিয়া আসিয়া যখন দেখিলেন 'কুরসে' বাংলার কাব্য ভরিয়া উঠিয়াছে, তখন তিনি জীবের কল্যাণের জন্য এই ভক্তিরসের কাব্য রচনা করিলেন। কিন্তু তাঁহার রচনার ত্রুটির জন্য ভক্তিরসও নিবিড়তা লাভ করিতে পারে নাই।

রামানন্দের একজন শিষ্যের নাম দ্বিজ কৃষ্ণকান্ত। তিনি গুরুর ভাবোন্মেষের (কবিত্ব উন্মেষের নহে) একটি বিবরণ দিয়াছেন। দ্বিতীয় পুঁথিখানিতে তাহা পাওয়া যায়—

যখন বয়স হৈল [illegible]ম বৎসর।
বসিয়াছিলেন আম্র বনের ভিতব।।
প্রচণ্ড বৈশাখ মাস রবি খরতর।
আকাশের শব্দ শুন্যা উদাস অন্তর।।
ভাবিলেন কে আমি ছিলাম বা কোথায়।
মর‍্যা বা সকল লোক কোথা চল্যা যায়।।
কতকাল আমি বা থাকিব এই ঠাঞি।
পূর্বে আছিলাম কোথা তাহা মনে নাই।।
এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যা হয়।
বন্ধুগণে তখন আসিয়া ধর‍্যা লয়।।

তারপর তাঁহার উপনয়নের দিন কোথা হইতে দুই সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন, তাঁহারা তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া চলিয়া গেলেন। তারপর দ্বাদশ বৎসর বয়সে তাঁহার আগম

তখন অন্ন ত্যাগ করিয়া তিনি ফলমূল আহার করিতে লাগিলেন। সর্বশেষে বেদান্ত পাঠ করিবার পর সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিলেন। তখন তিনি ভারতের নানা তীর্থ ভ্রমণ করিলেন। তারপর,

গৌড়দেশে আগমন জ্ঞানদান দিতে।

সেই সূত্রেই তিনি তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। রামানন্দ সংস্কৃত ভাষায় মোট পঞ্চাশটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন,—

সংস্কৃতে পঞ্চাশ পুস্তক করি আর।

বলা বাহুল্য, 'পঞ্চাশ পুস্তক'-এর মধ্যে একখানিরও নাম জানিতে পারা যায় না।

রামানন্দ তাঁহার বাংলা পদ্য রচনার মধ্যে মধ্যে স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়াছে।

আগেই বলিয়াছি, তিনি মুকুন্দরামের তীব্র সমালোচক ছিলেন। বোধ হয় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একই বিষয়ের একজন কবি তাঁহার পূর্ববর্তী একজন কবিকে এমন তীব্র ভাষায় ইতিপূর্বে আর সমালোচনা করিতে দেখা যায় নাই। ইহার ক্ষুদ্র একটি ব্যতিক্রম মনসা-মঙ্গলের কবি বিজয় গুপ্ত, তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী কবি কানা হরিদত্তকে সংক্ষেপে সমালোচনা করিয়াছেন।

এখানে মুকুন্দরামের মত একজন গৃহস্থ কবিকে দুই শত বৎসর পরে একজন সন্ন্যাসী কবির নিকট কি প্রকারের সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহার এটুকু নিদর্শন দেওয়া যাইতে পারে। ইহা মধ্যযুগের বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের একটি নিদর্শন বলিয়াও গ্রহণ করা যায়---

মুকুন্দের বিরচন ইন্দ্রপুরে কাণ্টাবন
ইন্দ্রসুত তাহে তুলে ফুল।
সর্পভূষা শোভে আঁকে পুষ্পের কণ্টকে তাকে
দংশিয়া করিল বেয়াকুল।।[১]

১। স্বর্গের পুষ্পবনে কাঁটা থাকিতে পারে না, ইহাই রামানন্দের বক্তব্য। কিন্তু মুকুন্দরামের স্বর্গ যে রবীন্দ্রনাথের মত 'বাঙ্গালীর আম-বাগান' ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই, রামানন্দ তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

আরো শুন অদ্‌ভুত জন্মিবে ব্যাধের সুত
সেখানে গেলেন ভগবতী।
কলিতে কলিঙ্গবনে কালকেতু সিংহাসনে
মল্লযুদ্ধ করিলেক কতি।।
কলিঙ্গেতে গুজরাট তাহে বাঙ্গালীর হাট
বসিল ছাপান্ন গাঞি রাটী।[১]
না জানে কলিঙ্গরায় বন কাটাইয়া তায়
কালকেতু করিলেক বাড়ী।।
ঘরখানা সয়াকোষ ইথে অনুভব দোষ
কালী গেলা বন্দ্যানের ঘরে।
কোটালের সনে রণ করেন অনেকক্ষণ
এইরূপে অপমান করে।।
অপমান করে আর কত।
দেবীর বক্ষের পরে জীবগণ চিত্র করে
কাঞ্চলীতে পশুপক্ষী যত।।
নিমাই চরণ রায় প্রতিপদে দোষ গায়
পুস্তকের নাম দোষো নাশ।
অষ্টাহের গান হয় এতো দোষ ধর‍্যা কয়
তাহে পাবে দোষের প্রকাশ।।
ডিঙ্গা ডুবিলেক জলে চণ্ডী হাসে খলখলে
ইন্দ্রকে বা সাধিলেন কত।
কালী যান কালীদয় পাথর উঠান কয়
ফিরিছেন কালী অবিরত।
পার্বতী যে পঞ্চশর পূরেন প্রভুর পর
সেই শর শিশুর উপর।
কালীদহে পুরে কালী মাকে দেয় এত গালি
হিন্দু নহে মুকুন্দ-গাবর।।[২]
মশানেতে হল বুড়ী ফির‍্যাসেন গুড়ি গুড়ি
ঠোঁটে কর‍্যা দেন ন্যা টোপর।
নিমেষে করেন সৃষ্টি দেবে যার নাই দৃষ্টি
তার এত লিখিল পামর।।[৩]

১। রামানন্দ নিজস্ব তীর্থভ্রমণের অভিজ্ঞতা দিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, কলিঙ্গে গুজরাট হইতে পারে না, তাহাতে বাঙ্গালী থাকিবার কথা নহে; সুতরাং মুকুন্দরামের এই উক্তি ভুল।

২। মুকুন্দরামকে এখানে অহিন্দু এবং 'গাবর' বলিয়া গালি দেওয়া হইতেছে।

৩। এখানে মুকুন্দকে পামর বা পাপিষ্ঠ বলিয়া গালি দেওয়া হইতেছে।

শাস্ত্রের কথন হয় তবে পণ্ডিতেরা লয়
মিথ্যা বর্ণনাতে এত দোষ।
কিছু বোধ নাই যার[১] দোষ গুণ কিবা তার
দোষ শুন্যা করে আরো রোষ।।
চণ্ডী যদি দেন দেখা তবে কি তা যায় লেখা
পাঁচালীর অমনি রচন।
বুদ্ধি নাই যার ঘটে তারা বলে সত্য বটে
পথে চণ্ডী দিলা দরশন।।[২]
এত দোষ উদ্ধারিতে লোকের চৈতন্য দিতে
চণ্ডী রচে রামানন্দ যতি।
অনেকের অনুরোধ কেহ না করিও ক্রোধ
অনেক শিষ্টের অনুমতি।।[৩]

দেখা যাইতেছে, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের লৌকিক অংশের রচনা রামানন্দ যতিকে আঘাত করিয়াছিল এবং তাহারই দোষ-ত্রুটি তাঁহার নিজের দিক হইতে (মঙ্গলকাব্যেব দিক হইতে নহে) সংশোধন করিয়া তিনি তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং রামানন্দের কাব্য মুখ্যত মুকুন্দরামের প্রতিবাদ।

রামানন্দ মুকুন্দরামের রচনাকে সাধন ভজনের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া বিচার করিতে গিয়া ভুল করিয়াছেন, কাব্যের দিক দিয়া বিচার করিলে এই ভুল করিতেন না।

দেখা যাইতেছে চণ্ডীমঙ্গলের নূতন কোন কবির পুঁথির সন্ধান পাইলেই সেই পুঁথির সম্পাদনা করিতে গিয়া তাহার সম্পাদক সেই পুঁথির রচয়িতাকে মুকুন্দরাম হইতেও শ্রেষ্ঠতর কবি বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন এবং নিজের 'আবিষ্কৃত' গ্রন্থের মূল্য বাড়াইতে চাহেন। রামানন্দ যদি সম্পর্কে এমন-কথা কোনও কোনও স্থানে বলা হইয়াছে যে, তিনি অনেক বিষয়েই মুকুন্দরাম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু নূতন পুঁথি আবিষ্কারের গুরুত্ব যত গভীরই হোক না কেন, তাহা দ্বারা যদি বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া যায়, তবে তাহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় হয়। মঙ্গলকাব্যের একদিকে মুকুন্দরাম ও আরেক দিকে ভারতচন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবির সন্ধান আজও বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায় নাই। একথা স্মরণ রাখিতে হইবে প্রতিভা কখনও আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে না। নিজ গুণেই তাহা প্রকাশ পায়। রামানন্দ যতির নাম আজও অজ্ঞাত থাকিলেও বাংলা সাহিত্যের কোনও ক্ষতি হইত না।

১। মুকুন্দকে এখানে নির্বোধ বলা হইতেছে।

২। মুকুন্দরামের আত্ম বিবরণীর এই উক্তি সত্য হইতে পারে না, রামানন্দের এই অভিমত।

৩। অর্থাৎ অনেক শিষ্ট ব্যক্তির এই প্রতিবাদে সম্মতি আছে।

কৃষ্ণরাম দাস

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবি কৃষ্ণরাম দাস একাধিক বিষয়ক মঙ্গলকাব্য রচনার খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'কালিকা-মঙ্গল', 'ষষ্ঠীমঙ্গল', 'রায়-মঙ্গল', 'শীতলা-মঙ্গল', ও 'কমলা-মঙ্গল' পুঁথির সন্ধান এ' যাবৎ পাওয়া গিয়াছিল।[১] সম্প্রতি তাঁহার রচিত চণ্ডী-মঙ্গলে'র একটি খণ্ডিত পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে।[২] পুঁথিতে কেবল মাত্র 'কমলে কামিনী'র বৃত্তান্তটি আছে। ইহাতে অষ্ট মঙ্গলারও একটি খণ্ডিত অংশ পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতেই মনে হয়, তিনি সমগ্র চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশিষ্ট অংশের সন্ধান এখনও পর্যন্ত কোথা হইতেও পাওয়া যায় নাই।

তাঁহার রচিত অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে কৃষ্ণরাম যেভাবে ভণিতার ব্যবহার করিয়াছেন, সেই ভাবে তিনি চণ্ডীমঙ্গলেও ভণিতার ব্যবহার করিয়াছেন—

নাম ভগবতী দাস নিমিতা গ্রামেতে বাস
কায়েস্ত কুলেত উৎপত্তি।
হইয়া ত একচিত রচিলা চণ্ডীর গীত
কৃষ্ণরাম তাহার সন্ততি॥

তিনি তাঁহার অন্যান্য মঙ্গলকাব্য অপেক্ষা চণ্ডীমঙ্গল অধিক যত্ন করিয়া লিখিয়াছেন, তাহাও তাঁহার কাব্যে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন.—

কালীর পাঁচালী আদি রচিনু সকল।
অধিক যতনে এই চণ্ডীর মঙ্গল॥

সেইজন্য তিনি গায়েনদের 'গুরুর দোহাই' দিয়া অনুরোধ করিয়াছেন, যেন তাঁহারা গীত গাহিবার সময় ইহার কোনও অংশ পরিত্যাগ না করেন। কারণ, চণ্ডীর আদেশে তাঁহার এই কাব্য রচিত হইয়াছে—

শুনবে গায়ন সব এক বোল আগে।
যে যাও এড়িয়া গীত মোর দিব্য লাগে॥
চণ্ডীর আদেশে ইহা রচিত যতেক।
নিশ্চয় এড়িয়া গেলে অধর্ম অনেক॥

১। 'কবি কৃষ্ণরামদাসের গ্রন্থাবলী', সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (১৯৫৮)

২। অক্ষয়কুমার কয়াল, 'একটি অপ্রকাশিত চণ্ডীমঙ্গল', সমকালীন, ১৩৭৮, ৯ম সংখ্যা, পৃ. ৪৩৩-৪৩৭

কৃষ্ণরামের ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষার প্রভাব মধ্যে মধ্যে লক্ষ করা যায়। কমলে কামিনী দেখাইতে না পারিয়া কারারুদ্ধ হইবার জন্য শ্রীমন্ত এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছে—

সুবর্ণের হার পায়্যা গলায় দিলাম লয়্যা
সর্প হয়্যা দংশিলেক সে।
চন্দন শীতল জানি সুখেরে পরিনু আমি
অনল হইয়া পোড়ে দে॥

শুধু বাংলায় নহে, বৈষ্ণব পদাবলী অনুসরণ করিয়া তিনি কয়েকটি ব্রজবুলি পদও রচনা করিয়াছেন—

ত্রিভুবন জননী লীলা কর অপঘন
হর নাহি বুঝত মায়া।
মাগত লছমিনাথ কমলাসন
যসু পদপঙ্কজ ছায়া॥
লোচন সারস তহিঁ মধুলালস
ভ্রমরপতি ভুরু জোর।
মালতিমালা কবরি ভেল বেড়ল
তড়িত জড়িত ঘনঘোর॥

কোটাল চরিত্রটিকে কৃষ্ণরাম অবাঙ্গালী বলিয়া পরিকল্পনা করিয়া তাহার মুখে হিন্দী ভাষারও ব্যবহার করিয়াছেন—

কোন হ্যায় সিতাব হুজুর আও মেরি।
কাহেকু নাগারা কিয়া দিল্ লাগা তেরি॥

কতকগুলি প্রচলিত প্রবাদ বাক্যকে কৃষ্ণরাম তাঁহার কবিতার ছন্দে গাঁথিয়া দিয়াছেন—

(১) না থাকিলে নয়ন মুকুরে করে কি।
(২) গায়নের গুণ কি বুঝিতে পারে কালা?
(৩) খোজার না হয় সুখ সুরত প্রসঙ্গে।
(৪) শিশুর কিসের ভয় ভুজঙ্গ ধরিতে।
(৫) তাবৎ জননী প্রতি পুত্রের মমতা অতি যাবৎ যুবতী নাহি পাশে।
(৬) সুজনের দড় বাক, যেন পাষাণের আঁক
প্রেম কভু তিলেক না টুটে।
কাপুরুষে কত কয় কিছু তার সত্য নয়
পয়োমুখ বিষকুম্ভ বটে॥

১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণরামের 'কালিকা-মঙ্গল' রচিত হয়, চণ্ডীমঙ্গল যে তাহার পরবর্তী রচনা তাহা তাঁহার পূর্বোদ্ধৃত একটি পদ হইতে জানিতে পারা গিয়াছে।

মুক্তারাম সেন

চণ্ডীমঙ্গলের অন্যতম প্রধান কবির নাম মুক্তারাম সেন।[১] তাঁহার কাব্যের প্রকৃত নাম সারদা-মঙ্গল। এই সম্বন্ধে কাব্যমধ্যে তাঁহার এই প্রকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—

শুন শুন সর্বলোক সারদা-মঙ্গল।
একচিত্ত হইয়া শুন না হইয়া চঞ্চল।।

ইহা 'অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী পাঞ্চালী' নামেও পরিচিত।

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত দেবগ্রাম (বর্তমানে আনোয়ারা) নামক গ্রামে কবি মুক্তারাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জ্ঞাতিবংশীয়েরা অদ্যাপি সেই গ্রামে বসবাস করিতেছেন। কবির বংশ চট্টগ্রামের মধ্যে বিশিষ্ট কুলীন বলিয়া সম্মানিত। কবি তাঁহার কাব্যে এই প্রকার আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন,—

চাটেশ্বরী রাজ্যে বন্দোম্ পাশ্চমে সাগর।
বাড়ব আনল পূর্বে তীর্থ মনোহর।।
তাহার উত্তরে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ হর।
চন্দ্রশেখর যাতে বসতি শঙ্কর।।
মহাসিংহ নামে ক্ষেত্রে দেশ অধিকারী।
সিংহ সম রণে দ্বিজগণ প্রতিকারী।।
ধার্মিক শরীর দানে অকাতর নাম।
তেন মত প্রতি সৈন্য লাল নন্দারাম।।
চাটীগ্রামে রাজ্যেতে বন্দোম নিজ গ্রাম।
বন্দহুঁ জনম ভূমি দেবগ্রাম নাম।।
আদ্যগোত্র আদ্য সেন ভেষজে বিশ্রাম।
বসতি জাহ্নবী কুলে নাঢ়া হেন নাম।।
স্বদেশেতে বংশাবলী ছিল পূর্বাপর।
বেদের উদ্ভব বৈদ্য পঞ্চম প্রবর।
আদ্য অত্রি অর্জুন গার্গব বার্হস্পত্য।
স্বকীয় বিদ্যাতে পর উপকারী চিত্ত।।
তথা হৈতে আইলা কেহ রাজসঙ্গী হইয়া।
বাড়ব্যাখ্যা চাটেশ্বরী রাজ্য উদ্দেশিয়া।।

১। মুক্তারাম সেন, সারদা-মঙ্গল, আবদুল্ল্ করিম সম্পাদিত (সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২৪)।

সে বংশে প্রপিতামহ রাঢ় জয়দেব।
তান পুত্র নিধিরাম স্যাগত পারগ।।
পিতা মোর মধুরাম তাহান সন্ততি।
তিন পুত্র লৈয়া কৈল দেয়াঙ্গ বসতি।।
সেন গোবিন্দ ব্রজলাল মুক্তারাম।
সদাএ ভবানী পদে মানস বিশ্রাম।।

কবির জ্ঞাতিবংশীয়দের নিকট যে বংশ-পত্রিকা রক্ষিত আছে, তাহাতে একটি সংস্কৃত শ্লোক লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও কবির সংক্ষিপ্ত বংশ-পরিচয় পাওয়া যায়,—

শাকে চৈব বিয়দ্বেদবাণ চন্দ্রামীতে পুরা।
আদ্য গোত্রোদ্ভবো পঞ্চ প্রবরো বৈদ্যসত্তমঃ।।
শ্রীযুক্ত যাদবরায়ঃ শম্ভুদর্শনকামায়া।
সার্ধং শ্রীমন্ত ভৃত্যেন চট্টলে চন্দ্রশেখরে।।
যশোহরাৎ সমায়াতঃ কালিয়া গ্রামতঃ খলু।
তদ্‌ভ্রাতা মাধবরায়স্তথৈবাত্মপুরোহিতৈঃ।।
নাম্না শ্রীলক্ষ্মীকান্তোহসৌ ন্যায়ালঙ্কারসংজ্ঞকঃ।
যাদবেন সহায়াতৌ তীর্থদর্শনমানসৌ।।[১]

ইহা হইতে কবির পূর্বপুরুষ যাদব রায় সম্বন্ধে জানিতে পারা যায় যে ১৫৪০ শকাব্দ (১৬১৮ খ্রীঃ) ফাল্গুন মাসে (সম্ভবত শিবচতুর্দশী উপলক্ষে) তিনি সহোদর মাধব রায়, নিজের কুল-পুরোহিত লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ালঙ্কার ও শ্রীমন্ত নামক ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার পূর্ব বাসস্থান যশোহর জেলার অন্তর্গত কালিয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া তীর্থভ্রমণ ব্যপদেশে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড ও চন্দ্রশেখরাধিষ্ঠিত স্বয়ম্ভূশিব দর্শনের জন্য আগমন করেন।

সম্ভবত চন্দ্রশেখর দর্শনের পর তাঁহারা আর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন নাই, চট্টগ্রামেই বসতি-স্থাপন করেন। স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন না করিবার আরও নানা রাজনৈতিক এবং সামাজিক কারণ থাকিতে পারে। এইভাবে সেকালে বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য বংশ আসিয়া চট্টগ্রাম এবং পূর্ব বাংলার নানা স্থানে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

মুক্তারামের পূর্বপুরুষ যাদব রায়ের চট্টগ্রামে বসতি-স্থাপন সম্বন্ধে এই কাহিনী প্রচলিত আছে,—যাদব রায় ও মাধব রায় যখন চন্দ্রনাথ দর্শনে আসিয়াছিলেন, তখন চট্টগ্রামের অন্তর্গত দেবগ্রাম নিবাসী তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মবণচাঁদ চৌধুরী সপরিবারে চন্দ্রনাথ আসিয়াছিলেন, যাদব রায় ও মাধব রায়ের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয় এবং যাদব রায়ের বিদ্যা ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার হস্তে নিজের কন্যা সম্প্রদান করেন এবং

১। মুক্তারাম সেন, ভূমিকা। ৯০

ঘরজামাই করিয়া দেবগ্রামে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দেন। অতঃপর মাধব রায় জানিতে পারেন, মরণচাঁদ চৌধুরী বৈদ্যবংশ-সম্ভূত নহেন, আইচ দাস উপাধিকারী কায়স্থ বংশীয়। মাধব রায় ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া অবশেষে ভ্রাতৃবধূকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিয়া গোপনে পলায়ন করেন। মরণচাঁদ কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থে এক বিরাট দীঘি খনন করাইয়া দেন, ইহা এখনও 'আইচের ঝির পুনী' নামে খ্যাত।

অতঃপর যাদব রায় পুনরায় দার-পরিগ্রহ করেন, এবং দ্বিতীয় পত্নী হইতেই মুক্তারামের পিতামহ নিধিরামের জন্ম হয়। নিধিরামের পুত্র মধুরাম হইতেই গোবিন্দরাম, ব্রজলাল ও কবি মুক্তারামের জন্ম হয়। মুক্তারাম চিরকুমার ছিলেন: তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দরামের বংশ অদ্যাপি বর্তমান আছে। অবশ্য উল্লিখিত কাহিনীর মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য আছে কিনা তাহা জানা যায় না।

কবি মুক্তারাম সাধক পুরুষ ছিলেন। তিনি বিষয়-নিঃস্পৃহ হইয়া তীর্থ পর্যটন ও সাধুসঙ্গ দ্বারাই জীবন অতিবাহিত করিতেন। সারদা-মঙ্গলই তাঁহার একমাত্র কাব্যগ্রন্থ।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কবির প্রপিতামহ যাদব রায় ১৫৪০ শকাব্দ বা ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে আগমন করেন। অতএব কবিকে ইহার অনুমানিক একশত বৎসর পরবর্তী বা ১৭১৮ কিংবা তন্নিকটবর্তী কোন সময়ের লোক বলিয়া ধরিতে পারা যায়।

কবির আত্মবিবরণীর মধ্যে 'দেশ অধিকারী' বলিয়া মহাসিংহের নামোল্লেখ রহিয়াছে। ইতিহাসে তিনি দেওয়ান মহাসিংহ নামে পরিচিত। তিনি চট্টগ্রামে মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে দেওয়ান ছিলেন, পরে তিনি নায়েবের পদেও অধিষ্ঠিত হন। মহাসিংহের সময় সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ১৭৪১ অব্দ হইতে ১৭৫৯ অব্দ। অতএব, কবি মুক্তারাম এই সময়ের মধ্যে বর্তমান ছিলেন বলা যাইতে পারে।

মুক্তারামের কাব্যমধ্যে দুই স্থলে গ্রন্থ-রচনার সময় নির্দেশক দুইটি পদ দেখিতে পাওয়া যায় —

> গ্রহ ঋতু কাল শশী শক শুভ জানি।
> মুক্তারাম শেনে ভণে ভাবিয়া ভবানী॥

'কাল' শব্দে তিন ধরিলে ইহার অর্থ ১৩৬৯ শকাব্দ বা ১৪৪৭ খ্রীষ্টাব্দ হয়।[১] কিন্তু এই সময়ের সঙ্গে গ্রন্থোক্ত অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্যের সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায় না। অতএব, এই কাল শব্দটিকে কেহ 'কায়' ধরিয়া ইহার অর্থ ছয় করিতে চাহন; এই ধারণাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়, সম্ভবত লিপিকর প্রমাদে 'কায়' 'কাল' হইয়া থাকিবে।[২] অতএব কবির নিজের উক্তি অনুসারেও দেখা যাইতেছে যে, ১৬৬৯ শকাব্দ বা ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি

১। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এইভাবে হিসাব করিয়া কবির কাল নির্ণয় করিয়াছেন। ব-সা-প ১, ৩০২

২। সা-প-প, ৪০-১৬৬

তাঁহার গ্রন্থ-রচনা সম্পন্ন করেন।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, চট্টগ্রাম অঞ্চলে দ্বিজ মাধবের চণ্ডী বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। দ্বিজ মাধবের কাব্যকে আদর্শ করিয়া মুক্তারামের কাব্য রচিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহার কাব্যে দ্বিজ মাধবের প্রভাবের কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। মুক্তারামের রচনা অনেকটা প্রাচীন পাঁচালীরই উন্নত এবং আধুনিক সংস্করণ বলিয়া মনে হইতে পারে।

মুক্তারামের কাব্যেরও দুইটি ভাগ,—প্রথম ভাগে কালকেতুর কাহিনী, দ্বিতীয় ভাগে ধনপতি সদাগরের কাহিনী। উভয় কাহিনীই সংক্ষিপ্তভাবে রচিত। চণ্ডীর নিকট পশুদিগের কালকেতুর বিরুদ্ধে অভিযোগের বৃত্তান্তটি এই প্রকার সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে,—

এই মত কথ কাল যদি নির্বাহিল।
পশুগণে দুর্গাস্থানে কান্দিয়া কাহিল॥
তিষ্ঠিতে না পারি বনে কালকেতুর শরে।
পুত্র দারা এক্ষ স্থানে রহিতে নারি ঘরে॥
বোলে তাহে মহামাএ না কর ক্রন্দন।
তোর হেতু কালকেতু লভিবেক ধন॥
সুখমনে পশুগণে যাও নিজালয়ে।
তার ঠাঁই আমি যাই না করিয় ভয়ে॥
তদন্তরে নারায়ণী গোধিকা হইলা।
অরণ্যের পন্থ মুখে আগুছি রহিলা॥

হরিরাম

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যের প্রত্যক্ষপ্রভাব-প্রণোদিত যে কয়খানি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হয়, তাহাদের মধ্যে দ্বিজ হরিরামের কাব্যখানি উল্লেখযোগ্য।[১] সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হরিরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হয়। হরিরাম তাঁহার কাব্যমধ্যে শোভাসিংহ নামক এক ব্যক্তির নামে চণ্ডিকার প্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছেন। শোভাসিংহ মেদিনীপুর জেলায় ঘাটালের অন্তর্গত চিতুয়া ও বরদাবাটী পরগণার অধীশ্বর ও কবির আশ্রয়দাতা বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। শোভাসিংহের মৃত্যুর কাল জানিতে পারা যায়, তিনি ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন বলিয়া বিশ্বাস। অতএব মনে হয়, কবি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে শোভাসিংহের আশ্রয়ে বাসকালীন এই কাব্য রচনা করেন। দ্বিজ হরিরামের কাব্যের যে পুঁথিখানা পাওয়া গিয়াছে তাহা সুপ্রাচীন, ইহা ১৬৮০ সালে অনুলিখিত। অতএব পুঁথিখানিকে কবির প্রায় সমসাময়িক বলা যাইতে পারে।

১। ব-সা-প ১, ৩১০-২০

হরিরামের কাব্যে চণ্ডীমঙ্গলের দুইটি কাহিনী অর্থাৎ কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী ও ধনপতি-খুল্লনার কাহিনী ইহাদের উভয়েরই সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। হরিরামের রচনায় কবিত্বের পরিচয় পাওয়া না গেলেও তাহাতে ভাষার পারিপাট্য লক্ষ করিবার বিষয়; গতানুগতিক উপায়ে সহজ বর্ণনায় লেখক সরলভাবে কাহিনীটি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, রচনায় কিংবা চরিত্র-পরিকল্পনায় কোথাও আন্তরিকতার স্পর্শ লাভ করা যায় না; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিত্র ও ভাষায় মুকুন্দরামের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। তবে সর্বত্রই তাঁহার ভাষা গ্রাম্যতামুক্ত হইয়া আসিয়া যুগোচিত পরিমার্জনা লাভ করিয়াছে। কাব্যখানি বিশেষ প্রচলিত ছিল না বলিয়া ইহার ভাষা পরিবর্তিত হইতে পারে নাই। সুতরাং ইহার ভাষার অকৃত্রিমতা সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া ইহা যে মুকুন্দরামের পরবর্তী রচনা তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না।

জয়নারায়ণ সেন

মুকুন্দরামের পরবর্তী আর একজন চণ্ডীমঙ্গলের কবির নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। তাঁহার নাম লালা জয়নারায়ণ সেন।[১] তিনি বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত জপসা গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে জয়নারায়ণের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না; তবে তিনি 'হরিলীলা' নামক সত্যপীরের কাহিনী অবলম্বন করিয়া আর একখানি পাঁচালী কাব্য রচনা করিয়াছিলেন[২]। তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, হরিলীলা কাব্য ১৬৯৪ শকাব্দ বা ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ইহার পূর্বে রচিত বলিয়া অনুমিত হয়।

আধ্যাত্মিক সাধনা, পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের খ্যাতিতে জয়নারায়ণের বংশ বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এই বংশের পূর্বপুরুষ বেদগর্ভ সেন যশোহর জেলার ইত্না গ্রাম হইতে বিক্রমপুরে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। অতঃপর কয়েকখানি গ্রাম ভূসম্পত্তিরূপে অর্জন করিয়া বিলদায়িনীয়াতে নিবাস স্থাপন করেন। রাজা রাজবল্লভ বেদগর্ভ সেনেরই অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ।[৩] এই বংশেরই এক শাখায় দেওয়ান কৃষ্ণরাম জন্মগ্রহণ করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে দেওয়ান কৃষ্ণরাম বিক্রমপুরের অন্তর্গত চাঁদপ্রতাপ প্রভৃতি পরগণার রাজস্ব আদায় করিতেন। দেওয়ান কৃষ্ণরামের দ্বিতীয় পুত্রের নাম রামপ্রসাদ। তাঁহার স্ত্রীর নাম সুমতি দেবী। ইঁহাদের পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করে—রামগতি, জয়নারায়ণ, কীর্তিনারায়ণ, রাজনারায়ণ ও নরনারায়ণ। প্রথম পুত্র রামগতি পরম সাধক ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাংলায় 'মায়াতিমির-চন্দ্রিকা' ও সংস্কৃতে 'যোগকল্পলতিকা' গ্রন্থ রচনা

১। জয়নারায়ণ সেন, ব-সা-পা, ১, ৩৭৭-৭৮, সা-প-প ৭, ১-২৪; ঐ ১৫২ ৬২; গ-স ৪২৪৮
২। দীনেশচন্দ্র সেন ও বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮২৮); গ-স ৪৩৪৯
৩। দীনেশচন্দ্র সেন, ৫০৭।

করেন। এতদ্ব্যতীত 'ভবকলহ-ভঞ্জিকা' নামে আরও একখানি কাব্য তিনি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। গ্রন্থে আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন—

ব্রহ্মপুত্র মহাতীর্থ পূর্বেতে প্রচার।
পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংসার।।
মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহে সদ্‌জ্ঞানী বিস্তার।।
বিশিষ্ট অম্বষ্ঠ শ্রেণীর বসতির স্থান।
জপসা নামেতে গ্রাম তথায় প্রধান।।
শ্রীরামপ্রসাদ রায় বিখ্যাত তাহাতে।
বৈদ্যশ্রেষ্ঠ লালা খ্যাতি যাঁর নিজামতে।।
জপসা উত্তম গ্রাম বসতি আলয়।
রামগতি নামে তাঁর প্রধান তনয়।।

রামগতি শেষ জীবনে প্রথমত কালীঘাট ও অতঃপর কাশীধামে গিয়া ধর্মজীবন যাপন করেন; ৯০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কাশীতেই দেহরক্ষা করেন।

রামপ্রসাদের দ্বিতীয় পুত্র জয়নারায়ণ, তিনিই 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' ও 'হরিলীলা'র প্রণেতা। চতুর্থ পুত্র রাজনারায়ণ 'পার্বতী-পরিণয়' নামক একখানি সংস্কৃত কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। জয়নারায়ণ তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন,—

অনুজ তাহার দিব্য সুকাব্য রচিছে।
পার্বতীর পরিণয় নাম রাখিয়াছে।।

জয়নারায়ণ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও রামগতি রায়ের কন্যা আনন্দময়ীও কবিত্বের খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি 'হরিলীলা' কাব্য-রচনায় পিতৃব্যকে প্রচুর সাহায্যই যে কেবল করিয়াছিলেন, তাহা নহে—স্বরচিত বহু পদও তিনি তাহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।

জয়নারায়ণের চণ্ডীকাব্যে অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মত দুইটি আখ্যায়িকা অর্থাৎ কালকেতু-ফুল্লরা ও ধনপতি-খুল্লনা, উভয়ের সহিতই সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। অতএব তিনি কাহিনীর দিক দিয়া ভারতচন্দ্রের অনুবর্তন না করিয়া প্রাচীনতর প্রথারই অনুবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু রচনার আদর্শের দিক দিয়া তিনি ভারতচন্দ্রের নিকট মুখ্যত ঋণী বলিয়া অনুভব করা যাইতে পারে। আদিরসের বর্ণনায় জয়নারায়ণ ভারতচন্দ্র হইতে কতকটা সংযত, তথাপি তাহা সমসাময়িক সমাজের রুচির সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল। স্থানে স্থানে এই বিষয়ে ভারতচন্দ্রের সমকক্ষতা যে তিনি লাভ না করিয়াছেন, তাহাও বলিবার উপায় নাই।

জয়নারায়ণ সংস্কৃত সাহিত্যে পরম পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন; চণ্ডীকাব্য তাঁহার

সংস্কৃত কাব্য ও সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রাদিতে পাণ্ডিত্য অর্জনেরই ফল। চণ্ডীকাব্যের প্রথম অংশে শিব-প্রসঙ্গ বর্ণনায় তিনি কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' হইতে স্থানে স্থানে অনুবাদের এমন সাফল্য দেখাইয়াছেন, যাহা প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে খুব সুলভ নহে।

ভারতচন্দ্রের মত ভাষার পারিপাট্য ও লাবণ্য জয়নারায়ণের কাব্যের অন্যতম বিশেষত্ব। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব অবশ্য ইহাতে সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। তবে ভারতচন্দ্র রচনা-শক্তির মৌলিকতা-গুণে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের ভাষাকে যেমন অপূর্ব কৌশলে নিজস্ব করিয়া লইয়া তাহার মধ্যে অদ্ভুত গতিবেগ দান করিয়াছিলেন, জয়নারায়ণ তেমন পারেন নাই। অনেক স্থলেই তাঁহার ভাষার রূপ সুমার্জিত, তথাপি এই গতিবেগের অভাবে তাহা যেন চাকচিক্যবিহীন। বিশেষত পদের মিলের দিক দিয়া (rhyming) ভারতচন্দ্র যে অপূর্ব নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন, জয়নারায়ণ তাহা দেখাইতে পারেন নাই; অনেক স্থলেই ক্রিয়াপদের সহিত ক্রিয়াপদের মিল দেওয়াতে তাঁহার রচনা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। ইতিপূর্বেই বাংলা কাব্যের ভাষায় বৈষ্ণব গীতিকাব্যের ভাষা ও রচনার প্রভাব দেখা দিয়াছিল; জয়নারায়ণ তাঁহার চণ্ডীকাব্যে তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন।

তথাপি এ'কথা বলিতে হয় যে, জয়নারায়ণের মধ্যে প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় খুব সুলভ নহে; পাণ্ডিত্যই তাঁহার রচনাকে যাহা কিছু গৌরব দান করিয়াছে সত্য, কিন্তু কবিত্বের সন্ধান করিতে গেলে সেখানে ব্যর্থকাম হইতে হইবে। বিষয়বস্তু পরিকল্পনার মূলে আন্তরিকতা সেই যুগে এক প্রকার লোপ পাইলেও, ভারতচন্দ্রের মধ্যে মানব-চরিত্র-চিত্রণ বিষয়ে যে দক্ষতা দেখিতে পাওয়া যায়, জয়নারায়ণের কাব্যে তাহারও বিশেষ পরিচয় নাই। তাঁহার চরিত্রসৃষ্টি কৃত্রিম ও নিতান্তই গতানুগতিক,—কোথাও সজীব হইয়া উঠিতে পারে নাই।

চণ্ডীমঙ্গলের আখ্যায়িকা দুইটি ব্যতীতও জয়নারায়ণের কাব্যে আরও একটি স্বতন্ত্র আখ্যান আছে। তাহা মাধব-সুলোচনার উপাখ্যান। কবির ভাগিনেয়ী গঙ্গা ও ভ্রাতুষ্পুত্রী দয়াময়ীর অনুরোধে তিনি উক্ত আখ্যায়িকাটি চণ্ডীকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করেন বলিয়া নিজেই কাব্যমধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন।

ভবানীশঙ্কর

ভারতচন্দ্রের পরও যে কয়েকখানি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে ভবানীশঙ্কর দাসের কাব্যখানি উল্লেখযোগ্য।[১] ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে কবি তাঁহার কাব্যশেষে উল্লেখ করিয়াছেন,—

ধাতা বিন্দু সাগরেন্দু শকাদিত্য সনে।
ভবানীশঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভণে।।

ইহা হইতেই জানা যায় যে, ১৭০১ শক বা ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীশঙ্কর তাঁহা

১। ভবানীশঙ্কর দাস, মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা, রাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত (সাহিত্য পরিষৎ ১৩২৩)

মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালিকা রচনা সমাপন করেন। তাঁহার এই কাব্য 'জাগরণের পুঁথি' ও 'চণ্ডীমঙ্গল গীত' নামেও পরিচিত।

কবি আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে গ্রন্থমধ্যে যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে তিনি আত্রেয় গোত্রীয় নরদাসের বংশধর ও কুলীন কায়স্থ কুলোদ্ভব। আত্রেয় গোত্রীয় নরদাস বাংলার সমাজে কৌলীন্যের প্রতিষ্ঠাতা বল্লাল সেনের কুল-নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া বারেন্দ্র সমাজে চলিয়া যান এবং বারেন্দ্র সমাজেই বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। প্রতিপত্তি দ্বারাই ক্রমে তাঁহারা নিজেদের মধ্যে কৌলীন্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া লন। নরদাসের বংশধরগণ কালক্রমে বরেন্দ্র ও বঙ্গে ছড়াইয়া পড়েন।

কবির পূর্বপুরুষ নরদাসের বংশধর কৃষ্ণানন্দ ও হৃদয়ানন্দ চট্টগ্রামের অন্তর্গত সমুদ্রতীরবর্তী দেবগ্রামের অনতিদূরে বটতলী গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। অতঃপর তাঁহাদের বংশধর মধুসূদন বটতলী হইতে চক্রশালার অন্তর্গত ছনহারা গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এই মধুসূদন কবির পিতামহ। কবি ভবানীশঙ্করের পিতার নাম শ্রীমন্ত। ছনহারা গ্রামেই ভবানীশঙ্করের জন্ম হয়, তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম কৃষ্ণকিঙ্কর। অদ্যাপি কবির বংশধরগণ চট্টগ্রামের নানাস্থানে বসবাস করিতেছেন। পূর্বে তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল। প্রতিবৎসর দুর্গোৎসবের সময় কবির বাটীতে তাঁহার কাব্যখানি গীত হইত। ইদানীং তাঁহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

ভবানীশঙ্করের কাব্যখানি আকারে সুবৃহৎ। ভারতচন্দ্রের পরবর্তী কবি হইলেও ভারতচন্দ্রের কোনও প্রভাব তাঁহার উপর দেখিতে পাওয়া যায় না; কারণ, তখনও ভারতচন্দ্রের প্রভাব এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, মুকুন্দরামের কাব্যও চট্টগ্রাম অঞ্চলে অপ্রচলিত ছিল, সেইজন্য তাঁহারও কোন প্রভাব এই কবির উপর দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবত দ্বিজ মাধবের কাব্য হইতে তিনি কাহিনীর মূল অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত পুরাণগুলির অনেক কাহিনী তিনি নানা উপায়ে তাঁহার কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার রচনা সংস্কৃত শব্দ, উপমা ও অলঙ্কারে ভারাক্রান্ত। অনেক সময় সংস্কৃত সন্ধি সমাসের নিয়ম পর্যন্ত তিনি তাঁহার বাংলা রচনার কার্যে নিয়োগ করিয়াছেন, যেমন—

> কি বর্ণিব মায়ের রূপ ময়াধম দীনে।
> যাহার রূপেরাভায় ত্রিভুবন জিনে।।
> প্রাতরর্করাভা জিনি শোভে পদতল
> পদোপরে অলঙ্কারে করে ঝলমল।। ইত্যাদি

সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্য তাঁহার কাব্য-কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতি পদে পদে প্রতিহত করিয়াছে, নতুবা তাঁহার মধ্যে সত্যকার কবি-দৃষ্টি ছিল বলিয়া অনুভব করা যায়। কবি এইভাবে ফুল্লরার বারমাসী বর্ণনা করিয়াছেন,—

ফুল্লরায়ে বলে বাক্য শুন রূপবতী।
যত ক্লেশে প্রভু সঙ্গে করিয়ে বসতি।।
মেষ রাশি মধ্যে ভাস্করোদয় হয়ে যাবে।
যত ক্লেশ ক্রমে আম্মি বঞ্চি এই ভবে।।
আতপ প্রতাপ হয়ে ধনঞ্জয় সমা।
হেন সমে মাংস লৈয়া ভ্রমি আম্মি বামা।।
দিবাকর বৃষস্থ হয়েন যেই মাসে।
আম্মার বিপত্তি দেখি শত্রু সর্ব হাসে।। ইত্যাদি

এই সকল রচনায় কবিত্ব অপেক্ষা লেখকের পাণ্ডিত্যই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে।

অকিঞ্চন চক্রবর্তী

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গল' রচনার পরও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল রচনার ধারাটি যে একেবারে লুপ্ত লইয়া যায় নাই, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ কবি অকিঞ্চনের 'চণ্ডীমঙ্গল'। ইঁহার পুঁথিখানি আজও প্রকাশিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করে নাই, কিংবা বাংলা সাহিত্যের কোনও ইতিহাস-লেখক এই পর্যন্ত এই পুঁথিখানির বিষয়ে কোনও উল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই। সম্প্রতি ইঁহার একখানি পুঁথি আমার হস্তগত হইয়াছে,[১] এখানে তাহার বিষয়ই উল্লেখ করিব। সম্প্রতি 'গঙ্গা-মঙ্গল' নামেও তাঁহার একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

চণ্ডীমঙ্গল পুঁথিখানি দুইটি খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছে---প্রথম খণ্ডে কালকেতু ব্যাধের কাহিনী ও দ্বিতীয় খণ্ডে ধনপতি সদাগরের কাহিনী, বর্ণনা কোথাও সংক্ষিপ্ত নহে—সর্বত্রই মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের ন্যায়ই দীর্ঘ। ষোলটি পালায় দুইটি কাহিনী সম্পূর্ণ হইয়াছে; প্রত্যেক পালায় নূতন করিয়া পত্রাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে। পুঁথিখানি কোথাও একই পাতার দুই পৃষ্ঠায়, কোথাও দো-ভাঁজ করা দুই পাতার এক পৃষ্ঠায় লিখিত। পুঁথিখানির অবস্থা ভাল, লিপি সুন্দর ও সহজপাঠ্য, তবে একাধিক হস্তে লিখিত। অক্ষরের ছাঁদ দেখিয়া খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পুঁথিখানি লিখিত বলিয়া মনে হয়। ভণিতায় কবি এই ভাবে নিজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন,---

চণ্ডিকার চরণ চিন্তিয়া অনুক্ষণ।
রচিলা কবীন্দ্র চক্রবর্তী অকিঞ্চন।।

১। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল মহকুমার বেঙ্গরাল গ্রামনিবাসী কবির বংশধর শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী বি. এ মহাশয়ের সৌজন্যে পুঁথিখানি আমার দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। পুঁথিখানির বিষয়ে পূর্বে আমি নিজেও কিছু অবগত ছিলাম না।

আজ্ঞা পায়্যা অপাঙ্গিনী আরম্ভে রন্ধন।
রচিলা কবীন্দ্র চক্রবর্তী অকিঞ্চন।। ইত্যাদি

অর্থাৎ কবির নাম অকিঞ্চন চক্রবর্তী, তাঁহার উপাধি কবীন্দ্র। ভণিতার অনেক স্থানে কেবলমাত্র তাঁহার উপাধিটি ব্যবহার করিয়াছেন,—

চণ্ডীর আদেশ পায়্যা কবীন্দ্র কহেন গায়্যা
দূর কর আমার কলুষ।

অকিঞ্চন তাঁহার বাসস্থান সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন,—

বসতি বরদা বদনে সারদা
চণ্ডিকা দেবীর আদেশে।
নতুন মঙ্গল শ্রবণে কুশল
কবীন্দ্র ব্রাহ্মণে ভাষে।।

মেদিনীপুর জিলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত বরদা একটি পরগণার নাম। প্রায় সমসাময়িক আর একজন মঙ্গলকাব্যের কবি তাঁহার কাব্যে বরদা পরগণার অন্তর্গত যদুপুর গ্রামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি 'শিবায়ন'-এর কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য। অকিঞ্চন রামেশ্বরের পরবর্তী কবি, সেই কথা পরে আরও বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করা যাইবে। বর্তমান কবির বংশধরগণ বরদা পরগণার অন্তর্গত বেঙ্গরাল নামক গ্রামে বসবাস করিতেছেন। কবির বংশধরদিগের গৃহে প্রাপ্ত একটি ব্রহ্মোত্তরের দলিলে কবির তিন পুত্র—রামচাঁদ, রামদুলাল ও শিবানন্দকে বেঙ্গরাল গ্রামেরই অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দলিলখানি ১২০৯ সালে লিখিত। কবি সেই সময় জীবিত ছিলেন না, তবে তিনিও বেঙ্গরাল গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পুঁথির মধ্যে তিনি কোথাও নিজের গ্রামের নামটি উল্লেখ করেন নাই। বরং তাঁহার পিতা আটঘরা নামক গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—

বিপ্রকুলোৎপতি আটঘরা স্থিতি
ঠাকুর পুরুষোত্তম।
তাহার নন্দন কবীন্দ্র-ব্রাহ্মণ
রচে কাব্য মনোরম।।

আটঘরা শ্রীরামপুর গ্রাম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমাতেই অবস্থিত। কবি স্বয়ং কিংবা তাঁহার পুত্রগণই সর্বপ্রথম আসিয়া ইহার অনতিদূরবর্তী বেঙ্গরাল গ্রামে বসতি স্থাপন করেন কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যায় না। কবি বর্ধমানের অধিপতি কীর্তিচন্দ্রের দেশে বাস করিতেন বলিয়া বার বার তাঁহার নাম কাব্যমধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন—

মহারাজ চক্রবর্তী কীর্তিচন্দ্র কৃতকীর্তি
ইন্দ্রের সমান বর্ধমানে।
নিবাস তাঁহার দেশে নূতন মঙ্গল ভাষে
ব্রাহ্মণ কবীন্দ্র অকিঞ্চনে।।
চিত্রসেনের তাত কীর্তিচন্দ্র নরনাথ
রাজা জগৎরায়েব নন্দন।
বসিয়া তাঁহার দেশে নূতন মঙ্গল ভাষে
শ্রীযুত কবীন্দ্র অকিঞ্চন।।

কিন্তু তিনি কীর্তিচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন না; কারণ, তিনি পুনরায় উল্লেখ করিয়াছেন,—

ভূপতি তিলকচন্দ্র বর্ধমানে যেন ইন্দ্র
তেজশ্চন্দ্র তাঁহার নন্দন।
নিবাস তাঁহার দেশে চণ্ডিকামঙ্গল ভাষে
কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ অকিঞ্চন।।

মনে হয়, তিনি যখন চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন তখন মহারাজ তিলকচন্দ্রেব পুত্র মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বর্ধমানের অধিপতি ছিলেন। তেজশ্চন্দ্রের রাজাকাল খ্রীষ্টাব্দ ১৭৭০ হইতে ১৮৩২। তবে মনে হয়, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই কাব্যখানি রচিত হয়। মহারাজ তিলকচন্দ্রের কথাও তিনি যে ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি তিলকচন্দ্রের রাজাকালের শেষ ভাগ হইতে তেজশ্চন্দ্রের রাজ্যকালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। এই বিষয়ে আরও একটি প্রমাণ আছে, তাহা পরে উল্লেখ করিব। পুঁথিখানিতে ইহাব রচনা-কাল-জ্ঞাপক নির্দিষ্ট কোনও তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায় না, অতএব ইহা অপেক্ষা এই বিষয়ে আব কিছু নির্দিষ্ট করিয়া বলা অসম্ভব।[১]

পুঁথিখানি নাম কবি এক জায়গায় 'পার্বতীর সঙ্কীর্তন' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অন্যত্র সর্বদাই তিনি ইহাকে চণ্ডীর 'নূতন মঙ্গল' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্তনের অনুকরণেই একবার ইহাকে 'পার্বতীর সঙ্কীর্তন' বলিয়া উল্লেখ কবা হইয়াছে; যেমন,—

পালা পূর্ণ হল্য পার্বতীর সঙ্কীর্তন।
বিরচিল কবীন্দ্র চক্রবর্তী অকিঞ্চন।।

১। কবির বংশধরদিগের গৃহে যে বংশলতা রক্ষিত আছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়—, হরিনারায়ণের পুত্র পুরুষোত্তম, তাঁহার পুত্র কবি অকিঞ্চন, তাঁহার তিন পুত্র—রামচাঁদ, রামদুলাল ও শিবানন্দ,—রামচাঁদের পুত্র রামজীবন, রামজীবনের পুত্র বেণীমাধব, তাঁহার পুত্র মাখন ও তৎপুত্র তারাপদ। অকিঞ্চন হইতে তারাপদ পর্যন্ত পঞ্চম পুরুষ চলিতেছে। চারিপুরুষে এক শতাব্দী ধরিবার নিয়ম, তাহা হইলে দেখা যায় মাত্র ১২৫ বৎসব পূর্বে অকিঞ্চন বর্তমান ছিলেন।

অকিঞ্চন বৃদ্ধ বয়সেই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, কারণ, ইহাতে তাঁহার তিন পুত্রেরই উল্লেখ আছে, যেমন,—

শ্রীরামদুলালে রামচন্দ্র শিবানন্দে।
কল্যাণে করিবে রক্ষা গঙ্গাপদদ্বন্দ্বে।।

এইবার কাব্যখানির আভ্যন্তরিক একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। মুকুন্দরামের বসতিস্থানের অনতিদূরবর্তী অঞ্চলে বাস করিয়া কবি অকিঞ্চন যে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না, তাহা স্বভাবতই মনে করা যাইতে পারে। যদিও বহুলাংশে অকিঞ্চন মুকুন্দরাম দ্বারাই প্রভাবিত হইয়াছেন, তথাপি এ'কথা সত্য কাহিনী ও চরিত্র পরিকল্পনায় তিনি কোন কোন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার ভাঁড়ুর চরিত্রটি যদিও মুকুন্দরামের ভাঁড়ুর ছায়াতলেই অঙ্কিত, তথাপি ইহার কতকটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন,—

মধ্যেতে মণ্ডপ করে সুভাবের ঘর।
ভাঁড় দত্ত বৈসে তায় ভণ্ডের ঈশ্বর।।
কড়ি সাধে কিঙ্করে করিয়া আটশ্বরী।
হাট ঘাট হইল ভঁড়ুর আজ্ঞাকারী।
কাপড়্যার কাপড় কিনিয়া আনে ছলে।
কড়ি নাঞি দেই তারে কলমের বলে।।
ধূর্ত বুদ্ধ্যে ধান কিনে ধার নাহি সুধে।
মাগিলে মালের টাকা মাব্যা প্রাণ বধে।।
কুমারের কুম্ভ লেই সরা ভাণ্ড হাঁড়ি।
ভাঁড়ুর ভগিনী তারে নাঞি দেই কড়ি।।
দুই বেটা দেই দেখা দোকানের কাছে।
লুট কর‍্যা লাড়ু খায় লাঙ্গট হয়্যা নাচে।।
জলে যায় যুবতী জঞ্জাল করে ঘাটে।
বাটুলে কলসী ভাঙে খাদ খুলে বাটে।।
পথে পাক পেল্যা পাঁশ ঢাকা দিয়া তায়।
হেরি যুবতীর মুখ হাস্যা পাক খায়।।
প্রবল প্রতাপ ধরে একটি জামাই।
মার‍্যা ধর‍্যা লিহ্য (?) লেই মানা শুনে নাই।।
দধি দুগ্ধ দেখিলে দোকান শুদ্ধ লুটে।
বীরের দোহাই দিলে বল কর‍্যা পিটে।।
পথে যায় পথিক প্রতাপে গালি পাড়ে।

দোষ বিনা দ্বন্দ্ব করে দণ্ড করাা ছাড়ে॥
নগরের লোক যত নানা দুঃখ পায়।
বিষাদ করিয়া বীরে জানাইতে যায়॥
বুলন মণ্ডল সঙ্গে বাইশ বাজার।
কান্দিতে কান্দিতে বীর করিল জোহার॥
চণ্ডিকার চরণ চিন্তিয়া অনুক্ষণ।
রচিলা কবীন্দ্র চক্রবর্তী অকিঞ্চন॥

ভাঁড়ুর ভগিনী পুত্র কিংবা জামাতার অনুরূপ বৃত্তান্ত মুকুন্দরামে নাই। উৎপীড়িত গুজরাটবাসী কালকেতুর নিকট ভাঁড়ুর নামে যে অভিযোগ উপস্থিত করিতেছেন, তাহার চিত্রটি বাস্তব ও করুণ,—

মহাবীর, নগর নিবাসে নাঞি সাদ।
শুন বীরশিরোমণি নিবাসে বসিল ফণী
ভাঁড়ু দত্ত পাড়িল প্রমাদ॥
তোমার আশ্বাস পায়্যা সর্ব্বে ছিনু সুখী হৈয়া
অন্ন বস্ত্রে পরম কল্যাণে।
নাঞি ছিল রাজকর অপর আপদ ডর
তোমার চরণ-কৃপাদানে॥
তোমার নগরে আসি আশ্বাসে সভাই বসি
প্রজা মোরা সুখের পায়রা।
যথা অপন্যায় নাঞি সর্ব্বে বসি সেই ঠাঞি
খুঁজি বড় বৃক্ষের ছায়া॥
রাজার জয়ার্থ কড়ি দিতে নাঞি করি দেরী
সেই বাটপাড় নগরের।
হিসাবি খাজনা লেয় ফারখতি লিখিয়া দেয়
চরণে বিদায় মাগি তোর॥

* * *

প্রজাগণ যত বলে শুনি বীর কোপানলে
ভাঁড়ুরে আনাইল দিয়া লোক।
অভয়া করিয়া ধ্যান কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ গান
সেবকে চণ্ডিকা দিবে সুখ॥

অকিঞ্চনের চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি সদাগরের কাহিনীটিও সুরচিত হইয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত মগরা নদীতে ঝড়বৃষ্টির বর্ণনাটির মধ্যে কবির বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাইবে,—

দেখি মগরার পানী বলে সাধুশিরোমণি
উপায় চিন্তহ কর্ণধার।
বুঝি বড় অমঙ্গল রাখ ডিঙ্গা যথাস্থল
বিষম সঙ্কটে কর পার।।
আসিতে মগরা নদে কোন দেবতার বাদে
ঝড় বৃষ্টি হৈল উপস্থিত।
তাল সম পড়ে শিলা বিদরে নৌকার খিলা
পবনে প্রবল হৈল শীত।।
অঙ্গে জল পড়ে বেগে দশনে দশন লাগে
শীতে অঙ্গ হৈল কম্পমান।
বারিদ বরিখে বারি ত্রিভাগ ডুবিল তরী
আজি মোর সংশয় পরাণ।।
প্রলয় হইয়াছে বা ঘুরে মুকুর লা (?)
ঝলকে ঝলকে উঠে জল।
কাণ্ডারী হৈল ভাঁড় বাহিতে না পারে দাঁড়
বুঝি ডিঙ্গা যায় রসাতল।।
দেখে বুহিত্রের পাশে মকর কুম্ভীর ভাসে
ভয়ঙ্কর বিস্তার বদন।
দুকূলে পড়িছে হানা রাশি রাশি ভাসে ফেনা
লহ লহ করে অহিগণ।।
অবনী ডুবিয়া জলে বুঝি গেল রসাতলে
বিপাক পড়িল আম লয়্যা।
উপরে পশিতে জল সতীপতি করে বল
কিরূপে নগরে যাব বায়্যা।।
উদ্ধার করিতে বাপে বিমাতার অভিশাপে
ধনে প্রাণে মজিলাম আমি।
বলিও আমার মায় ছিরা হৈল মগরায়
যদি দেশে যাতে পার তুমি।।
কর্ণধারে বলে সাধু, পূজহ শঙ্করবধূ
বিপদখণ্ডনী মহামায়া।
ভকতবৎসলা চণ্ডী রাখিব দুর্জন দণ্ডি
দিয়া পদপঙ্কজের ছায়া।।

* * *

কাণ্ডারের কথা শুনি চিন্তে সর্বস্বরূপিণী
পূজে সাধু চণ্ডীর চরণ।
দুর্গম মগরা মাঝে রক্ষ চণ্ডী পদরজে
বিরচিলা দ্বিজ অকিঞ্চন।।

করুণ রসের বর্ণনায় অকিঞ্চনের যথার্থ দক্ষতা ছিল, এই বিষয়ে তিনি যে কেবলমাত্র মঙ্গলকাব্যের বাঁধা পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা নহে—ইহার মধ্যে তিনি কতকটা মানবিকতার স্পর্শও দান করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। শ্রীমন্তের সঙ্গে বিবাহান্তে সিংহলরাজ-দুহিতা সুশীলার পতিগৃহযাত্রার চিত্রটি বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের স্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে,—

কন্যার গমনে রাণী করে হায় হায়।
ধৈরজ না ধরে ধরে ধনপতির পায়।।
বৈবাহিক হৈলে তুমি বিধির ঘটনা।
পাইলে পাষণ্ড হৈতে প্রচুর যন্ত্রণা।।
যত কাল জীব প্রাণে যাবে নাঞি খেদ।
কৃষ্ণচন্দ্র করিলেন কন্যার বিচ্ছেদ।।
রাখিল ঝিয়ের খোঁটা রাজা দুরাচার।
মোর কন্যা ইবে হৈল তনয়া তোমার।।
কন্যাভাব করিবে কহিবে নাঞি কিছু।
মোর ঝিয়ে আগে ডাক নিজ ঝিয়ে পাছু।।
রাণীর রোদনে কান্দে ধনপতি সাধু।
আমার চক্ষের তারা ওই পুত্রবধূ।।
দৈবে দুঃখ দিল মোরে কি করিবে তুমি।
দেখিয়া শ্রীমন্তে সর্ব বিসরিনু আমি।।
শ্রীমন্তে সঁপেন কন্যা রাণী প্রিয় বোলে।
মোর বাঞ্ছা ছিল তুমি থাকিবে সিংহলে।।
প্রাণের অধিক কন্যা তুমি লয়্যা যায়।
যতনে পালিবে ঝিয়ে মোর মাথা খায়।।
দশ দোষ ক্ষমা দিবে দোষ না লইবে।
হেরিয়া বদনচাঁদে হাসিয়া ডাকিবে।।
মা বাপে দেখিতে আছে বাসনা সভার।
আমার মাথার কিরা আস্য একবার।।

দশ দিন দেখা দিয়া দেশে পুন যাবে।
শাশুড়ীর অন্ন খাইলে পরমাই বাড়িবে।।
সে দেশের রাজা যদি ধনে করে বল।
ত্বরিতে গমনে আস্যা তোমার সিংহল।।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের সকল বিষয়েই যে রুচিদুষ্টির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল, অকিঞ্চনের কাব্যখানি তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। অকিঞ্চনের রুচিবোধ উন্নত ছিল; পরিচ্ছন্ন রচনার ভিতর দিয়া তাঁহার উন্নত রুচিবোধের বিকাশ হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সমগ্রভাবেই যে বাংলা সাহিত্য নৈতিক দুর্গতির চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহা অকিঞ্চনের কাব্য পাঠ করিয়া কিছুতেই মনে হইতে পারে না। অচলা দেবভক্তি লইয়াই তিনি তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের মত দেবদেবীকে লইয়া অহেতুক কৌতুক করেন নাই।

বিষয় বিন্যাসে মুকুন্দরামের প্রভাব অকিঞ্চনের উপর অনস্বীকার্য হইলেও ভাষার দিক দিয়া তাঁহার স্বদেশবাসী একজন কবির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। পূর্বে তাঁহার কথা একবার উল্লেখ করিয়াছি, তিনি শিবমঙ্গল বা শিবায়নের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য। পূর্বেই বলিয়াছি, সাহিত্যে ভাব-যুগের পর শব্দ-যুগেরই আবির্ভাব হইয়া থাকে, ভারতচন্দ্র শব্দযুগেরই কবি এবং শব্দশিল্পী হিসাবেই তাঁহার কৃতিত্ব। রামেশ্বর বিচিত্র ধ্বনিসংযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া তাঁহার কাব্যদেহে এক সুলভ অলঙ্কার পরিধান করাইয়াছিলেন, যেমন,—

ভাত নাই ভবনে ভবানী বাণী বাণ।
চমৎকার চন্দ্রচূড় চণ্ডী পানে চান।।
পদ্মাবতী পার্বতীকে প্রবোধিয়া আনে।
প্রাণনাথে প্রকারে ভেটিব সেইখানে।। ইত্যাদি।

অকিঞ্চন রামেশ্বরের নিকট হইতে এই সহজ অনুপ্রাস ব্যবহারের কৃত্রিম রীতিটির অন্ধ অনুকরণ করিয়াছিলেন, যেমন—

পুলোমজা পুরন্দরে প্রবোধিয়া দুর্গা।
অবিলম্বে অবনী আইলা অপবর্গা।।
বিশ্বমাতা বীরবরে বলেন মধুর।
কান্তা সহ কালকেতু চল স্বর্গপুর।।
বিমানে বসিল বীর বনিতা লইয়া।
যায় যমালয় পথে জয় জয় দিয়া।।
দুর্গা বল্যা দুর্গাদুত দুন্দুভি বাজান।
সদনে শমন শব্দ শুনিবারে পান।। ইত্যাদি।

ইহা রামেশ্বর ও অকিঞ্চনেরই যে কেবল বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা নহে; ইহা যুগেরই বৈশিষ্ট্য ছিল। এই শব্দবিন্যাসের কৃতিত্বের উপরই ভারতচন্দ্রেরও প্রতিভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; তবে

ভারতচন্দ্রের এই বিষয়ে যে শিল্পবোধ ছিল ইঁহাদের তাহা ছিল না; ইঁহারা শব্দ দ্বারা কোলাহল সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র, ভারতচন্দ্রের মত কলগুঞ্জন সৃষ্টি করিতে পারেন নাই।

অকিঞ্চন একখানি 'শীতলা-মঙ্গল'ও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'শীতলা-মঙ্গল' শীতলা পূজা উপলক্ষে ঘাটাল মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও গীত হইয়া থাকে। ইহার একখানি পুঁথি কবির বংশধরদিগের গৃহে রক্ষিত আছে, তাহাতে কবি বর্ধমানের মহারাজা তিলকচন্দ্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র তেজশ্চন্দ্রের কোন উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে মনে হয়, 'শীতলা-মঙ্গল'-খানিই অকিঞ্চনের প্রথম রচনা, ইহার পর তিনি চণ্ডী মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন ও গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াও অকিঞ্চন 'গঙ্গামঙ্গল' নামক একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রচনার পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া মনে হয়, ইহা তাঁহার সর্বশেষ রচনা।

এখন পর্যন্ত যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, অকিঞ্চনই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশেষ কবি। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের ধারাটিকে তিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ সীমা পর্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। এই সময় হইতেই নাগরিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া বাংলার সংস্কৃতি এক নূতন রূপ লাভ করিতে আরম্ভ করে; চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মৌলিক ধারাটি ইহার সম্মুখীন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়—ইহার ক্ষেত্রে নাগরিক রস ও রুচির অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিনিধি ভারতচন্দ্র একাধিপত্য স্থাপন করেন।

জনার্দন

বঙ্গদেশের, বিশেষত পূর্ববঙ্গের, বহুস্থান হইতে জনার্দনের চণ্ডী নামক ব্রতকথার ন্যায় একখানি ক্ষুদ্র কাব্য পাওয়া গিয়াছে। জনার্দনের কোনও পরিচয় কিংবা তাঁহার আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে তাঁহার পুঁথির বহুল প্রচার দেখিয়া ইহাই মনে হয় যে, তিনি আধুনিক কবি নহেন।[১] ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার একখানা পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা 'প্রায় ২৫০ শত বৎসরের প্রাচীন' বলিয়া তিনি অনুমান করেন।[২] কিন্তু তাঁহার এই অনুমানের কোনও ভিত্তি নাই।

জনার্দনের চণ্ডীরও দুইটি অংশ; প্রথম অংশে কালকেতু ব্যাধের কাহিনী, দ্বিতীয় অংশে ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। উভয় কাহিনীই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কাহিনীর এই সংক্ষিপ্ততা হইতেই ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধেও কেহ কেহ নিঃসন্দিগ্ধ হইতে চাহেন।[৩] তাঁহাদের বিশ্বাস, এই ক্ষুদ্র কাব্যখানিই ক্রমে মাধব, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কবির হাতে পড়িয়া মঙ্গলকাব্যের রূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহা খুব নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। কারন, দেখা যাইতেছে যে, মাধব, মুকুন্দরাম প্রভৃতির মঙ্গলকাব্যের প্রচারের পরও এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি শুধু যে

১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালায় ইহার অনেকগুলি খণ্ডিত ও সম্পূর্ণ পুঁথি সংগৃহীত আছে। ২। দীনশচন্দ্র সেন, ১৮৪। ৩. ঐ

আত্মরক্ষা করিয়াই টিকিয়া ছিল তাহা নহে—ইহার প্রচার কিছুমাত্রও হ্রাস পায় নাই। জনার্দনের চণ্ডীর মত ব্রতকথার আকারের ক্ষুদ্র রচনা প্রাচীন কালে কত যে রচিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই এবং এখনও বটতলার কল্যাণে ইহাদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। অতএব মনে হয়, পাঁচালীর উদ্ভব প্রাচীনতর হইলেও মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ইহার সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ ঘটে নাই। ইহারা ইহাদের পথে নিজেদের কার্য সাধন করিয়াছে। মঙ্গলগান উচ্চতর সমাজে উৎসবে অনুষ্ঠানে আড়ম্বরের সহিত গীত হইত, পাঁচালী সাধারণ গৃহস্থের নিত্যপূজায় পঠিত হইত, উভয়ের ক্ষেত্র এক নহে এবং একে অন্যের স্থান অধিকার করিয়া লইতে পারে নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, মঙ্গলকাব্যের আকার বিরাট হইবার যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনই ব্রতকথার আকারের ক্ষুদ্র পাঁচালীরও প্রয়োজন রহিয়াছে। পদ্মাপুরাণ কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ সমাজে (বিশেষত স্ত্রীসমাজে) স্বতন্ত্র মনসার ব্রতকথার প্রচলনও এই কারণেই দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব কাহিনীর সংক্ষিপ্ততা হইতেই জনার্দনকে মাধব-মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী বলিবার উপায় নাই। তবে এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, জনার্দনের পাঁচালীর কাহিনীর মত সংক্ষিপ্ত কোন কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াই পরবর্তী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল,—তবে তাহা জনার্দনেরই রচিত কাহিনী অবলম্বনে কিনা বলা যায় না।

জনার্দনের চণ্ডীর রচনা-কাল জানা না গেলেও, তাঁহার ভাষা যে আধুনিক তাহা স্বীকার করিতে হয়। এমন কি ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যে পুঁথিখানিকে ২৫০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনুমান করেন, ইহার ভাষা দেখিয়া ইহাকে এত প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। তবে নিতান্ত অল্পকালের মধ্যে একখানি সাধারণ ব্রতকথা বা পাঁচালীর পুঁথির এমন বিস্তৃত প্রচার হওয়াও সম্ভব নহে। অবশ্য কালক্রমে ভাষার আধুনিকতা প্রাপ্ত হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নহে। এই সকল নানা কারণে জনার্দনকে আড়াইশত থেকে তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া নির্দেশ করিতে আপত্তি থাকিতে পারে না। জনার্দনের রচনা সরল, কাহিনীর স্বচ্ছন্দ বর্ণনা থাকিলেও তাহা কবিত্ব-বর্জিত। মৃগয়া হইতে ভগ্ন-মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তন কালে কবি কালকেতুর এই বর্ণনা দিয়াছেন,—

মৃগয়া না পাইয়া ব্যাধ হইল চিন্তিত।
সুবর্ণ গোধিকা পথে দেখে আচম্বিত॥
সুবর্ণ গোধিকা পাইয়া হরষিত মনে।
ধনুর অগ্রে তুলি লইল তখনে॥
মনে মনে ভাবে ব্যাধ ধীরে ধীরে হাঁটে।
সত্বর গমনে গেল বাড়ির নিকটে॥

বিবিধ কবি

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মার্কেণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডী-আখ্যানের অসংখ্য

অনুবাদ-কাব্য রচিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতেই ক্রমে সমাজে পৌরাণিক আদর্শ সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে; তাহার ফলে লৌকিক চণ্ডীর আখ্যান ক্রমে লোকপ্রিয়তা হইতে বঞ্চিত হইতে থাকে। এইজন্য এই সময়ে লৌকিক চণ্ডীর আখ্যান লইয়া কাব্য রচনাও হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে। লৌকিক চণ্ডীর মৌলিক আখ্যানের মধ্যে বাংলার জাতীয় চরিত্রের বিকাশ এতদিন দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল, কিন্তু পৌরাণিক চণ্ডীর আখ্যায়িকা রচনার অনুবাদ দ্বারা সেই পথ রুদ্ধ হয়, তাহার ফলে বাঙ্গালীর কবিত্বের মৌলিক প্রতিভা বিকাশের আর সুযোগ পাওয়া যায় না।

মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডী-আখ্যায়িকার অনুবাদ-কাব্যগুলি 'কালিকা-পুরাণ', 'দেবী-মাহাত্ম্য' বা 'দেবীমঙ্গল', 'চণ্ডিকা-বিজয়', 'চণ্ডী-বিজয়', 'গৌরী-মঙ্গল', 'ভবানী-মঙ্গল', 'দুর্গাপুরাণ', 'দুর্গাবিজয়', 'দুর্গালীলা', 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী', 'দুর্গামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'অভয়ামঙ্গল', প্রভৃতি নামে পরিচিত। এই শ্রেণীর একখানি কাব্যের মধ্যে মাত্র অতি সংক্ষেপে কালকেতুর কাহিনীটি পাওয়া যায়। তাহা শিবচরণ সেনের 'গৌরীমঙ্গল'।[1] এই সকল অনুবাদ-কাব্যের মধ্যে দ্বিজ হরিদত্তের ভনিতাযুক্ত 'কালিকা-পুরাণ'খানি[2] সপ্তদশ শতাব্দীরও পূর্ববর্তী বলিয়া মনে হয়। নারায়ণ দেবের ভণিতা যুক্ত 'কালিকা-পুরাণ'-এর একটি খণ্ডিত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে।[3] ইহা যদি পদ্মাপুরাণের কবি নারায়ণ দেবের রচনা হইয়া থাকে, তবে ইহাও সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী রচনা। এই দুইখানি সন্দেহজনক পুঁথি ব্যতীত আর এই শ্রেণীর যত পুঁথিই আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সমস্তই সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর রচনা।

এতদ্ব্যতীত বাংলা রামায়ণোক্ত শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের কাহিনী লইয়াও কয়েকখানি চণ্ডীমাহাত্ম্যসূচক কাহিনী বাংলায় রচিত হয়। তাহাও মঙ্গলকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত নহে বলিয়াই আমাদের বর্তমান আলোচনার বহির্ভূত। শিবচন্দ্র সেন প্রণীত এই শ্রেণীর একখানি পুস্তকের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার নাম 'সারদা-মঙ্গল'।[4] প্রকৃতপক্ষে ইহা লৌকিক রামায়ণেরই কাহিনী, কেবলমাত্র রামচন্দ্রের চণ্ডীপূজার উল্লেখ হইতেই ইহার এই নামকরণ করা হইয়াছে।

মুকুন্দ মিশ্র—বাসুলী-মঙ্গল

মধ্যযুগের বাংলার মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত 'বাসুলী-মঙ্গল' নামক একখানি পুঁথির কেহ কেহ উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন, কিন্তু ইহার সম্বন্ধে এই পর্যন্ত কোনও পরিচয় কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। এই পুঁথিখানি কে কবে রচনা করিয়াছিলেন, ইহার বিষয়বস্তুই বা কি ছিল, প্রাচীন-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধানকারীদিগের নিকট এই সকল

১। বিশ্বকোষ [illegible]-৬২ ২। ঢা. কে. ১০৯, স-স ৩৬০২; ৩। ব ৯০৬

৪ [illegible]

বৃত্তান্ত একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। সম্প্রতি বর্ধমান জেলার চকদীঘি গ্রামের 'রাঢ় মিউজিয়ামে' ইহার একখানি পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। পুঁথিখানির কোনও বিবরণ বহুকাল পর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। কিছুকাল পূর্বে ইহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।[১]

পুঁথিখানির রচয়িতার নাম মুকুন্দ; রচনার মধ্যে তিনি এই আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

বিপ্রকূলে জন্ম পিতামহ দেবরাজ।
পিতা বিকর্তন মিশ্র বিদিত সমাজ॥
শ্রীযুক্ত মুকুন্দ হারাবতীর নন্দন।
পাঁচালী প্রবন্ধে করে ত্রিপুরা স্মরণে॥

কবির খুল্লতাতের নাম গদাধর, তিনি তাঁহাকে লেখা-পড়া শিখাইয়া পণ্ডিত করিয়াছিলেন—

বন্দিল পণ্ডিত গদাধর খুল্লতাত।
সুশিক্ষিত কৈল যত্নে দিয়া বহুজাত॥

তাঁহার উপাধি ছিল কবিচন্দ্র; কারণ, কোনও কোনও ভণিতায় তিনি তাহা এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,—

ত্রিপুরা পদারবিন্দ মকরন্দচয ভৃঙ্গ
কবিচন্দ্র শ্রীমুকুন্দ ভণে।
দণ্ডবত প্রণাম করে দেখিয়া যোগিনী।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ রচিল শুদ্ধ বাণী॥

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দ নামক ব্রাহ্মণ কবির অভাব নাই। তিনি তাঁহাদেরই কেহ কি না, এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, তিনি তাঁহাদের কেহ নহেন, তিনি একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। বিষয়টি একটু বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দ নামক ব্রাহ্মণ কবিদিগের মধ্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। বাসুলী-মঙ্গল-রচয়িতা দ্বিজ কবিচন্দ্র মুকুন্দ যে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি, ইহা উভয়ের ব্যবহৃত ভণিতার তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। তবে উভয়েরই কুলপদবী মিশ্র, মুকুন্দরামের পিতা হৃদয় মিশ্র, মুকুন্দের পিতা বিকর্তন মিশ্র। বাসুলী-মঙ্গল রচয়িতা নিজেকে মুকুন্দ বলিয়া উল্লেখ করিলেও চক্রবর্তী পদবীর ব্যবহার করেন নাই। তিনি কবিচন্দ্র উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু কবিকঙ্কণ ব্যবহার করেন নাই।

১। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব সহকারী সম্পাদক সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার উপর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শুভেন্দু সিংহ রায়ের সম্পাদনায় পুঁথিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে।

অবশ্য মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল কবিচন্দ্র, কিন্তু বাসুলী-মঙ্গলের ভণিতায় কবিচন্দ্র স্বতন্ত্র কোন ব্যক্তির নাম নহে, ইহা মুকুন্দের উপাধি। অতএব কবিচন্দ্র মুকুন্দ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম হইতে স্বতন্ত্র একজন কবি। কবিচন্দ্র মুকুন্দ তাঁহার কাব্যমধ্যে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার পিতামহের নাম দেবরাজ মিশ্র, পিতার নাম বিকর্তন মিশ্র, মাতার নাম হারাবতী, খুল্লতাতের নাম গদাধর মিশ্র ও তিন পুত্রের নাম রমানাথ, চন্দ্রশেখর ও সনাতন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর পরিচয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতএব মুকুন্দরামের নামে পরবর্তী কালে কেহ এই কাব্য খানা রচনা করিয়াছেন, এমন ভুল করিবারও কোন কারণ নাই।

মধ্যযুগে দ্বিজ মুকুন্দ নামক একজন কবি 'জগন্নাথ-বিজয়' বা 'জগন্নাথ-মঙ্গল' নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তিনি মুকুন্দ ভারতী নামে পরিচিত। তাঁহার কোনও পরিচয় উক্ত দ্বিজ কবিচন্দ্র মুকুন্দের পরিচয়ের অনুরূপ নহে। অতএব ইঁহারাও যে পরস্পর স্বতন্ত্র ব্যক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিজ মুকুন্দ নামক আর একজন কবি 'অর্জুন-সংবাদ' বা 'বৈষ্ণবামৃত' নামক একখানি গীতার অনুবাদজাতীয় কাব্য রচনা করেন। তিনি নিজেকে মুকুন্দদাস বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। বিশেষত একজন বৈষ্ণব কাব্য ও আর একজন শাক্ত কাব্য রচনা করিয়াছেন। অতএব ইঁহারাও উভয়ে পরস্পর স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়।

আলোচ্য পুঁথিখানি বর্ধমান জেলার মণ্ডলঘাট পরগণার আমুরিয়া গ্রামে অনুলিখিত হইয়াছিল বলিয়া পুঁথিখানিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। কবি এই অঞ্চলেরই অধিবাসী হইতে পারেন। বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচন্দ্র রায়ের রাজত্বকালে ১৬৫৭ শকাব্দ বা ১১৪৭ সাল পুঁথিখানির লিপিকাল বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইহাতে ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। ইহা কবির স্বহস্তলিখিত পুঁথি নহে; কারণ, ইহাতে লিপিকরের নাম পাওয়া যায় শ্রীকিশোরদাস মিত্র (মিশ্র?)। অতএব কবি ইহার পূর্বেই বর্তমান ছিলেন, কিন্তু কত পূর্বে বর্তমান ছিলেন, তাহা বলা সহজসাধ্য নহে। পুঁথিখানির রচনাকাল সম্পর্কে ইহাতে এই প্রকার উল্লেখ আছে,—

শাকে রস রথ (রস?) বেদ শশাঙ্ক গণিতে।
বাসুলিমঙ্গল গীত হইল সেই হতে।। (পৃ.৫)

সকলেই অবগত আছেন যে, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল বঙ্গবাসী-সংস্করণ ইহার রচনাকাল-জ্ঞাপক এই দুইটি পদ দেখিতে পাওয়া যায়—

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা।।

কিন্তু ইহা তাঁহার আর কোন মুদ্রিত সংস্করণ কিংবা হস্তলিখিত পুঁথিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গবাসী কর্তৃক ব্যবহৃত মুকুন্দরামের পুঁথির কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। অতএব এমন মনে করা যাইতে পারে কি যে, নামসামঞ্জস্যের জন্য বঙ্গবাসীর মুকুন্দরামকৃত চণ্ডীমঙ্গল-

সম্পাদক কবিচন্দ মুকুন্দকৃত বাসুলী-মঙ্গল রচনার কালনির্ণায়ক পদ দুইটি মুকুন্দরামের পুঁথিসম্পর্কেই ব্যবহার করিয়াছেন? তাহা না হইলে উক্ত পদ দুইটি বঙ্গবাসী-প্রকাশিত মুকুন্দরামের পুঁথিতে কোথা হইতে আসিল? এই পদ দুইটি যে মুকুন্দরামের পুঁথিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এই বিষয়ে তো আর এখন কাহারও সংশয় নাই। যদি এই পদ দুইটি কবিচন্দ্র মুকুন্দের বাসুলী-মঙ্গল হইতেই আসিয়া থাকে, তবে দেখা যাইতেছে, যে বাসুলী-মঙ্গলের রচনাকাল ১৪৯৯ শকাব্দ বা ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। তাহা হইলে কবিচন্দ্র মুকুন্দ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম হইতে পূর্ববর্তী কবি বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা যাইতে পারে না। ইার দুইটি কারণ; প্রথমত কবিচন্দ্র মুকুন্দের ভাষায় প্রাচীনত্বের কোনও লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত মুকুন্দরাম তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই, বরং মাণিক দত্তকে 'সঙ্গীত আদ্য কবি' বলিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। তবে ইহার উত্তরেও বলা যাইতে পারে যে, সম্ভবত কবিচন্দ্রের পুঁথি পরবর্তী কালে লিপিকর কর্তৃক আধুনিকতায় পরিবর্তিত হইয়াছে এবং মুকুন্দরামের বিষয় বস্তু কতকটা স্বতন্ত্র ছিল বলিয়া কিংবা তিনি স্বতন্ত্র অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া কবিচন্দ্রের বিষয়ে ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার কাব্যে কিছু উল্লেখ করেন নাই, অথবা তাঁহার বিষয়ে তিনি কিছুই অবগত ছিলেন না। কিন্তু কবিচন্দ্র মুকুন্দের বাসুলী-মঙ্গল কাব্যের আর কোন পুঁথি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত এই সকল বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই। কবিচন্দ্র মুকুন্দ-রচিত বাসুলী-মঙ্গলের বিষয়বস্তু কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম-রচিত অভয়া-মঙ্গলের বিষয়বস্তু হইতে কতকটা স্বতন্ত্র। বাসুলী-মঙ্গলের কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ ঃ

দক্ষের কন্যা সতী হিমালয়ের গৃহে মেনকার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে যথারীতি ভিখারী শিবের সঙ্গে তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল। শূলপাণি মদনমোহন রূপ ধারণ করিয়া বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইলেন, তাঁহার রূপ দেখিয়া সমবেত এয়োগণ নিজেদের পতিদিগের নিন্দা করিতে লাগিল। মেনকা প্রসন্নচিত্তে জামাতাকে বরণ করিয়া লইলেন। বিবাহের পর শিব পার্বতীকে সঙ্গে লইয়া কৈলাসে ফিরিয়া আসিলেন। যথাসময়ে তাঁহাদের দুই পুত্র হইল। সংসারে অসচ্ছলতা ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। গৌরীর তাড়নায় শিব ভিক্ষায় বাহির হইলেন। কিন্তু ইহাতেও দুঃখ দূর হয় না। চণ্ডী মর্ত্যে নিজের পূজা প্রচার করিতে মনঃস্থ করিলেন। এদিকে রাজা সুরথ রাজ্যপাট হারাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে মেধস মুনির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈশ্য সমাধিও ধনপুত্রহীন হইয়া ইতিপূর্বেই সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মেধস মুনি তাঁহাদের অবস্থার বিপর্যয় দেখিয়া তাঁহাদিগকে দেবী মহামায়ার শরণ লইতে বলিলেন। মেধস আখ্যানচ্ছলে মধু-কৈটভ, শুম্ভ-নিশুম্ভ ও মহিষাসুরের বিষয় বিবৃত করিলেন। অসুরগণ অমিতবিক্রমশালী হইয়া দেবগণের উপর উৎপীড়ন করিলে দেবী মহামায়া কি ভাবে তাহাদিগকে বিনাশ করেন, মেধস সেই বৃত্তান্ত তাঁহাদিগকে বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন। এই দেবীই বিশাললোচনী বা বিশালাক্ষী নামে পরিচিত হইয়াছেন। সাধু ধুসদত্ত 'লক্ষ ঘর দ্বীপে' বাস করেন। তিনি সতত

শিবকেই পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট হইতে বিশাললোচনীর পূজা পাইবার ইচ্ছা হইল। নিয়তির বিধানে ইন্দ্রের সভায় এক নটী নৃত্যে তালভঙ্গ করাতে দেবতার অভিশাপে নারায়ণ দত্ত বণিকের স্ত্রী কনকাবতীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে—তাহার নাম হয় রুক্মিণী। রুক্মিণীর সহিত ধুসদত্তের বিবাহ হইল। বিবাহের পর ধুসদত্তের উপর দেবী বিশাললোচনীর পূজার জন্য প্রত্যাদেশ হইল। তখন তিনি বাণিজ্যের জন্য বিদেশযাত্রা করিয়াছেন। ধুসদত্তের অবর্তমানে তাঁহার প্রথমা স্ত্রী সত্যবতী সতীন রুক্মিণীর সহিত অসদ্ব্যবহার আরম্ভ করিলে, রুক্মিণী, দেবীর অনুগ্রহে, সতীনের নির্যাতন হইতে রক্ষা পান। তৎপরে ধুসদত্ত গৃহে আসেন ও স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলে রুক্মিণী গর্ভবতী হন। ধুসদত্ত পুনরায় বাণিজ্যযাত্রা করেন। এই সময়ে গ্রহের ফেরে বাণিজ্যতরী বিপদে পড়ে। সেখানে তিনি 'মায়াদহের পুলিনে' দেবীর দর্শন পান। এই কথা তিনি বর্ধমানের অধীশ্বর সুরথের নিকট বিবৃত করেন। কিন্তু ইহা সুরথের নিকট মিথ্যা বোধ হওয়ায়, ধুসদত্ত বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ক্রমে দিন যায়—ধুসদত্ত অনেকদিন গৃহে অনুপস্থিত। এদিকে তাঁহার স্ত্রী রুক্মিণীর গুণদত্ত নামে এক পুত্র জন্মে। গুণদত্ত বড় হইয়া পিতাকে গৃহে না দেখিয়া ডিঙ্গা লইয়া 'পাটনে' পিতার অনুসন্ধানে বাহির হন। পথে মায়াদহে গুণদত্ত ভগবতীর দর্শন পান। দেবী-পূজা করিলে পিতার সন্ধান পাইবে, ইহা মানত করিয়া গুণদত্ত বর্ধমানে রাজা সুরথের রাজ্যে যান। ক্রমে মায়াদহে গুণদত্ত যে মহামায়ার দর্শন পাইয়াছেন, তাহা তিনি বিবৃত করেন; কিন্তু যথাস্থানে মহামায়ার সন্ধান রাজাকে দিতে না পারার জন্য, গুণদত্তকে মশানে লইয়া কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দেওয়া হয়। তখন গুণদত্ত দেবী বাসুলীর আরাধনা করিলে দেবী আবির্ভূতা হইয়া গুণদত্তকে রক্ষা করেন। দেবীর ইচ্ছায় রাজা কন্যা বিদ্যা এবং অর্ধ রাজ্য ও বিবিধ যৌতুক সহ গুণদত্তকে জামাতৃপদে বরণ করেন। জামাতার অনুরোধের ধুসদত্ত প্রভৃতি বন্দীদিগের মুক্তির আদেশ দেওয়া হয়। এইখানে তিনি পিতার সহিত মিলিত হন। ইহার পর গুণদত্ত পিতা ধুসদত্ত ও পত্নী বিদ্যা সহ দেশে প্রত্যাবর্তনকালে পথে মায়াদহে দেবীর অর্চনা করেন। বাটীতে ফিরিয়া সাধু ধুসদত্ত সপরিবারে দেবী বাসুলীর পূজা করেন। ইহার পর দেশে বাসুলী দেবীর পূজার প্রচার হয়।

কবিচন্দ্র মুকুন্দের রচনা দ্বাদশ পালায় বিভক্ত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের পুঁথি যোল পালায় বিভক্ত। কবিচন্দ্র মুকুন্দের পুঁথিতে সাতটি পালায় মূল মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অবলম্বনে অষ্ট মন্বন্তরকথা, সুরথ রাজার উপাখ্যান, মধুকৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ, শুম্ভনিশুম্ভ বধ প্রভৃতি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। অবশিষ্ট পাঁচটি পালায় বর্ধমানের ধুসদত্ত সদাগরের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। দেবী বিশালাক্ষী বা বাসুলীর পূজা প্রত্যাখ্যান করায় সদাগর ধুসদত্ত বাণিজ্য উপলক্ষে পাটনে গিয়া দ্বাদশ বৎসর বন্দী থাকিবার পর পুত্র গুণদত্ত কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হন। অতএব চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সদাগরের কাহিনীর সঙ্গে ইহার কাহিনীতে বিশেষ অনৈক্য নাই। তবে কালকেতুর কাহিনীটি ইহাতে নাই।

ধুসদত্তের কাহিনী কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের সমসাময়িক কালে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, মুকুন্দরাম তাঁহার 'অভয়া-মঙ্গল' বা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন,—

বর্ধমানে ধুসদত্ত যার বংশে সোমদত্ত
মহাকুল বেণ্যার প্রধান।
বাসুলীর প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বাদশ বৎসর বন্দী
বিশালাক্ষী কৈল অপমান।।

মুকুন্দরাম ধনপতি সদাগরকে ধুসদত্তের মামাত ভাই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খুল্লনার পরীক্ষা-গ্রহণকালে ধুসদত্ত আসিয়া তাহাকে 'জৌঘর' বা জতুগৃহ করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন,—

তুমি মামাইত ভাই অবশ্য কল্যাণ চাই
কহিতে মানহ পাছে রোষ।
তোমারে কহিলুঁ সাধু জৌঘর করুক বধূ
তবে সভে করিব নির্দোষ।।

মুকুন্দরামের পরবর্তী কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দও ধুসদত্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—

বর্ধমান হৈতে আল্য ধুসদত্ত বাণ্যা।

অতএব কবিচন্দ্র মুকুন্দ যদি মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী কবিও হন, তাহা হইলেও তাঁহার পক্ষে ধুসদত্ত বণিকের কাহিনী বর্ণনা করা কিছুই অসম্ভব ছিল না।

কবিচন্দ্র মুকুন্দরামের ভাষা সম্পূর্ণ গ্রাম্যতামুক্ত। তাঁহার উপর সংস্কৃত সাহিত্য ও বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। সেইজন্য ভাষা হইতে তাঁহার কাল-বিচার করা সম্ভব নহে। নিম্নে তাঁহার রচনার যে সকল আদর্শ উল্লেখ করা যাইতেছে, তাহা হইতেই তাঁহার ভাষায় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যাইবে। শিবের বর্ণানায় তিনি লিখিতেছেন,—

শিবোপরি গঙ্গ গৌরী আধ অঙ্গ
ত্রিশূল দিণ্ডিম ভুজে।
পেখি দিগম্বর মহিলা মণ্ডল
বদন লুকাঅহি লাজে।।

বরবেশী শিবের বর্ণনায় লিখেছেন,—

জামাতা লাঙ্গট দেখিয়া বিকট
সর্বহু ভাবহুঁ দুঃখ।

শিবস্তোত্রে লিখিয়াছেন,—

একানেকা লঘুগুরু ব্যক্তাব্যক্ত তনু।
ধেয়ানে না জানে ব্রহ্মা নারায়ণ স্থাণু॥
শ্রবণ পবন নিজ শ্রমজলহরা।
মধুগন্ধ লোভে মন্দ চপল ভ্রমরা॥
কুবতিদহনদক্ষ ভবভয়হারী।
নিয়ত দুরিত দুঃখ জগদুপকারী॥
নব শশী শিরে শোভে শরীর সুছান্দ।
মৃদঙ্গ বাদল পর পুনিমক চান্দ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দমধলুব্ধমতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী॥

বাসুলী-মঙ্গলের কাহিনী চণ্ডীমঙ্গল শ্রেণীর কাহিনীর অন্তর্গত; বাসুলীই কালক্রমে চণ্ডীতে পরিণতি লাভ করিয়াছেন। এই দিক দিয়াও বাসুলী-মঙ্গল কাব্যখানি মুকুন্দরামের চণ্ডী মঙ্গল হইতে প্রাচীনতর হওয়া সম্ভব। তবে, পূর্বেই বলিয়াছি, ইঁহার আরও দুই একখানি পুঁথির সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত ইহার রচনাকাল সম্পর্কে সুনিশ্চিত কোন ধারণা করিতে পারা যাইবে না।

রাধাকৃষ্ণ দাস—গোসানী মঙ্গল

প্রধানত খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি স্থানীয় লৌকিক দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াও কয়েকখানি মঙ্গলকাব্য রচিত হয়। ইহাদের মধ্যে বিষয়গত বৈচিত্র্য থাকিলেও রচনার কোনই মৌলিকতা ছিল না। এই শ্রেণীর একখানি মঙ্গলকাব্যের নাম 'গোসানী-মঙ্গল'।[১] কুচবিহার জেলার মহকুমা শহর দিনহাটা হইতে পাঁচ মাইল পশ্চিমে গোসানীমারী গ্রাম, তাহাতে গোসানী দেবীর এক প্রাচীন মন্দির আছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই মন্দির নির্মিত হয় বলিয়া জানিতে পারা যায়। কিন্তু গোসানী দেবী তাহারও পূর্ববর্তী কাল হইতে সেই গ্রামে পূজিত হইতেছেন। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে লৌকিক ও গ্রাম্য দেবদেবীর যে বিশেষত্ব, এখানেও গোসানী দেবীর সেই বিশেষত্ব রক্ষা পাইয়াছে। দেবীর কোনও মূর্তি নাই; রূপার কৌটায় আবদ্ধ একটি কবচ গোসানী দেবী বলিয়া কল্পিত হয়। দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া মঙ্গলকাব্য রচনার রীতিতে গোসানী-মঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছে। রচনা-কালের দিক হইতে ইহা নিতান্ত আধুনিক—কুচবিহারের মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইহা রচিত হয়। রচয়িতার নাম রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী। কাব্যখানি আকারে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায়

১। অমূল্যরতন গুপ্ত, 'একখানি অপরিচিত মঙ্গল কাব্য', দেশ, ১৩৫৬ সালে, পৃঃ ২২-২৩। ইহার পুঁথি ১৩০৬ সালে ব্রজচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

নিতান্ত ক্ষুদ্র। মঙ্গলকাব্য রচনার সাধারণ রীতি অনুসরণ করিয়া কবি রাধাকৃষ্ণ তাঁহার কাব্যরচনার মূলে দেবতার আদেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—

হরেন্দ্র নারায়ণ রাজা বেহারে পালেন প্রজা
যাঁর যশ ঘোষে সর্বজন।
সেই রাজ্যে করে ঘর শুধু সে করুণাকর
পরম বৈষ্ণব গুণধাম।।
তাহার তনয় এক পাইয়া চৈতন্য ভেক
চিন্তে হরিচরণ-কমল।
তাহে আদেশিলা দেবী কহে রাধাকৃষ্ণ কবি
সুমধুর গোসানী-মঙ্গল।।

গোসানী-মঙ্গলের কাহিনী এইরূপ ঃ

কুচবিহারে জামবাড়ি নামক গ্রামে ভক্তীশ্বর নামে এক শিবভক্ত ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল অঞ্জনা। এক রাত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে স্বপ্ন দেখিলেন যে, চণ্ডীদেবী তাঁহাদিগকে পূজা দিতে বলিতেছেন এবং অঙ্গীকার করিতেছেন যে, তাঁহাদের একটি পুত্র জন্মিবে ও সেই পুত্র 'রাজ্যের ঈশ্বর' হইবে। তাঁহারা পরদিন মহাসমারোহে চণ্ডীপূজা করিলেন ও পুত্রবর লাভ করিলেন। যথাসময়ে অঞ্জনার একটি অতি রূপবান পুত্র জন্মিল। তাহার নাম রাখা হইল কান্তেশ্বর, শাপভ্রষ্ট দেবভৃত্য; ইনি ছিলেন চণ্ডীদেবীর দ্বারী কান্তনাথ; ইঁহাকে মর্ত্যে পাঠাইয়া চণ্ডী বা গোসানী দেবীর পূজা প্রচার হইবে।

সুতরাং 'গোসানী-মঙ্গল' কাব্যে দেখিতেছি, চণ্ডীদেবী স্বীয় কন্যা পদ্মাকে ডাকিয়া কহিতেছেন,—

শুন শুন পদ্মা মা কুমারী বিষহরি।
কান্তনাথ রাজা হবে গ্রাম জামবাড়ি।।
কোচ রাজ্য মধ্যে কান্তা সুপবিত্র স্থান।
আমিও তথায় গিয়া হব অধিষ্ঠান।।
কান্তনাথ হতে হবে পূজার প্রচার।
মনে মনে এই যুক্তি করিয়াছি সার।।
চন্দ্রনাথ কামাখ্যাদি যত পীঠস্থান।
তাহার সমান ইহা কভু নহে আন।।
কান্তনাথ প্রিয় ভক্ত মম দ্বারী ছিল।
শাপেতে হইয়া ভ্রষ্ট ভূমিতলে গেল।।
কিছুকাল রাজ্য ভোগি আসিবে কৈলাস।
এইত বৃত্তান্ত তার জানিবে নির্যাস।।

অতি রূপবান পুত্রের জন্মে মাতাপিতা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। যথাকালে পুত্রের জাতককর্মাদি করান হইল এবং পাঁচ বৎসর বয়সে তাহার বিদ্যারম্ভ হইল। বালক অল্পকাল মধ্যেই বাঙলা, সংস্কৃত প্রভৃতি শিখিয়া ফেলিল এবং কাব্য-ব্যাকরণাদিতে পাণ্ডিত্য অর্জন করিল। কিন্তু সংসারে শীঘ্রই দারুণ দুর্বিপাক দেখা দিল; মাত্র তিন দিনের অসুখে ভক্তীশ্বর দেহত্যাগ করিলেন; বালক পুত্র লইয়া বিধবা মাতা অকূলে পড়িলেন। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ কান্তেশ্বরকে গোরুর রাখালরূপে নিযুক্ত করিলেন এবং বিনিময়ে মাতাপুত্রের ভরণ-পোষণের ভার লইলেন। কান্তেশ্বর ব্রাহ্মণের গৃহে থাকিয়া দিবসে বনে গোরু চরাইত এবং রাত্রে মাতার নিকট ফিরিয়া আসিত। গোরু চরাইতে চরাইতে ক্লান্ত কান্তেশ্বর প্রত্যহই এক বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইত এবং যখন তাহার মুখে রৌদ্রে অসিয়া পড়িত, দুইটি বিষধর সর্প ফণা তুলিয়া তাহার মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাখিত; এই সর্প দুইটি চণ্ডীর আদেশে পদ্মাদেবী কর্তৃক প্রেরিত হইত। এদিকে কান্তেশ্বরের নিদ্রাকালে গোরুগুলি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া কৃষকদের শস্যের ক্ষতি করিত; তাহারা আসিয়া ব্রাহ্মণের নিকট নালিশ করিলে ব্রাহ্মণ কান্তেশ্বরকে শাস্তি দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। একদিন তিনি যষ্টি হস্তে কান্তেশ্বরের অনুসন্ধানে যাইয়া দেখেন, কান্তেশ্বর বৃক্ষতলে নিদ্রিত এবং এক বিষধর সর্প ফণা দ্বারা তাহার মস্তক আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে, ব্রাহ্মণ নিশ্চিত বুঝিতে পারিলেন যে, কান্তেশ্বর ভবিষ্যতে রাজা হইবে; তিনি তাহাকে গো-চারণ কর্ম হইতে অবসর দিয়া তাহার ও তাহার মাতার ভরণ-পোষণের ভার লইলেন এবং কান্তেশ্বরকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, রাজা হইলে কান্তেশ্বর তাঁহাকে রাজগুরু করিবে। কবির ভাষায়—

এতেক শুনিয়া তবে বলে দ্বিজবর।
তুমি যদি কদাচিৎ হও দণ্ডধর॥
মম স্থানে মন্ত্র তুমি করিবা গ্রহণ।
রাজগুরু বলি যেন ঘোষে সর্বজন॥

ইহার কিছুকাল পরে কান্তেশ্বর শেষরাত্রে এক স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নে চণ্ডীদেবী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন যে, তিনি অবশ্যই রাজা হইবেন। চণ্ডীদেবী তাঁহাকে প্রাতঃকালে কাজিলীকুড়া নামক নিকটবর্তী জলাশয়ে স্নান করিতে আদেশ দিলেন। স্নানান্তে তিনি জলাশয় হইতে ভয়ঙ্কর তিন মূর্তি উঠিতে দেখিবেন; স্বয়ং দেবীই পর পর মকর, কুম্ভীর ও সর্প রূপ ধারণ করিয়া কান্তেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন; কান্তেশ্বর যদি কোনরূপ ভয় না করিয়া মকর মূর্তিকে ধরিয়া ফেলেন, তাহা হইলে কান্তেশ্বরের বংশ চিরকাল রাজ্যভোগ করিবে; মকর ধরিতে না পারিয়া যদি তিনি কুম্ভীর ধরেন, তাহা হইলে তাঁহার বংশ বৃদ্ধি হইবে। তাহাও না পারিয়া যদি তিনি সর্প স্পর্শ করেন, তাহা হইলে তিনি নির্বংশ হইবেন। দেবীর আদেশ অনুসারে পরদিন সকালে কান্তেশ্বর কাজিলীকুড়ায় স্নান করিয়া পর পর দেবীর তিন মূর্তি দেখিতে পাইলেন; ভয়ে তিনি মকর ও কুম্ভীর স্পর্শ করিতে পারিলেন

না; সর্প দেখিয়াও ভয় পাইলেন এবং সর্প যখন অন্তর্ধান করিতে উদ্যত, তখন তাহার লেজমাত্র স্পর্শ করিলেন। তখন—

হাসিয়া কহিলা দুর্গা সর্পরূপ ছাড়ি।
বংশ নাশ কৈলা কান্ত কেন ভ্রম করি।।
মকর-কুম্ভীর ছাড়ি ধর সর্পবর।
এক পুরুষের তরে হবে দণ্ডধর।।
মুখ বক্ষঃ না ধরিলা ধর লেজ শেষ।
অল্পকাল রাজ্য ভোগি দুঃখ পাবে শেষ।।

তখন কান্তেশ্বর দেবীর অনেক স্তবস্তুতি করিলেন; দেবী প্রসন্ন হইয়া বলিলেন যে, কান্তেশ্বরের রাজ্য এক পুরুষ মাত্র স্থায়ী হইলেও কান্তেশ্বর যদি রাজ্যে কোনরূপ অন্যায় না করেন, তাহা হইলে সুখে থাকিবেন। কিন্তু দেবীর বাক্য অন্যথা করিলে 'আপনার দোষে তুমি আপনি মজিবে।' চণ্ডীদেবী কৈলাসে ফিরিয়া বিশ্বকর্মাকে স্মরণ করিলেন এবং বিশ্বকর্মা এক রাত্রির মধ্যে অপূর্ব কামতাপুর নগর নির্মাণ করিলেন। পরদিন প্রভাতে চণ্ডীর পূজা করিয়া কান্তেশ্বর রাজা হইলেন; তাঁহার নাম পূর্বে ছিল কান্তনাথ, এখন চণ্ডীর আদেশে নাম হইল কান্তেশ্বর (অর্থাৎ কামতা-ঈশ্বর)। পূর্বপ্রভু ব্রাহ্মণ রাজগুরু হইলেন এবং শুভলগ্নে নূতন রাজার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। রাজ্যের সমস্ত লোক রাজা পাইয়া আনন্দে মগ্ন হইল; চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ পাইয়া বিভিন্ন দেশ হইতে নানা জাতি আসিয়া কামতা রাজ্যে বাস করিতে লাগিল; বহু সৈন্যসমান্তে, অস্ত্রশস্ত্রে রাজ্য গম গম করিতে লাগিল। চণ্ডীর আদেশে শশিবর নামক এক ব্রাহ্মণ কান্তেশ্বরের মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। রাজা হইবার পাঁচ দিন পরে কান্তেশ্বরের মাতা অঞ্জনার মৃত্যু হইল এবং রাজা যথোচিত ক্ষত্রিয় আচারে মাতার অন্ত্যেষ্টি ও শ্রাদ্ধক্রিয়াদি সম্পন্ন করিলেন।

রাজা হইবার কিছুকাল পরে কান্তেশ্বর স্বনামে কান্তেশ্বরী মোহর প্রচলন করিলেন এবং স্বপ্নে চণ্ডীদেবীর আদেশ পাইয়া বিরল গ্রামে কেবনন্দ নামক প্রজার পঞ্চকন্যা বিবাহ করিলেন। পাঁচ রাণীর মধ্যে জ্যেষ্ঠা সুশীলা হইলেন পাটরাণী, কিন্তু কনিষ্ঠা বনমালা হইলেন রাজার সর্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্রী। একদিন রাজা মৃগয়া যাইবার আয়োজন করিলে গণকাচার্য রাজাকে নিষেধ করিলেন; তিনি আগে রাজাকে মৎস্য ধরিবার আয়োজন করিতে বলিলেন—মৎস্য ধরিয়া রাজা যেন শিকারে যান, নতুবা শিকার সফল হইবে না। রাজা জেলে আনিয়া কাজিলীকুড়ায় মৎস্য ধরিবার আদেশ দিলেন; রাজদূত কোথাও জেলে পাইল না; অবশেষে মধু জালী নামক এক দরিদ্র জেলেকে ধরিয়া আনিল; মধুর স্ত্রী সীতা স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে আসিল। মধু জালী কয়েক ক্ষেপ জাল ফেলিয়াও কোনও মাছ ধরিতে পারিল না; রাজা বুঝিলেন, ইহা চণ্ডীর মায়া। তিনি চণ্ডী স্মরণ করিয়া জালীকে পুনরায় জাল ফেলিতে বলিলেন; তখন এক প্রকাণ্ড শোল মাছ উঠিল। কাজিলীকুড়ার তীরে এক শিমূল বৃক্ষ ছিল;

এক ভয়ঙ্কর চিল সেখান হইতে নামিয়া ছোঁ মারিয়া জালীর হাত চিরিয়া মৎস্য লইয়া গেল। কিন্তু চিল মৎস্য রাখিতে পারিল না; মৎস্য সীতার নিকটে মাটিতে পড়িয়া গেল; ইহা দেখিয়া সীতা হাসিয়া উঠিল। মধু জালী ভাবিল সীতা তাহাকে উপহাস করিল, কিন্তু তাহা নহে। রাজার আদেশে সীতা পূর্ব-ইতিহাস ও গোসানী-কবচের কাহিনী বিবৃত করিল। সীতা প্রথমেই বলিল যে, সে তাহার স্বামীকে উপহাস করে নাই, চিলকে দেখিয়াই হাসিয়াছিল; এই চিলের এক কাহিনী আছে। পূর্বে বেহারে (কুচবিহার অঞ্চলে) শ্রীবৎস রাজা ছিলেন; শ্রীবৎসের পর বহুকাল রাজ্য অরাজক ছিল; তৎপরে ভগদত্ত রাজা হইলেন। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে ভগদত্ত কৌরব পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন; অর্জুন ভগদত্তের মস্তক ছেদন করেন। ভগদত্তের এক হাতে চণ্ডীর কবচ ছিল, অর্জুন সকবচ সেই হাতও কাটিয়া ফেলেন; এক চিল ছোঁ ম[illegible]িয়া সেই হাত মাটি হইতে তুলিয়া লইয়া বেহারে আসে এবং এই শিমূল বৃক্ষের উপরে বসিয়া তাহার মাংস পেট ভরিয়া খাইয়া হাত মাটিতে ফেলিয়া দেয়, কালক্রমে সেই হাত মাটির মধ্যে তলাইয়া যায়, সেই বহু পূর্বের চিলই আজ মধু জালীর হাত হইতে শোল মৎস্য ছোঁ মারিয়া লইয়াছিল। সীতা চিলকে চিনিতে পারিয়াই হাস্য করিয়াছিল। সীতার কথার সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য রাজা শিমূল বৃক্ষের গোড়া খনন করাইলেন এবং এগার হাত তলায় 'অস্থিমাত্র সার' এক বাহু পাওয়া গেল। ইহার সহিত সংলগ্ন একটি চমৎকার কবচ দেখা গেল; কবির ভাষায়—

> চন্দ্র-সূর্য জিনিয়া কবচ গোটা জ্বলে।
> বহুদিন গত তবু আছয়ে উজ্জ্বলে।।
> দেখিয়া কবচ ভাতি হরে মন প্রাণ।
> স্ফটিক নির্মিত সবে করে অনুমান।।

শুধু ইহাই নহে, কবচের উপর সুন্দর অক্ষরে 'গোসানী কবচ' কথাটি লেখা ছিল। কাজিলীকুড়ার জলে কবচ ধৌত করা হইল এবং ইহার ভাতি দ্বিগুণ বাড়িল। সীতার কথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। রাজার অনুরোধ সীতা তাহার পূর্বজন্মের কাহিনী বলিল এবং কোন্ অপরাধে বর্তমানে হীনবংশে জন্মিয়াছে তাহাও বলিল। রাজা মহাসমারোহে গোসানী দেবীকে স্থাপন করিলেন ও তাঁহার নিত্য পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। গোসানী দেবী কামতা রাজ্যের প্রকৃত অধীশ্বরীরূপে পূজিত হইতে লাগিলেন; তাঁহার নাম হইল কান্তেশ্বরী (অর্থাৎ কান্তা বা কামতার ঈশ্বরী)। কবির ভাষায়—

> কান্তেশ্বর হ'ল গোসানীর অধিকারী।
> সেই হেতু তাঁর নাম হ'ল কান্তে

কান্তেশ্বর গোসানী দেবীর অধিকারী [illegible] সেবায়েত [illegible] শাসন করিতে লাগিলেন। ইহার পর রাজা কান্তেশ্বর মৃগয়ার বাহির হইয়া নানা [illegible] গেলেন এবং বহু দেবমন্দির নির্মাণ ও দেবদেবী প্রতিষ্ঠা করিলেন; তন্মধ্যে কাটেশ্বর, বিদ্যেশ্বরী, বাণেশ্বর, জল্পেশ্বর

প্রভৃতির নাম 'গোসানী-মঙ্গলে' পাওয়া যায়। রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের পথে রাজা মন্ত্রী শশিবরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং শশিবের পরম রূপবান্ পুত্র মনোহরকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। গৃহে ফিরিয়া রাজা প্রিয়তমা পত্নী বনমালার নিকট মনোহরের রূপ বর্ণনা করেন। বনমালা বর্ননায় আকৃষ্ট হইয়া গুপ্তভাবে মনোহরের দর্শন-আকাঙ্খা মনে পোষন করেন, পরে উভয়ে উভয়কে দেখিয়া প্রেমাবিষ্ট হন এবং 'কালিকা-মঙ্গল কাব্য' -এর সুন্দরের ন্যায় মনোহর প্রত্যহ সুড়ঙ্গপথে বনমালার সঙ্গে মিলিত হইতে থাকেন। রাজা ইহা জানিতে পারিয়া মনোহবের উপর কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন. মৃত অবস্থায় সুড়ঙ্গ-মধ্যে মনোহর ধৃত হয, তাহার মাংস রন্ধন কারয়া তাহার পিতা শশিবরকে খাওয়ান হয়। শশিবর ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া মুসলমানের পক্ষে মিলিত হন এবং তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিয়া কান্তেশ্বরের বাজ্য আক্রমণ করান। কান্তেশ্বর পরাজিত ও নিহত হইলেন। মৃত্যুর সময কান্তেশ্বর গোসানী দেবীর দর্শনলাভ করিলেন। কামতাপুরেব বাজ্য বহুদিন অরাজক রহিল। অবশেষে নূতন বাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইল।

'গোসানী-মঙ্গল' কাব্যের একটি ক্ষীণ ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকিলেও ইহাতে কোচবিহারের প্রাচীন রাজবংশ সংক্রান্ত বিভিন্ন জনশ্রুতির নির্বিচার সংমিশ্রণ হইয়াছে।

চণ্ডীমঙ্গলের চরিত্র-বিচার

কাব্য হিসাবে চণ্ডীমঙ্গলের সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি ইহার কাহিনীর মধ্যে কেন্দ্রগত ঐক্যের অভাব রহিয়াছে। এই কাব্যের চরিত্র ও ঘটনাগুলি বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রমুখী না হওয়ার ফলেই ইহা দ্বারা উচ্চতর কাব্য সৃষ্টি সম্ভব হয় নাই। একেই ইহাব মূল কাহিনী দুইটি স্বতন্ত্র, তাহাদের মধ্যেও কাহিনী ও চরিত্রগত ঐক্য নাই, তদ্ব্যতীত এই মূল কাহিনী দুইটিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিলে ইহাদের মধ্যেও অর্ন্তবিরোধ প্রকাশ পায়।

ব্যাধ কালকেতুকে চণ্ডী কেন সহসা দয়া করিলেন, তাহাব কোন সঙ্গত কারণ অনেকেই অনুমান করিয়া বাহির করিতে পারেন নাই, কিন্তু পশুকুলকে রক্ষা করিবার জন্যই যে চণ্ডী ব্যাধকে রাজ্য দান করিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এই ব্যাধের জীবনে চণ্ডীর দয়া প্রকৃতই দয়া না অভিশাপ, তাহা বলা যায না। মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে স্বাধীনভাবে কোনও মানব চরিত্র বিকাশ লাভ করিতে পারিত না, তাহার এতটুকু মনুষ্যত্ব বিকাশের মূলেও দেবতার অযাচিত করুণা আসিয়া স্থান জুড়িয়া বসিত। যতদিন কালকেতুর সঙ্গে চণ্ডীর সাক্ষাৎকার হয নাই, ততদিন এই অরণ্যচারী ব্যাধ যুবকের জীবনটি মন্দ কাটিতেছিল না। ফুল্লরার বারমাসের দুঃখের কাহিনীও ব্যাধজীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই চলিয়াছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে ব্যাধদম্পতি এই ছলনাময়ী দেবতার নিতান্ত অকারণ সুখের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইল, সেই মুহূর্তেই তাহাদের জীবনের এই স্বাচ্ছন্দ্যটুকুও চলিয়া গেল। ব্যাধকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস কবিত্বের দিক দিয়া যেমন ব্যর্থ হইয়াছে,

বাস্তবতার ক্ষেত্রেও তাহা তেমনই নিরর্থক। ব্যাধকে ব্যাধরূপেই যদি শেষ পর্যন্ত দেখিতে পাইতাম, তবে বোধ হয় ইহা অপেক্ষা অধিক সুখী হইতাম, কাব্যেরও মর্যাদা রক্ষা পাইত। এই সামঞ্জস্যের অভাবেই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রস বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, ঘন সন্নিবিষ্ট হইবার সুযোগ পায় নাই। এই সম্পর্কেই একজন সমালোচক বলিয়াছেন, 'এই কাব্যে সৌন্দর্যসৃষ্টি ও আর্টের উদ্গম আছে, বিকাশ নাই। আকরে খাঁটি স্বর্ণের পার্শ্বে ঈষৎ স্বর্ণে পরিণত লোষ্ট্রখণ্ড যেরূপ দেখায়, তেমনি এই কাব্যে কবিত্বের ও সৌন্দর্য-সৃষ্টির আশে পাশে বহু অপরিণত ও অস্ফুট বর্ণনা দেখিতে পাই।'

সমগ্রভাবে বিচার করিতে গেলে দেখা যায়, ধনপতির কাহিনীটির কাব্যগুণ অধিক। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, এই কাহিনীটির মধ্যে বিশেষ মৌলিকতা নাই; পদ্মাপুরাণের চাঁদ সদাগর চরিত্রের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধনপতির চরিত্রটি কল্পনা করা হইয়াছে; খুল্লনার পরীক্ষা প্রভৃতির কাহিনীও বেহুলার পরীক্ষার কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া রচিত। এতদ্ব্যতীত খুল্লনার দুঃখ-বর্ণনার অতিশয়োক্তি ও অতিরঞ্জন অত্যন্ত পীড়াদায়ক। মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক নির্দেশ অনুযায়ী ইহা আদ্যোপান্ত রচিত। বিষয়বস্তুও সুমার্জিত নহে, কোনও উচ্চতর কাব্যের সৃষ্টি-উপাদানও ইহাতে নাই। ইহাকেই ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 'দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্র' বলিয়াছেন।

মূল কাহিনীগত ঐক্যের অভাবে চণ্ডীমঙ্গলের কোন চরিত্রসৃষ্টিই বিশেষ সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। এই কাহিনীতে বিভিন্ন সংস্কারের একত্র সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়াই চরিত্রগুলির কার্যকারিতাও অনেক স্থলেই পরস্পর সামঞ্জস্যহীন। কেবলমাত্র অসামান্য প্রতিভাবলে মুকুন্দরাম কালকেতু-কাহিনীর কয়েকটি চরিত্রের পরিকল্পনায় অপূর্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। চরিত্রগুলি স্বতন্ত্রভাবে ধরিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

উভয় কাহিনীতেই যে উল্লেখযোগ্য একটি প্রধান চরিত্র পাওয়া যায়, তাহাই চণ্ডীর চরিত্র। চণ্ডীকে দেবতা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে; কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দেব-চরিত্রে কোন দেবত্ব দূরের কথা বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্বেরও সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। মনসার চরিত্র সমালোচনা সম্পর্কে তাহা উল্লেখ করিয়াছি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্র-বিচার করিতে গিয়া প্রথমেই চণ্ডীর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়। সমগ্র কাব্যটির মধ্যে তাঁহাকে অভিন্ন চরিত্র বলিয়া বিবেচনা করিলে তাঁহার মধ্যে পূর্বাপর সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এই বিষয়টি ভুল করিয়াই স্বর্গত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'চণ্ডীর চরিত্র-চিত্রণে কবিকঙ্কণ কিছুমাত্র কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।' কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ঐতিহ্যের ধারা হইতে আসিয়া কালক্রমে একত্র মিলিত হইয়াছে। চণ্ডীর চরিত্র বিচার করিবার কালে, এই বিভিন্ন অংশগুলিকে স্বতন্ত্র রাখিয়া বিচার করাই কর্তব্য।

চণ্ডীর চরিত্রের প্রথম অংশ পুরাণ হইতে আসিয়াছে। এই অংশ রচনায় চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ প্রধানত পুরাণকে অবলম্বন করিলেও, তাহারও কোনও কোনও স্থলে তাঁহারা স্বকীয়

বৈশিষ্ট্যও প্রমাণিত করিয়াছেন। কাহিনীর প্রথম অংশে দেবী প্রকৃত পক্ষে সতী ও উমা—চণ্ডী নহেন। উমার সঙ্গে শিবের বিবাহের পর, তাঁহাদের হিমালয়-গৃহ হইতে কৈলাস গমনের সঙ্গেই ইহার এই কাহিনীর পৌরাণিক অংশ শেষ হইয়াছে—তারপর হইতে এই দেবী আর পৌরাণিক সতী, উমা কিংবা গৌরী নহেন। তখন হইতে তাঁহার চরিত্রের দ্বিতীয় অংশের আরম্ভ—ইহাকেও স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা কর্তব্য। কালকেতু ব্যাধের কাহিনীতে এই দেবী-চরিত্রের দ্বিতীয় অংশের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। এখানে তিনি চণ্ডী—উমাও নহেন, মঙ্গলচণ্ডীও নহেন। ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে তাঁহার চরিত্রের তৃতীয় অংশের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়—সেখানে তিনি মঙ্গলচণ্ডী, ইহাও তাঁহার এক স্বতন্ত্র পরিচয়; অতএব ইহাকেও অন্যান্য অংশ হইতে স্বতন্ত্র রাখিয়াই বিচার করা কর্তব্য।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গলে' তাঁহার আর একটি পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা একটি স্বতন্ত্র পৌরাণিক কাহিনীর ধারা হইতে আসিয়াছে, সেখানে তিনি উমাও নহেন, চণ্ডীও নহেন, কিংবা মঙ্গলচণ্ডীও নহেন, সেখানে তিনি অন্নদা। তাহাও স্বতন্ত্রভাবে আলোচ্য। এখন চণ্ডী চরিত্রের এই বিভিন্ন অংশগুলি স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা যাইতেছে।

প্রথমত সতী। তিনি দেবাদিদেব স্বামীর গৌরবে গৌরবান্বিতা। তাঁহার এই স্বামী-অভিমানই তাঁহার দেহত্যাগের কারণ। কিন্তু তাঁহার মধ্যেও বাঙালী কবিগণ বাঙালী নারীসুলভ দুর্বলতার সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি পিতৃগৃহে যজ্ঞের কথা শুনিয়া স্বামীর নিকট এই বলিয়া পিতৃগৃহ-যাত্রার অভিলাষ জানাইতেছেন,

> এক তিল কোথা যাই জুড়াইতে নাহি ঠাঁই
> বিধাতা করিল জন্মদুখী।
> পর্বত কাননে বসি নাহি পাশ পড়শী
> সীমন্তে সিন্দুর দিতে সাথী॥
> সুমঙ্গল সূত্র করে আইলাম তোমার ঘরে
> পূর্ণ হৈল বৎসর পাঁচ সাত।
> দূর কর বিবাদ পূরহ আমার সাধ
> মায়ের রন্ধনে খাব ভাত॥

সতী শিবকে বলিতেছেন, তোমার সংসারে আসিয়া অবধি এমন এক নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছি যে সিঁথির সিঁদুরটি পরাইয়া দিবার পর্যন্ত একটি প্রতিবেশিনী নাই। আজ বহুদিন পর মায়ের রান্না ভাত খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, সেইজন্য পিতৃগৃহে যাইবার জন্য তোমার অনুমতি চাহিতেছি। বাঙ্গালী কবির আত্ম-সচেতনতা সর্বত্রই এত প্রবল যে, সুনিবিড় পৌরাণিক পরিবেশের মধ্যেও তাঁহার নিজের গৃহের চিত্রকে তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারেন না। সীমন্তে সিঁদুর পরাইয়া দিবার জন্য প্রতিবেশিনী সখী ও মায়ের রান্না ভাত খাইবার জন্য কৈলাসেশ্বরীর এই কাঙ্গালপনার চিত্র একমাত্র বাঙ্গালী কবির কল্পনায়ই সম্ভব; বর্ণিত

পরিবেশের সঙ্গে যে ইহা সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে নাই, সেই বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্যমাত্র নাই।

সতী দেহত্যাগ করিয়া গৌরী বা উমারূপে হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন; বাঙ্গালী কবির কল্পনায় উমা কন্যারূপিণী,—

হিমালয়ে বাঢ়েন চণ্ডিকা।
আন বেশ দিনে দিনে শোভা অলঙ্কার বিনে
দেখি সুখী হইল মেনকা॥

স্নেহশালিনী কন্যারূপে কল্পিতা উমার এই রূপ বাঙ্গালী কবির কল্পনায় অপূর্ব হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী কবি তাঁহার নিজ গৃহের ছায়াতলে বসিয়া এই কন্যারূপিণী উমামূর্তি গড়িয়াছেন বলিয়া ইহা তাঁহার একান্ত অন্তরের স্পর্শে এমন স্নেহ-কোমল হইয়াছে,—

আল্যা করি কোলে বসি ছেঁদে ধরি গলে।
ওমা ওমা বলি উমা কথা কন ছলে॥

উমা-চরিত্রের এই দিকটাই কালক্রমে গিয়া আগমনী-বিজয়া গানের ভিতর দিয়া রসস্ফূর্তি লাভ করিয়াছে, এই গৌরী বা উমার সঙ্গে আগমনী-বিজয়ার উমারই যোগ রহিয়াছে,— চণ্ডী কিংবা মঙ্গলচণ্ডীর কোনও যোগ নাই।

এইবার কালকেতু ব্যাধ-কাহিনীর চণ্ডীর চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা একটি স্বতন্ত্র চরিত্র—পূর্ববর্তী সতী, উমা, কিংবা পরবর্তী মঙ্গলচণ্ডীর সঙ্গে ইহার কোন যোগ নাই। অতএব ইহাকে স্বতন্ত্র রাখিয়াই বিচার করা সঙ্গত।

এই চণ্ডী পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পশুদিগকেই ব্যাধের আক্রমণ হইতে ত্রাণ করিবার জন্য তিনি মৃগয়াজীবী ব্যাধকে রাজ্য ও ধন দিয়া অন্য জীবিকার সংস্থান করিয়া দিলেন— তাহাতেই তাঁহার আশ্রিত পশুকুল নিরাপদ হইল। অতএব কালকেতুর প্রতি চণ্ডীর কৃপাকে 'অহেতুক' বলা চলে না।

এই চণ্ডী প্রকৃতপক্ষে অনিষ্টকারিণী (malignant) দেবী নহেন, বরং তিনি অভয়া,— বিপন্ন পশুকুল তাঁহার আশ্রয়প্রার্থী হইলে, তিনি তাহাদিগকে অভয় দিলেন—যাহার অত্যাচারে তাঁহার আশ্রিত পশুকুল ধ্বংস হইতে চলিয়াছে, তাহাকেও তিনি বিনাশ করিলেন না, বরং তাহার অবস্থার আরও উন্নতি বিধান করিয়া দিলেন—

আইলাম পার্বতী তোমারে দিতে বর।
লহ বর কালকেতু ত্যজ ধনুঃশর॥
মাণিক অঙ্গুরী লহ সাত রাজার ধন।
ভাঙ্গায়্যা বসাহ রাজ্য গুজরাট বন॥

মঙ্গলকাব্যের দেবতা-সুলভ কোন বৈশিষ্ট্য তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে

সামান্য যাহা কিছু আছে, তাহা ধনপতি-কাহিনীর চণ্ডীর প্রভাববশত তাহাতে আসিয়া থাকিবে। এই চণ্ডীরই যথার্থ নাম অভয়া; এখানে তাঁহার কল্যাণী (beneficent) রূপই অধিকতর স্পষ্ট বলিয়া অনুভূত হয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে ধনপতি-সদাগরের কাহিনীর দেবতা মঙ্গলচণ্ডীই প্রকৃত ভয়ঙ্করী (malignant) দেবী। ধনপতি তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছিলেন, সেইজন্য কমলে কামিনীর মায়া পাতিয়া তিনি ধনপতিকে ছলনা করিলেন; কিন্তু শ্রীমন্ত তাঁহার নিকট কোনও কারণে অপরাধী নহে, বরং তাহার জননী খুল্লনা পুত্রের মঙ্গলের জন্য সর্বদা তাঁহার নিকট প্রাথনা জানাইতেছে—ইহা সত্ত্বেও তিনি কমলে কামিনীর মায়া পাতিয়া তাহাকেও ছলনা করিলেন, ফলে সিংহলরাজের নিকট সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারিল না—এইজন্য তাহার শিরশ্ছেদের আদেশ হইল। কিন্তু মশানে শ্রীমন্তের চৌতিশা স্তব শুনিবামাত্র তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তাহাকে রক্ষা করিলেন। অকারণ নিগ্রহ এবং অকারণ অনুগ্রহ করাই তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার দৃষ্টির মধ্যেও উদারতা নাই, ধনী সদাগরের পুত্র নিজ ঐশ্বর্যের পরিচয় দিবার জন্য মাথা হইতে স্বর্ণটোপর খুলিয়া জলে ফেলিয়া দিল কিন্তু চণ্ডী তাহা সহিতে পরিলেন না,—

লক্ষ তঙ্কা ধন নষ্ট হৈবে অকারণ
ইহা চক্ষে দেখিবে কেমনে।

অতএব তিনি সেই টোপরখানি মুখে করিয়া তুলিয়া লইয়া উজানীতে খুল্লনার নিকট দিয়া আসিবার জন্য আকাশে উড়িয়া চলিলেন।

সিংহলের মশানে শ্রীমন্তকে রক্ষা করিবার কালে তাঁহার যথার্থ ভয়ঙ্কর রূপ প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু কালক্রমে চণ্ডীর এই ভয়ঙ্কর রূপ সামান্য একটু নমনীয় হইয়া আসিল। তখন ভক্তগণ তাঁহাকে ভয়হরা অভয়া বলিয়াও নিজেদের অন্তরে সান্ত্বনা সন্ধান করিয়াছে। সেইজন্য কারারুদ্ধ শ্রীমন্তের চৌতিশা স্তব শুনিয়া তিনি তাহাকে সঙ্কট হইতেও ত্রাণ করিয়াছেন। বস্তুত ভক্তের এই সঙ্কট-তারণ ও ভয়-নিবারণ গুণের উপরই চণ্ডীর দেবত্বের সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে প্রকৃত পৌরুষের অভাব থাকিলেও উৎকৃষ্ট রমণী-চরিত্র বিরল নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, 'কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মধ্যে কেবল ফুল্লরা এবং খুল্লনা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বিকৃত বৃহৎ স্থাণু-মাত্র এবং ধনপতি ও তাহার পুত্র কোন কাজের নহে।' ইহার কারণস্বরূপও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, 'বাঙ্গালীর জীবন মানস-প্রধান, কার্য-প্রধান নহে; মানস-জগতে স্ত্রীলোকের প্রভাব অধিক কার্য-জগতে পুরুষের প্রভুত্ব।'[১] ব্যাধ কালকেতু কিংবা সমুদ্র-বাণিজ্যরত ধনপতি সদাগরের জীবনে কার্যের অভাব না থাকিলেও বাঙ্গালী কবির জাতীয়তা-সুলভ অন্তর্দৃষ্টিতে তাহাদের জীবনে কর্মের এই দিকটা একেবারেই পরিস্ফুট হইতে

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিচিত্র প্রবন্ধ (১৩৩৪), ১৪৬-৬৫

পারে নাই, মানস-প্রধান স্ত্রীচরিত্রগুলিই তাঁহাদের কাব্যে সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়া ফুটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ফুল্লরার চরিত্রই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

ফুল্লরার পরিচয়, সে 'কিনিতে বেচিতে ভাল জানয়ে পসরা।' মৃগয়াজীবী ব্যাধের পত্নীর ইহা অপেক্ষা আর উল্লেখযোগ্য গুণ কিছুই থাকিতে পারে না। তাহার নামটিও ফুল্লরা, অর্থাৎ ফুল্ল বা স্পষ্ট রা বা রব, কণ্ঠস্বর যাহার। মাথায় লইয়া পসরা করিতে হইলে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিতে হয়, সেইজন্য পসারিণীর ফুল্লরা বা সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন। তাহার তাহা ছিল বলিয়াই সে ফুল্লরা। বাংলার কোন্ অজ্ঞাত পল্লীকবি তাঁহার পসারিণী নায়িকার এই অপূর্ব সার্থক নামটি রাখিয়াছিলেন তাহা কে বলিতে পারে? চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ ব্যাধ-পত্নীর গুণটির উল্লেখের পরিবর্তে সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রানুমোদিত এখানে যে তাহার এক বিস্তৃত রূপ-বর্ণনার অবতারণা করেন নাই, তাহা তাঁহাদের এই চরিত্রটি সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতারই পরিচায়ক বলিতে হইবে। কারণ, সে অনার্য ব্যাধের পত্নী, রূপের কথা তাহার আসেই না, তাহার শুধু গুণের কথা। সেই গুণের প্রধান গুণই হইতেছে যে, সে বুদ্ধিমতী পসারিণী; ইহা দ্বারাই তাহার জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়। অনার্য ব্যাধ-পত্নীকে চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ নিজেদের অন্তরের মমতা দিয়া গড়িয়াছেন, তাহার মধ্যেও স্বাভাবিক মানবিক স্নেহমমতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন,—তাহাকে কিছু একটা স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করেন নাই। সে ব্যাধ স্বামীর উপযুক্ত পত্নী, বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতিও তাহার সেবাযত্নের ত্রুটি নাই, তাহারা তাহাকে বধূরূপে পাইয়া তাহাদের জীবন সার্থক বলিয়া বিবেচনা করে। শাশুড়ীর মৃত্যুর পর ফুল্লরা এই ক্ষুদ্র সংসারখানির গৃহিণী পদে অধিষ্ঠিতা হইল। স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সাংসারিক কর্তব্য পালনের ভিতর দিয়া তাহার জীবন কাটিতে লাগিল।

সংসারে নিত্য অভাব,—স্বামী যেদিন শূন্যহাতে বন হইতে ফিরিয়া আসে সেদিন উপবাস; ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর তায় তালপাতার ছাউনি,—বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের খরা মাথার উপর দিয়া যায়, একখানি খুঞার বসন মাথায় আঁটিয়া পরা যায় না। বর্ষার ধারা মাথায় ধরিতে হয়,— এইভাবে শীত ও বসন্ত কাটে। কিন্তু দিনের পর দিন এই সব সহিয়া যায়, ইহাকেও কোনও দিন দুঃখ বলিয়া মনে হয় না। যেদিন ছলনাময়ী চণ্ডী তাহার গৃহাঙ্গিনায় আসিয়া মোহিনী মূর্তি ধারণ করিলেন, সেই দিনই ফুল্লরার জীবনের সর্বাপেক্ষা দুঃখের দিন। স্বামীর প্রতি তাহার অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি আর বুঝি রক্ষা পায় না। অথচ এমন নিষ্ঠুর সত্যকেই বা কি ভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া যায় ! সে ঊর্ধ্বশ্বাসে কাঁদিতে কাঁদিতে গোলাহাটে গিয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত হইল।

কাঁদিতে কাঁদিতে চোখ রাঙা হইয়া গিয়াছে। কালকেতু দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, এমন তো আর কোনদিন দেখে নাই; সে জিজ্ঞাসা করিল,—

শাশুড়ী ননদী নাই, নাই তোর সতা।
কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রাতা॥

শাশুড়ী ননদীই বাঙ্গালী বধূর সংসারের জ্বালা, তাহারাই যখন ফুল্লরার নাই, তবে কে

তাহাকে কাঁদাইল? ফুল্লরার কান্না কালকেতুর বিস্ময়। তাহাদের দাম্পত্য জীবনের পরম শান্তি সম্পর্কে ইহা অপেক্ষা আর কি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকিতে পারে?

তারপর চণ্ডী আবির্ভূতা হইয়া যখন কালকেতুকে একটি মূল্যবান অঙ্গুরী দান করিলেন,—

বীর হস্তে দিল দেবী মাণিক অঙ্গুরী।
লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী॥
এক গোটা অঙ্গুরীতে হবে কোন কাম।
সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম॥

কিন্তু 'এই অঙ্গুরীর মূল্য সাত কোটি টাকা', চণ্ডী এ'কথা বলা সত্ত্বেও 'ফুল্লরা শুনিয়া মূল্য মুখ করে বাঁকা।' ধনে যেন তাহার কেমন অনাসক্তি; বিশেষত এক যুবতীর হাত হইতে যখন তাহার স্বামী এই ধন পাইতেছে, তখন কে জানে ইহাতে কি আছে? দেবতার মাহাত্ম্য তো সে বুঝে না, বুঝিবার কথাও নহে। দেবতা তো এতদিন পর্যন্ত তাহার জীবনে এতটুকুও প্রসাদ দান করিলেন না; দুঃখের বারমাসীই যাহার জীবন-সঙ্গীত, সে কি করিয়া আজ অকস্মাৎ এই দেবতার অকারণ প্রসাদ লাভ করিয়া ভক্তি-গদ্‌গদ হইয়া উঠিতে পারে। সে অনার্য ব্যাধ-বধূ, দেবতার প্রতি তাহার ভক্তি নাই, আছে অবিশ্বাস। সেইজন্য আকস্মিক দৈবানুগ্রহকে সে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া গ্রহণ করিতে পারিল না; পর্ণকুটীরবাসিনী পসারিণী ফুল্লরাকে যেমনটি দেখিয়াছি, রাজান্তঃপুরে পাশাখেলারতা বিলাসিনী ফুল্লরাকে আর তেমনটি পাইলাম না। যে একদিন গ্রীষ্মের খর রৌদ্রে পসরা মাথার করিয়া ধূলি-ধূসরিত পল্লীপথে বিচরণ করিয়াছে, তাহাকে কোনও ভাবেই যেন রাজান্তঃপুরের বিলাস-জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কল্পনা করিতে পারি না। এইজন্য চণ্ডীমঙ্গল-কবিদিগের তাহার সম্পর্কিত এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে। দ্বিজ মাধব ফুল্লরাকে একটু দুর্বিনীতা ও মুখরা করিয়া আঁকিয়াছেন, মুকুন্দরামের দৃষ্টিতে তাহার চরিত্র একটু নমনীয় হইয়া আসিয়াছে। মুকুন্দরামের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, কলিঙ্গরাজের নিকট পরাজিত হইয়া ফুল্লরার নির্দেশে কালকেতু 'ধান্যঘরে' গিয়া লুকাইয়া রহিল। ইহার মধ্যে উভয়েরই চরিত্রে নীচজাতি-সুলভ জীবন সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়।

ধনপতির কাহিনীতে খুল্লনার চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। জীবনের কঠোরতম দুঃখের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াও সে তাহার স্বামিপ্রেম মুহূর্তের জন্যই ম্লান হইতে দেয় নাই। পরকে বিশ্বাস করিয়া, তাহাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করাই যেন এই চরিত্রটির ধর্ম। সেইজন্য স্বামীর প্রেমে তাহার যত বিশ্বাস, কুচক্রী দাসীকর্তৃক প্ররোচিত সপত্নীর কথায়ও তাহার তেমনই বিশ্বাস। আত্মশক্তি যেখানে দুর্বল, দেবতায় বিশ্বাস সেখানে স্বাভাবিক। ব্যক্তিগত বুদ্ধিবৃত্তির তাড়নায় খুল্লনা কোনও কার্যেই আত্মনিয়োগ করে না; আত্মশক্তিতে সে বিশ্বাস করে না, সেইজন্যই সর্বতোভাবেই দেবতার ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে। খুল্লনার চরিত্রে পদ্মাপুরাণের বেহুলা-চরিত্রের একটু প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া অনুভব করিতে পারা

যায়।

লহনার চরিত্রটিও একেবারে মন্দ চিত্রিত হয় নাই। সরল বিশ্বাস ও স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি তাহার কোন অংশেই কম নহে। এমন কি, স্বামীর কথায় সপত্নীকেও পর্যন্ত সে গৃহে বরণ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু দাসী দুর্বলা যখন তাহাকে সপত্নীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিয়া দিল, তখন তাহার মনে স্বার্থপরতার সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি জাগিয়া উঠিল। উদার সংস্কার দ্বারা তাহার জ্ঞান ও বুদ্ধি মার্জিত ছিল না বলিয়াই, সে সামান্য দাসীর প্ররোচনায় অসহায় একটা বালিকার এমন দুঃখের কারণ হইয়া পড়িল। একবার বিদ্বেষবহ্নিতে আহুতি পড়িলে, তাহা আর নির্বাপিত করা যায় না, অন্তত তাহা করিবার মত মানসিক শিক্ষা লহনার মত চরিত্রের ছিল না। সেইজন্য খুল্লনার প্রতি তাহার ব্যবহারে আর কোনও পরিবর্তন সাধিত হইল না।

পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে কালকেতুর চরিত্রটির একটু বিশেষত্ব আছে। ব্যাধজীবনোচিত সংস্কার একদিক দিয়া যেমন তাহার প্রবল, তেমনই আদর্শ সামাজিক চরিত্র হইবার উপযুক্ততারও তাহার অভাব নাই। তাহার নৈতিক জ্ঞান অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সামাজিক বিচার ন্যায্য, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস অপরিমেয় ও পত্নীর প্রতি তাহার প্রেম কর্তব্যের সংযম দ্বারা শাসিত। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ এই চরিত্রটিকে রাজসিংহাসনারূঢ় ও রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া শেষ কালে একেবারে হত্যা করিয়াছেন, পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, ধনপতির চরিত্রে কোন মৌলিকতা নাই, পদ্মাপুরাণের চাঁদ সদাগরের চরিত্রের অনুরূপ তাঁহার পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

যে একটি চরিত্র-চিত্রণে চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ একটু সামাজিক বুদ্ধিবিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। আর কোন মঙ্গলকাব্যে এমন জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ কোন চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। ইহার পরিকল্পনা প্রত্যক্ষ ও বাস্তব সমাজ-চরিত্র-অভিজ্ঞতার ফল। মাধব ও মুকুন্দ তাঁহাদের বিশিষ্ট প্রতিভা অনুযায়ী চরিত্রটির পরিকল্পনা করিলেও ইহার মূল বৈশিষ্ট্য উভয়ের সৃষ্টিতেই অক্ষুণ্ণ আছে।

ভাঁড়ু দত্ত ধূর্ততার প্রতীক। একান্ত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই তাহাকে এই ধূর্ততার আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক কার্যেই তাহার স্বার্থপরতার উদ্দেশ্য বাহিরের লোকের নিকট এতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত যে, সে পদে পদে ধরা পড়িয়া গিয়া তাহার জন্য নির্যাতন ভোগ করিত। তাহার সংসারে নিত্য অসচ্ছলতা, অন্তরে কদর্যতা, কিন্তু তাহা গোপন করিবার জন্য বাহিরে 'ফোঁটা-কাটা মহাদম্ভ'। গর্ব করিবার একমাত্র বিষয় তাহার কুল,—

ঘোষ বসুর কন্যা দুই জায়া মোর ধন্যা
মিত্রে কৈলুঁ কন্যা সমপর্ণ।

সে কালকেতুর পাত্র-পদের প্রত্যাশী হইয়া তাহার নিকট গেল। সরল প্রকৃতির

কালকেতুর তাহার মত ধূর্ত ব্যক্তির ছলনা বুঝিতে না পারিয়া তাহার আবেদন মঞ্জুর করিল। কিন্তু স্বভাব-দুর্বৃত্ত ভাঁড়ু উচ্চ রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াও নিজের প্রকৃতি ভুলিতে পারিল না। চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ চরিত্রটির এই সঙ্গতি অপূর্ব কৌশলে রক্ষা করিয়াছেন। কালকেতুর নিকট ভাঁড়ুর নামে প্রজাগণ দলে দলে আসিয়া অভিযোগ করিতে লাগিল। তাহার কি অপরাধ?—'টাকা সিকা নিত্য খায় ধুতি।' হাটুরিয়া লোকের নিকট হইতে সামান্য ঘুষ খায় অন্যায্য ভাবে তোলা দাবী করে, না দিলে তাহার উপর অত্যাচার করে। টাকা ভাঙাইয়া পরে কড়ি দিবে বলিয়া বিনামূল্যে পসরা করিয়া বেড়ায়। ভাঁড়ুর প্রকৃতি যেমন নীচ, তাহার দৃষ্টিও তেমনই নীচ—সামান্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাধারণ লোকের সঙ্গে বিবাদ বাধাইয়া দেয়। রাজার পাত্র বা মন্ত্রী হইবার মত উচ্চ গুণ তাহার নাই। সেইজন্য কালকেতু তাহাকে এই বলিয়া বিদায় করিয়া দিল, 'আপনি করিলে দূর আপন মহত্ত্ব'। ভাঁড়ু চরম অপমান বোধ করিল, বিশেষত তাহার স্বার্থসিদ্ধির পথ বন্ধ হইয়া গেল দেখিয়া একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। লোভ, স্বার্থপরতা, প্রতিহিংসা-পরায়ণতা,—তাহার মধ্যে কোনও দুর্গুণেরই অভাব ছিল না। এইবার এই অপমানের জন্য সে কালকেতুর উপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। সে কলিঙ্গরাজকে কালকেতুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে চলিল। কলিঙ্গরাজ ভাঁড়ুর প্রদর্শিত পথে কালকেতুর রাজধানী গুজরাট আক্রমণ করিলেন, পূর্ব-পরিচয়ের সূত্র ধরিয়া ভাঁড়ু সরলা ফুল্লরার নিকট হইতে কালকেতুর সন্ধান জানিয়া তাহা শত্রুপক্ষের কোটালকে জানাইল। কালকেতু বন্দী হইল। কিন্তু দেবীর অনুগ্রহে সে মুক্তিলাভ করিয়া যখন স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিল, তখন ভাঁড়ু পুনরায় কালকেতুর সম্মুখে আবির্ভূত হইল, তাহার চিরাচরিত কপটতা অবলম্বন করিয়াই বলিল,—

> যে জন আপন হয় সেই কভু পর নয়
> আপন জানিবে ভাঁড়ু দত্তে।

সে-ই যে কলিঙ্গরাজকে বলিয়া কি ভাবে তাহার মুক্তিবিধান করিয়াছে, বার বার তাহাই বলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার আচার ও ব্যবহারের মধ্যেই তাহার প্রকৃতি এত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, তাহা সরল ব্যাধ-সন্তানেরও দৃষ্টি এড়াইল না। কালকেতু বলিল, 'ভাঁড়ু রে নিজ দোষে খোয়ালে আপনা'। বলিয়া তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া রাজ্য হইতে বিদায় করিয়া দিল।

নীচ, স্বার্থান্বেষী, অকৃতজ্ঞ, ধূর্ত, খল একটি চরিত্র হিসাবে ভাঁড়ু দত্ত চণ্ডীমঙ্গল-কবিদিগের একটি সার্থক সৃষ্টি। বিশেষ কাল ও বিশেষ সমাজের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা চিরন্তন মানব-চরিত্রের বিশেষ একটা দিকের পরিচয় ইহাতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অনুরূপ পরিবেশে সর্বদেশে সর্বকালেই সম্ভব হইতে পারে। মানব মনের স্বাভাবিক দুষ্প্রবৃত্তিগুলিকে এখানে পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া অপূর্ব কৌশলে প্রকাশ করা হইয়াছে। মধ্যযুগে দেবমহিমা-মূলক কাব্য-রচনার মধ্যেও যে প্রকৃত মানব-চরিত্র সম্পর্কে কবিদিগের

দৃষ্টি কত সজাগ ছিল এই চরিত্রটি তাহার প্রমাণ।

শাক্ত পদাবলী

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই শাক্ত পদাবলী নামে এক শ্রেণীর গীতি-কবিতা বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। মঙ্গলকাব্যের দেব-কাহিনীর ক্ষীণতমএকটি সূত্র অবলম্বন করিয়া তাহার সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর ভক্তিভাব এবং গঠনপ্রণালীযুক্ত করিয়া ইহা রচিত হইতে থাকে। মধ্যযুগে শাক্তের মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণবের পদাবলী সাহিত্যের ধারা যে সমান্তরালে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা শাক্তপদাবলীর মধ্যে আসিয়া একত্র মিলিত হয়। তাহার ফলে একদিকে শ্রীরাধা উমা এবং আর একদিকে কালিকায় রূপান্তরিত হইয়া যান।

মঙ্গলকাব্যের ভিতর দিয়া আখ্যায়িকা-কাব্য রচনার ধারাটি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়া পরিণামে তাহা খণ্ড গীতিকাব্য রচনার মধ্যে একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। বৈষ্ণব গীতিকাব্যগুলির ক্রমবর্ধমান প্রভাবই ইহার একমাত্র কারণ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলা সাহিত্যের সকল বিভাগেই বৈষ্ণব গীতি-কবিতার প্রভাব অব্যাহত হইয়া উঠে। এমন কি, সমসাময়িক কালে রচিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গলকাব্য' যদিও আখ্যায়িকা-মূলক কাব্য, তথাপি ইহার আভ্যন্তরিক গীতিসুর-প্রবণতার কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। সেই যুগেই শাক্ত আখ্যানমূলক কাব্যগুলি খণ্ডগীতির প্রভাবের বশবর্তী হয়,—তাহার ফলেই সেই যুগে ইহাদের বিষয়-বস্তুর কোনও কোনও অংশ লইয়া যুগোচিত কতকগুলি খণ্ড গীতি-কবিতা রচিত হয়, তাহাই শাক্ত পদাবলী নামে পরিচিত। শাক্ত পদাবলীর দুইটি ধারা—একটিতে চণ্ডী কন্যারূপিণী উমা ও অপরটিতে মাতৃরূপিণী কালিকাতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। সাধক কবি রামপ্রসাদ এই উভয় ধারারই প্রতিষ্ঠাতা হইলেও তাঁহার পরবর্তী কাল হইতেই এই দুইটি ধারা স্বতন্ত্র ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। একটির মধ্যে গার্হস্থ্য সুর প্রবল হইয়া উঠে, আর একটির মধ্যে তান্ত্রিক আধ্যাত্মিক সুরই প্রবলতর হয়। ইহার প্রথম ধারাটি আগমনী-বিজয়গান ও দ্বিতীয় ধারাটি শ্যামাসঙ্গীত নামে পরিচিত। বাঙ্গালীর সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী দেবী-সাধনা অষ্টাদশ শতাব্দীতে আসিয়া এই রস এবং আধ্যাত্মিক পরিণতির সম্মুখীন হয়।

বাঙ্গালীর গৃহস্থ জীবন নানা স্নেহ-সম্পর্কের দ্বারা বিজড়িত। এই সমাজের মাতাপিতা নিজেদের শিশুকন্যাকে গৌরীদান করিয়া যে ভাবে পরের সংসারে পাঠাইয়া দিতেন, তাহাতে তাঁহাদের অতৃপ্ত সন্তানস্নেহ অন্তরের মধ্যে স্তম্ভিত হইয়া থাকিত। তারপর কোন অনুকূল অবস্থা পাইলেই তাহা সহস্র ধারায় বিগলিত হইয়া পড়িত। বাংলার আগমনী-বিজয়া গানগুলি এই স্তম্ভিত অশ্রুনির্ঝরের মুক্তি-সঙ্গীত। অপরিণত-বুদ্ধি শিশু-কন্যাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্বামী-গৃহে পাঠাইয়া দিয়া এই সমাজের জননীগণ বাৎসল্যরসের অতৃপ্তি-জাত

যে আশঙ্কা ও উদ্বেগাকুল জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালীর আগমনী-বিজয়া গানে তাহারই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর গৃহ-সংসার চির-দারিদ্র্যের লীলা-নিকেতন। দরিদ্রের সংসারে দুঃখেরও অন্ত নাই; সেইজন্য বৎসরান্তে কিংবা যে কোনদিন এই সন্তান-বিচ্ছেদের অবসানে স্নেহাতুর মাতৃহৃদয়ে তাহার সন্তান-সম্পর্কে এই অশুভ দারিদ্র্যের আশঙ্কাই সর্বপ্রথম জাগিয়াছে,—

কেমন করে হরের ঘরে
ছিলি উমা বল্ মা তাই।
চিতাভস্ম মাখি অঙ্গে,
জামাই ফিরে নানা রঙ্গে,
তুই নাকি, মা, তারি সঙ্গে
সোনার অঙ্গে মাখিস্ ছাই।।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন সমগ্র বাংলার ভাব-লোক বৈষ্ণব কবিতার বন্যায় প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, সেই যুগেই বিশেষ করিয়া এই আগমনী-বিজয়া গানগুলি রচিত হয়। পূর্বে যে বিস্তৃত শৈব ও শাক্ত সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কোথাও এই জাতীয় খণ্ড কবিতার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অতএব ইহা পূর্বোল্লিখিত লৌকিক কিংবা পৌরাণিক কোনও সাহিত্যেরই অন্তর্ভূত নহে, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে ইহাদের পরিকল্পনার আভাস মাত্রও পাওয়া যায় না।

এই শ্রেণীর খণ্ড গীতি কবিতা বাঙ্গালী চরিত্রের বিশিষ্ট উপাদান অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালী কবির মৌলিক সৃষ্টি। ইহাদের মধ্যে যে একটি ক্ষীণতম কাহিনীর সূত্র আছে, তাহা পৌরাণিক কাহিনীর ছায়াতলে পরিকল্পিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তাহা বাঙ্গালীর গৃহস্থ জীবনের নিত্য অভিজ্ঞতার চিত্র। এই খণ্ড গীতিগুলির রচনায় বাহিরের আর কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি-রচিত হরগৌরী বিষয়ক কতকগুলি পদ আছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে আগমনী-বিজয়ার বিষয়-বস্তুটি নাই। বাঙ্গালীর জাতীয় ভাবপ্রবণতার গুণের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক অতি নিবিড়। বৈষ্ণব কবিতায় ব্যাক্তি হৃদয়ের খণ্ড অনুভূতিগুলি আত্মকেন্দ্রিক হইয়া রসস্ফূর্তি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু আগমনী-বিজয়া গানে তাহাই আত্মসম্পর্কিত গার্হস্থ্য জীবনকে কেন্দ্র করিয়া রসরূপ লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে আত্মধর্মই প্রবল, কিন্তু আগমনী-বিজয়া গানে গৃহধর্মকেই বড় করা হইয়াছে। বাংলা মঙ্গলকাব্যের উপর বৈষ্ণব গীতিকবিতার প্রত্যক্ষ প্রভাবের জন্যই বাংলা সাহিত্যে এই অনবদ্য খণ্ড গীতিকাগুলির জন্ম হইয়াছিল। মঙ্গলকাব্যের দীর্ঘ কাহিনীকে খণ্ড খণ্ড গীতি কবিতার রূপে প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী কবি কাব্য-রচনায় এই ভাবে প্রাচীন সংস্কারের আদর্শ-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিল। বাংলার চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের সর্বশেষ পরিণতি এই ভাবে সম্পাদিত হইল।

আগমনী-বিজয়া গানের বিষয়-বস্তু অত্যন্ত সাধারণ। ইহা ভাব-প্রধান রচনা, কাহিনী-প্রধান নহে। ইহার মধ্যে একটি ক্ষীণতম কাহিনীর সূত্র থাকিলেও মঙ্গলকাব্যগুলির মত কাহিনী বর্ণনা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে,—অন্তরের একটি শাশ্বত স্নেহবোধকে সঙ্গীতের সুরে প্রকাশ করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য। এই জন্য যে ক্ষীণতম কাহিনীটি এখানে অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা পৌরাণিক আখ্যানের উপরই পরিকল্পিত, লৌকিক আখ্যানের উপর নহে। কাহিনীটি এই—

গিরিরাজ হিমালয় ভিখারী শিবের নিকট নিজের কন্যা উমাকে সম্প্রদান করিয়াছেন। রাজকন্যা উমা ভিখারী স্বামীর নিত্য-অভাব-পীড়িত সংসারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সন্তানের বিচ্ছেদে মহিষী মেনকা এক মুহূর্তেব জন্যও শান্তি পাইতেছিলেন না, তাঁহার ঐশ্বর্যভোগে বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল। অবশেষে শারদীয়া পূজার প্রাক্কালে মেনেকা একদিন শেষরাত্রে ভিখারী স্বামীর গৃহিণী তাঁহার দুঃখিনী উমাকে স্বপ্নে দেখিলেন। দেখিয়া তিনি ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেন না—স্বামীর নিকট গিয়া একবার কন্যাকে আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষে তাঁহার পিতৃভবনে আনাইবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন।

এদিকে উমাও জননীকে স্বপ্নে দেখিয়া সহসা ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। মাতাপিতাকে এতকাল পর একবার দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল। তিনি স্বামীর নিকট হইতে মাত্র তিন দিনের জন্য সময় ভিক্ষা করিয়া লইয়া পিতৃগৃহে যাত্রা করিলেন।

ভিখারীর পত্নী মাত্র তিন দিনের জন্য গিরিরাজ পিতার গৃহে অতিথি। মেনকার এই আনন্দ-মিলন দেখিতে দেখিতে বিজয়ার বিদায়-বেদনায় ঘনাইয়া উঠিল। তিন দিন পরে পিতৃগৃহ আঁধার করিয়া উমা পুনরায় ভিখারী স্বামীর সংসারে চলিয়া গেলেন—মেনকার চক্ষে পাষাণপুরী অন্ধকার হইয়া গেল।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই আগমনী-বিজয়া গান কবিওয়ালা ও ভাটদিগের মুখে মুখে গীত হইলেও, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কোনও পদ কিংবা পদ-রচয়িতার কোনও পরিচয় সংগৃহীত হয় নাই। সেই জন্যই সাধারণত কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনকেই আগমনী-বিজয়া গানের প্রথম কবি বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার পদাবলী রচনা করেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।[১]

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ব্যতীত অন্যান্য রচনা খণ্ড গীতি-কবিতারই সমষ্টি। সহজ ভাষায় গভীর ভাব ও ভক্তিমূলক খণ্ড গীতি-কবিতা রচনায় সেই যুগে রামপ্রসাদের সমকক্ষ আর কেহই ছিল না। আগমনী গানে রামপ্রসাদের আধ্যাত্মিক ভাব-দীপ্ত সংসার-অনাসক্ত সাধকের হৃদয় সহসা যেন গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি করুণ সমবেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া

১। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের কাল ও পরিচয় সম্বন্ধে পরে 'কালিকা-মঙ্গলে'র আলোচনা দ্রষ্টব্য।

উঠিয়াছে। সন্তান-স্নেহাতুর মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা বর্ণনা করিয়া ভক্ত কবি কি অপূর্ব সংসার-চরিত্র-অভিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন।—

আজ শুভ নিশি পোহাইল তোমার,
এই যে নন্দিনী আইল—বরণ করিয়া আন ঘরে।।
মুখ-শশী দেখ আসি দূরে যাবে দুঃখ-রাশি
ও চাঁদমুখের হাসি, সুধারাশি ক্ষরে।
শুনিয়া এ শুভ বাণী এলোচুলে ধায় রাণী
বসন না সম্বরে।।
গদ গদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি গিরিবরে অমনি কাঁদে গলা ধরে।।
পুন কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া
চুম্বে অরুণ-অধরে।
বলে, জনক তোমার গিরি, পতি জনম-ভিখারী
তোমা হেন সুকুমারী দিলাম দিগম্বরে।।

চোখের কোণে মিলনের আনন্দাশ্রু শুকাইতে-না-শুকাইতে বিজয়ার বেদনাশ্রু জমিয়া উঠে। নির্মম সংসারের নিয়মকে নিঃশব্দে মাথা পাতিয়া লইয়া অন্তরের স্নেহ-প্রবৃত্তিগুলিকে অসাড় করিয়া রাখা ছাড়া আর উপায় কি? রামপ্রসাদের বিজয়া-গানে গিরিরাণীর প্রাণের অনুভূতি যেন পাষাণের মত স্পন্দনহীন:—

ওহে প্রাণনাথ গি[illegible] হে
[illegible]
[illegible]।।
[illegible] ছাল [illegible] দ্বারে বসে মহাকাল
বেরোও [illegible]।
তব দেহ হে পাষাণ, [illegible] দেহে পাষাণ প্রাণ
এই হেতু এতক্ষণ না হলে [illegible]।।
তনয়া পরের ধন [illegible] না বুঝে মন
হায় হায় একি বিড়ম্বন বিধাতার।
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরাণী,
প্রভাতে চাকোরী যেন নিরাশা সুধার।।

রামপ্রসাদের পরই উল্লেখযোগ্য আগমনী-বিজয়া গানের কবির নাম রামচন্দ্র বসু—রামবসু নামেই তিনি অধিকতর পরিচিত। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়ার নিকটবর্তী সালকিয়ায় তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালেই কলিকাতায় তিনি তাঁহার এক পিতৃব্যের আশ্রয়ে আসিয়া

প্রতিপালিত হন। তরুণ বয়স হইতেই তাঁহার কবিতা রচনার অভ্যাস ছিল। কথিত আছে যে, যখন তিনি কলিকাতা জোড়াসাঁকোর কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন, তখন তালপাতায় স্বরচিত কবিতা লিখিয়া তাহা বাহিরে পথের উপর ফেলিয়া দিতেন। একদিন ভবানী বেণে নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালা সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি তালপাতাগুলি কুড়াইয়া লইয়া কবিতাগুলি পাঠ করিয়া ইহাদের রচনাগুণে আকৃষ্ট হইলেন। তিনি ইহাদের রচয়িতার সন্ধান লইয়া তাঁহাকে নিজের কবিদলের সঙ্গীত-রচনার কার্যে নিয়োজিত করিলেন। বহুকাল পর্যন্ত তিনি ভবানী বেণের কবির দলের জন্য গান রচনা করিয়া অবশেষে নিজেই স্বাধীনভাবে এক কবির দল খুলিলেন। একদা যখন নিজের গানের দল লইয়া পূজা উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ কাশিমবাজারের রাজবাটীতে গান করিতে যান, তখন সেখানেই তিনি রোগগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৪২ বৎসর।

রামপ্রসাদের পরবর্তী প্রায় প্রত্যেক কবিই আগমনী-বিজয়া গান রচনায় প্রধানত রামপ্রসাদকেই আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লইতেন। সেইজন্য অধিকাংশেরই রচনায় বিশেষ কোন মৌলিকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। তথাপি রামবসুর রচনার বৈশিষ্ট্য সহজেই অনুভব করা যায়। স্বাভাবিক কবিত্বশক্তির গুণে তাঁহার রচনায় সহজ রস-স্ফূর্তির অভাব হয় নাই।

রামবসুর মেনকায় বাঙ্গালীর শাশ্বত জননীর রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সংসার অনভিজ্ঞ কন্যার জন্য তাঁহার স্নেহবোধ নিতান্ত বাস্তব বলিয়া মনে হয়। তাঁহার গানে মেনকা তথাকথিত রাজরাণীর সমগ্র কল্পিত আভিজাত্য উত্তীর্ণ হইয়া বাঙ্গালীর চিরন্তনী জননীর রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

দীর্ঘ সন্তান-বিরহিণী জননী, স্বামীর নিকট গিয়া অনুনয় করিতেছেন,—

যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী
উমা কেমনে রয়েছে।
আমি শুনেছি শ্রবণে নারদ বচনে
মা মা বলে উমা কেঁদেছে।।

কিন্তু স্বামী তাঁহার প্রার্থনা-বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে অন্য কথায় প্রবোধ দিতে চাহিতেছেন, কিন্তু মেনকার হৃদয় হইতে তাঁহার উমার চিন্তা কিছুতেই মুছিয়া দিতে পারিতেছেন না,—

তুমি যে কত দিন, গিরিরাজ, আমায় কয়েছ কত কথা,
সে কথা আছে শেল সম আমার হৃদয়ে গাঁথা।
আমার লম্বোদর নাকি উদরের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে বেড়াত,
হয়ে অতি ক্ষুধার্তিক, সোনার কার্তিক ধূলায় পড়ে লুটাত।।

তারপর যখন মেনকা পুনরায় তাঁহার উমাকে ফিরিয়া পাইলেন, তখন তাঁহার চক্ষের

বিষাদের অশ্রু আনন্দাশ্রুতে পরিণত হইয়া গেল,—

গৌরী কোলে করে নগেন্দ্রাণী করুণ বচনে কয়,
উমা আমার সুবর্ণলতা, শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়।
মরি জামাতার খেদে তোমার বিচ্ছেদে
প্রাণ কাঁদে দিবানিশি।
আমি অচল নারী চলতে নারি,
পারি না যে দেখে আসি।
আছি জীবন্মৃত হয়ে আশাপথে চেয়ে
তোমায় না হেরিয়ে নয়ন ঝরে,
কও দেখি উমা কেমন ছিলে মা
ভিখারী হরের ঘরে।।

আগমনী-বিজয়া গানগুলি প্রধানত কবিওয়ালা দ্বারাই রচিত ও প্রচারিত হইত। এতদ্ব্যতীত ভাট ও কবি বলিয়া পরিচিত এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী গায়ক, শারদীয়া পূজার প্রারম্ভে বাংলার গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া সম্পন্ন গৃহস্থদিগের বাড়িতেও এই সকল গান গাহিয়া বেড়াইত। এই ভাবে এই গানের প্রচার হইত। মুখে মুখে প্রচারিত এই সকল গানের বিস্তৃত সংগ্রহ কোন দিন মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, শাক্ত পদাবলীর আর একটি ধারার মধ্যে আধ্যাত্মিক সুরটি প্রবলতর। অবশ্য এই আধ্যাত্মিক সুরটির মধ্যেও বাঙ্গালী সাধকের স্বকীয়তারই পরিচয় মূর্ত হইয়া রহিয়াছে; ইহার উদ্দিষ্টা দেবী মাতৃরূপিণী, কিন্তু তাঁহার মাতৃরূপ গার্হস্থ্য পরিবেশের মধ্যে সংস্থাপিত নহে—পরিদৃশ্যমান প্রকৃতিজগতের মধ্য দিয়া সেই অদ্বিতীয়া শক্তিরূপিণীর বহুমুখী বিচিত্র বিকাশ অনুভূত হইয়া থাকে। ইহা লীলাচঞ্চল বিশ্বের মূলীভূত শক্তি (force) ; তাঁহার এক হাতে সৃষ্টি, আর এক হাতে ধ্বংস,—তাঁহার রূপ কালিকা। ইহাকেই মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া সাধক-কবি ইহার সঙ্গে ঐকান্তিক সাযুজ্য কামনা করিয়াছেন; কবি রামপ্রসাদের মধ্য দিয়া এই সাধনার উন্মেষ ও তাঁহার পরবর্তী শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভিতর দিয়া তাহার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হইয়াছে। দেবতার সঙ্গে মানবিক সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে ইহা মঙ্গলকাব্যের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিরই যথার্থ উত্তরাধিকারী।

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মপূজার ইতিহাস—ধর্মমঙ্গলকাব্য—ধর্মমঙ্গলের কবিগণ

ধর্মপূজার ইতিহাস

বিগত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতেই পশ্চিম বাংলার একটি লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের উপর এ'দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়—তাহা ধর্মঠাকুরের পূজা।[১] পশ্চিম বাংলার বিস্তৃত অঞ্চলে, বিশেষত ভাগীরথীর পশ্চিম তীর হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটনাগপুরের অরণ্যভূমি পর্যন্ত, এই লৌকিক দেবতার পূজার এখনও ব্যাপক প্রচলন আছে। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই বিষয়ে আলোচনার উদ্বোধন করেন। তিনি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির এক সভায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সর্বপ্রথম এই বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[২] উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলিতে চাহেন যে, ধর্মঠাকুর প্রচ্ছন্ন বুদ্ধদেবতা। ইহার পর তিনি আরও দুই তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়া বিস্তৃততর যুক্তি ও তথ্য সহযোগে তাঁহার এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পান। তখন হইতেই তাঁহার এই মতবাদ বিভিন্ন লেখক কর্তৃক নানাদিক হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখা আরম্ভ হয়। ইহার ফলেই এই বিষয়ের আলোচনা একটু ব্যাপকতা লাভ করে। বলা বাহুল্য, তখনও বাংলাদেশের অন্যান্য লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে এ'দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কোনও উল্লেখযোগ্য আলোচনারই সূত্রপাত হয় নাই। অতএব এই ভাবে ধর্মঠাকুরের বিষয় সেই সময় হইতেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে সকল তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার এই মতবাদ গঠন করিয়াছিলেন, তাহা বর্তমানে এই সম্পর্কে আবিষ্কৃত তথ্যাদির তুলনায় অকিঞ্চিৎকর বলিতে হইবে; অতএব বর্তমানে নবাবিষ্কৃত তথ্যাদির সহযোগে তাঁহার এই মতবাদকে সকল দিক দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতবাদের প্রধান ত্রুটি এই যে, কেবল মাত্র স্থানীয়

১। দ্রষ্টব্য Asutosh Bhattacharyya, 'The Dharma-cult', Bulletin of the Department of Anthropology, Government of India, Vol. I (1952), pp. 117-153, 'Dharma Worship in West Bengal', Census, 1951, West Bengal, 'The Tribes and Castes of West Bengal' (Calcutta, 1953), pp. 351-360.

২। Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, December, 1894, 136, প্রবন্ধটি Discovery of Living Buddhism in Bengal নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে পরে প্রকাশিত হয় (Calcutta, 1897)।

অভিজ্ঞতাই ইহার ভিত্তি--ধর্মঠাকুর সম্পর্কিত বিশ্বাস পূর্ব ভারতের যে বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া বিভিন্নরূপে প্রচলিত আছে, তাহার কেবল মাত্র একাংশের উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহার এই মতবাদ গঠিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের পরবর্তী কালেও এই বিষয় লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও প্রধানত তাঁহারই অনুকরণ করিয়া সেই একই অঞ্চলে সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া শাস্ত্রী মহাশয়েরই মতবাদের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন.--সেইজন্য আজ পর্যন্তও এই সম্পর্কিত আলোচনা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিতে পারে নাই।

সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, ধর্মঠাকুরের পূজা পশ্চিমবঙ্গের যে অঞ্চল রাঢ় বলিয়া পরিচিত, সেই অঞ্চলেই উদ্ভূত হইয়া একমাত্র সেই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ আছে। এই ধারণার প্রধান কারণ এই যে, এই অঞ্চলে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই বিশিষ্ট দেবতাটিকে অবলম্বন করিয়া কতকগুলি উচ্চাঙ্গের মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল। এই মঙ্গলকাব্যগুলির উপর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনাকারীদিগের দৃষ্টি প্রথম হইতেই আকৃষ্ট হওয়ার ফলে, প্রধানত তাহাদিগের উপজীব্য এই ধর্মঠাকুরের বিষয়ও আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয়। তাঁহাদের এই বিষয়ক জ্ঞান এই মঙ্গলকাব্যগুলি কর্তৃক পরিবেশিত তথ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বলা বাহুল্য, মঙ্গলকাব্যগুলি স্বভাবতই এই অঞ্চলেরই বৈশিষ্ট্য-চিহ্নিত ছিল এবং উচ্চবর্ণের শিক্ষিত কবিদিগ-কর্তৃকই প্রধানত রচিত হইয়াছিল। অতএব ইহাদিগকে ভিত্তি করিয়া ধর্মপূজার মত ব্যাপক একটি ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কোনও মতবাদ গঠনই নির্ভুল হইতে পারে না, কিন্তু স্বর্গত শাস্ত্রী মহাশয়ের আমল হইতে আজ পর্যন্ত যাঁহারা এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই এই ভুলের বশবর্তী হইয়াছেন। ইহাই যথাসম্ভব নিরসন করিবার জন্য বর্তমান অধ্যায়ে বিষয়টির একটু বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইতেছে।

প্রাচীন কালে পূর্বে ভাগীরথী, উত্তরে ময়ূরাক্ষী, দক্ষিণে দামোদর ও পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পার্বত্য ভূমি—এই সীমানা বেষ্টিত বিস্তৃত ভূভাগ রাঢ় নামে পরিচিত ছিল। ইহা উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় নামে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এই রাঢ় ভূমির দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি ও উত্তর-পূর্বে পৌণ্ড্রবর্ধন নামক অঞ্চল অবস্থিত ছিল। এই বিস্তৃত অঞ্চল বর্তমানে হুগলি, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ (কান্দি মহকুমা) প্রভৃতি জেলায় বিভক্ত হইয়াছে। বাংলাদেশের মধ্যে পৌণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলে সর্বপ্রথম আর্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়া ক্রমে তাহা বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসার লাভ করা সত্ত্বেও, উক্ত রাঢ় অঞ্চল বহুকাল পর্যন্ত আর্যসভ্যতার বহির্ভূত ছিল। এক প্রবল অনার্যজাতি এই অঞ্চলে বসবাস করিত, তাহারা আদি-অস্ত্রাল বা প্রোটো-অস্ট্রালয়েড় জাতির এক কিংবা একাধিক শাখাভুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। যদিও পরবর্তী কালে এই রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসিগণ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রতি অনুরাগী হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়, তথাপি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত লিখিত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রামাণিক কোন গ্রন্থে এই অঞ্চল সম্পর্কে কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং

'আচারাঙ্গসূত্ত' নামক একখানি জৈন গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, মহাবীর কেবল-জ্ঞান লাভ করিবার পূর্বে নানা তীর্থ পর্যটন করিয়াছিলেন, এই ভ্রমণ-ব্যপদেশে তিনি রাঢ়দেশে আসিয়া উপনীত হন। তখন এই রাঢ়দেশের অধিবাসিগণ অত্যন্ত অসভ্য ছিল, তাহারা তাঁহার গায়ে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছিল, কুকুর লেলাইয়া দিয়াছিল ও অন্যান্য নানাভাবে অপমান করিয়াছিল।[১] 'মহাবীরের সময় বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চল ছিল অসভ্য, সুতরাং সে প্রদেশে সে সময়ে জৈনধর্ম প্রসারের কোন সম্ভাবনা ছিল না। বস্তুত জৈন সাহিত্যে যে সমস্ত প্রাচীন গণ, শাখা ও কুলের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার কোনটির সঙ্গেই এ অঞ্চলের কোন স্থানীয় নামের সম্বন্ধ দেখা যায় না।[২] খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত এই অঞ্চলের লোক-সাহিত্যে রাঢ়দেশের অধিবাসী সম্বন্ধে অনুরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ইহাদের সম্বন্ধে এই প্রকার পরিচয় দিতেছেন,—

অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়।।[৩]
ব্যাধ গোহিংসক রাঢ় চৌদিকে পশুর হাড়।।[৪]

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁহার ধর্মমঙ্গলকাব্যে লিখিয়াছেন, 'ডোম, রাঢ়, চোয়াড়'।[৫] তিনি অন্যত্র তাঁহার একটি খল চরিত্রের এই প্রকার পরিচয় দিয়াছেন—'জাতি রাঢ় আমি রে করমে রাঢ় তু'।[৬]

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চীনদেশের পরিব্রাজক ফা-হায়েন বাংলাদেশে ভ্রমণ করিতে আসেন, তিনি রাঢ়দেশেরই সংলগ্ন দক্ষিণ অঞ্চল সুহ্ম-প্রদেশের রাজধানী তাম্রলিপ্তির উল্লেখ করিলেও, রাঢ় কিংবা তাহার অভ্যন্তরস্থ কোন অঞ্চলের উল্লেখ করেন নাই। ইহার পর সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত চীনদেশীয় পরিব্রাজক য়ুয়ান্-চুয়াঙ্ বাংলাদেশে আসেন। তিনিও রাঢ়দেশের, কিংবা তাহার অন্তর্গত কোনও স্থানের কোনও উল্লেখ করেন নাই; ইহাতে মনে হয়, য়ুয়ান-চুয়াঙের সময় পর্যন্ত রাঢ় অঞ্চল কোন ভাবেই বিদেশী পরিব্রাজকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই,—আর্যসংস্কার ইহার মধ্যে তখনও প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। মনে হয়, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর পৌণ্ড্রবর্ধন হইতে বৌদ্ধধর্ম ক্রমে ক্রমে রাঢ় অঞ্চলে গিয়া প্রবেশলাভ করে। যদিও রাঢ় অঞ্চল প্রত্যক্ষভাবে কোনও দিনই পাল-সাম্রাজ্যভুক্ত হয় নাই, তথাপি দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাল রাজগণ বার বার সেই অঞ্চল আক্রমণ করিয়া সেখানে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। পাল-রাজত্বের অবসানের সময়ে এই রাঢ় অঞ্চলেই সেন রাজগণ এক স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্রমে সমগ্র বাংলাদেশ অধিকার করেন। পাল রাজদিগের সময়

১। H. B 121-22, ২। প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী, 'বঙ্গদেশে জৈনধর্মের প্রারম্ভ', সা-প-প ৪৬, ২;
৩। মুকুন্দরাম ৭৩; ৪। ঐ ৭০
৫। ঘনরাম ২৩৪; ৬। ঐ

হইতেই রাঢ়ে বৌদ্ধধর্মের প্রসার আরম্ভ হইলেও সেন-রাজত্বের সময়েই এই অঞ্চলের সহিত বাংলা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের যোগ নিবিড়তর হয়। ইহার পূর্বে ভারতের কেন্দ্রীয় আর্যসভ্যতার ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকার ফলে এই অঞ্চল নিজস্ব লৌকিক আর্যেতর সংস্কারের পরিপোষক ছিল। প্রাগ্-আর্য, এমন কি প্রাগ্-দ্রাবিড় এক প্রবল জাতি এই অঞ্চলে বসবাস করিত, তাহাদের ধর্ম ও আচারগত জীবনে বহুকাল পর্যন্ত বহিরাগত কোন প্রভাব কার্যকর হইতে পারে নাই; ধর্মপূজা মূলত ইহাদের মধ্যেই উদ্ভূত হইয়া কালক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রভাবের সম্মুখীন হয়।

ধর্মঠাকুর, ধর্মরাজঠাকুর বা ধর্ম নামক এক দেবতা এই অঞ্চলে সাধারণত সকলশ্রেণীর অধিবাসীদিগের মধ্যেই আজিও বিপুল আড়ম্বরে পূজিত হইয়া থাকেন। এই অঞ্চলের অধিবাসী উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণও কোনও কোনও স্থানে বর্তমানে এই দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। দেবতার এই নামটির উদ্ভব সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পুরাতত্ত্ববিদ্ স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, ধর্ম শব্দের অর্থ বুদ্ধ। অমরকোষে বুদ্ধদেবের এক নাম ধর্মরাজ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা, 'সর্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্মরাজস্তথাগতঃ।'[১] নৃতত্ত্ববিদ্ স্বর্গত শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় মনে করেন যে, প্রাচীন হিন্দুসাহিত্যে সূর্যের এক নাম ধর্ম।[২] কিন্তু ইহা ঠিক নহে; যমের এক নাম ধর্মরাজ হইলেও ধর্ম বলিতে কোনও দিন সূর্য বুঝায় না। ভাষাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন যে, ধর্ম শব্দটি কূর্মবাচক প্রাচীন অস্ট্রিক শব্দের সংস্কৃত রূপ।[৩] কিন্তু ধর্মঠাকুর হিন্দু পৌরাণিক প্রভাবে আসিবার পর কূর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট হন, মূলত ইহার সঙ্গে কূর্মের কোনও সংস্রব ছিল না—এই বিষয় নীচে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। নৃতত্ত্ববিদ্ ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন, ধর্মঠাকুর বৈদিক দেবতা বরুণের আধুনিক সংস্করণ মাত্র।[৪] বরুণের নিকট নরবলি দেওয়া হইত, ধর্মঠাকুরের নিকট যে লুয়ে ছাগ বলি হয়, তাহা বর্তমানে সেই নরবলির স্থান গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে যুক্তি এই যে, ধর্মঠাকুরের পূজা যদি বৈদিক দেবতা বরুণেরই পূজা, তবে তাহা কেবল মাত্র একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে আবদ্ধ থাকিবে কেন? বিশেষতঃ যে ডোম জাতি এই ধর্মঠাকুরের পূজারী, তাহার সঙ্গে তো বৈদিক ধর্মের কোনও সম্পর্ক নাই; তবে তিনি যে বলিয়াছেন, লুয়ে পাঁঠা বলি (পরে দ্রষ্টব্য) নরবলির স্থান গ্রহণ করিয়াছে, এই বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। ধর্মঠাকুর যিনিই হউন, পূর্বে যে তাঁহার নিকট নরবলি দেওয়া হইত, ইহা নিশ্চিত বলিয়াই মনে হয়। এই দেবতার বর্তমান পূজারিগণও ইঁহার

১। 'অমরকোষ' শিবদত্ত সম্পাদিত (বোম্বাই, ১৯৪৪) ৭. ২০. ৪০২

২। S.C.Roy, *The Kharias* (Ranchi, 1937), 321.

৩। B. C. *Law Volume* 1, (Calcutta, 1945), 79-80

৪। *JRASB* VIII. (1942). 132-33.

পরিচয় সম্বন্ধে একমত নহেন। পূজারিগণও তাঁহাকে কোথাও বিষ্ণু, কোথাও শিব, কোথাও যম, আবার কোথাও সূর্য বলিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন।[১] পরিচয়ের এই বিভিন্নতার জন্য কোনও কোনও স্থানে এই দেবতা ধ্যানমন্ত্রে 'বহুরূপ' বলিয়াও উল্লিখিত হন।

ধর্মঠাকুরের কোন মূর্তি নাই। তাহার পরিবর্তে এক খণ্ড স্বাভাবিক প্রস্তরই এই নামে পূজিত হয়। কোনও কোনও স্থানে প্রস্তরখণ্ডের গায়ে টুকরা টুকরা চাঁচ বা পিতলের পেরেক পরাইয়া দেওয়া হয়—তাহাই ধর্মঠাকুরের চক্ষু। কোনও ভক্ত চক্ষুরোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিয়া দেবতাকে তাহা উপহার দিয়া থাকে। কালক্রমে কোন কোন অঞ্চলে একটি রীতি প্রবর্তিত হইল যে, ধর্মঠাকুর কচ্ছপাকৃতি হইবে। বলা বাহুল্য, হিন্দুধর্মের প্রভাবের ফলে ধর্মঠাকুর যে অঞ্চলে বিষ্ণুরূপে পূজিত হন, কেবল মাত্র সেখানেই তাঁহাকে বিষ্ণুর অন্যতম অবতার কূর্মরূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে। সেই জন্যই সকল ধর্মঠাকুরই প্রকৃত কচ্ছপাকৃতি নয়, অধিকাংশই সুগোল কিংবা ডিম্বাকৃতি। কোন কোন মন্দিরের ধর্মঠাকুর একটি বস্ত্রখণ্ডদ্বারা সর্বদা আচ্ছাদিত থাকেন, বাহির হইতে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। ধর্মঠাকুরের মন্দিরে কোনও কোনও সময় দেবতার পার্শ্বে একাধিক শিলাখণ্ড থাকে, তাহা ধর্মঠাকুরের আবরণ দেবতা বলিয়া পরিচিত। কোনও কোনও সময় তাহাদের স্বতন্ত্র কোনও নামও থাকে। ধর্মরাজঠাকুরের অন্য কোন প্রতিমা নাই।

বর্তমানে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে কচ্ছপের সম্পর্ক বিষয়ে কেহ কেহ অতিরিক্ত জোর দিতেছেন।[২] বিষয়টি সম্পর্কে ইতিপূর্বেই বিস্তৃতভাবে অন্যত্র আলোচনা করা হইয়াছে।[৩] তথাপি সংক্ষেপে এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করা যাইতেছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, ধর্মঠাকুরের সুনির্দিষ্ট কোনও রূপ নাই। অতএব কূর্মমূর্তির সঙ্গে তাঁহার ঐক্য নির্দেশ করিবার কোনও সঙ্গত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্মঠাকুরের সর্বত্র প্রচলিত ধ্যানমন্ত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, তাঁহার সঙ্গে কূর্মমূর্তির কোনই সম্পর্ক নাই। মন্ত্রটি সর্বত্রই এই প্রকার—

যস্যান্তো নাদিমধ্যো ন চ করচরণৌ নাস্তিকায়ো ন নাদঃ।
নাকারো নৈবরূপং ন চ ভয়মরণে নাস্তি জন্মাদি যস্য।।
যোগীন্দ্রৈর্ধ্যানগম্যং সকলজনময়ং সর্বলোকৈকনাথম্।
ভক্তানাম্ কামপূরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্তিম্।।

ইহাতে ধর্মঠাকুরকে স্পষ্টতই করচরণহীন, নিরাকার ও বিশেষ কোনও রূপহীন বলিয়া

১। বর্ধমানের সর্বমঙ্গলার মন্দিরে একটি ধর্মমূর্তিকে সূর্য বলিয়া পূজা করা হইয়া থাকে।

২। দীনেশচন্দ্র সরকার, 'প্রাচীনবঙ্গে ধর্মপূজা', প্রবাসী. ভাদ্র (১৩৫৬), *J. R. A. S. B*-XV (1949), 101-18.

৩। আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'ধর্মঠাকুর ও কূর্মমূর্তি, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ (১৩৫৬), ১৭৩-১৭৫; পশ্চিমবাংলার ধর্মঠাকুর', মাসিক বসুমতী জ্যৈষ্ঠ (১৩৭৫), ২০৪-২০৬।

উল্লেখ করা হইয়াছে। কূর্মমূর্তির পরিবর্তে বরং ধর্মঠাকুরকে এখানে শূন্যমূর্তি বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, উক্ত ধ্যানমন্ত্রটি বৌদ্ধপ্রভাবিত সমাজে পরিকল্পিত হইয়াছিল বলিয়া স্পষ্ট অনুভব করা যায়। ইহাতে ধর্মঠাকুরের কূর্ম-পরিকল্পনার আভাস মাত্র নাই।

বৌদ্ধ ও হিন্দু-প্রভাবিত সমাজের বাহিরেও পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঠাকুর কূর্মমূর্তি নহেন। রিজ্‌লী তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Tribes and Castes of Bengal*-এ উল্লেখ করিয়াছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের ডোমগণ মৎস্যপুচ্ছ-বিশিষ্ট নরাকৃতি ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়া থাকে।'[১] বলা বাহুল্য, ইহাও কূর্মমূর্তি হইতে পারে না। রিজ্‌লী প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তখন তিনি ডোমদিগের মধ্যে এই আচার লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। অতএব কূর্মাকৃতি ধর্মঠাকুরের পূজা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল, এখন লুপ্ত হইয়াছে, এমন কথাও বলা যাইতে পারে না। সুতরাং এই রীতি পূর্ব হইতেও যে প্রচলিত ছিল না, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, 'আজকাল প্রস্তর খোদিত কূর্মমূর্তিকে ধর্মঠাকুররূপে পূজা করা হয়।' কিন্তু এ'কথা সত্য নহে। প্রস্তর খোদিত বলিতে পাঠকের মনে এই ধারণা হয় যে, সাধারণ প্রস্তরনির্মিত মূর্তির মতই বুঝি পাথর কাটিয়া ধর্মঠাকুরের মূর্তি নির্মাণ করা হয়। কিন্তু ইহা ধর্মপূজার মৌলিক সংস্কারের বিরোধী। ধর্মমূর্তি স্বাভাবিক শিলাখণ্ড মাত্র, ইহার আকৃতির কোন স্থিরতা নাই; এক এক স্থানে ইহার এক এক রূপ। পূর্বেই বলিয়াছি, সেইজনাই ইহাকে বহুরূপ বলিয়াও সম্বোধন করা হইয়া থাকে (তুলনীয় : 'নমস্তে বহুরূপায় যমায় ধর্মরাজায়'[২])। বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ ধর্মঠাকুরটি শালগ্রাম শিলার ন্যায় সুগোল, তবে শালগ্রামের মত গায়ে কোন ছিদ্র নাই। আসানসোলের নিকটবর্তী ডেমরা গ্রামের [illegible]টি ধর্মঠাকুরই ডিম্বাকৃতি। কেহ কেহ বলেন যে, 'ধর্মশিলা ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ।' ইহার [illegible]র্দিষ্ট কোন আকার আছে বলিয়া দাবী করিতে না পারায় আবার কেহ বলিয়া[illegible]ন, ধর্মশি[illegible] মোটামুটি কচ্ছপ আকার।'

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলের প্রারম্ভে রাঢ়ের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ধর্মশিলার নামোল্লেখ আছে। তাহাতে একটি ধর্মশিলাকে এইভাবে বন্দনা করা হইয়াছে, 'গোপালপুরের কাঁকড়া বিছায় বন্দি তারপর'[৩]। বলা বাহুল্য, গোপালপুর গ্রামের ধর্মশিলাটি দেখিতে কাঁকড়া বিছার আকৃতি ছিল বলিয়াই ইহা কাকড়া বিছা ধর্মঠাকুর নামে পরিচিত ছিল। ধর্মঠাকুরের মূর্তির কোন স্থিরতা ছিল না বলিয়া [illegible] উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার 'স্থানে স্থানে মূর্তিভেদ' আছে ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার [illegible]দিম অধিবাসিগণ ধর্মঠাকুর বা 'ধরম দেওতা' বলিতে সূর্য দেবতা ভিন্ন আর কিছুই বুঝে না।

১। H H Risley, Tribes and C[illegible] Bengal (1891) I, 241

২। সা-প-প ১৪, ১১৬

৩। মাণিকরাম, [illegible]

ধর্মমঙ্গল কাব্যে কচ্ছপের উল্লেখ মাত্র নাই। 'শূন্য পুরাণ' নামক ধর্মপূজাবিধান বিষয়ক গ্রন্থে কূর্মের যে একবার মাত্র অতি সামান্য উল্লেখ আছে, তাহা দ্বারাও ইহার সঙ্গে ধর্মঠাকুরের কোনও মৌলিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। 'শূন্য পুরাণে' কূর্মের এই প্রকার উল্লেখ আছে—ধর্মের বাহন উলুক (কূর্ম নহে) তাঁহার ভার সহ্য করিতে না পারিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, তিনি প্রথমে হংসকে তাঁহার ভার বাহন করিবার জন্য সৃষ্টি করিলেন। হংস অল্পকাল মধ্যে ধর্মঠাকুরকে ফেলিয়া পলাইয়া গেল. অবশেষে তিনি কূর্মকে সৃষ্টি করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন; কূর্মও অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার ভারে ক্লান্ত হইয়া তাঁহাকে ফেলিয়া পলাইয়া গেল। তাহার আর দেখা পাওয়া গেল না। 'শূন্য পুরাণ'-এর মতে ইহাই ধর্মঠাকুরের সঙ্গে কূর্মের সম্পর্ক। ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই নহে। অতএব কচ্ছপকে ধর্মঠাকুরের প্রতীকরূপে কিছুতেই মনে করা যাইতে পারে না।

তবে ধর্মঠাকুরের সম্পর্কে কূর্মের কথা আসিল কোথা হইতে? পূর্বে বলিয়াছি যে, যে-অঞ্চলে ধর্মপূজা হিন্দুধর্ম দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হইয়াছে, সেই অঞ্চলে ধর্মশিলাকে বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে। সেই অঞ্চলেই ধর্মশিলাকে বিষ্ণুরূপে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আকার-সাদৃশ্যবশতঃ ইহাকে বিষ্ণুর অন্যতম অবতার কূর্মের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। বাংলার সুপ্রসিদ্ধ লোক-সংস্কৃতিবিৎ পণ্ডিত স্বর্গত শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও ধর্মঠাকুরের কূর্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার ইহাই একমাত্র কারণ বলিয়া মনে করেন।[১] বাংলাদেশের ধর্মকর্মে কূর্ম অপরিচিত নহে,—বিষ্ণুর এক অবতার কূর্ম, যমুনার বাহন কূর্ম, 'কূর্মপুরাণ' নামকও একটি সংস্কৃত পুরাণ আছে। অতএব হিন্দুধর্মপ্রভাবিত অঞ্চলে ধর্মপূজায় কূর্মের প্রভাবের মধ্যে বিস্ময়ের কিছুই নাই। ভগ্ন যমুনা মূর্তির এই কূর্মরূপী পাদপীঠকে হিন্দু প্রভাবিত অঞ্চলে ধর্মঠাকুর বলিয়া পূজা করা হইয়া থাকে।[২] কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রভাব-বহির্ভূত অঞ্চলে ধর্মশিলার কূর্মরূপ সম্বন্ধে কোন বিশ্বাস প্রচলিত আছে বলিয়া জানা যায় না। শালগ্রাম শিলার মত ধর্মশিলার পূজাও আদিম বস্তুপূজার প্রবৃত্তি (fetishism) হইতে জাত। ইহার সঙ্গে 'কূর্মবাদ'-এর (tortoise-cult) কোন সম্পর্ক কল্পনা করা যায় না। ধর্মপূজার মধ্য দিয়া বাংলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী উপজাতীয় অঞ্চল হইতে যদি এই 'কূর্মবাদ' বাংলাদেশে আসিয়া থাকিত, তাহা হইলে সেখানে ধর্মঠাকুর বলিতে সূর্যদেবতা বুঝাইত না। এই সম্পর্কে এই কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাংলার প্রতিবেশী কোন উপজাতীয় অঞ্চলেই কূর্মোপাসনা প্রচলিত নাই।

স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ হইতে ধর্মঠাকুরের একটি প্রতিমার সন্ধান পাইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা বুদ্ধ ও পৌরাণিক

১। *J. A. S. B.*, XI, 54-3

২। প্রবাসী, বৈশাখ (১৩৫৭), ৮৭ পৃঃ চিত্র দ্রষ্টব্য।

৩। *Archaeological Survey of Mayurbhanj* (1911), XCVI.

বিষ্ণুর মিশ্র আদর্শে গঠিত কোনও স্থানীয় লৌকিক দেবতার মূর্তি,—ইহাকে ধর্মঠাকুরের মূর্তি বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে, এমন কোন প্রমাণ নাই। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, পশ্চিমবঙ্গের ডোম জাতির ধর্ম আলোচনা সম্পর্কে রিজ্‌লী লিখিয়াছেন যে, ডোম জাতি মৎস্যপুচ্ছবিশিষ্ট ধরম অথবা ধর্মরাজ নামক এক দেবতার পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু আমি এই বিষয়ে বহু অনুসন্ধানের ফলেও পশ্চিমবঙ্গের ডোমদিগের মধ্যে মৎস্যপুচ্ছবিশিষ্ট কোন দেবতার সন্ধান পাই নাই;—তাহারা পূর্ব-বর্ণিত প্রস্তরখণ্ডেই এখন ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়া থাকে। সম্ভবত এই প্রথা তাহাদের মধ্যে পূর্বে প্রচলিত ছিল, এখন লুপ্ত হইয়াছে।

সাধারণতঃ এই সকল প্রস্তররূপী ধর্মঠাকুর পল্লীর কোন নির্জন বৃক্ষমূলে অবস্থান করিয়া থাকেন, অনাবৃষ্টির সময় কিংবা কোন মানসিক পূর্ণ করিবার সময় গ্রামবাসিগণ বৃক্ষমূলে গিয়াই তাঁহার পূজা দিয়া থাকে। কোন কোন সময় সিদ্ধাভীষ্ট কোন ভক্ত বৃক্ষের সংলগ্নই তাঁহার জন্য মন্দির গড়িয়া দেন—ভক্তের সঙ্গতি অনুযায়ী এই মন্দির মাটি, খড় কিংবা ইটের কোঠাও হইতে পারে। বর্তমানে কোন কোন সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারেও শালগ্রাম শিলার মত ধর্মশিলা নিত্য পূজা পাইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, পৌরাণিক বিষ্ণুর সঙ্গে তখন তাঁহার আর কোন পার্থক্য থাকে না,—বিষ্ণুর মন্ত্রেই তাঁহার পূজা নিবেদন করা হয়। এই অঞ্চলে হিন্দুধর্ম বিস্তৃতির পূর্বে যখন বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য ছিল, তখন বুদ্ধের সঙ্গে অভিন্নরূপে এই ধর্মশিলা পূজিত হইতেন বলিয়া মনে হয়।

এক এক জায়গায় ধর্মঠাকুরের এক এক নাম; যেমন—কালু রায়, বুড়া রায়, কৌতুক রায়, যাত্রাসিদ্ধি রায়, বাঁকুড়া রায় ইত্যাদি। রায় কথাটি প্রায় প্রত্যেক নামের সঙ্গেই যুক্ত রহিয়াছে। ধর্মমঙ্গলের একজন কবি তাঁহার পরিচিত বিভিন্ন স্থানের ধর্মঠাকুরদিগের এই প্রকার নামোল্লেখ করিয়া বন্দনা করিয়াছেন,—

প্রথমে বন্দিব জয় জয় পরাৎপর।
স্থানে স্থানে মূর্তিভেদ মহিমা বিস্তর।।
বেলডিহার বাঁকুড়া রায় বন্দি এক মনে।
অসংখ্য প্রণতি শীতল সিংহের চরণে।।
ফুল্লরের ফতে সিং বৈতলের বাঁকুড়া রায়।
শুদ্ধভাবে বন্দি দোঁহে নত হয়ে কায়।।
পাণ্ডুগ্রামের বুড়া ধর্মে বন্দিয়া সাদরে।
শ্যাম বাজারের দলু রায়ে দিয়ে জয় জয়কারে।।
দেপুরে জগৎ রায়ে জোড় করি কর।
গোপালপুরের কাঁকড়া বিছায় বন্দি তারপর।।
সিয়াসের কালাচাঁদে ত্রিল্দাসের বাঁকুড়া রায়।
বন্দিব বিস্তর নতি করে নত কায়।।

গোপুরের স্বরূপ নারায়ণ স্বর্ণ সিংহাসনে।
বন্দিয়া বন্দিব মঙ্গলপুরের রূপ নারাণে।।
পশ্চিম পাড়ার যাত্রাসিদ্ধি বন্দিয়া তাহার।
বড়ুজা গ্রামের বন্দিব মোহন রায়।।
গুড়ুছাগ্রামের বন্দি শীতল নারায়ণে।
আলগুড়চিন্নার খুদিরায়ে বন্দি সাবধানে।।
আকুটিকুল্লার মাল্লার ধর্মের করিয়া স্তবন।
বন্দিপুরের শ্যামরায়ের বন্দিয়া চরণ।।
জাড়াগ্রামে কালুরায়ের কামিন্যা সহিত।
জাজপুরের দেহারা বন্দি দার্ঢ্য করি দিত।।[১]

ধর্মঠাকুরের নিকট নিঃসন্তান গ্রামবাসিগণ সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানায়। লোকের বিশ্বাস, অনাবৃষ্টির কালে ধর্মঠাকুরের পূজা দিলে অবিলম্বে সুবৃষ্টি হয়। কুষ্ঠরোগ হইলে ধর্মঠাকুরের পূজা মানসিক করিতে হয়,—পূর্বজন্ম কিংবা ইহজন্মকৃত কোন পাপের জন্য ধর্মঠাকুরই কুষ্ঠরোগ দিয়া থাকেন বলিয়া বিশ্বাস। চক্ষুরোগেও ধর্মঠাকুরের পূজা মানসিক করিতে হয়। মৃতবৎসার সন্তাননাশ নিরোধ করিবার উদ্দেশ্যেও ধর্মঠাকুরের পূজা দেওয়া হইয়া থাকে।

পশুবলি ধর্মপূজার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান হিন্দু প্রভাবিত অঞ্চলে ছাগ ও কবুতর বলিই বিধি। সাদা রঙের ছাগের অভাবে কালো রঙের ছাগ বলি দিতে হয়। কোন কোন অঞ্চলে সাদা রঙের পশু কিংবা পক্ষী বলি দেওয়াই একমাত্র রীতি। কিছুকাল পূর্বেও এই উপলক্ষে এই অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শূকর বলি দিত; মানভূম জিলার বাউরি জাতীয় লোকেরা এখনও এই উপলক্ষে শূকর ও মুরগী বলি দিয়া থাকে। অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে দেবতাকে মাটির ঘোড়াও[২] উপহার দেওয়া হয়। ধর্মঠাকুর হইতেই দেবতাকে মাটির ঘোড়া উপহার দিবার প্রথা এই অঞ্চলের অন্যান্য লৌকিক দেবতাতেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস ধর্মঠাকুর সাদা ঘোড়ায় চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়ান। কেহ আবার তাঁহার নিকট মাটির ঘোড়া উপহার দিয়া আশা করেন, ধর্মঠাকুব তাঁহার আহ্বানে ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া সাড়া দিবেন। 'কেহ কেহ মনে করেন, ঘোড়া দিলে শিশুপুত্র খট্ খট্ করিয়া

১। মাণিকরাম গাঙ্গুলি, 'ধর্মমঙ্গল', হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত (কলিকাতা ১৯০৬), ৬

২। দেবতাকে মাটির ঘোড়া উপহার দিবার প্রথা বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের প্রায় সকল আদিম জাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। W. G Archer, *The Vertical Man*, London, 1947, plate XXIX, Verrier Elwin, *Muria and Their Ghotul*, Bombay, 1947, 208. দাক্ষিণাত্যের আয়েনার নামক লৌকিক দেবতার নিকটও মাটির ঘোড়া উপহার দিবার রীতি প্রচলিত আছে। (See H. Whitehead, op. cit., plate II.)

চলিয়া বেড়াইবে।'

যাঁহারা ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সাধারণত ব্রাহ্মণ নহেন,—ডোম জাতিভুক্ত লোকই প্রধানত এই দেবতার পূজারী হইয়া থাকেন। পূজারীদিগের উপাধি পণ্ডিত, তাঁহারা দেয়াসী বা দেবাংশী বলিয়াও পরিচিত।[১] যে গ্রামে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, সেখানে বাৎসরিক পূজানুষ্ঠানের সময় বর্তমানে ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করা হইয়া থাকে। তথাপি দেয়াসীরাও দেবতার উপর নিজেদের কর্তৃত্ব ত্যাগ করেন না। দেবতার নামে তুকতাক ঔষধ ও মাদুলী দেয়াসীই দিয়া থাকেন,—একমাত্র পূজা করা ব্যতীত ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দেবতার উপর আর কোন অধিকার নাই। দেয়াসী সাধারণতঃ দেবতার সাংবাৎসরিক সেবক ও তত্ত্বাবধায়ক রূপেই কার্য করিয়া থাকেন। ডোম ব্যতীতও বর্তমানে কোন কোন জায়গায় অন্যান্য অস্পৃশ্য শ্রেণীর লোকও ধর্মঠাকুরের দেয়াসী হইয়া থাকেন। কিন্তু ডোম পণ্ডিতদিগেরই এই কার্যে বিশেষ অধিকার আছে বলিয়া মনে করা হয়। মানভূম জেলায় একটি প্রচলিত কথা আছে,—'আর কোথাও জায়গা পেলে না, শেষে ডোমের বাড়িতে উঠলে গিয়ে ধর্মরাজঠাকুর!' ব্রাহ্মণগণ যেমন উপবীত ধারণ করেন, তেমনই ধর্মরাজঠাকুরের ডোম পূজারিগণ তাম্র ধারণ করেন। তাম্র ধারণ অর্থ, বাহুতে তামার তাগা ও হাতে আংটি ধারণ করা। তাম্র ধারণ না করিলে কেহই ধর্মঠাকুরের পুরোহিত হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের তাম্রদীক্ষার প্রয়োজন হয় না। ধর্মপণ্ডিতগণ লোকের অসুখে বিসুখে বিশেষত কুষ্ঠরোগ, নানা চর্মরোগ ও স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্বরোগে নানা টোটকা ঔষধ দিয়া থাকেন। ইহা হইতেই তাঁহাদের উপর জনসাধারণের শ্রদ্ধার আকর্ষণ হয়। ধর্মঠাকুরের পূজা সাধারণত তিন প্রকার প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ক্রমে এই তিনটি প্রণালীরই যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে।

প্রথমত নিত্যপূজা। যাহাদের গৃহে পারিবারিক ধর্মশিলা প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাদের গৃহে নিত্যপূজা ব্যতীত অন্য কোন অনুষ্ঠান সাধারণত দেখা যায় না। পারিবারিক নিত্যপূজায় কোন ঘটা হয় না, তবে যদি পূজাসম্পর্কিত বিশেষ কোন দৈব কিংবা জনশ্রুতিমূলক নির্দেশ থাকে, তবে তাহা সতর্কতার সঙ্গে পালন করা হয়। যেমন বলা যাইতে পারে যে, বর্ধমান

১। কেহ কেহ মনে করেন, শব্দটি সংস্কৃত দেববাসী শব্দ হইতে জাত; কিন্তু মনে হয়, ইহা দ্রাবিড় ভাষা হইতে আগত, কারণ ত্রিবাঙ্কুরে প্রায় অনুরূপ অর্থে শব্দটি অদ্যাপি ব্যবহৃত হয় (Thurston, *Castes and Tribes of Southern India*, II, Madras, 1909, 121.) Risley-র প্রাগুক্ত *Tribes and Castes of Bengal* গ্রন্থে (Vol. I p 216), দেয়াসী ও দেবাংশী সম্পর্কে নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—'Deasi'—a synonym for Lohar Maiyhi; Debangsi—a title of upcountry and Uriya Brahmins; Debansi—a sub-tribe of Rajputs in Chota Nagpur, to which the Rajas of Bishnupur, in Bankura, profess to belong; Debansi—a class of Tiyars who are fishermen'. ইহাদের কাহারও সঙ্গে বাংলার ধর্মঠাকুরের পূজারী দেয়াসীর যে সম্পর্ক আছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

জেলার খুদকুড়ি গ্রামের আগুরী বাড়িতে যে একটি ধর্মশিলা প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে প্রত্যহ এক সের সিদ্ধ চাউলের নৈবেদ্য ভোগ দেওয়া হয়। তবে এই নিত্যপূজা উপলক্ষেই কোন কোন সময়ে পারিবারিক ধর্মশিলার নিকটও বিশেষ পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। যেমন কোন গৃহকর্তা কোন মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ধর্মঠাকুরকে একদিন পরমান্ন বা পায়েস ভোগ দিলেন এই মাত্র। গৃহে কোন উৎসব অনুষ্ঠানের দিনেও তাঁহার নিত্যপূজার বরাদ্দের অতিরিক্তও অন্য কোন উপকরণ দ্বারা তাঁহার ভোগ দেওয়া হইবে ইত্যাদি। নিত্যপূজায় পারিবারিক ধর্মশিলার নিকট সাধারণত কোন পশু বলি দেওয়া হয় না। তবে পরিবারস্থ কাহারও এই বিষয়ে মানসিক থাকিলে তাহা অবশ্য পালন করা হইয়া থাকে। পারিবারিক নিত্যপূজা সাধারণত দিনে দুইবার হয়—প্রথমত, দ্বিপ্রহরে ধর্মশিলাটিকে শয্যা হইতে তুলিয়া স্নানাদির পর পূজা করিয়া সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয়ত, রাত্রিকালে ইহাকে বৈকালী নৈবেদ্য দিয়া পুনরায় শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখা হয়। এই বিষয়ে শালগ্রাম শিলা পূজার সঙ্গে ইহার কোনই ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্মঠাকুরের নিত্যপূজা আরও একভাবে হইয়া থাকে। যে গ্রামে বারোয়ারী ধর্মতলা বা ধর্মমন্দির আছে এবং তাহাতে নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে, সেখানে ধর্মঠাকুরের নিত্যপূজায় ইহা হইতে একটু বৈচিত্র্য দেখা যায়। এই সকল ক্ষেত্রে ঠাকুরের যথানির্দিষ্ট পূজা ও ভোগের উপর প্রায়ই অতিরিক্ত মানসিক পূজা ও ভোগ হইয়া থাকে। যেমন অনেকে পুত্রকন্যা কিংবা নিজের অসুখ-বিসুখে বিশেষ এক গ্রামের ধর্মঠাকুরের নাম করিয়া মানসিক করিয়া থাকে যে রোগমুক্তির পর যেদিন সম্ভব হইবে সেদিন ধর্মঠাকুরের নিকট বিশেষ কিছু ভোগ কিংবা বলি দিয়া তাঁহার পূজা দিবে। বিশেষ কোন গ্রামের ধর্মঠাকুরের খ্যাতি যদি দূরবর্তী গ্রামসমূহেও ছড়াইয়া পড়ে অর্থাৎ তাঁহার দেয়াসী প্রদত্ত ঔষধ ও মাদুলী যদি কার্যকরী বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে গ্রামান্তর হইতেও এই প্রকার মানসিক পূজা আসিয়া থাকে। কোন গ্রামে যদি ধর্মতলা কিংবা ধর্মমন্দির থাকে এবং তাহাতে নিত্যপূজার ব্যবস্থাও থাকে, তবে সেই গ্রামের অধিবাসী সাধারণত গ্রামান্তরে গিয়া পূজা দেয় না। কিন্তু ইহার সুনির্দিষ্ট যে কিছু নিয়মও আছে, তাহা নহে। এই সকল মানসিক উপলক্ষে সাধারণত পাঁঠা, হাঁস কিংবা কবুতর বলি দেওয়া হয়। বর্তমানে সাধারণত এই সকল মন্দিরে একজন নিযুক্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও নিম্নশ্রেণীর অন্য একজন তাঁহার সহায়ক থাকে, মন্দিরের আয়ের ভাগ সেও পায়। মনে হয়, এই নিম্নশ্রেণীর সহায়কই পূর্বে দেবতার পূজারী ছিল, পরে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণের প্রভাববশতঃ সেই অধিকার ক্রমে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। কিন্তু ডোমজাতীয় সহায়ক বড় দেখিতে পাওয়া যায় না; মনে হয় তাহারা ব্রাহ্মণের নীচস্থ হইয়া ধর্মঠাকুরের পূজায় সহায়তা মাত্র করা অপেক্ষা মন্দিরের সম্পর্ক একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই শ্রেয় মনে করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের ডোমদিগের চরিত্র যাঁহারা ভাল জানেন, তাঁহারা এ কথা সমর্থন করিবেন। কিন্তু কোন কোন গ্রামে, বিশেষত বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশের কোন কোন গ্রামে, ডোম পুরোহিত মন্দিরের পূর্ণ কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করেন নাই।

যে সকল গ্রামে ব্রাহ্মণের প্রভাব বিশেষ কার্যকরী হইতে পারে নাই, সেই সকল গ্রামে ডোম পূজারীই এখনও বারোয়ারী ধর্মমন্দিরে নিত্যপূজা করিয়া থাকেন। অধিকাংশ বারোয়ারী ধর্মমন্দিরের নিত্য ও বার্ষিক পূজার ব্যয় নির্বাহের জন্য হিন্দু জমিদারগণ প্রদত্ত দেবোত্তর জমি আছে। মন্দিরের পূজারীই সেই সকল জমি তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। যে সকল হিন্দু জমিদার এই উপলক্ষে দেবোত্তর জমি দিয়া থাকেন, তাঁহারা, বিশেষতঃ তাঁহাদের হিন্দু কর্মচারিগণ, এই সকল মন্দির পরিচালনা সম্পর্কেও অনেক সময় কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার এক বারোয়ারী ধর্মমন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বার্ষিক পূজার সময় গ্রামের অধিবাসীদের পবিবর্তে কেবলমাত্র জমিদারের নামেই 'সঙ্কল্প' করা হয়, অর্থাৎ পূজা কেবলমাত্র জমিদারের ব্যয় ও চেষ্টায় একক তাঁহারই মঙ্গল কামনায় অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহাই ইহার উদ্দেশ্য। এই সকল উচ্চশ্রেণীর জমিদার কিংবা তাঁহাদের অনুরূপ সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন কর্মচারিগণ, ডোমজাতীয় লোকদ্বারা মন্দিরে পূজা করাইতে স্বভাবতই পছন্দ করিতেন না। এই জন্য বহু স্থানেই বর্তমানকালে ডোমজাতীয় লোক মন্দিরের সম্পর্ক ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। কোন কোন স্থলে তাঁহারা বারোয়ারী মন্দিরের নিত্যপূজা করিবার অধিকার রক্ষা করিলেও এই সকল মন্দিরে যখন বাৎসরিক পূজার আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তখন প্রায় সর্বত্রই ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত করা হয়। গ্রামের অবস্থা সচ্ছল না হইলে নিত্যপূজা সাধারণত হয় না—ধর্মতলা সারা বৎসর পরিত্যক্ত হইয়া থাকে; গ্রাম্য পাঠশালা, জমিদারের খাজনা আদায়ের কাছারী, কিংবা ভবঘুরের আড্ডারূপেই তখন ইহা ব্যবহৃত হয়। দেবতার কোন প্রস্তর-প্রতীক থাকিলেও তাহা অনাদৃত হইয়া পড়িয়া থাকে। কেবলমাত্র বার্ষিক পূজার কয়েকদিন পূর্ব হইতে ইহার উপর গ্রাম্য লোকের সজাগ দৃষ্টি পড়ে। যে সকল ধর্মঠাকুরের সচ্ছল দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, সুপ্রতিষ্ঠিত মন্দির আছে ও পূজার জন্য নির্দিষ্ট পুরোহিত আছে, কেবলমাত্র তাঁহাদিগের ব্যতীত বারোয়ারীতলায় অন্য কোন ঠাকুরের সাধারণত নিত্যপূজা হয় না।

তারপরই বার্ষিক পূজা। পারিবারিক ধর্মশিলার বার্ষিক কোন বিশেষ পূজানুষ্ঠান হয় না। তবে পরিবারের কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে কিংবা কাহারও মানসিক পালন করিতে হইলে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা হইতে পারে—তাহাকে বার্ষিক পূজা বলা যায় না। কেবলমাত্র বারোয়ারী ধর্মঠাকুরেরই আড়ম্বরপূর্ণ বার্ষিক পূজা হইয়া থাকে। পূর্বেই বলিয়াছি, যে ধর্মঠাকুর সারা বৎসর অনাদৃত হইয়া বারোয়ারী মন্দিরে পড়িয়া থাকেন, বার্ষিক পূজার প্রাক্কালে তাঁহার মন্দিরের চারিদিক উৎসবের আয়োজনে মুখর হইয়া উঠে। যে সকল মন্দিরে নিত্যপূজা হয় সে সকল মন্দিরের তো আর কথাই নাই।

বারোয়ারী ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজা চৈত্র পূর্ণিমা, বৈশাখী পূর্ণিমা, জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা ও আষাঢ়ী পূর্ণিমা—যে কোনদিন অনুষ্ঠিত হইতে পারে। বোলপুরের তিন মাইল উত্তরে ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম গোয়ালপাড়া; এখানে চৈত্র পূর্ণিমা তিথিতে বাৎসরিক ধর্মপূজার অনুষ্ঠান হয়। এখানকার ধর্মপূজার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এই অঞ্চলের সমস্ত ডোম বাদ্যকর

আপনা হইতেই এখানে আসিয়া সমবেত হইয়া বিনা পারিশ্রমিকে পূজা উপলক্ষে ঢাক বাজায়। কারণ, তাহারা বলে ধর্মঠাকুরের পূজায় তাহাদের কোনও পারিশ্রমিক লইতে নাই। এই সম্পর্কে প্রত্যেক মন্দিরেরই একটি প্রথা আছে, সেই অনুযায়ীই পূজার তারিখ পূর্ব হইতেই স্থির হইয়া থাকে। এই বিষয়ে কাহারও কাহারও একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, ধর্মঠাকুরের বার্ষিক পূজা কেবলমাত্র বৈশাখী পূর্ণিমাতেই হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সত্য নহে। চৈত্র পূর্ণিমা হইতে আষাঢ়ী পূর্ণিমা পর্যন্ত চারিটি পূর্ণিমা তিথি পড়ে। ধর্মঠাকুরের বার্ষিক পূজা এই চারিটি পূর্ণিমা তিথির একটিতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অনাবৃষ্টির চার মাসই তাঁহার পূজা হয়। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠে অনাবৃষ্টির প্রকোপ সর্বাধিক প্রকাশ পায় বলিয়া এই দুই মাসই ধর্মঠাকুরের বার্ষিক পূজা সর্বাধিক হইয়া থাকে। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমায় জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজা হয়।[১] ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে, অন্ততঃ নিম্নলিখিত স্থানসমূহে জ্যৈষ্ঠী কিংবা আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে; যথা, ঘুটিতোড়া (মানভূম), বেলিয়াতোড় (বাঁকুড়া), কেন্দুলী (বীরভূম), সুরুল (বীরভূম), সিউড়ি (বীরভূম) ইত্যাদি। জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিন পশ্চিমবঙ্গের ডোমগণ ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়া থাকে বলিয়া রিজ্‌লি উল্লেখ করিয়াছেন।[২] সম্ভবত তিনি যখন অনুসন্ধান কার্য করিয়াছিলেন, তখন এই সময়ই ডোমগণ ধর্মঠাকুরের পূজা করিত। এখন অবশ্য তাহাদেরও উক্ত তিন মাসের মধ্যে কোন না কোন পূর্ণিমা তিথিতেই ধর্মঠাকুরের পূজার অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়। তবে এ'কথা সত্য যে, বৈশাখী পূর্ণিমাতেই বার্ষিক পূজা অধিক হয়।

বর্ধমান জেলায় আসানসোল শহর হইতে তিন মাইল দূরবর্তী দামোদর নদের তীরে ডেমড়া নামে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। এই গ্রামে বিভিন্ন জাতীয় লোকের বাস—ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া বাউরী—প্রায় সকল জাতির লোকই এখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে। গ্রামের সর্বপ্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানই বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মের গাজন। দুর্গাপূজা কিংবা কালী পূজা এই গ্রামে কদাচিৎ অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু এই গ্রামে ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক গাজন উপলক্ষে যে উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহার সঙ্গে আর কাহারও তুলনা হয় না।

গ্রামে একটি সুগঠিত ইষ্টক নির্মিত ধর্মরাজ ঠাকুরের মন্দির আছে—তাহার চারিদিক ঘিরিয়া বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, মন্দিরের সম্মুখে একটি অতি প্রাচীন তেঁতুল গাছ। সহজেই বুঝিতে পারা যায়, ধর্মঠাকুরের জন্য মন্দির নির্মিত হইবার পূর্বে তিনি বৃক্ষতলেই অবস্থান করিতেন। এখনও পশ্চিমবঙ্গের বহু গ্রামে ধর্মশিলা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে কিংবা বৃক্ষতলেই অবস্থান করিয়া থাকেন। মন্দির-প্রাঙ্গণের এক কোণে ষাট্‌তলা বা ষষ্ঠীতলা নামক একটি স্থান আছে। সেখানে সিন্দুরলিপ্ত দুইখণ্ড প্রস্তর পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। ষষ্ঠীর দিন গ্রামের মেয়েরা

১। সা-প-প ১৪,৪২

২। Risley, p. 241

এখানে সমবেত হইয়া ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিয়া থাকে। বার মাসে যে বার রকমের ষষ্ঠীর পূজা হয়, তাহাদের প্রত্যেকটি উপলক্ষেই যে তাহারা এখানে পূজা লইয়া আসে, তাহা নয়—কেবল বিশেষ কোন পূজা উপলক্ষে তাহাদিগকে এখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে। সেইজন্য স্থানটি অনাদৃত ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থাতেই বৎসরের বেশির ভাগ সময় পড়িয়া থাকে।

ধর্মরাজ মন্দিরটি বড় সুন্দর। এমন সুদৃঢ় ও সুগঠিত মন্দির এই অঞ্চলে আর নাই। পঞ্চকোটের কাশীপুররাজপ্রদত্ত দেবোত্তর জমির উপর এই মন্দির পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রামবাসিগণ কাশীপুররাজের বদান্যতার কথা এখনও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করিয়া থাকে। তারপর কি ভাবে যে সেই কাশীপুররাজের সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী সিপাহীদলের নেতৃত্ব করিবার ফলে অন্যান্য বহু মৌজার সহিত তাঁহার এই অঞ্চলের মৌজাটিও হস্তচ্যুত হয়, সে কথাও গ্রামবাসিগণ আজও বিস্মৃত হয় নাই। বর্তমানে এই মন্দিরটি কাশীমপুরের জমিদারীভুক্ত দেবোত্তর সম্পত্তির অন্তর্গত। কি ভাবে যে কাশীপুররাজের নিকট হইতে এই অঞ্চল কাশীমপুরের জমিদার পরিবারের হস্তগত হইল, সে সম্পর্কে বিভিন্ন লোকশ্রুতি এখনও এই অঞ্চলে শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল লোকশ্রুতির মূলে ঐতিহাসিক উপাদান থাকা কিছুই বিচিত্র নহে। ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজায় পূর্বে কাশীপুররাজের নামে সঙ্কল্প হইত, এখন কাশীমপুররাজের নামেই সঙ্কল্প হয়।

মন্দিরের মধ্যস্থ 'সিংহাসনে' তিনটি ধর্মশিলা পাশাপাশি অবস্থান করিয়া থাকেন। তিনটিই ডিম্বাকৃতি, কূর্মাকৃতি নহে। প্রত্যেকটি ধর্মশিলার উপরিভাগ শ্বেতচন্দন দ্বারা লিপ্ত থাকে। ঠাকুরের মাথা যাহাতে স্নিগ্ধ থাকে, সেইজন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। আমি অন্যত্র আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি, ধর্মশিলা সূর্যদেবতার প্রতীক। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঐন্দ্রজালিক উপায়ে সূর্যতেজ প্রশমিত করিয়া কৃষিকার্যে সহায়ক জলবায়ু সৃষ্টি করিবার জন্য এই লৌকিক প্রথার উদ্ভব হইয়াছে। এই ব্যবস্থাকেই ইংরেজীতে Sympathetic magic বলে। শিলাখণ্ডের উপরিভাগ শ্বেতচন্দনে লিপ্ত, কিন্তু নিম্নভাগ রক্তচন্দন দ্বারা লিপ্ত। রক্তবর্ণ সূর্যতেজের প্রতীক। ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যে নানাভাবে রক্তবর্ণের সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক কল্পনা করা হইয়াছে। যাহা হউক, তিনটি শিলাখণ্ডের তিনটি নাম—বাঁকুড়া রায়, বুড়া রায় ও কালা রায়। এই তিনটি ধর্মশিলার উৎপত্তি সম্পর্কে তিনটি স্বতন্ত্র জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। তাহা উল্লেখ করিতেছি। বাঁকুড়া রায় নামে ধর্মশিলাটিকে আঁকড় (আকন্দ?) গাছের নীচ হইতে কুড়াইয়া পাওয়া যায়। সেইজন্যই ইহার সম্পর্কে বলা হয়, 'আঁকড়া তলার বাঁকড়া রায়।' কিন্তু কে কবে কোথাকার আঁকড়া নামক অপরিচিত কোন গাছের নীচ হইতে ইহা কুড়াইয়া পাইয়াছিল, সত্যই কেহ কোনদিন পাইয়াছিল কি না, তাহা সঠিক এখন আর কেহই বলিতে পারে না। দ্বিতীয় ধর্মশিলার নাম বুড়া রায়। এই ধর্মশিলাটি ৮।৯ মাইল দূরবর্তী আখলপুর নামক এক গ্রামে পূজিত হইত। একবার বাৎসরিক গাজনের সময় ডেমড়া গ্রামের ধর্মঠাকুরের কলুজাতীয় দেয়াসীর উপর স্বপ্নাদেশ হইল যে বুড়া রায়কে আখলপুর গ্রাম হইতে যেন ডেমড়া গ্রামে লইয়া আসা হয়। সেই অনুসারে ভক্ত্যারা গিয়া

তাঁহাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু গাজনের পর যখন আখলপুরের গ্রামবাসীরা তাঁহাকে ফিরাইয়া লইতে আসিল, তখন তাহারা শুনিল যে, পূর্বদিন রাত্রে স্বপ্নাদেশ হইয়াছে, তিনি এ'গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে চাহেন না। তদবধি ডেমড়াবাসিগণ তাঁহাকে নিজেদের গ্রামে রাখিয়া দিয়া নিজেদের ধর্মশিলার সঙ্গে তাঁহারও নিয়মিত দৈনিক ও বাৎসরিক পূজা করিতেছে—ধর্মশিলাটিকে আর কোনদিন আখলপুর যাইতে দেয় নাই। আখলপুরের অধিবাসিগণও আর কোনও দিন তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য কোনও আগ্রহ দেখায় নাই।

তৃতীয় ধর্মশিলাটির নাম কালু রায়। ইনি এক মাইল দূরবর্তী চেলাই নামক গ্রামে নিয়মিত পূজিত হইতেন। কিন্তু ক্রমে গ্রামের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইতে থাকে, বহু লোক কর্মের সন্ধানে গ্রাম ত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া যায়। অবশিষ্ট গ্রামবাসী ইহার পূজা আর চালাইতে পারিতেছিল না; তারপর একদিন ইহাকে মাথায় করিয়া আনিয়া ডেমড়া গ্রামের ধর্মমন্দিরে রাখিয়া যায়, আর কোনদিন ফিরাইয়া লইতে আসে নাই। অগত্যা ডেমড়া গ্রামের অধিবাসিগণ ইহাকেও নিজেদের ঠাকুরের সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে স্থান দিয়া নিয়মিত পূজা করিয়া আসিতেছে। একজন গ্রামবৃদ্ধ বলিলেন, এক বছর আগে চেলাই গ্রামের অধিবাসিগণ মহা ধুমধাম করিয়া ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়াছে, কিন্তু তাহারা ধর্মশিলা কোথা হইতে পাইল, তাহা তিনি বলিতে পারেন না—তাহাদের নিজেদের গ্রামের ধর্মশিলা তাহারা এই উপলক্ষেও ফিরাইয়া লইতে আসে নাই।

এই সকল কাহিনী সত্য বলিয়া মনে করা কঠিন। তিনটি ধর্মশিলাই দেখিতে সম্পূর্ণ অনুরূপ। বুড়া রায় আকারে একটু ক্ষুদ্র হইলেও গঠনভঙ্গিতে অভিন্ন। বাঁকুড়া রায় ও কালা রায় আকৃতিতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। বিভিন্ন গ্রাম হইতে বিভিন্ন সময়ে আনীত ধর্মশিলা হইলে ইহাদের আকৃতি ও গঠনভঙ্গিতে এমন ঐক্য থাকিবার কথা নহে। মনে হয়, তিনটি ধর্মশিলার এক সঙ্গেই প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তিন সংখ্যার একটি ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে বলিয়া পৃথিবীর বহু আদিম জাতিই বিশ্বাস করিত এবং এখনও করিয়া থাকে। এই বিশ্বাস হইতেই তিনটি ধর্মশিলার এখানে প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বৌদ্ধ ত্রিশরণের পরিকল্পনাও তিনসংখ্যা সম্পর্কিত এই আদিম সংস্কারেরই ফল—অতএব এই তিনটি ধর্মশিলার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মুখ্য কোনও সম্পর্ক আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

ডেমড়া গ্রামে উক্ত তিনটি ধর্মশিলারই নিত্য পূজা হয়। নিত্যপূজায় পশুবলি হয় না; মানসিক অনুসারে বাৎসরিক পূজায় প্রতিবৎসর শতাধিক পাঁঠা বলি হয়। যে নিত্যপূজা করে, তাহাকে দেয়াসী বলা হয়। দেয়াসী কলু জাতীয় লোক। বর্তমানে এই গ্রামে কলুদের বংশ লোপ পাইয়াছে, দুই এক ঘর শেষ পর্যন্ত ছিল, তাহারা নিকটবর্তী অন্য এক গ্রামে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। দেয়াসী সেখান হইতেই নিত্য যাতায়াত করিয়া দেবতার পূজা করিয়া থাকে। গ্রামের কোনও ব্রাহ্মণ যদি পূজা দিতে আসে, তবে কলু দেয়াসীর পরিবর্তে হাজরা উপাধিধারী গ্রামের একজন আগুরি জাতীয় হিন্দু পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু কলু দেয়াসী তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হয় না; কারণ, এ পূজায় যে তাহারই আইনগত অধিকার, তাহা

কেহ অস্বীকার করে না; কলু দেয়াসীকে তাহার প্রাপ্য না দিলে পূজার ফল পাওয়া যাইবে না বলিয়া সকলেই মনে করিয়া থাকে। সরকারী কাগজ-পত্রে কলুদেরই দেবতার সেবাইত বলিয়া উল্লেখ করা আছে। তাহারাই দেবতার নামে প্রদত্ত জমি বা দেবোত্তর জমি ভোগ করিয়া থাকে। দেবতার নামে বহু জমি আছে—বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে কতক জমি ইজারা বিলিও করা হইয়াছে। বাৎসরিক গাজনের সময় ইজারা জমির খাজনা আদায় করা হয়।

ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজায় বিশেষ আড়ম্বর হইয়া থাকে। বার্ষিক পূজার নির্দিষ্ট দিন বৈশাখী পূর্ণিমা। পূর্বে পূর্ণিমার নয় দিন পূর্বেই 'ভক্ত্যা কামান' হইত। 'ভক্ত্যা কামান' শব্দের অর্থ পূজায় মানসিক করিয়া যাহারা ভক্ত্যা বা সন্ন্যাসী হয় তাহাদের ব্রত উদ্‌যাপনের সূত্রপাত। ব্রত আরম্ভ করিলেই কেবলমাত্র ফলমূল ও দুগ্ধ পান করিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু বর্তমানে এই সকল জিনিস দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইবার ফলে পূজার নয়দিন পূর্বে ভক্ত্যা হইবার রীতিও পরিত্যক্ত হইয়াছে! এখন ৫।৬ দিন পূর্ব হইতে 'ভক্ত্যা কামান' হইয়া থাকে। যেদিন হইতে ভক্ত্যাদিগের ব্রত পালন আরম্ভ হয়, সেদিন প্রথমেই তাহাদের ক্ষৌরকার্য করিয়া লইতে হয়। সেইজন্যই এই অনুষ্ঠানের নাম ভক্ত্যা কামান। যাহা হউক, সেইদিন ভক্ত্যাগণ মন্দিব প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া তাহাদের সঙ্কল্প দেয়াসীর নিকট ব্যক্ত করে। জাতিবর্ণনির্বিশেষেই ভক্ত্যা হইবার অধিকার আছে—যতদিন পর্যন্ত তাহারা ভক্ত্যার ব্রত পালন করে, ততদিন দেবকার্যে সকলেরই সমানাধিকার স্বীকৃত হয়। ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর সকল জাতিই ভক্ত্যা হইয়া থাকে —সদ্‌গোপ ও বাউরী ভক্ত্যা হইলে সমপর্যায়ভুক্ত হয়। ভক্ত্যাদিগকে প্রথমদিনেই মন্দির হইতে এক একগাছি করিয়া সূতা দেওয়া হয়, ইহাকে উতুরী বা উত্তরীয় বলে। ভক্ত্যাগণ ইহা মালার মত করিয়া গলায় পরিয়া থাকে। বাঁকুড়া জেলার ধর্ম কিংবা শিবের গাজনে এই উপলক্ষে প্রত্যেক ভক্ত্যার হাতেই একখণ্ড বেত দেওয়া হয়। এখানে সে রীতি প্রচলিত নাই। উতুরী ধারণ করিলে প্রত্যেক ভক্ত্যাই ব্রাহ্মণের মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে। তাহারা দেবতাকে স্পর্শ করিয়া থাকে এবং অন্যান্য দেবকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার পায়। যেদিন ভক্ত্যা কামান হয়, সেদিন হইতেই ভক্ত্যাদিগের হবিষ্যি আরম্ভ হয়। মাতৃপিতৃদশায় যেমন হবিষ্যি পালন করিবার রীতি প্রচলিত আছে ইহাতেও তাহাই পালন করিতে হয়। পূজার আগের দিন হবিষ্যি ত্যাগ করিয়া ফল দুধ খাইতে পায়।

পূজার দিন অর্থাৎ বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে সন্ধ্যার পূর্বেই গ্রাম-গ্রামান্তরের অধিবাসিগণ দেবতার নিকট প্রদীপোপহার লইয়া আসে। সন্ধ্যার পর মন্দিরের মধ্যে গ্রামবাসীদের প্রদত্ত প্রদীপগুলি জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। আলোকমালায় মন্দিরের অভ্যন্তর ঝলমল করিতে থাকে। পূজার দিনে প্রত্যেক গ্রামবাসী ধর্মঠাকুরের নামে উপবাস পালন করিয়া থাকে, প্রত্যেকের গৃহ হইতেই সেই দিন পূজোপকরণ মন্দিরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়—তৎসঙ্গে এক বা একাধিক তৈল ও সলিতা সহ মাটির প্রদীপও থাকে। ধর্মরাজঠাকুরকে প্রদীপোপহার দেওয়ার রীতি সর্বত্র প্রচলিত নাই। এই মন্দিরের ইহা একটি অত্যন্ত প্রাচীন রীতি বলিয়া মনে হয়। ধর্মঠাকুর সূর্যদেবতার প্রতীক, প্রদীপগুলিও সূর্যতেজের প্রতীক ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পূজার তিন চারদিন পূর্ব হইতেই ধর্মশিলা তিনটিকে একবার করিয়া মন্দির হইতে বাহির করিয়া সম্মুখস্থ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বেদীর উপর স্থাপন করা হয়। পুনরায় প্রত্যহই ইহাদিগকে মন্দিরের ভিতরে সিংহাসনে রাখা হয়। ইহাকে 'বারাম' বলে। 'বারামে'র ঢাকের শব্দে গ্রামবাসীরা মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া প্রতিদিন সমবেত হয়। কাজটি নিতান্ত সহজ নহে। লোকের বিশ্বাস, দেবতা মন্দির ছাড়িয়া বাহির হইতে চাহেন না এবং যাহাতে কেহ তাঁহাকে মন্দির হইতে বাহির করিতে না পারে, সেজন্য তিনি ওজনে ভারি হইতে থাকেন। 'অতি কষ্টে' ভক্ত্যা তাঁহাকে কোলে লইয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করে, কিন্তু আসিবার পথেও বার বার দেবতা পিছনের দিকে মন্দিরের ভিতরে চলিয়া যাইতে চাহেন। ভক্ত্যা তাঁহাকে লইয়া যদি এক পা অগ্রসর হয়, তখনই আবার দুই পা পিছাইয়া যায়। এই অভিনয় বহুক্ষণ চলিতে থাকে। সমবেত জনতা করযোড়ে মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই 'দেব-লীলা' প্রত্যক্ষ করিতে থাকে। উচ্চরবে আট দশখানি ঢাক বাজিতে থাকে। ঢাকের শব্দে দামোদরের অপর তীর পর্যন্ত প্রকম্পিত হইতে থাকে।

বাৎসরিক পূজার পূর্বদিন মন্দিরে একটি অনুষ্ঠান পালন করা হয়—তাহার নাম 'লাপ্‌ড়া ভাঙ্গা'। বাঁকুড়া ও মানভূম জেলার অনেক ধর্মমন্দিরেই ইহা পালন করা হইয়া থাকে। বিষয়টি একটু বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন আছে। ভক্ত্যাগণ পূর্ব হইতেই বড় বড় কণ্টিকারি (এক প্রকার সকণ্টক বৃক্ষ)-র ঝাড় মন্দির-প্রাঙ্গণে আনিয়া স্তূপীকৃত করিয়া রাখে। তারপর নির্দিষ্ট দিনে প্রত্যেকে দুই হাতের মুঠিতে দুইটি ঝাড় লইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া পরস্পরকে তাহার দ্বারা আঘাত করিতে করিতে ঢাকের তালে তালে নৃত্য করিতে থাকে। ইহা একটি কৃত্রিম যুদ্ধ বা mockfight-এর রূপ ধারণ করে। ঢাকের তালে তালে নৃত্যপর ভক্ত্যাদের উত্তেজনা ক্রমেই বাড়িয়া চলিতে থাকে; অতএব অনেক সময় তাহারা দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রতিপক্ষকে আঘাত করে—আঘাতের ফলে কোন কোন সময় ভক্ত্যাদের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, তাহা হইতে রক্ত ঝরিতেও দেখা যায়। কিন্তু দেবকার্য বিবেচনা করিয়া ভক্ত্যাগণ দৈহিক যন্ত্রণার প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্রও করে না। এইভাবে বহুক্ষণ ধরিয়া নৃত্য চলিতে থাকে; সমবেত জনতা বিস্ময়ে হতবাগ হইয়া ভক্ত্যাদের এই দেব-লীলা পরম ভক্তিভরে প্রত্যক্ষ করিতে থাকে। ঢাকের শব্দে চারিপাশের পাঁচ ছয়খানি গ্রাম প্রকম্পিত হইতে থাকে। নৃত্য শেষ হইয়া গেলে ভক্ত্যাগণ কাঁটার ঝাড়গুলি মন্দিরের সম্মুখে আনিয়া গদির মত করিয়া সাজাইয়া রাখে। তারপর পাট ভক্ত্যা বা প্রধান ভক্ত্যা তাহার উপর দিয়া নগ্নগাত্রে একবার গড়াগড়ি দিয়া চলিয়া যায়, অন্যান্য ভক্ত্যারাও একজনের পর একজন করিয়া তাহাকে অনুসরণ করে। সমবেত জনতা চারিদিক ঘিরিয়া করযোড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। এক একজন ভক্ত্যা কাঁটার গদির উপর দিয়া গড়াইয়া চলিয়া যাইবামাত্র তাহারা ধর্মরাজঠাকুরের নাম উল্লেখ করিয়া এক একবার উল্লাস-ধ্বনি করিয়া উঠে। উল্লাস-ধ্বনির সময় ঢাকের শব্দ মৃদুতর হয়, সমবেত মনুষ্যকণ্ঠের জয়ধ্বনি তখন আকাশভেদী হইয়া উঠে। এই অনুষ্ঠানেরই নাম 'লাপ্‌ড়া ভাঙ্গা'।

ধর্মশিলার স্নানোৎসব ধর্মরাজঠাকুরের বাৎসরিক পূজানুষ্ঠানের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। বাৎসরিক পূজার নির্দিষ্ট দিনে ভক্ত্যাগণ একটি ধর্মশিলাকে পালকিতে স্থাপন করিয়া মহাসমারোহে স্নান করাইবার জন্য গ্রামের একটি পুকুরে লইয়া যায়। গ্রামের বিশেষ একটি পুকুর এই কার্যের জন্য নির্দিষ্ট আছে—গ্রামের অন্যান্য পুকুরের অবস্থা ইহা হইতে অনেক ভাল হইলওে যে পুকুরটি এই উদ্দেশ্যে স্মরনাতীত কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, সেই পুকুর ব্যতীত এই কার্য নিষ্পন্ন হইবার উপায় নাই। অতএব মনে হয়, এই পুকুরটিই গ্রামের প্রাচীনতম পুকুর এবং একদিন ইহাই সমগ্র গ্রামের লক্ষ্যস্থল ছিল। তিনটি ধর্মশিলার মধ্যে যদি বাঁকুড়া রায়কে স্নানার্থ মন্দির হইতে বাহির করা হয়, তবে তাঁহাকে পুকুরঘাটে লইয়া যাওয়ার পরিবর্তে অদূরবর্তী দামোদর নদে লইয়া যাওয়া হয়। ইহার কারণ সম্পর্কে বলা হইয়া থাকে যে, বাঁকুড়া রায় দামোদর নদ হইতেই উঠিয়াছিলেন, সেইজন্য বৎসরে একবার করিয়া তাঁহাকে দামোদরের জলে স্নান করাইয়া আনা হয়। কিন্তু দামোদর নদ গ্রাম হইতে একটু দূরবর্তী এবং সেখানে যাতায়াত একটু কষ্টসাধ্য বলিয়া গ্রামের পক্ষ হইতে বিশেষ কোন দাবী না থাকলে বাঁকুড়া রায়কে মন্দির হইতে স্নানার্থ বাহির করা হয় না। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বাঁকুড়া রায়ই এই গ্রামের আদি ধর্মশিলা এবং গ্রামের যখন কোন পুকুর কিংবা বাঁধ ছিল না, তখনই বাঁকুড়া রায়ের প্রতিষ্ঠা এবং পূজার সূত্রপাত হয়। তারপব জনবসতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে পুকুর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কালক্রমে নূতন ধর্মশিলা আসিয়া মন্দিরে স্থান লাভ করিয়াছে, তখন হইতেই নূতন প্রথার প্রবর্তন হইয়াছে।

যাহা হউক, যে ধর্মশিলাকেই স্নানার্থ মন্দির হইতে বাহির করা হয়, তাহারই পশ্চাতে বিরাট বাদ্যভাণ্ড অগ্রসর হইতে থাকে। পালকির মধ্যে ধর্মশিলাটিকে স্থাপন করিবার একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। একটি বাঁশের ঝুড়ির মধ্যে কিছু আতপ চাউল রাখা হয়, আতপ চাউলের উপর ধর্মশিলাটি স্থাপন করিয়া ঝুড়ি ও আতপ চাউল সহ তাহা পালকির মধ্যে স্থাপন কবা হয়। তারপর ভক্ত্যাগণ পালকি কাঁধে করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। পুকুরঘাটে আসিয়া পালকি হইতে ঝুড়িটি নামাইয়া ধামাৎকন্নি ও দেয়াসী তাহা ধরাধরি করিয়া লইয়া মধ্য পুকুরের দিকে অগ্রসর হয়। মন্দিরের পুরোহিতের সহকারীকে ধামাৎকন্নি বলে; পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মন্দিরের যে প্রধান সেবায়েত তাহাকেই দেয়াসী বলা হয়। ধামাৎকন্নি, দেয়াসী এবং পুরোহিত সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত হইয়া মন্দিরের দেব-সেবায় নিজেদের অধিকার স্থাপন করিয়াছে। এই মন্দিরের ধামাৎকন্নি অস্পৃশ্য হিন্দু, দেয়াসী কলুজাতীয় এবং পুরোহিত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। মন্দির হিন্দু জমিদারের পৃষ্ঠপোষিত হইবার ফলে তাহাতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অধিকার জন্মিলেও পূর্ববর্তী কালে ইহার উপর যাহাদের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহাদের বংশধরগণও ইহার উপর হইতে তাহাদের দাবী পরিত্যাগ করে নাই। দেব-শিলা স্পর্শ করিবার অধিকার পর্যন্ত তাহারা এখনও অক্ষুণ্ন রাখিয়া চলিয়াছে। পশ্চিমবাংলার যে সকল গ্রামে ব্রাহ্মণের অধিকার

অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানে ব্রাহ্মণের নিম্নজাতি গ্রাম্য দেবতার মন্দিরের কর্তৃত্ব করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু এখানে ব্রাহ্মণ হইতে গ্রামের নিম্নতম জাতি পর্যন্ত দেব-মন্দিরের সঙ্গে যে সমান সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

যাই হউক, ধামাৎকন্নি ও দেয়াসী ঝুড়িটি লইয়া মধ্য পুকুরের দিকে অগ্রসর হয়। তখন প্রচণ্ড গ্রীষ্ম—বৈশাখী পূর্ণিমা; অতএব পুকুরের গভীরতম অংশেও বুক জলের বেশি জল থাকে না। ধামাৎকন্নি ও দেয়াসী ঝুড়িটি ধরিয়া লইয়া সেইখানে গিয়া স্থির হইয়া দাঁড়ায়। যখন ইহারা উভয়ে ঝুড়িটি পালকি হইতে নামাইয়া লইয়া পুকুরের জলের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন এক বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ে। এই অঞ্চলের সাধারণ লোকের বিশ্বাস, ধর্মঠাকুরের স্নানজলের 'প্রথম বিন্দু' যদি কোনও বন্ধ্যা নারী নিজের মাথায় ধারণ করিতে পারে, তবে সেই নারী সেই বৎসরের মধ্যে অবশ্যই সন্তানসম্ভবা হইবে। ডেমড়ার ধর্মঠাকুরের এই মাহাত্ম্যের কথা কেবলমাত্র যে এই গ্রামের মধ্যেই প্রচারিত আছে, তাহা নহে—আশে পাশের দশ বারোখানি গ্রামের লোক ডেমড়া গ্রামের ধর্মঠাকুরের এই মাহাত্ম্যের কথা অবগত আছে। সেইজন্য সেই সকল গ্রামের বিভিন্ন বয়সের বন্ধ্যা নারীগণ এই গ্রামের ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজার দিন আসিয়া এখানে সমবেত হয়। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ধর্মঠাকুর সূর্যদেবতার প্রতীক—আদিম সমাজে সূর্যই উৎপাদন শক্তির মূল উৎস বলিয়া বিবেচিত হয়—এই উৎপাদন অর্থে পৃথিবীর শস্যোৎপাদনও যেমন বুঝায়, নারীর সন্তানোৎপাদনও তেমনই বুঝায়। পৃথিবী এবং নারী উভয়েই সূর্যের শক্তি দ্বারাই এক জন শস্যোৎপাদন ও আর এক জন সন্তানোৎপাদন করিয়া থাকে বলিয়া বিশ্বাস। বাংলাদেশে বিশেষত ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলে হিন্দুপ্রভাববশত আদিম সমাজের এই সূর্যদেবতাই শিব-রূপে পরিণতি লাভ করিয়াছেন; সেইজন্য এই অঞ্চলের কুমারী মেয়েরা শিবপূজা করিয়া নারীজীবনের সার্থকতার উপায় সন্ধান করিয়া থাকে। যাহা হউক, ডেমড়া গ্রামের ধর্মঠাকুরের স্নানোৎসবটির মধ্যে আদিম সমাজের ধর্মবোধের যে কিছু পরিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। ধামাৎকন্নি ও দেয়াসী যখন ধর্মশিলা সহ ঝুড়িটি লইয়া পুকুরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন সমবেত জনতা হইতে বন্ধ্যা নারীগণ তাহাদের অনুসরণ করিয়া জলে নামিয়া পড়ে। ধামাৎকন্নি ও দেয়াসী মধ্য পুকুরের দিকে যখন অগ্রসর হইয়া যায়, তাহারাও তখন মধ্য পুকুর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়া ঝুড়িটি ঘিরিয়া দাঁড়ায়। মাতৃত্বের কাঙ্গালিনী শত শত বন্ধ্যা নারী ধামাৎকন্নি ও দেয়াসীকে বার বার অনুরোধ করিতে থাকে যে, ঝুড়িটি জল হইতে উঠাইবা মাত্র যেন তাহাদের দিকে আগাইয়া দেওয়া হয়। সকলেই একসঙ্গে এই অনুরোধ জানাইতে থাকে—অতএব কোলাহল ব্যতীত তাহাতে আর কিছুই শুনা যায় না। তারপর ধর্মঠাকুরের নামে জয়োল্লাস করিয়া ধামাৎকন্নি ও দেয়াসী যখন ঝুড়িটি জলে চুবাইবার উদ্যোগ করে, তখন বন্ধ্যা নারীগণ পরস্পরকে ঠেলিয়া ঝুড়িটির নিকটে আসিয়া মাথা পাতিয়া রাখে। এই ঠেলাঠেলিতে ঝগড়াবিবাদের যে

সৃষ্টি না হয়, তাহা নহে—অনেক সময় গ্রাম্য ভাষায় পরস্পর পরস্পরকে নীচ গালাগালি করিতে শুনা যায়; ধর্মঠাকুর যদি পাষাণরূপী না হইতেন, তাহা হইলে এই গালাগালি শুনিয়া তাঁহাকে দুই হাতে কান ঢাকিয়া রাখিতে হইত।

যাহা হউক, বহু আয়োজন উদ্যোগের পর ধামাৎকন্নি ও দেয়াসী এইবার ধর্মশিলা ও পূর্বোক্ত আতপ চাউল সহ ঝুড়িটি মুহূর্তের জন্য মাত্র পুকুরের জলে চুবাইয়া ধরে—আবার সেই মুহূর্তেই তাহা জল হইতে উপরে উঠাইয়া লয়। ঝুড়ি হইতে সহস্র ধারায় জল নীচে ঝরিয়া পড়িতে থাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে সন্তানলোভাতুরা বন্ধ্যা নারীগণ সেই ঝুড়ির নীচে মাথা পাতিয়া দিয়া ধর্মঠাকুরের 'স্নানজলের' আশীর্বাদ মাথা ভরিয়া গ্রহণ করিতে থাকে। ধামাৎকন্নি ও দেয়াসীকে চারিদিক হইতে অতি কষ্টে এই জনতার বেগ রোধ করিতে হয়, তীরে দাঁড়াইয়া গ্রামবৃদ্ধগণ নানাপ্রকার সতর্ক উপদেশবাণী বর্ষণ করিতে থাকেন, কিন্তু বিভিন্ন বয়সী বন্ধ্যা নারীদের ঝগড়াবিবাদ ও কোলাহলের মধ্যে সকলই কোথায় তলাইয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, গ্রামবাসীদের বিশ্বাস ধর্মঠাকুরের স্নানজলের 'প্রথম বিন্দু' যে মাথায় ধারণ করিতে পারিবে, সেই নারী এক বৎসরের মধ্যেই সন্তানবতী হইবে। কিন্তু স্নানজলের এই 'প্রথম বিন্দু' যে ঝুড়ির কোন ছিদ্রপথে কখন উধাও হইয়া যায়, কেহই তাহার সন্ধান পায় না। তথাপি তাহারই প্রত্যাশায় বৎসরের পর বৎসর অসংখ্য বন্ধ্যা নারী এখানে আসিয়া সমবেত হয়। প্রতি বৎসরই তাহাদের নিরাশ হইতে হয়; তথাপি একটি আশা লইয়া তাহারা বাঁচিয়া থাকে যে, একদিন এই ধর্মঠাকুরের স্নানজলের 'প্রথম বিন্দু'র প্রসাদ তাহারা লাভ করিবে। প্রতাপচন্দ্র মিশ্র গ্রামের একজন প্রবীণ ব্যক্তি; ৭৬ বৎসর বয়সেও তাঁহার স্বাস্থ্য অটুট রহিয়াছে। তিনি রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, প্রায় চতুর্দশ পুরুষ যাবৎ তিনি এই গ্রামের অধিবাসী। তিনি নিঃসন্তান, তিনি নিজের মুখেই বলিলেন, তাঁহার স্ত্রী বন্ধ্যা। তাঁহার স্ত্রী কোনদিন ধর্মঠাকুরের স্নানজলের এই 'প্রথম বিন্দু' লাভ করিবার জন্য কোন রকম চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না, সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রশ্নটি এড়াইয়া যাইবার জন্য সংক্ষেপে বলিলেন,—'মেয়েদের কথা মেয়েরা বলিতে পারে, আমরা তাহাদের কথা কেমন করিয়া বলিব?' তিনি তাঁহার স্ব-গ্রামের ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যবোধ সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ থাকিলেও নিজের সন্তানহীনতার জন্য দেবতাকে দায়ী করিতে চাহেন না।

বন্ধ্যা নারীদের মাথায় ঠাকুরের স্নানজল বিতরণের পালা চলিবার সঙ্গে সঙ্গে 'নিয়ম কলসী' পূর্ণ করা হয়। একটি নূতন মাটির কলসী পুকুরের জলে পূর্ণ করিয়া তাহাতে কয়েক বিন্দু ধর্মঠাকুরের স্নানজল মিশ্রিত করা হয়। তাহাকেই 'নিয়ম কলসী' পূর্ণ করা বলে। মন্দিরের দেবকার্যে এই জল সংবৎসর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'নিয়ম কলসী' স্নানজলে পূর্ণ করিবার একটি বিশেষ রীতি আছে। পাট ভক্ত্যা পূর্ব হইতেই কলসীটি পুকুরের জলে পূর্ণ করিয়া বন্ধ্যা নারীদের সঙ্গে সঙ্গে পুকুরের মধ্যে ধর্মশিলার অনুগমন করে। তারপর যখন ধামাৎকন্নি ও দেয়াসী ধর্মশিলাকে ঝুড়িতে চুবাইয়া উপরে তুলিয়া ধরে, সেই সময় বন্ধ্যা নারীদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করিয়া পাট ভক্ত্যা ধর্মঠাকুরের স্নানজলের কয়েকটি বিন্দু কলসীতে পূর্ণ করিয়া লয়।

স্নানজলের 'প্রথম বিন্দু' কলসীতে পূর্ণ করা তাহারও লক্ষ্য; কারণ, তাহা হইলে 'নিয়ম কলসী'র জল বিশেষ শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে বলিয়া মনে করা হয় এবং স্নানজলের 'প্রথম বিন্দু'-ধৃত 'নিয়ম কলসী'র জল বন্ধ্যা নারীর সন্তানোৎপাদন শক্তির অধিকারী হয়। যাই হউক, 'নিয়ম কলসী'তে স্নানজল-বিন্দু মিশ্রিত করিবামাত্র পাট ভক্ত্যা কলসীটি লইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে পুকুরঘাট হইতে ধর্মঠাকুরের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার কারণ, পথিমধ্যে কোনও অপদেবতার দৃষ্টি পড়িলে সেই জল ঐন্দ্রজালিক (magic) শক্তি হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারে। দেব মন্দিরে আসিয়া প্রবেশ করিলে সে ভয় আর থাকে না। পাট ভক্ত্যা বলিল, অপদেবতার দৃষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়া আজকাল বড় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, সেইজন্য 'নিয়ম কলসী'র জলে পূর্বের মত আর শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। পূর্বে এই জলে চোখ ধুইলে অন্ধেরও দৃষ্টি ফিরিয়া আসিত।

স্নানের পালা শেষ হইবার পর পুনরায় ধর্মশিলা ও ধৌত আতপ চাউল সহ ঝুড়িটি পালকিতে আনিয়া তোলা হয় এবং ভক্ত্যাগণ তাহা কাঁধে করিয়া ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বাদ্যভাণ্ড পূর্ববৎ পশ্চাদনুসরণ করে। পূর্ব হইতেই শত শত গ্রামবাসী মন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। তাহাদের অধিকাংশেরই হাতে এক বা একাধিক প্রদীপোপহার, সঙ্কল্প করিবার জন্য সিদ্ধ চাউল এবং নৈবেদ্যের আতপ চাউলের এক একটি পুঁটুলি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে দুইটি বিষয় লক্ষ করিবার মত আছে—একটি প্রদীপোপহার ও অপরটি সঙ্কল্পের জন্য সিদ্ধ ধানের চাউল ব্যবহার। হিন্দুর দেবপূজায় দেবতাকে ধূপ ও প্রদীপোপহার দিবার রীতি প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু বারোয়ারী পূজায় গ্রামবাসীদের প্রত্যেকের এক বা একাধিক প্রদীপ দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া দিবার রীতি অন্যত্র প্রচলিত নাই। যদিও ধর্মঠাকুর সর্বত্রই সূর্যদেবতার প্রতীকই ছিলেন এবং সেই সূত্রেই সূর্যের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁহার নামে প্রদীপ উপহার দিবার প্রথার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তথাপি বর্ধমান জেলার এই অঞ্চলে আর একটি ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথাও কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না—তাহা জৈন ধর্মের প্রভাব। এ কথা সকলেই জানেন, জৈন তীর্থঙ্করদিগের নির্বাণ লাভের তিথিটিকে জৈনধর্মাবলম্বিগণ আলোকোৎসব রূপেই পালন করিয়া থাকেন। এই উপলক্ষে জৈন মন্দিরগুলি আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। বর্ধমান জেলার যে অংশের কথা বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হইতেছে, সেই অংশে জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষাও প্রবলতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। দামোদর নদের দুই তীরবর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত দেবমন্দিরগুলিই তাহার প্রমাণ। তাহা ছাড়াও জৈন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বহু পরিচয় এই অঞ্চলের বিস্তৃত ধর্মমন্দিরগুলির ভিতর হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব এ কথা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ডেমড়া গ্রামের ধর্মঠাকুরের মন্দিরে দেবতার নামে প্রদীপোপহার উৎসর্গ করিবার রীতিটি যে এত ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার মূলে জৈনধর্মেরই প্রভাব কার্যকর হইয়াছে। দ্বিতীয় বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ—তাহা দেবতার নামে সঙ্কল্প করিতে সিদ্ধ চাউলের ব্যবহার।

সকলেই জানেন, দেবকার্যে সিদ্ধ চাউল কদাচ ব্যবহৃত হইতে পারে না। কারণ, হিন্দুর সংস্কার ও বিশ্বাস অনুযায়ী ধান সিদ্ধ হইলেই অপবিত্র হইয়া যায়। অতএব আতপ চাউল দেবকার্যে সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ধর্মঠাকুরের পূজায় দুই এক জায়গায় ইহার ব্যতিক্রম আমি নিজেই লক্ষ করিয়াছি। বর্ধমান সহর হইতে দামোদর নদের অপর তীরে ক্ষুদকুড়ি নামে একটি গ্রাম আছে, সেই গ্রামে এক উগ্রক্ষত্রিয়ের বাড়িতে একটি ধর্মশিলা নিত্য পূজিত হইয়া থাকে—প্রতিদিন সেখানে এক সের সিদ্ধ ধানের চাউলের নৈবেদ্য দেওয়া হয়। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে, তাঁহাদের পূর্বপুরুষের নিকট ধর্মঠাকুরের এই প্রকারই স্বপ্নাদেশ হইয়াছিল যে, ধর্মঠাকুর আতপ চাউল আহার করিয়া তৃপ্তি পান না, তাঁহাকে যেন সিদ্ধ ধানের চাউলেরই নৈবেদ্য দেওয়া হয়—সেই অনুসারে এই রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। এ'কথা আজকাল সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এই প্রকার স্বপ্নাদেশ সম্পূর্ণ অর্থহীন, ইহার ভিতর কোন নিগূঢ় সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। বাঙ্গালী সিদ্ধ চাউলের অন্নভোজী, অতএব বাঙ্গালীর নিজস্ব ঘরের দেবতাকে সে আতপ চাউল ভোজন করাইয়া তৃপ্তি পায় না। নিজে সে যাহা আহার করে, তাহাই সে দেবতাকে নিবেদন করে—নিজে যাহা আহার করে না, যাহার স্বাদ জানে না, দেবতাকে তাহা উপহার দিয়া সে প্রবঞ্চনা করিতে চাহে না। অতএব এই আচারটির ভিতরে বাঙ্গালীর অধ্যাত্মবোধের একটি পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

যাই হউক, ধর্মশিলাকে পালকিতে করিয়া মন্দিরে লইয়া আসিবার পর ভক্ত্যাগণ কৃচ্ছ্র সাধনার নানা পরিচয় দিতে আরম্ভ করে। সমগ্র গ্রামবাসীর পক্ষে ইহাই সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হইয়া দাঁড়ায়। দেবকার্যে কত যে অসাধ্য সাধন হইতে পারে, নিরক্ষর গ্রামবাসী তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া পরম বিস্ময় বোধ করিয়া থাকে। ধর্মঠাকুরের পালকিটি লইয়া যখন জনতা ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন একদল ভক্ত্যা জনতার অগ্রবর্তী হইয়া পুকুরঘাট হইতে মাটিতে গড়াইতে গড়াইতে মন্দিরের দ্বার পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছায়। মাটিতে লুটাইয়া এই দুরূহ কার্যটি সাধন করিতে হয় বলিয়া ইহাকে 'লোটন' বলে। যে সকল ভক্ত্যা ইহাতে অংশ গ্রহণ করে, তাহাদিগকে লোটন ভক্ত্যা বলে। তাহাদের সর্বাঙ্গের ধূলি লইয়া গ্রামবাসিগণ নিজেদের গায়ে মাখে, জাতিবর্ণনির্বিশেষে তাহাদের স্পর্শকেও সকলেই পরম পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। পূর্বেই বলিয়াছি, ভক্ত্যাগণ অস্পৃশ্য জল-অনাচরণীয় জাতি হইতেই অধিক সংখ্যায় আসিয়া থাকে; কিন্তু এই দেবকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদের অস্পৃশ্যতা দূর হইয়া যায়, সেই সময়ের জন্য তাহারা উচ্চতম বর্ণের মর্যাদা লাভ করে। বাংলাদেশে সুদূর পল্লী অঞ্চলে বর্ণাশ্রমধর্ম যে আপনার সমুচ্চ আদর্শ সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই, এই সকল লৌকিক উৎসব অনুষ্ঠান হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ নিজের জাত্যভিমান ভুলিয়া গিয়া অন্ত্যজের অঙ্গের ধূলি পরম পবিত্রজ্ঞানে নিজের দেহে মাখিয়া লয়।

'লোটন' শেষ হইলেই সাধারণত 'ফুলখেলা' আরম্ভ হয়। যাঁহারা আনুপূর্বিক গাজনের

অনুষ্ঠান কোনদিন লক্ষ্য করেন নাই, তাঁহারা ফুলখেলা বলিতে কি বুঝায় তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন না। চোখে না দেখিলে বিষয়টির গুরুত্ব কেবল লিখিয়া বুঝাইতে পারা যাইবে না। তথাপি বিষয়টি সম্পর্কে একটু আভাস দিবার চেষ্টা করিতেছি। মন্দির-প্রাঙ্গণের এক অংশে কতকগুলি কাঠের অঙ্গারে আগুন জ্বালিয়া বহুক্ষণ যাবৎ হাওয়া দিয়া রক্তবর্ণ করা হইয়া থাকে। ভক্ত্যাগণ মন্দিরের সম্মুখে গিয়া দেবতাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়ায়। একটি লোহার চিম্‌টা করিয়া এই জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি ভক্ত্যাদের এক হাতের তালুতে তুলিয়া দেওয়া হয়। এক হাতের তালুতে জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি হাত পাতিয়া লইবামাত্র ভক্ত্যাগণ অপর হাতের তালুতে তাহা বৃত্তাকারে ফেলিয়া দেয়—পুনরায় তাহা প্রথম হাতের তালুতে লুফিয়া লয়। এইভাবে কেবলমাত্র দুই হাতের তালুর সাহায্যে জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি এক হাত হইতে অপর হাতে, অপর হাত হইতে পুনরায় সেই হাতে লইতে থাকে। অন্তত বিশ পঁচিশখানি বৃহদায়তন ঢাক দামোদরের দুই কূল প্রকম্পিত করিয়া বাজিতে থাকে। ভক্ত্যাগণ তাহাদের তালে তালে নাচিতে নাচিতে এইভাবে জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি এক হাত হইতে অপর হাতের তালুতে লুফিয়া লুফিয়া লইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার সময় কোন অঙ্গারখণ্ড যদি নিভিয়া অর্থাৎ ইহার ভিতর হইতে জ্বলন্ত অগ্নিকণা নিঃসৃত হইতে যদি দেখিতে না পাওয়া যায়, তবে ভক্ত্যা নিজেই সেই অঙ্গারগুলি মাটিতে ফেলিয়া দেয়, এবং তৎক্ষণাৎ অগ্নিকুণ্ড হইতে জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়া তাহার করতল পুনরায় পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। নৃত্যের তালে তালে অঙ্গারগুলি হইতে জ্বলন্ত অগ্নিকণা চারিদিকে তুবড়ির আলোর মত ছড়াইতে থাকে, কখনও চলমান অঙ্গারগুলির মধ্য হইতে আগুনের কণা একটি অর্ধবৃত্তাকার রেখার মত ফুটিয়া উঠে। দৃশ্যত ইহার 'ফুলখেলা' নামটি পরম সার্থক। দূর হইতে দাঁড়াইয়া দেখিলে মনে হয় যেন কোনও অগ্নিবর্ণ পুষ্প চারিদিকে নিজের রঙিন দলগুলি বিকীর্ণ করিতেছে। এইভাবে ভক্ত্যাগণ একবার, তিনবার কিংবা সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। বয়স এবং অভ্যাসের তারতম্য অনুসারে ইহার সংখ্যার পার্থক্য হইয়া থাকে। এই কার্যের পর ভক্ত্যাদিগের হাতের তালু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ইহাতে তাহাদের কোনই ক্ষতি হয় নাই। যাহারা সর্বদা হাতের কাজ করিয়া থাকে, তাহাদের হাতের চামড়া যথেষ্ট পুরু থাকে সত্য, কিন্তু তাহা দ্বারাই যে কি ভাবে প্রায় অর্ধঘণ্টাকালীন অগ্নিস্পর্শের প্রতিক্রিয়া তাহারা বাঁচাইয়া চলে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ভক্ত্যাদিগের বিশ্বাস যথাবিধি নিয়ম পালন করিয়া এই দেবকার্য করিলে কাহারও কোনও অনিষ্ট হইতে পারে না।

তারপর ধর্মঠাকুরের মাথায় 'ফুল চাপানো'র পালা আরম্ভ হয়। 'ফুল চাপানো'র অর্থ দেবতার 'মাথায়' পদ্মফুল স্থাপন করা। গ্রামবাসিগণ এক একটি শ্বেতপদ্ম পুরোহিতের হাতে দিয়া তাহাদের নামে তাহা দেবতার মাথায় স্থাপন করিতে বলে। এক একটি উদ্দেশ্য লইয়া এক একটি ফুল চাপানো হইয়া থাকে। চাপাইবা মাত্র যদি ফুলটি পড়িয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, যে ব্যক্তি যে উদ্দেশ্যে ফুল চাপাইয়াছে, তাহা অবশ্য সিদ্ধ হইবে। প্রকৃতপক্ষে

ধর্মঠাকুর একটি শিলাখণ্ড মাত্র—'মাথা' বলিয়া তাঁহার কিছু নাই। শিলাখণ্ডের উপরিভাগটিকে যদি মাথা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবে তাহা এত সঙ্কীর্ণ যে তাহাতে পদ্মফুলের মত একটি বড় জিনিস রাখিলে তাহা তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যাইতে বাধ্য। ফুলটি পড়িয়া গেলে পুরোহিতের পক্ষেও লাভ এই যে গ্রামবাসী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আশানুরূপ দক্ষিণা দিবে; অতএব ফুল চাপাইবা মাত্রই পড়িয়া থাকে, কোনদিন আটকাইয়া থাকিতে শুনা যায় না।

সমাজের একটি নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক কার্যেও ফুল চাপানোর রীতিটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গ্রামে কাহারও ঘরে কোনও জিনিস চুরি গেলে, যদি কাহাকেও সন্দেহ হয়, তবে তাহার নাম করিয়া ফুল চাপানো হয়—যদি ফুল পড়িয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই নির্দোষ—দোষী হইলে ফুল পড়িবে না। পূর্বেই বলিয়াছি, ফুল কখনও আটকাইয়া থাকিতে শুনা যায় না, অতএব ইহা দ্বারা দোষী নির্দোষ নিরূপণ করা সম্ভব হয় না, তবে ফুল চাপানোর ভয়ে যে ব্যক্তিকে সন্দেহ করা হয়, সে প্রকৃতই দোষী হইলে তৎক্ষণাৎ অপহৃত দ্রব্য ফিরাইয়া দিয়া যায়—এরূপ ঘটনা গ্রামে অনেক ঘটিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়।

বাৎসরিক পূজার পরের দিন দুপুরের দিকে তিনটি ধর্মশিলাকেই গ্রামের প্রান্তবর্তী একটি পুকুরে পুনরায় স্নানার্থে লইয়া যাওয়া হয়। এই স্নানের তাৎপর্য সম্ভবত এই যে উৎসব উপলক্ষে জনসাধারণ ধর্মশিলা কয়টি স্পর্শ করিয়া যে 'অপবিত্র' করিয়াছে, স্নান দ্বারা তাহাদের শোধন করা হয়। কারণ, এইবার সর্বসাধারণকে ধর্মশিলার নিকটবর্তী হইতে দেওয়া হয় না, কিংবা জনসাধারণও সেদিন ধর্মশিলা স্পর্শ করিবার কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াও মনে করে না। কিন্তু সেদিন ধর্মশিলা কয়টিকে স্নানার্থ লইয়া যাইবার স্বতন্ত্র একটি প্রণালী অবলম্বন করা হইয়া থাকে; তাহা এই—দুইটি ধর্মশিলা দুইটি রাধাচক্রের মত নির্মিত 'যন্ত্রে' স্থাপন করিয়া দুইজন ভক্ত্যা ইহাদিগকে বুকের উপর লইয়া বসে; অন্যান্য ভক্ত্যাগণ রাধাচক্রারূঢ় ধর্মশিলাধারী ভক্ত্যা দুইজনকে কাঁধে করিয়া লইয়া পুকুরঘাটের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া যায়। আর একজন ভক্ত্যা, সাধারণত পাটভক্ত্যা, আর একটি ধর্মশিলা বুকের উপর স্থাপন করিয়া পাট বা কাঠের উপর বিদ্ধ লৌহ শলাকার উপর শয়ন করে, অন্যান্য ভক্ত্যাগণ পাটশুদ্ধ ভক্ত্যাকে কাঁধে করিয়া পুকুরঘাটে পর্যন্ত লইয়া যায়। পশ্চাতে বাদ্যভাণ্ড চলিতে থাকে, খর রৌদ্রে দ্বিপ্রহরের স্তব্ধতা দূর করিয়া বাদ্যধ্বনি দামোদরের অপর তীরে গিয়া প্রতিহত হয়। পুকুর পাড়ে গিয়া সমবেত জনতার সম্মুখে একদিকে ধামাৎকন্নি ও পুরোহিত ধর্মশিলা কয়েকটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করাইতে থাকে, অপর দিকে ভক্ত্যাগণ বাণফোঁড়া জিভফোঁড়া প্রভৃতি দেখাইতে থাকে। বহুক্ষণ যাবৎ এই অনুষ্ঠান চলিতে থাকে, গ্রীষ্মের বেলা অবসন্ন হইয়া আসে। তখন ভক্ত্যাগণ ধর্মশিলা কয়েকটিকে পূর্ববৎ মন্দিরের দিকে লইয়া রওনা হয়। কেহ কেহ পায়ে ঘুঙুর বা নূপুর পরিয়া জনতার সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে নাচিতে অগ্রসর হয়। মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া পৌঁছিয়া ধর্মশিলা

কয়টিকে সোজাসুজি মন্দিরের ভিতর লইয়া আসিয়া বেদীর উপর স্থাপন করা হয়—বৎসরের মধ্যে তাঁহাদিগকে আর মন্দিরের বাহিরে আনা হয় না। ইতিপূর্বেই মন্দির-প্রাঙ্গণে এক বিরাট মেলার অধিবেশন হয়, চারিপাশের পঁচিশ ত্রিশখানি গ্রামের লোক তাহাতে আসিয়া সমবেত হয়, তাহাতে আজকাল নানা রকম সস্তা বিদেশী জিনিস কেনাবেচা হয়। সেইদিনই ভক্ত্যাদের 'উতুরী' খুলিয়া দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের 'নিয়ম-ভঙ্গ' হয়, অর্থাৎ তাহাদিগকে আর কোনও নিয়ম পালন করিতে হয় না, তাহাদের দেব-কার্যে আর কোনও অধিকার থাকে না। কিন্তু অনুষ্ঠান সেইদিনই সম্পূর্ণ শেষ হইয়া যায় না, পরদিনের জন্যও একটি অনুষ্ঠান অবশিষ্ট থাকে, তাহার নাম 'ধর্মযজ্ঞ'। তাহা এই—সে'দিন ভক্ত্যাগণ মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া ধর্মরাজঠাকুরের নামে দুইটি পাঁঠা বলি দেয়, তারপর গ্রামের সম্পন্ন লোকদিগের নিকট হইতে নগদ চাঁদা কিংবা চাউল ও বাঁধের মাছ সংগ্রহ করিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণেই উনুন কাটিয়া রান্না করে। গ্রাম-গ্রামান্তর হইতেও সে'দিন অনেকে আসিয়া সেখানে সমবেত হয়। ব্রাহ্মণ পাচক রান্না করে,—'যার পাত, তার ভাত' এই নীতি অনুযায়ী অব্রাহ্মণ সকল জাতি পাতা পাড়িয়া বসিয়া এক সঙ্গে আহার করে, ভোজনে কোনও পংক্তি বিচার হয় না। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই বাৎসরিক অনুষ্ঠান শেষ হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, ডেমড়ার ধর্মরাজঠাকুরের বিস্তৃত দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। এই দেবোত্তর সম্পত্তির যাহারা ভোগদখল করে, তাহারা তাহার বিনিময়ে ধর্মরাজঠাকুরকে বাৎসরিক একটা খাজনা দিয়া থাকে। এই খাজনা আদায় করিবার প্রণালীর মধ্যে একটু অভিনবত্ব আছে। ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজার এক মাস পূর্ব হইতেই মন্দিরসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ, কিংবা সে বছর যাহারা ভক্ত্যা হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহারা, প্রতি সন্ধ্যায় একটি পাট মাথায় করিয়া যাহারা ধর্মঠাকুরের জমি ভোগদখল করে তাহাদের গৃহের প্রাঙ্গণে গিয়া উপস্থিত হয়, পাটটি মাথা হইতে নামাইয়া রাখে। গৃহস্থ বধূগন ধূপ দীপ জ্বালিয়া পাটটির পূজা করে এবং গৃহস্থগণ যে যাহার দেয় খাজনা তাহার নিকট আনিয়া রাখে। এই খাজনার কোনও দাখিলা কিংবা রসিদ দিতে হয় না, পুরুষানুক্রমিকভাবে এই রীতি চলিয়া আসিতেছে, কোনদিন এই লইয়া কোনও বিবাদ-বিসম্বাদ হইয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। এই ভাবে যে খাজনা আদায় হয়, তাহাই বাৎসরিক পূজার ব্যয়ের মূল ভিত্তি। গ্রামবাসী এই উপলক্ষে যে চাঁদা দিয়া থাকে, তাহা তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়; বর্তমানে অর্থনৈতিক দুর্গতির দিনে তাহাদের নিকট হইতে ইহার বেশি কিছু আশাও করা যায় না।

বাৎসরিক পূজা ব্যতীতও মন্দিরে যে নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে, তাহার জন্য মন্দিরের দৈনিক প্রণামীর উপরই নির্ভর করিতে হয়। নিত্যপূজা দেয়াসী ও ধামাৎকন্নি কোনমতে নির্বাহ করে। ডেমড়ার ধর্মমন্দিরে ধামাৎকন্নি একজন হাজরা পদবীবিশিষ্ট উগ্রক্ষত্রিয় বা আগুরি। তাহার প্রধান কাজ, বার্ষিক পূজা উপলক্ষে জল-অনাচরণীয় যে সকল জাতি মন্দিরে পূজা লইয়া আসে, তাহাদের নিকট হইতে পূজা লইয়া দেবতার বেদীর উপর স্থাপন

করা, তারপর তাহাদের ভোগনৈবেদ্য তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া। কলুজাতীয় দেয়াসী নিত্যপূজা করিয়া থাকে; যেদিন দেয়াসী আসিতে পারে না, সেদিন ধামাৎকন্নিই পূজা নির্বাহ করিয়া দেয়। কাহারও মানসিক বিশেষ পূজা থাকিলে কোন কোন সময় ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরও আবির্ভাব হয়—নতুবা সমস্ত বৎসর মন্দিরে তাঁহার আর দেখা পাওয়া যায় না।

চড়ক ধর্মপূজার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ; কারণ, চড়ক আদিম সূর্য পূজারই একটি আচার। ডেমড়ার অধিবাসিগণ বলিয়া থাকে যে, পূর্বে ধর্মপূজা উপলক্ষে এখানেও চড়ক হইত, কত পূর্বে যে তাহা হইত, তাহা কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারে না; কেহ যে তাহা কোনদিন দেখিয়াছে, তাহাও মনে হইল না; তথাপি গ্রামের সকলেই বলিয়া থাকে যে একদিন এই মন্দির-প্রাঙ্গণে চড়ক হইত, শত শত ভক্ত্যা প্রতি বৎসর চড়কে উঠিয়া চক্রাকারে শূন্যে ঘুরিত। কিন্তু একবার একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাইবার পর হইতে তাহা বন্ধ হইয়াছে। একবাব যখন নিয়মিত চড়কের অনুষ্ঠান হইতেছে এবং সেই উপলক্ষে একজন ভক্ত্যা চড়কে উঠিয়া শূন্যমার্গে চক্রাকারে দ্রুতবেগে ঘুরিয়া যাইতেছে, সেই সময় সহসা চড়কগাছের উপরকার যে একটি সরু কাঠি লম্বমান বৃহত্তর কাষ্ঠখণ্ডটি ধরিয়া রাখে, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়া বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয়—ফলে তৎক্ষণাৎ সেই ভক্ত্যার মৃত্যু হয়। গ্রামবাসীর বিশ্বাস এই ভক্ত্যা যথারীতি নিয়ম পালন না করিয়াই চড়কগাছে আরোহণ করিয়াছিল, সেইজন্যই ধর্মঠাকুর তাহাকে এই শাস্তি দিয়াছিলেন। কিন্তু সে যাহাই হউক, তারপর হইতেই ডেমড়ার ধর্মরাজ মন্দিরে চড়ক বন্ধ হইয়াছে। ইহার পুনঃপ্রবর্তনের জন্য কোনও প্রয়াস আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ঘটনাটি যতদিন পূর্বেই সংঘটিত হউক না কেন, ইহার মূলে যে সত্যতা আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়; কারণ অনুরূপ ঘটনার পর পশ্চিমবঙ্গের বহু ধর্মমন্দিরেই চড়ক বন্ধ হইয়া গিয়াছে। চড়কের অনুষ্ঠানে কৃচ্ছ্র সাধনার উপর যে জোর দেওয়া হয়, তাহা হইতেই নানা দুর্ঘটনারও সৃষ্টি হইয়া থাকে—একবার কোনও দুর্ঘটনা হইলে অনুরূপ অনুষ্ঠান দেবতার অভিপ্রেত নহে বলিয়াও মনে করিয়া অনেক গ্রামবাসী তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

হিন্দুধর্মে ছুৎমার্গ এই সকল গ্রামাঞ্চলে যে কি ভাবে কার্যকরী হইয়া থাকে, তাহারও একটি পরিচয় এই অনুষ্ঠান হইতে পাওয়া যায়। পূর্বে যে 'নিয়ম কলসী'র কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার জল একজন জল-অনাচরণীয় জাতির লোক বিতরণ করিয়া থাকে। এই জলের ঐন্দ্রজালিক শক্তি (magic power) আছে বিবেচনা করিয়া তাহা গ্রামের ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া বাউরী পর্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকই সমানভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে — হিন্দু বর্ণাশ্রম ধর্মের ছুৎমার্গ নীতি এখানে কোনও দিক দিয়া কার্যকরী হয় না। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণগণ যে সকল নিম্নতম জাতির সংস্রবে আসিয়াছেন, সেখানে দুইটি নীতি সাধারণত অবলম্বন করিয়াছেন—প্রথমত ব্রাহ্মণেতর সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজেদের চারিদিকে এক নিশ্ছিদ্র প্রাচীর রচনা করিয়াছেন, দ্বিতীয়ত ব্রাহ্মণেতর সমাজের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতি স্বীকৃতি জানাইয়াছেন। পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণগণ প্রথমোক্ত এবং বাংলার

পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ দ্বিতীয়োক্ত সমাজের অধিবাসী। ধর্মঠাকুরের 'নিয়ম কলসী'র জলের সঙ্গে দেবতার ভোগরূপে প্রদত্ত চিনি ও বাতাসা মিশ্রিত করিয়া জল সর্বসাধারণের মধ্যে প্রধানত কলু দেয়াসীই বিতরণ করিয়া থাকে—দেবতার মন্ত্রপূত জল বিবেচনা করিয়া সকলে তাহা পান করিয়া মস্তকে ধারণ করে ও সেই দেবতা কে, কোন্ মন্ত্র দ্বারা তাহা কে পবিত্র করিয়াছে, এই সকল প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না।

পূর্বে বলিয়াছি যে, বৎসরের মধ্যে দেবতাকে আর কোনদিন মন্দিরের বাহির করা হয় না। বিশেষ কারণে ক্বচিৎ তাহার ব্যতিক্রমও হয়—তবে সে রকম কারণ গ্রামে সচরাচর বড় ঘটিতে দেখা যায় না। অনাবৃষ্টিই কৃষিজীবী পল্লীবাসীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দুর্বিপাক। অনাবৃষ্টিই সময় কোন কোন বৎসর ধর্মঠাকুরের নিকট জুড়িভোগ দেওয়া হয়, কোন কোন অঞ্চলে ধর্মঠাকুরকে মধ্যাহ্ন রৌদ্রে আনিয়া কিছুকাল রাখিয়া যে শাস্তিভোগ করান হয়, এখানে সে রীতি প্রচলিত নাই। জুড়িভোগ অর্থে পায়েস ভোগ। এই পায়েস মন্দিরপ্রাঙ্গণেই উনুন কাটিয়া রান্না করা হয়; তারপর দেবতাকে তাহা নিবেদন করার পর মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত লোকদিগের মধ্যেই বিতরণ করা হয়। ব্রাহ্মণ পাচক তাহা রান্না করে এবং ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল জাতিই মন্দির-প্রাঙ্গণে বসিয়া তাহা দেবতার প্রসাদরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে।

বীরভূম জেলায় 'ভাঁড়ার খেলা' নামক একটি বিষয়ও ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাহা এই প্রকার—ভক্ত্যাগণ মাথায় করিয়া এক একটা মাটির হাঁড়ি লয়। হাঁড়িটা ফুল দিয়া সাজান হয়। প্রত্যেক গ্রামের বাহিরে একটি নির্দিষ্ট পুষ্করিণীর তীরে শুঁড়িয়া দেশী মদ মিশ্রিত জলে উক্ত মাটির ভাঁড় পূর্ণ করিয়া দেয়। বীরভূম জেলার প্রায় সর্বত্রই ধর্মপূজা উপলক্ষে পচাই বা দেশী মদের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক। পূজা উপলক্ষে পচাইর ভাঁড় আনয়ন একটি বিশিষ্ট আচার। ভাঁড়ার মাথায় লইলে দেবতার 'ভর' হয়—ভক্ত্যা মাথা দুলাইতে থাকে, দেবতা তাহার উপর আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া সকলে বিশ্বাস করে। ভক্ত্যাগণ ভাঁড় মাথায় লইয়া মন্দিরের দিকে আসিতে থাকে, সেই সময় রোগের ঔষধ প্রত্যাশায় রোগীর আত্মীয়স্বজন, কোন কোন সময় রোগী নিজেও, এবং বন্ধ্যা নারীগণ তাহাদের সম্মুখে মাটিতে লম্বা লইয়া শুইয়া পড়ে এবং যে যাহার প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করে—কোন একটা জবাব না পাওয়া পর্যন্ত পথ ছাড়িয়া দেয় না। ভক্ত্যাগণ প্রত্যেককেই এক একটা উপায় বলিয়া দেয়, তারপর নিজেরা মন্দিরের দিকে অগ্রসর হয়। মন্দিরের সম্মুখে আসিয়াও ভাঁড়ার মাথায় লইয়া কিছুক্ষণ নৃত্য চলিতে থাকে, ভক্তাগণ নৃত্য করিতে করিতে মন্দির প্রদক্ষিণও করিয়া থাকে। অতঃপর ভাঁড়ারগুলি মন্দিরের বারান্দায় নামাইয়া রাখা হয়, ভাঁড়গুলি কোন গাছের নীচে ঢালিয়া দেয়। ইহাকেই 'ভাঁড়ার খেলা' বলে। বীরভূম ব্যতীত এই 'ভাঁড়ার খেলা' অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না—অতএব ইহা বীরভূমের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বলিয়াই মনে হয়।

তৃতীয় প্রকারের ধর্মপূজার নাম 'ঘর-ভরা'। ইহাকে শুদ্ধ করিয়া 'গৃহভরণ'ও বলা হইয়া

থাকে। রোগমুক্তি কিংবা অন্যান্য কারণে ব্যক্তিবিশেষের নামে মানসিক করিয়া ধর্মপূজার যে আড়ম্বরপূর্ণ বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করা হইয়া থাকে, তাহারই নাম ঘর-ভরা। ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ, এবং ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া বহুলোকের সহায়তায় ইহা অনুষ্ঠিত হয়। একমাত্র নিতান্ত সচ্ছল ব্যক্তি ব্যতীত কেহই এই পূজা মানসিক করিতে পারে না—সেইজন্য ইহা বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। তবে ইহা বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় এখনও অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া জানিতে পারা যায়—বীরভূম ও বর্ধমানে ইহা প্রচলন এখন আর নাই বলিলেই চলে।[১] এই উৎসব ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ—এই কয়মাসের যে কোন মাসে শুক্লপক্ষের তৃতীয়ায় আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমায় সমাপ্ত হয়। বারদিন ধরিয়া এই অনুষ্ঠান হয়। এই উপলক্ষে বারটি ধর্মশিলার প্রয়োজন হয়—পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে বারটি ধর্মশিলা সংগ্রহ করিয়া এক একটি আনুষ্ঠানিকভাবে পূজাস্থানে আনয়ন করা হয়। তারপর তাহাদের সকলের এক সঙ্গে পূজা হয়। কোন কোন প্রাচীন মন্দিরে বারটি কিংবা তাহার কিছু কম সংখ্যক ধর্মশিলা স্থায়িভাবেও রাখা হয়। তাহাদের অন্যত্র হইতে ধর্মশিলা ধার করিয়া আনিবার প্রয়োজন হয় না। 'ঘর-ভরা' অনুষ্ঠানে বারজন ভক্ত্যা ও চারিজন আমিনী (স্ত্রী বা বালা ভক্ত্যা)র প্রয়োজন হয়—এতদ্ব্যতীত প্রত্যেকটির বারটি করিয়া এই সকল উপকরণেরও প্রয়োজন হয়, যেমন—বার জাতির ফুল, বলির জন্য বারটি পাঁঠা, বারটি 'পাট', বারগাছি দূর্বা, বারটি সুপারি, বারটি উত্তরীয় ইত্যাদি। ধর্মপূজার সঙ্গে দ্বাদশ সংখ্যাটি যুক্ত হইবার তাৎপর্য পরে ব্যাখ্যা করিতেছি। বর্তমানে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলে যে ঘর-ভরা উৎসব হয় তাহাতে বারজন ভক্ত্যা সকল সময় পাওয়া সম্ভব হয় না, সেইজন্য ইহা অপেক্ষা কম ভক্ত্যা লইয়াই অনুষ্ঠান পালন করা হইয়া থাকে—অর্থনৈতিক কারণের জন্য বলির পাঁঠা সংগ্রহ করিবার রীতিও পরিত্যক্ত হইয়াছে—এখন দুইটি পাঁঠাতেই এই কার্য সম্পন্ন হয়—সে কথা পরে বলিতেছি।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে মন্দিরের সংলগ্ন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অস্থায়ী মণ্ডপ নির্মাণ করা হয় এবং তাহাতেই সকল অনুষ্ঠান পালন করা হয়, স্থায়ী মন্দিরের মধ্যে কিছুই করা হয় না। তৃতীয়া তিথি হইতেই ঘর-ভরা উৎসবের আচারসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হইতে আরম্ভ হয়। ঐ দিন ডোমজাতীয় পুরোহিত একটি মাটির ঘট মাথায় লইয়া একটি নির্দিষ্ট 'আকাটা' পুকুর হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে জল ভরিয়া আনিতে যায়। যে পুকুর কাটা হয় নাই, আপনা হইতেই হইয়াছে, অর্থাৎ natural reservoir-কেই 'আকাটা' পুকুর বলে, এই পুকুরের জলই পূজার সকল আচারের মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূজার পূর্বদিন হইতে আরম্ভ করিয়া পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ কার্যের জন্য কেহ এই পুকুরের জল

১। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় অনুষ্ঠিত 'ঘর-ভরা' উৎসবের বিস্তৃত বিবরণের জন্য যথাক্রমে দ্রষ্টব্য বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণ' (কলিকাতা, ১৩৩৭) পরিশিষ্ট, K. P. Chattopadhyay. 'Dharama-worship', *JRASB* Vol. (1942). pp. 99-135.

ব্যবহার করিতে পারে না। ঘট জলপূর্ণ করিয়া মণ্ডপের মধ্যে লইয়া আসা হয় এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত হিন্দু আচারে ইহাকে মন্ডপের মধ্যে যথারীতি প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। তারপর বারটি ধর্মশিলাকেই পূজা করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে মন্দির হইতে বাহির করিয়া আনিয়া মণ্ডপে স্থাপন করা হয়। বারটি ধর্মশিলার মধ্যে একটি ধর্মশিলাকে প্রধান বলিয়া মনে করা হয় এবং তাঁহার সম্মুখেই ঘট স্থাপন করা হয়। সেইদিন ঘটভরা হইতে আরম্ভ করিয়া উৎসব শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি অনুষ্ঠান পালন করিবার সময় বাদ্যভাণ্ড বাজিতে থাকে, এই বাদ্যভাণ্ডের মধ্যে অন্তত পাঁচটি সুবৃহৎ ঢাক থাকে, ইহাদের বাদ্যে চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলি কয়দিন ব্যাপিয়া উচ্চকিত হইতে থাকে। দ্বিপ্রাহরিক পূজা শেষ হইলে ব্রাহ্মণ পুরোহিত সংস্কৃত চণ্ডীপাঠ করেন ও ডোম পুরোহিত সৃষ্টিতত্ত্ববিষয়ক কতকগুলি বাংলা ছড়া আবৃত্তি করিয়া থাকেন। তারপর ডোম পুরোহিত 'জল পাবন', 'টীকা পাবন', 'পুষ্প পাবন', ইত্যাদি বিষয়কও কতকগুলি ছড়া বলিয়া থাকেন। এই ছড়াগুলি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

ঘর-ভরা উৎসবেও তৃতীয় তিথি হইতেই ভক্ত্যাগণের আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করিবার কথা। কিন্তু যে কারণে বাৎসরিক গাজন উপলক্ষে তৃতীয়া তিথি হইতে আজকাল আর আনুষ্ঠানিকভাবে ভক্ত্যাগণ যোগদান করে না, সেই কারণেই ইহাতেই ভক্ত্যাগণ পূর্ণিমার পাঁচ সাত কিংবা নয় দিন পূর্বে আসিয়া যোগদান করে। বাৎসরিক ধর্মপূজার মতই ভক্ত্যাগণ ইহাতেও জাতিবর্ণনির্বিশেষে পৈতা ধারণ করিয়া সকল কার্যে অংশ গ্রহণ করিবার সমানাধিকার লাভ করে। কোন কোন অঞ্চলে বালা ভক্ত্যা (স্ত্রীভক্ত্যা)-গণও 'পৈতা' ধারণ করে, তাহাদের সঙ্গেও পুরুষ ভক্ত্যাদিগের কোন পার্থক্য থাকে না, স্ত্রী বলিয়া পূজার কোন আচারে অংশ গ্রহণ করিতে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া হয় না।

তৃতীয়া তিথিতেই সর্বপ্রথম সন্ধ্যার পর এক পালা ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যসূচক ধর্মমঙ্গল গান হয়। ধর্মমঙ্গল গান বার দিনের চব্বিশ পালায় বিভক্ত। প্রত্যহ দুই পালা গীত হইয়া ইহা বার দিনে সমাপ্ত হইবার কথা। তবে প্রথম দিনে সন্ধ্যার পর ইহার এক পালা ও পূর্ণিমার পরের দিন সর্বশেষ পালা গীত হইয়া ইহার উপসংহার হয়। ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এখানে ধর্মমঙ্গল গান গাহিবার প্রণালী সম্পর্কে সামান্য উল্লেখ করা যাইতেছে।

মন্দির-প্রাঙ্গণের উন্মুক্ত স্থানে, কখনও কখনও বা উপরে চাঁদোয়া টানাইয়া তাহার নীচে ধর্মমঙ্গল গানের আসর বসিয়া থাকে। ইহাতে একজন মূল গায়েন থাকে, সে পায়ে নূপুর ও চামর লইয়া নাচিয়া নাচিয়া অঙ্গভঙ্গি সহকারে ইহার আখ্যানমূলক (narrative) পদগুলি গাহিয়া যাইতে থাকে। তৎসঙ্গে সামান্য কিছু বাদ্যের ব্যবস্থা থাকে এবং দুই চারিজন দোহারও থাকে—তাহারা কোন কোন পদের ধুয়া করে। এইভাবে প্রতিদিন বৈকালে এক পালা ও রাত্রে এক পালা গীত হয়। কোন কোন অঞ্চলে প্রথম দিন রাত্রে মাত্র এক পালা এবং সর্বশেষ দিন দিনে মাত্র এক পালা গীত হয়। সর্বশেষ রাত্রির পালাটি দীর্ঘতম, বিষয়ের দিক দিয়াও গুরুত্বপূর্ণ, সেইজন্য ইহা গাহিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যায়। সেইদিন

পূর্ণিমা তিথি থাকে এবং উৎসবের শেষদিন বলিয়া শ্রোতাগণও উৎসাহের সঙ্গে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া গান শুনিয়া থাকে, এইজন্য এই পালাটির নাম জাগরণ পালা।

সেইদিনই সন্ধ্যাকালে ধর্মঠাকুরকে পায়েস রন্ধন করিয়া ভোগ দেওয়া হয়—তাহাকে 'মনুই ভোগ' বলে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত সংস্কৃত মন্ত্রদ্বারা দেবতাকে ভোগ নিবেদন করিবার পর ডোম পুরোহিত বা পণ্ডিত একটি বাংলা ছড়া বলিয়া সেই ভোগ দেবতাকে নিবেদন করিয়া থাকেন। এই ক্ষেত্রে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মণের প্রভাব এই অঞ্চলে বিস্তৃত হইবার পূর্বে ডোম পণ্ডিতগণই এই সকল বাংলা ছড়া বলিয়া ইহার পৌরোহিত্যের সকল দায়িত্ব পালন করিতেন।

'মনুই ভোগ'-এর পর আর একটি ছড়া বলিয়া ডোম পুরোহিত ধর্মঠাকুরকে ছোলাভাজা নিবেদন করিয়া দেন। ভোগ নিবেদন করা হইলে পর ভক্ত্যাগণ মনুই রন্ধনের হাঁড়িটিকে সেই রাত্রেই বাদ্যভাণ্ড সহকারে জলে ভাসাইয়া দিয়া আসে।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ চতুর্থী তিথিতে ভোর বেলাতেই ডোম পুরোহিত ধর্মঠাকুরের নিদ্রাভঙ্গ বিষয়ক ছড়া আবৃত্তি করেন, দ্বিপ্রহরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে ধর্মঠাকুরের পূজা করেন। পূর্বদিনের মতই অন্যান্য আচার পালন করা হয়। তবে এইদিন হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রত্যহ বৈকালে একপালা ও রাত্রে একপালা করিয়া ধর্মমঙ্গল গান গীত হয়। এইরূপে কয়েকদিন চলিবার পর আনুষ্ঠানিকভাবে কামিন্যা আনয়ন করিতে হয়। কামিন্যা ধর্মঠাকুরের পত্নী, তাঁহাকে ভিন্ন ধর্মঠাকুরের পূজা সম্পূর্ণ হয় না। তবে তাঁহার কোন মূর্তি কিংবা প্রতীক নাই, সাধারণ মৃন্ময় পূজা-ঘটেই তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। পঞ্চমী হইতে একাদশীর মধ্যে যে কোনদিন কামিন্যা আনয়ন করা যাইতে পারে। যেদিন কামিন্যা আনয়ন করিতে হইবে সেদিন সান্ধ্যাকৃত্য সমাধা হইবার পর রাত্রের গান আরম্ভ হইলে, পূজার উপচার সহ ব্রাহ্মণ ও ডোম পুরোহিত ভক্ত্যাগণকে সঙ্গে লইয়া বাদ্যভাণ্ড সহ পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট একটি পুষ্করিণীর তীরে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে ছোট একটি মাটির ঘরে ব্রাহ্মণ কিংবা ডোম পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া তারপর কামিন্যা-ঘটে কামিন্যার আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, অধিবাস, কামিন্যা ও কামিন্যার আবরণ দেবতাদের পূজা করিয়া সেখানেই একটি ছাগ কিংবা মাগুর মাছ বলি দিয়া থাকেন। তারপর পাটভক্ত্যা বা প্রধান ভক্ত্যা মস্তকে কামিন্যা-ঘট লইয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে মণ্ডপে আসিয়া পৌঁছায়। এই কামিন্যা-ঘট প্রধান ধর্মশিলাটির বামভাগে স্থাপন করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হয়।

কামিন্যা আনিবার পরদিনই মণ্ডপের পার্শ্বে হিন্দোলা কাষ্ঠদ্বয় (swinging poles) পুঁতিয়া রাখিতে হয়। সেইদিন হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে ভক্ত্যাগণ ইহার নীচে ধুনি জ্বালাইয়া মাথা নীচের দিকে করিয়া দোল খায়। দোল খাইবার পূর্বে হিন্দোলা কাষ্ঠদ্বয়কে ডোম পুরোহিত আনুষ্ঠানিকভাবে পূজা করিয়া থাকে। ডোম পুরোহিত এই উপলক্ষেও কতকগুলি ছড়া আবৃত্তি করে। সেইদিন হইতে প্রত্যহ ভক্ত্যাগণ দ্বাদশ প্রকারে ধর্মঠাকুরের সেবা করিয়া থাকে, যেমন, প্রণাম সেবা অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ প্রণাম, বেতচালা অর্থাৎ স্বহস্তে

স্বগাত্রে বেত্রাঘাত ইত্যাদি। ইহাকে দ্বাদশ সেবা বলে, তারপর ভক্ত্যাগণ সকলে একটি সারি দিয়া বসিয়া থাকিবে, তাহাদের কাঁধের উপর পা রাখিয়া একজন ব্রাহ্মণ চলিয়া যাইবে; এইরূপে সেবা করিলে দ্বাদশ সেবায় কোন অঙ্গহানি হইলে তাহা পূর্ণ হয়।

ইহার পর প্রধান অনুষ্ঠানের নাম মুক্তা আনয়ন, মুক্তা কথাটির মুক্তির সঙ্গে সম্পর্ক আছে মনে করিয়া কেহ কেহ ইহাকে এখন মুক্তি আনয়নও বলিয়া থাকেন। মুক্তা বলিতে মুক্তাহার ধান্যের আতপ চাউল বুঝায়, এই চাউলের উপর মুক্তাদেবী বা মুক্তিদেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, আবাহন, অধিবাস, পূজা, ধর্ম পূজা ইত্যাদি সম্পন্ন করিয়া সেই চাউল একটি পাত্রে স্থাপন করিয়া তাহা বাদ্যভাণ্ড সহকারে পূজার মণ্ডপে লইয়া আসা হয়। কেহ কেহ মুক্তা বা মুক্তিদেবীকে ধর্মঠাকুরের পত্নী বলিয়া মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি কৃষিব্রতের আচার ব্যতীত আর কিছুই নহে। যেখান হইতে প্রতি বৎসর মুক্তা আনয়ন করিতে হয়, তাহা একটি নির্দিষ্ট স্থান এবং সেইস্থান পূর্ব হইতেই ইহার জন্য স্থির করা হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্বদিন বরের গৃহ হইতে যে রকম তৈলহরিদ্রা ও অধিবাস প্রভৃতি পাঠাইবার রীতি আছে, মুক্তা আনয়নের পূর্বদিনও ধর্মপূজার মণ্ডপ হইতে সেই প্রকার তৈলহরিদ্রা ও অধিবাস পাঠান হইয়া থাকে। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, মুক্তাদেবী বা মুক্তামালা ধান্যকে ধর্মঠাকুরের পত্নীরূপে কল্পনা করা হয় এবং এই পূজা উপলক্ষে তাঁহাদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যেদিন মুক্তা আনয়ন করিতে হইবে, সেইদিন সন্ধ্যার পর রাত্রের পালা ধর্মমঙ্গল গান আরম্ভ হইলে ব্রাহ্মণ ও ডোম পুরোহিত ভক্ত্যাদিগের সঙ্গে লইয়া একটি সুসজ্জিত চতুর্দোলায় ধর্মঠাকুরের পাদুকা প্রতীককে স্থাপন করিয়া বিবাহের সকল রকম উপকরণ, যথা মুকুট ইত্যাদি, লইয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে নির্দিষ্ট স্থানে গমন করে। গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ 'বরযাত্রী' রূপে তাহার অনুগমন করে। সেখানে উপস্থিত হইলে তত্রস্থ ব্যক্তিগণ, তাহাদিগের উপযুক্ত অভ্যর্থনা দ্বারা সকলের মান্য রক্ষা করে এবং সকলকেই উপযুক্তভাবে জল খাওয়াইবার ব্যবস্থা করে। পরে তাহাদের ব্রাহ্মণ কিংবা ডোম পুরোহিত মুক্তাহার ধান্যের উত্তম আতপ চাউল পাঁচ সের একটি পাত্রে স্থাপন করিয়া ধর্মঠাকুরের দোলার নিকট আনিয়া স্থাপন করে। তখন ব্রাহ্মণ পুরোহিত চাউলকে মুক্তাদেবী বলিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় ডোম পুরোহিত 'মুক্তা মঙ্গলা' ও ধান্যের জন্ম-বিবরণ নামক ছড়া পাঠ করেন। পরে ধর্ম ও মুক্তাকে চতুর্দোলায় স্থাপন করিয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে পূজা মণ্ডপে লইয়া যাওয়া হয়। মণ্ডপে আনিয়া 'মুক্তাদেবী'সহ ধর্মের দোলা যথাস্থানে স্থাপন করা হয়। এইসব কার্যে প্রায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়া যায়। ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্মমঙ্গল গানও চলিতে থাকে।

ত্রয়োদশী তিথিতে দিনের সকল কৃত্য শেষ করিয়া বৈকাল বেলা আনুষ্ঠানিকভাবে (ceremonially) গাম্ভারী বৃক্ষ ছেদন করিতে যাইতে হয়। ব্রাহ্মণ ও ডোম পুরোহিত ভক্ত্যাদিগকে সঙ্গে লইয়া বাদ্যভাণ্ডসহকারে নিকটস্থ কোন গাম্ভারী বা গামার বৃক্ষের নীচে উপস্থিত হয়। বৃক্ষতলে ঘট স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণ পঞ্চদেবতা, ধর্মঠাকুর, তাহার কামিন্যা ও গাম্ভারী বৃক্ষের অধিবাস, পূজা ইত্যাদি যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তারপর ডোম

পুরোহিত 'গাম্ভারী মঙ্গলা' নামক এক বাংলা ছড়া আবৃত্তি করেন। তারপর প্রধান ভক্ত্যো আবার কতকগুলি বাংলা ছড়া বলিয়া কুঠার দিয়া গাম্ভারী বৃক্ষের একটা বড় ডাল ছেদন করে। সেই ডাল লইয়া সকলে কর্মকারের (blacksmith) গৃহে যায়, কর্মকার সেই ডাল দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাটা প্রস্তুত করে, প্রত্যেকটা পাটার উপর ৫।৭টা লোহার কাঁটা সংযুক্ত করিয়া দেয়। পূর্ণিমার দিন ইহার উপর ভক্ত্যোগণ ঝাঁপাইয়া পড়ে, সেইজন্য ইহার নাম ঝাঁপকাঁটা।

চতুর্দশী তিথিতেও দিনের বেলা নিয়মিত ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। পূজা শেষ হইলে ব্রাহ্মণ ও ডোম পুরোহিত ভক্ত্যাদিগকে সঙ্গে লইয়া বাদ্যভাণ্ড সহযোগে সেই গ্রামের কিংবা তৎসংলগ্ন অন্য কোন গ্রামের নির্দিষ্ট গৃহস্থের বাড়িতে যায়—সেখানে গিয়া সকলে গৃহস্থের জয়ধ্বনি করিতে থাকে এবং ভক্ত্যোগণ তাহার জয়গান করে। গৃহস্থগণ ধর্মপূজার জন্য কিছু কিছু করিয়া নগদ অর্থ দান করেন। যে সকল গৃহস্থের বাড়িতে এই উদ্দেশ্যে যাওয়া হয়, তাহাদিগকে 'রাজা' বলে, এবং তাহাদের নিকট এইভাবে অর্থের জন্য আবেদন করাকে 'রাজা ভেটা' বলে। গৃহস্থগণ ইহাতে তাঁহাদের ইচ্ছামত অর্থ দিয়া থাকেন, ইহাতে বাধ্যবাধকতা নাই।

'ঘরভরা' উৎসবে ছাগবলি একটি বিচিত্র ব্যাপার। এই উপলক্ষে যে ছাগ বলি দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা উৎসবের দুই তিন বৎসর পূর্ব হইতেই ধর্মঠাকুরের নামে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত ছাগ পূর্ব হইতে এই ভাবে ছাড়িয়া দিবার রীতি রাঢ় অঞ্চলের বহু স্থানেই প্রচলিত আছে।[১] তবে ধর্মের ছাগ সম্পর্কে একটু বিশেষত্ব আছে। ইহার সম্মুখের এক পায়ের খুরের উপর একটি লোহার বেড়ী বা ডাঁড়ুকা পরাইয়া দেওয়া হয়। ইহা দেখিয়াই ইহাকে ধর্মের ছাগ বলিয়া চিনিতে পারা যায়। কোনও কোনও অঞ্চলে ধর্মের ছাগকে লুয়া বা লুয়ে বলে। সম্ভবত লোহার বেড়ী পরা থাকে বলিয়া লোহা উচ্চারণে লুয়া শব্দটি আসিয়াছে।

'ঘরভরা' অনুষ্ঠানে যে দুইটি পাঁঠা বলি হয়, তাহাদের মধ্যে যেটি প্রধান তাহার নাম লুয়ে। লুয়ে বলি দিয়া ইহার ছিন্ন মুণ্ডটি একটি হাঁড়ির মধ্যে পুরিয়া সারারাত সেই হাঁড়িটি কোলে করিয়া বসিয়া থাকিলে বন্ধ্যা নারী পুত্রলাভ করে বলিয়া বিশ্বাস। এই উপলক্ষে কোন না কোন বন্ধ্যা নারী আপনা হইতে আসিয়া লুয়ের হাঁড়ি ধরিবার জন্য প্রার্থী হয়। বর্তমানে কোন কোন সময় এই প্রকার নারী অনুসন্ধান করিয়াও আনিতে হয়। যে ব্যক্তির স্ত্রীর লুয়ের হাঁড়ি ধরা স্থির হয়, সেই ব্যক্তি সস্ত্রীক চতুর্দশী তিথি হইতেই হবিষ্যান্ন ভক্ষণ

১। দাক্ষিণাত্যের তামিল অঞ্চলের কোন কোন লৌকিক দেবতার পূজায় পশুবলি উপলক্ষে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। যেমন—'The buffalces devoted for sacrifice are generally chosen sometime beforehand by people who make vows in sickness or trouble, and then allowed to roam about in the village at will.' (H. Whitehead, op. cit. p. 107.)

করিয়া থাকে। তাহাদের লুয়েকে স্নান করাইয়া আনিতে হয়, তারপর একটি হলুদবর্ণের নূতন কাপড়ে পঞ্চশস্য প্রভৃতি বাঁধিয়া তাহা লুয়ের গলায় বাঁধিয়া দিতে হয়। গ্রামের স্ত্রীলোকগণ সাধারণত সেইদিন উপবাসী থাকিয়া ধর্মকে দীপদান করে। অনেক মেয়ে এই সময়ে মাথায় ও বক্ষে জ্বলন্ত ধুনার মালসা রাখিয়া ধুনা পোড়ায়।

ব্রাহ্মণ ও ডোম পুরোহিত কর্তৃক ধর্মঠাকুরের সেইদিনের মত নির্দিষ্ট পূজা সম্পন্ন হইলে পর এই উভয় পুরোহিত সমভিব্যাহারে ভক্ত্যাগণ ঝাঁপকাঁটা, শালবাণ, বাণ, পূজার উপচার লইয়া ধর্মঠাকুর ও তাঁহার পত্নী মুক্তাকে চতুর্দোলায় চাপাইয়া লুয়ে ছাগকে সঙ্গে করিয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে নির্দিষ্ট পুকুর বা নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। তথায় ডোম পুরোহিত মুক্তাতণ্ডুলগুলিকে কতকগুলি বাংলা ছড়া উচ্চারণ করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করায়। তারপর বাণ, শালবাণ, জিহ্বাবাণ, লুয়ে ছাগ, ঝাঁপকাঁটা ইত্যাদিকেও আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করাইয়া স্ত্রী ও পুরুষ ভক্ত্যাগণও স্নান করিয়া থাকে। তারপর বাদ্যভাণ্ড সহকারে সকলে পুনরায় মণ্ডপে ফিরিয়া আসে। ফিরিয়া আসিয়া ডোম পুরোহিত মুক্তাদেবীকে বসাইবার জন্য এক মণ্ডল চিত্রিত করেন, তথায় ডোম পুরোহিত মুক্তার পূজা করিয়া থাকেন। মুক্তাপূজার জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থান রঙ করিয়া রাখা হয়—সেই স্থানটি ধর্মঠাকুরের মণ্ডপের মধ্যেও হইতে পারে, কিংবা একটি স্বতন্ত্র চালাঘর বাঁধিয়া তাহার মধ্যেও হইতে পারে। ইহাকে মুক্তামণ্ডপ বা মুক্তিমণ্ডপ বলে।

ডোম পুরোহিত মুক্তাতণ্ডুল ও প্রধান ভক্ত্যাকে লইয়া মুক্তিমণ্ডপে যান, সেখানে নানা দেবতার পূজা করিবার পর ডোম পুরোহিত প্রধান ভক্ত্যার দুই হাতে দুই মুষ্টি মুক্তিতণ্ডুল দিয়া, নূতন গামছা দিয়া তাহার দুইচোখ বাঁধিয়া দেন, তারপর ডোম পুরোহিত কতকগুলি ছড়া আবৃত্তি করেন। ছড়াগুলি আবৃত্তি করা শেষ হইয়া গেলে প্রধান ভক্ত্যা বা পাট ভক্ত্যা সেই দুই মুষ্টি চাউল মাটিতে রাখিয়া দিয়া বাহিরে গিয়া চক্ষুর বাঁধন খুলিয়া দেয়। ডোম পণ্ডিত সেই দুই মুষ্টি চাউল লইয়া মুক্তিমণ্ডল অঙ্কিত করেন—এই মুক্তিমণ্ডলের মধ্যে ধর্মের পাদপদ্ম, কূর্ম, অনন্ত ও বাসুকি নাগ, হস্তী, দ্বারপাল, দিকপাল, ইত্যাদি অঙ্কিত হয়। ইহার অভ্যন্তরস্থ কোন চিত্র অঙ্কিত করিবার জন্য রঙ্গিন গুঁড়ি (powder)-ও ব্যবহৃত হয়। যদি কোন নারী পুত্রকামনায় এই মণ্ডল স্পর্শ করিতে চায়, তবে ডোম পুরোহিত তাহাকে দিয়া কতকগুলি বাংলা ছড়া আবৃত্তি করাইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে তাহাকে ইহা স্পর্শ করাইয়া দেন। সেই নারীকে তাহার স্বামীর সঙ্গে নিরাহারে ও অনিদ্রায় পরদিন মুক্তা বিসর্জন পর্যন্ত মুক্তামণ্ডপে বসিয়া থাকিতে হয়। ডোম পণ্ডিত ভিন্ন অপর কেহ মুক্তামণ্ডপে প্রবেশ করিতে পারে না। এমন কি, ব্রাহ্মণ পুরোহিতও নয়। ডোম পুরোহিত সর্বদা মণ্ডপ বন্ধ করিয়া থাকেন।

পূর্ণিমার দিন প্রত্যূষ হইতেই ভক্ত্যাগণ ধর্মের নাম করিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে থাকে। পূর্ণিমার দিন সকাল বেলা বাণ বা লৌহ শলাকা ও পাট পূজা করা হয়। এই সকল লৌহশলাকা দ্বারা ভক্ত্যাগণ জিহ্বা ফুঁড়িয়া থাকে —পাটের উপর

লৌহশলাকা পুঁতিয়া তাহার উপর শয়ন করে। সেইদিনই ভক্ত্যাগণ আর একটি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তাহার নাম 'নবখণ্ডসেবা'। ধর্মমঙ্গল গানে যে কাহিনী গীত হয়, তাহার নায়ক লাউসেন হাকন্দ নামক পুকুরের তীরে নয় খণ্ডে দেহ খণ্ডিত করিয়া ধর্মের পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়, ভক্ত্যাগণ সেই ক্রিয়ার অভিনয় মাত্র করিয়া থাকে, ইহাকেই 'নবখণ্ডসেবা' বলে। পূজামণ্ডপের মধ্যেই ধর্মঠাকুরের সম্মুখে একটি চতুষ্কোণ কূপ খনন করিয়া রাখা হয়, ইহাই হাকন্দ পুকুর। ভক্ত্যোরা স্নান করিয়া শালবাণ, বাণ, জিহ্বাবাণ, ঝাঁপকাঁটা, সূচীমুখ, খড়্গ, অর্ধচন্দ্র, ক্ষুরধার ইত্যাদি লৌহনির্মিত অস্ত্র লইয়া মণ্ডপে উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ইহাদের যথারীতি পূজা করিয়া দেন। তখন যে সকল ভক্ত্যা 'নবখণ্ডসেবা' করিবে তাহারা মন্ত্রপাঠ কবিয়া দেহের নয়টি স্থানে বাণ বা লৌহশলাকা বিদ্ধ করে। যে সকল ভক্ত্যা নয়টি লৌহশলাকা বিদ্ধ করিতে না পারে, তাহারা কেবলমাত্র জিহ্বাবাণ দ্বারা জিহ্বা বিদ্ধ করিয়া থাকে। ভক্ত্যাগণ তখন লাল রঙের পুষ্পমাল্য গলায় ধারণ করিয়া থাকে। যে সকল ভক্ত্যা দেহের নয় জায়গায় লৌহশলাকা বিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা হাকন্দ পুকুরের মধ্যে উপবেশন করে, পুকুরের চারিধারে চারিটি ঘাট থাকে, চারি ঘাটে চারিটি ভক্ত্যা ও ইহার চারিধারে অন্যান্য ভক্ত্যাগণ শুইয়া থাকে। নবখণ্ডসেবীদিগের দুই ধারে দুইটি ধারাল খড়্গ রাখা হয়, তারপর পুকুরের উপরিভাগ কলার পাতা দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়, ভক্ত্যাদিগের মাথাগুলি কেবল উপরের দিকে বাহির হইয়া থাকে। কেহ ঘৃতের প্রদীপ জ্বালাইয়া নবখণ্ডসেবীর মাথার উপর বসাইয়া দেয়. চিত্রটিকে একটি বাস্তব রূপ দিবার জন্য কেহ আলতা গুলিয়া ভক্ত্যাদিগের গায়ের উপর ছড়াইয়া দেয়। ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক লাউসেন যখন নবখণ্ডে দেহ কাটিয়া ধর্মকে পূজা করিয়াছিলেন, তখন এক বাটুয়া কুকুর সেই দেহখণ্ডগুলি পাহারা দিয়া রক্ষা করিয়াছিল। এখানেও কেহ কালো কম্বল গায়ে দিয়া বাটুয়া কুকুর সাজিয়া ঘেউ ঘেউ শব্দ করিতে থাকে। সেই সময় ধর্মমঙ্গল গানের গায়কদল আসর হইতে নামিয়া এই কৃত্রিম পুকুরের ধারে ভক্ত্যাদিগের নিকটে আসে, সেখানে আসিয়া লাউসেনেব নবখণ্ডসেবার কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার পুনর্জীবন লাভ ও পশ্চিমদিকে সূর্যোদয়েব বৃত্তান্ত পর্যন্ত গান করে। গান শেষ হইলে সকল ভক্ত্যাই সেখান হইতে উঠিয়া কয়েকবার মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া ধর্মঠাকুরের আসনের নিকট গিয়া তাহাদের গা হইতে লৌহশলাকাগুলি খুলিয়া দেয়।

লুয়ে পাঠার মুণ্ড রাখিবার জন্য একটি বড় মাটির হাঁড়ি সংগৃহীত হয়। হাঁড়ির একটি ঢাকনাও থাকে। হাঁড়ির গায়ে কিছু মন্ত্র লিখিয়া দেওয়া হয়। হাঁড়িটি একটি পুরু হলুদবর্ণের নূতন বস্ত্র দিয়া ঢাকিয়া ভিতরে রক্তপুষ্প ও পঞ্চফুল দিয়া একটি তণ্ডুলপূর্ণ কুলার উপর বসাইয়া রাখা হয়। একটি হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্রে পাঁচটি ফল বাঁধিয়া তাহা হাঁড়ির গলায় বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তারপর ব্রাহ্মণ ও ডোম পুরোহিত ভক্ত্যা ও লুয়া ছাগটি সহ বিবিধ পূজোপকরণ লইয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে একটি নির্দিষ্ট পুকুরে বা নদীতে যায়। সেখানে স্নানপূজা সম্পন্ন করে, লুয়া ছাগটিকেও স্নান করান হয়। তারপর পূজোপকরণাদি সঙ্গে

করিয়া লইয়া সকলে মহাসমারোহে বাদ্যভাণ্ড সহকারে মণ্ডপে ফিরিয়া আসে।

ব্রাহ্মণ পুরোহিত কর্তৃক এইবার ধর্মঠাকুরের নিকট লুয়া ছাগকে উৎসর্গ করা হয়, ইহার সঙ্গে আর একটি ছাগও উৎসর্গীকৃত হয়—তাহার নাম কোল-লুয়া। ডোম পুরোহিত ছাগের জন্ম সম্বন্ধে একটি বাংলা ছড়া আবৃত্তি করিয়া থাকে। এইবার কর্মকারজাতীয় বলিকর লুয়ার মস্তক ছেদন করে—হাঁড়িকাঠে যথারীতি লুয়া বলি হয় না, ইহার বলিদানের বিধি একটু বিচিত্র। লুয়া ফুল বেলপাতা খাইতে থাকে, বলিকর সেই অবস্থায় এক কোপে ইহার মস্তক দেহচ্যুত করে। যদি ইহাতে কোন বিঘ্ন হয়, অর্থাৎ এক কোপে মস্তক দ্বিখণ্ডিত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, পূজার কোন অঙ্গহানির জন্য দেবতা বলি গ্রহণ করেন নাই, সেইজন্য পুনরায় বলির ব্যবস্থা করিতে হয়। দ্বিতীয় ছাগ বা কোল-লুয়ারও এই ভাবেই বলি হয়। ডোম পুরোহিত তখন 'দিক ডাক' ও 'কাটা মনুই' নামক ছড়া আবৃত্তি করিয়া থাকেন। লুয়ার মস্তক ছিন্ন হইবামাত্র তাহা পূর্বোল্লিখিত হাঁড়ির মধ্যে স্থাপন করা হয়। হাঁড়ির মুখ সরা দিয়া ঢাকিয়া, একটু ফাঁক রাখিয়া ময়দার আঠা দিয়া তাহা জুড়িয়া দিতে হয়। একটি ঘৃতের প্রদীপ হাঁড়ির উপর বসাইয়া দেওয়া হয়। তারপর হাঁড়িতে কামিন্যাদেবীর পূজা হয়। কোল-লুয়ার মুণ্ড ও রক্ত যথারীতি ধর্মঠাকুরের নামে স্বতন্ত্রভাবে লইয়া নিবেদন করা হয়।

যে বন্ধ্যা নারী পুত্র কামনা করিয়া লুয়ার হাঁড়ি ধারণ করে, তাহাকে ডোম বা পুরোহিত মন্ত্রাদি বলিয়া দিলে সে হাঁড়িটি কোলে লইয়া বসে—উপবাসী থাকিয়া সারারাত্রি জাগিয়া হাঁড়ি ধরিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। হাঁড়ির মুখের ফাঁক দিয়া সেই মুণ্ডের উদ্দেশ্যে বারবার দুধ ঢালিয়া দেওয়া হয়—ইতিপূর্বেই মন্ত্রদ্বারা লুয়ার মুণ্ডে প্রাণসঞ্চার করা হইয়া থাকে এবং মুণ্ডটিকে নবজাত শিশু সন্তানের মত গণ্য করা হয়। তারপর লুয়ার রক্তের সঙ্গে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ব্রাহ্মণ পুরোহিত পূর্ণহোম করিয়া থাকে। তারপর ডোম পুরোহিত মুক্তিমণ্ডপের মধ্যে মুক্তি বা মুক্তা ও ধর্মের পূজা করিয়া থাকে। তারপর ভক্ত্যাগণ সহ পূজার অন্যান্য উদ্যোক্তারা মুক্তিদর্শনের জন্য মুক্তিমণ্ডপে যায়। ডোম পুরোহিত মুক্তিমণ্ডপের দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিয়াই কতকগুলি ছড়া বলে; ছড়াগুলির বিষয়-বস্তু 'দ্বারমুক্তি', 'দ্বারভেট' ও 'বৈতরণী'। ছড়া পাঠ হইয়া গেলে সকলে মুক্তিগৃহে প্রবেশ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়া মুক্তির পূজা করিয়া ধর্মপাদপদ্ম ও মুক্তিমণ্ডপ দর্শন করে। সাধারণ লোকও দর্শনী দিয়া মুক্তিমণ্ডপ দর্শন করিতে পারে। ইহার পর ভক্ত্যোরা ঝাঁপকাঁটার উপর শয়ন, কন্টকের উপর শয়ন ইত্যাদি 'সেবা' করিয়া থাকে। ইতিপূর্বে ডোম পুরোহিত ঝাঁপকাঁটা ও কন্টকের পূজা করিয়া দেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাত্রির পূজা সম্পূর্ণ করিয়া দিলে ডোম পণ্ডিত লুয়ার হাঁড়িতে ও মুক্তিমণ্ডপে চারি প্রহরে চারিবার পূজা করে। তারপর অর্থাৎ পূর্ণিমার পরের দিন বিসর্জনের পালা। ইহার মধ্যে মুক্তিঘট বিসর্জন এবং লুয়ার হাঁড়ি বিসর্জনই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চিত্রিত মুক্তিমণ্ডলের উপর একটি জীবন্ত হাঁস বা পায়রা ছাড়িয়া দেওয়া হয়, কোন কোন স্থলে একটি জীবন্ত মাগুর মাছও (clarias Batrachus) মুক্তিমণ্ডলের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহার ছুটাছুটিতে মুক্তিমণ্ডল ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া

বিশ্বাস করা হয়, তারপর ডোম পুরোহিত মুক্তি বিসর্জনের কতকগুলি ছড়া আবৃত্তি করেন—ইহাতেই মন্ত্র দ্বারা মুক্তিঘটের বিসর্জন হয়, পরে সেই দিনই সেই ঘট পুকুরে লইয়া বিসর্জন দেওয়া হয়।

এইবার লুয়ের হাঁড়িটি বিসর্জনের কথা বলিতে হয়। যে নারী সারা রাত্র লুয়ের হাঁড়িটি কোলে করিয়া বসিয়া থাকে, সে হাঁড়িটি এইবার মাথায় লইয়া সকলের সঙ্গে বাদ্যভাণ্ড সহ পুকুরঘাটের দিকে অগ্রসর হয়। আরও যে সকল জিনিস বিসর্জন দিবার কথা, যেমন মুক্তিঘট, পঞ্চঘট ইত্যাদি, পুরোহিত ও ভক্ত্যাগণ তাহাও সঙ্গে লইয়া তাহার পিছন পিছন যায়। পুকুরের তীরে জলের একেবারে সংলগ্ন হাঁড়িটিকে মাটিতে নামাইয়া রাখা হয়। এইবার ডোম পুরোহিত সংক্ষেপে সমগ্র ধর্মমঙ্গলের কাহিনীটি ছড়ার আকারে আবৃত্তি করেন, লুয়ার হাঁড়ি ধারনকারিনী নারী তাঁহার স্বামিসহ পূর্বদিকে মুখ করিয়া বসে এবং হাঁড়ির মুখের ঢাকনাটি খুলিয়া ফেলে। তারপর সেই হাঁড়িটি মাটির ঢেলা দিয়া পূর্ণ করে, লুয়ের মুণ্ডটি যাহাতে মাটির নীচে ঢাকা পড়িয়া না যায় সেইদিকে দৃষ্টি রাখা হয়। মাটিতে হাঁড়িটি ওজনে খুব ভারি হয়। একটি প্রদীপ পূর্ব হইতেই জ্বালাইয়া সঙ্গে লইয়া আসা হয়, তাহা ধীরে ধীরে হাঁড়ির মধ্যে নামাইয়া লুয়ার মুণ্ডের উপর রাখিয়া দেওয়া হয়। তারপর জ্বলন্ত প্রদীপটি ভিতরে রাখিয়াই হাঁড়ির মুখটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সন্তানকামী এই নারী ও তাহার স্বামীকে সর্বক্ষণ পূর্বদিকে মুখ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। ভক্ত্যাগণ ইতিপূর্বেই জলে নামিয়া একটি খুঁটি পুঁতিয়া রাখে; বন্ধ্যা নারী লুয়ার হাঁড়িটি মাথায় লইয়া সেই খুঁটিটি পর্যন্ত যায় এবং হাঁড়িটি মাথায় লইয়া ডুব দিয়াই হাঁড়িটি ছাড়িয়া দেয়। মাটির ভারে হাঁড়িটি জলের নীচে তলাইয়া যায়। তারপর স্নানাদি সারিয়া সকলে মণ্ডপে ফিরিয়া আসে। মন্দিরে ফিরিয়া পরবর্তী 'ঘরভরা' উৎসবের জন্য আর একটি লুয়ে ছাগ উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, ইহার সামনের দিকের খুরে একটি লোহার বেড়ী পরাইয়া দেওয়া হয়, ইহা দেখিয়াই সকলে ইহাকে চিনিতে পারে—কেহ ইহার অনিষ্ট করিতে সাহস পায় না।

ইহার পর ডোম পুরোহিত ছড়া বলিয়া ভক্ত্যাগণের উত্তরীয় ছাড়াইয়া দেন। সেইদিন লুয়ার মাংস রন্ধন করিয়া ধর্মঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হয়। ইহাতেই ভক্ত্যাগণ পারণা করিয়া থাকেন। সেইদিন ধর্মমঙ্গলের শেষ পালা গীত হয়।

ধর্মমঙ্গল গান 'ঘরভরা' অনুষ্ঠানের অন্তর্নিবিষ্ট একটি আচার। 'ঘরভরা' অনুষ্ঠান ব্যতীত ধর্মপূজার যে নিত্য ও বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহাতে সাধারণত ধর্মমঙ্গল গান হয় না। তবে ধর্মপূজার বাৎসরিক অনুষ্ঠানে যে দিন সমারোহপূর্ণ উৎসব হইত, তখন, শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথি হইতে পূর্ণিমার পরের দিন এক বেলা পর্যন্ত ধর্মমঙ্গল গান হইত বলিয়া জানিতে পারা যায়। নিত্যপূজায় ধর্মমঙ্গল গান হইত না। কিন্তু যদি কাহারও মানসিক থাকিত, তবে যাহার গৃহে ধর্মঠাকুরের নিত্যপূজা হইত, তাহার গৃহেও ধর্মমঙ্গল গান শুনিতে পাওয়া যাইত। বরিশাল জেলায় মনসামঙ্গল সম্পর্কিত রয়াণী গান

যেমন সাত দিনে, পাঁচ দিনে কিংবা আড়াই দিনেও গাহিবার ব্যবস্থা ছিল; ধর্মমঙ্গল গান সম্পর্কে সে রকম কোনও রীতি প্রচলিত ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায় না। ইহার সংক্ষিপ্ত কোনও রূপের পরিচয় পাওয়া যায় না।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী

ধর্মমঙ্গল গানের যে কাহিনীটি 'ঘরভরা' অনুষ্ঠানের বার দিনে চব্বিশ পালায় গীত হয়, তাহা এখানে বর্ণনা করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি। সেইজন্য তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইল—

গৌড়ে ধর্মপাল নামক একজন বিখ্যাত সম্রাট্ ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গৌড়ের সম্রাট্ হন। গৌড়েশ্বরের একজন মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার নাম মহামদ—তিনি সম্পর্কে গৌড়েশ্বরের শ্যালক। একদিন গৌড়েশ্বর হস্তীতে আরোহণ করিয়া শিকার করিতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, তাঁহার একজন অত্যন্ত অনুগত প্রজা সোম ঘোষ তাঁহারই মন্ত্রীর চক্রান্তে কারারুদ্ধ হইয়া বন্দিজীবন যাপন করিতেছেন। তিনি মন্ত্রীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, মন্ত্রী ইহার কোন সন্তোষজনক কারন দেখাইতে পারিলেন না গৌড়েশ্বর ইহাতে মন্ত্রীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রচুর ভর্ৎসনা করিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া সোম ঘোষের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। রাঢ়ে অজয় নদের তীরে ত্রিষষ্টীর গড়ে তাঁহার একজন সামন্ত রাজা বাস করিতেন, তাঁহার নাম কর্ণসেন, সেই কর্ণসেনের উপর তাঁহাকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া অচিরে তাঁহাকে সেখানে পাঠাইয়া দিলেন। সোম ঘোষের একটি শিশুপুত্র ছিল, তাহার নাম ইছাই। তিনি তাহাকে লইয়া ত্রিষষ্টীর গড়ে চলিয়া গেলেন। গৌড়েশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়কে কর্ণসেন পরম সমাদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। কালক্রমে সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ অত্যন্ত দুর্দান্ত হইয়া উঠিল। সে একদিন অকস্মাৎ কর্ণসেনের প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া গড় হইতে তাড়াইয়া দিল, কর্ণসেন সপরিবারে গৌড়ে পলাইয়া গেলেন, ইছাই নূতন গড় নির্মাণ করিয়া তাহার নাম রাখিল ঢেকুর। গৌড় হইতে যখন রাজকর আদায় করিতে আসিল, তখন গৌড়রাজের কর্মচারীকে ইছাই অপমান করিয়া দূর করিয়া দিল। গৌড়েশ্বর মনে করিলেন, ইহার জন্য ইছাইকে সমুচিত দণ্ড দিবেন। তিনি নয় লক্ষ সৈন্য লইয়া ঢেকুর আক্রমণ করিলেন, কিন্তু অজয় নদের বন্যায় তাঁহার বহু সৈন্য বিনষ্ট হইল, অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া তিনি কোন মনে গৌড়ে ফিরিয়া আসিলেন। ইহাতে কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হইল, ছয় পুত্রবধূ তাহাদের সঙ্গে সহমরণে গেল, শোকে দুঃখে রাণী আত্মঘাতিনী হইলেন, এই আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া কর্ণসেন পাগল হইয়া গেলেন।

কর্ণসেনের অবস্থা দেখিয়া গৌড়েশ্বরের বড় দয়া হইল। তিনি পুনরায় তাঁহাকে সংসারী হইবার জন্য পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কর্ণসেন কোন কথাই কানে তুলিলেন না। গৌড়েশ্বরের এক কুমারী শ্যালিকা ছিল, তাহার নাম রঞ্জাবতী। গৌড়েশ্বর মনে করিলেন, তাহার সঙ্গে

কর্ণসেনের বিবাহ দিয়া পুনরায় তাহাকে সংসারধর্মে আসক্ত করিবেন। কিন্তু এই বিবাহের একটি গুরুতর অন্তরায় ছিল। রঞ্জা রাজমন্ত্রী মহামদের অত্যন্ত প্রিয় ভগ্নী ছিল, মহামদ কিছুতেই তাহাকে বৃদ্ধের সহিত বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইবেন না, গৌড়েশ্বর ইহা জানিতেন। সেইজন্য গৌড়েশ্বর তাঁহার রাণীর সঙ্গে যুক্তি করিয়া এক কৌশল অবলম্বন করিলেন, তিনি কোন রাজকার্য উপলক্ষ করিয়া মন্ত্রী মহামদকে কামরূপ পাঠাইয়া দিলেন। এই সুযোগে কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিবাহ দিয়া তাঁহাদিগকে বহু দূর দক্ষিণে ময়নানগরের সামন্তরাজ নিযুক্ত করিয়া সেখানে পাঠাইয়া দিলেন। মহামদ বিবাহের কথা জানিতেও পারিলেন না। কামরূপ হইতে ফিরিয়া মহামদ এই বিবাহের কথা শুনিলেন। রাজা কৌশল করিয়া তাঁহার একমাত্র ভগ্নীকে এক বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া রাজার উপরই তাঁহার ক্রোধ হইল—কিন্তু রাজাকে তিনি এ'জন্য কিছুই বলিতে পারিলেন না, সেই ক্রোধ গিয়া তাঁহার ভগিনীপতি কর্ণসেনের উপর পড়িল; তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, জীবনে এই বৃদ্ধের মুখদর্শন করিবেন না, সঙ্গে সঙ্গে ভগ্নীর সঙ্গেও তাঁহার সকল সম্পর্ক ঘুচাইয়া দিবেন।

বহুদিন যাবৎ রঞ্জাবতী মাতাপিতার কোন সংবাদ পাইতেছিলেন না, সেইজন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, বিশেষত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুপস্থিতিতে তাঁহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এই অবস্থায় তিনিই বা গৃহে ফিরিয়া কি বলিয়াছেন, তাহাও জানিবার জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠার অবধি রহিল না। রঞ্জাবতী স্বামীকে গৌড়ে যাইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বিনা আমন্ত্রণে তিনি যাইতে চাহিলেন না। অবশেষে রঞ্জাবতী কাতর অনুনয় উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তিনি গৌড় যাত্রা করিলেন। তিনি গৌড়ের রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, মহামদ প্রকাশ্য রাজসভায় তাঁহাকে আঁটকুড়া ও তাঁহার পত্নীকে বন্ধ্যা বলিয়া নিন্দা করিলেন, গৌড়েশ্বর ইহার কোন প্রতিবাদ করিলেন না। অপমান ও লজ্জা মাথায় লইয়া তিনি নিজের রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। রঞ্জাবতী সকল কথা শুনিয়া স্বামীর এই নিদারুণ অপমানের জন্য অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন; তিনিও প্রতিজ্ঞা করিলেন, এমন ভ্রাতার কথা আর মনে স্থান দিবেন না। তখন হইতে তিনি বন্ধ্যা অপবাদ ঘুচাইবার জন্য নানাপ্রকার তুকতাক ঔষধ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। একদিন ধর্মঠাকুরের পুরোহিত রমাই পণ্ডিত ধর্মের গাজন লইয়া সেই নগরে প্রবেশ করিলেন। রমাই পণ্ডিতকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিলেন, ধর্মঠাকুরের পূজা করিলে পুত্রলাভ হয়। শুনিয়া রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের পূজা করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি নগরে ধর্মের মন্দির নির্মাণ করিয়া দিলেন এবং বিবিধ উপায়ে ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তিনি পুত্রলাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি ধর্ম পুরোহিত রমাই পণ্ডিতের শরণাপন্ন হইলেন। রমাই বলিলেন, 'ধর্মঠাকুরের পূজা করিতে যদি তুমি শালে ভর দিতে পার, তবে অবশ্যই তুমি পুত্রলাভ করিবে।' শালে ভর দিবার অর্থ লৌহশলাকার উপর ঝাঁপাইয়া পড়া। রঞ্জাবতী তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু কর্ণসেন তাঁহাকে এই দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপন করিতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। রঞ্জাবতী সে কথা শুনিলেন না। অবশেষে কর্ণসেন আর বাধা দিতে পারিলেন না,

শালে ভর দিয়া তাঁহার ধর্মপূজা করিবার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন। রঞ্জাবতী পূজার দ্রব্যসামগ্রী লইয়া চাঁপাই নদীর তীরে আসিয়া ধর্মঠাকুরের পূজা করিলেন, পূজা-শেষে লৌহশলাকায় ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া তাহাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার নিষ্ঠা ও ভক্তি দেখিয়া ধর্মঠাকুরের দয়া হইল, তিনি সশরীরে আবির্ভূত হইয়া রঞ্জাবতীর প্রাণদান করিয়া পুত্রবর দিয়া গেলেন। যথাসময়ে রঞ্জাবতীর এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল—তাহার নাম লাউসেন। শৈশবেই লাউসেনের আর একটি খেলার দোসর জুটিল, তাহার নাম কর্পূরসেন। দুই পুত্র লইয়া রঞ্জাবতীর জীবন সুখে কাটিতে লাগিল। যথাসময়ে লাউসেন ও কর্পূর মল্লবিদ্যা শিক্ষা করিলেন। ধর্মঠাকুরের কৃপায় অল্পদিনেই তাঁহারা মল্লবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন, বড় বড় মল্লবীরকে বাহুবলে পরাজিত করিতে লাগিলেন। মাতাপিতার শিক্ষার গুণে ও ধর্মঠাকুরের আশীর্বাদে লাউসেন আদর্শ-চরিত্র যুবক হইয়া উঠিলেন। লাউসেন কর্পূরকে সঙ্গে লইয়া গৌড়ে গিয়া তাঁহাদের মেসো-মহাশয় গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। বৃদ্ধ রাজা কর্ণসেন ও রাণী রঞ্জাবতী ইহাতে বড় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন—কিন্তু লাউসেন ইহাতে কর্ণপাত করিলেন না। বাধ্য হইয়া অবশেষে মাতাপিতাকে সম্মতি দান করিতে হইল। শুভদিন দেখিয়া লাউসেন ও কর্পূর গৌড়ের পথে যাত্রা করিলেন। গৌড়ের পথে লাউসেন একটি দুর্দান্ত ব্যাঘ্র ও একটি নরমাংসখাদক কুম্ভীরকে বধ করিলেন। পথের বিপদ এখানেই শেষ হইল না। জামতী নামক স্থানে একটি কুচরিত্রা নারী লাউসেনকে বিপন্ন করিবার জন্য চক্রান্ত করিল, কিন্তু তাহার চক্রান্ত ব্যর্থ হইল। তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া লাউসেন ও কর্পূর গোলাহাটে প্রবেশ করিলেন; গোলাহাট স্ত্রীরাজ্য, তাহার রানীর নাম সুরীক্ষা। সুরীক্ষা কতকগুলি হেঁয়ালী জিজ্ঞাসা করিয়া লাউসেনকে বন্দী করিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইল, কিন্তু তিনি সকল হেঁয়ালীরই সন্তোষজনক উত্তর দিয়া তাহার হাত হইতেও নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। রাজমন্ত্রী মহামদ ভাগিনেয়ের আগমনের সংবাদ পূর্ব হইতে সংগ্রহ করিলেন এবং তাঁহাকে নানাভাবে বিপন্ন করিবার জন্য চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। মহামদ লাউসেন ও কর্পূরকে চোর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য নগরে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, কাহারও গৃহে যদি কোন প্রবাসী ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। লাউসেন ও কর্পূর এক তাম্বুলীর গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন—লাউসেন তাহাকে নিরাপদ করিবার জন্য তাহার গৃহ ত্যাগ করিয়া এক বৃক্ষতলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মহামদের নির্দেশে রাজার পাটহস্তী লইয়া তাঁহার শিয়রে বাঁধিয়া রাখা হইল। তারপর তাঁহাকে হাতী-চোর বলিয়া ধরিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল। লাউসেন রাজার সম্মুখে নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিলেন, রাজা তাঁহার পরিচয় পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। অবশেষে নিজের অশ্বশালা হইতে সর্বোত্তম অশ্বটি তাঁহাকে দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। বিবিধ রাজপ্রদত্ত সম্মানে ভূষিত হইয়া লাউসেন ও কর্পূর স্বদেশের পথে যাত্রা করিলেন। পথ হইতেই তের জন ডোমকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার রাজ্যে লইয়া গেলেন, তাহাদের মধ্যে যে প্রধান তাহার নাম কালু। কালু

ডোমকে লাউসেন নিজের সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ডোমগণ পরম ভক্তির সঙ্গে লাউসেন ও তাহার পরিবারস্থ সকলের সেবা করিতে লাগিল। রাজমন্ত্রী মহামদ লাউসেনকে অপদস্থ করিবার জন্য নূতন নূতন উপায় সন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কামরূপের রাজা ইতিমধ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন, লাউসেনকে তাঁহার বিরুদ্ধে পাঠাইবার জন্য মহামদ গৌড়েশ্বরকে পরামর্শ দিলেন। গৌড়েশ্বর নিতান্ত ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ, মন্ত্রী তাঁহাকে যখন যাহা করিতে বলেন, তিনি তখন তাহাই করেন। তিনি লাউসেনকে আসিয়া কামরূপ আক্রমণ করিবার জন্য পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। লাউসেন তাঁহার সেনাপতি কালু ডোমকে সঙ্গে করিয়া গৌড় যাত্রা করিলেন. গৌড় হইতে সৈন্য লইয়া কামরূপরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। লাউসেন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নদীর জল কানায় কানায় পূর্ণ—নদী পার হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। অবশেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে, গৌড়েশ্বরের মাতার নিকট একটি কাটারি ও একটি জপমালা আছে—কাটারির স্পর্শে ব্রহ্মপুত্রের জল শুকাইয়া যায় এবং জপমালার সাহায্যে সহজেই কামরূপ অধিকার করা যায়। লাউসেন গৌড়েশ্বরের মাতার নিকট হইতে কাটারি ও জপমালা চাহিয়া আনিয়া-কাটারির সাহায্যে ব্রহ্মপুত্র অতি সহজেই অতিক্রম করিলেন এবং জপমালার সাহায্যে কামরূপের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে মন্দির হইতে দূর করিয়া দিয়া সহজেই কামরূপ অধিকার করিলেন। কামরূপের রাজা লাউসেনের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পরমাসুন্দরী কন্যা কলিঙ্গাকে তাঁহার সঙ্গে বিবাহ দিলেন। লাউসেন বিজয়-গৌরবে গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। গৌড় হইতে গৃহে ফিরিবার পথে মঙ্গলকোটের রাজা গজপতির কন্যা অমলাকে বিবাহ করিয়া তিনি সঙ্গে লইয়া গেলেন। বর্ধমানের রাজাও তাঁহার কন্যা বিমলাকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করিলেন। মাতাপিতা তাঁহাদিগকে পরম আহ্লাদের সহিত বরণ করিয়া লইলেন।

সিমুলার রাজা হরিপালের কন্যা কানড়ার রূপযৌবনে মুগ্ধ হইয়া গৌড়েশ্বর বৃদ্ধ বয়সে তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। হরিপালের নিকট ঘটক প্রেরিত হইল। হরিপাল বিবাহে সম্মতি দিলেন, কিন্তু কানড়া তাহাতে আপত্তি করিলেন এবং গৌড়েশ্বরের ঘটককে অপমানিত করিয়া দূর করিয়া দিলেন। গৌড়েশ্বর এই অবমাননায় ক্রুদ্ধ হইয়া নয় লক্ষ সৈন্য লইয়া সিমুলায় উপস্থিত হইলেন। কানড়া গৌড়েশ্বরকে একটি লৌহনির্মিত গণ্ডার দিয়া বলিলেন, যে ইহা এক আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিতে পারিবে, তিনি তাহাকে বিবাহ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। বৃদ্ধ রাজা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া লৌহগণ্ডারের গায়ে একটু আঁচড়ও ফুটাইতে পারিলেন না। রাজমন্ত্রী মহামদের পরামর্শে গৌড়েশ্বর লাউসেনকে ডাকাইয়া আনিলেন। লাউসেন অনায়াসেই গণ্ডার দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। কানড়া লাউসেনকে স্বামিরূপে বরণ করিতে চাহিলেন, ইহাতে গৌড়েশ্বর লাউসেনের উপর অপ্রসন্ন হইলেন। অবশেষে লাউসেনের সঙ্গে কানড়ার এই চুক্তিতে যুদ্ধ হইল যে, লাউসেন যদি কানড়ার হস্তে পরাজিত হন, তবে কানড়াকে বিবাহ করিবেন। যুদ্ধে লাউসেন কানড়ার হস্তে

পরাজিত হইয়া তাহাকে নিজেই বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন। গৌড়েশ্বর বিফলকাম হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। লাউসেন কানড়াকে সঙ্গে লইয়া নিজের রাজধানী ময়না নগরে ফিরিয়া আসিলেন।

মহামদ এইভাবে বার বার চেষ্টা করিয়াও যখন লাউসেনের কোন ক্ষতি করিতে পারিলেন না, তখন আবার এক নূতন ফন্দি বাহির করিলেন। তিনি গৌড়েশ্বরকে পরামর্শ দিলেন যে ঢেকুর গড়ে ইছাই গোয়ালা বহুদিন যাবৎ স্বাধীনভাবে বাস করিতেছে—গৌড়ে রাজকর পাঠাইতেছে না; অতএব লাউসেনকে তাহার বিরুদ্ধে পাঠাইয়া তাহাকে দিয়া গৌড়ের রাজকর আদায় করা হউক। গৌড়েশ্বর ভাবিলেন, এ অতি উত্তম প্রস্তাব; তিনি অবিলম্বে লাউসেনকে গৌড়ে আসিতে পত্র লিখিলেন। রঞ্জাবতী ও কর্ণসেন এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন; কারণ, ঢেকুরেই কর্ণসেন একদিন ইছাই গোয়ালার হাতে পরাজিত হইয়া ছয় পুত্র হারাইয়া পথের ভিক্ষুক হইয়াছিলেন। লাউসেন সকলের আপত্তি উপেক্ষা করিয়া গৌড়েশ্বরের অনুমতি লইয়া নয় লক্ষ সৈন্যসহ অজয় নদের অপর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে ইছাইর সেনাপতি লোহাটা বজ্জরের সঙ্গে তাঁহাদের তুমুল সংগ্রাম হইল। লোহাটা পরাজিত হইল, লাউসেন লোহাটার ছিন্ন মস্তক গৌড়েশ্বরের নিকট উপহার পাঠাইলেন। মহামদ এই মুণ্ড দ্বারা লাউসেনের একটি মায়ামুণ্ড প্রস্তুত করিয়া ময়না নগরে পাঠাইলেন। মায়ামুণ্ড দেখিয়া লাউসেনের বৃদ্ধ মাতাপিতা পুত্রশোকে কাতর হইয়া পড়িলেন এবং লাউসেনের চারিজন স্ত্রী স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ধর্মঠাকুর তাহা জানিতে পারিয়া হনুমানকে ছদ্মবেশে সেখানে পাঠাইয়া প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন। প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া সকলে নিশ্চিন্ত হইলেন। ইছাই ঘোষের সঙ্গে লাউসেনের তুমুল যুদ্ধ হইল। দুইজনই দুইজনের সমকক্ষ বীর। লাউসেন ধর্মঠাকুরের অনুগৃহীত, আর ইছাই পার্বতীর আশ্রিত। অতএব এখানে মানুষ উপলক্ষ মাত্র, প্রকৃত যুদ্ধ দেবতাদিগের মধ্যে—একদিকে ধর্মঠাকুর লাউসেনকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট হইয়া আছেন, অপর দিকে পার্বতীও তাঁহার ভক্ত ইছাই ঘোষকে রক্ষা করিতে তৎপর। অবশেষে লাউসেনই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। ইছাই অপূর্ব বিক্রম দেখাইয়াও তাঁহার হস্তে নিহত হইলেন। রাজমন্ত্রী মহামদ দেখিলেন, লাউসেন ধর্মঠাকুরের ভক্ত বলিয়া পরাক্রমশালী হইয়াছেন, অতএব তিনিও পরাক্রম লাভের জন্য ধর্মঠাকুরের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সকাম ভক্তিতে ধর্মঠাকুর বিরক্ত হইয়া তাঁহার পূজায় বিঘ্ন সৃষ্টি করিলেন—গৌড় নগরে অবিরাম বাদলের বর্ষণ আরম্ভ হইল, কিছুতেই তাহার নিবৃত্তি দেখা গেল না, সমস্ত নগর জলস্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বিপন্ন হইয়া গৌড়েশ্বর লাউসেনের শরণাপন্ন হইলেন। লাউসেন গৌড় রাজ্যের সমস্ত পাপ দূর করিবার জন্য ধর্মপূজার শ্রেষ্ঠ সাধনা পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় ঘটাইবার জন্য হাকন্দ নামক স্থানে গিয়া দুশ্চর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি ধর্মঠাকুরের নামে নিজের দেহ নয় খণ্ডে বিভক্ত করিয়া তাহা দ্বারা আহুতি দিলেন। যখন লাউসেন

ধর্মপূজার এই কঠিনতম সাধনায় নিমগ্ন, তখন তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া মহামদ ময়না নগর আক্রমণ করিলেন। কালু ডোমের পত্নী লখাই ডোমনীর সঙ্গে মহামদের তুমুল যুদ্ধ হইল। একা লখাই মহামদের বিপুল সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে সসৈন্যে নদীর তীর পর্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া আসিল। কালু ডোম নিজের সত্যরক্ষা করিবার জন্য বিশ্বাসঘাতকের হাতে নিজের প্রাণ বলি দিল। লাউসেনের অক্লান্ত সাধনায় তুষ্ট হইয়া ধর্মঠাকুর সূর্যদেবতাকে অমাবস্যার রাত্রে পশ্চিম দিকে উদিত হইবার জন্য আদেশ দিলেন। রাজ্যের সকল অমঙ্গল দূর হইয়া গেল। লাউসেন সগৌরবে গৌড়েশ্বরের দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহামদ লাউসেনের পশ্চিমে সূর্যোদয়ের ব্যাপারকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য হরিহর নামক বাদ্যকরকে ঘুষ দিয়া বাধ্য করিয়া রাখিলেন। কিন্তু ধর্মভয়ে হরিহর সত্যকথা প্রকাশ করিয়া দিল। মহামদ প্রকাশ্য রাজসভায় চরম লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। এই সকল অপকর্মের জন্য মহামদের উপর ধর্মঠাকুর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহার সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ হইবার অভিশাপ দিলেন—দেখিতে দেখিতে কুষ্ঠব্যাধিতে তাঁহার সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। লাউসেন দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে রোগ হইতে আরোগ্য করিয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহার দুষ্কার্যের শাস্তিস্বরূপ তাঁহার মুখে একটি শ্বেতকুষ্ঠের চিহ্ন রাখিয়া দিলেন। ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচার করিয়া লাউসেন যথাকালে পুত্র চিত্রসেনকে রাজ্যভার দিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

ধর্মঠাকুরের পরিচয়

পশ্চিমবাংলার লৌকিক ধর্মবিষয়ক আলোচনায় ইহার সংলগ্ন অঞ্চল মানভূমের একটি বিশেষ স্থান আছে। একমাত্র পূর্ব দিক ব্যতীত মানভূমের আর সকল দিকই ছোটনাগপুরের আদিম জাতির বাসভূমির সহিত সংযুক্ত। এক সময়ে এই জেলার সমগ্র অঞ্চল জৈনধর্ম কর্তৃক বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল—ইহার লোক-সংস্কৃতিতে এখনও তাহার সুস্পষ্ট প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও সময় সময় বিচ্ছিন্নভাবে আসিয়া ইহাতে কিছু কিছু উচ্চশ্রেণীর হিন্দুও বসতি স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তথাপি ইহার অধিবাসীদিগের মধ্যে এখনও ব্যাপক আর্যেতর জাতির প্রভাব বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের আদিম অধিবাসীদের মত ইহাদের উপর হিন্দুপ্রভাব তত কার্যকরী হইতে পারে নাই। এই জেলার উত্তরাংশে সামান্য কিছু অঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র ধর্মঠাকুরের পূজা সর্বত্র প্রচলিত। কিন্তু পূজার প্রণালীর মধ্যে পূর্ব-বর্ণিত পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত প্রণালী হইতে পার্থক্য আছে; এই পার্থক্যটুকু বিশেষভাবে লক্ষ করিবার মত। বাঁকুড়া জেলার সংলগ্ন কোন কোন গ্রামে পশ্চিমবঙ্গের অনুরূপই ধর্মপূজার অনুষ্ঠান হইলেও, মানভূম জেলার একটু অভ্যন্তরেই ইহার ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত ঘুটিতোড়া গ্রামে নিম্নলিখিত উপায়ে ধর্মঠাকুরের পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

এই অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের পূজা দুই প্রকার—বাৎসরিক এবং মানসিক। বাৎসকির পূজা

বৈশাখী পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হয় না,—বৈশাখী পূর্ণিমার পরবর্তী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি বারোয়ারী ধর্মতলা আছে, সেখানে খড়ো চালের একটি 'মন্দির'ও আছে; কিন্তু মন্দিরে কোন ধর্মশিলা নাই। প্রতিবার বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে তিন মাইল দূরবর্তী আচকোদা গ্রামের এক ডোমের বাড়ি হইতে একটি ধর্মশিলা আনিয়া লওয়া হয়। নাপিত জাতীয় এক ব্যক্তি ধর্মশিলাটি মাথায় করিয়া লইয়া আসে,—পিছনে বাদ্যভাণ্ড বাজিতে থাকে। পুরুষানুক্রমিক নাপিত এই কার্য করিয়া আসিতেছে, সেইজন্য তাহার পরিবার গ্রামের পক্ষ হইতে বৃত্তি ভোগ করিয়া থাকে। রাঢ়ী শ্রেণীর একজন ব্রাহ্মণ পূজায় পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। পূর্বে চড়ক হইত বলিয়া শোনা যায়, এখন তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রতি বৎসর বাৎসরিক পূজায় তিন চারিজন ভক্ত্যা হয়, তাহারা পূজার সকল আনুষঙ্গিক কার্যে পুরোহিতকে সাহায্য করে, মূল ভক্ত্যা 'পাট' মাথায় লইয়া তাহা পুকুরঘাট হইতে স্নান করাইয়া আনে। পূজার পর দিনই নাপিত বাদ্যভাণ্ড সহকারে মাথায় করিয়া ধর্মশিলাটিকে ডোমের বাড়ি ফিরাইয়া দিয়া আসে।

মানসিক পূজায়ই বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। ব্যক্তিগত কিংবা পরিবারস্থ কাহারও কল্যাণ-কামনায় ধর্মপূজা মানসিক করা হইয়া থাকে। অভীষ্ট পূর্ণ হইলে পূজার ব্যবস্থা করা হয়। এই পূজা বৎসরের শুক্লপক্ষের যে কোন রবিবার অনুষ্ঠিত হইতে পারে, রবিবার ব্যতীত অন্য কোন দিন হইতে পারে না, পূজা অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে পূজা মানসিককারী ব্যক্তি দ্বাদশটি রবিবার ধর্মের নামে উপবাস পালন করিয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষ যে কেহ এইভাবে মানসিক করিয়া উপবাস পালন করিতে পারে, তবে স্ত্রী-মানসিককারিণীর সংখ্যাই সাধারণত অধিক হইয়া থাকে; দ্বাদশটি রবিবারে উপবাস পালন করার পর, ধর্মের যে পূজা হইয়া থাকে, তাহাতে একটি সাদা রঙের পাঁঠা বলি দেওয়া হয়; পশুবলি যাঁহাদের কৌলিক প্রথার বিরোধী, তাঁহারা উক্ত সাদা রঙের পাঁঠার ডান কানটি সামান্য মাত্র কাটিয়া ইহাকে ছাড়িয়া দেন।[১] পাঁঠাটি বলি দিবার একটি নির্দিষ্ট সময় আছে—পূর্বাকাশে যখন সূর্যোদয় হয় সেই মুহূর্তে পাঁঠাটি বলি দিতে হয়। বর্তমানে যদিও মানভূমে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণই এই পূজায় পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন, তথাপি এই উপলক্ষে একজন 'দেওঘরিয়া' ব্রাহ্মণকে আহ্বান করা হইয়া থাকে এবং তাঁহাকেও এই উপলক্ষে তাঁহার প্রাপ্য দান করা হয়। ইহাতে মনে হয়, উচ্চবর্ণ হিন্দুর গৃহে কিছুকাল পূর্বেও 'দেওঘরিয়া'-গণই পূজায় পৌরোহিত্য করিতেন। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, যেমন শুঁড়ি প্রভৃতির গৃহে এখনও নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণই পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। পূজায় যে সাদা রঙের পাঁঠাটি বলি দেওয়া হয়, পূজা মানসিক করিবার

১। দাক্ষিণাত্যের বেরিলি জেলাতেও 'people who did not approve of the slaughter of animals cut off the right ear of a goat of sheep and: after carrying it round the temple, offer it to the pujari.' (H. whitehead, op. cit. 75). কেবলমাত্র কানটি কাটিয়া লৌকিক দেবতার নামে পশু ছাড়িয়া দিবার রীতি উত্তর ভারতের অন্যত্রও প্রচলিত আছে। (দ্রষ্টব্য W. Crook, *The Tribes and Castes of the Western Provinces and Oudh*, London, 1896, p. 163).

সময়ই তাহার পায়ে একটি লোহার খাড়ু পরাইয়া ধর্মের নামে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, আর্থিক সুবিধাই ইহার একমাত্র কারণ। ইহার গায়ের রঙ ও পায়ের খাড়ু দেখিয়াই ইহাকে সহজেই চিনিতে পারা যায়—সেইজন্যই কেহ ইহার অনিষ্ট করিতে সাহস পায় না। মানভূমে প্রচলিত মানসিক ধর্মপূজার এই প্রণালী হইতে স্পষ্টই অনুভূত হইবে যে, ধর্মপূজা সূর্যপূজা ব্যতীত আর কিছুই নহে, কিন্তু ইহার বার্ষিক পূজার আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় না।

যদিও পশ্চিমবঙ্গের সংলগ্ন অঞ্চলেব উচ্চতর হিন্দু সমাজে ধর্মপূজা প্রচলিত আছে, তথাপি মানভূম জেলার অভ্যন্তরে অনেক অঞ্চলের উচ্চতর হিন্দু সমাজে ধর্মপূজার প্রচলন নাই। মানভূম জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে বহু রাঢ়ীয় ও কান্যকুব্জ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাস। বাঁকুড়া জেলার সংলগ্ন পুঞ্চা থানার অধীনস্থ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও ধর্মপূজা অপ্রচলিত—তাঁহারা মনে করেন যে, ধর্মঠাকুর নিম্নশ্রেণীর বিশেষত ডোম জাতির দেবতা,—তাঁহাদের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই অঞ্চলের উচ্চবর্ণের হিন্দু মহিলাগণ কোন কোন রবিবারে কিংবা ধর্মঠাকুরের বার্ষিক পূজার দিনে ধর্মের নামে উপবাস পালন করিয়া থাকেন। মানভূম জেলার চন্দনকেয়ারী থানার অন্তর্গত এক গ্রামের অধিবাসী এক কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ পরিবারের পুরুষগণ ধর্মপূজাকে ছোট জাতির ধর্মানুষ্ঠান বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন, কিন্তু সেই পরিবারেরই মহিলাগণ ধর্মের মানসিক করিয়া কোন কোন রবিবার তাঁহার নামে উপবাস পালন করিয়া থাকেন—পুরুষদিগের সহানুভূতির অভাবে বাড়িতে কোন পূজার অনুষ্ঠান হয় না।

মানভূম জেলার একমাত্র ধানবাদ মহকুমার উত্তরাংশ ব্যতীত আর সর্বত্রই নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে ধর্মপূজা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত আছে। বাউরী এবং ডোম জাতিই ধর্মের সর্বাপেক্ষা উৎসাহী ভক্ত। মানভূম জেলার ডোম জাতির মধ্যে দুইটি শ্রেণী আছে,—একটি মঘৈয়া বা তুরী, অপরটি বাঙ্গালী। ইহাদের জাতিগত পরিচয়ও বিভিন্ন—প্রথমোক্ত শ্রেণী উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের কোন অনার্যজাতির বংশধর; দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ বাঙ্গালী ডোম বাংলাদেশের অধিবাসী কোন আদিম জাতির শাখার সন্তান। মানভূমের অধিবাসী বাঙ্গালী ডোম বলিয়া পরিচিত সমাজই ধর্মের সর্বাপেক্ষা উৎসাহী সেবক, মঘৈয়া কিংবা তুরী ডোমদিগের সঙ্গে ধর্মপূজার কোন সম্পর্ক নাই। মানভূম জেলার প্রায় সর্বত্রই বাঙ্গালী ডোম বিক্ষিপ্ত ভাবে বাস করিয়া থাকে। তবে মহাল, ঝরিয়া, নোয়াগড়, কর্‌হা, কল্যাণপুর—এই অঞ্চলেই ইহাদের বসতি কিছু ঘন। মানভূমের বাঙ্গালী ডোমদিগের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, সেইজন্য ইহাদের সামাজিক অনুষ্ঠান স্বভাবতই নিতান্ত দারিদ্র্যব্যঞ্জক; অতএব ধর্মপূজারও কোন সুপরিণত প্রথা ইহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। সাধারণত বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতেই তাহাদের এই পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। আর্থিক কারণেই সাধারণত কোন পশুবলির ব্যবস্থা হইতে পারে না। এই উপলক্ষে কিছুদিন পূর্ব হইতেই তাহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। চন্দনকেয়ারীর থানায় অন্তর্গত মহাল

গ্রামের দুবে পদবীবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ জমিদারগনও ধর্মের নামে মানসিক করিয়া তাঁহার বার্ষিক পূজা উপলক্ষে তাঁহাদের পূজার উপকরণ ডোমের বাড়িতে পাঠাইয়া দেন—নিজেদের গৃহে পূজার কোন অনুষ্ঠান করেন না। এই অঞ্চলেই পূর্বোল্লিখিত এই প্রবাদটির সাক্ষাৎকাল লাভ করা গিয়াছে,—'আর কোথাও জায়গা পেলে না, শেষে ডোমের বাড়ি উঠলে গিয়ে ধর্মঠাকুর।'

মানভূমের বাউরীগণ ও ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে ধর্মপূজার কোন নির্দিষ্ট তারিখ নাই, প্রথাও অত্যন্ত শিথিল। কোন কোন সময় এই উপলক্ষে একটি শূকর বলি দেওয়া হয়। অন্যথায় পাঁঠা বলির প্রথাই ব্যাপক। পাঁঠার রঙ সাদা কিংবা কালোও হইতে পারে, কিন্তু সূর্যোদয় মূহূর্তই বলি দেওয়ার সময়। পাঁঠার অভাবে সাদা রঙের মুরগীও চলে।

মানভূম জেলায় কূর্মি জাতির লোকই সংখ্যায় অধিক। একমাত্র ধানবাদ মহকুমা ব্যতীত আর প্রায় সর্বত্রই কূর্মি জাতির মধ্যে ধর্মপূজার প্রচলন আছে। সিংভূম ও রাঁচি জেলার সংলগ্ন অঞ্চলের কূর্মিগণ ধর্মকে সূর্য বলিয়াই পূজা করে। তাহাদের মধ্যে ধর্মের নামে উপবাস পালন করিবার কোন রীতির প্রচলন নাই, অভীষ্ট কামনায় তাঁহার নামে মানসিক করা হয় এবং তাহা পূর্ণ হইলে, যে কোন দিন সূর্যোদয়ের মূহূর্তে ধর্মের নামে একটি সাদা মুরগী বলি দিয়া তাঁহার পূজা করা হয়। পূর্বোক্ত বাউরী ও কূর্মিদিগের মধ্যে এই দেবতার কোন মন্দির কিংবা কোন মূর্তি নাই।

মানভূম জেলার সীমা অতিক্রম করিয়া আরও দক্ষিণ-পশ্চিমে ও দক্ষিণে ও সিংভূম জেলার ছোটনাগপুরের আদিম জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই অঞ্চলের আদিম জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে ধর্ম বা ধরম নামক এক দেবতার অস্তিত্ব আছে। প্রত্যেক জাতিরই পরম দেবতার (Supreme Deity) সঙ্গে তাঁহাকে অভিন্ন মনে করা হইয়া থাকে এবং সর্বত্রই তাঁহাকে সূর্যদেবতা বলিয়াই মনে করা হয়। এমন কি ছোটনাগপুরের আদিবাসী জাতি অধ্যুষিত অঞ্চল অতিক্রম করিয়া এক দিকে উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত ও অপর দিকে মধ্যভারতের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অধিবাসী আদিম জাতির সকল বিভিন্ন শাখার মধ্যেই ধর্মপূজার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সর্বত্রই এই সকল আদিম জাতির উপাস্য সূর্য দেবতার সঙ্গেই তাঁহাকে অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হয়।

ছোটনাগপুরের ওরাওঁ জাতি তাহার পরম দেবতাকে 'ধর্মেশ' নামে অভিহিত করিয়া থাকে।[১] তাঁহার আদিম জাতীয় নাম 'বিরিবেলাস'ও কখনও ব্যবহৃত হয়। ইহার অর্থ সূর্য রাজা বা সূর্য প্রভু। দেবতার রঙ সাদা, সাদা রঙের পাঁঠা কিংবা মুরগী তাঁহার নিকট বলি

১। Dalton, *Descriptive Ethnology of Bengal* (Calcutta, 1872), 256

দিতে হয়। এই দেবতার নিকট কিছু প্রার্থনা করিবার সময় পূর্ব দিকে মুখ করিয়া লওয়া হয়। দুষ্কৃতকারীকে ধর্মেশ দৃষ্টিহীনতা ও কুষ্ঠরোগ দিয়া থাকেন। এই প্রকার মুণ্ডা, হো, বীরহোর, খন্দ, খরিয়া, ভুইএঞা, বোণ্ডা, জুয়াঙ, শবর (শেওরা), সাঁওতাল, কোরোয়া, পার্বত্য খরিয়া, মালে বা সৌরিয়া পাহাড়িয়া প্রভৃতি বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যভারতের পার্বত্যাঞ্চলের অধিবাসী অস্ট্রিক বা দ্রাবিড় ভাষা-ভাষী প্রত্যেক আদিম জাতির মধ্যেই ধর্ম কিংবা সম-উচ্চার্য কোন শব্দের নামীয় এক সূর্য দেবতার অস্তিত্ব আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উত্তর বিহারে হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত করম একাদশী ব্রতের করম ও তাহার ভ্রাতা ধরমের সঙ্গে এবং ছোটনাগপুরের অধিবাসী সমাজের পরিকল্পিত অনুরূপ কর্মা ও ধর্মার সঙ্গে সূর্যরূপে পূজিত ধরমঠাকুরের বা 'ধরম দেওতা'র কোন যোগ নাই। কোন কোন অঞ্চলে ইনি স্থানীয় অনার্য নামেও অভিহিত হন; কিন্তু তাঁহার পূজার প্রণালীর মধ্যে কোথাও কোন পার্থক্য নাই। বাংলার পূর্বসীমান্ত-সংলগ্ন আসাম প্রদেশের অধিবাসী কোন কোন ইন্দোমঙ্গোলয়েড জাতির শাখার মধ্যেও এক অনুরূপ সূর্যদেবতার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।[১] আসামের অন্তর্গত ফায়েঙ্লুই'র পার্বত্য জাতি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে (April) সাদা রঙের একটি মোরগ ও একটি পায়রা বলি দিয়া সূর্যদেবতার পূজা করে। মণিপুর অঞ্চলের মাও নাগাগণও একটি সাদা রঙের মোরগ বলি দিয়া সূর্যদেবতার পূজা করে।.আসামে মিকির নামক উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসী এক পার্বত্য জাতিও সাদা রঙের মুরগী বা পাঁঠা বলি দিয়া আরনাম পারো নামক এক সূর্যদেবতার পূজা করিত। উত্তর-পূর্ব ভারতের সাংতাম নামক নাগাজাতির অন্য এক শাখার মধ্যেও সাদা মোরগ বলি দিয়া সূর্যোদয়ের মুহূর্তে সূর্যপূজার প্রচলন আছে।[২] এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া মনে হইয়াছে যে, পূর্বভারতে প্রাচীনকালে সূর্য-পূজক এক আদিম জাতি বাস করিত, তাহাদের প্রভাব যে কোন কারণেই হউক, আসাম হইতে উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে—সেইজন্য এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসী দৃশ্যত পরস্পর স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন জাতীয় লোকের মধ্যে এখনও ইহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বলাই বাহুল্য যে, যাহা আসাম হইতে মধ্যপ্রদেশের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার প্রভাব হইতে বাংলাদেশও কোনরূপেই মুক্ত ছিল না। নিম্নলিখিত আলোচনা হইতেই বাংলাদেশেরও লৌকিক কতকগুলি সূর্যোপাসনার প্রণালীর অস্তিত্বের আভাস পাওয়া যাইবে এবং পশ্চিমবঙ্গের ধর্মপূজা যে মূলত উক্ত আদিম জাতির সূর্যপূজার উপরই প্রতিষ্ঠিত তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে।

১। T. C. Das, 'Sun-worship amongst the Aboriginal Tribes of Eastern India', *J. D. L.*, Vol XI (1924), 93

২। C.R. Stonor, 'The Feasts of Merit Among the Northern Sangtam Tribe of Assam', *Anthropos*, XIV (Jan-June. 1950), 8

উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রেবন্ত নামক এক দেবতার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। কতকগুলি অর্বাচীন পুরাণের মতে তিনি সূর্যের পুত্র। তাঁহার নামের ব্যুৎপত্তিগত কোন সঙ্গত অর্থ সংস্কৃত অভিধানে সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। বাংলাদেশেও বহু রেবন্তমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইলে বাংলাদেশে এই দেবতা কোথা হইতে আসিলেন? কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, ইনি বাংলার লৌকিক ধর্ম (Folk religion) হইতে ক্রমে অর্বাচীন পুরাণের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন,—তাঁহার পূজা সূর্যপূজারই অঙ্গ হইয়া গিয়াছে।[১] কিন্তু দেবমূর্তিটিকে সর্বত্রই অশ্বারূঢ় দেখিতে পাইয়া আবার কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে, আর্যেতর জাতির সঙ্গে যখন অশ্বের সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে, তখন এই দেবতার 'মূলে ভারতীয় সূর্য-পূজার বৈদিক ও পারসিক ধারার সম্মিলিত প্রভাব কার্যকরী হয়েছিল।' কিন্তু অশ্বের সঙ্গে রেবন্তের সম্পর্ক পরবর্তী কালেও স্থাপিত হওয়া অসম্ভব নহে। এই ভাবেই আর্য প্রভাব বহির্ভূত অঞ্চলে উদ্ভূত হইয়াও ধর্মঠাকুর বাংলাদেশে মাটির ঘোড়া উপহার লাভ করিয়া থাকেন। আর্য ও পারসিক প্রভাবের পরবর্তী প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় লৌকিক সূর্য দেবতাই অশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাংলাদেশের মেয়েরা রালদুর্গা নামক এক দেবতার ব্রত করিয়া থাকে। এই 'রাল' শব্দটি 'রাতুল' অর্থাৎ সূর্য শব্দটিরই আধুনিক রূপ। এই 'রাল' যদিও মেয়েদের হাতে পড়িয়া দুর্গায় রূপান্তরিত হইয়াছেন, তথাপি ইনি পুরুষদেবতা সূর্য ব্যতীত আর কিছুই নহেন। তাঁহার ব্রতকথায় তাঁহাকে কুষ্ঠরোগের আরোগ্যকারী ও পুত্রসন্তানদাতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে।[২]

পশ্চিমবাংলায় আরও একটি লৌকিক সূর্যদেবতা আছেন, তাঁহার নাম ইতু। শব্দটিকে অনেকেই 'মিত্র', অর্থাৎ সূর্য শব্দ হইতে জাত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা আদিত্য শব্দ হইতে জাত।[৩] অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার এই ব্রত পালন করা হয়, সংক্রান্তির দিন ব্রত শেষ হয়। পূর্ববঙ্গে জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিন এই পূজা হইয়া থাকে, এই অঞ্চলে এই ব্রতের নাম করমাদি ব্রত এবং দেবতার নাম করমঠাকুর বা করমপুরুষ। বলা বাহুল্য, কোন পুরাণ কিংবা হিন্দুর ধর্মসম্পর্কিত গ্রন্থে করমঠাকুর নামক কোন দেবতার উল্লেখ নাই। পূর্ববঙ্গের কোন কোন পরিবারে চাউলের গুঁড়া দিয়া নির্মিত একটি ক্ষুদ্র পুরুষমূর্তি করমঠাকুর রূপে পূজিত হন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, রিজ্‌লি পশ্চিমবঙ্গের ডোমদিগের সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহারা জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিন মৎস্যপুচ্ছবিশিষ্ট একটি পুরুষমূর্তিকে ধরম অথবা ধরমরাজ বলিয়া পূজা করে। মনে হয়, রিজ্‌লি কর্তৃক উল্লিখিত এই ধরম ও পূর্ববঙ্গের পূজিত এই করম অভিন্ন। অতএব করমঠাকুর যখন ইতু, আদিত্য বা সূর্যদেবতার সঙ্গে এক, তখন ধরম দেবতাও সূর্য ভিন্ন আর কিছুই নহেন। ধরমঠাকুর বা করমপুরুষ ধরমঠাকুরেরই এক স্বতন্ত্র নাম। ধরমঠাকুরের

১। H. B. I., 400; নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (১৯৪৯), ৬২৭

২। আশুতোষ মজুমদার, মেয়েদের ব্রতকথা, (কলিকাতা, ১৯৪৭), ১৭৮

৩। আদিত্য>আইত্ত>ইত্ত, ইত, ইতু

নীচ জাতির সঙ্গে সংস্রবের জন্য ধরমঠাকুর নামের পরিবর্তে করমপুরুষ বলিয়া তিনি পূজিত হইতেছেন। মূলত ইহাদের উদ্ভব এক।

পূর্ববঙ্গে সূর্যোপাসনার আরও কয়েকটি লৌকিক রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাও সাধারণত মেয়েদের মধ্যেই প্রচলিত। প্রথমটির নাম সূর্যের ব্রত। ইহা ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলেই প্রধানত প্রচলিত আছে। তবে এই সমস্ত বিভিন্ন স্থানে ইহাদের আচারে কিছু কিছু বিভিন্নতা আছে। মাঘমাসের কোন রবিবার গৃহাঙ্গিনায় জ্বলন্ত ঘৃত প্রদীপ হাতে লইয়া সূর্যের দিকে মুখ করিয়া ব্রতীনীগণ সারাদিন দাঁড়াইয়া থাকে। সমস্ত দিন উপবাস পালন করিতে হয়; সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পর ব্রতিনীগণ স্থান ত্যাগ করিয়া সামান্য জলযোগ করিতে পারে। চট্টগ্রাম জেলায় ইহার আচার স্বতন্ত্র ও বিস্তৃততর।[১] এতদ্ব্যতীত তপা ব্রত ও মাঘমণ্ডল ব্রত নামক দুইটি কুমারীব্রত সূর্যেরই ব্রত, কুমারী মেয়েরা এই ব্রত পালন করিয়া থাকে। এই সকল ব্রত-পার্বণ ব্যতীতও যে কোন রবিবার সূর্যের নামে উপবাস পালন করিবার রীতি বাংলাদেশের সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য একমাত্র মেয়েরাই এই প্রকার উপবাস পালন করিয়া থাকে, পুরুষের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। উপরের দৃষ্টান্তগুলি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বাংলাদেশে আর্যসভ্যতা বিস্তৃত হইবার পর যে বৈদিক ও পৌরাণিক সূর্যপূজা এদেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহাদের পার্শ্বে সূর্যপূজার আর কয়েকটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ধারারও অস্তিত্ব রহিয়া গিয়াছে। যদিও ইহাদের মধ্যে কালক্রমে আর্য উপকরণ কতকটা প্রবেশ করিয়াছে, তথাপি ইহাদের মৌলিক স্বাতন্ত্র্যও সহজেই অনুভব করা যায়।

পূর্বোক্ত পূর্বভারতীয় প্রাগৈতিহাসিক সূর্যোপাসনা পূর্ববঙ্গে যেমন উল্লিখিত বিভিন্ন লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের ভিতর দিয়া আত্মরক্ষা করিয়া কোন রকমে বাঁচিয়া আছে, তেমনি রাঢ় অঞ্চলে একমাত্র ধর্মপূজার ভিতর দিয়া ইহার অস্তিত্ব রক্ষা পাইয়াছে। যদিও এই অঞ্চলে পরবর্তী বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রভাবের ফলে ইহার মৌলিক পরিচয় স্বভাবতই অনেকটা প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, তথাপি এই পূজার আচার ও ইহার সঙ্গে আখ্যায়িকাসমূহ সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ইহাদের মধ্য হইতে উক্ত আদিম সূর্যোপাসনারই মৌলিক উপাদানসমূহের সন্ধান পাওয়া যাইবে। তাহা হইলে ধর্মঠাকুর প্রকৃত পক্ষে কে? এই বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ধর্মঠাকুরের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির কথা স্পষ্ট স্মরণ রাখিতে হইবে। পূর্ববর্তী আলোচনায় এই সকল বৈশিষ্ট্যের কোন কোনটি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি এখানে তাহা সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) চৈত্র মাস হইতে আষাঢ়ের অনাবৃষ্টির কয় মাসই তাঁহার বার্ষিক পূজার অনুষ্ঠান হয়। (২) আনুষ্ঠানিক স্নান তাঁহার বার্ষিক পূজার একটি অঙ্গ। (৩) তিনি বন্ধ্যার সন্তান বরদাতা। (৪) পশুবলি তাঁহার পূজার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ (৫) তিনি সর্বশুক্ল বলিয়া কল্পিত হন, শুক্ল উপহারে তাঁহার তুষ্টি। (৬) তিনি চক্ষুরোগের পরিত্রাতা। (৭) তিনি ভয়ঙ্কর (malignant) দেবতা—অবিশ্বাসীকে কুষ্ঠরোগ দিয়া তিনি শাসন করেন। (৮) মাটির ঘোড়া

১। *J Anth. S.B., XIII, 316-17*

উপহারে তাঁহার তৃপ্তি। (৯) তাঁহার নিকট দ্বাদশ সংখ্যাটি পবিত্র। (১০) ডোম তাঁহার পূজারী। এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করিয়া এখন দেবতার প্রকৃত পরিচয় স্থাপন করিতে হইবে।

ধর্মরাজ ঠাকুরের পূর্বোদ্ধৃত প্রচলিত ধ্যানমন্ত্রটির দুই একটি বিশেষণ ব্যতীত সমস্ত গুণাবলীই সূর্যদেবতার উপর প্রযোজ্য। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, সূর্যদেবতারই প্রাচীনতর একটি ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর পরবর্তী বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রভাবের যুগে এই ধ্যানমন্ত্রটি নূতন করিয়া রচিত হইয়াছে।

এমন কি যে শূন্যমূর্তি কথাটির উপর ভিত্তি করিয়া স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্মপূজাকে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও সূর্যেরই একটি গুণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। 'ধর্মপূজাবিধানে' সূর্যকে শূন্যদেব্ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা 'শূন্যদেবং দিবাকরম্'[১]। অতএব এই শূন্যমূর্তির সঙ্গে বৌদ্ধ শূন্যবাদের সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বের কোন সম্পর্ক নাই। এতদ্ব্যতীত 'ধর্ম পূজাবিধান'-এর বহু স্থলেই ধর্মকে সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করা হয়—এই জন্য যথার্থই ইহাতে বর্ণিত ধর্মঠাকুরকে সূর্য বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।[২]

ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে রাঢ়দেশে যে সকল লৌকিক আখ্যান প্রচলিত আছে, তাহা হইতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্ম সূর্য ব্যতীত আর কিছুই নহেন। ধর্মমঙ্গল কাহিনীর নায়ক লাউসেনকে স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'ললিত-বিস্তর'-এর নায়ক বুদ্ধদেবের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন।[৩] কিন্তু শ্রীক্ষিতিশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই বলিয়া এই মত খণ্ডন করিয়াছেন যে, 'the resemblance is not however very great and the similarity may be due to borrowing of details from one mythological tale by another, without the necessity of equating Buddha with Dharma. If any equation is justifiable then Lausen has to be equated to the hero of *Lalitavistara* which leaves the question at issue unsolved. But a detailed examination does not justify any such identification. For example, Lausen's mother sacrifices herself in order to get a son, and is again brought back to life. Buddha's mother dies within a few days after the birth of the son. The two circumstances are quite different.'[৪] তবে এই লাউসেন প্রকৃতপক্ষে যে কে, সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয় নাই, তাহারই এখানে অবতারণা করা যাইতেছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে লাউসেনকে সর্বত্রই কশ্যপের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—তবে তিনি ধর্মের পূজা মর্তলোকে প্রচার করিবার জন্য কর্ণসেনের ঔরসে

১। ধর্মপূজাবিধান, ৮৯

২। Sashibusan Das Gupta, *Obscure Religious Cults* (Calcutta, 1946) 837-9.

৩। *J. A. S. B.* (1895), 65-8

৪। K. P. Chattopadhyaya, *op. cit.*, p. 131

মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা সত্ত্বেও তাঁহার নাম কশ্যপ-তনয় বলিয়াই বার বার উল্লেখ করা হইয়াছে। সূর্যকেও পুরাণাদিতে কশ্যপের পুত্র বা কাশ্যপেয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে।[১] যদিও ইহা বর্তমানে সূর্যের একটি গতানুগতিক বিশেষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তথাপি ইহার মূলে যে একটি বিশিষ্ট জনশ্রুতি ছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। এইজন্য মনে হয়, লাউসেন ও সূর্য অভিন্ন।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, লাউসেনের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ব্যবহারের জন্য আণ্ডীরপাখর নামক এক ঘোড়ারও জন্ম হইল। ধর্মমঙ্গলের কবিগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই আণ্ডীরপাখর সূর্যের ঘোড়া। ঘনরাম চক্রবর্তী লিখিয়াছেন,—'জন্মিল সূর্যের বাজী ভক্তের কারণ।' লাউসেন তাঁহার সমগ্র জীবনে কখনও এই পরম বিশ্বস্ত অশ্বের সঙ্গচ্যুত হন নাই। দেহত্যাগের সময় ইহাকে সঙ্গে লইয়াই তিনি স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। ইহা হইতেও স্পষ্টত লাউসেন ও সূর্যের অভিন্নতা বুঝিতে পারা যায়।

লাউ কথাটির সঙ্গে সূর্যের কি সম্পর্ক আছে, তাহা প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারা যায় না; কিন্তু সম্পর্ক যে কিছু একটা আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। যেমন উত্তর বিহারের হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত সূর্যপূজা বা ছটপূজার দিন তথাকার প্রত্যেক গৃহস্থের লাউ বা অলাবুর তরকারী খাইতে হয়। লাউ পাওয়া না গেলে অগত্যা লাউয়ের পাতা দিয়াই তরকারী রান্না করিতে হয়। ইহা হইতেও সূর্যের সঙ্গে লাউ বা অলাবুর সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয়। সূর্য অর্থে রাতুল শব্দ হইতে লাউ শব্দ উৎপন্ন হওয়াও আশ্চর্য নহে। এই সম্পর্কে আরও একটি কথা মনে হইতে পারে। বাংলার সূর্যব্রতের ছড়ায় সূর্যের নাম লাউল। শব্দটি সংস্কৃত রক্তুল্য হইতে রওউল্ল>রাতুল, রাউল, লাউল এইভাবে গঠিত হইয়াছে। রাঢ়দেশে কর্ণসেনের কাহিনীর সহিত যুক্ত হইবার পূর্বে লৌকিক সূর্যদেবতা বাউল নামেই পরিচিত হইতেন বলিয়া মনে হয়, অতঃপর কর্ণসেনের পুত্র বলিয়া লাউল শব্দটিকে লাউসেনে পরিবর্তিত করিয়া লওয়াও কিছুই আশ্চর্য নহে। উক্ত লাউল শব্দটি সংক্ষেপে লাউ হওয়া সম্ভব। অতঃপর লাউর সঙ্গে ইহার গোলযোগ (confusion) সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

রূপরামের ধর্মমঙ্গলে লাউসেনকে 'লাল্বাদিত্য' (বা লালু+আদিত্য) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কথাটির মধ্যে 'আদিত্য' কথাটি আছে; বলা বাহুল্য, ইহা হইতেও লাউসেনকে আদিত্য বা সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়।

ধর্মমঙ্গল কাহিনীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, যখন পুত্র-কামনায় রঞ্জাবতী ধর্মের নামে শালে ভর দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন স্ত্রীহত্যার পাপ সূর্যকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। ধর্ম তৎক্ষণাৎ রঞ্জাবতীর মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করিয়া তাঁহাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন। ধর্ম ও সূর্য যদি এক না হয়, তবে ধর্মের কার্যের জন্য সূর্যকে কেন দায়ী করা হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ধর্মমঙ্গল কাহিনীতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পশ্চিমদিকে

১। তুলনীয় : প্রচলিত সূর্যস্তব—জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।।

সূর্যোদয় করাই ধর্মপূজার শ্রেষ্ঠ সাধনা। লাউসেন পশ্চিমে সূর্যোদয় নিষ্পন্ন করিয়াই ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবকরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ধর্মপূজাদ্বারা সূর্যের গতি নিয়ন্ত্রণের যে কথা এখানে বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই মনে হয় যে, ধর্মপূজার সঙ্গে সূর্যপূজার নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। ধর্মপূজায় সিদ্ধিলাভ করিলে, সূর্যের গতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার জন্মে—ইহার অর্থই এই মনে হইতে পারে যে, ধর্ম ও সূর্য অভিন্ন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে বলা হইয়াছে, ধর্ম দুষ্কৃতকারীকে কুষ্ঠরোগ দিয়া শাসন করিয়া থাকেন। লাউসেনের সঙ্গে বিবাদ করিবার ফলে মহামদ পাত্র কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন, ধর্ম নিন্দা করিবার ফলে মার্কণ্ড মুনিও তদবস্থা প্রাপ্ত হন। আজ পর্যন্তও পশ্চিমবঙ্গের ধর্মঠাকুরের দেয়াসীগণ কুষ্ঠরোগের প্রতিষেধকরূপে নানা টোটকা ঔষধাদি দিয়া থাকে। বিহারের অন্তর্গত নালন্দায় একটি সূর্যমন্দির আছে। তাহাতে বহু দূরবর্তী অঞ্চল হইতে কুষ্ঠরোগিগণ আসিয়া সমবেত হইয়া থাকে। এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাহাদের নামে সূর্যদেবতার পূজা দেয়, পূজান্তে মন্দিরসংলগ্ন এক পুষ্করিণীতে রোগিগণ স্নান করিয়া থাকে। উক্ত প্রদেশের গয়া জেলার গোবিন্দপুর নামক গ্রামেও অনুরূপ একটি সূর্য মন্দির আছে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসী ওরাওঁ জাতির সূর্যদেবতা ধর্মেশও সামাজিক দুষ্কৃতকারীকে কুষ্ঠরোগ দ্বারা শাসন করিয়া থাকেন। বাংলাদেশে প্রচলিত মেয়েলি রালদুর্গাব্রতেও সূর্যকে কুষ্ঠরোগ আরোগ্যকারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সূর্যের সঙ্গে কুষ্ঠরোগের সম্পর্ক পরবর্তী কালে স্থাপিত হইয়াছে। এই বিষয়ে অনুমিত হইয়াছে যে, মাগী শবাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সূর্যদেবতার কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করিবার গুণটি প্রাচীন পারস্য হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয়।[১] এই অনুমান যথার্থ বলিয়া মনে হয়। মাগী বা শকদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের বিশিষ্ট সূর্যোপাসনার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যে এই বিশেষ গুণটিও এ'দেশে প্রচার করিয়া থাকিবেন। তাহা হইতেই পরবর্তী কালে তাহা সংস্কৃত কাব্য ও পুরাণগুলিতেও প্রবেশলাভ করিয়াছে। ময়ূরভট্ট নামক একজন সংস্কৃত কবি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া আরোগ্য কামনায় সূর্যের নামে একশত সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেন,—তাহা 'সূর্যশতক' নামে পরিচিত।[২] জনশ্রুতি এই যে, ইহার ফলে তিনি কুষ্ঠরোগ হইতে আরোগ্য লাভ করেন। ময়ূরভট্ট খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন বলিয়া মনে করা হয়। পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, কৃষ্ণের পুত্র শাম্ব পিতার শাপে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন। আরোগ্য-কামনায় তিনি নারদের পরামর্শে পাঞ্জাবের অন্তর্গত এক তীর্থস্থানে গিয়া কঠোর তপস্যা দ্বারা সূর্যকে প্রসন্ন করেন। অবশেষে সূর্যের বরে তিনি রোগমুক্ত হন।[৩] উড়িষ্যায় কোণারকের সূর্যমন্দির সম্বন্ধেও এই কাহিনীটি প্রচলিত আছে। পরবর্তী কালে কোণারক

১। দিলীপকুমার বিশ্বাস, 'ভারতীয় সূর্যপূজার একটি বৈশিষ্ট্য'; সা-প-প, ৫৭,২৫ ৪৩
২। সূর্য-শতকম্, হরিদাস গুপ্ত সম্পাদিত (বেনারস)
৩। স্কন্দপুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, অধ্যায় ২.৩; বরাহ-পুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ অধ্যায় ৩২৩৩

সূর্যমন্দিরের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য এই পৌরাণিক কাহিনীটি ইহার সম্পর্কে উল্লিখিত হইত।

ঋগ্বেদে সূর্য, সবিতৃ, মিত্র প্রভৃতি দেবতাকে রোগ আরোগ্যকারী দেবতা বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই, বরং রুদ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের এই গুণ আছে বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু কুষ্ঠরোগের সঙ্গে তাঁহাদের কাহারও কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই। মনে হয় পরবর্তীকালে শকদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণদিগের প্রভাববশত পৌরাণিক সাহিত্যে কুষ্ঠরোগের সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহা হইতেই ক্রমে অন্যান্য কোন কোন রোগ সম্পর্কেও এই ধারণা প্রসার লাভ করিয়াছে।

ধর্মঠাকুরের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি অপুত্রককে পুত্রসন্তান দান করিয়া থাকেন। ধর্মমঙ্গল কাহিনীর মধ্যে মহিষী মদনা ও রাণী রঞ্জাবতী উভয়ের ধর্মের বরে পুত্রসন্তান লাভের কথার উল্লেখ আছে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বর্ধমান জেলার আসানসোলের নিকটবর্তী ডেমড়া নামক গ্রামে যে প্রাচীন ধর্মমন্দির আছে, তাহার বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনায় নিম্ন জাতির শত শত বন্ধ্যা নারী আসিয়া সমবেত হয়। বলা বাহুল্য, বৈদিক কিংবা পৌরাণিক সূর্যদেবতার পুত্রবর দান করিবার ক্ষমতার উপর তত বেশি জোর দেওয়া হয় না। ভারতীয় ও অন্যান্য অঞ্চলের আদিম জাতির সূর্যদেবতারই ইহা বিশেষ একটি গুণ। তবে কোন কোন পুরাণে যে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অনার্য সংস্কৃতিরই প্রভাবের ফল বলিতে হয়। যেমন 'ভাগবত পুরাণ'-এ উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাজা সত্রাজিৎ দ্বাদশ বৎসর নিরাহারে থাকিয়া সূর্যের তপস্যা করিয়া তাঁহার নিকট পুত্রবর চাহিয়াছিলেন। উইলিয়ম ক্রুক লিখিয়াছেন, পুত্রহীনা নারী কোন কোন অঞ্চলে সন্তান-কামনায় সূর্যের দিকে ফিরিয়া উলঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ভেরিয়র্ এলউইন এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, মধ্যপ্রদেশের কোন কোন আদিম জাতির মধ্যেও অনুরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। বাংলাদেশে আদিম সূর্যপূজার বহু উপকরণ লৌকিক শৈবধর্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহা হইতেই অনেক স্থলে পুত্রসন্তানদাতৃরূপে বর্তমানে শিবকেই কল্পনা করা হইয়া থাকে। তারকেশ্বর, এক্তেশ্বর, রাঢ়েশ্বর প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের সুপরিচিত শিবমন্দিরসমূহ পূর্বে আদিম সূর্যোপাসনার কেন্দ্র ছিল বলিয়া মনে হয়। এমন কি সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত বৈদ্যনাথধামের শিবমন্দিরও অনুরূপ ঐতিহ্যের উপরই স্থাপিত বলিয়া মনে হইতে পারে। কারণ, পৌরাণিক শিবের রোগ হইতে মুক্তি কিংবা পুত্রবর দিবার গুণের উপর তত বেশি জোর দেওয়া হয় না। তবে কোন কোন পুরাণে যে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা

১। W. Crooke. *Religion and Folklore of Northern India*, (Oxford, 1926), 35

২। W. T. Elmore, *Dravidian Gods in Modern Hinduism* (Nebraska, 1915), 45; Hook-Swinging, Mysore, *Quarterly Journal of the Mythic Society II* (1911), 57-59; J. H. Powell ' Hook-Swinging in India', Folk lore, XXXV (1914), 147-97.

সূর্যোপাসনারই প্রভাব-জাত বলিয়া মনে হইতে পারে। অথচ এই সকল তথাকথিত শিবমন্দিরে রোগমুক্তি ও পুত্রবরের জন্য ধর্না দিবার রীতি অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে প্রচলিত আছে। এমন কি মনে হইতে পারে যে, এই দুইটি গুণের উপরই এই সকল মন্দিরস্থিত দেবতার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত। এই সকল শিবমন্দির আদিম সূর্য মন্দির বলিয়া মনে হইবার আর একটি প্রধান কারণ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। এই সকল শিবমন্দিরে বার্ষিক অনুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ চড়ক। চড়ক অনুষ্ঠানটি আদিম সূর্যপূজা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে দিনটিতে এই চড়ক অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ বিষুব সংক্রান্তির দিনটি, তাহা কোন পুরাণ কিংবা স্মৃতি-অনুমোদিত শিবপূজার দিন নহে; একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা সূর্য পূজারই একটি বিশিষ্ট দিন হইতে পারে; কারণ সূর্যই ঐদিন দ্বাদশ রাত্রির পথে ভ্রমণ শেষ করিয়া পুনরায় সেই পথে নূতন যাত্রা শুরু করে। মানভূম জেলার কোন কোন অঞ্চলে এখনও চড়ককে বিবুপরব অর্থাৎ বিষুবপর্ব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অঞ্চলে চড়কপূজা প্রচলিত আছে, সেখানেও শিবের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

চড়ক গাছ ও চড়কের চক্র স্পষ্টতই সূর্যের আবর্তন ও চক্রাকারে ভ্রমণ বুঝায়। ইউরোপের কোন কোন জাতি—যেমন শ্ল্যাভ্, লিথুনীয়, লেট্ প্রভৃতির মধ্যে সূর্যপূজারূপ চড়কের অনুরূপ অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে।[১] এইজন্য চড়ককে যথার্থই মনে করা হইয়াছে, 'imitaiton of swinging of the sun at the beginning of spring or at the solstices–a piece of magic to help the sun move'. পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য শিবমন্দিরেই এখনও চড়কের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। বর্তমানে হিন্দুধর্মের প্রভাববশত কোন কোন স্থলে ধর্মমন্দির শিবমন্দির বলিয়া পরিচিত হইলেও উক্ত চড়কের সংস্রব হইতেই তাহা যে পূর্বে সূর্যদেবতা বা ধর্মঠাকুরের মন্দির ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বৈষ্ণব সম্প্রদায় পরিকল্পিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার মধ্যেও ইহার একটি স্বতন্ত্র রূপের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের রাসচক্রে পরিভ্রমণ বিভিন্ন রাশিচক্রের ভিতর দিয়া সূর্যের আবর্তনই বুঝায়। মনে হয়, চড়ক ও রাসলীলা একই অনার্য ভিত্তি হইতে উদ্ভূত। ধর্মপূজার সঙ্গে চড়কের সম্পর্ক হইতেও ধর্মপূজা যে সূর্যপূজা তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইবার পূর্বে চড়কগাছে যে ভক্ত্যা বা সন্ন্যাসিগন মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া বঁড়শী বিঁধাইয়া চক্রাকারে শূন্যে আবর্তন করিত তাহা এই উপলক্ষ্যে নরবলি দিবার প্রথার একটি নির্দশন বলিয়া মনে হইতে পারে। সূর্যদেবতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য এই ভাবে নরবলি দিবার প্রথা দেশের আদিম সমাজে এককালে প্রচলিত ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

একজন পাশ্চাত্য নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'in the primitive stage of agriculture, the powers supposed to be concerned in sending rain to

১। W. Schmidt, *The Origin and Growth of Religion* (London, 1935), p. 49.

earth received the largest share of worship.' আদিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানবও যথার্থই মনে করিত যে, সূর্যই বৃষ্টির নিয়ামক (regulator)। সেইজন্য যখনই অনাবৃষ্টি দেখা দিত, তখনই সমাজে সূর্যদেবতাকে পূজা করিয়া কিংবা ঐন্দ্রজালিক উপায়ে তুষ্ট করিয়া বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রয়াস দেখা যাইত। সেইজন্য পশ্চিমবাংলার যে অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া গ্রীষ্মকাল দুঃসহ হইয়া উঠে এবং কৃষিকার্যের সফলতা বিষয়ে আশঙ্কা উপস্থিত হয়, সেই অঞ্চলেই বিশেষত এই গ্রীষ্মকালেই নানা উপায়ে সূর্যদেবতাকে প্রসন্ন করিয়া বৃষ্টিপাতের জন্য যে বিস্তৃত আচার পালন করা হইত, তাহাই বর্তমানে ধর্মপূজার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সকল আদিম আচারের মধ্যে কালক্রমে হিন্দুধর্মের উপাদান আসিয়া এমন ভাবে মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহাদিগকে আর পূর্ববর্তী আচারসমূহ হইতে পৃথক করিয়া দেখিবার উপায় নাই। এককালে যাহা ছিল ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া (magic), আজ তাহাই হিন্দুধর্মের প্রভাববশত পূজার রূপ লাভ করিয়াছে।

বাৎসরিক কিংবা ঘরভরা পূজা উপলক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মঠাকুরের স্নান ধর্মপূজার একটি বিশেষ অঙ্গ। অনাবৃষ্টির কালে সূর্যদেবতার প্রতীককে জলের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া বৃষ্টিপাত করাইবার চেষ্টা অনেক দেশেই প্রচলিত আছে। এই দেশে শিবের মাথায় জল ঢালিবাব যে রীতি প্রচলিত আছে, তাহা সূর্যদেবতার মাথায় জল ঢালিবার রীতিরই একটি প্রসারিত রূপ মাত্র। এ'দেশে বহু সূর্যশিলা স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু পূর্ববর্তী রীতি তাহাতে অনুসৃত হইয়া তাহাদের মাথায়ও বর্তমানে জল ঢালিবাব রীতি পালন করা হইতেছে। ইহাও sympathetic magic-এর নিদর্শন। প্রত্যেক ধর্মমন্দিরেই ধর্মঠাকুরের স্নান একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। বর্ধমান জেলার ডেমড়া গ্রামের ধর্মঠাকুরের স্নানের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামে তিনটি কাষ্ঠনির্মিত বৃহদাকার অশ্ব আছে, তাহাতে ধর্মঠাকুরকে আরোহণ করাইয়া বিশেষ আড়ম্বর সহকারে নির্দিষ্ট পুষ্করিণীতে লইয়া গিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করান হয়। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বর্ষার প্রারম্ভে পুরীর জগন্নাথদেবকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করাইবার মধ্যেও এই প্রবৃত্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব ধর্মপূজার এই অনুষ্ঠানটি বিশেষ তাৎপর্যমূলক। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্মঠাকুর সূর্যদেবতা ভিন্ন আর কেহই নহেন।

পশ্চিমবাংলার তারকেশ্বর, এক্তেশ্বর প্রমুখ স্থানে যে সকল শিবমন্দির আছে, তাহা যে পূর্বে সূর্যোপাসনার স্থান ছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়; কারণ, বিষুব সংক্রান্তির দিন শিবের নামে এই সকল মন্দিরে যে গাজন ও চড়ক হয়, তাহার আচারসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহাতে শিব অপেক্ষা সূর্যেরই দাবী অধিকতর বলিয়া মনে হইবে; বিষুব সংক্রান্তি তিথিটি সূর্যপূজারই একটি বিশিষ্ট তিথি, ইহা শিবপূজার কোন তিথি নহে। পূর্বেই বলিয়াছি, চড়কও সূর্যোৎসব ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সকল মন্দিরে বন্ধ্যা নারীগণ সন্তান-কামনায় যে ধর্না দিয়া থাকে, শিব অপেক্ষা সূর্যদেবতাই তাহার লক্ষ্য; কারণ পূর্বেই বলিয়াছি সূর্য ভূমিরই হউক কিংবা নারীরই হউক উভয়েরই অনুর্বরতা বিদূরক। এই সকল মন্দিরে রোগমুক্তির জন্যও যে প্রার্থনা করা হইয়া থাকে, তাহাও সূর্যেরই পূর্ণ করিবার ক্ষমতা আছে, পৌরাণিক শিবের এই সম্পর্কে বিশেষ খ্যাতি আছে বলিয়া জানিতে পারা যায় না।

পশুবলি ধর্মপূজার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। প্রতি বৎসর বার্ষিক পূজার সময় বিভিন্ন

ধর্মমন্দিরে শত শত পাঁঠা বলি দেওয়া হয়; এতদ্ব্যতীত যে সকল মন্দিরে নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে প্রায় প্রত্যহই পাঁঠা কিংবা কবুতর বলি দেওয়া হইয়া থাকে। ধর্মপূজার ঘরভরা অনুষ্ঠানের লুয়া বলি পূজার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যাঁহারা ধর্মঠাকুরকে বুদ্ধ কিংবা বিষ্ণু বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা ধর্মপূজার এই প্রথাটির সম্পর্কে কিছুই বলেন না। নরবলি পাইলেই দেবতা সর্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট হন বলিয়া পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক আদিম জাতির অধিবাসীই বিশ্বাস করিত। কৃষিজীবী সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ ও উপকারী দেবতা সূর্য। সেইজন্য প্রায় প্রত্যেক আদিম সমাজেই সূর্যোপাসনা প্রচলিত আছে এবং সমাজের এই প্রিয়তম দেবতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলি বা নরবলি দিয়া প্রসন্ন করিবারও রীতি অনেক ক্ষেত্রেই প্রচলিত ছিল বলিয়াও জানিতে পারা যায়। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বাংলার লৌকিক সূর্যোৎসব চড়ক উপলক্ষে মানসিক করিয়া পিঠে বঁড়শী বিঁধাইয়া শূন্যচক্রে আবর্তিত হইবার যে রীতি প্রচলিত ছিল, তাহা সূর্যের উদ্দেশ্যে নরবলি দিবারই একটি নিদর্শন বলিয়া সকলে মনে করিয়া থাকে। বিশেষত ধর্মপূজার ঘরভরা উৎসবে লুয়া বলি যে নরবলিরই অবশেষ, তাহাও অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সার্থকভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। ধর্মপূজা উপলক্ষে যে ব্যাপক পাঁঠা বলি দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা সূর্যপূজার প্রাচীনতম রীতি নরবলিরই স্থান গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সূর্য একটি অতি উপকারী ও প্রধান দেবতা বলিয়াই তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য আদিম সমাজের যে শ্রেষ্ঠ দান বা বলি তাঁহাকে অর্পণ করা হইয়া থাকে, এই সংস্কার অত্যন্ত দৃঢ়মূল—এইজন্য ইহার ঐতিহ্যও অত্যন্ত প্রাচীন। বাংলাদেশে ব্যাপক বৈষ্ণব প্রভাব সত্ত্বেও ধর্মপূজা হইতে এই রীতিটি কিছুতেই পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই। ধর্ম যদি বুদ্ধ, যম, কিংবা বিষ্ণু প্রমুখ কোন হিন্দু দেবতাই হইতেন, তবে তাঁহার পূজাচারে পশুবলির প্রথা এত সুদৃঢ় শিকড় গাড়িতে পারিত না। অতএব তিনি এক অতি আদিম সমাজের সূর্যদেবতা বলিয়াই মনে হইবে।

ধর্মঠাকুরকে সাধারণত চক্ষুরোগ হইতে পরিত্রাণকারী দেবতা বলিয়াও কল্পনা করা হইয়া থাকে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, চক্ষুরোগাক্রান্ত ব্যক্তি ধর্মঠাকুরের নিকট মানসিক করিয়া আরোগ্যলাভ করিলে তাঁহাকে 'চিক্' উপহার দিয়া থাকে। এই চিক্ ধর্মশিলার গায়ে পরাইয়া দেওয়া হয়। আদিম জাতির বিশ্বাস অনুযায়ী সূর্য জগতের চক্ষু-স্বরূপ; ধর্মঠাকুর সূর্য বলিয়াই মানুষও তাহার নিজের চক্ষুপীড়ার জন্য তাঁহারই শরণাপন্ন হয়—ধর্মঠাকুর যদি বুদ্ধ, বিষ্ণু, বরুণ, যম কিংবা কচ্ছপ হন, তবে অন্তত চক্ষুরোগের জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইবার তাৎপর্য কি, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কুষ্ঠরোগ ও চক্ষুরোগ ব্যতীত অন্যান্য কয়েকটি রোগে, যেমন বাতরোগ প্রভৃতিতেও ধর্মঠাকুরের শরণাপন্ন হইতে দেখা যায়। পুরাণের মধ্যে সূর্যের যে সাধারণ রোগ-বিনাশন গুণ আছে, তাহাই ক্রমে এই প্রাগার্য সূর্যদেবতার উপরও আরোপিত হওয়ায় ধর্মঠাকুরও প্রায় সর্বরোগহর হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষুরোগ বিনাশনের গুণটি প্রাগার্য সমাজ-সম্ভূত বলিয়া মনে হয়।

ধর্মঠাকুরের সঙ্গে দ্বাদশ সংখ্যাটির একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে দেখিতে পাওয়া যায়, সেকথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই সম্পর্ক ধর্মপূজার একটি ছড়াতেও উল্লেখ করা হইয়াছে—

বার ভাই বার আদিত্য।
হস্ত পাতি লহ সেবকের অর্ঘ্য পুষ্প পানী।।

ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পৌরাণিক দ্বাদশ আদিত্য হইতেই ধর্মঠাকুরের সঙ্গে দ্বাদশ সংখ্যার একটি বিশেষ সম্পর্ক যুক্ত হইয়াছে। ধর্মঠাকুর সূর্য বলিয়াই দ্বাদশ আদিত্যের সম্পর্ক তাঁহার সঙ্গে স্থাপিত হইয়াছে। অন্য কোনও দেবতা হইলে তাহা কোন মতেই সম্ভব হইত না। বলা বাহুল্য, ধর্মঠাকুরের উপর পরবর্তী পৌরাণিক প্রভাবের যুগেই তাঁহার সঙ্গে দ্বাদশ সংখ্যার এই বিশিষ্ট সম্পর্কটি স্থাপিত হইয়াছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ধর্মঠাকুরকে মাটির ঘোড়া উপহার দিবার রীতি পশ্চিমবঙ্গে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। ধর্মঠাকুর হইতে এই রীতি এই অঞ্চল ও ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অন্যান্য দেবতাতেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কোন কোন অঞ্চলে মাটির ঘোড়াই ধর্মঠাকুরকে দেয় একমাত্র উপহার, অন্য কোন উপহার তাঁহার মনস্তুষ্টি হয় না। পূর্বেই বলিয়াছি, বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামের ধর্মমন্দিরে তিনটি বৃহদাকার কাষ্ঠনির্মিত অশ্ব আছে; বার্ষিক পূজার সময় ধর্মঠাকুরকে ইহাতে আরোহণ করাইয়া স্নানার্থে লইয়া যাওয়া হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, পৌরাণিক সূর্যদেবতা অশ্বচালিত রথারূঢ়, অতএব ধর্মঠাকুরের সঙ্গে মাটির ঘোড়ার সম্পর্ক এই পৌরাণিক প্রভাবেরই ফল। কিন্তু পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই সমুদ্রদেবতা ও সূর্যদেবতার সঙ্গে অশ্বের সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে মনে করা হয় যে, 'through its swiftness strength and activity, it was itself a symbol of the sun' কেহ কেহ মনে করেন, ঋগ্‌বেদেও অশ্বকে কোন কোন স্থলে সূর্যেরই প্রতীকরূপে গণ্য করা হইয়াছে।[২] কিন্তু বাংলাদেশে পৌরাণিক প্রভাববশতই যে সূর্যদেবতার সঙ্গে অশ্বের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা কঠিন। কারণ, যে-অঞ্চলে পৌরাণিক প্রভাব বিস্তৃত হওয়া সম্ভব হয় নাই, সেই অঞ্চলে অশ্বের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের কেন সম্পর্ক নাই। উপজাতীয় অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গের ডোম জাতির প্রভাববশত কোন কোন দেবতার নিকট মাটির ঘোড়া উপহার দিবার রীতি প্রবর্তিত হইলেও সেখানকার ধর্মপূজায় মাটির ঘোড়ার কোন প্রয়োজন হয় না।

ধর্মঠাকুরকে সর্বশুক্ল বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে। রূপরাম নামক ধর্মমঙ্গলের একজন কবি ধর্মঠাকুরের বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—

ধবল অঙ্গের জ্যোতি ধবল মাথার ছাতি
ধবল বরণে বাড়ীঘর।
ধবল ভূষণ শোভা অনুপম মুনিলোভা
আলো কৈলে পরম সুন্দর।।

ধর্মমঙ্গলের আর একজন কবি ঘনরাম চক্রবর্তী একজন ধর্মভক্ত সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন, 'সর্বক্ষণ শুক্লফুলে পূজিল গোঁসাই।' ধর্মপূজার একটি প্রাচীন ছড়ায় ধর্মঠাকুরের অশ্ব সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে, 'ধবল বরণ ঘোড়া নিলয় না জানি।'—শূন্যপুরাণ। অর্থাৎ ধর্মঠাকুরের অঙ্গের জ্যোতি শুভ্র, তাঁহার মাথার ছত্র শুভ্রবর্ণ, তাঁহার মন্দিরের বর্ণ শুভ্র, তাঁহার ভূষণ শুভ্র, শুক্লবর্ণের পুষ্পে তাঁহার পূজা হয়, তিনি শুভ্রবর্ণের অশ্বে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিয়া থাকেন। পূর্বে তাঁহার নিকট সাদা রঙের পাঁঠা ও কবুতরই বলি দেওয়া হইত,

১। N. M. Penzer, *The Ocean of Story* (London, 1925), IV. 14.

২। A. A Macdonell, *Vedic Mythology*, Strassburg 1897, p. 150

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুপ্রভাবিত অঞ্চলে কালো রঙের পাঁঠাও বলি দেওয়া হয়। ইহা সূর্যের গুণ-সম্পর্কিত একটি সুপ্রাচীন আদিম বিশ্বাসেরই পরিচায়ক। কারণ, বেদ কিংবা পুরাণে সূর্যকে কোথাও এমন সর্বশুক্ল বলিয়া ধ্যান করা হয় না। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বৈদিক যুগের পরবর্তী কালেই সূর্যদেবতা সম্পর্কিত এই বিশ্বাসটি উচ্চতর হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যেও প্রবেশলাভ করিয়াছিল। মিত্র ও বরুণ দেবতার পূজা সম্পর্কিত আচারগত পার্থক্য নির্দেশ করিতে গিয়া 'তৈত্তিরীয় সংহিতা' ও 'মৈত্রায়ণী সংহিতা'য় উল্লিখিত হইয়াছে যে, মিত্র দেবতার নিকট সাদা রঙের পশু ও বরুণ দেবতার নিকট কালো রঙের পশু বলি দিতে হইবে। এই সম্পর্কে পণ্ডিত এ.এ. ম্যাক্‌ডোনেল উল্লেখ করিয়াছেন, 'The same contrast between Mitra as a god of day and Varuna as a god of night is implied in the ritual literature, when it is prescribed that Mitra should receive a white and Varuna a dark victim at the sacrificial post.' *(TS 2, 1, 749; Ms 2, 5^7)*[১] এমন কি, দেবতার কল্পিত রঙের সঙ্গে রঙ মিলাইয়া পশুবলি দিবার রীতি ব্রাহ্মণের যুগেই আর্য-সংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'in the *Satapatha Brahmana* (5.5. 4^1) the Asvins are described as red-white in colour and therefore a red-white goat is offered to them,'[২] তথাপি পুরাণে সূর্যকে 'জবাকুসুমের মত লাল' ('জবাকুসুমসংকাশম্' ইত্যাদি) বলিয়াই ধ্যান করা হইয়া থাকে। পুরাণে সরস্বতী এবং শিবকেই সর্বশুক্ল বলিয়া কল্পনা করা হয়, কিন্তু সূর্যকে নহে। বেদে সূর্যের অশ্বকে একবার মাত্র শুভ্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[৩] শিবের সঙ্গে শুভ্রতার সম্পর্ক ('রজতগিরিনিভ' ইত্যাদি) উক্ত অনার্য সূর্য-উপাসনা হইতে গৃহীত হওয়াও কিছুই আশ্চর্য নহে। কিংবা চিরতুষারাবৃত হিমালয় শৃঙ্গমালার অথবা তুষারাচ্ছাদিত কৈলাস পর্বতের অধিষ্ঠিত দেবতা বলিয়াও শিবকে রজতগিরির মত শুভ্র বলিয়া কল্পনা করা সম্ভব। কিন্তু বাংলার পশ্চিম সীমান্ত সংলগ্ন উপজাতীয় অঞ্চলে সর্বত্রই সূর্যকে সর্বশুক্ল বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে এবং তাঁহার নিকট সাদা রঙের মুরগী বলি দেওয়া হয়। মানভূম জিলার সদর মহকুমার কোন এক গ্রামে মানসিংহ ধর্মপূজায় সূর্যোদয়ের মুহূর্তে একটি সাদা রঙের পাঁঠা বলি দিবার রীতি অদ্যাপি প্রচলিত আছে। অজয়-দামোদরের তীর হইতেই এই রীতিটি মানভূমে গিয়াছে, কিন্তু সেই অঞ্চলে ক্রমাগত হিন্দুপ্রভাব বৃদ্ধির ফলে বলির পশুর রঙটি সম্পর্কে যে অনার্য রীতিটি প্রচলিত ছিল, তাহা কতকাংশে শিথিল হইয়া আসিয়াছে;

১। A. A. Macdonell, Vedic Mythology (Strassburg, 1897), pp. 29-30

২। Ibid. p. 61. আফ্রিকার দক্ষিণ নাইজেরিয়া অঞ্চলের আদিবাসিগণ অজগর (pythom) সর্পের উদ্দেশ্যে যে মোরগ কিংবা পাঁঠা বলি দিয়া থাকে তাহার রঙও সাদা। *Publications of the Field Museum of Natural History, Anthropological Series.* Vol. XXI (Chicago, 1931), p. 15. কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে অজগরের সঙ্গে সাদা রঙের কোন সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে এই অঞ্চলের আদিবাসিগণ সাদা রঙের কুম্ভীরকে দেবতা বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। ইহার নিকট সাদা পশুপাখি বলি দিবার রীতিটি ক্রমে অজগর সর্প-দেবতার পূজাচারেও প্রসারিত হইয়া থাকিবে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই অঞ্চলে অজগর ও কুম্ভীর উভয়েই একসঙ্গে হ্রদে বা জলাশয়ে বাস করিয়া থাকে বলিয়া অনুমিত হয়।

৩। A. A. Machdonell, op. cit. p. 31

কিন্তু তাহার প্রান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে এই প্রাচীন রীতিটি এখনও রক্ষা পাইয়াছে। ধর্মঠাকুরের সর্বশুক্র পরিকল্পনার মধ্যে তাঁহার প্রকৃত পরিচয়ের অনেকখানি অংশ উদ্ধার করা যায়। দেখিতে পাওয়া যায় যে, আসামের পূর্ব সীমানা হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যপ্রদেশের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিভিন্ন শাখাযুক্ত কয়েকটি আদিম জাতির মধ্যে এক কালে একটি বিশিষ্ট প্রকৃতির সূর্যোপাসনা প্রচলিত ছিল। তাহাতে সূর্য দেবতাকে সর্বশুক্র বলিয়া কল্পনা করা হইত। দেখা গিয়াছে যে, আসামের ইন্দো-মঙ্গোলয়েড্ জাতির কয়েকটি শাখার মধ্যেও সাদা রঙের পশু কিংবা পক্ষী বলি দিয়া সূর্যপূজা করিবার রীতি আজিও প্রচলিত আছে। অধ্যাপক তারকচন্দ্র দাস বলিয়াছেন, "The Sun-god is worshipped by the people of Fayeng Loi in Sajiban (April), when they offer up a white fowl and a white pigeon." তিনি আরও বলিয়াছেন, "The Mao Nagas of Manipur who regard the Sun-god as a beneficent deity sacrifice a white cock to him"[১] আসামের মিকির (Mikir) জাতি আরনাম্ পরো (Arnam paro) নামক একজন দেবতার নিকট সাদা রঙের পাঁঠা ও সাদা মুরগী বলি দিয়া থাকে। Arnam paro পূর্বে সূর্যদেবতাই ছিলেন, এই বিষয়ে কোন সংশয় না থাকিলেও বর্তমানে ধর্মঠাকুরের মত তাঁহারও প্রকৃত পরিচয় একটু অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। C. R. Stoner নামক একজন নৃতত্ত্ববিৎ দেখাইয়াছেন যে, আসামের নাগাজাতির Sangtam নামক শাখাভুক্ত গোষ্ঠী সূর্যাস্তের সময় একটি সাদা রঙের মুরগী বলি দিয়া সূর্যদেবতার পূজা করিয়া থাকে।[২] পশ্চিমবঙ্গে ডোম জাতি যে সাদা রঙের পাঁঠা বলি দিয়া ধর্মঠাকুরের পূজা করিত, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। মানভূম জিলায় কোন কোন অঞ্চলে ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া কূর্মী পর্যন্ত জাতির লোক যে সাদা রঙের পাঁঠা বলি দিয়া ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়া থাকে, তাহার কথাও বলিয়াছি। মানভূম জিলা অতিক্রম করিয়া যদি আমরা ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার উপজাতীয় অঞ্চলে প্রবেশ করি, তাহা হইলেও দেখিতে পাইব যে, তথাকার আদিম জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে সাদা রঙের মুরগী, শূকর কিংবা পাঁঠা বলি দিয়া সূর্যদেবতার পূজা করিবার রীতি প্রচলিত আছে। তবে সূর্যদেবতার নামটির মধ্যে কোন কোন স্থলে পার্থক্য আছে, যেমন মাল-পাহাড়িয়া জাতি সূর্যদেবতাকে বলে ধর্মের গোঁসাই, ওরাওঁ জাতি বলে ধর্মেশ বা ধর্মি, মুণ্ডা, সাঁওতাল, কোল, বীরহোড় ও হো জাতি তাহাকে বলে সিং বোঙ্গা, খরিয়া জাতি বলে ধর্ম, পার্বত্য খরিয়া জাতি বলে গিরিং, ভুঞা, বণ্ডো ও গঁড় বা জুয়াঙ জাতি বলে, ধরম দেবতা, শবর জাতি বলে দেবস্ম অথবা দেরস্মসুখ শবর ভাষায় সুখ অর্থে দেবতা দেরস্ম শব্দ ধর্ম শব্দ হইতে জাত), কন্দ জাতি বলে ধর্ম, পেনু ও করোয়া জাতি বলে ভগবান্। ধর্ম কথাটি যে কি ভাবে ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার উপজাতীয় অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে, সে কথা একটু পরেই বলিব। উপরে যে সকল দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল, তাহাতে দেবতার নামের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু কিছু বিভিন্নতা থাকিলেও সর্বত্রই তাহাদের পরিচয় এক এবং অভিন্ন—তিনি সর্বত্রই সূর্যরূপে উপাসিত এবং এখানে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে বিষয় তাহা হইতেছে এই তিনি পূর্ব আসাম হইতে আরম্ভ করিয়া

১। T. C. Das, op. cit

২। C. R. Stoner, op. cit

মধ্যপ্রদেশের পূর্বসীমান্ত পর্যন্ত সর্বত্রই সাদা রঙের মুরগী কবুতর কিংবা পাঁঠা বলিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট যে পশু কিংবা পক্ষী বলি দেওয়া হইবে তাহার রঙটি সর্বত্রই সাদা হওয়া চাই। পূর্বেই বলিয়াছি পশ্চিমবঙ্গের ধর্মঠাকুরকে সর্বশুক্ল বলিয়া কল্পনা করা হয়, সাদা ফুল দিয়া তাঁহার পূজা করিতে হয় এবং পূর্বে সাদা পাঁঠা যে তাঁহার নিকট বলি দেওয়া হইত তাহারও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এখনও মানভূম জিলায় সাদা পাঁঠাই তাঁহার নিকট বলি দেওয়া হইয়া থাকে। বাঁকুড়া জিলার বেলেতোড় গ্রামেও সাদা রঙের পাঁঠা কিংবা কবুতর বলি দিয়াই তাঁহার পূজা হয়। উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতে যথার্থই মনে করা যাইতে পারে যে, 'at some remote past there had been a people living in this Eastern who were ardent worshippers of Sun-god, and this is the keynote of similarity about sun-worship in tribes so widely separated from each other physically and geographically as the Khond and the Naga.'[১]

পশ্চিমবঙ্গের অতি প্রাচীন অধিবাসী ডোম জাতিও স্বভাবতই ইহার এই ব্যাপক প্রভাববশত প্রাচীন কাল হইতেই এই ভাবে সূর্যদেবতার পূজা করিয়া আসিতেছে; হিন্দু ও বৌদ্ধগণ এই দেশে আসিবার পূর্বে ডোম জাতি যে নামে এই দেবতার পূজা করিত বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবিত যুগে সেই নামটিকে একটি বৌদ্ধ বা হিন্দু রূপ দিবার প্রচেষ্টাতেই বর্তমানে 'ধর্ম' বা ধর্মঠাকুর বলিয়া তিনি পরিচিত হইয়াছেন। ইহা হইতেও পশ্চিমবঙ্গের ধর্মঠাকুর যে মূলত প্রাগার্য সূর্য-দেবতা এই বিষয়ে সংশয় করিবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ধর্মপূজা বৌদ্ধধর্মের শেষ নিদর্শন; যদি তাহাই হয়, তবে তাহা বাংলাদেশের অন্যত্র কোথাও প্রচলিত না থাকিয়া কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশেষ অংশে, প্রধানত একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার কি কারণ থাকিতে পারে? বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল চট্টগ্রাম। ধর্মঠাকুরের পূজা বৌদ্ধধর্মেরই শেষ নিদর্শন হইলে ইহা চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত না থাকিবার কি কারণ থাকিতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

উপরের আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, পূর্ব-ভারতীয় অঞ্চলে বৈদিক ও শকদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ প্রভাবিত পৌরাণিক সূর্যোপাসনার অতিরিক্ত আরও এক বিশেষ প্রকৃতির সূর্যোপাসনার অস্তিত্ব ছিল। আদিঅস্ত্রাল (Proto-Australoiad) জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যেই ইহার অধিকতর প্রচলন দেখিয়া মনে হইতে পারে যে, ইহা ইহাদেরই উপজাতীয় কৃষ্টির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। আসামে খাসিয়াদিগের ভাষায় যেমন আদি-অস্ত্রাল জাতির সংস্কৃতি-চিহ্ন আজ পর্যন্ত বর্তমান রহিয়াছে, তেমনই তথাকার কয়েকটি কিরাত (Indo-Mongoloiad) জাতির শাখার মধ্যেও আদি অস্ত্রাল জাতির বিশিষ্ট সূর্যপূজার কিছু কিছু চিহ্ন আজিও বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশেও স্বভাবতই তাহার প্রভাব বর্তমান রহিয়া গিয়াছে; এই দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রচলিত বেদ ও পুরাণ বহির্ভূত সূর্যপূজার বিবিধ আচারের মধ্যে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের আদি-অস্ত্রাল জাতির শাখাভুক্ত ডোম জাতির মধ্যেও প্রাচীন কালে এই বিশিষ্ট সূর্যপূজার প্রচলন ছিল। কালক্রমে এই অঞ্চলে যখন বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে, তখন তাহা এই অঞ্চলেই বৌদ্ধধর্ম

১। T. C. Das, op. cit

দ্বারা প্রভাবিত হয়; বর্তমান হিন্দুধর্মের প্রভাবের যুগে সেই ধর্মের প্রভাবের উপর তাহা পুনরায় নূতন করিয়া হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়। কেহ আবার মনে করেন, কালক্রমে ইহার উপর মুসলমান ধর্মেরও কিছু প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।[১] ইহার উপর এই বিভিন্নমুখী ধর্মমতের প্রভাবের জন্য এই দেবতা এই অঞ্চলে কখনও বুদ্ধ, কখনও বিষ্ণুরূপে পূজিত হন। তথাপি তাঁহার প্রকৃত পরিচয়ও কোনদিন একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায় নাই। মধ্যে মধ্যে প্রত্যক্ষ সূর্যরূপেই তাঁহাকে ধ্যান করা হইয়াছে; যেমন, 'ধর্মপূজা-বিধান'-এ তাঁহার ধ্যানমন্ত্রের মধ্যে এই ধ্যানটিও পাওয়া যায়, যথা—

মণ্ডলং বর্তুলাকারং শূন্যদেহং মহাবলম্।
একচক্রধরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্।।[২]

ধর্মপূজার অন্যতম পুঁথি 'শূন্যপুরাণে' দ্বাদশ আদিত্যকে 'বার ভাই' বলিয়া উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকেও পুষ্প নিবেদন করা হইয়াছে—ইহা প্রত্যক্ষ সূর্যপূজা ব্যতীত আর কিছুই নহে। পূর্বেই বলিয়াছি ধর্মপূজার 'ঘরভরা' অনুষ্ঠানে প্রত্যেকটি পূজোপকরণই বারটি করিয়া প্রয়োজন হয়; বলা বাহুল্য, ধর্মপূজা সূর্যপূজা বলিয়া দ্বাদশ আদিত্যের সংখ্যা হইতে পূজোপকরণও দ্বাদশটির প্রয়োজন হয়। ধর্মপূজার ঘরভরা অনুষ্ঠানের আর এক নাম বার্মতি বা বারমতি;[৩] বার দিনে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় বলিয়াই ইহার এই নাম। 'বারমতি' ১২ বছর পর পর হইবার কথা, ইহাতে গ্রামবাসিগণ ১২ দিন 'নিয়ম' পালন করে, ১২ হাত লম্বা মণ্ডপে ১২টি ধর্মশিলা স্থাপন করে, ১২টি চাঁদযুক্ত চাঁদমালা ধর্মঠাকুরের গলায় দেওয়া হয়। গাজনে ১২ জন সন্ন্যাসী হইবার নিয়ম। দ্বাদশ আদিত্যের পূজা বলিয়াই বার সংখ্যার উপর এই গুরুত্ব দেওয়া হয়।

উল্লিখিত কারণেই সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে, ধর্মপূজা আদিম সূর্যপূজা ব্যতীত আর কিছুই নহে; ইহার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের সম্পর্ক পরবর্তীকালে স্থাপিত হইয়াছিল। তথাপি ইহার আদিম উপকরণ ইহার মধ্যে এখনও কিছু কিছু বর্তমানে আছে।

এইবার ধর্মঠাকুরের সঙ্গে ডোম জাতির সম্পর্কের কথা আলোচনা করিতে হয়। পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে দেখা গিয়াছে যে, ডোম জাতি ধর্মপূজায় একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। পূর্বে ঘরভরা উৎসবের যে বর্ণনাটি দিয়াছি, তাহা হইতে দেখা যাইবে, ব্রাহ্মণ ও ডোম উভয়েই সমান ভাবে ধর্মঠাকুরের পূজার আচারগুলি অনুষ্ঠান করিয়া চলিয়াছে, প্রভেদের মধ্যে এই যে ব্রাহ্মণ সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্র বলিতেছেন, ডোম বাংলা ভাষায় ছড়া বলিয়া যাইতেছেন। এই বিষয়ে সংশয় করিবার কোনই কারণ নেই যে, পূর্বে এই সকল অনুষ্ঠানে একমাত্র ডোমই আনুপূর্বিক পৌরোহিত্য সম্পন্ন করিত, বর্তমানে গ্রামে ব্রাহ্মণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুও এই পূজায় অংশ গ্রহণ করিবার জন্য ডোম পুরোহিতের পার্শ্বে ব্রাহ্মণ পুরোহিতও আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহারা যেন পরস্পর

১। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখিত ভূমিকা, শূন্যপুরাণ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ।।৯০-।।৯০;

২। ধর্মপূজাবিধান, ৫২

৩। মধ্যপ্রদেশের কোল জাতির মধ্যে 'বার্মতি' নামে এক দেবতা আছেন (W G Griffiths, *The Kol Tribes of Central India*, Calcutta, 1946. p. 133)। আপাতদৃষ্টিতে তাঁহার সঙ্গে ধর্মঠাকুরের কোনও সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না।

হাত-ধরাধরি করিয়াই এই কার্যে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন—ব্রাহ্মণ ও ডোমের এমন সম্মিলিতভাবে পূজানুষ্ঠান নির্বাহ করিবার চিত্র বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। পশ্চিমবাংলার হিন্দুর সামাজিক জীবনের এই যে একটি স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের মিলনচিত্র, তাহার তাৎপর্য গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

ধর্মঠাকুর মূলত ডোম জাতিরই দেবতা এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। বড় মন্দিরে এখনও সাংবাৎসরিক পুরোহিত ডোম, কেবলমাত্র বাৎসরিক পূজায় তিন চারিদিনের জন্য তাঁহার পার্শ্বে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের আবির্ভাব হয়। অবশ্য যে গ্রামে উচ্চবর্ণের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে ডোমের পূজার অধিকার একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও ধর্মপূজা সম্পর্কে ডোমেরই যে প্রকৃত অধিকার, এ বিষয়ে কেহই সংশয় প্রকাশ করেন না। বাঁকুড়া জিলার সংলগ্ন মানভূম জিলার ঘুটিতোড়া গ্রামের ব্রাহ্মণগণ ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজার সময় গ্রামান্তরের এক ডোমের বাড়ি হইতে একটি ধর্মশিলা ধার করিয়া আনিয়া নিজেরাই তাহার পূজা করেন—পূজান্তে ডোমের বাড়িতে তাহা পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গেও এমন কি, খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পর্যন্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের একটি উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তখন পর্যন্তও ডোম জাতির সঙ্গেই ধর্মপূজার একমাত্র সম্পর্ক ছিল বলিয়া মনে করা হইত। তাহাতে একজন বলিতেছেন, 'আঃ, আমি কি ডোম, যে ধর্মশাস্ত্র শেখে পণ্ডিত হব?'[১] অতএব ডোম ও ধর্ম প্রায় এক কথা বলিলেও চলে। বর্তমানে ডোম ব্যতীতও যে অন্যান্য নিম্ন জাতি এই ধর্মঠাকুরের পূজার পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়াছে, তাহার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডোমগণ নানা কারণে তাহাদের আদিম বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে, তখন তাহাদের পরিত্যক্ত মন্দিরসমূহ অন্যান্য নিম্ন জাতি, কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চ জাতিও, অধিকার করিয়া লইয়াছে। ডোম জাতির উত্থান-পতনের সঙ্গেই ধর্মঠাকুরের পূজার ইতিহাস জড়িত।

H. H. Risley তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ *Tribes and Castes of Bengal*-এ (Vol. I) ডোম জাতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু পশ্চিমবাংলার ডোম যে এক স্বতন্ত্র জাতি—বিহার কিংবা অন্যান্য অঞ্চলের ডোমের সঙ্গে তাহাদের যে পার্থক্য আছে—সে সম্বন্ধে তিনি কিছু উল্লেখ করেন নাই। এই বিষয়টিতে সর্বপ্রথম W. B. Oldham এর দৃষ্টি পড়িয়াছিল, কিন্তু তিনি ইহার আর বিস্তৃত আলোচনা করেন নাই। পশ্চিমবাংলার ডোম জাতির উদ্ভব ও পরিচয়কে তিনি 'inexplicable' বলিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থ *Some Historical and Ethnic Aspects of the Burdwan District* (Calcutta, 1894) নামক গ্রন্থে বর্ধমান জিলার ডোম জাতি সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন (p. 17), 'The inexplicable Domes are over 50,000 strong, none of them, as far as my enquiries went, calling themselves Maghaihia, as do the most settled and respectable section of the race in the Katauri land (in Bihar) and its most nomad and criminal portion in Saran, Champaran and Gorakhpur.'

বর্তমানে বিহারে একশ্রেণীর ডোম আছে, বাংলার প্রান্তবর্তী জিলাসমূহেও তাহাদের

১। 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' (কলিকাতা, ১৩০৮), পৃ. ৫৬

সংখ্যা কম নহে, তাহারা নিজেদের মঘৈয়া বা তুরী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। তাহাদের সঙ্গে ধর্মপূজার কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু মানভূম প্রমুখ বাংলার সংলগ্ন জিলাসমূহে আর একশ্রেণীর ডোম এখন পশ্চিমবঙ্গ হইতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহারা নিজেদের বাঙ্গালী ডোম বলিয়া পরিচয় দেয়। মঘৈয়া কিংবা তুরী ডোমদিগের সঙ্গে তাহাদের কোন প্রকার সামাজিক সম্পর্ক নাই, তাহাদের মাতৃভাষা বাংলা, মানভূম জিলায় বাস করিলেও মঘৈয়া ডোমগণ হিন্দী ভাষাতেই কথা বলিয়া থাকে, অতএব তাহারা হিন্দী ভাষাভাষী কোনও অঞ্চল হইতে গিয়া ঐ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছে, বাঙ্গালী ডোমগণ স্বভাবতঃই বাংলাদেশ হইতে সে দেশে গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে ডোম যে এক অত্যন্ত প্রাচীন অধিবাসী এই বিষয়ে বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে ও লোক-সংস্কৃতিতে কিছু কিছু প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। শুধু প্রাচীন অধিবাসীই নহে, সমাজের মধ্যে তাহাদের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল, তাহা কেবলমাত্র তাহাদের সামাজিক সংহতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, আধ্যাত্মিক সাধন-ভজন ও দৈহিক শক্তির ক্ষেত্রেও তাহা বিস্তৃত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তীকালে প্রাচীন বাংলাভাষায় রচিত বৌদ্ধগান ও দোঁহা গ্রন্থে ডোম্ব বিশেষত ডোম্বী (ডুম্‌নী) সম্পর্কে যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে মনে হয়, দেশের সাধন-ভজনের মধ্যে তাহারা একটু বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। তারপর পশ্চিমবঙ্গের ছেলেভুলানো যে-সব ছড়া আজিও শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের কোন কোনটির মধ্যেও ডোম জাতির বীরত্বের কাহিনীই কীর্তন করা হইয়াছে। যেমন 'আগডুম, বাগডুম, ঘোড়াডুম সাজে', ইহা একটি ডোম চতুরঙ্গ সেনার বর্ণনা। বাদ্যকারের বৃত্তি ডোম জাতির জীবিকা অর্জনের অন্যতম উপায়, সেই সূত্রে তাহারা বাংলার লোক-সংস্কৃতিতে ডমরু বা ডম্বরু (ডোম-উরু) প্রমুখ বাদ্যযন্ত্র দান করিয়াছে। রাঢ়ের জাতীয় উপাদানে গঠিত মধ্যযুগের বাংলার লোক-সাহিত্যে ধর্মমঙ্গল নামক যে আখ্যানকাব্যের সৃষ্টি হইয়াছিল,—ইহার কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি,—তাহা প্রকৃতপক্ষে এই ডোম জাতিরই বিজয়-গাথা।

ডোম জাতি পশ্চিমবাংলার সীমান্তবর্তী উপজাতীয়দিগের মত মূলত অস্ট্রিক ভাষা-ভাষী ছিল বলিয়া মনে হয়। ডোম শব্দটি যে অস্ট্রিক ভাষা হইতেই আগত, এই বিষয়ে কাহারও কোনও সংশয় নাই। এ কথা অতি সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে, যখন আমাদের পূর্বালোচিত আদিম সূর্যোপাসনা আসাম হইতে মধ্যপ্রদেশের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বিভিন্ন আদিম জাতির শাখার মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তখন রাঢ়ের অধিবাসী ডোম জাতিও ইহার প্রভাব হইতে পরিত্রাণ পায় নাই—তখন হইতেই তাহাদের মধ্যে সাদা পশু কিংবা সাদা পক্ষী বলি দিয়া ভূমি কিংবা নারীর উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য তাহার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। তারপর ঐতিহাসিক যুগে রাঢ়দেশে ক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হইল। তাহার ফলে এই অঞ্চলের ডোম জাতির সামাজিক সংহতি বিনষ্ট হইল, যে সমাজের উপর তাহারা প্রভুত্ব করিত, সেই সমাজের উপর নবাগত ব্রাহ্মণ সমাজ আসিয়া আধিপত্য স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইল। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, ডোম জাতির সামাজিক সংহতি অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল; সেইজন্য আজ পর্যন্তও সকল অঞ্চলে অন্তত ডোম জাতির নিজস্ব 'পরমেশ্বর'-এর (Supreme God) পূজা সম্পর্কে ব্রাহ্মণ জাতির এই প্রয়াস সর্বাংশে সাফল্য লাভ করিতে পারে

নাই। উপরের বর্ণনাই ইহার প্রমাণ।

সাধন-ভজনের পরবর্তী যুগে যখন রাঢ়ের উপর বহিরাগতের আক্রমণ শুরু হইল, তখন ডোম জাতি তাহাদের দৈহিক শক্তির উৎকর্ষের জন্য এক পরাক্রমশালী যোদ্ধ জাতিতে পরিণত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই যুগই উপরি-উদ্ধৃত ছেলে-ভুলানো ছড়ার রচনার যুগ। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে একদিকে তাহাদের যেমন উচ্চ চরিত্রগুণের কথা কীর্তিত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনই তাহাদের পরাক্রমশীলতার কথাও বর্ণিত হইয়াছে। যে জাতির কোন নৈতিক ঐতিহ্য নাই, তাহার মধ্যে উচ্চ চরিত্র-গুণ বিকাশ লাভ করিতে পারে না। ডোম জাতির পরাক্রমশীলতা তাহার নৈতিক ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল; মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গলের ব্রাহ্মণ কবিগণও তাহাদের মহিমা-কীর্তন না করিয়া পারেন নাই। মধ্যযুগে রাঢ় দেশ বহিরাগতের আক্রমণের ফলে নানাভাবে উপদ্রুত হইয়াছিল, যেমন পাল রাজত্বে গৌড়ীয় পালরাজাদিগের রাঢ় আক্রমণ, ইহার কথা ধর্মমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত আছে, সেন রাজগণের রাঢ় দেশে প্রতিষ্ঠা স্থাপন, পাঠান আমলে বাংলার হুসেন সাহের সঙ্গে উড়িষ্যার প্রতাপ রুদ্রের যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদির ফলে রাঢ় দেশকে সর্বদাই বহিরাক্রমণের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; বিভিন্ন স্থান হইতে এই সম্পর্কে যে তথ্য সংগ্রহ করা যায়, তাহাতে মনে হয়, এই সকল আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে ডোম সৈন্যগণ প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। তারপর আরও পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুর ও স্থানীয় অন্যান্য রাজগণ নিজেদের রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার জন্য ডোম, মাল, বাগ্দী প্রভৃতিকে সৈন্যরূপে ব্যবহার করিতেন। তখন পর্যন্ত বাঙ্গালী ডোম জাতির সামাজিক সংহতি প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়াই মনে হয়। তারপর ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার পর যখন এই অঞ্চলের বহিরাক্রমণের আশঙ্কা দূর হইয়া যায়, তখন স্বভাবতই ডোম সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া যায়। তাহাদের সৈন্যবৃত্তি লুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপর আর এক নূতন বিপদ দেখা দেয়। দেশে ডাকাতি প্রভৃতি ঘটনা ঘটিলে পুলিস তাহাদিগকেই সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে, ডোম জাতির লোক মাত্রকেই পুলিস 'criminal' বলিয়া গণ্য করিতে থাকে। তাহারা এই কার্যে যে একেবারে নিরপরাধ ছিল, এমনও মনে হয় না; কারণ, যুদ্ধবৃত্তি যাহাদের দীর্ঘকাল ব্যবসায় ছিল, তাহারা সহজে নিতান্ত নিরীহ কৃষকে পরিণত হইয়া যাইতে পারে না। এই সূত্রে তাহাদের উপর পুলিসের কিছু অত্যাচারও চলিতে থাকে। ডোম তাহাদের প্রতিবেশী বাউরীর মত নহে। বাউরীর কোন ইতিহাস নাই, কোন ঐতিহ্য নাই, তাহাদের আত্মমর্যাদাবোধ নাই। কিন্তু ডোমের ইতিহাস আছে, তাহাদের আত্মমর্যাদাবোধও আছে। পুলিসের এই অত্যাচার সহ্য করা অপেক্ষা তাহারা দেশত্যাগ করিয়া ক্রমে ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যায় ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। সেই সূত্রে তাহাদের Supreme God-এর বা ধর্মঠাকুরের নামটি ঐসব অঞ্চলে বিভিন্ন আদিম জাতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। ডোম জাতি নিজের দক্ষতার বলে অনেক ক্ষেত্রেই আদিম জাতিকে প্রভাবিত করিয়াছে, তাহাদের নিজস্ব দেবতার নামটির ব্যাপক প্রচার তাহাদের অন্যতম। ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার প্রায় সকল আদিম জাতি অধ্যুষিত গ্রামেই ডোমগণ এখন কেহ চৌকিদার কিংবা কেহ মহাজনের কাজ করিয়া থাকে। তাহাদের ভাষা এখন সাদরি বা দক্ষিণী হিন্দী কিংবা ওড়িয়া, বাংলা ভাষা প্রায় কেহই বলিতে পারে না; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই এখনও জানে যে তাহারা এককালে বাংলাদেশের অধিবাসী ছিল, বাংলা ভাষা না জানিলেও তাহারা নিজেদের বাঙ্গালী ডোম বলিয়াই পরিচয় দেয়। ইহাদের শারীরিক গঠন ও সামাজিক

আচার-বিচার লক্ষ করিলে ইহারা যে পশ্চিমবঙ্গেরই পূর্বপুরুষের সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হইয়াছে, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইহাদের মেয়েরা ঠিক বাঙ্গালী মেয়েদের মত করিয়া শাড়ি পরে, চুল বাঁধে; ইহাদের পুরুষেরা এখনও 'ধরম দেবতা'র নাম করিয়া সূর্যদেবতার নিকট সাদা মুরগী বলি দিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, মানভূম জিলা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে ধর্মপূজার বিস্তৃত আচারের সঙ্গে আর সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। আদিবাসী ধর্মীয় আচারের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের পূজার পূজাচার মিশিয়া গিয়াছে।

এইবার পশ্চিমবঙ্গের ধর্মপূজার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা অনেকটা সহজ হইয়া আসিয়াছে। উপরের আলোচনা হইতে দেখিতে পাওয়া গেল যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত রাঢ় বলিয়া পরিচিত অঞ্চলে ডোম নামক জাতি সুসংহত সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিত। তাহারা এক অতি প্রাচীন পদ্ধতিতে সূর্যদেবতার উপাসনা করিত, তাহাদের মতে সূর্যদেবতা শ্বেতবর্ণ বলিয়া পরিকল্পিত হইত এবং সেই দেবতাকে তাহারা শ্বেতবর্ণের পশু বলি দিয়া তুষ্ট করিত। ইনি তাহাদের 'পরমেশ্বর' (Supreme God) ছিলেন। ক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দুগণ সেই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়া সেই দেবতার মধ্যে নিজেদের ধর্মের কিছু কিছু উপাদান মিশ্রিত করিয়া দিয়া তাঁহাকে নিজেদের বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের পরিকল্পনায় এই দেবতার মৌলিক আদিম উপাদানগুলি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইল না। এইভাবে ডোম জাতির 'পরমেশ্বর' সূর্য, বৌদ্ধ নিরঞ্জন ও হিন্দু বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইলেন। অতএব ধর্মপূজার মধ্যে বৌদ্ধধর্মের কিছু কিছু উপাদান দেখিয়া ধর্মঠাকুরকে বুদ্ধ ও হিন্দুধর্মের কিছু কিছু উপাদান দেখিয়া তাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া দাবী করা ভুল হয়।

ধর্মপূজার মধ্যে সূর্যোপাসনার তিনটি ধারা, যথা—একটি আদিম (primitive), একটি বৈদিক ও একটি পারসিক একত্র মিশিয়া গিয়াছে। অবশ্য বৈদিক ধারাটি ইতিপূর্বেই পৌরাণিক বিষ্ণু উপাসনার মধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সেই সূত্রে ধর্মপূজার মধ্যে হিন্দু-প্রভাবিত অঞ্চলে বিষ্ণু-আরাধনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এখন পর্যন্ত রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের যে ধ্যান-মন্ত্রটি তাঁহার পূজা উপলক্ষে আবৃত্তি করা হইয়া থাকে (পূর্বে দ্রষ্টব্য), তাহার মধ্যে ইহার আদিম পরিচয়ের অর্থাৎ সূর্যরূপের এখনও সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

ধ্যান-মন্ত্রের মধ্যে 'শূন্যমূর্তি' বলিয়া যে কথাটি উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতেই স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার সঙ্গে বৌদ্ধ শূন্যবাদ বা nihilism এর সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু 'শূন্যমূর্তি'র অর্থ cipher বা circular shaped বা গোলাকৃতি; ইহা সূর্যেরই একটি গুণ, বৌদ্ধধর্মের কিছু নহে। এই অর্থেই শব্দটি 'ধর্মপূজাবিধান' নামক গ্রন্থেও গৃহীত হইয়াছে, ধর্মঠাকুরের বন্দনায় সেখানেও বলা হইয়াছে,

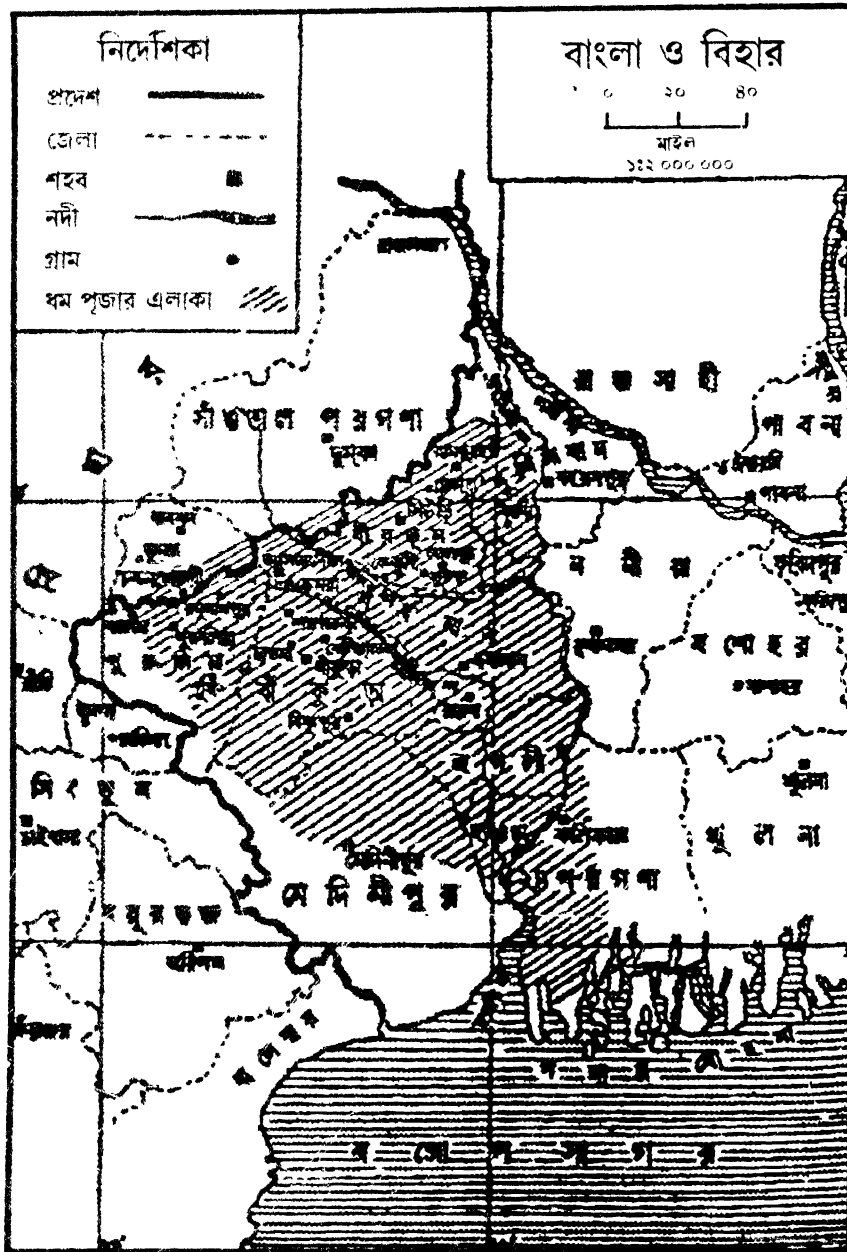
মণ্ডলং বর্তুলাকারং শূন্যদেহং মহাবলম্।
একচক্রধরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্।।

এখানে 'শূন্যদেহ'কেই সূর্য বলা হইয়াছে, অতএব 'শূন্যমূর্তি'ও যে সূর্য এই বিষয়ে সংশয় করিবার কোন কারণ নাই।

এখানে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়, ধর্ম নামটির কোথা হইতে উৎপত্তি হইল। যদিও শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি এই বিষয়ে

সকলেই একমত যে, শব্দটি কোন সমোচ্চায় অস্ট্রিক জাতীয় শব্দের আধুনিক সংস্কৃত রূপ। বৌদ্ধ কিংবা হিন্দু প্রভাবের যুগেই এই অঞ্চলের নবাগত বৌদ্ধ কিংবা হিন্দুগণ যখন নিজেদের মধ্যে এই দেবতার পূজাকে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখনই দেবতার নামটিও তাঁহারা এমনই ভাবে সংস্কৃত করিয়া ইহার একটু আভিজাত্য বাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে দেবতার অস্ট্রিক নামটি কি ছিল? এই বিষয়ে অনুমান ভিন্ন নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই। কিন্তু এই বিষয়ে কোনও কিছু অনুমান করিবার পূর্বে একটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ রাখা প্রয়োজন যে, ডোমের সঙ্গে যখন দেবতাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়, তখন এই দেবতার নামটির মধ্যেও ডোম কথাটি মূলত কোনও না কোনও ভাবে বর্তমান থাকা অসম্ভব নহে। কারণ, পূর্বেই দেখাইয়াছি, ইহাদের পরস্পর অতি নিকট সম্পর্কের জন্য ডোম আর ধর্ম প্রায় একার্থবাচক শব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাংলার বাহিরেও যেখানেই ডোম জাতি গিয়াছে, সেখানেই ধর্ম বা তাহার সমোচ্চার্য কোন শব্দ, যেমন 'ধরম', 'দেরাম্ম', 'ধর্মেশ' ইত্যাদি প্রচার লাভ করিয়াছে। আসাম প্রদেশে ডোমের অধিকার বিস্তৃত হইতে পারে নাই, সেখানে সূর্যদেবতার নামে ধর্ম শব্দও পরিচয় লাভ করিতে পারে নাই। ছোটনাগপুর অঞ্চলেও যে সকল আদিম সমাজ আজিও সংহত জীবন যাপন করিতেছে, সেখানেও বহিরাগত ডোমের প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে নাই; সেই সকল সমাজের সূর্যদেবতা আদিম জাতির নিজস্ব অনার্য নামেই পরিচিত। অতএব বাঙ্গালী ডোমের সঙ্গে ধর্ম নামটির সম্পর্ক অতি নিবিড়। সেইজন্য ধর্ম শব্দটির উৎপত্তির মূলেও কোনও না কোনও ভাবে ডোম শব্দটির অস্তিত্ব কল্পনা করা অসমীচীন হইবে না। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের যে বিভিন্ন স্থানীয় নাম ব্যবহৃত হয়, তাহাতে সর্বদাই 'রায়' কথাটি যুক্ত হইয়া থাকে; যেমন কালু রায়, বাঁকুড়া রায়, বুড়া রায় ইত্যাদি। 'রায়' কথাটি 'রাজ' শব্দ হইতে আসিয়াছে এবং হিন্দুপ্রভাবের যুগেই ধর্মঠাকুরের স্থানীয় নামের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রধানত ডোমদিগের পূজিত দেবতা বলিয়া রাঢ় অঞ্চলে নবাগত বৌদ্ধ ও হিন্দু বসতিস্থাপনকারিগণ বোধ হয় এই দেবতাকে 'ডোম রায়' বলিয়াই উল্লেখ করিত। 'ডোম রায়' হিন্দুপ্রভাবের যুগে ধ্বনিতত্ত্বের (phonology) সাধারণ নিয়মানুসারেই প্রথমত বর্ণ বিপর্যয়ে এবং দ্বিতীয়ত সংস্কৃতীকরণ (Sanskriti-sation) নীতি দ্বারা 'ধর্ম' কথাটিতে এই ভাবে পরিবর্তিত হইয়া থাকিবে, যেমন, ডোম রায়>ডোম্‌রা Domra> ডোম্‌রা> ডোর্‌মা>ধর্ম। পশ্চিম বর্ধমানে নিত্যানন্দপুর গ্রামে 'ডোমুর‍্যা' নামক এক ধর্মরাজ আছেন, তাঁহার সঙ্গে ডোম্‌রা বা ডোম রায় কথাটির সম্পর্ক থাকিতে পারে। বর্ধমান জিলার ডোম্‌বা, বীরভূম জিলার ডুম্‌রা ও মানভূম জিলার ডুম্‌রাও নামক গ্রামসমূহে প্রাচীন ধর্মমন্দির ও ডোম জাতির ঘন বসতি আছে। ইহাদের সঙ্গেও 'ধর্ম' কথাটির সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয়। ক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দুপ্রভাবিত যুগে রাঢ়ে প্রচলিত সূর্যদেবতার ডোমের সঙ্গে সম্পর্কিত অনার্য নামটির পরিবর্তে ধর্ম কথাটির ব্যাপক প্রচার হয়—কারণ ধর্ম এক অর্থে বুদ্ধ, আবার হিন্দু পুরাণের মতে যম। তখন ধর্ম নামটিকে বৌদ্ধ সমাজ বুদ্ধ এবং হিন্দু সমাজ যম কল্পনা করিল। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম যখন হিন্দুধর্মের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিল, তখন ধর্মঠাকুরের বুদ্ধ পরিকল্পনাও হিন্দু-পরিকল্পনার মধ্যে আসিয়া সংমিশ্রণ লাভ করিল; সেইজন্য ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণ পুরোহিত কর্তৃক বিষ্ণু কিংবা যম বলিয়া কল্পিত হইয়াও নিরঞ্জন বলিয়া অভিহিত হন।

ধর্মপূজা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচার লাভ করিবার ফলে আর এক দিক দিয়া একটি বড় সুফল দেখা গিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ



নির্দেশিকা
প্রদেশ
জেলা
শহর
নদী
গ্রাম
ধর্ম পূজার এলাকা
বাংলা ও বিহার
০ ২০ ৪০
মাইল
১:২ ০০০ ০০০
সাঁওতাল পরগণা
মেদিনীপুর
খুলনা
যশোহর
বঙ্গোপসাগর

ধর্মপূজার এলাকা

শতাব্দী পর্যন্ত রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে ধর্মমঙ্গল নামক এক অতি সমৃদ্ধ সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। মধ্যযুগের বাংলায় মঙ্গলকাব্য নামে যে এক শ্রেণীর আখ্যান-কাব্য প্রচলিত ছিল প্রধানত তাহাদের আদর্শে ইহা রচিত হইলেও ইহার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, ইহার ভিত্তি যেমন ঐতিহাসিক তেমনই রাঢ়ের জাতীয় চরিত্র ইহার অবলম্বন। এই দিক দিয়া গতানুগতিক অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে ইহার পার্থক্য রহিয়াছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যকে রাঢ় দেশের জাতীয় মহাকাব্য বা 'এপিক' বলা হইয়া থাকে —ইহাই রাঢ়ের রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত। কয়েকজন কবির প্রথম শ্রেণীর কবি-শক্তি ইহার সৃষ্টিমূলে নিয়োজিত হইয়া ইহাকে এই অপূর্ব জাতীয় গৌরব দান করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহার মধ্যে রাঢ়ের ডোম-চরিত্রই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, শুধু পুরুষ নহে, ডোম নারীগণও বীরত্ব, সাহসিকতা, কর্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি গুণে যে কাহারও অপেক্ষা পশ্চাৎপদ নহে, উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ কবিগণও তাহা উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সহিত কীর্তন করিয়াছেন। মধ্যযুগের বাংলার সমাজের নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের মধ্যে এত মহিমার সন্ধান আর কোথাও পাওয়া যায় না।

উপজাতির নাম	পরমেশ্বরের নাম	পরমেশ্বরের পরিচয়	বলি	শাস্তি
মালপাহাড়িয়া	ধর্মের গোঁসাই	সূর্য		
ওরাওঁ	ধর্মি ধর্মেশ	,,	সাদা পশু বা মোরগ	কুষ্ঠরোগ
মুড়া (মুণ্ডা)	সিং বোঙ্গা	,,		
সাঁওতাল	,,	,,	সাদা মোরগ	
বীরহোড়	,,	,,	পাঁঠা	
হো	,,	,,	সাদা মোরগ বা মোরগ	
খরিয়া	ধর্ম	,,	মোরগ	
পার্বত্য খরিয়া	গিরিং	,,		
ভুঁইঞা	ধরম দেওতা	,,	সাদা পাঁঠা বা মোরগ	
বোণ্ডো	,,	,,		
গদ্‌রা	,,	,,	সাদা মোরগ	
শেওরা (শবর)	দেবেম্ম, দেরম্মসুম	,,	,,	
জুয়াঙ্	ধরম দেওতা	,,	সাদা পাঁঠা	কুষ্ঠরোগ
কন্দ্	ধর্ম-পেন্ন	,,		
করোয়া	ভগবান্	,,	সাদা মোরগ	
কোল	সিং বোঙ্গা	,,	,,	
ডোম (পশ্চিমবঙ্গ)	ধর্ম	,,	সাদা পাঁঠা	কুষ্ঠরোগ

আদিবাসীর ধর্মপূজা

ধর্মমঙ্গলের ঐতিহাসিকতা

ধর্মমঙ্গল কাব্য যখন রচিত হইয়াছে, তখন আদিম জাতির এই সূর্যদেবতা বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের ভিতর দিয়া আসিয়া এক অভিনব মিশ্র পরিচয় লাভ করিয়াছেন —সেইজন্য তাঁহার মৌলিক পরিচয়টি পণ্ডিতমণ্ডলীকে এত বিভ্রান্ত করিয়াছে। কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেবতা কোনদিনই মুখ্য ছিল না বলিয়াই ইহার সাধারণ, পৃষ্ঠপোষকদিগের মধ্যে দেবতার বিষয়ে কোনদিনই ঔৎসুক্য দেখা যায় নাই। বিশিষ্ট ধর্মোপাসনার মাহাত্ম্য বর্ণনা ব্যতীতও ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে ক্রমে ক্রমে এমন সব উপকরণ গিয়া প্রসার লাভ করিয়াছে, যাহাতে ইহার সংস্কারের সাম্প্রদায়িক পরিচয়টি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে,— পরবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিই ইহার প্রমাণ। ইহাদের মধ্যে ইছাই গোয়ালার বীরত্ব, কালু ডোমের প্রভুভক্তি, কানড়ার দেশপ্রেম, রঞ্জাবতীর পুত্রবাৎসল্য ইত্যাদি এত আকর্ষণীয় হইয়া উঠিল যে, ইহাদের প্রভাবে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে দেশবাসীর মৌলিক সম্পর্কের কথা সকলে বিস্মৃত হইয়া গেল। ইহার কাহিনী একেবারে কাল্পনিক নহে—ইহাতে বর্ণিত চরিত্রগুলির ভিতর দিয়া মানব-চরিত্রের মাহাত্ম্যই কীর্তিত হইয়াছে। এই ভাবে ইহা মানুষেরই মহিমা-প্রকাশক কাব্য বলিয়া একটি উপজাতীয় দেবতাকে আশ্রয় করিয়া রচিত হইলেও ইহার প্রসার ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছিল।

এই কাব্য প্রচারের কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণও ছিল। যে সময়ে সাধারণত ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি বিশেষভাবে রচিত হইতে আরম্ভ করে, সেই সময়ের রাঢ়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, তখন সে দেশে অরাজকতার যুগ। খ্রী ষোড়শ শতাব্দীর উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রের সহিত বাংলার নবাব হুসেন শাহের যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্গীর আক্রমণ পর্যন্ত রাঢ়দেশ নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। ইহা দ্বারা দেশের আভ্যন্তরিক শান্তি একেবারে লোপ পাইয়াছিল। অতএব তখন স্বভাবতই দেশের লোক লাউসেনের যুদ্ধবৃত্তান্ত শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিল। এই সকল কারণেও এই বিশেষ লৌকিক দেবতাটির নাম তিন চারিটি জিলার মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিল। জাতীয় কাব্যরস-পিপাসার নিবৃত্তিই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, ধর্মঠাকুরের নাম একটা উপলক্ষ হইল মাত্র।

পূর্বেই বলিয়াছি, ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তবে তাহা শুধু কবির কল্পনায় কিছু কিছু পল্লবিত হইয়াছে, এই মাত্র। ধর্মমঙ্গলের বিভিন্ন কবিগণ ইহার কাহিনীগত ঐক্য সর্বত্রই রক্ষা করিয়াছেন। অবশ্য এই কাব্য একই স্থানে বিকাশ লাভ করিয়াছিল বলিয়া ইহাতে কাহিনীগত ঐক্য বিনষ্ট হইবার কোনও কারণ ছিল না। এখন কাব্যোক্ত চরিত্রগুলির ঐতিহাসিক মূল্য কি, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাইবে।

কাহিনীভাগে উল্লিখিত আছে যে, ধর্মপালের পুত্র যখন গৌড়ের অধিপতি তখন তাঁহার সামন্তরাজ সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হয়। কিন্তু কোনও ধর্মমঙ্গল কাব্যেই ধর্মপালের পুত্রের নামটির উল্লেখ নাই। ঘনরাম চক্রবর্তী লিখিয়াছেন,—

ধর্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর।
প্রসঙ্গে প্রসবে পুণ্য পাপ যায় দূর।।
পৃথিবী পালিয়ে স্বর্গ ভুঞ্জে নৃপবর।
বীর্যবন্ত পুত্র তার গৌড়ের ঈশ্বর।।

রূপরামের ধর্মমঙ্গলেও আছে,—

মহী নব রাজা সুধর্মপাল রায়।
তার পুত্র রাজা হয় শুনিতে উল্লাস।।

প্রায় প্রত্যেক ধর্মমঙ্গল কাব্যেই বর্ণিত একটি ঘটনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ধর্মপালের পুত্র এই গৌড়েশ্বর সিন্ধু বা সমুদ্রের ঔরসে রাণী বল্লভার গর্ভে জাত জারজ সন্তান—এই কাহিনী পালরাজাদিগের উৎপত্তিমূলক কিংবদন্তী হইতে যে জাত এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত'-এ ধর্মপালকে 'সমুদ্র-কুল-দীপ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[১] রামদাস আদকের ধর্মমঙ্গলে ধর্মপালের রাণী বল্লভাকে মান্ধাতা বংশের কন্যা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[২] একজন গুজরাটি লেখকের একখানি সংস্কৃত আখ্যায়িকা-কাব্যে ধর্মপালকে মান্ধাতা বংশের সন্তান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[৩] অতএব দেখা যাইতেছে, ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি পালরাজগণ সম্পর্কিত জনশ্রুতিসমূহ অবলম্বন করিয়াই রচিত। এই সকল জনশ্রুতি বহুলাংশেই ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়।

তাহা হইলে এই ধর্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বর কে? পালরাজদিগের বংশলতিকা লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে গোলযোগ আছে, সেইজন্য এই সম্বন্ধেও নানা জন নানা মত পোষণ করেন। সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত শূন্যপুরাণের ভূমিকায় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বাংলার প্রাচীন বংশাবলীর উপর নির্ভর করিয়া এই ধর্মপালের পুত্র বলিয়া দ্বিতীয় ধর্মপাল নামক একজন গৌড়ের পালরাজের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু স্বতন্ত্র কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ হইতে দ্বিতীয় ধর্মপাল বলিয়া কাহারও পরিচয় উদ্ধার করা যায় না। পালরাজদিগের বংশাবলী সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয়, তাহাতে

১। রামচরিত, ১, ৪.
২। রামদাস আদক (পরে দ্রষ্টব্য), ১৩৮;
৩। P.L.Paul, *The Early History of Bengal,* 1 (Calcutta, 1943)

দেখা যায়, ধর্মপালের পুত্র দ্বিতীয় ধর্মপাল বলিয়া কেহ নাই।

পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের পুত্র ধর্মপাল পালরাজদিগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন। তাঁহার সময়ে পাল-সাম্রাজ্য উত্তর ভারতে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সম্রাট ধর্মপাল 'পরম ভট্টারক', 'পরমেশ্বর', 'মহারাজাধিরাজ' প্রভৃতি রাজগৌরবসূচক পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শৌর্যবীর্যের কাহিনী সমাজে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল, সেইজন্য তাঁহার পুত্রের পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁহারই নামোল্লেখ করা হইয়াছে।

ধর্মপালের পুত্রের নাম দেবপাল। তিনি আনুমানিক ৮১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করেন। তিনি তাঁহার খুল্লতাতপুত্র জয়পালের সাহায্যে উৎকল বা কলিঙ্গ ও কামরূপ জয় করেন। পালরাজদিগের ভাগলপুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে যে, দেবপালের সেনাপতি জয়পাল উৎকলের রাজাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন, এবং প্রাগজ্যোতিষের রাজাকেও পরাজিত করেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে গৌড়েশ্বরের একজন সামন্ত রাজপুত্র কর্তৃক এই দুইটি উল্লেখযোগ্য অভিযানের কথাই বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে কলিঙ্গ-বিজয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে কিছু উল্লেখ নাই; সামান্য একটি ইঙ্গিত হইতে মনে হয়, ধর্মমঙ্গলের কবিগণ ইহা হইতেই লাউসেন কর্তৃক কলিঙ্গ-বিজয়ের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। ইঙ্গিতটি এই যে, তাঁহারা লিখিয়াছেন, কামরূপের রাজা কর্পূর ধলের কন্যার নাম কলিঙ্গা। কিন্তু কামরূপপতির কন্যার নাম কলিঙ্গা হইতে পারে না। ইহা দ্বারা বিজিত কলিঙ্গ-রাজেরই কন্যার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তবে ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের ভ্রমবশত কামরূপের অধিপতির সঙ্গে কলিঙ্গ রাজকন্যার নাম আসিয়া যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। লাউসেন কর্তৃক কলিঙ্গ ও কামরূপ বিজয়ের দুইটি স্বতন্ত্র কাহিনী এখানে একত্র মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।

স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'রামচরিত'-এর ভূমিকায় ধর্মমঙ্গলোক্ত ধর্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বরকে দেবপাল বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, লাউসেন ও ইছাই ঘোষ দেবপালেরই দুইজন সামন্ত রাজা ছিলেন। ইতিহাসে দেবপালের সহিত কামরূপ ও কলিঙ্গের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতেও তদনুরূপ কাহিনীর সমাবেশ হইতেই অনেকে এই মতই যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটু গোলযোগ আছে। একখানি প্রাচীন তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঢেক্করী বিষয়ের সামন্ত রাজা মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ নিব্বোক শর্মা নামক একজন ব্রাহ্মণকে দিগ্‌ঘ্যাসোদিয়া নামে একখানি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছেন।[১] তাম্রশাসনখানিতে কোন তারিখের উল্লেখ নাই, কিন্তু স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ

[১] । N. G Majumder, *Inscriptions of Bengal* (Rajshahi, 1929) III, 154.

লিপিবিশেষজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন, ইহা খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই ঈশ্বর ঘোষ ও ধর্মমঙ্গল কাহিনীর ইছাই ঘোষ অভিন্ন.— ঢেক্করী ও ঢেকুর একই স্থানের নাম, তাম্রশাসনে উল্লেখিত আছে—ঈশ্বর ঘোষের পিতার নাম ধবল ঘোষ, কিন্তু ধর্মমঙ্গলের কাহিনীতে ইছাই ঘোষের পিতার নাম সোম ঘোষ। স্বর্গত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় অনুমান করেন, "একজনের দুইরূপ নাম থাকা অসম্ভব নয়। কিংবা ময়ূরভট্ট প্রকৃত নাম বিস্মৃত হইয়া অর্থ চিন্তা করিয়া 'সোম' নাম রাখিয়াছেন।"[১]

ধর্মমঙ্গলের ইছাই ও তাম্রশাসনের ইছাই ঘোষ যদি অভিন্ন হয় এবং খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে যদি ঈশ্বর ঘোষ তাম্রশাসন লিখাইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই সময়ে গৌড়েশ্বর দেবপালকে পাওয়া যায় না। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, দেবপালের সময় আনুমানিক নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধ বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অনুমান করিয়াছেন। অতএব ধর্মমঙ্গল কাহিনীর মতে এই তাম্রশাসনোক্ত ঈশ্বর ঘোষ দেবপালের সামন্ত রাজা হইতে পারেন না। এই অনুসারে দেখা যাইতেছে, ঈশ্বর ঘোষ আরও প্রায় তিনশত বৎসর পরে আবির্ভূত হন।

সেইজন্য কেহ আবার অনুমান করেন, হয়ত এই গৌড়েশ্বর বাংলার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেন।[২] তিনি দ্বাদশ শতকেই গৌড়ের অধিপতি ছিলেন, তাঁহারই সামন্ত রাজা ঈশ্বর ঘোষ বা ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হইয়া লাউসেনের হস্তে পরাজিত হন। লক্ষ্মণসেনদেব কলিঙ্গ ও কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। হয়ত লাউসেন তাঁহার এক সামন্ত সেনাপতি ছিলেন, উভয়ের নামে সেন দেখিয়া মনে হয়, তাঁহাদের মধ্যে বন্ধু-সম্বন্ধ ছিল।[৩] কিন্তু এই ধারণা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, সেনরাজদিগের রাঢ়ভূমির উপরই সর্বপেক্ষা অধিক প্রভাব ছিল। তাঁহারা সর্বপ্রথম রাঢ়েই বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তথাকার কোন সামন্ত রাজের সঙ্গে লক্ষ্মণ সেনের যুদ্ধবিগ্রহের কোন ইঙ্গিত ইতিহাসেও পাওয়া যায় না। অথচ পালরাজদিগের সঙ্গে রাঢ়ের সামন্তরাজদিগের নিত্য যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত, ইতিহাসে তাঁহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পালরাজগণ উত্তর ভারতে বহুদূর রাজ্য বিস্তৃত করিলেও তাঁহাদের রাঢ় ও বঙ্গে অধিকার স্থাপন করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে। বস্তুত ধর্ম মঙ্গল কাব্যগুলি পালরাজদিগের রাঢ়ে বিদ্রোহ দমনের কাহিনী লইয়াই রচিত। এ'কথা পূর্বেও একবার উল্লেখ করিয়াছি।

বিশেষত ধর্মমঙ্গলকাব্যগুলি এক বাক্যে গৌড়েশ্বরকে ধর্মপালের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিতেছে। লক্ষ্মণসেন বহু পরবর্তী কালের লোক, বাংলার ইতিহাসে তাঁহার নাম সুপরিচিত।

১। সা-প-প ৩৮, ৭৯;
২। ঐ ৮০
৩। N. G. Majumdar, 154

অতএব তিনি যদি তখন গৌড়ের রাজা থাকিতেন, তবে ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার বহু পূর্ববর্তী একজন রাজার নামোল্লেখ করিবারও কোনও সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। অতএব মনে হয় তাম্রশাসনোক্ত ঈশ্বর ঘোষ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তাহার আর একটি প্রমাণ এই,—ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনে আছে যে, ঈশ্বর ঘোষ 'জটোদায়াং স্নাত্বা'[১] অর্থাৎ জটোদা নদীতে স্নান করিয়া এই তাম্রশাসন দান করিতেছেন। এই জটোদা নদী জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত ; ইহার বর্তমান নাম ঝড়্‌দা। 'কলিকা-পুরাণে'ও এই জটোদা নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কামরূপের বর্ণনা সম্পর্কে তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে,—

> জটোদ্ভবা তত্র নদী হিমবৎ প্রভবা শুভা।
> যস্যাং স্নাত্বা নরঃ পুণ্যমাপ্নোতি জাহ্নবীসমম্।।
> গৌরীবিবাহসময়ে সর্বৈর্মাতৃগণৈঃ কৃতঃ।
> জলাভিষেকো ভর্গস্য জটাজুটেষু যঃ পুরা।।
> তৈস্তোয়ৈরভবদ্ যস্মাজ্জটোদাখ্যা নদী ততঃ।

অতএব যে নদী হিমালয় হইতে উৎপন্ন ও কামরূপের নিকট অবস্থিত, তাহার সহিত রাঢ়ের কোন সম্পর্ক থাকিবার কথা নহে।

বিশেষত ধর্মমঙ্গলকাব্যসমূহে প্রদত্ত ইছাই ঘোষের পিতার নামের সহিত তাম্রশাসনোক্ত ঈশ্বর ঘোষের পিতার নামের ঐক্য নাই। সোম ঘোষও সংস্কৃত নাম, অতএব ইহাও অসম্ভব যে, ইছাই ঘোষ নিজের নামকে সংস্কৃত করিয়া যেমন ঈশ্বর ঘোষ করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতে পারে, তেমনই পিতারও লৌকিক নামের পরিবর্তে সংস্কৃত নাম ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম সোম ঘোষ হইলে তিনি স্বচ্ছন্দে তাহা সংস্কৃত তাম্রশাসনে ব্যবহার করিতে পারিতেন।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অনুমান করেন, তাম্রশাসনোক্ত ঢেক্করী রাঢ়ের অন্তর্গত নহে, বরং আসাম-প্রদেশের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া জিলায় অবস্থিত। আধুনিক ঐতিহাসিকদিগের অনেকেই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। ঈশ্বর ঘোষ তাঁহার তাম্রশাসনে কোন সার্বভৌম রাজার অধীনতার কথা উল্লেখ করেন নাই ; ইহাতে মনে হয়, দ্বাদশ শতাব্দীতে পালরাজগণ যখন হতবল হইয়া পড়িতেছিলেন তখন তাঁহাদের এই একজন সামন্ত রাজা নিজেকে স্বাধীন বলিয়াই বিবেচনা করিতেছিলেন। মনে হয়, তিনি

১। কালিকা পুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত (বঙ্গবাসী, ১৩১৬), ৪৯৭

রামপালের সমসাময়িক, অতএব দ্বাদশ শতাব্দীতে তাঁহার পক্ষে উক্ত তাম্রশাসন লিপিবদ্ধ করা সম্ভব।

অনেকে অবশ্য লিপি-বিশেষজ্ঞদিগের নির্দেশ অমান্য করিয়াও তাম্রশাসনের ঈশ্বর ঘোষকে তিনশত বৎসর পূর্বে লইয়া গিয়া ধর্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষের সঙ্গে অভিন্নতা সম্পাদনের প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, লিপি-বিশেষজ্ঞদিগের মত অগ্রাহ্য করিবার পূর্বে তাহার যথেষ্ট কারণ প্রদর্শন করাইয়া লওয়া প্রয়োজন। শুধু ইছাই ঘোষ ও ঈশ্বর ঘোষের নামের সামঞ্জস্য হইতে বিজ্ঞান-সম্মত একটি প্রমাণকে এত সহজে উপেক্ষা করা যায় না। তদুপরি সোম ঘোষ, ধবল ঘোষ, ঢেক্করী, ঢেকুর—ইহাদের মধ্যেও নিঃসন্দেহে অভিন্নতা কল্পনা করা যায় না। কেহ আবার তাম্রশাসনোক্ত ঈশ্বর ঘোষকে ধর্মমঙ্গল কাব্যের ইছাই গোয়ালার বংশধর বলিয়াও অনুমান করিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর পালবংশের রাজা রামপালের সভায় আগত যে ঢেক্করীর এক সামন্ত রাজা প্রতাপসিংহের উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনিও সেই মতে ঈশ্বর ঘোষেরই বংশধর। কিন্তু নামের পদবী দিয়া মনে হয়, প্রতাপসিংহ স্বতন্ত্র বংশের লোক, অতএব ঢেকুর ও ঢেক্করী এক নহে। তাহা হইলে ধর্মমঙ্গল কাব্যোক্ত গৌড়েশ্বর দেবপাল হইবার পক্ষে আর কোন বাধা নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, দেবপাল কামরূপ এবং উৎকল জয় করিয়াছিলেন। ভাগলপুরের তাম্রশাসনে পাওয়া যায়, উৎকল ও কামরূপ বিজয়ে তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা জয়পালই সেনাপতির কার্য করিয়াছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখা যায়, কামরূপ বিজয়ে তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল এক সামন্তরাজের পুত্র লাউসেন। লাউসেন ও জয়পাল কি এক? কিন্তু জয়পালের পিতৃ-পরিচয় আছে। জয়পালের পিতা পালরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের দ্বিতীয় পুত্র বাক্‌পাল। গোপালের পুত্র ধর্মপাল হইতে যেমন দেবপাল, তেমনি বাক্‌পাল হইতে জয়পাল; এই সূত্রে জয়পাল দেবপালের খুল্লতাতপুত্র। কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাহিনীতে লাউসেনের পিতা কর্নসেন। অতএব জয়পাল ও লাউসেন এক হইতে পারে না। ধর্মমঙ্গল ব্যতীত লাউসেনের কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না। এমন কি শূন্যপুরাণেও লাউসেনের নাম নাই। অতএব কোনও ঐতিহাসিক সূত্র হইতে তাঁহার পরিচয় সন্ধান করা অসম্ভব।

কিন্তু লাউসেনের কাহিনী একেবারেই অনৈতিহাসিক বলিয়াও উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। কারণ, ইহাতে ঐতিহাসিক চরিত্র অন্তত ধর্মপালেরও উল্লেখ আছে। ইহার নায়ক গৌড়ের এক সামন্ত রাজপুত্র লাউসেন। সেইজন্য মনে হয়, ইহার মূলে সামান্য হইলেও ঐতিহাসিক ভিত্তি বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু ধর্মমঙ্গলের কবিগণ তাঁহার উপরে কল্পনার এমন বিরাট সৌধ তুলিয়াছেন যে, তাহার নীচ হইতে তাঁহার চরিত্রের ঐতিহাসিব পরিচয়টি উদ্ধার করা এক প্রকার দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য অনেকেই তাঁহার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব

সম্বন্ধেই সন্দিহান হইয়াছেন।

লাউসেনের নাম যে একমাত্র ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতেই উল্লিখিত হইয়াছে তাহা নহে, বাংলা পাঞ্জিকায় কলিকালের রাজচক্রবর্তীদিগের মধ্যে যুধিষ্ঠিরাদির সঙ্গে লাউসেনের নামও অদ্যাবধি উক্ত হইয়া থাকে। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথ লবসেন নামক গৌড়ের একজন রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। তিব্বতীয় জনশ্রুতি অনুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, লবসেন পালরাজ যক্ষপালের মন্ত্রী ছিলেন। লবসেন যক্ষপালকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে রাজা হন। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় পালরাজগণের যে নামের তালিকা পাওয়া যায়, তাহাতে যক্ষপাল কিংবা লবসেন কাহারও নাম পাওয়া যায় না। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ তারানাথের উক্তির উপর কোনও ঐতিহাসিক গুরুত্ব না দিলেও, এই কাহিনী যে কোন বিশিষ্ট জনশ্রুতি হইতে গৃহীত, তাহা স্বীকার করিতে হয়। অনেকে লবসেন ও লাউসেনকে অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন। ''বর্ধমান জেলার অজয় নদের দক্ষিণে ইছাই ঘোষের দেউল আছে। ইহার নিকটে 'লাউসেন কুণ্ড' নামে এক পুকুর আছে। সে অঞ্চলের ডোমেরা ১৩ই বৈশাখ এই পুকুরে স্নান করিয়া স্বজাতি কালুবীরের তর্পণ করিয়া থাকে।''[১] ধর্মের নিকট মানসিক করিয়া পুত্র লাভ করিলে সাধারণত রাঢ়ভূমিতে সেই ছেলের নাম রাখা হয় লুইধর কিংবা লাউসেন। এই সকল কারণে মনে হয়, লাউসেন নিতান্তই অনৈতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না। তবে তাঁহার পরিচয় কি, কোন্ কালেই বা তিনি বর্তমান ছিলেন?

'শূন্যপুরাণে' লাউসেনের কোন উল্লেখ নাই। এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। কিন্তু অন্তত ষোড়শ শতাব্দীতে সঙ্কলিত ধর্মপূজার মহাত্ম্যসূচক এই গ্রন্থখানিতে ধর্মভক্ত লাউসেনের কোন উল্লেখ না দেখিয়া মনে হয়, ধর্মপূজার স্বতন্ত্র কোন কাহিনীর ধারা (tradition) হইতে তিনি আসিয়াছেন, ধর্মপূজার মৌলিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার কোন সংযোগ ছিল না। প্রাচীনতম ধর্মসাহিত্যের কাহিনীর নায়ক ছিলেন এক পৌরাণিক রাজা হরিশ্চন্দ্র, তাঁহার সম্বন্ধেও পরে আলোচনা করিতেছি। সম্ভবত ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্টই লাউসেনের কাহিনীর সর্বপ্রথম প্রবর্তক। কারণ, পরবর্তী সমস্ত ধর্মমঙ্গলের কবিই এই বিষয়ে আদি কবি ময়ূরভট্টের পথানুসরণ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লাউসেনকে লইয়া ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি রচিত হইবার পর উক্ত হরিশ্চন্দ্র রাজার অনৈতিহাসিক কাহিনী ইহাতে নিতান্ত অপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তৎপূর্বে যে হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনীই ধর্মসাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহা

১। সা-প-প ৩৮,৮৩

হইলে দেখা যাইতেছে, ধর্ম-সাহিত্যের উদ্ভবের কিছুকাল পরে লাউসেনের আর্বিভাব হয়। লাউ সেনের পিতার নাম কর্ণসেন। তিনি গৌড়েশ্বরের অধীন ত্রিষষ্ঠীর গড় বা ঢেকুরের সামন্ত রাজা ছিলেন। বর্ধমান জিলার পশ্চিম সীমান্তে সেনপাহাড়ী পরগণায় বর্তমান গৌরাণ্ডি গ্রামের নিকট কর্ণগড় নামে একটি স্থান প্রাচীন মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই কর্ণগড়েই কর্ণসেনের বাস ছিল। অতঃপর ইছাই ঘোষ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া তিনি দক্ষিণে ময়নানগরে চলিয়া যান এবং সেখানেই তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র লাউসেন গৌড়ের অধীনস্থ সামন্ত রাজা হন। ইতিহাসে পাওয়া যায়, দেবপাল উৎকল বা কলিঙ্গ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। বর্তমান মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ প্রাচীন উৎকলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্ভবত দেবপাল লাউসেনকে তাঁহার এই বিজিত রাজ্যের সামন্ত রাজা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ময়নানগরে তাঁহার রাজধানী ছিল।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, ময়নানগর রাঢ়ভূমির দক্ষিণে এবং সমুদ্রের একেবারে তীরবর্তী। ঘনরাম চক্রবর্তী লিখিয়াছেন, 'ময়নানগর বাটি সাগর সমীপ'। ইহা হইতেই মনে হয়, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক মহকুমার দক্ষিণভাগে ময়নানগর অবস্থিত ছিল। তমলুক মহকুমায় ময়না নামক একটি স্থান এখনও আছে। সে সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে,—

'Mayna—A village in the Tamluk sub-division, situated 9 miles south-west of Tamluk. It contains a Police Outpost and an old fort, called Maynagarh, situated on the western bank of the Kasai, a little above its junction with the Kiliaghai. The fort was evidently constructed by excavating two great moats, almost lakes, so that it practically stands on an island. The earth of the first was thrown inwards, so as to form a raised embankment of considerable breadth, which, having become overgrown with dense bamboo clumps, was impervious to any projectile that could have been brought against it 100 years ago. Inside the larger island, the outer edge of which is this embankment, another lake has been excavated with the earth thrown inwards, forming a large and well-raised island about 200 yards square. On this stands the residence of the Mayna raj.

According to the family records, the fort was originally constructed by one semi-mythical hero of Midnapur, Raja Lausen, in the days when the district was under the dominion of the kings of Gaur. At the time of the Maratha ascendancy, the descendant of Lausen was ousted, owing to default of payment of usual tribute, and the possession of

Mayna was made over to Bahubalendra (বাহুবালেন্দ্র), the founder of the Mayna raj.[১] স্বর্গত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, 'বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বর্তমান ময়নাপুর'ই ময়নানগর। কারণ, এই গ্রামে রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণ এতকাল পর্যন্ত বাস করিয়া আছেন। গ্রামে পাঁচটি ধর্মশিলা প্রতিষ্ঠিত আছে—যাত্রাসিদ্ধি, বাঁকুড়া রায়, ক্ষুদি রায়, শীতল নারায়ণ ও চাঁদ রায়'।[২] কিন্তু এই দাবী গ্রহণযোগ্য নহে।

তাহা হইলে ইছাই ঘোষই কি একেবারে কাল্পনিক? এই সম্বন্ধে একমাত্র প্রাচীন কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করা ছাড়া আর উপায় নাই। কিংবদন্তীর মূলেও কিছু না কিছু সত্য থাকিতে পারে। সেইজন্য এই সম্বন্ধেও যথাসম্ভব আলোচনা করা যাইতেছে। অজয় নদের তীরবর্তী জয়দেবের জন্মভূমি কেন্দুলির পূর্বদিকে এক বিস্তীর্ণ অরণ্য আছে। এই অরণ্যের নাম শ্যামারূপার গড়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, ইহাই ঢেকুর বা ত্রিষষ্ঠীর গড়—এখানে ইছাই গোয়ালার পূজিত ভবানীর দেউল ছিল; অরণ্যমধ্যে এখনও একটি চতুষ্কোণ ভগ্ন দেউল আছে; লোকে বলে, ইহাই সেই প্রাচীন দেউল। কিন্তু মন্দির-বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন, দেউলটি আধুনিক। দেউলের ভিতরেও কোন দেবতা নাই, আবদ্ধ একটি কৌটার মত জিনিস দেবতা বলিয়া পূজা করা হয়। প্রাচীন মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, এখানেই কর্ণগড় অবস্থিত ছিল। কেহ কেহ মনে করেন, 'এখানে কর্ণসেনের বাড়ি ছিল, এবং এখানে তিনি পরাজিত হইয়া দক্ষিণে পলায়ন করিয়াছিলেন।'[৩]

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তে অজয় নদের দক্ষিণতীরে সেনাপাহাড়ী পরগণার অন্তর্গত গৌরাণ্ডি নামে একটি স্থান আছে। এখানে ইছাই গোয়ালার রাজধানী ছিল বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ইহার অদূরে অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণী বর্তমান। ধর্মমঙ্গল কাব্য হইতে জানিতে পারা যায়, ইছাই গোয়ালার গড় পর্বত দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ঘনরাম লিখিয়াছেন,—

চৌদিকে পাহাড় বেড়ি বাড়ী গড়
দুর্গম গহন কাটি।
করিয়া চত্বর বসাল নগর
রাজার বসত বাটি॥

এখানে একটি প্রাচীন মন্দির আছে। সেনাপাহাড়ী পরগণার নামেও সেন রহিয়াছে, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন গৌরাণ্ডির কিংবদন্তী সত্য হইতে

১। L. S. S. O' Malley. *Bengal District Gazetteers, Midnapur,* Calcutta, 1911, pp. 207-208.

২। শূণ্যপুরাণ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা, ৭৩।

৩। রামচরিত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত ৩।৫ শ্লোক, টীকা।

পারে।[১] অবশ্য সেনপাহাড়ী কিংবা সেনভূম পরগণার নাম হইতেই ইহার সহিত কর্ণসেনের কোন সম্পর্ক কল্পনা করা সমীচীন নহে। কারণ, একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাংলার সেন রাজবংশের প্রথম কয়েকজন রাজা এই অঞ্চলেই বসতিস্থাপন করিয়াছিলেন। অতএব লক্ষ্মণ সেন বল্লাল সেনের পূর্বপুরুষের নাম অনুসারেই যে স্থানীয় পরগণাগুলির নাম সেনভূম ও সেনপাহাড়ী হইয়াছে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ, তাঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই বিষয়ে বর্ধমান, 'গেজেটিয়ারে' যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাও বিবেচ্য। বর্ধমান গেজেটিয়ারে বলা হইয়াছে যে, বর্ধমানের রাজা চিত্রসেনের নামানুসারে এই পরগণাগুলির এই প্রকার নামকরণ হইয়াছে। উক্ত কিংবদন্তী দুইটি বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হওয়া যাইতে পারে যে, সম্ভবত ইছাই গোয়ালা বর্তমান গৌরাণ্ডির নিকটেই তাঁহার পার্বত্য দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিল। তবে যে মন্দিরটি বর্তমানে তথায় ভগ্নদশায় পতিত হইয়া আছে, তাহা ইছাই গোয়ালার ভবানী-মন্দির ছিল না তাহা নিশ্চিত। অবশ্য পূর্ববর্তী কোন জনশ্রুতির উপর মন্দির পরবর্তী কালেও নির্মিত হইতে পারে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক লাউসেনের পিতা কর্ণসেনকেও কেহ কেহ ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। মালদহে অনুষ্ঠিত শিবের গাজনে যে লৌকিক ছড়া গীত হইয়া থাকে তাহাতে উল্লিখিত হয়,—

কাউসেন দত্তের বেটা নয়সেন দত্ত।
যে জন পৃথিবীতে আনিল মহেশ্বর ব্রত।।[২]

সাধারণের বিশ্বাস, এই কাউসেন কর্ণসেন ও নয়সেন লাউসেন। অবশ্য ধর্মঠাকুরের সঙ্গে শিব যে সময় অভিন্ন হইয়াছিলেন, তখনই লাউসেনকে শিবপূজার প্রবর্তক বলিয়াও কল্পিত হওয়া আশ্চর্য কিছুই নহে। এই সকল লোকপ্রবাদেরও বিশেষ একটা মূল্য আছে। মনে হয়, লাউসেনের পিতৃপরিচয়ও সাধারণের অজ্ঞাত ছিল না, অতএব কর্ণসেনও সমসাময়িক সমাজে বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিই ছিলেন এবং পুত্রের প্রতিষ্ঠা কতকটা এই পিতৃ-পরিচয়ের উপরও নির্ভর করিয়াছিল।

ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে হরিশ্চন্দ্রের পালা নামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। লাউসেন যেমন নিজের দেহ নয় খণ্ড করিয়া কাটিয়া ধর্মের পূজা করিয়াছিলেন, এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাজা হরিশ্চন্দ্রও তেমনই ধর্মের আদেশে নিজের পুত্রকে বলিদান করিয়াছিলেন। লাউসেনের কাহিনী ধর্মসাহিত্যে প্রবেশ করিবার পূর্বে রাজা হরিশ্চন্দ্রের

১। সা-প-প ৩৮, ৭৯, পাদটীকা।
২। ব-সা-প ১৫৭

কাহিনীই তাহাতে কীর্তিত হইত বলিয়া মনে হয়। কারণ, প্রাচীনতম ধর্মসাহিত্যে লাউসেনের কাহিনী নাই, হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীই আছে। কতকগুলি বিষয়ে এই কাহিনীটির একটু বিশেষ গুরুত্ব আছে; সেইজন্য সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা করিতেছি;—

নিঃসন্তান রাজা হরিশ্চন্দ্র মহিষী মদনাকে লইয়া একদিন মনের দুঃখে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে বল্লুকা নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল, সন্ন্যাসী ছদ্মবেশী ধর্ম। সন্ন্যাসীর নিকট রাজা তাঁহার দুঃখের কথা জানাইলেন, শুনিয়া সন্ন্যাসী রাজাকে পুত্রলাভের বর দিলেন; কিন্তু শর্ত রহিল, পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে ধর্মের উদ্দেশ্যে বলি দিতে হইবে। রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন। যথাসময়ে তাঁহার এক পুত্র হইল, তাহার নাম রাখিলেন, লুইচন্দ্র (বা লুইদাস)। পুত্র পাইয়া রাজা অঙ্গীকারের কথা বিস্মৃত হইলেন। একদিন সেই ধর্মরূপী সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া রাজবাড়িতে আসিয়া অতিথি হইলেন। রাজাকে জানাইলেন, রাজপুত্র লুইচন্দ্রের মাংস ব্যতীত অন্য কিছু তিনি আহার করিবেন না। রাজা ও রাণীর অনেক কাতর অনুনয় সত্ত্বেও তিনি নরমাংসে ভক্ষণের অভিলাষ ত্যাগ করিলেন না। অগত্যা রাজারাণী লুইচন্দ্রকে কাটিয়া তাহার মাংস রন্ধন করিয়া অতিথিকে পরিবেষণ করিলেন। অতিথি সেই মাংস তিনটি থালায়-পরিবেষণ করিতে বলিলেন। তিনি একা সেই মাংস খাইবেন না, রাজা ও রাণীকে তাঁহার সঙ্গে বসিয়া খাইতে হইবে। তিন জনই খাইতে বসিলেন, রাজা গ্রাস তুলিতে যাইবেন, এমন সময় অতিথি রাজার হাত ধরিয়া ফেলিয়া আত্ম-পরিচয় দিলেন। রাজ-দম্পতির ভক্তিতে অসীম সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বর দিতে চাহিলেন। রাজা রাণী পুত্রের জীবন ভিক্ষা চাহিলেন। ধর্ম বলিলেন, লুইচন্দ্র জীবিত আছে,—সে গাজনে বেত হাতে করিয়া নাচিতেছে। রাজা রাণী পুত্র ফিরিয়া পাইলেন।

এই কাহিনীটির অত্যন্ত প্রাচীন। কারণ, বাংলাদেশে প্রচলিত দাতা কর্ণের উপাখ্যানটিও এই কাহিনীরই অনুরূপ এবং তাহাও এই হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী হইতেই আসিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন।[১] কর্ণের নামের সহিত এই কাহিনী পরবর্তী কালে এই দেশে আসিয়া যুক্ত হইয়াছে বলিয়া সংস্কৃত মহাভারতেও এই কাহিনী দৃষ্টিগোচর হয় না। এমন কি, কাশীরাম দাসের মহাভারতেও ইহা নাই। ১০৮৪ বঙ্গাব্দের অর্থাৎ ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দের একখানি বাংলা পুঁথিতে দ্বিজ কবিচন্দ্র রচিত দাতাকর্ণের কাহিনীটি প্রথম পাওয়া যায়। সম্ভবত তিনি হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীকে একটা বিশেষ আভিজাত্য দিবার জন্য ধর্মমঙ্গল কাহিনী হইতে তাহা আনিয়া ইহাতে কর্ণের নাম সংযোগ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হরিশ্চন্দ্র -শৈব্যার

১। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'ধর্মমঙ্গলে হরিশ্চন্দ্র পালা', বঙ্গশ্রী ১, ৩১৭।

কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত স্বতন্ত্র কাব্যের সহিতও সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়।[১] ইহাতে মনে হইতে পারে যে, তিনি হরিশ্চন্দ্রের পালা স্বতন্ত্রভাবেই রচনা করিয়াছিলেন। কালক্রমে মহাভারতের প্রভাববশত তাহাতে হরিশ্চন্দ্রের স্থলে কর্ণের নাম আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে।

কেহ কেহ আবার মনে করেন, হরিশ্চন্দ্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি। স্বর্গত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের মতে হরিশ্চন্দ্র ঢাকা জিলার অন্তর্গত সাভারের রাজা ছিলেন। তাঁহারই দুই কন্যা অদুনা ও পদুনাকে ত্রিপুরার রাজা গোপীচন্দ্র বিবাহ করেন। কিন্তু কতকগুলি কারণে এই মত সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। প্রথমত সাভারের হরিশ্চন্দ্রের রাজা যে পুত্র বলিদান করিয়াছিলেন, এই সম্পর্কে কোনও লোক-প্রবাদ পূর্ববঙ্গে প্রচলিত নাই। বিশেষত পূর্ববঙ্গে ধর্মঠাকুরের পূজাও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অতএব পূর্ববঙ্গের প্রাচীন একটি রাজবংশের একজন খ্যাতনামা রাজা ধর্মঠাকুরের এত বড় একজন ভক্ত হইবেন, তাহা কখনই অনুমান করা যাইতে পারে না। তাহা হইলে গোপীচাঁদের সন্ন্যাসের কাহিনীর মত নানা লোক-গাথায় রাজার এই অপূর্ব অতিথি-সৎকারের কথা পূর্ববঙ্গে প্রচলিত হইয়া পড়িত। কিন্তু পূর্ব বঙ্গের কোন লোক-সাহিত্যেই তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না; বিশেষত সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের যে-সময়ের লোক তাহার পূর্বেই হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী পশ্চিমবঙ্গের ধর্মসাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অতএব এই মত কোন কারণেই গ্রহণ করা যায় না। স্বর্গত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় অনুমান করিয়াছেন, হরিশ্চন্দ্র রাজা বর্ধমান জিলার অন্তর্গত অমরার রাজা ছিলেন। তাঁহার মতে রাজা হরিশ্চন্দ্র খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বর্তমান ছিলেন। কোন কোন ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়, হরিশ্চন্দ্র রাজার রাজধানীর নাম অমরা। ইহা হইতেই স্বর্গত বিদ্যানিধি মহাশয় অনুমান কারিয়াছিলেন, 'অমরা দামোদরের উত্তরে, বর্ধমানের দিকে হইবে'।[২] অবশ্য ইহাই ধর্মপূজার এক প্রকার কেন্দ্রস্থল ছিল, কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী এই স্থানেই যে হইবে তাহার প্রমাণ কি ? তিনি এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'বর্ধমান জেলার দামোদরের উত্তরে, মানকর রেল স্টেশনের ঈশান কোণে অমরা-গড় জানিতেছি। সেখানে পুরাতন গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে। লোকে বলে, অমরার গড়; কেহ বলে, মহেন্দ্রের গড়, এবং কুতুহলী জনে রাজা মহেন্দ্রের পাটরাণীর নাম অমরাবতী রাখিয়া সেই রাণীর নামে গড়ের নাম কল্পনা করিয়াছে।

কিন্তু অমরার রাজার বংশধরদিগের নিকট যে কুলপঞ্জী আছে, তাহাতে তাঁহাদের পূর্বপুরুষের মধ্যে হরিশ্চন্দ্র নামে কাহারও উল্লেখ নাই। তাঁহাদের আদি পুরুষ রাঘব সিংহ ১০৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য স্থাপন করেন। রাঘব সিংহের পুত্র গোপাল, তাঁহার পুত্র শতক্রতু ও

১। গ-স ৫৪৩৯

২। সা-প-প ৩৮, ৭৭

শতক্রর পুত্র মহেন্দ্র ইত্যাদি। মহেন্দ্রের নামানুসারেই অমরার গড়কে কেহ কেহ মহেন্দ্রের গড় বলিয়া থাকে। বর্তমানে এই বংশের আদিপুরুষ হইতে ত্রিংশ পুরুষ চলিতেছে। স্বর্গত রায় মহাশয় অনুমান করেন, গোপালের পুত্র 'শতক্রতু নাকি শত যজ্ঞ করিয়া এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ শতক্রতু তাঁহার প্রকৃত নাম নয়। বোধ হয় তাঁহার প্রকৃত নাম হরিশ্চন্দ্র।' কিন্তু বংশপঞ্জীতে প্রকৃত নামের উল্লেখ না করিয়া তাঁহার গুণবাচক একটি 'উপাধি' উল্লেখ করিবার রীতি স্বীকার করা যায় না ; আর যদি তাহাও স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবে তাঁহার নাম যে হরিশ্চন্দ্র ছিল, তাহারই বা প্রমাণ কি? অতএব বংশপঞ্জিকায় যখন একটি স্বতন্ত্র নাম পাইতেছি, তখন তাহা অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিয়া, একটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নামকে সেখানে স্থান দান করা কোন মতেই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

সেইজন্য কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, হরিশ্চন্দ্র পৌরাণিক ব্যক্তি। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে এক অপুত্রক রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বরুণের বরে একটি পুত্র লাভ করেন, তাহার নাম রোহিত। হরিশ্চন্দ্র পুত্রকে বরুণের নিকট বলি দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। রোহিত একথা জানিতে পারিয়া বনে পলাইয়া যায়। সেখানে অর্থ দ্বারা এক লোভী ব্রাহ্মণের একটি পুত্র ক্রয় করিয়া লইয়া পিতার নিকট ফিরিয়া আসে। হরিশ্চন্দ্র নিজের পুত্রের পরিবর্তে তাহাকেই বলি দিয়া বরুণের ক্রোধ-শান্তির আয়োজন করেন। কিন্তু নরবলি দিবার জন্য কোন ঘাতক পাওয়া গেল না; অতঃপর সেই ব্রাহ্মণ অধিকতর অর্থলোভে নিজের পুত্রকেই বলি দিতে প্রস্তুত হইল। হস্ত-পদ-বদ্ধ অবস্থায় যজ্ঞস্থলে নীত হইয়া ব্রাহ্মণ-পুত্র বরুণের স্তব করিতে আরম্ভ করিল, বরুণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ-পুত্রও বিশ্বামিত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়নে মনোনিবেশ করিল এবং কালক্রমে বেদের কতকগুলি মন্ত্র রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিল। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ', 'কৌষীতকী ব্রাহ্মণ' প্রমুখ বৈদিক সাহিত্য হইতে এই কাহিনী ক্রমে রামায়ণ ও পুরাণে প্রবেশ লাভ করে[১] এবং কালক্রমে অল্পবিস্তর রূপান্তরিত হইতে থাকে। ধর্মমঙ্গলকাব্যে তাহারই আর এক রূপের সহিত আমরা পরিচয় লাভ করি। এই কাহিনীর সহিতই আবার প্রসিদ্ধ পৌরাণিক কাহিনী—কাশীর রাজা হরিশ্চন্দ্র, তৎপুত্র রোহিতাশ্ব ও মহিষী শৈব্যার কাহিনীর সুদূর সম্পর্ক রহিয়াছে।[২] উপরোক্ত একই বৈদিক কাহিনীর এই সমস্তই পৌরাণিক রূপান্তর মাত্র। ইহাদের সহিত ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই।

১। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭-৩ ; রামায়ণ ১-৬২ (মন্মথনাথ দত্তের ইংরেজি অনুবাদ)।
২। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ৩১৮।

হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী হইতে জানিতে পারা যায়, হরিশ্চন্দ্র রাজা বল্লুকা নদীর তীরে ছদ্মবেশী ধর্মের সর্বপ্রথম সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ইহার পূর্ব হইতে বল্লুকাতীর ধর্মপূজার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, নতুবা ছদ্মবেশী ধর্ম সেখানে বাস করিবেন কেন? রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত 'শূন্যপুরাণে'ও দেখিতে পাওয়া যায়, 'বৈকুণ্ঠেতে জীয়ে ধর্ম বল্লুকাতে স্থিতি' এই কথা উল্লেখ রহিয়াছে। ধর্মসাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্বের যে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতেও বলা হইয়াছে মার্কণ্ড মুনি কুষ্ঠ রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বল্লুকা-তীরেই চন্দন কাঠের ধুনি জ্বালিয়া ধর্ম পূজা করিয়াছিলেন। ধর্মপূজা-বিধানেও আছে, 'শনিবার ব্রত করিল বল্লুকার তীরে।' অতএব দেখা যাইতেছে যে, বল্লুকা নদীর সঙ্গে ধর্মপূজার প্রচীনতম' ইতিহাস জড়িত রহিয়াছে।

বল্লুকা নদী কোথায়? 'ধর্মপূজা-বিধান'-এর সম্পাদক স্বর্গত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—'বল্লুকা নদী বর্ধমানের নিকট দামোদর হইতে উঠিয়া মৃজাপুরের খালে পড়িয়াছে। নদীটি এখন মজিয়া গিয়াছে ; সব জায়গায় জল থাকে না, কিন্তু বড়োযাঁনে বিশেষ ধর্মঠাকুরের মন্দিরের নীচে, একটি বাঁওর হইয়া বেশ চটাল নদীর মত দেখা যায়। উহার জল অতি পরিষ্কার। এই বল্লুকা নদীই ধর্মঠাকুরের তীর্থস্থান।' বর্ধমান শহরের দক্ষিণে দামোদর নদের উপর বাঁধ নির্মাণ হওয়ার পর হইতে নদীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, এখন তাহার চিহ্ন একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। মেমারি রেল স্টেশনে দক্ষিণে একটি খাল এখনও বল্লুকা নামে কথিত হয়, ইহাই প্রাচীন বল্লুকার স্মৃতি বহন করিতেছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, বর্ধমান শহরের পূর্ব দিক দিয়া যে বাঁকা নদী প্রবাহিত হয়, তাহাই প্রাচীন বল্লুকা। মনে হয়, এই বল্লুকা-তীরেই রামাই পণ্ডিতের আশ্রম ছিল ; — 'শূন্যপুরাণে'ও পাই, 'রামাই পণ্ডিত করে নিত গাঁত পসন্ন হইল বল্লুকা।' এখনও বল্লুকা তীরে বড়োযাঁনে এক অতি প্রাচীন ধর্মঠাকুর আছেন।

মনে হয়, অপর কোন প্রসিদ্ধ ধর্মপূজারী হইতে বর্ধমানের দক্ষিণে আর একটি স্থান ধর্মপূজার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহা চম্পানদীর ঘাট। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে পাই, রঞ্জাবতী পুত্র-কামনায় চাঁপায়ের ঘাটে শালে ভর দিয়া ধর্মপূজা করিয়াছিলেন। 'শূন্যপুরাণে'ও আছে, 'স্নান সন্ধ্যা গোঁসাঞির চম্পা নদীর ঘাটে।' দামোদর নদের দক্ষিণে প্রায় সমান্তরাল ভাবে দ্বারকেশ্বর নদী প্রবাহিত। ইহা কোতুলপুর পর্যন্ত আসিয়া দক্ষিণে ক্রমে ঝুমঝুমি ও পরে রূপনারায়ণ নাম গ্রহণ করিয়া হুগলী ও মেদিনীপুর জিলার উপর দিয়া গিয়া গঙ্গাসাগরে পতিত হইয়াছে। বাঁকুড়া জিলার পূর্ব সীমান্ত হইতে বর্ধমানের কোতুলপুর পর্যন্ত এই নদী চাঁপাই নদী বলিয়াই কথিত হইত। এখন রূপনারায়ণ পর্যন্ত সমস্ত নদীই দ্বারকেশ্বর বলিয়া কথিত হয়। এই চাঁপাই নদীর তীরেই এক স্থান ধর্মপূজার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে স্বর্গত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, 'কোতুলপুরের ঈশান কোণে

দ্বারকেশ্বরের কূলে খন্নগর ও বিহার গ্রাম আছে। বিহারে কালুরায় ধর্মরাজ আছেন। ইঁহার মন্দির পুরাতন নয়। কিন্তু নিকটে মাটি খুঁড়িতে গিয়া প্রাচীন মন্দিরের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, আশে পাশে পুরাতন ইট ও পড়িয়া আছে। এইখানে চাঁপায়ের প্রসিদ্ধ ঘাট ছিল। অন্য কোথাও দেহারার চিহ্ন নাই, বিহার নামও নাই'।[১] সম্ভবত এই স্থানেই রঞ্জাবতী পুত্র-কামনায় ধর্মপূজা করিয়াছিলেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যোক্ত কাহিনীর স্মৃতি সমগ্র রাঢ়দেশ ব্যাপিয়াই বিক্ষিপ্ত হইয়াই রহিয়াছে। বীরভূম জিলার একজন প্রাচীন সাহিত্যসেবী লিখিয়াছেন, 'ধর্ম মঙ্গলের লাউসেনের সঙ্গে চণ্ডীদাসের জন্মভূমি নানুর[২] অঞ্চলের বিশেষ সংস্রব ছিল। ধর্ম মঙ্গলোক্ত সামন্ত শেখর রাজার রাজধানী জালন্দার গড়, তারাদীঘি, বা কামদলের মাঠ, নানুর হইতে বেশি দূর নহে।' ঐ স্থানের সাঁফুলীপুর নামক স্থানে অবস্থিত সাফুলেশ্বর শিবকেও তিনি ধর্মমঙ্গলের একটি চরিত্র 'সাফুলা'র সহিত সম্পর্কযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, ধর্মমঙ্গল কাব্যের বর্তমান কাহিনী অর্থাৎ লাউসেনের বিবরণ পরবর্তী কালে ধর্মসাহিত্যের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। প্রাচীনতর ধর্মসাহিত্যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, এই প্রাচীন ধারারই অনুবর্তন করিতে গিয়া খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি সহদেব চক্রবর্তী লাউসেনের কাহিনীকে তাঁহার কাব্যে স্থান দান করেন নাই। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী তাঁহারও কাব্যের উপজীব্য। অতএব লাউসেনের বিবরণ ধর্মসাহিত্যের মুখ্য কাহিনী নহে। ইহাতেই মনে হয়, রাজা হরিশ্চন্দ্রকে লইয়াই ধর্মমঙ্গল কাহিনীর সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, হরিশ্চন্দ্র পৌরাণিক ব্যক্তি; অতএব তাঁহার কাল নিরূপণ করিয়াই এই কাহিনীর উদ্ভবকাল সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছান যাইতে পারে না।

ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়, রামাই পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তি ধর্মপূজার প্রবর্তক বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছেন। অবশ্য অনুমান করা যাইতে পারে যে, রামাই পণ্ডিত ধর্মঠাকুরের পূজার প্রবর্তক না হইলেও তিনি এই লৌকিক সংস্কারের উপর বৌদ্ধ প্রভাবের কালে তাঁহার বিশিষ্ট একটি পূজা পদ্ধতির রচয়িতা ছিলেন। সম্ভবত তাঁহার কালেই হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী ধর্মপূজার সম্পর্কে সর্বপ্রথম কীর্তিত হইতে আরম্ভ করে। তাঁহার নামে প্রচলিত ধর্মপূজা পদ্ধতিতে এই হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীর আংশিক উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব তাঁহার কাল নিরূপণ করিতে পারিলেই, প্রাচীনতম ধর্মসাহিত্যের উদ্ভবকাল সম্বন্ধে একটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। অবশ্য এই রামাই পণ্ডিতের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কোন

১। সা-প-প ৩৮, ৭৮

২। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'নানুর', প্রবাসী ১৩৩৩, অগ্রাহয়ণ, ১৯৫।

সন্দেহ থাকিবার কারণ নাই। ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি নামক ধর্মঠাকুরের ডোম পূজারিগণ নিজেদের রামাই পণ্ডিতের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই রামাই পণ্ডিত ও ধর্মপূজার প্রবর্তক রামাই পাণ্ডিত যে এক ব্যক্তি নহেন, সে বিষয়ে অনেকেই নিঃসন্দেহ। রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত ধর্মপূজার পদ্ধতি প্রকৃতই তাঁহার নিজের রচিত কিনা, এ' বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ধর্মমঙ্গল কাহিনীতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি পূজার পুরোহিত মাত্র, সম্ভবত তিনি এই পূজার একটা বিশেষ বিধির প্রবর্তন করেন, তাহাই পরবর্তী কালে তাঁহার শিষ্যগণ কর্তৃক অনুসৃত হইতে আরম্ভ করে। মূলত ধর্মসাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার কোন সংশ্রব ছিল না। পরবর্তীকালে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার নামে কতকগুলি ছড়া-পাঁচালী রচনা করিয়া ধর্মপূজার আনুষঙ্গিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সেগুলি ব্যবহার করিতে থাকে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখক কর্তৃক রচিত ভারতীয় সমগ্র পৌরানিক সাহিত্যের মূলে যেমন একমাত্র বেদব্যাসকেই কল্পনা করা হইয়া থাকে, তেমনি ধর্মপূজার সমস্ত লৌকিক ছড়াই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মপুরোহিত কর্তৃক রচিত হইয়াও একই রামাই পণ্ডিতের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। অতএব রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত ধর্মপূজা পদ্ধতিতে কোন্ সময়ে যে হরিশ্চন্দ্র রাজার গল্প গিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে একটা অনুমান করা যায়, এই মাত্র।

ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখা যায়, রামাই পণ্ডিত কর্ণসেন ও রঞ্জাবতীর সমসাময়িক লোক। তাঁহারা গৌড়েশ্বর দেবপালের সমসাময়িক বলিয়া তিনিও খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। অবশ্য এই সম্পর্কে পরবর্তী ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের ঐতিহ্য গ্রহণ করার পূর্বে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ, তাঁহাদের অধিকাংশই ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাব্য রচনা করিতে গিয়া বহুলাংশে যে অনৈতিহাসিক লোকশ্রুতিরই সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা সত্য। তবু ইহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, রাঢ়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্বেই রামাই পণ্ডিত বর্তমান ছিলেন। কারণ, তিনি অস্পৃশ্য জাতির লোক হইয়াও তৎকালীন সমাজে এতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন দেখিয়া মনে হয়, কোন ব্রাহ্মণ্য আদর্শ সেই যুগের তদ্দেশীয় সমাজের সম্মুখে বর্তমান ছিল না। সেইজন্য রামাই পণ্ডিত গৌড়ের পালরাজগণের সময়েই বর্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি দেবপালের সমসাময়িক কাল খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির এই উক্তি এই ক্ষেত্রে মানিয়া লইতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। অতএব মনে হয় খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর পর রামাই পণ্ডিত কর্তৃক ধর্মঠাকুরের পূজার একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি রচিত হওয়ার পর ক্রমে ক্রমে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য-সূচক নানা কাহিনী লোকগাথার মধ্য দিয়া লাভ করে। অতঃপর প্রাচীনতম মঙ্গলচণ্ডীর গীত ও বিষহরীর গীতের মত তাহা ক্রমে কাব্য-কাহিনীর বদ্ধ হয়। কবি

ময়ূর ভট্টই সর্বপ্রথম এই কাহিনীকে মঙ্গলকাব্যের মর্যাদা দান করেন।

উপরোক্ত রামাই পণ্ডিতের নাম দিয়া 'শূন্যপুরাণ' বলিয়া একখানি পুস্তক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। রামাই পণ্ডিত রাঢ়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থানের পূর্ববর্তী লোক হইলেও তাঁহার নামে প্রচলিত এই গ্রন্থে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতেও মনে হয়, তিনি এই গ্রন্থের রচয়িতা নহেন—পরবর্তী কালের ধর্মপূজারিগণ ইহার সহিত তাঁহার নাম সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থের মধ্যে কোথাও ইহাকে 'শূন্যপুরাণ' বলিয়াও উল্লেখ করা হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার নাম দিয়াছিলেন, 'রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি'। প্রকৃত পক্ষে ধর্মপূজার নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান 'গৃহভরণ' বা 'ঘরভরা' উৎসবের ইহা একটি পদ্ধতির মাত্র। সেই জন্য এই নামই গ্রন্থখানির পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে শূন্যবাদের কথা দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গ্রন্থসম্পাদনকালে ইহার নাম দিয়াছিলেন, 'শূন্যপুরাণ'। গ্রন্থমধ্যে একস্থানে ইহা 'আগম-পুরাণ' বলিয়াও উল্লেখিত হইয়াছে, যথা—'রামাই পণ্ডিত কহএ আগম পুরাণে'। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, গ্রন্থখানি একজনের রচনা নহে। সম্ভবত খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মপূজারী ইহার বিভিন্ন অংশ স্বতন্ত্রভাবে রচনা করিয়াছিলেন। ইহার কোন কোন অংশ গোঁসাই পণ্ডিত নামক কোন ধর্মপূজারী কর্তৃক রচিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী কাব্যে ইহা বর্তমান আকারে সম্বলিত হইয়াছিল। অতএব ইহা হইতে প্রাচীন কোন তথ্য সন্ধানের উপায় নাই।

'শূন্যপুরাণ' সম্বন্ধে একটি বিষয় আমাদের আলোচনা করিবার আছে এই যে, ইহা কি আমাদের আলোচ্য মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত? ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়,— প্রথম ভাগে দেবতাখণ্ড বা সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী, দ্বিতীয় ভাগে পূজা প্রবর্তনের ইতিহাস ও তৃতীয় ভাগে চরিতখণ্ড বা লাউসেনের কাহিনী। কিন্তু শূন্যপুরাণে একমাত্র প্রথম খণ্ডটি আছে, তাহাও সুগ্রথিত নহে। মঙ্গলকাব্যের দেবতাখণ্ড মুখ্য বিষয় নহে, বরং চরিতখণ্ডই ইহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু এ কথা সত্য যে, 'শূন্যপুরাণ'-এ পরবর্তী কালে সমসাময়িক মঙ্গলকাব্যগুলির প্রভাবও কতক আসিয়া পড়িয়াছিল। সেইজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কবিও মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ ভক্ত ও নায়কের জন্য দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন,—

গাএন পণ্ডিত রামএ ধর্মপদতলে।
ভকত না একে পরভু রাখিব কুশলে।।

গাএন পণ্ডিত রাম ভাবি নিরঞ্জনে
ভকত নাএকে ধর্ম রাখিব কল্যাণে।।

দুই এক জায়গায় ইহাকে গীত ও পাঁচালী বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে যেমন,—

ধর্মর চরণে গীত পণ্ডিত রামাই গাএ।
পরভুর চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীযুত রামাই রচিল পাচালী সঙ্গীত।।

কিন্তু এই সকল লক্ষণ প্রায় মধ্যযুগের সমস্ত রচনা-মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। অতএব ইহা হইতেই 'শূন্যপুরাণ'কে মঙ্গলকাব্যের মর্যাদা দেওয়া যাইতে পারে না। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইহা ধর্মপূজার নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান 'গৃহভরণ'-এর পদ্ধতি মাত্র। অতএব ইহা আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নহে।

ধর্মমঙ্গলের কবিগণ

তাহা হইলে ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির আদি রচনা কি ও তাহার রচয়িতা কে? পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইহার কাহিনীর দুইটি স্বতন্ত্র ভাগ আছে। একটি হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী ও অপরটি লাউসেনের কাহিনী। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীটিই প্রাচীনতর। লাউসেনের কাহিনী পরবর্তীকালে ইহাতে সংযোজিত হইয়া ইহার মুখ্যবস্তু হইয়া পড়িলেও, তৎপূর্বে মার্কণ্ড মুনি ও হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীই এই শ্রেণীর কাব্যের উপজীব্য ছিল। ধর্মপূজা-বিধান ও শূন্যপুরাণে মার্কণ্ড মুনি ও হরিশ্চন্দ্র রাজার ধর্মপূজার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহাতে হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্রলাভ, ছদ্মবেশী অতিথির নরমাংস প্রার্থনা ইত্যাদি বিস্তৃত কাহিনীর উল্লেখ নাই। পরবর্তী ধর্মমঙ্গলগুলিতে মার্কণ্ড মুনির কাহিনী লোপ পাইলেও, হরিশ্চন্দ্র-পালায় হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী কতকটা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তবে ধর্মসাহিত্যে মার্কণ্ড মুনি ও হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী কে আনিল?

সংস্কৃত পুরাণে মার্কণ্ড মুনির নাম অপরিচিত না হইলেও তাহাতে তাঁহার নামে ধর্মসাহিত্যে প্রচলিত কাহিনীর অনুরূপ কোন কাহিনী নাই। হঠযোগের প্রধান একজন অনুষ্ঠাতা রূপে মার্কণ্ড মুনির নাম যোগশাস্ত্রাদিতে উল্লেখিত আছে। তিনি সুপন্থা নামক হঠযোগের একটি বিশিষ্ট প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া হঠযোগের অন্যতম সাধক গোরক্ষনাথের পন্থা হইতে স্বতন্ত্র এক পন্থার নির্দেশ দেন।[১] সম্ভবত মার্কণ্ড মুনির যোগাচারসমূহ ধর্মপূজারীদিগের মনঃপূত ছিল না; সেইজন্য ধর্মসাহিত্যে তাঁহাকে নিন্দাভাজন করা হইয়াছে। মার্কণ্ড মুনি গোরক্ষনাথের সমসাময়িক লোক না হইলেও পরবর্তী কালের লোক হওয়া সম্ভব। ধর্মপূজার উদ্ভবের সময় তাঁহার প্রচলিত যোগাচারের কথা রাঢ়দেশে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়।

১। "দ্বিধা হঠঃ স্যাদেকস্তু গোরক্ষাদি সুসাধিতঃ।
অন্যোমৃকণ্ডু পুত্রাদ্যৈঃ সাধিতো হঠসংজ্ঞকঃ।।"
কালীচরণ বেদান্তবাগীশ কর্তৃক পাতঞ্জল দর্শন (কলিকাতা, ১৩২৬) গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৪১২।

ঘনরাম[১] চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে হরিশ্চন্দ্র পালায় দেখিতে পাওয়া যায়, রাণী রঞ্জাবতী কর্ণসেনকে হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্র-বলিদানের কাহিনী শুনাইতে গিয়া পণ্ডিত গোঁসাই রচিত কোন গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছেন।—

তবে রঞ্জাবতী বলে করি নিবেদন।
পণ্ডিত গোঁসাই গ্রন্থে কহিল যেমন।।

অতএব মনে হইতেছে, পণ্ডিত গোঁসাই ধর্মসাহিত্যে হরিশ্চন্দ্র কাহিনীর আদি রচয়িতা। গোঁসাই পণ্ডিত শূন্যপুরাণোক্ত পঞ্চম পণ্ডিত বলিয়াই মনে হয়। ইনি রামাই পণ্ডিত নহেন, কিংবা 'পণ্ডিত গোঁসাই-গ্রন্থ' বলিতে 'শূন্যপুরাণ'কেও বুঝাইতেছে না। কারণ, শূন্যপুরাণে হরিশ্চন্দ্র রাজার বিস্তৃত কাহিনী নাই, কেবল তাঁহার ধর্মপূজার কথারই উল্লেখ আছে। অতএব মনে হয়, গোঁসাই পণ্ডিতের অধুনা-বিলুপ্ত কোন গ্রন্থই ধর্মসাহিত্যের আদি-রচনা। অতঃপর লাউসেনের বিস্তৃত কাহিনীর লোকপ্রীতির ফলে, তাহা কালক্রমে সংক্ষিপ্ত হইয়া ধর্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র পালায় কোনভাবে আত্মরক্ষা করিয়া আছে।

ময়ূরভট্ট

পরবর্তী ধর্মমঙ্গলের কবিগণ লাউসেনের কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহাদের পূর্ববর্তী একজন কবিকে এই কাহিনীর আদি-রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার নাম ময়ূরভট্ট। তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃত কিছুই জানিতে পারা যায় না, একমাত্র পরবর্তী কবিদিগের কাব্য হইতেই তাঁহার নামের সহিত পরিচয় লাভ করা যায় মাত্র।

রূপরাম তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্যে লিখিয়াছেন,

ময়ূর ভট্ট কৃপান্বিত হৈল করতার।
মরতে ধর্মের গীত করিতে প্রচার।।

মাণিক গাঙ্গুলী লিখিয়াছেন,

বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট কবি সুকোমল।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে শ্রীধর্মমঙ্গল।।
বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট আদি রূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্মগুণগান।।

ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁহার গীতারম্ভে লিখিয়াছেন,

হাকন্দ পুরাণ মতে ময়ূর ভট্টের পথে
জ্ঞানগম্য শ্রীধর্ম সভায়।
স্থানে স্থানে বন্দিব যতেক দেবদেবী।।
ময়ূর ভট্ট বন্দিব সঙ্গীত আদ্য কবি।
ময়ূর ভট্টে বন্দি দ্বিজ ঘনরাম গায়।।

১। ঘনরাম, ৩১

গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গলে লিখিয়াছেন,

আছিল ময়ূর ভট্ট সুকবি পণ্ডিত।
রচিল পয়ার ছন্দে অনাদ্যের গীত।।
ভাবিয়া তাঁহার পাদপদ্ম-শতদল।
রচিল গোবিন্দ বন্দ্য ধর্ম্মের মঙ্গল।।

সীতারাম দাস লিখিয়াছেন,

ময়ূর ভট্টকে বন্দিয়া মস্তকে
সীতারাম দাসে গায়।।
ময়ূর ভট্ট মহাশয় যোগে নিরমল।
প্রকাশ করিল ধর্ম্মের মঙ্গল।।
তাহার স্মরণ করি সবে গাই গীত।
সেই অঙ্ক শুনিলে ধর্ম্মেতে যাবে চিত।।
ময়ূর ভট্ট মহাশয়ের সুন্দর পাঁচালী।
আনন্দে হইল নষ্ট দুই এক কলি।।[১]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাচীন পুঁথিশালায় রক্ষিত একখানি নাম-তারিখ-হীন খণ্ডিত ধর্ম্মমঙ্গলের পুঁথিতে পাওয়া যায়,

যথা তুমি উপনীত তথাই * গীত
তোমা বিনু আনন্দে চঞ্চল।
দ্বিজ ময়ূর ভট্ট বঙ্গে (বন্দে?) ** গান স্কন্ধে
গাই গীত মঙ্গল।।[২]

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল হইতে উপরে যে পদ দুইটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার শেষটিতে ময়ূরভট্টের সঙ্গে রূপরাম বলিয়া একজন কবিরও বন্দনা রহিয়াছে। কিন্তু রূপরামও ময়ূরভট্টের পরবর্তী কবি এবং তিনিও যে তাঁহাকে বন্দনা করিয়া লইয়া নিজের কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, সাহিত্য পরিষদের প্রাচীন পুঁথি-শালায় রক্ষিত রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। রূপরাম লিখিয়াছেন, 'ময়ূরভট্টের পদ মনে অনুমানি'। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্মমঙ্গলের সকল কবিই তাঁহাদের কাহিনী মূলত ময়ূরভট্টের কাব্য হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ময়ূরভট্ট কে? তাঁহার পরিচয়ই বা কি?

স্বর্গত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ময়ূরভট্টের 'শ্রীধর্ম্মপুরাণ' নাম দিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ হইতে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মূল পুঁথি কিংবা তাহার কোন অনুলিপি পাওয়া যায় না। ১৩১০ সালে লিখিত একখানি মাত্র পুঁথির উপর নির্ভর

১। গ-স ৪৯৯৮, শেষপত্র।
২। সা-প-প ১৭ (অতিরিক্ত সংখ্যা) ১৭০

করিয়া গ্রন্থটি মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ-সম্পাদক ইহাকেই ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্টের কাব্য বলিয়া মনে করেন। ইহাতে কবির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, কবি ময়ূরভট্ট লাউসেনের পৌত্র ধর্মসেনের সমসাময়িক। গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করেন, মধূরভট্ট খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক।

কিন্তু নানা কারণে এই পুস্তকখানির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। একাদশ শতাব্দীর একজন কবির একখানি গ্রন্থ সহসা বিংশ শতাব্দীতে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিলে ইহার সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়া তাহা গ্রহণ করা উচিত। পুস্তকখানির ভাষা ও ভাবভঙ্গি অত্যন্ত আধুনিক। কিন্তু একখানি এতকাল অপ্রচলিত পুঁথির ভাষা এত আধুনিক হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদগুলি ব্যাপক প্রচলনের জন্য আধুনিকতা প্রাপ্ত হইয়াছে স্বীকার করা যায়, কিন্তু এত প্রাচীন পুঁথি-সংগ্রহের মধ্যে ময়ূরভট্টের আর একখানিও সম্পূর্ণ কিংবা খণ্ডিত পুঁথির পাতাও আবিষ্কৃত হয় নাই। অতএব যদি ইহা খাঁটি পুঁথিই হইত, তাহা হইলে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর মত ইহারও ভাষার প্রাচীনত্ব রক্ষা পাইত। বিশেষত এই আধুনিক পুস্তকখানি যাহার নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে, স্বর্গত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় তাহার যে ব্যক্তিগত পরিচয় আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাও এই পুস্তকখানির উপর বিশ্বাস স্থাপনের অনুকূল নহে। অতএব এই পুস্তকখানিকে কোনমতেই মাণিক-ঘনরাম-বন্দিত ময়ূরভট্টের রচিত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহা সম্ভবত অত্যন্ত আধুনিক কালে ময়ূরভট্টের নামের উপর অন্য কোন কবি রচনা করিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্বর্গত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় মনে করেন, ইহা আধুনিককালে শ্রীআশুতোষ পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তির রচিত।[১] এই রকম প্রয়াস আমাদের দেশে নূতন নহে।

ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন মনে করেন, ইহা 'অষ্টাদশ শতকের কবি রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জের রচনা। মুদ্রিত সংস্করণের আকর পুঁথির ভণিতা "দ্বিজ রামচন্দ" ছাপা বইয়ে হইয়াছে "দ্বিজময়ূরক"।[২] ভাষা বিচার করিয়া মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পুঁথিটিকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া মনে করিয়াছেন।[৩]

কিন্তু পুস্তকখানির রচনা আধুনিক হইলেও, ইহাতে ধর্মমঙ্গল কাহিনীর প্রাচীনতর ধারাটিরই অনুসরণ করা হইয়াছে। পুস্তকখানি সম্পূর্ণ নহে, চরিতখণ্ড বা লাউসেনের কাহিনী ইহাতেও নাই। তবে সংজাত খণ্ডের শেষে চরিতখণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত সূচী দেওয়া হইয়াছে, পুস্তকখানি অসম্পূর্ণ বলিয়াই পরবর্তী কাহিনী ইহাতে পাওয়া যায় না। এমন হইতে পারে যে, ময়ূরভট্টের কোন বিলুপ্ত-প্রায় স্মৃতি-অবশেষ কাহিনী অবলম্বন করিয়াই ইহা

১। সা-প-প. ৩৮, ৬৭

২। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ১ম খণ্ড, (১৯৪০), পৃ. ৫০৫

৩। প্রাগুক্ত পৃ, ১০০-১০১

আধুনিক কালে রচিত হইয়াছে; কারণ, ময়ূরভট্টের কোন পুঁথি আবিষ্কৃত না হইলেও তাঁহার রচিত অসংলগ্ন কতকগুলি পদের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বীরভূম রতন লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ স্বর্গত শিবরতন মিত্র মহোদয়ের প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের মধ্যে ময়ূরভট্টের ধর্মপুরাণও একখণ্ড সংগৃহীত ছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[১] স্বর্গত মিত্র মহাশয় উক্ত পুঁথিখানি এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি সংগ্রাহক স্বর্গত রাখালদাস কাব্যতীর্থের নিকট অর্পণ করেন, অতঃপর পুঁথিখানির আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মহামহোপাধ্যায় ঁহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ময়ূরভট্টের এই পুঁথিখানি দেখিয়াছিলেন বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুমান পুঁথিখানি পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখা। ময়ূরভট্ট এই সময়ের লোক হওয়াই খুব সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় শাস্ত্রী মহাশয় পুঁথিখানির আর কোন সন্ধান দিতে পারেন নাই, পুঁথিখানি প্রকাশিতও হয় নাই। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 'মাণিক গাঙ্গুলি ও ধর্মমঙ্গল' নাম দিয়া ১৩১২ (১ম সংখ্যা) সালে এক লেখক এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, ময়ূরভট্টের 'গ্রন্থ এখনও বাঁকুড়া জেলায় প্রচলিত আছে'। কিন্তু তিনিও ইহার আর কোন পরিচয় দিতে পারেন নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে, ময়ূরভট্টের নাম ও কাব্যকীর্তি যে একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহা নহে—হয় তো কোন কোন ধর্মমঙ্গলের কবির কাব্য-মধ্যে তাঁহার রচনাও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। নব্য ময়ূরভট্ট তেমনই মূল ময়ূরভট্টের প্রাচীন কোন অসংলগ্ন কাব্যকাহিনীকে ভিত্তি করিয়া হয়ত তাঁহার নূতন কাব্য গড়িয়াছেন, কিন্তু তাহা হইতে প্রাচীন ময়ূরভট্টের প্রকৃত পরিচয় উদ্ধারের উপায় নাই।

ময়ূরভট্ট জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কোন কোন ধর্মমঙ্গলের কবি তাঁহাকে 'দ্বিজ ময়ূরভট্ট' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বারেন্দ্র কুল-পঞ্জিকায় বাৎস্য গোত্রীয় ভট্টশালী গাঞির আদি পুরুষ মহীধরের পুত্র এক ময়ূরভট্টের উল্লেখ আছে।[৩] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব ইঁহাকেই ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি ময়ূরভট্ট বলিয়া অনুমান করিয়া ইঁহাকে ১১৭৯ বা ১১৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছির লোক বলিয়া ধরিয়াছেন।[৪] ময়ূরভট্ট কবি ছিলেন, এমন প্রসিদ্ধও আছে।[৫] কিন্তু তিনি বরেন্দ্রভূমির লোক, সেখানে ধর্মপূজাও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সেখান হইতে কোনও ধর্মমঙ্গল আবিষ্কৃত হয় নাই—ধর্মমঙ্গল একমাত্র রাঢ়েই রচিত হইয়াছিল—অন্যত্র কোথাও ইহা রচিত হয় নাই। অতএব এই ময়ূরভট্টের সহিত ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি ময়ূরভট্টের কোন সম্পর্ক কল্পনা করা যাইতে পারে না। মনে হয়, ময়ূরভট্ট কোন বাঙ্গালী কবির প্রকৃত নাম নহে—সংস্কৃত 'সূর্যশতক' রচয়িতা ময়ূরভট্টের নামটিই এখানে কোন বাঙ্গালী কবি গ্রহণ করিয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। ধর্মঠাকুরের পূজা তখনও নিম্ন

১। ব-প্রাপুবি ২।১, ।০
২। বৌদ্ধ গান ও দোঁহা (১৩২৩) ভূমিকা
৩। যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী কুলশাস্ত্র-দীপিকা (?), ২৬০
৪। সা-প-প, ৬০, ১৩-১৫, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ১ম খণ্ড, ঢাকা। (১৯৫৩), পৃ. ৯৮
৫। ব-সা-প-প, ১৩১৮ সাল, পৃ. ৪০

সমাজের মধ্যে আবদ্ধ ছিল বলিয়া ব্রাহ্মণ কবি ছদ্মনামের মধ্যেই আত্মগোপন করিয়া থাকিবেন। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য এক হিসাবে সূর্যদেবতার মাহাত্ম্যসূচক কাব্য—এই উদ্দেশেই বাঙ্গালী কবি সংস্কৃত কবির নামটি এখানে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ময়ূরভট্ট নামধারী কবিই ব্রাহ্মণ কবিদিগের মধ্যে ধর্ম্মমঙ্গল রচনার পথপ্রদর্শক। তাঁহারই দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া পরবর্তী কালে মাণিকরাম, ঘনরাম প্রভৃতি কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কবি এই কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

ময়ূরভট্টের কাব্যের নাম 'হাকন্দ-পুরাণ'। ঘনরাম চক্রবর্তী এই সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, 'হাকন্দ-পুরাণ মতে, ময়ূরভট্টের পথে'। হাকন্দ-পুরাণ বলিয়া স্বতন্ত্র কোন কবির লেখা কোন কাব্য নাই। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ'-এর নামও 'হাকন্দ-পুরাণ' নহে। কারণ, 'শূন্যপুরাণ'-এ পশ্চিমোদয়েব কোন কথা নাই, অথচ ঘনরাম উল্লেখ করিয়াছেন,—

হাকন্দ-পুরাণে লেখা সাক্ষাৎ আমার দেখা
কলিকালে পশ্চিম উদয়।

লাউসেন যেখানে দেহ নয়খণ্ড করিয়া কাটিয়া ধর্মের পূজা করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নামই হাকন্দ; ঘনরাম লিখিয়াছেন,—

দিবস দ্বাদশ দণ্ডে হাকন্দেতে নব খণ্ডে
হবে যবে রঞ্জার তনয়।

ময়ূরভট্টই এই হাকন্দ-কাহিনীর রচয়িতা বলিয়া তাঁহার কাব্যের নামও হাকন্দ-পুরাণ। পূর্বোল্লিখিত ময়নাপুর গ্রামে হাকন্দ পোখর নামে এক অতি পুরাতন ও বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। বারুণীর সময় ইহার তীরে মেলা বসে। যাত্রীরা ইহাতে স্নানের জল পায় না, কাদা জলই মাথায় দেয়। ময়ূরভট্টের বর্ণিত হাকন্দের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে। নব্য ময়ূরভট্ট তাঁহার কাব্যখানিকে সর্বত্রই 'ধর্মপুরাণ', 'শ্রীধর্মপুরাণ', কোথাও বা 'অনাদি-পুরাণ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—কোথাও 'হাকন্দ-পুরাণ' বলেন নাই। ইহা হইতেও এই পুস্তকের আর্বাচীনত্বই প্রমাণিত হয়।

আদি রূপরাম

ময়ূরভট্টের পথানুসরণ করিয়া সর্বপ্রথম কোন্ কবি ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলিবার উপায় নাই। তবে মাণিক গাঙ্গুলীর কাব্যেই ময়ূরভট্টের নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে আর একজন কবির নামের উল্লেখ রহিয়াছে, তাঁহার নাম রূপরাম। মাণিকরাম তাঁহাকে আদি রূপরাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন,

বন্দিয়া ময়ূরভট্ট আদি রূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্মগুণগান।।[১]

১। মাণিকবাম ১৯১

ইহাতে মনে হয়, মাণিকরামের সমসাময়িককালে রূপরাম নামে আরও একজন ধর্মমঙ্গলের কবি বর্তমান ছিলেন; সেইজন্য ইঁহাদের মধ্যে যিনি প্রাচীনতর, তাঁহাকেই তিনি আদি রূপরাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও বাংলা সাহিত্যে দুইজন রূপরামের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না,—রূপরাম ভণিতায় যে সকল পুঁথি এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা একজনেরই বা পরবর্তী রূপরামের রচনা বলিয়া মনে হয়—তথাপি মনে করা যাইতে পারে যে, সম্ভবত আদি রূপরামের অনেক রচনা নামসামঞ্জস্য হেতু পরবর্তী রূপরামের নামে চলিয়া গিয়াছে। তবে বর্তমান অবস্থায় স্বতন্ত্রভাবে আদি রূপরামের পরিচয় উদ্ধার করিবার উপায় নাই।

খেলারাম

আদি রূপরামের পর সম্ভবত খেলারাম তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্য প্রণয়ন করেন। অবশ্য পরবর্তী কোন কবি খেলারামের কথা উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার কাব্যে গ্রন্থ রচনার কাল-নির্দেশক যে পদটি পাওয়া যায়, তাহা হইতেই অনুমিত হয়, তিনি এই বিষয়ে একজন অতি প্রাচীন কবি। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনুসন্ধানকারীদিগের মধ্যে একজন মাত্র তাঁহার পুঁথি দেখিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; তাঁহা কর্তৃক উদ্ধৃত কয়েকটি পদই তাঁহাদের খেলারাম সম্পর্কিত আলোচনার একমাত্র ভিত্তি। তাঁহার হস্তলিখিত পুঁথি হইতে গ্রন্থরচনার কাল-সম্বন্ধে এই পদ দুইটি সাধারণত উদ্ধৃত হইয়া থাকে,

ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন।।
হে ধর্ম এ দাসের পুরাও মনস্কাম।
গৌড়কাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলারাম।।

'ভুবন' অর্থে চতুর্দশ, 'বায়ু' উনপঞ্চাশ। অতএব দেখা যাইতেছে, ১৪৪৯ শক অর্থাৎ ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে খেলারাম গ্রন্থরচনা আরম্ভ করেন। 'শরের বাহন' বলিতে তিনি সম্ভবত কার্তিক মাস মনে করিয়া থাকিবেন। কেহ কেহ মনে করেন, শরের বাহন ধনু অর্থাৎ ইহা পৌষ মাস। খেলারামের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না; তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন,

তোমার কৃপায় যদি গ্রন্থ সাঙ্গ হয়।
অষ্টমঙ্গলায় দিব আত্ম-পরিচয়।।

কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের শেষ ভাগ বা অষ্টমঙ্গলা পাওয়া যায় নাই। অতএব ধর্মঠাকুর তাঁহার মনস্কাম পূর্ণ করিয়াছিলেন কি না, তাহাও জানিতে পারা যায় না।

মাণিকরাম

ইহার পরই সম্ভবত মাণিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয়। তাঁহার পুস্তক মুদ্রিত

হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।[১] মাণিকরাম তাঁহার কাব্য-মধ্যে গ্রন্থ-রচনার কাল সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কালক্রমে লিপিকার-প্রমাদে কত বিকৃত হইয়াছে যে, বর্তমানে ইহা হইতে একটা নির্দিষ্ট সময় নিরূপণ করা এক প্রকার দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে মুদ্রিত পুস্তকে তাঁহার গ্রন্থ-সমাপ্তির কাল এইভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে,—

সাফেরী ও সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধ সহ যুগ দক্ষে যোগতার সনে।।

বলা বাহুল্য, এই পদে কোথাও কোনও মারাত্মক লিপিকর-প্রমাদ রহিয়াছে। তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য স্বর্গত পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় কবির বর্তমান বংশধরের গৃহে এই কাব্যের যে একখানি প্রতিলিপি রক্ষিত আছে, তাহা হইতে এই গ্রন্থ-সমাপ্তিব কাল-নির্দেশক পদটির একটি নকল আনাইয়াছিলেন। তাহাতে উক্ত পদটি এইভাবে পাওয়া যায়,—

সাকে রীত্ত সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিধসহ জ্জোগ দক্ষে যোগ তার সনে।।
বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহতি।
সর্বরি সরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল্য গীত।।

ইহা হইতে এই পদটির প্রকৃত পাঠ সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া যায়। সম্ভবত ইহার বিশুদ্ধ পাঠ এই প্রকার হইবে,—

শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধ (বা সিদ্ধি) সহ যুগ পক্ষে যোগ তার সনে।।
বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহৃত।
শর্বরী শরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হইল গীত।।

তাহা হইলে মাণিকরামের গ্রন্থ সমাপ্তির এই সময় পাওয়া যাইতেছে, 'ঋতু' ৬, তাহার সঙ্গে 'বেদ' অর্থাৎ ৪ এবং তাহার দক্ষিণে বা ডাইনে 'সমুদ্র' বা সাত, ইহাতে ৬৪৭ পাওয়া যাইতেছে, ইহার সহিত পরবর্তী পদে যে রাশির উল্লেখ আছে, তাহা যোগ করিতে হইবে। পরবর্তী পদে আছে 'সিদ্ধ', তাহাকে সিদ্ধি ধরিলে ৮, তাহার দক্ষিণে 'যুগ' আর 'পক্ষ' অর্থাৎ ৪ ও ২; অতএব ইহাতে হয়, ৮৪২, এই উভয় রাশি যোগ করিলে ১৪৮৯ শক পাওয়া যায়। ইহাতে ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হয়।

কিন্তু মাণিকরামের এই সময় সম্বন্ধে সকলেই একমত নহে। ডক্টর স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উক্ত 'সিদ্ধ' শব্দের অর্থ ঋষি ধরিয়া ইহার অর্থ ৭ বলিয়া বিবেচনা করেন। তাহাতে মাণিকরামের সময় আরও একশত বৎসর পিছাইয়া ১৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হয়। স্বর্গত যোগেশচন্দ্র

১। মাণিকরাম গাঙ্গুলী (পূর্ব দ্রষ্টব্য)।

রায় মহাশয় মাণিকরামের ভাষা, বংশলতা ও গীতসাঙ্গকালে উদ্ধৃত উক্তির সহিত প্রাচীন পঞ্জিকার বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন, মাণিকরাম দেড়শত বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন।[১] তিনি উক্ত পদের সিদ্ধা শব্দের অর্থে ২৪ ধরিয়াছেন; কিন্তু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, বংশলতার প্রমাণ সকল সময় নির্ভুল নহে এবং প্রাচীন পঞ্জিকার গণনার উপরও যে একান্তভাবে নির্ভর করা যায় না, কৃত্তিবাস সম্পর্কে তাহারও প্রমাণ স্বর্গত রায় মহাশয় নিজেই দিয়াছেন। তাঁহার মতে মাণিকরামের গ্রন্থসমাপ্তি কাল ১৭০৩ শক বা ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু মাণিকরামের কাব্য পড়িয়া তাঁহাকে এত আধুনিক বলিয়া মনে হয় না। বিশেষত যে মূল পুঁথিখানি হইতে সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থখানি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার 'বিতারিখ ১০ই ফাল্গুন শকাব্দ ১৭৩১। কিন্তু কাব্য রচনার ২৭।২৮ বৎসরের মধ্যেই ইহার রচনা-কাল নির্দেশক পদটি এত বিকৃত হইতে পারে না। এমন কি, তখন পর্যন্ত কবির বংশধরদিগের গৃহে মূল পুঁথিটি থাকিবার কথা, কিন্তু তাঁহার বংশধরদিগের গৃহে ইহার অনুলিপিই আছে, মূল পুঁথি নাই।

স্বর্গত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন, 'মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল, বিষ্ণুপুরে মদনমোহন-মন্দির প্রতিষ্ঠার (১৬৯৪ খ্রীঃ) পর এবং মদনমোহন ঠাকুরের বিষ্ণুপুর ত্যাগের (১৯৪৮-৭৮ খ্রীঃ) পূর্বে রচিত।[২] কারণ, তাঁহার কাব্যমধ্যে এই দুইটি পদ পাওয়া যায়,—

বিষ্ণুপুরে বন্দিব শ্রীমদনমোহনে।
পূর্বেতে আছিলা প্রভু বিপ্রের সদনে।।

কিন্তু মনে হয়, এই পদ দুইটি মাণিকরামের রচনা নহে, ইহা পরবর্তী কোন গায়েনের বন্দনা মাত্র। মঙ্গলকাব্যের প্রায় এই শ্রেণীর বন্দনার কোন পদই মূল কবি কর্তৃক রচিত হইত না, হইলেও তাহার মধ্যে পরবর্তীকালে সমসাময়িক প্রভাববশত গায়েনের অনেক রচনাও আসিয়া প্রবেশ লাভ করিত। এই দুইটি পদও তেমনই কোন পরবর্তী গায়েন মূল কবির কাব্য মধ্যে যোজনা করিয়া দিয়াছে; অতএব ইহা অবলম্বন করিয়া মূল কবির সময় নিরূপণের প্রয়াস সমীচীন নহে। সুরিক্ষার পাটে বন্দী বিদগ্ধ বিদেশী পুরুষের তালিকায় কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম, খেলারাম, ঘনরাম প্রভৃতি নামগুলি এই ভাবেই তাঁহার কাব্যমধ্যে পরবর্তী কালে কোন রসিক গায়েন কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। মাণিকরাম যদি খেলারাম, ঘনরাম প্রমুখ ধর্মমঙ্গল কবিদিগের নাম জানিতেন, তবে তিনি স্থানান্তরে ময়ূরভট্ট ও রূপরামের সঙ্গে ইহাদেরও নাম উল্লেখ করিতেন, কিংবা তাঁহার রচনায় ইঁহাদের প্রভাব থাকিত। অন্তত ঘনরামের প্রভাব এড়াইয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব অনুমান করেন, মাণিকরাম ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ধর্মমঙ্গল লিখেন। তাঁহার মতে ঋতু ৬, বেদ ৪, সমুদ্র ৭ অর্থাৎ ৬৪৭; তাহার সহিত সিদ্ধ ৮৪ (চৌরাশী সিদ্ধা হইতে), যুগ ৪, অর্থাৎ ৮৪৪ যোগ করিয়া ১৪৯১ শক বা ১৫৬৯

১। সা-প-প ১৫, ৪৭-৫২ ২। ময়ূরভট্ট

খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যাইতেছে।[১] আমাদের গৃহীত সময়ের সঙ্গে ইহার মাত্র দুই বৎসরের ব্যবধান; অতএব এই মতও সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায়। মাণিকরাম কাব্যমধ্যে এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন,—

বাঙ্গাল গাঙ্গুলী গাঁই পিতা গদাধর।
স্বসাহীন সম্প্রতি ছয় সহোদর।।
দুর্গারাম দ্বিতীয় বিখ্যাত গুণধাম।
মুক্তারমা তৃতীয় চতুর্থ ছকরাম।।
রামতনু পঞ্চম রসিক রসে পূর্ণ।
সর্বানুজ নয়ন সকল লোকে ধন্য।।
এক কন্যা অভয়া, আখ্যাত অতি ভব্যা।
শান্তমতি সুলক্ষণা সীমন্তিনা সখা।।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে কাত্যায়নী-সুত।
সত্যগুণে ধর্ম জাগে সদয় সদত।।

কবির পিতামহ অনন্তরাম, প্রপিতামহ সুদাম, বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম গোপাল। কবির পিতামহ একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের বংশ অত্যন্ত প্রাচীন, তাঁহারা কুলীন ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের বংশ বাঙ্গাল মেল গাঙ্গুলী গাঁই নামে পরিচিত। বেলডিহা গ্রাম কবির জন্মস্থান। গ্রন্থ-রচনার কারণ সম্বন্ধে কবি এক বিস্তৃত কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। কবি নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অবশেষে তর্কশাস্ত্র পড়িতে মনস্থ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তুঙ্গারি গ্রামে গমন করেন। পাঠ আরম্ভ করিবেন, এমন সময় রাত্রিতে এক দুঃস্বপ্ন দেখিলেন যে তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই দিবসই 'খুঙ্গি পুঁথি' বাঁধিয়া বাটি রওয়ানা হইলেন। গৃহে ফিরিবার পথে তিনি দৈবক্রমে পথ ভুলিয়া যান। একে দুশ্চিন্তায় তাঁহার মন অস্থির, তাহাতে আবার পথশ্রমে দেহ অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এমন অবস্থায় এক নির্জন মাঠের মধ্যে এক অপরিচিত বৃদ্ধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ যুবকের মূর্তি ধারণ করিলেন। অতঃপর উভয়ে শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ কবির শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং কবিকে—

সঙ্গোপনে কহিলেন সাবধান হইবে।
অধ্যয়ন করিতে আমার কাছে যা'বে।।
জগতে তোমার যশ হবেক যেরূপে.
সেই বিদ্যা দিব আমি সত্যের স্বরূপে।।

এই কথা বলিয়াই ব্রাহ্মণ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কবি বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। এমন সময় ধর্মের দুইটি পাদুকা গলায় বাঁধিয়া লইয়া এক ডোম পণ্ডিত

১। *I. H.Q. I*(1925) 185

আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। কবির নিকট পণ্ডিত এই পথে কোন ব্রাহ্মণকে যাইতে দেখিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিল। কবি তাহার কোন জবাব দিতে পারিলেন না, পণ্ডিতকে সেই ব্রাহ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, পণ্ডিত বলিল,—

চিনিতে নারিছ বাছা দ্বিজবর কেবা।
পদ্মতুল্য সম্প্রতি পাদুকা কর সেবা।।
পরে তাঁর পরিচয় পাবে অচিরাৎ।
সত্য মিথ্যা মোর কথা বুঝিবে সাক্ষাৎ।।

কবি এই কথার কোন অর্থ পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ সম্মুখে এক দিব্য সরোবর দেখিতে পাইলেন। তাহাতে গিয়া কবি তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন, কিন্তু বৃক্ষতলে ফিরিয়া দেখেন, পাদুকা সহ পণ্ডিত অদৃশ্য হইয়াছে। অবশেষে কবি নিজের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অপরিচিত ব্রাহ্মণ কবিকে তাঁহার নিকট গিয়া অধ্যয়ন করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন—ইহা স্মরণ করিয়া তৃতীয় দিবসে কবি সেই ব্রাহ্মণের নিবাস রঞ্জাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যেই এক দীঘির তীরে ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এইবার ব্রাহ্মণের মূর্তি বড় ভয়াবহ, হস্তে এক দীর্ঘ যষ্টি, মুখে ক্রুদ্ধ ভাব। কবি দেখিয়া ভয় পাইলেন—

বিপ্র কন তোর পারা না দেখি বর্বর।
দস্যুবৃত্তি করেছেন বাল্মিকী মুনিবর।।
বুঝি তোর আজি হল বিঘোর মরণ।
এত শুনি মোর হল অঘোর নয়ন।।

কোন অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য হয়ত ব্রাহ্মণ তাঁহার উপর অপ্রসন্ন হইয়া থাকিবেন, ভাবিয়া কবি তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। এইবার ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অভয় দিলেন, —বলিলেন, রঞ্জাপুরে আমার গৃহে গিয়া অপেক্ষা কর, আমি এখনই ফিরিব। কিন্তু কবি রঞ্জাপুরে গিয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, এমন কোন ব্রাহ্মণ সেই গ্রামে নাই। কবি নিরাশ হইয়া স্বগৃহে ফিরিলেন, পথশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন, নিদ্রায় অভিভূত হইলে পর অপূর্ব স্বপ্ন দর্শন করিলেন, যেন সেই ব্রাহ্মণ শিয়রে আসিয়া বসিয়া বলিতেছেন,—

কহেন কিসের চিন্তা কিসের ব্যামোহ।
উঠ বাছা আমার বচনে মন দেহ।।
গীত রচ ধর্মের গৌরব হবে বাড়া।
নকল লেখিয়া দিব লাউসেনী দাঁড়া।।
বিশ্বের কারণ আমি বাঁকুড়া রায় নাম।
না করিবে প্রকাশ হইবে সাবধান।।
সঙ্কটে সদয় হব করিলে স্মরণ।
অন্তকালে দিব দুটি অভয় চরণ।।

বাঁকুড়া রায় আরও বলিলেন যে, বার দিনে এই বারমতি সম্পূর্ণ করিতে হইবে, অন্যথায় তাঁহার সমূহ বিপদ। তিনি তাঁহার বীজমন্ত্র লিখিয়া দিলেন, ইহাতেই কবির লেখনী হইতে অনর্গল কবিতা বাহির হইবে বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন। মাণিকরামের চতুর্থ সোদর ছকুরামকে এই গানের গায়েন হইবার জন্য তিনি কবির নিকট বলিয়া গেলেন। এই নির্দেশ মত অগত্যা কবি কাব্য-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন, বাধ্য হইয়া কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তানকে গায়েন হইয়া আসরে নামিতে হইল।

মাণিকরামের গ্রন্থ অন্যান্য ধর্মমঙ্গল কাব্যের মতই ২৪ পালায় সম্পূর্ণ। প্রথম পালায় কবি গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ, ধর্মের বন্দনা, তন্মধ্যে মার্কণ্ড মুনির ধর্ম-পূজার কথা, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন; ইহাই ধর্মমঙ্গল কাব্যের স্থাপন পালা, পরবর্তী আরও ২৩টি পালায় লাউসেনের কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। কাহিনীভাগে দুই-এক স্থলে অন্যান্য ধর্মমঙ্গল হইতে একটু স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু অন্যত্র প্রায় অভিন্ন। দুই-এক স্থলে যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়, তাহা মাণিকরামের প্রাচীনত্বেরই পরিচায়ক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরামের কাব্যে মার্কণ্ড মুনির ধর্মপজার কোনই উল্লেখ নাই, হরিশ্চন্দ্র রাজার উল্লেখ রহিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, এই মার্কণ্ড মুনি ও হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীই ধর্মসাহিত্যের প্রাচীনতর উপজীব্য ছিল। লাউসেনের কাহিনী পরবর্তী যোজনা মাত্র। অতএব মাণিক-রামের এই মার্কণ্ড মুনির উল্লেখ হইতেই তাঁহার প্রাচীনত্বের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। মাণিকরামে গৌড়েশ্বরের মাতার নাম সাফুল্লা, ঘনরামে বল্লভা। সাফুল্লা নামটি প্রাচীনতর। মাণিকরামে লাউসেনের অশ্বের নাম অম্বির পাখর, ঘনরামে আগুির পাখর। আরও কয়েকটি বিষয়ে মাণিকরাম এবং পরবর্তী ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের মধ্যে সামান্য অনৈক্য রহিয়াছে। এই সমস্ত ব্যতিক্রম দেখিয়া মনে হয়, ইহাদের সময়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান।

মাণিকরাম যে কেবল একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাহাই নহে—তিনি একজন সুকবিও ছিলেন। ধর্মমঙ্গল বীর-রসাত্মক কাব্য। কবি তাঁহার কাব্যে বীররস ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যেমন স্থানে স্থানে ওজস্বিনী ভাষা ও বর্ণনার সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনই আবার তিনি নিপুণ চিত্রকরের দৃষ্টিদ্বারা সামাজিক চরিত্র-চিত্রণের প্রয়াসও সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। পাণ্ডিত্যের প্রভাবে তাঁহার রচনা কোথাও ব্যাহত হইয়া পড়ে নাই। তবে সংস্কৃত রচনার আদর্শানুযায়ী তাঁহার রচনায় নানা অলঙ্কারের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য হইতে সংগৃহীত উপকরণরাশি বাংলা ছন্দের সূত্রেও তিনি এমনভাবে গাঁথিয়াছেন যে, ইহাতেও বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাইয়াছে, তাহা সংস্কৃতের অন্ধ অনুকরণে পর্যবসিত হয় নাই—

কলুষনাশিনী কালরাত্রি করালিনী।
নৃসিংহনাশিনী নমোস্তুতে নারায়ণী।।

দক্ষের দুহিতা দুর্গে দুর্গতিনাশিনী।
নাগারিবাহিনী নমোস্তুতে নারায়ণী।।

মাণিকরামের এই সকল রচনা হইতে তাঁহার সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। তিনি লাউসেনের বিদ্যাভ্যাস সম্পর্কে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা একমাত্র তাঁহার নিজের সম্পর্কেই প্রযোজ্য হইতে পারে,—

অবশেষে পড়িলেন সাহিত্য সকল।
মুরারি ভারবি ভট্ট নৈষধ পিঙ্গল।।
কালিদাস কৃত কাব্য অন্য কাব্য কত।
অলঙ্কার জ্যোতিষ আগত তর্ক শাস্ত্র।।
ছন্দ শাস্ত্র পুরাণ পড়িল তারপর।
উত্তম হইল বিদ্যা নয় দশ বছর।।

সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে কবি জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রচুর রসও আহরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কাব্য হইতে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়; মাণিকরামের কবিকল্পনায় চরিত্র সৃষ্টিও কতকটা সার্থক হইয়াছে। লখ্যা ডোমনীর চরিত্র তাঁহার কাব্যের এক অতি অপূর্ব সৃষ্টি। আদিরস বর্ণনায় মাণিকরাম অন্যান্য ধর্মমঙ্গল কবিদিগের তুলনায় একটু বিশেষ অগ্রসর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও তাঁহার সংস্কৃত রসশাস্ত্র অনুশীলনের ফলই বলিতে হইবে।

রূপরাম

সম্ভবত মাণিকরামের সমসাময়িক কালেই দ্বিতীয় রূপরাম আবির্ভূত হইয়াছিলেন।[১] কিন্তু মাণিকরামের কাব্যের কয়েক বৎসর পরে তাঁহার কাব্য রচিত হয়। দ্বিতীয় রূপরাম তাঁহার কাব্যমধ্যে যে গ্রন্থরচনার কাল নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার বিশুদ্ধ পাঠ এই প্রকার হইবে বলিয়া মনে হয়,—

তিন বাণ চারি যুগে বেদে যত রয়।
শাকে সনে জড় হৈলে কত শক হয়।।
রসের উপরে রস তাহে রস দেহ।
এই শকে গীত হৈল লেখা কইরা লেহ।।

ইহার অর্থ হইতেছে, শক আর সন জড়াইয়া যুগপৎ বলিতেছি। তিন বাণ (৩×৫), চারি যুগ (৪×৪) অর্থাৎ ১৫১৬, বেদ দ্বারা হীন (minus) করিলে যত থাকে, তত শক অর্থাৎ ১৫১২ শক। আর রস + রস + রস = ৯৯৯ হিজরী সন (বাংলা সন তখনও প্রবর্তিত হয় নাই)। ৯৯৯ হিজরীতে ১৫১২ শকাব্দ পাইতেছি। অতএব রূপরামের গ্রন্থরচনার কাল ১৫১২ শকাব্দ বা ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ।

১। রূপরামের ধর্মমঙ্গল (পূর্বে দ্রষ্টব্য)

স্বর্গত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় সঠিক পাঠটি ধরিতে না পারিয়া ইহার আনুমানিক একটা অর্থ গ্রহণ করিয়া ইহাতে ১৭৪৮ শক বা ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ পাইয়াছেন।[১] শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহার অর্থ ১৬৪১ শকাব্দ বা ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।[২] স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় রূপরামকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া মনে করেন। রূপরামের কাব্যের যথেষ্ট প্রচার হইয়াছিল, সেই জন্য ভাষা হইতে তাঁহার কাল নিরূপণ অসম্ভব, তবে ভাষার বিচারেও তিনি ষোড়শ শতাব্দীর লোক হইতে কোন আপত্তি হইতে পারে না।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের জন্মস্থানের অনতিদূরবর্তী বর্ধমান জিলার অন্তর্গত রায়না থানার এলাকায় কাইতি শ্রীরামপুর গ্রামে রূপরামের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা একজন পরম পণ্ডিত ছিলেন, শতাধিক ছাত্র তাঁহার গৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন করিত। রূপরামের আর তিন সহোদর ছিলেন, জ্যেষ্ঠের নাম রত্নেশ্বর, তিনি রূপরামের লেখাপড়ায় ঔদাসীন্যের ভাব দেখিয়া তাঁহাকে সর্বদা ভর্ৎসনা করিতেন। অবশেষে বাধ্য হইয়া রূপরাম খুঙ্গি পুঁথি লইয়া পাঠাভ্যাসের জন্য কবিচন্দ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্যের টোলে আসিয়া ভর্তি হইলেন। রূপরাম অত্যন্ত দুর্বিনীত ছাত্র ছিলেন, গুরুর সঙ্গে একদিন বচসা আরম্ভ করিলেন, ক্রুদ্ধ হইয়া গুরু তাঁহাকে এক ঘা পুঁথির বাড়ি দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। রূপরাম নবদ্বীপে বিদ্যানিধি ভট্টাচার্যের টোলে পড়িতে চলিলেন; কিন্তু পথিমধ্যে জননীর কথা মনে হওয়ায় গৃহের দিকে ফিরিলেন। রূপরাম তাঁহার আত্মবিবরণী ও গ্রন্থোৎপত্তির কারণে লিখিয়াছেন, এই সময়েই ধর্মঠাকুর পথিমধ্যে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন,—

সুবর্ণ পইতা গলে পতঙ্গ-সুন্দর।
কলধৌত কাঞ্চন কুণ্ডল ঝলমল।।
তরাসে কাঁপিল তনু প্রাণ দুর দুর।
আপুনি বলেন ধর্ম দয়ার ঠাকুর।।
আমি ধর্ম ঠাকুর বাঁকুড়া রায় নাম।
বারদিনের গীত গাও শুন রূপরাম।।
চামর মন্দিরা দিব অপূর্ব মাদুলি।
তুমি গেছ পাঠ পড়িতে আমি খুঁজে বুলি।।

পথিমধ্যে এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া কবির 'তরাসে কাঁপিল তনু চঞ্চল পরাণ'। তিনি উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইয়া একেবারে নিজের বাড়িতে আসিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রত্নেশ্বর পুনরায় তর্জন গর্জন আরম্ভ করিলেন, বলিলেন, 'কালি গিয়াছ পাঠ পড়িতে আজি আইলা ঘরে'। রূপরাম পুনরায় গৃহত্যাগ করিলেন, নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে

১। প্রবাসী, ভাদ্র (১৩৩৪) ৬৪২;
২। ময়ূরভট্ট ।।৶০ পাদটীকা

গোপভূমের রাজা গণেশের আশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা গণেশ কবিকে চামর মন্দিরা উপহার দিয়া গানের দল বাঁধিয়া দিলেন। রূপরাম বলিয়াছেন, 'সেই হত্যে গীত গাই ধর্মের আসরে', পাঠে আর মনঃসংযোগ করেন নাই। রূপরাম সর্বত্র নিজেকে দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু সেই যুগে ব্রাহ্মণগণ এই বৃত্তি গ্রহণ করিলে সমাজে পতিত হইতেন, সম্ভবত তিনিও পতিত হইয়াছিলেন। গোপভূমির রাজা গণেশ কবে বর্তমান ছিলেন, তাহা জানা যায় নাই; তাহা হইলেও কবির কাল নিরূপণের অনেকটা সাহায্য হইত।

মাণিক গাঙ্গুলী রূপরামকে আদর্শ করিয়াই তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, অনেক স্থলে রূপরামের সহিত মাণিকরামের যে যে অংশে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিল দেখিতে পাওয়া যায়,তাহা সম্ভবত আদি রূপরামেরই রচনা, তাহা মাণিকরামের কাব্যেও যেভাবে প্রবেশ করিয়াছে, পরবর্তী রূপরামের কাব্যেও সেইভাবেই প্রবেশ করিয়াছে। উভয় কবির ইছাই বধ পালাটি প্রায় অভিন্ন, এই জন্য অবশ্য মাণিকরামই রূপরামের নিকট ঋণী, না উভয় কবিই তাঁহাদের পূর্ববর্তী ময়ূরভট্টের কাব্য এইভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন, ময়ূরভট্টের পুঁথি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত তাহা বলিবার উপায় নাই।

ভট্টাচার্যের টোলে অধ্যয়ন শেষ না করিলেও রূপরাম যে পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রচনা হইতেই প্রকাশ পায়। জামতি পালায় কুলটা নয়ানীর রূপ-সজ্জার যে বর্ণনা তিনি দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে—

কপালে সিন্দুর পরে তপন-উদয়।
চন্দন-চন্দ্রিমা তার কাছে কাছে রয়।।
চন্দ্র-কোলে শোভা যেন করে তারাগণ।
ঈষৎ করিয়া দিল বিন্দু বিচক্ষণ।।
এক ঠাঞি রবি শশী তারাগণযুতা।
আনন্দ অম্বুদকূলে বিজুরীর লতা।।

মধ্যে মধ্যে রূপরামের রচনায় এই প্রকার পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় তাঁহার কাব্যমধ্যে সুলভ নহে। অন্যত্র প্রায়ই তাঁহার বর্ণনা সরল, রচনাও মধ্যে মধ্যে শ্রুতি-মধুর। কাহিনী বর্ণনা করিবার একটি সহজ ভঙ্গিমা তাঁহার ছিল—তাহা দ্বারাই এই দীর্ঘ কাহিনীটি তিনি একটানা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আত্মবিবরণী রচনার অংশে কবি ভক্তের সঙ্গে ভগবানের যে সম্পর্কের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হইলেও ইহার মধ্যে তাঁহার একটি সুগভীর আন্তরিকতার পরিচয় মূর্ত হইয়া আছে।

শ্যাম পণ্ডিত

শ্যাম পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল বীরভূম অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। ইহার একখানি মাত্র পুঁথির

বিষয় জানিতে পারা যায়।[১] পুঁথিটির তারিখ ১৬২৫ শকাব্দ বা ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দ। অতএব শ্যাম পণ্ডিত ইহার পূর্ব্বেকার লোক।

পুঁথির মধ্যে শ্যাম পণ্ডিতের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পণ্ডিত উপাধি দেখিয়া মনে হয়, তিনি ধর্মপূজারী ছিলেন। নিজেকে তিনি ধর্মদাস বলিয়া ভণিতায় উল্লেখ করিয়াছেন। বীরভূম অঞ্চলে তাঁহার পুঁথির প্রচলন হইতে ইহাই মনে হয় যে, তিনি ঐ অঞ্চলেরই লোক ছিলেন। শ্যাম পণ্ডিত লাউসেন কাহিনীর স্থানীয় জনশ্রুতি লইয়াই কাব্য লিখিয়াছেন। বীরভূম অঞ্চলেই তিনি তাঁহার কাহিনীর ঘটনা-স্থান স্থাপন করিয়াছেন। 'শ্যাম পণ্ডিত ইছাই ঘোষকে ঈশ্বর ঘোষ ও তাঁহার অনুজকে বিজয় ঘোষ নামে অভিহিত করিয়াছেন, ইঁহার পুঁথিতে ঢেকুর গড়ের নাম ত্রিহট্ট গড়। মানিক গাঙ্গুলী, ঘনরাম প্রভৃতি জালন্দার গড়ের রাজার নাম লিখিয়াছেন জল্লাদ শেখর,—শ্যাম পণ্ডিতের পুঁথিতে সামন্তশেখর নাম পাওয়া যায়, সুতরাং স্থানীয় প্রবাদ-কথিত নামের সঙ্গে শ্যাম পণ্ডিতের মিল আছে।[২] বাংলার মেয়েলী ব্রতের ছড়ায় এক শ্যাম পণ্ডিতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—যেমন, 'অশ্বত্থ পাতা পুণ্য লতা শ্যাম পণ্ডিতের ঝি।' ইহার সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের শ্যাম পণ্ডিতের কোন সম্পর্ক আছে কি না, তাহা জানিতে পারা যায় না। শ্যাম পণ্ডিতের পুঁথিতে এক চণ্ডীদাসের উল্লেখ আছে। ইনি সম্ভবত বীরভূম জেলার নানুরের কবি দ্বিজ চণ্ডীদাস। ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, শ্যাম পণ্ডিত বীরভূম অঞ্চলের বহু স্থানীয় জনশ্রুতিকে তাঁহার কাব্যের উপকরণ রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। শ্যাম পণ্ডিতের কবিত্বশক্তি উচ্চাঙ্গের ছিল না। তাঁহার রচনায় দেবতাই লক্ষ, মানুষ উপলক্ষ মাত্র। শ্যাম পণ্ডিত তাঁহার কাব্যের নাম 'নিরঞ্জন-মঙ্গল' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন,—

নিরঞ্জন-মঙ্গলের অপূর্ব বন্দনা।
আদর করিয়া ভাই শুন সর্বজনা।।[৩]

শ্যাম পণ্ডিতের পুঁথিতে ধর্মদাস নামক একজন স্বতন্ত্র কবির ভণিতাযুক্ত বহু পদ পাওয়া যায়; পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত শ্যাম পণ্ডিতের পুঁথির লিপিকাল ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দ। অতএব ধর্মদাস যদি স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইয়া থাকেন, তবে তিনি ইহার পূর্ববর্তী লোক।

ধর্মদাস প্রকৃতই কোন কবির নাম, কিংবা শ্যাম পণ্ডিতই ধর্মঠাকুরের কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া নিজেকে ধর্মদাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বলা কঠিন। তবে তাঁহার নিম্নলিখিত ভণিতা হইতে মনে হয়, শ্যাম পণ্ডিতের নামই ধর্মদাস ছিল এবং তিনি জাতিতে বণিক ছিলেন,—

১। গ. স ৪৯৯২; ইঁহার আর একখানি অপ্রকাশিত ও অসম্পূর্ণ পুঁথি শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট আছে। পুঁথিখানির একটি অসম্পূর্ণ বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল।
২। মহিমারঞ্জন চক্রবর্তী ৩, ১৯১ ৩। গ-স ৪৯৯২, ৩৭ক

ধর্মদাস বণিকের রচন সুসার। . . .
ধর্মদাস বণিকের সরস রচন। . . .
বাণ্যা ধর্মদাস গীত করিল রচন।

কিন্তু তাহাতে 'রচিল ধর্মের দাস' এই প্রকার ভণিতাও আছে—তাহাতে তাঁহার প্রকৃতই এই নাম ছিল কি না, বলা সহজ নহে। শ্যাম পণ্ডিতই ধর্মদাস ভণিতায় পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াও সন্দেহ হইতে পারে।

সীতারাম

সীতারাম দাস ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্যতম কবি।[১] তাঁহার যে সকল প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায়, তাহাদের তারিখ ১০৩৪ মল্লাব্দ (১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ), ১০৫৪ মল্লাব্দ (১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ), ১০৬০ মল্লাব্দ (১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দ)। সীতারামের ধর্মমঙ্গল রচনাকাল ১০০৪ সাল বলিয়া তাঁহার পুঁথিতে উল্লেখ করা আছে।[২] ইহাকে বঙ্গাব্দ ধরিয়া কেহ কেহ ১৫৯৭ খ্রীঃ এই কাব্যের রচনাকাল বলিয়া অনুমান করেন, আবার মল্লাব্দ ধরিয়া ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দ গ্রন্থরচনার কাল বলিয়াও কেহ কেহ মনে করেন। মল্লভূমি অঞ্চলে মল্লাব্দের ব্যবহারও প্রচলিত ছিল, অতএব শেষোক্ত মতও সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে; কিন্তু বঙ্গাব্দ ও শকাব্দের প্রচলনও সে দেশে অজ্ঞাত ছিল না, অতএব এই সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার উপায় নাই।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ইন্দাস গ্রাম সীতারাম দাসের জন্মস্থান। কবি তাঁহার কাব্যমধ্যে তাঁহার স্বগ্রামের ধর্মঠাকুরের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন, 'ইন্দাসের দেহারা বন্দিব সাবধানে'। কোন কোন খণ্ডিত পুঁথিতে কবির এই প্রকার পরিচয় পাওয়া যায়,—তাঁহারা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ জাতিভুক্ত। তাঁহার আদি পুরুষের নাম গোপীনাথ দে; গোপীনাথের তিন পুত্র, মথুরা, মদন ও ধর্মদাস; কনিষ্ঠ ধর্মদাসের চারিপুত্র ছিল. তাঁহার বড় ভাই মদনের এক পুত্রের নাম দেবীদাস, দেবীদাসের পুত্র সীতারামদাস। সীতারামের এক ভ্রাতা ছিল, নাম সভারাম। সীতারামও স্বপ্নাদেশেই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু এই স্বপ্নাদেশের মধ্যে একটু অভিনবত্ব আছে। স্বপ্নাদেশের কর্তা এখানে ধর্মঠাকুর নহেন, বরং 'গজলক্ষ্মী মা'। ইনিই বৌদ্ধ আদ্যা বা চণ্ডী বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছেন। কবি লিখিয়াছেন,—

শিওরে বসিল মোর গজলক্ষ্মী মা।
উঠ বাছা সীতারাম গীত লেখ গা।।

অবশ্য এই স্বপ্নের মধ্যে বিবিধ বিগ্রহের সঙ্গে ধর্মও আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যেমন কবি লিখিয়াছেন—'ধর্ম দেখা দিল জামকুড়ির রনে।' খণ্ডঘোষ নিবাসী অযোধ্যারাম চক্রবর্তী ও

১। গ-স ৪১৯৮, পুঁথিখানি ১১১৫ সালে বা ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত.

২। ঐ, ৩ক

নারায়ণ পণ্ডিত সীতারামের সমসাময়িক লোক। তাঁহারা সীতারামকে কাব্য রচনায় উৎসাহ দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

সীতারাম তাঁহার রচনার শেষে ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্টকে যে ভাবে বন্দনা করিয়াছেন, তাহা হইতে মনে হয়, তাঁহার সময়ও ময়ূরভট্টের স্মৃতি ধর্মমঙ্গল কবিদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ জাগরূক ছিল এবং তাঁহার রচনাকেই ভিত্তি করিয়া তিনি নিজের কাব্য রচনা করিয়াছেন,—

ময়ূরভট্ট মহাশয় যোগে নিরমল।
প্রকাশ করিল যেই ধর্মের মঙ্গল।।
তাহার স্মরণ করি সবে গাই গীত।
সেই অঙ্ক শুনিলে ধর্মেতে থাকে চিত।।
ময়ূরভট্ট মহাশয়ের সুন্দর পাঁচালী।
আনন্দে হইল নষ্ট দুই এক কলি।।
ভুল ভ্রান্তি গীত যদি গেছি এড়াইয়া।
নিদ্রার আলসে যদি না গেছি গাইয়া।।
তুমি না ক্ষেমিলে ক্ষেমিবে কোন জন।
দাসের অশেষ দোষ না লবে নারায়ণ।।

সীতারামের রচনা সরল। ধর্মমঙ্গলের পরবর্তী কবিগণ রচনা-বিষয়ে যেমন আলঙ্কারিক পারিপাট্য দেখাইয়াছেন, সীতারামের রচনায় তাহা দৃষ্ট হয় না। ইহাতে তাঁহার আপেক্ষিক প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হয়। মনে হয়, বঙ্গভাষা তখনও সংস্কৃত অলঙ্কার-সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই। তাঁহার রচনা অনেকটা প্রাচীন পাঁচালীর লক্ষণাক্রান্ত, কাহিনী কিংবা চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়াও কোন বৈশিষ্ট্য তিনি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। তবে সুদীর্ঘ কাহিনীর অনাড়ম্বর বর্ণনা স্বচ্ছন্দ গতিতে সর্বত্রই সহজভাবে অগ্রসর হইয়া যাইতে দেখা যায়।

সীতারামের রচনা কবিত্ব-বর্জিত, পাণ্ডিত্যও তাঁহার রচনায় যে খুব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও নহে—কাহিনী বিষয়ে সর্বতোভাবে তিনি গতানুগতিকতারই অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যের খুব বিশেষ প্রচার হইয়াছিল বলিয়াও মনে হয় না।

সীতারামের সহজ বর্ণনা ও সরল ভাষার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার কামরূপের বর্ণনাটি উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

গড় দেখি সমুখে একাশী হাত খাণ্ডা।
সারি পথ ঘোড়ার বসিতে নাহ্রি দাণ্ডা।।
তারপর বেতগড় ষাটি হাত খানা।
কেয়া বনে দেখি কত পিব্যাসীর থানা।।
গুয়া-গড় গভীর দেখিয়া প্রাণ উড়ে।
সাত হাত দরিয়া পঞ্চাশ হাত আড়ে।।

রাজারাম দাস

২৪ পরগণা জিলার মাগুরা পরগণার শিখরবালি গ্রামের অধিবাসী রাজারাম দাস ১৬২২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন[১]। তাঁহার হরিশ্চন্দ্র পালাটিই মাত্র পাওয়া গিয়াছে এবং কবি ইহাকে জাগরণ পালা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও ধর্মমঙ্গল কাব্যের জাগরণ পালা বলিতে পশ্চিমোদয় পালাকেই বুঝায়, তথাপি রাজারাম দাস ইহাকেই জাগরণ পালা বলিয়া উল্লেখ করিবার জন্য এই কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে হরিশ্চন্দ্র পালা ব্যতীত কবি অন্য কোন পালা রচনা করেন নাই, সেইজন্য ইহাকেই জাগরণ পালা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্রের পালাই ধর্মমঙ্গল কাহিনীর প্রাচীনতম অংশ, ইহা ক্রমে লাউসেন কাহিনীতে আসিয়া প্রবেশ করিয়া অপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে। মনে হয়, রাজারাম ধর্মমঙ্গল কাহিনীর প্রাচীনতর ধারাটি অনুসরণ করিয়াই তাঁহার জাগরণ পালা রচনা করিয়াছেন।

রাজারামের যে একখানি মাত্র পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহা আদি অন্ত ও মধ্য ভাগে সামান্য খণ্ডিত, তথাপি কাহিনীটি অনুসরণ করিবার পক্ষে কোন অসুবিধা হয় না। পুঁথিখানির মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের মঙ্গলকাব্য রচনার বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পাইয়াছে; অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনা তখনও দেখা দিতে পারে নাই।

পুঁথিখানিতে কবি এক দীর্ঘ আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থরচনার কাল সম্পর্কে এই প্রকার উল্লেখ আছে—

পক্ষ পক্ষ রস মহী শক সম্বৎসর।
বাদসাহা অরঙ্গ সাহা দিল্লীর ঈশ্বর।।

ইহা হইতে ১৬২২ শকাব্দ বা ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যাইতেছে।

রাজারাম রচিত হরিশ্চন্দ্র পালাটির একটু অভিনবত্ব আছে। সেইজন্য সংক্ষেপে তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

হরিশ্চন্দ্রের রাজসভায় একদিন এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, তিনি গয়া হইতে আসিতেছেন, কাশী হইয়া বৃন্দাবন যাইবেন, তাহার পথের কোন সম্বল নাই, পঞ্চমাণিক পাইলে তিনি আশীর্বাদ করিয়া বিদায় হইবেন। রাজা 'পঞ্চরত্নমণি' আনিয়া দিলেন।

সন্ন্যাসী রাজপুত্রকে ডাকিতে বলিলেন। রাজা বলিলেন, শত রাণী সত্ত্বেও তিনি নিঃসন্তান। শুনিবামাত্র ভিক্ষা উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। রাজা পায়ে পড়িলেন, সন্ন্যাসী প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, তোমাকে শত পুত্র দিব, কিন্তু এক পুত্র আমাকে দিতে হইবে। রাজা বলিলেন, তুমি পঞ্চাশ পুত্র লইও। শুনিয়া সন্ন্যাসী একটি পদ্মফুল দিয়া

১। অক্ষয়কুমার কয়াল, 'ধর্মমঙ্গলের নূতন কবি', সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ১৩৭৫, পৃ. ৩৮৬-৩৯৩.

বলিলেন, ইহা ভাগ করিয়া তোমার শত রাণীকে খাওয়াইও। বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রাজা অন্তঃপুরে আসিয়া রাণী মদনাকে ডাকিলেন, সন্ন্যাসী যাহা বলিয়াছেন, তাহা পালন করিতে বলিয়া গেলেন। কিন্তু শত রাণীকে পদ্মফুল বাঁটিয়া দিতে গিয়া দেখিলেন, নিজের অংশে কম পড়িয়াছে। দাসী পদ্মফুলের ফলটি দিয়া বলিল,—

> শতদল উন নহে শুন ঠাকুরাণী।
> ফুল ফলে শতদল আমি ভাল জানি॥
> যত্ন করি খাও ইহা না করিও হেলা।
> সঞ্জোগিয়া দিলে তা'তে মর্তমান কলা॥

সকল রাণীরই পুত্র হইল। মদনার পুত্রের নাম হইল লুইচন্দ্র। রাজপুত্রেররা একদিন গণক দিয়া গণনা করাইয়া দেখিল, তাহারা কেহই সিংহাসন লাভ করিবে না, বরং লুইচন্দ্রই রাজা হইবে। শুনিয়া সকলে লুইচন্দ্রের শত্রুতা করিতে লাগিল। একদিন এক গোমুণ্ড আনিয়া রাজার নিকট হাজির করিল, বলিল, লুইচন্দ্র এই গো-হত্যা করিয়াছে। শুনিয়া রাজা লুইচন্দ্রকে নির্বাসনে পাঠাইলেন। মদনা অন্তঃপুরে কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

লুইচন্দ্র বনে গিয়া ধর্মপূজা প্রচার করিতে লাগিলেন। তারপর পল্লব নগরের রাজা হেরম্বের রাজ্যে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচার করিতে গিয়া মহাবিপদে পড়িলেন। রাজা ছিলেন শাক্ত, তিনি লুইচন্দ্রের প্রাণবধ করিবার আদেশ দিলেন। মশানে নীত হইয়া লুইচন্দ্র ধর্মঠাকুরের নাম স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ধর্মঠাকুর সকল কুষ্ঠরোগকে সাজিতে বলিলেন। ধবল, হিঙ্গুলিয়া, হরিতাল, সিন্দুরিয়া, পাঙ্গাসিয়া, ঝিঞ্জিনা, কালাময়ূরা, পাথরিয়া, নারাঙ্গা, পশ্চিমা, খয়রা—এইসকল কুষ্ঠরোগ আসিয়া হাজির হইল, ধর্মঠাকুর স্বয়ং আতুর মূর্তি ধারণ করিয়া সকলকে লইয়া মশানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

আতুরবেশী ধর্মঠাকুর মশানে গিয়া কোটালকে বলিলেন, শিশুকে মার কেন? ইহাকে আমায় ফিরাইয়া দাও। কোটাল তাহাকেও হত্যা করিবার জন্য খড়্গ তুলিল, কিন্তু খড়্গ আর নামাইতে পারিল না, হাত সেখানেই স্থির হইয়া রহিল। কুষ্ঠ সৈন্যেরা চারিদিক হইতে রাজসৈন্যকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিল। এইখানেই পুঁথি খণ্ডিত হইয়াছে। তবে মনে হয়, কাহিনী ইহার পর আর বিশেষ অগসর হয় নাই।

ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনার কেন্দ্রস্থল অর্থাৎ রাঢ়দেশ হইতে দূরবর্তী অঞ্চলে এই পুঁথি রচিত হইবার জন্য ইহাতে হরিশ্চন্দ্র পালার কাহিনীর মধ্যেও নানা বিচিত্র উপকরণ প্রবেশ করিয়াছে, অন্যান্য ধর্মমঙ্গলের সঙ্গে এই বিষয়ে ঐক্য রক্ষা পাইতে পারে নাই। কাহিনীটি রূপকথাধর্মী এবং চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী দ্বারা শেষাংশে বিশেষ প্রভাবিত। সুদীর্ঘ আত্মবিবরণীর তুলনায় কবির রচনা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

ভাগীরথীর পূর্বতীরে কোন পূর্ণাঙ্গ ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয় নাই; যে দুই-একখানি রচিত হইয়াছে, তাহা যেমন অসম্পূর্ণ তেমনই ইহার ঐতিহ্যের ধারা হইতে বিচ্যুত। রাজারামের রচনাও তাহাই।

রামদাস

ইহার পর রামদাস আদকের ধর্মমঙ্গল কাব্যখানি রচিত হয়। তাঁহার কাব্যের প্রকৃত নাম অনাদি-মঙ্গল।[১] কবি রামদাস কৈবর্ত-বংশোদ্ভব। তাঁহার পিতার নাম রঘুনন্দন। হুগলী জেলার হায়ৎপুর গ্রামে কবির আদি নিবাস ছিল, পরে তাঁহারা সেই জেলার অন্তর্গত পাড়াগ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। কবি আত্মপরিচয়চ্ছলে লিখিয়াছেন,—

ভুরসুটে রাজা রায় প্রতাপ নারায়ণ।
দানদাতা কল্পতরু কর্ণের সমান।।
তাঁহার রাজত্বে বাস বহুদিন হ'তে।
পুরুষে পুরুষে চাষ চষি বিধিমতে।।

এই প্রতাপনারায়ণ রায় কবি ভারতচন্দ্র রায়ের পূর্বপুরুষ। ইহাতেই মনে হয়, কবি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন। কবি তাঁহার গ্রন্থোৎপত্তির যে কারণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এখানে সংক্ষেপে উক্ত হইতেছে,—কবির স্বগ্রামে এক অতি অত্যাচারী তহ্‌শীলদার ছিলেন। তাঁহার নাম চৈতন্য সামন্ত। পিতার ঋণের জন্য রামদাস তাঁহার কারাগারে আবদ্ধ হন। কবি দ্বারবানের হাতে-পায়ে ধরিয়া অবশেষে সেখান হইতে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু মাতুলালয়ে পলাইয়া যাইবার পথে এক সিপাহী কর্তৃক ধৃত হইয়া অশেষ অত্যাচারিত হন। তারপর পিপাসার্ত হইয়া জলপানের নিমিত্ত সম্মুখস্থ এক দীঘিতে অবতরণ করিলেন, দীঘি তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া যায়। কবি দারুণ নৈরাশ্যে সেই স্থানেই বসিয়া পড়িলেন। তখনই এক দিব্য পুরুষ স্বর্ণভৃঙ্গারে জল লইয়া তাঁহার সম্মুখস্থ হইলেন। তিনি তাঁহাকে জল পান করাইয়া সুস্থ করিয়া বলিলেন,—

জলপানে রামদাস প্রাণ পেলে তুমি।
ধর্মের সঙ্গীত গাও শুনি কিছু আমি।।

রামদাস এই বিষয়ে নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করাতে সেই দিব্য পুরুষ আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন,

আজি হৈতে রামদাস কবিবর তুমি।
ঝাড়গ্রামে কালুরায় ধর্ম হই আমি।।
আসরে জুটিবে গীত আমার স্মরণে।
সঙ্গীত কবিতা ভাষা ভাসিবে বদনে।।

এই দৈবনির্দেশক্রমে রামদাস তাঁহার কাব্য রচনা করিলেন। ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্য তাঁহার স্বগ্রামে সর্বপ্রথম গীত হয় বলিয়া প্রকাশ।

অনাদি-মঙ্গলের ভাব ও ভাষার মধ্যে পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর নাই। ইহা সীতারামের কাব্য

১। রামদাস আদক, অনাদি-মঙ্গল, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৪৫)

হইতেও অনেকাংশে সরল। তবে ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, সীতারামে তাহার অভাব আছে।

প্রভুরাম

দ্বিজ প্রভুরাম নামক একজন কবির ভণিতা-যুক্ত একখানি ধর্মমঙ্গলের পুঁথি পাওয়া যায়।[১] পুঁথিখানি ১০৭৩ সালে (বা ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে) অনুলিখিত হইয়াছিল। ইহার কোন কোন অংশ ১১১৭ সাল বা ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত। কবি কাব্যমধ্যে এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন,—

মল্লভূমে বাটি ফুল্যার মুখটি
শ্রীযুত জানকীরাম।
তস্য সুত গায় সখা ক্ষুদিরায়
নায়কে পুরহ কাম।।[২]

মনে হয় প্রভুরাম ক্ষুদিরাম নামক ধর্মঠাকুরের সেবক ছিলেন। তিনি ভণিতায় ক্ষুদিরামের নাম বার বার ভক্তির সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থ-সমাপ্তিতেও তাঁহার এই প্রকার উল্লেখ পাওয়া যায়,—

সঙ্গীত সমাপ্ত দ্বিজ প্রভুরাম বলে।
অন্তকালে ক্ষুদিরাম রাখ পদতলে।।
এই বর মাগি মুই দৃঢ় করি মন।
বাসনা করহ পূর্ণ প্রভু নিরঞ্জন।।

প্রভুরামের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার পুঁথি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই।

ঘনরাম চক্রবর্তী

১৬৩৩ শকাব্দ বা ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে ঘনরাম চক্রবর্তীর সুপ্রসিদ্ধ ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা সম্পূর্ণ হয়।[৩] তিনি তাঁহার সুবৃহৎ গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতে এইভাবে ইহার রচনা-কাল নির্দেশ করিয়াছেন,—

সঙ্গীত আরম্ভ কাল নাহিক স্মরণ।
শুন সবে যে কালে হইল সমাপন।।
শক লিখে রামগুণ রস সুধাকর।
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর।।

১। গ-স ৫৪৪১
২। ঐ ৩ক
৩। ঘনরাম চক্রবর্তী (পূর্বে দ্রষ্টব্য)।

সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি।
যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুঁথি।।

ইহাতে দেখা যায়, ১৬৩৩ শক অথবা ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের শুক্রবার শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে তাঁহার পুস্তক রচনা সম্পূর্ণ হয়। স্বর্গত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় প্রাচীন পঞ্জিকার সাহায্যে এই শক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লিখিয়াছেন, "মাগশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাসের আদ্য অংশে হংস সূর্য ছিলেন (১লা কি ২রা), শুক্রবার, সুলক্ষণ শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথি। পাঁজি গণিয়া দেখিতেছি, ১৬৩৩ শকে ১লা অগ্রহায়ণ শুক্রবার শুক্লা তৃতীয়া। ১লা হওয়াতে আদ্য অংশেও বটে। 'যাম সংখ্য দিনে'—যাম অর্থে প্রহর। এক প্রহর বেলায় সময় সঙ্গীত সাঙ্গ হয়।"[১] কিন্তু ইহার অর্থটি পরিষ্কার হইল না। সংখ্যা[২] 'যাম সংখ্য দিনে' অর্থাৎ যাম অর্থে যদি প্রহর ধরি, তাহা হইলে ৮ (অষ্ট প্রহর) হয়, অর্থাৎ ৮ই তারিখে এই গ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু ৮ই তারিখে অন্যান্য তিথিনক্ষত্র পাওয়া যায় না, অতএব 'দিন' শব্দটিকে যদি 'দণ্ড' ধরি, তাহা হইলে বেলা ৮ দণ্ডের সময় পুঁথি সম্পূর্ণ হয়, এরূপ বলা যাইতে পারে। ইহাতে শেষ পদটির অর্থও সুসঙ্গত হয়। সম্ভবত লিপিকর প্রমাদে দণ্ডে 'দিনে' হইয়া থাকিবে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ঐশ্বর্য-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি যেমন ভারতচন্দ্র, ঘনরামও তেমনই ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঐশ্বর্য-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। পূর্বেই দেখাইয়াছি, ভারতচন্দ্রও অনেকাংশে তাঁহার নিকট ঋণী।

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কইয়ড় পরগণার কৃষ্ণপুর গ্রামে কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর জন্ম হয়। তিনি এইভাবে নিজের বংশ-পরিচয় দিয়াছেন,—

ঠাকুর পরমানন্দ কৌশল্যার বংশে।
ধনঞ্জয় পুত্র তার সংসারে প্রশংসে।।
তত্তনুজ শঙ্কর অনুজ গৌরীকান্ত।
তার সুত ঘনরাম গুরু পদাক্রান্ত।।

মাতার পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, 'মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা'। কবির মাতামহের কুল রাজবংশসম্ভূত। তিনি লিখিয়াছেন,—

কৌকুসাবি অবতংসে কুশধ্বজ রাজবংশে
দ্বিজ গঙ্গাহরি পুণ্যবান,
তাঁহার দুহিতা সীতা, সত্যব্রতী পতিব্রতা
তাঁর সুত ঘনরাম গান।

১। প্রবাসী, ভাদ্র (১৩৩৬), ৬৪১

২। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই হিসাব মত '৮ই তারিখে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়' বলিয়া লিখিয়াছেন (শ্রীধর্মপুরাণ, ভূমিকা পৃঃ।৶০)। কিন্তু ৮ই তারিখে শুক্লা তৃতীয়া তিথি হয় না।

ঘনরামের চারি পুত্র, —রামপ্রিয়, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণ। কবি তাহাদের জন্যও তাঁহার কাব্যমধ্যে দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন। কবির অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র বর্তমানে জীবিত আছেন। ঘনরাম তাঁহার কাব্যে বর্ধমানাধিপতি কীর্তিচন্দ্রেরও কল্যাণ-কামনা করিয়াছেন,

অখিলে বিখ্যাত কীর্তি মহারাজ চক্রবর্তী
কীর্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রস গান।।

সম্ভবত কীর্তিচন্দ্র কবির পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিপালক ছিলেন। কিন্তু কীর্তিচন্দ্রের সহিত তাঁহার মুখ্য কি সম্পর্ক ছিল, তাহা তাঁহার কাব্যপাঠে জানা যায় না। তিনি কীর্তিচন্দ্রের আদেশে এই কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এমন কথা কোন স্থানেও উল্লেখ করেন নাই; কিংবা তিনি কীর্তিচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন, এমন উক্তিও কোথাও নাই। তবে সম্ভবত কীর্তিচন্দ্রের রাজ্যের প্রজা বলিয়া এবং নিজেও ব্যক্তিগতভাবে কোন কারণে তাঁহার নিকট হইতে উপকৃত হইয়া কৃতজ্ঞতাভরে এই রাজার নাম তাঁহার কাব্যমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এতদতিরিক্ত তাঁহার সহিত কীর্তিচন্দ্রের আর কোন সম্পর্ক ছিল না। এই কথা বিশদভাবে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, অনেকেই ঘনরামকে কীর্তিচন্দ্রের সভাকবি ও তাঁহারই আদেশে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত ঘনবামের এই সৌভাগ্য হয় নাই।

ঘনরাম তাঁহার কাব্য-রচনার মূলে একজনের কথা শ্রদ্ধার সহিত বার বার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার গুরু,—

গুরুপদে হয়ে যত্ন ঘনরাম কবিরত্ন
বিরচিল শ্রীধর্মমঙ্গল।

এই গুরু তাঁহার টোলের অধ্যাপক। গ্রন্থোৎপত্তির মূলে কবি কৃতজ্ঞতাভরে এই গুরুর ঋণ স্মরণ করিয়াছেন। ধর্মের বন্দনায় তিনি লিখিয়াছেন,

ভাবি তব পদদ্বন্দ্ব দুই এক ভাষা ছন্দ
কবিতা করিতাম পূর্বফলে।
শুনে হয়ে কৃপান্বিত বর্ণিতে বলিয়া গীত
গুরু ব্রহ্মা বদন-কমলে।।

ঘনরামের কাব্য-রচনায় দেবতার স্বপ্নাদেশের কোন উল্লেখ নাই। এখানে গুরুর আদেশই দেবতার স্বপ্নাদেশের কার্য করিয়াছে। এই গুরুই তাঁহাকে কবিরত্ন উপাধিতে ভূষিত করেন,— তিনি লিখিয়াছেন, 'নিজ গুণে করি যত্ন,. নাম দিলা কবিরত্ন, কৃপাময় করুণা-আধান'। কবিরত্ন তাঁহার রাজদত্ত উপাধি নহে। ঘনরাম শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন, তিনি প্রায় সর্বত্রই

লিখিয়াছেন, 'প্রভু যার কৌশল্যা-নন্দন কৃপাবান্।' সেইজন্য তাঁহার লাউসেনের চরিত্র অঙ্কনেও শ্রীরামচন্দ্রের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। এই সম্বন্ধে পরে আরও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। ঘনরাম বাল্যকাল হইতেই কবিতা রচনা করিতেন, তদুপরি তাঁহার পরবর্তী জীবনে সঞ্চিত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান তাঁহার স্বভাব-কবিত্বের উপর পাণ্ডিত্যের প্রভা বিকীর্ণ করিয়াছে। লাউসেনের বিদ্যাভ্যাস বর্ণনা সম্পর্কে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা একমাত্র তাঁহার নিজের উপরই প্রযোজ্য,—

বেদবাণী বিজ্ঞ হ'ন পড়িয়া পাণিন।
কাব্য অলঙ্কার কোষ আগম নিগম।
ভক্তিযোগ সার যার ঘুচে মনোভ্রম।।

স্বভাব-কবিত্বের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের সংযোগই ঘনরামের কাব্যকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। পাণ্ডিত্যের প্রভাব ঘনরামের সহজ কবিত্বকে কোন স্থানে প্রতিহত করিতে পারে নাই, এই বিষয়ে একমাত্র তাঁহার পরবর্তী কবি ভারতচন্দ্রের সহিতই তাঁহার তুলনা হইতে পারে। তাঁহার কাব্যে ভারতচন্দ্রের ভাষা ও ভাবের পূর্বসূচনা দেখিতে পাই। ঘনরামের ভাষা অত্যন্ত মার্জিত এবং উন্নত রুচির পরিচায়ক। যথাযথ অনুপ্রাস-প্রয়োগ তাঁহার রচনাকে অনেক সময় শ্রুতিমধুর করিয়াছে। তাঁহার কাব্যের যে কোন স্থান হইতে দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে,—

করপুটে এ' সঙ্কটে কাতরে কিঙ্কর রটে
উর ঘটে পুর অভিলাষ।
নিশি-নাশে নয়নে ছাড়িল নিদ্রা-মায়া।
জগতে জাগাবে যশ যদি জিন যেয়ে।।
গদ গদ গরুড় গোবিন্দ গুণ গায়।
গুড়ি গুড়ি গরুড় গমনে গুড়ি যায়।।
ঘোরে রবে ঘুঘু যেন ঘন ঘন ডাকে।
চঞ্চল চড়ুই চিল লিখে চক্রবাকে।।
চকোর চকোরী নাচে চাহিয়া চপলা।
মনে হৈল নিকটে আইল মেঘমালা।।

অবশ্য এই সকল স্থলেও অনেক সময় তিনি অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া মধ্যে মধ্যে রচনার অর্থপরিগ্রহ দুর্ঘট করিয়া তুলিয়াছেন; উত্তর দিক বুঝাইতে কোথাও লিখিতেছেন, 'বিরাট-তনয়-মুখ'; প্রাতঃকাল অর্থে উষা শব্দ বুঝাইতে লিখিয়াছেন, 'গোবিন্দ-তনয়-সুত-জায়া', দশ বাণ সোনা বুঝাইতে লিখিয়াছেন, 'ইন্দু বিন্দু বাণ হেম' ইত্যাদি। প্রবচনের মত সংক্ষিপ্ত কথায় গভীর ভাব প্রকাশ করিতে ভারতচন্দ্র যে রচনার দক্ষতা দেখাইয়াছেন, ঘনরামেই তাহার সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য ঘনরামের রচনার আপেক্ষিক অপ্রচলনের

জন্য তাহা লোকমুখেও বিশেষ প্রচার লাভ করিতে পারে নাই; তথাপি ঘনরামই এই ধরনের রচনার পথপ্রদর্শক। তাহার কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, ইহা হইতে কবির গভীর সামাজিক অভিজ্ঞতারও পরিচয় পাওয়া যাইবে,—

রোগ ঋণ-রিপু-শেষ দুঃখ দেয় র'য়ে।
হাতে শঙ্খ দেখিতে দর্পণ নাই খুঁজি।।
না করে মিথ্যাকে ভয় বিশেষে ঘটক।
বিবাহ বিষয়ে মিথ্যা দোষ নাহি তায়।।
কলিকালে নারীর কুটুম্বে বড় ভাব।
সুব্যঞ্জন ঝোল ঝালে, কুটুম্বিতা হালাহোলে,
পরকালে কেহ কার নয়।।

লখাইর সপত্নী সনকার মুখ দিয়া মাত্র একটি কথায় কবি বাঙ্গালী সংসারের যে একটি চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। শত্রু আসিয়া নগর আক্রমণ করিলে লখাই তাহার সপত্নীর নিকট রক্ষার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু এই সপত্নী ছিল কাল্ ' উপেক্ষিতা; সে এই সুযোগে শুনাইয়া দিল,—

মোর গায়ে উড়ে খড়ি তোর গায়ে চুয়া।
দাসীতে যোগায় পান গালে গোটা গুয়া।।

অতএব এই বিপদের সময় এখন তাহার সাহায্য প্রার্থনা নিষ্ফল। কথাগুলিতে কবির বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। কতকগুলি নূতন মাত্রাবৃত্ত ছন্দসৃষ্টিতেও ঘনরাম কয়েক স্থানে কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাই পরবর্তী কালে গিয়া ভারতচন্দ্রে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। মৌলিকতাহীন ও গতানুগতিক কাহিনীর মধ্যেও ঘনরাম কয়েকটি চরিত্রসৃষ্টিতে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন; ইহাদের মধ্যে কর্পূরের চরিত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ভীরু বাঙ্গালীর চরিত্রটি একঘেয়ে বীররসাত্মক ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে একটি বিপরীতধর্মী সৃষ্টি। ইহার পরিকল্পনায় কাব্যের আখ্যানভাগের মধ্যে অনেক স্থানেই একটু বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে। বীর লাউসেনের পার্শ্বে এই ভীরু বাঙ্গালীর চরিত্রটি অঙ্কিত করিয়া ধর্মমঙ্গলের কবিগণ দুইটি চরিত্রকেই পরস্পরের সান্নিধ্যে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। পূর্বপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ঘনরামের এই কর্পূর চরিত্রটি একটি অতি সুন্দর বাস্তব চরিত্ররূপে অঙ্কিত হইয়াছে। বীরত্বের আদর্শ বাঙ্গালী কবির পরিকল্পনায় যে কত নিষ্ফল, তাহা কর্পূর চরিত্রের সার্থকতা হইতেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। লাউসেন ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদর্শ সৃষ্টি, কিন্তু কর্পূরই একমাত্র বাস্তব সৃষ্টি। ঘনরামের সামাজিক চরিত্রসৃষ্টির প্রয়াস কর্পূরের চরিত্রসৃষ্টিতে সুসঙ্গত সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়াছে।

ঘনরামের কাব্যে তাঁহার পূর্ববর্তী কয়েকজন কবির সামান্য প্রভাব বর্তমান থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত তাহা স্পষ্ট নহে, কিংবা তাহা একেবারে তাঁহার কাব্যের মূলেও

নিহিত নহে। দেবতাদিগের ছলে আত্মপরিচয় প্রদান করা বিজয়গুপ্তের পরবর্তীকাল হইতে মঙ্গলকাব্যের একটি বিশেষ লক্ষণ হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়া কবিগণ পাণ্ডিত্যের কৌশল দেখাইতেন। কালকেতু ভবনে চণ্ডীর আত্মপরিচয় দানের মত ঘনরামেরও অনেক স্থলে দেবতাদের আত্মপরিচয় দানের কথা আছে, তাহাতে সাধারণত মুকুন্দরামেরই পথ অনুসরণ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঘনরামের নিম্নোদ্ধৃত পদগুলি মুকুন্দরাম হইতে গৃহীত হইয়াছে,—

গজ পৃষ্ঠে সাজি' চলে ভূপতির মামা।
আন্ধারের মণি তুমি অন্ধকের নড়ি।।
হরি-হর-হিরণ্য গর্ভের তুমি মূল।
ননদী সতিনী নাই বচনের জ্বালা।।

ঘনরামের নিম্নোদ্ধৃত পদগুলি কাশীরাম দাসের মহাভারতের অনুবাদ হইতেই গৃহীত বলিয়া মনে হয়,—

মিছা বাণী সাঁচা পানী কতক্ষণ রয়।
কতক্ষণ জলের তিলক রয় ভালে।
কতক্ষণ রয় শিলা শূন্যেতে ফেলিলে।।

এতদ্ব্যতীত ঘনরাম অসংখ্য সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক সুন্দর ও সহজ বাংলায় অনুবাদ করিয়া তাঁহার কাব্যের স্থানে স্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি,—

মৃত দেহ দাহ করে চিতার অনলে।
সজীব শরীর সদা দহে চিন্তানলে।।

('চিতাচিন্তাদ্বয়োর্মধ্যে' ...)

রাজা বলে দূর নহে যেবা যার বন্ধু।
দুই লক্ষ যোজন অন্তর দেখ ইন্দু।।
কেমন কুমুদ ফুটে চন্দ্র দরশনে।
সরোরুহ বিকশিত সূর্যের কিরণে।।

('গিরৌকলাপী' ...)

তেজীয়ান্ যা করে করিতে পারে তাই।

('তেজীয়াষাং ন দোবায়' ...)

সুবৃক্ষ চন্দন গন্ধে সুশোভিত বন।
সুপুত্র হইলে গোত্রে প্রকাশে তেমন।।

('একেনাপি সুবৃক্ষেণ' ....)

কুপুত্র হইলে কুলে কুলাঙ্গার কহে।
কুবৃক্ষ কোটরে অগ্নি উঠে বন দহে।।

('একেনাপি কুবৃক্ষেণ' ...)

বহু বাংলা প্রবচনকে ঘনরাম নিজের কাব্যমধ্যে যেমন স্থান দিয়াছেন, তেমনই তাঁহার নিজের রচিত বহু পদও বাংলা প্রবচনে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই বিষয়ে তিনি ভারতচন্দ্রেরই অগ্রদূত।

অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনীতে তাঁহার কাব্য পরিপূর্ণ। গৌড়পতির পুরাণপাঠ-শ্রবণ-প্রসঙ্গে কত পৌরাণিক কাহিনী যে তিনি আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, তাহার অন্ত নাই। তবে এই কাহিনীগুলির বর্ণনাতেও কবি বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন, যথেচ্ছভাবে তাহা বর্ণনা করিয়া যান নাই। ধর্ম্মমঙ্গল কাহিনীর মধ্যে মধ্যে পুরাণের অনুরূপ এক-একটি ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া তিনি এক-একটি সুদীর্ঘ পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। একদিকে মঙ্গলকাব্যের বিধিনিয়মের গণ্ডী, অন্যদিকে সংস্কৃত পৌরাণিক আদর্শ, এই উভয়ের মধ্যবর্তী হইয়া ঘনরামের বিপুলায়তন কাব্য আর নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পায় নাই।

ঘনরামের কাব্যে কেহ কেহ করুণরসের অভাব বোধ করিয়াছেন। অবশ্য প্রাচীন বাংলা কাব্যে করুণরস বলিতে যাহা বুঝায়, অর্থাৎ লাচারী ছন্দে দীর্ঘ বিলাপোক্তি, তাহা ঘনরামের কাব্যে একেবারেই নাই। বিলাপ করিবার চরিত্রগুলি অর্থাৎ স্ত্রী-চরিত্রগুলি ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যে পুরুষের অপেক্ষাও বীর, সম্মুখযুদ্ধে সর্বত্রই তাহারা সশস্ত্র অগ্রসর হইয়া যায়; অতএব ইহাদিগকে লইয়া ধর্ম্মমঙ্গলের গতানুগতিক করুণরস সৃষ্টির অবকাশ নাই। কিন্তু সেইজন্য স্বাভাবিক মানবীয় প্রবৃত্তিগুলি বিমূঢ় করিয়া কোন ধর্ম্মমঙ্গলের কবিই কাব্য লিখিতে বসেন নাই; অতএব সহজ করুণরসও তাহাতে প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা কর্তব্যের শাসনে অত্যন্ত সংযত। ইহা দ্বারা প্রাচীন বাংলা কাব্যের একটি নূতন দিক উদঘাটিত হইয়াছে। ইহা কোন কবির বিশেষ কোন রস বর্ণনার ক্ষমতার অভাবজাত নহে, ইহা এই জাতীয় কাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য হইতেই জাত। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি,—যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আহত হইয়া লাউসেনের পত্নী কলিঙ্গা প্রাসাদ-দ্বারে ফিরিয়াই প্রাণত্যাগ করিল। সপত্নীর শোকে কানড়া কাঁদিয়া আকুল হইল। যোদ্ধবেশিনী কলিঙ্গার মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া কানড়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু সেই কান্না এক মুহূর্তের জন্য মাত্র, হয়ত অশ্রুও তাহাতে নির্গত হয় নাই, দুর্মুখা দাসী আসিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিল,—

এ'লাল কবরী কেশ ধূলায় লুটায়।
মু'খানি মুছায়ে দাসী দুর্মুখা পেতায়।।
কেঁদ না সুন্দরী শুন উঠ বুক বেঁধে।
মরিলে কে কোথাকারে প্রাণ পেল কেঁদে।।
শোকের সময় নয় শত্রু আসে পুরে।
সংহার সংগ্রামে সাজি শোক ত্যজ দূরে।।

যে যুদ্ধে পুত্র নিহত হইয়াছে, সেই যুদ্ধে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া জননী পুত্রশোক

ভুলিতেছে, ভ্রাতা মৃত ভ্রাতার পরিত্যক্ত যুদ্ধাশ্ব গ্রহণ করিয়া সেই যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ভ্রাতৃশোক ভুলিতেছে; অতএব এই কর্মতৎপরতার মধ্যে ধর্মমঙ্গলের কবিগণ কোন চরিত্রের জন্যই অলস বিলাপের দীর্ঘ অবকাশ রচনা করিতে পারেন নাই। তথাপি কোন চরিত্রকেই যে তাঁহারা হৃদয়হীন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা নহে। মাতার মুখ হইতে ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া মাতার আদেশেই যুদ্ধসজ্জা করিতে করিতে শুকা বলিতেছে,—

শুকা বলে শুন মা সমরে সেজে যাব।
শত্রু ত সংহারি রণে ভাই কোথা পাব।।
যে শোকে ব্যাকুল রাম অখিলের নাথ।
হেন শেল বুকেতে বাজিল বজ্রাঘাত।।
এত বলি কাঁদে শুকা লখে দেয় বোধ।
শোক তেজে সমরে ভেয়ের ধার শোধ।।

প্রাচীন বঙ্গের জাতীয় চরিত্রের ইহাতে আর একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব ইহার মধ্যে কোন বস্তুর যে অভাব আছে, তাহা বলা যায় না।

রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চামট গ্রাম নিবাসী রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মল্লভূমের রাজা গোপাল সিংহের সময় ১০৩৮ মল্লাব্দে বা ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।[১]

মল্লভূমে নিবসি মল্লের লিখি শক।
হাজার আটত্রিশ সালে হইল পুস্তক।।

তাঁহার কয়েকটি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কাব্যমধ্যে তিনি মল্লভূমের তদানীন্তন রাজা গোপাল সিংহের নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন,—

দুর্জন সিংহ সুত গোপাল সিংহ খ্যাত
বৈষ্ণব প্রহ্লাদ সমান।
তস্য দেশে বাস ধর্মের ইতিহাস
দ্বিজ রামচন্দ্রের গান।।

রামচন্দ্রের রচনা বৈশিষ্ট্য-বর্জিত—অত্যন্ত সাধারণভাবে তিনি কাহিনী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন মাত্র, তাঁহার রচনা অনেকটা প্রাচীন পাঁচালীর লক্ষণাক্রান্ত। তবে ধর্মমঙ্গল কাব্যের দীর্ঘ কাহিনী ইহাতে কোথাও ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে নাই বলিয়া তাহা শেষ পর্যন্ত সহজভাবে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কাহিনী-পিপাসু পাঠকের মন পড়িতে পড়িতে কোথাও পীড়িত হইয়া পড়ে না।

রামচন্দ্রের মধ্যে প্রকৃত কবিত্বের অভাব থাকিলেও পাণ্ডিত্যের অভাব ছিল না। ইছাইর বিরুদ্ধে গৌড়েশ্বরের যুদ্ধাভিযানের বর্ণনাটি এইরূপ,—

১। ব-সা-প ১, ৪১১-৪২০

নানা বাদ্য বাজে সাজে নৃপসেনাগণ।
তোলপাড় করে রাজ্য গৌড্ড ভুবন।
রায়বেলি গন্ধবেলি জম্বুরা ক্রলান।
ক্ষমরি মোহরি কাড়া ফুকরে কাহান।
দগড় দগড়ী বেণু রুদ্ধ বীণা বাঁশী।
কাংস্য করতাল ঘণ্টা ঘোর শব্দ কাঁসি।
সিন্ধু আনবরোল ভেরী রণভেরী কালী।
জয় ঢাক বীর ঢাক কর্ণে লাগে তালি।

এই পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরের সহিত যদি একটু প্রকৃত কবিত্বের সংযোগ ঘটিত তাহা হইলে রামচন্দ্রের কাব্যরচনা সার্থক হইত।

সহদেব চক্রবর্তী

১১৪১ সাল (১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ) ৪ঠা চৈত্র তারিখে সহদেব চক্রবর্তী কালুরায় ধর্মের স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন।[১] এই বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন,—

দ্বিজ সহদেব গান পূর্ব তপফলে।
যাহারে করিলে দয়া একচল্লিশ সালে।।
চৈত্রের চতুর্থ দিন পূর্ণিমার তিথি।
হেন দিনে যারে দয়া কৈলে যুগপতি।।

পাঁজির গণনায় দেখা গিয়াছে, ১১৪১ সালে ১৬৫৬ শকাব্দের ৪ঠা চৈত্র পূর্ণিমা তিথি ছিল না, কৃষ্ণা চতুর্থী তিথি ছিল। ইহার এক শত বৎসর পূর্বে কিংবা পরেও এই তারিখে পূর্ণিমা ছিল না, অতএব পূর্ণিমার তিথি বলিতে পূর্ণিমার পর চতুর্থীর তিথিই হয়ত কবি মনে করিয়া থাকিবেন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।[২]

হুগলী জেলায় বালিগড় পরগণার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে কবি সহদেব চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার এই কাব্য রচনায় কালুরায় ধর্মের কথা বার বার শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। কোথাও লিখিয়াছেন, 'দয়া কৈলে কালুরায় স্বপনে শিখালে যারে গীত', আবার কোথাও লিখিয়াছেন, 'দ্বিজ সহদেব ভণে, বিল্বমূলে যেই জনে দয়াবান্ হৈলে কালুরায়'। লাউসেনের কাহিনী ইহাতে নাই। ধর্মসাহিত্যের প্রাচীনতর কাহিনী অর্থাৎ হরিশ্চন্দ্র রাজা ও তৎপুত্র লুইচন্দ্রের বৃত্তান্ত ইহাতে সংক্ষিপ্ত ভাবে পাওয়া গেলেও, লৌকিক শিবের

১। ব-সা-প ১, ৪৮২-৪৮৫

২। যোগেশচন্দ্র রায়, 'ধর্মের গান কত কালের', প্রবাসী, ১৩৩৪, ভাদ্র, ৬৪১

প্রাচীনতর কাহিনী, পৌরাণিক শৈব কাহিনী, মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রমুখ সিদ্ধাচার্যগণের জীবনী, তদুপরি পৌরাণিক দেবদেবীর কাহিনীও ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে। পৌণ্ড্রবর্ধন হইতে পালরাজত্বের সময় বৌদ্ধ প্রভাব যখন এই দেশে বিস্তৃত হয়, তখন তাহার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যোগতান্ত্রিক নাথদিগের ধর্মের কথাও এই দেশে প্রচার লাভ করিয়াছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যের জামতি পালা ও গোলাহাট পালা যে নাথসাহিত্য হইতে গিয়া ধর্মসাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এই বিষয়ে পরে আলোচনা করিয়াছি। সহদেবের কাব্যেও নাথসাহিত্যেরই প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, এতদ্ব্যতীত নাথসাহিত্যের সহিত ধর্মসাহিত্যের আভ্যন্তরিক আর কোন সম্পর্ক নাই।

কতকগুলি স্বতন্ত্র বিষয়বস্তুর একত্র সমাবেশের জন্য সহদেবের কাব্য কোন দিক দিয়াই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। ইহাকে সমগ্র ভাবে বিচার করিবারও উপায় নাই। ইহাতে চরিত্রসৃষ্টির কোন প্রয়াস নাই, কাহিনীর ঘটনা-সন্নিবেশেও কোন কৃতিত্ব নাই; ইহাতে কতকগুলি অসংলগ্ন উপকরণ আনিয়া একত্র সংকলনের চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। অতএব কাব্য হিসাবে ইহা নগণ্য।

তবে সহদেবের রচনার যে একটা বিশেষত্ব ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার ভাষা সুমার্জিত না হইলেও স্থানে স্থানে সরল ও মর্মস্পর্শী। বৈষ্ণব কবিতার ভাষার প্রভাব তাঁহার রচনায় অনুভব করা যায় এবং তাহাই তাঁহার ভাষাকে সরসতা দান করিয়াছে। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভাষা গ্রাম্যতা-দোষ-দুষ্ট; পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তাঁহার স্বভাব-কবিত্ব সকল সময় সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই। অনেক সময় তিনি গ্রাম্য উপমা প্রয়োগ করিয়া কোন কোন উন্নত কবিত্বপূর্ণ চিত্র ম্লান করিয়া দিয়াছেন। এই একটি ত্রুটি অন্তত সংস্কৃত পুরাণ প্রভাবিত সেই যুগে একটু বিশেষ ত্রুটি বলিয়াই মনে করিতে হয়।

নিম্নোদ্ধৃত রচনাটি হইতে সহদেবের কবিত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করা যাইবে,—

মিছা মায়া মধুরসে বন্দী হয়্যা মায়াপাশে
হবিপদে না রহে ভকতি।
তসরের পোকা যেন লুতায় বসিয়া হেন
নিজ সুখে মজে লঘু গতি।।
যোগীর পরম ধন গোবিন্দের পদে মন
শুনেছি সনক সনাতন।
না শুনি ব্রহ্মার কথা সবে হ'লো ঊর্ধ্বরেতা
সাক্ষাৎ পাইল নারায়ণ।।

মস্তকেতে জটা ধরি গাছের বাকল পরি
বিভূতি ভূষণ ধরি গায়।
কি করিব রাজ্যধন পরম সুন্দরীগণ
উহা কি আমারে শোভা পায়।।

দ্বিজ সহদেবের ভণিতায় 'তারকেশ্বর বন্দনা'র একটি ক্ষুদ্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে,[১] ইহা ১২৪৪ সাল অর্থাৎ ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত। এই সহদেব উক্ত ধর্মমঙ্গল কাব্যের সহদেব হওয়াই সম্ভব।

নরসিংহ বসু

১৬৫৯ শকাব্দ বা ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল রচনা আরম্ভ হয়।[২] নরসিংহের পিতামহ মথুরা বসু বর্ধমানাধিপতি কীর্তিচন্দ্রের সময় বর্ধমানের অন্তঃপাতী শাঁখারীতে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। মথুরা বসুর তিন পুত্র, তাঁহাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তাঁহার নাম ঘনশ্যাম। নরসিংহ ঘনশ্যামের পুত্র।

নরসিংহ নিজের বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে বীরভূমের তদানীন্তন নবাব আসাদুল্লাহ খাঁয়ের ওকালতি পদ লাভ করেন। বহুকাল তিনি এই কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। একদা তিনি নবাব আসাদুল্লাহ খাঁয়ের মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে দেয় এক লক্ষ টাকা খাজনা লইয়া শিবিকারোহণে মুর্শিদাবাদ যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে সহসা ঝড়বৃষ্টিতে আক্রান্ত হইয়া আউস গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় তাঁহার এক আত্মীয়-বাড়িতে তিনি অত্যন্ত আদর সম্ভ্রম লাভ করিলেন। তাহার অনতিদূরেই এক স্থানে ধর্মপূজার অনুষ্ঠান হইতেছিল, তিনি তাহা অবগত হইয়া তথায় তাহা দেখিবার নিমিত্ত গমন করেন। এক সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, সন্ন্যাসী তাঁহাকে ধর্মের সঙ্গীত রচনা করিতে আদেশ করিলেন। নরসিংহ মুর্শিদাবাদ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সন্ন্যাসীর আদেশ-বৃত্তান্ত তাঁহার পরিজনের নিকট প্রকাশ করিলেন, তাঁহারাই তাঁহাকে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় উৎসাহ প্রদান করেন।

কবি নরসিংহ বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ব্যতীতও পারসী, হিন্দী, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁহার কাব্যের মধ্যে এই সকল পাণ্ডিত্যের অযথা প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার কাব্যখানি আকারে সুবৃহৎ। কিন্তু ইহার কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতি কোথাও পাণ্ডিত্যে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে

১। গ-স ৫৩৬৪; ২। ব-সা-প ১, ৪৫৬-৮১; ক ৩২২৪

নাই। যে কোন স্থান হইতেই তাঁহার সামান্য একটু রচনা গ্রহণ করিয়া দেখাইলেই ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। কর্ণসেন লাউসেনকে পশ্চিমোদয় করিয়া গৌড়রাজ্যের সমস্ত পাপ দূর করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন,

এত শুনি মহারাজ সেন পানে চান।
হাত ধর্‌্যা বচন বলেন বিদ্যমান।।
অনেক কর‌্যাছ কার্য প্রাণধন বাপ।
এ'বার ঘুচাইয়া লহ মোর এই পাপ।।
অস্তাচলে যাইয়া দেহ পশ্চিমে উদয়।
তোমা বিনে এ' কার্য অন্যের সাধ্য নয়।।

নরসিংহের ভাষা মার্জিত, কোথাও গ্রাম্যতা দোষ-দুষ্ট নহে।

হৃদয়রাম সাউ

হৃদয়রাম সাউ ১১৫৬ সাল বা ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা সম্পূর্ণ করেন।[১] 'হৃদয়রামের পূর্ব নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার খুরুল গ্রামে, খুরুল বনপাশ স্টেশনের নিকটবর্তী। সেখানে মাতামহের বাড়িতে চাঁদরায় নামক ধর্মঠাকুরের সেবার অংশ লইয়া মামাদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া তিনি গ্রামত্যাগ করেন। মাতৃপিতৃহীন বালক মাতুলালয়ে পালিত হইয়াছিলেন, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বড় মামা কিছু সম্পত্তি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু চাঁদরায়ের সেবার অংশ দিতে চাহেন নাই, হৃদয় মনের দুঃখে গ্রামপ্রান্তে তুলসীপুকুরে আত্মহত্যা করিতে গেলে ধর্মঠাকুর দেখা দিয়া অজয় নদের সিদিয়াদহ হইতে তাঁহার মূর্তি উদ্ধার করিতে আদেশ দেন। হৃদয়রাম সিদিয়াদহ হইতে ঠাকুরের মূর্তি সংগ্রহ করিয়া উচকরণে চলিয়া আসেন। উচকরণ নানুরের দক্ষিণে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম, সে গ্রামে হৃদয়রামের বংশধরগণ আজিও বাস করিতেছেন। উচকরণে আসিয়া তিনি ধর্মের গীত রচনার জন্য স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন এবং ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। কবির পিতামহের নাম গোবিন্দ, মাতার নাম মুকতা, পিতার নাম কমল, তিনি জাতিতে শুঁড়ি'।[২]

হৃদয়রামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। ভাষা সংস্কৃতবহুল ও বৈশিষ্ট্যবর্জিত।

পশ্চিম-উদয় পালা ধর্মমঙ্গল কাব্যের একটি বিশিষ্ট পালা।[৩] ধর্মভক্ত লাউসেনের ঐকান্তিক কৃচ্ছ্র সাধনা এবং ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য-প্রচারে ইহা বিশেষভাবে স্মরণীয়। কবি হৃদয়রাম সাউ

১। বীরভূম বিবরণ ৩, ১৯১
২। প্রাগুক্ত,
৩। প্রাগুক্ত

রচিত 'ধর্মপুরাণ'-এর খণ্ডিত পুঁথি হইতে পশ্চিম-উদয় পালাটি সম্প্রতি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রারম্ভে গৌরবন্দনা, দেশমালাবন্দনা, গণেশবন্দনা এবং ধর্মবন্দনার পর আখ্যানভাগের সূচনা। ইহার কাহিনীটি এইরূপ—

ময়নাধিপতি লাউসেন পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখাইবার প্রতিশ্রুতি লইয়া হাকন্দে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কারাগারে বন্দী মাতাপিতার জন্য তখনও তাঁহার প্রাণ কাতর। সামুলা মাসী তাঁহাকে প্রবোধ দিলেন, ধর্মের অনুগ্রহে সমস্ত সমস্যার সমাধান হইবে। তাঁহার নির্দেশে লাউসেন ইছা রানাকে দিয়া পূজার উপযুক্ত স্থান প্রস্তুত করাইলেন।

গঙ্গায় স্নান-তর্পণ শেষে স্বর্ণপাদুকা আসনে বসাইয়া লাউসেন সাড়ম্বরে ধর্মের পূজা করিলেন। কিন্তু অর্ঘ্য গৃহীত হইল না দেখিয়া অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তখন শুকসারী বার্তা আনিবার জন্য গৌড় অভিমুখে উড়িয়া চলিল। গৌড়ে পৌঁছিয়া পক্ষীদ্বয় জননী রঞ্জাবতীকে সেনের খবর দিল এবং অভাগিনী মায়ের লিখন লইয়া আবার ফিরিয়া চলিল। পথিমধ্যে ময়নানগরে আসিয়া তাহারা চরম শোকসংবাদ শুনিল, গৌড়েশ্বরের সৈন্যদের আক্রমণ রোধ করিতে গিয়া বীর কালু ডোম এবং তাহার পর সেনপত্নী কলিঙ্গা যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছেন। প্রত্যাগত শুকসারীর কাছে জননীর দুর্দশার কথা শুনিয়া, তদুপরি কালু ও কলিঙ্গার নিধন সংবাদে লাউসেন শোকে অচৈতন্য হইলেন। তাঁহার সংজ্ঞালাভের পর সামুলা লাউসেনকে শতদল পদ্মে ধর্মের পূজা করিতে বলিলেন। শতদল পদ্ম আর কিছুই নয়, লাউসেনের মস্তক। এইবার শুরু হইল লাউসেনের কৃচ্ছ্রসাধনার পালা। প্রথমে নানা খণ্ডে অঙ্গচ্ছেদ করিয়া তিনি ঠাকুরের অর্ঘ্য সাজাইলেন। শেষে নিজের মস্তক উপহার দিলেন। তাঁহার দেখাদেখি তাঁহার সঙ্গীরাও মৃত্যুবরণ করিল। বাটুয়া কুকুর তাহাদের মৃতদেহগুলি রক্ষার ভার নিল।

বাটুয়ার রোষে গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যার সমস্ত পাপ আসিয়া সূর্যদেবের রথে লাগিল। রথ অচল দেখিয়া সূর্য ধর্মের দরবারে হাজির হইলেন। কিন্তু ধর্মের শত অনুরোধেও তিনি পশ্চিমে উদয় দিতে রাজী হইলেন না।

শেষ পর্যন্ত কৌশলী নারদমুনি সূর্যের সহিত কলহ বাধাইয়া ধর্মের নিকট বিচার প্রার্থনা করিলেন। বিচারে হারিয়া সূর্যদেব পূর্বপ্রতিজ্ঞা অনুযায়ী বাধ্য হইয়াই পশ্চিমে উদয় দিতে সম্মত হইলেন। তখন ধর্মঠাকুর দেবতাদের লইয়া হাকন্দে আসিলেন। তাঁহার আদেশে মেঘ মৃতদেহে প্রচুর বারিবর্ষণ করিল। কিন্তু শিলাবৃষ্টি সহ্য করিয়াও বাটুয়া কুকুর তাহার কর্তব্যে অটল রহিল। শেষে কুকুরকে তাহার অভিলষিত বর দিয়া ধর্ম লাউসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং লাউসেন ও তাঁহার সঙ্গীদের পুনর্জীবিত করিলেন। ভক্তের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাঁহাকে জ্যোতির্ময়রূপে দেখা দিলেন এবং তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন।

লাউসেন সূর্যের পশ্চিম উদয় বর প্রার্থনা করিলেন। নিরঞ্জনের কৃপায় সেই অসাধ্যসাধন সম্ভব হইল।

উল্লিখিত কাহিনীতে পরিকল্পনাগত কোন অভিনবত্ব নাই। গতানুগতিক রীতিতেই কবি আখ্যানভাগ অনুসরণ করিয়াছেন।

হৃদয়রামের ভাষা সংস্কৃতবহুল ও বৈশিষ্ট্যবর্জিত। কিন্তু কাব্যে পয়ার ও ত্রিপদীবন্ধ এবং গীতের মধ্যে মধ্যে "বাচান" অংশে কবি বিশুদ্ধ গদ্য ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন—

'সারী শুক পক্ষী গৌড় ও ময়নানগরের বিবরণ পত্র লইয়া রাজা লাউসেনেব নিকটে প্রত্যাগমন করিয়া পত্র দিয়া বলিতেছে— এই পত্রেতে সকল জ্ঞাত হউন।'

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই ধরনের শুদ্ধ, সরল এবং সু-অন্বয়ী গদ্য রচনা বিস্ময়কর বলিয়াই মনে হয়। ইহাতে আধুনিক পরিমার্জন থাকা সম্ভব বলিয়া কাহারও মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা সত্য নহে।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, ধর্মের পূজারিগণ তাঁহাদের দেবতাকে নানারূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। কবি হৃদয়রাম ধর্মঠাকুরকে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন রূপে দেখিয়াছেন। অবশ্য সে রূপের মধ্যে ঐশ্বর্য ও মাধুর্য একাকার হইয়া গিয়াছে—

"শঙ্খচক্রগদাপদ্ম বনমালাধারী
শিখিপুচ্ছচূড়া শিরে পীত বসন পরি।
ত্রিভঙ্গভঙ্গিয়া হইলেন নারায়ণ
যে রূপেতে শঙ্খাসুরে কবিলেন নিধন।"

হৃদয়রামের কাব্যে সর্বত্র হরিভক্তির পরিচয় সুস্পষ্ট। হয়ত তাহা বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবেরই ফল।

গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়

গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত একখানি ধর্মমঙ্গল কাব্য পাওয়া যায়।[১] ইহাতে কবির কোন পরিচয় কিংবা তাঁহার রচনাকাল সম্বন্ধেও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ডক্টর স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহাকে ময়ূরভট্টের পরবর্তী কবি বলিয়া মনে করিয়া খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু স্বর্গত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্তমান ছিলেন। ইঁহার যে হস্তলিখিত খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া যায়, তাহা ১০৭১ সালে লিখিত। কেহ মনে করেন, ইহা বঙ্গাব্দ, আবার কেহ মনে করেন ইহা মল্লাব্দ; মল্লাব্দ হইলে পুঁথির বয়স আরও ১০০ শত বৎসর কম হয়, অর্থাৎ

১। ব-সা-প ১, ৩৭৯-৮৪

১০৭১ বঙ্গাব্দে ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দ ও ইহা মল্লাব্দ হইলে ইহাতে ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ হয়।

কিন্তু কতকগুলি কারণে গোবিন্দরামকে ধর্ম্মমঙ্গলের একজন প্রাচীন কবি বলিয়াই মনে হয়। রচনায় তখনও অষ্টাদশ শতাব্দীর মত পারিপাট্য দেখা দেয় নাই, ভাষাও সংস্কৃত শব্দ দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে নাই; চরিত্রগুলির পরিচয়ও একটু প্রাচীনতা-দ্যোতক। অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন কবির প্রভাব তাঁহার উপর খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় না। রচনায় একটা গ্রাম্যতাসুলভ স্বাভাবিক সরলতা আছে। বিশেষতঃ ময়ূরভট্টের স্মৃতি তাঁহার মন হইতে তখনও বিলুপ্ত হয় নাই; সেইজন্য কৃতজ্ঞতাভরে সুদীর্ঘ বন্দনায় তিনি ময়ূরভট্টের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঘনরাম ও অপর কেহ কদাচিৎ অতি সংক্ষেপে তাঁহার নাম স্মরণ করিয়াছেন।

তাঁহার কাব্য হইতে সামান্য কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিলেই গোবিন্দরামের রচনার বৈশিষ্ট্য অনুভব করা যাইবে। 'ইন্ধা' মেটে ময়নানগর জুড়িয়া নিদুটি লাগাইয়াছে,—

যাবন্ত গড়ের লোক হল্য নিদ্রাতুর।
নিদ্রা গেল পক্ষী মৃগ বিড়াল কুকুর।।
কালুসিংহ নিদ্রা গেল যত বীরগণ।
চারি নারী সেনের নিদ্রায় অচেতন।।
সুখে নিদ্রা গেল ঘোড়া আণ্ডির পাখর।
দুয়ারী প্রহরী দাসী যতেক নফর।।
সন্তান মায়ের কোলে কত নিদ্রা যায়।
সামন্তের বৌ একা গড়েতে বেড়ায়।।

গোবিন্দরাম অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক না হইলেও তাঁহাকে আনুমানিক মঙ্গলকাব্যের সৃজন যুগের কবি বলা যাইতে পারে।

রামনারায়ণ

রামনারায়ণ নামক একজন ধর্ম্মমঙ্গলের কবির পুঁথি পাওয়া গিয়াছে,[১] কিন্তু পুঁথির মধ্যে তাঁহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তিনি সপ্তদশ কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। তাঁহার যে প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায়, তাহা ১১৯৩ বঙ্গাব্দ বা ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। কাব্যের রচনা অনেকাংশে আধুনিক বলিয়া মনে হয়, ভাষায়ও পারিপাট্য আছে। অতএব মনে হয় খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই তিনি বর্তমান ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা ও মার্জ্জিত ভাষার একটু নিদর্শন দেখান যাইতেছে। ইছাইয়ের স্তবে

১ ব-সা-প ১, ৪২১-৩৬

সন্তুষ্ট হইয়া তাহার আরাধ্য কালী তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন,—

মন্ত্রের অধীন আর ভক্তের কারণ।
নিজ মূর্তি ধরি কালী দিলা দরশন।।
মুক্তকেশী চতুর্ভুজা করাল বদনা।
লহ লহ বদনেতে লম্বিত রসনা।।
কোটর নয়ন তিন গলে মুণ্ডমাল।
ঊর্ধ্ব বাম ভুজে খড়্গ শোভিত বিশাল।।

এই মার্জিত ভাষা ও সুপরিণত কল্পনাগুণ হইতেই কবিকে মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যযুগের লোক বলিয়া অনুমিত হয়।

রামকান্ত রায়

রামকান্ত রায় নামক একজন কবিই ধর্মমঙ্গল কাব্যের সর্বশেষ কবি বলিয়া মনে হয়। ১১৫৭ সাল বা ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয়। তিনি এইভাবে তাঁহার কাব্যরচনার কাল নির্দেশ করিয়াছেন,—

এগার শ সাতানয় সালের আশ্বিনে।
আরম্ভ করিনু শুক্ল একাদশী দিনে।।
মনে যাহা করি তাহা লিখি অনায়াসে।
বারমতী সাঙ্গ হল্য বাষট্টি দিবসে।।

কেহ কেহ 'এগার শ সাতানয়' কথা কয়টির অর্থ ১১৯৭ বা ১১৭৯ বলিয়াও মনে করেন।

বর্ধমান শহরের দক্ষিণে দামোদর নদের অপর তীরে অবস্থিত সেহারা গ্রামে কবির নিবাস ছিল। তিনি তাঁহার কাব্যমধ্যে বিস্তৃত বংশপরিচয় ও কাব্য রচনার ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। শেষোক্ত বিষয়ের বর্ণনায় তিনি রাঢ়ের অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের কবিদিগকেই প্রধানত অনুকরণ করিয়াছেন। কাব্যের মধ্যে এই বর্ণনাটি অত্যন্ত বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে, ইহাতে আধুনিকতার স্পর্শ অত্যন্ত স্পষ্ট।

ধর্মদাস বৈদ্য

ধর্মমঙ্গল-রচয়িতাদিগের মধ্যে কবি ধর্মদাস বৈদ্যের নাম নানা দিক হইতে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পুঁথির নাম 'অনাদ্যমঙ্গল'। ইহার জাগরণ-পালাটি সম্প্রতি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।[১]

১। 'দ্বাদশ মঙ্গল' শ্রী পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, বিশ্বভারতী (১৩৭৩)

নামে জাগরণ পালা হইলেও ইহার শেষাংশে পশ্চিম-উদয়া পালা এবং স্বর্গারোহণ পালা দুইটিও অন্তর্ভুক্ত হইয়া কাহিনীর সুনির্দিষ্ট পরিণতি নির্দেশ করিয়াছে। অবশ্য শেষ দুইটি পালা সংক্ষিপ্ত। জাগরণ পালাটি বিস্তৃতপরিসর, নানা ঘটনার ঘনঘটায় পূর্ণ এবং কবিবৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।

লাউসেন রাজার হাকন্দে অবস্থানের সুযোগ লইয়া কূটবুদ্ধি মহামদ মনে মনে দুরভিসন্ধি করিলেন। গৌড়েশ্বরকে মিথ্যা অজুহাত দেখাইয়া ময়নানগর পরিদর্শনের ছলে তিনি বিরাট সৈন্যসজ্জা করিলেন। ময়নায় আসিয়া কালিন্দীর তীরে তাঁহার শিবির স্থাপিত হইল। এদিকে লখাই ডোমনী নদীতে স্নান করিতে আসিয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝিল এবং সত্বর গিয়া কালু ডোমকে শত্রুর আক্রমণ-সম্ভাবনা জানাইল। কালুর উপর নগর রক্ষার ভার। সে কলিঙ্গা-রাণীর সহিত পরামর্শ করিয়া যুদ্ধই স্থির করিল। কিন্তু পথিমধ্যে মদ্যপানের ফলে তাহার আর চেতনা রহিল না। মহামদ প্রেরিত চর তাহাকে নানা প্রলোভনে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বাধা দিল লখাই ডোমনী। কালুর মুখে যুদ্ধ বর্জনের হীন প্রস্তাব শুনিয়া লখাই চরম ঘৃণায় তাহা প্রত্যাখ্যান করিল এবং কালুর ভীরুতাকে লজ্জা দিয়া শক্তি পরীক্ষায় অবলার অসামান্য বলের প্রমাণ দিল। কিন্তু শত তিরস্কারেও মধুপানে মত্ত কালু ডোমের তখন যুদ্ধ করিবার মত সাধও ছিল না, সাধ্যও ছিল না। অগত্যা তাহাকে ঘুমন্ত রাখিয়া লখাই স্বয়ং তেরোজন ডোম লইয়া নগর পাহারা দিল। কিন্তু মহামদ অনুচর ইন্দাকে দেবীর বরদানের ফলে সমস্ত নগর তখন গভীর সুপ্তিতে মগ্ন। সুযোগ বুঝিয়া মহামদ ময়না আক্রমণ করিলেন। কালুর নেশা কাটাইতে না পারিয়া লখাই তাহার পুত্র শাখাকে যুদ্ধে পাঠাইল। যুদ্ধে শাখার জয় হইলেও শেষ পর্যন্ত নদীতে তাহার জলপানের সুযোগে শত্রুপক্ষের বীর চূড়া তাহাকে হত্যা করিল। পুত্রের নিধন-সংবাদে কালু ডোমের নেশা কাটিল। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া কালু মহামদের সৈন্যদলকে বিপর্যস্ত করিল। কিন্তু কামদেব নামে এক বীরের ছলনায় ভুলিয়া শেষে শপথ-রক্ষার দায়ে কালু নিজের মাথা নিজে কাটিল। কামদেব অবশ্য লখাইয়ের হাতে পরিত্রাণ পায় নাই। বীর কালুর মৃত্যুতে বাধ্য হইয়া গর্ভবতী কলিঙ্গা-রাণী পুরুষের বেশে যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রধারণ করিলেন। কিন্তু যথেষ্ট বিক্রম দেখাইলেও শত্রুসৈন্য বেষ্টিত হইয়া তাঁহার আত্মহত্যা ভিন্ন উপায় ছিল না। শেষরক্ষা করিলেন কলিঙ্গার সপত্নী কানড়া। দেবী ভবানীর অনুগ্রহে তাঁহার জয় হইল এবং মহামদ পাত্র বন্দী হইলেন।

এদিকে ময়নার অমঙ্গল-আশঙ্কায় হাকন্দে তপস্যারত লাউসেনের মন চঞ্চল হইল। সংবাদ আনিবার জন্য তিনি শুকসারীকে পত্র দিয়া পাঠাইলেন। প্রত্যুত্তরে নিদারুণ দুঃসংবাদ শুনিয়া লাউসেন শোকে আকুল হইলেন। শেষে সামুলার প্রবোধে ধৈর্য ধরিয়া তিনি ধর্মঠাকুরের উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা শুরু করিলেন। কোনক্রমেই দেবতাকে তুষ্ট করিতে না পারিয়া তিনি নিজের দেহ নবখণ্ড করিয়া পূজার অর্ঘ্য দিলেন। তাঁহার দেখাদেখি তাঁহার সঙ্গীরাও

প্রাণ দিল। সেনের দুর্দশা দেখিয়া পর্বতকুমারী কমলা কোকিলের ছদ্মবেশে ধর্মঠাকুরের তপস্যা ভাঙিয়া তাঁহাকে হাকন্দে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। ভক্তের দুঃখে বিগলিতপ্রাণ ধর্মঠাকুর লাউসেনকে পুনর্জীবিত করিলেন এবং তাঁহার দুশ্চর সাধনার ফলস্বরূপ তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন। লাউসেনের একমাত্র প্রার্থনা সূর্যের পশ্চিমে উদয়। ধর্মের আদেশে পবন-নন্দন হনুমান সূর্যদেবকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিল। লাউসেনের বাসনা পূর্ণ কারিয়া সূর্য পশ্চিমে উদিত হইলেন। চারিদিকে সেনের নামে ধন্য ধন্য পড়িল। হরিহর বায়েনকে সূর্যোদয়ের সাক্ষী রাখিয়া লাউসেন ময়নায় ফিরিলেন। মহামদের প্রতি দয়াবশে লাউসেন তাঁহাকে মুক্ত করিলেন এবং ধর্মের কৃপায় তাঁহার সৈন্যসামন্ত ফিরাইয়া দিলেন।

এইবার সকলে গৌড়ের পথে রওনা হইলেন। গৌড়ে আসিয়া লাউসেন তাঁহার অপূর্ব তপস্যা ও সূর্যোদয়ের কাহিনী কর্ণসেনকে শুনাইলেন। কিন্তু মহামদের ধূর্ততার তখনও শেষ হয় নাই। তিনি সমস্ত ব্যাপারটিকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং সাক্ষী হরিহরকেও প্রলোভনে বশীভূত করিলেন। কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে হরিহর রাজসভায় সত্য কথাই বলিল। ক্রুদ্ধ মহামদ তাহাকে শূলে দিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু ধর্মের কৃপায় হরিহর দেবলোকে মুক্তি পাইল। শূলে দিলেই মুক্তি হইবে ভাবিয়া মহামদ একে একে তাঁহার পুত্রদের জন্য শূলের ব্যবস্থা করিলেন। সকলেই প্রাণত্যাগ করিল। তখন লাউসেনের অভিশাপে মহামদ কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইলেন। লাউসেন তাঁহার জনক-জননীকে কারামুক্ত করিয়া দেশে ফিরিলেন। মর্ত্যে ধর্মপূজা প্রচার হওয়ায় লাউসেনের কর্তব্য শেষ হইয়াছিল। ইহার পরই ঘোর কলির দিন। কলির দুঃখ ভোগ করিবার পূর্বেই ধর্মঠাকুর তাঁহার ভক্তকে মুক্তি দিতে চাহিলেন। ধর্মের আদেশে পুত্র চিত্রসেনের হাতে রাজ্য দিয়া লাউসেন সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন।

উল্লিখিত কাহিনীটিকে কবি ধর্মদাস অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। গতানুগতিক কাহিনীর মধ্যেও ঘটনাগত নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া এবং বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে বিভিন্নমুখী প্রবণতা দেখাইয়া কাব্যটিকে তিনি উপভোগ্য করিয়াছেন।

অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনীর সমাবেশে ধর্মদাসের কাব্যখানি পরিপূর্ণ। গৌড়েশ্বরের সভায় কালীয়দমন-পালার কাহিনী-কথন হইতে শুরু করিয়া কবি যেখানেই সুযোগ পাইয়াছেন, সেখানেই পুরাণের কাহিনী-প্রসঙ্গ আনিয়াছেন।

কাব্যের বহু স্থানে তাঁহার লোকজীবন-প্রচলিত নানা প্রবচনের ব্যবহার কোথাও বা সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত উক্তি প্রবচনের রূপ ধরিয়াছে। যেমন—

(১) নীচ জাতি অল্পবুদ্ধি কভু নহে ভাল
(২) সংসারে জন্মিয়া কার সম নহে দিন

দুখ সুখ দুই ভাই কাহার অধীন।
(৩) কাল পূর্ণ হইলে হয় অবশ্য বিপাক।
(৪) আজি মরি কালি মরি অবশ্য মরণ
মরণে যে করে ভয় সেই মূঢ় জন।
(৫) সংসার অসার ঘোর কপটের মেলা
কুহক-তেজেতে যেন নাচায় পুতলা।
আপনার তনু, বাছা, আপনার নয়
পর তনু, বাছাধন, আপন কি হয়।

ইত্যাদি।

ভাষার উপর ধর্মদাসের যথেষ্ট মুন্শীয়ানা ছিল। তৎসম শব্দকে তিনি অনভিজাত শব্দের সঙ্গে অনায়াসে মিলাইয়াছেন। তবে একটি স্থানে দেবীস্তবকে সংস্কৃতানুগ করিতে গিয়া তিনি অতি হাস্যকর নিদর্শন রাখিয়াছেন—

লখ্যার বাণী কর্ণে শুনি রাজার নন্দিনীং
পূজে কালী কুতুহলী শিখরবাসিনীং।
বিধিমত দিব্য জত ছাগ মেষ ছেদনং
কৃতাঞ্জলি করি রাণী বহুবিধ স্তবনং।
বুঝি ভক্তি আদ্যাশক্তি মূর্তিমান আসনিং
শূন্যে রই জই জই দেব সর্ব ডাখিনীং। (পৃঃ ৪৫)

ধর্মদাসের সর্বাধিক কৃতিত্ব চরিত্র চিত্রণে। এ বিষয়ে তিনি কোথাও কোথাও মুকুন্দরামের অনুসারী। যেমন, কালু ডোম শুঁড়িগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে—

"বীরের শবদ শুনি শুড়ি রহে ঘর
শুড়িনী ধাইয়া আইল শুড়িনীগোচর।
মাসী মাসী বলি কালু বৈসে তার কাছে
সত্য করি কহ, মাসী, মেসো কোথা গেছে।
শুড়িনী বলেন, বাপু, তুমি নাঞি জান
কহি আগে বিবরণ মন দিয়া শুন।
শুন, বাপু, বীর কালু বাক্য শুন মোর
দিন দশ হৈল ঘরে মেসো নাঞি তোর।"

শুঁড়ির আত্মগোপন ও শুঁড়িনীর কপটতা এখানে মুরারি শীল ও তাহার পত্নী-চরিত্রের কথা স্মরণ করায়।

কানড়া-চরিত্রের সপত্নীবিদ্বেষের তীব্র জ্বালা আমাদের পরিচিত সংসার-জীবনের একান্ত

বাস্তবানুগ নারীমনের সন্ধান দেয়। কানড়া বলিতেছে—

"কলিঙ্গা কালিয়া জেন সর্পের মড়াই
অন্তর বাহিরে কাল লোকের বালাই।
কন্দল পাইলে মাগী তেজে অন্ন জল
কেবল হস্তিনী গো হস্তীর ধরে বল।
মুখানি খুরের ধার খই জেন ফুটে
গঞ্জে মাগী সদাই গরব মোর কাটে।"

ঘনরামের কাব্যে কালু ডোমের জায়া সনকার মধ্যে আমরা লখাই সম্পর্কে অনুরূপ সপত্নীবিদ্বেষের চিত্র পাই।

কালু ডোমের চরিত্রের বীর্যকে কবি ধর্মদাস অনেকাংশে খর্ব করিয়াছেন। যাহার উপর সমস্ত ময়নানগরের ভার দিয়া লাউসেন নিশ্চিন্ত আছেন, শত্রুপক্ষকে দেখিবামাত্র সেই কালু ডোমের হৃৎকম্প উপস্থিত—

দেখিয়া ত্রাসিত বীর উড়িল পবাণ
কাতর কপোত যেন দেখিএ সয়চান।

লাউসেনের নিমক খাইয়াও প্রলোভনের বশে তাঁহার প্রতি কৃতঘ্নতা করিতেও কালুর আপত্তি নাই।

কালু ডোমের ব্যক্তিত্বহীন চরিত্রের পাশে বীরাঙ্গনা লখাই বিশেষভাবেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লখাই কবির এক অপূর্ব সৃষ্টি। ঘনরামের লখাই বীর্যবতী হইলেও প্রথমে শক্তিপরীক্ষায় দ্বিধাগ্রস্ত—

অবলা কেবল আমি কিবা বল ধরি,
কালু বলে ছাড় কলা কোলে কাল অরি।

কিন্তু ধর্মদাসের লখাই প্রথমাবধি সাহসে এবং ব্যক্তিত্বে প্রাণবন্ত। তবে তাহার মধ্যে নারীসুলভ স্নেহ-মমতার অভাব আছে বলিলেও ভুল হইবে। পুত্রকে সে প্রাণাধিক ভালবাসে। স্বামীর মৃত্যুতেও সে শোকে উন্মাদ হইয়াছে। তবু নিজের দৌর্বল্যকে প্রশ্রয় দিয়া লখাই কখনও কর্তব্যের পথে বিচলিত হয় নাই। কালুকে সে যুদ্ধে প্ররোচিত করিয়াছে, তাহার কৃতঘ্ন প্রবৃত্তি দেখিয়া তাহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়াছে, এমন কি, উপায় না দেখিয়া একমাত্র পুত্রকে লখাই স্বেচ্ছায় রণে পাঠাইয়াছে। তাহার নিজের শরীরেও প্রচণ্ড বল। জগদ্দল পাথর ভেদ করিয়াই লখাই ক্ষান্ত নয়, সকলকে সে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিয়াছে। শত্রুর সম্মুখে তাহার রণরঙ্গিণী রূপও ভুলিবার নয়—

"মুণ্ড কাটি কামদেব পলাইএ যায়
ভুখিলি বাঘিনীপ্রায় লখ্যা পিছে ধায়।

ধাইল ডোমের মেয়্যা তারা যেন ছুটে
মার মার বলিয়া কতেক বীর কাটে।
আর কত কাটিল সিফাই সরদার
কামের কাটিয়া মাথা ফিরে পুনুর্বার।"

বস্তুত, ঘনরামকে আমরা ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দিলেও ধর্মদাস বৈদ্যের মধ্যেও সার্থক কবিজনোচিত গুণের অভাব দেখিতে পাই না। ঘনরামের প্রভাব অনেকক্ষেত্রে কবির উপর পড়িলেও কোন কোন দিক হইতে ধর্মদাস তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।

বিশ্বনাথ দাস

বিশ্বনাথ দাসের ধর্মপুরাণের 'নিশিজাগরণ' নামে একটি পালা প্রকাশিত হইয়াছে।[১] আসলে কিন্তু ইহা জাগরণ-পালা নয়, পশ্চিম-উদয় পালার অনুরূপ। কাব্যের কাহিনীটিও প্রায় অভিন্ন। কাব্যের কাহিনীটি অনুসরণ করিলেই তাহা বোঝা যাইবে।

ধর্মঠাকুরের পূজা দ্বারা পাপ খণ্ডনের অভিলাষে লাউসেন এবং তাঁহার ভক্তগণ হাকন্দে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূজার আয়োজন শুরু হইল। সামুলা মাসীর কথায় প্রথমে লাউসেন নিজের মুণ্ড বলি দিতে আপত্তি করিলেও শেষে রাজী হইলেন। তাঁহার সঙ্গিগণও তাঁহার দুঃখের সমান অংশীদর হইতে চাহিল।

নিশায় পূজা আরম্ভ করিয়া লাউসেন দণ্ডে দণ্ডে তাঁহার অষ্টাঙ্গ ধর্মঠাকুরকে অর্ঘ্য দিলেন এবং শেষে স্বহস্তে নিজ মুণ্ড কাটিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহচরেরাও প্রাণ দিল। কিন্তু সমস্ত মৃত্যুর পাপ লাগিল সূর্যের রথে। রথ অচল দেখিয়া সূর্যদেব ক্রোধে উন্মত্ত। নিরঞ্জনের অনুরোধে ফল হইল না, কোন দেবতাই তাঁহাকে শান্ত করিতে পারিলেন না। তখন নারদমুনি কৌশলে তাঁহার সহিত কলহ বাধাইলেন। ধর্মের বিচারে সূর্যের দোষ প্রমাণিত হইল। অগত্যা লাউসেনকে বর দিতে ধর্মঠাকুর ও অন্যান্য দেবতাগণের সহিত সূর্য হাকন্দে চলিলেন। কিন্তু বাটুয়া কুকুর তাঁহাদের পথ রোধ করিল। শিলাবৃষ্টিতেও তাহাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া এবং তাহার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া নিরঞ্জন বাটুয়া কুকুরকে স্বরূপে দেখা দিলেন এবং বাঞ্ছিত বরদান করিলেন। ইহার পর তিনি তাঁহার ভক্ত লাউসেনকে পুনর্জীবিত করিলেন। প্রাণ পাইয়া প্রথমেই লাউসেন ধর্মঠাকুরের কাছে তাঁহার সঙ্গীদের জীবন ভিক্ষা চাহিলেন। এইবার সকল দেবতাগণের সভায় তিনি নিরঞ্জনের নিকট সূর্যের পশ্চিম-উদয় বর প্রার্থনা করিলেন। ধর্মের আদেশে এবং দেবতাগণের সহায়তায় সূর্য তাঁহার রথের মুখ ফিরাইলেন। কৈশাখী

১। প্রাগুক্ত

অমাবস্যায় সূর্যের পশ্চিমে উদয় হইল। গৌড়ের অধিবাসিগণ তাহা দেখিয়া লাউসেনকে ধন্য ধন্য করিলেন। ঈর্ষায় জ্বলিয়া মহামদ পাত্র কিন্তু ইহাকে মিথ্যা প্রমাণিত করিতে চাহিলেন। লাউসেনের মনে সে-আশঙ্কা ছিলই। তাই তিনি ধর্মঠাকুরের আবির্ভাব এবং পশ্চিমে সূর্যোদয় সম্পর্কে হরিহর বায়েনকে সাক্ষী রাখিলেন। ধর্ম তাঁহাদের সকলকে আশীর্বদ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। লাউসেনের পূজা সাঙ্গ হইল।

উল্লিখিত কাহিনী বর্ণনায় বিশ্বনাথ ধর্মমঙ্গলকারগণের পশ্চিম-উদয়-পালার অনুবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র; মৌলিকতা কোথাও দেখান নাই। রচনার মধ্যে তাঁহার কবিত্বের পরিচয়ও উল্লেখযোগ্য নয়। অনাড়ম্বর ভাষায় একটানা গতিতে তিনি আখ্যানভাগ উপস্থাপিত করিয়াছেন মাত্র; কাহিনীর পরিসরও সংক্ষিপ্ত।

বিবিধ কবি

যে সকল ধর্মমঙ্গলের কবির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধেই যথাসম্ভব আলোচনা করা গেল।

এতদ্ব্যতীত দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ,[১] নিধিরাম গাঙ্গুলি,[২] শঙ্কর চক্রবর্তী প্রভৃতি কয়েকজন কবিও ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়, কিন্তু তাঁহাদের কাব্য কিংবা জীবন সম্বন্ধে কোন পরিচয় লাভ করা যায় না। ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের পরিচয় হইতে জানা যাইতেছে, যে ধর্মমঙ্গল কাব্য একই স্থানে উৎপত্তি ও প্রসার লাভ করিয়াছিল; এমন কি, ধর্মপূজা মালদহ, মুর্শিদাবাদ, ময়ূরভঞ্জ, মানভূম, বীরভূম অঞ্চলে সামান্য প্রসার লাভ করিলেও সেই সকল দেশে কোন ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয় নাই। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী রাঢ়ের জাতীয় ও সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বতন্ত্র দেশে ও সমাজে তাহা লোকপ্রীতি লাভ করিতে পারে নাই।

ধর্মমঙ্গল কাব্যবিচার

অবশ্য ইহাও স্বীকার্য যে, ধর্মমঙ্গল কাব্যের উপরও বাংলার সমসাময়িক সাহিত্যের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। অনেকগুলি অপ্রধান চরিত্র পরিকল্পনায় ধর্ম-মঙ্গলের কবিগণ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিলেও, মূল কাহিনীর পরিকল্পনায় যেমন ধারাবাহিক গতানুগতিকতাকে আশ্রয় করিয়াছেন, তেমনই ঘটনাবিন্যাসেও অনেক ক্ষেত্রেই সমসাময়িক একখানি বিশেষ কাব্যকে ভিত্তি করিয়া লইয়াছেন—তাহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

অবশ্য কৃত্তিবাসের খাঁটি রামায়ণ পাওয়া যায় না; বর্তমানে যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রচলিত আছে, তাহাতে অনেক অংশই পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত। অতএব সাধারণভাবে ইহাও

১। ক ১৬৫১ ২। ব ৩৯৪

মনে হইতে পারে যে, সম্ভবত ধর্ম্মমঙ্গলের কাহিনী হইতেই তাহা গিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্য নহে; কারণ, ধর্ম্মমঙ্গল যে সকল অংশে রামায়ণ কর্তৃক প্রভাবিত বলিয়া অনুমিত হয়, সেই সকল অংশের কোন কোন চরিত্র বিশেষভাবে রামায়ণেরই চরিত্র। যেমন হনুমান। অতএব ইহা ধর্ম্মমঙ্গলের উপর রামায়ণেরই প্রভাব বলিয়া অনুমিত হয়, ইহা রামায়ণের উপর ধর্ম্মমঙ্গলের প্রভাবজাত নহে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের একটি সমগ্র পালার নাম মায়ামুণ্ড পালা। নব্য ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণের শেষভাগেও পরবর্তী চরিত্র-খণ্ডের যে সূচী পাওয়া যায়, তাহাতেও বারমতির নবম মতি মায়ামুণ্ড বলিয়া উল্লিখিত আছে। তিনি বলিয়াছেন, 'নবমেতে মায়ামুক্ত (মুণ্ড) ইছাই নিধন।' অতএব ধর্ম্মমঙ্গলের প্রাচীনতম যে কাহিনীর ধারা, তাহার মধ্যেও মায়ামুণ্ড পালার উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি। ধর্ম্মমঙ্গলেব আদিকবি ময়ূরভট্টই লাউসেনের কাহিনী লইয়া বারমতি বা চতুর্বিংশতি পালায় বিভক্ত করিয়া কাব্য রচনা করেন। অতএব মায়ামুণ্ড পালা তাঁহারই সৃষ্টি। ইহাতেও মনে হয়, ময়ূরভট্ট কৃত্তিবাসের পরবর্তী লোক। ধর্ম্মমঙ্গলের মায়ামুণ্ড পালাটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের একটি কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া রচিত। রামায়ণের কাহিনীটি এই যে, রাবণ রামচন্দ্রের এক মায়ামুণ্ড রচনা করিয়া অশোক বনে সীতার নিকট উপস্থিত করিলেন। সীতা ইহা দেখিয়া স্বামীর শোকে কাঁদিয়া অধীর হইলেন। অতঃপর হনুমানের নিকট হইতে প্রকৃত সংবাদ জানিতে পারিয়া আশ্বস্ত হইলেন; মায়ামুণ্ড পালাতেও লাউসেনের একটি মায়ামুণ্ড রচনা করিয়া তাহা তাঁহার পত্নীদিগের সম্মুখে আনিয়া স্থাপন করার কাহিনী আছে। অতএব দেখিতে পাইতেছি, ধর্মমঙ্গল কাব্যের একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ই রামায়ণের কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রামায়ণের ছোট বড় কত ঘটনা যে ধর্ম্মমঙ্গলের মধ্যে গিয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।

ধর্মমঙ্গলের কতকগুলি চরিত্রসৃষ্টিতে কৃত্তিবাসী রামায়ণের কতকগুলি চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া লওয়া হইয়াছে। রামায়ণের হনুমান চরিত্রটিকে ধর্মমঙ্গল কাব্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য হনুমানের উল্লেখ একমাত্র যে ধর্মমঙ্গল কাব্যেই দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে, পরবর্তী মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলেও এই হনুমান চরিত্রের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। এমনকি, পরাগলী মহাভারতে পর্যন্ত হনুমান চরিত্রটি আছে। অবশ্য তাহাও রামায়ণেরই প্রভাবজাত।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে যে রুচিদুষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা আকস্মিক বস্তু নহে। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্য অর্থাৎ পদ্মাপুরাণগুলির আদর্শ ছিল কতকগুলি শৈব পুরাণ। শৈব পুরাণগুলির নৈতিক আবহাওয়া অত্যন্ত দূষিত ছিল। ইহা হইতেই মঙ্গলকাব্যের নায়কদের রূপদর্শনে নারীদিগের নিজের পতিনিন্দা ইত্যাদি বিষয় অতি প্রাচীনকাল হইতেই মঙ্গলকাব্য রচনার বিধিনিয়মের অন্তর্বর্তী

হইয়া পড়ে। কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি এই বিষয়ে আরও একটুকু অগ্রসর ছিল। ইহাদের মধ্যে জামতি ও গোলাহাট পালা নামে যে দুইটি স্বতন্ত্র পালা বা অধ্যায় আছে, তাহা বিশেষভাবেই এই দূষিত নৈতিক দৃষ্টির পরিচায়ক। অবশ্য এই অধ্যায়ের পরিকল্পনা যে ধর্মমঙ্গল কবিদিগের মৌলিক কল্পনা-প্রসূত, তাহা বলা যায় না। নাথসাহিত্য হইতেই তাহা ধর্মসাহিত্যে সংক্রমিত হইয়াছে। নাথসাহিত্যে মীননাথের যে কাহিনী আছে তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি স্ত্রীরাজ্য কদলীপত্তনে গিয়া ব্যভিচারে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কদলীপত্তন স্ত্রীরাজ্য—

কদলিত দেখে যুবতী সব প্রজা।
স্ত্রীরাজ্য হয় সে যে স্ত্রী হয় রাজা।।

ধর্মমঙ্গলের গোলাহাট পালার পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ ইহারই অনুরূপ। কর্পূর লাউসেনকে গোলাহাটের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

এ বড় বিষম বাট বামে রাখ দূরে।
নারী রাজা দারী তায় বৈসে ঐ পুরে।।

মঙ্গলা ও কমলা যেমন মীননাথকে কুহকজালে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তেমনই লাউসেনকে সুরীক্ষা নানা কৌশলে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল। গোরক্ষনাথ কতকগুলি হেঁয়ালীর উত্তর দিয়া যেমন মীননাথকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তেমনই লাউসেনও কতকগুলি হেঁয়ালীর জবাব দিয়া সুরীক্ষার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন।

অতএব অন্যান্য মঙ্গলকাব্য হইতে স্বতন্ত্র ধর্মমঙ্গলের কবিগণ এই জামতি ও গোলাহাট পালা রচনায়ও অশ্লীলতার দিক দিয়া কোন মৌলিকতা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। মায়ামুণ্ড পালা যেমন রামায়ণ হইতে গৃহীত, জামতি ও গোলাহাট পালার পরিকল্পনাও সম্পূর্ণভাবেই নাথসাহিত্য হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। নাথসাহিত্যের সঙ্গে ধর্মসাহিত্যের যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাহা সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। ধর্মসাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্বের যে কাহিনীর পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতেও ধর্মসাহিত্যের উপর নাথ-সাহিত্যের প্রভাব অনুভব করা যায়। নাথসাহিত্যে বিশেষত গোরক্ষবিজয়, মীন-চেতন প্রমুখ কয়েকখানি মধ্যযুগের কাব্যে দুর্নীতির যে নগ্ননৃত্যের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহারই ফলে মধ্যযুগের বহু সাম্প্রদায়িক সাহিত্যই কলুষিত হইয়া উঠিয়াছিল। পরবর্তী অধ্যায়ের কালিকা-মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের কথা-প্রসঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

এতদ্ব্যতীত আখড়া পালার একটি প্রসঙ্গও নাথসাহিত্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। নাথসাহিত্যে পাই, পার্বতী গোরক্ষনাথকে ছলনা করিবার জন্য তাঁহার প্রণয় যাচ্ঞা করেন কিন্তু গোরক্ষনাথ চরিত্রবলে তাঁহার ছলনা-জাল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতে সমর্থ হন। ধর্মমঙ্গলের

আখড়া পালার বর্ণনাতেও আছে, লাউসেনকে ছলনা করিবার জন্য পার্বতী মোহিনীমূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রণয় যাচ্ঞা করেন। লাউসেনও নিজের চরিত্রবলে তাঁহার ছলনা হইতে আত্মরক্ষা করেন। অতএব মনে হয়, ধর্মসাহিত্যের লাউসেন নাথসাহিত্যের গোরক্ষনাথেরই প্রকারভেদ মাত্র। এই চরিত্রের পরিকল্পনায় ধর্মমঙ্গলের কবিগণ কোনও মৌলিকতা দেখাইতে পারেন নাই। ধর্মমঙ্গলের মহামদ পাত্রের চরিত্রটিও ভাগবত-পুরাণের দশম স্কন্ধে বর্ণিত কংস চরিত্রের সম্পূর্ণ অনুরূপ। মহামদ পাত্র লাউসেনের পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

দৈবকী হইল রঞ্জা উগ্রসেন তুমি।
সবংশে করিতে ধ্বংস কংসরূপী আমি।।

ধর্মমঙ্গলের কবিগণ এই চরিত্রটির পরিকল্পনায় কংসকেই সর্বতোভাবে আদর্শ করিয়া লইয়াছিলেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিশেষত্ব সম্বন্ধে ভূমিকাভাগেই সাধারণভাবে আলোচনা করিয়াছি, এখন ইহার চরিত্রগুলির বিচার সম্পর্কে তাহা আরও একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করা যাইতেছে। লাউসেন ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির নায়ক। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ নায়ক-চরিত্রের জন্য যে সকল গুণ নির্বাচন করিয়া থাকেন, লাউসেনের মধ্যে তাহাদের একটিরও অভাব নাই। তিনি ধীর এবং উদাত্ত গুণ-সম্পন্ন, কখনও কর্তব্য-বিমুখ নহেন। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ তাঁহাকে যদি দেব-সম্পর্ক হইতে একটু দূরবর্তী করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মহত্ত্ব আরও প্রকাশ পাইত। কিন্তু এই বীর চরিত্রটি কোন কারণে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াই যখন ধর্মের স্তব করিতে আরম্ভ করেন, তখনই তাঁহার উপর হইতে নিরপেক্ষ পাঠকের সমগ্র সহানুভূতি দূর হইয়া যায়। কারণ, এইখানে তাঁহার আত্মশক্তির উপর কবিগণ দারুণ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপি এই দেব-প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়াও এই চরিত্রটির মধ্যে মহানুভবতার সন্ধান করা যায়। অতএব দেবতাই তাঁহার সমগ্র কর্মজীবন নিয়ন্ত্রিত এবং পরিণামে সার্থকতা-মণ্ডিত করিয়া দিলেও, ইহার মধ্যে তাঁহার যে ব্যক্তিগত একটা সংযম ও উদারতার সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। পার্বতী তাঁহার চরিত্রবল পরীক্ষা করিতে গেলে লাউসেন মাত্র সংক্ষেপে ছদ্মবেশিনী পার্বতীকে বলিলেন,—

সকল তীর্থের ফল ঘরে বসি' করতল,
পতি পদে ভক্তি বল যার।
পৃথিবী পবিত্র যা'র পায়ের ধূলায় আর
আমি কি মহিমা ক'ব তার।।

সমগ্র ধর্মমঙ্গল কাব্যের নৈতিক দূষিত আবহাওয়া এই প্রকার কয়েকটি উক্তি হইতে যথাসম্ভব বিনষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যে কাব্যে সমাজের পতিগণ স্ত্রীকর্তৃক অহর্নিশি নিন্দা ও অসন্তুষ্টির ভাজন, সেই কাব্যেই এই প্রকার নৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন চরিত্রের পরিকল্পনা করিয়া কবিগণ সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বিদ্যাসুন্দরের নায়ক ও ধর্মমঙ্গলের নায়কে এই পার্থক্য।

লাউসেনের দেবতার প্রতি যেমন শ্রদ্ধা, মাতাপিতার প্রতিও তেমনই ভক্তিশ্রদ্ধা বর্তমান। সকল সময়ই গৃহ হইতে যাত্রা করিবার কালে তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা দিয়া, তারপর নিজের সঙ্কল্প সাধন পথে অগ্রসর হন।

লাউসেন সৎসাহসী ও নির্ভীক, কিন্তু দুঃসাহসী নহেন। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস আছে বলিয়াই যে কোন অবস্থার মধ্যে আত্মসমর্পণ করেন এবং এই আত্মশক্তির সহিত দৈবশক্তির সহযোগে প্রায় সকল প্রতিকূল অবস্থা হইতেই মুক্তিলাভ করিয়া আসেন। গৌড়ের পথে সমস্ত বিপদের কথা অবগত থাকিয়াও তাহা হইতে কখনও তাঁহাকে পশ্চাৎপদ হইয়া আসিতে দেখা যায় না। এই নির্ভীক সাহসিকতাই তাঁহাকে একটি কাব্যের নায়ক-চরিত্রের উপযুক্ততা দান করিয়াছে। লাউসেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল, যখন কর্পূর সুরীক্ষার 'কাটিল লোটন নাক ঘষারিল ভূঁয়ে', তখন 'দয়ার ঠাকুর সেন জল দেন মুঞে।' একদিকে নাথসাহিত্যের গোরক্ষনাথের প্রভাব ও অপরদিকে রামায়ণের রাম চরিত্রের প্রভাব—এই উভয় প্রভাবের মধ্যবর্তী হইয়া লাউসেন এই উভয়েরই বিশিষ্ট গুণাবলীর অধিকারিরূপে কল্পিত হইয়াছেন।

লাউসেনের বিচার-বিচক্ষণতা প্রশংসনীয়। গৌড়ের পথে লাউদত্ত কর্মকারের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া শুনিলেন, মহামদ পাত্র প্রচার করিয়া দিয়াছেন যে, যাহার ঘরে প্রবাসী কোন পুরুষকে পাওয়া যাইবে, তাহাকে রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যে একাগ্রতা ও সত্যনিষ্ঠা থাকিলে জগতের যে কোনও কার্যে জয়লাভ করা যায়, লাউসেনের তাহাই ছিল। পশ্চিমোদয় কবির রূপক মাত্র; কিন্তু যে নিজের দেহকে নয় খণ্ড করিয়া কাটিয়া আদর্শের পূজা করিতে পারে, তাহার পক্ষে সংসারের যে কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা আশ্চর্য কিছুই নহে। কারণ, একমাত্র সাধনা দ্বারাই জগতের যত অসম্ভাব্য বস্তু সম্ভব হইয়াছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের চরিত্রকে একটা আদর্শরূপে কল্পনা করা হইলেও, এই ভাবেই সেই আদর্শের পরিকল্পনাও সার্থক হইয়াছে।

এইবার রঞ্জাবতীর চরিত্রটি আলোচনা করিব। লাউসেনের ব্যক্তিগত জীবনের সমগ্র সাধনার মূলে তাঁহার জন্মের ইতিহাস জড়িত হইয়া আছে। যে দুশ্চর তপশ্চর্যা দ্বারা লাউসেনকে তাঁহার জননী সন্তানরূপে লাভ করিয়াছিলেন, লাউসেনের জীবনেও সেই দুশ্চর তপশ্চর্যার

শক্তিলাভের তাহাই মূলীভূত কারণ। আদর্শের সন্ধানে জননীর যে সাধনা দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাই সন্তানে নূতন রূপ লাভ করিয়াছিল মাত্র। কিন্তু পুত্রমুখ দর্শন করিয়াই রঞ্জাবতী তাঁহার পূর্ব জীবনের আদর্শ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিলেন বলিয়াই মনে হয়। বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি রঞ্জাবতীর কোনদিনই অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নাই; এমন কি, স্বামীর অপমানের জন্য ভ্রাতার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—

কিছু হক আজ হতে ঘুচিল মমতা।
শুনে রঞ্জাবতী বলে মোর ঐ কথা।।
আজ হতে ও'পথে আপনি দিনু কাঁটা।
সোদর বচন বুকে বাজে যেন জাঠা।।

অভিমানিনী ভগ্নীর এই দুঃখ যে ভাই তাহাকে বন্ধ্যা বলিয়াছে,—

বয়স বছর বার বন্ধ্যা বলি হেলে।
প্রাণনাথে সভায় বিন্ধেছে বাক্‌ছলে।।
সেই অগ্নি উঠে নিত্য অন্ন নাহি রুচে।
কাণা খোঁড়া পুত্র হক তবু দুঃখ ঘুচে।।

এই অভিমানের জন্য তিনি শালে ভর দিয়া দেহত্যাগ করিয়া পর্যন্ত পুত্র লাভের সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন, এই দুঃখাভিমান-জাত ঐকান্তিকী নিষ্ঠার জন্যই তাঁহার একাগ্র সাধনায় সিদ্ধিলাভও সম্ভব হইয়াছে।

এত সাধনার ধন এই পুত্র লাভ করিয়া রঞ্জা তাঁহার পূর্বপ্রকৃতি একেবারে বিস্মৃত হইলেন। অতঃপর তাঁহার যে চরিত্রের সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটে, তাহা কোনমতে কোন বীর নায়ক-চরিত্রের জননী হইবার ধৃষ্টতা রাখিতে পারে না। বিশেষত ধর্ম্মমঙ্গলের স্ত্রী চরিত্রের যে বিশেষত্ব সম্বন্ধে ভূমিকাভাগে আলোচনা করিয়াছি, রঞ্জাবতীব চরিত্রের মধ্যে তাহা লেশমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। এই চরিত্র-চিত্রণে রাঢ়ে জাতীয় চরিত্রের প্রভাব অপেক্ষা গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যের নায়ক-জননীর চরিত্রের আদর্শই জয়ী হইয়াছে। পদ্মাপুরাণের সনকা, চণ্ডীমঙ্গলের খুল্লনা ও ধর্ম্মমঙ্গলের রঞ্জা এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভিন্না। বরং রঞ্জাবতী ইহাদের তুলনায় অধিকতর সন্তান-স্নেহাতুরা। লাউসেন যখন গৌড়যাত্রা করিবার অনুমতি চাহিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত কৌশলে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিয়া মাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন,—

বরঞ্চ এমন কেহ মহামল্ল থাকে।
বিক্রমে বাছারে মোর খোঁড়া করি রাখে।।
চরণ ভাঙ্গিলে ঘুচে গমনের আশ।
ঘরে বসি চাঁদমুখ দেখি বারমাস।।

সমগ্র মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে মাতৃস্নেহের এমন শোচনীয় দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না। একটা গতানুগতিকতার প্রভাববশত ধর্মমঙ্গলের কবিগণ রাজমহিষী ও বীরমাতা রঞ্জাবতীর চরিত্র এত হীনভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, —পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই কাব্যের কবিগণ এতদ্দেশের জাতীয় চরিত্র সৃষ্টিতে যে অসীম কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। নিম্নলিখিত কয়েকটি স্ত্রী-চরিত্রই তাহার প্রমাণ।

কেবলমাত্র রাজোচিত আভিজাত্য রক্ষা করিয়া কোন উচ্চাদর্শের চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা যে ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের ছিল না, রঞ্জাবতীর দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা বলিবার উপায় নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, রঞ্জার চরিত্রটি গতানুগতিকতার অনুকরণে বিনষ্ট হইয়াছে, নতুবা কামরূপের রাজমহিষীর সংক্ষিপ্ত একটি চরিত্র কি অপূর্ব হইয়া ফুটিয়াছে, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কামরূপরাজ কর্পূরধবল লাউসেনের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া নিজের কন্যা তাঁহার নিকট বিবাহ দিয়া দীনতা স্বীকার করিতে চাহিলেন, শুনিয়া রাজমহিষী বলিলেন,—

রাণী বলে কুলের পদ্মিনী ওই বালা।
না করো মাথায় নাথ কলঙ্কের ডালা।।
এ' বড় অবনী জুড়ে অতিশয় লাজ।
পরাজয় হয়ে কন্যা দিলা মহারাজ।।
কলঙ্ক না করো কুলে কন্যা কর বই।
বরঞ্চ সকল ছেড়ে দেশান্তরী হই।।
কোথাকার বরে তুমি দিতে চাও ঝি।
বাপ হ'য়ে জলে ফেল আনে কবে কি।।

অবশ্য মঙ্গলকাব্যে প্রকৃত পুরুষ-চরিত্রের অভাব আছে; সেইজন্য রাণীর এই নিতান্ত সুযুক্তিপূর্ণ উদ্দীপনাময়ী বাণীও অরণ্যে রোদনের মত হইল—রাজা ইহাতে কর্ণপাত করিলেন না।

গৌড়েশ্বরের চরিত্রে পূর্বাপর সামঞ্জস্য সুন্দর রক্ষা পাইয়াছে। তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ, মন্ত্রীর হাতের পুতুল মাত্র। বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে এই অবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে; কারণ, তিনি বয়সে বৃদ্ধ, কোন বিষয়ে নিজে অগ্রসর হইয়া কিছু করিবেন, সেই ক্ষমতা নাই, —সেইজন্য মন্ত্রীর উপরই সকল বিষয়ে নির্ভর করিতে হয়। তিনি একটু স্ত্রৈণ প্রকৃতির লোক, কোন কোন সময় মন্ত্রীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়াও এই বলিয়া তাঁহার উপর কোন শাসন করিতে পারেন না যে, তিনি তাঁহার স্ত্রীর 'কুটুম্ব'।

অন্য যদি পাত্র হত পেত বড় লাব।
কলিকালে নারীর কুটুম্বে বড় ভাব।।

তবে তিনি ন্যায়পরায়ণ ও স্নেহশীল। সোমঘোষকে কারামুক্ত করিয়া দিয়া, লাউসেনকে তাহার যোগ্যতার জন্য বরাবরই পারিতোষিক দিয়া তিনি এই ন্যায়পরায়ণতা ও সৌজন্যেরই পরিচয় দিয়াছেন।

মহামদ পাত্রই ধর্মমঙ্গল কাব্যের খল-চরিত্র (villain)। কাব্যের সার্থকতার জন্য এই চরিত্রটির পরিকল্পনা বড় সুন্দর হইয়াছে। লাউসেনকে হতপ্রভ করিবার জন্য তিনি যত চক্রান্তের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিয়াই লাউসেনের পৌরুষ জীবন্ত রহিয়াছে, —এক মুহূর্তের জন্য স্তিমিত হইয়া পড়িতে দেয় নাই। স্বভাবতই ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিদিগের সহানুভূতি-বঞ্চিত এই চরিত্রটি নিজের মধ্যে নিজেই এক সুন্দর ও সুসঙ্গত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। চরিত্রটির আদ্যোপান্ত সামঞ্জস্যও সুন্দর রক্ষা পাইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, রাঢ়ের কতকগুলি জাতীয় স্ত্রীচরিত্র-পরিকল্পনায় ধর্মমঙ্গলের কবিগণ সমগ্র মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একটু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। লাউসেনের কোন কোন পত্নীর চরিত্রের মধ্যেও রাঢ়ের এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে প্রথমেই কানড়ার চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। কানড়া বীর রমণী। গৌড়েশ্বরের আক্রমণে পিতা সপরিবারে দুর্গত্যাগ করিয়া গেলেন. কিন্তু সে যোদ্ধাবেশ ধারণ করিয়া অশ্বারোহণে শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইল। বাঙ্গালী নারীর ইহা এক অভিনব পরিচয়। এই চিত্রের স্বাভাবিকতা অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে এখানে প্রশ্ন করিয়া কোন লাভ নাই, শুধু ইহাতে যে বাঙ্গালী স্ত্রী-চরিত্রের গতানুগতিকতা-বর্জিত নূতন একটা দিকের সন্ধান পাইলাম, তাহার কথাই উল্লেখ করিতেছি।

কানড়ার হৃদয়ে ধর্মমঙ্গলের কবিগণ এক অপূর্ব দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন— যাহাকে সে আশৈশব পতিরূপে কামনা করিয়াছে, সেই আজ যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার প্রতিপক্ষের সেনাপতি হইয়া তাহারই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। রণক্ষেত্রে লাউসেনের নিকট কানড়া এইভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করিল,—

এতেক বলিল যদি ময়নার নাথ।
ঘুঁড়ি পিঠে কানড়া যুড়িল দুটি হাত।।
বার সাত অমনি চরণে দণ্ডবৎ।
বদনে বসন দূর করিল ঈষৎ।।
বলিতে লাগিল বালা বিনয় বচন।
শুন মহাশয় রায় মোর নিবেদন।।
হরিপাল দুহিতা আমি প্রমাদে পড়িয়া।
পিতামাতা ভাই বন্ধু গেল পলাইয়া।।
কানড়া আমার নাম স্বামী ভাবি তোমা।

পঞ্চম বৎসর হতে সেবি শিব উমা।।

মেসো গৌড়েশ্বর যাহাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন, তাহার মুখে এই কথা শুনিয়া লাউসেন কর্ণ রুদ্ধ করিলেন, কিন্তু অবশেষে প্রতিজ্ঞা করিতে বাধ্য হইলেন যে, 'বলে ধরে তোমারে পাঠাব রাজধানে। হারি যদি এখনি বিবাহ এইখানে।। শুনিয়া কানড়া বলিল,—

ভবানী ভাবিয়া বালা বলে ভালো ভালো।
কোপে বিধুবদন ঈষৎ হ'লো আলো।।
বলে ধ'রে নিতে পারে কার এ'ত বুক।
বলিতে বলিতে কোপে ধরিল ধনুক।।
এখন বাঁচাই নাথ অনুমতি দে।
না হয় দাসীর এক বাণ সয়ে নে।।
মরি যে তোমার হাতে মোক্ষ ফল পাব।
হানি যে তোমার শির সহমৃতা হব।।

সংস্কার ও কর্তব্যবুদ্ধির মধ্যবর্তী এই নারী চরিত্রটির সামান্য কয়টি মুখের কথায় এই যে অকৃত্রিম আন্তরিকতা প্রকাশ পাইয়াছে, সমগ্র মধ্যযুগের কাব্য-সাহিত্যে বুঝি তাহার তুলনা হয় না। এই চিত্র অঙ্কনে ধর্মমঙ্গলের কবিগণ কোন অমূলক আদর্শকে অনুসরণ করেন নাই বলিয়াই ইহার চিত্র এত জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে হয়।

নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলিকে ধর্মমঙ্গলের কবিগণ অপূর্ব মহিমামণ্ডিত করিয়া কল্পনা করিয়াছেন; ইহার কারণ, নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলিই ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। শৌর্যবীর্যে, কর্তব্যজ্ঞানে, ধর্মবুদ্ধিতে তাহাদের, যে কোন দিক দিয়া কোন অভাব নাই, বৈষম্যমূলক সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও সেই যুগের ব্রাহ্মণ কবিগণ ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই সমুন্নত ও উদার মানব-চরিত্রের পরিকল্পনাই ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির রাঢ়ের জাতীয় কাব্য হিসাবে সার্থকতার কারণ। অস্পৃশ্য ডোম জাতীয় চরিত্রের মধ্যেও যে কত মহত্ত্ব থাকিতে পারে, লাউসেনের সেনাপতি কালু ডোমের চরিত্রটিই তাহার প্রমাণ। অবশ্য এই চরিত্রটি রামায়ণের হনুমান-চরিত্রের উপর অনেকটা নির্ভর করিয়া রচিত, কিন্তু ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের কল্পনায় তাহা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লইয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। জাগরণ পালায় বিশ্বাসঘাতক বিভীষণ-কল্প কাম্বা ডোম যখন কালুকে সত্যে আবদ্ধ করিয়া তাহার মস্তক প্রার্থনা করিল, তখন কালু ডোম বলিল,—

কি করিব কোথা হ'তে পরকাল মজে।
এ পাপে পরশে পাছে সেন মহারাজে।।
এ পাপে না হয় পাছে পশ্চিম উদয়।

সেনের কঠোর সেবা পাছে ব্যর্থ হয়।।
সত্য না লঙ্ঘিনু আমি ইহার কারণ।
অতেব অধম তোর বাঁচিল জীবন।।

সরল প্রকৃতির মানব-মন হইতে উৎসারিত ধর্মবিশ্বাসের অতি স্বাভাবিক অভিব্যক্তি এই কথাগুলির মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে, ইহাতে আদর্শবাদের লেশ-মাত্রও নাই।

কালু ডোমের পত্নী লখাইর চরিত্রেও অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নারীর বাঙ্গালী-সুলভ স্বাভাবিক মনোবৃত্তিগুলির ইহাতে বিকাশ লাভ সম্ভব হয় নাই। কর্তব্যের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিগত হৃদয়-বেদনা পুরুষের মত নারীও যে অনেক সময় বলি দিতে সক্ষম হয়, ধর্মমঙ্গল কাব্যের এই চরিত্রগুলিই তাহার প্রমাণ। পূর্বেই বলিয়াছি, ধর্মমঙ্গলে পুরুষ-চরিত্রের চরম অবমাননা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার স্থলে নারী-চরিত্রই মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। ময়নানগর শত্রু আক্রমণ করিয়াছে, লাউসেন নগরে অনুপস্থিত। কালুর হস্তে নগরের ভার অর্পিত আছে, কিন্তু কালু মায়া-নিদ্রায় অভিভূত। তখন লখাই স্বামীর কর্তব্যভার নিজে গ্রহণ করিল। পুত্রকে যুদ্ধে যাইবার জন্য বলিল, কিন্তু পুত্র অস্বীকৃত হইল। লখাই বলিল—

মোর দুগ্ধ খেয়ে বেটা রণে ভীত হ'লি।
তু বেটা তখনি কেন হ'য়ে না মরিলি।।

স্ত্রী আসিয়া স্বামীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল,—

ময়ূরা বলেন নাথ তুমি কৈলে কি।
দেশের বিপত্তি এই শ্বশুরের সেই।
শাশুড়ী বিকল কাঁদে শত্রু দেশ লেই।।
মহাগুরুবচন রাজার লুন খেলে।
পাতক সঞ্চয় কেন কর বুক হেলে।।
জগতে জাগাবে যশ যদি জিন যেয়ে।
মর ত মুকুন্দ পাবে মুক্তিপদ পেয়ে।।

বাঙ্গালী নারী-চরিত্রের এই মহিমায় ধর্মমঙ্গল কাব্য সমুদ্ভাসিত। মাতা এবং স্ত্রীর ভর্ৎসনায় শাকা নিজের কর্তব্য বুঝিতে পারিয়া যুদ্ধযাত্রা করিল। যুদ্ধে সে নিহত হইল। তখন মাতা লখাইর আর এক মূর্তি দেখিতে পাই,—

শোয়ায়ে সোনার খাটে শাকায়ের শির।
ছোট পো শুকায় ডাকে চক্ষে বহে নীর।।

সমাজের অবহেলিত অস্পৃশ্য এবং অবজ্ঞাত স্ত্রী-পুরুষ চরিত্রের মধ্যে উন্নত চারিত্রিক আদর্শের সন্ধান করিয়া ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি একটি বিশেষ মর্যাদা লাভের অধিকারী হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

অন্নদা-মঙ্গল কাব্য (১৭৫৩)

ভারতচন্দ্র রায়

জীবনী

মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যযুগে ভারতচন্দ্র রায়ই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।[১] শুধু তাহাই নহে, ভারতচন্দ্র তাঁহার অসাধারণ শক্তিদ্বারা মঙ্গলকাব্যের বিধিনিয়মের গণ্ডীর মধ্যেও যে ইহার সর্বাঙ্গে এক অপূর্ব লাবণ্য সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত মধ্যযুগের সমগ্র কাব্যসাহিত্যের মধ্যে আর নাই। বৈষ্ণব কবিতার রসসিঞ্চন দ্বারা মঙ্গলকাব্যের রূপে এক অপূর্ব দীপ্তি দান করিয়া ভারতচন্দ্র নিতান্ত সাম্প্রদায়িক প্রেরণা-মূলক একটা বৈশিষ্ট্যহীন সাহিত্যের ভিতর হইতে উচ্চতর সাহিত্য-সৃষ্টির উপযোগী এক অপূর্ব ভাষার সন্ধান করিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দশ বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়া অন্যান্য প্রাচীন কবিদিগের সঙ্গে ভারতচন্দ্রেরও জীবন-কাহিনী সঙ্কলিত এবং তৎসম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত করেন। কতিপয় প্রামাণ্য লোকের কথাই প্রধানতঃ এই সমস্ত বৃত্তান্তের উপকরণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছিল। এ যাবৎকাল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের লেখকগণ ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বিবরণ সঙ্কলন করিবার কালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রদত্ত বিবরণীর উপরই নির্ভর করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত অন্যান্য দিক হইতেও বিচার করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে এবং সেই প্রচেষ্টা সম্প্রতি কিছু কিছু আরম্ভও হইয়াছে।

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বর্তমান বর্ধমান জেলার ভুরসুট বা ভুরিশ্রেষ্ঠ পরগণায় এক ব্রাহ্মণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠাতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র রায়। ইনি ফুলিয়ার মুখটি-বংশজাত। যে বংশে বাংলার আর এক প্রাচীন কবি কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, রাজা কৃষ্ণ রায় সেই বংশেরই সন্তান। রাজা কৃষ্ণ রায়ের মূল বংশ রাজা প্রতাপনারায়ণ নামে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভুরসুট পরগণায় তিনটি প্রধান গড় ছিল। ইহাদের মধ্যে ভবানীপুরের গড়ই প্রাচীনতম এবং রাজবংশের প্রধান শাখা এখানেই বাস করিত। ভুরসুট রাজ্যের দ্বিতীয় গড় ছিল পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো গ্রামে। রাজা কৃষ্ণ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র মহেন্দ্র রায় ও তাঁহার পর তাঁহারই বংশধরগণ এই গড়ের অধিকারী ছিলেন। জানিতে পারা যায় যে, সমগ্র ভুরসুট রাজ্যের ৯০ আনা অংশের ইঁহারা মালিক ছিলেন। ভুরসুট রাজ্যের তৃতীয় গড় দোগাছিয়ায় অবস্থিত ছিল। ইঁহারাও ৯০ আনা অংশে

১। ভারতচন্দ্র রায়, গ্রন্থাবলী (বসুমতী), ১৪শ সং।

মালিক ছিলেন। রাজা কৃষ্ণ রায়ের তৃতীয় পুত্র মুকুট রায় হইতে এই শাখার উৎপত্তি। রাজবংশের যে শাখা ভুরসুট রাজ্যের দ্বিতীয় গড় পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো গ্রামে অবস্থিত ছিল, সেই শাখাতেই কবি ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। ভারতচন্দ্রের পূর্বপুরুষের পরিচয় সম্বন্ধে এক কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়,—

'রাজা কৃষ্ণ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র মহেন্দ্র রায়, তৎসত গোপী রায় তৎসুতাঃ ভূপতিরায়-শ্যাম-জগজ্জীবন-প্রাণবল্লভ-নরোত্তম-জনার্দন-মধুসূদনাঃ ভূপতিরায়-সুতাঃ সদাশিব-চাকু-রাজবল্লভ-কিশোর-কন্দর্প-বাণেশ্বরাঃ। সদাশিবসুতাঃ নরেন্দ্রবংশী-কাশী-রসিক-শুকদেবাঃ। নরেন্দ্রসুতাঃ চতুর্ভুজ-অর্জুন-দয়ারাম-ভারতচরণাঃ। সাঃ পাণ্ডুয়া ভুরসুট্ট।'[১]

উদ্ধৃত কুলগ্রন্থে প্রদত্ত ভারতচন্দ্রের এই কুল-পরিচয় প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।[২] অতএব ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, ভুরসুট রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণ রায়ের প্রপৌত্র সদাশিব রায়ের পৌত্র ও নরেন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্ররূপে ভারত রায় জন্মগ্রহণ করেন।

ভারতচন্দ্রের জন্মকাল সম্বন্ধে মতবিরোধ দেখা যায়। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১১১৯ সন বা ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ ভারতচন্দ্রের জন্মকাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতচন্দ্র-রচিত সত্যপীরের কথার রচনাকাল ১১৩৪ সন[৩] বা ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দ; কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত এই হিসাবটিতে একটি ভুল করিয়াছিলেন এবং এই ভুলটিই এই যাবৎ কাল বিনা পরীক্ষায় প্রায় সকলে গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। শুদ্ধ হিসাবে উক্ত সত্যপীরের কথার রচনা-কাল হয় ১১৪৩ সাল বা ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দ। ঈশ্বর গুপ্ত উল্লেখ করিয়াছেন যে, কতিপয় প্রামাণিক লোকের কথানুসারে সত্যপীরের কথা রচনার সময়ে ভারতচন্দ্রের বয়স ছিল পনর বৎসর। কিন্তু ইহাও ঠিক নহে; কারণ, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুকালে বা ১৭৬০ খ্রীষ্টাবোদ, —যাহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যায়, —তাঁহার বয়স হয় মাত্র ৩৯ বৎসর। অথচ তিনি চল্লিশ বৎসর বয়সে যে 'নাগাষ্টক' রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন।[৪] এই সমস্ত কারণে ঈশ্বর গুপ্তের উক্তির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া নিরপেক্ষ বিচারে তাঁহার জন্মকাল স্থূলতঃ ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে নির্দেশ করা হইয়াছে।[৫] এই বিষয়ক সর্বশেষ প্রামাণিক আলোচনা হইতে জানা যায় যে, ভারতচন্দ্র ১১১৩ বঙ্গাব্দ

১। ঢা $\frac{\text{M3/38}}{7+8}$, ৩১৫ (খ)

২। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র ও ভুরসুট রাজবংশ সা-প-প ৪৮, ১৮৯-২০০; নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষে (৪,৩৩৬) এই কুলপঞ্জীর একটি স্বতন্ত্র পাঠ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহা যে ভুল তাহা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে (দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৯২)।

৩। সনে রুদ্রচৌগুণা, (ভারতচন্দ্র, ১৮৬) ইহার অর্থ—রুদ্র ১১, চৌ ৪ গুণ ৩, অর্থাৎ ১১৪৩ বাংলা সাল; ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইহাকে ১১৩৪ সন ধরিয়া ভুল হিসাব করিয়াছেন।

৪। ভারতচন্দ্র, ১৮৭

৫। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯০

অর্থাৎ ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে পাঁড়ুয়া ওরফে রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[১]

সেই সময়ে বর্ধমানের রাজা ছিলেন কীর্তিচাঁদ। প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে জানিতে পারা যায়, ভুরসুট রাজ্যের মূল শাখার তদানীন্তন রাজা লছমীনারায়ণের সহিত কীর্তিচন্দ্রের সদ্ভাব ছিল না; কীর্তিচন্দ্র কয়েকবার লছমীনারায়ণের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু লছমীনারায়ণ অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহা প্রতিহত করেন। তদবধিই কীর্তিচন্দ্র ভুরসুট রাজ্য জয় করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার 'রসমঞ্জরী'তে উল্লেখ করিয়াছেন,—

রাজবল্লভের কার্য, কীর্তিচন্দ্র নিল রাজ্য।[২]

এই রাজবল্লভ ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্র রায়ের পিতৃব্য বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। মনে হয়, রাজবল্লভ জ্ঞাতি-শত্রুতার বশবর্তী হইয়া কীর্তিচন্দ্রের সহায়ক হন; তাহারই ফলে ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দ বর্ধমানরাজ কীর্তিচাঁদ ভুরসুট আক্রমণ করিয়া ভবানীপুরের গড় অধিকার করেন। ভুরসুট রাজ্যের অধিকৃত পাণ্ডুয়া বা পেঁড়োও কীর্তিচন্দ্রের রাজ্যভুক্ত হয়। নরেন্দ্র রায় হৃত-সর্বস্ব হইয়া পড়েন। ভারতচন্দ্র ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গলঘাট পরগণার অধীন গাজিপুরের নিকটবর্তী নওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে পলাইয়া যান। তথায় বাসকালীন তিনি নিকটবর্তী তাজপুর গ্রামে এক সংস্কৃত টোলে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ করেন এবং মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাজপুরের নিকটবর্তী সারদা গ্রামের কেশরকুণি আচার্যদের একটি বালিকা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পাঠাভ্যাসও সমাপ্ত হয়, তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। সেকালে পারসী শিক্ষা না করিলে সামান্য কর্মও কেহ লাভ করিতে পারিত না। তিনি একমাত্র সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অগ্রজগণ তাঁহাকে অনুযোগ দেন। তাহার উপর অভিভাবকগণ তাঁহার বিবাহের জন্যও অপ্রসন্ন ছিলেন। সেইজন্যও নানাভাবেই তাঁহারা তাঁহার উপর বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে অভিমানাহত হইয়া ভারতচন্দ্র একদিন বাটী হইতে পলাইয়া যান এবং হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুর নিবাসী রামচন্দ্র মুন্সীর বাটীতে আশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহার নিকট পারসী শিক্ষায় মনোনীবেশ করেন। রামচন্দ্র মুন্সী জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, তিনি বালকের আগ্রহ দেখিয়া স্বগৃহে রাখিয়া তাঁহাকে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একদিন মুন্সীর গৃহে সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষে ভারতচন্দ্রকে পাঁচালী পড়িবার জন্য বলা হইল।[৩]

১। সা-প-প- ৫৯, পৃ, ৫২

২। ভারতচন্দ্র, ১৭০

৩। ভারতচন্দ্র দেবানন্দপুর বাসকালীন সত্যনারায়ণের উপর দুইটি পাঁচালী রচনা করিয়া ছিলেন (হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, ২০৪)। প্রথমটি চৌপদী ছন্দে রচিত, দ্বিতীয়টি ত্রিপদী ছন্দে রচিত। প্রথমটির রচনাকালে তাঁহার নায়ক অর্থাৎ আশ্রয়দাতা ছিলেন হীরারাম রায়; দেবানন্দপুরের মুন্‌শীবংশেই হীরারাম রায় নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। প্রথম রচনাটিতে তাহারই নাম রহিয়াছে, দ্বিতীয় রচনাটিতে রামচন্দ্র মুন্‌শীর নাম উল্লেখিত হইয়াছে। (দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সা-প-প ৪৯, পৃ-৪৯)

ভারতচন্দ্র তাহাতে স্বরচিত পাঁচালী পাঠ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। ইহাই তাঁহার সর্বপ্রথম রচনা। তাহাতে এইভাবে তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন,

ভরদ্বাজ অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ,
সদা ভাবে হতকংশ, ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতীযুত
ফুলের মুখুটি খ্যাত দ্বিজপদে সুমতি।।
দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর নাম
তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুন্সী।
ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায়
হয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী।।
সবে কৈল অনুমতি সংক্ষেপে করিতে পুঁথি
তেমনি করিয়া গতি, না করিও দূষণা।
গোষ্ঠীর সহিত তাঁয়, হরি হোন্ বরদায়,
ব্রত কথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা।।

১১২৪ বঙ্গাব্দ হইতে ১১৪৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতচন্দ্র পাঠদ্দশায় অতিবাহিত করেন। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পারসী ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়া ভারতচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অগ্রজের এইবার তাঁহার যথোপযুক্ত বিদ্যালাভ হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, তাঁহাদের সম্পত্তি-সম্পর্কিত কোন ব্যাপারের তদ্বির করিবার জন্য তাঁহাকে বর্ধমান রাজসরকারের প্রেরণ করিলেন। এই কার্য উপলক্ষে তিনি ১৭৩৯-৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধমানে বাস করেন। কিন্তু এই কার্যে কোন গোলযোগের জন্য বর্ধমানরাজ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। কারারক্ষীকে উৎকোচ দিয়া ভারতচন্দ্র কারাগার হইতে পলাইয়া যান, একেবারে বর্ধমানরাজের রাজ্যের সীমানার বাহিরে উড়িষ্যার অন্তর্গত কটকে গিয়া উপস্থিত হন। তখন তাঁহার একমাত্র সঙ্গী এক নাপিত ভৃত্য, তাহার নাম রঘুনাথ। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি উড়িষ্যা ভ্রমণ করেন। কটকের তদানীন্তন মহারাষ্ট্র সুবাদার শিবভট্ট তাঁহাকে শ্রীক্ষেত্রে গিয়া বাস করিবার অনুমতি প্রদান করেন। শ্রীক্ষেত্রে তিনি এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতে থাকেন। একদা এই সন্ন্যাসীর দলের সহিত তিনি বৃন্দাবন যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে হুগলী জিলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেই গ্রামেই তাঁহার শ্যালিকা-পতির নিবাস ছিল। তাঁহারা ভারতচন্দ্রকে চিনিতে পারিয়া অনেক অনুরোধ দ্বারা তাঁহার সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করাইলেন। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি অজ্ঞাতবাস করেন। অতঃপর তিনি শ্বশুরালয়ে গিয়া তাঁহার পত্নীকেও দেশ হইতে আনাইয়া কিছুকাল সেখানেই বাস করিলেন। তারপর পত্নীকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া কর্মের সন্ধানে বাহির হইলেন। ফরাস-

ডাঙ্গায় তখন প্রসিদ্ধ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ফরাসী সরকারের দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ অত্যন্ত গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। তিনি ভারতচন্দ্রের কবিত্ব-গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ১১৫৩ বঙ্গাব্দ বা ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কাব্যালোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে ৪০ টাকা বেতন নির্ধারণ করিয়া দিয়া তাঁহার সভাকবি নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারই আদেশে ভারতচন্দ্র তাঁহার প্রসিদ্ধ 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। গুণগ্রাহী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে 'গুণাকর' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। এতদ্ব্যতীত গঙ্গাতীরবর্তী মূলাযোড় গ্রাম তাঁহাকে সামান্য খাজনায় প্রথমতঃ ইজারা দেন; পরে মূলাযোড়ের ১৬ বিঘা ভূমি এবং তাহার সন্নিকটবর্তী গুস্তে গ্রামের ১০৫ বিঘা জমি তাঁহার নামে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর দান করেন। ১১৫৬ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র মূলাযোড় গ্রামে বসবাস করিবার উদ্দেশ্যে বাটী নির্মাণ করেন। বর্ধমানের মহারাণীর অনুরোধে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মূলাযোড় গ্রাম মহারাণীকে পত্তনে দেন এবং মহারাণী রামদেব নাগ নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহার রাজস্ব আদায়ের ভার দেন। রামদেব নাগ রাজস্ব আদায়ে বড়ই কঠোরতার পরিচয় দিতেন, প্রজাদের উপর নানারকম অত্যাচার করিতেন। রামদেব নাগের অত্যাচারের কথা বিবৃত করিয়া ভারতচন্দ্র ১১৫৭ বঙ্গাব্দ বা ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে 'নাগাষ্টক' নামক দ্ব্যর্থবোধক এক কাব্য রচনা করেন এবং তাহা কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার প্রদান করেন। কৃষ্ণচন্দ্র ইহার লিপি-কৌশলের উচ্চ প্রশংসা করেন এবং ইহার অর্থ উপলব্ধি করিয়া রামদেব নাগের অত্যাচার নিবারণ করিবার ব্যবস্থা করেন। ৪০ বৎসর বয়সে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় যান এবং সম্ভবতঃ ৪৮ বৎসর বয়সে ১১৬৭ বঙ্গাব্দ বা ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বহুমূত্র রোগে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে; তন্মধ্যে প্রথম পরীক্ষিৎ রায়, দ্বিতীয় রামতনু রায় ও কনিষ্ঠ ভগবান রায়। প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রের বংশ লোপ পাইয়াছে, তৃতীয় পুত্রের বংশধরগণ অদ্যাপি মূলাযোড় গ্রামে বসবাস করিতেছেন। তাঁহাদের অবস্থাও বেশ সচ্ছল। ভারতচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধে আর কিছু জানিতে পারা যায় না।

ভারতচন্দ্র যখন বাংলা দেশে আবির্ভূত হন, তখন খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পুরাতন যুগকে বিদায় দিয়া নূতন যুগে পদার্পণ করিতেছে; এই যুগসন্ধিক্ষণে ভারতচন্দ্র আবির্ভূত হইয়া তাঁহার কাব্যে যুগের রূপটি ধারণ করিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেশ হইতে মুসলমান শাসনের অবসান ঘটিল। সাগরপার হইতে আগত বিদেশী বণিক বাংলার শাসনভার অধিকার করিবার সময় আসন্ন হইল। মুসলমান আমলের চাকচিক্যময় বিলাসী সমাজ-সভ্যতার পতনের শেষ ক্ষীয়মাণ দীপ্তি তৎকালীন সমাজের উপর আপনার বিলীয়মান প্রভাবের অন্তিম প্রহর ঘোষণা করিল। অপর পক্ষে ইংরেজ বণিকের অনুগ্রহ-পুষ্ট হইয়া দেশে এক নূতন অভিজাত ধনি-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে লাগিল। সমাজে তখনও পুরাতন ধারার রেশ রহিয়াছে, কিন্তু ভাঙনের মুখে সমাজের শাসন নাই, চারিদিকে অন্ধ উচ্ছৃঙ্খলতা, প্রবৃত্তির অবারিত উন্মত্ত রাজত্ব করিতেছে। প্রবৃত্তির এই নিম্নাভিমুখী গতি ভারতচন্দ্রকে

গ্রাস করিয়াছিল। কবি তাঁহার অপূর্ব ক্ষমতা মহত্ত্বের প্রয়োজন সাধনে নিয়োগ করিতে পারিলেন না। তৎকালীন সমাজরুচিকে আশ্রয় করিয়াই তিনি আত্মপ্রকাশ করিলেন।

'অন্নদা-মঙ্গল' রচনার পূর্বেই ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি ১১৫৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে ১৬৭৪ শকাব্দ বা ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্য রচনা সম্পূর্ণ করেন,—

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা।।

'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্য তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এই তিন খণ্ড তিনটি স্বতন্ত্র কাব্য, মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডীর অনুকরণে ভারতচন্দ্র প্রথম খণ্ড রচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে ইহারই নাম 'অন্নদা-মঙ্গল' বা 'অন্নপূর্ণা-মঙ্গল'। দ্বিতীয় খণ্ডে কালিকা-মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের কথা অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে মানসিংহের বাংলা আক্রমণ ও প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

'অন্নপূর্ণা মঙ্গল'

অন্নদা মঙ্গলের প্রথম খণ্ডে প্রথমেই পঞ্চদেবতা ও লক্ষ্মী, সরস্বতী ও অন্নপূর্ণার বন্দনা, গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে, কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-বর্ণনা, সতীর দক্ষালয় গমনোদ্যোগ, সতীর দক্ষালয় গমন, শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ, শিবের দক্ষালয় যাত্রা, দক্ষযজ্ঞনাশ, প্রসূতির স্তবে দক্ষের পুনর্জীবন লাভ, একান্ন পীঠের বর্ণনা, শিব বিবাহের মন্ত্রণা, নারদ কর্তৃক শিবের বিবাহ-সম্বন্ধ, শিবের ধ্যানভঙ্গ ও মদনভস্ম, রতি-বিলাপ, রতির প্রতি দৈববাণী, শিবের হিমালয় যাত্রা, শিবের বিবাহ, শিব নিন্দা, শিবের মোহিনী-মূর্তি ধারণ, সিদ্ধি-ভক্ষণ, হর-গৌরীর কথোপকথন, হরগৌরীর রূপ, কৈলাস-বর্ণন, হর-গৌরীর বিবাদ-সূচনা, হর-গৌরীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্যোগ, সখী জয়ার উপদেশ, দেবীর অন্নপূর্ণা মূর্তিধারণ, শিবের ভিক্ষায় যাত্রা, ভিক্ষুক শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ, শিবকে অন্নদান, অন্নপূর্ণা-মাহাত্ম্য, শিবের কাশী-বিষয়ক চিন্তা, বিশ্বকর্মার প্রতি পুরী নির্মাণের অনুমতি, অন্নপূর্ণার পুরী নির্মাণ, দেবগণের নিমন্ত্রণ, শিবের পঞ্চতপ, ব্রহ্মাদি দেবগণের তপ, অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান, শিবের অন্নদাপূজা, অন্নদার বরদান, ব্যাসের পরিচয়, বেদব্যাস কর্তৃক শিবপূজা নিষেধ, শিব-স্তোত্র, ঋষিগণের কাশীযাত্রা, হরি-সঙ্কীর্তন, ব্যাসের শিবানন্দা, ব্যাসের ভিক্ষা বারণ, কাশীবাসী লোকের প্রতি বেদব্যাসের শাপ, অন্নদার মোহিনী রূপ, শিব ও ব্যাসের কথোপকথন, ব্যাসের দ্বিতীয় কাশী নির্মাণের উদ্যোগ, গঙ্গাকর্তৃক ব্যাসের অভ্যর্থনা, ব্যাসের কৃত গঙ্গার তিরস্কার, গঙ্গাকৃত ব্যাসের তিরস্কার, বিশ্বকর্মার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা, ব্যাস ও ব্রহ্মার কথোপকথন, ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চল্য, অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসকে ছলনা, ব্যাসের প্রতি দৈববাণী, কুবেরের পুত্র বসুন্ধরের প্রতি অন্নদার শাপ, বসুন্ধরের বিনয়, অন্নদার শাপে বসুন্ধরের মর্ত্যলোকে জন্ম, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, হরিহোড়ের প্রতি অন্নদার দয়া, হরিহোড়ের প্রতি বর

দান, বসুন্ধরার জন্ম, কুবেরের অন্যতম পুত্র নলকুবেরের প্রতি অন্নদার শাপ, মর্ত্যলোকে নলকুবেরের ভবানন্দ মজুমদার রূপে জন্ম, অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা ইত্যাদি বিষয় ক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর অনুকরণেই অন্নদা-মঙ্গলের প্রথম খণ্ড রচিত হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর পৌরাণিক অংশ ও অন্নদা-মঙ্গলের পৌরাণিক অংশ প্রায় অভিন্ন, কিন্তু উভয় কাহিনীর লৌকিক অংশে পার্থক্য রহিয়াছে। অন্নদা-মঙ্গলের লৌকিক অংশ কাব্যের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অপ্রধান অংশ মাত্র। ইহাতে হরিহোড়ের প্রতি চণ্ডীর অহৈতুকী দয়া, তাহাকে বরদান ও পরে তাহাকে অন্যায় ভাবে পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার ভবনে যাত্রা ইত্যাদির কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই লৌকিক কাহিনীটুকু কাব্যের যে অল্পপরিসর স্থান গ্রহণ করিয়া আছে, তাহার মধ্যে চরিত্রসৃষ্টি যেমন সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই, তেমনই কাহিনীও সুপরিস্ফূট হইয়া উঠিতে পারে নাই। 'অন্নদা-মঙ্গল' প্রথম খণ্ডের এই লৌকিক অংশটুকুই কাহিনীর দিক দিয়া একটু মৌলিকতা দাবী করিতে পারে।

অন্নপূর্ণা নরলোকে তাঁহার পূজা প্রচারের সঙ্কল্প করিয়া জয়া-বিজয়াকে ইহার উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন জয়া-বিজয়া বলিলেন, কুবের তোমার পূজা করিতে চাহিলে অনুচর বসুন্ধরের উপর ফুল তুলিবার ভার দিবে, কিন্তু তাহার পুষ্পবনে রমণীসম্ভোগ হেতু তুমি তাহাকে মনুষ্য জন্ম লাভ করিবার জন্য অভিশাপ দিবে। সে মর্ত্যলোকে হরিহোড় নামে জন্মগ্রহণ করিবে। তুমি তাহাকে ধন-প্রাপ্তির বর দিবে, তাহা হইলে তোমার পূজার প্রচার হইবে। কুবেরের পুত্রকেও তুমি শাপ দিবে, সে ভবানন্দ নামে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবে। হরিহোড়কে পরিত্যাগ করিয়া তুমি তার গৃহে যাইবে। তাহা দ্বারা তোমার পূজার প্রচার হইবে। তাহার বংশে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবে, তাহা হইতেই তোমার পূজার ব্যাপক প্রচার হইবে। বিজয়া-জয়ার পরামর্শ মত অন্নপূর্ণা তাহাই করিলেন, ফলে মর্ত্যলোকে তাঁহার পূজার প্রচার হইল।

বসুন্ধরের কাহিনীটি একটু বিস্তৃত ভাবে বলা আবশ্যক—বাংলাদেশের বাগুয়ান পরগণার বড়গাছি গ্রামে অন্নদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি জয়াকে বলিলেন, 'এ গ্রামে কে বড় দুঃখী দেখহ ভাবিয়া।' তার ঘরেই আমার বসুন্ধরকে জন্ম দিব। প্রথমে দুঃখ দিয়া পশ্চাৎ তাহাকে সুখী করিব। এমন সময় এক দরিদ্রা নারীকে দেখিলেন, তাহার নাম পদ্মিনী, সংকায়স্ত বংশের বধূ, কিন্তু দারিদ্র্যের অবধি নাই।

বড়ই দুঃখিনী এই অন্নদা জানিলা।
কাছে গিয়া আপনি যাচিয়া বর দিলা।।

যথাকালে তাহার গর্ভে বসুন্ধরের জন্ম হইল। বসুন্ধরের নাম হইল হরিহোড়। একদিন হরিহোড় ঘুঁটে কুড়াইতে বাহির হইয়া একটিও ঘুঁটে পাইল না। অবশেষে এক বৃদ্ধার দেখা

পাইল, তাহার অনেক ঘুঁটে সংগ্রহ হইয়াছে। বৃদ্ধা হরিহোলকে ঘুঁটেগুলি বহিতে বলিল। সন্ধ্যা আসন্ন দেখিয়া নিকটেই হরিহোড়ের ঘরে গিয়া ঘুঁটে সহ বৃদ্ধা আশ্রয় লইল। বলিল, আজ রাত্রে এখানে থাকিব। হরিহোড় প্রমাদ গণিল, একমুঠ খুদ নাই, কি দিয়া অতিথির সেবা করিবে। থাকিবার ঠাঁইও নাই। 'ভাঙ্গা কুড়ে ছাওয়া পাতে, বৃদ্ধ পিতামাতা তাতে, ঠাঁই নাহি হয় চারিজনে।' শেষ পর্যন্ত অন্নদা বলিলেন, 'দুঃখ দেখি আসিয়াছি তোরে দিতে বর।' হরিহোড় ধন লইবার আগে দেবীকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইল, আমি বিদায় না দিলে তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। অন্নদা স্বীকৃতা হইলেন। অন্নদা এবার স্থির করিলেন, কুবের-পুত্রকে মর্ত্যে জন্ম দিবেন, বসুন্ধরকে স্বর্গে পাঠাইয়া দিবেন। কুবেরের পুত্র নলকুবেরকে অভিশাপ দিয়া তিনি ভবানন্দ রূপে মর্ত্যে জন্ম দিলেন। তারপর একদিন হরিহোড়কে ছলনা করিয়া ভবানন্দ-গৃহে উপস্থিত হইলেন।

মুকুন্দরামের প্রায় সমসাময়িক কাল হইতেই মঙ্গলকাব্যগুলির উপর সংস্কৃত পুরাণগুলির প্রভাব ব্যাপকভাবে আসিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। মুকুন্দরাম নিজে 'বিচারিয়া অনেক পুরাণ' তাঁহার কাব্য-রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার মূল কাহিনীকে পৌরাণিক প্রভাব দ্বারা আচ্ছন্ন হইতে দেন নাই।

ভারতচন্দ্রের উপরও এই সংস্কৃত পুরাণগুলির বিশেষ প্রভাব বর্তমান ছিল। সংস্কৃত পুরাণের প্রভাবের ফলেই মুকুন্দরামের চণ্ডী ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল কাব্যে অন্নদায় পরিণত হইয়াছেন। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বাংলার লৌকিক শক্তি-দেবতাদিগের ভয়ঙ্করী (malignant) প্রকৃতি কালক্রমে শুভঙ্করী (beneficent) প্রকৃতিতে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। বাংলা মঙ্গলকাব্যের উপর পরবর্তী কালে পৌরাণিক প্রভাব ইহার অন্যতম কারণ। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল হইতে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গলে' যে সকল স্থানে কাহিনীর দিক দিয়া স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়, তাহাদের সমস্তই তাঁহার সংস্কৃত পুরাণ-ভিত্তিক রচনা। ভারতচন্দ্রের এই বিষয়ে কোনও মৌলিকতা নাই। লৌকিক মঙ্গলচণ্ডীর আখ্যায়িকার অসংলগ্ন চিত্রগুলি ইতিপূর্বেও সমাজে গভীর রেখাপাত করিতে পারে নাই; সেইজন্য সংস্কৃত পৌরাণিক কাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া ভারতচন্দ্র অতি সহজেই তাহাদের অস্তিত্ব এই সমাজ হইতে মুছিয়া দিবার প্রয়াস পাইলেন।

ভারতচন্দ্র তাঁহার সংস্কৃত-জ্ঞান সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন,

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক।
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারশী।

ভারতচন্দ্র তাঁহার এই বহুমুখী জ্ঞান অন্নদা-মঙ্গল কাব্য রচনায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তথাপি এই কাব্য-রচনায় কয়েকটি সংস্কৃত পুরাণের ঋণ তিনি বিশেষভাবে স্বীকার করিয়াছেন, —প্রথমতঃ তিনি একান্ন পীঠ বর্ণনায় 'মন্ত্র-চূড়ামণি-তন্ত্রে'র সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া

স্বীকার করিয়াছেন,

একমত না হয় পুরাণমত যত।
আমি কহি মন্ত্র চূড়ামণিতন্ত্র মত।।

ব্যাসের শিবনিন্দাব কাহিনী মুকুন্দরামের চণ্ডীতে নাই। এই অংশ রচনায় তিনি স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীর মাহাত্ম্যসূচক অংশ 'কাশীখণ্ড' হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন,—

শঙ্করে বিস্তর স্তুতি করিলেন ব্যাস।
কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ।।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশীর মাহাত্ম্যসূচক 'কাশীখণ্ড' নামক 'স্কন্দপুরাণে'র অংশবিশেষের কতকগুলি বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্য-রচনায় সমসাময়িক প্রভাবকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের এই সর্বতোমুখী জ্ঞান তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ কবিত্ব-গুণের সহিত সুন্দর সমাঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই রচনার আভ্যন্তরীণ মৌলিকতার অভাব সত্ত্বেও তাঁহার কাব্য বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। তবে এই কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, 'অন্নদা-মঙ্গলে'র প্রথম খণ্ড কৃত্রিম পৌরাণিক আবহাওয়ার মধ্যে পরিপুষ্ট হইয়াছে বলিয়াই ইহার মধ্যে বাস্তব চরিত্রসৃষ্টি সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। ইহার মধ্যে দুই-একটি অতি সাধারণ চরিত্রে একটু বাস্তবতার সম্পর্ক আছে। কিন্তু তাহাদের কেহই প্রধান চরিত্র নহে; তাহারা কাব্যের সামান্য অংশ মাত্র অধিকার করিয়া আছে। তাহাদের একটি ঈশ্বরী পাটনীর চরিত্র। এই চরিত্রটিই সমগ্র কাহিনীর মধ্যে একটু বাস্তবধর্মী, কিন্তু এই চরিত্রটি মূল কাহিনীর মধ্যে যেমন অতি সামান্য অংশ অধিকার করিয়া আছে, তেমনই ইহা মূল কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়াও ইহার বাস্তব-পরিকল্পনা দ্বারা সমগ্রভাবে কাব্যের কোন মর্যাদা বৃদ্ধি পায় নাই।

এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরী পাটনীকে কেহ কেহ পুরুষ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্য নহে। ঈশ্বরী পাটনীর এই চিত্রটি ভারতচন্দ্রের মৌলিক কল্পনার ফল নহে, ইহা মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্য—বিশেষতঃ মনসামঙ্গলকাব্যে এই প্রকার ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া আত্মপরিচয় দিয়া খেয়া পার হইবার কথা আছে, তাহাতে স্পষ্টতঃই পাটনীকে খেয়ানী এবং ডোম্‌নী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলে আছে,—

ঘাটে দাঁড়াইয়া দেবী মনে মনে পাঁচে।
হাসিতে হাসিতে গেলা ডোম্‌নীর কাছে।।
কপট করিয়া সাঁচা মিছা কথা কই।
এক নাম জানিয়া তাহারে বলে সই।।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বত্রই ডোমনী খেয়া-পারাপারকারিণী; একদিন বাংলাদেশের ডোম নারীই এই কাজ করিত; ভারতচন্দ্র তাহারই ঈশ্বরী নামকরণ করিয়াছেন।

অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত কথায় গভীরতম ভাবদ্যোতক প্রবচনের মত এক-একটি পদ রচনা করিতে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের তুলনা নাই। ভাষার উপর কতখানি অধিকার থাকিলে ভাবপ্রকাশ এত সংক্ষিপ্ত ও সরল হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার 'অন্নদা-মঙ্গলে'র নিম্নোদ্ধৃত পদগুলি খনার বচনের মত শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিত্যব্যবহার্য হইয়া রহিয়াছে; প্রাচীন কি আধুনিক, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসে এমন গৌরব আর কেহ লাভ করিতে পারেন নাই। 'অন্নদা-মঙ্গলে'র প্রথম খণ্ড হইতে আমি মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি,—

১। নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ?
২। বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে।
৩। হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।
৪। বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির।
৫। খুএগ তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত।
৬। মাতঙ্গ পড়িলে গড়ে পতঙ্গ প্রহার করে।
৭। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। ইত্যাদি

ইহা হইতে ভারতচন্দ্রের কাব্যের লোক-প্রিয়তারও কতক আভাস পাওয়া যাইবে।

ভারতচন্দ্রের ভাষার ঐশ্বর্য অতুলনীয়। সংস্কৃত, পারসী ও প্রাকৃত বাংলা শব্দের সুন্দর সমন্বয় দ্বারা তিনি ভাষার যে শুধু লাবণ্যই বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা নহে— তাঁহার অপূর্ব শব্দবিন্যাস-নৈপুণ্য দ্বারা তাহার মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ গতিবেগ দান করিয়াছেন, —তাহা যেন নিজের কাকলিতে নিজেই মুখর। এইজন্যই তাঁহার রচনার কোন অংশই জড়তাপ্রাপ্ত হইয়া কাব্যদেহকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে নাই। ভারতচন্দ্রের এই সুমার্জিত ভাষাই রাজসভার উপযুক্ত ভাষা হইল; বঙ্গভাষা সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ গ্রাম্যতামুক্ত হইয়া উচ্চতর সাহিত্যিক ভাষার উপযোগিতা লাভ করিল; বহিরঙ্গ-গঠনে সর্বপ্রথম বাংলা কাব্য উচ্চতর রূপ-গরিমা লাভ করিল। মুকুন্দরামের কবিকল্পনা বাংলার ধূলিমাটিতে সমাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু ভারতচন্দ্র সেই ধূলিমাটির উপাদান লইয়া তাজমহল রচনার স্বপ্ন দেখিলেন।

ভারতচন্দ্রের ভাষার মূলে বৈষ্ণব কবিতার দান কখনই উপক্ষেণীয় নহে; বাংলা ভাষা সর্বপ্রথম বৈষ্ণব কবিতার ভিতর দিয়াই সুমার্জিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহা হইতেই ভারতচন্দ্রের ভাষায় তাহার পরিণতি অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের অসীম পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃত বাংলার সুন্দর এবং সহজ শব্দগুলিকে তিনি তাঁহার কাব্য রচনা-কালে উপেক্ষা করেন নাই। এই শব্দগুলি নৈপুণ্যের সহিত মধ্যে মধ্যে তিনি এমনভাবে ব্যবহার করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা ভাষায় গ্রাম্যতা সৃষ্টি করা দূরে থাকুক, বরং ভাব প্রকাশ আরও

প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অপূর্ব শব্দ-যন্ত্রী ভারতচন্দ্র রতি-বিলাপের মধ্যে সংস্কৃত শব্দগুলিকেও এমনভাবে সাজাইয়াছেন যে, তাহা পড়িতে পড়িতে একটি বীণার ঝঙ্কার কানের নিকট বাজিয়া উঠিতে শোনা যায়। কিন্তু ইহাও স্বীকার্য যে, তাহা কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিতে পারে না,—

শিব শিব শিব নাম, সবে বলে শিবধাম, বামদেব আমার কপালে।
একের কপালে রহি, আরের কপাল দহি, আগুনের কপালে আগুন।
চরণ রাজীব-রাজে, মনঃশিলা পাছে বাজে, হৃদে ধরি লহ রে বহিয়া

যে সংস্কৃত শব্দ রামপ্রসাদ প্রমুখ কবিদিগের রচনায় ভার স্বরূপ এবং কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতিপ্রবাহের মধ্যে দুস্তর বাধার সৃষ্টি করিয়াছে, সেই সংস্কৃত শব্দেরই শুধু প্রয়োগ-কৌশলদ্বারা ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যে অপরূপ সৌষ্ঠব দান করিয়াছেন, মৌলিকতাহীন কাহিনীর আশ্রয় লইয়াও নিজের রচনাবৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

কিন্তু এ কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গলে' মুকুন্দরামের চণ্ডী-মঙ্গলের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। শুধু কাহিনী কেন—স্থানে স্থানে ভাষার দিক দিয়াও মুকুন্দরামের নিকট ভারতচন্দ্রের যে অসীম ঋণ রহিয়াছে, তাহা বিস্মৃত হইবার উপায় থাকে না। তবে পার্থক্যের মধ্যে এই যে, অত্যন্ত সহজ ও নিরলঙ্কার ভাষার মুকুন্দরাম যে কথাটি প্রকাশ করিতেন, ভারতচন্দ্র তাহাই নিজের পাণ্ডিত্য দ্বারা সুমার্জিত করিয়া লইতেন মাত্র। অনেকে মুকুন্দরামের নিকট ভারতচন্দ্রের এই ঋণের মাত্রা এত অধিক মনে করেন যে, তাঁহারা ভারতচন্দ্রকে তাঁহার কাব্যের জন্য প্রায় কোন মর্যাদা দান করিতেই কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকেন। মনীষী স্বর্গত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, 'গুণাকর পত্রে পত্রে কবিকঙ্কণের নিকট ঋণী। কবিকঙ্কণের কবিত্ব পত্রে পত্রে নকল করিয়াছেন, কবিকঙ্কণের স্বাভাবিক সুন্দর বর্ণনাগুলি অলঙ্কার দিয়া কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। কবিকঙ্কণের কাব্য সরল, স্বাভাবিক ও সুখপাঠ্য; গুণাকরের কাব্য অধিকতর সুললিত, কিন্তু অস্বাভাবিক এবং স্থানে স্থানে অপাঠ্য'।[১]

ভারতচন্দ্র যে ভাবে মুকুন্দরাম হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ নিদর্শন দেওয়া প্রয়োজন বিবেচনা করি।

সতী দক্ষালয়ে যাইবার নিমিত্ত পতির নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন; মুকুন্দরাম এই সম্পর্কে অত্যন্ত সহজ কথায় প্রকাশ করিয়াছেন,

অনুমতি দেহ হর, যাইব বাপের ঘর
যজ্ঞ মহোৎসব দেখিবারে। ইত্যাদি

১। সা-প-প ১, ১৫৫

পত্নীর এই প্রার্থনায় স্বামীর নিকট স্বাভাবিক আব্দারই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক পাণ্ডিত্য সহকালে এই স্থলে প্রকাশ করিয়াছেন,—

নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।
যজ্ঞ দেখিবারে যাব পিতার ভবন।

দক্ষের শিব-নিন্দায় মুকুন্দরাম যেখানে বলিয়াছেন,

পরিধানে বাঘ ছাল, গলায় হাড়ের মালা
বিভূতি ভূষিত যার অঙ্গে।
শ্মশানে যাহার স্থান, তার কেবা করে মান
প্রেতভূত চলে যার সঙ্গে।।

ভারতচন্দ্র সেখানে বলিয়াছেন,—

সভাজন শুন জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাঁই
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।।

দক্ষযজ্ঞনাশ বর্ণনায় মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন,—

লয়ে নানা রুদ্র ক্রুদ্ধ বীরভদ্র
চলে যজ্ঞ নাশিবারে।

ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।

ব্যাধ-ভবনে মুকুন্দরামের চণ্ডী আত্মপরিচয়চ্ছলে যেখানে কহিতেছেন,—

কি কব দুঃখের কথা গঙ্গা নামে মোর সতা
স্বামী যারে ধরয়ে মস্তকে।

ভারতচন্দ্র তাহাই অন্নদার আত্মপরিচয়চ্ছলে অপূর্ব কবিত্ব সহকারে প্রকাশ করিতেছেন,

গঙ্গা নামে মোর সতা তহঙ্গ এমনি।
জীবন-স্বরূপা সেই স্বামীর শিরোমণি।।

মুকুন্দ যেখানে বলিতেছেন,—

বিষকণ্ঠ মোর স্বামী সহিতে না পারি আমি
পঞ্চমুখে দেয় গালাগালি।

ভারতচন্দ্র সেখানে বলিতেছেন,—

কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।।

এই প্রকার বহু স্থলে ভাব ও ভাষার মুকুন্দরামের সহিত ভারতচন্দ্রের অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক অনুভূত হয়।

মুকুন্দরাম ব্যতীতও ভারতচন্দ্র তাঁহার পূর্ব্ববর্তী আর একজন কবির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কাব্যেই ভারতচন্দ্রের সুর যেন অধিক ধ্বনিত হইয়া উঠিতে শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি ধর্ম্মমঙ্গলের প্রসিদ্ধ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। তাঁহার সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এই স্থলে ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্য হইতে কোন্ কোন্ অংশ কিভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারই শুধু উল্লেখ করিব।

ধর্ম্মমঙ্গলের 'আখড়া-পালা'য় ছদ্মবেশিনী পার্বতী লাউসেনের নিকট কৌশলে আত্ম-পরিচয়-প্রসঙ্গে কহিতেছেন,—

মমতা না করে পিতা পাষাণ শরীর।

ভারতচন্দ্রের অন্নদার আত্ম-পরিচয় নাই,—

না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।

ঘনরামের পার্বতী এই প্রসঙ্গেই বলিতেছেন,—

যে ডাকে আদর ভাবে যাই তার কাছে।

আবার অন্যত্র ছদ্মবেশী হনুমান কামরূপরাজের নিকট আত্ম-পরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

যে ডাকে কাতর হয়ে যাই তার কাছে।

ভারতচন্দ্রে আছে,—

যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই।

ঘনরামের পার্বতী পতির পরিচয়-সম্বন্ধে কহিতেছেন,—

ভিক্ষুক ভক্ষণ ভাঙ্গ ভস্মগুলা গায়।

ভারতচন্দ্রে পাই,—

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গলে ঈশ্বরী পাটনীর নিকট অন্নদার আত্ম-পরিচয় সম্পর্কে কবি যে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহা মুখ্যত মুকুন্দরামের বর্ণিত ব্যাধগৃহে চণ্ডীর ছলনাময় আত্মপরিচয়-দানের উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইলেও, এই সম্পর্কে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নিকটই তাঁহার ঋণ বিশেষভাবে অনুভূত হইবে। কিন্তু ঈশ্বরী পাটনীর এই চিত্রটির জন্য ভারতচন্দ্র সর্বতোভাবে যে মনসামঙ্গলের কবিদিগের নিকট ঋণী তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রায় প্রত্যেক মনসামঙ্গলকাব্যেই পাই, স্বামীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া চণ্ডী এক খেয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই খেয়া ঘাটে চণ্ডী নামে এক ডোমনী পাটনী ছিল —

ঘাটে দাঁড়াইয়া দেবী মনে মনে পাঁচে।
হাসিতে হাসিতে গেল ডোমনীর কাছে।।
কপট করিয়া সাঁচা মিছা কথা কই।
এক নাম জানিয়া তাঁহারে বলে সই।[১]

ভারতচন্দ্রের অন্নদা খেয়া পাটনীর নিকট আত্ম-পরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি।।
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।।

এই প্রসঙ্গে মনসা-মঙ্গলে পাওয়া যায়,—

চণ্ডী বলে সখী মোর দুঃখের নাহি ওর।
বৃদ্ধকালে স্বামী মোর পর নারী চোর।।

ভারতচন্দ্রও লিখিয়াছেন,—

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।।

ভারতচন্দ্র তাঁহার ঈশ্বরী পাটনীর চিত্রটি পরিকল্পনার জন্য মনসা-মঙ্গলের নিকট যে মুখ্যতঃ দায়ী, তাহা স্পষ্ট অনুভব করা যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বরী পাটনী মনসা-মঙ্গলের ডোমনী।

ভারতচন্দ্রকে তাঁহার এই কাহিনীগত মৌলিকতার অভাবের জন্য কতখানি দোষী বিবেচনা করা যায়, এক্ষণে তাহাই বিচার করা কর্তব্য। এ'কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই যুগে মঙ্গলকাব্যগুলির নির্দিষ্ট গতানুগতিক কাহিনীগত ধারা অবলম্বন না করিয়া কোন কবিই মঙ্গলকাব্য রচনা করিতে পারিতেন না। আমাদের এই রক্ষণশীল সমাজের মধ্যে প্রাচীন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা এতই অধিক ছিল যে, তাহার কোন প্রকার সংস্কার কেহ সহজে স্বীকার করিত না। সেই জন্যই যত বড় কবিত্বশক্তি লইয়াই কেহ জন্মগ্রহণ করুন না কেন, সেই প্রাচীনকেই ভিত্তি করিয়া তাঁহাকে নূতন কাব্যসৌধ গড়িয়া তুলিতে হইত। ভারতচন্দ্রেরও ইহার ব্যতিক্রম করিবার উপায় ছিল না। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ইতিপূর্বেই সমাজে এত প্রচলিত ছিল যে, শত কবিত্বগুণে গরীয়ান্ হইলেও ইহার ব্যতিক্রমটি সাধারণতঃ কেহই গ্রহণ করিতে চাহিত না। ভারতচন্দ্র চরমপন্থী ছিলেন না, সেই জন্য পুরাতনের উপরই দৃষ্টি রাখিয়া নিজের কাব্য রচনা করিয়াছেন।

যে রুচি-দোষের জন্য ভারতচন্দ্রের সাধারণতঃ নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়, 'অন্নদা-

---

১। বিজয়গুপ্ত, ১১১

মঙ্গলে'র প্রথম খণ্ডে তাহা নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের আরাধ্য দেবতার মর্যাদা রক্ষা করিয়া কবি তাঁহার কাহিনী রচনা করিয়াছেন। তবে মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য দেবদেবীর মত তাঁহাকে ছলনাময়ী করা হইয়াছে, এই মাত্র। ভারতচন্দ্রের 'কালিকামঙ্গল' বা বিদ্যাসুন্দরের কথা আলোচনা সম্পর্কে কবির এই নৈতিক দৃষ্টি সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভারতচন্দ্র প্রাচীন বঙ্গভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ শব্দশিল্পী, তাঁহার 'কবিতার প্রধান রস তাঁহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য'। কাব্যের ইহা যত বড় গুণই হউক, তাহা ইহার বহিরঙ্গগত পরিচয়। অবশ্য যথার্থ সার্থক যে কাব্য তাহার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা নাই, অন্তঃসৌন্দর্যের জ্যোতিতে ইহার বহিরঙ্গ উদ্ভাসিত হইয়া থাকে; অতএব এক হইতে আরকে বিচ্ছিন্ন করিবার কল্পনাও করিতে পারা যায় না; কিন্তু কাব্যের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের এই যে সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহা আধুনিক রোমান্টিক কাব্যের সম্পর্কে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিতে পারা গেলেও, গতানুগতিক একই বিষয়বস্তু লইয়া রচিত মঙ্গলকাব্য শ্রেণীর আখ্যায়িকা-কাব্য সম্পর্কে তাহা কতদূর প্রযোজ্য হইবে, তাহা বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। যেখানে কাব্যের অন্তরঙ্গের পরিকল্পনায় কবির নিজস্ব প্রতিভা-বিকাশের অন্তরায় ছিল, কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ধরাবাঁধা উপকরণকেই যেখানে কাব্যের অন্তর্বস্তু রূপে প্রত্যেক কবিকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং তাহার ফলে কবির মৌলিক প্রতিভা বিকাশের পথে পদে অন্তরায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে কাব্যের অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গের পার্থক্য কিছুতেই দূর হইতে পারে না।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ভারতচন্দ্র তাঁহার সমগ্র কাব্যের ভিত্তিভূমির জন্য তাঁহার পূর্ববর্তীদিগের নিকট গভীরভাবে ঋণী। বিশেষত ভারতচন্দ্রের মধ্যে একটি যুগ আসিয়া পূর্ণতা লাভ করিয়াছে; তাঁহার কাব্যসৃষ্টির উপকরণসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে গেলে তাহাদের মধ্যে সুদীর্ঘ একটি যুগের পরিণত সাহিত্য-সাধনার বহু উপাদানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যাইবে। ভারতচন্দ্র যুগস্রষ্টা নহেন, বরং যুগের সৃষ্টি। যদিও আসন্ন নব যুগের ইঙ্গিতও তাঁহার মধ্যে পাওয়া যায় তথাপি তাঁহাকে লইয়া একটি যুগ আরম্ভ হয় নাই, বরং তাঁহার মধ্যেই একটি যুগ পরিণতি লাভ করিয়াছে; এই যুগের পটভূমিকা হইতে ভারতচন্দ্রকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিচার করিবার উপায় নাই। তাঁহার কাব্য সমগ্রভাবে তাঁহার একান্ত ব্যক্তি-প্রতিভার সৃষ্টি বলিয়া দাবী করা ভুল হইবে—এই সৃষ্টির মূলে দীর্ঘ যুগের একটি পরিণত-প্রায় সাধনাও কার্যকরী হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্যের যুগ রাজনৈতিক যুগের ন্যায় নহে—নূতন রাজনৈতিক যুগের সূচনায় যেমন কোনও রাজবংশে পূর্ববর্তী রাজবংশকে সম্পূর্ণ নির্মূল করিয়া দিয়া নিজের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, সাহিত্যের যুগে তাহা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। সাহিত্যে পূর্ববর্তী যুগের ভিত্তির উপরই নূতন যুগের সৌধ স্থাপিত হয়। এইজন্য ভারতচন্দ্রের মধ্যে বাঙ্গালীর একটি সুদীর্ঘ রস-সাধনার যুগ সমাহিত হইলেও, তাহার পরবর্তী যুগও তাঁহারই সাধনার ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। সেই জন্যই বলা হইয়াছে যে 'ভারতচন্দ্রের কাব্যোৎকর্ষ কেবল তাঁহার

কাব্য-প্রসাধন কলা বা রাজসভা-সুলভ রুচিবৈদগ্ধ্যের উপর নির্ভর করে না, পরন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে তাঁহার অন্নদা-মঙ্গল ভাবী যুগের সাহিত্যিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার অস্ফুট বার্তা বহন করে।'

ভারতচন্দ্রের কাব্যে সন্নিবিষ্ট গীতি-কবিতাগুলি খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতি-কবিতার উৎস খুলিয়া দিয়াছিল। বৈষ্ণব পদাবলী হইতে ক্রমাগত রস আহরণ করিবার ফলে বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে ক্রমে রচনাগত শৈথিল্য দেখা দিয়াছিল—কাহিনীর নিবিড়তা বিনষ্ট হইয়া গিয়া ইহাদের মধ্যে মধ্যে গীতি-সুরের ঝঙ্কার ধ্বনিত হইতেছিল। ভারতচন্দ্রের মধ্যে আসিয়া মঙ্গলকাব্যের প্রচ্ছন্ন গীতি-সুরটি স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। যে গীতি-সুর ও গীতি-রস ইতিপূর্বে মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছেল, ভারতচন্দ্রের মধ্যে আসিয়া তাহাই স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন পরিচয় লাভ করিল। ইতিপূর্বে কোন কোন অঞ্চলের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা বিষ্ণুপদ ব্যবহারের যে রীতি প্রচলিত ছিল, ভারতচন্দ্র তাহাই অধিকতর রস এবং শিল্প-সুষমায় মণ্ডিত করিয়া নিজের রচনার মধ্যে গ্রহণ করিলেন। বিষ্ণুপদগুলির আপাত ধর্মীয় আবেদন ইহাদের মধ্যে আর রক্ষা পাইল না—ইহারা মানবিক অনুভূতি-সমৃদ্ধ হইয়া যথার্থ গীতি-কবিতা রচনার উপযোগিতা লাভ করিল। 'অন্নদা-মঙ্গলে'র প্রথম খণ্ড হইতে নিম্নোদ্ধৃত পদগুলির মধ্যে ভক্তিরস অপেক্ষা শব্দরস অধিক প্রকাশ পাইয়াছে।

(১)

আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো।।
উমার কেশ চামর ছটা, তামার শলা বুড়ার জটা,
তায় বেড়িয়া ফোঁপায় ফণী দেখে আসে জ্বর লো।।
উমার নখ চাঁদের চূড়া, বুড়ার দাড়ী শণের নুড়া
ছার কপালে ছাই কপালে দেখে পায় ডর লো।।
উমার গলে মণির হার, বুড়ার গলে হাড়ের ভার,
কেমন করে, ওমা, উমা করবে বুড়ার ঘর লো।।
আমার উমা শেখর চূড়া, ভাঙড় পাগল ঐ না বুড়া,
ভারত কহে পাগল নহে ওই ভুবনেশ্বর লো।।

(২)

আমারে ছাড়িও না, ভবানি।
সুশীলা হইয়া শিলায় জন্মিয়া
শিলাময়-হিয়া হইও না।

এ বার পাথারে ফেলিয়া আমারে
দোষ বারে বারে লইও না।।
শিশুগণ মিলা যেন খেলা দিলা
তেমন এখানে খেলিও না।
তব মায়াছান্দে বিশ্ব পড়ি কান্দে
ভারতে এ ফেরে ফেলিও না।।

(৩)

কেবা এমন ঘরে থাকিবে। (জয়া)
এ দুঃখ সহিতে কেবা পারিবে।।
আপনি মাখেন ছাই আমারে কহেন তাই
কেবা সে বালাই ছাই মাখিবে।
দামাল ছাবাল দুটি অন্ন চাহে ভূমে লুটি
কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে।।
বিষ পানে নাহি ভয় কথা কৈতে ভয় হয়
উচিত কহিলে দ্বন্দ্ব বাড়িবে।
মা-বাপ পাষাণ হিয়া হেন ঘরে দিল বিয়া
ভারত এ দুঃখের ঘর ছাড়িবে।।

(৪)

চল কাশীমাঝে সবে যাব।
অন্নদা পূজিবে শিব দেখিবারে পাব।।
মণিকর্ণিকার জলে স্নান করি কুতূহলে
অন্নদা-মঙ্গল ছলে হরগুণ গাব।
পাপ তাপ হবে ছন্ন নানা রস সুসম্পন্ন
অন্নদা দিবেন অন্ন মহাসুখে খাব।।
শিব শিব শিব কয়ে জ্ঞানবাপী কূলে রয়ে
সুখে রব শিব হয়ে কোথায় না ধাব।
শিবের করুণা হবে দেখিব ভবানী-ভবে
ভারত কহিছে তবে হরিভক্তি চাব।।

(৫)

আমারে শঙ্কর দয়া কর হে।
শরণ লয়েছি আমি দয়াময় হে।।
তুমি দীন দয়াময় আমি দীন অতিশয়
তবে কেন দয়া নয় দেখিয়া কাতর হে।
তবে পদে আশুতোষ পদে পদে মোর দোষ
জানি কেন কর রোষ আমার্ উপর হে।।
পিশাচে তোমার প্রীতি মোর পিশাচের রীতি
তবে কেন মোর নীতি দেখে ভাব পর হে।
ভারত কাতর হয়ে ডাকে শিব শিব কয়ে
ভবনদী পারে লয়ে দূর কর ভয় হে।।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর ভাব-লোকে যে মঙ্গলকাব্যের শাক্তধারা এক মহাজন পদাবলীর বৈষ্ণবধারার একত্র সংযোগের ফলে শৈব অথবা শাক্ত পদাবলী নামে এক শ্রেণীর অভিনব ভক্তিমূলক গীতি-কবিতার জন্ম হইয়াছিল, ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল কাব্যের প্রথম খণ্ড হইতে উদ্ধৃত পদগুলির মধ্যে তাহার প্রথম পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর ভক্তিমূলক গীতি-কাব্যের ধারারও উৎসমুখ যে কি ভাবে খুলিয়া দিয়াছিলেন, এই পদগুলি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। তারপর তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্যে এই ভক্তির ভাব আরও তরলায়িত হইয়া গিয়া যে ধর্মভাব নিরপেক্ষ গীতি-কবিতার উৎস খুলিয়া দিয়াছিল, তাহারই সূত্র ধরিয়া উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতি-কবিতা জন্মলাভ করিয়াছিল— মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' তাহার প্রমাণ।

বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী কিংবা কোনও কোনও অঞ্চলের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ব্যবহৃত বিষ্ণুপদের সঙ্গে উদ্ধৃত পদগুলির প্রধান পার্থক্য কেবলমাত্র যে বহিরঙ্গগত তাহাই নহে, ভাবগতও বটে। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী ও বিষ্ণুপদ প্রধানত ভক্তি-রসাশ্রয়ী, গৌড়ীয় অধ্যাত্মদর্শন অনুযায়ী একটি শুদ্ধা ভক্তির ভাব ইহাদের মধ্যে নিবিড়তা লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু ভারতচন্দ্র রচিত উদ্ধৃত পদগুলির মধ্যে ভক্তিরসের নিবিড়তা নাই, অধ্যাত্মদর্শন-নিরপেক্ষ একটি সহজ মানবিক বর্হিমুখী রসানুভূতি ইহাদের মধ্যে নিতান্ত তরলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতচন্দ্রের যুগে সমাজের জীবন-দৃষ্টি ইহার গভীরতম স্তর পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র উপরি-স্তরে লঘুভাবে বিচরণ করিয়াছে। রসিকের চিত্তাকাশে ধারাবর্ষী ঘন মেঘসঞ্চারের পরিবর্তে তখন জলভারহীন শারদীয় শুভ্র মেঘের উদয় হইয়াছিল। সেই জন্য উদ্ধৃত পদগুলির মধ্যে কেবলমাত্র ভারতচন্দ্রেরই ব্যক্তিমানসের পরিচয় প্রকাশ পায় নাই, বরং তাহার সঙ্গে তদানীন্তন সমাজের অন্তরগত পরিচয়টি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র

সমাজের চিত্তাকাশ এইভাবে আশ্রয় করিয়াছিল বলিয়া ভারতচন্দ্রের এই গীতি-রচনাগুলি বাংলা কাব্যসাহিত্যে যতদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সাধনের মধ্যে নূতন আদর্শের সন্ধানলাভ করিতে পারে নাই, ততদিন আপনার প্রভাব অব্যাহত রাখিয়াছে। ভারতচন্দ্র হইতে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত বাংলা গীতি-কাব্যসাহিত্যের আকাশে প্রায় এক শতাব্দী ব্যাপিয়া যে অন্ধকার বিরাজ করিয়াছিল, তাহা ভারতচন্দ্রের এই গীতিগুলির অক্ষম অনুকরণ-জাত রচনার খদ্যোতালোকে মধ্যে মধ্যে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে মাত্র—কবিগান, পাঁচালী, টপ্পা, কথকতা ইত্যাদির ভিতর দিয়া নানাভাবে ভারতচন্দ্রের এই গীতিসুরটিই সেই যুগে অনুরণিত হইয়াছে। এমন কি, বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণের প্রথম প্রত্যুষে ঈশ্বর গুপ্ত এবং রঙ্গলালা আঙ্গিকের দিক হইতে ভারতচন্দ্রকেই অনুকরণ করিয়াছেন; মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর কাব্যে'র প্রভাত অবিসংবাদিত।

ভারতচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাংলা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে সচেতনভাবে শিল্পীরীতির অনুসরণ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে বাংলা কাব্যদেহ অলঙ্করণের যে রীতি প্রচলিত ছিল, তাহা একদিক দিয়া যেমন সংস্কৃতের অন্ধ অনুকরণ-জাত ছিল. তেমনি অন্য দিক দিয়া অনেক কবিরই অনায়াসলব্ধ ছিল। কিন্তু সচেতনভাবে কাব্যদেহ শিল্প-সুষমামণ্ডিত করিবারও কবির যে একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে, তাহা ভারতচন্দ্রের পূর্বে গভীরভাবে কেহই অনুভব করেন নাই। ভারতচন্দ্র কাব্য রচনার মধ্যে 'রস'-এর প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন—

'যে হৌক সে হৌক ভাবা কাব্য রস লয়ে।'

এই আদর্শ অনুযায়ীই তাঁহার কাব্যরচনা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সচেতন শিল্পমানসের রস-সৃষ্টির প্রয়াস তাঁহার কাব্যে সার্থক হইয়াছে। বাংলা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে ইহা এক নূতন দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছিল।

ভারতচন্দ্রের ব্যবহৃত ছন্দের অন্ত্যানুপ্রাসগুলি একেবারে নির্ভুল। বাংলা কাব্য রচনায় ইতিপূর্বে এই প্রকার নির্দোষ অন্ত্যানুপ্রাস আর কেহ ব্যবহার করিতে পারেন নাই। এই বিষয়েও তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম সচেতন শিল্পী। ভারতচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাংলা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে নানাবিধ ছন্দ্রে অনুশীলনে প্রবৃত্ত হ'ন। বহু ছন্দই তাঁহার মৌলিক সৃষ্টি। পয়ার এবং ত্রিপদীকে ভিত্তি করিয়াও যে বাংলা ছন্দে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যাইতে পারে, ছন্দও যে বাংলা কাব্যদেহ গঠনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ, তাহা তিনি সর্বপ্রথম অনুভব করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দ অনুকরণেরই বা কি সম্ভাবনা, তাহাও তিনি নানা দিক হইতে পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারই অনুশীলনের সূত্র ধরিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে 'বৃত্রসংহারে'র কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন। অবশ্য ভারতচন্দ্রের এই বিষয়ক প্রয়াস যে সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না—তথাপি এই বিষয়ে তিনি যে কেবলমাত্র গতানুগতিক পথেই বিচরণ না করিয়া দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সে যুগের বাংলা

সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। অপরিসর পয়ারের মধ্য দিয়া তিনি যে 'মিতাক্ষর-গাঢ়তা বা বাক্‌সংযমের পটুতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে অতি সরল সহজ ভাষায় একটি উৎকৃষ্ট ক্ল্যাসিক্যাল স্টাইলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।'

সাধারণভাবে তাঁহার পরিচয় এই যে তিনি অশ্লীল। এই অশ্লীলতা তাঁহার 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যের একটিমাত্র অংশ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা 'বিদ্যাসুন্দর' বা 'কালিকা-মঙ্গল'। বিদ্যাসুন্দর কাব্য আশ্রয় করিয়া অশ্লীলতা ইতিপূর্বেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাহার নিজস্ব ধারা সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল—ভারতচন্দ্র সেই ধারাই অনুবর্তন করিলেও অশ্লীলতার মধ্যে তাঁহার একটু স্বকীয় বিশেষত্ব ছিল। ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কবিগণ অশ্লীলতাকে প্রাকৃত জীবনের সহজাত বা nature হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অশ্লীল বিষয়ও যে শিল্প-সৌষ্ঠবের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে, ভারতচন্দ্র তাহা অনুভব করিয়াছিলেন; সেইজন্য তাঁহার রচনার অশ্লীল স্থানগুলি ভাষার দীপ্তি ও রসের ঔজ্জ্বল্যে বিদগ্ধ মনের নিকট সার্থক আবেদন সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার যাবতীয় অলঙ্কার, ভাষার চাতুর্য সবই এই অশ্লীল স্থানগুলির বর্ণনাতেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভাষাগত অশ্লীলতা বা গ্রাম্যতা ভারতচন্দ্রে একেবারেই নাই, তাঁহার মধ্যে যে অশ্লীলতা আছে, তাহা ভাব বা অর্থগত অশ্লীলতা; কিন্তু তাহা অলঙ্কৃত কাব্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইবার ফলে তাহারও প্রকাশ-ভঙ্গির মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষতা (directness) ছিল না। অশ্লীলতা যে সাহিত্যিক শিল্প-সাধনার বিষয়, তাহা বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের রচনাতেই প্রথম বুঝিতে পারা গেল। সুতরাং তথাকথিত অশ্লীলতার জন্য তাঁহার 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যের যে ক্রটিই প্রকাশ পাক না কেন, ইহার একটি অভিনব শিল্প-পরিচয় দিতে গিয়া তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার মূল্য কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারা যায় না।

ভারতচন্দ্র ব্যঙ্গরসের কবি। সামাজিক কুপ্রথার প্রতি বক্রোক্তিই তাঁহার হাস্যরসের মূল। দাসু বাসুর বর্ণনায় ও কোটালের ভীতিতে তদানীন্তন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের কাপুরুষতার প্রতিই তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন। অথচ ইহাই তাঁহার হাস্যরসের অবলম্বন। তাঁহার মধ্যে ভক্তিভাবের একান্ত অভাব, ভক্তির স্থান গ্রহণ করিয়াছে ব্যঙ্গ ও অবিশ্বাস। খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে সর্বসংস্কারমুক্ত যে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ভারতচন্দ্রের ব্যঙ্গপ্রধান রচনার ভিতর দিয়াই তাহার প্রথম সোপান রচিত হইয়াছিল। মধ্যযুগের সমাজের বুকে যে ভক্তিভাব তাহার অচল আসন স্থাপন করিয়াছিল, ভারতচন্দ্রের ব্যঙ্গভাবের ফুৎকারে সেই আসন বিচলিত হইয়াছিল। তাঁহার ব্যঙ্গের কষাঘাত হইতে দেবতারাও রক্ষা পান নাই। বাংলা সাহিত্যে দেব-ভক্তির মধ্যে এই প্রথম শৈথিল্য দেখা দিয়া ইহাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত জাতির আত্মাকে প্রতিবিম্বিত করিবার উপযোগী করা হইয়াছিল। এই ভাবে মঙ্গলকাব্যের ভক্তিবাদকে পদদলিত করিয়া দূর করা হইয়াছে। এতকাল মঙ্গলকাব্যের ধারা ঝরণার ধারার মত স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উৎসারিত হইতেছিল, ভারতচন্দ্র তাহাতে সর্বপ্রথম

নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছাপ দিয়া তাহাকে পাথরে গাঁথা কুণ্ডে পরিণত করিয়া তাহার গতিপথ রুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ভক্তিহীন ব্যঙ্গোক্তি, তাঁহার সর্বব্যাপী ও সুগভীর সামাজিক অভিজ্ঞতা প্রভৃতির ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যে তাঁহার ব্যক্তি-প্রতিভার ছাপ মুদ্রিত করিয়া দিয়া মঙ্গলকাব্যের যুগাবসান ঘটাইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই বিশেষত্বগুলি তাঁহার ঐহিক প্রীতির নিদর্শন রূপে গণ্য হইবার মর্যাদা লাভ করিয়া তাঁহাকে আধুনিক যুগেরও অগ্রদূত বলিয়া নির্দিষ্ট হইবার যোগ্যতা দান করিয়াছে।

স্বাভাবিক নিয়মেই সাহিত্যে ভাবযুগের পর শব্দযুগের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যে ও বৈষ্ণব কবিতায় যে ভাবের প্রবাহ বহিয়াছিল, তাহা ক্রমশ শান্ত সমুদ্রবক্ষের মত স্থিতিলাভ করিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহার বক্ষের উপর মৃদুমন্দ বায়ুপ্রবাহে তরঙ্গধ্বনির সৃষ্টি হইল। সেইজন্যই ভারতচন্দ্রের ভাষা, 'কলকল ছলচ্ছল টলট্টল তরঙ্গা'।

চরিত্র-সৃষ্টির দিক দিয়া 'অন্নদা-মঙ্গলে'র প্রথম খণ্ডে একাত্র ঈশ্বরী পাটনীর চরিত্রটিই সার্থকতা লাভ করিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার চরিত্র ও পরিবেশটি ভারতচন্দ্রের মৌলিক কল্পনার ফল নহে—মনসা-মঙ্গল কাব্য হইতে তাহা গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও ভারতচন্দ্র ইহাকে এক অভিনব রূপ দিয়াছেন—ভারতচন্দ্রের মৌলিক সৃষ্টি-প্রতিভাকে অবলম্বন করিয়া, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরী পাটনী জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে—এমনটি ইহার আগে আর কখনও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। মনসা-মঙ্গল কাব্যে খেয়া পারাপারকারিণ ডোমনীর মধ্যে যে মানবিক পরিচয়টি তখনও প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, ভারতচন্দ্রের পরিকল্পনার মধ্যে তাহারই পূর্ণাঙ্গ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বরী পাটনীর মধ্যে একান্ত মানবিকতার সন্ধান ভারতচন্দ্রের কৃতিত্বের পরিচায়ক।

বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দরাম বড় কবি, না ভারতচন্দ্র বড় কবি, এই বিষয় লইয়া বিভিন্ন সমালোচকদিগের মধ্যে বহুকাল যাবৎই মতানৈক্য চলিতেছে। এই বিষয়ে মতবিরোধের কোন দিন অবসান হইবে, এমনও মনে হয় না। কারণ, এই উভয় মতাবলম্বিগণ দুই স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ হইতে এই দুইজন কবির রচনা বিচার করিয়া থাকেন। মুকুন্দরামের অনুভূতি-গুণ ও ভারতচন্দ্রের শিল্প-গুণ—ইহারা কাব্যের দুইটি বিপরীতমুখী গুণ। এই দুইটির একত্র সমন্বয় দ্বারা কাব্য অপূর্ব হইয়া উঠে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত এই দুইটি গুণের একত্র সমন্বয় সাধন আর কেহই করিতে পারেন নাই। অনুভূতি-গুণে মুকুন্দরাম শ্রেষ্ঠ, শিল্প-গুণে ভারতচন্দ্র শ্রেষ্ঠ—অতএব একজন অপর হইতে বড়, ইহা বলা সঙ্গত হয় না। অনুভূতি ও প্রকাশ-কৌশল উভয়ই কাব্যের মধ্যে সমান অপরিহার্য—ইহাদের কোন্‌টি ছোট, কোন্‌টি বড়, তাহা বলা কঠিন। অতএব এই দিক দিয়া মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্র কে বড় কবি, তাহার কোন মীমাংসা করা যায় না। ভারতচন্দ্রের

নাম শুনিবামাত্র বিগত শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের প্রায় সমস্ত সমালোচকই নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন—বলা বাহুল্য, তাঁহার 'বিদ্যাসুন্দরে'র অশ্লীলতার জন্যই সে যুগের ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজে তাঁহার সম্বন্ধে এই মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহারই ফলে সমাজের নীতিবাগিশ সাহিত্য-সমালোচকদিগের নিকট ভারতচন্দ্র অপাঠ্য ও অশ্রদ্ধেয় ছিলেন। বর্তমানে নিরপেক্ষ সাহিত্যিক বিচারের দিক হইতে ভারতচন্দ্রের কিছু আলোচনা হইয়াছে, ফলে তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে পুনর্বিচার আরম্ভ হইয়াছে, ফলে তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে পুনর্বিচার আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা এই বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভারতচন্দ্রকেই মঙ্গলকাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া দাবী করিয়াছেন—মুকুন্দরামের প্রতিভা তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। এই শ্রেণীর সমালোচকদিগকে লক্ষ্য করিয়াই হয়ত বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, 'ভারতচন্দ্র আদিরস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গিয়াছেন, কবিকঙ্কণের ঋষভস্বর কে শোনে ?'[১] উপরে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে যে আলোচনা করিলাম, তাহা হইতে স্পষ্টতই অনুমতি হইবে যে, ভারতচন্দ্র ছিলেন শিল্পী; মুকুন্দরাম ও তাঁহার পরবর্তী কবিদিগের প্রতিষ্ঠিত ভাব ও ভাষার ভিত্তির উপর তিনি তাঁহার নিজের সৌধ সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সৌধ শিল্পীর নির্মান-কৌশলগুণে তাজমহল হইয়া উঠিয়া বাহির হইতে দর্শকের চক্ষু ঝলসাইয়া দিয়াছে, কিন্তু ইহার ভিত্তিমূলে যে একটি অমর প্রেমের কাহিনী গোপন রহিয়াছে, তাহা ভুলিলে চলিবে কি করিয়া? তেমনই দীর্ঘ যুগের বংলা সাহিত্যের একটি প্রচ্ছন্ন অমর সাধনা ভারতচন্দ্রের সমগ্র কাব্য-সৃষ্টির অবিস্মরণীয় উৎস হইয়া রহিয়াছে। কবি হিসাবে জয়দেব ও ভারচন্দ্র স্বজাতি, মৈথিল বিদ্যাপতি তাঁহাদেরই সগোত্র; সেইজন্যই বিদ্যাপতির এক উপাধি 'অভিনব জয়দেব'। এই উপাধি ভারতচন্দ্রেরও প্রাপ্য। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এক প্রান্তে জয়দেব এবং অপর প্রান্তে ভারতচন্দ্র—সূর্যকরোজ্জ্বল তুষার-শৈলের দুই সমুন্নত স্বর্ণশৃঙ্গ, একটি উদয়াচলে অপরটি অস্তাচলে সংবদ্ধ। এই দুই উন্নত গিরিশৃঙ্গের পাদমূলে তৃণাস্তীর্ণ শ্যামল উপত্যকায় যে স্বচ্ছন্দ জীবনের কলনিস্যন্দিনী ধারা প্রবাহিত, তাহারই নিভৃত তীরে মুকুন্দরামের পর্ণকুটীর বিরাজিত।

ভারতচন্দ্রকে রাজসভার কবি বলিতে কেহ কেহ রাজকবি বলিয়া ভুল করিয়াছেন। রাজসভার কবি এবং রাজকবি এক কথা নহে, উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে। সভা সমাজের প্রতিনিধি—রাজসভাও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি। অতএব ভারতচন্দ্রকে রাজসভার কবি বলিতে তাঁহাকে সমসাময়িক নাগরিক রস ও রুচির প্রতিনিধি বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়া থাকে, রাজার ব্যক্তিগত রস ও রুচিবোধের দাস বলিয়া মনে করা হয় না, —এই বৃত্তি রাজকবির কাজ, রাজসভার কবিব নহে।

১। কমলাকান্তের দপ্তর (বসুমতী), ২০

কেহ কেহ ভারতচন্দ্রকে যুগসন্ধির কবি বলিয়াও ভুল করিয়া থাকনে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, তাঁহার মধ্যে একটি যুগ সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাঁহার পরবর্তী যুগ-সূর্যোদয়ের জন্য তিনি আর অপেক্ষা করেন নাই। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার মাত্র তিন বৎসর পূর্বে ইংরেজগণ পলাশীতে জয়লাভ করিয়া রাজ্যের কর্তা হইয়াছেন— ইহার পূর্বেই ভারতচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবন শেষ হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই যুগসন্ধির কবি, ভারতচন্দ্র নহেন। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর একশত বৎসর পর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই যুগ-সন্ধি দেখা দিয়াছিল। এই সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, '১৮৫৯-৬০ সন বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়—উহা নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরানো দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়।' অতএব ইহার একশত বৎসর পূর্বে যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহাকে যুগ-সন্ধিক্ষণের কবি বলিয়া ভুল করিবার কোন কারণ নাই।

'বিদ্যাসুন্দর' বা 'কালিকা-মঙ্গল'

'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াই রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন। সমগ্র মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যযুগের মধ্যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

তাঁহার 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য সম্বন্ধে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' অন্নদা-মঙ্গলেরই একটি অসংলগ্ন অংশ। মানসিংহের বাংলা আক্রমণের কাহিনী-বর্ণনা উপলক্ষ করিয়া কবি কৌশলে ইহা মূল কাব্য-মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহা অন্নদা-মঙ্গলের কাহিনীতে অবান্তর হইলেও স্বতন্ত্র কাব্য-হিসাবেই ইহার মূল্য আছে। পূর্বেই বলিয়াছি, অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যগুলিতে ধর্মভাব অনেকটা হ্রাস পাইয়া আসিয়াছিল, দেবতা ইহা হইতে বহুদূরে সরিয়া গেল— কেবল তাহার ছায়াটুকু মাত্র ইহাতে অবশিষ্ট রহিল, বাংলা কাব্য উপলক্ষ করিয়া সংস্কৃত অলঙ্কার ও রসশাস্ত্রেরই অনুশীলন আরম্ভ হইল। বিশেষত উন্মুক্ত লোকালয়ের প্রাঙ্গণ হইতে গিয়া দেশের সাহিত্য তখন প্রহরিবেষ্টিত রাজসভায় প্রবেশ করিল ও নাগরিক রস ও রুচির পরিতুষ্টির কার্যে আত্মনিয়োগ করিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাসুন্দর কাব্যের নৈতিক ত্রুটির জন্য ভারতচন্দ্রকে কোন ভাবেই দায়ী করা যায় না। কাহিনী-ভাগের গতানুগতিকতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া গিয়া তিনি যে নূতন কোন পরিকল্পনা দ্বারা তাঁহার কাব্যের নৈতিক আবহাওয়া দূষিত করিয়াছেন, তাহা নহে—বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী মাত্রেরই যাহা লক্ষ্য, তাঁহার কাব্যেও তিনি তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। তবে পূর্বেই বলিয়াছি, কালিকা-মঙ্গল রচনা করিয়া দেবতার মনস্তুষ্টি সাধন তাঁহার মুখ্য কিংবা গৌণ কোন অভিপ্রায়ই ছিল না, সমসাময়িক নাগরিক রস ও

রুচির তুষ্টি সাধন করিতে গিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান রাজপরিবারের প্রতি নিজের যে আক্রোশ ছিল, তাহাও আংশিক মিটাইতে গিয়া তাঁহার কাব্য-মধ্যে কতকগুলি অতিরিক্ত উপকরণও আসিয়া পড়িয়াছে। এইরূপ কতকগুলি উপকরণ বর্জন করিলেও তাঁহার মূল কাব্যের কোন হানি হইত না। অবশ্য ইহাতে নৈতিক আপত্তির কারণ থাকিলেও, তাহা দ্বারা তাঁহার কাব্যের বহির্গুণ কোন অংশেই খর্ব হয় নাই; কারণ, সামাজিক নীতির বিচারে কাব্যের মূল্য নির্ধারিত হইতে পারে না। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের নৈতিক আবহাওয়া যে খুব সুস্থ ছিল, তাহাও বলিতে পারা যায় না। বিদ্যাসুন্দরের কোন চরিত্রই অষ্টাদশ শতাব্দীর আকস্মিক সৃষ্টি নহে। মঙ্গল কাব্য আলোচনা সম্পর্কে বলিয়াছি, বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্য হইতেই ইহার যাত্রা শুরু হইয়াছে। গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতনের যোগিনী, ধর্মমঙ্গলের নয়ানী, বিদ্যাসুন্দরের মালিনীতে আসিয়া স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করিয়াছে মাত্র। ভারতচন্দ্র এখানে একটি জাতীয় প্রাচীন ধারারই অনুবর্তন করিয়াছেন। নাথসাহিত্যে যেমন পাওয়া যায় যে, গোরক্ষনাথ মীননাথের সন্ধান করিতে করিতে কদলীপত্তনে গিয়া উপস্থিত হইলে তথাকার এক যোগিনী গোরক্ষনাথের পরম সুন্দর কান্তি দেখিয়া তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল,—

নাথের দেখিয়া রূপ যোগিনীএ পাএ শোক
চল চল পরদেশী যোগাই।
যথ কিছু কহি আহ্মি মনে ভাবি চাহ তুহ্মি
আহ্মার বাড়ীতে চল যাই॥

ধর্মমঙ্গল কাব্যের জামতি-পালায় তেমনই দেখিতে পাওয়া যায় যে, লাউসেনের সুন্দর কান্তি দেখিয়া নয়ানী তাঁহাকে নানা ছলনায় প্রলুব্ধ করিয়া নিজের গৃহে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে,—

বচনে মিশাল মধু মন্দ মন্দ বলে।
কোন্ দেশে ঘর বঁধু কেন তরুতলে॥
এসো এসো আমার মন্দিরে উত্তরিবে।
যে কিছু বাসনা কর সকলি পাইবে॥

ভারতচন্দ্রের মালিনীতে ইহারই এই প্রকার একান্ত স্বাভাবিক পরিণতি ঘটিয়াছে, এখানেও অনুরূপ অবস্থায় সুন্দরকে দেখিয়া ভারতচন্দ্রের মালিনীর—

হেরিয়া হরিল চিত্ত বলে হরি হরি।
কাহার বাছুনিরে নিছুনি লয়ে মরি॥
কাছে আসে হাসে হাসে করয়ে জিজ্ঞাসা।
কে তুমি কোথায় যাবে কোন্ খানে বাসা॥

বিদ্যা ও সুন্দরের জীবনের গুপ্ত অভিসার বর্ণনার যে নির্লজ্জ কাহিনী পাঠ করিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লই, তাহাই জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' হইতে আরম্ভ করিয়া চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর মধ্য দিয়া সমগ্র পরবর্তী বৈষ্ণব গীতিসাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহা হইতেই বাংলার রসিক-সমাজের তাহা একেবারে মজ্জায় গিয়া স্থান লাভ করিয়াছিল। বিশেষত মঙ্গলকাব্যগুলির আদর্শ যে সংস্কৃত পুরাণ, তাহাও এই ভাব হইতে মুক্ত ছিল না। তদুপরি সংস্কৃতশিক্ষিত দেশের পণ্ডিত সমাজের মধ্যে সংস্কৃত অলঙ্কার ও রসশাস্ত্রের ব্যাপক অনুশীলন দ্বারা নবরসের চর্চাও ব্যাপকভাবেই আরম্ভ হইয়াছিল। অতএব ইহার এই ঐতিহাসিক দিকটি উপেক্ষা করিয়া বিংশতি শতাব্দীর মার্জিত রুচি ও সংস্কার লইয়া বাংলার অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্যের রস-বিচার করা যাইতে পারে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ বিশেষ করিয়াই খণ্ড গীতি-কবিতার যুগ। রামপ্রসাদের খণ্ড গীতি-কবিতা রচনার সার্থকতাও তাঁহার যুগন্ধর প্রতিভার উপরই প্রতিষ্ঠিত বলিতে হইবে। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'-এর কাহিনী খণ্ড গীতিকবিতার সমষ্টি না হইলেও ইহার সুব মূলত গীতি-প্রধান। চরিত্র-সৃষ্টি কিংবা কাহিনী-পরিকল্পনায় কাব্যের সমুচ্চ আদর্শ ইহাতে অনুসরণ করা হয় নাই। এই বিষয়ে ইহা প্রকৃত মঙ্গলকাব্য ও খণ্ড গীতি-কবিতাগুলির মধ্যবর্তী বলিতে পারা যায়। ভারতচন্দ্রও যুগন্ধর প্রতিভা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য গীতি-ভাবাপন্ন কাব্য 'বিদ্যাসুন্দর' রচনাতেই তাঁহার প্রতিভার সম্যক বিকাশ হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্ট আদর্শ হইতে এই বিষয়ে একটু স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হইবে। পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যগুলি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের মত গীতি-প্রধান (lyric) নহে। কথিত আছে, বিদ্যাসুন্দর কাব্যখানি রচনা করিয়া ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট তাহা উপস্থিত করেন। কৃষ্ণচন্দ্র তখন কার্যান্তরে ব্যাপৃত ছিলেন, পুঁথিখানি কবির হাত হইতে লইয়া তাহা না দেখিয়াই পার্শ্বস্থ উপাধানের উপর হেলান দিয়া রাখিয়া তিনি নিজের কাজ করিতেছিলেন। ভারতচন্দ্র কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, পুঁথিখানি এইভাবে রাখিবেন না, ইহার রস গড়াইয়া পড়িবে।' শুনিয়া কৃষ্ণচন্দ্র পুঁথিখানি খুলিয়া দুই-একটি পাতা পড়িলেন, পড়িয়া হাস্যমুখে কবিকে বলিলেন, 'বাস্তবিকই যে রস তুমি সৃষ্টি করিয়াছ, তাহা গড়াইয়া পড়িবারই মত।'

মধ্যযুগের বৈচিত্র্যহীন কাহিনী অনুসরণ করিয়া ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যে এমন এক ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা সেই যুগের আদর্শ হইয়াও তাঁহার নিজস্ব। সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য থাকিলেই যে রচনা মার্জিত হইবে, এমন কোন কথা নাই। মধ্যযুগের বহু কবি সংস্কৃতে অশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াও ভাষারচনায় অনেক স্থলে গ্রাম্যতা-মুক্ত হইতে পারেন নাই। কিন্তু ভারতচন্দ্র আপন প্রতিভাবলে উচ্চতর কাব্যের উপযোগী করিয়া ভাষা নিজের হাতে সৃষ্টি করিলেন, ইহা তাঁহার অপূর্ব সৃজনীশক্তিরই পরিচায়ক। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে একই নিয়মে গতানুগতিক বর্ণনায় যে সকল আনুষঙ্গিক কাহিনী আমরা এতকাল পাঠ

করিতেছিলাম, তাহাই নবতর শব্দ-যোজনায় নূতন ভঙ্গিতে রচনা করিয়া ভারতচন্দ্র ইহার মধ্যেই অভিনবত্বের সৃষ্টি করিলেন; যাহা বৈচিত্র্য হীনতার জন্য প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাই একমাত্র নূতন রূপ-গরিমায় ঝলমল করিয়া উঠিল।

ভাষায় উপর এতখানি অধিকার ছিল বলিয়াই ভারতচন্দ্র ভাবপ্রকাশের অনুযায়ী নূতন নূতন ছন্দ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। মঙ্গলকাব্যে অনুসৃত বাংলা ছন্দের গতানুগতিক রীতিকে সর্বতোভাবে লঙ্ঘন করিয়া তিনি নিজের শক্তি অনুযায়ী ভাবের অনুকূল ছন্দ সৃষ্টি করিয়াছিলেন; ইহাই তাঁহার কাব্যের বহিরঙ্গ নির্মাণ-সার্থকতার অন্যতম কারণ। এই দিক দিয়াও বাংলা কাব্যের একটি স্বতন্ত্র ও নূতন পরিচয় পাওয়া গেল। পদের মিলের দিক দিয়াও ভারতচন্দ্র সর্বপ্রথম উপান্ত স্বর হইতে মিলের নিয়ম প্রবর্তিত করিলেন, ইহার পূর্বে, এমন কি, পরেও রবীন্দ্রনাথের সময় পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ এই নিয়মে কাব্য রচিত হয় নাই।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যের প্রধানত 'বিদ্যাসুন্দর' অংশই অষ্টাদশ শতাব্দীর সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতি-কবিতা ধারার যোগ রক্ষা করিয়াছে। 'বিদ্যাসুন্দর'-এর নিম্নোদ্ধৃত পদগুলির সঙ্গে মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্যের তুলনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

(১)

ওহে বিনোদ রায় ধীরে ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশিটি বাজাও হে॥
নব জলধর তনু শিখি পুচ্ছ শক্রধনু
পীতধড়া বিজলীতে ময়ূরে নাচাও হে॥
নয়ন চকোর মোর দেখিয়া হয়েছে ভোর
মুখ-সুধাকর হাসি সুধায় বাঁচাও হে॥
নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা,
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও,
ভারত যে মত চাহে সেই মত চাও হে॥

(২)

কি বলিলি, মালিনি, ফিরে বল বল।
রসে তনু ডগমগ মন টল টল॥
শিহরিল কলেবর তনু কাঁপে থর থর
হিয়া হৈল জর জর আঁখি ছল ছল।

তেয়াগিয়া লোক-লাজ   কুলের মাথায় বাজ
ভজিব সে ব্রজরাজ লয়ে চল চল।।
রহিতে না পারি ঘরে   আকুল পরাণ করে
চিত্ত না ধৈরজ ধরে পিক কল কল।
দেখিব সে শ্যামরায়   বিকাইব রাঙা পায়
ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে ঢল ঢল।।

(৩)

আলো, আমার প্রাণ কেমন লো করে,
কি হৈল আমারে।
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে।।
লুকায়ে পিরিত কৈনু   কুলকলঙ্কিনী হৈনু
আকুল পরাণ মোর অকূল পাথারে।
সুজন নাগর পেয়ে   আগু পাছু নাহি চেয়ে
আপনি করিনু প্রীতি কি দুষিব তারে।।
লোকে হৈল জানাজানি   সখীগণে কানাকানি
আপনা বেচিয়া এত সহিতে কে পারে।
যাক যাক জাতি কুল   কে চাহে তাহার মূল
ভারত সে ধন্য শ্যাম ভালবাসে যারে।।

(৪)

কারে কব লো যে দুঃখ আমার
সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার।।
বাঁধা আছি কুল ফাঁদে,   পরাণ সতত কাঁদে
না দেখিয়া শ্যামচাঁদে দিবসে আঁধার।
ঘরে গুরু দুরাশয়   সদা কলঙ্কিনী কয়
পাপ ননদিনী-ভয় কত সব আর।।
শ্যাম অখিলের পতি   তারে বলে উপপতি
পোড়া লোক পাপমতি না বুঝে বিচার।
পতি সে পুরুষাধম   শ্যাম সে পুরুষোত্তম
ভারতের সে নিয়ম কৃষ্ণচন্দ্র সার।।

(৫)

মোর পরাণ-পুতলী রাধা।
সুতনু তনুর আধা।।
দেখিতে রাধায় মনে সদা ধায়
নাহি মানে কোন বাধা।
রাধা সে আমার আমি সে রাধার
আর যত সব বাধা।।
রাধা সে ধেয়ান রাধা সে গেয়ান
রাধা সে মনের সাধা।
ভারত ভূতলে কভু নাহি টলে
রাধা কৃষ্ণপদে বাঁধা।।

সুগভীর রস-দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের চরিত্র-সৃষ্টি সার্থকতায় মণ্ডিত হইতে পারে নাই। গভীর সামাজিক জ্ঞান ও ব্যক্তি-চরিত্র সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের সুগভীর অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু ব্যক্তি-চরিত্রের মূলে তাঁহার সুনিবিড় অনুভূতিবোধ না থাকায় চরিত্রগুলি তাঁহার আন্তরিকতার স্পর্শে সজীব হইয়া উঠিতে পারে নাই—ইহারা যেন সুসজ্জিত কৃত্রিম পুত্তলিকা মাত্র হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মালিনী ও বিদ্যার চরিত্রই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কালিকা-মঙ্গলের কোন কবিই এই দুইটি চরিত্র-সৃষ্টির বিষয়ে কোন বিশেষত্ব দেখাইতে পারেন নাই, গতানুগতিকতারই অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। ভারতচন্দ্রের রচনায় ইহাদের বাহিরের চাকচিক্য একটু বাড়িলেও ইহাদের অন্তর্লোক অনাবিষ্কৃতই রহিয়া গিয়াছে।

হীরার বর্ণনায় ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম।।
গাল ভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কয় ছলে।।
চূড়া বান্ধা চুল পরিধান সাদা সাড়ী।
ফুলের পাপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী।।
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।।
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কোন্দল ভেজায়।
পড়শী না থাকে কাছে কোন্দলের দায়।।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর চরিত্র নূতন নহে। পূর্বেই বলিয়াছি, গোরক্ষ-

বিজয়ের যোগিনী, ধর্মমঙ্গলের নয়ানী ও বিদ্যাসুন্দরের মালিনী অভিন্ন চরিত্র। সংস্কৃত সাহিত্যেও কুট্টিনী নামক অনুরূপ চরিত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। এই বিশেষ প্রকৃতির স্ত্রী-চরিত্রের পরিকল্পনা বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের উপরও কতকটা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের এই বর্ণনাতে এই চরিত্রটি কেমন যেন নিষ্প্রাণ মৃৎ-প্রতিমার মত—বাহিরে কৃত্রিম অলঙ্কার-সজ্জায় সমুজ্জ্বল, কিন্তু দৃষ্টি অপলক। ইহাকে তিনি একটি ছাঁচ (type) চরিত্ররূপেই কল্পনা করিয়াছেন—বিশিষ্ট একটি রূপের মধ্যে ইহাকে জীবন দান করিতে পারেন নাই।

একটি গুপ্ত প্রণয়কাহিনীর নায়িকার চরিত্র যে প্রকার হওয়া উচিত, ভারতচন্দ্র বিদ্যাকে সম্পূর্ণ সেইরূপই চিত্রিত করিয়াছেন। বুদ্ধিমত্তায় তাঁহার তুলনা হয় না, কথাবার্তা ও কার্যপ্রণালীতে রাজকন্যার সমুচিত মর্যাদাও যে তাহা দ্বারা কোন অংশে খর্ব হইয়াছে, তাহাও নহে। বিদ্যা, বুদ্ধি ও বয়স থাকিলে রাজান্তঃপুরের বিলাস-জীবন কুমারী রাজকন্যার পক্ষে যে প্রকার হইতে পারে, এই চরিত্রটি হইতে তাহারই একটি সুন্দর এবং সঙ্গত আভাস পাওয়া যায়। তাহার নির্ভীক সাহসিকতাব মূলেও রহিয়াছে তাহার জন্ম ও শিক্ষাগত সংস্কার। এই শিক্ষা দ্বারা মানসিক সংযমও যে তাহার জন্ম ও শিক্ষাগত সংস্কার। এই শিক্ষা দ্বারা মানসিক সংযমও যে তাহার আয়ত্ত না হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। রাণীর তিরস্কারেও সে অবিচলিতা, কোটাল সুন্দরকে ধরিয়া শ্মশানে লইয়া গেলেও প্রণয়ীর এই বিপন্মুহূর্তেও তাহার অন্তরাবেগ কোথাও অসংযত হইয়া উঠে নাই। বিলাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আধ্যাত্মিক সম্পর্কহীন বিদ্যার্জনের যে কুফল হইতে পারে, বিদ্যার চরিত্রেও স্বভাবতই তাহা হইয়াছিল,—ইহার এই অত্যন্ত সঙ্গত এবং স্বাভাবিক বিষয়ের অতিরিক্ত আর কিছুই হয় নাই। তথাপি ভারতচন্দ্র বিদ্যাকে যেন রক্তমাংসের মানবী করিয়া গড়িতে পারেন নাই।

ভাবের গভীরতার জন্য নহে, রসের উচ্ছলতার জন্য ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল। কাব্যখানি মঙ্গলকাব্যের আকারে লিখিত হইলেও কালীর মাহাত্ম্য-কীর্তন করিয়া তাঁহাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। একটি মানবিক প্রণয়-কাহিনীকেই আধ্যাত্মিক গৌরব দিবার জন্য কালিকার নাম ইহাতে আনিয়া যুক্ত করা হইয়াছে।

'মানসিংহ-কাব্য'

এইবার খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের 'মানসিংহ-কাব্য'-এর কথা উল্লেখ করিতে হয়।[১] তাঁহার জীবনী পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, অতএব তাহার আর

১। ভারতচন্দ্র রায়, গ্রন্থাবলী (বসুমতী, ১৪ সং), ১১৫-১৪৩

পুনরুল্লেখ করিব না। তাঁহার মানসিংহ-কাব্যের ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্যই এখানে বিচার করিয়া দেখা যাইবে। 'মানসিংহ-কাব্য' ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদা-মঙ্গলেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি স্বতন্ত্র কাব্য। আটদিনের বিভিন্ন পালায় ইহা অন্নদা ও বিদ্যার কাহিনীর সঙ্গে ক্রমান্বয়ে একত্র গীত হইলেও কাহিনীর দিক বিচার করিয়া দেখিলেই ইহার স্বাতন্ত্র্য সহজেই অনুভূত হইবে। সেইজন্য এখানে ইহার পৃথক আলোচনা করা যাইতেছে। মানসিংহ-কাব্যের রচনাকাল ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ—সমগ্র 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যখানিই একসঙ্গে এই সময়েই রচিত—ইহার প্রথম খণ্ডে দেবতা, দ্বিতীয় খণ্ডে মানুষ ও তৃতীয় খণ্ডে অতীত ইতিহাস প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহার তৃতীয় খণ্ড বা 'মানসিংহ-কাব্য' রচনায় ভারতচন্দ্রের প্রতিভার একটা নূতন দিকের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়।

ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু ভিত্তি করিয়া রচিত হইলেও 'মানসিংহ-কাব্য' কাব্যই, ইতিহাস নহে। এমন কি, পরবর্তী কবি 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' রচয়িতা গঙ্গারামের মধ্যে যে তথ্যনিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, ভারতচন্দ্রের মানসিংহ-কাব্যের মধ্যে তাহা নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, গঙ্গারাম সম্ভবত তাঁহার বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, ভারতচন্দ্র তাহা ছিলেন না—প্রচলিত জনশ্রুতি ও কুলপঞ্জী শ্রেণীর গ্রন্থ হইতে তাঁহার তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। বিশেষত ভারতচন্দ্র ছিলেন কবি, গঙ্গারাম ছিলেন বর্ণনাদাতা (narrator)। অতএব ভারতচন্দ্রের নিকট তথ্য যে বহুলাংশে পল্লবিত হইবে, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। 'মানসিংহ-কাব্য' ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া রচিত হইলেও তাহাতে দেবতারও একটি স্থান আছে কিন্তু গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ'-এ তাহা নাই। এই সকল কারণে ভারতচন্দ্রের রচনা হইতে ঐতিহাসিক তথ্য অধিকতর সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যখানির পরিচয় দিতে গিয়া মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নাম তাহাতে যুক্ত করিয়াছেন—তিনি মোগল সম্রাট্ আকবরের রাজপুত সেনাপতি মানসিংহ। মানসিংহের বাংলা আক্রমণের কাহিনী লইয়াই তাঁহার এই কাব্য রচিত। বাংলার ইতিহাসে ইহা একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরামও মানসিংহের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁহার কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন। মানসিংহের সঙ্গে বাংলার বারভূঞার যুদ্ধের বৃত্তান্ত বাংলার ইতিহাসের অতি মূল্যবান উপাদান। ভারতচন্দ্র এই উপাদান তাঁহার কাব্যে কি ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাই দেখিতে হইবে।

মানসিংহ ব্যতীতও এই কাব্যে জাহাঙ্গীর, প্রতাপাদিত্য, ভবানন্দ প্রমুখ ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গেও আমরা সাক্ষাৎ লাভ করি। প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জাহাঙ্গীর সম্পর্কে কোনও ঐতিহাসিক তথ্য এই কাব্যের মধ্যে হইতে পাওয়া যায় না, বরং তাঁহার সম্পর্কে যাহা পাওয়া যায়, তাহা ইতিহাস-বিরোধী। কেবলমাত্র মানসিংহ, প্রতাপাদিত্য ও ভবানন্দ সম্পর্কে কিছু ঐতিহাসিক-তথ্য পরিবেষণ করা হইয়াছে কিন্তু তাহাও বহুলাংশে বিকৃত। 'মানসিংহ-কাব্য'

রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য—কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের মহিমা-কীর্তন; এমন কি অন্নদার মাহাত্ম্য বর্ণনাও নহে, কিংবা ইতিহাসেরও মর্যাদা রক্ষা নহে। নবদ্বীপের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা, অন্নদার মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য তিনি মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন— ইহাই প্রধানত মানসিংহ-কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ প্রসঙ্গত ইহার সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, কাব্যখানির নাম 'মানসিংহ-কাব্য' না হইয়া ভবানন্দ হওয়া উচিত ছিল। মানসিংহের মত একটি খ্যাতনামা ঐতিহাসিক চরিত্রে নাম ইহার সঙ্গে যুক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই এই কাব্যের নাম 'মানসিংহ-কাব্য' রাখা হইয়াছে। মূল কাহিনীর মধ্যে প্রতাপাদিত্যের কোনও স্থান নাই—কেবলমাত্র মানসিংহকে একটু প্রাধান্য দিবার জন্যই প্রতাপাদিত্যের অবতারণা করা হইয়াছে। কাহিনীর তথাকথিত ঐতিহাসিক অংশটি সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করিয়া লইলেই বিষয়গুলি স্পষ্ট হইবে,—

যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য কর্তৃক বসন্ত রায়ের হত্যার পর বসন্ত রায়ের পুত্র কচুরায় দিল্লীতে জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। জাহাঙ্গীর প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য মানসিংহকে বাংলায় পাঠাইলেন। মানসিংহ কচুরায়কে সঙ্গে লইয়া বর্ধমান পর্যন্ত আসিলেন। ভবানন্দ মজুমদার তখন সামান্য একজন কানুনগোর কাজ করিতেন—তিনি বর্ধমান পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়া মানসিংহকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বাংলাদেশের বিস্তৃত অবস্থা তাঁহাকে জানাইলেন। যশোরের পথে মানসিংহ বাগোয়ানে আসিয়া পৌঁছিলেন—বাগোয়ানে ভবানন্দ মজুমদারের নিবাস ছিল। এখানে আসিয়া ঝড়-বাদলে মানসিংহের সৈন্যগণ অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। ভবানন্দ মানসিংহকে এই বিপদে সাহায্য করিলেন। যশোর যাইবার সময় মানসিংহ ভবানন্দকে সঙ্গে করিয়া লইলেন। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া দিল্লীর পথে ফিরিয়া চলিলেন। ভবানন্দও তাঁহাদের সঙ্গী হইলেন। পথিমধ্যে অনাহারে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হইল। ভবানন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত মানসিংহ তাঁহাকে জাহাঙ্গীরের দরবারে লইয়া উপস্থিত করিলেন। মানসিংহের নিকট হইতে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জাহাঙ্গীর ভবানন্দকে 'রাজা-ই ফরমান্' দিলেন। দিল্লীশ্বরের ফরমান লইয়া ভবানন্দ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কবি অন্নদার মুখ দিয়া ভবানন্দের ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন—এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যেও কতক ঐতিহাসিক সত্য আছে।

'মানসিংহ-কাব্য'-এর ঐতিহাসিক অংশটি কবি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছে, এই কাব্যের মূল উদ্দেশ্য ইতিহাস-কীর্তন নহে, বরং কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দের মহিমা-কীর্তন। অতএব নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। ভবানন্দের সম্পর্কেই মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের কথা

আসিয়াছে—কবির মধ্যে কোনও ঐতিহাসিক প্রেরণা হইতে তাঁহাদের কথা এখানে আসে নাই। ভবানন্দ ও কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে পাঁচ পুরুষ বা অন্তত ১২৫ বৎসরের ব্যবধান মাত্র এবং ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়া তাঁহার রচনায় অন্তত ভবানন্দ সম্পর্কে কতকটা নির্ভুল ঐতিহাসিক তথ্য আশা করা অসঙ্গত নহে। এখন দেখা যাক, ভারতচন্দ্র এই আশা কতদূর পূর্ণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

প্রথমত দেখা যাইতেছে, 'মানসিংহ-কাব্য'-এর ভিত্তি কি? ইতিহাস আলোচনার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির তখনও বিকাশ হয় নাই। ঘটকেব পুঁথি নামক এক শ্রেণীর কুলজী-গ্রন্থে খ্যাতনামা পরিবারসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিত। দুইশত বৎসরের অধিককালের বিবরণ তাহাতে পাওয়া যাইত না—তাহাও ক্রমিক ঘটনার যথাযথ ইতিহাস না হইয়া সাধারণত বিশেষ কোন সময়ের, বিশেষ ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিদিগের বিবরণই তাহাতে বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া থাকিত। জনশ্রুতি ইহাদের প্রধান ভিত্তি। প্রধানত এই শ্রেণীর ঘটকের পুঁথি অবলম্বন করিয়াই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকাল 'ক্ষিতীশ বংশাবলী' ও ভারতচন্দ্রের 'মানসিংহ-কাব্য' রচিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক কালে নবদ্বীপ রাজবংশ সম্পর্কে যে সকল জনশ্রুতি এদেশে প্রচলিত ছিল, তাহাদের সমস্তই তিনি তাঁহার কাব্যমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের জন্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যেমন তাঁহার নিজেরও লক্ষ্য ছিল না, তেমনই তৎকালীন সমাজে তাহার জন্য অন্য কাহারও দাবীও ছিল না। তথ্য পরিবেষণের পরিবর্তে মহিমা-কীর্তনই যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে তাহা আশাও করা যাইতে পারে না। যদি ভারতচন্দ্র প্রকৃতই তথ্যনিষ্ঠ হইতেন, তবে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের পারিবারিক বিবরণী হইতে ভবানন্দ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করিতে পারিতেন। নদীয়া, যশোর ও খুলনা জেলার কয়েকজন ইতিহাস রচয়িতা উক্ত 'ক্ষিতীশবংশাবলী' ও 'মানসিংহ-কাব্য'কে ভিত্তি করিয়াই তাঁহাদের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। কিন্তু কয়েকজন আধুনিক ঐতিহাসিকের গবেষণায় মানসিংহ, ভবানন্দ ও প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে সম্প্রতি প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের উদ্ধার হইয়াছে। তাঁহাদের গবেষণালব্ধ তথ্যের আলোকে নিম্নে 'মানসিংহ-কাব্য'-এর ঐতিহাসিকতা বিচার করা হইতেছে।

প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে মানসিংহের যুদ্ধ বর্ণনায়ই ভারতচন্দ্রের মূল ঐতিহাসিক ত্রুটি। সাম্প্রতিককালে গবেষণার ফলে জানিতে পারা গিয়েছে যে, প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে মানসিংহের কোনও যুদ্ধই হয় নাই;[১] মানসিংহ বারভূঞার মধ্যে এই সকল স্বাধীন ভূঞাদিগের সঙ্গে বাংলাদেশে আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন,—যেমন ইস্‌লাম খাঁ, কত্‌লু খাঁ, সুলেমান, ওস্‌মান, ঈশা খাঁ, কেদার রায় ইত্যাদি—ইঁহাদের মধ্যে প্রতাপাদিত্যের নাম নাই। মানসিংহের সঙ্গে বাংলার ভূঞাদিগের যুদ্ধের বৃত্তান্ত 'আকবর-নামা', 'ইকবালনামা-ই-

১। H B II. 251. 264-70

জাহাঙ্গীরী', 'মুন্তাখাব-উৎ-তাওয়ারিখ্', 'মখ্জান-ই-আফ্গানা'—সমসাময়িক কালে রচিত ও পারসী ভাষায় লিখিত এই সমস্ত গ্রন্থে বির্ণিত আছে। কিন্তু ইহাদের কাহারও মধ্যে প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ নাই। প্রতাপাদিত্যের বৃত্তান্ত একমাত্র 'বাহার-ই-স্তান' নামক একখানি পারসী ভাষায় লিখিত পুস্তকে বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থের রচয়িতা মিরজা নথন নামক এক ব্যক্তি ইস্লাম খাঁর সেনাপতি ছিলেন। ইস্লাম খাঁর বাংলা আক্রমণের সময় তিনি তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন এবং ইস্লাম খাঁর অভিযানের বৃত্তান্ত ডায়েরীর আকারে এই গ্রন্থে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানসিংহ দিল্লী ফিরিয়া যাইবার পর বারভূএগার বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ইস্লাম খাঁ ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় আগমন করেন। সেই সময় প্রতাপাদিত্য প্রথমে তাঁহার পুত্র ও মন্ত্রীকে পাঠাইয়া ও পরে নিজেও তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লন। প্রতাপাদিত্য ভূএগাদিগের দমন করিবার কার্যে তাহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে ওস্মানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইস্লাম খাঁ প্রতাপাদিত্যের নিকট আশানুরূপ সাহায্য না পাইয়া নিজেই প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া যান। এই অভিযান ভবানন্দের নিবাস বাগোয়ানের উপর দিয়া অগ্রসর হয়। ইস্লাম খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য পরাজিত হন। বন্দী অবস্থায় তিনি ঢাকায় (দিল্লীতে নহে) নীত হন—তাঁহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মনে হয়, লোকচক্ষুর অন্তরালে ঢাকায় মোগলের কারাগারে তাঁহার শোচনীয়ভাবে মৃত্যু হয়; কিংবা বন্দী অবস্থায় দিল্লীতে নীত হইবার কালে কাশীতে তাঁহার মৃত্যু হওয়া সম্পর্কে যে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহা সত্য হইতে পারে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। মানসিংহ ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ত্যাগ করিয়াছিলেন—তিনি আর বাংলায় ফিরিয়া আসেন নাই। ঐতিহাসিক সত্য এই যে, ইহার পাঁচ-ছয় বৎসর পর প্রতাপাদিত্যের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে—অতএব ইহার সঙ্গে ইস্লাম খাঁ জড়িত, মানসিংহ নহেন।

কোনও প্রমাণিক ইতিহাস হইতে ভবানন্দ সর্ম্পকে কিছুই জানিবার উপায় নাই। ভারতচন্দ্র তাঁহার বিষয়ে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সাধারণভাবে সত্য হইতে পারে। মানসিংহ যখন বর্ধমানে আসেন, তখন ভবানন্দ তাঁহার সঙ্গে গিয়া হয়ত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন—তখন তিনি মোগল সম্রাটের অধীনে দুই-তিনটি পরগণার জমিদার ও হুগলীর কানুনগো ছিলেন। এই সূত্রেই মানসিংহকে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া লওয়া সম্ভব। মানসিংহের বাগোয়ান যাওয়া সম্পর্কে কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। ভবানন্দ মানসিংহেরও নিকট হইতে তাঁহার বিস্তৃত জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন, ইহাও ঐতিহাসিক সত্য নহে। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্বাক্ষরিত যে দুইটি ফরমান্ কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে অদ্যাপি রক্ষিত আছে, তাহাদের প্রথমটির তারিখ ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ—ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ভবানন্দ মানসিংহের নিকট হইতে মাহমুদপুর নামক একটি পরগণা লাভ

করেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় মনে করেন যে, তাঁহার জমিদারীর সংলগ্ন এই সাধারণ জনবিরল পরগণাটি ভবানন্দ স্বাভাবিকভাবেই পাইয়াছিলেন— এইজন্য প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে তাঁহার কোন সাহায্যদানের প্রয়োজন হয় নাই।[১] কৃষ্ণনগর রাজবাটীর দ্বিতীয় ফরমান্‌টির তারিখ ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ, অর্থাৎ ইহা প্রতাপাদিত্যের পতনের পরে প্রদত্ত হয়। মনে হয় ইস্‌লাম খাঁ যখন ভাবনন্দের বাসস্থান বাগোয়ানের উপর দিয়া প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া যান, তখন তাঁহার কোনও সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ কিংবা সাহায্যের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আরও সাতটি পরগণা তাঁহাকে দান করেন— কিন্তু উক্ত 'বাহাব-ই-স্তান' কিংবা ফরমানে এই বিষয়ে কিছুই উল্লিখিত নাই; অতএব এই বিষয়ে নিঃসংশয়ে কিছুই বলিতে পারা যায় না। ভবানন্দ দুর্গাদাস ও রায় বসন্ত নামক তাঁহার দুই ভ্রাতাকে দিল্লী পাঠাইয়া প্রথম ফরমান্‌টি আনাইয়াছিলেন— তিনি নিজে দিল্লী গিয়াছিলেন বলিয়া কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই, কিন্তু তাঁহার নিজের যাওয়াও খুব স্বাভাবিক। প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে মানসিংহের সাক্ষাৎকারের কথা কোনও প্রামাণিক ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

ভারতচন্দ্র উল্লেখ করিয়াছেন যে, যশোর আক্রমণ করিবার পূর্বে মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন, দূতের হস্তে একটি তরবারি ও একটি শৃঙ্খল দিয়া বলেন, 'ইহাদের মধ্যে যে কোনও একটি তাঁহাকে বাছিয়া লইতে বলিও।' প্রতাপাদিত্য ইহাদের মধ্যে হইতে তরবারিটি তুলিয়া লইয়া দূতের মুখে মানসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন—

'কহ গিয়া,আরে চর, মানসিংহ রায়ে।
বেড়ী দেউক আপনার মনিবের পায়ে।।
লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে।
যমুনার জলে ধুব এই তলবারে।।

মানসিংহের উদ্দেশ্যেই হউক কিংবা ইস্‌লাম খাঁর উদ্দেশ্যেই হউক, প্রতাপাদিত্যের এই বীরত্ব-ব্যঞ্জক উক্তি কবি-কল্পনারই ফল বলিতে হয়। বহু বীর যোদ্ধার জীবনী সম্পর্কে অনুরূপ উক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। বিশেষত এখানে প্রতাপাদিত্যের মোগলের প্রতি আনুগত্যের কথা যখন ইতিহাসে লিখিত আছে, তখন ইহার অনৈতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

ভারতচন্দ্র যে প্রতাপাদিত্যের 'বাহান্ন হাজার ঢলী'র কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও কবি-কল্পনারই ফল বলিতে হয়। আব্দুল লতিফের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারা যায় যে, প্রতাপের বিশ হাজার সৈন্য ও সাতশত রণতরী ছিল। ভারতচন্দ্র তাঁহার রণতরীর কথা

১। নলিনীকান্ত ভট্টশালী, 'প্রতাপাদিত্যের কথা', ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৩৮, ৩৫৩-৬৩ দ্রষ্টব্য।

কিছুই উল্লেখ করেন নাই; অন্যান্য ঐতিহাসিক সূত্র হইতে প্রতাপের নৌবাহিনীর কথা জানিতে পারা যায়।

'মানসিংহ-কাব্য'-এর উপসংহারে ভারতচন্দ্র অন্নদার মুখ দিয়া কৃষ্ণনগরের রাজবংশাবলী ও তাহার রাজাদিগের সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের ঐতিহাসিক তথ্য হইতেই জানিতে পারা যায়, ভবানন্দের পর গোপাল, গোপালের পর রাঘব কৃষ্ণনগরের রাজা হন। রাঘব সম্পর্কে ভারতচন্দ্র অন্নদার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

দেগাঁয়ে আছিল রাজা দেপাল কুমার।
পরশ পাইয়াছিল বিখ্যাত সংসার।।
আমার কপটে তার হয়েছে নিধন।
রাঘবেরে দিব আমি তার রাজ্য ধন।।

দেবগ্রামের রাজা দেবপাল তন্তুবায় বংশজাত ছিলেন। 'নদীয়া কাহিনী' প্রণেতা বলিয়াছেন, 'এই উক্তির মূলে কতখানি ঐতিহাসিক সত্য আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না।[১] কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, দেবপালের বংশের পতনের পর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রাজা রাঘবের হস্তগত হয়। রাঘব সম্পর্কে ভারতচন্দ্র আরও বলিয়াছেন,—

গ্রাম দীঘি নগর যে করিবে পত্তন।
দীঘি কাটি করিবেক শঙ্কর স্থাপন।।
তার পুত্র হইবেক রাজা রুদ্র রায়।
বাড়িবেক অধিকার আমার দয়ায়।।

উদ্ধৃত বিবরণ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়াই মনে হয়। রুদ্র রায় জমিদারী বিস্তৃততর করেন, তাঁহার তিন পুত্র ছিল— রামচন্দ্র, রামজীবন ও রামকৃষ্ণ। ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

রামকৃষ্ণ ছোট তার বড় ব্যবহার।
রামচন্দ্র নিধনে রাজাই হবে তার।।
জিনিবেক শোভা সিংহ আদি রাজযাজী।
সোমযোগ করি নাম হবে সোমযাজী।।
এই ঝাঁপা হেলন করিবে অহঙ্কারে।
সেই অপরাধে আমি ছাড়িব তাহারে।।
নিধন করিব তারে দরবারে লয়ে।
রাজ্য দিব রামজীবনেরে তুষ্ট হয়ে।।

দীর্ঘ ঐতিহাসিক তথ্যকে কবি এখানে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথার ভিতর দিয়া অতি

১। কুমুদনাথ মল্লিক, নদীয়া-কাহিনী (রাণাঘাট),২৭

কৌশলে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে যে ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা এই—কনিষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণকে যোগ্যতম বিবেচনা করিয়া রুদ্র রায় তাঁহাকেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর রুদ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র ঢাকার নবাব ও হুগলীর ফৌজদারের সহায়তায় পৈতৃক জমিদারী নিজে হস্তগত করেন। একবার রামজীবন কিছু সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে গদিচ্যুত করিবার চেষ্টা করেন— কিন্তু ব্যর্থকাম হইয়া রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর রামজীবন দ্বিতীয়বার রাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামকৃষ্ণের সঙ্গে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কোন কারণে মনোমালিন্য হয়। এইজন্য রামকৃষ্ণকে তিনি ঢাকায় বন্দী করিয়া রাখেন। কারাগারে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় রামকৃষ্ণের মৃত্যু হয়—তাঁহার মৃত্যুর পর রামজীবন মুক্তিলাভ করেন ও নদীয়ায় আসিয়া এইবার পৈতৃক জমিদারী লাভ করেন।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ধমানে শোভা সিংহ প্রবল হইয়া উঠেন এবং বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামকে বধ করেন। তাঁহার পুত্র জগৎ রায় পলাইয়া আসিয়া নবদ্বীপে রামকৃষ্ণের আশ্রয়প্রার্থী হন।[১] শোভা সিংহ মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহার সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু রামকৃষ্ণের নিকট তাহারা পরাজিত হইয়া ফিরিয়া যায়। রামজীবনের চারি পুত্র ছিল—রাজারাম, রামকৃষ্ণ, রঘুরাম এবং রামগোপাল। ইঁহাদের মধ্যে রঘুরাম রাজা হইলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রঘুরামের পুত্র। কৃষ্ণচন্দ্র সম্পর্কে ভারতচন্দ্র অন্নদার মুখ দিযা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন,

শকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে।
বরগীর বিভ্রাট হইবে এই দেশে।।
আলিবর্দী কৃষ্ণচন্দ্রে ধরি ল'য়ে যাবে।
নজরানা বলি বার লক্ষ টাকা চাবে।।
বদ্ধ করি রাখিবেক মুর্শিদাবাদে।
মোরে স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে।।

আলিবর্দীর রাজ্য লাভ ও বর্গীর আক্রমণ সম্বন্ধে ইহাতে যে বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহার সঙ্গে ইতিহাসের মোটামুটি মিল আছে। এই সকল ঘটনা কবির, জীবদ্দশাতেই ঘটিয়াছিল বলিয়া এই বিষয়ে তাঁহার উক্তিসমূহ প্রামাণিক বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনাকে পল্লবিত করিয়া প্রকাশ করিবার অভ্যাস ভারতচন্দ্রের ছিল না—কিন্তু যে সকল ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না, কিংবা প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট হইতে তাহাদের বিবরণও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, কেবলমাত্র সেই সকল ক্ষেত্রেই

১। H.B. II, 98-94

ভারতচন্দ্র প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেষণ করিতে পারেন নাই। পুনঃপুনঃ বর্গীর আক্রমণের জন্য আলিবর্দীর আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল—রাজভাণ্ডার শূন্য হইয়া গেল। কৃষ্ণচন্দ্র দশ লক্ষ টাকা পৈতৃক ঋণ ও নিজের দুই লক্ষ টাকা নজরানা আলিবর্দীকে পরিশোধ করিতে না পারিয়া মুর্শিদাবাদের কারাগারে বন্দী হইলেন। কিন্তু রঘুনন্দন মিত্র নামক তাঁহার একজেন বিশ্বস্ত মন্ত্রী পরম যোগ্যতার সঙ্গে জমিদারী তত্ত্বাবধান করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই এই অর্থ সংগ্রহ করেন এবং তাহা দ্বারা মহারাজকে কারাগার হইতে মুক্ত করেন।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইতিহাস রচনার রীতি তখনও প্রচলিত হয় নাই; বিশেষত ঐতিহাসিক তথ্যের খুঁটিনাটির দিকে তখনও সমাজের কোন আকর্ষণ সৃষ্টি হইতে পারে নাই; অতএব প্রকৃত ইতিহাস বলিতে যাহা বুঝায় ভারতচন্দ্রের মধ্যে তাহা নাই। ভারতচন্দ্র যদি ইচ্ছা করিতেন, তবে ভবানন্দ সম্বন্ধে একখানি প্রামাণিক ইতিহাস কিংবা 'ঐতিহাসিক কাব্য' রচনা করিতে পারিতেন— কারণ, নবদ্বীপ রাজপরিবারের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন বলিয়া এই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিতে তাঁহার কোন অসুবিধা হইত না। কিন্তু ভারতচন্দ্রের সেই ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কৃষ্ণচন্দ্রের বংশমহিমা প্রচার— অতএব 'মানসিংহ-কাব্য' উদ্দেশ্যমূলক রচনা, সুতরাং ইহা হইতে ইতিহাস কিংবা কাব্য কাহারও পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা পাইতে পারে না।

'মানসিংহ-কাব্য'-এর কাহিনীর মধ্যে এই সকল ঐতিহাসিক ত্রুটির কথা ছাড়িয়া দিলেও কাব্য হিসাবেও যে ইহা খুব সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহাও বলিতে পারা যায় না। ইহার আখ্যায়িকার প্রকৃত কোন নায়ক কিংবা নায়িকা নাই; কাহিনীর মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ সংহতি নাই, কিংবা কেন্দ্রমুখী কোন ঐক্য নাই। ইহার মধ্যে যে কতকগুলি চরিত্র আছে, তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক কোনও যোগ নাই। আপাতদৃষ্টিতে ভবানন্দকে কাব্যের নায়ক মনে হইতে পারে; কিন্তু নায়কোচিত কোনও গুণ তাঁহার মধ্যে নাই। সেইজন্য কাব্যের মূল আদর্শই অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। যদি ভারতচন্দ্র প্রতাপাদিত্যকে অবলম্বন করিয়া প্রচলিত জনশ্রুতির ভিত্তিতেও কোনও কাব্য রচনা করিতেন, তাহা হইলেও ইহা অপেক্ষা সফলকাম হইতে পারিতেন; কারণ, জনশ্রুতিমূলক প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের মধ্যে কাব্যের নায়কোচিত উপাদান ছিল—ভবানন্দের মধ্যে তাহা ছিল না। দুই-এক জায়গায় প্রতাপাদিত্যের যে উল্লেখ আছে, তাহাতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশ না পাইলেও, কাব্যের দিক দিয়া নায়কোচিত গুণে তাহা সার্থকতা লাভ করিয়াছে— অতএব মনে হয়, ভারতচন্দ্রের মধ্যে ঐতিহাসিক কাব্য রচনার প্রতিভা ছিল, কিন্তু প্রকৃত আদর্শের অভাবে তাহা স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে নাই। এই কাব্যে ভবানন্দের জীবনের যে বাস্তব অংশটির বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতেও ভারতচন্দ্র বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। মনে হয়, তাঁহার পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে কিছু লিখিতে গিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত

সতর্কতার সঙ্গে লেখনী চালনা করিতে হইয়াছে—স্বাধীন প্রতিভা-বিকাশের অবকাশ তিনি পান নাই। সেইজন্য ইহা জীবন্ত না হইয়া নিতান্ত কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ভবানন্দ তাঁহার দুই স্ত্রীর সঙ্গে যে আচরণ করিয়াছেন, তাহার বর্ণনায় ভারতচন্দ্র তাঁহার সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন—তাঁহার নিজস্ব প্রতিভা-বিকাশের এই একটি দুর্লভ অবকাশের তিনি সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। সকল দিক বিবেচনা করিয়া বলিতে হয়, 'মানসিংহ্ কাব্য' কোনও কোনও স্থানে ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশ পাইলেও, কাব্যের দিক দিয়া ইহা সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই— ইহা রাজার-মুখাপেক্ষী রচনা, অতএব ইহার মধ্যে ইহার বেশি কিছু আশাও করা যায় না।

'অন্নদা-মঙ্গল কাব্য'- বিচার

মঙ্গলকাব্য রচনার বহির্মুখী প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াই ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করিলেও ইহার বিষয়বস্তু এবং চরিত্র পরিকল্পনার মধ্যে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় কতগুলি বিশেষত্বও প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা চণ্ডীমঙ্গলের ঐতিহ্য অনুসারী রচনা হইলেও চণ্ডীমঙ্গলে যেমন দুইটি কাহিনী আছে, ইহাতে তাহার পরিবর্তে পরস্পর স্বাধীন তিনটি কাহিনী আছে। সেই জন্য যে সকল মঙ্গলকাব্যে একটি অখণ্ড কাহিনীর ভিতর দিয়া আদ্যোপান্ত একটি রস নিবিড় হইয়া প্রকাশ পাইবার সুযোগ পাইয়াছে, ইহাতে তাহা পাইতে পারে নাই; তবে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দুইটি কাহিনীর মধ্যেও ভাবগত যেমন কোনও ঐক্য নাই, ইহাতেও তাহা নাই। তবে ইহার তিনটি কাহিনীর মধ্যে দুইটিরই দেবতা অন্নদা বা অন্নপূর্ণা, অবশিষ্ট কাহিনীর দেবতা অন্নদা নহেন, তিনি কালিকা; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কালিকার সক্রিয় কোন প্রভাব কাহিনীতে লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীর মতই অন্নদার সক্রিয় প্রভাব দুইটি কাহিনীর মধ্যে অনুভব করা যায়।

মধ্যযুগের, বিশেষত চৈতন্য-সমসাময়িক কাল হইতে, মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে ভক্তিরসের একটি ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা সমগ্র কাহিনীটির মধ্যে একটি অখণ্ডতা দান করিতে সহায়ক হইয়াছে। কিন্তু মধ্যযুগের এই ভক্তিরসের প্রবাহ অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামপ্রসাদ পর্যন্ত আসিয়াই সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, ভারতচন্দ্রের ভিতর দিয়া তাহা আর অগ্রসর হইয়া যাইতে পারে নাই। কাহিনীর ঐতিহ্য রক্ষা করিলেই যে কাব্যের ভাব রক্ষা করা যায়, তাহা নহে। ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের কাহিনী কিংবা তাহা প্রকাশ করিবার যে একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি আছে, তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করিয়া তাঁহার 'অন্নদা-মঙ্গল কাব্য' রচনা করেন নাই, একথা সত্য, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলির বহির্মুখী গঠনের অন্তরালেও যে ভক্তিরসের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যে তাহা সম্ভব করিয়া তুলিতে পারেন নাই। অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভক্তিরসের ধারা এ দেশের ভাবজগৎ হইতে যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহা নহে—তাহার নিদর্শন রামপ্রসাদ,

তাহার নিদর্শন কৃষ্ণকমল গোস্বামী, তাহার নিদর্শন শাক্ত পদাবলী। সুতরাং ভারতচন্দ্রের মধ্যে ভক্তিভাবের অভাবের জন্য মুখ্যত সমসাময়িক যুগপ্রভাব যতখানি দায়ী, ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিগত ধর্মবোধ তাহা অপেক্ষা অধিকতর দায়ী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। মঙ্গলকাব্য রচনার বহির্মুখী রীতি রক্ষা করিয়াও ভারতচন্দ্র সম্পূর্ণ আত্মসচেতনভাবেই তাঁহার 'অন্নদা-মঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। মধ্যযুগের মঙ্গলগানে প্রচারিত ধর্মবোধের সঙ্গে তাঁহার একান্ত আত্মসচেতন কবি-মানস-প্রসূত ধর্মবোধের ঐক্য ছিল না; ইহাতেই সর্বপ্রথম মঙ্গলকাব্যের মধ্যে কবির আত্মসচেতনতার সম্যক বিকাশ দেখা গেল। এ পর্যন্ত যত মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কবি আত্মনির্লিপ্ত হইয়া কেবলমাত্র প্রচলিত ভাবেরই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অন্নদা-মঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নূতন মঙ্গলগান রচনা করিতে গিয়া বহির্মুখী পরিচয়ে প্রচলিত রীতির প্রতি যে শ্রদ্ধাই প্রকাশ করুন না কেন, ইহার ভাব-বস্তুর মধ্যে আদ্যোপ্রান্ত নিজের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার কারণ ভারতচন্দ্রের প্রতিভা পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্য-রচয়িতাদিগের সমগোত্রীয় ছিল না; এমন কি, এই বিষয়ে মুকুন্দরাম অপেক্ষাও তাঁহার ব্যক্তিত্ব আরও প্রখর ছিল সেইজন্য মুকুন্দরাম মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত রূপ, রীতি এবং ভাবকে অতিক্রম করিয়া যান নাই—কেবল-মাত্র সুদীর্ঘ কাহিনীর কোনও কোনও অংশে তাঁহার নিজের জীবনের এক-আধটু স্পর্শ বুলাইয়া দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র তাহার পরিবর্তে অন্নদা-মঙ্গলে সর্বত্র তাঁহার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। ভারতচন্দ্র যে প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহার অন্যথা হইবার কোনও উপায় ছিল না। এক যুগে আবির্ভূত হইয়, একই রাজার সভাকবি হওয়া সত্ত্বেও রামপ্রসাদ এই বিষয়ে ভারতচন্দ্রের সমধর্মী ছিলেন না। রামপ্রসাদের ধর্মবোধ জাতীয় ঐতিহ্যের সূত্রেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বলিষ্ঠ অনুভূতি ছিল, তাঁহার 'অন্নদা-মঙ্গল কাব্য' সেইজন্যই তাঁহার নিজস্ব কবি-মানসের অভিব্যক্তিত্বে এক বিশিষ্ট রচনা হইয়াছে।

ভারতচন্দ্রের জীবনী ইতিপূর্বে যাহা আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে তিনি প্রথম হইতে জীবনের শেষ পর্যন্ত স্বচ্ছন্দ এবং স্বস্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে পারেন নাই, ব্যক্তিগত জীবনে নানা বিক্ষোভ এবং বিরুদ্ধ অবস্থার ভিতর দিয়া সংগ্রাম করিতে করিতেই তাঁহার জীবনের অবসান হইয়াছে শেষ জীবনে কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহে তিনি ভূমিসম্পত্তি লাভ করিয়া জীবনে স্বস্তি এবং স্থিতি লাভ করিবার যখন আশা করিতেছিলেন, তখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার বসতভূমি সমেত তাঁহার গ্রাম তাঁহার শত্রু বর্ধমান-রাজের অনুরোধে তাঁহাকে হস্তান্তর করিয়া দিলেন, তিনি এক অত্যাচারী পত্তনীদার নিযুক্ত করিয়া তাঁহার শেষজীবনও দুর্বিষহ করিয়া তুলিলেন। তাহাতেই তাঁহার শেষজীবনের স্বাচ্ছন্দ্য দূর হইয়া গেল। ভারতচন্দ্র যদি তীব্র অনুভূতিশীল এবং একান্ত আত্মসচেতন কবি না হইতেন, তবে কোন বিক্ষুব্ধ অবস্থাই তাঁহার জীবনের মধ্যে দাগ

কাটিতে পারিত না। কিন্তু তিনি সচেতনভাবে সকলই অনুভব করিয়াছেন এবং কাব্যের মধ্যে তাহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। বর্ধমান-রাজের নিকট তাঁহার অকারণ-লাঞ্ছনার অপমান তিনি সমগ্র জীবনে ভুলিতে পারেন নাই এবং তাহারই প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য তিনি বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর সঙ্গে বর্ধমান-রাজপরিবারকে আনিয়া যুক্ত করিয়াছেন। ক্ষুদ্র শক্তি এবং সামর্থ্য লইয়া তিনি যে সে যুগে বর্ধমান-রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইতে মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষ দিকের পরিচয় পাওয়া যাইবে। প্রতিশোধ গ্রহণ স্পৃহা তাঁহার চরিত্রের মধ্যে প্রবল ছিল· কেবলমাত্র ব্যক্তির বিরুদ্ধে নহে, সমাজের বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রচলিত সমাজব্যবস্থার প্রতি তাঁহার ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের প্রকাশই তাহার অন্যতম নিদর্শন।

চণ্ডীমঙ্গল প্রণেতা মুকুন্দরামেরও ব্যক্তিগত জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল এই কথা সত্য; কিন্তু মুকুন্দরাম ভক্তির মধ্যে তাঁহার জীবনের সকল সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। তারপর আড়রার জমিদার গৃহে আশ্রয় লাভ করিয়া সরল অনাড়ম্বর জীবনের মধ্যে পরম প্রশান্তি লাভ করিয়াছিলেন। মুকুন্দরাম জীবনে দরিদ্রের সন্তান ছিলেন, সুতরাং যত সহজে তাঁহার জীবনের প্রশান্তি ফিরিয়া আসা সম্ভব হইয়াছিল, ভারতচন্দ্রের মধ্যে তত সহজে তাহা সম্ভব ছিল না; কারণ, ভারতচন্দ্র অভিজাত জমিদার পরিবারের সন্তান, অন্যায়ভাবে অধিকতর পরাক্রমশালী ভূস্বামী দ্বারা নিগৃহীত এবং পিতৃসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত। শক্তির এই দম্ভ এবং উৎপীড়ন তাঁহার নিকট দুঃসহ হইয়াছিল, তিনি তাহার প্রত্যক্ষ কোনও প্রতিকার করিতে না পারিয়া নিষ্ফল আক্রোশে কেবল গর্জন করিয়াছেন। 'ভূপতি নরেন্দ্র রায়'-এর পুত্র হইয়া পরানুগ্রহে জীবনধারণের মধ্যে তাঁহার কোন দিনই স্বস্তি দেখা দিতে পারে নাই। তাঁহার অন্তরের এই চির-অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যেই তাঁহাকে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে তাঁহারই গৃহদেবতা অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে হইয়াছে। সুতরাং এই দেব-মাহাত্ম্য কীর্তনের মধ্যে কবির অন্তরের কোনও যোগ স্থাপিত হইতে পারে নাই, সেইজন্যই তাহা অন্তঃসারশূন্য হইয়াছে। তাই 'অন্নদা-মঙ্গল' অন্নদার প্রতি ভক্তিহীন রচনায় পরিণত হইয়াছে। মধ্যযুগের আর কোনও মঙ্গলকাব্যের কবিরই এই দুর্ভাগ্য হয় নাই। তাঁহাদের কবিত্ব যে স্তরেরই থাকুক, তাঁহাদের কোন রচনার মধ্যেই ভক্তির অভাব আছে, এই কথা বলিতে পারা যাইবে না। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কবিত্ব যে স্তরেরই থাকুক, তাহাতে যে ভক্তিরসের স্পর্শ ছিল না, একথা সত্য।

অনেকে ভারতচন্দ্রের রচনায় ভক্তিহীনতার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ-প্রভাবকেই দায়ী করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে ভক্তিরসের যে একান্ত অভাব দেখা দিয়াছিল, তাহা নহে; কারণ, সেই যুগেই গভীর ভক্তিরসাশ্রিত শাক্ত পদাবলীর উদ্ভব এবং বিকাশ হইয়াছে. সেই যুগেই শাক্ত সাধক রামপ্রসাদ ভক্তির পরাকাষ্ঠা

দেখাইয়া গিয়াছেন। ভক্তির প্রেরণা যতখানি বহির্মুখী সমাজগত, তদপেক্ষা অধিক ব্যক্তিগত। এমন কি, বিংশ শতাব্দীর সর্ব্বব্যাপী বিজ্ঞান এবং বুদ্ধিবাদের যুগেও সুগভীর ভক্তিপরায়ণ সাধকের অভাব নাই। সুতরাং ভারতচন্দ্রের মনে যদি ভক্তির প্রেরণা যথার্থই থাকিত, তবে যুগ তাহাতে বাধা সৃষ্টি করিতে পারিত না। কিন্তু একান্ত আত্মসচেতন কবি ভারতচন্দ্র নিতান্ত যুগপ্রভাবেই সম্পূর্ণ ভাসিয়া যাইতে পারেন নাই।

ভারতচন্দ্র অত্যন্ত স্বাধীনচেতা এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সেজন্য নিজ ভ্রাতাদিগের সঙ্গেও তাঁহার মনোমালিন্য হইয়াছিল। তিনি পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার পাঠ শেষ হইবার পূর্বেই নিতান্ত অল্প বয়সে পরিবারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একমাত্র নিজের ইচ্ছায় বিবাহ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা তাঁহার অভিভাবক ছিলেন, সে যুগে অভিজাত বংশে একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে অভিভাবকদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্মহীন যুবকের স্বেচ্ছায় বিবাহ করিবার দৃষ্টান্ত ছিল না বলিলেই হয়। বিশেষত ভারতচন্দ্র যে বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভ্রাতাদিগের পরিবারের কাহারও মনঃপুত ছিল না, সেইজন্য ভারতচন্দ্র তাঁহার পত্নীকে লইয়া নিজগৃহে বাস করিতে পারেন নাই। বিবাহের প্রথম দিকে তাঁহার পত্নীকে পিতৃগৃহেই বাস করিতে হয়; ইহাতেই জীবনের প্রথম হইতেই ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব যে কত প্রখর ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

ভারতচন্দ্র যখন সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া গৃহে ফিরিলেন, তখন কতকটা তাঁহার বিবাহের জন্যও পরিবারের সকলে অপ্রসন্ন ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কেহ অভিনন্দন জানাইয়া গ্রহণ করেন নাই। বরং সংস্কৃত বিদ্যা অর্থকরী বিদ্যা নহে বলিয়া তাঁহাকে সকলে তিরস্কৃত করিলেন। কাহারও তিরস্কার সহ্য করিবার মত চরিত্র ভারতচন্দ্রের ছিল না, তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহ ত্যাগ করিয়া দেবানন্দপুরে রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে আসিয়া পারসী ভাষায় শিক্ষা লাভ করিলেন। তারপর যখন তিনি গৃহে ফিরিলেন, তখন তাঁহাকে তাঁহাদের ভূসম্পত্তি বিষয়ক এক দুরূহ দায়িত্বের ভার দিয়া ভ্রাতারা বর্ধমান-রাজসরকারে পাঠাইলেন। সেখানে গিয়া তিনি অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ হইলেন। কিন্তু বর্ধমানরাজের এই অপমান তিনি মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন না; কঠিন প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তাহার ফলে বর্ধমান-রাজপরিবারকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার অন্নদা-মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের সৃষ্টি হইল। বর্ধমান-রাজপরিবারের মধ্যে চিরদিনের জন্য একটি কলঙ্কের দাগ লাগিয়া গেল। ভারতচন্দ্রের প্রতিহিংসার কতকটা নিবৃত্তি হইল। ভারতচন্দ্র অন্যায়কে সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার কাব্যের মধ্যে বিশেষত যাহারা ন্যায়ের নামে অন্যায় আচরণ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে তিনি তীব্রতম ব্যঙ্গের কশাঘাতে আহত করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার কোন ক্ষমা ছিল না। সেখানে ভূপতিই হোক, কিংবা সমাজপতিই হোক, কোথাও তিনি আপোষ মীমাংসা করিতে চাহেন নাই। এই মনোভাব তাঁহার কাব্যের ভিতর নানাভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল।

পুরীতে গিয়া ভারতচন্দ্র সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে মিশিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলেন, কিন্তু যাঁহার মনে বিদ্যাসুন্দরের চিন্তা অঙ্কুরের মত বিরাজ করিতেছিল, সন্ন্যাসের আচার তাঁহার আত্মগোপন করিবার ছদ্মবেশ মাত্র ছিল; সেইজন্য তীর্থের পথে অগ্রসর হইবার সময় সহসা তাঁহার সন্ন্যাসের সাজ খসিয়া পড়িল, এক মুহূর্তেই তিনি পুনরায় দাম্পত্য জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। ভবিষ্যৎ বিদ্যাসুন্দরের কবি ভারতচন্দ্রের মানসিক প্রকৃতির এখানেই একটি উল্লেখযোগ্য ইঙ্গিত পাওয়া গেল। কেহ অনুমান করিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের সন্ন্যাসী সাজিবাব কারণ, 'জীবনযুদ্ধে পরাজিত ভগ্ন শ্রান্ত ভারতচন্দ্র অধ্যাত্ম জীবনে শান্তি খুঁজেছেন।' কিন্তু ভারতচন্দ্রের মনে অধ্যাত্মচিন্তার কোনও স্পর্শ ছিল না, অধ্যাত্ম জীবনে শান্তি থাকিতে পারে বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করে, ভারতচন্দ্র তাহাদের প্রকৃতির লোকই ছিলেন না। তাঁহার জীবনের একটি সহজ সরল পথ ছিল, তাহা প্রত্যক্ষ ভোগের পথ। ভারতচন্দ্র ভোগবাদী কবি; প্রত্যক্ষ জীবনের অতৃপ্তভোগের মধ্যে কোনও আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা থাকিতে পারে না। জীবনভোগের মধ্যেও তাঁহার নিকট কোনও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নাই। সেইজন্য যৌবনে তিনি যে সন্ন্যাসী সাজিলেন, তাহা কোনও আধ্যাত্মিক পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য নহে, বরং কেবলমাত্র আত্মগোপন করিবার উদ্দেশ্যে। একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে তিনি সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলেন মাত্র, সন্ন্যাসে দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই সেইজন্য শ্যালিকা-পতির গৃহে আসিয়া অতি সহজেই সেই সাজ খুলিয়া ফেলিয়া ছিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া পত্নীকে পিত্রালয় হইতে লইয়া আসিয়া দাম্পত্য জীবনে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িলেন; যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গী হইয়া তিনি আসিয়াছিলেন, তাহারা তীর্থের পথে চলিয়া গেল, তিনি গার্হস্থ্য জীবনের বন্ধনে সেখানে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর আর দশজন সাধারণ গৃহস্থের মতই কর্মের সন্ধানে বাহির হইলেন। ভোগজীবনের প্রতি তীব্রতম আসক্তিই ভারতচন্দ্রের ধর্ম ছিল, ইহার অতিরিক্ত তাঁহার মধ্যে আর কিছু ছিল না।

ব্যক্তিগত জীবনে ভারতচন্দ্র চরিত্রবান ব্যক্তি ছিলেন এই বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। তিনি অপরের জন্য ভোগের নৈবেদ্য সাজাইলেও নিজে তাহা গ্রহণ করেন নাই। এমন কি, কালিদাসের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে যে সকল জনশ্রুতিমূলক কাহিনী প্রচলিত আছে, বিদ্যাসুন্দরের কবি ভারতচন্দ্রের নামে তাহা নাই। তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নী তাঁহার পরিবারের অবাঞ্ছিতা হইলেও নিজে কোনদিন পত্নীর প্রতি দায়িত্ব পালন করিতে অবহেলা করেন নাই। পিতার প্রতিও তিনি কর্তব্য পালনে বিমুখ ছিলেন না। কিন্তু তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরদিগের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না; কারণ, অন্যায়কে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না।

অন্নদা-মঙ্গল কাব্যের মূল ভাবটি ভারতচন্দ্র তাঁহার একটি চরিত্রের মুখে একটি মাত্র পদে এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' পারত্রিক

জীবনের কোন কল্যাণ নহে, বরং তাহার পরিবর্তে পার্থিব ভোগ-বাসনার চরিতার্থতাই জীবনে একমাত্র কাম্য—ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল কাব্যের ইহাই মুখ্য বক্তব্য। একথা বলাই বাহুল্য, এই বিষয়ে মঙ্গলকাব্যের মূল সুরটিই তিনি অনুসরণ করিয়াছেন, এই বিষয়ক ঐতিহ্যের ধারা হইতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নাই। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে ভোগজীবনের যে চরিতার্থতার কথা আছে, ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত তাহার মধ্যে কোথাও অসংযম প্রকাশ পায় নাই। ইহার প্রধান কারণ, তখন পর্যন্ত ইহাদের মধ্য হইতে দেবতার প্রতি ভক্তি দূর হইয়া নাই। মনুষ্যের ভোগজীবনের সার্থকতার মধ্যে দেবতার আশীর্বাদ সর্বদাই সক্রিয় ছিল। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মধ্যে দেবতার প্রতি কোন ওশ্রদ্ধাভাব ছিল না, বিশেষত তিনি সমাজ এবং পরিবারের নানা উৎপীড়ন নানাদিক হইতে সহ্য করিয়া যে অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে দিন যাপন করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার মত ব্যক্তির পক্ষে সে-যুগে ভক্তিমার্গে আশ্রয় লওয়া সম্ভব ছিল না। দেবতা, মানুষ এবং সমাজ সকলের উপরই এক গভীর বীতস্পৃহ ভাব লইয়া তিনি ইহাদের সকলকেই ব্যঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যিনি দেবদেবীর চরিত্রের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন, তিনি মানুষের প্রতিও শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারিলেন না। সেইজন্য তাঁহার 'বিদ্যাসুন্দর কাব্যে'র মধ্যে ভোগের এমন অসংযত উপকরণ সাজাইবার দুঃসাহস প্রকাশ করিলেন। ইহা তাঁহার দেবতা এবং সমাজের উপর ব্যক্তিগত আক্রোশ এবং অবিশ্বাসেরই পরিচায়ক। বিশেষত কৃষ্ণচন্দ্রের কৃত্রিম নাগরিক জীবনের প্রাণহীন বিলাসিতার প্রতি তাঁহার কোনও সমর্থনই ছিল না; সেইজন্যই তিনি বিদ্যাসুন্দর কাব্যে নাগরিক চতুরালির বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে বিদ্যা এবং সুন্দরের বিলাস-জীবন বর্ণনায় কবি কোনও সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবনরসের অভিব্যক্তি দেখাইতে যান নাই; বরং তাহার পরিবর্তে নাগরিক বিলাস-জীবনের কৃত্রিম এক রূপ প্রকাশ করিয়াছেন; ইহা তাঁহার জীবনের বিশ্বাস হইতে রচিত হয় নাই, বরং কৃত্রিম নাগরিক জীবনের প্রতি অবিশ্বাস হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা বিদ্যা এবং সুন্দরের সুস্থ জীবনের অনিবার্য ধারায় বিকাশ লাভ করে নাই, বরং এক বিকারগ্রস্ত মনোভাবের অভিব্যক্তি রূপেই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার মধ্যে কেহ কেহ যৌবনের রূপ দেখিয়াছেন; কিন্তু যৌবনের মধ্যে সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবনের পরিপূর্ণতার বিকাশ দেখা যায়; কিন্তু ভারতচন্দ্রের মানসিকতায় যেমন সেদিন নাগরিক জীবন সম্পর্কে অশ্রদ্ধা এবং অবিশ্বাস প্রকাশ পাইয়াছিল এবং তাহা দ্বারা স্বাভাবিক নাগরিক চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব ছিল না, তেমনই বিদ্যা এবং সুন্দরের মধ্যে স্বাভাবিক এবং সুস্থ জীবনের রূপ প্রকাশ পাইতে পারে নাই। যৌবন শব্দের অর্থ অসংযম এবং উচ্ছৃঙ্খলতা নহে, তাহাতে প্রাণ এবং শক্তির প্রাচুর্য থাকিলেও তাহাদের অসঙ্গত অপচয়ের কথা নাই; কিংবা বিকারগ্রস্ত অস্বাভাবিক মানসিকতা যৌবনের পরিচায়ক হইতে পারে না। সুতরাং ভারতচন্দ্রে যথার্থ যৌবনের পরিচয় নাই, বরং অযথা অসংযমের পরিচয় আছে।

ভারতচন্দ্র ভোগবাদের কবি হইলেও ভোগমত্ততার কবি নহেন। কোনও অবস্থাতেই মত্ততা জীবনের স্বাভাবিক রূপ নহে; ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে ভোগমত্ততার চিত্র আছে; কিন্তু প্রকৃত ভোগের চিত্র নাই।

ভোগবাদেরও একটি জীবন-দর্শন আছে, বিদ্যা এবং সুন্দরের ভোগজীবনের মূলে কোন জীবন-দর্শন নাই, একথা সহজেই অনুমান করা যায়। ভারতীয় প্রাচীন মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ মিথুন মূর্তিগুলিরও একটি দর্শন কিংবা তত্ত্ব আছে, কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের নির্লজ্জ বিহার বর্ণনার মধ্যে কোনও দর্শন কিংবা তত্ত্ব আছে একথা কেহ বলিবেন না। একথা কেহ মনে করিতে পারেন যে, মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ মিথুন মূর্তিগুলির যদি কোন দর্শন কিংবা তত্ত্ব থাকে, তবে বিদ্যাসুন্দরের বিহার বর্ণনার মধ্যে দর্শন কিংবা তত্ত্ব থাকিবে না কেন? কিন্তু একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মিথুন মূর্তিগুলি মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ থাকে, কোন গৃহস্থের অট্টালিকায় উৎকীর্ণ থাকে না। মিথুন মূর্তিগুলির পটভূমিকায় যে দেবমন্দির রহিয়াছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া ইহাদের বিচার করা চলিতে পারে না। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের বিহার বর্ণনায় কোন দৈব কিংবা স্বর্গীয় পটভূমিকা নাই—নাগরিক বিলাস-জীবনের একটা বিকৃত রূপই ইহার পটভূমিকা। দেহবাদ কিংবা ভোগবাদের মধ্যেও যে জীবন-দর্শন আছে, তাহা বিদ্যাসুন্দরের বিহার বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং জীবনদর্শন-নিরপেক্ষ অসংযত জৈব আচার কোনও সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের স্বাদ দিতে পারে না, বিদ্যাসুন্দরের কাব্যও তাহা দিতে পারে নাই।

ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে সমাজ এবং তাহার নাগরিক বিলাসিতাকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন, ইহার মাধ্যমে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার বিলাস-জীবনকেই পরোক্ষে ব্যঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইবে। তাঁহার বর্ণনায় কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার আন্তঃসারশূন্যতা যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনই রাজসভার ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দিকটি বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সংযতচারী, আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন অনুভূতিশীল কবি এই রাজসভার সভ্য থাকিয়াও নিজেকে ইহার বিলাস-স্পর্শ হইতে ঊর্ধ্বে রাখিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বের একটি পরিপূর্ণ ভোগচিত্র অঙ্কন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; যদি তিনি ইহার মধ্যে লিপ্ত হইয়া পড়িতেন, তবে তাহা কদাচ সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিতেন না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যক্তিগতভাবে সুগভীর সাধন-ভজন করিবার দৃষ্টান্ত সমাজে বিরল না থাকিলেও সামগ্রিকভাবে যে সমাজের ধর্মভাবে শৈথিল্য দেখা দিয়াছিল, একথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ, ভারতচন্দ্র যেভাবে দেবদেবী লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন, তাহার পশ্চাতে সামাজিক সমর্থন না থাকিলে তিনি তাহা করিতে কখনও সাহসী হইতে পারিতেন না। সাধারণের সমাজ রাজসভা দ্বারাও প্রভাবিত হইয়া থাকে; ভারতচন্দ্রের যে রচনায় কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার সমর্থন ছিল তাহার উপর জনসাধারণেরও

সমর্থনের অভাব ছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। সুতরাং ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যকে যুগ-ভাবনার অভিব্যক্তিরূপে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায়। এইখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে, ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যে যেভাবে সমাজ, ব্যক্তি এবং দেবদেবীকে লইয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ধর্মবিষয়ে কি ধারণা কিংবা উপলব্ধি ছিল, তাহা কি কিছু অনুমান করা যাইতে পারে? অর্থাৎ 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যে ভারতচন্দ্রের নিজস্ব ধর্মবোধের কি কোন পরিচয় পাওয়া যায়? মুকুন্দরামের রচনা পাঠ করিয়া কেহ তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়াছেন, কেহ তাঁহাকে পঞ্চোপাসক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন; ভারতচন্দের রচনার মধ্য দিয়াও কি তাঁহার এই প্রকার ধর্মবোধের কোনও অভিব্যক্তি হইয়াছে? তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্মবোধ দ্বারা কি তাঁহার কাব্য রচনা কোনদিক দিয়া নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে? কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতচন্দ্র প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, সুতরাং তাঁহার কাব্যের মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্মবোধের স্বাক্ষর থাকা স্বাভাবিক। যদি তাহা থাকে, তবে তাহা কি, তাহাও ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সামগ্রিকভাবে সমাজের ধর্মচেতনায় যে শৈথিল্যই দেখা দিক না কেন, ব্যক্তিগতভাবে সাধন-ভজন করিবার মত লোকের অভাব ছিল না; এমন কি সেই যুগেই শাক্ত পদাবলীর উদ্ভব কিংবা বৈষ্ণব পদাবলীর যে পুনর্জাগরণ দেখা দিয়াছিল, তাহার মূলেও যুগের একটি প্রেরণা সক্রিয় ছিল। ভারতচন্দ্রও তাঁহার 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য গীতি রচনা করিয়াছিলেন, কোনও কোনও গীতের মধ্যে ভক্তির কথাও আছে, ইহাদের সঙ্গে তাঁহার প্রাণের যোগ কতখানি স্থাপিত হইয়াছিল এবং কতখানি রীতি রক্ষা মাত্র করা হইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে।

ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যের প্রথম খণ্ডের একটি গীতে উল্লেখ করিয়াছেন,

ধর্মে জানি সুখ হয় তবু মনে নাহি লয়,
অধর্মে বিবিধ ভয় তবু তাই সাধে।
মিছা দারা সুত লয়ে মিছা সুখে সুখী হয়ে,
যে রহে আপনা করে, সে মজে বিষাদে।
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের আর সব মিছাফের,
ভারত পেয়েছে টের গুরুর প্রসাদে।।

হরগৌরীর বিবাদের সূচনায় ভারতচন্দ্র এই গীতিটি রচনা করিয়াছেন, ইহা কি তাঁহার নিজস্ব উপলব্ধির কথা? ইহা হইতেই সাধারণভাবে বুঝিতে পারা যাইবে যে তাঁহার রচিত এই প্রকার গীতগুলির মধ্য দিয়া ধর্ম বিষয়ে তাঁহার কোনও ব্যক্তিগত ধারণা কিংবা বিশ্বাস প্রকাশ হইয়াছে কি না।

দেখা যাইতেছে যে, তিনি ইহাতে 'দারাসুত'কে মিথ্যা বলিয়া প্রচার করিতেছেন; কিন্তু ভারতচন্দ্রের জীবনে তাহা সত্য ছিল না। তিনি এখানে যে 'গুরুর প্রসাদে'র কথাও উল্লেখ

করিলেন, এই বিষয়টিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। তিনি গুরুবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, একথাও কিছুতেই মনে হইতে পারে না। তাঁহার রচনায় আর কোথাও গুরুর বন্দনা কিংবা উল্লেখ মাত্রও নাই। সুতরাং এই গীতের মধ্যে তিনি যে ধর্মের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজ জীবনের উপলব্ধি, তাহা মনে হইতে পারে না। ইহা গতানুগতিক বর্ণনা। প্রত্যেক পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইবার পূর্বে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে যে দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক বিষ্ণুপদ শ্রেণীর গীতি রচিত হইত ইহার মধ্যে সেই প্রাণহীন প্রথারই অনুকরণ করা হইয়াছে। ইহার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের অন্তরের কোনও যোগ স্থাপিত হইয়াছিল, এই কথা কিছুতেই মনে করা যাইতে পারে না।

'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্য শিব-কাহিনীমূলক রচনা; কিন্তু শিবভক্তিমূলক রচনা নহে। সংস্কৃত কবি কালিদাসের জীবনের বিস্তৃত কাহিনী জানিতে পারা যায় না, তথাপি তিনি যে শৈব ছিলেন, তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না; কারণ, তাঁহার 'কুমারসম্ভব কাব্য' কেবলমাত্র শিবকাহিনীমূলক রচনাই নহে, শিবের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিমূলক রচনা। এমন কি, কালিদাসের যে রচনায় মুখ্যত শিব প্রসঙ্গ লাভ করেও নাই, তাহাতেও তিনি নানাভাবে শিবের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়া তাঁহার নিজস্ব ধর্মবোধের পরিচয়কে সুস্পষ্ট করিয়াছেন। সৌন্দর্যের কবি এবং সম্ভোগের কবি হওয়া সত্ত্বেও ধর্মবিষয়ে একটি সুস্পষ্ট আদর্শ যে কালিদাসের সম্মুখে ছিল, এই কথা বুঝিতে কোন ভুল হয় না। কিন্তু ভারতচন্দ্রের তাহা ছিল না, তিনি শিবকাহিনীমূলক রচনা প্রকাশ করিলেও তাহা শিবভক্তিমূলক রচনারূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। বরং যাহা করিয়াছেন, তাহা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অথচ একথাও সত্য, তিনি তাঁহার গীতগুলিতে আপাতদৃষ্টিতে ভক্তিমূলক এই প্রকার পদও রচনা করিয়াছেন—

ভারত কাতর হয়ে ডাকে শিব শিব ক'য়ে
ভবনদী পারে লয়ে দূর কর ভয় হে।

বিদ্যাসুন্দরের কবি ভারতচন্দ্র 'ভবনদী পার' হইবার জন্য যে খুব ব্যাকুল ছিলেন, তাহা নহে—একথা সকলেই মনে করিবেন। সুতরাং এই শ্রেণীর গতানুগতিকধর্মী রচনার সঙ্গে তাঁহার অন্তরের যোগ ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

অন্নদা-মঙ্গল কাব্যের কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদার প্রতিও যে একান্ত আন্তরিক ভক্তি ছিল, তাহাও মনে করিবার কোনও কারণ নাই; তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহারই গৃহদেবতা অন্নদার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া ইহাতে নিজের বৃত্তি রক্ষা করিয়াছেন মাত্র, ইহা তাঁহার অন্তরের কোন স্পর্শ লাভ করিতে পারে নাই।

সুতরাং দেখা গেল, অন্নদা-মঙ্গল কাব্যের কবি অন্নদার প্রতি ভক্তিবশত যে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা নহে— প্রতিপালক রাজার আদেশে রাজার গৃহ-দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন মাত্র। নিজের কথা ইহাতে কিছু বলেন নাই।

অন্নদা-মঙ্গল কাব্যের প্রথম খণ্ডের মধ্যে ভারতচন্দ্র শিব এবং বেদব্যাস এই দুইটি চরিত্রকেই ব্যঙ্গের পাত্র করিয়াছেন, কৃষ্ণচন্দ্রের গৃহদেবতা বলিয়া অন্নদাকে তাহা হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন, তবে যেভাবে চণ্ডী নিজের ভক্তদিগের সঙ্গে স্বেচ্ছাচাব করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে শ্রদ্ধার পাত্রী করিয়াও তুলিতে পারেন নাই। অন্নদা ছলনা করিয়া এক ভক্তের গৃহ হইতে আর এক ভক্তের গৃহে গিয়া আবির্ভূত হইতেছেন। এইখানে মঙ্গলকাব্যের দেবী চরিত্রের মৌলিক গুণ রক্ষা করিতে তিনি যত যত্নবান ছিলেন, নিজের ধর্মোপলব্ধি প্রকাশ কতিতে তত যত্নবান ছিলেন না। কারণ, ভারতচন্দ্রের মত বিদগ্ধ ব্যক্তি অন্নদার আচরণের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পরিস্ফুট কারিয়াও তাঁহার অন্নদা-মঙ্গল কাব্যের কাহিনী রচনা করিতে পারিতেন; কিন্তু কোনও দেবদেবীর চরিত্রই ভারতচন্দ্রের পরিকল্পনায় সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে নাই।

ব্যাস প্রসঙ্গ বর্ণনার স্থলে ভারতচন্দ্র সর্বধর্ম-সমন্বয়ের কথা বলিয়াছেন; কেহ ইহাকেই তাঁহার নিজস্ব ধর্মোপলব্ধি বলিয়া মনে করিয়াছেন। যাঁহার মনের মধ্যে এক ধর্মই বিশ্বাস আছে কি না তাহা সন্দেহের বিষয় হইয়া দাঁড়াইতে পারে, তাঁহার মধ্যে সর্বধর্মে বিশ্বাসের কথা কি ভাবে আসিতে পারে, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। ব্যাসের কাহিনীর ভিতর দিয়া সে যুগের বৈষ্ণবধর্মের গোঁড়ামিকে তিনি নিন্দা করিয়াছেন।

যে কোনও ধর্ম বিষয়েই গোঁড়ামি যে নিন্দার কারণ ভারতচন্দ্রের মত সুনিপণ সমাজদ্রষ্টা তাহা অতি সহজেই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি শিবের মুখ দিয়া ব্যাসের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

দেখ দেখ ওরে নন্দী ব্যাসের দুর্দৈব।
ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হৈল গোঁড়া শৈব।।
যবে ছিল বিষ্ণুভক্ত মোরে না মানিল।
যদি হৈল মোর ভক্ত বিষ্ণুরে ছাড়িল।।
কি দোষে মুছিল হরিমন্দির ফোঁটায়।
কি দোষে ফেলিল ছিঁড়ি তুলসী মালায়।।
হের দেখ তুলসী পত্রের গড়াগড়ি।
বিল্বপত্র লইয়া দেখহ বাড়াবাড়ি।।
হের দেখ টানিয়া ফেলিল শালগ্রাম।
রাগে মত্ত হইয়া ছাড়িল হরিনাম।।
মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি।
আমি ত তাহার পূজা গ্রহণ না করি।।

অষ্টাদশ শতাব্দী প্রথম হইতেই ধর্ম-বিষয়ক গোঁড়ামি সামাজিক ব্যঙ্গের কারণ হইয়াছিল, পরবর্তী শতাব্দীতে এই মনোভাবের পূর্ণতর বিকাশ দেখা দিয়াছিল। উদ্ধৃত

অংশে ধর্মসমন্বয় প্রচার অপেক্ষা ধর্মা॰ াণের গোঁড়ামিকেই অধিকতর ব্যঙ্গ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে। কারণ, ভারতচন্দ্রের বুদ্ধিবাদী মন ধর্মবিষয়ক যে ধারণাই পোষণ করুক না কেন, সে-যুগের ধর্ম-বিষয়ে গোঁড়ামিকে যে সহ্য করিতে পারে নাই, ব্যাসের প্রসঙ্গ তাহারই নিদর্শন।

ভারতচন্দ্রে ধর্মসমন্বয়ের কথা তাঁহার নিজস্ব ধর্মবিষয়ক কোনও মনোভাব হইতে যে আসিয়াছে, তাহা মনে করিতে পারা যায় না, বরং তাঁহার কাব্যে তাহা যুগপ্রভাববশত আসিয়াছে। মুসলমান আক্রমণের পর হইতেই ধর্ম সমন্বয়ের একটি সমস্যা এই জাতির মনে নানাভাবে উদয় হইয়াছে, ভারতচন্দ্রের পূর্বেই সমাজে উহার একটি সুস্পষ্ট রূপও প্রকাশ পাইয়াছিল। সত্যপীরের পরিকল্পনায় দুইটি বিপরীতমুখী ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনেব প্রয়াস দেখা যায়। কৃষ্ণ-কালী পরিকল্পনার মধ্যেও তাহার একটি রূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, চৈতন্যদেবের ধর্ম প্রচারিত হইবার পর হইতে এই ভাব বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। চৈতন্যদেব নিজেও যে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যেও ধর্মসমন্বয়বাদ এক বিশেষ প্রেরণা লাভ করিয়াছিল। আদি মধ্যযুগে রচিত অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণগুলির মধ্যেও সর্বধর্মসমন্বয়েরে কথা প্রকাশ পাইয়াছে। বাংলার বাউল ধর্ম এই ধর্মসমন্বয়ের আদর্শেরি উপরই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পঞ্চোপাসক বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্মজীবন পরিকল্পনার মধ্যেও ইহার প্রেরণা ছিল। সুতরাং ধর্মসমন্বয়ের কথা ভারতচন্দ্রের মধ্যে কোনও নূতন কথা নহে, কিংবা ইহার ভিতর দিয়া তাঁহার যে কোনও বিশিষ্ট ধর্মীয় মনোভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহাও মনে করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। ভারতচন্দ্রের কাব্য পাঠ করিলে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে কোন্ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন, তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদা-মঙ্গল কাব্যের প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের সূচনায় যে গীতগুলি রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যে আন্তরিক ভক্তির ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বলা কঠিন। তিনি গীতগুলির মধ্যে শিব এবং অন্নদার বন্দনা করিয়াছেন, কিন্তু কাহিনীর প্রায় সর্বত্রই শিবকে লইয়া ব্যঙ্গ এবং অন্নদা ছলনাময়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং গীতগুলির মধ্যে সমসাময়িক একটি রীতি রক্ষা পাইয়াছে মাত্র; তারপর গীতগুলির বহিরঙ্গ রচনায় যে পারিপাট্য দেখা যায়, ইহাদের অন্তরঙ্গ ভাবের মধ্যে সেই গভীরতা নাই। কারণ, যেখানে বহিরঙ্গের রূপসজ্জায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সেখানে অন্তরঙ্গের দৈন্য অনেক সময়ই ঘুচিতে পারে না। তারপর পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ব্যাসের চরিত্র বর্ণনাতেও ভারতচন্দ্রের বৈষ্ণবধর্মবিষয়ক মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

মঙ্গলকাব্যের কবিদিগের মধ্যে ভারতচন্দ্রের ধর্মবোধের যে অনিশ্চয়তা দেখা যায়, আর কাহারও মধ্যে তাহা দেখা যায় না। কারণ, অন্যান্য কবি নিজেদের ব্যক্তিগত ধর্মবোধের প্রেরণায় কাব্য রচনা করিয়াছেন, অনেকে কবিত্বের প্রেরণা না থাকা সত্ত্বেও

তাহা করিয়াছেন, কিন্তু ভারতচন্দ্র পরের আদেশে পৃষ্ঠপোষকের পারিবারিক গৃহদেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। সেইজন্য অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের কবির সঙ্গে তাঁহাদের অন্তরের যে কোন যোগ স্থাপিত হইত, ভারতচন্দ্রে তাহা হইতে পারে নাই।

ভারতচন্দ্রের সমাজ-জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা যে কত ব্যাপক ছিল, তাঁহার ব্যঙ্গ যে কতখানি তীক্ষ্ণ ছিল, তাহা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশ হইতে জানিতে পার যায়। মঙ্গলকাব্যের নায়ক দর্শনে নারীদিগের নিজ নিজ পতিকে নিন্দা করা একটি গতানুগতিক বর্ণনার বিষয়। ইহার ভিতর দিয়া যে মনোভাবই প্রকাশ পাক না কেন, ক্রমে ইহা এক নিতান্ত গতানুগতিক বর্ণনায় মাত্র পর্যবসিত হয়। কিন্তু ভারতচন্দ্র তাঁহার প্রত্যক্ষ সমাজ-দর্শনের অভিজ্ঞতা লইয়া এই বর্ণনাটিকে যেমন বিচিত্র, তেমনই জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার মধ্যে সমসাময়িক সমাজ সম্পর্কে যে তাঁহার কি মনোভাব ছিল তাহা, সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন কবিগণ এই বিষয়ক যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাদের তুলনায় ভারতচন্দ্রে ইহার বর্ণনা দীর্ঘতম এবং বিচিত্রধর্মী জীবনোপকরণে সমৃদ্ধ। ইহা কেবলমাত্র গতানুগতিক বর্ণনা নহে, ইহার মধ্য দিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ-জীবনের একটি চিত্র জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে; ভারতচন্দ্র তাঁহার সমস্ত ঘৃণাবোধ লইয়া এই জীবনটিকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন, কোথাও কোন সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই। তবে এই ব্যঙ্গের মধ্য দিয়াই সহানুভূতির ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও হয়ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অসম বিবাহ দাম্পত্য-জীবনে যে কি সুগভীর দুঃখের কারণ হয়, তাহা সমাজ সেদিন অনুভব করে নাই; কারণ নারীমনের দুঃখবেদনার অনুভূতি সেদিন অব্যক্ত ছিল। ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্য রচনার একটি প্রথা অনুসরণ করিবার সুযোগে নারীমনের এই অব্যক্ত বেদনার অবরুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন। অসম বিবাহই সেই যুগে সমাজের নারীজীবনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল। বিদুষী নারী তাহার কালা স্বামী সম্পর্কে বলিতেছে,—

> সাধ ক'রে শিখিলাম কাব্যরস যত।
> কালার কপালে প'ড়ে সব হ'লো হত॥

অন্ধ স্বামীর গৌরাঙ্গী পত্নী বলিতেছে—

> মন্দভাগা অন্ধপতি দ্বন্দ্বে মাত্র ভাল।
> গোরা ছিনু ভাবিতে ভাবিতে হৈনু কাল॥

যুবতী পত্নী তাঁহার বৃদ্ধ স্বামী সম্পর্কে বলিতেছে,—

> আর রামা বলে সই এ' মাথার চূড়া।
> আমি এই যুবতী আমার পতি বুড়া॥
> বদনে দশন লড়ে ওদনে বঞ্চিত।
> সে মুখ চুম্বনে সুখ না হয় কিঞ্চিত॥

সর্বত্রই অসম বিবাহ-জনিত সমাজের যে অবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহার প্রতি ভারতচন্দ্র তাঁহার তূণীর হইতে এক-একটি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের তীর বাছিয়া লইয়া নিক্ষেপ করিতেছেন। ইহার চিত্র আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর হইলেও এই হাস্যের অন্তরালে সমাজের সুগভীর মর্মবেদনা প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল।

সমাজ-জীবনের প্রকৃত অবস্থার চিত্রটিকে সকল দিক হইতে সম্পূর্ণ করিতে গিয়াই ভারতচন্দ্র 'নারীগণের পতিনিন্দা'র বর্ণনাটিকে অত্যন্ত দীর্ঘ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কোনও মঙ্গলকাব্যেই ইহা এত দীর্ঘ ত নহেই, বরং ইহা হইতে অনেক সংক্ষিপ্ত; তাহাতে সমাজের বাস্তব রূপ প্রকাশ পাইবার পরিবর্তে একটি গতানুগতিক বর্ণনার অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামনারায়ণ তর্করত্ন যে 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটক রচনা করিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্র রচিত 'নারীদিগের পতি-নিন্দা' বর্ণনার নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতেই তাহার প্রেরণা আসিয়াছিল, এই কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়,—

আর রামা ব'লে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে।।
যদি বা হইল বিয়া কতদিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই।।
বিয়াকালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে।
পুনর্বিয়া হবে কিবা বিয়া হবে আগে।।
বিবাহ ক'রেছে সেটা কিছু খাটি বাটি।
জাতিতে যেমন হৌক কুলে বড় আঁটি।।
দু'চারি বৎসরে যদি আসে একবার।
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার।।
সূতা বেচা কড়ি যদি নিতে পারি তায়।
তবে মিষ্ট মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায়।।

কেবলমাত্র রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটক নহে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের শ্যামা চরিত্রটিও সম্পূর্ণ অনুরূপ সমাজ-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার মধ্যে ভারতচন্দ্র কেবল ব্যঙ্গের কথাই বলেন নাই, বাস্তব জীবনের সত্যের কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং ভারতচন্দ্রের যাহা ব্যঙ্গ, তাহা কেবলমাত্র ব্যঙ্গ নহে, তাহাতে বাস্তব সত্যের গুরুত্ব আছে। ব্যঙ্গের আকারে সত্যকে প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়াই তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। স্পষ্টভাষী ভারতচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে সমাজ-জীবনের আচারগুলিকে যদি প্রকাশ করিতেন, তবে তাহার রূঢ়তা স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রকেও আঘাত না করিয়া যাইত না। কারণ, তিনিই সেদিন এক হিসাবে

সমাজপতিও ছিলেন, সুতরাং সমাজের সেই দিনকার অনাচারের দায়িত্ব হইতে তিনি মুক্ত ছিলেন না। সুতরাং ব্যঙ্গের আবরণেই সেই দিন কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ভারতচন্দ্রকে তাঁহার কাব্য রচনা করিতে হইয়াছে। ব্যঙ্গই তাঁহার কাব্যের মধ্যে সেই জন্য প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রকে হাস্যরসের কবি বলতে এইখানে একটু বাধা আছে বলিয়া মনে হইতে পারে। হাস্যরস আর ব্যঙ্গরস একার্থবাচক নহে। হাস্যরসে জ্বালা নাই, নির্মল আনন্দ ব্যতীত তাহাতে আর কিছু অনুভূত হয় না। ইহার প্রভাবও ক্ষণিক, ইহা কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া গভীরভাবে কিছু প্রকাশ করে না, ইহাতে সহানুভূতিও যে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তাহা নহে। কিন্তু ব্যঙ্গরস জ্বালাময়, সমাজদৃষ্টি এবং তদ্বিষয়ক চিন্তা তাহাতে গভীরতর; ইহার প্রভাব ক্ষণস্থায়ী নহে, ইহার অন্তরালে অনেক সময় উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি কবিচিত্রে সহানুভূতির ভাব প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। ভারতচন্দ্র ব্যঙ্গরসেরই কবি ছিলেন, যথার্থ হাস্যরস (humour) বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার কবি ছিলেন না। নরনারী চরিত্রের ক্ষুদ্র অসঙ্গতির প্রতি তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, বরং তাহার গভীর সমস্যাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তিনি সমাজের মধ্যে যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা পান নাই; আত্মসুখের জন্য মানুষ সেদিন সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ বলি দিয়াছিল, তাহাই তাঁহার ব্যঙ্গের লক্ষ্য হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজের যে সকল সংস্কারমূলক আন্দোলন আমাদের মধ্যে দেখা দিয়াছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের সম্মুখে সেই নীতিভ্রষ্ট সমাজটিরই রূপ বর্তমান ছিল, এক শতাব্দীর মধ্যে ইহাতে বিশেষ কোনও ব্যতিক্রম সৃষ্টি হইতে পারে নাই। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর মনীষিবৃন্দ যে সমাজটির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা একান্ত ভাবে অনুভব করিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রই সর্বপ্রথম সেই সমাজটিরই ত্রুটিগুলি অনুরূপ প্রেরণার বশবর্তী হইয়াই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু সমাজপতি এবং দেশের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে অতিক্রম করিয়া গিয়া এই সম্পর্কে তাঁহার কিছু বলিবার থাকিলেও বলিবার উপায় ছিল না। সেই জ্বালাতেই তাঁহার 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যের মধ্যে ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল। যাই হোক, ভারতচন্দ্রই সমাজ-জীবনের সেদিনকার অব্যবস্থাগুলিকে সর্বপ্রথম চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছিলেন, আমাদের দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিভঙ্গির সেদিন বিকাশ হয় নাই বলিয়া সংস্কারের পরিবর্তে সেই দিন বিষয়গুলিকে লইয়া ব্যঙ্গ করাই হইয়াছিল এবং এমন কি, ব্যঙ্গের অন্তরালে যে গূঢ়ার্থ ছিল, তাহা সেদিন ভাবিয়া দেখিবারও কেহ ছিল না। সেইজন্য অন্নদা-মঙ্গল কাব্যের মধ্য হইতে সেদিন শুধু রসই গড়াইয়াছিল, কিন্তু সেই গড়ানো রসের মধ্যে যে তিক্ততার স্বাদ ছিল, তাহা সেভাবে কেহ অনুভব করিতে পারে নাই।

আদ্যোপান্ত সামাজিক অসমতা এবং অব্যবস্থার উপর কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার বিলাস-জীবনের নিষ্প্রাণ কৃত্রিমতা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন কবি ভারতচন্দ্রের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাই ব্যঙ্গের আকারে ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদা-মঙ্গল কাব্যের মধ্য দিয়া

প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্র সম্পূর্ণ সচেতনভাবে তাঁহার কাব্যকাহিনী রচনা করিয়াছিলেন, কেবলমাত্র অন্ধভাবে মঙ্গলকাব্য রচনার প্রথাকে অনুসরণ করেন নাই। ইতিপূর্বে একমাত্র মুকুন্দরাম ব্যতীত আর কোনও মধ্যযুগের কবি এমন সচেতনভাবে তাঁহাদের কোনও কাব্যই রচনা করেন নাই। ঐতিহ্যমূলক রচনায় অনেক সময় আত্মসচেতনতাকে বিসর্জন দিবার আবশ্যক হয়। কিন্তু ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের মত ঐতিহ্যমূলক রচনা প্রকাশ করা সত্ত্বেও আত্মসচেতনতাকে বিসর্জন দেন নাই। মঙ্গলকাব্য রচনার বাঁধাধরা নিয়মানুবর্তিতার মধ্যেও তাঁহার নিজস্ব সমাজদৃষ্টি এবং বক্তব্য অস্পষ্ট করিয়া রাখেন নাই। এই দিক দিয়া ভারতচন্দ্র আধুনিক; কারণ, ইহার মধ্যেই কবির আত্মবোধের আধুনিকতাধর্মিতা বিকাশ লাভ করিয়াছে।

ভারতচন্দ্র রচিত 'নারীদিগের পতিনিন্দা' বর্ণনার একটি অংশ যে কি ভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কার মূলক রচনার প্রেরণা দান করিয়াছিল, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইহা হইতেও তাঁহার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতচন্দ্র রচিত বিদ্যাসুন্দরের গীতগুলি যে কি ভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক কাব্যধারার প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্তকে তাঁহার ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি[১] এবং তাহাতে একথাও বলা হইয়াছে যে, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের নায়িকা বিদ্যা-চরিত্রই মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্যে রাধা চরিত্রে পরিণত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের প্রধানত বিদ্যাসুন্দরের গীত-রচনাগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের প্রেমমূলক গীতিকবিতা রচনার উৎস-মুখ খুলিয়া দিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য যে মানবিকতার জয়গানে মুখর, ভারতচন্দ্রের মধ্যেও সেই বিপর্যস্ত মানবতার প্রতি সহানুভূতিবোধের অস্তিত্ব ছিল। ব্যঙ্গচ্ছলে তিনি জীবনকে লক্ষ্য করিলেও ইহাতে তাহার গুরুত্ব লাঘব হয় নাই।[২]

১। 'গীতিকবি শ্রীমধুসূদন' (১৯৬০) পৃ. ৫৫-৭৯

২। শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু 'ভারতচন্দ্রের কবি মানস' সম্পর্কে সম্প্রতি একটি উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন ('বাংলা সাহিত্য পত্রিকা', ১৯৬৮, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. (১০০-১১৯)

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবিধ দেবী-মঙ্গল কাব্য

কালিকা-মঙ্গল, শীতলা-মঙ্গল, ষষ্ঠী-মঙ্গল, সারদা-মঙ্গল, রায়-মঙ্গল, সূর্য-মঙ্গল, গঙ্গা-মঙ্গল, পঞ্চানন্দ-মঙ্গল, সুভদা-মঙ্গল, তীর্থ-মঙ্গল

কাহিনীর পরিকল্পনা ও কবিত্ব সৃষ্টির দিক দিয়া আর কোন মঙ্গলকাব্যেই তেমন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই। পূর্বালোচিত প্রধান তিনখানি মঙ্গলকাব্য অবলম্বন করিয়াই ইহাদের কাহিনী সাধারণত পরিকল্পিত হইয়াছে; উপরন্তু চরিত্রসৃষ্টির মধ্যেও এই সকল কাব্যের চরিত্রগুলির প্রভাব অনেকাংশেই বর্তমান রহিয়াছে। বিশেষত মঙ্গলকাব্যের সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় মূল্য ব্যতীতও যে আরও একটা দাবী আছে, বিবিধ দেবী-মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে তাহা প্রায়ই পূর্ণ হয় নাই। ইহারা পূর্বোক্ত প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিরই ব্যর্থ অনুকরণে পর্যবসিত হইয়াছে মাত্র। কোন কোন কাব্যে দেবতাই একমাত্র লক্ষ্য কাহিনী উপলক্ষ্য মাত্র; আবার, কোন কোন কাব্যে কাহিনীই একমাত্র লক্ষ্য দেবতা উপলক্ষ্য— ইহাদের কোনটির মধ্যেই ইহাদের উভয়ের একত্র সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া লইবার প্রয়াস দেখা যায় না। 'শীতলা-মঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দরের কথা'ই ইহার প্রমাণ,—একটির মধ্যে দেবতাই আছে, কাহিনী নামে মাত্র আছে; আর একটির মধ্যে কাহিনীই আছে, দেবতাই আছে, কাহিনী নামে মাত্র আছে; আর একটির মধ্যে কাহিনীই আছে, দেবতা এক রকম নাই বলিলেই চলে। বিশেষ কোন শক্তিমান কবিও এই শ্রেণীর কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। অনেক সময় দেখা যায় যে, বিষয়বস্তুগুলি মঙ্গলকাব্যের আদর্শোপযোগী নহে, তথাপি সমসাময়িক প্রভাবকে স্বীকার করিয়া কোন না কোন উপায় ইহাদিগকে মঙ্গলকাব্যের পর্যায়ভুক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই চেষ্টা অনেক সময়ই সফল হয় নাই। এই শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যগুলির উপর পৌরাণিক প্রভাব কোন কোন স্থানে অত্যন্ত অধিক দেখা যায়। শুধু কাহিনীভাগে প্রসঙ্গত যে পৌরাণিক প্রভাব আসিয়াছে, তাহা নহে—অনেক সময় পৌরাণিক চরিত্র লইয়া কাহিনী রচনারও প্রয়াস দেখা গিয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই কাহিনীর কোন নির্দিষ্ট জাতীয় আদর্শ সম্মুখে না থাকার জন্য বিভিন্ন সময়ে কবি হয়ত বিভিন্ন প্রণালীতে একই দেবতার বিষয়ক

কাব্য রচনা করিয়াছেন ইহাদের রচনার যুগ পৌরাণিক কিংবা লৌকিক দেবতার প্রতি সমাজের ভক্তি ও বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসিয়াছিল—কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, এই যুগে দেবতাকে নামে মাত্র আখ্যানভাগের মধ্যে স্থান দিয়া ঐতিহাসিক আখ্যানমূলক কয়েকখানি কাব্যও রচিত হয়। ঐতিহাসিক ঘটনাকে মঙ্গলকাব্যের পরিবেশের মধ্যে স্থান দিবার প্রবৃত্তি এই যুগেই প্রথম দেখা দেয়। এই শ্রেণীর কাব্যগুলিকে 'ঐতিহাসকি কাব্য' নাম দিয়া পরবর্তী অধ্যায়ে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিয়াছে। একমাত্র বিদ্যাসুন্দর ব্যতীত এই শ্রেণীর আর কোন মঙ্গলকাব্যেই খুব ব্যাপক প্রচার লাভ করিতে পারে নাই—এক একটা বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে এক একটি বিশেষ কাব্য সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই শ্রেণীর কোন কাব্যের মধ্যেই আঞ্চলিক কোন বৈশিষ্ট্য রূপ লাভ করিতে পারে নাই,—সাহিত্যের অধঃপতিত (decadent) যুগে ইহার মধ্যে যে সকল ত্রুটি প্রকাশ পায়, এই শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সেই সকল ত্রুটি অত্যন্ত প্রকট বলিয়া অনুভূত হয়। তথাপি ইহাদের মধ্যে একখানি কাব্য কয়েকজন শক্তিমান কবির হাতে পড়িয়া যে একটু বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহার কথাই সর্বাগ্রে আলোচনা করিব,—তাহার নাম কালিকা-মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর।

মধ্যযুগের শেষভাগে মুসলমান কবি কর্তৃক চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য অঞ্চলে যে এক বিপুল সংখ্যক বাংলা আখ্যানকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহাদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ মঙ্গলকাব্যের রূপ ও রীতি দ্বারা গঠিত হইয়াছিল, অথচ তাহাদিগকে পূর্ণাঙ্গ মঙ্গলকাব্যও বলা যায় না। তবে ইহারাও অলৌকিক চরিত্রে মাহাত্ম্যসূচক রচনা এবং মঙ্গলকাব্যের অনুযায়ী চৌতিশা, বারমাসী প্রভৃতি বিষয় ইহাদেব মধ্যেও স্থান লাভ করিয়াছে। প্রত্যক্ষভাবে মঙ্গল নামে কোন পুঁথিকে উল্লেখ করা না হইলেও কয়েকটি মুসলমান কবি রচিত এই শ্রেণীর গ্রন্থকে 'বিজয়' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। 'রসুল বিজয়' তাহার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

কালিকা-মঙ্গল

তন্ত্রশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কালী শক্তিদেবতা চণ্ডীরই রূপভেদ মাত্র। অবশ্য নিম্নস্তরের অনার্য সমাজ হইতেই যে কালিকাদেবীর উদ্ভব হইয়াছে, তাহা তাঁহার দেবত্বের প্রকৃতি হইতেই উপলব্ধি করা যায়। তন্ত্রের ভিতর দিয়া ইনি ক্রমে পৌরাণিক সাহিত্যেও প্রবেশ লাভ করেন। কিন্তু পরবর্তী পৌরাণিক সম্পর্কের ফলেও তাঁহার অনার্য প্রকৃতির মূলে বিন্দুমাত্রও আর্য প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব অনার্য সমাজের মধ্যে তিনি যে একজন বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্না দেবী ছিলেন, তাহাই মনে হয়। 'লিঙ্গপুরাণ', 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ', 'কালিকা-পুরাণ' ইত্যাদিতে অনেক কাহিনীর অবতারণা করিয়া কালীর সহিত একটা মৌলিক আর্যসম্পর্ক স্থাপন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; পুরাণে চণ্ডীর সহিতও কোন কোন স্থানে তিনি অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার বিশিষ্ট অনার্য প্রকৃতির অত্যন্ত স্পষ্ট।

বহির্বাংলার কোন অনার্য সমাজ হইতে উদ্ভূত হইয়া এই দেবী ক্রমে তন্ত্রও পুরাণের ভিতর দিয়াই বাংলার সমাজে আসিয়া প্রবেশলাভ করিয়াছেন, এই দেবী অনার্য বাংলার নিজস্ব মৌলিক সৃষ্টি বলিয়া মনে হয় না। তাহা না হইলে বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্যেও তাঁহার সম্বন্ধে গতানুগতিক নিয়মে মঙ্গলকাব্য রচনার প্রয়াস দেখা যাইত। কালীর পরিকল্পনায় আসামের নরমুণ্ড শিকারী (head-hunter) নাগাজাতির কোনও প্রভাব থাকিতে পারে। কারণ, কালীর মত শত্রুর ছিন্নমুণ্ড মস্তকে ও কণ্ঠে ধারণ করার রীতি তাহাদের মধ্যে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত Sten Konow কালীর সঙ্গে জার্মান দেশের নার্থুস নামক লৌকিক দেবীর মৌলিক সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করেন। তিনি বলেন যে, কালী ইন্দো-ইউরোপীয় জাতীয় দেবতা—তিনি ভারতে কালী এবং জার্মানীতে নার্থুস্ নামে পূজিতা হন।[১] কিন্তু তাঁহার মতের স্বপক্ষে তিনি যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা বিশেষ সারবান বলিয়া মনে হয় না। কালিকা-মঙ্গলে কালিকার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করা মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, অন্য কোনও দেবতার সহিত তাঁহার দ্বন্দ্বও ইহাতে বর্ণিত হয় নাই,—বিদ্যা ও সুন্দরের গুপ্ত প্রণয়-কাহিনীই এই কাব্যের মুখ্য বর্ণিতব্য বিষয়, এই কাহিনীর মধ্যে মঙ্গলকাব্যের আধ্যাত্মিকতা আরোপ করিবার জন্যই একটি দেবতার নাম আনিয়া ইহাতে সংযুক্ত করা হইয়াছে।

চণ্ডীর মত কালীরও প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্নতা আছে। চণ্ডীর মত বিভিন্ন অনার্য সমাজের স্বতন্ত্র ধর্মপ্রবৃত্তি হইতে বিভিন্ন দেবতার প্রায় অনুরূপ পরিকল্পনা করা হইয়াছিল—কালক্রমে তাহা সকলই কালী নামের সাধারণ পরিচয় গ্রহণ করে। ভদ্রকালী, রক্ষাকালী, দক্ষিণাকালী, শ্মশানকালী, নিশিকালী, মহাকালী, উন্মত্তকালী প্রভৃতি সকলই এক কালীর সাধারণ নামের

১। 'A European Parallell to the Durga Puja' ; *JASB. XXI* (1925), ppr 315-24

অন্তর্গত হইলেও মূলত ইঁহাদের উদ্ভব ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র। অবশ্য অনেকের উদ্ভব পরবর্তী হইলেও ইঁহাদের মধ্যে যিনি মূল, তিনি অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভৈরব শিবের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া লইয়াছিলেন। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ পশ্চিম ভারতের ইলোরা গুহা-ভাস্কর্যে শিবের সহিত কালীর মূর্তিও পাওয়া যায়। ইহাই কালীর প্রাচীনতম রূপ বলিয়া মনে হয়। 'তন্ত্রসারে' ভদ্রকালীর যে ধ্যান বর্ণিত আছে, তাহার সহিত ইহার অনেক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়,[১] ধ্যানটি এরূপ,—

'ক্ষুৎকামা কোটরাক্ষী মসীমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদন্তী।
নাহং তৃপ্তা বদন্তী জগদখিলমিদং গ্রাসমেকং করোমি।।
হস্তাভ্যাং ধারয়ন্তী জ্বলদনলসন্নিভং পাশমুগ্রম্।
দন্তৈর্জম্বুফলাভৈঃ পরিহরতু ভয়ং পাতু মাং ভদ্রকালী।।'

এই পরিকল্পনা আশ্রয় করিয়া পরবর্তী কালে সম্ভবত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অনুরূপ লৌকিক দেবীর পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। কলিকাতা কালীঘাটের কালীও তাহাদের অন্যতম। সমগ্র দাক্ষিণাত্য ব্যাপিয়া নিম্ন জাতির মধ্যে এখনও কালীপূজার ব্যাপক প্রচলন আছে; সেখানকার প্রাচীন ভাস্কর্যও বিভিন্ন প্রকৃতির বহু কালীমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ প্রকৃতির এক কালী দস্যু-তস্করের দেবতা ছিলেন। তান্ত্রিক আচারে তাঁহার পূজা হইত এবং তান্ত্রিক সমাজেই এই দেবতার উদ্ভব হইয়াছিল, 'তন্ত্রসারে' তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 'চৈতন্য ভাগবতে' দেখিতে পাওয়া যায়, দুই চোর শিশু চৈতন্যকে হরণ করিবার জন্য এই দেবীর শরণাপন্ন হইতেছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যেও আছে যে শিশু লাউসেনকে হরণ করিবার উদ্দেশ্যে ইন্দা মেটে নিশাযোগে কালীর পূজা করিয়া লইতেছে। এই বিশেষ প্রকৃতির কালীকে লইয়াই প্রাচীন বাংলায় বহু পাঁচালী রচিত হইয়া ছিল। তাহা 'চোরের পাঁচালী' নামে পরিচিত। কালিকা-মঙ্গলেও এই প্রকৃতির এক দেবীর উল্লেখ আছে। ইহার কাহিনীটি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া এই সম্বন্ধে অন্যান্য প্রশ্নের বিচার করা যাইতেছে,—

গভীর রাত্রে এক রাজপুত্র ভদ্রকালীর পূজা করিতেছিল, রাজপুত্রের নাম সুন্দর। পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া কালী তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তাহাকে বলিলেন, 'যে বর প্রার্থনা কর, তাহা লইতে পার।' রাজপুত্র বলিল, 'নিভৃতে রাজকন্যা বিদ্যার সঙ্গে সাক্ষাতের বর প্রার্থনা করি।' কালী 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাকে একটি শুকপক্ষী দিলেন, বলিলেন, এই পক্ষীটি তাহার এই কার্যের সহায়ক হইবে। সুন্দর শুকপক্ষী লইয়া অদৃশ্য যাত্রা করলি, অবশেষে তাহার প্রণয়িনী পিতৃরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে সুন্দর রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিল।

১। V. A. Smith, *A History of Fine Art in India and Ceylon* (Oxford, 1911), Plate XLIII, 210.

সুন্দর এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছিল। তথায় এক মালিনী ফুল বেচিতে আসিল। মালিনী রাজ-অন্তঃপুরে ফুল যোগায় সুন্দরের সহিত মালিনীর পরিচয় হইল। মালিনী তাহাকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিল। সুন্দর মালিনীকে মাসী বলিয়া ডাকিল। মালিনীর নিকট সুন্দর বিদ্যার বিস্তৃত পরিচয় পাইল, তাহার বিবাহের প্রতিজ্ঞার কথাও শুনিল,—সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যে তাহাকে বিদ্যায় পরাজিত করিতে পারিবে, তাহাকেই সে বিবাহ করিবে—অন্য কাহাকেও নহে। শুনিয়া সুন্দর বিদ্যার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল। প্রত্যহ মালিনী রাজবাড়িতে ফুল লইয়া যায়, সেদিনও গেল সুন্দর সেই ফুলের মধ্যে একছড়া অতি চিকণ মালা গাঁথিয়া সঙ্গে দিয়া দিল, মালার সঙ্গে একটি লিখনে নিজের পরিচয় লিখিয়া দিল। মালার সঙ্গে লিখন পাইয়া বিদ্যা সুন্দরের প্রতি আসক্ত হইল, মালিনীকে বলিল, সরোবরে স্নানের সময় তোর বোনপোকে দেখিতে চাই। স্নানের ঘাটে দুইজনে দেখা হইল, সঙ্কেতে আলাপও হইল। সুন্দর সঙ্কেতে জানাইল, সেই রাত্রেই তাহার সহিত সে সাক্ষাৎ করিবে। কিন্তু কি ভাবে সুন্দর রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না, অনন্যোপায় হইয়া কালীকে ডাকিতে লাগিল। কালী সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন বলিলেন, আমার বরে মালিনীর গৃহ হইতে বিদ্যার গৃহ পর্যন্ত সুড়ঙ্গ হইয়া যাইবে, তুমি সেই সুড়ঙ্গ পথে গিয়া বিদ্যার সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিবে। সুড়ঙ্গ-পথে সুন্দর বিদ্যার শয়নগৃহে প্রত্যহ যাতায়াত করিতে লাগিল। গান্ধর্বমতে তাহাদের বিবাহ হইল, কালক্রমে বিদ্যা গর্ভবতী হইল। এক দাসী গিয়া রাণীর নিকট এই সংবাদ দিল। শুনিয়া রাণী মহাক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্যাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন, তারপর রাজাকে গিয়া এই সংবাদ জানাইলেন। শুনিয়া রাজা কোটালকে আহ্বান করিয়া বিদ্যার গৃহে যে গোপনে যাতায়াত করে তাহাকে ধরিবার জন্য আদেশ দিলেন। বহু অনুসন্ধানেও চোর ধরা পড়িল না। সুন্দরের যাতায়াত তেমনই চলিতে লাগিল। অবশেষে কোটাল এক কৌশল অবলম্বন করিল। বিদ্যার সমস্ত গৃহ সিন্দুরে রাঙাইয়া দিল, সুন্দর তাহার গৃহে আসিলে তাহার বস্ত্রও রঞ্জিত হইল। রজকের গৃহে রঞ্জিত বস্ত্রের সন্ধান করিয়া কোটাল সুন্দরকে ধরিল। রাজা তাহার শিরশ্ছেদ করিবার আদেশ দিলেন। সুন্দরকে বাঁধিয়া দক্ষিণ মশানে লইয়া যাওয়া হইল। সুন্দর মশানে কালীর স্তব পাঠ করিল। কালী আবির্ভূত হইলেন এবং সুন্দরের হস্তে বিদ্যাকে সমর্পণ করিতে রাজাকে আদেশ করিলেন। রাজা সুন্দরের পরিচয় পাইয়া সাগ্রহে তাহাতে সম্মত হইলেন। সুন্দর বিদ্যাকে বিবাহ করিয়া লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিল।

প্রাচীনকাল হইতেই প্রায় সকল দেশের লোক-সাহিত্যে চোরের বুদ্ধির প্রখরতা সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে। ইউরোপীয় লোক-সাহিত্যেরও একটি সাধারণ বিষয় (motif), Princess won by cleverness.[১] সংস্কৃত ভাষায় 'চতুর' শব্দ হইতেই 'চৌর' শব্দজাত। ইহাতে উপস্থিত বুদ্ধির অনুশীলন হইয়া থাকে বলিয়া, প্রাচীনকালে ইহা একটি শিক্ষণীয়

১। Simth Thompson, *The Folktale* (New York, 1946), p 158

ও উচ্চশ্রেণীর বিদ্যা বলিয়া কল্পিত হইত। বাংলার অনেক রূপকথায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজপুত্র অন্যান্য বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে চৌর্য বিদ্যায়ও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া দেশান্তরের রাজকন্যাকে কৌশলে হরণ করিয়া আনিতেছেন। প্রাচীন বাংলায় চোরের এই বিচিত্র জীবন কাহিনী অবলম্বন করিয়া পাঁচালী আকারে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য রচিত হইয়াছিল। বীর কাশীশ্বর রচিত 'চোর-চক্রবর্তী' নামক একখানি কাব্য বহুবার বটতলায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাচীন পুঁথিশালায় 'চৌর-চক্রবর্তী কথা' নামে এই শ্রেণীর আর একখানি পাঁচালী আকারের ক্ষুদ্র কাব্য রক্ষিত আছে। স্বর্গত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় ইহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।[১] তাহার চোর-নায়ক বিজয়নগরের রাজমন্ত্রীর পুত্র, নাম খরবর; কাব্য, জ্যোতিষ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সে 'কৌতুকে শিখিল উত্তম অধম চৌরবিদ্যা'। খরবর কালীর সহায়তায় রাজার শয়নগৃহ হইতে রাণীকে চুরি করিল, বহু অনুসন্ধানেও কোটাল চোরের সন্ধান পাইল না। যে চতুঃষষ্টিকলা লোকের নিকট বিশেষ আদর ও সম্মান পাইত, তাহার মধ্যে চুরিবিদ্যারও স্থান দেখিতে পাওয়া যায়।

বাংলা দেশের বাহিরেও চোরের এই প্রকার বুদ্ধি বিচক্ষণতা সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত রহিয়াছে।[২] উড়িষ্যার প্রায় বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর অনুরূপ মুঘলমারীর রাজকন্যা শশীসেনার গল্প প্রচলিত আছে। এই শ্রেণীর গল্প যে বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের সর্বত্র প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে তাহার বিস্তৃত উল্লেখ হইতেই জানিতে পারা যায়। 'কথাসরিৎসাগর', 'দশকুমার-চরিত' ইত্যাদি সংস্কৃত গ্রন্থে রাজপুত্রের চুরিবিদ্যা শিক্ষাবিষয়ক অনেক গল্প বর্ণিত হইয়াছে। কালক্রমে চৌর্যশাস্ত্র নামে এক বিশেষ শাস্ত্র সম্বন্ধে সংস্কৃতে কতকগুলি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থও রচিত হয়। ইহাদের একখানির নাম 'ষণ্মুখকল্প' ও অপর একখানির নাম 'চোরচর্য' বা 'চৌর্যস্বরূপ'। সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাসুন্দরের একখানি সমগ্র কাব্যও রচিত হইয়াছিল।[৩] কিন্তু তাহা খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। অনেক গুলি বাংলা বিদ্যাসুন্দর লিখিত হইবার পর হইতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় বররুচিই সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের লেখক বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু তাহা লোকশ্রুতি মাত্র। বেহুলার কাহিনী লইয়াও সংস্কৃতে কাব্য রচিত হইয়াছে, চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীও সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু সেইজন্য বেহুলা ও চণ্ডীর সংস্কৃত কাহিনীকেই পদ্মাপুরাণ ও চণ্ডীমঙ্গলের মূল বলা যাইতে পারে না। 'বিদ্যাসুন্দর-উপাখ্যানম্' নামক বাংলা ও নাগরীর অদ্ভুত মিশ্র অক্ষরে লিখিত ও বিক্রমাদিত্যের সভাকবি বররুচি কর্তৃক রচিত বলিয়া উল্লিখিত একটি সংস্কৃত

১। সা-প-প- ৪৫, ২১৭-১৮

২। Bloomfield, The Art of Stealing in Hindu Fiction, *American Journal of Philosophy*, Vol. XXXIV, 97-133, 193-239

৩। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত ও প্রকাশিত (কলিকাতা, ১৯১৮)

পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১] পুঁথিখানি কোন বাঙ্গালী লিপিকর কর্তৃক অত্যন্ত আধুনিক কালে লিখিত—তাহা যে কেহ ইহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। বাংলা দেশে প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে বররুচি এই শ্রেণীর একখানি কাব্যের রচয়িতা এবং উজ্জয়িনী এই কাহিনীর ঘটনা-স্থান;[২] অতএব মনে হয়, এই জনশ্রুতি ভিত্তি করিয়াই এই উপাখ্যানখানি পরবর্তী কালে কোন বাঙ্গালী কর্তৃক রচিত হইয়াছে—ইহা হইতে বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে বিবেচনা করা সঙ্গত নহে। বররুচি প্রণীত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরকে বাংলা বিদ্যাসুন্দরকে বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মূল বলিয়া কেহ কেহ নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। তবে সংস্কৃত হইতেই যে ইহার কাহিনীর কতক অংশ বাংলার পূর্বোল্লিখিত কোন লৌকিক চোরের কাহিনীর সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হইয়া বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এই সংস্কৃত আখ্যায়িকাটি কি এবং ইহা কোথা হইতে আসিল?

কাশ্মীরের বিখ্যাত কবি বিল্‌হণ রচিত 'চৌর-পঞ্চাশিকা' একখানি সংস্কৃত খণ্ডকাব্য। ইহার পঞ্চাশটি শ্লোকে কবি তাঁহার প্রেমিকার উদ্দেশ্যে গভীর হৃদয়াবেগ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ ধর্মভাব-বিবর্জিত। কথিত আছে, কবি বিল্‌হণ কোন রাজকন্যার সহিত গুপ্ত প্রণয়ে আবদ্ধ ছিলেন। রাজা তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রাণবধ করিতে উদ্যত হন। বিল্‌হণ তখন পঞ্চাশটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া রাজকন্যার প্রতি তাঁহার অন্তরের গভীর প্রণয় জ্ঞাপন করেন। ইহাই বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মূল বলিয়া মনে হয়। কাশ্মীরী কবি বিল্‌হণ আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। অতএব দ্বাদশ শতাব্দীতেই ইহা রচিত হইয়াছিল, —পরে সর্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছে। কাশ্মীরে প্রচলিত কাহিনীতে রাজকন্যার পিতার নাম বীরসিংহ, বাংলা বিদ্যাসুন্দরেও রাজার নাম তাহাই। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত এই কাহিনীতে ইহার নামগুলি একটু স্বতন্ত্র, অবশ্যইহা স্থানীয় প্রভাব বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

ক্রমে 'চৌরপঞ্চাশিকা'র কাহিনীটি বাংলা দেশেও আসিল এবং তাহা এতদ্দেশে পূর্ব হইতেই প্রচলিত একটি প্রণয়-কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু এই প্রণয়-কাহিনীটি যে কি, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। 'ভাগবত-পুরাণে'র অন্তর্গত উষা-অনিরুদ্ধের কাহিনীও ইহার ভিত্তি হইতে পারে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে উষা-অনিরুদ্ধের প্রণয়-কাহিনীটি ব্যাপক প্রচারলাভ করিয়াছিল—ইহা মনসা-মঙ্গলেরও অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাই কালক্রমে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীরও প্রেরণা দান করা সম্ভব। কেহ মনে করেন, পালি ভাষায় রচিত উম্মগ্‌গ জাতক হইতে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীটি আসিয়াছে।[৩]

১। S-C. Mitra, 'The Long-lost Sanskrit Vidyasundar', *Proceeaings of the Oriental Conference, Second Sessión* (Calcutta,1923), 215-20.

২। রামগতি ন্যায়রত্ন ১৫৮।

৩। S. C. Mitra, 220

কিন্তু উম্মগ্গ জাতকের কাহিনী বাংলার লোকসাহিত্যে যে প্রচলিত ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে উষা-অনিরুদ্ধের কাহিনীটি যে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুন্দর মশানে নীত হইয়া 'চৌর-পঞ্চাশিকা'র অনুরূপ সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। অবশ্য দুইজন বাঙ্গালী বিদ্যাসুন্দরের লেখক—কঙ্ক ও কাশীনাথ—সম্ভবত বাংলার অবিমিশ্র প্রাচীন লৌকিক কাহিনীটি লইয়াই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, বিল্হণের 'চৌরপঞ্চাশিকা' তাঁহাদের কাব্যে স্থান লাভ করে নাই। এই প্রণয়-কাহিনীর মধ্যে একটি গুপ্ত চৌর্যের বৃত্তান্ত জড়িত আছে বলিয়া ক্রমে কালিকাদেবীকে এই কাহিনীর মধ্যে আনিয়া স্থান দান করা হইয়াছে। শক্তি দেবতা কালীর মাহাত্ম্যই যে এই কাহিনীর মুখ্য বর্ণিতব্য বিষয় নহে, তাহা একজন বৈষ্ণব কবি ও একজন মুসলমান কবি লিখিত বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী হইতেও জানিতে পারা যায়।

কালিকা-মঙ্গলের কবিগণ

বাংলার বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর আদি-রচয়িতা কে? এই পর্যন্ত বিদ্যাসুন্দরের যত পুঁথি সম্বন্ধে জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, পূর্ব ময়মনসিংহের অধিবাসী কবি কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরই প্রাচীনতম।[১] কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আছে। প্রথমত যিনি তাঁহার পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন, তিনি ব্যতীত প্রচীন বাংলা সাহিত্যের আর কোনও অনুসন্ধাকারীই তাঁহার পুঁথি দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করেন নাই—ভবিষ্যতেও তাহা আর কাহারও পক্ষে দেখিবার আশা কম। দ্বিতীয়ত তাঁহার ভাষা অত্যন্ত আধুনিক,—প্রচীন ভাষা বলিয়া তাহা গ্রহণ করা কঠিন। তবে ভাষা কালক্রমে পরিবর্তিত হইতে পারে। তাঁহার কাব্য রচনার নির্দিষ্ট কোনও সময়েরও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

কঙ্ক

কবি কঙ্কের রচনা হইতে অনুমান করিতে পারা যায়, তিনি চৈতন্যের সমসাময়িক লোক। তিনি এই বিষয়ে তাঁহার কাব্যমধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন,—

> কবে বা হেরিব আমি গৌরার চরণ।
> সফল হইবে মোর মনুষ্য জনম॥

১। স্বর্গত চন্দ্রকুমার দে মহাশয় কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরের আবিষ্কর্তা। ইহার একখানি পুঁথি তিনি স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে দেন, আরও একখানি তাঁহার সন্ধানে ছিল বলিয়া তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই পুঁথিখানি আজিও প্রকাশিত হয় নাই। তিনি ১৩২৫ ও ১৩২৬ সনের ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত 'সৌরভ' পত্রিকায় কঙ্কের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন। তাহাই সকলের এই সম্পর্কিত আলোচনায় ভিত্তি।

পাপী তাপী মুঞি প্রভু আমি অল্প মতি।
হইবে কি প্রভুর দয়া অভাগার প্রতি।।
হউক বা না হউক পদ না ছাড়িব।
বাজন্ত নূপুর হইয়া চরণে লুটিব।।

কঙ্ক তাঁহার আত্ম-পরিচয়ে বলিয়াছেন, তাঁহার পিতার নাম গুণরাজ, মাতা বসুমতী। রাজ্যেশ্বরী নদীর তীরবর্তী বিপ্রগ্রাম তাঁহার জন্মভূমি; ব্রাহ্মণবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু শৈশবেই মাতৃপিতৃহীন হন। সংসারে তাঁহাকে দেখিবার মত কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না, এক চণ্ডালের গৃহে তিনি মানুষ হইতে লাগিলেন। চণ্ডালিনী মাতাই তাঁহারই নাম রাখিল কঙ্ক। চণ্ডালের নাম মুরারি এবং তাহার পত্নীর নাম কৌশল্যা। তাহারাই কবির মাতাপিতার স্থান পূর্ণ করিল।

বাল্যে গর্গ নামক এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে তিনি রাখালের কার্যে নিযুক্ত হন। গর্গ পরম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার পত্নীর নাম গায়ত্রী। তাঁহারা কঙ্ককে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজে তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ-সমাজ তাহার বিরোধিতা করে। গর্গের কন্যা লীলার সহিত কঙ্কের প্রণয়-কাহিনী বর্ণনা করিয়া পূর্ব ময়মনসিংহের গীতিকাব্যে কবি রঘুসুত কর্তৃক এক পালাগান রচিত হইয়াছিল, তাহা 'কঙ্ক ও লীলা' নামে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছে।[১] ইহার মধ্যে কিছু সত্যতা থাকাও অসম্ভব নহে।

কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর কালিকার মাহাত্ম্য-প্রচারক কাব্য নহে, বিপ্রগ্রামবাসী এক পীরের আদেশে কঙ্ক তাঁহার কাব্য রচনা করেন; সেইজন্য তাঁহার কাব্যোল্লিখিত দেবতা সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ। তিনি তাঁহার কাব্যকে 'পীরের পাঁচালী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যথা— 'গুরুর আদেশে গাহি পীরের পাঁচালী'। অবশ্য এ ব্যতীত কাহিনীর আর কোনও বিষয়ে পার্থক্য নাই। সত্যপীরের উল্লেখ করিবার জন্যই কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে, কঙ্কের কাব্য খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হইতে পারে না, কিন্তু স্কন্দপুরানেও সত্যপীরের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২] স্কন্দপুরাণ ইহারও পূর্ববর্তী রচনা। বিদ্যাসুন্দরের কবিদিগের মধ্যে কাব্যোক্ত স্থানসমূহের নামের কোনও স্থিরতা ছিল না। বিদ্যা ও সুন্দরের নাম ব্যতীত অন্যান্য নামগুলিতেও অনেক সময় অনৈক্য দেখা যায়। অবশ্য ইহাতে মূল কাহিনীর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না; কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, কালিকা-মঙ্গলে দেবতা মুখ্য নহে। কঙ্কের কাব্য ও পরবর্তী কালিকা-মঙ্গল কাব্যের কতকগুলি বিষয়ে একটু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মূল কাহিনী বর্ণনায়ও সামান্য একটু ব্যতিক্রম আছে।

১। মৈমনসিংহ গীতিকা, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত (১৯২৩) ১।২, ২৪৯-৯৮
২। স্কন্দপুরাণ (বঙ্গবাসী, ১৩১৮) ৩৬৬০-৬২

কঙ্কের কাব্য আদিরস-প্রধান নহে। চৈতন্যে আসক্তি দেখিয়াই মনে হয়, তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, সেইজন্য রচনায় নীতির সংযম তিনি কোথাও লঙ্ঘন করেন নাই। কঙ্কের রচনা সরল ও মধুর, অনেক স্থানে বৈষ্ণব কবিতার সুরও ধ্বনিত হইতে শোনা যায়; তাঁহার পূর্বোদ্ধৃত 'বাজন্ত নূপুর হয়্যা চরণে লুটিব' পদটি লোচন দাসের প্রসিদ্ধ পদ 'বাজন নূপুর হয়্যা চরণে রহিব গো' পদটির সহিত তুলনা করা যায়। ময়মনসিংহ অঞ্চলে কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল।

শ্রীধর

মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের মধ্যে হইতে একজন অতি প্রাচীন বিদ্যাসুন্দরের কবির নাম জানিতে পারা যায়।[১] তাঁহার নাম শ্রীধর, উপাধি কবিরাজ। তাঁহার দুইখানি মাত্র অসম্পূর্ণ পুঁথি চট্টগ্রাম অঞ্চলে হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু হইতে কবির কালনিরূপণের কোন অসুবিধা হয় না। কারণ, তিনি তাঁহার রচনার মধ্যে গৌড়ের নবাব হুসেন শাহের পৌত্র ফিরোজ শাহের উল্লেখ করিয়াছেন। ফিরোজ শাহ্ নস্‌রত শাহের পুত্র। নস্‌রত শাহের মৃত্যুরপর তিনি ১৫৩২-৩৩ খ্রীষ্টব্দে মাত্র কয়েক মাসের জন্য গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন।[২] পুঁথির আবিষ্কর্তা মনে করেন যে, শ্রীধর গৌড়ে ফিরোজ শাহের সভাকবি ছিলেন। কিন্তু এ'কথা নিশ্চিত বলা যায় না; কাবণ, তাঁহার কাব্যের যে খণ্ডিত অংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এ'কথা কোথাও উল্লেখ নাই। তিনি তাঁহার ভণিতায় কেবলমাত্র ফিরোজ শাহের প্রশংসা করিয়াছেন। গৌড়ের দরবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে না থকিয়াও কোনও কোনও কবি সেকালে যে গৌড়েশ্বরের স্তুতিগান করিয়া গিয়াছেন, মনসা-মঙ্গলের কবি বিজয় গুপ্তই তাহাব প্রমাণ।

শ্রীধর তাঁহার কাব্যের ভণিতায় ফিবোজ শাহ্‌কে কোথাও রাজা, কোথাও যুবরাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয় যে, ফিরোজ শাহ্ যখন যুবরাজ তখনই শ্রীধর তাঁহার কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। সম্ভবত কোনও উপায়ে যুবরাজ কবির পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন—নতুবা গৌড়ের সুলতানকে বাদ দিয়া তাঁহার পুত্রের নিকট কবির কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের কোনও কারণ থাকিতে পারে না। মনে হয়, নস্‌রত শাহের রাজত্বকালের শেষভাগে শ্রীধর তাঁহার কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তারপর ফিরোজ শাহ্ যখন গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার রচনা সম্পূর্ণ হয়। নস্‌রত শাহ্ ১৫১৯

১। আব্দুল করিম, গৌড়েশ্বরের আদেশে রচিত বিদ্যাসুন্দর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনী, চন্দননগর, বিংশ অধিবেশন (১৩৪৩)-এর কার্যবিবরণী, ৫৭-৫৯। সা-প-প ৪৪, ২২-৪৪। সাহিত্য পত্রিকা (ঢাকা) ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ ১১৫-৩৪; ইহাতে পুঁথিটি আদ্যোপান্ত মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

২। H.B.II. 159

খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। ফিরোজ শাহ্ ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন লাভ করিয়া মাত্র কয়েক মাস মধ্যে পরলোকগমন করেন। শ্রীধরের কোনও কোনও ভণিতায় ফিরোজ শাহ্‌কে রাজা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে দেখিয়া মনে হয়, তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর এবং তাঁহার মৃত্যুর পূর্বেই তাঁহার কাব্য রচনা সম্পূর্ণ হয়। অতএব ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দই শ্রীধরের কাব্য রচনাকালের শেষ সীমা ধরিতে হয়। সুতরাং পুঁথির আবিষ্কর্তা যে মনে করেন, নস্‌রত শাহের রাজত্বকালেই ইহার রচনা সম্পূর্ণ হয়, তাহা সমর্থনযোগ্য নহে।

দুইখানি পুঁথিই খণ্ডিত বলিয়া শ্রীধরের ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছুই জানিতে পারা যায় না। তাঁহার কোনও কোনও ভণিতায় তিনি নিজেকে 'দ্বিজ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব মনে হয়, তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার দুইখানি পুঁথিই চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে— অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীটি সুপরিচিত ছিল—তথাকার আরও কয়েকজন প্রাচীন কবি এই বিষয় লইয়া পরবর্তী কালেও কাব্যরচনা করিয়া গিয়াছেন—মনে হয়, দ্বিজ শ্রীধরই তাঁহাদের পথপ্রদর্শক ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, প্রাচীন বাংলার বিদ্যাসুন্দরের কবিদিগের মধ্যে শ্রীধর কবিরাজের সময় সম্বন্ধে সর্বপ্রথম স্পষ্ট ঐতিহাসিক নির্দেশ পাওয়া যায়। কবি কঙ্কের সময় সম্পর্কে একমাত্র অনুমানের উপরই নির্ভর করিতে হইয়াছে।

শ্রীধর তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী রচনায় অনেক স্থলেই সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে গ্রহণ করিয়াছেন— বাংলা রচনার মধ্যে মধ্যে তাঁহার স্বরচিত কতকগুলি সংস্কৃত বচনিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। যেমন প্রথমেই তিনি এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন,

'অস্তি উত্তর দেশে রত্নাবতী নাম দিব্যা পুরী। তত্র রাজা সর্বগুণ-বিভূষিতো গুণসারো নানা-শাস্ত্র-সুনিপুণো ধর্মপরায়ণস্তস্য কলাবতী নাম্নী ভার্যা সর্বগুণশালিনী। তস্যাঃ গর্ভে সুতো জাতঃ কালিকায়াঃ প্রসাদাৎ। সাক্ষাৎ কামঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ।'

ইহার পর এই অংশের কবি একটি পদ্যানুবাদ দিয়াছেন। ইহা হইতে পুঁথির আবিষ্কর্তা মনে করিয়াছেন যে, বিদ্যাসুন্দরের কোনও সংস্কৃত আখ্যায়িকা হইতে শ্রীধর তাঁহার কাব্যখানি বাংলায় অনুবাদ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই উক্তি সমর্থনযোগ্য নহে; কারণ, প্রাক্-চৈতন্যযুগের বাংলা সাহিত্য সংস্কৃত রচনার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া আসিতে পারে নাই—বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করিলেও, সেকালের কোনও কোনও কবি তাঁহাদের রচনার স্থানে স্থানে স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক যোজনা করিয়া দিতেন—তাহার প্রমাণ বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। সংস্কৃত পুরাণ পাঠে অভ্যস্ত পাঠকের নিকট ইহাতে ভাষা-সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইত— সাধারণ অজ্ঞ লোকের নিকটও কাহিনীর অভিজাত্য

সহজেই প্রতিষ্ঠিত হইত। অতএব ইহা প্রাক্-চৈতন্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রীতি বলিয়া গণ্য করিতে হয়, ইহার আর কোন তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

শ্রীধরের রচনায় সুন্দরের পিতার নাম গুণসার ও মাতার নাম কলাবতী—সুন্দরের পিতৃরাজ্যের নাম বিজয়নগরী রত্নাবতী। বিদ্যার পিতার নাম বীরসিংহ, মাতার নাম শীলাদেবী, রাজধানীর নাম কাঞ্চী। শ্রীধরের রচনায় পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেলেও প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় দুর্লভ।

বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যের ধর্ম ও সাহিত্যের প্রভাব স্থাপিত হইবার পূর্বেই বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচয়িতাদিগের মধ্যে সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে নির্দেশ অনুযায়ী বিদ্যার রূপবর্ণনার যে একটি বিশিষ্ট রীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল, শ্রীধরের রচনাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারই ধারা ভারতচন্দ্র পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়া তাঁহার মধ্যে একটি পরিণত রস-রূপ প্রকাশ করিয়াছে। শ্রীধরের রচনায় বিদ্যার রূপবর্ণনাটি এই—

নবীন ঘনের পুঞ্জ যেন কেশভার।
ধরণী বিলোটায় সে লম্বিত অপার।।
বিদ্যার বদনশশী যেন অববান্ধা।
খঞ্জন জিনিয়া দুই নয়নের ছন্দা।।
উহার ললাট যেন আধশশীখণ্ড।
অধর বান্ধুলী যেন মুখ রসভাণ্ড।।
দশন মুকুতা পাঁতি বাক্য মধুপান।
ভুরুভঙ্গে কামদেব ধনুর সমান।।
গ্রীবাখণ্ড দেখি শঙ্খ জলধি প্রবেশ।
মদন-মোহন-বিদ্যা যৌবন বিশেষ।।
কহত মাধব ভাট স্বরূপ উহার।
শ্রুতি নাসা কুচযুগ কিরূপ আকার।।
কুচযুগ মধ্যদেশ কুহরের ছন্দ।
উরুযুগ নিতম্ব কেমন প্রবন্ধ।।
।। মাধব ভাট কথয়তি।।
একমন হই শুন কহি যুবরাজ।
শ্রবণ গৃধিনী দেখি পাইলেক লাজ।।
ফাটিল তাল পয়োধর দেশ।
কমল-কলিকা জলে করিল প্রবেশ।।
সমুখে কমলনাসা যেন তিন ফুল।

এ রামকদলী ভুজ নিতম্ব বিপুল।।
দেখিয়াছি কুমারীর বাহু ভুজঙ্গ।
সুবর্ণ মৃণালবর পদ্মএ সুরঙ্গ।।
ক্ষীণ মাঝা দেখি সিংহ পাই উপহাস।
লজ্জায় করিল গিরি কোটরেতে বাস।।
রক্ত-পদ্মসম পদযুগ সুকোমল।
নবশশী জিনি পদ-নখ নিরমল।।
চরণে মল সাজে গমন লীলায়।
চলিতে চলএ যেন রাজহংস যায়।।[১]

ইহার সঙ্গে পরবর্তী বিদ্যাসুন্দরের কবিদিগের বিদ্যার রূপবর্ণনার অংশ তুলনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এই বিষয়ে একটি বিশিষ্ট অলঙ্কার-শাস্ত্রসম্মত রীতি প্রথম হইতেই স্থাপিত হইয়াছিল; খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ পর্যন্ত তাহাই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।

শা'বারিদ খান

সম্ভবত শ্রীধর কবিরাজের কালিকা-মঙ্গল রচনার অব্যবহিত পরেই শা'বারিদ খান নামক চট্টগ্রাম অঞ্চলের একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান কবি বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী লইয়া একখানি কাব্য রচনা করেন। মুন্সী আবুদল করিম সাহিত্যবিশারদ চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে তাঁহার যে খণ্ডিত পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছেন,[২] তাহাতে কবির এই প্রকার আত্মপরিচয় পাওয়া যায়,—

পিয়ার মল্লিক[৩] সুত বিজ্ঞবর শাস্ত্রযুত
উজীয়াল মল্লিক প্রধান।
তান পুত্র জিঠাকুর তিন 'সিক'[৪] সরকার
অনুজ মল্লিক মুসা খান।।

১। সাহিত্য পত্রিকা, ১ (১৩৬৪), ১২১-২২

২। পুঁথিখানির দুইটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী মুন্সী আবদুল করিম সাহেবকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে,— 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যপ্রসঙ্গ', সওগাত (কলিকাতা), ১৩২৬ সাল, পৌষ, ৮৫; 'মুসলমান কবির বিদ্যাসুন্দর' ভারতবর্ষ ১৩২৫, ৬৩৩-৩৬। সম্প্রতি এই পুঁথিখানি আনুপূর্বিক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, 'সাহিত্য পত্রিকা', 'ঢাকা'১ (১৩৬৪), পৃষ্ঠা ৯৬-১১৪; আহম্মদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ইহা ঢাকা বাঙলা একাডেমি হইতে ১৩৭৩ (ইং ১৯৬৬) সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। মল্লিক—মহল্লিক, মহলেরে তত্ত্বাবধায়ক

৪। সিক্—চাক্‌লা, পরগণা

রসেতে রসিক অতি রূপে জিনি রতিপতি
দাতা অগ্রগণ্য অর্কসুত।[১]
ধৈর্যবন্ত যেন মরু জ্ঞানেত বাসবগুরু
মানে কুরু ধর্মে ধর্মসুত।।[২]
তান সুত গুণাধিক নানুরাজ মহল্লিক
জগতে প্রচার যশখ্যাতি।
তান সুত অল্পজ্ঞান হীন শা'বারিদ খান
পদবন্ধে রচিত ভারতী।।

উদ্ধৃত কবির আত্মবিবরণীতে তাঁহার পূর্বপুরুষ জিঠাকুরকে তিন সিকের সরকার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তিন সিক নামে কোন পরগণা চট্টগ্রামের কোথাও নাই। বরং নোয়াখালি জেলায় উত্তরসিক, দক্ষিণসিক—এই সকল নামে পরগণার অস্তিত্ব ছিল। অতএব পুঁথির আবিষ্কর্তা মনে করেন, তিনসিক পরগণাও নোয়াখালি জেলাইতে অবস্থিত ছিল। সুতরাং কবি নোয়াখালি জেলারই অধিবাসী হইবেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুসলমানদিগের মধ্যে ঠাকুর পদবী নূতন নহে। প্রসিদ্ধ পদ্মাবতের অনুবাদক কবি আলাওলের মুসলমান পৃষ্ঠপোষকের নাম ছিল মাগন ঠাকুর— তিনি সৈয়দ বংশজাত সম্ভ্রান্ত মুসলমান ছিলেন। মনে হয়, সেই অঞ্চলে সম্ভ্রান্ত মুসলমানদিগকে ব্রাহ্মণদিগের মত ঠাকুর বলিয়া সম্মানিত করা হইত।

শা'বারিদ খান তাঁহার কাব্য রচনায় প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত দ্বিজ শ্রীধরকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। উভয়ের কাব্যেই চরিত্রের নামগুলি অভিন্ন—উভয়ের পুঁথিরই খণ্ডিত অংশ হইতে যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে মনে হয়, একই সূত্র হইতে তাঁহারা উভয়েই কাহিনীভাগ আহরণ করিয়াছিলেন, কিংবা শা'বারিদ খান শ্রীধরকে অনুসরণ করিয়াছিলেন।

শা'বারিদ খান সংস্কৃত ভাষায়ও ব্যুৎপন্ন ছিলেন—শ্রীধরের মত তিনিও সংস্কৃত বচনিকা এবং স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক তাঁহার কাব্যের স্থানে স্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা এই মুখবন্ধ রচনা করিয়া তিনি তাঁহার বাংলা কাব্যের সূচনা করিয়াছেন,—

অস্ত্যাত্তরে শুভদেশে সর্বশান্তিসমন্বিতা।
পুরী রত্নাবতী নাম্নী সর্বরত্নবিভূষিতা।।
গুণসার নৃপস্তত্র নীতি ধর্ম-পরায়ণঃ।
তস্য কলাবতী নাম্নী ভার্যা চ গুণশালিনী।।

১। সূর্যের পুত্র কর্ণ
২। যুধিষ্ঠির

তস্যা গর্ভে সুতঃ জাতঃ কালিকায়া প্রসাদতঃ।
সুন্দর ইতি-আখ্যাতঃ সর্বশাস্ত্র-বিশারদঃ।।

অতঃপর শ্রীধরের মত ইহার একটি গদ্যানুবাদ দ্বারা তাঁহার কাব্যের সূচনা হইয়াছে। শ্রীধরের রচিত বচনিকা কিংবা শ্লোক তিনি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার এই শ্লোকগুলি পুঁথির পরবর্তী লিপিকর কর্তৃক বিকৃত হইয়াছে— অতএব ইহাতে শা'বারিদ সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞ ছিলেন, এমন অনুমান করা ভুল হইবে। এই শ্লোকগুলি শ্রীধর ও শা'বারিদ কোন তৎকালীন প্রচলিত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না; কারণ, তাহা হইলে উভয়ের রচনার মধ্যে অন্ততঃ কয়েকটি শ্লোকও অভিন্নরূপে পাওয়া যাইত—কিন্তু তাহা পাওয়া যায় না। অতএব সংস্কৃত শ্লোকগুলি উভয়েরই স্বাধীন রচনা বলিয়া মনে হয়।

শা'বারিদ খানের সময় সম্পর্কে তাঁহার কাব্যমধ্যে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাঁহার পুঁথিখানি অসম্পূর্ণ ভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব এই বিষয়ে তাঁহার পুঁথির মধ্যে কোন উল্লেখ ছিল কিনা, তাহাও বলিবার উপায় নাই। অগত্যা পুঁথির ভাষা বিচার করিয়া তাঁহার কাল-নিরূপণ করিবার চেষ্টা করা যাইবে। ভাষা বিচার করিবার কালে এই একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হয় যে, পুঁথির যদি প্রচার ব্যাপক হইয়া থাকে, তবে তাহার ভাষার বিচার নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না— কারণ, বহুল প্রচার দ্বারা মূল ভাষাই পরিবর্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় শা'বারিদ খানের পুঁথি বহুল প্রচার করিতে পারে নাই; কারণ, তাঁহার একখানি মাত্র খণ্ডিত পুঁথি ব্যতীত আর কোনও পুঁথি আবিষ্কৃত হয় নাই। অতএব তাঁহার পুঁথির ভাষা বিশেষ পরিবর্তিত হইতে পাবে নাই। এমন কি, আবিষ্কৃত পুঁথিখানিকে কবির সমসাময়িক বলিয়াও মনে হইতে পারে।

শা'বারিদ খানের পুঁথিতে ক্রিয়াপদের ব্যবহার এই প্রকার,— সম্মানার্থক প্রথম পুরুষ— 'শুনন্ত', 'করন্ত', 'পালয়ন্ত', 'যান্ত', 'জনায়ন্ত', ও তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষ—'ফিরসি' ইত্যাদি। ইহা ভাষার প্রচীনতা-দ্যোতক। 'কে' বিভক্তির পরিবর্তে 'ক' বিভক্তির প্রয়োগ পুঁথিখানির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যথা—'তনয়ক' (তনয়কে), 'তা-সাবক' (তাহাদিগের), 'পতিক' (পতিকে), 'বিদ্যাক' (বিদ্যাকে), 'তাক' (তাহাকে)। ইহাও ভাষার প্রাচীনতা-দ্যোতক। এতদ্ব্যতীত এই সকল প্রাচীন বিভক্তিযুক্ত শব্দ পুঁথিখানির সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে—যেমন, 'তথি' (সেখানে), 'তছু' (তাহার), 'মোহ' (আমার), 'আহ্মি' (আমি), 'তুহ্মি'(তুমি) ইত্যাদি। 'তোহ্মা', 'আহ্মা' শব্দগুলি বাদ দিলেও এ'কথা স্বীকার করিতে হয় যে, উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদে 'উ' ও 'অম্' প্রমুখ প্রত্যয়ের প্রয়োগ বাংলা ভাষায় অত্যন্ত প্রাচীন—প্রাচীনতম বাংলা ভাষারই ইহা একটি নিদর্শন।[১] ইহাতে অনুজ্ঞাসূচক ক্রিয়াপদে

১। S.K. Chatterji. *The Origin and Development of the Bengali Language* (Calcutta, 1929, II, 934).

স্বার্থে 'ক' বিভক্তির সর্বত্র অভাব,—যেমন, যাউ (যাউক নহে)—ইহা হইতেও পুঁথিখানিকে ভাষার দিক দিয়া প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। এই ভাষা বিচার করিয়া মনে হয়, পুঁথিখানি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী যুগে রচিত হইতে পারে না। অতএব মনে হয়, শ্রীধর কবিরাজের মাত্র অল্পকাল পরে, কিংবা সমসাময়িক কালেই শা'বারিদ খান তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন। কেহ অনুমান করিয়াছেন, '১৪৮০ থেকে ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই' শা'বারিদ খান বর্তমান ছিলেন।[১]

রচনার মধ্যে শা'বারিদ খান তাঁহার সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। স্বভাবস্ফূর্ত কবিত্বের বিকাশ তাঁহার কাব্যের মধ্যে প্রায় নাই বলিলেই হয়, তাঁহার পাণ্ডিত্য কবিত্ব-বিকাশের বাধা হইয়াছে। বিদ্যার রূপবর্ণনায় তিনি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিয়া চিত্রটিকে প্রাণহীন করিয়া তুলিয়াছিলেন। ছন্দের বৈচিত্র্যসৃষ্টি শা'বারিদ খানের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—

দ্বিজ বর তনয় পণ্ডিত।
আম্মা জান বৈদেশী নিশ্চিত।।
পাঠ পাঢ় ভ্রমিএ নগর।
পণ্ডিতালি করিএ বিচার।।
বেলি শেষে অস্ত যায়ে সুর।
বাসখানি মাগি তোম্মাপুর।।
পালহ বচন সুনয়নী।
প্রেম-চিত্তে দেহ বাসাখানি।।

তারপর,

ভাটের উত্তরে কল্পিত সুন্দর হৃদএ আনন্দ অতি।
বিদ্যারূপগুণ ভাবিয়া যখন বিরহে জ্বলিতে মতি।।
এ নাট-নাটিকা কাব্যবেদগীতা পুরাণ আগম সুতা।
অলঙ্কার বোধ ভারত জ্যোতিষ পুছিয়া মন উন্মতা।।

বহিরঙ্গের কৃত্রিম অলঙ্করণ ব্যতীত শা'বারিদ খানের রচনায় আর কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার ভাষা একান্ত সংস্কৃতানুগ এবং আরবি-পারসির প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত।

গোবিন্দ দাস

১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের অন্তর্গত দেবগ্রাম নিবাসী কবি গোবিন্দ দাসের 'কালিকা-মঙ্গল' রচিত হয়। ইহার কাহিনীভাগে একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। বিদ্যার পিতা রত্নপুরের রাজা,

১। সাহিত্য পত্রিকা, ১২৯১

সুন্দর পশ্চিমবঙ্গের কাঞ্চননগরের অধিবাসী ও মালিনী মাসীর নাম রম্ভা, ইঁহারা নহে। চট্টগ্রাম অঞ্চলেই তাঁহার পুস্তকের প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল, অন্যত্র প্রসাব লাভ করিতে পারে নাই। এসিয়াটিক সোসাইটির প্রাচীন পুঁথি-সংগ্রহে গোবিন্দ দাসের 'কালিকা-মঙ্গল' নামক একখানি পুঁথি সংগৃহীত আছে।[১] কিন্তু তাহাতে 'মার্কণ্ডেয়-পুরাণে' উল্লিখিত সুরথ ও বৈশ্যের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর সঙ্গে তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। তিনি একজন স্বতন্ত্র কবি বলিয়াই মনে হয়।

গোবিন্দ দাসের কাব্যমধ্যে কালীর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াসই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয়-কাহিনী ইহার উপলক্ষ মাত্র। কঙ্কের রচনার মত তাঁহার কাব্যেও অল্পাধিক ভক্তিরস ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি গোবিন্দ দাস পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার রচনার মধ্যেও এই পাণ্ডিত্য যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার শিবস্তোত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

নৌমি নন্দিকেশ ঈশ, কণ্ঠে কালকূট বিষ
নীলকণ্ঠ নাম রামদেব দেববন্দিনী।
অর্ধ অঙ্গ গৌরীসঙ্গ, মৌলী কেলি চতুরঙ্গ,
অঙ্গভঙ্গ অতিরঙ্গ, সোহি জহ্নুনন্দিনী।।
রঙ্গনাথ লোকপাল, অর্ধঅঙ্গ বাঘছাল,
ব্যোমকেশ শেষ মাল ভালে ইন্দুমোহিনী।

বিদ্যার বিলাপ বর্ণনায় কবি গতানুগতিকভাবে প্রভাব অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই—

বিদ্যা ক্ষণে মূর্ছিত হয় ক্ষণেক ভাবনা।
ক্ষণে চমকিত ক্ষণে করেন করুণা।।
ক্ষণে ক্ষণে মেলে আঁখি ক্ষণেক মুদিত।
সিন্দুর কজ্জল বিদ্যার হইল গলিত।।
ছিঁড়িল গলার হার খসিল কবরী।
ধরিতে না পারে কেহ যায় গড়াগড়ি।।
বিদ্যার বিলাপ দেখি রাণীর করুণা।
কতো বা সহিব বিদ্যার এ সব যন্ত্রণা।।
বিদ্যা কোলে করি রাণী পরম তাপিত।

১। গ. স ৪২৬২

চাহিয়া সুন্দর পানে হইলা মূৰ্চ্ছিত।।

কৃষ্ণরাম দাস

অতঃপর সম্ভবত কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'কালিকা-মঙ্গল' রচিত হয়।[১] কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গল' ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। তিনি একাধিক বিষয়ের মঙ্গলকাব্য রচয়িতা। 'কালিকা-মঙ্গলে' তিনি তাঁহার গ্রন্থ-রচনার কাল এইভাবে নির্দেশ করিয়াছেন,—

সারসা সানের নেত্র, ভীমাক্ষিবর্জিত মিত্র
তেজিয়া ঋষির পক্ষ তবে।
বিধুর মধুর নাম, রচনাতে কহিলাম,
বুঝ সকল বিচারিয়া সভে।।

ইহার অর্থ সম্ভবত এই প্রকার, 'সারসা সানের' অর্থাৎ শরাসনের, 'শরাসন' শব্দের অর্থ ধনু, ধনু নবম রাশি; অতএব ধনুতে ৯, তাহা হইতে নেত্র অর্থাৎ ৩ বর্জিত, তাহা হইলে ৬; ভীমাক্ষি বর্জিত মিত্র, অর্থাৎ মিত্র বা ১২ হইতে ভীম ও অক্ষি একত্রে বর্জিত হইল, তাহা হইলে ৮ রহিল; 'তেজিয়া ঋষির পক্ষ' অর্থাৎ ৭ হইতে ২ বাদ যাইবে, তাহা হইলে পাই ৫; তারপর বিধুর নাম অর্থাৎ ১। এখন অঙ্কের বামা গতিতে ইহা হইতে পাই ১৫৮৬ শকাব্দ, অর্থাৎ ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময়ের সমর্থক আর একটি ঐতিহাসিক উক্তি তাঁহার কাব্যে আছে। কবি সায়েস্তা খাঁ ও আওরঙ্গজেবের নাম করিয়াছেন,—

অরংসাহা ক্ষিতিপাল, রিপুর উপরে কাল
রামরাজা সর্বজনে বলে।
নবাব সায়েস্তা খাঁ আদি করি সাতগাঁ
বহু সরকার করতলে।।

সায়েস্তা খাঁ ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুবেদার ছিলেন;[২] অতএব এই সময়ে কবি কৃষ্ণরামের 'কালিকা-মঙ্গল' রচিত হয়। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মাহাশয় অনুমান করিয়াছেন, 'রায়মঙ্গল' কৃষ্ণরামের প্রথম বয়সের রচনা, তাঁহার 'কালিকা-মঙ্গল' বা বিদ্যাসুন্দর ইহার পরে রচিত।[৩]

কিন্তু রায়মঙ্গলের আলোচনা সম্পর্কে দেখা যাইবে যে, 'রায়মঙ্গল'ই কালিকা মঙ্গলের পর রচিত হয়। 'কালিকা-মঙ্গল' হইতে দেখা যায়, ইহাই কবির প্রথম বয়সের রচনা,

১। গ-স ৩৭২৮ (মুদ্রিত তালিকায় ৩৯২৮); 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী' সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২। H.B. II, 371

৩। 'কবি কৃষ্ণরাম,' সাহিত্য, ১৩০৫ সাল, পৃঃ ১১৫

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী প্রথম বয়সের রচনা হওয়া স্বাভাবিক; রামপ্রসাদের জীবনেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণরাম তাঁহার 'কালিকা-মঙ্গলে' উল্লেখ করিয়াছেন, এই কাব্য রচনা সময় তাঁহার বয়স মাত্র বিংশ বৎসর; বিংশতি বৎসরের পূর্বে কবি আর কোনও কাব্য লিখিয়াছিলেন বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে না,—

সেই গ্রামের মধ্যে বাস, নাম ভগবতী দাস,
কায়স্থ কুলেতে উৎপত্তি।
তাঁহার তনয় হই, নিজ পরিচয় কই,
বয়ঃক্রম বৎসর বিংশতি।।
শুভ সভে একচিত, যেমনে হইল গীত
কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি,
প্রথম বৈশাখ মাসে, স্বপনে আপন বাসে
দেখিনু সারদা ভগবতী।।[১]

কলিকাতার নিকটবর্তী নিমতাগ্রাম কবির বাসভূমি। 'রায়মঙ্গলে'র আলোচনা সম্পর্কে তাঁহার বিস্তৃত পরিচয় উল্লেখ করিয়াছি। কারণ, 'রায়মঙ্গল' পুঁথিতেই কবি তাঁহার বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কোনও বিদ্যাসুন্দরে কবি এই কাব্যের ঘটনাস্থল বর্ধমান বলিয়া উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু 'বীরসিংহের দেশ' বর্ধমান নহে, বীরসিংহপুর। মালিনীর নাম বিমলা। কৃষ্ণরামের রচনা সরল, কিন্তু পাণ্ডিত্য-বর্জিত নহে। রচনা সরল হইলেও তাহা মার্জিত ও সম্পূর্ণ গ্রাম্যতা-মুক্ত। সুন্দরের বীরসিংহপুর যাত্রার বর্ণনাটি এইরূপ,—

জনকেরে না বলিল না জানে জননী।
একাকী করিল গতি কবি শিরোমণি।।
জয়পত্র যুবক বিচিত্র ছত্র ধরি।
দিব্য বস্ত্র ভূষণ দ্বিজেরে দান করি।।
কবি পণ্ডিতের বেশে প্রতাপের শূর।
সারদা সহায়ে যায় বীরসিংহপুর।।

প্রাণরাম চক্রবর্তী

ইহার অল্পদিন পরেই প্রাণরাম চক্রবর্তী 'কালিকা-মঙ্গল' রচিত হয়।[২] প্রাণরাম এইভাবে তাঁহার কাব্যরচনার সমাপ্তি-কাল নির্দেশ করিয়াছেন,—

বসুদ্বয় বাণচন্দ্র শক নিরূপণ।।

ইহা হইতে ১৫৮৮ শকাব্দ বা ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। 'দ্বয়' শব্দটিকে পৃথক্‌ভাবে

১। ব ২৩৬৯, এক

২। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'প্রাণরাম চক্রবর্তীর কালিকা-মঙ্গল', সা-প-প ৫০; ৬২-৬৩

দুই সংখ্যা ধরিয়া কেহ ইহাতে ১৫২৮ শকাব্দ বা ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ পাইয়াছেন। কিন্তু তাহা সমীচীন মনে হয় না। কাব্যখানি মুদ্রিত হইয়া ১২৪৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু মুদ্রিত পুঁথিখানিরও কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। বহুপূর্বে ইহার সম্বন্ধে একটি আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে প্রাণরামের নিম্নোদ্ধৃত ভণিতাটির জন্য তাঁহাকে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের পুত্র বলিয়া মনে করা হইয়াছিল। কিন্তু মুকুন্দরামের পুত্রের নাম ছিল শিবরাম, তাঁহার কবিখ্যাতি ছিল বলিয়াও জানা যায় না। ভণিতাটি এই—

মুকুন্দনন্দন ভণে, নৃপবৈশ্য দুইজনে, চলিল মুনির সন্নিধান।
কালিপদ সরসিজ হৃদয়ে চিন্তিয়া দ্বিজ, শ্রীকবিবল্লভ রসগান।।

প্রাণরামের উপাধি ছিল কবিবল্লভ।

বলরাম চক্রবর্তী

তারপর কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তীর 'কালিকা-মঙ্গল' রচিত হয়।[১] তাঁহার মাত্র একখানি পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া মুদ্রিত পুঁথিখানি সম্পাদিত হইয়াছে। তাঁহার সময় সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু জানা না গেলেও তিনি যে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কবি এই বিষয়ে অনেকেই নিঃসন্দেহ। ইহার প্রমাণ এই যে, বলরাম কাব্য-মধ্যে কাহিনীর দিক দিয়া প্রাচীনত্বের লক্ষণ আছে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচনার পর, অন্য কেহ এই কাহিনী লইয়া কাব্যরচনায় প্রয়াসী হইলেও ভারতচন্দ্রের প্রভাব অস্বীকার করিতে পারিতেন না; বিশেষত কাহিনীর দিক দিয়া হইলেও ভারতচন্দ্রের সঙ্গে কোন না কোন সঙ্গতি লক্ষ্য করা যাইত, কিন্তু, এই বিষয়ে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের সঙ্গে কোন না কোন সঙ্গতি লক্ষ্য করা যাইত; কিন্তু, এই বিষয়ে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের কোনও প্রভাবই বলরামের কাব্যে অনুভব করা যায় না। অবশ্য বলরামকে কেহ কেহ পূর্ববঙ্গের কবি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।[২] তাহা হইলে ভারতচন্দ্রে প্রভাব তাঁহার উপর না থাকিবারই কথা; কারণ, একেবারে সমসাময়িক কালেই সুদূর পূর্ববঙ্গ ভারতচন্দ্রের প্রচার হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু বলরাম পূর্ববঙ্গের কবি ছিলেন, তাহা মনে করিবার পক্ষে কোন নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য যুক্তি নাই। গ্রন্থ-সম্পাদক মহাশয়ের একমাত্র যুক্তি এই যে, তাঁহার পুস্তকের অনেক স্থানে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু পুঁথিখানি যখন কবির স্বহস্ত-লিখিত বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই, তখন ইহার ভাষা দেখিয়া কবির বাসস্থান নির্ধারণ করিতে যাওয়া সমীচীন বোধ হয় না, অনুলিপিকারগণও ভাষা বিকৃত করিয়া থাকে। বিশেষত যে শব্দগুলি গ্রন্থ-সম্পাদক পূর্ববঙ্গের ভাষার নির্দশন-স্বরূপ কবির কাব্য হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন (১-১০), তাহাদের মধ্যে কোন কোন শব্দ আজ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের ভাষায় প্রচলিত থাকিলেও সবগুলিই প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় সর্বত্রই প্রচলিত ছিল—প্রাচীন বাংলা পুঁথি হইতে তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। বিশেষত এই

১। বলরাম কবিশেখর, কালিকা-মঙ্গল, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত (সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫০)।

২। ঐ, ১।

শব্দগুলির অধিকাংশ এখনও পশ্চিমবঙ্গও প্রচলিত আছে।

কিন্তু আমাদের অনুমান হয় বলরাম পশ্চিমবঙ্গেরই কবি। দেবদেবী-বন্দনায় তিনি যে সকল দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের কোনও দেবতারই নাম নাই। এক বিক্রমপুরের বিশালাক্ষীর কথা উল্লেখ আছে; কিন্তু বিক্রমপুরের বিশালাক্ষীর খ্যাতি বহুকাল হইতেই যে অনেক দূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা ধর্মমঙ্গলের কবি রামদাস কৈবর্তের উল্লেখ হইতেও জানা যায়।[১] বলরাম রাঢ়েরই সমস্ত দেবদেবীর নাম করিয়াছেন; এমন কি, তিনি পশ্চিমবঙ্গের ঘাটু নামক লৌকিক দেবতারও নাম করিয়াছেন, ইহাতেই তিতি বর্ধমান অঞ্চলের লোক বলিয়া মনে হয়; অতএব তিনি যদি ভারতচন্দ্রের পরবর্তী হইতেন, তাহা হইলে ভারতচন্দ্রের প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারিতেন না। বলরামের কাব্যে তাঁহার বিস্তৃত আত্মপরিচয় নাই, মাত্র এক স্থলে উল্লেখ আছে,—

পিতামহ চৈতন্য লোকেতে বলয়ে ধন্য
জনক আচার্য দেবীদাস।
জননী কাঞ্চন নাম তার সুত বলরাম
কালিকা পুরিল যার অংশ।।

বলরামের উপাধি ছিল কবিশেখর। ভণিতার অনেক স্থলেই তিনি নামের পরিবর্তে উপাধিই ব্যবহার করিয়াছেন, 'শ্রীকবিশেখর গায় কালিকার গীত।' কাব্যের কোনও স্থলে তিনি 'বলরাম', কোনও স্থানে 'চক্রবর্তী বলরাম' বা 'দ্বিজ বলরাম' ভণিতাও ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা হইতেই তাঁহার পূর্ণ নামটির পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদ্যা ও সুন্দরের গুপ্ত প্রণয়-কাহিনী অপেক্ষা কালিকার মাহাত্ম্য বর্ণনাতেই কবির অধিকতর আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য ইহাতে মঙ্গলকাব্যের নিষ্ঠা সম্পূর্ণ রক্ষা পাইয়াছে। তিনি আদিরস-বর্ণনায় ও কবি ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের মত যথেচ্ছাচারিতার প্রশয় দেন নাই, এই বিষয়ে তিনি সংযমের মর্যাদা যথাসম্ভব রক্ষা করিয়াছেন। বররুচির নামে প্রচলিত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর সাহত তাঁহার কাহিনীর অনেকাংশই ঐক্য আছে। কাহিনীর দিক দিয়া আরও কয়েকটি সামান্য বিষয়ে অন্যান্য বিদ্যাসুন্দরের সহিত তাঁহার পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

বলরাম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রচনা পাণ্ডিত্যে ভারাক্রান্ত নহে; তাঁহার রচনা অনেক স্থানেই সরল, উচ্চাঙ্গের কবিত্ব ইহাতে সুলভ না হইলেও ইহার অনাড়ম্ব ভাব সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করে। সুন্দরের সহিত মালিনীর সাক্ষাতের বর্ণনাটি এই,—

নগরে পশারি সব আছে সারি সারি।
আপন ইৎসায় সভে বেচা কিনি করি।।
দেখিল মালিনী বৃক্ষতলে ফল বেচে।
পুষ্প না বিকায় সেই একাকিনী আছে।।
ধীরে ধীরে কুমার গেলেন বৃক্ষতলে।

১। 'বিক্রমপুরের বন্দিলাম বিশাল-লোচনী'—অনাদি-মঙ্গল (রামদাস) পৃঃ ৬সা-প সংস্করণ

কৌতুক মালিনী মাল্য দিল তার গলে।।

রামপ্রসাদ সেন

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাবে চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত হালিশহরের নিকটবর্তী ভাগীরথী তীরস্থ কুমারহট্ট গ্রামে কুলীন বৈদ্য বংশে ধন্বন্তরি গোত্রে বাংলার সাধক কবি রামপ্রসাদের জন্ম হয়।[১] তাঁহার পিতার নাম রামরাম সেন। কবি তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্যে এই ভাবে তাঁহার বংশের পরিচয় দিয়াছেন,—

ধন হেতু মহাকুল পূর্বাপর শুদ্ধ মূল
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণান্বিত
প্রসন্ন কালিকা কৃপামই।।
সেই বংশে সমুদ্ভব পুরুষার্থ কত কব
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনতির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরল হৃদয়।।
তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধাম
সদা যাঁরে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ' প্রসাদে কহে কালিকার পদে
কৃপাময়ি ময়ি কর দয়া।।

কবির সর্বজ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম অম্বিকা। সম্ভবত অম্বিকা বালবিধবা ছিলেন। দ্বিতীয় ভগিনীর নাম ভবানী, ভগিনীপতি লক্ষ্মীনারায়ণ। কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বিশ্বনাথ। কবির রামদুলাল ও রামমোহন নামে দুই পুত্র ও পরমেশ্বরী এবং জগদীশ্বরী নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কবির কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের বংশধর অদ্যাপি বর্তমান আছেন।

রামপ্রসাদ ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[২] উদ্ধৃত কবির বংশ-পরিচয় হইতে জানা যায় যে, কবির পরিবার দরিদ্র ছিল না, রামপ্রসাদও শৈশব হইতেই সচ্ছল অবস্থার মধ্যে লালিত-পালিত হইয়া উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া সংসারের ভার তাঁহার উপরই পড়িল, তিনি কর্মের সন্ধানে বর্তমান কলিকাতার নিকটবর্তী কোনও স্থানে আসিয়া এক ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদারের মুহুরীর কার্যে নিযুক্ত হইলেন। কেহ অনুমান করেন, দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের নিকট তিনি কর্মগ্রহণ করেন, আবার কেহ মনে করেন, নবরঙ্গ কুলাধিপতি দুর্গাচরণ মিত্র তাঁহার কর্মদাতা।[৩] কিন্তু এই

১। রামপ্রসাদ সেন, গ্রন্থাবলী (বসুমতী, তৃতীয় সং), ১-৫৬

২। সা-প-প-৩৬, ৫-৬

৩। অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামপ্রসাদ (১৯২৫), ৪৩

সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলিবার প্রমাণাভাব। সম্ভবত পিতৃবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই রামপ্রসাদের আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হইয়া পড়ে, বৃহৎ পরিবারের ভরণ-পোষণের চিন্তার অল্পদিনের মধ্যেই কবি মানসিক স্থৈর্য হারাইয়া ফেলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার ভাবতন্ময়তার সূত্রপাত হয়। তিনি তাঁহার হিসাব লিখিবার খাতায় কালী-কীর্তনের, পদাবলীর পদ রচনা করিয়া লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন। কথিত আছে, ইহারই সঙ্গে তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ পদ—'আমায় দাও মা তহবিলদারী। আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী' পদ দুইটিও লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার উর্ধ্বতন কর্মচারী একদিন ইহা দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করেন, তারপর মনিবের নিকট সেই হিসাবের খাতাখানি লইয়া উপস্থিত করেন। কিন্তু তাঁহার মনিব রামপ্রসাদের এই অপূর্ব ভক্তিরস-সিক্ত পদাবলী পাঠ করিয়া তাঁহার উপব অত্যন্ত প্রসন্নস হন এবং মাসিক ৩০্ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গৃহে যাইতে অনুমতি দেন। রামপ্রসাদও গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া একাগ্রমনে আধ্যাত্মিক চিন্তায় কালাতিপাত করিতে থাকেন। রামপ্রসাদ যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন তাঁহার এই গুণগ্রাহী মনিব-প্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিযা গিয়াছেন। কুমারহট্ট নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই গ্রামে মহারাজের একটি কাছারীও ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া বাস করিতেন। একবার কৃষ্ণচন্দ্র কুমারহট্টে আসিয়া রামপ্রসাদের কথা শুনিলেন, তাঁহার অপূর্ব ভক্তিরস-মিশ্রিত পদাবলীর কথা শুনিয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন তাঁহার মুখ হইতে দুই-একটি পদ-কীর্তন শুনিয়া তিনি এতই আকৃষ্ট হইলেন, যে তাঁহাকে নিজের সঙ্গে রাজধানী নবদ্বীপ লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বিষয় বিরাগী স্বাধীন-প্রাণ কবি ইহাতে সম্মত হইলেন গুণগ্রাহী রাজা রামপ্রসাদের এই অসম্মতিতে বিরক্ত না হইয়া বরং তাঁহাকে 'কবিরঞ্জন' উপাধিতে ভূষিত করিলেন। তদুপরি তাঁহাকে একশত বিঘা জমি নিষ্কর ভোগাধিকার স্বত্ব দান করিলেন। রামপ্রসাদের কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহার আরাধ্য দেবতা কালীর মাহাত্ম্য-সূচক কাব্য 'বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী' রচনা করিয়া মহারাজের সম্মুখে নিজেই তাহা পাঠ করিয়া শ্রবণ করান, তাঁহার রচনায় প্রীত হইয়া মহারাজ তাঁহার কবিত্বশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রামপ্রসাদ তন্ত্রোক্ত কৌলিক ধর্মাচারী ছিলেন। সেইজন্য শক্তির রূপ-ভেদ কালিকাই তাঁহার আরাধ্যা ছিল। তিনি তন্ত্রের আচারে কালীর সাধনা, করিতেন, আনুষঙ্গিক মদ্যপানেও তাঁহার অভ্যাস ছিল। সেইজন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আজু গোঁসাই নামক অন্য একজন কবি এই সম্বন্ধে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন, তিনিও স্বরচিত পদে তাহার প্রত্যুত্তর দান করিতেন। হালিশহরে শিবের গলিতে এখনও রামপ্রসাদের পঞ্চমুণ্ডী সাধনাসন বর্তমান আছে। কুমারহট্ট বর্তমানে হালিশহরেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বাহ্যিক এই আচারের অন্তরালেও রামপ্রসাদের একটি বিশিষ্ট ধর্মমত ছিল। তাহা বৈদান্তিক একেশ্বরবাদ। কালীকে তিনি এক ব্রহ্মময়ী রূপে বিশ্ব-প্রকৃতির সকল বৈষম্যের মধ্যেও অধিষ্ঠিতা দেখিয়াছেন। অখণ্ড প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ-স্বরূপিণী যে শক্তি, তাঁহার আরাধ্যা কালিকা তাহারই

রূপময়ী। এই বিশ্বপ্রকৃতি সেই অদৃশ্য শক্তিস্বরূপিণীর লীলাস্থলী। পরবর্তী যুগে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ধর্মমতের মধ্যে যে সর্বমূলীভূত ঐক্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল, রামপ্রসাদে তাহারই সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। রামপ্রসাদের জীবনে এই আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতার জন্য তিনি সিদ্ধপুরুষ বলিয়া সমাজে খ্যাতি লাভ করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই এই সূত্রে তাঁহার জীবনের সঙ্গে নানা অলৌকিক বৃত্তান্ত জড়িত হইয়া নানা কাহিনী লোকমুখে প্রচারিত হইয়া পড়িল। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধেও এক অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। কবিরঞ্জন কোন্ সময়ে তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাহিনী রচনা করেন, কাব্যমধ্যে তাহা উল্লেখ করেন নাই। কেহ অনুমান করেন, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ভাবতচন্দ্রের কাব্যের দুই-এক বৎসরের পূর্ববর্তী রচনা। কেহ আবার মনে করেন, ভারতচন্দ্রের রচনাই পূর্ববর্তী। অবশ্য ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদা-মঙ্গলের রচনা-কাল ১৬৭৪ শকাব্দ বা ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রামপ্রসাদের রচনা ইহার দুই-এক বৎসর অগ্রপশ্চাৎ হইতে পারে, এই বিষয়ে কিছুই নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। উভয়ের কাহিনীগত ঐক্যও যথেষ্ট লক্ষিত হয়। আদিরস বর্ণনায় উভয়েই সমান পটু।

রামপ্রসাদের কাব্যের নাম 'কবিরঞ্জন'। কালিকার মাহাত্ম্য বর্ণনাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীই ইহার মূল লক্ষ্য। কথিত আছে, রামপ্রসাদের 'কবিরঞ্জন' তাঁহার কালিকা-মঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত ছিল, কালক্রমে কাব্যের পূর্বাপর অংশ বিনষ্ট হইয়াছে, একমাত্র বিদ্যাসুন্দর কাহিনীই রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু রামপ্রসাদের কালিকা-মঙ্গল বলিয়া স্বতন্ত্র কোন পুঁথি পাওয়া যায় না। তাঁহার কালী-কীর্তন বলিয়া যে কাব্যগ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহাও খণ্ড গীতি-কবিতা বা পদাবলীর সমষ্টি মাত্র; সমগ্র কাব্য একটি বিশেষ কোন কাহিনী-বদ্ধ রচনা নহে, অতএব তাঁহার সুদীর্ঘ বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী ইহার অন্তর্গত হওয়া অসম্ভব।

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী-রচনায় রামপ্রসাদ বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার কালী-কীর্তন ও কৃষ্ণ-কীর্তনের খণ্ড গীতি-কবিতাগুলির সহিত ইহা একাসনে স্থান পাইতে পারে না। শাক্ত পদাবলী রচনায় রামপ্রসাদের যে স্বতঃস্ফূর্ত কবি-প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে, তাহা তাঁহার আগমনী বিজয়াগান রচনার সার্থকতা হইতেই অনুমিত হইবে। রামপ্রসাদের প্রতিবা প্রকৃতপক্ষে এই গীতি-কবিতা বা পদাবলী রচনারাই প্রতিভা। ভাব-প্রবণ কবির কোন ভাব-প্রেরণার সংক্ষিপ্ত রসস্ফূর্তি যত স্বাভাবিক হয়, দীর্ঘ কাহিনীর মধ্যে তাহা তত স্বাভাবিক হইতে পারে না। কেহ কেহ অনুমান করেন, বিদ্যাসুন্দর তাঁহার প্রথম বয়সের রচনা। ইহা খুবই সম্ভব বলিয়া মনে হয়, একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্রের বিদগ্ধ মনের পরিতুষ্টির জন্যেই যে তিনি ইহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নহে—ইহার সহিত তাঁহার প্রথম বয়সোচিত ভাব ও রুচির অসংযত বিলাসের নিদর্শনও হয় ত প্রকট হইয়া আছে।

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী-রচনায় রামপ্রসাদ অনেক স্থলেই অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলা রচনায় সংস্কৃত শব্দ-প্রয়োগের কৌশল তখনও তিনি আয়ত্ত করিতে

পারেন নাই; সেইজন্য প্রায়ই তাহা তাঁহার রচনার ভারস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণেই স্থানে স্থানে তাঁহার রচনা প্রায় দুর্বোধ্যও হইয়া রহিয়াছে। অবাধে তিনি অনেক স্থলে সংস্কৃত ধাতুবিভক্তি-নিষ্পন্ন পদ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, যেমন—

পূর্ণচন্দ্র শোভা যেন পিবতি চকোর।
ক্ষেপ করে দশদিক্ষু লোষ্ট্র বিবর্ধনে।।

কিন্তু মধ্যে মধ্যে এই শ্রেণীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাও তাঁহার অনুপ্রাস সৃষ্টির প্রয়াস কতক সার্থক হইয়াছে, যেমন—

ডুবিল কুরঙ্গ শিশু মুখেন্দু শোভায়।
লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দৃশ্য হয়।।
সিংহাসনে নরসিংহ বীরসিংহ রায়।
তপ্ত তপনীর তনু তারাপতি প্রায়।।

রামপ্রসাদ 'শিবায়নে'র কবি রামেশ্বরের সমসাময়িক কালে বর্তমান ছিলেন, সেইজন্য যুগ-প্রভাব তাঁহাকে এই বিষয়ে স্বীকার করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর উপর রামপ্রসাদের কবি-প্রতিভা প্রতিষ্ঠিত নহে, তাঁহার শ্যামা-সঙ্গীতই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

নিধিরাম আচার্য

ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক কালে নিধিরাম আচার্য নামক একজন কবি একখানি কালিকা-মঙ্গল রচনা করেন।[১] তাঁহার পিতার নাম দুর্লভ আচার্য ও মাতার নাম লক্ষ্মী। কবি নিজের গণক বংশে জন্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন— অতএব তিনি আচার্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। গ্রন্থ রচনার কাল সম্বন্ধে তিনি যে নির্দেশ দিয়াছেন[২] তাহা হইতে জিনিতে পারা যাই যে, ১৬৭৬ শকাব্দ বা ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কাব্য রচিত হয়। নিধিরামের কাব্যে আলী আকবর নামে এক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। সম্ভবত তিনি কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নিধিরামের উপাধি ছিল কবিরত্ন। চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে তাঁহার পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে; অতএব মনে হয়, তিনি এই অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন।

নিধিরামের কাব্যের ঘটনাস্থল উজ্জয়িনী। কাব্য-বর্ণিত চরিত্রসমূহ নাম সম্পর্কে চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত জনশ্রুতিকেই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলে রচিত কালিকা-মঙ্গলসমূহ নীতির দিক দিয়া তত দূষণীয় ছিল না—কাহিনীর মধ্যে দেবতা একেবারে

১। সা-প-প ৯. ৩০-৩১ ; ব-প্রা-পু-বি ১।২, ১০-১১; বিশ্বকোষ ১৮, ৬৭;

২। সা-প-প ৯,৩১

অন্তরালবর্তী নহেন, নিধিরামের কাহিনীর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাইয়াছে। নিধিরামের রচনায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া গেলেও তাহাতে কবিত্বের পরিচয় খুব সুলভ নহে।

দ্বিজ রাধাকান্ত

দ্বিজ রাধাকান্তের ভণিতাযুক্ত একখানি কালিকা-মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের পুঁথি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।[১] তাঁহার কাব্যে তাঁহার ব্যক্তিগত কোনও পরিচয় কিংবা কাব্যরচনার কাল সম্পর্কে কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে 'কণ্বমুনির পারণাভঙ্গ' নামক তাঁহার একখানি পুঁথি চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে[২] দেখিয়া তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন, এমন অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার কাব্যে বিদ্যার পিতৃরাজ্য বর্ধমান এবং পিতার নাম বীরসিংহ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিদ্যাসুন্দর রচনার যে ধারা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে এই নামগুলি যে স্বতন্ত্র, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণত ভারতচন্দ্রের প্রভাব বশত তাঁহার পরবর্তী কাল হইতেই বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ঘটনাস্থল বর্ধমান বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। সুতরাং মনে হয়, দ্বিজ রাধাকান্ত ভারতচন্দ্রের পরবর্তী কবি। তাঁহার ভাষায়ও আধুনিকতার পরিচয় অতি সুস্পষ্ট। যেমন,—

> এমনি কতেক দিন করিয়া ভ্রমণ।
> সম্মুখে বিষম ঘোর গহন কানন।।
> প্রবেশে পরমা পাদপদ্ম অনুবলে।
> সম্মুখে শার্দূল সিংহ শত শত চলে।।
> তর্জন করিয়া তারে মারিবারে ধায়।
> অসিধারী শ্যামা বামা দেখিয়া পালায়।।
> লোভ সম্বরিতে নারে আইসে পুনর্বার।
> কি করিতে পারয়ে পার্বতী সখা যার।।
> পথতে প্রদোষ হৈল অন্ধকার নিশি।
> নির্ণয় না হয় দিক হারাইল দিশি।।

দ্বিজ রাধাকান্ত তাঁহার কালিকা-মঙ্গলকে 'শ্যামার সঙ্গীত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন, 'শ্যামার সঙ্গীত দ্বিজ রাধাকান্ত গায়।'[৩]

১। বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী (বসুমতী—প্রকাশকাল অনুল্লিখিত), পৃ. ১-৫৪
২। ব-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ. ২৫
৩। বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী (বসুমতী)

কবীন্দ্রের ভণিতা-যুক্ত একখানি কালিকা-মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের পুঁথি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।[৩] তিনি রামপ্রসাদ এবং ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কালে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ তাঁহার কাব্য রচনা করেন বলিয়া অনুমতি হয়; কারণ, ইঁহাদের কোনও প্রভাব তাঁহার কাব্যে অনুভব করা যায় না। ভণিতা হইতে জানতে পারা যায় যে, তাঁহার পদবী ছিল চক্রবর্তী এবং তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। একটি ভণিতা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার পদবী ছিল চক্রবর্তী এবং তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। একটি ভণিতায় তাঁহার পিতৃপরিচয়ও পাওয়া যায়,

ঘটক চক্রবর্তী সুত কৃষ্ণচন্দ্র পদে রত
শ্রীযুক্ত ঘটকচূড়ামণি।
তাঁহার অনুজ কহে কালীপদ সরোরুহে
রক্ষ রক্ষ নগেন্দ্রনন্দিনী।।

কেহ অনুমান করিয়াছেন, তাঁহার নাম ছিল মধুসূদন। তাঁহার সমগ্র কাব্যের মধ্যে একটি মাত্র ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে,—

কুসুম সরস জর জর অন্তর
দংশিল কালিনী সাপ।
কহে মধুসূদন রহ ধনি দুই দিন
পহর কি পঞ্চ উপাস।।

ইহার প্রকৃতি দেখিয়া মনে হয়, ইহা কোনও স্বতন্ত্র কবির রচনা; বিশেষত ইহা বিদ্যাসুন্দর কাব্য-কাহিনীর অন্তর্নিবিষ্ট অংশ নহে; সুতরাং সমগ্র কাব্যমধ্যে এই একটি মাত্র ভণিতা হইতেই ইহার নাম যে মধুসূদন ছিল এমন মনে করিবার কিছুই কারণ নাই। তাঁহার রচনা হইতে তাঁহার সময় কিংবা বাসস্থানের কথা জানিতে পারা যায় না। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর ধারাটি তিনি সাধারণভাবেই অনুসরণ করিয়াছেন। তবে তাঁহার ভাষার মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর পারিপাট্য বিশেষভাবেই লক্ষ্য করিবার মত। বৈষ্ণব কবিতার প্রভাবও তাঁহার মধ্যে বিলক্ষণ অনুভব করা যায়।

এই সকল কবি ব্যতীতও মধুসূদন[১], ক্ষেমানন্দ[২], বিশ্বেশ্বর দাস[৩], কবিচন্দ্র[৪] প্রভৃতি প্রণীত কালিকা-মঙ্গলের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাদের কবি সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় না।

মধ্যযুগের বাংলার কালিকা-মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্যগুলি আলোচনা করিলে দেখা

১। বিশ্বকোষ ১৮, ৬৫; ২। D.C. Sen, *History of Bengali Language and Literature* (Calcutta; 1911), 656; ৩। ঐ, ৪। ঘ, ২৩৮৩ এই পুঁথির একটি মাত্র পত্র পাওয়া গিয়াছে।

যায়, ইহারা প্রধানত দুইটি ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে; প্রথমত পশ্চিম বঙ্গের একটি ধারা, দ্বিতীয়ত চট্টগ্রামের একটি ধারা। চট্টগ্রামের ধারাটি কেবলমাত্র যে প্রাচীনতর, তাহাই নহে—তাহা নানাদিকে দিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল; কারণ কয়েক শতাব্দীর ভিতর দিয়া ইহা অব্যাহতভাবে অগ্রসর হইয়াছে। ইহার মধ্যে অশ্লীলতার বর্ণনা অপেক্ষাকৃত অল্প। উদ্দিষ্ট দেবতা কালিকা ইহাতে কাহিনীর পটভূমিকায় একেবারে বিলীন হইয়া যান নাই। পশ্চিম বঙ্গের ধারাটি ভারতচন্দ্রের পূর্ব পর্যন্ত তেমন শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে নাই। ইহার মধ্যে দেবতা পটভূমিকায় বিলীন হইয়াছেন, মানবিক লালসা উদ্দাম নৃত্য করিয়াছে। চট্টগ্রামের ধারাটিতে ভক্তিভাব কখনও একেবারে বিদূরিত হইয়া যায় নাই।

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী ব্যতীতও কালীমাহাত্ম্যসূচক আরও একটি কাহিনী লইয়া পরবর্তীকালে আর একটি কালিকা-মঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়।[১] ইহার রচয়িতার নাম রাঘব কবীন্দ্র। মঙ্গলকোটের অধিপতি বৎসমল্লের বিরুদ্ধে নাগরাজ যমঘন্টের যুদ্ধবৃত্তান্ত লইয়া ইহা রচিত। বৎসমল্ল শিবভক্ত, যমঘন্ট কালীভক্ত; শেষপর্যন্ত যমঘন্টের বিজয় বর্ণনা করিয়া কাহিনী সম্পূর্ণ হইয়াছে। কবির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

১। সা-প-প ৬৭, ৭২-৭৬

শীতলা-মঙ্গল

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিষ-চিকিৎসা প্রকরণে বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও রোগ প্রশমনকর্ত্রী বলিয়া শীতলাদেবীর উল্লেখ আছে। এই দেবীর পূজা শুধু বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ নহে, ভারতের বহু স্থানেই এই শ্রেণীর দেবতার পূজা প্রচলিত আছে।[১] সেকেন্দার লোদী (খ্রীঃ ১৪৮৮-১৫১৬) মথুরার মন্দিরসমূহ ধ্বংস করিয়া হিন্দুদিগকে শীতলা পূজা করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।[২] কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর এক অতি প্রাচীন শীতলা মন্দির আছে। বিহারের অন্তর্গত সাসারামের নিকটবর্তী এক গ্রামে একটি শীতলা মন্দির আছে। উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত মির্জাপুরের ধাঙ্গড়েরা শীতলা-ভবানী নামে বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী এক দেবীর পূজা করিয়া থাকে। অন্যান্য উপলক্ষ্যে তাহারা এই দেবীকে স্মরণ করিয়া থাকে। মধ্যভারতেও শীতলা পূজার প্রচলন আছে।[৩] পুণায় কন্যার বিবাহ উপলক্ষে জননী শীতলার পূজা করে—বোম্বাই প্রদেশে পুত্রলাভের উদ্দেশেও শীতলা দেবীর পূজা করা হয়। ময়ূরভঞ্জে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারেও কয়েকটি শীতলা-মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু উড়িষ্যার অন্যত্র বর্তমানে বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে ঠাকুরাণী নামে অভিহিত করা হয়—কোথাও তাঁহার শীতলা নাম প্রচলিত নাই।[৪] আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রায় সর্বত্র, বিশেষত ইহার পশ্চিমাংশে, বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম 'আই'।[৫] শব্দটি সংস্কৃত আর্যিকা বা আর্যা হইতে জাত। সেখানে তাঁহার শীতলা নাম অবিদিত। আইগণ সাত ভগিনী, ইহাদের নামে অসমীয়া ভাষায় বহু লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে। তাহাদিগকে 'আই নাম' বলে। কাহারও বসন্ত রোগ হইলে 'আই নাম' কীর্তন করা হয়, শীতলা বলিয়া কোনও দেবীর নাম তথায় অজ্ঞাত। মনে হয়, নামটি ঐ অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে নাই।

আয়ুর্বেদ গ্রন্থ 'ভাব-প্রকাশ'-এর মসূরিকা চিকিৎসায় (২য় খণ্ড, ৪র্থ ভাগ) যে স্থলে শীতলাদেবীর স্তব বর্ণনা করা আছে, তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্কন্দপুরাণান্তর্গত 'কাশীখণ্ড' হইতে শীতলা-স্তব গৃহীত হইয়াছে। মনে হয়, পরবর্তীকালে শীতলা দেবীর পৌরাণিক আভিজাত্য স্থাপন করিবার জন্য কয়েকটি শ্লোক কেহ রচনা করিয়া কাশীখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

যাহা হউক, শীতলা-পূজারীদিগের বিশ্বাস, এই দেবীর বর্তমান পূজাবিধান 'পিচ্ছিল-তন্ত্র' হইতে সংকলিত ও তাঁহার ধ্যান 'স্কন্দপুরাণ' হইতে গৃহীত। প্রকৃতপক্ষে ইনি লৌকিক দেবী, পরবর্তীকালে হিন্দু পৌরাণিকআভিজাত্য লাভের প্রয়াস পাইয়াছেন মাত্র। তথাকথিত

১। Asutosh Bhattacharyya, 'The Cult of the Goddess of Smallpox in West Bengal', *Quarterly Journal of the Mythic Society,* XLIII (1952), 55-69.

২। Elliot, *History of India,* Vol. IV., pp. 447-48.

৩। *MIA* V (1925), 254-60.

৪। *MIA* VII (1927), pp. 277-86

৫। *MIA* XXX (1950) p. 76.

'পিচ্ছিলা-তন্ত্রে' দেবীর ধ্যান এই প্রকার,—

শ্বেতাঙ্গীং রাসভস্থাং করযুগলবিলসম্মার্জনীপূর্ণকুম্ভম্।
মার্জন্যা পূর্ণকুম্ভাদমৃতময়জলং তাপশান্তৈঃ ক্ষিপন্তীম্।।
দিগ্‌বস্ত্রাং মূর্দ্ধিসূর্পাং কনকমণিগণৈর্ভূষিতাঙ্গীং ত্রিনেত্রাম্।
বিস্ফোটকাদুগ্রতাপ-প্রশমনকরী শীতলা তাং ভজামি।।

শীতলা-স্তবে পাওয়া যায় যে, শিব বলিতেছেন,—

নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
মার্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্।।
বিস্ফোটকবিশীর্ণানাম্ ত্বামকামৃতবর্ষিণীম্।।
গলগণ্ডগ্রহরোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাং।
ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলে যান্তি তে ক্ষয়ম্।।
মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভিহৃন্মধ্যসংস্থিতাম্।
যস্ত্বাং বিচিন্তয়েদ্দেবীং তস্য মৃত্যুর্নজায়তে।।
যস্ত্বামুদকমধ্যে তু কৃত্বা সাংপূজয়েন্নরঃ।
বিস্ফোটকং ভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে।।

'স্তবকবচমালা'তেও শীতলার এই স্তব উদ্ধৃত আছে। শীতলা প্রকৃতপক্ষে লৌকিক দেবী, অতএব বৈদিক সাহিত্যে ইহার অনুসন্ধান বৃথা। ইঁহাব পূজার আচার, মূর্তি-পরিকল্পনা সমস্তই উন্নত আর্য-সমাজের দেব-কল্পনার বিরোধী। বিশেষত বসন্ত রোগ গ্রীষ্মপ্রধান দেশেরই ব্যাধি, অতএব প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক থাকা সম্ভব নহে।[১] কেহ কেহ শীতলার মূর্তি ও পূর্বোদ্ধৃত ধ্যান-মন্ত্রের এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়া বৈদিক সাহিত্যের অপদেবীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক কল্পনা করিয়াছেন।[২] কিন্তু আর্যেতর সমাজ হইতে যে এই দেবীর উৎপত্তি হইয়াছে, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৌদ্ধ তন্ত্রে হারীতী নামে এক দেবী আছে। বৌদ্ধ তন্ত্র-সাহিত্য ও পুরাণে তিনি যাক্ষিণী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন,[৩] তিনি কুবেরের পত্নী। কিন্তু হারীতী যক্ষিণী হইলেও কালক্রমে দেবীর মতই তিনি বৌদ্ধ সমাজে পূজা পাইতে থাকেন। কারণ পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নেপালে বুদ্ধ বা ধর্মঠাকুরের মন্দিরের পার্শ্বেই হারীতীর মন্দির অবস্থিত দেখিতে পাওয়া

১। বিশ্বকোষকাব স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বৈদিক তক্মন্ ও শীতলা অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন (১৮, ৪২), কিন্তু শীতলা অনার্য সমাজ হইতে উদ্ভুতা, ইঁহার সহিত বৈদিক সাহিত্যের কোন সম্পর্ক নাই।

২। 'শীতলা পূজা প্রকৃত কি?' (ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর), সমীরণ, ১৩০২ সাল, ১ম, ২য় খণ্ড। স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্তৃক সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ১৩০৫, প. ২০৯, উদ্ধৃত।

৩। অত্রজা লোকাঃ শৈবাপি বৌদ্ধশৈবকাঃ। হারীত্যামপি যক্ষিণ্যাং সদা মদা প্রপূজিতম্। — স্বয়ম্ভুপুবাণ, এসিয়াটিক সোসাইটি সং, পৃ ৪২৮।

যায়। অবশ্য কোনও বৌদ্ধ মন্দির কিংবা বৌদ্ধ মঠের অভ্যন্তরে তাঁহার স্থান হয় নাই। তান্ত্রিক মতে এই দেবীর পূজা করিতে হয়,—

যে চ যা বা মনুষ্যাশ্চ পঞ্চোপচারকৈরপি।
মদ্যধারাদিভিঃ পূজ্যৈর্মাংসৈর্বলিভির্মীনকৈঃ।।

—বৃহৎ স্বয়ম্ভুপুরাণ (বঙ্গবাসী), পৃঃ ৪২৮

বৌদ্ধ সমাজের হারীতী হইতেই পরবর্তী বাংলার সমাজে লৌকিক দেবতা শীতলার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।[১] এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্বে বৌদ্ধ সমাজে পূজিতা হারীতী দেবীর প্রকৃতি সম্বন্ধে একটু পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন।

বৌদ্ধ সাহিত্যে হারীতী শব্দের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই — যিনি হরণ করেন, তিনি হারীতী। এই হরণ-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে চীনা বৌদ্ধদিগের মধ্যে একটি গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি ভারতীয় বৌদ্ধ সাহিত্য হইতেই চীন দেশে গিয়াছে, কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে আর তাহার অস্তিত্বের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। চীন দেশে প্রচলিত গল্পটি এইরূপ, —রাজগৃহে এক যক্ষিণী বাস করিত। এই যক্ষিণী সমগ্র মগধের রক্ষয়িত্রীরূপে কল্পিতা হইত। কালক্রমে এই যক্ষিণী নগরের শিশুদিগকে অপহরণ করিয়া ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে। নগরবাসিগণ এইজন্য তাহার নাম দেয়, হারীতী বা হরণকারিণী। বুদ্ধের নিকটে এই বিষয়ে তাহারা অভিযোগ করে। অতঃপর বুদ্ধের কৌশলে হারীতী তাহার জাতাপহরণবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শান্ত জীবন-যাপন করিতে আরম্ভ করে। বুদ্ধও তাহাকে বৌদ্ধ মঠ ও মন্দিরের রক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্ত করেন।[২]

উদ্ধৃত কাহিনীর মধ্যে শীতলার যে বিশেষ গুণ অর্থাৎ তিনি যে বসন্ত রোগ নিবারণকারিণী, তাহার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে সংক্রামক কোনও রোগদ্বারা ব্যাপক শিশুমৃত্যুর কারণ, তাহার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু এই সংক্রামক ব্যাধি যে বসন্ত, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। পরবর্তী বৌদ্ধ সাহিত্যে হারীতী সন্তানদাত্রী ও শিশুর রক্ষয়িত্রী রূপে কল্পিত হইয়াছেন। পুরাণের ষষ্ঠীদেবীর সহিত তখন তাঁহার আর কোনও পার্থক্য নাই। অতএব বৌদ্ধসমাজের এই মঠ-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী সন্তানদাত্রী ও তাহার রক্ষয়িত্রী হারীতীর সহিত বাংলার লৌকিক দেবতা বসন্ত-রোগনাশিনী শীতলার কোন সঙ্গত সম্পর্ক কল্পনা করা যাইতে পারে না। বৌদ্ধ সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়, একমাত্র শিশুর সহিতই হারীতীর সম্পর্ক, কিন্তু বসন্তরোগ বালবৃদ্ধ-নির্বিশেষে সমান ভয়াবহ। অথচ শীতলার শিশুর সহিত যে বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে, তাহা নহে—সমাজের সকল বয়সের লোকের

১। 'It is difficult to ascertain whether Hindus have taken Sitala from the Buddhistic Hariti or the Buddhists from the Hindu Sitala. I am inclined to think that the Hindus are the borrowers.' (Mm. H.P. Sastri, *Discovery of Living Buddhism in Bengal*, p. 20.)

২। T. Walters, *On Yuan Chwang's Travels in India*, 629-645 A.D. (London. 1904,

সহিতই তাঁহার সম্পর্ক সমান। সেইজন্য মনে হয়, পৌরাণিক ষষ্ঠীদেবী কিংবা পৌরাণিক জাতাপহারিণীর সহিত হারীতীর সম্পর্ক, শীতলার সহিত তাঁহার কোনও সম্পর্ক নাই।

বৌদ্ধ ভাস্কর্যে হারীতীর সকল মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা লক্ষ করিলেও আধুনিক শীতলার ধ্যানোক্ত বর্ণনা কিংবা তাঁহার যে সকল মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের সহিত হারীতীর সুদূর পার্থক্য সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, হারীতী যক্ষিণী ও যক্ষপতি কুবেরের পত্নী। সেইজন্য কুবেরের মূর্তির পার্শ্বে আসীনা হারীতীর মূর্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১] এতদ্ব্যতীত শিশুপরিবৃতা তাঁহার স্বতন্ত্র দণ্ডায়মানা মূর্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্তিগুলির গঠন-ভঙ্গি অনুপম এবং উন্নত শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক। তাঁহার দুই স্কন্ধারূঢ় দুই শিশু, অঙ্কে স্তন্যপানরত এক শিশু, পাদনিম্নে ক্রীড়ারত আরও দুই-একটি শিশু দেখিতে পাওয়া যায়। মুখে প্রসন্ন হাস্য। দেবীর সর্বাঙ্গে অলঙ্কারসম্ভার ও পরিধানে বিচিত্র বসন। ইহার সহিত রাসভস্থা দিগ্বস্ত্রা সূর্পমূর্ধা সম্মার্জনীহস্তা শীতলাদেবীর কি ভাবে সম্পর্ক কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। অতএব মনে হয়, বৌদ্ধ হারীতী হইতেই পরবর্তী হিন্দু পুরাণে জাতাপহারিণীর পরিকল্পনা হইয়া থাকিলেও লৌকিক শীতলার সঙ্গে তাঁহার কোনও সম্পর্ক নাই।

নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর শীতলা-মঙ্গলে (পরে দ্রষ্টব্য) শীতলার উৎপত্তি সম্বন্ধে এই অর্বাচীন পৌরাণিক কাহিনীটি বর্ণিত হইয়াছে,—

করিল পুত্রেষ্টি যজ্ঞ নহুষ রাজন।
কত মুনি ঋষি আইল কে করে গণন।।
নির্বিঘ্নে করিয়া যজ্ঞ দিলেক আহুতি।
হইলেক পূর্ণ যজ্ঞ শান্ত হৈল মতি।।
যজ্ঞপূর্ণে নিভাইল যজ্ঞের অনল।
তাহে জনমিল এক কন্যা সমুজ্জ্বল।।
মস্তকে ধরিয়া কুলা বাহির হইলা।
দেখি প্রজাপতি তারে যত্নে সুধাইলা।।
কে তুমি সুন্দরী কন্যা কাহার গৃহিণী।
কি হেতু অগ্নিতে ছিলা কহ সে কাহিনী।।
দেবী কন অগ্নিকুণ্ডে মম জন্ম হইল।
কোথা যাই কি করিব পরাণ বিকল।।
শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলা বচন।
যজ্ঞ শীতলের কালে তোমার জনম।।
সেহেতু শীতলা নাম তোমার হইল।

১। V. A. Smith, 114-15

মম বাক্যে যাহ তুমি শীঘ্র ভূমণ্ডল।।

শীতলা নামটি পৌরাণিক প্রভাব-জাত বলিয়া মনে হয়। বসন্ত রোগের দারুণ প্রদাহ-গুণ হইতেই ইহার উপশমকারিণী দেবীর নাম বিপরীতোক্তি (euphemistic tendency)তে শীতলা হইয়াছে। ধ্যানেও তাঁহাকে 'বিস্ফোটকাদুগ্রতাপ প্রশমনকারী' বলা হইয়াছে। কিন্তু শীতলা শব্দটি অর্বাচীন সংস্কৃত। দাক্ষিণাত্যেও শীতলম্মা বলিয়া এক গ্রাম্য দেবী আছেন।[১] কিন্তু তিনি জলের দেবতা (water-goddess)। অবশ্য দাক্ষিণাত্যের গ্রাম্য জলদেবতাগণই বসন্তরোগনাশিনী দেবী বলিয়া কোনও কোনও স্থানে কল্পিত হইয়া থাকেন। মস্‌লিপট্টম্‌ জিলায় জলদেবী গঙ্গম্মা বসন্ত রোগেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া কল্পিত হন। পূর্বোদ্ধৃত শীতলাস্তবেও বলা হইয়াছে যে, জলমধ্যেই শীতলার পূজা হয়, যথা, —'যস্তামুদকমধ্যে তু কৃতা সংপূজয়েন্নরঃ'। কাশীতে যে শীতলা মন্দির আছে, তাহা এক প্রকার জলের উপরই অবস্থিত — প্রতি বৎসর বর্ষায় এই মন্দির নদীজলে নিমজ্জিত হয়। ইহার সম্পর্কে এই প্রকার জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, গঙ্গাদেবী প্রতি বর্ষায় তিনবার শীতলাদেবীকে তাঁহার জলে নিমজ্জিত করিয়া থাকেন। তাহাতেই ইহার পবিত্রতা রক্ষা পায়। দাক্ষিণাত্যের শীতলম্মা নামক জল-দেবতার বৈশিষ্ট্য বাংলার শীতলার মধ্যেও বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। শীতলম্মা নামক জল-দেবতাও যে বসন্ত রোগেরই দেবী এই বিষয়ে কোন ভুল নাই। দাক্ষিণাত্যের এই লৌকিক দেবী শীতলম্মা ও বাংলার লৌকিক দেবী শীতলা অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। পূর্বেই দেখা গিয়াছে, দাক্ষিণাত্যের কোনও কোনও উপদেবতা বাংলার লৌকিক দেবতাতে পরিণত হইয়াছেন। শীতলম্মাও তাঁহাদের অন্যতম। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর বিভিন্ন নামও পাওয়া যায়; যেমন, —মহীশূর জেলায় হাম ও বসন্তের দেবীর নাম সুখজম্মা, আরকট জেলায় তাঁহার নাম কন্নিয়ম্মা, ইনি দাক্ষিণাত্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রাম্য দেবতা মরী"ম্মারই রূপান্তর মাত্র, কোথাও তাঁহার নাম মরম্মা বা মরম্মা-হেথনা। আদি মানবের সাধারণ রোগভীতি হইতে এই সকল দেবতার পরিকল্পনা করা হইলেও, ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সম্পর্কও ছিল। বাংলার শীতলা ও দাক্ষিণাত্যের শীতলম্মা একই সূত্র হইতে উদ্ভূত। হারীতীও স্বতন্ত্র কোনও সমাজকে আশ্রয় করিয়া বৌদ্ধ তন্ত্রসাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন; অতএব হারীতী হইতে শীতলার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। পরবর্তীকালে ইঁহাদের উপর সামান্য পৌরাণিক প্রভাব স্থাপিত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাও অত্যন্ত নগণ্য।

দাক্ষিণাত্যের যে সমস্ত বসন্তরোগনাশিনী লৌকিক দেবতার উল্লেখ করিলাম, তাঁহাদের কাহারও কোনও নির্দিষ্ট মূর্তি নাই, স্বাভাবিক প্রস্তরখণ্ডেই তাঁহাদের পূজা হইয়া থাকে। পূজারীগণ সেই প্রস্তরখণ্ডে সিন্দুর লিপ্ত করিয়া দেন। বাংলার শীতলারও পূর্বে কোনও মূর্তি ছিল না, স্বাভাবিক প্রস্তরখণ্ডে তাঁহার পূজা হইত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতার যে ধর্মমন্দিরের

১। Whitehead, 23

কথা উল্লেখ করিয়াছেন,[১] তাহার অভ্যন্তরস্থ ধর্মমূর্তির আসনের নিচে যে শীতলার মূর্তি ছিল; তাহার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, ('Below there is a stone with eruptions representing small-pox. This is Shitala.') স্বর্গত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ও লিখিয়াছেন, 'শীতলা-পাণ্ডিতদিগের শীতলা করচরণহীন, সিন্দুরলিপ্তাঙ্গী, শঙ্খ বা ধাতুখচিত ব্রণ-চিহ্নাঙ্কিতা মুখমণ্ডলমাত্রাবশিষ্টা প্রতিমা মাত্র।[২] এই ক্ষুদ্র ব্রণ-চিহ্নাঙ্কিত শিলাখণ্ডই শীতলার প্রাচীনতম রূপ। ইহাও ধর্মশিলার উপাসনার মত আদি মানবের প্রস্তরোপাসনার প্রবৃত্তি হইতে জাত, দাক্ষিণাত্যেও সেইজন্য অনুরূপ গঠন শিলাখণ্ডেই সমস্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা হইয়া থাকে। তাহা হইলে পূর্বোদ্ধৃত শীতলার ধ্যানমন্ত্রে তাঁহার যে নির্দিষ্ট গঠন একটি মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা যে বহু পরবর্তী বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক প্রভাবজাত, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ময়ূরভঞ্জ হইতে অনেকটা এই ধ্যানের অনুরূপ একটি শীতলা-মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৩] এই মূর্তি যে অত্যন্ত আধুনিক সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ধর্মের পূজারীগণ যেমন ধর্মপণ্ডিত, শীতলার পূজারীগণও তেমনই শীতলাপণ্ডিত নামে পরিচিত। গ্রহ-বিপ্রেরাই বসন্ত রোগের চিকিৎসা ও শীতলা পূজা করিয়া থাকেন। শীতলার আর্যের জাতির সঙ্গে সম্বন্ধের ইহাও প্রমাণ।

শীতলা-মঙ্গলের কাহিনী

শীতলা-মঙ্গলের বিশিষ্ট কোনও কাহিনী পাওয়া যায় না। ইহার বিভিন্ন পালায় বিভিন্ন কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (১৩০৫ সাল, ১ম সংখ্যা) একখানি শীতলা-মঙ্গলকাব্যের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, ইহার চরিটি পালা চারিটি স্বতন্ত্র কাহিনী। স্বতন্ত্র পালাগুলি আবার স্বতন্ত্র কবির ভণিতা-যুক্ত। মনে হয়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শীতলা-পূজারী শীতলা-মাহাত্ম্য-সূচক বিভিন্ন কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাহা আসিয়া একত্র সংযুক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'গোকুল পালা' নিত্যানন্দ চক্রবর্তী নামক কবির রচিত। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ-বলরামের শরীরে বসন্ত দেখা দেয়, তাঁহারা শীতলা পূজা করিয়া পরে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ইহার আর একটি পালার নাম 'বিরাট পালা'। ইহাতে বিরাট রাজ্যে ব্যাপক বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ও শীতলা পূজায় এই রোগের উপশমের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহার আর একটি পালার নাম 'চন্দ্রকেতুর পালা', ইহাতেও চন্দ্রকেতুর রাজ্যে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ও শীতলা পূজায় তাহার শান্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে আর একটি লৌকিক পালা আছে, তাহার নাম 'রঘুনাথ দত্তের পালা'। শেষোক্ত পালা দুইটির রচয়িতা কবিবল্লভ। পূর্বোল্লিখিত বিরাট পালা আবার আরও কয়েকটি খণ্ডপালার বিভক্ত, 'জাগরণ পালা', 'হেমঘট তোলা পালা' ও 'নিমাই জগাতির পালা'। নিম্নে চন্দ্রকেতুর পালাটির সংক্ষেপে

১। H. P. Sastri, 22.

২। সা-পৃপ ৫, ৩০-৩১

৩। N. N. Vasu, XCVI

বর্ণনা করিয়া ইহার কাহিনীগত বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করা যাইতেছে।

শীতলাদেবী মর্ত্যে পূজা প্রচার করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি তাঁহার অনুচর জ্বরাসুরকে বলিলেন, —

সকল দেবেতে আছে মোর অধিকার।
মনুষ্য গৃহেতে পূজা না হয় আমার।।

জ্বরাসুরের পরামর্শে শীতলা চৌষট্টি বসন্তকে ডাকাইলেন। সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, জ্বরাসুর আগে গিয়া মনুষ্যদেহে জ্বররূপে প্রবেশ করিবে, অতঃপর মাতা শীতলা তাহার অনুসরণ করিবেন। এই পরামর্শ মত সকলে চন্দ্রকেতুর রাজ্যে চলিলেন।

শীতলা অপূর্ব বেশ ধারণ করিলেন। সমস্ত আভরণ ত্যাগ করিয়া এলোচুলে চৌষট্টি বসন্তের ঝুড়ি কক্ষে লইয়া হস্তে লড়ি ধারণপূর্বক লোলচর্মা বৃদ্ধার বেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শীতলা চন্দ্রকেতুর রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। প্রথমেই তিনি নগরের কুলরমণীদিগকে দেখিলেন। তাহারা ছদ্মবেশিনী দেবীকে দেখিয়া মুখ ফিরাইল। তিনি ইহাতে মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন; মনে করিলেন, ইহার প্রতিশোধ লইবেন। অতঃপর তিনি পথে নগরের বালক-বালিকাদিগকে দেখিলেন। 'কিন্তু নাহি দেখি কার মুখে বসন্তের চিন।' তখন 'ছাওয়ালে দেখিয়া দয়া জন্মিল অন্তরে।' দয়া অর্থে রোগের আক্রমণ। প্রথমেই নগরের বালকগণ বসন্ত রোগের কবলগ্রস্ত হইল।

শীতলা এইবার রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার বাড়ি শান্তিপুরে। সাতটি পুত্র তাঁহার বসন্ত রোগে মরিয়াছে। স্বামী শৈব, শীতলার পূজা করিতে স্বীকার করেন না, সেইজন্য তাঁহার পরিবারে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। শীতলা রাজাকে বলিলেন, তোমার রাজ্যেও বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে দেখিতেছি, তুমি অচিরে শীতলার পূজা না করিলে রাজ্য ছারখারে যাইবে। বিশেষত তোমারও একশত পুত্র আছে। অতএব এই পুত্রদিগের কল্যাণের জন্য তোমার শীতলা পূজা করা কর্তব্য।'

নৃপতি বলেন বুড়ী হয়্যাছ অজ্ঞান।
কেমনে ছাড়িব আমি প্রভু ত্রিনয়ান।।

শীতলা শিবের নিন্দা করিলেন। শুনিয়া রাজা কানে হাত দিলেন, আরাধ্য দেবতার নিন্দা নিজ কর্ণে শ্রবণ করিলেন না। তিনি বলিলেন,—

কেবা কার পুত্র বধূ কেবা কার পিতা।
মরিলে সম্বন্ধ নাই শুন এই কথা।।

অতএব পুত্রের কল্যাণের জন্য তিনি শীতলা পূজা করিয়া নিজের দেবতার অবমাননা করিবেন না,—

জন্মেও না ছাড়িব মহেশ ঠাকুর।
শুনরে অজ্ঞান বুড়ী এথা হৈতে দুর।।

শুনিয়া শীতলা ক্রোধে অন্ধ হইলেন। তাঁহার রাজ্য ছারখার করিতে জ্বরাসুরকে আদেশ দিলেন। রাজপুত্রগণ একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে রাণী রাজার নিকট কাঁদিয়া বলিলেন, 'এখনও শীতলার পূজা করিয়া রাজ্যের অশান্তি দূর কর।' কিন্তু শীতলার কার্যে রাজার আক্রোশ আরও বাড়িয়া গেল, তিনি বলিলেন,—

রাজা বলে শীতলা করেছে যদি বাদ।
কদাচিৎ আমি তার না লব প্রসাদ।।

রাজা দিবারাত্র শিবের পূজা করিতে লাগিলেন। ভক্তের বিপদে শিব তাঁহার একজন অনুচর ভীমকে তাঁহার রক্ষার্থে পাঠাইলেন। শিবও যুদ্ধে সাজিয়া আসিলেন, কিন্তু শীতলার হস্তে পরাজিত হইয়া পলাইয়া গেলেন। রাজার উনসত্তরটি পুত্র বসন্তরোগে মরিল, তিনি কনিষ্ঠ পুত্রটিকে সূর্যের সাহায্যে পদ্মবনে লুকাইয়া রাখিলেন। শীতলা তাহার সন্ধান করিতে লাগিলেন, রাজপুত্র পদ্মের নাল বাহিয়া একেবারে পাতালে গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু পাতালের রাজা বাসুকি সর্পকুলকে শীতলার ক্রোধ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাজপুত্রকে লইয়া এক পর্বতগহ্বরে লুকাইয়া রাখিলেন। সেখানেই বসন্তরোগের আক্রমণে রাজপুত্র প্রাণত্যাগ করিল। রাজকুমারের পত্নী চন্দ্রকলা পিতৃগৃহে থাকিয়া এই দুঃস্বপ্ন দেখিলেন। শীতলা চন্দ্রকলাকে তাঁহার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ দিয়া আসিলেন। চন্দ্রকলা স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। শীতলা জরতী বেশে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন,—

ব্রাহ্মণী দেখিয়া দণ্ডবত হৈল সতী।
ঈশ্বরী বলেন হও জনম এয়তি।।

চন্দ্রকলা বলিলেন, তিনি স্বামীর সহমৃতা হইতেছেন, এই অবস্থায় তাঁহার এই আশীর্বাদ কিভাবে সফল হইতে পারে? শীতলা বলিলেন, তাঁহার কথা মিথ্যা হইবার নহে। তিনি 'মৃতসঞ্চারিণী মন্ত্রে' রাজকুমারের প্রাণদান করিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি চন্দ্রকলাকেও মৃতসঞ্চারিণী মন্ত্র শিক্ষা দিলেন; চন্দ্রকলা স্বামীকে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল এবং উনসত্তর ভাসুরকে জীবিত করিবে এইরূপ আশ্বাস দিয়া রাজাকে শীতলা পূজা করিতে বলিল, কিন্তু রাজা স্বীকৃত হইলেন না; বলিলেন,—

পুনর্বার পুত্র বধূ মরুক দুজন।
জন্মে নাহি ছাড়িব প্রভু ত্রিলোচন।।

কিন্তু এইবার প্রভু শিব নিজেই আসিয়া চন্দ্রকেতুকে শীতলার পূজা করিতে বলিলেন। নিজের আরাধ্য দেবতার আদেশ শিরোধার্য করিয়া নৃপতি অবশেষে বাধ্য হইয়া শীতলার পূজা করিলেন। রাজ্যে যে সকল প্রজা বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই

বাঁচিয়া উঠিল।

এই কাহিনীর রচনা যে আধুনিক, ইহার বিষয়বস্তু ও রচনাপ্রণালী একটু লক্ষ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই কাহিনীভাগে কোনই মৌলিকতা নাই। মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর উপরই ইহার ভিত্তি মূলত প্রতিষ্ঠিত, মৌলিক অংশও কাব্যগুণ-বিবর্জিত। এই কাহিনী রচনায় মঙ্গলকাব্য রচনার একটা ধারাবাহিক ও পর্যুষিত প্রথারই অনুকরণ করা হইয়াছে মাত্র। অতএব প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি রচনার বহু পরে ইহাদেরই আদর্শে যে এই কাহিনী রচিত হইয়াছে, এই বিষয় নিশ্চিত। গোকুল পালা ও বিরাট পালা হইতেও জানা যায় যে, বৈষ্ণবধর্ম সাধারণ সমাজে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরই এই সকল কাহিনী রচিত হয়। কারণ, ইহাতে মঙ্গলকাব্যের নায়ক কোনও কল্পিত শাপভ্রষ্ট দেব-সন্তান নহে, একেবারে স্বয়ং কৃষ্ণ-বলরাম। কৃষ্ণ-বলরামকে নায়ক করিয়া মঙ্গলকাব্য রচনার প্রয়াসও এই প্রথম। অর্থাৎ চাঁদ সদাগর, ধনপতি, লাউসেনের মত নির্দিষ্ট কোনও নায়কের অভাবে এই শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যগুলি প্রকৃত কাহাকে যে নায়ক করিয়া কাব্যরচনা করিবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না; সেইজন্য শীতলা-মঙ্গল কাব্যে নির্দিষ্ট কোনও কাহিনী নাই, ঘটনাগুলিও সুগ্রথিত নহে, সর্বোপরি কোনও প্রথম শ্রেণীর কবিও এই বিষয় লইয়া কাব্যরচনা করেন নাই। সেইজন্য ইহাদিগকে দ্বিতীয় স্তরের মঙ্গলকাব্য বলা যাইতে পারে।

শীতলা-মঙ্গলের কবিগণ

নিত্যানন্দ চক্রবর্তী

শীতলা-মঙ্গলের কাহিনীর আদি রচয়িতা কে তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। বটতলায় মুদ্রিত নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর 'বিরাট পালা'য় গ্রন্থ-প্রকাশক ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত মহাশয় 'প্রকাশকের উক্তি' নামে কয়েকটি পদ রচনা করিয়া তাহাতে বলিয়া গিয়াছিলেন,

শীতলার জাগরণ পালা বঙ্গভাষায়।
নাহি ছিল কোন দেশে সুশৃঙ্খলায়।।
অনেকের ইচ্ছা দেখে মনেতে ভাবিয়া।
উড়িষ্যা হইতে পুঁথি আনি মাঙ্গাইয়া।।
উড়িষ্যায় লিখেছিল দ্বিজ নিত্যানন্দ।
নানাবিধ কবিতায় করিয়া সুছন্দ।।
দেখিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে ব্যয় করি অর্থ।
বাঙ্গালা ভাষায় দিলাম করিবারে অর্ঘ্য।
শিবনারায়ণ সিংহ উড়িষ্যায় নিপুণ।
গীতছন্দে এই পুঁথি করিল বচন।।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, উড়িষ্যায় সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম ঠাকুরাণী, শীতলা নহে। বাংলাদেশের শীতলা-মঙ্গলের অনুরূপ কোনও কাহিনীও সেখানে প্রচলিত নাই। সুতরাং নিত্যানন্দ সেখান হইতে কাহিনীটি বাংলাদেশে আনিয়াছে, এমন কথা বলিতে পারা যায় না।

উদ্ধৃত অংশে যে দ্বিজ নিত্যানন্দের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি ওড়িয়া নহেন, বাঙালী কবি; বাংলা ভাষাতেই তাঁহার শীতলা-মঙ্গল পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে পরে আলোচিত হইয়াছে। তথাপি এই নিত্যানন্দই এই শ্রেণীর কাব্যের আদি কবি বলিয়া একটা লোকপ্রবাদ প্রচলিত ছিল, উদ্ধৃত কাহিনী তাহা অবলম্বন করিয়াই রচিত।[১] 'গোকুল পালা'য় নিত্যানন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন,

সৌতিসম সর্বশাস্ত্র, শ্রীযুত ভবানী মিশ্র, তস্য সুত মিশ্র মনোহর।
তার পুত্র চিরঞ্জীব, কি গুণে তুলনা দিব, যার সখা প্রভু দামোদর।।
মহামিশ্র তস্যাত্মজ, শ্রীরাধাচরণাম্বুজ, শ্রীচৈতন্য তাহার নন্দন।
তাহার মধ্যম ভ্রাত, নিত্যানন্দ নামযুত , গাহে ভেবে শীতলা চরণ।।

অন্যত্র তিনি তাঁহার বাসস্থানের নামও উল্লেখ করিয়াছেন, 'কাঁটাদের ডিণ্ডিসাঞি গোত্র ভরদ্বাজ।' তিনি নিজেকে চক্রবর্তী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, 'বিরচিল চক্রবর্তী কবি নিত্যানন্দ।'

১। সা-প-প ৫, ৩২-৭০

ডিগুিসাহীগ্রামী কাঁটাদিয়াবাসী কবির পূর্বপুরুষ বল্লালের আমল হইতে কৌলীন্যহীন হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তাহারা সিদ্ধ শ্রোত্রিয় নামে পরিচিত হন। কাঁটাদিয়া গ্রামে বল্লালী কুলীন বংশ অদ্যাপি কাঁটাদিয়া বাঁড়ুয্যা বলিয়া পরিচিত। কবিবংশের সহিত তাঁহাদের কোনও সংস্রব নাই। নিত্যানন্দ মেদিনীপুরের অন্তঃপাতী কাশীযোড়ার রাজা রাজনারায়ণের সভাসদ ছিলেন; তিনি তাঁহার কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন,—

কাশীজোড়া সৃষ্টিপাড়া অতি বিচক্ষণ।
রামতুল্য রাজা তথা রাজনারায়ণ।।
নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ তাহার সভাসদ্।
শীতলা মঙ্গল রচে পান সুধামত্।।

রাজা রাজনারায়ণের সময় জানা যায় না। তবে মেদিনীপুর অঞ্চলের একজন শক্তিশালী এবং 'গ্রন্থরসিক' জমিদার রাজনারায়ণের পরিচয় পাওয়া যায়; তাঁহার সভায় বহু সংস্কৃত গ্রন্থ অনুদিত হইয়াছিল।[১] মনে হয়, নিত্যানন্দের পৃষ্ঠপোষক রাজনারায়ণ এবং এই রাজনারায়ণ অভিন্ন। রাজনারায়ণের সভায় ১৬৯৯ শকাব্দ বা ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'-এর অন্তর্গত 'গণেশ খণ্ড' এবং ১৭০৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 'বৃহন্নারদীয় পুরাণ' অনুলিখিত হইয়াছিল। নিত্যানন্দ চক্রবর্তী এই সময়েই বর্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। নিত্যানন্দের ভাষা সুমার্জিত এবং একটু আধুনিকতার পরিচায়ক। ভাষা দেখিয়া তাঁহাকে অন্তত সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বেকার লোক বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। বরং তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বর্তমান ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার রচনা সরল, কোথাও পাণ্ডিত্যে ভারাক্রান্ত নহে; একটু নিদর্শন দেখাইতেছি। কিভাবে পৃথিবীতে নিজের পূজা প্রচার হইতে পারে, দেবী জ্বরাসুরকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে জ্বরাসুর বলিল,

নাশিতে ক্ষিতির ভার দৈত্যের নিধনে।
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ নন্দের ভবনে।।
বাল্য বেশে ব্রজপুরে বিহরে গোপাল।
শ্রীদামের অংশ কলা দ্বাদশ রাখাল।।
ষোড়শ সহস্র গোপী স্বয়ং আদ্যা রাধা।
কলাবতী কেবল কৃষ্ণ অঙ্গ আধা।।
দেবতা তেত্রিশ কোটি ত্যজি স্বর্গশালা।
ত্রিসন্ধ্যা গোকুলে আসি দেখে কৃষ্ণলীলা।।
ত্রিস্বর্গপ্রিয়া গঙ্গা কাশী বারাণস।
এসব এখন নয় গোকুল সদৃশ।।
এমন গোকুলে মাতা পূজা নেয় যদি।
ত্রিভুবনে যশ হয় জব্দ হয় ক্ষিতি।।

১। সা-প-প, ৫৮, ১৭-১৮

গোকুলে শীতলা পূজা প্রতিষ্ঠিত হইলে সমস্ত পৃথিবী জব্দ হইবে এবং ত্রিভুবনবাসী তাঁহাকে পূজা করিতে বাধ্য হইবে। যাহা হউক, উদ্ধৃত অংশের ভাষা হইতে কবিকে কিছুতেই প্রাচীন বলিয়া মনে হইতে পারে না।

বল্লভ

বল্লভের শীতলা-মঙ্গলের[১] কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় অনুমান করিয়াছেন ইহা ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তীকালে রচিত। সম্ভবত কবি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। কাব্য-মধ্যে তাঁহার রচনা-কাল সম্বন্ধে তিনি কিছুই উল্লেখ করিয়া যান নাই। একমাত্র ভাষার বিচার হইতে তাঁহার কাল-সম্বন্ধে অনুমান করা যায়। তিনি এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন,—

পিতামহ পুরুষোত্তম, জগতে ঈশ্বর নাম,
শ্রীচৈতন্য তাহার কুমারে।
তস্য সুত শ্রীশ্যাম, সকল গুণের ধাম,
কতকাল হস্তিনা নগরে।।
তস্য সুত শ্রীগোপাল মান্দারণে কতকাল
নিবাস করিল বৈদ্যপুরে।
শ্রীবল্লভ তাহার সুত, গোবিন্দ পদেতে রত
হরি বল পাপ গেল দূরে।।

শ্রীবল্লভ কবির নাম, উপাধি নহে; তিনি কাব্যমধ্যে বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন, 'শ্রীকবি-বল্লভ গায় মধুর সঙ্গীত', 'শ্রীকবি-বল্লভ রস গায়' ইত্যাদি। কবি কোন্ সম্প্রদায়-ভুক্ত লোক ছিলেন, তাহা জানা যায় না; তবে তিনি বৈষ্ণব ছিলেন না, তাহা তাঁহার এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়; তিনি লিখিয়াছেন,—

শ্রীকবি বল্লভে গায় সেবিয়া ঈশ্বর।
পাষণ্ড বৈষ্ণবার মুণ্ডে পড়ুক বজ্জর।।

কবি সম্ভবত বসন্ত-চিকিৎসক গ্রহবিপ্র ছিলেন। কারণ, তিনি তাঁহার কাব্যে চৌষট্টি প্রকার বসন্ত রোগের যে জ্বলন্ত বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা তাঁহার এই রোগ-সম্পর্কে সাক্ষাৎ জ্ঞান না থাকিলে কিছুতেই সম্ভব হইত না। 'কাঁটাল্যা', 'মসূরিয়া', 'শিখর্যা', 'উনানিএগা', 'বেউচিয়া', 'চামদল', 'মগর্যা', 'গজশুঁড়া', 'আলকুশ্যা', 'আম্রবোয়া' ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের বসন্ত রোগ ও তাহার চিকিৎসার বর্ণনা ইহাতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাকে বসন্ত-চিকিৎসক শীতলা-পণ্ডিত গ্রহবিপ্র বলিয়াই মনে হয়।

১। সা-প-প ৫, ৩২-৫১

নিত্যানন্দের ভাষার মত শ্রীবল্লভের ভাষা এত মার্জিত নহে, ইহা অনেকাংশে গ্রাম্যতা-দোষদুষ্ট। অবশ্য ইহা হইতেই শ্রীবল্লভকে প্রাচীনতর কবি বলিয়া নির্দেশ করিবার উপায় নাই। কারণ, নিত্যানন্দ উচ্চবর্ণের শিক্ষিত কবি ছিলেন, তাঁহার ভাষা সেইজন্য স্বভাবতই মার্জিত ছিল। কিন্তু বল্লভ তাঁহার শিক্ষা ও সংস্কার-অনুযায়ী যে ভাষায় তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা মার্জিত ও সুপরিচ্ছন্ন হইতে পারে নাই। অবশ্য শ্রীবল্লভ নিত্যানন্দের পূর্ববর্তী কবিও হইতে পারেন, এবং এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিবার বিশেষ কিছু অবলম্বনও নাই। তবে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, নিত্যানন্দ সর্বপ্রথম ওড়িয়া ভাষায় তাঁহার শীতলা-মঙ্গল কাব্য রচনা করেন, তাহাই এই বিষয়ের আদি রচনা। সেইজন্য নিত্যানন্দকেই প্রাচীনতর কবি বলিয়া মনে হয়।

বল্লভের মধ্যে কবিত্ব ছিল। তাঁহার নিম্নলিখিত পদগুলি প্রায় প্রবচনের মত শোনায়,

সুখের হাটে দাগা বিধি দিল এত দিনে।
কেবা কার পুত্র বধূ কেবা কার পিতা।
মরিলে সম্বন্ধ নাই শুন এই কথা।। ইত্যাদি

মাণিকরাম গাঙ্গুলী

ধর্মমঙ্গলকার মাণিকরাম গাঙ্গুলী রচিত 'শীতলা-মঙ্গল' কাব্যখানি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।[১] আগেই বলিয়াছি অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত শীতলা-মঙ্গলের কোনও নির্দিষ্ট কাহিনী পাওয়া যায় না। ইহার বিভিন্ন পালায় বিভিন্ন কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মাণিকরামও একটি স্বতন্ত্র পালায় অতি সংক্ষেপে শীতলা-মাহাত্ম্যমূলক কাব্যটি সমাপ্ত করিয়াছেন। কাব্যের কাহিনীটি এইরূপ—

শীতলাদেবী মুনিপুরে নিজের পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে জানকীতনয় লব-কুশকে বসন্তরোগে আক্রান্ত করিতে মনস্থ করিলেন। জনমদুঃখিনী সীতার কথা ভাবিয়া প্রথমে জ্বরাসুর এই প্রস্তাবে আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু শীতলাদেবী তাঁহার সংকল্পে অটল। তাঁহার আদেশে চৌষট্টি বসন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল এবং নিজের নিজের প্রতাপের কথা জানাইল। তখন চৌষট্টি বসন্তের ঝুড়ি কক্ষে লইয়া বৃদ্ধার বেশে শীতলাদেবী ব্রজপুরে আসিলেন। সেখানে ক্রীড়ারত শিশুরা তাঁহাকে লইয়া রঙ্গে মাতিয়া উঠিল। লব-কুশ তাঁহার কলাইয়ের ছালা ধরিয়া টানাটানি শুরু করিল। কপট ক্রোধে শীতলা দর্পী বালক দুইটিকে অভিশাপ দিলেন, অচিরেই তাহাদের গর্ব খর্ব হইবে। বুড়ীর কলাই খাওয়ার পর ব্রজের যত মুনিকুমার

১। 'দ্বাদশ-মঙ্গল', পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, শান্তিনিকেতন (১৯৬৬)

জ্বরাসুরের আক্রমণে এবং বসন্তের প্রচণ্ড প্রকোপে যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়িল। লব-কুশের জীবনসংশয় দেখিয়া অভাগিনী সীতার বেদনা দুর্বহ হইয়া উঠিল। তাঁহার আর্ত ক্রন্দন শুনিয়া নারদমুনি আসিয়া পরামর্শ দিলেন, পবন-নন্দনের মারফৎ যেন ধন্বন্তরি বৈদ্যকে সংবাদ পাঠানো হয়। হনুমানের সঙ্গে মুনিপুরে আসার পথে ধন্বন্তরি শীতলাদেবীর আকাশবাণী শুনিলেন এবং তদনুযায়ী মনিপুরে সকলকে শীতলাপূজা করিবার উপদেশ দিলেন। মুনিগণ মহাসমারোহে মাহেশ্বরী মঙ্গলা শীতলার অর্চনা করিলেন। দেবীর কৃপায় মুনিকুমারেরা অচিরে আরোগ্যলাভ করিল এবং শীতলার মহিমা প্রতিষ্ঠিত হইল।

আলোচ্য কাব্যটি হইতে কবির ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে নূতনতব কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু ধর্মমঙ্গলের মধ্যে মাণিকরামেব কবিপ্রকৃতির যে বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িয়াছে, তাহ 'শীতলা-মঙ্গল' কাব্যেও সুপরিস্ফুট। কাঁহিনীর স্বল্পপরিসরেও কবির বর্ণনার সাবলীল ভঙ্গি এবং অবাঞ্ছিত আড়ম্বরের পরিবর্তে পাণ্ডিত্যের সংযমটুকু লক্ষ্য করিবার মত।

কবি শ্রীবল্লভের মত মাণিকরামের কাব্যেও চৌষট্টি প্রকার বসন্ত রোগের বিস্তৃত বর্ণন পাওয়া যায়। বসন্তের প্রচণ্ড প্রকোপের কথায় কবি বলিতেছেন—

> ধুকুড়্যা বসন্ত যাকে ধরিলেক যায়্যা।
> জ্বলনে জীবন তার যায় বারি হয়্যা। ....
> কাঁঠাল্যা বসন্ত যাকে ধরিলেক আস্যা
> মাংস ফাট্যা রক্ত ঝরে হাত পড়ে খস্যা।" ইত্যাদি।

ইহাতে মনে হয়, কবি চিকিৎসা-শাস্ত্রেও কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন।

কাব্যের স্থানে স্থানে কবি নানা পৌরাণিক কাহিনীর প্রসঙ্গ আনিয়াছেন। যেমন লব-কুশের দর্প দেখিয়া শীতলা বলিতেছেন—

> অহঙ্কার কর্যাছিল রাজা পরীক্ষিত, তে কারণে ব্রহ্মশাপ হল্য সমুচিত।
> হস্তিনানগরে ঘর রাজা দুর্যোধন, অহঙ্কার কর্যা কৃষ্ণে কৈল্য কুবচন।
> গোধন চরায়্যা তোর গেল সর্বকাল, গোয়ালার ভাত খায়্যা এত ঠাকুরাল।
> সবংশে মরিল শেষে সেই অহঙ্কারে, যুধিষ্ঠির রাজা হ'ল হস্তিনানগরে।

অলঙ্কার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও কবি অনুরূপ নীতি অনুসরণ করিয়াছেন। যেমন—

> আগুদলে জ্বরাসুর চলিল কৌতুকে, তীক্ষ্ণ শরাসন হাতে চাপিয়া ভল্লুকে।
> পাছু পাছু যান মাতা আনন্দ অন্তর, বলিকে ছলিতে যেন যান দামোদর।

প্রতিক্ষেত্রেই তাঁহার কবিত্বের সহিত পাণ্ডিত্যের সংযোগ লক্ষণীয়।

কবির চরিত্রসৃষ্টির কয়েকটি বিশিষ্ট দিকও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শীতলার

মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াও সীতার প্রতি কবি সমবেদনায় বিগলিত। জ্বরাসুরের আসুরিক প্রবৃত্তির মধ্যে তাই তিনি করুণার কোমল অনুভূতিটুকু সঞ্চারিত করিয়াছেন। জ্বরাসুর শীতলাকে বলিতেছে—

কৈকেয়ী পাষণ্ডী দুঃখ দিয়্যাচে বিস্তর, বনে বনে বেড়াইলো এ চৌদ্দ বছর।
রাবণ হরিল সীতা সকাতর রাম, বান্ধিলেন সমুদ্র সহায় হনুমান।
দেশাগমনের পরে দৈবের প্রকাশ, পুনর্বার সীতাকে দিলেন বনবাস।
এত দুঃখ পায়্যাচেন জনকনন্দিনী, পুনর্বার দুঃখ তাকে না দিও জননী।

অন্যদিকে হনুমানের চরিত্রে প্রভুপত্নীর প্রতি ভক্তি ও আনুগত্যের সঙ্গে তাহার বীরদর্পটুকুও কৌতুকস্মিত দৃষ্টিতে দেখিতে কবি ভুলেন নাই। ধন্বন্তরির মুনিপুরে যাইতে আপত্তি শুনিয়া হনুমান বলে—

রোমের রোমে পর্বত বাঁধ্যাচি অবহেলে, ডুবাইব দশুটাক সমুদ্রের জলে।
আপন মঙ্গল চাও চল গুটিগুটি, নয় তবে দেখিবি কিলের পরিপাটি।

সামান্য কয়েকটি ছত্রের মধ্যে কবি নারদ-চরিত্রের যে-ইঙ্গিতটুকু দিয়াছেন তাহাও অভিনব সন্দেহ নাই। নারদকে আমরা কোন্দলের ঠাকুর রূপেই জানি; কখনও বা পাই বিদূষক রূপে। কিন্তু এখানে দেখি—'ঢেঁকির উপরে চাপ্যা ঢঙ্গ কর্যা যান, গদগদ বীণায় গোবিন্দগুণ গান' —সেই নারদ সীতার ক্রন্দন শুনিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই। তিনি স্বর্গ হইতে আসিয়া সীতাকে আশ্বাস দিয়াছেন এবং লব-কুশের রোগ প্রতিবিধানের উপায়ও বলিয়া গিয়াছেন।

স্বয়ং কবির মধ্যে এবং কবিসৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যেও এই ধরণের সমব্যথী মনের প্রকাশ ঘটায় কাব্যে স্বেচ্ছাচারী দেবতার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অপেক্ষা পীড়িত মানুষের বেদনাই আমাদিগকে অধিক অভিভূত করে।

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার গ্রামাঞ্চল হইতে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নামক একজন কবির একখানি শীতলা-মঙ্গলার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।[১] ইহা যথাক্রমে সৃষ্টি সঞ্চার পালা, ইন্দ্রপূজা, লঙ্কাপূজা, অযোধ্যাপূজা ও জরাসন্ধপূজা এবং জাগরণ পালা এইভাবে রচিত হইয়াছে। পুঁথিটির বয়স দেড়শত বছরের অধিক নহে। কবি বর্ধমানের রাজা তেজশ্চন্দ্রের

১। মালীবুড়ো, একটি নবাবিষ্কৃত মঙ্গলকাব্য, অহল্যা (१) পৃ. ১৩৩-৩৭

রাজত্বকালে (১৭৭০-১৮৩২) বর্তমান ছিলেন।[১]

পুঁথিটিতে অন্য একজনের ভণিতাও পাওয়া যায়—

কান্দ্যা কান্দ্যা কন সব জাগতির ঘরে।
বিরচিল চন্দ্রচূড় শীতলার বরে।।

গায়েনেরা এই প্রকার সংমিশ্রণ ঘটাইয়া থাকিবেন। কাব্যখানিতে মুকুন্দরা এবং রামেশ্বরের প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। দেবী কলাই বিক্রয় করা অপমানজনক বলিয়া মনে করিলে জ্বরাসুর শিবায়নের নজির উল্লেখ করিতেছেন—

কয়ে বলে বড়াই রাখ বিধাতার ঝি।
দেবতার মায়্যা কাছে বাকি আছে কি।।
শিবদুর্গা মৎস্য ধর‍্যা বেচিলেন হাটে।
তেমন নীচ কর্ম নয় কলাই বেচা বটে।।[২]

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের নজির এই ঃ

সুবর্ণ গোধিকা চণ্ডী হৈল্যা পূজা হেতু।
জালে তার বান্ধিল আখেটি কালকেতু।।

কৃষ্ণনাথ, রামপ্রসাদ, রঘুনাথ ইঁহাদের রচিত শীতলা মঙ্গলের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের সম্পর্কে কিছুই জানিতে পারা যায় না। কালিকামঙ্গল রচয়িতা কৃষ্ণরাম রচিত একখানি শীতলা মঙ্গলেরও-সন্ধান পাওয়া যায়।

শঙ্কর

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমায় শঙ্কর নামক একজন 'শীতলা মঙ্গলে'র কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার 'শীতলা-মঙ্গলে'র কয়েকটি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৩] ইতিপূর্বে তাঁহার রচিত কেবলমাত্র 'ফেস্যারার পালা'টি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃকসংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কোনও আলোচনা কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। তাহা ছাড়া শীতলা-মঙ্গলের এই পালাগুলির সম্প্রতি সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যেমন লঙ্কাপূজা, বিরাটও জাগরণ পালা, নীলধ্বজ রাজার পূজা পালা, নিমা জগাতীর পালা, রঘুদত্তের পালা। শেষোক্ত

১। মালীবুড়ো, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের পঞ্চানন্দের পালা, সূর্যদেশ, মেদিনীপুর (১৩৮০), ১ম সংখ্যা, পৃ. ২২

২। পৃ. ১৩৬

৩। ত্রিপুরারঞ্জন বসু 'মধ্যযুগের একজন অজ্ঞাত কবি', অমৃত, ১৭ই কার্তিক, ১৩৭৯. পৃ ১০২৫-২৬; একটি খণ্ডিত পুঁথি অন্য একজনও সংগ্রহ করিয়াছেন (জাগৃহি, ঘটাল, ১৩৬৬, শারদীয়া)

পালাটি সম্পূর্ণ শীতলা-মঙ্গলের পুঁথি' বলিয়া দাবী করা হইয়াছে।[১] তাঁহার ভণিতা পাঠ করিলে মনে হয় তিনি সম্পূর্ণ শীতলা-মঙ্গলই রচনা করিয়াছিলেন—

মাধবী জঠরে জন্ম সদা চেষ্টা গান কর্ম
বিরচিলা শীতলা মঙ্গল।

মেদিনীপুর জেলার কলাইকুণ্ডে কবির নিবাস ছিল, 'নিবাস কলাইকুণ্ড চেতুয়া পরগণা।' তিনি তাঁহার কাব্যরচনার কাল এইভাবে নির্দেশ করিয়াছেন—

সন এগার চুয়াল্লিশ সালে
শুক্রবার সন্ধ্যাকালে
শুক্লপক্ষ আটাশে আশ্বিনে।
কাতরে শঙ্কর বলে
ঝড় বৃষ্টি মহীতলে
শীতলা সদয় সেই দিনে।।

১১৩৪ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কবি শীতলার স্বপ্নাদেশ লাভ করেন। ইহার কিছুকালের মধ্যেই তাঁহার কাব্য রচিত হয়। তাঁহার 'ফেস্যারার পালা'টি আজ পর্যন্ত কবির নিজ অঞ্চলে গীত হয়।

১। ঐ

ষষ্ঠীমঙ্গল

কোন্ও সংস্কৃত মহাপুরাণ কিংবা ধর্মসাহিত্যে ষষ্ঠীদেবীর নাম পাওয়া যায় না। কতকগুলি অর্বাচীন পুরাণ, যেমন 'দেবী-ভাগবত', 'ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ' ইত্যাদিতে তাঁহার অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায়। 'দেবী-ভাগবতে' আছে যে ষষ্ঠী কাত্যায়নীরূপা দুর্গারই এক নাম। সমাজে ষষ্ঠীর আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কতকগুলি অর্বাচীন পুরাণ তাঁহাকে দুর্গার সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। কিন্তু মনসা, মঙ্গলচণ্ডীর মতই ষষ্ঠী লৌকিক দেবী—মনসা ও মঙ্গলচণ্ডী যেভাবে কয়েকখানি অর্বাচীন পুরাণে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সেই উপায়েই ষষ্ঠীদেবীও কয়েকখানি অর্বাচীন পুরাণের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন।[১]

শিশুমৃত্যু বাংলার চির-কলঙ্ক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীন সমাজে ইহার প্রকোপ স্বভাবতই অধিকতর ছিল। এইজন্যই অজ্ঞ ও অসহায় সমাজ শিশুর রক্ষয়িত্রীরূপে কোনও কোনও দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, ষষ্ঠী তাঁহাদেরই অন্যতম। বাংলার প্রতিবেশী কোনও কোনও অনার্য সমাজের মধ্যে পুংশিশুর মৃত পিতামহ ও স্ত্রীশিশুর মৃত পিতামহীর (কিংবা মাতৃতান্ত্রিক বা matrianchal সমাজের মাতামহ ও মাতামহীর) আত্মাকেই শিশুর রক্ষক কিংবা রক্ষয়িত্রীরূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে। শিশু রোগগ্রস্ত হইলেই মনে করা হয় যে, ইহার পিতামহ কিংবা পিতামহীর আত্মা কোনও কারণে কুপিত হইয়াছে। সেইজন্য শিশুর রোগমুক্তি কামনায় সেই কুপিত আত্মাকে প্রশমিত করিবার জন্য নানারূপ 'পূজা'র ব্যবস্থা করা হয়। পিতামহ কিংবা মাতামহের আত্মা হইলে আদিম সমাজে তাহার নামে মোরগ কিংবা শূকর বলি দেওয়া হয়, পিতামহী কিংবা মাতামহীর আত্মা হইলে, তাহার সন্তুষ্টির জন্য স্ত্রীশিশুর পায়ে লোহার বালা, পুঁতি বা হাড়ের মালা কিংবা কর্ণাভবণ পরাইয়া দেওয়া হয়। এই প্রকার পিতামহী, মাতামহীর আত্মার পরিকল্পনা হইতেই পরবর্তী হিন্দু প্রভাবের যুগে ষষ্ঠীদেবীর পরিকল্পনা আসিয়া থাকিবে—সেইজন্য কোন মহাপুরাণে তাঁহার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। আমরা ছেলেপিলেদিগকে যে জুজুর ভয় দেখাইয়া থাকি, মনে হয়, জুজু শিশুর পিতামহদেরই প্রেতাত্মা; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, উড়িষ্যার অস্ট্রিকভাষী শবর নামক উপজাতীয় লোক পিতামহ অর্থে জুজুমা শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকে এবং শিশুর কোনও পীড়া হইলে পূজার ব্যবস্থা করিয়া তাহার পিতামহের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিবার প্রয়াস পায়।[২] আদিম সমাজের এই প্রকার পিতৃপুরুষের পূজা হইতেই পরবর্তীকালে দেবপূজা সমাজে প্রবর্তিত হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু আর্য সমাজে

১। Asutosh Bhattacharyya, 'The Cult of Sasthi in Bengal', *Man in India*, XXVIII (1948), 152-162

২। আফ্রিকার দক্ষিণ নাইজেরিয়া অঞ্চলের আদিবাসীদিগের কথ্যভাষায় ভূত অর্থে জুজু শব্দ ব্যবহৃত হয়। (Field Museum of Natural History, Anthropological Series, Vol. XXI, No. 1. Chicago, 1921, p. 15)

প্রবেশ করিবার পূর্বে কবে কোন্ আর্যেতর সমাজ হইতে মৃতপিতৃপুরুষের আত্মার পরিকল্পনার সূত্র ধরিয়া ষষ্ঠীদেবীর পরিকল্পনার সর্বপ্রথম উন্মেষ হইয়াছিল, তাহা অনুমান করিয়াও বলিতে পারা যাইবে না। প্রাগৈতিহাসিক আবিষ্কারের ফলে অনুমান করা যায় যে, সমাজে অতি প্রাচীন কাল হইতেই শিশুর রক্ষয়িত্রী এক 'গৃহ-দেবতা'র অস্তিত্ব ছিল। মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার খননকার্যের ফলে কতকগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি মাতৃকামূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দেবতা একদিকে 'গৃহ-দেবতা' (guardian deity of the house) অন্যদিকে নবজাত শিশুর রক্ষয়িত্রী বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন।[১]

বৌদ্ধ তান্ত্রিকসমাজের হারীতীর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। হারীতীর সঙ্গে ষষ্ঠীর একটু পার্থক্য আছে। হারীতী শিশু-অপহরণকারিণী, অর্থাৎ শিশুমৃত্যুর কারণ; সেইজন্যই তাঁহার এই নাম। তাঁহার পূজা দ্বারা নবজাত শিশুর মৃত্যুর আশঙ্কা দূর করা হয়, তাঁহার চরিত্রের মধ্যে অনিষ্টকারী গুণটিই প্রধান। কিন্তু ষষ্ঠী শিশুর রক্ষয়িত্রী, তাঁহার চরিত্রের মধ্যে কল্যাণগুণই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—অতএব বৌদ্ধ হারীতী ও পৌরাণিক ষষ্ঠী দুই স্বতন্ত্র ক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। বাংলাদেশে হারীতীর অনুরূপ আর একটি লৌকিক দেবীচরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়—তাঁহার নাম জাতাপহারিণী, অর্থাৎ যিনি নবজাত শিশুকে হরণ করিয়া থাকেন। মনে হয়, হারীতী ও জাতাপহারিণী অভিন্না, ষষ্ঠীদেবীর সঙ্গে ইঁহাদের কাহারও মৌলিক কোনও সম্পর্ক নাই। ষষ্ঠী চরিত্রের মধ্যে তাঁহার অনিষ্টকারিণী (malignant) শক্তি অপেক্ষা তাঁহার ইষ্টকারিণী (beneficent) শক্তিই অধিকতর প্রবল। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত মাতৃকা-মূর্তিগুলির মধ্যে প্রধানত যে সকল গুণের অস্তিত্ব অনুমান করা হইয়া থাকে, ষষ্ঠীর মধ্যেও তাহাই বর্তমান থাকিতে দেখা যায়। বাংলার লৌকিক দেবদেবী চরিত্রের মধ্যে ষষ্ঠীর এই বিষয়ক বৈশিষ্ট্যটি অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই বাংলার সমাজে সূতিকা গৃহে শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিবসে ষষ্ঠীদেবীর পূজা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৃন্দাবন দাস কর্তৃক রচিত 'চৈতন্যভাগবতে' চৈতন্যদেবের জন্মের ষষ্ঠ দিবসে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠীপূজার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। বস্তুত ইহার বহু পূর্ব হইতেই ইহা সমাজে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে ইহার বিধান রহিয়াছে। এই বিষয়ে বাংলার প্রতিবেশী কোনও কোনও আদিম সমাজের সঙ্গে বাংলায় অনুষ্ঠিত আচারসমূহের আশ্চর্য রকম ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়; মনে হয়, ইহাদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক রহিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রত্যেক পল্লীতে ষষ্ঠীতলা নামক একটি স্থান থাকে— ষষ্ঠীদেবী সাধারণত এই স্থানে অধিষ্ঠিত থাকেন বলিয়া বিশ্বাস। সন্তানের মঙ্গল কামনায় বৎসরের মধ্যে যে কোনও সময়, কিংবা নির্দিষ্ট ষষ্ঠীপূজার তিথিতে সেখানে গিয়া দেবতার নামে

১। E. Mackay, *The Indus Civilisation* (London, 1935), p. 67.

পূজা নিবেদন করা হয়। যে সকল গ্রামে বারোয়ারী ষষ্ঠীতলা নাই, বিশেষত পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে, সেখানে সাধারণত গৃহে দেবীর অর্চনা করা হইয়া থাকে। প্রাচীন ভাস্কর্যে কয়েকটি ষষ্ঠীর মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেলেও বর্তমানে ষষ্ঠীতলায় কিংবা গৃহে পূজিতা ষষ্ঠীদেবীর সাধারণত কোনও মূর্তি নাই, অনেক স্থলে প্রস্তরনির্মিত মনসার মূর্তি বৃক্ষতলে ষষ্ঠী বলিয়া পূজিতা হয়। যদিও প্রাচীন ভাস্কর্যে অনেক হারীতীর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, মাত্র কয়েকটি ষষ্ঠীদেবীর মূর্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।[১]

পশ্চিম বাংলার সর্বত্রই মনসাতলা ও ষষ্ঠীতলা অভিন্ন স্থান, উভয় দেবীই সেখানে একই স্থানে পূজিতা হইয়া থাকেন। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রাচীন ভাস্কর্যে মনসার মত ষষ্ঠীদেবীও স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। তবে ষষ্ঠীদেবীর পূজার প্রচলন আরও সীমাবদ্ধ ছিল— মনে হয়, তাহা স্ত্রী-সমাজ অতিক্রম করিয়া পুরুষের সমাজে বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

কয়েকটি অর্বাচীন পুরাণে ষষ্ঠীদেবীর সামান্য উল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়। শিশুর সঙ্গে জননীর সম্পর্কই নিকটতর, সেইজন্য শিশুর রক্ষয়িত্রী দেবী ষষ্ঠী প্রধানত স্ত্রী-সমাজের পূজা। সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক পটভূমিকা হইতে বিভিন্ন স্ত্রী-দেবতার উদ্ভব হইয়া কালক্রমে যেমন এক চণ্ডী নামের মধ্যে আসিয়া অভিন্নত্ব লাভ করিয়াছে, তেমনই বিভিন্নকালে সমাজের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক পটভূমিকা হইতে বিভিন্ন রূপে শিশুর রক্ষয়িত্রীরূপিণী বিভিন্ন দেবতা বলিয়া কল্পিত হইয়া কালক্রমে তাহাদের সকলেই এক ষষ্ঠী নামের মধ্যে আসিয়া অভিন্নত্ব লাভ করিয়াছে। এই দেবীর ষষ্ঠী নাম হইবার একমাত্র কারণ এই যে, তিনি প্রধানত শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিবসে কৃত জাতকর্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবী,—ষষ্ঠ দিবসের স্ত্রী-দেবতা বলিয়াই তাঁহার নাম ষষ্ঠী; এতদ্ব্যতীত শিশু-সম্পর্কিত দেবীর ষষ্ঠী নাম হইবার আর কোনও কারণ নাই। দেবীর ষষ্ঠী নামটিই পরবর্তীকালে শিশুর রক্ষয়িত্রী বলিয়া কল্পিত সকল দেবী কিংবা মৃত পিতামহী কিংবা মাতামহীর আত্মার উপর প্রযোজ্য হইতে থাকে। এইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাংলাদেশে বৎসরের বার মাসে এই বিভিন্ন প্রকৃতির ষষ্ঠীর পূজা হইয়া থাকে, যেমন বৈশাখে ধূলাষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠে অরণ্যষষ্ঠী, আষাঢ়ে কোড়াষষ্ঠী, শ্রাবণে লোটনষষ্ঠী, ভাদ্রে মন্থনষষ্ঠী, আশ্বিনে দুর্গাষষ্ঠী, কার্তিকে গোটষষ্ঠী, অগ্রহায়ণে মূলাষষ্ঠী, পৌষে পাটাইষষ্ঠী, মাঘে শীতলাষষ্ঠী, ফাল্গুনে অশোকষষ্ঠী এবং চৈত্রে নীলষষ্ঠী। মূলত ইঁহারা সকলেই শিশুর রক্ষয়িত্রী দেবী ছিলেন, ইঁহারা এখনও স্ত্রী-সমাজ কর্তৃক পূজিতা, তবে ইঁহাদের মৌলিক পরিচয় প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে —অনেককে বাহির হইতে দেখিলে ইঁহাদের সঙ্গে আদৌ যে শিশুর কোনও সম্পর্ক ছিল, তাহা মনে হয় না। মূলত ইঁহাদের কাহারও নাম ষষ্ঠী ছিল বলিয়া মনে হয় না,— কারণ, যে দেবী শিশুর ষষ্ঠ দিবসে অনুষ্ঠিত জাতকর্মের অধিষ্ঠাত্রী

১। ঢাকা শহরের যাদুঘরে একটি সুন্দর সুগঠিত কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত ষষ্ঠীদেবীর মূর্তি সংরক্ষিত আছে। ইহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমি যাদুঘরের অধ্যক্ষ এনামুল হক সাহেবের নিকট ঋণী।

দেবী, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই নাম ষষ্ঠী হওয়া উচিত। শব্দের ব্যুৎপত্তি বিচার করিয়া দেখিলে অন্য কাহারও ষষ্ঠী নাম হইতে পারে না। কিন্তু কালক্রমে এই নামটি শিশু ও জননীর সম্পর্কিত সকল লৌকিক দেবীর উপরই প্রযোজ্য হইতে থাকে। যে দেবী শিশুর ষষ্ঠ দিবসের জাতকর্মের অধিষ্ঠাত্রী, তিনি জন্ম-ষষ্ঠী নামে বিশিষ্টতা লাভ করেন। তবে তিনি সূতিকাষষ্ঠী নামে অধিকতর পরিচিত। জন্ম-ষষ্ঠীর পূজাচার ও তাঁহার সম্পর্কিত ব্রতকথা উল্লিখিত সকল ষষ্ঠীর আচারপূর ও ব্রতকথা হইতে পৃথক। কালক্রমে উক্ত দ্বাদশ রকমের ষষ্ঠীর মধ্য হইতে একটি ষষ্ঠী বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন---তাঁহার নাম অরণ্যষষ্ঠী বা প্রচলিত কথায় জামাইষষ্ঠী। আম্রফল এই পূজার একটি বিশিষ্ট উপকরণ বলিয়া কোনও কোন অঞ্চলে, বিশেষত পাবনা বগুড়া জেলায় ইহা আমষষ্ঠী নামে পরিচিত। ইঁহার পূজা প্রকৃতপক্ষে কন্যার সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে জামাতার সম্বর্ধনা। বাংলার সমাজে জামাতার একটু বিশেষ অধিকারবশতই তাহার সম্পর্কিত এই অনুষ্ঠানটি এ দেশের সমাজে কালক্রমে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়া গিয়াছে। উল্লিখিত দ্বাদশ প্রকৃতির ষষ্ঠীর মধ্যে পূর্ববঙ্গে একমাত্র অরণ্যষষ্ঠীর বা জামাইষষ্ঠীর পূজাই প্রচলিত আছে --- ইহা ছাড়া আর কোনও ষষ্ঠী পূজা স্ত্রী-সমাজে সেখানে অজ্ঞাত। সূতিকাষষ্ঠীর পূজা বাংলার বাহিরেও সর্বত্রই প্রচলিত আছে।

অরণ্যষষ্ঠী কিংবা জামাইষষ্ঠীর কাহিনী লইয়া দুই একটি মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগের বাংলায় রচিত হইয়াছিল; সাধারণত এই সম্পর্কে যে কাহিনী পাওয়া যায়, তাহা নিম্নে বর্ণনা করা যাইতেছে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অরণ্যষষ্ঠীর মাহাত্ম্য-সূচক কাহিনীটি এক নহে। নিম্নলিখিত কাহিনীটি খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই একখানি প্রাচীন ষষ্ঠীমঙ্গল-কাব্য রচিত হইয়াছিল—

সপ্তগ্রামে শত্রুজিৎ নামক এক রাজা ছিলেন। ষষ্ঠীদেবী নিজের পূজা প্রচার করিতে গিয়া ভাবিলেন, যদি শত্রুজিৎ তাঁহার পূজা করে, তবেই উচ্চতর সমাজে তাঁহার পূজা সহজে প্রচারলাভ করিতে পারে। ইহা ভাবিয়া তিনি এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করিলেন। তারপর শত্রুজিতের রাণীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'গঙ্গাস্নান করিবার জন্য আমি বর্ধমান হইতে আসিয়াছি, আজ অরণ্যষষ্ঠীর পূজার দিন। তোমাকে আমি সঙ্গে করিয়া লইব ও ষষ্ঠীর পূজা করাইব।' রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ষষ্ঠীর পূজা করিলে কি হয়?' বৃদ্ধা বলিলেন, 'তুমি রাণী, সংসারের দুঃখকষ্ট কিছুরই ধার ধার না। সেইজন্যই ষষ্ঠীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কিছুই জান না। ষষ্ঠীর মাহাত্ম্যকীর্তন করিতেছি, মন দিয়া শোন—'

সায়বেনে নামে এক বণিক ছিল। ষষ্ঠীর কৃপায় তাহার স্ত্রী সাতটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। বণিকের স্ত্রী তাহার সাত পুত্রবধূ লইয়া সর্বদা কায়মনে ষষ্ঠীর পূজা করিত। একদিন ষষ্ঠীর পূজার আয়োজন শেষ করিয়া শাশুড়ী ছোট পুত্রবধূটিকে সেখানে রাখিয়া নিজে কি কাজের জন্য বাহিরে চলিয়া গেলেন। ছোট বউ গর্ভবতী ছিল। পূজার দ্রব্য নিজে খাইয়া ফেলিবার জন্য তাহার অত্যন্ত লোভ হইতে লাগিল, অবশেষে কিছুতেই লোভ সংবরণ

করিতে না পারিয়া কিছু কিছু দ্রব্য খাইয়া ফেলিল। শাশুড়ী যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন সে বলিল যে, এক কালো বিড়াল সকল খাইয়া গিয়াছে। কালো বিড়াল ষষ্ঠীর বাহন। যখন কালো বিড়াল শুনিতে পাইল যে, ছোট বউ নিজে পূজার সামগ্রী খাইয়া তাহার উপর মিথ্যা করিয়া দোষ চাপাইয়াছে, তখন সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলা এবং মনে মনে ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। যথাসময়ে ছোট বউ একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল, কালো বিড়াল শিশুটিকে সূতিকা-গৃহ হইতে মুখে করিয়া লইয়া পলাইয়া গেল। এইভাবে ছোট বউ ক্রমে ছয়টি পুত্রসন্তানের জন্ম দিল—কালো বিড়াল একে একে ছয়টিকেই সূতিকা-গৃহ হইতে হরণ করিল। ছোট বউ পুনরায় গর্ভবর্তী হইল। যথাসময়ে প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইলে সে এইবার অরণ্যের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল এবং সেখানেই একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। শিশুটিকে কোলে লইয়া সে সারারাত জাগিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু শেষ রাত্রির দিকে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। এই সুযোগে কালো বিড়াল তাহার কোল হইতে শিশুটিকে লইয়া পলাইয়া গেল। ছোট বউ সহসা জাগিয়া উঠিয়া দেখিতে পাইল যে, কালো বিড়াল শিশুটিকে মুখে করিয়া পলাইতেছে। ছোট বউ তাহার পিছন পিছন ছুটিয়া গেল, কিন্তু বেশী দূর যাইতে পারিল না, কিছু দূর গিয়াই হুমড়ি খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কালো বিড়াল শিশুটিকে মুখে করিয়া ষষ্ঠীদেবীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোট বউয়ের উপর এই নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিবার জন্য কালো বিড়ালকে ষষ্ঠীদেবী তিরস্কার করিলেন। তারপর তিনি নিজে যেখানে ছোট বউ মাটিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া ছিল, সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ছোট বউ তাঁহার প্রতি ভক্তিমতী নহে বলিয়া ষষ্ঠীদেবী অনুযোগ দিলেন, তাঁহার পূজার সামগ্রী খাইয়া ফেলিবার জন্য তাহার যে অপরাধ হইয়াছে, সে বিষয়েও তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার সকল অপরাধই ক্ষমা করিলেন। তাহার সাতটি পুত্রই তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। গৃহে ফিরিয়া ছোট বউ ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিল। শত্রুজিতের রাণী ছদ্মবেশিনী বৃদ্ধার নিকট হইতে ষষ্ঠীদেবীর এই মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া নিজেও মহাসমারোহে তাঁহার পূজা করিলেন। এইভাবে ষষ্ঠীদেবীর পূজা রাজপরিবারের মধ্যে প্রচার লাভ করিল।

ষষ্ঠীমঙ্গলের কবিগণ

কৃষ্ণরাম দাস

উপরোক্ত কাহিনী লইয়া যে সকল মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যখানিরই প্রথম সন্ধান পাওয়া যায়।[১] কৃষ্ণরাম দাস পূর্বালোচিত কালিকা-মঙ্গলের কবি। কৃষ্ণরাম তাঁহার ষষ্ঠীমঙ্গল রচনার কাল যেভাবে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ১৬০১ শকাব্দ বা ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য রচিত হয়। ইহাতে সপ্তগ্রামের একটি বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা হইতে বাংলার এই প্রাচীন নগরের অতীত ঐশ্বর্য সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া যায়। তখন পর্যন্তও সপ্তগ্রামের স্মৃতি এই দেশের সমাজে জাগরূক ছিল। কৃষ্ণরাম রচিত ষষ্ঠীমঙ্গলের কোনও সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় না। এখানে যে পুঁথিখানির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা খণ্ডিত। কৃষ্ণরাম রচিত ষষ্ঠী-মঙ্গলের উদ্ধৃত কাহিনীটি অদ্যাপি পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলের অরণ্যষষ্ঠীর ব্রতকথায় প্রচলিত আছে।

রুদ্ররাম চক্রবর্তী

ইহার পর আর একজন কবির রচিত ষষ্ঠীমঙ্গলের কথা উল্লেখ করিতে হয়, তাঁহার নাম রুদ্ররাম চক্রবর্তী।[২] তাঁহার কাব্যখানি নিম্ন বঙ্গ, বিশেষত খুলনা জেলায়ই প্রচলিত ছিল—অন্যত্র বিশেষ প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। কাব্য মধ্যে কবির বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না; কেবল এই মাত্র জানিতে পারা যায় যে, কবির পিতার নাম গঙ্গারাম, তাঁহার উপাধি ছিল বিদ্যাভূষণ। কাব্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি একটি বিবরণ দিয়াছেন; তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, একবার কবির কন্যা গুরুতর রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন, তখন ষষ্ঠীদেবী কবিকে স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার মাহাত্ম্যসূচক একখানি কাব্য রচনা করিতে আদেশ দেন। তাঁহারই আদেশ পালন করিতে গিয়া কবি তাঁহার ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যখানি রচনা করেন। ইহার ফলেই কবির কন্যা রোগমুক্ত হন।

রুদ্ররামের সময় কিংবা তাঁহার কাব্যরচনার কাল সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে কিছুই জানিতে পারা যায় না। পূর্বোদ্ধৃত অরণ্যষষ্ঠীর কাহিনী তাঁহার বর্ণিতব্য বিষয় নহে। তাঁহার বিষয়বস্তু প্রধানত সংস্কৃত পুরাণ হইতে গৃহীত। মনে হয়, ষষ্ঠীদেবীর কাহিনী-সম্পর্কিত লৌকিক ধারাটির সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন না, কিংবা সংস্কৃত পুরাণের প্রতি অধিকতর আকর্ষণবশত তিনি পুরাণকেই উপজীব্য করিয়া লৌকিক ধারাটিকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্য তের পালায় বিভক্ত,—এই তের পালায় মোট তিনটি কাহিনী ব্যক্ত করা হইয়াছে; প্রথম কাহিনীটি পৌরাণিক চরিত্র কার্তিকেয়কে অবলম্বন করিয়া লিখিত,—কাহিনী-ভাগ সম্পূর্ণই পুরাণ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় কাহিনীটি ক্ষেত্রমিশ্র নামক এক রাজার ষষ্ঠীদেবীর বরে পুত্র ও রাজালাভের বৃত্তান্ত লইয়া এবং তৃতীয় কাহিনীটি কলাবতীর উপাখ্যান লইয়া রচিত। শেষোক্ত কলাবতীর উপাখ্যানটি লৌকিক

১। গ-স, ৫৬-৭৪।

২। ইহার একখানি অসম্পূর্ণ ও আধুনিকতা-প্রাপ্ত পুঁথি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে (আশুতোষ দত্ত সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৩৯ সাল)।

কোনও জনশ্রুতি হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। উক্ত তিনটি কাহিনীতে রুদ্ররাম যে উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার কোনটিরই বঙ্গদেশে প্রচলিত ষষ্ঠীদেবী সম্পর্কিত কোনও কাহিনীর সঙ্গে মিল নাই,—এই হিসাবে রুদ্ররামের রচনা বাংলা ষষ্ঠীমঙ্গল সাহিত্যের মূল ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন। ভাষা বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয়, রুদ্ররাম খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভাষা সুপরিচ্ছন্ন ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ, কিন্তু প্রকৃত কবিত্বের স্পর্শ তাহাতে একপ্রকার নাই বলিলেই চলে।

কবিচন্দ্র ও গুণরাজের ভণিতায় ষষ্ঠীমঙ্গলের পদ পাওয়া যায় বলিয়া জানিতে পারা যায়।[১] কিন্তু তাঁহাদের পরিচয় কিছুই জানা যায় না।

শঙ্কর

সম্প্রতি শঙ্কর নামক একজন কবির একখানি ষষ্ঠীমঙ্গলের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে— বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার বিষয়ে এ'যাবৎ কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।[২] মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এই কবির ষষ্ঠীমঙ্গল এখনও গীত হয়। কবি তাঁহার রচিত ষষ্ঠীমঙ্গলে এইভাবে আত্ম-পরিচয় এবং কাব্য-রচনার কাল নির্দেশ করিয়াছেন,—

আদ্য বসু চন্দ্রকলা শেষে রাণী পাটনীলা (?)
নাম যার ছিদাম সুদাম।
রাণীর বাজারে স্থিতি যশোমতী পুণ্যবতী
বিশালাক্ষী পদে যার আশ॥
তাহার তনুজ শ্যাম (?) সীতারাম তার নাম
তার জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবর্ধন।
তাহার অনুজ ভাই ষষ্ঠীর আদেশ পাই
শ্রীকবি শঙ্করে রস গান॥

এই পাঠটিতে নানা ভ্রমপ্রমাদ আছে স্বীকার করিয়া লইলেও 'আদ্য বসু চন্দ্রকলা' অর্থাৎ ১৬৮১ শকাব্দ বা ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কাব্য রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তিনি শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্র হইতে যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি তাহা তাঁহার উদ্ধৃত পাঠদৃষ্ট আত্মপরিচয় হইতেও বুঝিতে পারা যায়। সীতারাম যে তাঁহার পিতার নাম এবং গোবর্ধন যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহা অন্যান্য ভণিতায়ও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্কর রচিত ষষ্ঠীমঙ্গলের কাহিনীটি কৃষ্ণরাম দাসের কাহিনী হইতে স্বতন্ত্র; তাহা সংক্ষেপে এই—

একদিন সুলোচনাকে ষষ্ঠীদেবী জিজ্ঞাসা করেন, কোথায় গেলে তাঁহার পূজা প্রচারিত হইবে। সুলোচনা বলিলেন, দিলীপনগরে জয়সিংহ নামে এক রাজা আছেন, তাঁহার সাত রাণী, কিন্তু পুত্রকন্যা নাই। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ ধরিয়া তুমি ভিক্ষা করিবার ছলে রাজার কাছে যাও এবং রাজার নিকট পূজা চাহিয়া লও; রাজা অস্বীকৃত হইলে ঘাটের কূলে

১। বিশ্বকোষ ১৮, ৭৫।

২। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল হইতে শ্রীভূপতি দত্ত এই কবির দুইখানি পুঁথির সন্ধান পাইয়াছেন।

অপেক্ষা করিও, ছোট রাণী ঘাটে আসিলে তাহাকে পুত্রবর দিও। এই ভাবেই রাজবাড়িতে তোমার পূজা প্রচারিত হইবে। ষষ্ঠীদেবী তাহাই করিলেন। রাজা রাজসভা হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে তিনি ঘাটের কূলে ছোট রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহেন। ছোট রাণী বলিলেন, 'আমার কোনও ধনের অভাব নাই, আমি তোমার নিকট কি বর চাহিব?' তখন ষষ্ঠীদেবী বলিলেন, সকল ধনের শ্রেষ্ঠ ধন পুত্র, তাহাই তোমার নাই,'—

'পর্বত প্রমাণ যদি গৃহে ধন রহে।
অপুত্রিব মৃত্যু কালে রাজা সব লহে।।
কাণা খড়া হইয়া যদি পুত্র থাকে ঘরে।
মৃত্যুকালে অবহেলে পিণ্ড দান করে।।'

ছোট রাণীকে ষষ্ঠীদেবী পুত্রবর দিলেন। যথাসময়ে তিনি এক পুত্র প্রসব করিলেন, ইহাতে অন্যান্য রাণীগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার শিশুপুত্রকে জলে ফেলিয়া দিলেন। রাজাকে মিথ্যা করিয়া সংবাদ দেওয়া হইল যে, ছোট রাণী ইঁট, কাঠ, মুড়া ঝাঁটা প্রসব করিয়াছে। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া ছোট রাণীকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু পাত্রমিত্রের কথায় শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে ঘোড়াশালে বন্দিনী করিয়া রাখিলেন। ষষ্ঠীদেবী ছোট রাণীর সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—

বেঁচে আছে তব পুত্র জলের ভিতরে।
এস বাছা দুগ্ধ দিয়া আসিবে সত্বরে।।

রাণী ষষ্ঠীদেবীর কথায় আশ্বস্ত হইয়া শিশুকে স্তন্যপান করাইয়া আসিলেন। ষষ্ঠীদেবী ছোট রাণীকে নানা অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া পুনরায় ঘোড়াশালে পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। এ সংবাদ শুনিয়া রাজা ছোট রাণীকে দ্বিচারিণী বলিয়া সন্দেহ করিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। তারপর রাণীর অনুনয়ে তিনি সরোবরে গিয়া ষষ্ঠীদেবীর সাক্ষাৎ পাইলেন। দেবী তখন সাতটি শিশু লইয়া আবির্ভূত হইলেন।

ডালেতে বসিয়া যেন পক্ষী করে রা।
সেই মত শব্দ করে পাইয়া নিজ মা।।

শিশুদের দেখিয়া রাজা পরম বিস্মিত হইলেন। ষষ্ঠীদেবী করুণাপরবশ হইয়া তাঁহার অবশিষ্ট ছ'টি রাণীর এক-একজনকে এক-একটি করিয়া ছয়টি শিশু উপহার দিলেন। সেই হইতেই দিলীপনগরে ষষ্ঠীপূজা প্রচারিত হইল।

শঙ্করের কাহিনীতে যে ষষ্ঠীদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে, তাঁহার নাম জলষষ্ঠী বলিয়া কবি উল্লেখ করিয়াছেন,—

জলষষ্ঠী নাম মোর জগতে খ্যাতি।
প্রথমে করিল পূজা শ্রীহরি পার্বতী।।

বাংলাদেশে বার মাসে যে বার রকম ষষ্ঠীর পূজা হয়, তাহাদের মধ্যে জলষষ্ঠীর কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না; তবে শীতলষষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার পরিচয় স্বতন্ত্র। শিশুকে 'জলের ফাঁড়া' হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য জলষষ্ঠীর পরিকল্পনা হওয়া স্বাভাবিক। শঙ্করের রচনায় কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট অনুভূত হয়। এই সম্পর্কে ছোট রাণীর সাধভক্ষণের বর্ণনাটির সঙ্গে মুকুন্দরামের অনুরূপ বর্ণনার তুলনা করা যাইতে পারে। ইহা মুকুন্দরাম রচিত কালকেতু-কাহিনীর নিদয়ার সাধভক্ষণের বর্ণনা হইতেই আনুপূর্বিক গৃহীত হইয়াছে।

সারদা-মঙ্গল

সারদা বা সরস্বতী বৈদিক দেবতা, তিনি বিদ্যা ও চারুকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যদিও পরবর্তীকালে পৌরাণিক সাহিত্যে তাঁহার পূর্ববর্তী বৈদিক পরিকল্পনার কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছিল, তথাপি বৈদিক কাল হইতে পৌরাণিক কাল পর্যন্ত সরস্বতীর মৌলিক গুণাবলীর মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। বাংলার সমাজে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পর অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে এই দেবীকে অবলম্বন করিয়া কয়েকখানি মঙ্গল-কাব্য রচিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, মঙ্গলকাব্যের বাঙালী কবিগণ তাঁহার বৈদিক কিংবা পৌরাণিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া মঙ্গলকাব্যের স্ত্রী-দেবতার চরিত্রের অনুরূপ তাঁহার চরিত্র পুনর্গঠন করিয়া লইয়াছিলেন--দেবতার নামটি বৈদিক হইলেও তাঁহার অন্তরটি বাঙ্গালী কবির নিজস্ব পরিকল্পনা-অনুযায়ী নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছিল। এই দেবী-সম্পর্কিত মঙ্গলকাব্য একটিও অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে,—পরবর্তী মঙ্গল-কাব্যের বৈশিষ্ট্যহীন আদর্শ ও রচনা-রীতি ইহাদের রচনায়ও নিয়োজিত হইয়াছিল—কাহিনী-পরিকল্পনায় কিংবা রচনায় ইহাদের মধ্যে কোনও মৌলিক কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। দেবতার কল্পিত মাহাত্ম্য রচনা করাই উদ্দেশ্য—মানবিক চরিত্র বিকাশ ইহাদের লক্ষ্য ছিল না, কিংবা ইহার কবিদিগের দ্বারা তাহা ফুটাইয়া তোলা সম্ভবও ছিল না। বিদ্যার মাহাত্ম্য প্রচার করাই এই মঙ্গলকাব্যের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া অশিক্ষিত সাধারণ সমাজে ইহার কোনও প্রচার ছিল না। সাধারণত কোনও ধনি সন্তানের বিদ্যারম্ভ উপলক্ষে ব্যবসায়ী গায়েন কর্তৃক সময়োপযোগী এই সারদামঙ্গল গীত হইত। সরস্বতী পূজার সময়ও ধনিগৃহে এই গানের অনুষ্ঠান হইত। কিন্তু বর্তমান কালের মত সরস্বতী পূজা সেকালে এত ব্যাপক ছিল না। এই সকল কারণেই সারদা-মঙ্গলের প্রচার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। এই বিষয়ক একখানি মাত্র কাব্য এই পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দয়ারাম নামক একজন কবির রচিত।[১] দয়ারাম রচিত সারদা-মঙ্গলের কাহিনীটি এইরূপ—

সুরেশ্বর নামক রাজ্যে সুবাহু নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। রাজার কোন পুত্রসন্তান ছিল না। সেইজন্য অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে বাসা করিয়াও তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। অবশেষে তিনি পুত্রের জন্য কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন, তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিব তাঁহাকে পুত্রবর দান করিলেন। পুত্রের নাম রাখা হইল লক্ষধর। পুত্রের যখন সাত বৎসর বয়স, তখন রাজা তাঁহার কুলগুরু গৌরীদাস পণ্ডিতের হস্তে তাহার শিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। তাহার বিদ্যারম্ভ-সময়ে মহাসমারোহে সরস্বতী দেবীর পূজা করা হইল, গৌরীদাস সানন্দচিত্তে রাজপুত্রের শিক্ষার ভার লইলেন। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে রাজপুত্রকে নাগরী (হিন্দী), পারসী, বাংলা, উড়িয়া ইত্যাদিতেও যথার্থ শিক্ষিত করিয়া দিবার জন্য গৌরীদাসকে নির্দেশ দেওয়া হইল। বার বৎসর যাবৎ গুরু রাজপুত্রকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনও বিষয়েই তাহার সাধারণ জ্ঞানও জন্মাইতে পারিলেন না।

১। ক ৩৭৮০

পূর্বজন্মকৃত তাহার কোনও পাপের জন্য দেবী সরস্বতী তাহার উপর বিরূপ ছিলেন, এইজন্যই সে এই জন্মে সাধারণ বর্ণজ্ঞানও লাভ করিতে পারিল না। রাজার নিকট গুরু সমস্ত খুলিয়া বলিলেন এবং তাঁহার দ্বারা রাজপুত্রের যে আর কিছু হইবে না, তাহা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিলেন। রাজা তাঁহার পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া কোটালকে তাহার শিরশ্ছেদ করিবার আদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন মূর্খ পুত্র থাকার চাইতে অপুত্রক থাকা ভাল। কোটাল রাজপুত্রকে লইয়া বধ্যভূমিতে গেল। দেখিয়া সরস্বতীর অত্যন্ত দয়া হইল। তিনি কোটালের কানে কানে বলিলেন, 'আমার আদেশ, ইহাকে মুক্ত করিয়া দাও, রাজা তোমাকে কিছু বলিবেন না।' কোটাল রাজপুত্রকে মুক্ত করিয়া দিল। তারপর একটা শিয়াল মারিয়া তাহার রক্ত আনিয়া রাজাকে দেখাইয়া বলিল, 'রাজপুত্রকে বধ করিয়া আসিয়াছি।' লক্ষধর একাকী এক গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে কোথায় যাইবে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। তাহাকে আশ্রয় দিবার জন্য দেবী সরস্বতী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে একটি পাতার কুটির নির্মাণ করিয়া সেই বনেই বাস করিতেছিলেন। লক্ষধর সেই কুটিরে আশ্রয় পাইল, ছদ্মবেশিনী ব্রাহ্মণী তাহার প্রতি পরম সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন এবং তাহাকে নিজের পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন। একদিন ব্রাহ্মণী লক্ষধরকে একাকী কুটিরে রাখিয়া নিজে কি কাজে বাহির হইয়া গিয়াছেন। কুটিরের এক কোণে একটি পুঁথি ছিল—তাহাতে রাধাকৃষ্ণের নাম লেখা। লক্ষধর পুঁথিটি উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া যখন কিছুই বুঝিতে পারিল না, তখন তাহা ছুঁড়িয়া নিকটবর্তী নদীর জলে ফেলিয়া দিল— পুঁথিটি জলে ভাসিতে লাগিল—তাহা হইতে রাধাকৃষ্ণের নামটি ধুইয়া গেল। স্বর্গ হইতে দেবতাগণ তাহা দেখিতে পাইলেন, এই পবিত্র গ্রন্থটি জল হইতে উদ্ধার করিয়া আনিবার জন্য তাঁহারা নারদকে মর্ত্যলোকে পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণী যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন পুঁথিটি দেখিতে না পাইয়া সন্ধান করিলেন—পরে সকল বিষয় জানিতে পারিলেন। লক্ষধরকে এইজন্য তিনি কঠিন শাস্তি দিবার সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু পরমুহূর্তে তাহাকে নিরক্ষর ও অজ্ঞান বলিয়া ক্ষমা করিলেন। ব্রাহ্মণী নিজের মূর্তি ধারণ করিলেন, লক্ষধরকে সেখান হইতে বৈদেব নামক রাজ্যে যাইতে বলিলেন। তিনি তাহাকে বলিয়া দিলেন যে, সেখানে গিয়া তাহার নিজের পরিচয় গোপন করিয়া সেখানকার রাজকন্যাদিগের ভৃত্যরূপে সেবা করিতে হইবে—এইভাবে চারি বৎসরকাল কাটিলে পর সে সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত হইতে পারিবে। রাজকন্যাদিগের শিক্ষাগুরুর নাম জনার্দন ওঝা—তাঁহার নিকট হইতে তাহাকে পরোক্ষে বিদ্যালাভ করিতে হইবে। লক্ষধর বৈদের রাজ্যে আসিল। এখানে আসিয়া সে রাজকন্যাদিগের ভৃত্যের পদ লাভ করিল—তাহার নাম দেওয়া হইল ধূলাকুট্যা। কিছুদিন পরে যখন সরস্বতী পূজার সময় আসিল তখন তাহাকে পূজার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হইল। পূজার দ্রব্যসামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য সে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিল,—কিন্তু শেষ রাত্রির দিকে সে আর কিছুতেই থাকিতে পারিল না, নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতেই দেখিতে পাইল, এক বৃদ্ধা পূজার সামগ্রীগুলি খাইয়া ফেলিতেছে। সে তাহাকে চোর বলিয়া ধরিয়া ফেলিল, এবং প্রহার করিতে লাগিল। বৃদ্ধা স্বমূর্তি ধারণ করিলেন; ধূলাকুট্যা দেখিল, তিনি দেবী সরস্বতী। তিনি তাহাকে বর

দিলেন,—অল্পদিনের মধ্যেই সে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হইবে। ধূলাকুট্যা এ'কথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না। গুরু জনার্দন তাঁহার শিষ্যা রাজকন্যাদিগের প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি তাহাদিগকে তাঁহার অধীত সমস্ত বিদ্যায় শিক্ষিতা করিয়া দিতে এক সর্তে সম্মত হইলেন যে, তাহাদিগকে তাঁহার সঙ্গে পলাইয়া যাইতে হইবে। রাজকন্যাদিগের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহ এত প্রবল ছিল যে, ইহার জন্য তাহারা কুলে জলাঞ্জলি দিতেও রাজী হইল—ইহা যে তাহাদের পক্ষে কত বড় কলঙ্কের কথা, তাহা তাহাদের অপরিণত বুদ্ধিতে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। এই উদ্দেশে রাত্রিযোগে একটি নৌকা সংগ্রহ করা হইল—দেবী সরস্বতী এখানে অন্তরায় হইয়া জনার্দনের সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিলেন। কারণ, তাঁহার ইচ্ছা যে, তাঁহার অনুগৃহীত ছদ্মবেশী রাজপুত্রই এই কন্যাদিগকে বিবাহ করুক। তিনি এক কৌশল অবলম্বন করিলেন—তাহার ফলে জনার্দন নিজের গৃহে বন্দী হইয়া রহিল এবং ধূলাকুট্যাই তাঁহার স্থান গ্রহণ করিয়া নৌকায় আরোহণ করিল। সরস্বতী স্বয়ং নৌকার হাল ধরিয়া বসিলেন। রাজকন্যাগণ পূর্বেই আসিয়া নৌকায় আরোহণ করিয়াছিল—তাহারা দেবীর এই কৌশল তখন জানিতেও পারিল না। রাত্রি যখন ভোর হইয়া গেল, তখন তাহারা ধূলাকুট্যাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। ক্রমে তাহারা সকল ব্যাপার জানিতে পারিল এবং অগত্যা ধূলাকুট্যাকেই তাহাদের স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। নৌকা রাজা সুবাহুর রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিল। ইতিমধ্যে সুবাহুর রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে—তিনিও দারিদ্র্যের চরন সীমায় পৌঁছিয়াছেন। বিজয় দত্ত নামক এক বণিকের গৃহে ধূলাকুট্যা তাহার পত্নীগণসহ আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিল। দেবীর অনুগ্রহে সুবাহুর নিকট হইতে ধূলাকুট্যা প্রভূত পতিত জমি লাভ করিল এবং তাহাতে এক নগর পত্তন করিল। একদিন ধূলাকুট্যা তাহার গৃহে এক বিরাট ভোজের আয়োজন করিল, তাহাতে সে নিকটবর্তী সকল রাজ্যের রাজাকেই নিমন্ত্রণ করিল। সুবাহুও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন, কিন্তু তাঁহার দারিদ্র্যব্যঞ্জক পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহাকে যথোপযুক্ত সম্মান দেখান হইল না। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার কোটালকে আদেশ দিলেন, 'ইহাকে বন্দী করিয়া বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া ইহার শিরশ্ছেদ কর।' কোটাল ধূলাকুট্যাকে বধ্যভূমিতে লইয়া গেল, কিন্তু এইবারও পূর্বেকার মত তাহাকে মুক্তি দিল। রাজা এই কথা জানিতে পারিলেন, জানিবামাত্র তিনি কোটালের শিরশ্ছেদ করিবার আদেশ দিলেন। এইবার সরস্বতী স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া রাজার নিকট সকল কাহিনী বিস্তৃতভাবে ব্যক্ত করিলেন। কোটাল রাজপুত্রের জীবন-রক্ষা করিয়াছিল শুনিয়া তিনি তাহাকে মুক্তি দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। পিতাপুত্রের মিলন হইল—রাজকন্যাগণ রাজপুত্রের বধূরূপে সসম্মানে রাজান্তঃপুরে গৃহীত হইল।

সরস্বতী বৈদিক দেবী হইলেও উদ্ধৃত কাহিনীতে তাঁহার বৈদিক কিংবা পৌরাণিক চরিত্রের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। এখানে তাঁহার শুধু বৈদিক নামটিই গ্রহণ করা হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক শাক্তদেবীর মতই এখানে তাঁহার পরিকল্পনা করা হইয়াছে—নিজের পূজা প্রচার করিতে গিয়া মঙ্গলকাব্যের দেবতাগণ যেমন তাঁহাদিগের নির্বাচিত ভক্তকে অনুগ্রহ ও অন্যকে নিগ্রহ করিয়া থাকেন—এখানেও তাহারই পরিচয়

পাওয়া যায়। তথাপি কাহিনীটির মধ্যে লক্ষ্য করিবার মত কতকগুলি বিষয় আছে। সরস্বতী দেবী এখানে মূর্খকেই অনুগ্রহ করিতেছেন—বিদ্যার যাঁহারা গুরু, যেমন গৌরীদাস কিংবা জনার্দন, তাঁহাদিগের প্রতি তাঁর কোনও সহানুভূতি নাই, গৌরীদাস রাজপুত্রকে শিক্ষাদান করিতে ব্যর্থকাম হইল ও হতভাগ্য জনার্দন তাঁহারই চক্রান্তে তাহার নিষ্ফল প্রণয়-স্বপ্ন লইয়া নিজের গৃহে বন্দী জীবন কাটাইতে লাগিল। যদিও বিদ্যা ব্রাহ্মণেরই ব্যবসায় এবং এখানে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরই মাহাত্ম্য-কীর্তন করা হইয়াছে, তথাপি এখানেও কোন ব্রাহ্মণ চরিত্রই কোনও বিশেষ স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। তবে কোনও মঙ্গলকাব্যেই যেমন ব্রাহ্মণ চরিত্র কোনও উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করিতে পারে নাই, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এই কাহিনীটির মধ্য হইতে মধ্যযুগের বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কিত কতকগুলি মূল্যবান উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে। ইহার মধ্যে বিদ্যালাভের বিনিময়ে রাজকন্যাদিগের কুলবিসর্জন ও গুরু জনার্দনের পাপাভিলাস সম্পর্কে যে নির্ভীক ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহা সমসাময়িক বাংলার সামাজিক অবস্থারই প্রত্যক্ষচিত্র, না কবিকল্পনার ফল মাত্র, তাহা কে বলিবে?

এই কাহিনীটি কোথা হইতে আসিল? মনে হয়, বিষ্ণুশর্মা রচিত 'পঞ্চতন্ত্র' নামক পুস্তকের 'কথামুখ' অংশের নিম্নোদ্ধৃত সুপরিচিত সংস্কৃত শ্লোকটি হইতেই এই কাহিনীর প্রেরণা আসিয়াছে,—

অজাতমৃতমূর্খেভ্যো মৃতাজাতৌ সুতৌ বরম্।
যতস্তৌ স্বল্পদুঃখায় যাবজ্জীবং জড়ো দহেৎ।।
কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ভক্তিমান।
কিং তয়া ক্রিয়তে ধেন্বা যা ন সূতে ন দুগ্ধদা।।

মনে হয়, প্রধানত এই শ্লোকটিকেই ভিত্তি করিয়া মঙ্গলকাব্য রচনার গতানুগতিক রীতিতে দয়ারামের এই কাব্যখানি রচিত হইয়াছে। ইহার আর কোনও স্বাধীন ভিত্তি ছিল না। রচনাখানির বিশেষ কোনও কাব্যগুণ নাই, তবে ইহার মধ্যে যে সমাজচিত্রটির আভাস পাওয়া যায়, তাহা সুনিপুণ হস্তের রচনা কিন্তু এই সমাজ বাংলার প্রাচীন সমাজ বলিয়া মনে হয় না—তাহা খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের সমাজ হওয়াই সম্ভব।[১]

দয়ারাম দাস

সারদা-মঙ্গল বা 'সারদা-চরিত্রে'র কবি দয়ারামের সময় সম্পর্কে কিছুই জানিতে পারা যায় না। কাব্যমধ্যে তিনি নিজের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রপিতামহের নাম রামেন্দ্রজিৎ, পিতামহ পরীক্ষিৎ এবং পিতার নাম জগন্নাথ। কিশোরচক পরগণার কাশীযোড়ায় তাঁহার নিবাস ছিল। ইহা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। স্থানীয় জমিদারের অনুগ্রহে তিনি সেই গ্রামে বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানে বাসকালীনই তাঁহার কাব্য রচনা করেন। দয়ারামের পদবী ছিল দাস। তাঁহার ভাবা

১। কাব্যখানি ডক্টর শ্রীতমোনাশ দাশগুপ্ত কর্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া একটি সংক্ষিপ্ত ইংরেজি ভূমিকাসহ প্রকাশিত হইয়াছে (J. D. L. XXIII, pp. 1-30, XXIX, pp. 30-81

ও রচনাভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় তিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই বর্তমান ছিলেন। দয়ারামের কাব্যখানি ক্ষুদ্রাকৃতি; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার যে পুঁথি সংগৃহীত আছে, তাহা মাত্র কুড়িটি পাতায় সম্পূর্ণ—প্রতিটি পাতায় আটটি করিয়া মাত্র চরণ। ইহা পনরটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালায় বিভক্ত। ইহার রচনা পাঁচালীর লক্ষণাক্রান্ত, এবং প্রায় কাব্যগুণ-বিবর্জিত; 'সারদার পাঁচালী' নামই ইহার যথার্থ পরিচয়।

সারদা-মঙ্গল বা সরস্বতী-মঙ্গল কাব্যের আর একজন কবির নাম জানিতে পারা যায়, তিনি বীরেশ্বর।[১] এই কবির সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে ইহার কাহিনী দয়ারাম রচিত উল্লিখিত কাহিনী হইতে স্বতন্ত্র—সংস্কৃত সাহিত্যে সরস্বতীর বরপুত্র কালিদাস, বররুচি প্রভৃতির আখ্যায়িকা বর্ণনাই ইহার উদ্দেশ্য।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ময়মনসিংহ সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহ বাহাদুর কর্তৃক 'ভারতী-মঙ্গল' নামক একখানি কাব্য রচিত হয়।[২] সংস্কৃত কবি কালিদাস সম্পর্কিত একটি লৌকিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত—তিনি সরস্বতীকুণ্ডে স্নান করিয়া কিভাবে যে অপার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব লাভ করিলেন ইহাতে তাহাই বর্ণিত আছে—মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক লক্ষণ ইহাতে নাই। ইহার ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট।

উক্ত কয়েকখানি রচনা ব্যতীত মধ্যযুগের বাংলায় এই বিষয় অবলম্বন করিয়া আর কোনও কাব্য-রচনার কথা জানিতে পারা যায় না।

উনবিংশ শতাব্দীতে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী 'সারদা-মঙ্গল' নামক একখানি কাব্য রচনা করেন। কিন্তু ইহার নামটির মধ্যে প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা রক্ষা পাইলেও বিষয়বস্তু, এবং তাহার উপস্থাপনার মধ্যে মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যের কোনও বিশেষত্বই রক্ষা পায় নাই। ইহার মধ্যে কবির একান্ত আত্মগত মনোভাবেরই অভিব্যক্তি হইয়াছে। ইহাতে সারদা নামে যে দেবী আছেন, তিনি কবির মানস-সুন্দরী, তাঁহার সঙ্গে লৌকিক সারদা দেবীর কোনো সম্পর্ক নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে যে নবজাগরণ দেখা দিয়াছিল, তাহার মধ্যে পাশ্চাত্য রোমান্টিক কবিগণের প্রেরণাই সর্বতোমুখী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বিহারীলালও সেই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার 'সারদা-মঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি সারদাকে তিনি কতকটা সরস্বতীর গুণান্বিতা বলিয়াই অনুভব করিয়াছিলেন, সাধারণভাবে চণ্ডী বলিয়া মনে করেন নাই। তারপর 'সারদা-মঙ্গল' নামকরণের মধ্য দিয়াও উনবিংশ শতাব্দীতেও আমাদের সাহিত্যে যে মঙ্গলকাব্যের সংস্কার সম্পূর্ণ বিদূরিত হইয়া যায় নাই, তাহাই অনুভব করা যাইতেছে।

১। ব, ২৭১৬, সা-প-প ৪৮, ১৪৮

২। আরতি (ময়মনসিংহ) ৩, ১৮; সা-প-প ১২, ২৩১

রায়মঙ্গল

আদিম মানব-সমাজের সহিত পশু-জগতের যে সম্পর্ক ছিল, বর্তমান সমাজের সেই সম্পর্ক নাই।[১] প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ ও পশু নিত্য প্রতিবেশী ছিল এবং পরস্পর আত্মরক্ষার জন্য সমভাবে সচেষ্ট থাকিত। জাগতিক পরিবর্তনের নিয়মে মানুষ আত্মরক্ষায় দুর্বল হইয়া পড়িতেছে, অথচ অরণ্যবেষ্টিত বাসভূমি মধ্যে অবস্থান করিয়া পশু-জগতের সান্নিধ্য হইতেও অধিক দূরে সরিয়া আসিতে পারিতেছে না। অতএব নানা দৈব উপায়ে মানুষ হিংস্র পশুকুলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় সন্ধান করিতেছে। তাহারই ফলে সমাজের বিশেষ বিশেষ পশুর অধিষ্ঠাতা এক-একজন দেবতা কল্পনা করিয়া তাঁহার পূজা দ্বারা অত্যাচারী পশুদিগকে প্রসন্ন করিবার প্রয়াস দেখা দিয়াছে। এই ভাবেই মানবসমাজে পশুপূজার উৎপত্তি হইয়াছে। ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের পূজাও নিঃসন্দেহে পশুপূজার অন্তর্গত।

ভারতীয় প্রাগার্য সমাজে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ব্যাঘ্রের পূজা প্রচলিত ছিল। মহেঞ্জোদারোতে যে প্রাচীন শিবলিঙ্গ পাওয়া যায়, তাহার পার্শ্বেই ব্যাঘ্রের আকৃতি কতকগুলি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ভারতের প্রাচীন আর্যেতর সমাজের দেবতা শিব বাঘাম্বর বা কৃত্তিবাস এবং ব্যাঘ্রচর্মই তাঁহার আসন। সম্ভবত ব্যাঘ্রই প্রাচীনতম শিবের বাহন ছিল, তারপর সমাজে গো-পূজা আরম্ভ হইলে পর, তাঁহাকে বৃষভ-বাহন করিয়া তাঁহার পরিধেয় বসন ও আসনে ব্যাঘ্রচর্মটি রক্ষা করা হইয়াছে। শিব দেবতার সহিত এই একটি বিশেষ পশুর সংস্রব হইতে ইহাই মনে হয়, প্রাচীনতম সমাজের ব্যাঘ্রোপাসনা শৈব ধর্মের মধ্যে পরবর্তীকালে আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে। উত্তর ভারতের আর্য-সমাজের বহির্ভূত অংশে ব্যাঘ্রপূজা যে বিশেষ প্রচলন লাভ করিয়াছিল, তাহার আরও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাজপুতনায় 'বাঘেল রাজপুত' বলিয়া একটি সম্প্রদায় আছে। সম্ভবত তাহা প্রাচীনতম কোনও ব্যাঘ্রোপাসক সম্প্রদায়েরই বংশধর। মধ্যভারতেও ব্যাঘ্রোপাসক এক সম্প্রদায় আছে; তাহারা ব্যাঘ্রের পূজা করে এবং কখনও ব্যাঘ্র শিকার করে না। সাহেবরা যদি বাঘ ধরিবার জন্য কোনও ফাঁদ তৈয়ার করে, তাহা হইলে এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকগণ রাত্রিকালে সেই ফাঁদের নিকটে গিয়া অরণ্য মধ্যে বাঘের উদ্দেশ্যে বলিতে থাকে যে, এই ফাঁদ তাহারা নির্মাণ করে নাই, কিংবা তাহাদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াও নির্মিত হয় নাই; অতএব এইজন্য তাহাদিগের কোনও অপরাধ নাই। রাজপুতানার ভীলেরা নিজেদের ব্যাঘ্রবংশজ বলিয়া মনে করে। নেপালে 'বাঘযাত্রা' বলিয়া এক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাও এক প্রকার ব্যাঘ্রেরই পূজা, ব্যাঘ্রের মুখোশ পরিয়া পূজারীরা নৃত্য করিয়া থাকে। নেপালে বাঘের দেবতার নাম 'বাঘভৈরব'। উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর অঞ্চলে

১। Asutosh Bhattacharyya, 'The Tiger-cult and its Literature in Lower Bengal' *Man in India*. XXVII (1947), 44-56

বাঘেশ্বর নামে এক ব্যাঘ্র-দেবতা নিম্নশ্রেণীর সমাজকর্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। ছোটনাগপুরের সাঁওতালদিগের মধ্যেও ব্যাঘ্রের পূজা প্রচলিত আছে। বিহারের কিষাণেরাও কোনও কোনও স্থানে 'বনরাজা' বলিয়া এক ব্যাঘ্রদেবতার পূজা করিয়া থাকে। মধ্যপ্রদেশে হোসাঙ্গাবাদের কুর্কুজাতি 'বাঘদেও' বলিয়া এক বাঘের দেবতার পূজা করে, বেরারেও এই 'বাঘদেও'র পূজা প্রচলিত আছে। হোসাঙ্গাবাদের ব্যাঘ্রের পূজারীদিগকে ভোমকা বলে, তাহারা নিম্নশ্রেণীর লোক, গ্রামে বাঘ আসিয়া উপদ্রব করিলে এই ভোম্‌কারা গিয়া বাঘদেওর নিকট পূজা দেয়। দাক্ষিণাত্যের প্রায় সর্বত্র অনুরূপ ব্যাঘ্র-পূজার প্রচলন আছে। ত্রিচিনপল্লী জেলায় এক গ্রামে ব্যাঘ্র-মূর্তির উপর আসীন তিনুট পুরুষমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা প্রাচীন কোনও ব্যাঘ্র-দেবতা হইবেন। দাক্ষিণাত্যে বিশেষত কর্ণাট অঞ্চলে, এই প্রকার আরও ব্যাঘ্র-দেবতার সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়।[১]

উপরের উল্লেখ হইতেই জানা যায় যে, অরণ্যচারী জাতির মধ্যেই ব্যাঘ্র-পূজা সবিশেষ প্রচলিত আছে। পূর্বেই বলিয়াছি, পশুপূজার প্রবৃত্তি মূলত নিম্নশ্রেণীর সমাজ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে এবং ইহা উন্নত আর্য দেব-পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বিরোধী। বঙ্গদেশও বহুকালাবধিই অরণ্যাকীর্ণ, বিশেষত বঙ্গদেশের গৌরব সুন্দরবনের প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্র এই দেশের অতি আদিম অধিবাসী। সেইজন্য ব্যাঘ্র-পূজা বঙ্গদেশেও বহুকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। মধ্যভারতে সাধারণত কোনও কোনও স্থানে যে প্রণালীতে ব্যাঘ্র-পূজা অনুষ্ঠিত হয়, তাহার সঙ্গে বাংলায় অনুষ্ঠিত প্রাচীন ব্যাঘ্রপূজার বিশেষ কোনও সম্পর্ক নাই। ইহা হইতেই মনে হয়, এই পূজার বিশিষ্ট কোনও পদ্ধতি বাংলার বাহির হইতে এই দেশে আনীত হয় নাই। নাগরিক জীবনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্র-ভীতি এই দেশের সমাজে আর নাই বলিলেই চলে, বিশেষত বঙ্গদেশের বসতি ঘনসন্নিবিষ্ট; সুন্দরবনের অরণ্য ব্যতীত ঘন অরণ্যও এই দেশে বিশেষ নাই; সুন্দরবনও অনেকদিন হইতেই লোকালয়ে পূর্ণ হইতেছে; সেইজন্য ব্যাঘ্র পূজা এই দেশে বিশেষ প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে পারে নাই। নাগরিক জীবনের প্রসারের পূর্বে এই বিশিষ্ট পশু-পূজা সমাজে সম্ভবত প্রবর্তিত হইয়াছিল; কিন্তু এখন ইহার অনুষ্ঠানের কথা বিশেষ শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাঘ্রোপাসনার সঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত বহির্বাংলার ব্যাঘ্রোপাসনার পার্থক্য আছে। উল্লিখিত নিম্নজাতিসমূহের মধ্যে ব্যাঘ্রকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুলকেতু (totem) বলিয়া মনে করা হয়—তাহারা ব্যাঘ্রের কোনও অনিষ্ট করে না—ইহাদের কেহ কেহ নিজদিগকে ব্যাঘ্রের বংশধর বলিয়া মনে করে। কিন্তু

১। এই সম্পর্কিত বিস্তৃততর আলোচনার জন্য W. Crooke, II, 211-15, H. Whitehead, 98, Verrier Elwin, *The Agaria* (Bombay, 1948), 78 *Folk=Tales of Mahakoshal (Bombay, 1944)* 393, 416,424 *Tve Baiga* (London, 1939) 351; S. Hivali, *The Pradhans* (Bombay. 1946); *J. Anih* SB-III, 45-60. 158-68, JASB LXV (1896), 1-8, *J. ANTH* SB-IV (1895), 80-9, VIII (1907), 113-35 ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশে ব্যাঘ্রের সঙ্গে কাহারও সেই সম্পর্ক নাই। এদেশে সুবিধা পাইলে ব্যাঘ্র বধ করিতে বাধা নাই—কেবলমাত্র ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই এখানে ব্যাঘ্র-দেবতার পূজা করা হইয়া থাকে। সাপের ওঝার মত সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাঘ্রেরও ওঝা আছে, তাহারা মন্ত্রবলে ব্যাঘ্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে বলিয়া দাবী করে।

নিম্নবঙ্গে ব্যাঘ্রের অধিকারী দেবতা বলিয়া একটি দেবতাকে কল্পনা করা হইয়া থাকে, তাঁহার নাম দক্ষিণ রায়। বাংলার দক্ষিণ দিকের অধিকারী দেবতা বলিয়া তাঁহার নাম দক্ষিণ রাজ বা দক্ষিণ রায়। বাংলার দক্ষিণেই প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্রের বাসভূমি সুন্দরবন অবস্থিত; সেইজন্যই ইহার দেবতাকেও দক্ষিণ দিকের অধিকারী বলিয়াই কল্পনা করা হইয়া থাকে। কেহ কেহ অনুমান করেন, দক্ষিণ রায় সুন্দরবনের একজন প্রসিদ্ধ শিকারী ছিলেন, তিনি বহু ব্যাঘ্র ও কুম্ভীর ধনুর্বাণ শিকার করেন, তাঁহার চরিত্রটিই ক্রমে দেবত্বে পরিণত হয়। দক্ষিণ রায় নাকি যশোহর জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণনগরের রাজা মুকুট রায়ের সেনাপতি ছিলেন, তিনি নিম্নবঙ্গের শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়া তাঁহার উপাধি ছিল ভাটীশ্বর বা আঠার ভাটি অর্থাৎ বিভাগের অধীশ্বর।[১] অবশ্য এই সকল কাহিনীর মূলে কোনও ঐতিহাসিক সত্য নাই। দক্ষিণ রায়কে লইয়া যে দুই-একটি মঙ্গলকাব্য রচত হয়, তাহাই রায়মঙ্গল নামে পরিচিত। দক্ষিণ রায় বাংলার নিজস্ব লৌকিক দেবতা।[২] সংস্কৃত পুরাণাদিতে তাঁহার কোনও উল্লেখ নাই। বাংলার নিজস্ব লৌকিক দেবতাদিগের মধ্যে তিনি অন্যতম পুরুষ চরিত্র। অবশ্য উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বাঘের দেবতা সর্বত্রই পুরুষ। বাংলাদেশেও তাঁহার পরিকল্পনা উন্নত সৌন্দর্যজ্ঞানের পরিচায়ক। তিনি দিব্যকান্তিবিশিষ্ট, ব্যাঘ্রাসীন ও তাঁহার হস্তে ধনুঃশর। দেবতার এই সুন্দর পরিকল্পনা আদিম প্রস্তরোপাসক সমাজের দেব-কল্পনা হইতে অনেক মার্জিত; সেইজন্য মনে হয়, ইহার উদ্ভব অনেক পরবর্তী এবং পৌরাণিক প্রভাব-যুক্ত। কিন্তু সাধারণত তাঁহার কোনও পূর্ণাঙ্গ মূর্তির পরিবর্তে তাঁহার মৃন্ময় মুণ্ড মাত্র পূজিত হয়। মুণ্ডটিকে সাধারণত দক্ষিণদের দেবতা বলা হইয়া থাকে। স্থানীয় জনশ্রুতি এই—শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড উড়িয়া আসিয়া এই অঞ্চলে পতিত হয়। —ইহা সেই মুণ্ড এবং তদবধি ইহা ব্যাঘ্র-ভয় নিবারণ-কল্পে এই অঞ্চলে পূজিত হইতেছে।[৩] বলা বাহুল্য, এই লৌকিক দেবতাকে পৌরাণিক বৈশিষ্ট্য দিবার জন্যই পরবর্তীকালে এই কাহিনী পরিকল্পিত হইয়াছে। একটি

১। S. C. Mitra, 'On a Musalmani Legend', J. D. L., X. 167; *J. Anth S B XI* (1918), 438-54.

২। S. C. Mitra, 'The Cult of Dakshin Roy in Sokhern Bengal'. *Hindusthan Review*. Jan. 1923, 167-71.

৩। JASB XI (1915). pp. 175 ff

বিবরণী হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই অঞ্চলে সুবৃষ্টির জন্যও দক্ষিণ রায়ের পূজা করা হইয়া থাকে।[১]

দক্ষিণ রায় দেবতার মাহাত্ম-কীর্তন করিয়া যে কয়খানি মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২] তাহাতে কাহিনীটি এই প্রকার—

বড়দহে পুষ্পদত্ত নামে এক বণিক বাস করিতেন—তিনি রতাই বাউল্যা নামক এক ব্যক্তির উপর সমুদ্রগামী কয়খানি ডিঙ্গা নির্মাণ করিবার উপযুক্ত কাঠ সংগ্রহ করিবার ভার দিলেন। রতাই তাহার ছয় ভাই ও একমাত্র পুত্রকে লইয়া কাঠ সংগ্রহ করিতে সুন্দরবনের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রচুর কাঠ সংগৃহীত হইল, ছয়-সাতটি নৌকা একেবারে বোঝাই হইয়া গেল। যখন তাহারা ফিরিবার উপক্রম করিল, তখন একটি সুবৃহৎ বৃক্ষের দিকে তাহাদের দৃষ্টি পড়িল। গাছটি কাটিয়া মাটিতে ফেলা হইল। সেই গাছটিকে দক্ষিণ রায় বাস করিতেন,—তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার ছয়টি বিশ্বস্ত ব্যাঘ্রকে আদেশ দিলেন—'রতাইর ছয় ভাইকে বধ কর, রতাই ও তাহার পুত্রের কিছু করিও না।' তৎক্ষণাৎ আদেশ পালিত হইল। ভ্রাতৃশোকে রতাই প্রাণবিসর্জন সঙ্কল্প করিল। এমন সময় দক্ষিণ রায় দৈববাণী করিলেন—সে যদি নিজের পুত্রকে বলি দিয়া তাঁহার পূজা করিতে পারে, তবে ছয় ভাইয়ের জীবন ফিরিয়া পাইবে। রতাই তাহাই করিল। তাহার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া দক্ষিণ রায় তাহার ছয় ভাই ও পুত্রকে ফিরাইয়া দিলেন। সকলকে লইয়া রতাই বড়দেহে ফিরিল সুদক্ষ ডিঙ্গি-নির্মাতা দ্বারা পুষ্পদত্ত সাতটি সমুদ্রগামী ডিঙ্গা নির্মাণ করাইলেন। ডিঙ্গার পূজা করিয়া পুষ্পদত্ত সর্বোৎকৃষ্ট ডিঙ্গাটির নাম রাখিলেন, মধুকর। তারপর রাজার নিকট গিয়া সমুদ্র-যাত্রার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পুষ্পদত্তের পিতা সমুদ্র-বাণিজ্যে গিয়া বহুকাল যাবৎ নিরুদ্দিষ্ট, তাঁহার অনুসন্ধানের জন্যই পুষ্পদত্তের এই সমুদ্র-যাত্রা। রাজা প্রথমত আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাঁহার দৃঢ়তা দেখিয়া শেষ পর্যন্ত অনুমতি দিলেন। ডিঙ্গা সাজাইয়া পুষ্পদত্ত পিতার সন্ধানে বাহির হইলেন, মাতা সুশীলা চোখের জলে সন্তানকে বিদায় দিলেন। পুত্রকে বলিয়া দিলেন, বিপদে পড়িলে যেন সর্বদা দক্ষিণ রায়ের কথা স্মরণ করে। পুত্রকে বিদায় দিয়া তিনি দক্ষিণ রায়ের পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভক্তিতে সন্তুষ্ট

১। বর্তমানে আমার ছাত্র শ্রীমান তুষার চট্টোপাধ্যায় আমারই অধীনে আধুনিক নৃতত্ত্বসম্মত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাংলার লোকসংস্কৃতির গবেষণার বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হইতে অনুসন্ধানে দক্ষিণরায় সম্পর্কে নবতর তাৎপর্যের ইঙ্গিত দিয়েছে। উপযুক্ত তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে বিস্তৃত আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া ডঃ চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছে দক্ষিণ রায়-বাবাঠাকুর মৌলিক উৎস ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে আদিত উর্বরতা জাদু বিশ্বাস সঞ্জাত কর্তি নৃমুণ্ড পূজার অবশেষ এবং এবং মূলত কৃষিজাদু সহায়ক লৌকিক দেবতা। (Daksin Ray Cult--Proceeding of the Fifth-Sixth Indian Science Congress, Part III. Section VIII–Anthropology and Archaeology. p. 554-555.)

২। ক ১৭৯৮

হইয়া দক্ষিণ রায় তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, যে-কোনও বিপদ হইতে তিনি তাঁহার পুত্রকে রক্ষা করিবেন। বড়দহ পিছনে ফেলিয়া পুষ্পদত্ত ক্রমে কল্যাণপুর হোগ্‌লাপাথরঘাটা, বারাসত পার হইয়া খনিয়ায় আসিয়া পৌঁছিলেন। খনিয়ায় পুষ্পদত্ত দক্ষিণ রায়ের পূজা করিলেন। দক্ষিণ রায়ের থানের সম্মুখেই পীরের মোকাম দেখিতে পাইয়া কর্ণধারের নিকট ইহার উৎপত্তি ও ইতিহাস জানিতে চাহিলেন। একটি মৃত্তিকার বেদী ঘেরিয়া কয়েকজন ফকির বসিয়া ছিলেন—সেই মৃৎবেদীতে তাঁহারা পীরের উপাসনা করিতেছিলেন। সেখানেই দক্ষিণ রায়ের মৃন্মুণ্ডও স্থাপিত ছিল। কর্ণধার বলিল—একবার দক্ষিণ রায় ও বড় গাজী খাঁর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়—কেহই কাহাকেও পরাজিত করিতে পারেন না। তাঁহাদের যুদ্ধের ফলে পৃথিবী রসাতলে যাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ভগবান পৃথিবী রক্ষা করিবার জন্য অর্ধেক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্ধেক পয়গম্বর মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া দিলেন। সন্ধির সর্ত অনুসারে স্থির হইল যে, সমস্ত ভাটি অঞ্চল দক্ষিণ রায়ের অধিকারে থাকিবে, কালুরায় হিজলীর অধীশ্বর থাকিবে, বড় গাজী খাঁ সর্বত্র সম্মান লাভ করিবেন—বড় গাজী খাঁর সমাধি ও দক্ষিণ রায়ের মুণ্ড সর্বত্র পূজিত হইবে। তখন হইতেই বড় গাজী খাঁকে সমাধির প্রতীক মৃত্তিকা বেদী এবং দক্ষিণ রায়ের মুণ্ডের প্রতীক একটি মৃন্মুণ্ড একত্রে পূজিত হইতেছে। এই কাহিনী শুনিয়া পুষ্পদত্ত সেখানে বড় গাজী ও দক্ষিণ রায়ের পূজা করিলেন। তারপর পুনরায় যাত্রা করিলেন। ছত্রভোগ পার হইয়া মগরা অতিক্রম করিয়া গেলেন, তারপর গঙ্গাসাগরে প্রবেশ করিলেন। মার্তণ্ড রাজার রাজ্য অতিক্রম করিয়া উড়িষ্যার উপকূলে গিয়া পৌঁছিলেন, এইভাবে রামেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামেশ্বর হইতে তাঁহারা শ্রীহদ্যাদহ, কাঁকড়াদহ এবং জোকাদহ অতিক্রম করিয়া গেলেন। এইবার তাঁহারা সমুদ্র-মধ্যবর্তী রাজদহে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে পুষ্পদত্ত এক অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে পাইলেন—যেন সমুদ্রবক্ষে এক বিচিত্র নগরী জলের উপর ভাসিতেছে। দৃশ্য দেখিয়া পুষ্পদত্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলেন। পুষ্পদত্ত তাঁহার সঙ্গীদিগকেও এই দৃশ্য দেখিতে বলিলেন; তাহারা বলিল, তাহারা সম্মুখে জল ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছে না—ইহাতে পুষ্পদত্তের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। অবশেষে পুষ্পদত্ত গিয়া তুরঙ্গ নগরে উপস্থিত হইলেন, সাত ডিঙ্গা লইয়া তীরে ভিড়াইলেন। সংবাদ শুনিয়া রাজা কোটালকে আগন্তুকের সংবাদ জানিবার জন্য পাঠাইলেন। উপযুক্ত ভেট লইয়া পুষ্পদত্ত রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন,—পথের দুই ধারে রাজধানীর ঐশ্বর্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি রাজা সুরথের সম্মুখে নীত হইলেন। পুষ্পদত্তের অল্প বয়স দেখিয়া রাজা সুরথ তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পুষ্পদত্ত বলিলেন, আমার পিতা দেবদত্ত বহুকাল নিরুদ্দিষ্ট, তাঁহার সন্ধানের জন্য আমি আসিয়াছি। রাজা তাঁহার পিতৃভক্তির প্রশংসা করিলেন, তারপর কিভাবে এতদূর আসিয়া পৌঁছিলেন, সেই বৃত্তান্ত শুনিতে চাহিলেন। তাহা বর্ণনা-প্রসঙ্গে পুষ্পদত্ত সমুদ্র-বক্ষস্থিত পুরীর কথাও উল্লেখ করিলেন। রাজা সুরথ

তাহা বিশ্বাস করিলেন না, বরং মিথ্যা কথা বলিবার জন্য পুষ্পদত্তকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। পুষ্পদত্ত বলিলেন, 'আমার সঙ্গে আপনি চলুন, যদি আমি ইহা আপনাকে দেখাইতে না পারি, তবে আমার শিরশ্ছেদ করিবেন।' রাজা বলিলেন, 'বেশ, আর যদি তুমি ইহা আমাকে দেখাইতে পার, তবে তোমাকে আমার অর্ধেক রাজ্য ও আমার কন্যা দান করিব।' পুষ্পদত্ত রাজা সুরথকে লইয়া রাজদহে গেলেন, কিন্তু মায়াপুরী দেখাইতে পারিলেন না। তিনি কারাগারে বন্দী হইলেন, পরদিন তাঁহার শিরশ্ছেদের আদেশ হইল। কারারুদ্ধ পুষ্পদত্ত দক্ষিণ রায়ের স্তব করিতে লাগিলেন। প্রসন্ন হইয়া দক্ষিণ রায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে অভয় দিলেন। পরদিন পুষ্পদত্তকে যখন শিরশ্ছেদের জন্য মশানে লইয়া যাওয়া হইল, তখন সহসা চারিদিক হইতে ব্যাঘ্র আসিয়া রাজপ্রহরীদিগকে আক্রমণ করিল—ক্রমে তুরঙ্গ শহরে ব্যাঘ্রের আক্রমণ ছড়াইয়া পড়িল—নগরের লোক প্রাণ লইয়া চারিদিকে ছুটিতে লাগিল, কেহবা প্রাণ হারাইতে লাগিল। ব্যাঘ্রের আক্রমণে কোটালের দুর্গতির একশেষ হইল। রথে আরোহণ করিয়া দক্ষিণ রায় স্বয়ং যুদ্ধে অবিভূত হইয়া পুষ্পদত্তকে রক্ষা করিলেন, অবশেষে রাজা সুরথ স্বয়ং অগ্রসর হইলেন, দক্ষিণ রায় স্বয়ং তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে নিহত করিলেন। যখন রাজান্তঃপুরে এই সংবাদ পঁহুছিল, তখন রাণী বিলাপ করিতে করিতে সহচরীদিগের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দক্ষিণ রায় রথে চড়িয়া শূন্যে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, 'আমার ভক্তকে অন্যায়' ভাবে নির্যাতন করিবার জন্য তোমার স্বামীর প্রাণবধ করিয়াছি। বিলাপ করিয়া এখন আর কিছু ফল নাই; প্রতিজ্ঞা কর যে তোমার কন্যাকে পুষ্পদত্তের হাতে সমর্পণ করিবে ও প্রতিমা গড়িয়া আমার পূজার ব্যবস্থা করিবে, তাহা হইলে তোমার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়া পাবে।' রাণী তাহাতেই সম্মত হইলেন। তখনই অমৃতকুণ্ড হইতে জলসিঞ্চন করিয়া দক্ষিণ রায় সুরথ রাজা ও তাঁহার মৃত সৈন্যদিগকে বাঁচাইয়া দিলেন। রাজা ও রাণী পরম আনন্দের সঙ্গে রাজকন্যা রত্নাবতীকে পুষ্পদত্তের হস্তে সমর্পণ করিলেন। দক্ষিণ রায় পুষ্পদত্তকে বলিলেন, 'তোমার পিতাও সুরথ রাজাকে সমুদ্রের মধ্যে মায়াপুরী দেখাইতে না পারিয়া রাজকারাগারে বন্দিজীবন যাপন করিতেছেন। এইবার তাঁহার মুক্তির উপায় কর।'[১] পুষ্পদত্ত রাজাকে বলিয়া পিতার মুক্তিসাধন করিলেন। পিতাপুত্রে মিলন হইল। ডিঙ্গা সাজাইয়া পুত্র ও পুত্রবধু লইয়া দেবদত্ত স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। মাতা সুশীলা পরম আহ্লাদের সঙ্গে তাঁহাদিগকে বরণ করিয়া লইলেন। দক্ষিণ রায়ের পূজা সর্বত্র প্রচার লাভ করিল।

দেখা যাইতেছে যে, দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে বড় গাজী খাঁর যুদ্ধ-বৃত্তান্তই এই কাহিনীর মৌলিক অংশ—এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অংশ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী হইতে অবিকল গ্রহণ করা হইয়াছে। মনে হয়, দক্ষিণ রায় ও বড় গাজী খাঁর যুদ্ধ-বৃত্তান্তের একটি ঐতিহাসিক

১। কালিদাস দত্ত, 'রায়মঙ্গল কাব্যে রাজা মদন রায়', সংস্কৃতি (১৩৭১), শারদীয় সংকলন, পৃঃ ১-১১

ভিত্তি আছে। সম্ভবত সুন্দরবন অঞ্চলের অধিকার লইয়া ইহাদের মধ্যে কোনও বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল—পরে বিরোধের একটা আপোষ মীমাংসা হইয়াছিল। ইহাতে মদন রায় নামক এক রাজার উল্লেখ আছে, তিনিও ঐতিহাসিক ব্যক্তি। অনুমান করা হয় যে, 'তিনি ঢাকার নবাব নাজিম শায়েস্তা খাঁর সমসাময়িক ছিলেন এবং তখন তাঁহার উপর পেঁচাকুল ও মদনমল দুইটি পরগণার শাসনভার ন্যস্ত ছিল।' এই পরগণা দুইটি ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত।

এই কাহিনী লইয়া মুসলমান সমাজেও কোনও কোনও মুসলমান কবি কর্তৃক কাব্য রচিত হয়। ব্যাঘ্রের উপদ্রব হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সমান ভয়াবহ, সেইজন্য উভয় সম্প্রদায় একই উপায়ে এই উপদ্রবের হাত হইতে নিষ্কৃতলাভের উপায় সন্ধান করিয়াছে। নিম্নবঙ্গের, বিশেষত, চব্বিশ পরগণা জেলার, মুসলমান সমাজে প্রায় রায়মঙ্গলের অনুরূপ এক কাহিনী প্রচলিত আছে। সম্ভবত উভয়ের মূল এক। মুন্সী বয়.নদ্দীন সাহেব রচিত 'বনবিবি জহুরানামা' নামক[১] একখানী কাব্যে হিন্দু সমাজের কল্পিত দক্ষিণ রায় ও মুসলমান সমাজের কল্পিত বনবিবির একটি মিশ্র কাহিনী পাওয়া যায়। ইহাই রায়মঙ্গলের কাহিনীর মুসলমান সংস্করণ। ইহার মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর কোনও প্রভাব নাই। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই,—

কলিঙ্গ নগরে এক সদাগর বাস করিত। একবার সে সুন্দরবনে মধু ও মোম সংগ্রহ করিবার জন্য নৌকা লইয়া যাত্রা করিল, সঙ্গে করিয়া তাহার ভ্রাতুস্পুত্রটিকেও লইল, তাহার নাম দুখে। দুখে তাহার দরিদ্রা বিধবা মাতার একমাত্র সন্তান। একমাত্র পুত্রকে গভীর অরণ্যে পাঠাইয়া দুখের মাতা কাঁদিয়া বনবিবিকে ডাকিল,—

কাঙ্গালের মাতা তুমি বিপদনাশিনী।
আমার দুখেরে মাগো তরাও আপনী।।

দলবল সহ সদাগর গিয়া গভীর বনে প্রবেশ করিল। দক্ষিণ রায়ের পূজা করিয়া সদাগর নৌকা হইতে অবতরণ করিল, দুখে নৌকার মধ্যেই রহিল, সদাগর ও তাহার লোকজন মধু আহরণের জন্য বনের অভ্যন্তরে চলিয়া গেল। সমস্ত দিন অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিয়া এক বিন্দুও মধু পাইল না, দক্ষিণ রায় ছলনা করিয়া বনের সমস্ত মধু গোপন করিয়া ফেলিলেন। অসীম নৈরাশ্যে সদাগর সন্ধ্যায় নৌকায় ফিরিয়া আসিল, অবসন্ন দেহে অল্পকাল মধ্যেই নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। দক্ষিণ রায় স্বপ্নে আবির্ভূত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সদাগর দুরবস্থার কথা জানাইল। দক্ষিণ রায় বলিলেন, 'তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব, কিন্তু তৎপূর্বে দুখেকে আমার নিকট বলি দিতে হইবে।' সদাগর প্রথমে ইহাতে অস্বীকৃত হইল, কিন্তু পরে মনে মনে তাহাকে দক্ষিণ রায়ের পায়ে বলি দিবে বলিয়া স্থির করিল। দক্ষিণ

১। পুঁথিখানি সর্বপ্রথম ১২৮৪ সালে মুদ্রিত হইয়া ৩৩৭৯২ আপার চিৎপুর রোড, আফাজদ্দীন আহমদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

রায় প্রসন্ন হইয়া তাহার নৌকা বোঝাই করিয়া মোম ও মধু দিয়া দিলেন। দেশে রওয়ানা হইবার সময় সদাগর দুখেকে ঠেলিয়া নৌকা হইতে জলে ফেলিয়া দিয়া গেল। দুখে কোনমতে নদীর তীরে আসিল, অমনি দক্ষিণ রায় ব্যাঘ্রের রূপ ধরিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন। দুখে চক্ষু মুদিয়া বনবিবিকে স্মরণ করিল, বনবিবি আসিয়া তাহাকে কোলে লইলেন, ব্যাঘ্ররূপী দক্ষিণ রায় পলাইয়া গেলেন। বনবিবির আদেশে তাহার ভ্রাতা জঙ্গলী দক্ষিণ বায়কে বন হইতে তাড়াইয়া দিতে গেল। দক্ষিণ রায় তাড়িত হইয়া জেন্দা গাজীর (বা বড় গাজী খাঁ) শরণাপন্ন হইলেন। জেন্দা গাজী তাঁহাকে অভয় দিলেন। বনবিবি দক্ষিণ রায়কে ক্ষমা করিলেন।

এই কাহিনীতে যেমন দক্ষিণ রায়ের উপর বনবিবিরই মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, রায়মঙ্গলের পরিণামে দক্ষিণ রায়েরই প্রতিষ্ঠা নির্দেশ করা হইয়াছে।

রায়মঙ্গলের কবিগণ

মাধব আচার্য

রায়মঙ্গলের কাব্যের একজন পরবর্তী কবি কৃষ্ণরাম এই কাব্যের আদি কবি বলিয়া মাধব আচার্যের নাম উল্লেক করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায় মাধব আচার্যের রচিত কাব্যে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহার পরবর্তী আর একজন কবিকে তাহা রচনা করিবার জন্য স্বপ্নাদেশ করিয়াছেন,—

পূর্বেতে করিল গীত মাধব আচার্য।
না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য।।

এই মাধব আচার্য যে কে, তাহা জানিতে পারা যায় না। তাঁহার রচিত রায়মঙ্গলের পুঁথিও পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণরাম দাস

ইহার পর কবি কৃষ্ণরাম তাঁহার 'রায়মঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।'[১] মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক নিয়মানুসারে কবি কৃষ্ণরামও তাঁহার গ্রন্থোৎপত্তির একটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—

শুনহ সকল ধীর অপূর্ব কথন।
যেমতে ঘটিল এই কবিতা বচন।।
খাসপুর পরগণা নামে মনোহর।
বড়িস্যা তাহার এক তপ বির্শাম্বর।।

১। ক ১৭৯৮

তথায় গেলাম ভাদ্র মাস সোমবারে।
নিশিতে শুইলাম গোয়ালার গোল ঘরে।।
রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাপঠে আরোহণ এক মহাজন।।
করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায়।
পরিচয় দিলা মোরে দক্ষিণের রায়।।
পাঁচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার।
আঠার ভাটীর মধ্যে হইবে প্রচার।।
পূর্বেতে করিল গীত মাধব আচার্য।
না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য।।
মশান নাহিক তাহে সাধু খেলে পাশা।
চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা।।
মোর গীত না জানিয়া যতেক গায়ন।
অন্য গীত করাইয়া গায় জাগরণ।।
কাকুটি নাকুটি করে আর রঙ্গি ভঙ্গি।
পরম কৌতুকে শুনে মউল্যা মলঙ্গি।।[১]

দক্ষিণ রায় কবিকে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত করিবার জন্য আর একটু বিশেষ ক্ষমতা তাঁহার হাতে দিয়া গেলেন, তাহা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় একটু অভিনব। তিনি বলিয়া দিলেন,

তোমার কবিতা যার মনে নাই লাগে।
সবংশে তাহারে তবে সংহারিবে বাঘে।।[২]

যে তাঁহার কাব্য অনাদর করিবে, তাহাকে বাঘ দিয়া ধরিয়া খাওয়াইবার ক্ষমতা তিনি কবির হাতে দিয়া দিলেন। তথাপি কবি নিজেকে 'শিশু' বলিয়া গীত-রচনায় অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। দেবতা তখন নিজের মাহাত্ম্য-কীর্তন করিয়া কবিকে শুনাইলেন, ইহাতেই—

রায়ের চরণ-চারু অরবিন্দ ভাবি।
রচিল পাঁচালী ছন্দ কৃষ্ণরাম কবি।।

কবি তাঁহার কাব্যরচনার কাল-সম্বন্ধেও গ্রন্থমধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন,—

কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙ্গল।
বসু শূন্য ঋতুচন্দ্র শকের বৎসর।।[৩]

১। ঐ ১খ; ২। ঐ
৩। ঐ ২ক, পুঁথিতে 'চন্দ্র' স্থানে 'চয়' পাঠ

ইহা হইতেই দেখা যায় যে, ১৬০৮ শক বা ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গল' কাব্য রচিত হয়। কবির আত্মপরিচয় সম্বন্ধে গ্রন্থ-মধ্যে উল্লেখ আছে,—

নিমিতে গ্রামেতে বাস নাম ভগবতী দাস
কায়স্থ কুলেতে উৎপত্তি।
হইয়া যে একচিত, রচিয়া রায়ের গীত
কৃষ্ণরাম তাহার সন্ততি।।[১]

কবির বাসস্থান নিমিতা। অতএব এই কৃষ্ণরাম ও কালিকা-মঙ্গলের কবি কৃষ্ণরাম অভিন্ন ব্যক্তি। নিমিতা গ্রাম সম্বন্ধে স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় লিখিয়াছেন,— 'কলিকাতা হইতে চারি ক্রোশের মধ্যে, বেলঘরিয়া স্টেশনের অর্ধক্রোশ পূর্বে, নিমিতায় কৃষ্ণরামের বাড়ি। তিনি যখন জীবিত ছিলেন, তখন কবি বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। কারণ, এখনও নিমিতা গ্রামে দুই-একজন লোক কবি কৃষ্ণরামের নাম করে, এবং তাঁহার ভিটা দেখাইয়া দেয়। সে ভিটায় একশত বৎসরেরও অধিককাল কেহ বাস করে না, অথচ প্রাচীন লোকেরা বিশ্বাস করিয়া থাকেন—উহা কৃষ্ণরামের ভিটা, কৃষ্ণরামের বংশ নাই, কিন্তু তিনি নিজে নিঃসন্তান ছিলেন কিনা, কেহ বলিতে পারে না'।[২]

কৃষ্ণরাম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। 'কালিকা-মঙ্গল' রচনাতেও তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে। কোনও কোনও স্থানে সংস্কৃত শ্লোকের বাংলা পদ্যানুবাদে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন,— যেমন,—

যদি করি পরিণয়, বহু পুত্র-কন্যা হয়
সহোদর ভাই নাহি মিলে।

ইহার সঙ্গে মূল সংস্কৃত শ্লোকটি তুলনা করা যাইতে পারে—

দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ।।

কিন্তু তিনি পণ্ডিত হইলেও তাঁহার রচনা সরল, তাঁহার 'কালিকা-মঙ্গলে'র আলোচনায়ও তাহা উল্লেখ করিয়াছি। 'রায়মঙ্গল' কালিকা-মঙ্গলের পরবর্তী রচনা, ইহার রচনাতেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণরামের মধ্যে একটি বলিষ্ঠ রচনা-ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। রচনায় একটু নিদর্শন উল্লেখ করা যাইতেছে। কাব্যের শেষে সদাগর কর্তৃক দক্ষিণ রায়ের এই স্তব বর্ণিত আছে,—

স্তব করে সদাগর হইয়া কাতর।
ভকত বৎসল তুমি গুণের সাগর।।

১। ঐ তথ্য

২। সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩০০, ১১২-১৩।

অপরাধ ক্ষমা কর বলি যোড় পাণি।
কৃপার সাগর প্রভু রায় গুণমণি।।
ইন্দু হেন বদন মদন জিনি রূপ।
তোমা বিনা দক্ষিণের কেবা আছে ভূপ।।

'রায়মঙ্গল' কাব্যখানি নাতিবৃহৎ। রায়মঙ্গল এবং কালিকা-মঙ্গল ব্যতীত কৃষ্ণরাম 'হরপার্বতী-মঙ্গল', 'গাজীসাহেবের গান' ও 'মদন পালা' নামক গীতকাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। ২৪ পরগণা জেলার ধপধপি গ্রামে এখনও দক্ষিণ রায়ের বার্ষিক পূজা উপলক্ষে যে দক্ষিণ রায়ের যাত হয়, তাহাতে কৃষ্ণরাম রচিত 'মদন পালা' গীত হয়।

কৃষ্ণরামের পর দ্বিজ হরিদেব ও বলরাম নামক দুইজন কবি একসঙ্গে একখানি রায়-মঙ্গল কাব্য লিখিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।[১] হরিদেবের হস্তলিখিত যে পুঁথিখানি পাওয়া যায়, তাহার লিপি-সমাপ্তির তারিখ ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দ। বলরাম তাঁহার সমসামজিক ছিলেন, তিনি হরিদেবেরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন এবং হরিদেবের কাব্যেরই তিনি কোনও কোনও পদ রচনা করিয়াছিলেন। রায়মঙ্গলের দেবতা লৌকিক দেবতা মাত্র। নিম্নবঙ্গেই ব্যাঘ্রের অত্যাচার অধিক বলিয়া সেইখানেই এই কাব্য ও দেবতার পরিকল্পনা উদ্ভূত হইয়াছিল, অন্যত্র ইহার প্রসার সম্ভব হয় নাই। উত্তরবঙ্গে পরিকল্পিত ব্যঘ্র-দেবতার নাম সোনা রায়।[২] সম্প্রতি তাঁহার সম্পর্কিত একটি আখ্যায়িক-কাব্য মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।[৩] তাঁহার নামে উত্তরবঙ্গে বহু ছড়া প্রচলিত আছে—সুসংবদ্ধ কাহিনীযুক্ত রচনা বিশেষ নাই। মুসলমান কৃষকগণ সোনা রায়কে পীর বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। রাজসাহী জেলায় পৌষ-সংক্রান্তির দিন বাস্তু-পূজা উপলক্ষ্যে একটি ব্যাঘ্রের মৃন্মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করা হয়। কিন্তু তাঁহার যে প্রকৃত কি নাম, তাহা জানিতে পারা যায় না। তাঁহার সম্বন্ধে কোনও সুসংবদ্ধ কাহিনীও প্রচলিত নাই। পূর্ববঙ্গে 'বাঘাইর বয়াৎ' নামক ছড়াজাতীয় ব্যাঘ্রবিষয়ক কিছু কিছু রচনার সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়—কিন্তু এই বিষয়ক সুসংবদ্ধ কাহিনীযুক্ত আর কোনও রচনার সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায় না। প্রাচীন হিন্দু পুরাণ কিংবা হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্কর্যে ব্যাঘ্রবাহন কোনও দেবতার সন্ধান পাওয়া যায় না। অতএব একান্তভাবে এই কাব্য ও দেবতা বাংলার বিশেষ একটি অঞ্চলের নিজস্ব কল্পনা-প্রসূত। নিম্নবঙ্গের মুসলমান সমাজকে আশ্রয় করিয়া বড়গাজী খাঁ, কালু গাজী খাঁ, বনবিবি প্রভৃতির মত হিন্দুসমাজে দক্ষিণ রায় আজিও বাঁচিয়া আছেন। হিন্দুসমাজে বড়গাজী খাঁ ও কালু গাজী খাঁর যেমন প্রতিপত্তি, তদ্দেশীয় মুসলমান সমাজে দক্ষিণ রায়েরও তেমনই প্রতিপত্তি রহিয়াছে। সমগ্র চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুরের দক্ষিণভাগে বড়গাজী কালু

১। পু-প ২২০
২। JDL. VIII (1922), 141072, 141072, *J Anth S B* XIII (1925), 265-76
৩। অজয় কুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত 'সোনা রায়ের গীত' (ধুবড়ী, ১৩৫৪)

গাজী ও দক্ষিণ রায় বাঘের দেবতা বলিয়া হিন্দু ও মুসলমান সমাজে সমভাবে শ্রদ্ধা পাইয়া আসিতেছেন। সেইজন্য এই দেবতার সম্পর্কিত লোক-সাহিত্য এই উভয় সমাজেরই উপাদানে গঠিত হইয়াছে।

দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে আর একজন অলৌকিক ব্যাঘ্র-দেবতার নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি কালু রায়। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গেই তাঁহার পূজা প্রচলিত আছে। তাঁহার সম্পর্কিত লোক-সাহিত্য সাধারণত 'কালু রায়ের গীত' নামে পরিচিত; ইহা মঙ্গলকাব্যের মর্যাদায় উন্নীত হইতে পারে নাই; সংক্ষিপ্ত পাঁচালীর আকারেই সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। ইহাদের মধ্যে 'শীতলা-মঙ্গল' রচয়িতা শ্রীবল্লভ এবং দ্বিজ নিত্যানন্দের 'কালু রায়ের গীত' উল্লেখযোগ্য।[১] দুইখানি রচনাই নিতান্ত সংক্ষিপ্ত এবং অকিঞ্চিৎকর। ইহাদের কাহারও কোনও সাহিত্যিক মূল্য নাই। মঙ্গলকাব্য কথাটিকে যাঁহারা নিতান্ত শিথিল ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ইহাদিগকেও 'কালু রায়মঙ্গল' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের এ দাবী নিতান্তই অর্থহীন।

রুদ্রদেব

ব্যাঘ্র-অধিদেবতা দক্ষিণ রায়ের মাহাত্ম্যসূচক 'রায়মঙ্গল' কাব্যরচয়িতাদিগের মধ্যে কবি রুদ্রদেবের নাম উল্লেখযোগ্য। রুদ্রদেবের কাব্যের তিনটি পালা— (১) রায়-গাজি-যুদ্ধ, (২) রতা বাউলিয়া এবং (৩) পুষ্পদত্ত বণিক পালা। প্রাপ্ত পুঁথিটি খণ্ডিত থাকায় তিনটি পালাই অবশ্য অসম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে।

কাহিনী :— ১ম পালায় দেখি, দক্ষিণ রায় এবং বড়গাজী পরস্পর যুদ্ধের সম্মুখীন। রায়ের আদেশে বিচিত্র-আকৃতি এবং বিচিত্র-শক্তিধর চৌষট্টি ব্যাঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইল এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। বলা বাহুল্য, বড়গাজীর দলেও রণোপযোগী অস্ত্র ও আভরণের অভাব ছিল না। দুই দলে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বড়গাজীর পক্ষের পীরফকিরেরা প্রথমে রায়-পক্ষীয় ব্যাঘ্রদের এবং পরে তাঁহার পঞ্চপাত্রকে বাণে বিপর্যস্ত করিল। মহাক্রোধে দক্ষিণ রায় মৃত্যুকীট ছাড়িয়া দিলেন। বিপন্ন বড়গাজী তখন অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিলেন। রায়ের বরুণবাণ তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিল। এইভাবে ক্রমাগত শর-বিনিময়ের ফলে রণক্ষেত্র ঘোর আকার ধারণ করিল। তাহার উপর আবার শিবের আদেশে তাঁহার অনুচরগণ রায়ের দলের সহায়ক হইল। প্রচণ্ড বাণবর্ষণে অকালে প্রলয় উপস্থিত দেখিয়া শঙ্কিত দেবতাগণ ইহার বিহিত করিবার জন্য নারদকে পাঠাইলেন। নারদের মধ্যস্থতায় উভয়পক্ষে সন্ধির সম্ভাবনা দেখা গেল।

দ্বিতীয় পালার কাহিনীটি এই—রতাই বাউলিয়া কাঠ সংগ্রহ করিবার জন্য বনে চলিয়াছে। সঙ্গে একমাত্র পুত্র বুলচন্দ্র তাহার সঙ্গ ধরিল। বনে আসিয়া অনেক খুঁজিয়াও

১। সা-প-প ৬২, ৮১-৮৯, ঐ ৬৩, ১৭-২৪—ইহাদের মধ্যে দুইটি গীতই আনুপূর্বিক প্রকাশিত হইয়াছে।

রতাই মনোমত কাঠ পাইল না। তখন দক্ষিণ রায় তাহাকে স্বপ্নাদেশ দিলেন, সমাঙ্গ রুধিরে পূজা করিলে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। রতাই স্বীকৃত হইল। কিন্তু পূজার সময় রুধিরের আয়োজন না দেখিয়া রায় মহাক্রুদ্ধ হইলেন। ভীত রতাই ভাবিল—'আপনি কাটিয়া দিব আপনার মাথা।' কিন্তু দক্ষিণ রায় তাহাকে পুত্র বলিদানের আদেশ দিলেন। রতাইয়ের পিতৃহৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল, তথাপি রায় অবিচল। তিনি হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্র-বলিদানের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া রতাইকে প্রতিজ্ঞা-পালনে প্রবৃত্ত করিলেন। বাধ্য হইয়া রতাই পুত্রকে সব কথা খুলিয়া বলিল। পুত্র সানন্দে সম্মত হইয়া পিতাকে প্রবোধ দিল—

দেবতা তুষ্ট যাতে বেজ না করিহ তাথে,
সুখ মোক্ষ হবে পরলোকে।

অগত্যা রতাই কাতর হৃদয়ে পুত্রবলির জন্য প্রস্তুত হইল।

দ্বিতীয় পালাটি এইখানে খণ্ডিত হইয়াছে।

তৃতীয় পালার সূচনা বণিক পুষ্পদত্তের সাগরযাত্রার বর্ণনায়। সমস্ত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে মাতার আশীর্বাদ লইয়া পুষ্পদত্ত মধুকর ডিঙায় উঠিলেন। বড়দহ পিছনে ফেলিয়া ক্রমে কল্যাণপুর, বারিপুর, বরিজহাটি প্রভৃতি পার হইয়া তাহার ডিঙা গঙ্গাসাগরে প্রবেশ করিল। সেখানে পীরের মোকাম দেখিয়া পুষ্পদত্ত ভক্তিভরে প্রণাম জানাইলেন। দক্ষিণ রায়ের নাম স্মরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত তিনি উড়িষ্যার উপকূলে উপনীত হইলেন। পুষ্পদত্তের সাজসজ্জা, আড়ম্বর এবং দামামা ও কামানের শব্দ শুনিয়া নগরের কোটাল অবিলম্বে সৈন্য লইয়া ঘাটে উপস্থিত হইল। কোটালের তর্জন-গর্জনে অস্থির হইয়া পুষ্পদত্ত যখন ফিরিবার উপক্রম করিয়াছেন, তখন কোটাল স্বাগত ভাষণে তাঁহাকে রাজার আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ জানাইল। নদীর ঘাটে নবীন সদাগরকে দেখিয়া নগরের রমণীগণের আর রঙ্গ-তামাসার অন্ত নাই। এমনকি একজন বুড়ী তাহার রূপসী নাতিনীর কথা শুনাইয়া সদাগরকে প্রলুব্ধ করিতেও চেষ্টা করিল। বণিক-তনয় বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া তাহার কথায় সম্মতি দিলেন। ব্যাপার দেখিয়া কর্ণধার বুঝিল, এ বড় সহজ স্থান নয়। পুষ্পদত্তকে সে বারবার সাবধান করিয়া দিল। সদাগর তখন নদীতীর ছাড়িয়া নানা উপহার সমেত নৃপতি-সন্দর্শনে চলিলেন।

ইহার পর কাহিনী খণ্ডিত হইয়াছে। পুঁথির স্থানে স্থানে এইরূপ খণ্ডনের ফলে সমগ্র কাহিনীটি যেমন পাওয়া যায় না, তেমনি বিভিন্ন পালার মধ্যে যোগসূত্রটি খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

রায়মঙ্গল সম্পর্কে পূর্বে যে-কাহিনী পাওয়া গিয়াছে, তাহার সহিত রুদ্রদেবের কাহিনীর মূল কাঠামোর কোনও প্রভেদ নাই। তবে ঘটনাগুলিকে কবি অনেক ক্ষেত্রে নূতনভাবে সাজাইয়াছেন। রায়-বড়গাজির যুদ্ধ এবং রতা-বাউলিয়ার প্রসঙ্গকেও মূল কাহিনীর মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট না করিয়া স্বতন্ত্র পালা রচনা করিয়াছেন।

রুদ্রদেবের কাব্যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় নাই বলিলেই চলে। অভিজাত শব্দের পরিবর্তে লোকজীবন-প্রচলিত গ্রাম্য শব্দ ব্যবহারেই কবির ঝোঁক বেশি। বর্ণনার ভঙ্গিটিও তদনুরূপ। যেমন—

কোঁদবনে কইদড শরীর ডাগর বড়
চলিতে না পারি অতি বাড়া
নাহি করে চলুখলা পড়ে থাকে খালের কূলা
কেওড়া বনের মধ্যে আড়া।।

কাব্যে বহু পারসী শব্দের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়।

রুদ্রদেবের কাব্যের তিনটি পালার মধ্যে রায়-বড়গাজি-যুদ্ধ পালাটিই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ইহাতে কবি চৌষট্টি ব্যাঘ্রের বিচিত্র নাম, আকৃতি, বেশ এবং ব্যবহারের চমকপ্রদ রূপ-বর্ণনা দিয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরামের মত রুদ্রদেবও পশুর গোহারি বর্ণনায় মানবীয় ভাব আরোপ করিয়াছেন। দক্ষিণ রায়ের কাছে কেস বাঘ তাহার বিগত জীবনের প্রতাপের কথা বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান দুরবস্থার অতি করুণ চিত্র আঁকিয়াছে—

এখন কলির ফলে মাগ না ভাতার বলে
ছেলে দুটি নাহি বলে বাপ।
কলসী বাঁধিয়ে গলে ঝাঁপ দিয়ে মরি জলে
এমনি মনের মধ্যে তাপ।।

সকলেই যখন অপমান করে, তখন আর আত্মহত্যা ছাড়া উপায় কি? বৃদ্ধ বয়সে জীবনের ইহা অপেক্ষা বাস্তব পরিণতি আর কি হইতে পারে? বস্তুত, বাঘেদের দুঃখ বর্ণনা কবির মানব-জীবনাভিজ্ঞতারই পরিচয়বাহী।

রায়-গাজির যুদ্ধ বর্ণনা রুদ্রদেবের হাতে অতি জীবন্ত রূপ লাভ করিয়াছে। দেবতার মহিমা প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াও মানুষের শক্তিকে কবি কোথাও খর্ব করেন নাই।

দ্বিতীয় পালায় রতাই বাউলেয়ার স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয়টিকে কবি সহানুভূতির চোখে দেখিয়াছেন। রায়মঙ্গলের অন্যান্য কাহিনীতে রতাই ছয় ভাইয়ের প্রাণ রক্ষার জন্য অনায়াসে পুত্রবলি দিয়াছে। কিন্তু রুদ্রদেবের কাব্যে—

কান্দিরে বলিল রতা শুন মহাপ্রভু।
বাপ হয়ে পুত্র কাটিব নাই কভু।।

তৃতীয় পালার যে খণ্ডিত অংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে কবির কাব্যকৃতিত্বের পরিচয় আবিষ্কার করা দুরূহ। তবে পুষ্পদত্ত বণিককে নাগরীদের প্রলুব্ধ করার বর্ণনাটি রুদ্রদেবের বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার কথা বারবার স্মরণ করাইয়া দেয়।

সূর্যমঙ্গল

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ধর্মঠাকুরের পূজার মধ্যে পশ্চিম বঙ্গে সূর্য পূজার তিনটি ধারা আসিয়া একত্র মিলিত হইয়াছে,—বৈদিক, স্কাইথীয় ও অনার্য; কিন্তু পূর্ববঙ্গে ধর্মঠাকুর পূজার প্রচলন না থাকায় সেখানে এই স্বতন্ত্র ধারাগুলি বিশেষ একটি ধর্মচারকে অবলম্বন করিয়া বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ পায় নাই;—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া প্রায় স্বাধীন ভাবেই বর্তমান আছে। অবশ্য এ কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, ইহাদের উপর এক হিন্দুধর্মের সর্বজয়ী প্রভাবের ফলে এই স্বাতন্ত্র্যগুলি অনেক সময়ে খুব সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় না। তথাপি বৈদিক সূর্যোপাসনার সঙ্গে ইহাদের স্থূল পার্থক্য অনুভব করিতেও বেগ পাইতে হয় না। পূর্ববঙ্গের কুমারীগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত মাঘমণ্ডলব্রতের ভিতর দিয়া প্রাচীন বাংলার সূর্যোপাসনার একটি বিশিষ্ট ধারা বিকাশ লাভ করিয়াছে। ইহা ধর্মপূজার দেশ পশ্চিম বঙ্গে একেবারেই অপরিচিত। ইহার নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটি হইতেই ইহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পরিচয় পাওয়া যাইবে।[১]

চারি-পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই কুমারী মেয়েরা এই ব্রত আরম্ভ করিয়া থাকে। ইহা আরম্ভ করিবার পর পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রতি মাঘ মাসের প্রত্যেক দিন ইহা উদ্‌যাপন করা হইয়া থাকে, পঞ্চম বৎসরে ইহা সম্পূর্ণ হয়। সূর্যোদয়ের পূর্বেই কুমারীগণ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠে, তারপর মাঘের শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে পুকুরঘাটে কিংবা নিকটবর্তী নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা হাতে এক-একটি করিয়া ফুল লইয়া জলের একেবারে ধারে গিয়া বসে এবং একজন মহিলার নির্দেশমত সূর্যদেবতা-বিষয়ক কতগুলি লৌকিক ছড়া আবৃত্তি করিয়া যায়। এই ছড়াগুলির ভিতর দিয়া তাহারা সূর্যঠাকুরের শৈশব, যৌবনপ্রাপ্তি, বিবাহ ও পুত্রলাভ ইত্যাদি বর্ণনা করে; এই সকল ছড়ার মধ্য দিয়াই নিজেদেরও ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা তাহারা ব্যক্ত করিয়া থাকে। ইহাদের সঙ্গে তাহাদের ব্যক্তিগত অনুভূতির যোগ এত নিবিড় যে, ইহা কোনও ধর্মীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার পরিবর্তে, একান্ত গার্হস্থ্য অনুভব অনুভূতির বাহন হইয়া আছে। উদয়োন্মুখ সূর্যের দিকে তাকাইয়া তাহারা গায়,—

উঠ উঠ সুরুজাই ঝিকিমিকি দিয়া।
তোমারে পূজিব আমি রক্তজবা দিয়া।।
উঠ উঠ সুরুজাই ঝিকিমিকি দিয়া।
উঠিতে পারি না হিমানীর লাগিয়া।।

দুরন্ত মাঘের শীতে সূর্যের উদয়-মুহূর্তটি যতই বিলম্বিত হইতে থাকে, কুমারী ব্রতিনীগণ ততই অধৈর্য হইয়া গাহিতে থাকে,—

---

১ Asutosh Bhattacharyya, 'The Popular Sun-cult of Bengal', *The Amrita Bazar Patrika 1945, Puja Issue.*

উত্তরে আলা কদম গাছটি দক্ষিণ আলা বাওরে।
গা তোল গা তোল সূর্যাই ডাকে তোমার মাও রে।
শিয়রে চন্দনের বাটি বুকে ছিটা পড়েরে।
গা তোলে গা তোল সূর্যাই ডাকে তোমার মাও রে।।

শীতের অলস সূর্য কুজ্ঝটিকার অন্তরাল হইতে কাতর চক্ষু মেলিয়া চাহিল। এইবার সূর্যের ধুতি-গামছা পরা, সূর্যের পূজা, আকাশ-রথে, সূর্যের যাত্রা, খেয়াপার, সূর্যের বিবাহ করিবার ইচ্ছা, ঘটকের আগমন, সূর্যের বিবাহ, সূর্যের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা, গৌরার সঙ্গ বিবাহান্তে তাঁহার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি কাহিনী গীত হয়। উল্লিখিত মাঘমণ্ডল ব্রতের ভির দিয়া বাংলার সূর্যোপাসনার প্রাক্-পৌরাণিক যুগের একটি সংস্কৃতিক সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়। অতএব ইহার একটু বিস্তৃত বর্ণনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—

শীতের প্রভাতে পুকুরে বা নদীতে স্নান করিয়া কুমারী ব্রতিনীগণ গৃহে ফিরিয়া আসে। গৃহে সমস্ত আঙ্গিনা জুড়িয়া সেখানে বিচিত্র আলপনা আঁকা হইয়া থাকে। ইহাদের পূর্বদিকে একটি বৃত ও পশ্চিমদিকে একটি অর্ধবৃত্ত আঁকা হয়—ইহারা যথাক্রমে সূর্য ও চন্দ্র। ব্রতিনীগণ এই বৃত্তাকৃতি সূর্যের পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া সূর্যবিষয়ক বিবিধ লৌকিক ছড়া আবৃত্তি করিয়া থাকে। প্রতি বৎসর এক একটি নূতন বৃত্ত এখানে যোগ করিতে হয়, পাঁচ বৎসরে পাঁচটি বৃত্ত পূর্ণ হইলে ব্রত সাঙ্গ হয়। এই বৃত্তগুলি বিবিধ রঙিন গুঁড়া দিয়া সুরঞ্জিত করা হয়। চন্দ্র-সূর্যের চিত্র ব্যতীত সেই আঙ্গিনার মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের নানা ব্যবহারিক বস্তু, যথা আয়না, চিরুনি, দোলা, থালা, গ্লাস ইত্যাদিও অঙ্কিত হয়।

এই সকল চিত্রাঙ্কনে চাউল ও ইঁটের গুঁড়ি ও ছাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে,— ইহাদিগদ্বারা যথাক্রমে সাদা, লাল ও কালো রঙের কাজ চলিয়া থাকে। প্রতিদিন এই প্রকার চিত্রিত প্রত্যেকটি জিনিসের নিকট ব্রতিনী নানা ঐহিক বর প্রার্থনা করিয়া থাকে, যেমন—চিরুনির নিকট এই বর প্রার্থনা করে, 'আমি পূজি গুঁড়ির চিরুনি—আমার লাগি থাকে যেন সোনার চিরুনি।' আয়নার নিকট প্রার্থনা জানায়, 'আমি পূজি গুঁড়ির আয়না—আমার লাগি থাকে যেন আভের আয়না,' ইত্যাদি। পূর্বেই বলিয়াছি, পৃথিবীর প্রায় প্রত্যোক আদিম জাতির মধ্যেই সূর্য উর্বরতা (fertility) বা উৎপাদান বৃদ্ধির দেবতা বলিয়া কল্পিত হন, এখানেও বাংলার কুমারীকন্যাদিগের সূর্যের নিকট নানা ঐহিক বর প্রার্থনার মধ্যে যে তাদের মাতৃত্বেরও একটি সলজ্জ কামনা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সেইজন্য আদিম সূর্যদেবতার সঙ্গে নারী, বিশেষত কুমারী নারীরই সম্পর্ক বেশী। পশ্চিম বঙ্গের কুমারীপূজার শিব, পূর্ববঙ্গের উক্ত কুমারী ব্রতের সূর্য ছাড়া আর কিছুই নহেন—এই বিষয়ে পূর্ব বঙ্গ পশ্চিম বঙ্গ হইতে অধিকতর রক্ষণশীল। মাঘমণ্ডল ব্রত যে সময়ে উদ্‌যাপন করা হইয়া থাকে, সেই সময়টিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়—তখন হইতেই সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়, প্রকৃতপক্ষে ইহা পৃথিবীর বহু আদিম ও সভ্যজাতির সূর্যোৎসবের (Sun festival) অন্যতম সময়।

মাঘমণ্ডল ব্রত উপলক্ষে একটি সূর্যের পাঁচালী গীত হইয়া থাকে—ইহা শিথিলবদ্ধ কতকগুলি খণ্ড গীতিকবিতারই সমষ্টি—তাহা পূর্ণাঙ্গ আখ্যায়িকা কাব্যের রূপ লাভ করিতে পারে নাই। ইহার বিষয়বস্তুর মধ্যে যে একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু হইতে অধিকতর প্রত্যক্ষ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন হিসাবে তাহা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে পারি।[১]

শীতের প্রভাবে সূর্যঠাকুরের ঘুম কিছুতেই ভাঙ্গিতে চাহে না—অবশেষে তাঁহার মাতাব অবিশ্রাম ডাকাডাকিতে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল। কুজ্ঝাটিকার ভিতর দিয়া পূর্বাকাশে সূর্য উঁকি দিলেন—তাঁহার আভা ক্রমে রক্ত হইতে স্বর্ণবর্ণে পরিণত হইল—পল্লীর গৃহচূড়া সেই আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল। এইবার সূর্যঠাকুর রূপার বাটি হইতে তৈল ও সোনার বাটি হইতে গন্ধদ্রব্য লইয়া ক্ষীরসাগরে স্নান করিতে চলিলেন। স্নান করিয়া সূর্যঠাকুর একটি গামছা পরিধান করিলেন, তারপর তিনি ভক্তের পূজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পূজা গ্রহণ করিয়া বারুই বাড়িতে গিয়া পান হরীতকী দিয়া মুখশুদ্ধি করিলেন, তারপর যেখানে তাঁহাব মঙ্গলগান হইতেছে, তিনি সেখানে চলিলেন। যাইবার পথে যখন তিনি খেয়া নৌকায় নদী পার হইতেছিলেন, তখন নদীর অপর তীরে দুইটি ব্রাহ্মণ-কন্যার দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল—

ঐ পার দুই বাউনের কন্যা মেল্যা দিছে শাড়ী।
তাস্থা দেখ্যা সূর্যাই ঠাকুর ফেরেন বাড়ী বাড়ী।।

ব্রাহ্মণকন্যা দুইটিকে দেখিয়া সূর্যঠাকুরের মনে পূর্বরাগের সঞ্চার হইল। পাড়ার লোকের কাছে এ'কথা গোপন রহিল না। তাহাবা সূর্যঠাকুরের মায়ের নিকট গিয়া বলিল,

ওগো সূর্যাইর মা!
তোমার সূর্যাই ডাঙ্গর হৈছে বিয়া করাও না।।

কিন্তু সূর্যের মা জানেন, তাঁহার ছেলে মাত্র সেদিনের শিশু, সে আজই কি বিবাহ করিবে? তিনি এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না। এদিকে সূর্যঠাকুরের কি অবস্থা?

ও পার দুইটি বাউনের কন্যা মেল্যা দিছে কেশ।
তাহা দেখ্যা সূর্যাই ঠাকুর ফেরেন নানা দেশ।।

সূর্যের মা'র নিকট পাড়ার লোক গিয়া আবার বলিল—

ওগো সূর্যাইর মা।
তোমার সূর্যাই ডাঙ্গর হৈছে বিয়া করাও না।।

সূর্যের মা এইবার সংশয়ে পড়িলেন, ছেলের হাবভাব ত নিজে এখনও কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু সূর্যঠাকুর নিজের মনের ভাব আর কিছুই গোপন করিতে পারেন না।

১ ব-সা-প ২, ১৪৬-৮১

ওপার দুইটি বাউনের কন্যা মল খাড়ুয়া পায়।
তাহা দেখ্যা সূর্যাই ঠাকুর বিয়া করতে চায়।।

সূর্যের মা পুত্রের বিবাহে আর আপত্তি করেন না। এই সূর্যঠাকুরই বাংলার ছেলে-ভুলানো ছড়ার শিবঠাকুর—বাংলার লৌকিক ধর্মে সূর্যই যেমন পরবর্তী কালে শিব হইয়া গিয়াছেন, এ'দেশের লোক-সাহিত্যেও তেমনই সূর্য ও শিব একাকার হইয়া আছেন। এইবার সূর্যঠাকুরের বিবাহের পালা। বিবাহ স্থির করিবার জন্য একজন ঘটক নিযুক্ত হইল। অবিলম্বে সূর্যের সঙ্গে গৌরার বিবাহ স্থির হইল। কন্যার বয়স আট বৎসর মাত্র। সূর্যঠাকুর শ্বশুরবাড়ি যাত্রা করিলেন—সেখানে কি রকম আচরণ করিতে হইবে, মা তাঁহাকে তাহা শিখাইয়া দিলেন। নির্বিঘ্নে বিবাহ সম্পন্ন হইল। এইবার বধূ লইয়া সূর্যঠাকুরের স্বগৃহে যাত্রার পালা। কাহিনীর মধ্যে এই অংশটিই সর্বাপেক্ষা করুণ। বিবাহের উৎসবাড়ম্বর শেষ হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই গৌরা বুঝিতে পারিল, এইবার তাহাকে পিতৃসংসার হইতে বিদায় লইতে হইবে। সে নীরবে মায়ের বস্ত্রাঞ্চলের নীচে গিয়া লুকাইল। মা তাহার মস্তকে স্নেহহস্ত বুলাইতে বুলাইতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—

টাকা নয় রে কড়ি নয় রে কোটরে রাখিব।
পরের লাগ্যা হইছ গৌরা পরেরে সে দিব।।

সমাজের নির্মম বিধানকে মাথা পাতিয়া লইয়া জননীর অন্তরেব স্নেহ বোধকে স্তম্ভিত করিয়া লইতে হইবে। শিশুকন্যা এ'যাবৎ মায়ের অঞ্চলের নীচে নিরাপদ আশ্রয় পাইয়া আসিয়াছে—কিন্তু আজ তাহা সে পাইল না,—

অর্ধেক গাঙ্গে ঝড় বৃষ্টি অর্থেক গাঙ্গে খুয়া।
মধ্য গাঙ্গে বাদ্য বাজে গৌরা লবার লইয়এণ্ড।।
আড়শী কান্দে পড়শী কান্দে কান্দে রইয়া রইয়া।
গৌরার জনকে কান্দে গামছা মুড়ি দিযা।।
গৌরার যে ভাই কান্দে খেলার সজ্জ লইয়া।
গৌরার যে মায়ে কান্দে শানে পাছাড় খাইয়া।।

মাতার ক্রোড়চ্যুতা অসহায়া ক্ষুদ্র বালিকা অবশেষে নৌকায় আরোহণ করিয়া স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরগৃহে যাত্রা করিল। অশ্রুতমুখী জনতা নদীতীরে দাঁড়াইয়া তাহাকে বিদায় দিল—নৌকার ভিতর হইতে জনতার দূরাগত ক্রন্দনের ধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল,—

ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা চলকে ওঠে পানী।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি মায়ের কান্দন শুনি।।
নাইয়ারে দিয়াম তাড় বালা মাঝিরে দিয়াম কড়ি।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি ভায়ের কান্দন শুনি।।

ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানী।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি বাপের কান্দন শুনি।।

অভিমানিনী কন্যা পিতার ক্রন্দন শুনিয়া বলিতেছে—

এখন কেন কান্দ বাপধন মুখে গামছা দিয়া।
তখন নি কইছিলাম তোমায় দূরে না দেও বিয়া।।

এমন কি, এইজন্য সে তাহার মাতা ও শিশু ভাইটিকে পর্যন্ত দোষী করিতেছে—

এখন কেন কান্দ মাগো শানে পাছাড় খাইয়া।
তখন নি কইছিলাম তোমায় দূরে না দেও বিয়া।।

এখন কেন কান্দ ভাইগো খেলার সজ্জ লইয়া।
তখন নি কইছিলাম তোমায় দূরে না দেও বিয়া।।

একটি অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয় বুকে করিয়া লইয়া নৌকা নদীপ্রবাহে দ্রুত অদৃশ্য হইয়া গেল—ক্ষুদ্র আনন্দ-প্রতিমাটিকে নদীর জলে বিসর্জন দিয়া অশ্রুমুখী জনতা শূন্যগৃহে ফিরিয়া গেল।

কন্যা-বিদায় বাঙ্গালীর গৃহের বিজয়া। ইহার বেদনা যে কত গভীর, তাহা বাঙ্গালীকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না,—সাহিত্যে ইহার অনুভূতি বাঙ্গালীকে কবি করিয়াছে, সাধনায় ইহাই মৃন্ময়ী দেবী-প্রতিমাকে চিন্ময়ী করিয়াছে।

বহুদূরাগত ক্রন্দন যখন আর নদীতীর হইতে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না, তখন অশ্রুমুখী গৌরা তাহার নববিবাহিত পতির দিকে ফিরিয়া তাকাইল। তাহার আশঙ্কা কিছুতেই দূর হইতেছে না—স্নেহময় স্বামী নবোঢা পত্নীর সকল অপরিচয়ের আশঙ্কা এইভাবে দূর করিয়া দিতেছে—

'তোমার দেশে যাব সূর্যাই বাপ বলিব কারে।'
'ঘরে আছে আমার বাপ, বাপ বলিবে তারে।।'

'তোমার দেশে যাব সূর্যাই মা বলিব কারে।'
'ঘরে আছে আমার মা, মা বলিবে তারে।।'

'তোমার দেশে যাব সূর্যাই কাপড়ের দুঃখ পাব।'
'নগরে নগরে আমি তাঁতিয়া বসাব।।'

বাঙ্গালী কবির দৃষ্টিগুণে আকাশের দেবতা যে কিভাবে মাটির মানুষ হইয়া গিয়াছেন, তাহাই এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

উল্লিখিত কাহিনী লইয়া কোন পূর্ণাঙ্গ আখ্যায়িকা-কাব্য রচিত হয় নাই—ইহা শিথিলগ্রন্থি কতকগুলি গীতিকবিতার আকারেই মুখে মুখে প্রচলিত। গার্হস্থ্য স্নেহ-সম্পর্কের বাস্তব অনুভূতির উপরই ইহার ভিত্তি—ইহাদের মধ্যে কোনও আধ্যাত্মিক সুর

নাই। ইহাদের উদ্ভবের ইতিহাস কিংবা ইহাদের রচয়িতারও কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহা প্রকৃতপক্ষে বাংলার লোকসাহিত্যেরই অন্তর্গত। বাংলার লৌকিক সূর্যকাহিনীর বিশিষ্ট একটি ধারার সঙ্গেই এখানে পরিচয় হয়—এই ধারাটিরও সঙ্গে এই বিষয়ক স্বতন্ত্র ধারাটির যোগ নাই।

বাংলার লৌকিক সূর্যকাহিনীর স্বতন্ত্র একটি ধারা গতানুগতিক পথে অগ্রসর হইয়া মঙ্গলকাব্যের রূপের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু এই ধারাটি অত্যন্ত ক্ষীণ—কয়েকজন মাত্র কবি এই বিষয় অবলম্বন করিয়া সাধারণ কয়েকখানি মঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে যে কাহিনীটি সাধারণত বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা সংক্ষেপে এই,—

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ,—তাহার দুই কন্যা, রুমুনা ও ঝুমুনা। কিছুদিনের মধ্যে ব্রাহ্মণের পত্নী বিয়োগ হইল—তিনি অতি কষ্টে কন্যা দুইটিকে লইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। ভোরবেলায় ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বাহির হইয়া যাইতেন, সারাদিন ঘুরিয়া যাহা পাইতেন, তাহা লইয়া সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিতেন—যাহা সংগ্রহ করিতে পারিতেন, তাহাতেই তিনজনের কোনরকমে দিন কাটিত। একদিন ব্রাহ্মণ যখন ভিক্ষায় বাহির হইয়া গেলেন, তখন তাঁহার কন্যা দুইটি নিকটেই এক বনের মধ্যে শাক তুলিতে গেল। পিতা বাড়ি ফিরিবার পূর্বেই তাহারা শাক তুলিয়া লইয়া বাড়ি ফিরিল। পরদিনও তাহারা এইরকম করিল। এইভাবে প্রত্যহ যখন তাহাদের পিতা বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাইতেন, তখনই তাহারা শাক তুলিবার জন্য বনের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিত, তিনি ফিরিবার পূর্বে তাহারা ফিরিয়া আসিত। একদিন যখন তাহারা এইভাবে বনের মধ্যে শাক তুলিতে গেল, তখন দেখিতে পাইল, দেবকন্যাগণ এক সরোবরের পার্শ্বে বসিয়া সূর্যদেবতার পূজা করিতেছে। ভগ্নী দুইজনকে তাঁহারা বলিল, 'সূর্যদেবতার পূজা কর, সকল বিপদ দূর হইবে।' ভগ্নী দুইজন সেখানেই দেবকন্যাদের সূর্যদেবতার পূজায় যোগদান করিল। সূর্যদেবতা তাহাদের ভক্তিতে প্রীত হইয়া স্বয়ং তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন, এবং অচিরে তাহাদের দুঃখ দূর হইবে বলিয়া বর দিলেন। ভগ্নী দুইটি বাড়িতে ফিরিয়া দেখিল তাহাদের ভাঙ্গা কুটিরখানি রাজপ্রাসাদে পরিণত হইয়াছে—প্রথমে তাহারা তাহা চিনিতেই পারিল না, পরে সূর্যদেবতার বরের কথা স্মরণ করিয়া অতি সঙ্কোচের সঙ্গে গিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিল—ব্রাহ্মণ বাড়ি ফিরিলে তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। পরদিন হইতে ব্রাহ্মণকেও আর ভিক্ষায় বাহির হইতে হইল না। সেই রাজ্যের রাজা সহসা একদিন দেখিলেন, রাজকন্যার অনেক বয়স হইয়াছে—তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া যাহারই মুখ প্রথম দেখিবেন, তাহার হস্তেই রাজকন্যাকে সমর্পণ করিবেন। সূর্যদেবতা স্বপ্নে রুমুনা ও ঝুমুনার নিকট আবির্ভূত হইয়া এই বৃত্তান্ত তাহাদিগকে বলিলেন এবং তাহাদের পিতাকে পরের দিন প্রভাতে রাজবাড়িতে যাইবার জন্য পরামর্শ দিতে বলিলেন। ভগ্নী দুইজন ভোর না হইতেই ব্রাহ্মণকে রাজবাড়িতে পাঠাইয়া দিল—রাজা ঘুম হইতে উঠিয়া সকলের আগে তাঁহারই মুখ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার কথামত তিনি রাজকন্যাকে তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাজকন্যাকে লইয়া ব্রাহ্মণ নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ভগ্নী দুইজন তাহাদের বিমাতাকে পাইয়া প্রথম খুব খুশী হইল, কিন্তু অল্পদিনেই বুঝিতে পারিল, তাঁহার নিকট হইতে

তাহাদেব সুখেব আশা নাই। একদিন তাহারা সূর্যদেবতার পূজা করিতেছিল, বিমাতা তাহাতে আপত্তি করিলেন এবং তাহাদিগকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য স্বামীকে বলিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তরুণী ভার্যার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনিও ইহাতে আপত্তি করিতে পারিলেন না। কন্যা দুইটিকে মাসীর বাড়ি লইয়া যাইবেন বলিয়া ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে লইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইলেন,—দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া এক গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া কন্যা দুইটি এক গাছের নীচে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। এই সুযোগে ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে সেইখানেই ফেলিয়া রাখিয়া নিজে একাকী বাড়ি আসিলেন। ঘুম ভাঙ্গিয়াই কন্যা দুইটি নিজেদের অবস্থা বুঝিতে পারিল। তখন গভীর রাত্রি। হিংস্র পশুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহারা উপায় সন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু যখন তাহারা কোন উপায়ই দেখিতে পাইল না, তখন উপরিস্থিত অশ্বত্থ বৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'যদি সত্যযুগের অশ্বত্থ হও, তবে আমাদিগকে আশ্রয় দাও।' বলিবামাত্র অশ্বত্থ শাখা-প্রশাখা ভূমিতল পর্যন্ত আনত করিয়া দিল, তাহারা তাহাতে আরোহণ করিবামাত্র পুনরায় তাহা ঊর্ধ্বে উঠিয়া গেল—হিংস্র পশুর আক্রমণ হইতে তাহারা সেই রাত্রির জন্য রক্ষা পাইল।

পার্বতীপুরের রাজা অনঙ্গশেখর পরের দিন বনে শিকার করিতে আসিলেন। তিনি কন্যা দুইটিকে দেখিতে পাওয়া নিজের প্রাসাদে লইয়া গেলেন। বড়টিকে নিজে বিবাহ করিলেন ও ছোটটিকে তাঁহার কোটালকে সম্প্রদান করিলেন। কালক্রমে তাহারা উভয়েই অন্তঃসত্ত্বা হইল। একদিন রবিবারে যখন রাণী সূর্যদেবতার পূজা করিতেছিলেন, তখন রাজা সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি জানিতে চাহিলেন, রাণী কাহার পূজা করিতেছেন। যখন শুনিতে পাইলেন, সূর্যদেবতার পূজা, তখন পদাঘাতে পূজার ঘট ভাঙ্গিয়া দিয়া রাণীর প্রাণবধ করিবার জন্য তাঁহাকে কোটালের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কোটাল দয়া-পরবশ হইয়া গোপনে রাণীকে মুক্ত করিয়া দিল। রাণী অরণ্যে পলাইয়া গেলেন। যথাসময়ে দুই ভগ্নীর দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। রাণীর পুত্রের ম হইল দুখরাজ ও কোটোলের পুত্রেব নাম হইল সুখরাজ। জন্মের পর হইতে নাম হইল দুখরাজ নিজের পিতাকে দেখে নাই, সেইজন্য তাহার মনে শান্তি ছিল না। একদিন বনবাসিনী রাণী দুখরাজকে তাহার মাসীর বাড়িতে পাঠাইলেন, মাসী তাহাকে অনেক জিনিস দিলেন—তাহা লইয়া যখন সে মায়েব নিকট ফিরিতেছিল, তখন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া সূর্যদেবতা আসিয়া তাহার নিকট হইতে তাহার কাড়িয়া লইয়া গেলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে দুখরাজ শূন্য হাতে মায়েব নিকট ফিরিল। কিছুদিন পর বনবাস হইতে রাণী দুখরাজকে লইয়া নিজেও তাঁহার ভগ্নীর বাড়িতে আসিলেন। কোটালেরর সংসারে তাঁহার ভগ্নী সুখেই বাস করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে সূর্যদেবতার কৃপায় রাজা অনঙ্গশেখরও নিজের পত্নীকে স্মরণ করিলেন—তিনি কোটালকে তাঁহার রাণীকে ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। কোটালের গৃহেই রাজা ও রাণীর মিলন হইল—যখন রাজা-রাণী দুখরাজকে লইয়া প্রাসাদে ফিরিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে এক অমঙ্গল দেখিতে পাইয়া সাতজন হাড়ীর শিরশ্ছেদ করিবার আদেশ দিলেন। কোটাল বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া অবিলম্বে সাত হাড়ীর শিরশ্ছেদ করিল। এই সংবাদ শুনিয়া হাড়ীদের জননী পুত্রশোকে

বিলাপ করিতে লাগিল। সূর্যদেতা দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের প্রাণ ফিরাইয়া দিলেন, দেখিয়া রাজা পরম বিস্মিত হইলেন; সূর্যদেবতার প্রতি রাজার বিশ্বাস হইল—তিনিও তখন হইতে পরম ভক্তিভরে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। সূর্যের কৃপায় তিনি পরম সুখে রাজত্ব করিয়া বৃদ্ধ বয়সে পুত্রকে সিংহাসন দিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

রামজীবন

এই কাহিনী লইয়া যে কয়খানি মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহাদের একখানির মাত্র কবির পরিচয় পাওয়া যায়—তাঁহার নাম রামজীবন। ১৬৩১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার সূর্যমঙ্গল বা 'আদিত্য-চরিত' রচনা করিয়াছিলেন।[১] তিনি একখানি মনসা-মঙ্গলও রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার মনসা-মঙ্গলের আলোচনা সম্পর্কে তাঁহার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 'মনসা-মঙ্গল' রচনায় ছয় বৎসর পর রামজীবনের 'সূর্যমঙ্গল' রচিত হয়। তিনি ইহাকে 'আদিত্য-চরিত' বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইহাতে প্রচলিত সূর্যব্রতের কাহিনীকে একটি পাঁচালীর রূপ দিয়াছেন বলিয়া নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন—তাঁহার পূর্বে এই বিষয়ক আর কোন পদ্য-রচনা প্রচলিত ছিল বলিয়া তিনি জানিতেন না। কিন্তু তথাপি কাহিনীটি তাঁহার মৌলিক নহে। পূর্ব ময়মনসিংহে প্রচলিত করমাদি ব্রতে উক্ত কাহিনীটি শুনিতে পাওয়া যায়। ধর্মপূজার আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি, করমাদি ব্রত সূর্যেরই ব্রত। মেয়েদের মুখে মুখে প্রচলিত ব্রতকথার কাহিনীকে কোন কোন সময় পুরোহিত পদ্যরূপ দিয়া থাকেন, ক্বচিৎ তাহাতে কবিত্বের স্পর্শও অনুভব করা যায়—এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। রামজীবনের রচনা কবিত্বের বৈশিষ্ট্য-বর্জিত ও সর্বাংশেই শেষ যুগের মঙ্গল-কাব্যসমূহের বৈচিত্র্যহীন ও গতানুগতিক প্রণালীতে রচিত। ইহাতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত কিছু নাই।

বিবিধ কবি

মালাধর বসু নামক একজন কবি প্রায় অনুরূপ কাহিনী লইয়া 'অষ্টলোকপাল কথা' নামক একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।[২] সূর্যকেই অষ্টলোকপাল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীতও কালিদাস নামক একজন কবি সূর্যমঙ্গল অথবা সূর্যের পাঁচালী নামক একখানি আখ্যায়িকা কাব্য রচনা করেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। তিনি নিজেকে 'দ্বিজ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহার অতিরিক্ত তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানিতে পারা যায় না। তিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। দ্বিজ কালিদাস নামক অন্যান্য বিষয়ক মঙ্গলকাব্যের একজন কবির সঙ্গে তাঁহার কোনও সম্পর্ক আছে কিনা, তাহা জানিবার উপায় নাই।

১ সা-প-প ১৩ ৮৯

২ পু-প ১৫-১৯

গঙ্গামঙ্গল

গঙ্গার মাহাত্ম্য এবং ভগীরথ কর্তৃক মর্ত্যে গঙ্গা আনয়নের বৃত্তান্ত লইয়া কয়েকখানি কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহা প্রধানত গঙ্গামঙ্গল নামে পরিচিত। পুরাণ কাহিনী ইহার মূল ভিত্তি হইলেও ইহা মঙ্গলকাব্যের আকারেই লিখিত এবং মঙ্গলকাব্যের মতই দেবতার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসের আধার। তবে বৈষ্ণবভাবে প্রভাবিত বলিয়া ইহার ভক্তি ও বিশ্বাসের মধ্যে সাত্ত্বিক শুচি ও রচনার মধ্যে সংযম লক্ষ্য করা যায়।

কবে হইতে গঙ্গামঙ্গল রচিত হইতেছে, তাহার সঠিক বিবরণ জানিতে পারা না গেলেও এ পর্যন্ত এই শ্রেণীর যত কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে মাধবাচার্য রচিত গঙ্গামঙ্গলই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। মাধবাচার্য শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা মাধবাচার্য বলিয়াই মনে হয়। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ইহার পর আর যে কয়খানি গঙ্গামঙ্গল রচিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিই সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহাদের মধ্যে দ্বিজ গৌরাঙ্গ প্রণীত গঙ্গামঙ্গল, জয়রাম বিরচিত গঙ্গামঙ্গল, দ্বিজ কমলাকান্ত রচিত গঙ্গার পাঁচালী, শঙ্করাচার্য (?) রচিত 'বিষ্ণুপদ তীর্থনাম', দুর্গাপ্রসাদ মুখুটি রচিত 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' ইত্যাদির নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার বাসুদেবপুর গ্রাম হইতে 'জাহ্নবী-মঙ্গল' নামে গঙ্গামঙ্গল কাব্যের একখানি নূতন পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পুঁথিখানি এখনও মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই; সুতরাং ইহার বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতেছে।

ইহা ১৭৪ পাতার তুলোট কাগজের পুঁথি।[১] লিপিকাল ১৬৪৬ শকাব্দ, সন ১১৩১ সাল। এই পুঁথিটি মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার বাসুদেবপুর গ্রাম হইতে পাওয়া গিয়াছে। লিপিকার বাসুদেবপুর-নিবাসী সীতারাম সুর। গ্রন্থটির রচনাকাল পুঁথিটির লিপিকাল হইতে খুব বেশি প্রাচীন নহে।

কাব্যের মধ্যে কবির যেটুকু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নিশ্চিত বলা যায় যে, কবি কখনই বাসুদেবপুর-নিবাসী ছিলেন না। কাব্যের মধ্যে কবি বহুবার অম্বিকানগরের উল্লেখ করিয়াছেন এবং একস্থানে বর্ধমানের রাজা 'ভূপতি বাবুরায়' ও কীর্তিচন্দ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। কবি নিজেকে একাধিকবার অম্বিকানগরবাসী বলিয়াছেন। তাই মনে হয়, বর্ধমান জেলার গঙ্গাতীরস্থ কাল্না-অম্বিকানগরেই ছিল কবির নিবাস।

'জাহ্নবী-মঙ্গলকাব্য' আঠারটি পালায় বিভক্ত। প্রথম দুইদিন কেবলমাত্র নিশাপালা, তৃতীয় দিবস হইতে দশম দিবস পর্যন্ত প্রতিদিন দুইটি করিয়া পালা—দিবাপালা ও

---

১ আমার ছাত্র শ্রীমান মৃগাঙ্কভূষণ ভট্টাচার্য এই পুঁথিখানির সন্ধান দিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে গবেষকদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। মেদিনীপুর জেলার বাসুদেবপুরের অধিবাসী শ্রী[illegible]ানন্দ রায় মহাশয়ের নিকট ইহার একমাত্র পুঁথি[illegible] গৃহীত আছে।

নিশাপাল। দশম দিবস পাত্রের পালাটি দীর্ঘতম—ইহাকে 'জাগরণ পালা' বলা হইয়াছে। ইহাতে গঙ্গার বিবাহ, শান্তনু এবং ভীষ্মের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই পালার শেষে লিখিত আছে—

'জাগরণ পালা সাঙ্গ। প্রাতে সংক্ষেপে ভারতকথা লিখিয়া সাঙ্গ।।' ইহার পরে সংক্ষেপে মহাভারতের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহা প্রকৃতপক্ষে একাদশ দিবসের ঊনবিংশ পালা।

'জাহ্নবী-মঙ্গলে'র আঠারটি পালার মধ্যে সতেরটি পালার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ষোড়শ পালাটি সম্পূর্ণ এবং পঞ্চদশ ও সপ্তদশ পালা দুইটি আংশিক খণ্ডিত। নিম্নে সতেরটি পালার পরিচয় দেওয়া হইল—

(১) দেব সম্ভাষণ, (২) গঙ্গার জন্ম, (ইহাতে তিলোত্তমা-সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনীও আছে), (৩) বলি উপাখ্যান, (৪) ভগীরথ জন্ম, (৫) সগর বংশ পালা, (৬) সৌদাস মুক্ত পালা, (৭) গৃধর (গৃধ্র) পালা, (৮) ভেকভেকী পালা, (৯) বকীমুক্ত, (১০) কালকল্প উপাখ্যান, (১১) প্রয়াগ মাহাত্ম্য, (১২) মাধব-সুলোচনা পালা, (১৩) সুলোচনা হরণ, (১৪) মাধব স্বর্গদাস, (১৫) বারাণসী মাহাত্ম্য (খণ্ডিত), (১৬) ষোড়শ পালাটি সম্পূর্ণ খণ্ডিত (এইখানে ১৩টি পাতা নাই), (১৭) কৃষ্ণনৃপ স্বর্গবাস (প্রথমাংশ খণ্ডিত), (১৮) রাত্রে জাগরণ পালা—গঙ্গার বিবাহ।

এই পুঁথির প্রথম পৃষ্ঠায় আছে—

অবনীর মধ্যে ধন্য অম্বিকানগর।
অম্বুরীশ আদি মুনি আছে বহুতর।।

গঙ্গার পশ্চিমভাগ অতি মনোহর।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বসতি বিস্তর।।

বৈদ্যবর্গ বিদ্যা ....

এইখানে পুঁথিটি খণ্ডিত।

৭৯।২ পৃষ্ঠায় একটি বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে যে ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়, তাহা হইতে লেখকের রচনাকাল সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়।

গঙ্গাগাথা পদ্মমধু পান অভিলাষ।
অম্বিকা নিবাসী তাহা সতত প্রয়াস।।

গঙ্গার পশ্চিমভাগে বসতি সুসার।
জ্ঞানবান্ সর্বজন নহে কদাচার।।

বিপ্রবর্গ বিদ্যারম্ভ বিবিধ প্রকার।
ক্ষত্রিয় ক্ষিতির নাথ সম নাহি যার।।

বৈশ বৈভব অতি বাণিজ্য সতত।
নানা জাতি শূদ্র তথা আছে কতকত।।
বৈদ্যবর্গ যশবান্ কায়স্থ প্রবীণ।
বিশ্বামিত্র শৌকালিন গৌতম কুলীন।।
দত্ত আদি দর্পবান্ বসতি সুসার।
সদ্‌গোপ সদাচার সৎ ব্যবহার।।
নবশাখ বহুস্থিতি পঞ্চম বণিক।
নাগরী নগরবাসী বড়ই রসিক।।
পশ্চিমা পণ্ডিত যত পরম ভাজন।
উৎকলিয়া গঙ্গাবাসী করিছে শোভন।।
উত্তর হইতে বৈসে বারেন্দ্র ঠাকুর।
অদ্বৈত দৌহিত্র যথা পাপ করে দূর।।
গঙ্গাবাস করিয়াছে অনেক বাঙ্গাল।
গোদ-গলগণ্ড-গর্ব গিয়াছে তাহার।।
যবন যতেক স্থিতি জড়তা বিহীনে।
যথার্থ যতেক কর্ম আপনার দিনে।।
যথায় ভূপতি বাবুরায়ের সন্ততি।
কীর্তিচন্দ্র মহারাজ জগতে খেয়াতি।।
যাহার জননী যতি কৃষ্ণ পরায়ণী
বহু রাজ্য সুশাসিত কৈল ঠাকুরাণী।।
নবরত্ন সম সভা জগতে বাখানে।
অবন অতুল বিপ্র তুষিলেন দানে।।
তাহার আশ্রিত বংশী ঘোষের নন্দনে।
শ্রীপ্রাণবল্লভ ভণে গুরুর চরণে।।

ভণিতা : অধিকাংশ স্থলে নিম্নলিখিত ভণিতাটি দৃষ্ট হয়—

গঙ্গার চরণ সার ভরসা কেবল।
শ্রীপ্রাণবল্লভ ভণে জাহ্নবীমঙ্গল।।

নিম্নলিখিত ভণিতায় কবি সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন :

অম্বিকানগরে স্থিতি কৃষ্ণপদে করি নতি
বিরচিল শ্রীপ্রাণবল্লভ

নাহি মোর জ্ঞানলেশ কিছু না করিহ দ্বেষ
নরদেহ পরম দুর্লভ।। (৯৮।১)

কবি যে বৈষ্ণব ছিলেন, তাহার পরিচয় গ্রন্থটির আদ্যন্ত ছড়াইয়া আছে। একাধিক স্থানে কবি 'ক্রিয়াযোগসারে'র উল্লেখ করিয়াছেন—

ক্রিয়াযোগ সাব কথা করহ শ্রবণ।
জাহ্নবী চরণে ভণে বংশীর নন্দন।।

অন্যত্র ঃ

ক্রিয়াযোগে সার গাথা জাহ্নবীমঙ্গল পোথা
শ্রবণে পাতক হয় নাশ।
যে দেশে গঙ্গার নাম তার সিদ্ধি মনস্কাম
প্রাণ ভণে না কর নৈরাশ।।

সমগ্র কাব্যখানি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহার সমস্ত কাহিনীই মহাভারত ও পদ্মপুরাণান্তর্গত 'ক্রিয়াযোগসার' হইতে গৃহীত. দেবসম্ভাষণ, গঙ্গার উৎপত্তি, বলি উপাখ্যান, ভগীরথ জন্ম, সগরবংশ পালা, সৌদাসমুক্ত পালা এবং গঙ্গার বিবাহ মহাভারত ও অন্যান্য পুবাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। গৃধ্র পালা, ভেকভেকী পালা, কালকল্প উপাখ্যান, মাধব-সুলোচনা আখ্যান ক্রিয়াযোগসার হইতে গৃহীত। ধর্মস্থ ধার্মিক কথা, মঞ্জুকলার শাপমুক্তি প্রভৃতি কাহিনী ক্রিয়াযোগসারে আছে। এইজন্য 'জাহ্নবী-মঙ্গলকাব্য' মৌলিক কাব্যের পর্যায়ে পড়িতে পারে না. ইহা একান্তভাবেই অনুবাদ কাব্য।

মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে দেখা যায়, শৌনক প্রশ্নকর্তা এবং সৌতি বা সুত উত্তরদাতা। পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসারের প্রারম্ভে আছে—

একদা মুনয়ঃ সর্বে সর্বলোকহিতৈষিণঃ।
সুরম্যে নিমিষারণ্যে গোষ্ঠীং চক্রুর্মনোরমাং।।
তত্রান্তরে মহাতেজা ব্যাসশিষ্যো মহাযশাঃ।
সূতঃ শিষ্যগণৈর্যুক্তঃ সমায়াতো হরিং স্মরন্।। . .
তত্রোপবিষ্টং তং সূতং শোনকো মুনিসত্তমঃ।
বদ্ধাঞ্জলিরিমাং বাচমুবাচ বিনয়ান্বিতঃ।।
শৌনক উবাচ ঃ

জাহ্নবীমঙ্গলের প্রতি পালার সূচনায় আছে নৈমিষারণ্য, 'সৌনকাদি মুনিগণ' ও 'সূতে'র কথা।

নিমিষকানন স্থল অতি নিরমল।
শৌনকাদি যথাস্থিতি ঋষির মণ্ডল।।

ব্যাসাসনে সুত যথা কহেন পুরাণ।
জিজ্ঞাসিল মুনিগণ না করিহ আন।।

শুনিল গঙ্গার বার্তা দ্রবময় হরি।
তোমার প্রসাদে সভে ভবাগারে তরি।।

পাদোদ্ভবা করি গঙ্গা তিনলোকে কয়।
বিবরিয়া কহ তত্ত্ব ঘুচাহ বিস্ময়।।

সুত বলে সর্বজন শুনহ আখ্যান।
বলি হৈতে পাদোদ্ভবা হৈলা ভগবান্।। .... ইত্যাদি

মাধব-সুলোচনা কাহিনী 'ক্রিয়াযোগসারে' প্রদত্ত কাহিনীর যথাযথ অনুবাদ. কথোকথন অংশও অনূদিত হইয়াছে।

রাজপুত্র মাধব স্নানরতা যুবতীকে দেখিয়া মুগ্ধ ঃ

দদর্শ যুবতীমেকাং সরসি স্নানতৎপরাম্।
স্নানার্দ্রদিব্যবসনৈর্ব্যক্তীকৃতকলেবরাম্।
স্বকীয় মুখসৌন্দর্য জিত পূর্ণনিশাকরাম্।।

রাজপুত্র তাহার আলিঙ্গন প্রার্থনা করিলে চন্দ্রকলা বলিল—

বলাদালিঙ্গ্য মামত্র যশঃ কিন্তে ভবিষ্যতি।।

পরস্ত্রিয়ং সমালিঙ্গ্য ক্ষণমাত্রাং সুখং ভবেৎ।
ইহাপকীর্তি শেষে চ দুঃখং কল্পশতাবধি।। ...

মাংস-পূরীষাস্থি-নির্মিতং মে কলেবরম্।
এতদেব সমালোক্য স্মরস্য শতাং গতঃ।।

প্রাণবল্লভের কাব্যে আছে ঃ

দূর হইতে সরোবরে দেখিল যুবতী। . . .
একাকিনী স্নান করে জলেতে নাম্বিয়া।।

প্রথম যৌবন তার পরম সুন্দরী।
তার রূপে নিন্দা করে স্বর্গ বিদ্যাধরী। ...

পরপত্নী পরসনে পাতক সঞ্চয়।
আলিঙ্গন কৈলে তায় নাহি হয় ভয়।।

এক ক্ষণ মিথ্যা মুখে কেন অভিলাষ।
ঘোর পরিহর নৃপ তেজ্জ পরিহাস।।

মলমূত্র পূর্ণ দেহ প্রশংসিত নয়।

সে ছার দেহের গর্ব উচিত না হয়।।

এইরূপ নানা স্থলে সংস্কৃতের বিশ্বস্ত অনুবাদ লক্ষিত হয়। শান্তনু ও ভীষ্মের কথোপকথনে কবি সংস্কৃত মহাভারতকে পুরাপুরি অনুসরণ করিয়াছেন।

যদিও গঙ্গামঙ্গল মূলত অনুবাদ কাব্য, তথাপি ইহার কবিত্ব অস্বীকার করা যায় না। ভাষার প্রসাদগুণ এবং বর্ণনার সৌকুমার্যের জন্য কাব্যটি সুখপাঠ্য এবং আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ 'তিলোত্তমা'র বর্ণনাটি উল্লেখযোগ্য ঃ

সীমন্তে সিন্দুর বেড়ি শশধর
আধা নীলমণি সাজে।
তিল ফুল নাসা তথি কাম কীসা
কাম চাপ ভুরু রাজে।।
পয়োধর মাঝে রত্নহার সাজে
মালতী রঞ্জিত তথি।
হরের ডম্বরু ভঞ্জিত কটিবর
কিঙ্কিণী সুনাদ অতি।।
করেতে কঙ্কণ করে ঝন্‌ঝন্
সরসিজ হাথে করি।
আকাশের পথে মিলে জুতে জুতে
দনুজের মন হরি।।
রামা নেত্র বাণে স্থির করি প্রাণে
বিজুরি নিন্দিত হাস।
পীযূষ সমান ক্ষণে ক্ষণে গান
সমীরণে উড়ে বাস।।

শ্রীহরির বর্ণনা—

চতুর্ভুজ মনোহর কৌস্তুভ ভূষণ।
চন্দন চর্চিত তনু পরম শোভন।।
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম হস্তে লইয়া।
মালতী মল্লিকা মালা গলায় পরিয়া।।
সুগন্ধ সৌরভে অলি ধায় মধুলোভে।
পাদপদ্মে ভৃঙ্গগণ থরে থরে শোভে।। ৪৭।১

রাজা শান্তনু দাসরাজকন্যা সত্যবতীকে দেখিয়া মুগ্ধ। কিন্তু দাসরাজ তাঁহাকে কন্যা

সম্প্রদান করিতে অনিচ্ছুক। তাই রাজা শান্তনু বিষন্ন। স্নানাহার ত্যাগ করিয়া তিনি শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। পুত্র দেবব্রত পিতার নিকটে গিয়া তাঁহার বিষন্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে—

পুত্রের দেখিয়া যত্ন কহেন রাজন।
তোমার সমান মোর নাহি অন্যজন।।
এক পুত্র হও তুমি সহস্র সমান।
গঙ্গার গর্ভেতে জন্ম জগতে বাখান।।
চিত্তে তোলপাড় করি না হয় নির্ণয়।
এক চক্ষু চক্ষু নহে জানিল হৃদয়।।
এক নাসা কর্ণ কর এক পদ যার।
এক হৈতে শোভা নহে এই চমৎকার।।
একেতে অনেক তুমি ইহা ভালে জানি।
তথাপিও অনুক্ষণ হৃদে অনুমান।।

বুদ্ধিমান দেবব্রত। সচিবের নিকট গিয়া সমস্ত ব্যাপার জানিয়া লইল। সমস্ত রচনাটি এইরূপ প্রসাদগুণসম্পন্ন বলিয়া সুখপাঠ্য হইয়াছে।

কয়েকটি প্রবাদ বচনকেও কবি তাঁহার কাব্যে স্থান দিয়াছেন ঃ

বড় বড় বানরের বড় বড় পেট।
লঙ্কার নামেতে যেন শির করে হেঁট।।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের কাহিনীকাব্যকারগণের পার্শ্বে প্রাণবল্লভ ঘোষও সম্মানিত আসন লাভ করিবার যোগ্য। পূর্ববর্তী যুগের কবি মুকুন্দরামের মত তাঁহার গভীর জীবনদৃষ্টি ও অনন্যসাধারণ চরিত্রচিত্রণ-ক্ষমতা ছিল না, অথবা পরবর্তী যুগের কবি ভারতচন্দ্রের মত তাঁহার আলাংকারিক চমৎকৃতি ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ছিল না। রামেশ্বরের মত দেবলীলার আধারে তিনি চাষী গৃহস্থ ঘরের পাঁচালী রচনা করিতে পারেন নাই, এ'কথাও সত্য। তথাপি যে সুরুচি ও শালীনতা এবং প্রাঞ্জল ভাষা সমসাময়িক কবি ঘনরামকে কবিত্ব-গৌরবভূষিত করিয়াছে, প্রাণবল্লভ ঘোষও বহুলাংশে সেই গৌরব লাভের অধিকারী। জাহ্নবী-মঙ্গলে চণ্ডী-মঙ্গলা, মনসা-মঙ্গল অথবা ধর্মমঙ্গলের কাহিনীগৌরব নাই, দেবলীলার অন্তরালে মানবজীবনরসের উৎসারেরও অবকাশ অল্প, তবুও এই কাব্য যে একদিন স্মার্ত হিন্দুর ধর্মপিপাসাকে মিটাইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কবি সত্যই বলিয়াছেন ঃ

জাহ্নবী মঙ্গল পোথা অমৃত লহরী।
পিবত ভকতলোক কর্ণকুট ভরি।।

মহাকবি কৃত্তিবাস বঙ্গভারতী মন্দিরে হিন্দুর পৌরাণিক ধর্মচেতনার যে মঙ্গলদীপ

জ্বালাইয়াছিলেন, মালাধর বসু ও কাশীরাম দাস যে প্রদীপশিখাকে সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, প্রাণ বল্লভ ঘোষও তাহাকে সযত্নে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন—এইজন্য সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার নাম স্মরণীয়।

সম্প্রতি চণ্ডীমঙ্গলের কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী রচিত একখানি 'গঙ্গামঙ্গল' আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১] তাঁহার রচিত চণ্ডীমঙ্গলের আলোচনা সম্পর্কে তাঁহার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। 'গঙ্গামঙ্গলে'ও তাঁহার অনুরূপ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে।

---

১ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৭৯, পৃ. ২৭-৩৭।

পঞ্চানন-মঙ্গল

দ্বিজ শ্রীরঘুনন্দনের ভণিতায় পঞ্চানন-মঙ্গলের দুইখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। পুঁথি দুইটির মধ্যে স্থানে স্থানে সামান্য পাঠছভেদ, কোতাও বা বর্ণনাংশে ছেদ লক্ষ্য করা যায়। তবে মূল কাহিনী একই।

কাহিনী ঃ— কার্তিকের হাতে পরাজিত তারক বীরের উদ্ধারের জন্য দেবতাগণের অনুরোধে শিব পঞ্চমুখে গান ধরিলেন। সেই বিগলিত সংগীতধারা হইতে ব্যাধির অধিদেবতা পঞ্চাননের জন্ম। মর্ত্যে পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে পঞ্চানন তাঁহার পাত্র বঙ্করাজের পরামর্শে অবন্তীরাজের সভায় আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে রাজাকে তিনি পঞ্চানন পূজা করার উপদেশ দিলেন। রাজা এবং তাঁহার পার্ষদগণ সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। সুতরাং শুরু হইল প্রতিশোধ গ্রহণের পালা। পঞ্চাননের আদেশে ভীষণ প্রতাপ চৌষট্টি ব্যাধি উপস্থিত হইল। প্রথমে তাহারা পাত্রমিত্রদের ধরিল, পরে নৃপতিতনয় মণিময় আক্রান্ত হইল। একমাত্র পুত্রকে অচৈতন্য দেখিয়া রাজারাণী যখন ক্রন্দনে ব্যাকুল, তখন পঞ্চানন ব্রাহ্মণরূপে আসিয়া তাহার জ্ঞান ফিরাইলেন এবং স্বপ্নে দেখা দিয়া মণিময়কে তাঁহার পূজা করিবার আদেশ দিলেন। পুত্রের কথায় মহারাজ মহাসমারোহে পঞ্চানন-পূজার আয়োজন করিলেন।

পূজাশেষে মণিময় শুভক্ষণে জনক-জননীর আশীর্বাদ লইয়া সপ্তডিঙা বাহিয়া পাটন-দর্শনে চলিল। অবন্তীনগর পিছনে রহিল। নবদ্বীপ, হুগলি, খড়দহ পার হইয়া ছত্রভঙ্গ-সেতুবন্ধ প্রভৃতি স্থান সম্পর্কে নানা পৌরাণিক কাহিনীকথা শুনিতে শুনিতে অবশেষে তাহার ডিঙা অমূল্যপাটনে গিয়া ভিড়িল। কিন্তু কপাল মন্দ! সেই দেশের রাজার আজ্ঞায় মণিময় কারাগৃহে বন্দী হইল। বিপদে পড়িয়া মণিময় পঞ্চাননের নাম স্মরণ ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইল। ভক্তের দুঃখে কাতর পঞ্চানন রাজাকে আদেশ দিলেন—

মম ব্রতদাস বটে সাধুর নন্দন।
নিজ কন্যা বিভা দিবে দুর্জয় রাজন।।

প্রথমে ইতস্তত করিলেও রোগের আশঙ্কায় রাজা শেষ পর্যন্ত মণিময়কে মুক্ত করিয়া পরম সমাদরে তাহাকে সিংহাসনে বসাইলেন এবং তাহাকে নিজ কন্যা দান করিলেন। শ্বশুরগৃহে সুখসম্ভোগের মধ্যে মণিময় কিছুকাল পঞ্চাননের কথা ভুলিয়াছে। দৈবাদেশে তাহার চৈতন্য হইল এবং সে দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিল। মাতাপিতাকে কাঁদাইয়া রাজকন্যা মালতীও স্বামীর সঙ্গ ধরিল। তাহাদের ডিঙা অবন্তীনগরে পৌছিলে মণিময়ের জননী সানন্দে পুত্র ও পুত্রবধূকে বরণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজগৃহে পঞ্চাননের পূজারও আয়োজন হইল। পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া ঠাকুর পঞ্চানন রাজাকে তাঁহার অভীষ্ট বর দান করিলেন।

কাহিনী এই পর্যন্ত। ইহার পর অষ্টমঙ্গলা অংশে আছে অবন্তীরাজের স্বর্গগমনের কথা এবং কৈলাসশিখরে বিশ্বনাথের নিকট আটদিনের ব্রতকথায় পঞ্চাননের নিজ পূজাপ্রচারের কাহিনী বর্ণনা। পুঁথিটির বিষয়ের অন্যান্য তথ্য এই ঃ—

(১) পঞ্চানন-মঙ্গলের পুঁথিটি ১২০০ সালের ২৫শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার শ্রীরামকান্তনাথ পণ্ডিত কর্তৃক অনুলিখিত হয়।

(২) পুঁথির মধ্যে বহু আধুনিক স্থাননামের উল্লেখ আছে। এমন কি, মণিময়ের যাত্রাপথে কবি কলিকাতা শহরের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩) কাহিনী কথনে বহুস্থানে লোকসাহিত্যের অনুরূপ বাগ্‌ভঙ্গি লক্ষণীয়। যেমন—

(ক) আরতি পাইয়া বিশাই কোন বুদ্ধি কৈল
(খ) তখন ত রাজপুত্র কোন বুদ্ধি কৈল
(গ) 'সুবুদ্ধি পাত্রেরে তবে কুবুদ্ধি লাগিল'
ইত্যাদি।

(৪) আখ্যান-বিবৃতির ফাঁকে ফাঁকে কোথাও গৌরাঙ্গ বা রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদের অথবা অন্য কোন পালাকীর্তনের বিচ্ছিন্ন অংশ পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। মনে হয়, এগুলি পরবর্তী গায়েনদের সংযোজন। যেমন—

(ক) গোরা প্রেমভরে চলিতে না পারে,
আরে ও বিনোদ গোরা চলিতে না পারে।
(খ) বাছা কার বোলে কোথা যায় ছাড়িয়া জননীরে
আরে রাম রে বাছা আয় করি কোলে রে।
(গ) কি আর গঙ্গাবাসে আহা মরি
অপরূপ নিরক্ষিলেন হর হরি।
(ঘ) জগন্নাথে লীল্যা একি বলরামে লীলে
চণ্ডালে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মণেতে খেলে।।
(ঙ) কুল মজালে কুল মজালে শ্যাম
বংশী বাজায়া বংশী বাজায়া।।
(চ) ও মোর বঁধুয়া হেঃ প্রাণের বধুয়া হেঃ আজি রহ দেশে।
(ছ) চল ঘরে যাই রে বলাই চল ঘরে যাই
সন্ধ্যার সময় হইলে গোধন হারাই রে ...।
(জ) আজি সুপ্রভাত দিন রে রাম আইল দেশে রে....।

প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি অনেক ক্ষেত্রেই কাহিনীর পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক।

(৫) দ্বিজ রঘুনন্দন তাঁহার কাহিনীতে মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত রীতি অনুসরণে একটি 'বারমাস্যা' সংযোগ করিয়াছেন। মণিয়ের পত্নী মালতী স্বামীর সহগমন অভিলাষে তাহাকে বারমাসের দুঃখ সম্পর্কে সচেতন করিয়া দিয়া বলিয়াছে—

বৈশাখে জৈষ্ঠী মাসে প্রবল তপন
পীড়য়ে শরীর জ্বলে রবির কিরণ।
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ঘন মেঘ ডাকে
নবীন জলধর মত্ত ডাকয়ে দারুকে। .... ইত্যাদি।

সুবচনী-মঙ্গল

সুভদামঙ্গল বা সুবচনীমঙ্গল নামক একখানি ক্ষুদ্র মঙ্গলকাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।[১] একাধিক কবি যেমন দ্বিজমাধব, দ্বিজ শ্রীরামজীবন, মাধবদাস ইঁহারা এই বিষয়ে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের রচিত কাব্যই হুগলী জেলার গ্রামাঞ্চল হইতে সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

সুভদা বা সুবচনীদেবীর কোনও মূর্তি নাই। গৃহে কোনও শুভকর্ম উপলক্ষে গৃহাঙ্গিনায় একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর আকৃতি গর্ত করা হয়, তাহা দূর্ব দ্বারা পূর্ণ করা হইয়া থাকে। তারপর একটি শিলনোড়ার আকৃতি পাথর সিন্দুরে লিপ্ত করিয়া সেই গর্তের মধ্যে স্থাপন করা হয়। কলা দিয়া ২১টি হাঁস তৈরি করিয়া সেই গর্তের পার্শ্বে রাখা হয়। হাঁসগুলির মধ্যে একটি হাঁস খোঁড়া বলিয়া নির্দেশ করা হয়। সেই ভাবেই সুবচনী দেবীর পূজা হইয়া থাকে। পূর্ব বাংলায় তাঁহার পূজার রীতি কিছু স্বতন্ত্র, তবে পূর্ব বাংলায় সুবচনীর কোনও পাঁচালী কিংবা মঙ্গলকাব্য শ্রেণীর রচনা পাওয়া যায় না।

সুবচনীর মাহাত্ম্য-কীর্তন করিয়া মঙ্গলকাব্যের রীতিতে যে ক্ষুদ্র পাঁচালী জাতীয় কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাই এখানে সুবচনী-মঙ্গল বলিয়া উল্লেখ করা হইতেছে, নতুবা ইহার কোনও কবিই তাঁহার রচনাকে 'মঙ্গল' বলিয়া উল্লেখ করেন নাই—পাঁচালী বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন--

সুবচনীর চরণ ভাবিয়া অনুখন।
পাঁচালী প্রবন্ধে কিছু মাধব বচন।।

অবশ্য অনেক মঙ্গলকাব্যের কবিও তাঁহাদের রচনাকে পাঁচালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। একটি পুঁথির পুষ্পিকায় ইহাকেও 'মঙ্গল' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন 'ইতি সুভদামঙ্গল সমাপ্তং'। সুবচনীর প্রচলিত ব্রতকথাটিই এখানে পাঁচালীর আকারে রচিত হইয়াছে।

দ্বিজ মাধবের ভণিতায় দুইটি ক্ষুদ্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। একটি পুঁথিতে এই ভণিতার ব্যবহার আছে—

সুবচনীর পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
রচিল মাধব দ্বিজ অপূর্ব কথন।।

ইনি চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা দ্বিজ মাধব কি না সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাহা সত্ত্বেও চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা দ্বিজ মাধবের পুঁথি কেবলমাত্র পূর্ব বাংলার চট্টগ্রাম হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাঁহার নাম হুগলী জেলায় প্রচলিত এই ক্ষুদ্র কাব্যখানির মধ্যে কি ভাবে ভণিতারূপে ব্যবহৃত হইল, তাহাও ভাবিয়া স্থির করিতে পাওয়া যায় না।

১। ত্রিপুরারঞ্জন বসু, একটি অপ্রচলিত মঙ্গলকাব্য ; ইতিহাস (ঢাকা, ১৩৭৮), পৃ. ১৭-২৪

দ্বিতীয় পুঁথিখানিতে দ্বিজ মাধব ভণিতা নাই, অন্য প্রকার ভণিতা দেখা যায়, যেমন—

সুবচনী পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
রচিল মাধব দাস অপূর্ব কথন।।
দেবীর বচন এই করিল প্রকাশ।
রচিল মাধবলতা কহিলেন ব্যাস।।

সুতরাং এই মাধব 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর দ্বিজ মাধব নহেন। সুভদা-মঙ্গলের অন্যতম কবির নাম শ্রীরামজীবন। হুগলী জিলার আরামবাগ মহকুমার আরাণ্ডী গ্রামে কবির নিবাস ছিল। কবি তাঁহার ক্ষুদ্র কাব্যখানিতে বিস্তৃত আত্মপরিচয় দিয়াছেন, গ্রামের আশেপাশের দেবদেবীরও বন্দনা করিয়াছেন।

তীর্থমঙ্গল

আর একখানি একটু অভিনব প্রকৃতির মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াই এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। ইহা পৌরাণিক, বৈষ্ণব কিংবা লৌকিক কোনও মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত নহে। ইহার বিষয়-বস্তু স্বতন্ত্র। কাব্যখানির নাম 'তীর্থমঙ্গল'।[১] ক্রমে 'মঙ্গল' শব্দটি এত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল যে, যে কোনও বিষয়ক মাহাত্ম্যপূর্ণ কাব্য হইলেই তাহা মঙ্গল নামে অভিহিত হইত। তীর্থমঙ্গলও প্রকৃতপক্ষে একখানি তীর্থভ্রমণ কাহিনী এবং এই প্রসঙ্গেই ইহাতে তীর্থের মাহাত্ম্যাদিও বর্ণনা করা হইয়াছে। এই জন্যই ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'তীর্থমঙ্গল'।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে যে ভ্রমণ-কাহিনী কাব্যাকারে লিখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল, চৈতন্যচরিতকারগণের চৈতন্যদেবের বিস্তৃত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত রচনা হইতেই তাহা জানা যায়। অবশ্য তীর্থযাত্রা ব্যতীত পূর্বে কেহ দেশান্তর-ভ্রমণে বাহির হইত না। সেই জন্যই এই ভ্রমণ ব্যপদেশে দেশ-দেশান্তরের রীতিনীতির যেমন বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তেমনই তীর্থের দেবতাদিগেরও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। অবশ্য দেব-মাহাত্ম্যই ছিল তাহার মুখ্য বর্ণিতব্য বিষয়।

'তীর্থমঙ্গল'-রচয়িতার নাম বিজয়রাম সেন। তাঁহার নিবাস ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ভাজনঘাট। তিনি জাতিতে বৈদ্য ও চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল বিশারদ। পলাশীর যুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক কালে চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত খিদিরপুরে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল নামে এক অতি ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন। কাশী যাত্রার মানসে তিনি বহু লোকজন সহ নৌকা সাজাইয়া গঙ্গাপথে রওনা হইলেন। পথিমধ্যে পুঁটিমারীতে তাঁহার নৌকা আসিয়া লাগিল। এখান হইতে দুইজন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণচন্দ্রের

১। বিজয়রাম সেন, তীর্থমঙ্গল, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত (সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২২)

সহযাত্রী হইলেন। কবি বিজয়রাম সেনও আসিয়া ঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সহানুগমনের প্রার্থনা জানাইলেন। সঙ্গে একজন চিকিৎসক লওয়া ভাল বিবেচনা করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র ইহাতে আপত্তি করিলেন না। কবি সেখান হইতেই তাঁহার সঙ্গী হইলেন। অতঃপর নবদ্বীপ, হাঁড়রা, ঝিনুকঘাটা, টুঙ্গীবালী, জলঙ্গী, রাজমহল, মুঙ্গের, গয়া, রামনগর, কাশী, প্রয়াগ, বিন্ধ্যগিরি হইয়া পুনরায় ফিরিবার পথে মুঙ্গের, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ হইয়া ১১৭৭ সন ভাদ্র মাসে তাঁহারা সকলে খিদিরপুর প্রত্যাবর্তন করেন।

> সাতাত্তরি সনেতে আর ভাদ্রপদ মাসে।
> বিশারদে কহে পুঁথি কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে।।
> শিবনিবাস সন্নিধানে ভাজনঘাট ধাম।
> কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে কহে সেন বিজয়রাম।।
> শুন শুন মহাশয় বলিগো তোমারে।
> মহাশয়ে আন্যা দিলাম বিদায় কর মোরে।।

তীর্থযাত্রীদের মধ্যে একবার মারাত্মক বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হয়, বিজয়রামের চিকিৎসায় অনেকেই আরোগ্য লাভ করে, এই কারণে বাটি ফিরিয়া কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন।

অত্যন্ত নিঁখুতভাবে বিজয়রাম প্রত্যেকটি স্থানের বর্ণনা দিয়াছেন। বিন্ধ্যগিরি দর্শন করিয়া ফিরিবার পথে তাঁহারা মির্জাপুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মির্জাপুরের বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন,—

> গঙ্গার তীরেতে গ্রাম বড়ই সহর।
> যাহা চাহে তাহা মিলে সামগ্রী বিস্তর।।
> স্নান পূজা ভোজন করিয়া মহাশয়।
> আনন্দে সামগ্রী লয়েন যাহা মনে লয়।।
> দুলিচা গালিচা আদি শতরঞ্চি শীল।
> নানাবর্ণে ছিট লয়েন হয়্যা হৃষ্ট দিল্।।
> অল্প কর‍্যা দ্রব্য লৈল যার কিছু নাই।
> শীল জাঁতা লয়্যা কৈল নৌকায় বোঝাই।।

কবি তাঁহার রচনাখানিকে 'তীর্থমঙ্গল' বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন,—

> তীর্থ মঙ্গল গানে, মনোযোগে যেই শুনে
> তাঁহাকে সদয় হন শিব।

কবির রচনা লালিত্যহীন, কিন্তু তাঁহার বর্ণনাগুলি সর্বত্র স্পষ্ট ও যথাযথ।

অন্যান্য দেবীমঙ্গল কাব্য

উল্লিখিত বিবিধ বিষয়ক মঙ্গলকাব্য ব্যতীত স্থানীয় ও পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কীর্তন করিয়া ক্ষুদ্র পাঁচালীর আকারে বহু আখ্যায়িকা কাব্য সেই যুগে রচিত হইয়াছিল—কিন্তু প্রকৃত মঙ্গলকাব্যের মর্যাদায় ইহাদের আর একখানিও উন্নীত হইতে পারে নাই। ইহাদের মধ্যে শিবানন্দ কর নামক একজন কবি রচিত 'লক্ষ্মীমঙ্গল' নামক একখানি কাব্য. একটু ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু 'লক্ষ্মীমঙ্গল', 'দেবী-ভাগবত' নামক একখানি অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণের অন্তর্গত নবম স্কন্ধ. একচত্বারিংশৎ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ মাত্র। অতএব ইহা প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন বাংলার অনুবাদ-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

মঙ্গল নামক পৌরাণিক আরও কতকগুলি পদ্যরচনা মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে প্রচলিত ছিল। তাহাদের মধ্যে 'কপিলা-মঙ্গল' নামক একখানি কাব্য বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। 'কপিলা-মঙ্গল' ভাগবতের কাহিনী-বর্ণিত ব্রহ্মা কর্তৃক কপিলা ধেনু হরণের বৃত্তান্ত লইয়া রচিত। ইহার কাহিনীকেও জাতীয় কোন রূপ দিবার চেষ্টা করা হয় নাই। তবে ইহাদের রচনায় কোনও কোনও স্থানে সমসাময়িক মঙ্গলকাব্যের বহিরঙ্গগত প্রভাব স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। তবে এই বিষয়বস্তু লইয়া পশ্চিম সীমান্ত বাংলার কোনও কোনও অঞ্চলে মৌখিক এক গীতিকাহিনী রচিত হইয়াছে, তাহা লোকসাহিত্যের অন্তর্গত, মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত নহে।

পূর্ববঙ্গে ত্রিপুরা জেলার বরদাখাত পরগণার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বরদেশ্বরীর মাহাত্ম্য-কীর্তন করিয়া 'বরদা-মঙ্গল' নামক একখানি কাব্য রচিত হইয়াছিল।[১] ইহার একমাত্র পুঁথির পত্রসংখ্যা ৫৫, রচয়িতার নাম ছিল নন্দকিশোর। তিনি ত্রিপুরা জেলার শ্রীকাইল গ্রামের নিকটবর্তী রোয়াচোলা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহার স্বহস্তলিখিত পুঁথির লিপিকাল ১২২৬ সন অর্থাৎ ইংরেজী ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ। বিবিধ পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের ভিত্তির উপর ইহাতে এই লৌকিক দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। এই বিষয়ে ইহা আমাদের পূর্ব-বর্ণিত 'গোসানীমঙ্গল' কাব্যের অনুরূপ। কামরূপ কামাখ্যার কামাখ্যাদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াও কয়েকখানি মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে, তাহা 'কামাখ্যা-মঙ্গল' নামে পরিচিত।[২] এই প্রকার স্থানীয় দেবতার লৌকিক মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া আরও মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়া থাকিবে; কিন্তু তাঁহাদের সকলের পরিচয় জানিতে পারা যায় না।

১। সা-প-প ৫৯, ১-১২
২। অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের নিকট ইহার পুঁথি আছে।

সপ্তম অধ্যায়

ঐতিহাসিক কাব্য

যদিও পূর্ববর্ণিত অনেক মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যের বহু উল্লেখ আছে, তথাপি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে সমগ্রভাবে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া মঙ্গলকাব্যের পরিবেশের মধ্যে কোনও উল্লেখযোগ্য রচনাই প্রকাশিত হয় নাই।[১] কারণ, তখন হইতেই মঙ্গলকাব্য রচনার গতানুগতিক বিধিনিয়মের বন্ধন শিথিল হইতে আরম্ভ করে এবং যে দেবতা এতদিন পর্যন্ত ইহার উপলক্ষটুকু মাত্র হইয়া ছিলেন, তিনিও সেই যুগেই এই শ্রেণীর আখ্যায়িকা-কাব্য রচনার ক্ষেত্র হইতে এক প্রকার বিদায় গ্রহণ করেন। তখন হইতেই দেবতার মধ্যস্থতা বাদ দিয়া, দেবতার স্বপ্নাদেশ ব্যতিরেকেই প্রত্যক্ষভাবে মানুষ নিজের ব্যবহারিক সুখদুঃখের কাহিনী আখ্যায়িকা কাব্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই সকল কাব্যে দেবতাকে কাহিনীর মধ্যে কোনও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া না হইলেও, ইহাদের আখ্যায়িকার কাঠামো রচনায় প্রচলিত আখ্যায়িকা কাব্য বা মঙ্গলকাব্যের ধারাটিকেই বহুলাংশে অনুসরণ করা হইয়াছে। যদিও দেবতার উল্লেখ ইহাতেও আছে, তথাপি সমগ্রভাবে ইহা দেবতা-বিষয়ক কাব্য নহে, মানুষেরই সাংসারিক অভিজ্ঞতা বিষয়ক (secular) কাব্য। আলোচনার সুবিধার জন্য ইহাদিগকে ঐতিহাসিক কাব্য বলিয়া উল্লেখ করা যাইতেছে। মঙ্গলকাব্যের কি পরিণতি হইয়াছিল, ইহা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, পূর্ববর্তী যুগের ধর্মমঙ্গল কাব্য ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। তথাপি ধর্মমঙ্গল ইতিহাস না হইয়া কাব্যই হইয়াছে; কারণ, কবিকল্পিত মানব ও দেব চরিত্র দ্বারা ইহার ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক ঘটনার খুঁটিনাটি সেখানে কবি কিংবা পাঠক কাহারও লক্ষ্য ছিল না—দেবতাই ছিল সেখানে লক্ষ্য। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই দৃষ্টিভঙ্গির কতকটা পরিবর্তনের ফলে ঐতিহাসিক ঘটনার খুঁটিনাটির উপর কবি ও তাঁহার পাঠকের দৃষ্টি কতকটা নিবদ্ধ হইয়াছিল। যদিও এই দৃষ্টি সম্পূর্ণ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক দৃষ্টি বলা যায় না, তথাপি ইহাতে এদেশে ইহার সর্বপ্রথম উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়—ইহার ভিতর দিয়া প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নূতন একটি ধারার উদ্বোধন হইয়াছিল, কিন্তু ইহা অধিকদূর অগ্রসর হইবার পূর্বেই পাশ্চাত্ত্য আদর্শসম্মত বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইতিহাস আলোচনার পদ্ধতি এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়—তাহার ফলে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর এই বিবরণ মাত্র কয়খানি কাব্যই সেকালের বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক কাব্যের নিদর্শন হইয়া রহিয়াছে।

১। Asutosh Bhattacharya, 'Medieval Bengali Narrative Poetry on Historical Themes, I, H.Q. XX, 21-35.

'মহারাষ্ট্র-পুরাণ'

ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ'।[১] ইহার রচয়িতার নাম গঙ্গারাম। ইহার প্রকৃত রচনাকাল জানা যায় না; কারণ, পুঁথিতে এই বিষয়ের কোনও উল্লেখ নাই, কিন্তু পুঁথিখানি ১৬৭২ শক ও ১১৫৮ বঙ্গাব্দে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইহাতে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। গ্রন্থমধ্যে যে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা মাত্র ইহার ছয়-সাত বৎসর পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল। অতএব পুঁথিখানি লেখার তারিখ ইহার রচনারও তারিখ হইতে পারে। পুঁথিখানি কবির স্বহস্তলিখিত হওয়াও কিছুই আশ্চর্য নহে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলায় বর্গীর আক্রমণ একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গের ছেলেভুলানো ছড়া ও লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ে ইহার প্রভাব অনুভব করা যায়। এই ঐতিহাসিক ঘটনাই গঙ্গারামের কাব্যের অবলম্বন। সম্ভবত তাঁহার কাব্যের একটি কাণ্ড বা অধ্যায় মাত্র রচিত হইয়াছিল। এই কাণ্ডের নাম 'ভাস্কর পরাভব'। প্রথমত ইহার কাহিনী বর্ণনা করিয়া পরে ইহার ঐতিহাসিকতা নির্ণয় করা যাইতেছে।—

পাপের ভারে পৃথিবী ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন—তিনি ব্রহ্মার নিকট গিয়া বলিলেন,—'আর পারি না, এই ভার হইতে আমাকে মুক্ত কর।' ব্রহ্মা শিবকে ডাকিয়া বলিলেন, 'পৃথিবীর একটা বিধান কর।' শিব নন্দীকে ডাকিলেন, —বলিলেন, 'তোমাকে এখনই মর্ত্যলোকে যাইতে হইবে—

নন্দীরে ডাকিয়া শিব বলিছে বচন।
'দক্ষিণ সহরে তুমি যাহ ততক্ষণ।।
সাহু রাজা নামে এক আছে পৃথিবীতে।
অধিষ্ঠান হও যাইয়া তাহার দেহেতে।।
বিপরীত পাপ হইল পৃথিবী উপরে।
দূত পাঠাইয়া যেন পাপী লোক মারে।।'

নন্দী কালবিলম্ব না করিয়া দক্ষিণ শহরে সাহুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সকল কথা খুলিয়া বলিল। রাজা সাহু রাজা রঘুর নিকট গিয়া বলিলেন, 'দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে সংবাদ লও,—কেন কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলার চৌথ পাইতেছি না।' রাজা রঘু সম্রাটের নিকট এই বিষয়ে এক পত্র লিখিলেন। সম্রাট তাহার উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন,—'ভৃত্য প্রভুকে বধ করিয়া বাংলার মস্‌নদ অধিকার করিয়াছে। আমাকে সে কোনও নজরানা পাঠায় না। আমার সৈন্য নাই যে আমি ইহার প্রতিবিধান করি। দুই বৎসর

১। ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্তৃক প্রকাশিত, সা-প-প ১৩, ২৯০-৬৬। ইহার একমাত্র পুঁথি ময়মনসিংহ জেলার ধরীশ্বর গ্রাম হইতে স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদার কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। (সা-প-পা ১৫, ২৫৩)।

হইয়া গেল বাংলা হইতে এক কানাকড়িও দিল্লীতে পৌঁছায় নাই। বাংলার নবাব এখন স্বাধীন—অতএব তাঁহার নিকট হইতেই তোমরা চৌথ আদায় কর, আমাকে আর এইজন্য বিরক্ত করিও না।' এই উত্তর পাইয়াই রাজা রঘু তাঁহার দেওয়ান ভাস্করকে চল্লিশ হাজার মারাঠা সৈন্যের অধিনায়ক করিয়া বাংলার চৌথ আদায় করিতে পাঠাইলেন। সাতারা হইতে ভাস্কর বিজাপুর আসিয়া এক রাত্রি অতিবাহিত করিলেন, দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া নাগপুর আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখান হইতে তিনি একজন গুপ্তচর পাঠাইয়া জানিলেন, বাংলার নবাব তখন বর্ধমানে রাণীদীঘির তীরে তাঁবু ফেলিয়া বাস করিতেছেন। বীরভূম বামে রাখিয়া গোয়ালাভূমির উপর দিয়া ১৯শে বৈশাখ ভাস্কর বর্ধমানে পৌঁছিলেন এবং শহরটিকে অবরোধ করিলেন। নবাব পূর্ব হইতে বর্গীর এই অভিযানের কথা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই। বর্ধমান শহর অবরোধ হওয়ার পর একজন গুপ্তচর আসিয়া নবাবকে বিস্তৃত সংবাদ দিল।

নবাব মুস্তাফা খাঁকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দিল্লী হইতেই বর্গীরা বাংলার চৌথ পাইত, এখন তাহারা নিজেরা চৌথ আদায় করিবার জন্য বাংলায় আসে কেন?' মুস্তাফা খাঁ ইহার জবাব জানিবার জন্য ভাস্করের নিকট একজন উকিল পাঠাইলেন। ভাস্কর উত্তরে জানাইলেন, দিল্লীর সম্রাটই তাঁহাদিগকে বাংলা হইতে নিজেদের চৌথ আদায় লইতে বলিয়াছেন—অতএব নবাব তাহা পরিশোধ করুন উত্তম, নতুবা গ্রাম ও শহর লুট করিয়া তাঁহারা নিজেরাই তাহা আদায় করিয়া লইবেন। নবাব কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। সৈন্যনায়কগণ পরামর্শ দিলেন, বর্গীদিগকে টাকা না দিয়া সেই টাকা বরং নবাবের সিপাহীদিগকে দেওয়া হউক—তাহার বিনিময়ে তাহারাই বর্গীদিগকে হটাইয়া দিবে। নবাব ইহাতে সম্মত হইলেন এবং সমস্ত সমস্যার সমাধান হইয়া গেল ভাবিয়া প্রফুল্লচিত্তে বাটা হইতে পান লইয়া নিজে খাইলেন ও পার্শ্বস্থ সকলের মধ্যে বিতরণ করিলেন। নবাবের সিপাহীর দল বর্গীদিগকে পাল্টা আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ভাস্করও নবাবের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া প্রতি-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সাত দিন যাবৎ বর্ধমান শহর অবরুদ্ধ হইয়া রহিল, শহরের লোকের দুঃখ-দুর্দশার সীমা রহিল না। বর্গীদিগের ভয়ে লোক ঘরের বাহির হইতে পারে না, খাদ্যদ্রব্য মহার্ঘ ও দুর্লভ হইল। গরীবেরা অনাহারে মরিতে লাগিল; এমনকি, নবাবকেও কলার বীচি খাইয়া কোন রকমে দিন কাটাইতে হইল। ক্রমে অবরুদ্ধ অবস্থা শহরবাসীর পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। নবাব বর্গীদিগকে আক্রমণ করিয়া শহর অবরোধমুক্ত করিবার জন্য তাঁহার সেনাপতিকে আদেশ দিলেন। একদল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া মুস্তাফা খাঁ বর্গীদিগকে আক্রমণ করিলেন। বর্গীরাও প্রতি-আক্রমণ করিল। নবাবের পক্ষে পশ্চাদ্‌রক্ষী সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন মীর হাবিব। বর্গীদের প্রতি-আক্রমণে তাঁহার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইল—তিনি প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেলেন! বর্গীরা নবাবের তাঁবুতে আগুন লাগাইয়া দিল। নবাবের সেনাপতি মুসাহাব খাঁ বর্গীদিগের পার্শ্বরক্ষী সৈন্যদিগের উপর এক আকস্মিক আক্রমণ করিয়া নবাবের পলায়নের পথ করিয়া দিলেন—নবাব সেই পথে পলাইয়া একেবারে কাটোয়াতে গিয়া তাঁবু ফেলিলেন। নৌকাযোগে কাটোয়ায় নবাবের খাদ্য সরবরাহ করা হইল। ভয়ে

লোক চারিদিকে দৌড়াইতে লাগিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিত, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, কাঁসারু, কর্মকার, তাঁতী, জেলে, যে যাহার বৃত্তি ফেলিয়া পলাইল। অন্তঃপুর হইতে নারীগণও বাহির হইয়া আসিয়া পলাইবার পথ সন্ধান করিতে লাগিল। বর্গীরা তাহাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ তরবারি ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। কেহ কাহাকেও রক্ষা করিবার নাই। বর্গীদিগের অত্যাচারে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ জনশূন্য হইয়া গেল। তাহারা লোকের ঘরবাড়ি পুড়াইয়া দিতে লাগিল। তারপর ক্রমে বর্ধমান শহর, চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর, দিঙ্নগর, ক্ষীরপাই, নিমগাছি, শেরগাঁও, সিকুলিয়া, চণ্ডীপুর এবং শ্যামপুর গ্রামসমূহ পুড়াইয়া দিয়া বর্গীরা হুগলী বন্দরে পৌঁছিল। সেখানকার সৈন্যাধ্যক্ষ পীর খাঁ সসৈন্যে তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন—তাঁহার জন্যই সেখানে বর্গীরা আর কিছু করিতে পারিল না। তাহারা অন্য এক পথ ধরিয়া ভাগীরথী অতিক্রম করিল এবং মুর্শিদাবাদে গিয়া পৌঁছিল। মুর্শিদাবাদে তাহারা জগৎ শেঠের প্রাসাদ লুট করিল। নবাবের দুইজন সেনাপতি হাজি আহ্‌মদ ও নোয়াজিস্ মহম্মদ অতি কষ্টে নবাবের প্রাসাদ রক্ষা করিলেন। বর্গীরা মুর্শিদাবাদ লুট করিতেছে শুনিয়া নবাব সসৈন্যে কাটোয়া হইতে মুর্শিদাবাদ ফিরিলেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র বর্গীরা কৌশলে নগর ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেল। জগৎ শেঠের প্রাসাদ লুট করিয়া বর্গীরা আড়াই কোটি টাকা পাইল। ভাগীরথী অতিক্রম করিয়া ভাস্কর কাটোয়ায় গিয়া তাঁবু ফেলিলেন—সেখানে গিয়া তিনি তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে নতুন করিয়া গঠন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সকল সৈন্য লইয়া সেখানে তিনি সমস্ত কাটোয়া শহর ও তাহার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামে শিবির করিলেন। অচিরেই বর্ষা আরম্ভ হইল—লুটতরাজ আর সম্ভব হইল না। কেবল পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে ভাস্কর খাজনা আদায় করিতে লাগিলেন।

ক্রমে আশ্বিন মাস পড়িল। মহাসমারোহে ভাস্কর দুর্গাপূজা সম্পন্ন করিলেন। ইতিমধ্যে বর্গীরা গঙ্গার উপর দিয়া এক সেতু নির্মাণ করিয়া লইয়াছে। একদিন তাহারা সেতুর উপর দিয়া নদীর পূর্বতীরে উপস্থিত হইল। ইহা শুনিবামাত্র নবাব ষাট হাজার ঘোড়া ও দেড় লক্ষ সৈন্য লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই বিপুল সৈন্য তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিল। বর্গীরা তাহাদের সেতুপথে কোনও রকমে নদী পার হইয়া সেতুটি তৎক্ষণাৎ ভাঙিয়া দিল। নবাবের সাহায্যের জন্য পূর্ণিয়া ও পাটনা হইতে সৈন্য প্রেরিত হইল। নবাব সসৈন্যে ভাগীরথী পার হইতে চাহিলে বর্গীরা তাহাতে প্রাণপণ বাধা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নবাবের সৈন্য নৌকাযোগে নদী পার হইয়া অজয়ের তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গেল। অজয় পার হইবার কালে নবাবসৈন্যের মধ্যে এক দুর্ঘটনার ফলে তাহাদিগকে সাঁতরাইয়া তীরে উঠিতে হইল—তাহারা বর্গীর পিছনে আর অগ্রসর হইতে পারিল না। বর্গীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া নিজ দেশে পলাইয়া গেল।

সেই বৎসরই চৈত্র মাসে ভাস্কর বর্গীর দল লইয়া পুনরায় আসিয়া বাংলাদেশ আক্রমণ করিলেন। এইবার তাঁহার অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইল, গো-ব্রাহ্মণ ও নারী নির্বিচারে বধ করা হইতে লাগিল। এইবার আসিয়াও তিনি কাটোয়াতে তাঁবু ফেলিলেন। নবাবও তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়া মানকরে তাঁবু ফেলিলেন। আলী ভাই নামক

এক ব্যক্তি ভাস্করকে কহিলেন, 'এইভাবে বারবার আক্রমণ করিয়া সৈন্যক্ষয় করিবার প্রয়োজন কি? নবাবের সঙ্গে এই বিষয়ে একটা আপোস-মীমাংসা করিয়া লইলেই তো হয়?' ভাস্কর বলিলেন, 'বেশ, নবাব যদি ইহাতে রাজী হন, তাহা হইলে আমার আপত্তি কি? তুমি বরং নবাবের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ কর।' আলী ভাই নিরস্ত্র অবস্থায় একাকী নবাবের সম্মুখীন হইয়া ভাস্করের প্রস্তাব তাঁহাকে জানাইল। আলী ভাই বলিল, 'যদি আপনার দুইজন সরদারকে আমার সঙ্গে দেন, তবে ভাস্করকে আমি নিজেই তাহাদের সঙ্গে করিয়া আপনার সম্মুখে লইয়া আসিতে পারি। আপনারা দুইজনে সামনা-সামনি সন্ধির সর্ত বিষয়ে আলোচনা করুন।' নবাবের পক্ষ হইতে জানকীরাম ও মুস্তাফা খাঁ আলী ভাইকে লইয়া ভাস্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য গেল। তাহারা ভাস্করকে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করিল, কিন্তু ভাস্করের লোক তাঁহাকে এই কাজ করিতে নিষেধ করিল। ইহাতে জানকীরাম গঙ্গাজল ও মুস্তাফা খাঁ কোরান স্পর্শ করিয়া ভাস্করের নিরাপত্তার ভার নিজেদের উপর গ্রহণ করিল। মাত্র কুড়িজন সঙ্গী লইয়া ভাস্কর নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। সেদিন শনিবার, ২রা বৈশাখ। ভাস্কর নিরস্ত্র হইয়া একাকী নবাবের সম্মুখীন হইলেন—তাঁহার সঙ্গিগণ বাহিরে রহিল। সামান্য দুই একটি কথার পর নবাব একটি সামান্য কারণ দেখাইয়া বাহির হইয়া গেলেন—তাঁহার ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া ভাস্কর উঠিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় নবাবের লোক তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিল। তাঁহার সঙ্গিগণও নিস্তার পাইল না। নবাবের শিবির আনন্দ-কোলাহলে নিমগ্ন হইল।

এই কাহিনীতে ঐতিহাসিক তথ্য সমাবেশ করিতে কবি যথেষ্ট নিপুণতা দেখাইয়াছেন। কারণ, উপরে যে সকল ঘটনা পর পর বর্ণনা করা হইল, তাহাদের সঙ্গে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের বিশেষ অনৈক্য নাই।[১] দুই-এক জায়গাতে অতি সামান্য যে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, তাহা উপেক্ষা করা যাইতে পারে। কবি দক্ষিণ দেশের রাজা বলিয়া রাজা সাহুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন—অবশ্য দক্ষিণ দেশ বলিতে কবি দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত মহারাষ্ট্র দেশই যে মনে করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে কোনও অসুবিধা হয় না। মহারাষ্ট্রপতি ও তাঁহার অনুচরদিগের নামোল্লেখ করিতে কবি ভুল করেন নাই। রাজা সাহু বলিতে শিবাজীর পৌত্র রাজা সাহুর কথাই মনে করা হইয়াছে। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা সাহুর মৃত্যু হয়, কিন্তু তাহার পূর্বেই তিনি মহারাষ্ট্রের শাসনভার বালাজী বাজিরাওয়ের হাতে অর্পণ করেন। বালাজী বাজিরাও ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মহারাষ্ট্র জাতির অধিনায়ক ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে যখন ভাস্কর বাংলা আক্রমণ করেন, তখন রাজা সাহু জীবিতই ছিলেন। রাজা রঘু বলিতে কবি নিশ্চয়ই বেরারের ভোঁসলা পরিবারের প্রতিনিধি রঘুজী ভোঁসলার কথা মনে করিয়াছেন। বালাজী বাজিরাওয়ের সময় মারাঠাগণ যে দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে বাংলার রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ বা চৌথ আদায় করিত, তাহাও ঐতিহাসিক সত্য।

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে আলীবর্দী খাঁ নবাব সরফরাজ খাঁর নিকট হইতে বাংলার মসনদ

১। H. B. II., 455-61 দ্রষ্টব্য।

অধিকার করিয়া লন। দেশের আভ্যন্তরিক গোলযোগের জন্য ইহার পর দুই বৎসর বাংলার রাজস্ব দিল্লীতে প্রেরিত হয় নাই। সেইজন্য মারাঠাগণও তাহাদের চৌথ হইতে বঞ্চিত হয়। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরের শাসনকর্তা রঘুজী ভোঁস্‌লা ভাস্কর রাম কৌলহৎকারের অধীনে একদল মারাঠা সৈন্য দিয়া তাঁহাকে চৌথ আদায় করিবার জন্য বাংলায় পাঠান। মারাঠাগণ পশ্চিমবঙ্গ আক্রমণ করিয়া তাহার অন্তর্গত কতকগুলি স্থান অধিকার করিয়া লয় এবং অর্থ আদায়ের জন্য তথাকার লোকজনের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে। প্রথম বারের আক্রমণ শেষ পর্যন্ত আলীবর্দী প্রতিহত করিতে সমর্থ হন। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রঘুজীর সেনাপতি ভাস্কর পুনরায় বাংলা আক্রমণ করেন—সেইবার আলীবর্দী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ভাস্করকে হত্যা করেন, ফলে মারাঠা সৈন্য ছত্রভঙ্গ লইয়া পলাইয়া যায়। এই ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরই গঙ্গারাম তাঁহার কাহিনী রচনা করিয়াছেন। উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ অনুসরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গঙ্গারামের কাহিনীর সঙ্গে তাহাদের ঐক্য আছে। অতএব গঙ্গারামের এই রচনাটি অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনার নির্ভুল বিবরণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। গঙ্গারামের উল্লিখিত কোনও কোনও বিষয় ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া না গেলেও, তাহাও একেবারে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না, —প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবেই হউক, কিংবা নির্ভরযোগ্য কোনও তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়াই হউক, গঙ্গারাম তাহা রচনা করিয়া তাঁহার কাব্যমধ্যে স্থান দিয়া থাকিবেন, এই বিষয়ে ইতিহাসের সঙ্গে তাঁহার এই রচনাখানি সমপর্যায়ভুক্ত হইতে পারে। কল্পনার রশ্মি গঙ্গারাম অত্যন্ত সংযত করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে কবিত্বের নিতান্ত অভাব ছিল বলিয়াই নীরস ঐতিহাসিক তথ্যগুলিই তাঁহার রচনায় সহজ স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে।

গঙ্গারাম দত্ত

গঙ্গারাম তাঁহার রচনার মধ্যে নিজের কোনও পরিচয় দিয়া যান নাই। স্বর্গত ব্যোমকেশ মুস্তফী মনে করেন যে, কবি রাঢ়ের অধিবাসী ছিলেন।[১] কিন্তু ইহার স্বপক্ষে একমাত্র যুক্তি এই যে, তাঁহার কাব্যে তিনি রাঢ় দেশে সংঘটিত একটি ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ মনে করেন, গঙ্গারাম যশোহরের অন্তর্গত নড়াইলের অধিবাসী।[২] ইহারও একমাত্র যুক্তি এই, নড়াইলে গঙ্গারাম দত্ত নামক রামায়ণের একজন অনুবাদকের নিবাস ছিল। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি এই যে, রামায়ণের অনুবাদক গঙ্গারাম দত্তের সময় জানা যায় নাই—রামায়ণের অনুবাদকের ভাষা ও 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ'-এর ভাষায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য, রামায়ণের অনুবাদ সংস্কৃত-প্রভাবিত ও তৎকালীন প্রচলিত সাধুরীতিসম্মত, কিন্তু 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ' আনুপূর্বিক পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চলের কথ্যভাষায় রচিত। অতএব রামায়ণের অনুবাদ-রচয়িতা গঙ্গারাম দত্তই 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ'-এর গঙ্গারাম একথা স্বীকার করা যায় না।

১। সা-প-প ১৩, ২৫৭; ২। সা-প-প ৪৬, ৪০

একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ'-এর একমাত্র পুঁথি ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত ধারীশ্বর গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে—এবং এই অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষাতেই যে ইহা রচিত, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। স্বর্গত মুস্তফী মহাশয় বলিয়াছেন, পুঁথির পূর্ববঙ্গবাসী অনুলিপিকার ইহা তদ্দেশীয় ভাষায় পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের বহু কবির পুঁথি পূর্ববঙ্গে আবিষ্কৃত হইয়াছে—কিন্তু এই প্রকার আনুপূর্বিক ভাষা পরিবর্তীকরণের দৃষ্টান্ত আর কোনও পুঁথিতে দেখা যায় নাই,– কবির জীবদ্দশাতেই তাহা আরও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। অতএব যথার্থই মনে করা হইয়াছে যে পুঁথিখানি কবিরই স্বহস্তলিখিত।[১] সুতরাং পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চলই যে কবির নিবাস তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

অতএব যিনি মনে করিয়াছেন, গঙ্গারাম ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ধারীশ্বর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন, তাঁহার অনুমান যথার্থ।[২] গঙ্গারামের বংশধরগণ আজও ঐ গ্রামে বসবাস করিতেছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে গঙ্গারামের সম্পর্কে এই বিবরণ জানিতে পারা যায়—গঙ্গারাম ঈশা খাঁর বংশধর জঙ্গলবাড়ির দেওয়ানদিগের অধীনস্থ একজন নায়েব ছিলেন। সম্ভবত মুর্শিদাবাদে বর্গীর আক্রমণের সময় তিনি তাঁহার প্রভুর দেয় রাজস্ব পরিশোধ করিবার জন্য মুর্শিদাবাদ গিয়াছিলেন,—মুর্শিদাবাদে সংঘটিত ঘটনাসমূহ তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং সেখানে অবস্থান কালেই অন্যান্য প্রত্যক্ষ সূত্র হইতে এই সংক্রান্ত অন্যান্য ঘটনারও তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াই তিনি তাঁহার এই অপূর্ব অভিজ্ঞতার বিষয় এই আখ্যায়িকা কাব্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন—তাঁহার কাব্যখানির কোনও প্রচার হয় নাই, ইঁহার আর দ্বিতীয় পুঁথি পাওয়া যায় নাই।

ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠাই গঙ্গারামের রচনার একমাত্র গুণ। রচনা কিংবা ভাষাগত কোনও কৃতিত্ব তাঁহার কাব্যে প্রকাশ পায় নাই, স্থলে তাঁহার রচনা নিতান্ত গ্রাম্যতা দোষদুষ্ট। সেকালের বাংলা সাহিত্যে দেবদেবীর অলৌকিক মাহাত্ম্যসূচক গতানুগতিক রচনার মধ্যে তাঁহার এই ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেষণ বিষয়ে সতর্কতা কৌতূহলী পাঠকের নিকট একটু নূতনত্বের আস্বাদ সৃষ্টি করে মাত্র, ইহার আর কোনও গুণ নাই।

১। সা-প-প ১৫, ২৫০
২। কেদারনাথ মজুমদার, ৭৫

অষ্টম অধ্যায়

আধুনিক যুগ ও মঙ্গলকাব্য

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যখন নবজন্ম হইল, তখন হইতে প্রায় একশত বৎসর পূর্বেই বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের ধারা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তবে সাহিত্যের ধারা বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার অর্থ এই নহে যে, ইহার কোনও চিহ্ন কিংবা কোনও প্রভাবই পরবর্তী কালে ছিল না, বরং ইহার অর্থ এই যে, যে ভাব-ধারা অনুসরণ করিয়া প্রায় এক হাজার বৎসরের বাংলাভাষা সাহিত্যকে রূপদান করিয়া আসিতেছিল, তাহার গতি হ্রাস পাইল। ইহার দুইটি কারণ, প্রথমত প্রাচীন ও মধ্যযুগের যে ধারা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল, ইতিমধ্যেই তাহার প্রাণশক্তি অনেকটা হ্রাস পাইয়া গিয়াছিল। মধ্যযুগের বাংলার যে সামাজিক পরিবেশ হইতে বৈষ্ণব সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল, তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনে অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিল না। তুর্কী বিজয়ের ফলে যে সামাজিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়া বাঙ্গালীর সমাজ-মানসে মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির প্রেরণা জাগিয়াছিল, তাহাও সেদিন আর অবশিষ্ট ছিল না। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীতে আসিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারা এবং শাক্ত সাহিত্যের ধারা উভয়ই শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, ইহাদের প্রবাহ ঊনবিংশ শতাব্দীর ভিতর দিয়া অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইবার মত ইহাদের আর কোনও শক্তি ছিল না। এই অবস্থার মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই দেশের উপর এক রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখা দিল। অল্পদিনের মধ্যেই এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই প্রবর্তিত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা এই দেশের উপর দিয়া নূতন ভাবধারা প্রবাহিত করিয়া দিল। তাহার ফলে দেশের ক্ষীয়মাণ ঐতিহ্য এক প্রবলতর নূতন ভাবধারার সম্মুখীন হইল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই অবস্থা সৃষ্টি হইবার দুইটি প্রধান কারণ, প্রথমত দেশীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রাণশক্তির হ্রাস এবং দ্বিতীয়ত সেই মুহূর্তেই একটি বলিষ্ঠ পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার আবির্ভাব। দেশীয় ঐতিহ্যের ধারা যদি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও অত্যন্ত প্রবল থাকিত, তবে পাশ্চাত্ত্য ঐতিহ্য যত শক্তিশালীই হউক, কিছুতেই তাহা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যকে এমন করিয়া আচ্ছন্ন করিয়া দিতে পারিত না। মধ্যযুগে রাজনৈতিক দিক হইতে পরাজিত ও পরাধীন হিন্দুসমাজও যে তাহার জাতীয় ঐতিহ্যের ধারা রক্ষা করিয়াছিল, তাহার কারণই এই যে, সেদিন বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যেও জাতীয় চেতনায় যে প্রাণশক্তি ছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীতে নূতন পরাধীনতার মধ্যে তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। মধ্যযুগের পরাধীন হিন্দুসমাজ বিজয়ী জাতির ধর্ম ও সাহিত্য-চিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছে, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর পরাধীন বাঙালী-সমাজ বিজয়ীর নিকট চিন্তায় ও কর্মে সর্ববিষয়ে যে দাসত্ব বরণ করিয়া লইয়াছিল তাহার ইহাই কারণ।

জগতের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, যে সকল জাতির একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থাকে, যে কোনও কারণেই হউক তাহা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া সাংস্কৃতিক

জীবনে তাহার সম্পূর্ণ পুনর্জন্ম হয় না, প্রাচীন ঐতিহ্যের ক্ষীয়মাণ ধারাকে পরিপুষ্ট করিয়াই জাতীয় জীবনের পুনর্জাগরণ দেখা দেয়। জাতীয় সাংস্কৃতিক উপকরণ কিংবা জাতীয় ঐতিহ্যের ধারা সম্পূর্ণ লুপ্ত করিয়া দিয়া যে 'সভ্যতা'র সৃষ্টি হয়, তাহাকে আর যাহাই বলা যাক না কেন, জাতীয় অভ্যুত্থান বলা যায় না। কারণ, অভ্যুত্থান কথাটির সঙ্গে জাতীয় কথাটি যুক্ত থাকিবার ফলে বরং ইহাই মনে হইতে পারে যে, নানা কারণে যে সকল জাতীয় সাংস্কৃতিক উপকরণ জাতির জীবন হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ইহার লক্ষ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীকেও বাঙ্গালীর জাতীয় পুনর্জাগরণের যুগ বলিয়া সকলেই অভিহিত করিয়া থাকেন। ইহা যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে ইহার মধ্যেও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন উপকরণকেই পরিপুষ্ট করিবার প্রেরণা কার্যকরী হইবে, তাহা কোনদিক হইতেই যে পরিত্যক্ত হইবে তাহা নহে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত আসিয়া বাঙ্গালী প্রায় সকল বিষয়েই রিক্ত হইয়া গিয়াছিল। সে বিষয়ে ভারতচন্দ্রের মত প্রতিভাশালী কবিও প্রাচীন পর্যুষিত রীতির মুখ রক্ষা করিতে গিয়া অন্নদা-মঙ্গল, কালিকা-মঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর রচনাতেই তাঁহার প্রতিভাকে সীমাবদ্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহার পদানুসরণকারীরা তাঁহার শিল্পকুশলতার অধিকারী না হইবার ফলে কেবলমাত্র দোষটুকু অনুকরণ করিয়া সে-যুগের বাংলা সাহিত্য হইতে সজীব প্রাণের স্পর্শ দূর করিয়া দিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের পরবর্তীকালেই দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে বাঙ্গালীর চিন্তা ও কর্মে যে বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল, তাহার মধ্যে সাহিত্যের সংস্কার জাতির জীবনে গৌণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই অরাজকতার যুগে জাতির সম্মুখে সাহিত্য-সৃষ্টির যে অস্পষ্ট আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর নবযুগে নূতন কোনও প্রেরণা সঞ্চার করিতে পারিল না। সেইজনাই জাতির সাহিত্যে যে ধারা নিরবচ্ছিন্ন হইয়া অগ্রসর হইয়া যায়, বাংলা সাহিত্যে তাহার ব্যতিক্রম দেখা দিল। তথাপি সেদিনকার বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যতখানি সাংস্কৃতিক উপকরণ তখনও আচার এবং আচরণ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াও অস্পষ্ট স্মৃতি ও সংস্কারের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল, তাহাও উপেক্ষিত হইল না। বাঙ্গালীর ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে ইহাদের মধ্য দিয়াই জাতীয়তা রক্ষা পাইল। এই জাতীয়তাবোধ হইতে বাঙ্গালীর সাহিত্য ক্রমে মুক্ত হইয়া আসিলেও সেদিন যখন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রথম সংঘাতের মধ্যে বাঙ্গালীর নূতন যুগের নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন ইহা নানা দিক দিয়াই সক্রিয় ছিল। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় হইতেই তাহা উপলব্ধি করা যায়।

প্রথমত আধুনিক কাব্যসাহিত্যের কথাই ধরা যাক। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে আধুনিক যুগের প্রথম কবি কিংবা যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তাঁহার আধুনিকতা কোথায় এবং কিসের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। একথা সকলেই জানেন, ঈশ্বর গুপ্ত ইংরেজি শিক্ষিত ছিলেন না, সুতরাং অন্তরের দিক হইতে ইংরেজি সাহিত্যের কোন প্রেরণা তিনি অনুভব করিতে পারেন নাই। তাঁহার ইংরেজি সাহিত্যে প্রেরণা কেবলমাত্র বাহির হইতে লাগিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতার নাগরিক জীবনে শিক্ষা-দীক্ষা ও সমাজ-চিন্তায় যে নূতনত্ব প্রকাশ পাইতেছিল, বাহির হইতে

তাঁহার সমাজ-সচেতন মন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া কেবলমাত্র সাময়িক প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার জন্য তাঁহাকে কাব্যরচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তিনি অন্তরে বাহিরে দুই দিক হইতেই সাংবাদিক ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যিক প্রয়াস সাংবাদিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কাব্যের গঠনভঙ্গির দিক হইতে তিনি ঐতিহ্যের ধারা অতিক্রম করিতে পারেন নাই; কারণ, এই বিষয়ে তিনি ভারতচন্দ্রের শিষ্য। তবে বিষয়বস্তু ও ভাবচিন্তার দিক হইতে তাঁহার উপর ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব বিস্তারলাভ করিয়াছিল বলিয়া উনবিংশ শতাব্দীর সমসাময়িক যুগের তিনি প্রবক্তা। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রকে 'খাঁটি বাঙ্গালী' বলিয়াছেন; ঈশ্বরচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর নূতন ভাব-বাজোর অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে অকৃত্রিম বাঙ্গালিত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তাঁহার সাধনায় ঐতিহ্যের শক্তি যে কত প্রবল ছিল, তাহা অনুমান করা যাইবে। ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রের মত মঙ্গলকাব্য লেখেন নাই, তিনি বৈষ্ণব পদাবলীও রচনা করেন নাই, রামায়ণ-মহাভারত পুরাণের কাহিনীও অনুবাদ করেন নাই, অথচ তাঁহার মধ্যে খাঁটি বাঙ্গালিত্ব কোথায় তাহা সন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে, জাতীয় জীবনের যে সকল উপকরণ অবলম্বন করিয়া মধ্যযুগের জাতীয় সাহিত্য মঙ্গলকাব্যগুলি একদিন গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদিগকেই সামগ্রিকভাবে অবলম্বন না করিয়াও তাহাদের উপর বিচ্ছিন্নভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি তাঁহার কাব্যসাধনাকে রূপায়িত করিয়াছিলেন। মঙ্গলকাব্যে রন্ধন-প্রণালীর যে বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে, তাহারই ভাব 'পাঁঠা', 'পোষেড়া', 'তপসী মাছ' ইত্যাদি খণ্ড খণ্ড কবিতার মধ্য দিয়া ঈশ্বর গুপ্ত প্রকাশ করিয়াছেন, এখানে মধ্যযুগের কবি এবং আধুনিক যুগের কবির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। তবে মধ্যযুগের কবিদিগের বর্ণনা একটি সুদীর্ঘ কাহিনীর অন্তর্নিবিষ্ট, ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে কাহিনী-নিরপেক্ষভাবেই বর্ণনাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

আমরা দেখিতে পাইয়াছি, মঙ্গলকাব্য রচনার শেষযুগে ইহার কাহিনী শিথিলবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্য কতকগুলি শিথিলবদ্ধ গীতি-কবিতার সমষ্টি মাত্র। সুতরাং একথা অনুমান করিতে পারা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীতে যদি ইংরেজের আবির্ভাব নাও ঘটিত, তথাপি মঙ্গলকাব্যের দৃঢ়সংবদ্ধ কাহিনীরূপের কোনও অস্তিত্ব থাকিত না; ঈশ্বর গুপ্ত যে ভাবে ইহার বিভিন্ন অংশকে বিচ্ছিন্ন গীতি-কবিতার আকারে পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন, ইহার সাধারণ পরিণাম তাহাই হইত। সুতরাং ইংরেজি সাহিত্য সম্পর্কে অজ্ঞ ঈশ্বর গুপ্ত যে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাববশত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আধুনিক গীতি-কবিতা রচনার ধারা প্রবর্তিত করিলেন, তাহা নহে; এ দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া কাব্য রচনার যে ধারা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল, তাহাই অনুসরণ করিয়া তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন।

তবে একথা সত্য, কতকগুলি নূতন ভাব বাংলা কবিতার জীর্ণ দেহের মধ্যে তিনি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। প্রথমত তাঁহার ঈশ্বর-চিন্তা এবং দ্বিতীয়ত তাঁহার স্বদেশ-চিন্তা। মধ্যযুগে যে সুনিবিড় ভক্তির ভাব শাক্ত সাহিত্য এবং বৈষ্ণব সাহিত্য উভয়েরই প্রাণস্বরূপ ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহাই শিথিল হইয়া গিয়া রামপ্রসাদের মাতৃসাধনার মধ্য দিয়া

অনেকটা একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা হইতেছিল। ঈশ্বর গুপ্তের ঈশ্বর-চিন্তা প্রকৃতপক্ষে তাহারই ধারা অনুসরণ করিয়া বিকাশলাভ না করিলেও তাঁহার একেশ্বরবাদ যে বাঙ্গালীর জাতীয় অধ্যাত্ম-চিন্তার ক্রমবিকাশের ধারার বিপরীতধর্মী কোনও চিন্তা কিংবা ভাব ছিল না, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টানধর্মের প্রভাব-জাত কিংবা ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ফলস্বরূপ একেশ্বরবাদের যে ভাব বাঙ্গালার সমাজে সেদিন বিস্তারলাভ করিতেছিল, সে-যুগের সমাজের ঐতিহ্যের ধারায়ও তাহাব অস্তিত্ব ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের কৃষ্ণোপাসনার মধ্যে একেশ্বরবাদেরই প্রভাব ছিল। বাংলার বৃহত্তম সমাজ-জীবনের আরও একটি পরিচয়ের কথা আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না, তাহা এই যে, তুর্কী আক্রমণের পর হইতেই একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম বাঙ্গালী হিন্দুর সম্মুখে বলিষ্ঠ একটি আদর্শ স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল। সামগ্রিকভাবে বাংলার হিন্দুসমাজ তাহার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিতে পারিয়াছিল, একথা কিছুতেই মনে করা যাইতে পারে না। অবশ্য চৈতন্যধর্ম এই বলিষ্ঠ একেশ্বরবাদী ধর্মের সঙ্গে বহু দেবদেবী-বিশ্বাসী হিন্দুধর্মের সামঞ্জস্য-স্থাপনের এক সার্থক প্রয়াস করিয়াছিল। তাহারই প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে হিন্দুসমাজের মধ্যে অধ্যাত্ম-চিন্তা যে ধারায় ক্রমবিকাশ লাভ করিতেছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর একেশ্ববাদ তাহা হইতে স্বাভাবিকভাবেই ঈশ্বর গুপ্তের মনে বিকাশলাভ করিয়াছিল বলিয়া অনুভূত হইবে। অবশ্য তাহার সঙ্গে বহিরঙ্গের দিক দিয়া একদিকে খ্রীষ্টানধর্মের প্রচার এবং আর একদিকে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ইহাদেরও যোগ যে ছিল না তাহা বলিতে পারা যায় না। সুতরাং মূলত ঈশ্বর গুপ্তের ঈশ্বর-চিন্তার মর্মমূলে যে ঐতিহ্যের সম্পর্ক ছিল না, তাহা বলিতে পারা যাইবে না।

ঈশ্বর গুপ্তের আধুনিকতা কেবল তাঁহার স্বদেশ-চিন্তায়। একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচীন কোনও ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া তাঁহার মধ্যে ইহার উদয় হইতে পারে নাই। ইহা ইংরেজি শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ সে-দিন বাঙ্গালীর সমাজের মধ্যে বিকাশলাভ করিয়াছিল। কিন্তু এখানেও একটি বিষয় লক্ষ করা যাইতে পারে। মধ্যযুগের অন্তত এক শ্রেণীর মঙ্গলকাব্য আছে, তাহাতে স্বদেশরক্ষায় আত্মবিসর্জনের গৌরব প্রচার করা হইয়াছে, তাহা ধর্মমঙ্গল কাব্য। ইংরেজি ভাবধারা এই দেশে প্রবর্তিত হইবার বহু পূর্বেই ইহা রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। তবে এই কথা অবশ্যই সত্য যে, ঈশ্বরচন্দ্রের দেশাত্মবোধ ইহার ধারা অনুসরণ করিয়া বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই; তাহা একমাত্র পাশ্চাত্ত্য প্রভাবেরই ফল। কিন্তু এই সম্পর্কে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবকে স্বীকার করিয়া লইবার মত প্রবণতা যদি এই জাতির প্রথম হইতে না থাকিত, তবে সেই প্রভাব যত শক্তিশালীই হোক, তাহা এই দেশের অধিবাসীর মনে এত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না। স্বদেশ-চিন্তা কোনও না কোনও ভাবে এই জাতির মধ্যে বর্তমান ছিল বলিয়াই ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষার মধ্য হইতে বাঙ্গালী জাতিই ইহা দ্বারা সর্বাপেক্ষা প্রভাবিত হইয়াছিল। বহিঃপ্রভাবকে স্বীকার করিয়া লইবার মত মানসিক প্রস্তুতি এক মুহূর্তেই সৃষ্টি হইতে পারে না, অর্থাৎ ইংরেজি সাহিত্যের মধ্য হইতে দেশাত্মবাদের কথা শুনিবামাত্রই বাঙ্গালী জাতি যে জীবনপণ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, ইহার অর্থই এই যে

এই জাতির মধ্যে ইহার প্রেরণা পূর্ব হইতেই সুপ্ত ছিল। নতুবা ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজি সাহিত্যে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষিত না হইয়াও ইহার প্রেরণা আধুনিক বাংলা কবিতার জন্মমুহূর্তেই এমনভাবে অনুভব করিতে পারিতেন না। সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী বাংলার স্বাধীন ভুঁইঞাগণ মোগলের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য যে সংগ্রাম করিয়াছে, ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীতেও গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য ক্ষুদ্র সামন্তরাজ ইছাই ঘোষ যে সংগ্রাম করিয়াছে, তাহাদের প্রেরণা জাতির চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে নাই। সেইজন্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার সংস্পর্শে আসিবার ফলে পাশ্চাত্ত্য দেশাত্মবোধের যে আদর্শ এই জাতির সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছিল তাহার প্রেরণা ইহার চিত্তে এত সক্রিয় এবং শক্তিশালী হইয়াছিল। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশ-চিন্তা অবিমিশ্র পাশ্চাত্ত্য প্রেরণার ফল বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না, ইহার সঙ্গে জাতীয় ঐতিহ্যেরও যোগ ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বরচন্দ্র 'খাঁটি বাঙ্গালী' হইয়াও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রবর্তক ছিলেন। একজন 'খাঁটি বাঙ্গালী'র হাতেই আধুনিক বাংলা কবিতা রচনার সূচনা হইয়াছিল। ঈশ্বরগুপ্তের পর যদি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আলোচনা করা যায়, তাহা হইলেও দেখিতে পাওয়া যায়, মধ্যযুগের বাংলা কবিতার মত তিনি আখ্যানকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মধুসূদনের কাব্য যে-অর্থে 'রোমাণ্টিক মহাকাব্য', রঙ্গলালের কাব্য সেই অর্থে 'রোমাণ্টিক মহাকাব্য' নহে, আখ্যায়িকা কাব্য বলিলেই রঙ্গলালের কাব্যের যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয়। মধ্যযুগের বাংলার আখ্যায়িকা কাব্যের সঙ্গে তাঁহার কাব্যের প্রাণের যোগ নাই সত্য, তথাপি দেহগঠনের যে যোগ আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। রঙ্গলাল ইংরেজি শিক্ষায় সুশিক্ষিত হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন, সুতরাং তাঁহার মধ্যে বাঙ্গালীর জাতীয় ঐহিত্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না পাইলেও বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখিতে পাওয়া যায়, জাতীয় ঐতিহ্যকে নানা দিক হইতে স্বীকার করিয়া লইয়াই তিনি তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন। তবে তাঁহার জাতীয় চিন্তা কেবলমাত্র বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রাচীন এবং নবীন সমগ্র ভারতবর্ষকে লইয়াই তাঁহার জাতীয় চিন্তা বিকাশলাভ করিয়াছে। তবে একথাও সত্য, এই ভারত হিন্দু ভারত, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ভারত নহে। মধ্যযুগ হইতেই বাংলার সাহিত্য হিন্দুসমাজকে লইয়া, হিন্দুর সামাজিক ও ধর্ম-জীবনের উত্থান-পতনের ধারায় সংযুক্ত হইয়া যে ভাবে রচিত হইয়াছে, ইহাতেও তাহার কিছু ব্যতিক্রম নাই। তবে মধ্যযুগের হিন্দুসমাজের লক্ষ্য ছিল একান্তভাবেই বাংলার হিন্দুসমাজ, তাহার পরিবর্তে রঙ্গলালের হিন্দুসমাজ বলিতে সমগ্র ভারতেরই হিন্দুসমাজ বুঝাইয়াছে। ইংরেজি শিক্ষা ও ভারতে ইংরেজ শাসনের ফলেই যে অখণ্ড ভারতের রূপ জন্ম লাভ করিয়াছিল, তাহা সত্য নহে। ধর্ম ও রাজনীতির বন্ধনে অতীতকালেও ভারতবর্ষ যুগে যুগেই এক-এক বার অখণ্ড পরিচয় লাভ করিয়াছিল। তবে একথা সত্য, বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়া তাহার সেই রূপ রঙ্গলালের পূর্বে আর কোথাও এতখানি স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। চৈতন্যদেবের সর্বতীর্থ ভ্রমণের কাহিনীর মধ্যে তাহার যে স্বরূপ কোনও কোনও চৈতন্য-জীবনীতে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা যেমন বিচ্ছিন্ন,

তেমনই অস্পষ্ট। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সেই চিত্র আঁকিবার প্রয়াস দেখা গিয়াছে, এই কথা সত্য।

ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া রঙ্গলাল যে আখ্যায়িকা কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ভারতীয় নারী-জীবনের সনাতন আদর্শের কথাই তিনি প্রচার করিয়াছেন,—পাতিব্রত্য, সতীত্ব, শৌর্য, প্রেম, নারী-জীবনের শাশ্বত এই ঐতিহ্যমূলক আদর্শ রঙ্গলালের কাব্যের অবলম্বন। এই বিষয়ে তিনি আধুনিক হইয়াও প্রাচীন। সুতরাং কাব্যের বহিরঙ্গের গঠনেই হউক কিংবা ভাব-বস্তুতেই হউক তিনি ঐতিহ্যের সঙ্গে নিবিড় যোগ রক্ষা করিয়াই ঊনবিংশ শতাব্দীর নূতন যুগের কাব্য রচনা করিয়াছেন। ঐতিহ্যের প্রেরণা তাঁহার মধ্যে যে কত শক্তিশালী ছিল, তাহা তাঁহার 'কাঞ্চীকাবেরী' কাব্য রচনা হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক বুঝিতে পারা যায়। উড়িষ্যার রাজপরিবারের একটি প্রাচীন কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া ইহা প্রায় মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ ভঙ্গিতে রচিত হইয়াছে। এমনকি, যে ভক্তি-চন্দনের সুরভি মঙ্গলকাব্য হইতে ক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, রঙ্গলাল তাঁহার 'কাঞ্চীকাবেরী'র মধ্যে তাহা আবার অনেকখানি পুনরুজ্জীবিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর সমাজ যে এক মুহূর্তেই তাহার প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কোনও চিন্তা কিংবা কর্মের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তাহা নহে; বরং ধীরে ধীরে তাহার প্রাচীন ধারার মধ্য হইতে যতখানি রক্ষণীয়, তাহা রক্ষা করিয়া এবং যাহা বর্জনীয় আপনা হইতেই তাহা নিজেরাই বর্জন করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। আধুনিক বাংলা কবিতার মধ্যে তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইবে।

রঙ্গলালের পরই মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা উল্লেখ করিতে হয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদন সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, 'মধুসূদন ডাহা ইংরেজ।' মধুসূদন সম্পর্কে এই ধারণাই বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল। কিন্তু মোহিতলাল প্রমুখ কয়েকজন আধুনিক সমালোচকের আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির বিরোধিতা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গ টি এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচনার অবকাশ নাই, সংক্ষিপ্তভাবে সামান্য আলোচনা করা যাইতেছে মাত্র।

প্রথমত মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক বলিয়া পরিচিত। অনেকে মনে করিয়াছেন, তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দের গঠনের মধ্য দিয়াই প্রাচীন ধারার বাংলা কবিতার গঠনের সঙ্গে তাঁহার বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে একথা স্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ, মধ্যযুগের সমগ্র আখ্যায়িকা কাব্য যেমন চৌদ্দ অক্ষরে গঠিত পয়ার ছন্দে রচিত, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের পদও চৌদ্দ অক্ষরে গঠিত। দৃশ্যত অমিত্রাক্ষর ছন্দের গঠনে ও পয়ার ছন্দের গঠনে কোনও পার্থক্য নাই। পার্থক্য যাহা আছে, তাহা কেবলমাত্র সুরের। এই কথা কেবলমাত্র তাঁহার দুইখানি কাব্যের উপরই প্রযোজ্য। 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনাতেই তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'-এ বাংলা কাব্যরচনার প্রাচীনতর ধারার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করেন নাই। তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তেও পয়ারের অনুরূপ চৌদ্দ অক্ষরে পদ গঠিত

হইয়াছে এবং ইহার অনুযায়ীই মিল ব্যবহার করা হইয়াছে, তবে মিত্রাক্ষরযুক্ত পদগুলি ইতালীয় সনেটের রীতিতে বিন্যস্ত করিয়াছেন। মধুসূদন তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনায় প্রচলিত যতি ও মিলের রীতি পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও চৌদ্দ অক্ষরের পদ যে রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহার কারণ এই যে, পয়ারের ঐহিত্যকে তিনি সম্পূর্ণ মুছিয়া দিতে পারেন নাই। পরবর্তীকালে মহাপয়ার অর্থাৎ অষ্টাদশ অক্ষরের পদ দ্বারা সনেট রচিত হইলেও মধুসূদন চতুর্দশপদী কবিতা রচনায় চৌদ্দ অক্ষরের রীতিই সর্বত্র অনুসরণ করিয়াছেন, কোথাও ইহার ব্যতিক্রম করেন নাই। আমরা অমিত্রাক্ষর ছন্দের দেহগঠন বিচার করিয়া দেখি না, কেবলমাত্র ইহার আত্মার পরিচয় লাভ করিয়াই ইহার মধ্যে মধুসূদনের ঐতিহ্যবিরোধী মনোভাবের সন্ধান করিয়া থাকি। ঐতিহ্যের প্রতি প্রীতি না থাকিলে মধুসূদন তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দের পদে যেখানে যতি পড়িয়াছে, সেখানেই পদচ্ছেদ করিতে পারিতেন; কারণ, যতি ও মিলের অভাব থাকায় চৌদ্দ অক্ষরের পদবন্ধনের কোনও সার্থকতা নাই। পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার তথাকথিত 'গৈরিশ ছন্দ'-এর পদগঠনে যে রীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন, মধুসূদনের মধ্যে পয়ার ছন্দের গঠনের প্রতি নিষ্ঠা না থাকিলে তিনিও অনায়াসে সেই রীতিই গ্রহণ করিতে পারিতেন। সুতরাং কাব্যদেহগঠনে মধুসূদনের মধ্যে কোনও ঐতিহ্যবিচ্যুতি ঘটে নাই, ইহাই স্বীকার করিতে হয়।

এইবার তাঁহার কাব্যের প্রাণবস্তুর বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হয়। মধুসূদনের কাব্য যাঁহারা গভীরভাবে অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন, মধুসূদনের মধ্যে একটি বৈষ্ণব-প্রাণ অত্যন্ত সজীব ও সক্রিয় ছিল। মধুসূদন ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী জাতিরই সন্তান, সেই সূত্রেই তিনি জীবনের মর্ম্মমূল হইতেই বৈষ্ণব-ভাবের প্রেরণা অনুভব করিতেন, তাঁহার বহির্মুখী পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষা তাঁহার জীবনের মর্ম্মমূলাশ্রয়ী সেই ভাব-প্রবাহকে কোন দিক দিয়াই রোধ করিতে পারে নাই। তাঁহার 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য হইতে আরম্ভ করিয়া 'চতুর্দশপদী কবিতা' রচনার যুগ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গেলেই ইহা প্রমাণিত হইবে।

মধুসূদন তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' একসঙ্গে রচনা করিয়াছিলেন দেখিয়া তাঁহার জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "তিলোত্তমাসম্ভব" ও "একেই কি বলে সভ্যতা" একসঙ্গে রচনা যদি বিস্ময়ের হয়, তবে "মেঘনাদবধ" ও "ব্রজাঙ্গনা" একসঙ্গে রচনা তদপেক্ষা শতগুণ অধিক বিস্ময়কর।' কিন্তু 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর অন্তস্তলে গীতি-কবিতার যে ফল্গুধারা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহা অনুভব করিতে পারিলে উভয়ের একসঙ্গে রচনা বিস্ময়বোধ সৃষ্টি করিতে পারে না। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর মত 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'ও মধুসূদনের সহজাত প্রতিভার নিতান্ত স্বাভাবিক সৃষ্টি; মেঘনাদবধ কাব্যের কেবলমাত্র বহিরঙ্গ গঠনের মধ্যেই যাঁহাদের দৃষ্টি সীমায়িত, তাঁহারাই কেবলমাত্র ব্রজাঙ্গনা কাব্যের সঙ্গে ইহার এককালীন রচনা বলিয়া বিস্ময়বোধ করিতে পারেন, কিন্তু উভয়ের অন্তঃপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহারা উভয়ে একই কবি-প্রাণ হইতে নিতান্ত স্বাভাবিক সূত্রেই উৎসারিত হইয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্যের অশোকবনে বন্দিনী বিরহিণী সীতার সঙ্গে যদি ব্রজাঙ্গনা

কাব্যের বিরহিণী রাধিকার তুলনা করা যায়, তবে ইহাদের মধ্যে যে বিশেষ কিছু পার্থক্য লক্ষিত হইবে তাহা নহে। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' বাদ দিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে মধুসূদন তাঁহার সমগ্র কাব্যরচনার মধ্যেই মধ্যযুগের ঐতিহ্য-অনুসারী বৈষ্ণব-চেতনা সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নবজাগরণের যুগের কবি হওয়া সত্ত্বেও মধুসূদনের সঙ্গে জাতীয় ঐতিহ্যের ধারার কোনদিক দিয়াই যে বিচ্ছেদ ঘটে নাই, তাঁহার বৈষ্ণবপ্রাণতা ইহার অন্যতম নিদর্শন মাত্র। মধ্যযুগ হইতে সকল শ্রেণীর বাঙ্গালী কবির মনেই যে বৈষ্ণব কবিতার ধারা ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহাই স্বাভাবিক সূত্রে অগ্রসর হইয়া আসিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের যুগেও মধুসূদনের নূতন কাব্যরচনার সঙ্গেও যোগরক্ষা করিয়াছে। মধ্যযুগে মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের কবি হইয়াও বৈষ্ণব-প্রেরণা যে-ভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন, মধুসূদনও ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাকাব্যের কবি হইয়াও তাহা সেইভাবেই অনুভব করিয়াছেন।

মধুসূদন যে কেবলমাত্র মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিতার ধারার সঙ্গেই যোগরক্ষা করিয়া তাঁহার কাব্যজীবনে সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন তাহাই নহে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ধারা মঙ্গলকাব্যের সঙ্গেও তাঁহার যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। মধুসূদন তাঁহার ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যরচনা দ্বারা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা মঙ্গলকাব্যের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্রের সঙ্গেও যোগরক্ষা করিয়াছেন।

মধুসূদন তাঁহার 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' নামক চতুর্দশপদী কবিতায় ভারতচন্দ্রের অমর-কীর্তি 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্য সম্পর্কে এইভাবে সুগভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন ঃ

> মোহিনী-রূপসী-বেশে ঝাঁপি-কাঁখে করি,
> পশিছেন, ভবানন্দ, দেখ তব ঘরে
> অন্নদা! বহিছে শূন্যে সঙ্গীত-লহরী,
> অদৃশ্যে অপ্সরাচয় নাচিছে অম্বরে।—
> * * * *
> তব বংশ-যশঃ-ঝাঁপি—অন্নদা-মঙ্গল—
> যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
> রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে।।

কাব্যের বহিরঙ্গগঠনে এবং অন্তর্মুখী ভাব-প্রকৃতি বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের সঙ্গে মধুসূদনের যে কতকগুলি বিষয়ে সুনিবিড় ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা অনেকেই তত গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখেন নাই। এইজন্যই অনেকে কবি ঈশ্বর গুপ্ত কিংবা মধুসূদনের পরিবর্তে ভারতচন্দ্রকেই যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গল' রচনার পর বাংলা সাহিত্যে এক শত বৎসর যে অরাজকতার যুগ চলিযাছিল, তাহা অতিক্রম করিয়া মধুসূদনের মধ্যেও 'অন্নদা-মঙ্গল'-এর প্রেরণা যে সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা এই উভয় কবির রচনা গভীরভাবে অনুসরণ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। বাংলা সাহিত্যের এই ঐতিহ্যকে অনুসরণ করিবার মধ্যেই মধুসূদনের শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকে পরিত্যাগ করিবার মধ্যে নহে।

মধুসূদন তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনায় বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের অনুসরণ করিবার

পরিবর্তে তাঁহারই অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবি ভারতচন্দ্রকেই অনুসরণ করিয়াছেন। এইখানে রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র সঙ্গে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'-এর একটু পার্থক্য আছে। একথা সত্য, উভয়েই এখানে প্রাচীনতর একটি ধারাকে অনুসরণ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেখানে তাঁহার নিকট পূর্ববর্তী যুগকে অস্বীকার করিয়া আরও দূর অতীত হইতে প্রেরণা লাভ করিতে গিয়া একদিকে অপ্রচলিত ব্রজবুলি ভাষা এবং অপরদিকে মধ্যযুগীয় ভক্তির পুনরুদ্ধার করিতে চাহিয়াছিলেন, মধুসূদন তাহার পরিবর্তে তাহার অব্যবহতি পূর্ববর্তী কবি ভারতচন্দ্রকেই আদর্শ করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মধ্যে বৈষ্ণব কবিতার রূপ যথাযথ প্রকাশ পায় নাই সত্য, তথাপি ঐতিহ্যের ধারাকে অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজন্য ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের বিদ্যা মধুসূদনের সৃষ্টিতে ব্রজাঙ্গনা কাব্যে রাধার রূপ ধারণ করিয়াছে। বাঙ্গালীর সে-যুগের সাহিত্যচিন্তার ক্রমবিকাশের ধারা ইহাতে রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া ইহার শক্তিও অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতচন্দ্র তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্যে যে সকল ধুয়া বা ধ্রুবপদ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকটি বিদ্যাসুন্দর কাহিনী-নিরপেক্ষ রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদমাত্র, তাহাই মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনার প্রেরণা দান করিয়াছে। এইভাবে মধুসূদন ভারতচন্দ্রের সঙ্গে ঐতিহ্যের যোগ রক্ষা করিয়াছেন।

এইবার মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'মেঘনাদবধ কাব্য'খানির কথা উল্লেখ করিতে হয়। ইহার মূল কাহিনী কৃত্তিবাস হইতে গৃহীত হইয়াছে। বাল্মীকির যে কাহিনী কৃত্তিবাস বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন-রসে পরিণত করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাকেই মূলত ভিত্তি করিয়া মধুসূদন বিবিধ দেশীয় এবং বিদেশীয় উপাদানের সংমিশ্রণে এই 'মধুচক্র' রচনা করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে জাতির চিত্ত হইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রভাব দূর হইয়া যাইতে পারে নাই, সেইজন্যই মধুসূদন যখন কৃত্তিবাসী রামায়ণকেই ভিত্তি করিয়া তাঁহার কাহিনীর পরিকল্পনা করিতে গেলেন, তখন শিক্ষিত বাঙ্গালীও তাহার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিল। কৃত্তিবাস বাল্মীকির মত রাবণকে অনাচারী রাক্ষসরূপে চিত্রিত করেন নাই, বরং তাহার পরিবর্তে তাহাকে একজন ভক্তরূপেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। ভক্তি মানুষেরই গুণ, রাক্ষসের কোনও গুণ নহে। মধুসূদনও রাবণকে মানুষ রূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রাবণ শিবের ভক্ত, বিষ্ণুর অবতারের প্রতি তাঁহার যে বিদ্বেষ সৃষ্টি হইয়াছিল, অন্তিমে তাঁহার মধ্য হইতে তাহাও দূর হইয়া গিয়া তাঁহাকে শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। নিয়তির নির্মম বিধানে রাবণের আরাধ্য দেবতা শিবও যখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন তিনি নিয়তির নির্মম বিধানের কথা স্মরণ করিয়া বিলাপ করিলেও আরাধ্য দেবতার প্রতি বিশ্বাসহীন হন নাই। কোনও কোনও সময় সাধারণ মানুষের ভক্তের সুখ-দুঃখে উদাসীন দেবতার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক মানবিক অভিমানবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে সত্য, তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিবাদের পথ অনুসরণ করিয়া তিনি ভক্তির পথ হইতে কদাচ সরিয়া দাঁড়ান নাই। সুতরাং মধুসূদনের রাবণ চরিত্রকে উনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিবাদের প্রতিনিধি বলিয়া উল্লেখ করা যায় না, বরং তাহার মধ্য দিয়া মধ্যযুগের ঐতিহ্যের ধারাই উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায়।

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর রাবণ চরিত্রের সঙ্গে মধ্যযুগের মনসা-মঙ্গলকাব্যের নায়ক চরিত্র চাঁদ সদাগরের তুলনা করিলেও বুঝিতে পারা যাইবে, মধুসূদন তাঁহার পরিকল্পনায় জাতির ঐতিহ্য পরিত্যাগ করেন নাই। তবে মনসা-মঙ্গলের চাঁদ সদাগর মধুসূদনের রাবণ অপেক্ষা আরও শক্তিশালী চরিত্র। ইহার কারণ, মধুসূদন চাঁদ সদাগরের ঐতিহ্য আনুপূর্বিক অনুসরণ করেন নাই, যে পরিমাণে তিনি চাঁদ সদাগরের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, সেই পরিমাণেই তাঁহার রাবণ চরিত্র শক্তিহীন হইয়াছে। চাঁদ সদাগর বাঙ্গালীর সাহিত্যের জাতীয় নায়ক (national hero) চরিত্র। মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়া নব নব রূপায়ণ স্বীকার করিয়া চাঁদ সদাগর চরিত্র অব্যাহতভাবে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সেই জন্যই চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগের চাঁদ সদাগর এবং চৈতন্য-পরবর্তী যুগের চাঁদ সদাগরের মধ্যেও পার্থক্য অনুভব করা যায়। মধুসূদনের রাবণ চরিত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর চাঁদ সদাগর ব্যতীত আর কেহই নহে। চাঁদ সদাগরের ভাগ্যের সঙ্গে মধুসূদনের ব্যক্তিগত জীবনের ভাগ্যেরও অনেকখানি ঐক্য ছিল বলিয়া তিনি তাঁহার রাবণ চরিত্রে আত্মসচেতনতারও সংযোগ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার মৌলিক কোনও পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন নাই। মধ্যযুগের চাঁদ সদাগর ঊনবিংশ শতাব্দীতে আসিয়া ইহার মধ্য-যুগোচিত পরিচয় রক্ষা করিবেন, এমন কেহ আশা করিতে পারেন না; সেইজন্যই রাবণের মধ্যে যে সামান্য পরিবর্তিত রূপ দেখা যায়, তাহা যুগোচিত বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যে মানবিক ব্যাপারে যে দৈব হস্তক্ষেপের কথা বলিয়াছেন, তাহা আপাতদৃষ্টিতে হোমারের কাব্যের প্রভাবজাত মনে হইলেও ইহার সঙ্গে বাঙ্গালীর জাতীয় ঐতিহ্যেরও সাধারণত কোনও বিরোধ ছিল না। কারণ, মধ্যযুগের সমগ্র মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও দেখা যায়, দেবদেবীগণ মানবিক জীবনের সুখদুঃখের সঙ্গে নিজদিগকেও জড়িত করিয়াছেন। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণ যে-ভাবে মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন হইয়া গিয়া নিতান্ত মানবিক আচার আচরণ পালন করিয়াছেন, মধুসূদন এই বিষয়ে প্রাচীন গ্রীক আদর্শকেই মুখ্যত অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দেবদেবীগণ তাহা করিতে পারেন নাই। এই বিষয়ে তাঁহার কাব্যের দেবদেবী চরিত্র একটু স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে স্ত্রী-চরিত্র সম্পর্কে জাতির মনে যে নূতন ধারণা বিকাশ লাভ করিতেছিল, মধ্যযুগের সঙ্গে তাহার কোনও দিক দিয়াই যোগ ছিল না, তাহা স্বীকার করিতে পারা যায় না। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্য দিয়া স্ত্রী-চরিত্রের মহিমাও নানা দিক দিয়া কীর্তিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেবল পাতিব্রত্য কিংবা সতীত্বেরই মহিমা নহে, বীরত্বের মহিমাও কীর্তিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। মধুসূদনের প্রমীলা চরিত্রের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নারীজাতির সম্পর্কে যে নবপ্রবুদ্ধ চেতনারই বিকাশ হোক না কেন, মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যেও অনুরূপ নারীচরিত্রের অস্তিত্ব ছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যের বীর নারী-চরিত্র কানড়ার সঙ্গে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রমীলা চরিত্রের মৌলিক কোনও পার্থক্য নাই—উভয়ই অভিন্ন বীরত্বের উপাদানে গঠিত। এমন কি, কানড়াকে অশ্বারূঢ়া হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসম্মুখীন হইতে যে-ভাবে দেখা গিয়াছে, প্রমীলাকে সে-ভাবে কোথাও দেখা যায় নাই। অবশ্য একথা সত্য, মধুসূদন ধর্মমঙ্গল হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া প্রমীলা চরিত্রের

পরিকল্পনা করেন নাই, তবে আনুপূর্বিক পাশ্চাত্ত্য বীর নারীচরিত্র অনুসরণ করিয়াই যে ইহার কল্পনা করিয়াছেন, তাহাও নহে; কারণ, ভারতবর্ষের ইতিহাসে বীর নারীর চরিত্র বিরল ছিল না। ঐতিহ্যের সঙ্গে এই যোগ ছিল বলিয়াই প্রমীলার চরিত্র মেঘনাদবধ কাব্যে এত শক্তি সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের রাম-লক্ষ্মণ চরিত্রকে মধুসূদন যে-ভাবে নিন্দিত রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাহা কিছুমাত্র নূতন নহে। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণ সর্বদাই কাব্যের নায়ক কর্তৃক নিন্দিত এবং লাঞ্ছিত হইয়াছেন। চাঁদ সদাগর হেঁতালের লাঠি লইয়া সর্বদাই মনসা দেবীকে তাড়া করিয়া বেড়াইয়াছেন। প্রাণভয়ে মনসা তাঁহার নিকট হইতে সর্বদা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন। মধুসূদন শ্রীরামচন্দ্রকে যেমন 'ভিখারী রাঘব' বলিয়া সর্বদা উল্লেখ করিয়াছেন, মনসাও ভিখারিণীর মত চাঁদ সদাগরের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া কেবলমাত্র একটি ভিক্ষা তাঁহার নিকট সর্বদা প্রার্থনা করিয়াছেন,—'মোর তরে ফুল জল দেও একবার।' কিন্তু চাঁদ সদাগর অবজ্ঞাভরে তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, মনসা দেবী পলাইয়া বাঁচিয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সদাগর চণ্ডীর ঘট ভাঙিয়া ফেলিয়া তাহা পদদলিত করিয়াছেন। সুতরাং দেবতা সম্পর্কে কোনও অন্ধ সংস্কার—এই জাতির মনে কোনও কালেই গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। মধুসূদনও জাতীয় অধ্যাত্ম-চৈতন্যের সেই ধারাই অনুসরণ করিয়া তাঁহার রাম-লক্ষ্মণকে আত্মশক্তিতে নির্ভরহীন ও দৈবকৃপা-ভিখারী করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। জাতীয় ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মধুসূদনের মনে আপনা হইতেই এই চিন্তার বিকাশ হইয়াছিল। অনেকে যে মনে করেন, তিনি বিজাতীয় ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জাতীয় চরিত্রকে কলঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা কদাচ সত্য নহে।

সীতা চরিত্র সম্পর্কে মধুসূদনের সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ বাঙ্গালীর জাতীয় ঐতিহ্যকেই যে সুনিবিড়ভাবে অনুসরণ করিয়াছে, এই বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। সীতা রামায়ণ-কাহিনীর একটি মুখ্য চরিত্র, ইহার মর্যাদা রক্ষায় মধুসূদন যেভাবে সতর্ক ছিলেন, তাহাতে তাঁহার বাঙ্গালীর জাতীয় ঐতিহ্যের ধারার সঙ্গে যে যোগ কত নিবিড় ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। একটি চতুর্দশপদী কবিতাতে মধুসূদন সীতার প্রতি তাঁহার অন্তরের সুগভীর ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন।

মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাগুলিই আধুনিক যুগের সার্থক গীতিকবিতা। ঈশ্বর গুপ্তের গীতিকবিতার সঙ্গে ইহাদের প্রধান পার্থক্য এই যে, ইহারা কেবলমাত্র বস্তুলীন নহে, প্রত্যেকটি বস্তুই কবি-মানসের উপলব্ধিতে রসায়িত। ইহাই গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠ গুণ, এই কবিতাগুলি হইতেই আধুনিক গীতিকবিতার ধারা জন্মলাভ করিয়াছে। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র বিষয়বস্তুগুলির প্রতি লক্ষ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, মধুসূদনের দৃষ্টি কত গভীরভাবে বাঙ্গালী জীবনের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করিয়াছিল, যেমন : 'বঙ্গভাষা', 'কমলে কামিনী', 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি', 'কাশীরাম দাস', 'কীর্তিবাস', 'জয়দেব', 'বউকথা কও', 'দেবদোল', 'শ্রীপঞ্চমী', 'আশ্বিন মাস', 'নিশাকালে নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির', 'বিজয়া দশমী', 'কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা', 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত', 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', 'শ্রীমন্তের টোপর', 'ব্রজবৃত্তান্ত' ইত্যাদি।

বাঙ্গালী-জীবনের বিজয়া-দশমীর বেদনাটি মধুসূদনকে গভীরভাবে অভিভূত করিয়াছিল। এই বেদনা যে বাঙ্গালীমাত্রেরই একটি সার্বভৌম বেদনা তাহা কবি নিজের জীবন-সূত্রেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেইজন্য যে বেদনার ভাষা নাই, সেই বেদনা বুঝাইতেই মধুসূদন বিজয়া দশমীর চিত্রটির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বিজয়ার বেদনার অনুভূতি দিয়াই তিনি যেমন তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা মেঘনাদবধ কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন, তাঁহার সর্বশেষ কাব্য 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র উপসংহারেও এই চিত্রটির কথা স্মরণ করিয়াছেন। 'বিজয়া দশমী' নামে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ 'চতুর্দশপদী কবিতা'ও রচনা করিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দী উত্তীর্ণ হইয়া বাঙ্গালা কাব্য যখন ঊনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক যুগে পদার্পণ করিল, তখন যদি তাহার বিজাতীয় রূপটিই প্রকট হইয়া উঠিত, তবে তাহা সে-যুগে কেহই গ্রহণ করিত না। যাঁহাদের রচনার মধ্যে এই বিজাতীয় ভাব প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহারা কেহই সেদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। এমন কি, মধুসূদনেরও একখানি রচনায় এই বিজাতীয় ভাব প্রাধান্য লাভ করিবার জন্য পাঠক-সমাজ তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার 'পদ্মাবতী নাটক'। ইহা লইয়া মধুসূদন যে পরীক্ষামূলক কার্য করিতে গিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। মধুসূদন যে নবযুগের প্রথম কবির মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কারণই এই যে নূতন যুগে অবতরণ করা মাত্রই বাংলা সাহিত্য আনুপূর্বিক পাশ্চাত্ত্য রূপ লাভ করিতে পারে নাই, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের রস-সংস্কারের উপরই সেদিন নূতন যুগের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, মধুসূদনের মধ্যে সেই জাতীয় রস-চেতনাই সক্রিয় থাকিয়া তাঁহার কাব্যরচনাকে সেদিন সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র যে বলিয়াছেন, 'মধুসূদন ডাহা ইংরেজ' একথা স্বীকার করা যায় না। তিনিও খাঁটি বাঙ্গালী, তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু কলেজের বাঙ্গালী ছাত্র।

মধুসূদনের কাব্যের ঐতিহ্যানুসারিতার কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার পর সে যুগের অন্যান্য কবির বিষয়ে আলোচনা না করিলেও চলিতে পারে, কারণ, অন্যান্য কবি প্রধানত মধুসূদনকেই অনুসরণ করিয়া সে-যুগে কাব্য রচনা করিয়াছেন। বিশেষত মধুসূদনের মত আত্মসচেতন কবি সে-যুগে আর কেহই ছিলেন না। সেইজন্য তাঁহার পরবর্তী কবিদিগের মধ্যে বস্তুধর্মিতা আরও প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহাদের ঐতিহ্যধর্মিতা আরও স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। এই সম্পর্কে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাই যদি ধরা যায়, তবে দেখা যায় যে মধুসূদনের অপেক্ষাও ঐতিহ্যের প্রভাব তাঁহার উপর অধিক। তাঁহার 'বৃত্র-সংহার' কাব্যে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' অপেক্ষা নিবিড়তরভাবে ঐতিহ্যকে অনুসরণ করা হইয়াছে। তবে ইহার প্রেরণা যে মধুসূদনের কাব্য হইতেই আসিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তথাপি হেম-নবীনের সঙ্গে মধুসূদনের কতকটা পার্থক্যও আছে। মধুসূদন বাঙ্গালীর ঐতিহ্যকে যতখানি একান্তভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন, হেম-নবীন তাহা ততখানি পারেন নাই। বরং হেম-নবীনের সম্মুখে সে দিন ভারতীয় ঐতিহ্যের বিস্তৃততর রূপটি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। এমনকি, তাহাকে ভারতীয় ঐতিহ্য বলিলেও ভুল করা হইবে, হেম-নবীনের সম্মুখে যাহা প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, তাহা প্রধানত ছিল হিন্দু ঐতিহ্য। কিন্তু মধুসূদন যে ঐতিহ্যকে প্রধানত অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা

ভারতীয় হিন্দু-ঐতিহ্য তো নহেই, এমন কি বাঙ্গালী হিন্দু-ঐতিহ্যও নহে, তাহা ছিল প্রধানত বাঙ্গালীর জাতীয় ঐতিহ্য। বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতিকে পরিত্যাগ করিয়া বৃহত্তর ভারতীয় হিন্দু-ঐতিহ্যের অনুসরণ করিবার ফলে হেম-নবীনের আদর্শ যেমন বহুলাংশে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল, মধুসূদনের ক্ষেত্রে তাহা হইতে পারে নাই; একটি সুস্পষ্ট জীবনের বলিষ্ঠ ঐতিহ্য তাঁহার কাব্যের প্রেরণা দান করিয়াছিল বলিয়া তাঁহার কাব্যের শক্তি আর কোনও কবি সে-যুগে লাভ করিতে পারেন নাই।

কবি বিহারীলাল সে যুগে গীতিকবিতার যে আর একটি উৎসমুখ খুলিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে জাতীয় ঐতিহ্যধারার যে কি যোগ ছিল, তাহাও বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। কারণ, এই ধারাটিই কালক্রমে রবীন্দ্রনাথের সাধনার ভিতর দিয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। বিহারীলাল অন্তর্জগতের কবি, বহির্জগতের কবি নহেন। বহির্জীবনের তুলনায় মনোজীবনের ঐতিহ্যের প্রভাব অপেক্ষাকৃত অপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তথাপি তাঁহার মধ্যেও নানা দিক দিয়া যে তাহা সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও লক্ষ্যগোচর হইবার যোগ্য।

বিহারীলালের রচনা একান্ত অন্তর্মুখী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যখানির নাম যে 'সারদা-মঙ্গল' তাহা তাঁহার মধ্যযুগীয় বাংলার ঐতিহ্যকে অনুসরণ করিবারই ফল। দেহে এবং আত্মায় তাঁহার 'সারদা-মঙ্গল' মধ্যযুগের মঙ্গল-কাব্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রবলতম আত্মসচেতনতার মধ্যেও মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের চেতনা যে তাঁহার মধ্যে লুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাঁহার কাব্যের নামকরণ হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। 'সারদা-মঙ্গল'-এর মধ্যে যে চিত্রটি প্রধানত অবলম্বন করিয়া তিনি তাঁহার একান্ত গীতিকবিসুলভ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাও রামায়ণ হইতেই গৃহীত হইয়াছে। ইহারই ধারা অনুসরণ করিযা সে-যুগে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নাটকটিও রচিত হইয়াছিল। একান্ত চিন্ময় সাধনায় ব্রতী হইয়াও যে বিহারীলাল রামায়ণের একটি ঐতিহ্যমূলক চিত্র নিজের ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখীন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে কবির একান্ত আত্মগত ধ্যান-ধারণারও ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করা কিছুতেই সম্ভব হয় না। সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের মধ্য দিয়াও তাহাই অনুভব করিতে পারা যায়। একান্ত আত্মভাব-পরায়ণ (subjective) সৃষ্টির মধ্যেও জাতীয় ঐতিহ্য প্রচ্ছন্নভাবে হইলেও সক্রিয় থাকে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি হওয়া সত্ত্বেও বাঙ্গালীর কবি, বাঙ্গালীর জাতীয় রস-সংস্কারের ধারা অনুসরণ করিয়াই তাঁহার বিশ্বলোক উত্তরণ সম্ভব হইয়াছে, ইহা পরিত্যাগ করিলে তাহা কোনও দিক দিয়াই সম্ভব হইত না। জাতির সাহিত্য ইহার ঐতিহ্যের সঙ্গে যত নিবিড় যোগ রক্ষা করিতে পারে, ততই শক্তিশালী হইতে পারে; ঐতিহ্যের সঙ্গে তাহার বিচ্যুতি ঘটিলেই ইহার বিনাশ অনিবার্য হইয়া উঠে।

পূর্বেই বলিয়াছি, মধুসূদনের পর হইতে এই ঐতিহ্যের ধারা দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে—একটি বাঙ্গালীর নিজস্ব জাতীয় জীবনের ঐতিহ্য, অপরটি বৃহত্তর ভারতীয় ঐতিহ্য। বৃহত্তর ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে হিন্দু-ঐতিহ্যই প্রথমত প্রাধান্য লাভ করিলেও কালক্রমে মানবিকতার ঐতিহ্যটি তাহার মধ্য হইতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তখন হইতেই তাহা বিশেষ কোনও দেশ কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ হইয়া বিশ্বমানব-চেতনার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শেরই উপাসক ছিলেন।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট—ক

ব্যাড়িভক্তিতরঙ্গিণী

[রাজা দর্পনারায়ণ সিংহ-এর আমলে
মৈথিলকবি বিদ্যাপতি বিরচিত]

স্তুতি।

ওঁ নমো গণেশায়। অথ ঘটস্থাপনবিধিঃ।
প্রথমতঃ সূর্যার্ঘ্যং দত্ত্বা স্বস্তিবাচনং কুর্যাৎ।
ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তিনস্তা
র্ক্ষ্যোহরিষ্টনেমিঃ স্বস্তিনো বৃহস্পতির্দধাতু।
স্বস্তিনঃ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।
অপসর্পন্তু যে সর্বে বৈষ্ণবাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ।
সূর্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতানাহঃ ক্ষপা। পবনো দিকপতির্ভূমি
বাকাশং খচরামরাঃ ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পাধ্বমিহ সন্নিধিম্।

। প্রমাণতরঙ্গ ঃ।

লোকবাদাশ্চ তত্রোক্তাঃ। আকাশাদ্দৈবতানাঞ্চ সৌহৃদাৎ। পৃথিব্যামপ্রতিলোকে চ লোকবাদা ইতীরিতাঃ। তে চ ভূতডাকিন্যাদ্যতিশান্ত্যর্থং লৌকিকৌষধমন্ত্রাদয়ো বিষহরী-মঙ্গলচণ্ডিকাগীতাদয়শ্চ। তে চ প্রসিদ্ধাঃ লোকবাদা যথা। লক্ষ্মীধবেন নৌর্দত্তা যস্মান্মধুকরাভিধা। তস্মান্মনোরমাং নাবং কৃত্বা তত্র প্রপূজয়েৎ। মৃন্ময়ীং প্রতিমাং কৃত্বা দেবতাদ্যৈঃ সমাবৃতাং। ঘটয়িত্বা বিচিত্রাঞ্চ পূজয়েদ্ গীতনর্তনৈঃ। দেবতাদ্যৈরিত্যত্রাদিশব্দাৎ সিদ্ধনাগকিন্নরগন্ধর্বযক্ষরাক্ষসাদিনামপি পরিগ্রহস্তেষাং পূজ্যতাচোক্তা। অধমা বিংশহস্তা নৌ চত্বারিংশচ্চ মধ্যমা। উত্তমা ষষ্টিহস্তা চ শতহস্তোত্তমো। চতুর্দশকরান্যূনা নৌকা পরিকীর্তিতা। সন্নিধৌ ভূতনাথস্য বিপুলায়াশ্চ নর্তনে। যে সমাগতাঃ দ্রষ্টুং তাংস্তু তৎস্থানং প্রপূজয়েৎ। ব্রহ্মাণং মাধবং রুদ্রং বাণীং লক্ষ্মীঞ্চ পার্বতীং কার্তিকেয়ং গণেশঞ্চ কালীয়ং পন্নগাষ্টকম্। জরৎকারুমস্তিকঞ্চ মর্ত্যে চন্দ্রধরং তথা। স্বর্ণরেখাঞ্চ তৎপত্নীং পুত্রং লক্ষ্মীধরং তথা। তৎপত্নীং বিপুলাঞ্চাপি শ্রীধরাখ্যং দ্বিজং তথা। যশোধরঞ্চ দৈবজ্ঞং কর্ণধারঞ্চ দুর্লভম্।

অগ্রে গণেশং নৌকায়াঃ পত্নীনষ্টৌ মনোহরান্। ভাণ্ডারিংশ্চাস্ত্রধরান্ মধ্যেহগ্রে মূলকে তথা। লেখ্যাং রক্তকীশ্চৈব সুগন্ধাঞ্চ তথাপরাম্। সুরেশ্বরীং তথা দুর্গাং দেবীং দিক্ষু সমন্ততঃ। ইন্দ্রাদিলোকপালাংশ্চ সায়ুধাংশ্চ স্ববাহনান্। পূজাহোমাদিকং কুর্যাদ্ যুগ্মদিবসং দ্বিজৈঃ।

যথাকামং যথাশক্তি বলিদানং বিধানতঃ। নীরাজনঞ্চ কর্তব্যং তৌর্য্যত্রিকপুরঃসরঃ। নদ্যাঞ্চ স্থাপয়েদ্দেবীমুড়পে চোত্তমে ততঃ। দক্ষিণাং বিধিবদ্দত্ত্বা গীতবাদ্যৈঃ সমাপয়েৎ। দর্শনাচ্চ বিচিত্রায়া বাগ্দৃষ্টিহরণং ভবেৎ। নাগনাম্নাচ গৌহারী বিখ্যাতা সা মহীতলে। যোহর্চয়েৎ সুরসাং দেবীং ব্রতস্থো ভক্তিভাবতঃ। ইহেষ্টকামান্ সংপ্রাপ্য দেহান্তে স্বর্গমুত্তমম্। পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রান্তং লক্ষ্মীনৈরুজ্যভাগ্‌ভবেৎ। ডাকিন্যাদিভয়ং নাস্তি ন চ সর্পভয়ং তথা।

গৌড়মিথিলকৃত্যসারে চ। সুরসাং পূজয়েৎ যস্তু কালীয়াদ্যষ্টপন্নগৈঃ। ভুক্ত্বা তু বিধিধান্ · ভোগানন্তে স্বর্গে প্রমোদতে। ক্বচিন্নৈব সর্পস্য ভয়ং প্রাপ্নোতি স তু মর্ত্যঃ। তদ্বিত্তঋদ্ধিনৈরুজ্য পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রকম্।তেনসর্বপাপচ্ছান্তিঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাবধিবিত্তনৈরুজ্যাস্তি।

সর্পভয়ং প্রাপ্য ভাবঃ (?) ঐহিকবিবিধভোগপ্রাপ্তিপূর্বকস্বর্গাবস্থিতত্বকামো মনসাদেবী-প্রীতিরিত্যভিলাষঃ। অথ রয়হানিঃ।

দর্শনাপায়তে যস্যারয়হানিস্তু অখিলাং। রয়হানিরিতি প্রোক্তা প্রতিমা ভব্যদায়িনী। শুদ্ধিদীপিকায়াং। মৃগলঘু বর্গে বারুণে বিষ্ণুদেবে মরুদদিতি ধনিষ্ঠে শোভনে বাসরে চ। ১২।২১।২৬।৪।১৭।—।২৯।৮।১।১৩।২৪।২২।২৫।৭।২৩। ত্রিদশ মদন ভনে বা দশে শীতরশ্মৌ বিবুধ কৃতিতিরতিষ্ঠীনাড়ীনক্ষত্রহীনে সামান্যদেবতাঘটনং।

হেমাদ্রৌ কাশীখণ্ডে।

সৌবর্ণী রাজতী তাম্রী মৃন্ময়ী বা বিশেষতঃ। যথাশক্তি প্রকর্তব্যা প্রতিমা ঋদ্ধিবৃদ্ধয়ে। গৌড়মৈথিলপ্রাচ্যাদিকৃত্যসারে। প্রতিমায়াঞ্চ চিত্রে বা মণ্ডলে বা ঘটেহপি বা। পূজয়েৎ সুরসাং দেবীং দুর্গাবদ্ভুবি সাধকাঃ। দুর্গাবদিত্যতিদেশাদ্বলিদানাচারঃ। তথাচ নিরামিষেণ যোহভ্যর্চেজ্জগদ্গৌরীং মুনেঃ প্রিয়াম্। তস্য সংবৎসরে হানির্নিত্যং স্যাত্তুপদেপদে। এতেন যচ্ছাগাদিবলিদানং নাস্তীতি বিশারদাদিভিরুক্তংতদ্ধেয়ম্।

তত্রৈব। পঞ্চম্যাং গুরুবারেচ রবিবারেহর্কসংক্রমে। দশম্যাঞ্চ ত্রয়োদশ্যাং শুক্লপক্ষে তথাপরে। বৈশাখাদিষু মাসেষু পূজয়েৎ সর্বশান্তিদাং। এতেন শ্রাবণ মাস্যেব পূজনমিতি মতমপাস্তং। তত্রৈব পদ্মপত্রে চ নৈবেদ্যং দদ্যাদ্দেব্যৈ করণ্ডিকাং। পূজায়াঃ ফলশ্রবণাৎ প্রতিমানির্মাণস্য প্রয়াসবাহুল্যাৎ ফলভূয়স্তৎ। তথাচ ছান্দোগ্যপরিশিষ্টং। যত্রস্যাৎ কৃচ্ছ্র বাহুল্যং শ্রেযসোহপি মনীষিণঃ। ভূয়স্তং ধ্রুবতে তত্র কৃচ্ছ্রে য়েহ্যবাপ্যতে।

অত্র যদ্যপি সকৃৎ কৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থ ইতি ন্যায়েন সকৃৎ পূজাকরণাদেব ফলসিদ্ধির্জায়তে। তথাপি ফলবাহুল্যায় দিনত্রয়াধিকং প্রত্যহং পূজ্যতে। তথাপি জৈমিনিঃ। ফলস্য কর্মনিষ্পত্তির্লোকবৎ পরিমাণতঃ। যথা লৌকিককর্ষণা-দীনাং বাহুল্যে পুনঃ ফলাধিক্যং তথা বৈদিককর্মনামপীত্যন্বয়ঃ। এবং কর্ম কুর্বতাং যত্তাদৃশং ফলং ন দৃশ্যতে তৎ কলিস্বভাবাৎ।

। তথাচ বিষ্ণুপুরাণম্।

যদা যদা সতাং হানির্বেদমার্গানুসারিণাং। তদা তদা কলেবৃদ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ। আরম্ভাশ্চাবসীদন্তি যদা ধর্মভৃতাং নৃণাং। তদানুমেয়ং প্রাধান্যং কলে মৈত্রেয় পাণ্ডিতৈঃ। মণ্ডলন্তু গৌড়মৈথিলকৃত্যসারে।

স্থণ্ডিলং হস্তমাত্রং চ মণ্ডলং চতুরস্রকং। চতুষ্কোণং চতুর্দ্বারং বক্তপদ্মাবিভূষিতং পূজয়েন্মনসাদেবীং তত্র নাগাষ্টকৈঃ সহ।

। অথ দেবীপুরাণম্।

সুপ্তে জনার্দনে কৃষ্ণে পঞ্চম্যাং ভবনাঙ্গনে। পূজয়েন্মনসাদেবীং স্নুহীবিটপসংস্থিতাং। পল্লবোহস্ত্রী কিশলয়ং বিস্তারো বিটপোহস্ত্রিয়ামিত্যমকরকোষাং। দেবীং সংপূজ্য নত্বা চ ন সর্পভয়মাপ্নুয়াৎ। পঞ্চম্যাং পূজয়েন্নাগাননন্তাদ্যান্মহোরগান্।

ক্ষীরং সর্পিস্তু নৈবেদ্যং দেয়ং সর্পবিষাহপহং। পরবচনং গারুড়েহপি। অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মোমহাপদ্মোহথ তক্ষকঃ। কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খোহ্যষ্টৌ নাগাঃ প্রকীর্তিতাঃ। তথা, কালীয়ং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ পিঙ্গলং মণিভদ্রকং। তথৈ-বৈরাবতং নাগং ধনঞ্জয়মথার্চয়েৎ। চতুর্দশ সমাখ্যাতা বরদাঃ কামরূপিণঃ। অত্র পূজয়েন্মনসাদেবীর্মিতি। দেবীপুরাণে দর্শনান্মনসাত্বিদং।

তেন ওঁ মনসা দেব্যৈ নমইত্যষ্টাক্ষরো মন্ত্রঃ।
মং মনসা দেব্যৈ নম ইতি বা।
ওঁ বিষহরায়ৈ নম ইতি সপ্তাক্ষরঃ।
বিংবিষহরায়ৈ ইতি বা।
তথাধিবাসঃ নির্ণয়ামৃতে হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র।
অধিবাসগৃহে দেবঃ শয্যায়াং শেতে যথাবিধি।
বসসাহোদ্যতে যস্মাদধিবাসঃ স উচ্যতে।
একরাত্রং দ্বিরাত্রং বা ত্রিরাত্রমপি বা তথা।
কর্তৃবৃত্ত্যনুসারেণ কুর্য্যাৎ সদ্যোহধিবাসনং।

সংস্কারোগন্ধমাস্যাদ্যৈর্যঃ স্যাত্তদধিবাসনং ইত্যমরঃ। জিব্যাতভি মনসাদেবদিবে প্রত্যয়াস্তান্বদাদিত্বাদি।

তথাচ শ্রীপতিঃ।

পঙ্কজং মনসাদেবী পদ্মনাভো যুধিষ্ঠির ইত্যাদি।
তেন ওঁ মনসা দেব্যৈ নম ইত্যেব মন্ত্রঃ।
মনসাদেবীতি পঞ্চাক্ষরনামত্বাৎ।

তথাচ ব্রহ্মপুরাণম্।

ওঙ্কারাদ্য সমাযুক্তং নমস্কারান্তকীর্তিতং

স্বনাম সর্বসত্ত্বানাং মন্ত্রইত্যভিধীয়তে।

ব্রযা মনো স্বনামাদ্যক্ষরং বীজং সর্বেষামভিধীয়তে।

ওঙ্কারান্তে চ ওঁকারং।

বিন্দুমধ্যস্থনামধেয়মাদ্যমক্ষরং।

দেবতানাং স্ববীজং তৎপূজায়ামৃদ্ধিসিদ্ধিদং।

অত্র ফলজনকপূর্বোক্তাৎ কর্মণোহপৈক্যাং অন্যথা সঙ্কল্পঃ।

বাহ্যাবসর্জনদক্ষিণাভেদঃ স্যাৎ। ততশ্চ শ্বো যিযক্ষুণাধিবাসদিনে ইঙ্গাধিকারায়তদ্বীজভূত-প্রধান্যপ্রধানাধিকারসম্পাদকঃ পুষ্পতিলজলত্যাগসহিতকামাভিলাষপূর্বকঃ প্রধানঃ সঙ্কল্পঃ কার্য ইতি দ্বৈতনির্ণয়ম্। ভৃঙ্গারস্নানাদিমন্ত্রাস্তু লৌকিকা এব। ভৃঙ্গারঃ স্বর্ণকর্করী। ভদ্রকুম্ভঃ পূর্ণকুম্ভ ভৃঙ্গারঃ কনকালুকা। কর্কর্যালুর্গলন্তিকেত্যমরং। পূজায়াং কায়শুদ্ধ্যর্থং প্রথমতো ভূতশুদ্ধিপ্রকারমাহ। ভবিষ্যপুরাণং। গন্ধাথায়তনং শুদ্ধং অর্কং শুদ্ধতনুর্যজেৎ। পূরকং কুম্ভকং কৃত্বা রেচকঞ্চ সমাহিতঃ। কৃত্বোঙ্কারেণ দোষায়াংস্তু হন্যাৎ কায়াদিসম্ভবান্। আদিপাদেন কাষ্ঠানসোরুপাদানং। বায়ব্যাগ্নেয়মাহেন্দ্রবারুণীভির্যথাক্রমং। কিল্বিষং ধারণাভিশ্চ হন্যাৎ শুদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ। শোষণে দহনে স্তম্ভে প্লাবনে চ যথাক্রমং। বায়্বগ্নীন্দ্রজলাখ্যাভির্ধার ণাভিঃ কৃতে সতি। ধ্যায়েদ্বিশুদ্ধমাত্মানং প্রণবেনার্কবৎস্থিতং। দেহং তেনৈব সঞ্চিন্ত্য পঞ্চভূতময়ং পরম্। তেনৈব প্রণবেন। সঞ্চিন্ত্য-সংঘট্য। স্থূলং সূক্ষ্মং তথাঙ্গানিস্বস্থানেষু প্রকল্পয়েৎ।

ইত্যাদীনভিধায় আবাহনাদি কর্মানি রক্ষাঞ্চ প্রণবেনতু। আদিপদেন সংস্থাপনসন্নিধাপনসন্নিবোধনানি বোধ্যানি। যাবদ্যাগাবসানন্তু সান্নিধ্যং পরিকল্পয়েৎ। দত্ত্বা পাদ্যাদিকাং পূজাং স্বাদ্বন্নঞ্চ নিবেদয়েৎ। জপস্থাতু বিধিবন্নত্বা ততো দেবং বিসর্জ্জয়েৎ। এষ কর্মক্রমঃ প্রোক্তঃ সর্বেষাং যজনক্রমে। অত্র বিসর্জয়েদিত্যন্তেন মূলপূজামভিধায় এষক্রম ইত্যনেন চ সর্বেষাং দেবানাং পূজনে আকাঙ্ক্ষিতভূতশুদ্ধ্যাদিকমুপচারদানাং পর্বমিতি দৃশ্যতে। ততঃ মূলমন্ত্রেণ বীজেন প্রণবেন প্রাণায়ামঃ। তথাচ কালীহৃদয়ে। প্রাণায়ামং এয়ং কৃত্বা মূলেন প্রণবেন বা। অথবা মন্ত্রবীজেন যথোক্রাবিধনা সুধীঃ। তথাচ তন্ত্রান্তরে। পূরয়েৎ ষোড়শভির্বায়ুং ধারয়েচ্চতুর্গুণৈঃ। রেচয়েৎ কুম্ভকার্দ্ধেন শক্ত্যাষং বীর্যকৈঃ। তদশক্তৌতচ্চতুর্থমেব প্রাণসংযমঃ। প্রাণায়ামং বিনা মন্ত্রপূজনে নহি যোগ্যতা।

শারদায়াং। অঙ্গহীনস্য মন্ত্রস্য স্বৈনৈবাঙ্গানি কল্পয়েৎ। অথ ষোড়শোপচারাঃ কৃত্যচিন্তামণৌ। আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্। মধুপর্কাচমনস্নানবস্ত্রাভরণানি চ গন্ধেপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনং তথা। প্রপঞ্চসারে অর্ঘ্যপাদ্যাচমনকমধুপর্কাচমনান্যপি গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তা উপচারা দশক্রমাৎ। গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তা পূজা পঞ্চোপচারিকা। মধুপর্কেত্যত্র পাঠিত্বাস্নানীয়েতি ধ্যানং পঠিত্বা। গন্ধপুষ্পমাত্রোপচারস্তু ব্রহ্মপুরাণে।

অনেনৈব বিধানেন গন্ধপুষ্পে নিবেদয়েৎ। কেবলং পুষ্পোপাচারস্ত্বাগ্নিপুরাণে। ধ্যাত্বা প্রণবং পূর্বন্তু তন্নাম্নাসুসমাহিতঃ। নমস্কারেণ পুষ্পানি বিন্যাসেত্তু পৃথক্ পৃথক্। উপচারাভাবে রাঘবভট্টঃ। সর্বোপচারবস্তুনামলাভেভাবনৈবহি নির্মলেনোদকেনাথ পূর্ণতেত্যাহ নারদঃ।

অথাভরণপূজা।

গৌড়াদিসংগ্রহে অঙ্গাস্ত্র বাহনে তস্যাঃ পূজয়েচ্চ ততঃপরং। নাগানাং প্রতিমাভাবেত্তু দেব্যা মুকুটাদিষ্বনন্তাদীন্ পূজয়েৎ। যথা অনন্তাদিত্রিনাগৈর্মুকুটং ভাবয়েদ্বুধঃ। কর্কটক-কুলীরাভ্যাং কর্ণাভরণভূষিতাং। শঙ্খপদ্মাঙ্কহস্তাঞ্চহ্নকথণকাঞ্চদা। তথা পূজয়েন্ মনসাদেব্যাঃ পুরতো গণনায়কং। দক্ষিণে চণ্ডিকাঞ্চৈব বাসুদেবঞ্চ পৃষ্ঠতঃ। বামভাগে মহাদেবং সর্বকামফলপ্রদং। যজেচ্ছিছ্ বান্তিকে গঙ্গাং বাসুদেবান্তিকে শ্রিয়ং। পুরোগ্রহনয়জদ্দেব্যা অবতারাংস্তথাপরান্। ইন্দ্রাদিলোকপালাংশ্চ স্ব স্ব :দিক্ষু প্রপূজয়েৎ। ততশ্চন্দ্রধরাদীংশ্চ যথানাম যজেৎ ক্রমাৎ। ততোহোম।

সারদাতিলকে স্থণ্ডিললক্ষণং যজ্ঞপার্শ্বঃ। হস্তামাত্রং স্থণ্ডিলং বা সংক্ষিপ্তে হোমকর্মণি। অঙ্গুল্যোৎসেধসংযুক্তং চতুরশ্রং সমন্ততঃ। খাদিরাদিশ্রুবাভাবে রাঘবভট্টধৃতসংহিতায়াং।

পলাশপত্রে নিশ্ছিদ্রে রুচিরে স্রুক্ শ্রুবৌ স্মৃতৌ। বিদধ্যাদ্বাশ্বথপত্রে সংক্ষিপ্তে হোমকর্মণি। হোমে স্বাহান্ততামাহ যজ্ঞপার্শ্বঃ। আদায় দক্ষিণে পাণৌ স্রুবং ত্রিমধুরং হবিঃ। ওঁ প্রাঙ্মুখোবহ্নিজায়ান্তে জুহুয়ান্ ন্যুব্জপাণিনা ত্রিমধুরং ঘৃতমধুশর্করাত্মকং। ন্যুব্জপাণিনেতিশাখান্তরীয়ং। বিষ্ণুধর্মোত্তরে। দূর্বাহোমঃ পরঃ প্রোক্তস্তেন স্বর্গে মহীয়তে। তস্মাদ্দশগুণং পুণ্যং ইক্ষুভিঃ প্রাপ্নুয়াৎ কৃতে। তস্মাদ্দশগুণং শস্যৈ ব্রীহিভির্দ্বিগুণং ভবেৎ। যতশ্চর্তুগুণং প্রোক্তং তিলৈ দশগুণং স্মৃতং। বিল্বৈ দশগুণং প্রোক্তং ঘৃতেনাষ্টগুণং ততঃ। ইত্যনেন ঘৃতস্য সর্বোত্তমত্বং দর্শিতং। মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশঃ। নমোন্তেন নমো দদ্যাৎ স্বাহান্তে দ্বিঠমেব চ। পূজায়ামাহুতৌচাপি সর্বত্রায়ং বিধি শি॰ ; অন্তেহবসানে। দ্বিঠং স্বাহা। অত্র ওঁ স্বাহা শব্দঃ স্বীয়দ্রব্যত্যাগার্থকঃ। যথাহ্ হরিশর্মা উপদিষ্ট হোমাঃ স্বাহাকার প্রাণাহুতয়ইতি। স্বাহাকারণে স্বাহেতিপদেন প্রদানং ত্যাগো যাসু আহুতিসু তাস্তথা। অতএব স্বাহাকারস্য প্রদানার্থকত্বাৎ হবিস্ত্যাগস্যাম্নায়সিদ্ধত্বেন কৃতার্থত্বাদ্ দ্বিতীয়স্যাম্নায়নর্থকং স্যাদিতি ভট্টভাষ্যম্ প্রদানার্থবত্বন্তু। তত্রৈব যত্র মন্ত্রস্থনাম্নি চতুর্থনন্তু তেন ওঁ মনসা দেব্যৈ নমঃ স্বাহেতি। হোমে দশাক্ষরী মন্ত্রং। ভবিষ্যে আহুতিস্তু ঘৃতাদীনাং স্রুবেণাধোমুখেনতু। হুণেতিলাজ্যাহুতিস্তু দৈবেনোত্তানপাণিনা। মহাকপিল পঞ্চরাত্রে। সংখ্যাপ্যুক্তা শতংসাষ্টং সহস্রং বাজপাদিষু। অত্রশান্তিকত্বাদ্বরদোহগ্নিঃ। গোভিল পুত্রঃ। শান্তিকে বরদঃস্মৃতঃ। শান্তিদীপিকায়াং বশিষ্ঠঃ। বন্দনাং কারয়েত্তেন শিরঃকণ্ঠাংশকেষু চ। কশ্যপস্যেতি মন্ত্রেণ যথানুক্রমযোগতঃ। ততঃ শান্তিং প্রকুর্বীত অবধারণবাচনম্। দক্ষিণা চ প্রদাতব্যা গ্রহানাঞ্চ বিসর্জনং।

শান্তির্বামদেব্যগানাদিঃ। অবধারণমচ্ছিদ্রাবধারণান্তরং কার্যং নতু পাঠক্রমাদরঃ। বৃথা বিপ্রবচো যস্তু গৃহ্নাতিমনুজঃ শুভে। অদত্বা দক্ষিণাং বাপি স যাতি নরকং ধ্রুবমিতি নারদীয়াৎ।

বিসর্জনানন্তরস্তনদ্যামুড়োপাদিস্থাপয়েন্নতু জলে। নদ্যাঞ্চস্থাপয়েদ্দেবীমুড়ুপোচাম্বরে ততঃ। ইতিলোকবাদাৎ তদশক্তস্থলে চ। অথাচ কামরূপত্বাদতি দা দক্ষিণাত্যৈঃ কালবিষহরীত্বে নাব্যবহার্যকৃষ্ণবর্ণা পূজ্যতে। অথ পূজাভেদাঃ দ্বিযামং বা চতুর্যামং হলীং কৃত্যর্চাদ্বিধাস্থিরানেস্কতিশ্চরহস্যর্চা এক রাত্রঃ তথাপরা। কৃদৃশীভিশ্চ পূজাভিরর্চিতারোগ্যদায়িকা। কৃমিতিদৈবাক্রীকাংরস্তস্মিন্ কৃতিঃ কারণং যস্যাঃ পূজায়াঃ সা ক্রীকৃতিঃ পূজেত্যর্থঃ। ন বিদ্যতে কুস্কতিবীক্ষণং যস্যাঃ পূজায়াঃ সালিক্ষতি। পূজেত্যর্থঃ অনুক্তঃ যদন্যদ্দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণ্যাম্ অনুসন্ধেয়ং গ্রন্থগৌরবাশঙ্কয়াত্র পুনর্নলিখিতমিতি। ইতি সমস্ত-প্রক্রিয়ালঙ্কৃত-ভূপতিবর-বীর-শ্রীদর্পনারায়ণ-দেবেন সময়বিজয়িনাজ্ঞপ্ত শ্রীবিদ্যাপতিকৃতৌ শ্রী-ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণ্যাং প্রধানতরঙ্গঃ প্রথমঃ। শ্রীব্যাড়ীচরণে মদ্ভক্তিরস্তু। [শ্রীহরি বামবাণ—শ্রীদুর্গাসহায়।]

প্রয়োগতরঙ্গঃ

ওঁ মনসা দৈব্যৈ নমঃ। স্মৃত্যাগমপুরাণাদিলোকবাদানুসারতঃ। ব্যাড়ীপূজার্বিধানস্য প্রয়োগোলিখ্যতেহধুনা। অথাধিবাসবিধিঃ। তত্র পূর্বদিনে কৃতিনিয়মোহধিবাসদিনে সায়মধিবাসাৎ প্রাক্ প্রাতঃকালে কৃতস্নানাদির্গোময়প্রতিলিপ্তদেশে দর্ভপাণিরাচম্ভ উদঙ্মুখোদর্ভযুক্তাসন উপবিষ্ট ব্রাহ্মণান্ স্বস্তির্বাচ্য ওঁ তদ্বিষ্ণোরিত্যনেন বিষ্ণুং স্মৃত্বা তৎসদিতুচ্চার্য তাম্রপাত্রং দর্ভত্রয়তিলজলপূর্ণং যথোৎপন্নং বা গৃহীত্বা ওঁ অদ্যামুকামাস্যমুকপক্ষেহমুকতিথেরারভ্য দিনত্রয়ং যাবৎ প্রত্যহমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাবধি ঋদ্ধিনৈরুজ্যপ্রাপ্তিসর্পভয়ান

ব্যাপ্ত্যৈহিকবিবিধভোগপারত্রিকস্বর্গমোদনকামোহমুকাপচ্ছান্তিকামো মনসাদেবীপ্রীতিকামো বা পূর্বস্বীকৃতমনসাদেবীপূজামহং করিষ্যে পরার্থঞ্চেৎ ষষ্ঠান্তেন প্রযোজ্য করিষ্যামীতি প্রয়োগঃ।

ইতি সঙ্কল্প্যত ফলমৈশান্ত্যং ক্ষিপ্তা ওঁ যজ্জাগ্রত ইতি পঠেৎ। যদ্যন্যদ্বারা পূজাং করোতি তদা তং বৃনুয়াৎ। ওঁ সাধুভবানাস্তমিতি বদেৎ। ওঁ সাধ্বহমাস ইত্যুক্তোপরিশেৎ। ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তমিতি বদেৎ। ওঁ অর্চয়েতি প্রত্যুক্তে। গন্ধপুষ্পাঙ্গুরীয় বস্ত্রাদিনার্চয়িত্বা দক্ষিণং জানুংবিধৃত্য। ওঁ অদ্যামুকেমাস্যমুকপক্ষেহশ্রীঅমুক।

ইতি ঘটশোধনং। ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্যস্কম্ভসর্জনীস্থো বরুণস্য ঋত সদন্যসি বরুণস্য ঋত সদন্যসি।

। অসমাপ্ত তথা অলিখিত।

পরিশিষ্ট—খ

'ময়ূরভট্ট—ধর্মমঙ্গল'

সম্প্রতি একখানি মাত্র আদ্যন্ত এবং মধ্যে মধ্যে খণ্ডিত নিতান্ত অসম্পূর্ণ পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া সম্পাদিত 'ময়ূরভট্ট—ধর্মমঙ্গল' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ময়ূরভট্ট ব্যতীতও মহেশ দাস নামক কোনও ব্যক্তির ভণিতা আছে। মহেশ দাসের ভণিতাগুলি এই প্রকার ঃ[২] —

(১) পুরাণের কথা বলি শুন এক চিত্ত করি
মহেশ দাস এ সব গায়।

(২) কথোক দিবসে যাই গৌড় নগর পাই
মহেশ দাসে ইহ রস গান।

(৩) ধর্মপদে মধুকর শ্রীমহেশ দাস।
অনাদ্যমঙ্গল গীত করিল প্রকাশ।।

(৪) কানুরায় মোর গুরু বৎসল কল্পতরু
হরিনামে শোধিত অন্তর।
তাহার সেবক কবি মহেশ দাস অনুভবি
বিরচিত অনাদ্য মঙ্গল।।

(৫) হেন বেলে বোধে বালা আণ্ডীর পাখড় ঘোড়া
মহেশ দাস এই রস গায়।

মহেশ দাস 'কবির নাম, না গায়ন বা লিপিকারের নাম'—এই বিষয়ে গ্রন্থসম্পাদকদ্বয় নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই। তথাপি মহেশ দাস ও ময়ূরভট্ট একই ব্যক্তি হইতে পারেন, তাহা অনুমান করিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন যে ময়ূরভট্টকে সকলেই 'দ্বিজ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মহেশ দাস নিজেকে 'দ্বিজ' বলেন নাই, দাস বলিয়াছেন, তবে উড়িষ্যার ব্রাহ্মণেরা এবং বৈষ্ণব ব্রাহ্মণেরা দাস পদবী গ্রহণ করেন, সুতরাং মহেশ দাসও 'দ্বিজ' হইতে পারেন। ময়ূরভট্ট নিজেকে ধর্মের সেবক বলিয়াছেন, মহেশ দাস নিজেকে 'কানুরাম'-এর শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইহার কোনও কারণ নির্দেশ না করিয়া গ্রন্থ-সম্পাদক মাত্র বলিয়াছেন, এই কানুরাম 'নিত্যানন্দ অনুচর পুরুষোত্তম দাসের পুত্র' হইতে

১। সম্পাদক অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (কলিকাতা, ১৩৮১) ভূমিকা ২৪ পৃ, মূল গ্রন্থ ৯৮ পৃ, পরিশিষ্ট ১৬ পৃ।
২। বানান শুদ্ধ করিয়া লওয়া হইয়াছে।

পারেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে মহেশ দাস 'ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগের কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোক।'

যে পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া মূল গ্রন্থখানি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় দিতে গিয়া গ্রন্থ-সম্পাদকদ্বয় লিখিয়াছেন যে পুঁথিখানি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুঁথিশালায় রক্ষিত ছিল। গ্রন্থাগারের একজন কর্মী তাঁহাদিগকে পুঁথিখানির সন্ধান দেন। তাঁহাদের ভাষায় 'পুঁথি সংখ্যা "সাহিত্য ৪২", পত্র ৩০-৮৮, আদ্যন্ত খণ্ডিত, মধ্যে মধ্যেও দুই-একটি পত্র নাই। পত্র সংখ্যা ৪৯। আকার ১৩$^{১}/_{৪}$ × ৪$^{৩}/_{৪}$ ইঞ্চি। দু'ভাগ তুলোট কাগজে লিখিত। বয়স আনুমানিক ১৫০—১৭৫ বৎসর। হস্তী চুরির অপবাদে লাউসেনের বন্দীদশা হইতে ইছাই বধের পর গৌড়েশ্বরের ধর্মপূজার জন্য মন্দির নির্মাণ পর্যন্ত এই পুঁথিতে পাওয়া যায়। ৫০ পত্রে ৫৪ বার ময়ূরভট্ট ভণিতা, ৪ বার মহেশ দাস, ২ বার "ময়ূরভট্ট অনুভবি" ও একবার "মহেশ দাস অনুভবি" ভণিতা স্থান পাইয়াছে।' পরিশিষ্টে আর একটি খণ্ডিত পুঁথি হইতে ধর্মমঙ্গলের কেবলমাত্র কাঙুর পালাটি মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ভণিতা খুব বিরল, ছাপা ১৬ পৃষ্ঠা পাঠের মধ্যে একবার মাত্র ময়ূরভট্টের ভণিতা পাওয়া যায়, যেমন—

এতেক বলিয়া রামা কান্দে উভরায়।
প্রভুর কৃপাতে [দ্বিজ] ময়ূরভট্টে গায়।।

ইতিপূর্বে ময়ূরভট্টের 'শ্রীধর্মপুরাণ' নাম দিয়া স্বর্গত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে যে একখানি সম্পূর্ণ পুঁথি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার বিষয় পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি (পৃ. ৭২৮)। তাহা ময়ূরভট্টের রচনা বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। ইহাও রূপরাম-ঘনরাম বন্দিত ময়ূরভট্টের পুঁথি বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বিশেষত আদ্যন্ত এবং মধ্যে মধ্যে খণ্ডিত একখানি পুঁথির কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন কয়েকখানি পাতার উপর নির্ভর করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও অত্যন্ত অসমীচীন। অথচ গ্রন্থ-সম্পাদকদ্বয় সম্ভবত মহেশ দাসের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিবার জন্য লিখিয়াছেন, মহেশ দাস পূর্ববর্তী কোনও কবির নামোল্লেখ করেন নাই।

রচনার কিছু নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

এত বলি লাউসেন দেব-নিরঞ্জন।
গৌড়েশ্বরে প্রভু স্বপ্ন দিল ততক্ষণ।।
চিয়াও চিয়াও ওরে রাজার নন্দন।
ত্রিদশের নাথ ডাকে করহ শ্রবণ।।
প্রভু যত ডাকি বলে না শুনে বচন।
কুপিলা তখন তবে দেব নিরঞ্জন।।
পদ তুলি লাথি মাল্য দেব রায়াধরে।

তিন ঝলক রক্ত তার মুখের উপর পড়ে।।
আপনার ভাল যদি চাখিরে কল্যাণ।
বন্দী মুক্তি করি দেহ্ ধর্ম্মের নন্দন।।
এত বলি গৌড়েশ্বরে দেব-নিরঞ্জন।
বিমানে চাপিয়া গেলা কাঞ্চণা ভুবন।।

পরিশিষ্টে মুদ্রিত 'কাঙুর পালা'র ভাষা এই প্রকার ঃ—

মন দিয়া শুন সভে ধর্ম্ম পুরাণ।
সকায় মহিমা শুন হঞা সাবধান।।
পাত্রকে মহারাজা কহেন সকল।
কাঙুরের রাজা আমাকে করে বল।।
তোমাকে বলিয়ে সাজ নব লক্ষ দল।
কামরূপ জিনিয়া ক [র] হ করতল।।
তবে ত আমর বড় বাড়িবে সখ্যতা।
জোড় হাতে মহামদ রাজাকে কন কথা।।

ইহাদের ভাষায় প্রাচীনত্বের এমন কি ১৬শ-১৭শ শতাব্দীর ভাষারও কোনও লক্ষণ নাই। যে পুঁথি বহুল প্রচার লাভ করে তাহার ভাষা স্বাভাবিক নিয়মেই পরিবর্তিত হয়, কিন্তু যে পুঁথির কোনও প্রচার হয় নাই, এমন কি, যাহার কবির নাম এই পর্যন্ত কোনও দিক হইতেই শুনিতেও পাওয়া যায় নাই, তাহার পুঁথির ভাষা আধুনিকতায় রূপান্তরিত হইবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। সুতরাং পুঁথিখানির আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

পরিশিষ্ট—গ

শব্দসূচী

অ

আ

খ

গ

ছ

জ

ঝ

ট

ড

ঢ

ত

দ

ধ

ন

প

ফ

ষ

স